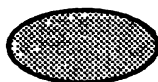
বর্তমান যুগে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পটভূমিকার কিছু দিক



শুভাশীষ গুপ্ত

সারস্বতকুঞ্জ

১১বি, নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

● প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

● প্রকাশক ঃ
সারস্বতকুঞ্জ
১১বি, নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

● প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীবলরাম প্রকাশনী
১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

● মুদ্রক ঃ
ওরিয়েণ্ট প্রেস, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

কৃতজ্ঞতা

সমস্ত ক্ষেত্রেই একথা সত্য যে কোনো রচনা একজন লেখকের দ্বারা সম্পন্ন হলেও আসলে সমাজ, পরিবেশ ও পরিস্থিতি তার প্রধান রসদ যোগায়। এর ব্যতিক্রম এই গ্রন্থের ক্ষেত্রেও ঘটেনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার'এ গ্রন্থটির বিষয়কে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছিলেন সংগঠন ও পত্রিকাটির নেতৃবৃন্দ। পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-এর লাইব্রেরী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ও প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরীর কর্মীরা অকৃপণভাবে নানা পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়েছেন। বন্ধুবর মুরারী মিত্র'র পক্ষ থেকে বিদেশী পত্রিকাসহ বহু বইয়ের সাহায্য পেয়েছি। নারী প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাতে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী সাহায্য পেয়েছি আমার শুভানুধ্যায়ী দীপা চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

পুস্তক আকারে ধারাবাহিক লেখাটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী। প্রকাশনার প্রকল্পটি পরিচালনা করেছেন এই সংগঠনের অন্যতম সংগঠক বন্ধুবর অজয় মৈত্র। তাছাড়া পুস্তকের গ্রন্থনা, ভাষা-সংস্কার ও বানান-সংস্কারের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন বন্ধুবর রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর বিশ্বাস ও প্রশান্ত সরকার। প্রুফ রিডিং-এ যুক্ত ছিলেন অঞ্জন সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ, উদয় ঘোষ, কুমারেশ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল, দীনেশ দত্ত, সিতেন মিত্র, সুবীর শিকদার, তাপস সেন প্রমুখ অনেকেই। লেখাপত্র 'টাইপ' করে দিয়ে সাহায্য করেছেন গোপা সিংহ রায় ও পার্থ চক্রবর্তী। পত্রিকাটির ছাপা, বাঁধাই ও প্রকাশনার কাজ সম্পাদন করেছেন সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইনডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেডের কর্মীবৃন্দ। গ্রন্থটির রচনায় ব্যবহৃত পুস্তকের তালিকা সংরক্ষণ করেছেন চন্দনা গুপ্ত। লেখাটির ধারাবাহিক রচনাকালে প্রসঙ্গগুলি নিয়ে তর্ক ও সমালোচনা প্রধানত এসেছিলো শ্রীমান সপ্তর্ষি গুপ্ত'র কাছ থেকে; 'লেবার প্রসেস' ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখযোগ্য সাহায্য পেয়েছি শ্রীমান রাজর্ষি গুপ্ত'র কাছ থেকে। তাছাড়াও আলোচনা-সমালোচনামূলক বহু চিঠিপত্র পেয়েছি চেনা-অচেনা শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে।

এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। এঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া আমার অন্য কোনো সম্বল নেই।

শুভাশীষ গুপ্ত

লেখকের কথা

অনেকটা অতৃপ্তি, বহুলাংশে উদ্বেগ ও তার ফলে উদ্ভূত এক ধরনের জেদ থেকে এই লেখার সূত্রপাত ঘটেছিল। এর পটভূমিকা ছিল এই রকম ঃ

আশির দশকের প্রথমার্ধ থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা সংশয় ও প্রশ্ন দেখা দিচ্ছিল। এই রকম মুহূর্তে পাশ্চাত্যের বামপন্থীদের নানা আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতি নিয়ে রচিত কিছু কিছু পুস্তক বা প্রকাশিত পত্রিকা পাঠের কিছুটা সুযোগও এসে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকের প্রাচুর্যও ছিল এই সময়ে। লক্ষ্য করছিলাম যে দেশ-বিদেশের শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েত আলোচক ও পাশ্চাত্যের আলোচকদের মতামতে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর ধারণা প্রকাশিত হচ্ছিল। এর কিছুকালের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবং অন্যত্র, বিশেষত ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে, নানা আলোড়ন দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'রেগনোমিকস' ও ইউনাইটেড কিংডম-এ 'থ্যাচারিজম'এর উদ্ভব এবং ১৯৮৫ সালে ব্রিটেনের খনি শ্রমিকদের সুদীর্ঘ ১০ মাসব্যাপী ধর্মঘটের পরাজয় ঘটে। এই সময় থেকেই ভারতে টেলিভিশন ব্যবস্থার গণ-ব্যবহার শুরু হচ্ছে। রাজীব গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকার, পুরানো আর্থনীতিক ব্যবস্থা থেকে, কিছুটা নতুন ধরনের প্রকরণ প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু করে। ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নতুন দলিলও এই সময়ে প্রকাশিত হয়। দেশে কম্পিউটার ও ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত শিক্ষা ও ব্যবহার এই সময় থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন ও অভিনব একটা প্রবাহ যে চারদিকে বইতে শুরু করছে এমন একটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু, এসব পরিবর্তনের তাৎপর্য কি, অন্যান্য দিকের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের উপরেও এর কোন প্রভাব আছে কিনা, থাকলে কি, তার কোন ধারণা করা যাচ্ছিল না। একজন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক হিসাবে এর পূর্ববর্তী প্রায় তিন দশক সময় ধরে মানসিকভাবে যেভাবে গড়ে উঠেছি, সংঘাত শুরু হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতার সাথে। প্রচলিত শৃঙ্খলাবোধের চাপে মনের ভেতরে সৃষ্ট এই আলোড়ন প্রকাশ্যে ব্যক্ত হওয়ার কোন সুযোগ না পাওয়ায় যন্ত্রণায় ভুগছিলাম নিজে। তবে মন্দের ভাল হিসাবে এটুকু অন্তত অনুভব করতে থাকি যে বিশ্বময় এক গুরুতর পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এবং এটাও বোধ করতে থাকি যে এই পরিবর্তন বুর্জোয়া বা কমিউনিস্ট—কোন অংশের বুদ্ধিজীবী বা ট্রেড ইউনিয়ন-সংগঠক-নেতারাই সম্ভবত যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না—কোথাও গুরুতর ফাঁক থেকে যাচ্ছে। আরও একটা বিষয় অনুভব করি যে পাশ্চাত্যের লিবারাল ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা যদিও বা উদ্ভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশের বুদ্ধিজীবীরা নতুন কোন অবস্থার আগমনের স্বীকৃতিটুকুও দিতে চান না, অন্তত পরবর্তীকালে বিকশিত বাস্তবতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি তাঁদের সেই সময়ের আলোচনাগুলিতে। তাঁরা পুঁজিবাদের বিপর্যয়ের কল্পিত চিত্রই তখনও এঁকে চলেছিলেন। সেই সময়ে নিজের চিন্তার জগতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বুদ্ধিজীবীদের আচরণও বিভ্রান্তির এক বড় কারণ হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশত এই রকম আকস্মিক উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশের ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বা বাম বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে আমাদের মতো সংগঠকরা কোন রকম সাহায্য যে পায়নি, তাও এক ঐতিহাসিক সত্য। এইসব কিছুর ফলে এক ধরনের একগুঁয়েমি মনে চেপে বসতে শুরু করে। নতুনের প্রসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ ও নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী তা ব্যাখ্যা করার কিছুটা চেষ্টা শুরু করি। ফলে এই রকম মুহূর্তে ট্রেড ইউনিয়নের সভা, সম্মেলন ও আলোচনা সভাতে আমার বক্তব্য অনেক সময়েই অসংলগ্ন অথবা অবাস্তব বা দুর্বোধ্য বলে কোন কোন অংশ থেকে অভিহিত বা ব্যাখ্যাত হয়েছে।

তৎসত্ত্বেও, ১৯৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনে, গোটা দেশের ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে এই সর্বপ্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব এবং শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গে একটি ওয়ার্কশপের শিরোনামে যৌথ উদ্যোগ নিই। চারটে 'নোট' তৈরি করেন সংগঠনের চার জন সংগঠক; এজন্য দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস ধরে তাঁরা ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। সারা রাজ্যের প্রতিনিধিদেরও এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তুতি নেওয়ার মতো তেমন তথ্য, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক ইত্যাদির তেমন সুযোগ তখন কোথায় পাওয়া যেতো ? তথাপি প্রযুক্তি শাখার ছাত্র হিসাবে বৃত্তিগত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে এবং কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত কিছু 'নোট' ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে জেলার কিছু কিছু সদস্যকে যথাসম্ভব প্রস্তুত করে সেই আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। 'নোট'গুলির মুখবন্ধে আমার তদানীন্তন ধারণার কিছুটা আভাষ দিয়েছিলাম নিম্নোক্ত বয়ানে ঃ

"এই শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যে নতুন ও অপরিমেয় গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব বা 'সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশন', সংক্ষেপে 'এস.টি.আর.' এর আবির্ভাব ঘটেছে, তার দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এটি সৃস্টি করেছে তুমুল ও সার্বিক দ্বন্দ্ব-আলোড়ন—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে;......."

"বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেবল বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের একান্ত বিষয় নয়। প্রকৃতি ও শ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্বে সৃস্ট এই সব আবিস্কার সভ্যতার অগ্রগতির সকল হাতিয়ার এবং সমগ্র সমাজের সম্পদ। স্বার্থপ্রণোদিতরাই এগুলিকে নিজেদের একান্ত কব্জায় রাখতে বিষয়টিকে কেবল বিশেষজ্ঞদের প্রসঙ্গ বলে প্রচার চালায়। সর্বশেষ "বিপ্লবটি" সর্বাধিক সামাজিক প্রভাব সৃস্টি করায়, জনগণের কাছ থেকে এটিকে দূরে রাখার ঐ ভেদবুদ্ধির প্রচার ও চেষ্টা, স্বভাবতই, তীব্রতর হয়েছে।........."

"ফলে ট্রেড ইউনিয়নসহ শ্রমজীবীদের বিভিন্ন ধরনের সংগঠনগুলির কাঠামো ও অন্তর্বস্তুতে এই সব দ্বন্দ্বগুলির প্রভাব পড়ছে। এই নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের শক্তিতে বলীয়ান মালিক শ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে মেহনতিদের সংগঠন ও সংগ্রামের পদ্ধতি-প্রকরণও নতুন বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছে।........."

"যে কোন ধরনের বিপ্লবই দার্শনিকতার জগতকে কম-বেশি আলোড়িত করে। পরস্পর-বিরোধী ভাবাদর্শের সংঘাত, এইরকম মুহূর্তগুলিতে তীব্রতর হয়। সমাজ-বিপ্লব বা বিজ্ঞান-বিপ্লব, যাই হোক না কেন, তা শ্রেণীগত বা প্রকৃতির সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব তীব্রতর করে। এস.টি.আর'কে কেন্দ্র করেও এই আদর্শগত সংঘাত তীব্রতর হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনও এর দ্বারা আক্রান্ত।........."

"যেহেতু এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবটি সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া। সেহেতু একই সাথে এটি বিশ্বের শ্রমজীবীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ-ঐক্য সৃষ্টির এক সুনির্দিষ্ট ভিত্তি হিসাবেও আবির্ভূত হবে।........."

"এক সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাতের গৌরব মাথায় নিয়েও এই সমগ্র সম্মেলনের বোঝা দরকার যে এই ওয়ার্কশপ একাডেমিক আলোচনার জন্য কেবল নয়। ভবিষ্যৎ-দায়িত্ব পালনের জন্য এক পূর্ব-প্রস্তুতি মাত্র।"

সমিতির এই প্রয়াসকে কোন কোন নেতৃত্ব উপেক্ষা করেছিলেন "অপ্রাসঙ্গিক" বলে;কেউ তুলেছিলেন শৃঙ্খলার প্রশ্ন—"কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন (ভারতের) পর্যন্ত যা বলেনি, চুনোপুঁটিরা বলছে তাই"; অনেকে একে বলেছিলেন "আড়ম্বর", "লোক দেখানো" ইত্যাদি। যাই হোক, সবই ইতিহাস হয়ে আছে। কিন্তু ইতিহাস থামেনি। অন্যদিকে, অপরিচিত প্রসঙ্গকে স্বাগত জানানোর মতো মানুষের একেবারে অভাবও হয়নি;উৎসাহ এসেছে কোন কোন নেতৃত্বের কাছ থেকেও। তবে শেষোক্তরা প্রধানত ছিলেন তুলনামূলকভাবে নিচুতলার সংগঠক-কর্মীরা, ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন সমিতির নেতা-সংগঠক ও কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী।

এই রকম একটা প্রতিকূল, বিভ্রান্তিকর এবং অনেকটাই অপ্রস্তুত অবস্থায়, ১৯৯৪ সালের মে-সংখ্যা থেকে, দেশের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় প্রচারিত ট্রেড ইউনিয়ন মাসিক মুখপত্র—'সংগ্রামী হাতিয়ার'এ (তখন এটির প্রচার সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষর কাছাকাছি, বর্তমানে পৌনে দু'লক্ষ) ধারাবাহিকভাবে, বর্তমান পুস্তকের শিরোনামেই, গঠনাত্মক নতুন পৃথিবী সম্পর্কে আলোচনা শুরু করি। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনাগুলি, (দু-তিনটি সংখ্যা বাদে) প্রায় প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, শুরুর মুহূর্তে এই প্রকল্পের গঠন, মর্মবস্তু ও লক্ষ্য সম্পর্কে নিজের কোন সুস্পস্ট ধারণা ছিল না; স্বভাবতই পরিকল্পনাভিত্তিক ক্রমানুবর্তী করে সেই আলোচনা নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি তখন। ফলে অনেক সময় একটি প্রসঙ্গের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের আগেই হয়তো অপর একটি প্রসঙ্গ পেশ করা হয়ে গিয়েছিল। এর প্রথম ও প্রধান কারণ যেমন সমগ্র বিষয় সম্পর্কে নিজের উপযুক্ত প্রস্তুতির আগেই এ কাজে হাত দেওয়া, অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল মুহুর্মুহু সৃস্ট নতুন নতুন বাস্তবতার অভিঘাতে জর্জরিত হওয়া। আসলে নিজের মানসিকতায় এক ধরনের 'আরজেন্সি' তাড়া করে বেড়াচ্ছিল—সময়ের পেছনে যাওয়ার আশঙ্কা। ফলে অপরিণত ও কিছুটা চপলতার চাপের শিকার হতেও কেন জানি তখন সংকোচ হয়নি। নানা সূত্র ও ব্যক্তির কাছ থেকে যখন যেভাবে এই প্রসঙ্গে যে পুস্তক, পত্রিকা, তথ্য, সংবাদ ইত্যাদি পেয়েছি, তা নিজের আলোচনার ক্ষেত্রে যতোটুকু প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে, তাই নির্ভয়ে ব্যবহার করে যাচ্ছিলাম। আলোচনার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ নতুন, অপরিচিত ও জটিল বলেই কেবল নয়, পরিবেশনায় অবিন্যস্ততা এবং প্রাপ্ত নতুন নতুন প্রসঙ্গ ও শব্দগুলিকে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের শাখার ভাষায় উত্থাপনের পরিবর্তে নিজের ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার, গুরুত্বপূর্ণ একটি ট্রেড ইউনিয়ন পত্রিকার সীমিত সংখ্যক পৃষ্ঠার একটা বড় অংশকে এক ধরনের দখল করে নেওয়া, পত্রিকার এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠকের প্রসঙ্গটি সম্পর্কে নিস্পৃহতা প্রভৃতির ফলে ধারাবাহিক রচনাটি সম্পর্কে কোন কোন মহলে বিরূপতার চিহ্নও দেখা দিতে থাকে। এমনকি সংগঠনের একটি জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত করে পত্রিকা নিয়ে কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনাতে বিনীতভাবে জানায় যে এতো দীর্ঘ আলোচনা পত্রিকায় ছাপানো কতোখানি বাঞ্ছনীয় হচ্ছে তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। ফলে আলোচনাটি সংগঠনের পক্ষে ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা, এই রকম একটা সংশয়ের মুখে একজন সংগঠক হিসাবে তৎক্ষণাৎ বাস্তবতায় ফিরতে হয়েছে। অনেকটা ব্যক্তিগত ইমোশনকে থামাতে ১৯৯৭-এর ডিসেম্বরের পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনা বন্ধ করি। তারপর থেকে পুস্তক রচনার জন্য ভাবনা শুরু হয়। বহু শূন্যস্থান পূরণসহ পুস্তকটির প্রসঙ্গের স্বাভাবিক বিকাশের উপযোগী করে গ্রন্থনার কাজে হাত দিতে হয়েছিল। বহু লেখা যেমন বাদ দিতে হয়েছে, আবার বহু নতুন নতুন প্রসঙ্গও এসে পড়েছে আলোচনাতে। তাতেও সময় লেগে গেল প্রায় এক বছর। মোট ফল হিসাবে বলা যায়, এই পুস্তকটির রচনাতে, প্রস্তুতি পর্বসহ, মোট সময় লেগেছে এক দশকের বেশি সময়কাল। পাশাপাশি মানসিক স্তরে নিজের সাথে নিজের সংগ্রামের অন্যতম ফল এই গ্রন্থটি।

পুস্তকটির বিস্তার বিশ্ব পরিসর জুড়ে—উন্নত-অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে। অনুন্নত দেশের তথ্য তেমন পাওয়া যায় না বলে, সমস্ত ক্ষেত্রে তৃতীয় দুনিয়ার প্রতি সুবিচার করা গেছে, এমন দাবী করা যায় না। আরও বিশেষত, ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে তৃতীয় দুনিয়ার তথ্য পাওয়া খুবই দুরূহ। অথচ বর্তমানে তৃতীয় দুনিয়াই সর্বাপেক্ষা আক্রান্ত। তবুও তথ্যের এই সীমাবদ্ধতা কাটাতে সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে।

সমগ্র গ্রন্থটি দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বিশ্ব-পুঁজিবাদের বর্তমান আঙ্গিক অর্জনের পটভূমিকাটি বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং এই খণ্ডটি অনেকটাই ইতিহাস ও ঘটনার বিবরণমূলক। প্রথম খণ্ডে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলন এবং এসব বিষয়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা বাস্তবতা ও সংশ্লিষ্ট তথ্য-তত্ত্ব, তর্ক-

বিতর্কের কিছু ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড মূলত আধুনিক বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর দুনিয়া। তাই এখানে প্রথম খণ্ডের মতো বিষয়বস্তুর পরিসর ততোটা ছড়ানো নয়; দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনাকে সীমিত ও কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে পুস্তকটির শিরোনামের প্রসঙ্গের মধ্যে।

সমগ্র পুস্তকের কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে 'লেবার-প্রসেস' বা শ্রম-প্রক্রিয়াকে। 'ডাইলেকটিক্যালি' তথা দ্বান্দ্বিকভাবে পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেওয়া ছাড়াও, পরিস্থিতিকে বিচারের হাতল হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে 'লেবার-প্রসেস'কে। স্বদেশী-বিদেশী প্রাসঙ্গিক চর্চাগুলির ক্ষেত্রে, বামপন্থী অংশও, 'লেবার-প্রসেস'কে কার্যত তেমন কোন গুরুত্ব কখনো দেননি, সামান্য দু'একটি অতি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া। তাই, শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র অবস্থার মূল্যায়ন 'লেবার-প্রসেস' হাতিয়ার হিসাবে অতীতে তেমন ব্যবহৃত হয়নি। শ্রমিকশ্রেণীর আধুনিক অবস্থার মূল্যায়নেও এই মনোভাবের তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। পুঁজিবাদের সমগ্র ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ পরিস্থিতি বিচার করতে হলে, মনে হয়, 'লেবার-প্রসেস'কে অনুসরণ করাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান পরিবর্তনের প্রবল ঘূর্ণাবর্তের মুহূর্তে এই পদ্ধতির সাহায্যে মূল্যায়নের চেষ্টা অনেক বেশি কার্যকরী হবে বলে মনে হয়েছে। বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিটি কেবল শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে নয়, সমগ্র সমাজ প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

ইতিহাসের দিকে যদি নজর দেওয়া যায় তবে সততই দেখা যাবে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্তরে নতুন বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্রের উৎপাদন-প্রক্রিয়ারও সব সময় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটেছে। তার ফলে শ্রম-প্রক্রিয়ার স্তরেও ঘটেছে প্রবল উৎক্ষেপণ। আর এই পরিবর্তনের প্রথম ও তুমুল প্রভাব পড়েছে শ্রমিকশ্রেণীর উপর। কেননা, লক্ষ্যণীয় যে প্রত্যেকটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সাথে পুঁজিবাদের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলির প্রত্যক্ষ ও গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, বাষ্পশক্তির উদ্ভবের সাথে শিল্প-পুঁজিবাদের, বিদ্যুৎ শক্তির সাথে সাম্রাজ্যবাদী স্তরের, পারমাণবিক শক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স-কম্পিউটার ব্যবস্থার সাথে বর্তমান পুঁজিবাদের 'বিশ্বায়নে'র স্তরের। পুঁজিবাদের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক রূপান্তরও ঘটেছে। এই সমগ্র উৎপাদন-প্রক্রিয়া তথা শ্রম-প্রক্রিয়ার অনুধাবনে ব্যর্থতার অন্যতম কারণেই কোন কোন মহলে বিভ্রান্তি ঘটেছে—শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বের বিলোপ এবং তার ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম, ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনের অবসানের তত্ত্ব ঘুরে ফিরে এসেছে। বর্তমানেও এই 'রিভিশনিস্ট ক্রাইসিস'-এর উত্থান লক্ষ্য করা যায় এই কারণে।

লেখাটি ধারাবাহিকভাবে যখন প্রকাশ হতে শুরু করেছিল তখন ট্রেড ইউনিয়নের সামনে 'বিশ্বায়ন' প্রসঙ্গ ততোটা স্পষ্ট ও গুরুতরভাবে সামনে আসেনি। বরং সমকালের ঘটনাবলীর আলোচনাতে পুঁজিবাদী বিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলিকে প্রথমে সংগ্রহ ও দৃশ্যমান বাস্তবতাকে উত্থাপনের কাজটাই প্রধান হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার পূর্বপটে কি কি ঘটেছিল তা' যথাসম্ভব বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল জরুরি। এক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে প্রথমে যা' দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তা' হলো, সত্তর দশকের প্রথমার্ধে একইসাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী বিশ্ব, বিপরীত দিক থেকে, সংকটের একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছিল। ক্রমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের কারণ ও সমাধানের পথ সমাজতান্ত্রিক পথে অনুসন্ধান না করে পুঁজিবাদী পথের সাহায্য নিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ের গভীরে নেমে যায়; অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজ প্রণালীর মধ্যেই ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে সংকট থেকে উত্তরণের। সাফল্য তারা শেষ পর্যন্ত পেয়েছে কি না, সেই শেষ উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি; কিন্তু নতুনভাবে বাঁচার চেষ্টায় তারা বেশ কিছুটা সাফল্য যে পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। গ্রন্থটির গঠনে এই ইতিহাসও জড়িয়ে গেছে। তবে, ট্রেড ইউনিয়নকে কেন্দ্রে রেখে যেহেতু

এই গ্রন্থের আলোচনা, স্বভাবতই তাতে অর্থনৈতিক 'বিশ্বায়ন'এর প্রসঙ্গ মঞ্চ-কেন্দ্রের স্থান গ্রহণ করেনি। এই কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হচ্ছে একটি কারণে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন প্রসঙ্গ কেন্দ্রে না রেখে এখন কোন আলোচনাই ট্রেড ইউনিয়নে হচ্ছেনা।

শ্রমিকশ্রেণীর গঠন ও অবস্থান সম্পর্কে ধারণা এখন অনেকটাই ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে গড়ে উঠছে। এ কেবল নতুন উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার ফলে ব্যাপ্ত অংশ বা অসংগঠিত ক্ষেত্র প্রভৃতি জুড়ে নয়, বহু বামপন্থী সমাজতাত্ত্বিক ও ট্রেড ইউনিয়ন বারবণিতা, হিজড়া এমন কি সমকামী প্রভৃতি সামাজিক গোষ্ঠীকেও শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্গত বলে অভিমত ও যুক্তি দিচ্ছেন। বর্তমান পুস্তকে এইসব সামাজিক অংশের প্রসঙ্গও বাদ দেওয়া হয়নি। ফলে, দৃশ্যত এমন মনে হতে পারে যে পুস্তকটি শ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজতত্ত্বের প্রশস্ত আঙ্গিনায়, অপ্রয়োজনে, পা দিয়ে ফেলেছে। এমন ধারণা হলে, তার ত্রুটি স্বয়ং লেখকেরই সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা অনুভূতি ও নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এসব প্রসঙ্গকে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে এবং বর্তমানকালে অনতিক্রম্য বলে বিশ্বাস করে, সেগুলিতে সামান্য বিচরণের চেষ্টা হয়েছে এখানে। কেননা বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে এঁদের প্রসঙ্গ ও সমস্যাগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সৃস্টও বটে। তাছাড়া, এঁদের সংগঠন ও আন্দোলনগুলির অভ্যন্তরে পুঁজিবাদ বিরোধী মর্মও গড়ে উঠছে। সমকামীদের সমস্যা যেমন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীভূত, অন্যদিকে বারবণিতা ও হিজড়াদের প্রসঙ্গ তৃতীয় দুনিয়াসহ উন্নত দুনিয়ার অন্যতম সর্বজনীন সমস্যায় পরিণত হচ্ছে, যেমন হয়ে উঠছে লিঙ্গ-বর্ণ-ধর্ম-বয়স-অভিভাষী প্রভৃতিদের সমস্যা।

পুস্তকটির বৈশিষ্ট্যের অন্যান্য বিভিন্ন দিকের আর কোন উল্লেখ না করে, এটির বিশেষ ত্রুটির কয়েকটি দিক সবিনয়ে স্বীকার করা বেশি প্রয়োজন। যেহেতু দীর্ঘ তিন বছর ধরে ধারাবাহিক রচনা হিসাবে বর্তমান গ্রন্থটির একটি খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল, তার ফলে, সেগুলিতে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে অনুরূপ ধরনের বা একই প্রসঙ্গের পরিসংখ্যান বা তথ্য ব্যবহার করার সময় তথ্যগুলি পূর্ব প্রদত্ত থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, গ্রন্থ আকারে ছাপার সময় ধারাবাহিক রচনার খসড়াটি খুব গভীর ও যত্ন সহকারে সংস্কার বা 'এডিটিং' করা সম্ভব হয়নি সময়াভাব ও ব্যস্ততার জন্য। তাই পুনরুল্লেখ বা একই প্রসঙ্গ একাধিকবার আলোচিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। একইসাথে আরও যে কথা স্বীকার্য তা হলো কোন একটি প্রসঙ্গ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে প্রথমে উপনীত হয়েছিলাম, পরবর্তীকালে অনুরূপ প্রসঙ্গে হয়তো ভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। এটা এক ধরনের স্ব-বিরোধিতা। একথা উল্লেখ করার কারণ হলো যে পরিবর্তনের প্রথম ধাক্কাতে কিছুটা বিচলিত হওয়া ও দৃশ্যমান পরিস্থিতির দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত হওয়ার প্রভাব প্রথম দিকে এভাবে পড়েছিল। পরের দিকে ধারণা ক্রমশ স্বচ্ছ হতে থাকায় মূল্যায়ন ও মন্তব্য ভিন্ন পথ নিয়েছে।

তৃতীয়ত, লেখকের যোগ্যতার ও ক্ষমতার চাইতে প্রকল্পটা বেশি বড় ও ভারী হয়ে যাওয়ার গুরুতর পরিণাম কোন কোন অধ্যায়ে যে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের মধ্যে 'ওভার অ্যাম্বিশন' কাজ করেছিল। সেই 'ওভার-অ্যাম্বিশন'এর একটা বড়ো দিক ছিল বাংলা ভাষায় অন্তত এসব বিষয় নিয়ে সর্বপ্রথম কাজ করার আকাঙ্ক্ষা। এমন কিছু বিষয়ও, যা ভালভাবে আত্মস্থ নয়, সেসব বিষয় কিছু বইপত্র ঘেঁটে বোঝা ও উত্থাপনের চেষ্টার ফলে এমনও হতে পারে যে প্রসঙ্গগুলি যথোপযুক্তভাবে উত্থাপন করা যায়নি বা কম-বেশি অসম্পূর্ণ রয়েছে। লেখাটি শুরু করার আগে এটা বুঝতে পারিনি যে কাজটা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ক্রমশ অকূল পাথারে পড়ে যাব। তার ফলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য জলে পড়া মানুষকে যেমনটি মরিয়া চেষ্টা করতে হয়, তেমনি কোনক্রমে তরে যাওয়ার চেষ্টা

করতে হয়েছে কিছু কিছু প্রসঙ্গে। তবে একটা তৃপ্তি এক্ষেত্রে আছে। তা' হলো, ভীতির দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রসঙ্গগুলিকে এড়িয়ে যাইনি।

চতুর্থত, ট্রেড ইউনিয়নের মুখপত্রে লেখার সততই একটি বৈশিষ্ট্য থাকে—যাতে থাকে ক্যাম্পেন করার আঙ্গিক। এক একটি প্রসঙ্গ বা অধ্যায় সমাপ্ত করতে গিয়ে বিশেষত সেই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়। এই রীতিটি ধারাবাহিক রচনাকালে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু পুস্তক আকারে প্রকাশ প্রসঙ্গে যখন গ্রন্থনার বিষয়টি এলো, তখন দীর্ঘকাল ধরে বয়ে আনা প্রবণতাটি কাটানো কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সচেতনভাবে তা অপসারণের চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে কাজটা পুরোপুরি করা যায়নি; কোন প্রসঙ্গ বা অধ্যায়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে তার রেশ থেকে গেছে।

পঞ্চমত, বিনা মতবাদে কোন 'সিরিয়াস' আলোচনার চেষ্টা হতে পারে না। তথাকথিত নিরপেক্ষতার ভাণ বা 'ক্রিটিক্যাল ক্রিটিসিজম'এর নামে যেসব লেখা প্রকাশিত হয়, কার্যকালে কোন একটি বিশিষ্ট মতবাদকে আশ্রয় বা সমর্থন না করে তা পারেনা। এই পুস্তকে, লেখকের ধারণা মতো 'ক্রিটিক্যাল' পর্যালোচনা ও মন্তব্য আছে ঠিকই, তবে তা তথাকথিত মতবাদহীন নয়। তবে মতবাদসহ সমালোচনার এই দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষেত্র বিশেষে ও কোন কোন সময়, প্রচলিত ও প্রচারিত নীতিবাক্যের তর্জ্জনীকে শিরোধার্য করেনি। পাশাপাশি মতবাদকে গোপন রেখে পাঠককে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়নি। পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে তা সোচ্চারেই বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠত, গ্রন্থটির বাক্য বিন্যাসে, বহু ক্ষেত্রে, জটিলতা রয়েছে। লেখক সম্পর্কে এ সমালোচনা বহুল প্রচলিত। এক্ষেত্রে নিজের ত্রুটিটাই বড়ো। প্রথমত বিশুদ্ধ বাঙালী যুবকের প্যাটার্ণে যৌবনে কবিতা লেখার অভ্যাস তৈরি হয়েছিল। কবিতার বাক্য গঠন আর প্রবন্ধধর্মী রচনাশৈলীর চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যৌবনের অভ্যাস মজ্জায় মজ্জায় জমে থাকায় তার প্রভাব পড়েছে এই পুস্তকের রচনা বিন্যাসে। তদুপরি ইংরেজী ভাল লিখতে পারিনা নিজে, কিন্তু ব্যাপক পরিসরের ইংরেজী বই পড়তে হয় প্রাণান্তকর চেষ্টায়, তারও একটা প্রভাব আছে—বিশেষত আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের রচনার। ইংরেজী 'কমপাউন্ড' ও 'কমপ্লেক্স সেনটেন্‌সে'র মধ্যে 'ক্লজে'র দাপটে পংক্তির শুরুর সাথে লেজকে মিলিয়ে নিতে যে কাঠিন্য, ইংরেজী রচনার ভাল কিছু তেমন আয়ত্ত্ব করতে পারিনি, কিন্তু এই দিকটা যেন কেমন করে আত্মস্থ হয়ে গেছে। তাই বাক্য বিন্যাস নিয়ে এত যথার্থ বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। তাছাড়া স্বচ্ছন্দ গতির লেখা সেই লেখকের প্রধানত গড়ে ওঠে, যিনি সমগ্র প্রসঙ্গ সম্পর্কে চিন্তনের স্তরে অর্থাৎ উপলব্ধিতে স্বচ্ছন্দ হয়েছেন। এক্ষেত্রেও লেখকের দুর্বলতা, সন্দেহ নেই, অনেকটাই। তবে চৌকাঠ তো সব শিশুকেই পার হতে হবে।

এই গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণের প্রকাশের জন্য মোট খরচ বাদ দিয়ে, যে লাভ পাওয়া যাবে তা সম্পূর্ণ ব্যয়িত হবে পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের 'কর্মচারী কল্যাণ তহবিল'এর ব্যয়ের প্রয়োজনে। এই সংগঠনের একজন সদস্য হিসাবে সংগঠনের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। এই বিনম্র প্রয়াস আসলে নিজেই কৃতার্থ হওয়ার জন্য।

শুভাশীষ গুপ্ত

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৯

বিষয়সূচী*

* [পাঠক মহোদয়কে বিষয়সূচীর ধারা ও ভাগ অনুযায়ী অনুসরণের জন্য অনুরোধ জানাই। কেননা পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়, ধারা-উপধারাগুলির শিরোনামের হরফ ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ না করায় পাঠকের বিভ্রান্তির আশঙ্কা রয়েছে।]

ভূমিকা

একটি শতাব্দী ও একটি সহস্রাব্দকে অতিক্রম করার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্ব-মানব-সমাজ। আগামী একবিংশ শতাব্দী ও তৃতীয় সহস্রাব্দ সভ্যতার জন্য কি প্রতিশ্রুতি বা আশঙ্কা বহন করে আনছে তা' প্রায় সর্বাংশে অনির্ণীত। বরং বলা যায় যে সমগ্র ইতিহাসে বিশ্ব-সমাজ নতুন শতাব্দীর সম্মুখীন হয়ে এত জটিলতা ও বিভ্রান্তি, আশা-নিরাশার দোলাচলতার মুখোমুখি হয়নি। সমস্ত দিকের বিচারে এ'কথাই সম্ভবত বলা চলে যে সভ্যতার ইতিহাসের বৃহত্তম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে বর্তমান মানব-সমাজকে। তাই বর্তমান শতবর্ষ শেষে, প্রত্যাসন্ন শতাব্দীর কালপর্ব সমাজ-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখার সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হবে সন্দেহ নেই। স্বভাবতই আজকের জীবন্ত ও সচেতন প্রাণ-সত্তার সামনে প্রধান প্রশ্নটি হলো অন্তর্লীন বা প্রকাশ্য এই আবর্ত-প্রবাহী পরিস্থিতিতে নিজ অবস্থান কি হবে;এই প্রাণবন্ত রঙ্গমঞ্চে একের ভূমিকা হবে কি নিছক দর্শকের অথবা সক্রিয় অভিনেতার, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তব্য সমুপস্থিত। তবে একটি কথা নির্ধারকভাবে বলা যায় যে ভবিষ্যৎ কোনক্রমেই নির্লিপ্তকে স্বীকৃতি দেবে না।

মানবজাতির পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় সহস্রাব্দ ও বিংশ শতাব্দী এক বিরল অধ্যায় মাত্র নয়, সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠও বটে। বর্তমান সহস্রাব্দেই মানবজাতি সর্বপ্রথম তার বিশ্ব-পরিচয় জেনেছে। খণ্ড খণ্ড এলাকায় অবস্থান ও ঘেরাবদ্ধ ভূমিকা পালন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত অংশের মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে স্বাভাবিক ও নিয়মিত যোগাযোগ সৃষ্টি ও ভাবের সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-পরিচিতি ও ধারণা গড়ে উঠেছে মানুষের। এইভাবে আঞ্চলিক সত্তা থেকে বিশ্ব-সত্তা গঠিত হয়েছে মানুষের। দুনিয়াজুড়ে বসতি ও পূর্তবিদ্যা, যোগাযোগ, পরিবহন, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, ভাষা, হরফ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, যুদ্ধ-বিদ্যা, আচার, নীতি, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, আইন, প্রচার ইত্যাদি সমস্ত দিকের উদ্ভব, উন্নয়ন, বিকাশ ও সংহতি এবং সেগুলির বন্টন ঘটেছে এই সহস্রাব্দে। স্বভাবতই সহস্রাব্দটি ছিল, এক অর্থে, পরিণত মানবজাতি গঠনের কাল-পর্ব।

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের অভ্যন্তরে তো বটেই, সমগ্র সভ্যতার ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী মহত্তম সন্দেহাতীতভাবে। অতীতের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের কালের বা ইউরোপের রেনেসাঁ-র অধ্যায়ের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল নিছক গণ্ডীবদ্ধ ভৌগোলিক এলাকাতে অথবা একটি বা একাধিক জাতির মধ্যে এবং কয়েক শতাব্দী বিস্তৃত। কিন্তু একটি শতাব্দীর অভ্যন্তরে এবং বিশ্বময় ও সমস্ত জাতিকে আবৃত করে সর্বোচ্চ সাফল্য ও মহত্ত্ব অর্জিত হয়েছে কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীর অভ্যন্তরেই।

এরিক হবস্‌বম বিংশ শতাব্দীকে দেখেছেন ১৯১৪ থেকে ১৯৯১ সালের 'শর্ট টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' হিসাবে। তাঁর মূল্যায়নে সমগ্র শতাব্দী হলো 'এজ অব এক্সট্রিমস্' বা চরমতার যুগ। সমগ্র শতাব্দীকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন : ১৯১৪-৪৫ 'এজ অব ক্যাটাস্ট্রফি' বা বিপর্যয়ের যুগ, ১৯৪৫-৯০ 'গোল্ডেন এজ' বা স্বর্ণযুগ এবং ১৯৯০ পরবর্তী 'দা ল্যাণ্ডস্লাইড' বা ধসের কাল-পর্ব। বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বিংশ শতকের ১৯১৪ সাল পর্যন্ত হবস্‌বমের পূর্বে প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থের সাথে পূর্বোক্ত সর্ট বা সংক্ষিপ্ত বিংশ শতকের ইতিহাস, প্রকৃত প্রস্তাবে, মূল্যায়নের সঠিক স্তর অর্জন করেনি। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়গত ও আশু ফলাফলকে বিষয়ীগত ও দীর্ঘমেয়াদী হিসাবে বিশ্বাস করেছেন। আসলে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের একটি বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক মডেলের বিপর্যয়ের প্রভাব তাঁর মত অনেককেই এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে সমাজ-বিকাশের প্রমাণিত নিয়মাবলী পর্যন্ত দৃষ্টিতে ধূসর হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে একাংশ বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে শ্রেণী-সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ও সামাজিক নিয়মের

সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা হলেও, রূপান্তরিত শ্রেণী শ্রেণী-সত্য হিসাবে সর্বাত্মকভাবেই বিদ্যমান এবং সম্পূর্ণ সক্রিয়; সর্বকালের মতই শ্রেণীর ভূমিকা তথা শ্রেণী-সংগ্রাম, নেপথ্যে বা প্রকাশ্যে, সম্পূর্ণ অব্যাহত। কেননা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্বহীন তথাকথিত নতুন বিশ্ব, সংকটহীন বিশ্বে পরিণত হয়নি। বরং সংকটের ভয়ঙ্কর তীব্রতার জন্য আগামী শতাব্দীকে এখনও স্পষ্টভাবে আঁচ করা সম্ভব হচ্ছে না। আর এই সংকটের দ্বারাই প্রতিফলিত হচ্ছে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। মানব-সভ্যতার ইতিহাসকে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস হিসাবে চিহ্নিত করার মার্কসীয়-বিজ্ঞান, এ কারণেই, সমাজ-বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়মকে শাশ্বত রেখেছে। সেই বিচারে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্যই হলো যে সভ্যতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ শ্রেণী-সংগ্রাম ঘটেছে এই শতকেই। এই শতাব্দীর ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মানব-সমাজের শ্রেণী-সংগ্রামের চূড়ান্ত একটি রূপ অর্জিত হয়েছিল। এই ঘটনাই সৃষ্টি করেছিল বিশ্বব্যাপী সুমহান ও বৃহত্তর শ্রেণী-সংগ্রামের পটভূমি। এটা ছিল শ্রমিকশ্রেণীর কাছে ঐতিহাসিকভাবে 'ভিক্টরি ইন ডিফিট' বা পরাজয়ের মধ্যে জয়। প্রায় চারশ' বছর ব্যাপী পুঁজিবাদের অপ্রতিহত বিশ্বময় জয়ের অধ্যায়ে এবং পরাজয়ে জর্জরিত শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম প্রকৃত জয় ছিল রুশ-বিপ্লব। আর এইভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম উন্মেষের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা জয় অর্জিত সমাজের অনিবার্য আগমনী ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ১৯৮৯ সালে ঘটেছে 'ডিফিট ইন ভিক্টরি' বা জয়ের মধ্যে আকস্মিক পরাজয়। অজস্র দেশের স্বাধীনতা অর্জন, উপনিবেশবাদের পতন ও সাম্রাজ্যবাদের প্রবল সংকট এবং বিশ্বের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে সমাজতন্ত্রের জয়ের মধ্যে এসেছে পূর্বোক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়, অন্য অর্থে পরাজয়। কিন্তু বলা যায় যে এই বিপর্যয় ইতিহাসের নিয়ম মেনেই ঘটেছে। কোন একটি মাত্র বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কি অতীতে ধনতন্ত্র পৃথিবীতে স্থায়ী রূপ পেয়েছিল? নেদারল্যাণ্ডস্, জার্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা। সমাজতন্ত্র একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়েই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পাবে, যখন ধনতন্ত্রের অন্তঃশক্তি নিঃশেষ হয়নি, এমন ধারণা অলীক ও অনৈতিহাসিক। তাই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ে বিশ্ব প্রতিবিপ্লবের সাফল্য, দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুযায়ী, দূরে অপেক্ষমাণ রেখেছে ভবিষ্যতের বৃহত্তর বিপ্লবকে। এই বিচারে বিংশ শতাব্দীর অপর বৈশিষ্ট্য হলো যে সমাজ বিকাশের নিয়মকে এটি বৃহত্তর মাত্রায় পুনঃপ্রমাণ করেছে।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেণী-সংগ্রাম ও তা' জনগণের পক্ষে সাফল্যের অন্যতম প্রধান নজির কোনগুলি? ১৯১৪-১৮-এর যুদ্ধ ও বিপ্লবের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে হোহেনজোলের্ন, হ্যাপস্বার্গ, রোমানভ ও অটোমান সাম্রাজ্য। ১৯৩৯-৪৫-এর যুদ্ধ ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধ্বংস হয়েছে জার্মানি, জাপান ও ইতালির ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিস্ত সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পক্ষ থেকে অজস্র আগ্রাসী যুদ্ধ চালানো সত্ত্বেও, বিপ্লব ও মুক্তি-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফরাসী, ডাচ, পর্তুগীজ, এমনকি বহুলাংশে আমেরিকান সাম্রাজ্যও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। নয়া উপনিবেশবাদ থেকে পুনরুপনিবেশবাদী(?) স্তরে বিশ্ব-পুঁজিবাদের আত্মপ্রকাশ ও নয়া বিশ্ব-শৃঙ্খলা গঠনের উদ্যোগকেও যদি বিচার করা যায়, তথাপি দেখা যাবে যে শ্রেণী-সংগ্রামের অভিঘাতে পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে চলেছে 'নিউ ওয়ার্ল্ড ডিস্অর্ডার' বা নতুন বিশ্ব-বিশৃঙ্খলা।

১৯৮৯ সালে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক ব্যাপক অংশে বিপর্যয়ের পর 'কোল্ড ওয়ার' বা ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল-পর্বের অবসানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শুরু হয়েছে আরও তীব্র দ্বিতীয় ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল-পর্ব। প্রথম ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রধানত ঘনীভূত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশেষত তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন বনাম সাম্রাজ্যবাদী শিবির, প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। এই কাল-পর্বে ঠাণ্ডা যুদ্ধ সামরিক ও রাজনৈতিক স্তরে মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় ঠাণ্ডা যুদ্ধের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে। সর্বোপরি উন্নত দুনিয়া বনাম

অনুন্নত দেশ ও জনগণের মধ্যে। অন্যভাবে বলা যায় যে এই ঠাণ্ডা যুদ্ধ পুঁজিবাদী নতুন বিশ্বায়নের শক্তি ও ব্যবস্থা বনাম সমগ্র জনগণের মধ্যে। এবং এই পর্যায়ের ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রধানত জারি হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরে। কিন্তু দুই ঠাণ্ডা যুদ্ধের মর্মের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। শ্রেণী-সংগ্রাম অভ্রান্তভাবে বহাল উভয় ক্ষেত্রেই। নতুন বিশ্ব-বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র পরিবর্তন ঘটেছে রূপের।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের ধারণা এক আরোপিত প্রসঙ্গ ছিল। আরোপিত এই অর্থে যে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' শব্দের অন্তরালে ছিল সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী—দুই ব্যবস্থার দুই মেরুতে অবস্থান ও শ্রেণী সংঘর্ষকে প্রকৃত মর্ম থেকে গোপন করা। কোন কোন অংশ এমনভাবেও প্রস্তাব করেছিল যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অর্থাৎ তথাকথিত সম-সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কৃত্রিম সংঘর্ষ, কিন্তু আসলে সহাবস্থানের প্রতীক। এদের মতে দৃশ্যত যেসব বিরোধ-সংঘর্ষ চলেছিল, সেগুলি ছিল মেকী ও উভয়ের মধ্যে আশু স্বার্থ-বিরোধের প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু, মতাদর্শগত সহ অন্যান্য বাস্তব দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও, এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় স্বয়ং নির্ধারকভাবে প্রমাণ করছে যে দুই ব্যবস্থার বিরোধ মেকী ছিল না, ছিল প্রকৃত। শ্রেণী-সংগ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্তর ও রূপ হিসাবেই তা' ছিল বলবৎ। আর শ্রেণী-সংঘর্ষ অনতিক্রম্য বলেই প্রথম ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ঠাণ্ডা যুদ্ধের উদ্ভব ঘটেছে। সুতরাং, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে—এই ঘোষণাকারীদের উদ্দেশ্যের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধকে অস্বীকার করার চেষ্টা আবারও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের নতুন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠত্বের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই কাল-পর্বে অবিস্মরণীয় 'ব্যাটল অব আইডিয়াজ'-এর পরিসরে। যে মূল দুই ধারাতে এই ভাবাদর্শগত স্তরের সংগ্রাম সভ্যতার সুদূর অতীত থেকে শুরু হয়েছিল, তা' অজস্র শাখা-প্রশাখাতে বিংশ শতাব্দীতে ছড়িয়ে পড়া শুধু নয় ঘনীভূতও হয়েছে। উত্তালময়তা ও বৈচিত্র্যে আজও সেগুলি ভাস্বর রয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রবেশ করেছে এক কালান্তরের পর্বে মাত্র।

প্রতি যুগেই শ্রেণী-সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে মতাদর্শের স্তরে সংঘাত চলেছে। কিন্তু অতীতে তা' কখনো বিশ্বময় রূপ পরিগ্রহ করেনি, যেমনটি করেছে বিংশ শতাব্দীতে। অতীতের সংগে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়ে মতাদর্শগত সংগ্রাম এই শতাব্দীতে মাত্রা পেয়েছে প্রায়োগিক স্তরে—জীবনের ও সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরে পূর্বের সমস্ত ধারাগুলি প্রাথমিকভাবে দুই মূল ধারায় সুসংবদ্ধ হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর পূর্বপটে দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। প্রথমটি হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রথম জাতীয় মুক্তি আন্দোলন—১৭৭৬-১৭৮২ সালব্যাপী আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সূচনায় 'ডিক্লারেশন অব ইণ্ডিপেনডেন্স'-এ "স্বপ্রকাশিত সত্য" ও "অপসারণের অসাধ্য অধিকার" হিসাবে সম্পত্তির অধিকারের নীতিকে রাষ্ট্রিক আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠার দ্বারা। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে প্রথমটির ৭২ বছর পর ১৮৪৮ সালে মার্কস-এঙ্গেলস রচিত 'ম্যানিফেস্টো অব দা কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ঘোষিত হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ও শোষিত মানুষের শৃঙ্খল-মুক্তির অখণ্ডনীয় ও অনিবার্য অধিকার। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে ঐ দুই মতবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দুই রাষ্ট্রিক শক্তির নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী 'ব্যাটেল অব আইডিয়াজ'-এর প্রবাহ সৃষ্টি করে।

মতাদর্শ একবার সৃষ্ট হওয়ার পর, সেটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে সেটির উদ্গাতা-শক্তির থেকে, যদি সামাজিক নিয়ম ও সত্য-র অব্যাহত সমর্থন থাকে সেই মতাদর্শের পিছনে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসানের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের অবসান বোঝায় না, যেমন বোঝায় না সমস্ত কলোনিগুলি বাহ্যত সাম্রাজ্য-হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী মতবাদের অবসানের। উভয়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হবে সেই অন্তিম ফলাফল এখনও অর্জিত হয়নি। ফলে 'ব্যাটেল অব আইডিয়াজ'-এর অবসানের পরিবর্তে, বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের জটিল ও বিভ্রান্তিকর বাস্তবতা

স্বয়ং প্রতিফলিত করছে মতাদর্শের স্তরের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের উপাদানটিকে। সংঘর্ষের ফলে উৎক্ষিপ্ত মাত্রাগুলিকে এখনও যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারা এবং নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে সূচনার অভাবের জন্য, সাময়িকভাবে অনুভূত হচ্ছে এত জটিলতা ও বিভ্রান্তি।

মানব-সমাজের জন্য শ্রেষ্ঠতম এবং অন্তিম ব্যবস্থা হিসাবে, বিশ্ব-পুঁজিবাদের পক্ষ থেকে, 'লিবারাল ডেমোক্র্যাসি' বা উদারনীতিক গণতন্ত্রকে এই অবাস্তব পটভূমিতে আরোপ এবং গ্রহণীয় করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে পরিস্থিতির সাথে প্রস্তাবের দ্বন্দ্বও এত অস্থিরতা সৃষ্টির অপর কারণে পরিণত হয়েছে। আসলে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটি কাল-পর্ব জুড়ে তুমুল সংঘর্ষ চলার পর সাময়িক যে বাহ্যিক প্রশান্তি এবং যা আবশ্যিকভাবেই এক অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা মাত্র, তাকে অস্বীকার করার আপ্রাণ চেষ্টা রয়েছে বিশ্ব-পুঁজিবাদের পক্ষে। কেননা শ্রেণী-সংগ্রাম ও তার ভবিষ্যৎ ফলাফলের অন্তর্নিহিত সত্য তাদের কাছে অধিকতর বিপজ্জনক।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু দেশে বিপর্যয়কে কেন্দ্রীয় শর্ত হিসাবে উত্থাপন করে ধনতন্ত্রের তথাকথিত নতুন রূপকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রচারে অন্যতম উদ্যোগ নিয়েছেন ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা তাঁর 'দা এণ্ড অব হিস্ট্রি অ্যাণ্ড দা লাস্ট ম্যান' (১৯৯২) পুস্তকে।

১৮০৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তদানীন্তন জার্মানির (অনেকগুলি রাজ্যের সমন্বয়ে জার্মানী গঠিত ছিল) বৃহৎ অংশ দখল করার পর জেনা-শান্তি চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। এই সংবাদে মহান জার্মান দার্শনিক জি. ডব্লু. এফ. হেগেল (১৭০০—১৮৩১) প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন 'এণ্ড অব হিস্ট্রি' তথা ইতিহাসের অবসানের তত্ত্ব। বুর্জোয়া-ব্যবস্থার দ্বারা জার্মানির রাজতন্ত্রের অবসানের সূত্রপাতকে তাঁর কাছে ইতিহাসের সমাপ্তি বলে প্রতিভাত হয়েছিল। বিশ্ব-বন্দিত মহান দার্শনিকের কথা ইতিহাস মানেনি। সমাজ-বিকাশের অগ্রগতি, ক্যানিউটের সমুদ্র-শাসনের ব্যর্থতার মতই, হেগেলকে যে অস্বীকার করেছিল, পরবর্তী প্রায় দু'শ' বছরের মানব-সভ্যতার অভিজ্ঞতাতেই তার প্রমাণ রয়েছে।

তবে এ'কথা সত্য যে হেগেল-প্রকাতার ঐ ধারা কখনো থামেনি। 'এণ্ড' বা অবসানের তত্ত্ব নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। কখনো তা' 'এণ্ড অব ইকনমিকস্' বা 'এণ্ড অব ক্লাস', কিংবা 'এণ্ড অব ফিলজফি' ইত্যাদি শিরোনামে আবির্ভূত হয়েছে। হেগেল অবতীর্ণ হয়েছিলেন উদীয়মান বিপ্লবী বুর্জোয়া দর্শন ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, তাঁর উত্তরসূরীরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন মার্কসবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পর থেকে এবং ষাটের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ধারাতে সৃষ্টি হয়েছিল 'এণ্ড অব আইডিওলজি ডিবেট' বা মতবাদের অবসান বিতর্ক। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস যখন লিখেছিলেন 'লুড্‌উইগ ফয়েরবাখ্ অ্যাণ্ড দা এণ্ড অব ক্লাসিক্যাল জার্মান ফিলজফি', তার দ্বারা তিনি পূর্বোক্ত ধরনের সমাপ্তি তত্ত্বের মর্মের পরিবর্তে অগ্রগতির তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। 'এণ্ড অব আইডিওলজি ডিবেট' বহন করে এনেছিল হেগেল ও এঙ্গেলসের মধ্যবর্তী সংস্করণ, বলা যায় কমপ্রোমাইজ বা সমঝোতামূলক সমাপ্তির তত্ত্ব।

স্তালিনের মৃত্যুর পর, এই প্রসঙ্গে ১৯৫৫ সালে দুই বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকের দ্বারা রচিত দু'টি নিবন্ধ দিয়ে পূর্বোক্ত বিতর্কের সূত্রপাত। প্রথমটি হলো, এল. এস. ফিউয়ারের 'বিয়ণ্ড আইডিওলজি' এবং দ্বিতীয়টি হলো ই. এ. শিলস-এর 'এণ্ড অব আইডিওলজি'। ১৯৬০ সালে প্রখ্যাত আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ ডানিয়েল বেল প্রকাশ করেন 'দা এণ্ড অব আইডিওলজি'। তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য ছিল, 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' তথা কল্যাণকারী রাষ্ট্র অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও মিশ্র-অর্থনীতি অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রাধান্যের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থনীতির বিকাশ পশ্চিমী দেশগুলিতে বহুধা চরিত্রের অর্থনীতি গঠনের মনোভাব গড়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত স্তরে বিরোধের অবসান ঘটিয়েছে এবং অবসান ঘটেছে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধের। এই যুগ হচ্ছে মতবাদের অবসানের যুগ। এই বক্তব্য ঘিরে সি. ডব্লু. মিলস্ 'নিউ লেফট রিভিউ' পত্রিকাতে যে নিবন্ধ লেখেন তাতে বেলের বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করে উত্থাপন করেন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মতবাদের পার্থক্য

ঘুচে যাওয়ার যুক্তি। এর পর অজস্র আলোচনা ও পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে, যেগুলি সংকলন করে ১৯৬৮ সালে সি. আই. ওয়াক্সম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দা এণ্ড অব আইডিওলজি ডিবেট'। একই সময়ে প্রসঙ্গটি আরও এগিয়ে নিয়ে শ্রেণী-সংগ্রামের অবসানের তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল কে. হারমান্ন-এর 'দা এণ্ড অব দা রিভোল্ট'। বলাই বাহুল্য এই বিতর্ক নিষ্ফল হয়েছিল ইতিহাসের পরবর্তী অভিজ্ঞতার বিচারে।

ফুকুয়ামা অ্যাণ্ড কোম্পানির ইতিহাসের সমাপ্তি-তত্ত্বের মর্ম হলো যে বর্তমান শতাব্দীতে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতি প্রধান চ্যালেঞ্জটি এসেছিল সোভিয়েত আদলের কমিউনিজমের দিক থেকে। যেহেতু শেষোক্তটির নিশ্চিত ব্যর্থতা ঘটেছে, তাই ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র, যাকে তিনি বলেছেন 'লিবারাল ডেমোক্র্যা সি' বা উদারনীতিক গণতন্ত্র, সেটির সামনে আর কোন বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প নেই। সমাজ ইতিহাসের শেষতম স্তর হলো এই গণতন্ত্র; সুতরাং ইতিহাসের বিকাশ এখানেই ক্ষান্ত হলো। কিন্তু বাস্তবের কঠোর আঘাতে স্ববিরোধিতাকে অতিক্রম করতে পারেননি তিনি। তিনি লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে "উদারনৈতিক গণতন্ত্রগুলি নিঃসন্দেহে বহু সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে যেমন বেকারী, দূষণ, মাদকাসক্তি, দুষ্কৃতি ইত্যাদি" (পৃঃ ২৮৮)। তিনি কবুল করেছেন যে "ধনতন্ত্র কার্যকালে যে অর্থনৈতিক অসাম্য ডেকে এনেছে, তাতে মানুষে মানুষে সমতার স্বীকৃতিতে বৈষম্য ঘটেছে।" তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতিটি হলো "প্রধান প্রধান সামাজিক অসাম্য ও বৈষম্য সর্বোত্তম লিবারাল সোসাইটিগুলিতেও অব্যাহতভাবে থেকে যাবে" (পৃঃ ২০২)। ক্যাপিটালিজমকে লিবারাল ডেমোক্র্যাসি হিসাবে পরিচিত করানোর পাশাপাশি 'ফ্রি মার্কেট ইকনমিকস্' বা মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে এ'টির সমার্থক বলে ঘোষণা করেছেন ফুকুয়ামা। তাঁর বর্ণিত গণতন্ত্রের বিস্ময়কর বহু মাত্রা রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন, "যে টোটালিটারিয়ান স্টেট" বা সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্ষেত্রের সুযোগ দেয়, সংজ্ঞাগতভাবে সেই রাষ্ট্রকে এখন আর সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী বলা যায় না" (পৃঃ ৩৩)। অর্থাৎ তাঁর ঘোষিত এবং বর্তমানে পুঁজি আকাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের একমাত্র ভরকেন্দ্র হলো সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা, দ্বিতীয় কিছু নয়।

বিশ্ব-পুঁজিবাদ স্বয়ং পুঁজিবাদী গণতন্ত্রকেও প্রকৃতই কি দৃষ্টিতে দেখে, তার অজস্র নজির রয়েছে সাম্প্রতিক ইতিহাসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ফুকুয়ামা লিবারাল ডেমোক্র্যাসির শ্রেষ্ঠতম মডেল মনে করেছেন, সেই আমেরিকা ১৯৫৩ সালে ইরানের মোহম্মদ মোসাদ্দেকের সরকার, ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালার আরবেঞ্জ সরকার, ১৯৬৪ সালে ব্রাজিলের জোম্বাও গোউলার্ট সরকার, ১৯৬৫ সালে ডোমিনিকান রিপাবলিকের জুয়ান বসচ্-এর সরকার, ১৯৬৭ সালে গ্রীসের জর্জ পাপান্দ্রুর সরকার, ১৯৭৩ সালে চিলির সালভাদোর আলেন্দে'র সরকার ইত্যাদি বহু গণতান্ত্রিক সরকারকে সম্পূর্ণ অন্যায় ও প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উৎখাত করেছিল এবং প্রতিষ্ঠা করেছিল জনসমর্থনহীন স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলিকে।

'লিবারাল ডেমোক্র্যাসি' বলে যা বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে, তা' নিছক 'আমেরিকান ডেমোক্র্যাসি'। বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদদেরই মতে সত্তরের দশকে পৌঁছে আমেরিকান ডেমোক্র্যাসি পরিণত হয়েছিল 'এলাইটিস্টস ডেমোক্র্যাসি' থেকে 'কনজিউমারিস্ট ডেমোক্র্যাসি'তে। আমেরিকার কাছে ডেমোক্র্যাসি হলো তাদের বৈদেশিক নীতি, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থে অন্য দেশকে, বিশেষত, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে এই ডেমোক্র্যাসির খোলস পরতে বাধ্য করা, তাদের বৈদেশিক নীতির অন্যতম উপাদান—দেশগুলি যাতে শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কবলিত হতে না পারে। এই বিশেষ গণতন্ত্রকে তারা এখন ব্যবহার করে 'হিউম্যান রাইটস্' বা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নাম করে—নিজ দেশে মানবাধিকারের ভয়াবহ পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও।

অনুন্নত দেশসমূহের এক উল্লেখযোগ্য অংশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ব্রিটিশ মডেলের অনুকরণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসান ও আমেরিকান কর্তৃত্বের অভ্যুদয় হলেও বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে ব্রিটিশ কলোনির দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠাজনিত প্রবহমান সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার,

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের মডেল অনুসরণে স্বাভাবিক বাস্তবতা হিসাবেই কাজ করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি বিশাল অংশ জুড়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর, নতুন বিশ্বব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে, আমেরিকান সার্বিক প্রয়াসের অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছে অনুন্নত দেশগুলির পুঁজিবাদী বর্তমান রাষ্ট্রিক ব্যবস্থারও পুনর্বিন্যাস সাধন। দেশগুলিতে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মতই রপ্তানি করার চেষ্টা হচ্ছে তথাকথিত লিবারাল ডেমোক্র্যাসির নামে আমেরিকান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি আমেরিকান গণতন্ত্র আমদানিতে কিছুটা বাধ্য হতে শুরু করেছে পরিস্থিতির চাপে। যদিও একথা সব সময় সত্য যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র গাণিতিক বিচারেও কখনো প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার দ্বারা কারচুপি করে, সংখ্যালঘিষ্ঠের ইচ্ছা ও কার্যকলাপকে বৃহত্তম সংখ্যক জনগণকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য করার অন্তর্লীন ব্যবস্থা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মর্মে সব সময়ে বলবৎ থাকে। পুঁজিবাদের সংকট ও উৎপাদনে নৈরাজ্য যখন বাড়ছে, তখন বিশ্বব্যাপী নতুন নতুন এই ধরনের তৎপরতার মধ্য দিয়ে তাকে গোপন রাখা এবং রাষ্ট্র-ক্ষমতায় শাসকশ্রেণীর কর্তৃত্ব বজায় রাখা হচ্ছে। শেষোক্ত তৎপরতার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠছে নয়া কিসিমের গণতন্ত্র। বিশ্ব-পুঁজিবাদের সামনে সর্বোন্নত দেশের আদল হিসাবে আমেরিকান মডেলের আকর্ষণ তাই বাড়ছে। তাছাড়া, আমেরিকান গণতন্ত্র, বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে, সর্বাপেক্ষা চাতুর্যপূর্ণ সাফল্য পুঁজিবাদকে এনে দিয়েছে। কেননা আমেরিকান পুঁজিবাদ সাফল্যের সাথে নিজ দেশে প্রতিহত করেছে শোষণ-বিরোধী সমস্ত সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে।

আমেরিকান গণতন্ত্র স্বীয় বৈদেশিক নীতি ও ব্যবস্থা হিসেবে তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশে গণতন্ত্রকে খতম করে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল নিজ স্বার্থ কায়েম করার পথে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে; কারণ স্বৈরতন্ত্রের পরের স্তর হলো আমেরিকান মডেল। এই পরিকল্পনা ও প্রয়োগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত গণতন্ত্র বিষয়ক বৈদেশিক নীতি উন্নত দুনিয়ার গণতন্ত্রকেও রেহাই দেয়নি, যখন সেই গণতন্ত্র আমেরিকার স্বার্থের অনুকূল হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার লেবার পার্টির হুইটহ্যাম সরকার স্বীয় দেশে আমেরিকার সামরিক ও গুপ্তচর ব্যবস্থার ভূমিকার বিরোধিতা করা শুরু করলে, আমেরিকা সি. আই. এ.-র সাহায্যে নেপথ্য তৎপরতা চালিয়ে ১৯৭৫ সালে ঐ সরকারকে উৎখাত করে। ইতালির রাজনৈতিতে সি. আই. এ.-র ব্যাপক তৎপরতার তথ্য ১৯৭৬ সালে সে দেশের 'পাইক রিপোর্ট'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৯০ সালেও ইতালির তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সি. আই. এ.-র তৎপরতার ব্যাপারে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সত্তরের দশকে ফ্রান্স ও স্পেনে কমিউনিস্টরা যাতে ক্ষমতায় না যেতে পারে সেজন্য সি. আই. এ.-র তৎপরতা সমকালেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।

বুর্জোয়া লিবারাল গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু উল্লেখ এ'কারণেই যে সমাজতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে সেটিকে তুলে ধরার চেষ্টা অতীতে যেমন হয়েছে, বর্তমানে তা' ব্যাপকতর। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্রীয় শ্লোগানও ছিল বুর্জোয়া-গণতন্ত্র। ফুকুয়ামা সুকৌশলে সেটাকেই সামনে এনেছেন ইতিহাসের সমাপ্তির তত্ত্বের অন্তরালে।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক—দুই মেরুর ব্যবস্থার পরিবর্তে, বর্তমানে এক মেরুর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেও দাবী করা হচ্ছে। একে বলা হচ্ছে বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কার্যকালে এই শৃঙ্খলা আসলে বিশৃঙ্খলা বা অন্যভাবে বলা যায় 'থিওরি অব ক্যাওস' বা বিশৃঙ্খলার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। এক মেরুর তথাকথিত পৃথিবীতে এখন শক্তিধর তিন মেরুর আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থনৈতিক বিশ্ব-ব্যবস্থায় আমেরিকা, জাপান ও জার্মানী এখন ত্রিভুজাকৃতি পৃথিবী গঠন করে তিনটি কোণের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ায় তৎপর এবং অর্থনৈতিক স্তরে তারা পরস্পর যুযুধান পক্ষ। এই ত্রিভুজের বাহু ও কোণকে বৃদ্ধি করতে এখন তিন শক্তিই মরিয়া। তা'ছাড়া একাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশের ব্যবস্থার বিপর্যয় ঐ শিবিরের অবসান প্রমাণ করে না। কেননা এখনও বিশাল অংশে, ব্যবস্থা হিসাবে, সর্বোপরি মানবতাবাদের উন্নততর বিকাশের ব্যবস্থা হিসাবে, সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ অটুট। সমাজতান্ত্রিক চীনের এখন উত্থান ঘটছে প্রবল শক্তিধর বিশ্ব-অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে। সুতরাং পূর্বতন দুই মেরুর মধ্যে একটি

মেরুর (সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা) অবসান বা দুর্বল হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে পূর্ব বর্ণিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। অতীতে ক্ষমতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান আন্তর্জাতিক স্তর ছিল সামরিক। এখন পরিবর্তন এইটুকু যে তা' সামরিক স্তর থেকে সরে এসেছে অর্থনৈতিক স্তরে। স্তরের এই পরিবর্তন, পুঁজিবাদের স্বীয় শক্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রকে আত্মঘাতী করার মুখোমুখি করেছে—যে বিপদ দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তরকালে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সামনে কখনো ছিল না। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে এই শতাব্দীর দু'টি বিশ্ব-যুদ্ধ পুঁজিবাদের স্বীয় শিবিরের অভ্যন্তরে, অর্থনৈতিক স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র সামরিক দ্বন্দ্বের পরিণতি পেয়েছিল।

বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবী নোয়াম চোমস্কি তাঁর 'ডেটারিং ডেমোক্র্যাসি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে বর্তমানে সামরিক স্তরেই কেবল 'ইউনিপোলার' ব্যবস্থা বলবৎ হয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে এই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। অর্থনৈতিক স্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্জন করতে না পারা, অথচ সামরিক স্তরে তা' বহাল থাকা—এই পরস্পর-বিরোধী বাস্তবতা সমগ্র বিশ্ব তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামনে নতুন ধরনের বিপদ সৃষ্টি করেছে। অন্য শক্তিগুলির দ্বারা অর্থনৈতিক স্তরে আমেরিকা যত বেশি বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হবে, ততই দর-কষাকষির জন্য তাকে বেশি শরণাপন্ন হতে হবে সামরিক শক্তির। অর্থনৈতিক স্তরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতাকে সামরিক ব্যবস্থার দ্বারা সমাধানের যে কোন প্রবণতা ও চেষ্টা পুঁজিবাদকে আরও বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে বাধ্য। সুতরাং আমেরিকান মডেলের বিশ্ব-ব্যবস্থার অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি (লিবারাল ডেমোক্র্যাসি), সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে সমগ্র পরিকল্পনাকে 'থিওরি অব ক্যাওস'-এর প্রস্তাব ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

'লিবারাল ডেমোক্র্যাসি'— অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক— কোন স্তরেই আদৌ লিবারাল নয়। আমেরিকাসহ উন্নত ধনতান্ত্রিক সমস্ত দেশই মতাদর্শগত স্তরে সাম্যবাদ, এমনকি সামান্য বামপন্থাকে যেমন বরদাস্ত করে না, জনগণের শ্রেণীগুলির শ্রেণীগত অধিকার ও আন্দোলনকেও কোনভাবে মাথা তুলতে দেয় না। এমনকি সংস্কারবাদী বা দক্ষিণপন্থী শ্রমিক আন্দোলনকেও বর্তমানে তারা আক্রমণ করছে। আড়াই শ' বছরের সুদীর্ঘ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী সামাজিক নিরাপত্তার ও অধিকারগত যেসব সুযোগ অর্জন করেছিল, পুঁজিবাদ এখন একে একে সেগুলি অপহরণ করা শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের গণতন্ত্রের নমুনা এখন প্রতিদিন বিশ্ব-জনগণ লক্ষ্য করেন। বিশ্ব-গণতন্ত্রের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রসংঘকে তারা, বিশেষত আমেরিকা, কার্যত করায়ত্ত করেছে। অন্য দেশকে আক্রমণ, কোন দেশের বিরুদ্ধে তথাকথিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা নিজেদের বাঞ্ছিত শক্তিকে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য দেশে সৈন্য প্রেরণ, নিজেদের স্বার্থানুকূল আইন প্রণয়ন ইত্যাদি সবই রাষ্ট্রসংঘের শীলমোহরে নয়া সাম্রাজ্যবাদ সংঘটিত করছে। কোন কোন দেশে তারা গৃহযুদ্ধে উস্কানি, এমনকি সরাসরি সামরিক সহায়তা পর্যন্ত দিচ্ছে। অতীতে 'নন-প্রোলিফারেশন ট্রিটি'র (এন. পি. টি.) বা বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির জন্য চাপকে অপসারিত করে এখন 'কমপ্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি' (সি. টি. বি. টি.) তথা 'সুসংবদ্ধ পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ চুক্তি'তে সমস্ত দেশকে বাধ্য করার জন্য তারা উদ্যত। নিজেদের হাতে মজুত, মানব-সভ্যতা ধ্বংস সাধনে সক্ষম, বিপুল পরিমাণ তাপ-পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার প্রশ্ন এখন বাতিল করা হয়েছে। অন্য কোন দেশ যাতে পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হয়ে তাদের একচ্ছত্র সামরিক কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ ভবিষ্যতে না পায়, সেজন্য এই শেষোক্ত উদ্যোগ। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ'বিষয়ে চুক্তি পাশ করাতে না পেরে চূড়ান্ত অসঙ্গতভাবে তারা রাষ্ট্রসংঘকে দিয়ে এই সিদ্ধান্ত পাশ করিয়েছে। এই হলো লিবারাল ডেমোক্র্যাসির অপর পিঠ।

বিশ্বে অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে 'ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ড' (আই. এম. এফ.) এবং 'ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক'কে ব্যবহার করে সাফল্য অর্জনের পর, আধিপত্যের স্থায়ী রূপ দিতে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এখন গঠন করেছে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন' (ডব্লু.

টি. ও.)। এই ব্যবস্থার প্রতিটি উপাদান এবং কর্তৃত্ব পুরোপরি নয়া-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির হাতে। ডব্লু. টি. ও. এখন কেবল রাষ্ট্রসংঘ, আংটাড, আই. এল. ও. প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির কর্তৃত্ব দখলেই উদ্যত নয়; পুঁজিবাদী জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপরও শুরু করেছে পরোক্ষ হস্তক্ষেপ। এইভাবে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার অবসানের জন্য তথাকথিত উদারীকরণের সর্বজনীন নীতি নিয়েছে 'লিবারাল ডেমোক্র্যাসি'।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বকালীন তিন মৌলিক উপাদান—ভূমি, পুঁজি ও শ্রমের সাথে 'মিডিয়া অ্যাণ্ড ইনফরমেশন' তথা প্রচার মাধ্যম ও তথ্যকে উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদানে পরিণত করেছে আধুনিক পুঁজিবাদ। এবং একই সাথে শেষোক্ত উপাদানকে এটি পরিণত করেছে 'ব্রেন-ম্যানেজমেন্ট ইণ্ডাস্ট্রি' তথা মস্তিষ্ক ব্যবস্থাপনার শিল্পতে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি স্তরে এক বিশ্ব গঠনের উদ্যোগে পুঁজিবাদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেছে বিশ্ব-জনগণের মনস্তাত্ত্বিক স্তরে স্বীয় লক্ষ্যধর্মী ঐক্য প্রতিষ্ঠায়। বিশ্বের সর্বকালের শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাসে মনস্তাত্ত্বিক স্তরের শ্রেণী-সংগ্রাম অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল। শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় মনস্তাত্ত্বিক স্তরে তথা আদর্শগত স্তরে, শ্রেণী-সংগ্রাম এখন পুঁজিবাদের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই, বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আবির্ভাব এবং সেটির অবিশ্বাস্য বিপুল ও বিশাল ক্ষমতাকে সার্বিকভাবে দখল করে সাম্রাজ্যবাদ মনস্তাত্ত্বিক স্তরে আগ্রাসী অভিযানকে করেছে প্রত্যক্ষ ও ভয়ঙ্কর। কেননা তারা জানে 'প্রটেস্ট ইনস্‌টিংক্ট' মানুষের সহজাত। তাছাড়া তারা সবচাইতে বেশি জানে, যে কার্যকারণের জন্য প্রটেস্ট ইনস্‌টিংক্ট সক্রিয় থাকে মানুষের মধ্যে, তার সামান্যও অবসান হয়নি বরং বেড়েছে। প্রটেস্ট ইনস্‌টিংক্ট-এরই প্রধানতম বহিঃপ্রকাশ শ্রেণী-সংগ্রামে। প্রতিবাদ ও শ্রেণী-সংগ্রামের কার্যকারণ বন্ধ করতে না পারার সর্বকালীন অক্ষমতাকে তাই সক্ষমতায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা হচ্ছে 'ব্রেন-ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থার দ্বারা। বিশ্বময় সমস্ত ধরনের ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে ব্রেন-ম্যানেজমেন্ট। একই কারণে ইম্‌পিরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার অন্যতম প্রধান উপাদানে পরিণত করতে হয়েছে 'মিডিয়া ইমপিরিয়ালিজমকে'।

ধনতন্ত্রের পক্ষ থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দ্বারা জনগণকে গ্লোবাল-ভিলেজের অন্তর্গত করার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যটি হলো মানুষের মধ্যে সামাজিক সমবায়ী ধারণার "আমরা"-কে "আমি"-তে পরিণত করা। যদিও গ্লোবাল-ভিলেজ বা বিশ্ব-পল্লীর ধারণাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এমন অন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিশ্ব হিসাবে যেখানে একটি পল্লীগ্রামের মত প্রতিটি মানুষ অপর মানুষের পরিচিত হবে। কিন্তু কার্যকালে মিডিয়ার অভিঘাত মানুষের বহির্মুখী সমস্ত প্রবণতাকে নিভিয়ে দিয়ে আত্মগত করতে উদ্যত চলছে প্রত্যেকটি মানুষকে বিচ্ছিন্নতার একাকীত্বের দ্বীপে নির্বাসিত করার চেষ্টা। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ডাইলেকটিকস বা দ্বান্দ্বিক নিয়ম ওদের প্রয়াসের বিরুদ্ধে একই সাথে সক্রিয় হয়েছে। সারা দুনিয়ার বাস্তবতা এখন মুহূর্তের মধ্যে পশ্চাৎপদ অঞ্চলের জনগণের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে। নিরক্ষর, পশ্চাৎপদ অংশের মানুষও এখন সুশিক্ষিত হয়ে উঠছে দূরের বাস্তবতাকে নিজ জীবনের সাথে মিলিয়ে অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে। কেননা অভিজ্ঞতা হলো শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। এইভাবে ওদের ইচ্ছার অগোচরে শোষণ ও শক্তিশালী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে "আমরা" তথা ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা "আমি" গঠনের প্রচেষ্টাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেকটা খণ্ডিত করে চলেছে। মনস্তাত্ত্বিক স্তরে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির শর্ত, বিপরীত দিক থেকে, এইভাবে সৃষ্টি হচ্ছে জনগণের মধ্যে।

একদা ফরাসী অর্থনীতিবিদ ও জন-বিজ্ঞানী আলফ্রেদ সৌভি 'তৃতীয় দুনিয়া' শব্দটি সর্বপ্রথম চয়ন করেছিলেন। যে ধারণা থেকে তখন তৃতীয় দুনিয়া বলা হতো, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নতুন চরিত্রের তীব্রতাতে সেই উপাদানগুলি এখন গভীরতর হওয়ার মুখে। তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষুদ্র একাংশ যেমন উন্নত দুনিয়ার কাছাকাছি চলে গেছে, বাকি দেশগুলির অধিকাংশই অতি দরিদ্র দেশে পরিণত হচ্ছে। ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২-তে প্রকাশিত ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টে ২০০০ সালের মধ্যে

পৃথিবীর দরিদ্র জনগণের সংখ্যা ৩০০ মিলিয়নে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অথচ কেবলমাত্র আফ্রিকা মহাদেশে ১৯৯৪ সালে মোট দরিদ্র জনগণের সংখ্যা ছিল ৩২৮ মিলিয়ন। ১৯৯০ সালে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বৈদেশিক ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। এই ঋণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ঋণের সুদ বাবদ বছরে তাদের ফেরৎ দিতে হতো যথাক্রমে ৪৬.৭ বিলিয়ন ডলার ও ৪.৫ বিলিয়ন ডলার। চুম্বকে তৃতীয় দুনিয়ার হাল হচ্ছে এইরকম।

দারিদ্র্যের সমস্যা যতটা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির, ততটাই উন্নত দুনিয়ার; কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে। তৃতীয় দুনিয়ায় দারিদ্র্যের এই প্রকোপ বিশ্ব-পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের প্রচেষ্টার সামনে স্বয়ং এক বিপদ সৃষ্টি করছে। কেননা দারিদ্র্যের অভ্যন্তরে রয়েছে 'রেজিস্ট্যান্স' ও 'রিভোল্ট'-এর উপাদান। ফলে নতুন বিশ্ব গঠনের প্রক্রিয়াতে অদৃষ্টপূর্ব চাতুর্যের আমদানি করা হচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'আমূল পরিবর্তন' দূরের কথা, 'প্রগ্রেস' বা অগ্রগতির এতাবৎ কালের সীমিত ধারণার অবসান ঘটাতে অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে 'ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট' বা উন্নয়নের ধারণাকে। বিশ্ব-পুঁজিবাদের কাছে ডেভেলপমেন্ট শব্দের অন্তর্নিহিত মর্মার্থ হলো 'ডেভেলপমেন্ট অব ইণ্ডাস্ট্রি', উন্নয়নের জন্য পুঁজিবিনিয়োগ থেকে শুরু করে সমস্ত কার্যকলাপকে লাভ-ভিত্তিক ইণ্ডাস্ট্রি বা শিল্পে পরিণত করা। অনুন্নত দেশগুলির তথাকথিত উন্নয়ন ঘটাতে, ব্যাপক পরিকল্পনা সাজিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা অর্জনের জন্য তৎপরতার প্রথমদিকের একটি ছোট নজির উল্লেখ করেছেন বারটারনভ শ্চেনেইভার তাঁর 'দা স্ম্যাণ্ডাল অ্যাণ্ড দা সেম ঃ পভার্টি অ্যাণ্ড আণ্ডার ডেভেলপমেন্ট' পুস্তকে।

১৯৭৭ সালে জেনেভার ক্যাস্টনের একটি সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উন্নয়নের জন্য তৃতীয় দুনিয়ার বিষয়ে অনুষ্ঠিত মোট ১০২০টি সভাতে ৫২,০০০ বিশেষজ্ঞ অংশ নিয়েছিলেন; এই সভাগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৪,০০০ ওয়ার্কিং সেসন। জেনেভাসহ অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতে ১১০টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে যে ২০,০০০ আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভেন্ট কর্মরত, তাদের দৈনিক অন্যান্য কাজের বাইরে অনুষ্ঠিত সভাগুলির সংখ্যা বাদ দিয়ে এই পরিসংখ্যান। এইগুলি ছাড়াও, উন্নয়নের বিষয়ে আরও হাজার হাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্কস্থিত রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বে, ওয়াশিংটন ডি. সি.-র 'ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক'-এর সদর কার্যালয়ে, ব্রাসেলসের 'ইউরোপীয়ান কমিউনিটি', প্যারিসের 'ইউনেস্কো', রোমের 'ও. ই. সি. ডি.' এবং 'ফুড অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন', ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় 'ও. এ. ইউ.', 'আসিয়ান', 'কমিশন ফর সাউথ', ইত্যাদি সংস্থাগুলির দ্বারা। এইসব সভার ফলাফল জনগণের দিক থেকে শূন্য। তাদের জীবনে তথাকথিত উন্নয়নের কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ইণ্ডাস্ট্রির প্রসার ঘটেই চলেছে। তৃতীয় দুনিয়ায় উন্নয়নের নামে উন্নত দুনিয়ার মুনাফা বিলিয়ন থেকে ট্রিলিয়ন গণিতাঙ্কে পৌঁছে যাচ্ছে।

সমগ্র পরিস্থিতির জন্য ধনতন্ত্রের নিজস্ব বিকাশের নিয়মও বহুলাংশে দায়ী। একে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনবাদী নিয়ম বলেও ব্যাখ্যা করা চলে। অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষায় নিজ আবিষ্কার বা উদ্ভাবন, ঐতিহাসিক বিভিন্ন স্তরে, কার্যকালে ধনতন্ত্রকেই বিপন্ন করেছে। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সমস্যার সমাধানে তৃতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব বেশ কিছুকাল তাদের কাছে সুবিশাল সহায়কের ভূমিকা পালন করলেও, এখন তা' উৎপাদন, বন্টন, বাণিজ্য, সমাজ ইত্যাদি স্তরে তুমুল সমস্যা সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। নিজের সৃষ্ট নেশন-স্টেট তথা জাতীয় রাষ্ট্রকে এখন 'ডাউন-সাইজিং' বা বামনাকৃতি করে সুপ্রা-স্টেট বা অতিরাষ্ট্র (যেমন ইউরোপীয়ান কমিউনিটি বা মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি) গঠনের উদ্যোগ বিশ্ব-পুঁজিবাদের গুরুত্বপূর্ণ এজেণ্ডা। কিন্তু সেই প্রয়াসেও অন্তর্ঘাত হানছে বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতা, ধর্মান্ধতা, বর্ণ-জাতি সংঘর্ষ ইত্যাদি। মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে 'কমাণ্ড ইকনমি' বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকল্প হিসাবে প্রচার করা ছাড়াও শান্তির সাথে পুঁজিবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা ধনতন্ত্র অতীতেও প্রচার করেছে, এখনও করে। এই প্রস্তাবই সম্ভবত, পুঁজিবাদের সব চাইতে কষ্ট-কল্পনা। কেননা অতীতে যেমন প্রমাণিত হয়েছে ধনতন্ত্র মানে অশান্তি ও যুদ্ধ, এখন তা' অধিকতর সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কেননা ১৯৮৯ সালের পরও সাম্রাজ্যবাদ নিজে অথবা রাষ্ট্রসংঘের পতাকার তলে

অনেকগুলি যুদ্ধ চালিয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা যুদ্ধ এখন রাজনৈতিক স্তর থেকে সামাজিক স্তরে আসীন হয়েছে প্রাত্যহিক বিষয় হিসাবে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের চেষ্টা বিশ্ব-খণ্ডায়নের প্রবণতাকে বৃদ্ধি করছে। সামাজিক স্তরে জেণ্ডার-ডিভিশন বা লিঙ্গগত বিভাজন, এজ-ডিভিশন তথা বয়স ভিত্তিক বিভাজন, কালার-কাস্ট ডিভিশন বা বর্ণ-সম্প্রদায়গত বিভাজন ইত্যাদি আবির্ভূত হয়েছে নতুন রূপে ও তীব্র আকারে। তাছাড়া শ্রেণীগত স্তরে শোষক ও শোষিতের মধ্যে বিভাজন হয়েছে আরও গভীর। অর্থনৈতিক স্তরে তথাকথিত তিন বিশ্বের বিভাজন—ফার্স্ট ওয়ার্লড, সেকেণ্ড ওয়ার্লড ও থার্ড ওয়ার্লড—নতুন করে মেরুকরণের সক্রিয় প্রক্রিয়ায় দুই বিপরীত মেরুর সৃষ্টি করছে—প্রথম ও তৃতীয় বিশ্ব, যাকে বলা হচ্ছে নর্থ-সাউথ ডিভাইড। আসলে পরিকল্পিতভাবে এই সব প্রক্রিয়া গড়ে তোলা হচ্ছে। উন্নত দেশগুলিকে সেন্টার বা কেন্দ্র হিসাবে স্থায়ী রূপ দেওয়া এবং অন্যদিকে কেন্দ্রকে সর্বক্ষণ পুষ্ট করার ব্যবস্থা হিসাবে অনুন্নত দেশগুলিকে 'পেরিফেরি' বা প্রান্তীয়করণ করা হচ্ছে। এই প্রান্তীয়করণের একমাত্র অর্থ হলো অধিকতর দারিদ্রায়ন। সর্বোপরি, লিবারাল ডেমোক্র্যাসির কালপর্বে প্রকৃতি ও পরিবেশ সর্বাপেক্ষা আক্রান্ত। তার ফলে এই ভূমণ্ডলের মানুষসহ সমস্ত প্রাণ-সত্তার অস্তিত্ব পর্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে। প্রকৃতির সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব হয়েছে সংঘর্ষধর্মী। ১৯৭৩ সালে দুইজন রসায়নবিদ্ রাওল্যাণ্ড ও মোলিনা প্রথম লক্ষ্য করেন যে ক্লোরোফ্লুরো-কার্বন রাসায়নিক গ্যাস (সি. এফ. সি. যা প্রধানত ব্যবহৃত হয় রেফ্রিজারেশন বা কৃত্রিমভাবে শীতলতা তৈরীর জন্য) পৃথিবীর পরিমণ্ডলের ওজোনস্তরকে দুর্বল এবং সেখানে গহ্বর সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে গবেষণা থেকে জানা গেছে যে ১৯৫০ সালের পূর্বেই ঐ রাসায়নিক গ্যাস (সি. এফ. সি.-১১ ও সি. এফ. সি.-১২) নির্গত হয়ে গেছে ৪০ হাজার টনের বেশী। ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে ঐ গ্যাসের প্রবেশের পরিমাণ ছিল ৩.৬ মিলিয়ন টন। যে ওজোন স্তর সূর্য থেকে নির্গত আলট্রাভায়োলেট রে-র প্রবেশকে প্রতিহত করে মানব সমাজ ও প্রকৃতিকে রক্ষা করে, তা' এখন ওজোন স্তরে সৃষ্ট গহ্বর দিয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে তুলেছে। পৃথিবীতে 'রেফ্রিজারেশন' এবং 'এয়ারোসলস্'-এর ব্যবহারের নব্বই শতাংশের বেশি ঘটে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত অরণ্যানী লুণ্ঠন, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার ও খনিজ সম্পদের বেপরোয়া উত্তোলন, পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ, শিল্পজাত বর্জ্য সামগ্রী তৃতীয় দুনিয়ায় প্রেরণ বা উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা বা সমুদ্রে নিক্ষেপ ইত্যাদির ফলে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভয়ঙ্করভাবে দূষিত ও বিপন্ন করে চলেছে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এখন আধুনিক সভ্যতার স্বাভাবিক অঙ্গ-ভূষণ। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের স্তরে ধনতন্ত্রের বিজ্ঞানের রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম বা 'এইডস্' ও ক্যানসার নামক কালান্তক রোগ। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বকালীন অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য ও ফ্রাঙ্কেনস্টাইনী প্রবণতার এগুলি হলো নতুন কিছু দিক।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানবজাতির সামাজিক সমগ্র পরিকাঠামোর মূল ভিত্তিকেই বিপন্ন করতে উদ্যত এখন। মানবিক সুকোমল বৃত্তিগুলির—প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, বন্ধন, ঐক্য, আন্তরিকতা, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদির—প্রথম ও প্রধান আধার পরিবারকেই দীর্ণ করতে উদ্যত এই ব্যবস্থা। পরিবার হলো সমাজের 'নিউক্লিয়াস' বা অনু-শক্তি ; সমাজের উপরিকাঠামোর সমস্ত ধরনের সংগঠনের ইতিহাসগত উৎপত্তি পরিবার থেকে। উপরিসৌধের সমস্ত ধরনের পারিবারিক প্রকোষ্ঠগুলি দাঁড়িয়ে আছে পরিবার সংগঠনের বেদীর ওপর। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অতীতের বিশালায়তন পারিবারিক ব্যবস্থাকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে স্বামী-স্ত্রী ও নাবালক সন্তানদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। অর্থনৈতিক কারণ ছিল এই পরিবর্তনের ভিত্তি। কিন্তু সেই ভিত্তির পরিবর্তন করে ফেলছে আধুনিক পুঁজিবাদ। এখনকার পরিবার-ভাঙ্গনের এবং নতুন ধরনের পরিবার গঠনের পেছনে সক্রিয় হলো মানসিক-বিক্ষিপ্ততা এবং চরম নৈরাজ্যবাদী কৈবল্য এবং বিচ্ছিন্নতা। অবিবাহিতা-পরিবার, এমনকি 'অ্যাডোলেসেন্ট মাদার' বা কিশোরী মাতার পরিবার, পিতা বা মাতা-ত্যক্ত এক

অভিভাবকের পরিবার, বিবাহ-বন্ধনহীন নারী-পুরুষের লিভিং টুগেদারের পরিবার, পুরুষদের হোমোসেক্সুয়াল পরিবার, লেসবিয়ান বা নারী সমকামীদের পরিবার, হিজড়েদের পরিবার ইত্যাদি হলো এখন পরিবারের উদ্ভিন্ন নতুন প্রকরণ। বিকৃতিকে সুকৃতি বলে চালানোর চেষ্টা এবং সেকারণে সেগুলিকে আইনানুগ স্বীকৃতি দেবার জন্য আন্দোলন ও সমর্থন বাড়ছে। এইসব প্রবণতা বাড়ছে উন্নত দুনিয়াতেই প্রধানত। অর্থনৈতিক গণ্ডী অতিক্রম করে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে এবং যখন সমাজকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত করা হচ্ছে, তখন যৌন ব্যবস্থাতেও মুক্ত বাজার এবং সেটির বিশ্বায়ন, সমগ্র প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে ঘটতে থাকবে—এটাই যেন স্বাভাবিক। প্রচারে যা কিছুই বলা হোক না কেন, শোষণ-ভিত্তিক ব্যবস্থার সর্বকালীন অংশ হল ব্যাভিচার। শোষণ ব্যবস্থার যত উন্নতি ও উৎকর্ষ ঘটেছে, এই উপাদানটি বাহ্যত পরিশীলিত রূপ নিয়ে উন্নত হয়েছে। প্রমাণিত হচ্ছে যে লিবারাল ডেমোক্র্যাসি অন্যান্য বিষয়ের সাথে লিবারাল সেক্স-এর ব্যবস্থা ব্যতিরেকে বিকশিত হতে পারে না। এই প্রক্রিয়ার ভয়াবহ পরিণাম ধীরে ধীরে ভোগ করতে শুরু করেছে সারা বিশ্ব-সমাজ। শিশু দুষ্কৃতিকারী, খুন, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অপহরণ, আত্মহত্যা, মস্তিষ্ক বিকৃতি ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি নতুন ব্যাপকতা নিয়ে নতুন বিশ্বের সামনে আবির্ভূত হচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শঙ্কুল ও অমীমাংসিত আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানকে বিশ্ব-পুঁজিবাদ, বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ও ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শন বলে উত্থাপন করেছে। একটি হলো প্যালেস্টাইন সমস্যা এবং অপরটি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষবাদের সমস্যা। এই দুই সমস্যার তথাকথিত বর্তমান সমাধান একান্তই কমপ্রোমাইজ বা সমঝোতামূলক। সমস্যার কারণ আদৌ নির্বাপিত হয়নি। এই দুই সমস্যা ও সেগুলিকে কেন্দ্র করে জনগণের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে বিশ্ব-পুঁজিবাদ নিজেই ক্লান্ত। সর্বোপরি বিশ্বায়নমূলক নতুন জগৎ গঠনের সামনে সমস্যা দু'টিকে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচনা করেই, সমঝোতার উদ্যোগ তাদের নিতে হয়েছে। এই সমঝোতা থেকে এটাও পুনর্বার প্রমাণিত হয়ে গেছে যে এই দুই সমস্যা ছিল তাদেরই পরিকল্পিত সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, এই দুই সমস্যাই পুঁজিবাদের স্বাভাবিক অন্তর্বস্তু। জাতিসত্তা ও বর্ণ—এই উভয় সমাজ-উপাদান পুঁজিবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে, সমস্যায় পরিণত হয়ে এসেছে। তাছাড়া ঐ দুই সমস্যার বিষয়ে সমঝোতা ঘটেছে দুই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, পুঁজিবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার সর্বত্র এবং সার্বিকভাবে আদৌ নয়। ব্যাপক উদাহরণে না গিয়েও কেবলমাত্র আইরিশ সমস্যা, বসনিয়ার সমস্যা, আমেরিকান-আফ্রিকান সমস্যা, কানাডার কুইবেক সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

শোষণ অব্যাহত রাখার প্রশ্নে পুঁজিবাদের নেপথ্য দর্শনটি হলো 'থিওরি অব কনফিউশন' তথা বিভ্রান্তি সৃষ্টির তত্ত্ব প্রচার। শ্রম ব্যতিরেকে মূলধনের কোন কার্যকরী ভূমিকা নেই। পুঁজি ও শ্রমের সর্বকালের অস্তিত্ব ও বিকাশ ঘটেছে একই বিরোধ ও ঐক্যের দ্বারা। এই দ্বন্দ্ব অবিরাম। মূলধন এক সামাজিক সম্পর্ক, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেটি ব্যক্তিগত মালিকানার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্যদিকে শ্রমের চরিত্র সাধারণভাবেই সামাজিক। পুঁজিপতিরা জানে যে শ্রমিক ছাড়া উৎপাদন হবে না, শ্রম-শক্তির শোষণ ছাড়া উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং শ্রমকে নিয়মিত ক্রয় না করে পুঁজির পরিত্রাণ নেই। পুঁজিবাদের এই অসম্পূর্ণতা তথা শ্রমের ওপর নির্ভরশীলতা, শোষণের ফলাফল ও সর্বক্ষণ দ্বন্দ্বের পরিবেশে নিজেদের দুর্বলতা গোপন করতে এবং শোষণ অব্যাহত রাখতে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকে অন্যতম পথ হিসাবে পুঁজিবাদকে গ্রহণ করতে হয় সর্বকালে। এখন আরও বেশি মাত্রাতে তা' করতে হচ্ছে। তাই বিভ্রান্তির তত্ত্ব পুঁজিবাদ হাজির করতে শুরু করেছে উন্নয়ন, বিশ্বায়ন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সহযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলির নতুন মোড়কে।

জনগণের মধ্যে, বিশেষত শ্রমজীবী অংশগুলির মধ্যে, বিভ্রান্তির উপাদান যেমন বাইরে থেকে সংক্রমিত করা হয়ে এসেছে, সত্তরের দশকে এসে অভ্যন্তরীণভাবেও তা' ব্যাপকভাবে উপ্ত হতে শুরু করে। শেষোক্ত ধারাও এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং শ্রেণীসংগ্রামের বিচ্ছুরিত এক মাত্রা। শ্রমিকশ্রেণীর

স্বীয় মতবাদের অভ্যন্তরে বাম ও দক্ষিণপন্থী ঝোঁক বারে বারে এই কন্‌ফিউশনের সমস্যা অতীতেও সৃষ্টি করেছে। মধ্য-সত্তরের দশকে পুঁজিবাদ যখন নতুন সংকটে জর্জরিত হতে শুরু করেছিল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরেও নেপথ্যে ঘনীভূত হচ্ছিল সংকট। মধ্য-পঞ্চাশের দশক থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যে অভ্যন্তরীণ বিতর্ক ও বিরোধ ছিল সংকটের সতর্কবাণী, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের পরবর্তী ঐতিহাসিক এই সংযোগ মুহূর্তে, উভয়পক্ষীয় 'থিওরি অব কন্‌ফিউশন'-এরও যেন এক বিন্দুতে মিলন ঘটেছিল। শ্রমিকশ্রেণী, শ্রেণী-চেতনা, সংগঠন, আন্দোলন ও ঐক্যের সংকট ঘনীভূত হয়েছিল এই দুই ধারার এক ধরনের মিলিত ভূমিকায়।

'থিওরি অব কন্‌ফিউশন'-এরও এক দ্বান্দ্বিক রূপ রয়েছে। তা' হলো উদ্ভাবক ও প্রয়োগকারীকেও পরিণামে বিভ্রান্ত করে এই তত্ত্ব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেমন এই পরিণাম দেখা গেছে, বেপথুমনা সমাজতান্ত্রিকদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। খ্রুশচভ-বাদ, মাও-বাদ, ইউরো-কমিউনিজম ইত্যাদি ধারার কেউই, ইতিহাসের অভিজ্ঞতার বিচারে, এই ফলাফল থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক ধারার অভ্যন্তরে এই প্রবণতা ও প্রক্রিয়াকে 'ট্রোজান হর্স সিনড্রোম' বা 'বিভীষণী লক্ষণসমূহের বিদ্যমানতা' বলে চিহ্নিত করাই সঙ্গত হবে। সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত দুর্বলতা ও জটিলতার ঘোলা জলে মৎস্য শিকারে নেমেছিল আরও সব স্ব-ঘোষিত নানা বামপন্থী প্রবণতা, যেগুলি সমাজতন্ত্রের সংকট থেকে তথাকথিত মুক্তির অন্বেষণে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংমিশ্রণে কিম্ভূতকিমাকার সব তত্ত্ব উত্থাপন করছিল।

ফলে এই 'কন্‌ফিউশন তত্ত্ব' ও তার প্রয়োগ শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণী ও মালিকশ্রেণী কাউকেই পরিত্রাণ দেয়নি, দেয়নি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে। এর রেশ বহন করেই একবিংশ শতাব্দীতে মানবসমাজকে প্রবেশ করতে হচ্ছে।

বিভ্রান্তির এক অভিনব উপাদান, শতাব্দী শেষে, সৃষ্টি হয়েছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায়। এই অবস্থার প্রধান উদগাতা উপাদান হলো তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব। উৎপাদন ও সমাজ বিকাশের প্রসঙ্গে এই বিপ্লব অভূতপূর্ব ইতিবাচক দিক বহন করে নিয়ে আসা সত্ত্বেও, অবিশ্বাস্য বিভ্রান্তি, জটিলতা ও সংকট কি করে সৃষ্টি হলো, তাও গভীর বিস্ময়ের প্রসঙ্গ। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই এস. টি. আর-এর প্রয়োগ উৎপাদন প্রক্রিয়ার কেবল সুবিপুল পরিবর্তন ঘটায়নি, শ্রম-প্রক্রিয়াতেও অবিশ্বাস্য ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করেছে। এই সমগ্র অবস্থার চূড়ান্ত চাপ এসে পড়েছে শ্রমিকশ্রেণীর উপরই। কার্ল মার্কস তাঁর রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছিলেন, "উৎপাদনের যন্ত্রপাতিতে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী টিকে থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে, অতীতে শিল্পক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেণীর টিকে থাকার প্রথম শর্তই ছিল, পুরানো উৎপাদন পদ্ধতিকে অপরিবর্তিত রূপে জিইয়ে রাখা। আগেকার সমস্ত যুগের সঙ্গে বুর্জোয়া যুগের পার্থক্য এই যে, এ'যুগে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কে অনবরত রদবদল ঘটছে, অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা এ'যুগে হয়েছে চিরস্থায়ী।.... সমস্ত সাবেকি শ্রমশিল্পকে এরা হয় ধ্বংস করেছে, নয়তো প্রতিদিন ধ্বংস করছে। ঐসব শ্রমশিল্পকে স্থানচ্যুত করছে এমন সব নতুন নতুন শ্রমশিল্প যার প্রচলন সমস্ত সভ্য জাতির পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন ....''। 'দা পভার্টি অব ফিলজফি' রচনায় মার্কস আরও বলেছিলেন, "উৎপাদিকা-শক্তিগুলির সাথে সামাজিক সম্পর্কসমূহ নিবিড়ভাবে যুক্ত। মানবসমাজ যখন নতুন উৎপাদিকা-শক্তি অর্জন করে তখন উৎপাদনের প্রণালীর পরিবর্তন ঘটে, উপার্জনের পথের জীবন্ত পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তিত হয় সামাজিক সম্পর্কসমূহও। বায়ু শক্তির যন্ত্রের কালে পাওয়া গিয়েছিল রাজতন্ত্রকে, বাষ্প শক্তির যন্ত্রের কালে পাওয়া গেছে শিল্প পুঁজিবাদকে।" এই সত্যের নির্মম উদঘাটন ঘটলো পুনর্বার এই সময়ে। নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে মস্তিষ্কজাত শ্রমের বৃদ্ধি, অর্থনীতির ভর শিল্প-ক্ষেত্র থেকে পরিষেবাতে স্থানান্তর, 'অ্যাসেম্বলি লাইন প্রোডাকশন' থেকে 'ম্যাস প্রোডাকশন' এবং আশির দশকের শেষার্ধে এসে 'লীন প্রোডাকশন' পদ্ধতি, 'জবলেস গ্রোথ', 'হিডেন ইকনমি'তে শ্রমের ব্যাপক উত্থান, শিল্প

কারখানার দেশান্তর, স্থায়ী শ্রমিকের পরিবর্তে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ, ফ্লেক্সিবল শ্রম-কাঠামো, দেশান্তরীদের ব্যাপক শ্রম, বৃহৎ শিল্পে সাব-কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থা, শ্রম-বাজারের লিঙ্গ-বয়স-বর্ণ-দেশগত বিভাজন, ইনফরমাল ও সেল্‌ফ এমপ্লয়মেন্ট সেক্টরের ব্যাপক বিস্তার, কায়িক ও মানসিক শ্রমের অপসারণ ঘটিয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-শ্রমের আগমন, ম্যানেজারিয়াল রেভলিউশন, উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে অতীতের 'ডিমাণ্ড-পুল-ইকনমিকস্' বা চাহিদাভিত্তিক উৎপাদন থেকে 'সাপ্লাই-পুল-ইকনমিকস্' বা সরবরাহমূলক উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদনের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও ব্যবহারে 'ইনফরমেশন টেকনোলজি'কে কেন্দ্রীয় স্থানে প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নব নব তৎপরতার মধ্য দিয়ে আধুনিক পুঁজিবাদ সমগ্র 'প্রেডাকশন প্রসেস' তথা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং 'লেবার-প্রসেস' বা শ্রম-প্রক্রিয়ায় অবিশ্বাস্য ও অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করা শুরু করেছে। তার ফলে মৌলিক ও উপ-শ্রেণীগুলির কোন কোনটির বাহ্যিক অপসারণ বা বিলুপ্তি এবং তার পরিবর্তে নতুন ধরনের শ্রমজীবীর আবির্ভাব, শ্রমিকশ্রেণীর পরম্পরাগত ও অগ্রাধিকারমূলক ভূমিকার ব্যাপক হেরফের এবং কার্যকালে অতীতের সমগ্র শিল্প শ্রমিকশ্রেণীর সর্বজনীন বিন্যাসে সূচিত হয়েছে বিপুল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে তথা উৎপাদিকা-শক্তির নানা প্রকরণে বিবর্তন সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। পুরানো সামজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল হয়ে পড়ছে, বিকাশের নিয়মে নতুন নতুন ধরনের সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব অথবা পুরানোগুলির নবায়ন বা রূপান্তর ঘটছে।

সামাজিক সংগঠনসমূহের মধ্যে সর্ব-অগ্রগণ্য শ্রেণী-সংগঠন—শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন স্বভাবতই এক যুগ সন্ধিক্ষণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সংকটের কালে ট্রেড ইউনিয়নের কৌশল হিসাবে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে থেকেই 'কনফ্রন্ট' বা সংঘর্ষ করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, সংস্কারবাদের কবলে পড়ে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছিল। পরবর্তীকাল থেকে পুঁজিবাদকে সংস্কার করার 'ইনিসিয়েটিভ থিওরি', 'কমপ্রোমাইজ-কনফ্রন্টেশন থিওরি' ইত্যাদির ব্যর্থতা এখন চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। অথচ সর্বাধুনিককালে (১৯৯৬) শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক-আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কিত 'সিনথেসিস্ ডিবেট থিওরি'ও এই নতুন বাস্তবতার সমাধান হিসাবে সামান্যতম আলো দেখাতে পারেনি। এক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের উদ্যোগও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ, যদিও একথা সত্য যে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, প্রধানত মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলনের রি-গ্রুপিং-এর প্রাথমিক প্রয়াস শুরু হয়েছে। রণনীতিগত দিক থেকে 'মজুরি দাসত্বের অবসান' ট্রেড ইউনিয়নের সামনে অনির্বাণ থাকলেও নতুন পরিস্থিতিতে, রণকৌশলগত পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কার্ল মার্কস 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস এসোসিয়েশন'-এর সভাতে 'ট্রেড ইউনিয়ন—ইয়েস্টার-ডে, টু-ডে অ্যাণ্ড টু-মরো' শীর্ষক বক্তৃতাতে এটাই স্পষ্ট করেছিলেন যে ট্রেড ইউনিয়নের কাঠামো ও কার্যকলাপ চির স্থির নয়, পরিবর্তনশীল এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনে সেই পরিবর্তন সংঘটিত করতে হয়। সারা বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এখন সেই ঐতিহাসিক, সমূহকঠিন দায়বদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু কন্‌ফিউশন এখনও সর্বব্যাপী।

ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের ফলে বিশ্ব-শ্রমজীবী বিপ্লবী আন্দোলন আপাতত আন্তর্জাতিক 'সাপোর্ট বেস' হারিয়েছে। কেবল তাই নয়, দীর্ঘকাল ধরে দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে নীতি ও কৌশল উভয় স্তরেই বুর্জোয়াদের সাথে 'কমপ্রোমাইজ' বা সমঝোতার পথ অনুসরণ করছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে চীনের মত সুবিশাল ও শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন বিশ্ব-শ্রমজীবী আন্দোলনের প্রতি তেমন কোন দায়িত্ব গ্রহণের মনোভাব প্রদর্শন করেনি। সব কিছু মিলিয়ে উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন এখন প্রবল প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছে আরও বিভিন্ন দিক থেকে। সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেসব অধিকার ও সুযোগ- সুবিধা মেহনতীরা অর্জন করেছিল, সর্বত্রই তা' পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করা শুরু হয়েছে। ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের বিরুদ্ধে মালিকশ্রেণী ও রাষ্ট্রীয় শক্তির সুচতুর ও ব্যাপক আক্রমণ

সংঘটিত হচ্ছে। বাইরের ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিজনিত প্রতিকূলতা ট্রেড ইউনিয়নের সামনে অবিশ্বাস্য মাত্রা পেয়েছে। সেগুলি প্রধানত সৃষ্টি হচ্ছে আদর্শগত হাতিয়ারের ব্যবহারে অক্ষমতা ও বিভ্রান্তিতে, তৃতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অভিঘাতে, পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের অর্থনীতি ও কাঠামোগত সংস্কারের ফলে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির উৎপাদন ও বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন ও ফ্লেক্সিবল শ্রম-ব্যবস্থার অন্যতম শ্রম-সংকোচন ও অনিয়মিত শ্রমিক নিয়োগের পদ্ধতির দ্বারা উৎপাদনের প্রণালীগত পরিবর্তনের জন্য, বিদেশাগত শ্রমিক ও ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গগত শ্রম-বিভাজনের জন্য শ্রমিক ঐক্যে প্রবল সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায়, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-ব্যবস্থার বিধ্বংসী বেসরকারীকরণের ব্যবস্থাপনায়, ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে ক্রমাগত ভাঙ্গন ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, উন্নত দেশগুলির একাংশ ট্রেড ইউনিয়নের দেশীয় সংকীর্ণতা থেকে এক ধরনের 'ট্রেড ইউনিয়ন ইমপিরিয়ালিজম', 'গ্লোবাল বিজ্‌নেস ট্রেড ইউনিয়নিজম' ইত্যাদি প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে, সর্বত্র বিস্ফোরণমুখী বেকারী বৃদ্ধিতে, বিশ্বব্যাপী নতুন শ্রম-বাজারের বিভাজনের দ্বারা, 'ওয়ার্ক-কালচার' তথা কর্ম-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে জনগণের বিরূপতার সম্মুখীন হওয়ায়, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমের, বিশেষত ইলেকট্রনিক, নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পিত প্রয়াসের ফলে, ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নানা ধরনের নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনের আবির্ভাব ঘটায়, শ্রমিকাদের সমস্যা দীর্ঘকাল উপেক্ষা করার পরিণতিতে নারীদের স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার উদ্যোগ নেওয়ার ফলে শ্রমিক-ঐক্যের আর এক প্রস্থ বিভাজনের আশঙ্কা সৃষ্টিতে, ট্রেড ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের অনুপস্থিতি এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ঐক্য ও সংগ্রাম গড়ে তোলার ব্যর্থতায়, সর্বোপরি নবাগত শ্রমজীবীদের মধ্যে সংগঠন ও আন্দোলন-বিমুখতার প্রবণতার ফলে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে এক স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম চালানোর উদ্যোগ নিয়ে এসেছে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। অন্যান্য গণসংগঠনগুলির তুলনায় মজুরি-দাসত্বের অবসানের জন্য সংগ্রাম ট্রেড ইউনিয়নের এই স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। পুঁজিপতিরাও ট্রেড ইউনিয়নের এই স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টায় কখনো ক্ষান্তি দেয়নি। ট্রেড ইউনিয়নকে সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ও শোষণের অবিভাজ্য অংশ করে নেওয়ার চেষ্টা ছাড়াও মুনাফার তথাকথিত ভাগীদার করার জন্য প্রস্তাবিত বা গৃহীত হয়েছে নানা ব্যবস্থা। কিন্তু তা' সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। এখন পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নকে মালিকদের 'সোস্যাল পার্টনার' করার আওয়াজ তুলেছে; শ্রমিকশ্রেণীকে তারা মুনাফা অর্জনের প্রক্রিয়ার অংশীদার করার চেষ্টা শুরু করেছে সমগ্র ব্যবস্থার অন্তর্গত করে নিয়ে। দক্ষিণপন্থী, সংস্কারবাদী, মেকী-বামপন্থী ইত্যাদি চরিত্রের অধিকাংশ দেশের ট্রেড ইউনিয়ন মালিকশ্রেণীর এই অপচেষ্টায় ধীরে ধীরে সহমত হয়ে শুরু করেছে যুক্ত হতে।

তৃতীয় দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের সামনে সমস্যা আরও দুরূহ। এমনিতেই ব্যাপক পশ্চাৎপদতার জন্য শ্রম-শোষণ এইসব দেশে যেমন মর্মান্তিক ধরনের এবং শ্রম-ব্যবস্থা, আইন ও শ্রম অধিকারও অতীব নিম্ন স্তরের; অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বও দীর্ঘকালের নয় এইসব দেশে। ফলে চেতনা, ঐক্য ও আন্দোলনের স্তর সাধারণভাবে অত্যন্ত দুর্বল। ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পতনের ফলে অধিকাংশ অনুন্নত তৃতীয় দুনিয়ার দেশ তাদের সাপোর্ট বেস হারিয়ে এখন উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি ও তাদের নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে। স্বভাবতই তৃতীয় দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির শোষণ নতুন মাত্রা পেয়েছে। সদ্য বিকশিত ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক-আন্দোলন, তার ফলে, প্রবলতর প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছে।

তবে বিশ্ব-ব্যাপী আপাত এক ধরনের নিস্তরঙ্গতার গর্ভে এক দামাল মুহূর্তকে সঞ্চয় করছে মানব-সমাজ। কেননা বিপুল নেতিবাচক উপাদান ও প্রবণতাগুলি প্রতিফলিত হচ্ছে বিশ্ব-পুঁজিবাদের বর্তমান ধ্বংসাত্মক অভিযানের মধ্যে। বাংলার আদ্যক্ষর 'বি'-পূর্বক সেইসব উপাদান ও প্রবণতার প্রধানগুলিকে

চিহ্নিত করা যায় এইভাবে ঃ বি-রাষ্ট্রায়ন, বি-শিল্পায়ন, বি-আদর্শায়ন, বি-সংঘাত, বি-মূল্যায়ন, বিচ্ছিন্নতা, বি-জাতীয়তা, বি-শ্রেণী-অবস্থান, বি-সংহতি, বি-মূর্ততা ইত্যাদি।

শতাব্দী শেষে এই ধ্বংসের প্রবণতা যদি ভবিষ্যতের নতুন সৃষ্টির আগমনী সংকেত হয়, তবে সততই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে সৃষ্ট সেই নতুন পৃথিবী কার পক্ষে যাবে—শোষক অথবা শোষিত। বলাই বাহুল্য, বর্তমানে যে ভাঙ্গনের কালপর্ব চলছে তাতে যা ধ্বংস করা হচ্ছে তা' প্রধানত পুঁজিবাদের স্বয়ং সৃষ্টিগুলি; এক্ষেত্রে কালপাহাড়ী ভূমিকা পুঁজিবাদেরই। প্রায় চারশ' বছর ধরে নির্মিত উপরি-সৌধের নানা প্রকোষ্ঠকে ধ্বংস করার এই ঘটনা স্বয়ং প্রমাণ করে যে নিজেদের সমগ্র সৃষ্টি আজ পুঁজিবাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছে বিপুল প্রতিবন্ধক হিসাবে। ধনতন্ত্র স্বীয় ভূমিকায় প্রমাণ করছে যে ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে তাদের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুপস্থিতির পরও, তারা সংকট মুক্ত হয়নি, উপরন্তু বৃহত্তর সংকটে পড়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার তাড়নায় তারা নিজেরা ইতিহাসের বৃহত্তম জুয়াতে জড়িয়ে পড়েছে। একে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না বলে জুয়া হিসাবে চিহ্নিত করার কারণ হলো, পুঁজিবাদের ইতিহাসে এজাতীয় বারংবারের প্রয়াস সব সময়ে জুয়াতে পর্যবসিত হয়েছিল। ধনতন্ত্রের কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ক তত্ত্ব ও প্রয়োগ সর্বকালীন সাফল্য কখনো আনতে পারেনি। সাময়িক সাফল্যের পরই সংকট অক্টোপাসের মত ধনতন্ত্রকে জড়িয়ে ধরেছে। প্রতিবারই তাদের মরিয়া চেষ্টা করে আবার সাময়িক পরিত্রাণ পেতে হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ধনতন্ত্রের এক সর্বকালীন উপাদান ও নিয়ম। চারশ' বছরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে যে ব্যবস্থা নিজ প্রতিষ্ঠাকে স্থায়ী করার নীতি ও ব্যবস্থা অর্জন করতে পারেনি, সংকট যে ব্যবস্থার জন্ম-সঙ্গী, সেই ব্যবস্থার দ্বারা সমাজকে স্থায়িত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার, যেমন করছে বর্তমানে, তা' অলীক হতে বাধ্য।

পুঁজিবাদের অন্তঃশক্তি এবং তাদের কলাকৌশলের ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্র লঘু না করেও একথা বলা যায় নিশ্চিতভাবে যে একবিংশ শতাব্দী হবে প্রবল সংঘর্ষের শতাব্দী। সেই সংঘর্ষের ব্যাপকতা ও মাত্রা কেবল অতীতকে অতিক্রম করবে না, তা' হবে অভিনব চরিত্রেরও। এই সংঘর্ষ যত প্রাবল্যে বাস্তব জগতে সংঘটিত হবে, তার চেয়ে বহুগুণ তীব্র হবে ভাবজগতে। এই শ্রেণী-সংগ্রাম আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাকে আবৃত করে নতুন সভ্যতার জন্য নতুন রেনেসাঁয় পর্যবসিত হবে। পুঁজিবাদের আকাঙ্ক্ষিত নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা থেকে শোষিত জনগণের সর্বাংশের সাথে তাদের সংঘর্ষের যে নতুন বীজ উপ্ত হচ্ছে, তা' আরও প্রশস্ত হবে। একথাও সত্য যে বিষয়ীগত বাস্তবতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাফল্য এনে দেয় না। শোষিত জনগণের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি করে সত্য এই কারণে যে রাষ্ট্রশক্তি ও সমগ্র ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে;অবিরাম সংঘর্ষ চলা সত্ত্বেও শ্রমজীবীদের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হলো বিষয়গত শক্তি অর্জন। সেক্ষেত্রে মতাদর্শ, সংগঠন, আন্দোলন ও ঐক্যের অর্জিত শক্তি বিষয়গত অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে দেয়।

'নতুন' সব সময়েই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে থাকে। সেই 'নতুন' যদি প্রত্যাশিত ধারায় সৃষ্টি না হয়ে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকভাবে ও অকস্মাৎ মাথার উপরে ভেঙ্গে পড়ে, তবে তা' জন্ম দেয় সাময়িক বিহ্বলতার। 'নতুন' যদি সম্পূর্ণ প্রতিকূলতা নিয়ে হাজির হয়, তা' আস্থার সংকট ডেকে আনে। এই স্তর সংক্ষিপ্ত হবার পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী হলে বিমূঢ়তা ও হতাশার কালে পরিণত হয়। অবশ্য মানব-সমাজের গতিপথ হলো পুনঃপুনঃ নতুনের আবির্ভাবের ইতিহাস। সময়ের অভিঘাত যতই তীব্র ও কঠিন হোক না কেন, সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়মাবলীতে যাঁদের প্রকৃত আস্থা আছে এবং যাঁরা ইতিহাস থেকেই যথার্থভাবে শিখেছেন তাঁদের উপর ঐতিহাসিক নৈতিক নতুন দায়িত্ব থেকে যায়। সময়ের দৃশ্যমান বাস্তবতার ভেতরে ঢুকে সত্য আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা সতত করতে পারলে এবং যথার্থ উদ্যোগ নিলে একটা পর্যায়ে পুনঃ-নতুন অগ্রগতির পথ নির্ণয় করা যায়। সুদীর্ঘকালের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের গতিপথ পরিবর্তিত হয়। প্রচলিত ব্যবস্থা, ধারণা ও ব্যবহারিক জীবনের সাথে প্রবল সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সাফল্য আসে। এই রকম নতুন

অধ্যায়গুলিতে মানব-সমাজে বাড়তি উদ্যম সৃষ্টি হয়। এই 'নতুন' নতুন মানুষ সৃষ্টি করে। এই ঘটনা বারে বারে ঘটেছে বলে মানুষ-প্রজাতি পৃথিবীতে শুধু নিজ অস্তিত্বকে রক্ষা করেনি, শ্রেষ্ঠ হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছে—সবসময়ে শেষ বিচারে জিতেছে প্রগতির ধারাই।

এইসব কথা কোন বিমূর্ত দার্শনিক আপ্তবাক্য নয়। এটা হলো মানব-ইতিহাসের গতির এক শাশ্বত 'ফেনোমেনা' তথা দৃশ্যমান প্রবাহ। তবে, বড় কঠিন এই কাজ। বর্তমানে বিশেষত, এই কাজে সাফল্য অর্জন কোন দু'একজন যুগন্ধর ব্যক্তিত্বের দ্বারা অর্জিত হবার নয়। এই কাজ সমগ্র সমাজের। ইতিহাসে মানুষের যথার্থ ভূমিকা পালন বলতে যা বোঝায় তা' হলো সমাজটাকে যথার্থ উপলব্ধি করে, যুগের অগ্রগতির জন্য বেশি সচেতন ও সক্রিয় দায়িত্ব পালন করা। মানুষের সংঘবদ্ধ কর্তব্যটা সমাজ-সভ্যতার সংকটের কালে সবচেয়ে জরুরি হয়ে দেখা দেয়। জনগণের সংগঠন সঠিকভাবে উদ্যোগ নিলে মানুষ রথের রশিতে হাতও লাগান। এইভাবে যুগ-রঙ্গমঞ্চে আসল মহানায়ক থাকেন জনগণ। প্রতিকূলতা যতই থাক না কেন, মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা, মানুষের কাছে শেখা, মানুষের মাঝে থাকা এবং মানুষকে সমবেত করে তাঁদের নিয়েই এগোনোর দ্বারাই এই সাফল্য আসে।

এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আরও নানা পূর্ব শর্ত আছে। তার অন্যতম হলো প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক নিয়মে বিশ্বস্ত থেকে মাথাটাকে কোথাও বন্ধক না রাখা। চোখ-কান খোলা রেখে দুনিয়ার মূল বিষয়গুলির সাথে যথাসাধ্য খুঁটিনাটিগুলোকে জানার চেষ্টা, সেখানে আমাদের বিষয় আর ওদের বিষয় বলে আগেই ভাগাভাগি না করা এবং প্রাপ্ত যাবতীয় ঘটনাবলী ও তথ্যের সর্বক্ষণ বিচার-বিশ্লেষণ চালিয়ে যাওয়া। যুদ্ধে—তা' যে চরিত্রেরই হোক, প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা জানা যত জরুরি, মিত্রপক্ষের উভয় দিক জানাও ততটাই জরুরি—যদি জয়ী হতে হয়। এই মনোভাব সর্বক্ষণ মাথায় রেখে আশু কর্তব্য আর দীর্ঘমেয়াদী করণীয়-র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় এবং পরস্পরের সম্পর্ক যুক্ত করে, অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজ করে, জয়ী হতে হয়। কেননা রণকৌশল আর রণনীতি মিলে-মিশে একাকার হলে পরিণাম কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দেয় না। সর্বোপরি, ট্রেড ইউনিয়নের কোন ঘেরাবদ্ধ গণ্ডী নেই এই নতুন যুগাভাসে। সমাজ-সভ্যতা-জীবনের সমস্ত ভাল ও মন্দ-র ক্ষেত্রে তাদের বিচরণ চাই। এটা ব্যতিরেকে আকাঙ্ক্ষিত সৃজন হবে না। নতুন সৃজন ছাড়া এযুগে জয় অর্জন দারুণ কষ্টসাধ্য হবে।

প্রথম খণ্ড
(পটভূমিকা)

আধুনিক মুহূর্তের সংলগ্ন প্রেক্ষাপট

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ধারণ করার চেষ্টা হয়েছে আধুনিক মুহূর্ত গঠনের পটপূর্বকে। এক্ষেত্রে বিশ্বের ঘটনাবলী, বিশেষত, সর্বজনীন রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি দিক তেমন আলোচিত হয়নি। শ্রমিকশ্রেণী, ট্রেড ইউনিয়ন ও সেটির ভূমিকার ওপর আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনে কিছুটা উত্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রধান দিকগুলি। সন্দেহ নেই সেইসব প্রসঙ্গও অনেকটাই খণ্ড খণ্ড ভাবে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে রয়েছে গভীর অন্তর্লীন সম্পর্ক।

বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হিসাবে মধ্য-সত্তরের দশকে ব্রেটন-উডস্ ব্যবস্থার পতন এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরে মতাদর্শগত স্তরে সংঘর্ষের কাল থেকে বর্তমান খণ্ডের পরিসর স্থির করা হলেও, সামান্য পূর্ব-পরিস্থিতি রেখা-চিত্রে উত্থাপন করা হয়েছে সঙ্গতি রক্ষার স্বার্থে। সেই অর্থে বলা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর থেকে কিছু সূত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান মুহূর্তের পৃথিবীকে যতখানি আকণ্ঠ পুঁজিবাদী বলে দাবী করা হচ্ছে, আলোচিত প্রেক্ষাপটের কালপর্ব মৌলিকভাবে ছিল তা' থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। ব্রেটন-উডসের এক-চতুর্থ শতাব্দী স্বর্ণ-যুগে বাস করার দাবী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি করলেও, বিশাল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উত্থান এবং নিরন্তর মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে শতাধিক সদ্য-স্বাধীন দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিও পাশাপাশি ঘটছিল এই কালপর্বে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, তুলনামূলকভাবে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অগ্রগতি ছিল কিছুটা বেশি। কিন্তু তারপর থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রবল সংকট ঘনীভূত হওয়া এবং বিশ্বের সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ও জনগণ থেকে তাদের ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা পৃথিবী সঞ্চয় করছিল। উৎপাদনের সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য এই কালপর্বে সবচাইতে বেশী সংখ্যক আগ্রাসী সামরিক তৎপরতায় নিজেকে যুক্ত করেছিল বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাহ্যত বিপুল অগ্রগতি এই সময়ে লক্ষ্য করা যায়। সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পররাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতি ছিল উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সাম্রাজ্যবাদের নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলিকে এবং অনুন্নত দেশগুলির দেশ গঠনে ও উন্নয়নে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষত তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করছিল। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমাজতন্ত্রের সংঘর্ষে বিশ্বের সর্বস্তরে নতুন রূপ পেয়েছিল বিশ্ব-শ্রেণীসংগ্রাম। এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ঘটেছিল সদ্য-স্বাধীন তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অগ্রগতি। এই পরিস্থিতি বিশ্ব-শ্রমিক আন্দোলনেও নতুন মাত্রা যুগিয়েছিল। সারা বিশ্বে এই সময় শ্রমিক আন্দোলন কেবল ছড়িয়ে পড়েনি, আন্দোলনগুলি অর্জন করছিল জঙ্গী মাত্রা। শ্রমিক আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে পুঁজিবাদ বাধ্য হচ্ছিল বেশি বেশি নতি স্বীকারে এবং শ্রমজীবী সহ জনগণের দাবী মেনে নিতে। দৃশ্যমান এই পরিস্থিতির বিচারে অনুমিত হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয়িষ্ণুতা ও সমাজতন্ত্রের বৃহত্তর সম্ভাবনা।

কিন্তু নেপথ্যে ঘনায়মান সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিকে তেমনভাবে নজর রাখেনি মানবসমাজ, বিশেষত বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক শক্তি, শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন। আসলে এই কালপর্ব বিশ্ব-ধনতন্ত্রের একক সংকটের কাল ছিল না, এটি ছিল সার্বিক বিশ্ব-সংকটের কাল। এই সময়ে পুঁজিবাদের ও প্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মডেলের সংকট একই বিন্দুতে মিলিত হচ্ছিল দুই বিপরীত মেরু থেকে। ধনতন্ত্রের সংকটের প্রধান প্রতিফলন ঘটছিল অর্থনৈতিক স্তরে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে মতাদর্শের পর্যায়ে। দৃশ্যত সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে বেদীমূলে এবং সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে উপরিসৌধে সংকট বলে অনুমিত হলেও, উভয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই এই সংকট ছিল বেদী ও কাঠামো উভয়ের সম্মিলনে এবং আকণ্ঠ। উৎপাদিকা শক্তির সামনে বিকাশের সংকট সমাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ কেউই সামাল দিতে পারছিল না; উভয়পক্ষই এই সংকট ও সেটির মাত্রাকে বিশ্ব-জনগণের সামনে

গোপন রাখার এবং নিজেদের অমিত শক্তিশালী বলে কৃত্রিমভাবে প্রদর্শনের চেষ্টা চালাচ্ছিল। এই প্রয়াসে সাম্রাজ্যবাদ তো বটেই সমাজতন্ত্রও কম-বেশী মিথ্যাচার করে বিভ্রান্ত করেছে নিজ দেশের ও আন্তর্জাতিক জনগণকে।

অথচ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে, মানব-ইতিহাসের সর্বাত্মক ও বিস্ময়কর সুযোগ এই সময়েই সৃষ্টি হয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। তৃতীয় 'সায়েন্স এণ্ড টেক্নোলজিকাল রেভলিউশন' (এস. টি. আর.) বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব-এর প্রথম অধ্যায় এই সময়ে সম্পন্ন হয়। প্রধানত সামরিক স্তরে এবং মহাকাশ বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে একান্তভাবে ব্যবহার করা শুরু করে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র। এই সময়ে সামাজিক উৎপাদন ও গণ-ভোগের স্তরে উপেক্ষিত হয় এটির ব্যবহার। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আঁকড়ে থাকে এই অবস্থান। পুঁজিবাদের সংকটকে নির্ধারকভাবে বিনাশী বলে ধরে নিয়ে তারা উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে সংকট বিমোচনে এস. টি. আর.-কে ব্যবহারের সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রচেষ্টাগুলিকে। সমাজতন্ত্রের নবায়নের জন্য সৃজনশীল ভাবনা ও প্রয়োগে দীর্ঘ উপেক্ষার পাশাপাশি শত্রুর তৎপরতা থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিবর্তে গোঁড়ামি এবং নিজ-শক্তির মধ্যে বিতর্ক-বিরোধ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংকটকে দ্রুতই গভীরে নিয়ে যেতে শুরু করে। এই ভ্রান্ত প্রবণতা ও ভূমিকায় ভয়ানকভাবে বিভ্রান্ত হয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশ্ব-কেন্দ্র প্রথমে ভেঙ্গে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দ্বিধা-বিভক্তি যেমন বিশ্ব-কমিউনিস্ট শক্তি ও আন্দোলনকে বিভক্ত করে, ফলস্বরূপ সেগুলির অভ্যন্তরে গড়ে উঠতে থাকে নানা ভুল ও অসঙ্গত প্রবণতা।

পরীক্ষামূলকভাবে হলেও, তৎপরতার সাথে স্বীয় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সামনে সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে ধীরে ধীরে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু করে সাম্রাজ্যবাদ। উৎপাদনের আঙ্গিকের রূপান্তর, উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলির প্রথাগত অবস্থানের হেরফের ঘটিয়ে অধিক ও উন্নত উৎপাদন, নয়া-উপনিবেশবাদী অধ্যায়ের পরিবর্তনমূলক বিন্যাস, শোষণের নতুন নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও ব্যবহার, নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের অনুকূলে মানুষের চাহিদা, রুচি ও ভোগের গঠন ইত্যাদি প্রয়াস নিয়ে স্বীয় ইতিহাসের বৃহত্তম অন্বেষণে ও কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে থাকে তারা। মূলধনের তাৎপর্য ও ব্যবহারকেও নানা মাত্রা দেওয়া শুরু হয় নানা প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির মাধ্যমে। ব্যক্তিগত মলিকানার পরিবর্তে কর্পোরেট মালিকানাকে নতুন উচ্চতায় তারা উন্নীত করতে শুরু করে। মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন বা বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করা হতে থাকে ;একই সাথে সেগুলিকে ব্যবহার করা হতে থাকে শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে।

উৎপাদনের আঙ্গিকের দ্রুত ও অবিশ্বাস্য ধরনের পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির পুনর্বিন্যাসের ফলে শ্রমজীবীদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সূচিত হতে থাকে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। এই কালপর্বে ক্রমশ সৃষ্ট পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ রূপ না পাওয়া গেলেও, সন্দেহ নেই, এই সময় ছিল ভবিষ্যৎ বৃহত্তর পরিবর্তনের বীজ বপনের কাল।

পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায়, এই অস্পষ্ট অথচ সংকটের পরিস্থিতিতে বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়ন শক্তি ক্রমশ বিহ্বলতা ও বিভ্রান্তির অধ্যায়ে প্রবেশ করছিল। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের স্তরে সৃষ্ট সংকট, বিরোধ ও নানান মাত্রার আবির্ভাব ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক-আন্দোলনকে সর্বাগ্রে আক্রান্ত করে ফেলে। বিভ্রান্তি থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে শ্রেণী-সমঝোতা ও পিছু হঠার প্রবণতা ও প্রক্রিয়া।

আশির দশকের প্রথমার্ধ থেকে পরস্পর বিপরীতমুখীন পরিবর্তনের চিহ্ন আস্তে আস্তে আরও স্পষ্ট হতে শুরু করে। একদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভ্যন্তরে সর্বময় সংকটের লক্ষণ ফুটে বেরুতে থাকে, অন্যদিকে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সুস্থিতি ও পুনরুত্থানের ইঙ্গিত স্পষ্টতর হয়। বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনে সহযোগিতা দানের ভূমিকা থেকে কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ হাত গুটিয়ে নিতে শুরু করে। এই সুযোগকে যথার্থে বিবেচনা করে বিশ্ব-পুঁজির বৃহত্তর আক্রমণ শুরু হয় বিশ্ব-শ্রমের বিরুদ্ধে।

আক্রান্ত হতে থাকে শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমিক-আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন।

ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাপ্ত মডেলের বিপর্যয় ঘটার মুহূর্ত পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে এই গ্রন্থের পটভূমিকার কাল হিসাবে—প্রথম খণ্ডে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের পরিস্থিতি

সর্বাধুনিক বিশ্বের গতি-প্রকৃতিকে অনুসরণ করতে হলে সর্বাগ্রে আলোচ্যকালের বিশ্ব-অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি অনুসরণ করার চেষ্টা একান্ত জরুরী। এটা সত্য যে 'আলোচ্য কালের' বলে উল্লেখ করা হলেও এই সময়ের অর্থনীতির কোন নির্দিষ্ট রূপ চিহ্নিত করা যায়নি; এত দ্রুত পরিবর্তনশীল ছিল এটির গতি ও প্রকৃতি। সমকালের অর্থনৈতিক বিশ্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতামতে এত ফারাক ছিল যে ন্যূনতম বিষয়ে সর্বসম্মত কোন সূচক পাওয়া যায় না। এই সমস্যা সত্ত্বেও খণ্ড-খণ্ড ভাবে কিছু প্রসঙ্গের বিবেচনা এবং তা' থেকে একটি প্রাথমিক ধারণার কাঠামো নির্মাণ করে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনীতির সমকালীন সুনির্দিষ্ট স্তরটি কি—সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী, নয়া-উপনিবেশবাদী, বহুজাতিকীয় অথবা অন্য কিছু—এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সম্ভবত সময়ের চাইতে পেছনে পড়ে যায় শ্রমিক-আন্দোলন। প্রধানত দু'টি কারণে এটা ঘটেছিল—নিজেদের তরফ থেকে সিরিয়াস মনোভাব নিয়ে আগে থেকে এসব বিষয়ে তেমন কোন চর্চা বা গবেষণা হয়নি দ্বিতীয়ত কিছু পূর্ব-প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তকে অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্তনীয় ধরে নিয়ে সেগুলিকে অবলম্বন করা এবং সেই ধারণা-ভিত্তিক মূল্যায়নের ধারা অনুসরণ। বিশেষত অর্থনীতির বিষয়ে সোভিয়েত অর্থনীতিবিদদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন ঘটনাবলী মূল্যায়নে অনুকরণপ্রিয়তা। আধুনিক পুঁজিবাদ সম্পর্কে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত অর্থনীতিবিদরা তথ্যের পর্বত সংগ্রহ করে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এখন প্রমাণিত হচ্ছে যে গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে তাঁদের মূল্যায়ন মুষিক প্রসব করেছিল। পুঁজিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে যথার্থ ভাবে উপলব্ধির ব্যর্থতা এবং সেটিকে দুর্বল ও ভঙ্গুর বিবেচনা করা, বিশেষত মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের ভূমিকাকে সাম্রাজ্যবাদী স্তরের অভ্যন্তরে এক পরিবর্তিত ও মামুলি মাত্রার বিস্তার হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে, তাঁদের মূল্যায়ন পরবর্তীকালে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পুঁজিবাদের সমকালীন স্তর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার পূর্বে পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এ কার্ল মার্কসের বক্তব্য স্মরণ করা দরকার।

"নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরাম বর্ধমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়াশ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।

"বুর্জোয়াশ্রেণী বিশ্ব-বাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও উপভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে।... সমস্ত সাবেকি জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস পেয়েছে, নয় প্রত্যহ ধ্বংস পাচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির মরা-বাঁচার প্রশ্নের সামিল; এমন শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচা মাল নিয়ে নয় দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে কাজ করছে; এমন শিল্প, যার উৎপাদন শুধু বিদেশেই নয়, ভূলোকের সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্নে যা মিটতো তেমন সব পুরানো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার সুদূর দেশ-বিদেশের ও নানা আবহাওয়ার উৎপন্ন দ্রব্য। আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতার স্ব-পর্যাপ্তির বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর নির্ভরতা।... সকল উৎপাদন যন্ত্রের উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফৎ বুর্জোয়ারা সভ্যতায় টেনে আনছে সমস্ত,...। সকল জাতিকে সে বাধ্য করে বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণে, অন্যথায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে; বাধ্য করে সেই বস্তু গ্রহণে যাকে বলে সভ্যতা—অর্থাৎ

বাধ্য করে তাদেরও বুর্জোয়া বনতে। এক কথায়, বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে।"

মার্কসের এই বক্তব্য অতীতের পুঁজিবাদের বাস্তবতা সম্পর্কে যতখানি সত্য ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি প্রমাণিত হতে থাকে এই সময়ের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। 'এ কনট্রিবিউশন টু দা ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি' পুস্তিকায় মার্কস ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াদের বিশ্ব-উৎপাদন-সম্পর্কের চরিত্রকে 'সেকেন্ডারি' বা মধ্য-স্তরীয়, 'ডিরাইভড্' বা নির্গতমূলক এবং 'ট্রান্সমিটেড' বা বিচ্ছুরিত বলেছিলেন। পরবর্তী দেড়শ' বছরে পরিবর্তনটি হলো, তা' সেকেণ্ডারির পরিবর্তে প্রাইমারি বা প্রাথমিক চরিত্র হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে মার্কসের মন্তব্য আমাদের আলোচ্য সময়ের পুঁজিবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। "স্পীচ্ অ্যাট দা অ্যানিভারসারি অব দা পিপলস পেপার"-এ তিনি বলেছিলেন—"পুঁজিবাদ সর্বদাই বিপরীতের গর্ভাধানে আসীন।" তার এই মন্তব্যের মর্ম হলো পুঁজিবাদের বিচরণের চরিত্রের জটিলতা। কার্যকালে এই সময়ের পুঁজিবাদীদের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেই জটিলতা অবিশ্বাস্য ব্যাপকতা ও গভীরতা পাচ্ছিল।

পুঁজিবাদী আর্থনীতিক তত্ত্বের দীর্ঘ বিকাশ-পর্ব রয়েছে। শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রের দ্বারা রাজনৈতিকভাবে অর্থনীতিকে ব্যবহার করার পলিটিক্যাল ইকনমি বা রাজনৈতিক-আর্থনীতিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের ইতিহাসও সুদীর্ঘ। বাস্তব চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতির পরিবর্তনের পথে বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদের সামনে বারে বারে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন সময়ে একটি 'স্কুল অব থট' বা 'বিশেষ ধারার ধারণা' প্রাধান্য বিস্তার করলেও, অতীত থেকে বিভিন্ন যেসব তত্ত্ব প্রস্তাবিত হয়ে এসেছে, সেগুলির সমন্বয়েই অর্থনীতিগত ব্যবস্থা কার্যকরী থেকেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অর্থনীতিকে ধ্রুপদী বুর্জোয়া অর্থনীতি এমনভাবে আদর্শায়িত করেছিল, যেখানে 'মার্কেট' বা 'বাজার' হবে বাধামুক্ত; প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অর্থনীতিতে বেকারীত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই মতবাদী ধারার কেন্দ্রীয় ধারণা দাঁড়িয়েছিল মজুরি-মূল্যের নমনীয়তার ভিত্তির উপর—যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারকে মুক্ত করবে। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আর একটি তাত্ত্বিক উপাদান গুরুত্ব অর্জন করেছিল। "সে'জ ল" বা 'সে'র নিয়ম বলে পরিচিত এই ধ্রুপদী বুর্জোয়া অর্থনৈতিক মতবাদ মনে করতো যে যোগানই চাহিদা সৃষ্টি করে। "সে'জ ল" বা 'সে'র নিয়ম বা 'ল অব মার্কেট' প্রস্তাব করেছিলেন জে. বি. সে (১৭৬৭-১৮৩২)। এই নিয়মের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল সম্পদ কখনো 'আনডার-ইউজড' বা নিম্ন-ব্যবহৃত থাকে না। অন্যভাবে বলা যায় 'সাপ্লাই ক্রিয়েটস ইটস ওন ডিমাণ্ড' বা সরবরাহই সেটির নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে। তবে, ১৯২৯-'৩৩ মহামন্দার আঘাতে এই মতবাদের প্রভাব ভেঙ্গে পড়ে।

১৮০০ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশক জুড়ে বুর্জোয়াদের নিও-ক্লাসিক্যাল পলিটিকাল ইকনমি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে অভ্যুদয় ঘটে লর্ড জন মেইনার্ড কেইনস্ প্রস্তাবিত কেইনসিয়ানিজমের (যা'কেইনসিয় বিপ্লব' বলে পরিচিত)। অতীতের ধারার সাথে কেইনসিয় আর্থনীতিক মতবাদের প্রথম পার্থক্য হলো, শেষোক্তটি অর্থনীতিকে মোটামুটি এক সামগ্রিকতায় বিচার করেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি বুর্জোয়া অর্থনীতিতে প্রথম 'ম্যাক্রো-ইকনমিকস' বা সর্বাত্মক অর্থনীতির জন্ম দেয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্বিতীয় সাধারণ সংকটের কালে বিশ্ব-পুঁজিবাদের ভিত্তি ছিল একচেটিয়া পুঁজির কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া বাজার বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন চালানো। কেইনসিয় তত্ত্বের সংক্ষিপ্ততম মর্ম ছিল যে, যখন ব্যাপক বেকারী দেখা দেয় তখন রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে চাকুরীর সংস্থান ক'রে কৃত্রিমভাবে চাহিদার শর্ত সৃষ্টি করবে—এটার অর্থ যদি এমনও হয় যে গর্ত বোঁজাবার জন্য গর্ত খোঁড়া! চাকুরী পেলে ও চাকুরীজীবীর সংখ্যা বাড়লে যথাক্রমে মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়বে সুতরাং চাহিদা সৃষ্টি হবে; সুতরাং বাজার প্রসারিত হবে; ফলে কল-কারখানাকে বেশি উৎপাদন করে যোগান বাড়াতে হবে। তাতে মুনাফা বাড়বে; সেই মুনাফা ব্যবহার করে শিল্পের প্রসার হবে, তাতে আরো মানুষের নতুন নিয়োগ হবে;এইভাবে পৌনঃপুনিক পথে, অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিত হবে। কেইনসিয় তত্ত্বের অপর এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বক্তব্য ছিল— রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতে

বাজারের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বাজার কেন্দ্রীয় সংযোগকারীর ভূমিকা নেয় পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায়। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থাবলীর অভ্যন্তরে একচেটিয়া উচ্চ মুনাফা গ্যারান্টি সৃষ্টির কার্যসাধন-বন্দোবস্তে (মেকানিজম) বাজার এক স্বাধীন অঙ্গ হিসাবে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বাজার হলো অন্যতম এক নির্ধারক ক্ষেত্র—যার ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থার আইন-কানুন কার্যকরী হয়।

কিন্তু এই তত্ত্বও ক্রমে ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পূর্বোক্ত মতবাদ সহ অতীতে বিশ্ব-পুঁজিবাদী ধ্রুপদী আর্থনীতিক অধিকাংশ তত্ত্বই প্রবল সংকটের সম্মুখীন হয়। শুরু হয় 'সংকট ব্যবস্থাপনার' জন্য নতুন তত্ত্বের জন্য সন্ধান ও প্রয়োগ। আধুনিক বিশ্বের আর্ন্তজাতিক প্রধান সংগঠনগুলির সৃষ্টিকাল এই সময়ে। সেগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি কার্যকালে এবং শেষ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ সালের অন্তর্বর্তী তিনটি দশকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ব্রিটেনের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ছিল। ব্রিটেন জন্ম দিয়েছিল লগ্নী-পুঁজির ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী স্তরের। সাম্রাজ্যবাদী স্তরের নতুন আদর্শগত অর্থনৈতিক তত্ত্বে, যা বিশ্বে প্রথম 'পলিটিকাল ইকনমি' তথা রাজনৈতিক-অর্থনীতি নামকরণে উপস্থিত হয়, ছিল দু'টি প্রধান উপাদান ঃ গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড বা স্বর্ণ-মানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিনিময় ব্যবস্থা এবং ফ্রী ট্রেড বা মুক্ত বাণিজ্যের নীতি। স্বর্ণ-মান হলো ব্রিটিশ মুদ্রা স্টার্লিং। আন্তর্জাতিক স্তরে এই মুদ্রা ও সেটির মান এবং আন্তর্জাতিক বিনিময় হার পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। এই দুই ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশ প্রাধান্যের মূল ভিত্তি। স্বদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষমতার প্রবল শক্তির জোরে তারা বিশ্ব-বাজার দখল করে নিয়েছিল। সমুদ্রে অমিত শক্তিশালী নৌবহরের সমর্থনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অধিকৃত দেশগুলি শাসনের জন্য বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী, ইউরোপে রাজনৈতিক স্তরে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মিত্র দেশগুলির সাথে জোট গঠন ও তাদের সাথে সহযোগিতা ইত্যাদি ব্রিটিশ সাফল্যের সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু ১৮৭০ সালের পর ইউরোপ ভূখণ্ডের কিছু দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষমতা ও বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ব্রিটেনের একাধিপত্যকে ক্ষুণ্ন করতে শুরু করে। তার অর্থ এটা ছিল না যে ব্রিটেনের কর্তৃত্বের তখনই অবসান ঘটে গিয়েছিল। তারই মধ্যে ১৮৭৩-১৮৯৬-এর 'গ্রেট ডিপ্রেশন' বা মহামন্দা ব্রিটেন-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব-অর্থনীতিতে বিশাল আঘাত হানে। এই সময় সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দেশ দখলের তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়। ১৮৭০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতি বছর গড়ে ২,৪০,০০০ বর্গ মাইল হিসাবে ভূসীমা দখল করতো, যা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ৭৫ বছরের প্রতি বছরের চেয়ে গড়ে ৩ গুণ বেশি। জার্মান মুদ্রা মার্কের দাপটে বিশ্ব-অর্থ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী লণ্ডনের অর্থ-বাজারের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন হতে থাকে দ্রুত; অন্য শক্তিগুলির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমরাস্ত্র ও সামুদ্রিক নৌবহরের প্রাধান্য দারুণভাবে কমে যায়। এরপর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩০-এর দশকে অতিকায় মন্দা, ব্রিটিশ স্বর্ণ-মান পরিত্যক্ত হওয়া, নতুন এক অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও মুদ্রা ব্যবস্থার জোটের উদ্ভব প্রভৃতি এবং এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশক ব্যাপী জার্মানীর নেতৃত্বাধীন জোটের সাথে সংঘাত ও সংকট ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন বিশ্ব-অর্থনীতির অবসান ঘটায়।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর নতুন বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পত্তনে নতুন শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অতীতের ব্রিটেনের মত অস্ত্রবলে, উৎপাদনের ক্ষমতায়, অর্থবলে এবং পুঁজিবাদী সমগ্র বিশ্বকে নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে নেবার একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্জনকারী উদীয়মান আমেরিকা পূর্বের মুদ্রা-মানের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-মান হিসাবে স্বদেশীয় মুদ্রা ডলারকে প্রতিষ্ঠা করে, ব্যবস্থা গ্রহণ করে নতুন বিশ্ব-অর্থনীতির মূল ভিত্তি হিসাবে মুক্ত বাজার ও মুক্ত বাণিজ্যের তত্ত্বকে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠার। এজন্য নীতিগত ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা করতে ১৯৪৪ সালে ব্রেটন-উডস্ চুক্তির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার পত্তন ঘটায়।

এই কালপর্বে বিশ্ব-অর্থনীতির একটি সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায়। একাধিক দেশের মধ্যে আর্থিক

ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুদীর্ঘকালের বিশ্ব-অর্থনীতির ঢিলেঢালা ও ভলান্টারি তথা স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থ' থেকে, এইকালে, বিশ্ব-অর্থনীতির একটি সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট আর্থনীতিক নিয়মভিত্তিক চরিত্র গড়ে ওঠে। এই বিশ্ব-অর্থনীতির মূল উপাদান ছিল তিনটি : (ক) প্রত্যেক দেশের জাতীয় অর্থনীতি বিবেচিত হতো এটির ইউনিট বা একক হিসাবে (খ) এই এককগুলির মধ্যে সম্পর্কের ও চুক্তির ভিত্তিতে পণ্য বা মালপত্রের পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘটতো এবং (গ) এই আদান-প্রদানকে তথা বিনিময়কে স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করতে সমস্ত এককগুলির দ্বারা স্বীকৃত একটি বিনিময় মাধ্যম তথা মুদ্রা-ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেকটি ইউনিট মূলগতভাবে পুঁজিবাদী হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি স্বীয় দেশের ঐতিহাসিক বিকাশ, বাস্তবতা ও আইন-কানুনের দ্বারা পরিচালিত ছিল। দেশের অভ্যন্তরের শ্রেণীগুলির মধ্যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক আদান-প্রদানের নিজস্ব নীতি ও ব্যবস্থা সেখানে স্বীকৃত ছিল। এই ন্যাশনাল ইকনমি বা জাতীয় অর্থনীতিকে 'রিয়েল ইকনমি' বা প্রকৃত আর্থব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হওয়ায় শোষণ এইসব রাষ্ট্রের সর্বোত্তম লক্ষ্য হলেও, একমাত্র লক্ষ্য হয়নি। এই অর্থনীতি নিজ জনগণের প্রয়োজনে প্রধানত পণ্য উপাদান করে, কর্ম-সংস্থানে সচেষ্ট হয়, 'ফিজিকাল রিসোর্স' বা বাস্তব সম্পদকে সংগ্রহ ও সংঘবদ্ধ করে ও ব্যবহার করে যথাযথভাবে, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশকে রক্ষা করে অর্থাৎ জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বারা সমাজের অন্যান্য শাখার বিকাশ ঘটায়। অন্ততপক্ষে এগুলি ছিল ঘোষিত লক্ষ্য। এই ইউনিটগুলির মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক বিনিময়ের জন্য রাষ্ট্রসংঘ, আংটাড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্রেটন-উডস্ ব্যবস্থা, মার্শাল পরিকল্পনা, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ড, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব রিকনস্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক), জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যাণ্ড ট্যারিফস প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি হয়। সেগুলির নিয়মাবলী ও স্থিরীকৃত ব্যবস্থাগুলি সাধারণভাবে কার্যকরী থেকেছে। তৃতীয়ত অতীতে ব্রিটেনের কর্তৃত্ব থাকায় বিনিময়ের ব্যবস্থা হিসাবে, পাউণ্ড ছিল বিশ্ব-স্তরের বিনিময় মুদ্রা; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পাউণ্ডের পতন ও তার পরিবর্তে আমেরিকার সার্বিক কর্তৃত্বের পটভূমিকায় আসে ডলার। ডলারই আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা নেয়। এইভাবে নতুন চেহারায় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে (পুঁজিবাদী বিশ্বের) পাওয়া গিয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রথম ২৫ বছরে পুঁজিবাদের স্বার্থে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রত্যক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ উদ্ভূত এই পরিস্থিতির মূল উপাদানগুলি ছিল :

(ক) রাষ্ট্র ও একচেটিয়া স্বার্থের মধ্যে আরও অখণ্ডতা সৃষ্টি;স্বদেশে ও বিদেশে একচেটিয়া পুঁজিকে সক্রিয় করতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ;অন্য দেশের পুঁজির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিকে রাষ্ট্রের নানা ধরনের সহায়তা দান।

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক রুগ্ন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ অথবা রক্ষার ব্যবস্থা : সেগুলিকে পরিচর্যা করে লাভজনক করে তোলার পর পুনরায় বিরাষ্ট্রীকরণ; পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও যেসব ক্ষেত্রগুলি একচেটিয়া পুঁজির পক্ষে লাভজনক নয় অথচ সমাজ এবং ভবিষ্যৎ অর্থনীতির পক্ষে জরুরী সেইসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ।

(গ) রাষ্ট্র কর্তৃক বিপুল আয়তনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র-শিল্প ও যুদ্ধাস্ত্র-অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) বাজেট ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার দ্বারা কর সংগ্রহ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় আয়ের বন্টন, মুদ্রাস্ফীতি-নিরোধী ব্যবস্থা, মজুরি-নীতি এবং চক্রায়িত সংকটকে প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গুচ্ছ-প্রকল্প চালু রাখা।

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য 'রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট' (আর অ্যাণ্ড ডি) তথা গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, বিশেষত একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে, রাষ্ট্র কর্তৃক তা' যোগানের ব্যবস্থা।

এইসব তৎপরতার দ্বারা সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণকে স্থবির করতে এবং দেশের

অভ্যন্তরে শ্রেণী-সংগ্রামকে ভোঁতা করতে এসেছিল 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' বা 'কল্যাণকর রাষ্ট্র'র তত্ত্ব ও প্রচার। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জনগণের কাছ থেকে কর বা অন্যভাবে অর্থ নিঙড়ে নিয়ে বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি জনগণের জন্য চালু করেছিল। অবশ্য সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর উজ্জীবিত সংগ্রাম ছিল শেষোক্ত ব্যবস্থাগুলি বলবৎ হবার পেছনে অন্যতম বাধ্যতা।

১৯৪৫ সালে ব্রেটন-উডস সম্মেলনে পুনর্গঠন ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কেইনসের প্রস্তাবের একটা অংশ খারিজ হয়েছিল। ব্রিটেনের মুদ্রা পাউণ্ডকে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের কেন্দ্রীয় মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ, একটি ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা, ব্যাঙ্কের হাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা প্রচলনের অধিকার এবং আন্তর্জাতিক স্তরের প্রধান মুদ্রাগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রার মূল্যমান নির্ধারণের ব্যবস্থার নামে হীনবল পাউণ্ড এবং উদীয়মান ডলারের মধ্যে একটা সমঝোতার প্রস্তাব কেইনস দিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্ররা ব্রেটন-উডস্ সম্মেলনের অংশীদার হলেও কেইনস্ প্রস্তাব করেছিলেন তাদের এই আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থা থেকে বাইরে রাখার। কিন্তু ডলার ও সোনার মধ্যে স্থায়ী বিনিময় হার ও ডলারকে একমাত্র বিশ্ব-মুদ্রা হিসাবে আমেরিকা গ্রহণ করিয়ে নেয়। তবে অর্থনীতিবিদ সামির আমিন দেখিয়েছেন যে এই সময়ে কার্যকরীভাবে তিন ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়—(ক) উন্নত পুঁজিবাদী দেশে কেইনসিয় নীতি-ভিত্তিক জাতীয় অর্থনীতি এবং একই সঙ্গে বিশ্ব-বাজারের জন্য উদ্যোগ, (খ) সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির বুর্জোয়াদের 'দি প্রজেক্ট অব বান্দুং' বা বান্দুং প্রকল্পের (তৃতীয় দুনিয়ার জোটবদ্ধ হবার সূত্রপাত এবং পঞ্চশীল ব্যবস্থা) মাধ্যমে 'ক্যাচিং আপ' বা জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্রুত উন্নত ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অগ্রগতি স্পর্শ করার জন্য তৎপরতা তথা স্ব স্ব দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণীগত ও অর্থনীতিগত প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপরতা এবং (গ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতি। সামির আমিনের এই মূল্যায়ন ও তার পেছনের যুক্তিগুলি বা স্বতঃসিদ্ধগুলি হুবহু গ্রহণ করা কঠিন হলেও, বিষয়গতভাবে এই তিন ধরনের বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্রেটন-উডস চুক্তির সংগঠন

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে বিপর্যস্ত সমগ্র আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা থেকে, আমেরিকার নেতৃত্বে এবং গ্রেট ব্রিটেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় ১৯৪৪ সালের ২২শে জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন-উডসে ৪৪টি দেশের চুক্তির মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ড (আই. এম. এফ.), দা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট বা আই. বি. আর. ডি. (সংক্ষেপে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক) এবং বিশ্ব বাণিজ্যিক ব্যবস্থার জন্য ভবিষ্যতে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অরগানাইজেশন (আই. টি. ও) পত্তন করার পূর্ব-ব্যবস্থা হিসাবে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যাণ্ড ট্যারিফস (গ্যাট) সংগঠন ও ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই ৪৪টি দেশের মধ্যে মাত্র ৮টি দেশ ছিল এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকা থেকে। এটাও স্মর্তব্য যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত কিন্তু পরবর্তীকালে আমেরিকার সাথে অর্থনৈতিক স্তরে সর্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিশ্ব-অর্থনীতিতে মহাশক্তি অর্জনকারী জাপান ও জার্মানি ব্রেটন-উডস্ চুক্তির অংশীদার ছিল না। আই. এম. এফ.-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময় হারের স্থিরতা রক্ষা এবং তা' নির্ভরযোগ্য ও শৃঙ্খলা-সম্পন্ন করে বহাল রাখার জন্য বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি সমাধানের ব্যবস্থা করতে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ককে ভার দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ প্রদান ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ-বিঘ্নকারী যে কোন পরিস্থিতির স্বাভাবিকীকরণের জন্য ভূমিকা গ্রহণে। যথার্থ অর্থে এগুলিকে অরগানাইজেশন না বলে বরং একধরনের বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী এজেন্সি বলা বাঞ্ছনীয়। বাহ্যিকভাবে এগুলির অত্যন্ত ব্যাপক, দক্ষ ও সাংগঠনিক রূপ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কার্যকালে এগুলি লগ্নী তথা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিকাশ ও সংহতি সাধনের সংবাহক হিসাবে কাজ করেছে। ব্রেটন-উডসের পরবর্তীকালে নানা কারণে আই. টি. ও. গঠিত হতে পারেনি ফলে গ্যাট চলেছে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা প্রতিষ্ঠান রয়েছে—

ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন (আই. এফ. সি.), ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আই.ডি.এ.) এবং মালটিল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (এম. আই. জি. এ.)।

ব্রেটন-উডস্ সংগঠনে প্রকৃত কর্তৃত্বের স্বরূপ

সংস্থাগুলির উপর ক্রমশ কর্তৃত্ব অর্জনকারী দেশগুলি, যাদের উন্নত দেশ বলা হয়ে থাকে, তাদের নামগুলি হলো (ইংরেজীর আদ্য অক্ষর অনুসারে) ঃ অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, নেদারল্যাণ্ডস (হল্যাণ্ড), নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ইউনাইটেড কিংডম (ইংলণ্ড) এবং ইউনাইটেড স্টেটস (আমেরিকা)। এগুলির মধ্যে নেতৃত্বদায়ী দেশ ৭টি, যারা পরবর্তীকালে জি-সেভেন নামে পরিচিত,—আমেরিকা, জাপান, জার্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, কানাডা ও ইতালি।

সংস্থাগুলির (প্রধানত তিনটি—আই. এম. এফ., ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও গ্যাট) গঠনের চরিত্র লক্ষ্য করলে সর্বপ্রথমেই চোখে পড়বে আসল নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলিকে।

সদস্য দেশগুলির প্রতিষ্ঠানে আমানতের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে আই. এম. এফ.-এ ভোটদানের মাত্রা। ফলে ১৫৫টি দেশের মধ্যে শিল্পোন্নত প্রধান ৫টি দেশের ভোটের ক্ষমতা হলো ৪১.২ শতাংশ।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিটি সদস্য দেশের ২৫০টি ন্যূনতম ভোট থাকলেও, ১ লক্ষ বাড়তি ডলার জমা দিলে তার ভোট দানের ক্ষমতা একটি করে বাড়ে। ফলে ১৫৮টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধান পাঁচটি ধনী দেশের ভোটের ক্ষমতা হলো মোট ভোটের ৩৮.১০ শতাংশ। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯.৭ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ও ব্রিটেন এইভাবে সংস্থা দু'টিতে কার্যকরী কর্তৃত্ব করে থাকে।

বহুল পরিচিত 'গ্যাট'-এর ভ্রূণও নিহিত ছিল ১৯৪৫ সালে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে বিশ্ব-বাণিজ্য কাঠামোর চরিত্র নির্ধারণের বিষয়ে গৃহীত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মধ্যে। ঐ চুক্তি প্রথমত ছিল আন্তর্জাতিক স্তরে দুই দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে, দ্বিতীয়ত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক বিকাশের উদ্দেশ্যে। ক্রমে চুক্তিটি সর্বাগ্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষী হয়ে ওঠে। গ্যাটের প্রথম পাঁচটি রাউণ্ডের আলোচনাতে আমেরিকা তার নিজের দেশের ১৯৩৪ সালে চালু আইন রেসিপ্রোকাল ট্রেড এগ্রিমেন্টের সমস্ত অন্তর্বস্তুকে গ্রহণ করাবার ব্যবস্থা করে। ১৯৬২ সালে গ্যাটের ষষ্ঠ রাউণ্ডের (কেনেডি রাউণ্ড বলে পরিচিত) সিদ্ধান্তে আমেরিকা স্বীয় দেশের ট্রেড এক্সপ্যানশন অ্যাক্ট, ১৯৬২-এর মর্ম সদস্য দেশগুলিকে মেনে নিতে বাধ্য করে। ১৯৭৩ সাল থেকে গ্যাটের যে টোকিও রাউণ্ড শুরু হয় তাতে আমেরিকার 'ট্রেড অ্যাক্ট '৭৩-এর বিষয়বস্তু প্রাধান্য পায়। ১৯৮১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের অন্যতম উপদেষ্টা ও আমেরিকার ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ উইলিয়াম ব্রুক কংগ্রেসের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে গ্যাটের নতুন রাউণ্ডের আলোচনা ও সিদ্ধান্তে আমেরিকার স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে সে বিষয়ে আভাস দেন। জানুয়ারী '৮২-তে, ইউরোপীয়ান ম্যানেজমেন্ট ফোরাম (দাভোস সিম্পোজিয়াম)-এ মিঃ ব্রুক যা বলেন, তাই কার্যত উরুগুয়ে রাউণ্ডে আর্থার ডাঙ্কেলের প্রস্তাবে ছিল। সর্বোপরি আমেরিকার 'অমনিবাস ট্রেড অ্যাণ্ড কম্পিটিটিভনেস অ্যাক্ট, ১৯৮৮' এবং 'সুপার-৩০১' ও 'স্পেশাল-৩০১'-এর বিষয়বস্তু ডাঙ্কেল প্রস্তাব আত্মীকরণ করে। একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে এর পাশাপাশি আমেরিকান এক্সপ্রেস, সিটি ব্যাঙ্ক ও আই. বি. এম. নামক তিনটি অতিকায় আমেরিকান মালটিন্যাশনালের নেতৃত্বে ২০০টি এম. এন. সি. নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল এক মঞ্চ—মালটিল্যাটারাল ট্রেড নেগোশিয়েশনস কোয়ালিশন, যার উদ্দেশ্য ছিল গ্যাটের উরুগুয়ে রাউণ্ডের আলোচনা ও ফলাফল যাতে আমেরিকার পক্ষে যায় সেজন্য সার্বিক তৎপরতা চালানো। তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আমেরিকা ও এম. এন. সি.গুলি—উভয়ের এবং অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই সংস্থার সাথে নিয়মিত বৈঠক করতেন এবং গ্যাটে আমেরিকার কি ভূমিকা হবে সে বিষয়ে পরামর্শ নিতেন। সেই পরামর্শ তিনি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

পূর্বোক্ত এই উপাদানগুলি তিনটি বিশ্ব-সংস্থার চরিত্র অনুধাবনের অন্যতম দিক হলেও, আরও স্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য এগুলির ফাংশনিং তথা কর্মপন্থার প্রধান দিকগুলি কিছুটা লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

ব্রেটন-উডস্ সৃষ্ট সংগঠনগুলির কাজের ধারা

আই. এম. এফ. এবং ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের ব্যবস্থার ও ভূমিকার কেন্দ্রে রয়েছে সাহায্য বা ঋণ-প্রদত্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঘোষিত পথে ধীরে ধীরে উচ্ছেদ ঘটানো, ঐসব দেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু, দেশীয় অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী পুঁজির স্বার্থে সর্বপ্রকার সুযোগের প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় অর্থনীতির তথাকথিত বিশ্বজনীনীকরণ তথা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অবাধ বিচরণের ব্যবস্থা করা। এগুলি কার্যকরী করতে এই দুই সংস্থার নানা জটিল নিয়ম ও ব্যবস্থাপনা রয়েছে। তার মধ্যে লক্ষণীয় দিকটি হলো প্রথমে কিছুটা সাদাসিধে ও সুদহীন বা স্বল্প সুদে একবার ঋণ বা মঞ্জুরি দেবার পর এমন সব প্রক্রিয়া সংস্থা দু'টি নেয় যার ফলে সাহায্যপ্রাপ্ত বা ঋণ-গ্রহণকারী দেশগুলি বাধ্য হয় ক্রমান্বয়ে আরও ঋণ গ্রহণ করতে। প্রতি দফায় ঋণে শর্তের পরিমাণ ও মাত্রা বাড়তে থাকে। তারপর অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা শুরু করে, এই সংস্থা দু'টি ক্রমে ঋণপ্রাপ্ত দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে হস্তক্ষেপ করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে—যাকে কার্যত 'ডেট-ট্র্যাপ' বা ঋণ-ফাঁদ বলে অভিহিত করা চলে। সংস্থা দু'টি বিশ্বের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষত, মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের পথকে প্রশস্ত করে চলে।

আই. এম. এফ. তাদের তথাকথিত (ক) রিজার্ভ ট্রেঞ্চি ও (খ) ক্রেডিট ট্রেঞ্চি—এই দুই ব্যবস্থা থেকে ঋণ দিয়ে থাকে। প্রথমোক্ত ব্যবস্থা আসলে ঋণ-গ্রহীতা দেশের নিজস্ব জমা রাখা অর্থ থেকে দেওয়া ঋণ। তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাটিই প্রধান। ঋণ দেবার শর্ত এই ব্যবস্থাতে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। ঋণ-গ্রহীতা দেশগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নানা সমস্যা সমাধানের বাগাড়ম্বর করে আই. এম. এফ. যেসব খাতে ঋণ দিয়ে থাকে সেগুলি হলো ঃ (ক) বাফার স্টক ফেসিলিটি (বি. এস. এফ.), (খ) কমপেনসেটরি অ্যাণ্ড কনটিনজেন্ট ফাইনান্সিং ফেসিলিটি (সি. সি. এফ. এফ.), (গ) স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটি (এস. এ. এফ.); (ঘ) এনহান্সড্ স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটি (ই. এস. এ. এফ.), (ঙ) এক্সটেনডেড্ ফাণ্ড ফেসিলিটি (ই. এফ. এফ.) ইত্যাদি। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক যেসব খাতে ঋণ দিয়ে থাকে সেগুলি হলো ঃ (ক) প্রজেক্ট লোন, (খ) সেকটোরাল অ্যাডজাস্টমেন্ট লোন, (গ) স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট লোন ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে ঘোষিত বক্তব্য কি রয়েছে সে বিষয় এখানে উল্লেখ নিরর্থক। কার্যকালে সুনির্দিষ্ট কি ঘটে তার সামান্য কিছু দিক এখানে উল্লেখ করাই বাঞ্ছনীয় হবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে ঋণদানের শর্তগুলির মধ্যে প্রধানত রয়েছে ঋণগ্রহীতা দেশকে (ক) বৈদেশিক বাণিজ্যের ও মুদ্রার ঘাটতি কমানোর ব্যবস্থা নিতে রপ্তানিমুখী বাণিজ্য বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করতে হবে। এই ব্যবস্থা শুরু হবার আগে তারা ঋণগ্রহীতা দেশকে মুদ্রার অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাধ্য করে। (খ) মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও আর্থিক ঘাটতি হ্রাস করার ব্যবস্থার জন্য চাপ দেয়। এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে তারা বাধ্য করে তথাকথিত অনুৎপাদক খাতে ব্যয় হ্রাসের পরামর্শ দেবার নামে সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিষেবামূলক খাতে ব্যয় ও ভর্তুকি হ্রাস, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, গণবন্টন ব্যবস্থা প্রভৃতির সংকোচন, শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা ও বেতন-ভাতার ব্যয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস করতে। (গ) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ ও উদারনীতির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করায়। এজন্য সরকারি সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ শিথিল, সমস্ত সংরক্ষণমূলক আইন ও নিয়ম-কানুন বাতিল, শিল্প-কৃষি ও পরিষেবার বেসরকারীকরণ, উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিরাষ্ট্রীকরণে চাপ দেয়। (ঘ) তথাকথিত কর-কাঠামোর পুনর্গঠন করার নামে ব্যক্তি-মালিকানার পুঁজি, উৎপাদন ও লাভের উপর থেকে করের চাপ ক্রমশ হ্রাস করে উৎপাদনে উৎসাহ দানের দাবী করে। (ঙ) বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে সমস্ত ধরনের আইনী

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেবল প্রত্যাহার নয়, বিদেশী পুঁজির স্বেচ্ছা-বিচরণের তথা ইচ্ছামত ক্ষেত্রে উৎপাদনে, পণ্যমূল্য নির্ধারণে ও যৌথ অংশীদারিত্বে অবাধ সুযোগ, শিল্প-উৎপাদন-মুনাফাকে স্বদেশে বা বিদেশে স্থানান্তরের অধিকার, নিয়োজিত শ্রমিকদের উপর মালিক ও কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব করার অবাধ অধিকার ও সেজন্য সমস্ত ধরনের শ্রম-আইন মালিকদের পক্ষে সংস্কার, বিদেশী পুঁজির জন্য একটি পূর্ব-নির্ধারিত ন্যূনতম লাভের ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক গ্যারান্টি করা, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন সরকারকে দিয়ে নির্ধারণ ও নির্মাণ করানো, উৎপাদনের পরিকাঠামো—বিদ্যুৎ, সড়ক, পরিবহন, দক্ষ শ্রমশক্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করানো। (চ) ঋণের কিস্তি ও সুদ সুনির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত সময়ে পরিশোধ করার ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা, অমনোযোগিতা বা ইচ্ছাকৃত অবহেলা ঘটলে আন্তর্জাতিকভাবে প্রয়োজনীয় পাল্টা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনাও ঘটে। সংক্ষেপে বলা যায় যে শর্তগুলির তাৎপর্য হলো—একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আর একটি বিদেশী শক্তির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

ব্রেটন-উডস্ ব্যবস্থার পতনের আন্তর্জাতিক সাধারণ পটভূমিকা

কিন্তু ব্রেটন-উডস্ ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতিতে ও সমাজ-জীবনে (৬০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে) সংকট পরিস্ফুট হতে থাকে। অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় এক নতুন বাস্তবতা—'স্ট্যাগফ্লেশন'—স্ট্যাগনেশন বা মন্দা ও ইনফ্লেশন তথা মুদ্রাস্ফীতি, একই সাথে উভয়ের সমাহার। ইউরোপীয়ান কমন-মার্কেটের দেশগুলিতে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা রেকর্ড স্তরে পৌঁছায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৯৬৮ সাল থেকে প্রতিবছর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শ্রমিক-আন্দোলন, বিশেষত লাগাতার চরিত্রের শিল্পভিত্তিক ধর্মঘট, সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি মানুষ ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়। ১৯৬৮ সালের মে মাসে ফ্রান্সে ছাত্র ও শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট পৌঁছেছিল প্রায় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পর্যায়ে। ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্পুচিয়া, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া (বর্তমানে নামিবিয়া) প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় মুৎসুদ্দি বা সামরিক একনায়কত্বের সরকারগুলির বিরুদ্ধে, বিশেষত লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে, জনগণের অভ্যুত্থান-ধর্মী আন্দোলনগুলি অচিরেই ব্যাপক ও সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে পরিণত হয়। তাছাড়া, তৃতীয় দুনিয়ার অনেকগুলি দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম, যেমন পাকিস্তান, ইথিওপিয়া, সাইপ্রাস, ইরান ইত্যাদিতে, ব্যাপক রূপ পায়। দীর্ঘকালব্যাপী স্পেন ও পর্তুগালে ফ্যাসিস্ত শাসন ও গ্রীসে সামরিক জুন্টার শাসন গণ-আন্দোলন ও বিপ্লবী গেরিলা-যুদ্ধের ফলে ভেঙ্গে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন জয়ী হয়। ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়াতে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সামরিক পরাজয় সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ও এটির সামরিক ক্ষমতার উপকথাকে চূর্ণ করে। এই সময়ে অপর উল্লেখযোগ্য নব-অভ্যুদিত সংগ্রামের ধারা হলো পরমাণু অস্ত্র ও যুদ্ধের বিরোধী এবং শান্তির জন্য ব্যাপক গণ-আন্দোলন। ১৯৭০ থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে 'গ্রীন পীস মুভমেন্ট' সাম্রাজ্যবাদকে প্রবলভাবে কোণঠাসা করতে থাকে। এই সময়ে সারা পৃথিবীর মোট ১৭০টি স্বাধীন দেশের মধ্যে ১৩০টি উন্নতিশীল দেশ (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, তেল রপ্তানিকারী আরবের ৫টি এবং শিল্পকেন্দ্র-রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি বাদে) সদস্যভুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক মঞ্চের শক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। ১৯৫৩ সাল থেকে তৃতীয় দুনিয়ার পক্ষ থেকে জোটবদ্ধ হবার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল (অভ্যন্তরীণ নানা জটিলতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও) যার অন্যতম মর্মবস্তু ছিল সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণ ও সামরিক তৎপরতার বিরোধিতা করা, তা' এই সময়ে যথেষ্ট প্রসারিত ও আন্তর্জাতিক প্রভাব সৃষ্টিকারী ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়। নিছক সংগঠন ও যৌথ বিবৃতি দানের স্তর থেকে এটি রূপান্তরিত হয় 'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন'-এ। ১৯৬৪ সালে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি নিয়ে গঠিত 'গ্রুপ-৭৭' বা 'জি-৭৭'-এর উদ্যোগে এবং সর্বপ্রথমে এদেরই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রসংঘের নতুন এক শাখা প্রতিষ্ঠান—'ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট' বা 'আংটাড' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক অর্ডার' (এন.আই.ই.ও.) বা 'নতুন

আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা'-র প্রস্তাব তুলে তৃতীয় দুনিয়ার জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন সক্রিয় চাপ সৃষ্টি করে। পরিস্থিতির চাপে ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রসংঘের আর একটি শাখা সংগঠন—ইউনাইটেড নেশনস ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন (ইউনিডো)। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ও শাখা প্রতিষ্ঠানগুলির স্তরে তৃতীয় দুনিয়ার দাবী বহুক্ষেত্রে প্রস্তাব আকারে মেনে নিতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বাধ্য হয়। প্রত্যেকটি স্তরেই, সাধারণভাবে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তৃতীয় দুনিয়ার দাবীর পেছনে সক্রিয় সমর্থন দিয়ে যায়।

মার্কস তাঁর 'গ্রুনডিসি'তে বলেছেন যে বৃহৎ শিল্পের উচ্চস্তরের উন্নয়ন ও যখন সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্র পুঁজির স্বার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে তখন "আবিষ্কার পরিণত হয় ব্যবসায় এবং প্রত্যক্ষ উৎপাদনে বিজ্ঞানের ব্যবহার পুঁজির ভবিষ্যৎ সাফল্য স্থির করে দেয় এবং পুঁজি তা দাবী করে।" ব্রেটন-উডস ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী উৎপাদনে তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের ব্যাপক ব্যবহার, বিশেষত মাইক্রোচিপস ও ইলেকট্রনিকসের, শিল্প-কাঠামো ও উৎপাদনের চরিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন আনছিল এই সময়ে।

দ্বিতীয়ত, নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণের দ্বারা তৃতীয় দুনিয়া থেকে বিপুল মুনাফা অর্জনের নতুন ব্যবস্থা পুঁজিবাদকে সংকট থেকে পরিত্রাণে বিশাল সুযোগ দিচ্ছিল, বিশাল বাড়তি মুনাফার দরজাও খুলে দিয়েছিল। তৃতীয় দুনিয়ার বিরুদ্ধে বাণিজ্য-শর্ত আরোপ করে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজেদের মুদ্রাস্ফীতি কমানো এবং তাদের (তৃতীয় দুনিয়াকে) ঋণ-জালে জর্জরিত করে মুনাফা ও সম্পদ নিজেদের ঘরে তুলছিল।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের দ্বারা গ্যারান্টিকৃত মুনাফার নতুন সুবিশাল ক্ষেত্র হিসাবে সামরিক-সম্ভার-শিল্পকে ব্যবহার এবং যখন অসামরিক অর্থনীতি নিম্নগামী তখন সামরিক-সম্ভার-শিল্পে ব্যাপক পুঁজি নিয়োগের ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ও ব্যবস্থা, একচেটিয়া পুঁজিবাদকে সংকট থেকে বেরিয়ে এসে বিশাল মুনাফা অর্জনে সহায়তা করছিল।

কিন্তু ১৯৭৪-'৭৫ সালে এই বিকাশ প্রক্রিয়ায় আঘাত আসে। ব্রেটন-উডস ব্যবস্থা তথা সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবল সংকেটের মুখে পড়ে। কেননা ব্যবস্থাগুলির মধ্য দিয়ে ব্রেটন-উডসের পূর্বোক্ত নব কলেবরের উৎপাদিকা শক্তিও আরও বিকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। পাশাপাশি জাপানের মুদ্রা ইয়েন ও জার্মানির মুদ্রা ডয়েস্‌মার্কের ক্রমোন্নত শক্তির সাথে সংঘাতে আমেরিকান ডলারের নিরঙ্কুশ আধিপত্য দ্রুত চিড় খেতে থাকে।

পরিস্থিতির চাপ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করে। বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের উপর মানুষের আস্থা কমে যাওয়ার লক্ষণ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির জনগণের বিভিন্ন অংশের নানাবিধ প্রত্যক্ষ আন্দোলনে প্রতিভাত হতে থাকে। তা' প্রতিফলিত হতে থাকে নির্বাচনে অনাসক্তি ও ভোটদানে জনগণের বিরত হওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতাতে। ব্রিটেনে ভোটদাতাদের হার দাঁড়ায় ঃ ১৯৫০ সালে ৮৪%, ১৯৫৯ সালে ৭৮.৭%, ১৯৭৩সালে ৭২%। ফ্রান্সে ভোটদানে বিরত থাকা নাগরিকদের হার দাঁড়ায় ঃ ১৯৫১ সালে ১৯.৮%, ১৯৫৮ সালে ২২.৯%, ১৯৭৩ সালে ১৮.৮%, ১৯৮১ সালে ২৮.৫%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের যত অংশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে যাননি তার হার ছিল ঃ ১৯৬০ সালে ৩৭%, ১৯৬৪ সালে ৩৮%, ১৯৬৮ সালে ৪০%, ১৯৭২ সালে ৪৪.৬%, ১৯৭৬ সালে ৪৫.৭% এবং ১৯৮০ সালে ৪৭.৫%।

পুঁজিবাদী দেশগুলির সরকারগুলির পরম্পরাগত গঠনেও পরিবর্তিত বাস্তবতা সৃষ্টি হয়। বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে যারা 'সেন্ট্রিস্ট' বা মধ্যপথ-অনুগত বলে পরিচিত, তারা এই সময়ে বেশ কিছু উন্নত দেশে গোঁড়াপন্থী তথা বুর্জোয়াদের দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে হঠিয়ে দিয়ে সরকারে আসীন হতে থাকে। ষাটের দশকের শেষার্ধ থেকে সত্তরের দশকের প্রায় দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ১৫টি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, হয় সরকার গঠন করেছিল নচেৎ অন্য বুর্জোয়া মধ্যপন্থীদের সাথে কোয়ালিশন সরকারে থেকেছে। ১৯৬৪-৭০ সাল ব্রিটেনে লেবার পার্টির সরকার ছিল। ১৯৬৬ সালে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা

পশ্চিম জার্মানিতে 'গ্র্যাণ্ড কোয়ালিশন'-এ ক্ষমতায় যায় এবং পরে প্রধান ক্ষমতাসীন দলে পরিণত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় ছিল ১৯৬০-৬৮ সাল পর্যন্ত। কানাডাতে লিবারাল পার্টি ১৯৬৩ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে সরকার গঠন করেছে। ইতালিতে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তাদের দক্ষিণপন্থী ভূমিকা থেকে সরে এসে কিছুটা লিবারাল ভূমিকা নিয়ে সরকার (অ্যামিনটোরি ফ্যানফেনি ও অ্যালডোমেরোর দু'টি সরকার) গঠন করে। জাপানের লিবারাল ডেমোক্র্যোটিক পার্টি, যারা গোঁড়াপন্থী বলে পরিচিত, তারাও কিসি, ইকেডা ও সোটোর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাগুলিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান পার্টিও ক্ষমতায় এসে অনুরূপ ভূমিকা নেয়। ব্রিটেনে টোরিরা হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, অ্যালেক ডগলাস হিউম ও এডওয়ার্ড হীথের সরকারগুলির সময় কালে অনুরূপ পথ নিতে বাধ্য হয়েছিল।

এই সমগ্র পরিস্থিতির চাপে সংকটাপন্ন ডলার, পাউণ্ড, ফ্রাঁ, লিরা, পিয়েস্ত্রা এমনকি ডয়েসমার্ক ও ইয়েনের বিনিময় হারে প্রবল ওঠা-নামা শুরু হয়। কার্যত ডলার ও পাউণ্ডের অবমূল্যায়ন ঘটে। ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডলার থেকে স্বর্ণ-মানের গ্যারান্টি প্রত্যাহার করার মধ্যে দিয়ে আড়াই দশকের আন্তর্জাতিক স্থায়ী মুদ্রা-মানের দ্বারা বিনিময় ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন। এর ফলে ব্রেটন-উডসের মৃত্যু ঘন্টা বেজে যায়। তারপর ১৯৭৪-'৭৫ সালে পেট্রোলিয়াম উৎপাদক ও রপ্তানিকারী দেশগুলির পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ তেলের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভয়ঙ্কর সংকট সৃষ্টি করে। এতে ব্রেটন-উডস ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংকটের প্রথম উদ্ভব

বিশ্ব-ধনতন্ত্র যখন ব্রেটন-উডস ব্যবস্থা পত্তনের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, তার এক দশকের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক শিবিরে তত্ত্বগত স্তরে দেখা দিতে শুরু করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ফাটলের লক্ষণ। কোরিয়ার যুদ্ধে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে, সামরিক স্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবল অগ্রগতির প্রথম স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু সমকালেই বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন হারায় তাদের অবিসম্বাদী বিশ্ব-নেতাকে—জোসেফ স্তালিনের মৃত্যু হয় ১৯৫৩ সালে। শেষোক্ত ঘটনার পর, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্তরে পরিবর্তনের পালা শুরু হয়ে যায়। প্রথমদিকে এইসব পরিবর্তন বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক শিবিরে খুব একটা রেখাপাত করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে থাকে।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক নিকিতা খ্রুশ্চভের রিপোর্টে কিছু কিছু নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত ও স্তালিন সম্পর্কে বিরূপ মূল্যায়ন, ১৯৫৭ সালে শাসক কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ঘোষণাপত্র এবং ১৯৬০ সালে বিশ্বের ৮১টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির 'মস্কো ঘোষণাপত্র'কে কেন্দ্র করে, সমাজতন্ত্রের দুই প্রধান শক্তি—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তীব্র ও ব্যাপক মতাদর্শগত বিরোধে অবতীর্ণ হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬০ সালে লেনিনের জন্মের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'লং লিভ লেনিনিজম' শিরোনামে (আস্‌লে হঙ্গকি পত্রিকায় 'লং লিভ লেনিনিজম', রেনমিন রিবাও পত্রিকায় 'ফরওয়ার্ড আলং দা পাথ অব দা গ্রেট লেনিন' এবং লু চিঙ ই-র 'ইউনাইট আণ্ডার লেনিনস রেভিলিউশনারি ব্যানার' শিরোনামে তিনটি নিবন্ধের সংকলন) প্রকাশিত পুস্তিকাতে প্রকাশ্যে সোভিয়েত পার্টির গৃহীত লাইনকে চ্যালেঞ্জ করে। এরপর বিতর্ক বাড়তে থাকে। ১৫ই ডিসেম্বর '৬২ চীনের পিপলস ডেইলিতে 'ওয়ার্কার্স অব অল কান্ট্রিজ ইউনাইট ঃ এক্সপোজ আওয়ার কমন এনিমি' শীর্ষক বক্তব্যের জবাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাভদাতে 'স্ট্রেংদেন ইউনিটি অব দি কমিউনিস্ট মুভমেন্ট ফর দি ট্রায়ামফ অব পীস এন্ড সোস্যালিজম', ২৭শে জানুয়ারী '৬৩-তে পিপলস ডেইলির 'লেট আস ইউনাইট অন দা বেসিস অব মস্কো ডিক্লারেশন অ্যান্ড মস্কো স্টেটমেন্ট'-এর জবাবে ১৩ই ফেব্রুয়ারী '৬৩-তে প্রাভদায় প্রকাশিত 'ফর মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট ইউনিটি অব দা কমিউনিস্ট মুভমেন্ট, ফর কোহেশন

অব দা সোস্যালিস্ট কান্ট্রিজ' প্রভৃতি আলোচনায় বিতর্ক ঘনীভূত হয়। ক্রমশ আরও কিছু দেশের কমিউনিস্ট পার্টি যেমন ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালি ইত্যাদি এই বিতর্কে যুক্ত হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঐক্য প্রসঙ্গে পিকিং-এর ১৪ই জুন '৬৩-এর পত্রের জবাবে মস্কোর ১৮ই জুন '৬৩-এর বিবৃতি বিতর্ককে নতুন স্তরে নিয়ে যায়। চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রথমে সংশোধনবাদী এবং পরিশেষে 'সোস্যাল ইমপিরিয়ালিস্ট' বলে ঘোষণা করে এবং দাবী করে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। এই প্রসঙ্গে তারা 'অন যুগোশ্লাভ রিভিশনিজম', 'অন তোগলিয়ত্তি', 'মোর অন তোগলিয়ত্তি', 'অ্যাপোলজিস্ট অব নিও-কলোনিয়ালিজম', 'এন. খ্রুশ্চভস ফোনি কমিউনিজম অ্যান্ড ইটস হিস্টোরিকাল লেসন ফর দা ওয়ার্লড', 'স্তালিন ঃ অ্যান ইভ্যালুয়েশন অন দা ডিক্টেটরশিপ অব দা প্রলেতারিয়েত', 'অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডিফারেন্সেস ইন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট মুভমেন্ট' ইত্যাদি প্রচার পুস্তিকায় ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যায়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নও আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক পাল্টা প্রচার এবং চীনকে 'লেফট সেকটেরিয়ান' বলে প্রথমে অভিযুক্ত করে ক্রমে সাম্রাজ্যবাদের দোসর হিসাবে ঘোষণা করে। সংকটকে নিজেদের ঘরে ডেকে আনার এই ছিল সূত্রপাত।

আদর্শগত সংঘাত ক্রমশ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে এই বিরোধ অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জন্ম দেয়। এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের বাইরে, বিশেষত, তৃতীয় দুনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বিভক্ত হতে শুরু করে সোভিয়েতপন্থী ও চীনপন্থীতে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই বিভক্তি অচিরে শ্রমিক আন্দোলন এবং দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সামনে কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করে।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির, বিশেষত ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর এই বিরোধের প্রভাব প্রথমে তেমন পড়েনি। তবে ১৯৫৬ সালের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি, ১৯৭২ সালে বিশ্বের দুই সর্বোচ্চ শক্তিধর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার মধ্যে পরমাণু বোমাবাহী দূরপাল্লার রকেট সীমিতকরণ সল্ট-১ চুক্তি, ১৯৭৫ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত 'কনফারেন্স অন সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ' বৈঠকে ইউরোপীয় দেশগুলি ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পরস্পর পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা দান, শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা বিরোধ-মীমাংসা প্রভৃতি বিষয়ে চুক্তি এবং '৬০-এর দশক থেকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রভাব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন ধারার জন্ম দেয়—ইতিহাসে যা 'ইউরো-কমিউনিজম' আখ্যায় পরিচিত হয়েছে।

ইউরো-কমিউনিজমের পত্তন

প্রসঙ্গটির মর্ম আলোচনা করার পূর্বে কিছু ঘটনাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। ইউরো-কমিউনিজম শব্দটি সম্ভবত সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এফ-বারবিয়েরী ১৯৬৭ সালে। এই সময় থেকে ইউরোপের একাংশ কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিবাদের তথাকথিত সংকটজনিত কোণঠাসা অবস্থার সুযোগ নিয়ে উদারনীতিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে সমন্বয় এবং সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সাথে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে সরকার দখল বা গঠন করার কথা বিবেচনা করছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির তথাকথিত কর্তৃত্ববাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তোলা ও নিজেদের স্বাধীনভাবে চলার ঘোষণা করতে ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৫ সালে ফরাসী ও ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি যৌথভাবে প্রকাশ করে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। পূর্বোক্ত বিষয় ছাড়াও তারা অস্বীকার করে সর্বহারার একনায়কত্ব। তারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে সঠিক বলে ঘোষণা করে। পার্লামেন্টারি পথে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ অর্জন করার ঘোষণা এবং নাগরিক স্বাধীনতা ও বিরোধীদলের প্রয়োজনীয়তাকে তারা স্বীকার করে। এইরকম পটভূমিকায় ২৯-৩০ শে জুন, ১৯৭৬ ইউরোপের ২৯টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি বার্লিনে মিলিত হয় এবং আলোচনার শেষে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এতে অংশ নেয় কমিউনিস্ট পার্টি অব বেলজিয়াম, বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অব

ডেনমার্ক, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি (পঃ জার্মানি), সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানি (পূঃ জার্মানি), কমিউনিস্ট পার্টি অব ফিনল্যান্ড, ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রীস, কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রেট ব্রিটেন, কমিউনিস্ট পার্টি অব আয়ারল্যান্ড, ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি, লীগ অব কমিউনিস্ট অব যুগোশ্লাভিয়া, কমিউনিস্ট পার্টি অব লুক্সেমবার্গ, কমিউনিস্ট পার্টি অব নেদারল্যান্ডস, কমিউনিস্ট পার্টি অব নরওয়ে, কমিউনিস্ট পার্টি অব অষ্ট্রিয়া, পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি, পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি, রোমানিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি, সান মারিনো কমিউনিস্ট পার্টি, লেফট পার্টি—কমিউনিস্টস অব সুইডেন, সুইস পার্টি অব লেবার, কমিউনিস্ট পার্টি অব দ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট পার্টি অব স্পেন, কমিউনিস্ট পার্টি অব চেকোশ্লোভাকিয়া, কমিউনিস্ট পার্টি অব টার্কি, হাঙ্গেরিয়ান সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি, সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব ওয়েস্ট বার্লিন এবং প্রোগ্রেসিভ পার্টি অব ওয়ার্কিং পিপল অব সাইপ্রাস।

মূল দলিলে স্পষ্টভাবে মার্কসবাদের সংশোধন সম্পর্কে বক্তব্য না বলা হলেও হেলসিংকি চুক্তিকে বাড়িয়ে দেখা এবং শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিপ্লবে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক প্রভৃতি প্রস্তাবিত হলো। কোন কোন কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বহু প্রসঙ্গই বর্তমানে অচল —এমন বক্তব্য নিজেদের ভাষণে রাখলেন, যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্য দু'একটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর উপর প্রভাব

যুগোশ্লাভিয়া ছাড়াও ষাটের দশকের শেষার্ধ থেকে পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও আলবেনিয়া প্রধানত অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কিছু কিছু বিষয় স্ব স্ব দেশে চালু করার চেষ্টা শুরু করেছিল। প্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মডেলের পরোক্ষ বিরোধিতা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মত এক ধরনের গণতন্ত্রের ধারণার প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থনের প্রতীকী উন্মোচন ঘটে পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রুডলফ ভারো কর্তৃক রচিত একটি দলিলে। সেটি গোপনে পাচার করে পশ্চিমী সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। দলিলটির প্রতি বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীরা ছাড়াও, বিভিন্ন দেশের, এমনকি পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক কোন কোন দেশের, কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা প্রকাশ্য সমর্থন জানান।

ইতিমধ্যে ১৯৭৬ সালে জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সংবিধান ও কর্মসূচী থেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভৃতি শব্দ প্রত্যাহার করে নেয়। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আত্মগোপন করে বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনার অন্যতম প্রবাদপ্রতিম পুরুষ, সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সান্তিয়াগো ক্যারিয়ো ১৯৭৮ সালে প্রকাশ করলেন ইউরো-কমিউনিজমের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের অবয়ব—'ইউরো কমিউনিজম অ্যান্ড দ্য স্টেট'। এই আলোচনাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল প্রত্যয়গুলিকে পরিত্যাগ করা হলো; শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে মান্য করা হলো; বলা হলো, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা নেই; কর্মসূচী নেওয়া হলো যে বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা জনগণের অধিকাংশকে পক্ষে এনে গণতান্ত্রিক পথে সরকারে অধিষ্ঠিত হয়ে সমাজের পরিবর্তন সাধন করতে হবে। শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিভিত্তিক শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী নিয়ে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির গঠন প্রভৃতি খারিজ করে লিবারাল বা উদারনীতিক মত ও পথের কথা বলা হলো এই পুস্তকে। সরাসরি না বলেও সমাজতন্ত্রের পরিকল্পিত অর্থনীতির পরিবর্তে মার্কেট ফোর্স বা বাজার-শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধির কথা স্বীকৃত হলো ক্যারিয়োর তত্ত্বে। এই তত্ত্বে শ্রমিকশ্রেণীর চেয়েও অধিক গুরুত্ব দিয়ে নব-উদ্ভূত 'নিউ মিডল স্ট্রাটা' বা নতুন মধ্যবর্তী স্তরের প্রতি আবেদন জানানো হলো ও তাঁদের প্রাধান্য দেওয়া হলো। সুপ্তভাবে হলেও 'ডি-বলশেভিজেশন' বা নি-বলশেভিকবাদ, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ও গঠনাত্মক পথে সমাজতন্ত্রে

পৌঁছানো, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সোভিয়েত মডেলের বিরোধিতা করা, নি-স্তালিনীকরণ, পার্টির অভ্যন্তরে মুক্ত গণতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্যকে অস্বীকার করা ইত্যাদি ছিল 'ইউরো-কমিউনিজম'-এর অপর প্রধান দিক।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম বাস্তবক্ষেত্রে ইউরো-কমিউনিজমের তত্ত্ব প্রয়োগ শুরু করে ১৯৭৩ সালে, তাদের তথাকথিত 'হিস্টোরিক কমপ্রোমাইজ' বা ঐতিহাসিক সমঝোতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে। সেখানকার বুর্জোয়াদের প্রধান রাজনৈতিক দল—ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে যৌথভাবে গণতান্ত্রিক সংস্কারের কাজে তারা নামে। এই সময়কালে সংকটাপন্ন বুর্জোয়া অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে বাঁচাতে তারা এই ধরনের সহায়তা দিয়েছিল। একইভাবে ফ্রাঙ্কোর রাজত্বের অবসানের পর বুর্জোয়া দলগুলির দ্বারা পরিচালিত তথাকথিত নতুন ও অগ্রসর স্পেনীয় গণতন্ত্র গঠনে অনুগত দলের ভূমিকা নিয়েছিল স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭৬ সালে তাদের দ্বাবিংশ কংগ্রেস থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে সোস্যালিস্ট দলের সাথে গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য ঐকমত্য কর্মসূচীর ভিত্তিতে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা চালিয়েছিল—যখন সোস্যালিস্টদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল বিপন্ন। যদিও ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে ইউরো-কমিউনিজমের সমস্ত অন্তঃশক্তি শূন্য হয়ে যায়। বুর্জোয়াদের সংকটের কালে ইউরো-কমিউনিজম নিঃশেষ হয়ে যায় পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদী চোরাবালিতে নিক্ষেপ করে। এরপর অবশ্য ফ্রান্সসহ সামান্য কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টির অনেকটা পূর্বাবস্থানে ফেরার পালা শুরু হয়।

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ ব্যবস্থা পতনের পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির দ্বারা সম্মিলিতভাবে তৃতীয় এক বিশ্ব-রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটতে থাকে। পরবর্তীকালে এই মিলিত শক্তি 'জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন' (নন-এলাইনড মুভমেন্ট) নামে পরিচিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে উত্থিত এই জোট-শক্তি কার্যকালে, নতুন পরিস্থিতিতে, ছিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক ধরনের সম্প্রসার। কেননা এই সময় এমন এক বিশ্ব-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যখন সাম্রাজ্যবাদ পুরানো উপনিবেশবাদী প্রথায় শোষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবল শক্তিশালী সমর-ক্ষমতার উদ্ভব ও সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির পাশে দাঁড়ানোর ফলে, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সামরিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দেশগুলির উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছিল না। এই সুযোগে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন ছিল উদীয়মান অনুন্নত দেশগুলির এক ধরনের সুনির্দিষ্ট আত্মপ্রকাশ, ছিল সেগুলির জাতীয়, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা শক্তিশালী করার জন্য প্রচেষ্টার অন্যতম হাতিয়ার। একই সাথে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের নানাবিধ মঞ্চে ও প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের এবং বিশ্ব-সমস্যা সমাধানে সক্রিয় অংশীদার হওয়ার ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিল এই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন।

চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বীজাকারে এই আন্দোলনের লক্ষণ দেখা গেলেও, পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক জোট গঠনের তৎপরতার ফলে এই আন্দোলন গড়ে তোলার এক পরোক্ষ বাধ্যতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, অঞ্চল-ভিত্তিতে তাদের মিত্র দেশগুলি নিয়ে একে একে গড়ে ওঠে 'ন্যাটো' (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অরগানাইজেশন), 'সিয়াটো' (সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অরগানাইজেশন বা ম্যানিলা প্যাক্ট), 'সেন্টো' (সেন্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশন), এসপ্যাক (এশিয়ান অ্যাণ্ড প্যাসিফিক কাউন্সিল), আনজুস ইত্যাদি। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির অধিকাংশই এইসব সামরিক জোটের তাৎপর্য ও বিপদ উপলব্ধি করে এবং সাম্রাজ্যবাদের সাথে অনুরূপ মৈত্রী চুক্তিতে যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়।

১৯৪৫ সালে তদানীন্তন ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনামের (উত্তর ভিয়েতনাম) রাষ্ট্রপতি হো চি মিন ইন্দোনেশিয়ার সরকারের কাছে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছিলেন। জানুয়ারী ১৯৪৭-এ তদানীন্তন

বার্মার (বর্তমানে মায়নামার) নেতা আউঙ সন্ আবেদন জানান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশীয় জোট গড়ে তোলার জন্য। মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৭-এ জওহরলাল নেহরুর আহ্বানে দিল্লীতে ২৭টি এশীয় দেশের প্রথম 'এশিয়া রিলেশনস কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। ২৯শে এপ্রিল ১৯৫৪-তে পিকিং-এ (বর্তমানে বেজিং) ভারত ও চীনের মধ্যে 'পঞ্চশীল' নীতির ভিত্তিতে (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচ নীতি) তিব্বতে বাণিজ্য চুক্তি ঘটে। এগুলি ছিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে ওঠার, পরোক্ষে, প্রস্তুতিমূলক অধ্যায় ও ঘটনাবলী।

পরিস্থিতির চাপে এই প্রবণতা এশিয়া অতিক্রম করে, ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যত্রও প্রসারিত হতে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার খ্যাতনামা নেতৃত্ব এক বিশ্ব-মঞ্চ গঠনের অন্য উৎসাহী হয়ে ওঠেন। হো চি মিন, চৌ এন লাই, জোসিফ টিটো, জওহরলাল নেহরু, আবদাল গামাল নাসের, আহমেদ সুকর্নো, কাওয়াসি নক্রুমা, সলোমন বন্দরনায়েকে, অসোয়াল্ডো ডো ডরটিকস, মেকারিওয়স, উ নু, মোডিবো কেইটা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রথমদিকে এবিষয়ে উদ্যোগ নেন।

এপ্রিল ১৯৫৫-তে পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির নেতাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বান্দুং সম্মেলন। ঠাণ্ডা যুদ্ধের কালপর্বে, তদানীন্তন সময়ে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা এবং দেশগুলির রাষ্ট্রীয় স্তরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার স্তর অনুযায়ী এই সম্মেলনে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

জুন ১৯৬১-তে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের ২০টি দেশ ও দর্শক হিসাবে লাতিন আমেরিকার ব্রাজিলের উপস্থিতিতে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সভা। এই সভা থেকে এই আন্দোলনের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বৃহৎ শক্তির সাথে সামরিক জোট বা অন্যভাবে যুক্ত থাকাকে নিষিদ্ধ করা হয়। প্রথম বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১-৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬১, বেলগ্রেডে ২৫টি সদস্য দেশ ও ৩টি দর্শক দেশের উপস্থিতিতে। সম্মেলন থেকে গৃহীত হয় 'ডিক্লারেশন অব দা হেডস অব স্টেট অর গভর্ণমেন্ট অব নন-এলাইনড কান্ট্রিজ অন দা ডেনজার অব ওয়ার অ্যাণ্ড অ্যাপিল ফর পীস।" সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে তাপ-পরমাণবিক যুদ্ধের হুমকি ও বিশ্ব-মানবতার বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সপক্ষে ও তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির স্বাধীন বিকাশের দাবীতে এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

এই আন্দোলনের সম্মেলনগুলির তথ্য ছিল নিম্নরূপ :

সম্মেলন	সদস্য দেশের সংখ্যা	দর্শক দেশের সংখ্যা	অতিথি দেশের সংখ্যা
প্রথম সম্মেলন, বেলগ্রেড (১-৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)	২৫	৩	—
দ্বিতীয় সম্মেলন, কায়রো (৫-১০ অক্টোবর, ১৯৬৪)	৪৬	১০	—
তৃতীয় সম্মেলন, লুসাকা (৮-১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০)	৫৪	৯	৮
চতুর্থ সম্মেলন, আলজিয়ার্স (৫-৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩)	৭৫	৮	১২
পঞ্চম সম্মেলন, কলম্বো (১৬-১৯ আগস্ট, ১৯৭৬)	৮৫	৮	৮
ষষ্ঠ সম্মেলন, হাভানা (৩-৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯)	৯২	১২	৮

সপ্তম সম্মেলন, দিল্লী (৭-১১ মার্চ, ১৯৮৩)	১০২	১০	১০
অষ্টম সম্মেলন, হারারে (১-৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬)	৯৯	৬	১৩

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিকাশ সহজসাধ্য ও সাবলীলভাবে ঘটেনি। এই আন্দোলন যতই বৃদ্ধি পেয়েছে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে সেটির সমস্যা। এই আন্দোলনে যেসব রাষ্ট্র যুক্ত হয় সেগুলির সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন, এমনকি পরস্পর বিরোধিতা-মূলক। এতে ছিল সমাজতান্ত্রিক কিছু দেশ, রাজতন্ত্র সম্পন্ন দেশ, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের দেশ এবং পুরোপুরি পুঁজিবাদী পথ গ্রহণকারী দেশ। সুতরাং ভিন্নতা সম্পন্ন সমাজব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যে প্রায়শই দ্বন্দ্ব দেখা দিতো; মাঝে মাঝে সৃষ্টি হতো বিপরীত মেরু-কেন্দ্রিকতা; আন্দোলন থেকে বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতাও সৃষ্টি হতো। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনকে ভেতর থেকে দুর্বল করার জন্য বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রকে প্রলোভিত করা, সাম্রাজ্যবাদের সাথে কিছুটা ঘনিষ্ঠ সদস্য দেশকে দিয়ে আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিরোধ-বিতর্ক সৃষ্টি, সদস্যভুক্ত কোন কোন দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্ররোচনা দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল দিয়ে আন্দোলনের বিরোধিতা করানো ও চাপ-সৃষ্টি ইত্যাদি নানা অপচেষ্টা চলেছে। আন্দোলনের কোন কোন নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সমঝোতামূলক বা নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলেও পরবর্তীকালে সমস্যা তীব্রতর হয়েছিল। কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যে জোট-নিরপেক্ষ শক্তি এক ঐতিহাসিক ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিন দশকব্যাপী।

১৯৬১ সালে প্রথম সম্মেলনে মাত্র ২৫টি দেশের সদস্য সংখ্যা থেকে ১৯৮৩ সালে সপ্তম সম্মেলনে সদস্য দেশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০২টিতে। সদস্য দেশগুলির মোট জনসংখ্যা ছিল (১৯৭৯ সালে হাভানা সম্মেলনের সময়) ১,৬৯৬ মিলিয়ন—তার মধ্যে আফ্রিকাতে ৪১৮,২৯৫,০০০, এশিয়াতে ১,১৮৯,৩৯১,০০০, লাতিন আমেরিকাতে ৬৭,৫১৬,০০০ এবং ইউরোপে ২২,৯১৮,০০০। সুতরাং বিশ্ব-প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে এই জনসংখ্যা ছিল আন্দোলনের শক্তির অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

সমগ্র ইতিহাসে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন যে মূল দৃষ্টিভঙ্গিগুলি গ্রহণ করে, সাধারণভাবে, তা' ছিল নিম্নোক্ত চরিত্রের :

—সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ এবং সমস্ত ধরনের বর্ণ-বিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা;

—বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা-সম্পন্ন দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার সমাপ্তি এবং বিশ্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা;

—সমতা ও গণতান্ত্রিক পথে আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস এবং আন্তর্জাতিক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক অর্ডার বা এন. আই. ই. ও.) জন্য লড়াই করা;

—তথ্য সাম্রাজ্যবাদের (ইনফরমেশন ইমপিরিয়ালিজম) বিরুদ্ধে এবং নতুন বিশ্ব-তথ্য ব্যবস্থার (নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন অর্ডার বা এন. আই. আই. ও.) জন্য সংগ্রাম চালানো;

—জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ও অন্যান্যভাবে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ভিত্তিতে আন্দোলনকে সংহত করার জন্য আন্দোলন করা প্রভৃতি।

এই আন্দোলনের কালপর্বে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক, মরিয়া ও সর্বাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছিল। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকট, ১৯৬২ সালে ক্যারিবিয়ান সংকট, ইজরায়েলকে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ও উত্তর আফ্রিকাতে দুই দফা আক্রমণ চালানো, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ এবং সামরিক জুন্টার সরকার প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীব্যাপী সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, প্রতিবেশী

দেশের বিরুদ্ধে সামরিক প্ররোচনা সৃষ্টি করে অব্যাহত আঞ্চলিক উত্তেজনা জিইয়ে রাখার মধ্য দিয়ে সমরাস্ত্র সরবরাহ, ইন্দোচীনে (ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়া) সামরিক আগ্রাসন ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, রাষ্ট্রসংঘের কর্তৃত্ব করায়ত্ত করার জন্য নানা কূটনৈতিক তৎপরতা, চাপ ও ব্লাকমেইল ইত্যাদি ছিল সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের তৎপরতার কিছু উল্লেখযোগ্য দিক। সামরিক উত্তেজনা তীব্রতর করে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে অনুৎপাদক সামরিক ব্যয়ে বাধ্য করছিল সাম্রাজ্যবাদ। ফলে ১৯৭০ সালে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সামরিক ব্যয় যেখানে ছিল ২৭.৮ বিলিয়ন ডলার, ১৯৮২ সালে তা' দাঁড়ায় ১২৫ বিলিয়ন ডলারে। এসময়ে বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের ১৬ শতাংশ ছিল অনুন্নত দেশগুলির। এইভাবে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির আর্থনীতিক পুনর্গঠনের প্রয়াসকে বানচাল করার চেষ্টা চালাচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ ও সেটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলিকে তথাকথিত সাহায্য দান, দেশগুলিকে ঋণজালে জড়িয়ে ফেলার এক শক্ত-পোক্ত পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়। ১৯৭৪ সালে তৃতীয় দুনিয়ার ঋণ ছিল যেখানে ৩৩ বিলিয়ন ডলার, ১৯৮৬ সালে তা' গিয়ে দাঁড়ায় ১০০০ বিলিয়ন ডলারে। অন্যদিকে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে, ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী, ৯৮টি অনুন্নত দেশের মধ্যে যেখানে মাত্র তিনটি দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতি ছিল, ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে ২৭টি দেশ রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতির দেশে পরিণত হয়। আরও ৫৭টি দেশের রপ্তানি বাণিজ্য আমদানির চেয়ে অনেক কমে যাওয়ার ফলে ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে প্রয়োজনীয় বিদেশী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করার ক্ষমতা দারুণ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ১৯৮১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ৬৯টির মধ্যে ৬৩টি দেশের বকেয়া বিদেশী ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা প্রায় শূন্যে পৌঁছেছে।

প্রায় দু'শ বছরের পুঁজিবাদী শোষণের, অন্যতম পদ্ধতি ছিল—বর্ণ-বিদ্বেষ। এই শতাব্দীতে পৌঁছে তা' সুনির্দিষ্টভাবে মতবাদ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে বর্ণ-বিদ্বেষবাদ প্রকট আকারে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেত-শাসনে ২৮ মিলিয়ন কৃষ্ণাঙ্গ প্রবল বৈষম্য ও অত্যাচারের জর্জরিত ছিল। প্রশাসনিক এলাকা বিভাজন করে বান্টুস্থান গঠন করে যেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের বাধ্যতামূলকভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি তখন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষী সরকার বর্ণ-বিদ্বেষকে সংরক্ষণের জন্য পার্শ্ববর্তী দেশগুলি—অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও অন্যান্য দেশগুলির বিরুদ্ধে নিয়মিত সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছিল বর্ণ-বিদ্বেষ বিরোধী লোসেথো, সেচেলেস ইত্যাদি দেশে সংঘটিত করছিল সন্ত্রাসবাদ।

ষাটের দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রো-আমেরিকানরা রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে তাদের প্রতি প্রবল বৈষম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহের স্তরে প্রতিবাদ ও আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকে। সত্তরের দশকের শেষার্ধে আমেরিকাতে লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশাগত জনগণ, বিশেষত শ্রমজীবীর সংখ্যা ছিল ৫০ মিলিয়ন। এদের প্রতিও পূর্বোক্ত ধরনের বৈষম্য ছিল প্রবল। ইজরায়েলের জিওনবাদীরা প্যালেস্টাইন এলাকায় অনুরূপভাবে আর এক ধরনের বর্ণ-বৈষম্যবাদ চালু রেখেছিল। সমকালে পশ্চিম জার্মানিতে কৃষ্ণ ও পীত বিদেশাগত জনসংখ্যা ছিল ৪.৫ মিলিয়ন, ফ্রান্সে ৪.২ মিলিয়ন, ইংলণ্ডে ২ মিলিয়ন এবং সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ মিলিয়ন। সর্বত্রই এই বৈষম্য ও আক্রমণ বেড়েছিল। কেবল দেশজ ক্ষেত্রেই নয়, বর্ণ-বৈষম্যের প্রসঙ্গে বর্ণ-বিদ্বেষবাদী সরকারগুলি পরস্পরকে পরোক্ষে সর্বাত্মক সহায়তা করতো। বর্ণ-বিদ্বেষ-বিরোধী আন্তর্জাতিক মঞ্চে, কখনো প্রকাশ্যে কখনো নেপথ্যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অভিযুক্ত সরকারগুলির পক্ষ নিয়েছে।

'ইনফরমেশন ইমপিরিয়ালিজম' বা তথ্য-সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ফিনল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট উরহো কেক্কোনেন, ১৯৭৩ সালে। ষাটের দশক থেকে শোষণের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ পুস্তক প্রকাশনা, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমাকে ব্যবহার করতে থাকে। তথ্য-ব্যবস্থাতে ছিল অনুন্নত দেশগুলি সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ। বিশ্ব-জনসংখ্যার প্রায় দুই-

তৃতীয়াংশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের প্রচারিত সংবাদপত্রের মোট প্রচার সংখ্যার ২০ শতাংশের কম ছিল অনুন্নত দেশগুলিতে। আফ্রিকার ৯টি দেশের কোন দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না; ১০টি এশীয় দেশে প্রতি ১০০০ জনে ১০০ কপি, আরও ১০টি দেশে প্রতি ১০০০ জনে ২০ কপি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। 'ইউনেস্কো'র হিসাব অনুসারে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ছিল বিশ্বের মোট রেডিও স্টেশনের এক-চতুর্থাংশ ও টি. ভি. স্টেশনের মাত্র ৭ শতাংশ; বিশ্বে প্রকাশিত মোট পুস্তক সংখ্যার ২০ শতাংশ ও মোট চলচ্চিত্রের ১৮ শতাংশ উৎপাদন করতো এরা। উন্নত দেশগুলিতে যেখানে প্রতি ১০০০ জনে ৮০০টি রেডিও ছিল, অনুন্নত দেশগুলিতে ছিল ১০০টি। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলি এইসব তথ্য-প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে অনুন্নত দেশগুলিতে ব্যবসা চালাতো, অন্যদিকে চালাতো মনস্তাত্ত্বিক জগতে আক্রমণ। আমেরিকার টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশে বছরে ২,০০,০০০ ঘন্টা, ব্রিটেন ৩০,০০০ ঘন্টা, ফ্রান্স ২০,০০০ ঘন্টা নানা কর্মসূচী প্রচার ও বিক্রি করতো।

জোট-নিরপেক্ষ তৃতীয় দুনিয়ার আন্দোলন স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজস্ব মঞ্চ ছাড়াও আন্তর্জাতিক মঞ্চে, এই ইনফরমেশন ইমপিরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে এই আন্দোলন শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ একক গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তথ্যের বিষয়ে নিজ অনুকূলে প্রস্তাব পাশ করাতে সক্ষম হয়। ১৯৬৫ সালে তাদের প্রস্তাবিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭০ সালে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে সত্তরের দশকে মাঝামাঝি থেকে পরমাণু অস্ত্র সীমিতকরণ, পরমাণু শক্তিধর দেশগুলির পক্ষ থেকে প্রথম পরমাণু অস্ত্র নিক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি, সমস্ত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বিনষ্ট করা, ভারত মহাসাগর সহ বিভিন্ন এলাকাকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত শান্তির এলাকা ঘোষণা ইত্যাদি দাবী নিয়ে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রবল তৎপরতা চালিয়েছিল রাষ্ট্রসংঘসহ বিভিন্ন মঞ্চে। এসব প্রসঙ্গে তারা পেয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সক্রিয় সমর্থনও। বর্ণ-বিদ্বেষবাদ ও জিওনবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের সংগ্রাম ছিল সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত। রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব গ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমস্ত দিক থেকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত বহুলাংশে কার্যকরী হয়। কিন্তু জিওনবাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নগ্ন সহায়তায়, সেটি বানচাল হয়ে যায়।

জাতীয় মুক্তি-যুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন কিছুটা ভূমিকা পালন করতে পারলেও এই ভূমিকা ঐক্যবদ্ধ ও ধারাবাহিক চরিত্রের ছিল না। যেমন বলা যায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়ার সংগ্রামে ব্যাপক বিশ্ব-জনমত, এমনকি আমেরিকা ও ইউরোপের বিপুল জনগণের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও, জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সমস্ত দেশ একবাক্যে সমর্থন দিতে পারেনি। তৃতীয় দুনিয়ার অন্তর্গত দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধেও (যেমন ইরান ও ইরাকের মধ্যে), অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সক্রিয় হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয়নি জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন।

নতুন বিশ্ব-তথ্য ব্যবস্থার জন্য জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের তৎপরতার অনেকটাই ব্যাপক ও কার্যকরী রূপ পেয়েছিল। জানুয়ারী ১৯৭৫-এ, ২৬টি দেশের সংবাদ-সংস্থার দ্বারা ৩,৫০০টি বিষয় স্থির করে 'নিউজ এজেন্সি পুল অব নন্-এলাইনড কান্ট্রিজ' গঠিত হয়। জুলাই ১৯৭৬-এ দিল্লীতে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট 'পুল কো-অর্ডিনেটিং কমিটি' গঠিত হয়। ১৯৭৭-এ, কায়রোতে 'পুল কমিটি'র সভাতে যোগ দেয় প্রেনসা ল্যাটিনা (কিউবা), সমাচার (ভারত), ঘানা নিউজ এজেন্সি, তানযুগ (যুগোস্লাভিয়া), এ. আই. এম (মোজাম্বিক), এম. এ. পি (মরক্কো), আই. এন. এ (ইরাক), এ. পি. এস (আলজিরিয়া), টি. এ. পি. (টিউনিসিয়া), আওরা (ইন্দোনেশিয়া), এ. জেড. এ. পি. (জায়রে), ই. সি. আই-আনদিনা (পেরু), মেনা (মিশর) এবং ইথিওপিয়া ও সেনেগালের নিউজ এজেন্সি। অক্টোবর ১৯৭৭-এ, যুগোস্লাভিয়ার সারাজেভো শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জর্ডন, ইরাক, ভারত, আফগানিস্তান, উত্তর কোরিয়া, মালয়েশিয়া, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, গিনি, টোগো, জায়রে, নাইজিরিয়া, তানজানিয়া,

কেনিয়া, জাম্বিয়া, কিউবা, পেরু, পানামা ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় 'অরগানাইজেশন অব রেডিও অ্যাণ্ড টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং অব নন্-এলাইনড কান্ট্রিজ'। পাশাপাশি আঞ্চলিক ভিত্তিতেও, তথ্য সমন্বয়ের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল—ক্যারিবিয়ান নিউজ এজেন্সি (সি. এ. এন. এ.), অরগানাইজেশন অব এশিয়া প্যাসিফিক নিউজ এজেন্সি (ও. এ. এন. এ.), প্যান-আফ্রিকান নিউজ এজেন্সি (পি.এ.এন.এ.) লাতিন আমেরিকান স্পেশাল ইনফরমেশন সার্ভিস (এ. এল. এ. এস. ই. আই.); ওপেক-ভুক্ত দেশগুলি গঠন করে ও. পি. ই. সি. এন. এ. প্রভৃতি। উন্নত দেশগুলির প্রবল শক্তিধর ও প্রতিষ্ঠিত সংবাদ ও তথ্য সংস্থার পাশাপাশি, এইভাবে তৃতীয় দুনিয়ার পক্ষ থেকে এক প্রয়াস শুরু হয়েছিল।

তৃতীয় দুনিয়ার পক্ষ থেকে নয়া বিশ্ব-অর্থনীতির প্রস্তাব

এই পরিস্থিতিতে আরও একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানের উদ্ভব ঘটে। তা' হলো, তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়াদের নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্ব। এরা 'গ্রুপ-৭৭'-এর পক্ষে দু'টি দলিল বিশ্ব- দরবারে পেশ করে। প্রথমটি নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক অর্ডার প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র এবং দ্বিতীয়টি নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক অর্ডার (এন. আই. ই. ও.) প্রতিষ্ঠার জন্য প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন। এই এন.আই.ই.ও.-র প্রধান বক্তব্যগুলি ছিল :

—সমস্ত দেশের স্বার্থে বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের বিষয়ে প্রতিটি রাষ্ট্রের ভূমিকা পালনের অধিকার;

—নিজেদের দেশের উন্নয়নে কোন পথ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হবে সে বিষয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিরূপণে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বীয় অধিকার;

—নিজের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর রাষ্ট্রের অবিচ্ছিন্ন সার্বভৌমত্ব এবং যেসব দেশ, এলাকা ও অঞ্চল অন্য দেশের অধীন থাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ বা ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটেছিল, তার জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার;

—নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক সাধন;

—দেশগুলি একে অপরকে সর্বাপেক্ষা সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের সুযোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা; বাণিজ্য বা অন্য কোন ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শর্ত আরোপ করার বৈষম্য বিলোপ;

—পণ্যের দামের ওঠা-নামা কমানো এবং নির্মিত সামগ্রী ও পণ্যের মধ্যে দামের পার্থক্য সীমাবদ্ধ করা;

—শিল্পায়নের বিকাশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিল্পসামগ্রী রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক পরিবেশ গঠনে উৎসাহ দান;

—উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে কারিগরী অসাম্যের অবসান;

—উন্নত দেশগুলি থেকে যথার্থ সম্পদ উন্নয়নশীল দেশে প্রবাহের ব্যবস্থা;

—বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থার স্বাভাবিকীকরণ;

—বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকার ওপর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, প্রভৃতি।

এইভাবে এক নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্ব সামনে চলে আসে, যা সমকালীন উন্নত পুঁজিবাদী সমকালীন তত্ত্ব ও ব্যবস্থার সামনে অনেকটা প্রতিবন্ধক হিসাবে আবির্ভূত হয়।

অ্যানাদার ডেভেলপমেন্ট তত্ত্ব

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির 'ক্যাচিং-আপ ডেভেলপমেন্ট' বা পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলির উন্নয়নের স্তরের সাথে সমতা অর্জনের জন্য এন. আই. ই. ও.-র আর্থনীতিক তত্ত্বের পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে ইউ. এন.-র জেনারেল অ্যাসেম্বলির স্পেশাল সেশনে 'ড্যাগ হ্যামারশেল্ড ফাউণ্ডেশন'-এর (ইউ. এন.-র প্রাক্তন প্রয়াত সেক্রেটারি-জেনারেলের নামে) পক্ষ থেকে 'অ্যানাদার ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনীতির জন্য এক প্রস্তাব পেশ করা হয়। ফাউণ্ডেশনের

এই প্রস্তাব রচনার কাজে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক প্রমুখ বুদ্ধিজীবী অংশের ব্যক্তিরা ছিলেন।

এই তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে বলা হয় যে যদিও বিশ্বের সম্পদ সীমাবদ্ধ, তথাপি সম্পদের সুষম বন্টন ও মিতব্যয়িতা ঘটলে তা' মানব সমাজের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সক্ষম। তবে এটা সম্ভব হতে পারে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে দ্রুত আয়ত্তাধীন ও নিম্নগামী করে।

'অ্যানাদার ডেভেলপমেন্ট' বা বিকল্প উন্নয়নের তত্ত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এটির প্রথম লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করা; বিশ্বের মানুষের যোগ্যতা ও ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ছিল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বিকাশ।

যেসব দেশে পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেগুলির বাস্তবতার ভিন্নতা অনুসারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কারিগরী স্তরে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা রিপোর্টে বলা হয়। ধনী ও দরিদ্র—এইভাবে বর্তমান পৃথিবীর বিন্যাসকে স্বীকার করে নিয়ে, 'অ্যানাদার ডেভেলপমেন্ট' আর্থ-তত্ত্ব বলেছিল যে এই ধারণার ফলে কেবল দরিদ্র দেশগুলি আক্রান্ত হচ্ছে তা' নয়, ভবিষ্যতে ধনী দেশগুলিও বিপন্ন হবে। মানুষের চাহিদা মেটানোর প্রথম শর্ত হলো আধুনিক পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া। এই স্বীকৃতির জন্য অগ্রাধিকার স্থির করে মানুষের বস্তুগত প্রধান প্রয়োজনগুলি যেমন যথোপযুক্ত পুষ্টি, পোষাক, আবাসন ও স্বাস্থ্যের সমস্যা মেটাবার ব্যবস্থা নিতে হবে। বৈষম্য-ভিত্তিক পশ্চিমী উন্নয়নের মডেল এই ধরনের লক্ষ্যে ফলপ্রসূ হবে না বলে রিপোর্ট দাবী করে। 'অ্যানাদার ডেভেলপমেন্ট' তত্ত্ব পৃথিবী থেকে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা ও সামরিকীকরণের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বন্ধের দাবী করেছিল। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে দেশোপযোগী করে ব্যবহার, বিজ্ঞান ও কারিগরী তথ্যের অবাধ বিশ্ব-বিচরণ, উন্নয়নের অভিজ্ঞতা সমস্ত দেশগুলির মধ্যে আদান-প্রদান, আত্মনির্ভরতার অধিকার স্বীয় দেশের নীতিতে গ্রহণ ও এই আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য প্রয়াসের সমর্থনে সমস্ত দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা, 'অ্যানাদার ডেভেলপমেন্ট'-এর জন্য বর্তমান বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও একারণে বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির পশ্চিমী ব্যবস্থার আধিপত্যকে বন্ধ করা, মালিকানার প্রশ্নে উৎপাদকের মালিকানা স্বীকার করা ও উৎপাদনের উপায়ের উপর তাদের কর্তৃত্ব, দেশের রাজনৈতিক স্তরে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ, আত্ম-নির্ভরতার ভিত্তিতে প্রত্যেক সমাজকে এমনভাবে গঠিত করা যাতে তারা নিজের সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থাপনা নিজেরা করতে পারেন এবং রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে সমগ্র 'অ্যানাদার ডেভেলপমেন্ট' ব্যবস্থার পরামর্শদাতা, সহায়ক ও পরিদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ইত্যাদি ছিল সমগ্র প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য।

কার্যকালে আদর্শায়িত এই তত্ত্ব ও প্রস্তাব গ্রহণ কাগুজে স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছিল, যদিও এটির সমর্থনে বিশ্বের উদারনীতিবাদী বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার হয়েছিলেন।

পুঁজিবাদের খোলস পরিবর্তনের উপক্রমণিকা

ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার পতনের পরে সমস্ত পরিমণ্ডলে যে অন্তর্বর্তী ও কিছুটা বিভ্রান্তিকর অবস্থা গড়ে ওঠে, তার অন্যতম প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় পুঁজিবাদী আর্থনীতিক তত্ত্বে নানা নব-প্রকরণের উদ্ভবের মধ্যে। এই সময়ে বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে নতুন দুই ধরনের প্রবণতা তৈরী হয়। প্রথম প্রবণতা হলো : যে অর্থনৈতিক কাঠামোগত ব্যবস্থা চলছে তাকে যথাসম্ভব টিকিয়ে রাখতে যেটুকু আশু পরিবর্তন করা দরকার সেই পথ নেওয়া; একে বলা যায় 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইকনমিকস্'। দ্বিতীয় প্রবণতা হলো : যতটা সম্ভব বহমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলকে রক্ষা করে কিন্তু তথাকথিত গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে, দরকার হলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যা কিছু ভাল সেগুলি আত্মীকরণ করে নতুন ধরনের ব্যবস্থা। শেষোক্তকে বলা হচ্ছিল 'নিউ সার্চ'। শেষোক্ত প্রবণতার মধ্যে সমাজ সম্পর্কে অনেকটা সর্বজনীন লক্ষ্য কাজ করেছিল; কিছুটা উদার গণতন্ত্রী মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এগুলির কোন কোনটির মধ্যে।

পুঁজিবাদের 'চক্রাকার সাধারণ সংকট'-এর কালপর্বগুলিতে অর্থাৎ একটি স্তর থেকে পুঁজিবাদ অন্য একটি স্তরে প্রবেশের অন্তর্বর্তীকালে, এই ধরনের 'নিউ সার্চ ইকনমিক থিওরি'র আবির্ভাব অতীতেও ঘটেছে। এই জাতীয় ইকনমিক থিওরি মানুষের মধ্যে কিছুটা আলোড়নও ঘটাতো। প্রসঙ্গত অতীত ইতিহাসের একটি অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করা যেতে পারে।

১৯২৯-৩৩-এর মহা-মন্দার সংকট থেকে পুঁজিবাদ কেইনসিয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় থিতু হবার সময়েও 'নিউ সার্চ'-এর একটি অধ্যায় এসেছিল। সেগুলির মধ্যে কিছুটা উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন জোসেফ অ্যালোইস স্চুমেটার (১৮৮৩-১৯৪৬)। তিনি তাঁর মূল তত্ত্ব হাজির করেছিলেন তাঁর রচনা 'ক্যাপিটালিজম, সোস্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি'তে (১৯৪২)। তিনি পুঁজিবাদের তদানীন্তন অর্থনৈতিক সংকটের চরিত্র লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে পশ্চিমে যাকে পুঁজিবাদ বলা হচ্ছে, তাকে ধীরে ধীরে পথ ছেড়ে দিতে হবে এমন এক ব্যবস্থার কাছে, তাকে যদি নামে সমাজতন্ত্র না'ও বলা হয়, কার্যকালে সেই আর্থনীতিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের মূল দিকগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। স্চুমেটার দেখিয়েছিলেন তেমন কিছু উপাদান, যেগুলি সৃষ্টি করবে নতুন পথের বাধ্যতা। যেমন, পুঁজিবাদের বিকাশের স্তর এমন মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে যাতে ব্যবস্থাটি স্বয়ং উপকরণের মালিকানার সামাজিকীকরণ ঘটাতে বাধ্য হবে; কেননা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সংহতিসাধন ও আমলাতান্ত্রিকীকরণ ক্রমে ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষমতা ও উৎসাহকে পেছনে ফেলে দেবে; তাছাড়া পারিবারিক বন্ধন ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ার মধ্য দিয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা অকার্যকর হতে থাকবে এবং তার ফলে নির্বাপিত হবে সম্পত্তি বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও সংরক্ষণের প্রবণতা; সামাজিক বিরোধ-বিতর্কের কালে বুদ্ধিজীবীদের বেশি বেশি করে পুঁজিবাদ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণের জন্য পুঁজিবাদ-বিরোধী সমস্ত প্রবণতা উৎসাহ পাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন তাঁদের রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তিকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে। এই পরিবর্তনগুলি রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও প্রতিফলিত হতে থাকবে এবং চালু গণতন্ত্রে যে ধরনের গুরুতর ত্রুটি রয়েছে, স্চুমেটারের মতে, সেগুলিকে অপসারণ করে আসবে অতিকায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক এক নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা।

প্রায় অনুরূপ পটভূমিকায়, যখন কেইনসিয় অর্থনীতিভিত্তিক ব্রেটন-উডস ব্যবস্থাসহ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যান্য সৌধগুলি ধীরে ধীরে সংকটাপন্ন হতে শুরু করে, তখন আবার লক্ষ্য করা যায় নিউ সার্চ ইকনমিক থিওরির আবির্ভাব। সমকালের সোভিয়েত ও অন্যান্য মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরা এগুলিকে 'ভালগার ইকনমিক থিওরি', সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আঘাতে বিপর্যস্ত পুঁজিবাদের আত্মসমর্পণের অর্থনীতি, দিশেহারাদের অর্থনীতি, পুঁজিবাদের পতনের সংকেতমূলক অর্থনীতি, দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক ধারণা প্রভৃতি নানান বিশেষণে অভিহিত করেছিলেন। যুগ-ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্ব হিসাবে মূল্যায়ন তাঁদের এই ধারণায় দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। অবশ্য নিউ সার্চ অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি শেষপর্যন্ত টেঁকেনি। তেমনই সত্য যে মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদদের প্রত্যাশা মত পুঁজিবাদের বিপর্যয়ও ঘটেনি। সর্বোপরি যেটা শেষোক্তরা নজর করতে পারেননি তা' হলো সংকটগ্রস্ত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ এইসব ট্রানজিশনাল ইকনমিক থিওরি বা নিউ সার্চ ইকনমিক থিওরির প্রস্তাবের দ্বারা উদার গণতন্ত্রী বা সমঝোতামুখী অর্থনীতি-চর্চার মধ্যে কেবলমাত্র দাঁড়িয়ে ছিল না, বরং পাশাপাশি স্বীয় ব্যবস্থার মূলনীতিগুলিকে আরও শক্ত এবং নতুন বিকাশের জন্য অজস্র ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও ব্যাপৃত ছিল এবং সেইসব তৎপরতাগুলির মধ্য দিয়ে আজকের বাস্তবতার জন্য প্রস্তুতিও শুরু করেছিল।

ষাট ও সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধব্যাপী উদ্ভূত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির মূল সুরটি ছিল যে পুঁজিবাদকে অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা থেকে মুক্ত করতে হবে এবং প্রভূত পরিবর্তন এজন্য দরকার। একে 'ট্রান্সফরমেশন অব ক্যাপিটালিজম' ধারা বলেও অভিহিত করা হয়েছে। এই ধারার কিছু পূর্বে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের 'নিও-ক্যাপিটালিজম' বা নয়া-পুঁজিবাদী ধারা, যাঁদের তত্ত্বে 'পিপলস ক্যাপিটালিজম', 'অরগানাইজড ক্যাপিটালিজম', 'ম্যানেজারিয়াল ক্যাপিটালিজম', 'হিউম্যান ক্যাপিটালিজম', 'হিউম্যানী ক্যাপিটালিজম' প্রভৃতি ধারণা ব্যক্ত হয়েছিল, তা' থেকে এই 'ট্রান্সফরমেশন অব ক্যাপিটালিজম' ধারা স্বতন্ত্র ছিল।

শেষোক্ত ধারার প্রবক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রেমঁ আরঁ, জন কেনেথ গলব্রেইথ, বার্তান্দ দ্যু জোভেনেলে, ডানিয়েল বেল, হেরেম্যান খান, রবার্ট টাইবোল্ড, জিবিগনিউ ব্রেজিঝিনিস্কি, অ্যালভিন টফ্‌লার, কেনেথ বোল্ডিং, অ্যালাইন টোরেইন, র‍্যালফ ডাহারানডরফ, জর্জ লিচথেইম, ক্লার্ক কার প্রমুখ। এঁদের তত্ত্বগুলি 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল', 'নিউ-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল', 'পোস্ট-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল', 'সুপার-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল', 'পোস্ট-ক্যাপিটালিস্ট', 'পোস্ট-বুর্জোয়া', 'প্রোগ্রামড', 'পোস্ট-সিভিলাইজড', 'কগ্‌নাইজিঙ', 'কনজিউমার', 'পারটিসিপেটরি', 'অ্যাফ্লুয়েন্ট', 'টেকনোট্রনিক', 'সাইবারনেটিক রেভলিউশনারি', 'মালটিমেজারড' ইত্যাদি ক্যাপিটালিজম বা সোসাইটি বলে পরিচিত হয়েছিল।

কেইনসিয় তত্ত্বের 'ডিমান্ড সাইড ইকনমিকস' বা চাহিদা বৃদ্ধির অর্থনীতি থেকে এগুলি 'সাপ্লাই সাইড ইকনমিকস' বা সরবরাহ বৃদ্ধি করে ক্রেতার প্রয়োজন মেটানোর ধারণাকে, সাধারণভাবে, অন্তর্গত করেছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ইতিহাসে তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী মহা-বিপ্লবের জন্য কমপিউটার, বায়ো-টেকনোলজি, কমিউনিকেশন, স্পেস-রিসার্চ অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন প্রভৃতির দ্বারা যে অভাবনীয় সুযোগ সৃষ্টি হতে থাকে মানব-সমাজের সামনে, তাকেই অন্যতম প্রধান ভিত্তি করেছিল এই তত্ত্বগুলি। এই তত্ত্বগুলির সাধারণ মতে, বুর্জোয়ারা ঐতিহাসিক মঞ্চ থেকে ক্রমশ অন্তর্হিত হচ্ছে। পাশাপাশি এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটিতে তথা শিল্পগত সমাজে মানুষের ভোগ্যপণ্যের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হবার মধ্য দিয়ে এবং যন্ত্রের ব্যবস্থায় মনুষ্যশ্রম ব্যাপক লাঘব হওয়ায় কায়িক শ্রমের পরিবর্তে বুদ্ধিজ শ্রমের প্রসার ঘটছে। ফলে সমাজে 'ডি-প্রলেটারিয়ানাইজেশন' বা নি-সর্বহারাকরণ ঘটতে থাকবে। এই প্রক্রিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান চরিত্রের ও কাঠামোর পরিবর্তন সংঘটিত হবে। শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্তে রূপান্তরের প্রক্রিয়া পরিণামে সর্বহারা শ্রেণীকে লুপ্ত করবে। এই ধারার তত্ত্বের মন্তব্য ছিল, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে সমাজ-পরিবর্তন অনেকটা ঘটে গিয়েছে। অবাধ ও উন্নত পণ্যের প্রাচুর্যের ফলে সমাজ শ্রেণীহীন স্তরে পৌঁছুবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন প্রয়োজন দেখা দেবে না। এইভাবে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন করা ও স্বীয় কাঠামোগত অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীতার অবসান হবে। এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার প্রয়োজনের অন্যতম কারণ ও পটভূমিকা হিসাবে এঁরা বলেছিলেন যে বিপ্লবের ফলে সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ক্ষমতা-কাঠামো বিধ্বস্ত হয়। অজস্র বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিদ্রোহ প্রভৃতির ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের পুরানো আইন-ভিত্তি বিপর্যস্ত ও অবসিতপ্রায় হয়ে দাঁড়ায়। এগুলি সমাজের কাঠামোর গুরুতর অসুস্থতার প্রমাণ; ফলে সমাজ প্রথাগত দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে। মোট ফল হলো, মানব-সমাজ সব সময়ে বিপ্লবের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন থেকে মানসিকভাবে হয় বিপর্যস্ত। তাঁদের মতে এই দিকগুলি পুঁজিবাদের সংকট প্রমাণ করে না, প্রমাণ করে বহমান শিল্প সমাজের সংকট। তারই উত্তর হিসাবে এসেছে নতুন বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব। সুতরাং নতুনের এই অভিযানের ফলে আদর্শগত স্তরে ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজমের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হবে—উভয় ভাবধারার বিলোপের মধ্য দিয়ে।

প্রধানত এই মূল বক্তব্যগুলিকে আবর্তন করে ট্রান্সফরমেশন অব ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির ধারাগুলি প্রস্তাবিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের আড়াই দশকের ইতিহাস এই ধারাকে স্বীকৃতি দেয়নি। প্রথমত, সোনার পাথরের বাটি তৈরীর—সমাজতন্ত্র দিয়ে পুঁজিবাদ বাঁচাবার অলীক প্রস্তাব, সমাজ-বিকাশের নিয়মে অস্বীকৃত হবার কারণে; দ্বিতীয়ত ক্যাপিটালিজমের শক্তিকে অবসিত বলে বিবেচনা করার ভ্রান্তির জন্য।

তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব

মানব-সভ্যতার সংকট থেকে মুক্তির জন্য নানা ধরনের তৎপরতার পাশাপাশি এই কাল-পর্বে আর এক প্রবাহের সূত্রপাত ঘটে অবিস্মরণীয় উদ্ভাবন ও আবিষ্কারসমূহ, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অভিনব সংযোজন, নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রসার, অর্থনীতিতে নতুন ধরনের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও বিস্তার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। এগুলির প্রত্যেকটি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে অবিশ্বাস্য সাফল্যও ধীরে ধীরে গড়ে

তোলে যার কোনো অতীত নজির পাওয়া যায় না। এই নতুন ধারার সৃষ্টি ও বিকাশ সম্পর্কে একথাও বলা দরকার যে কোন পূর্ব-প্রস্তাবিত তত্ত্ব ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে এই প্রবাহ গড়ে ওঠেনি। অদৃষ্টপূর্ব এইসব তৎপরতা যেমন আবিষ্কারকদের ধারণা ও প্রত্যাশার প্রায় বাইরে বিস্ফোরণের মত সচকিত করা সাফল্য এনে দিয়েছিল, অন্যদিকে এইসব প্রক্রিয়ার ফলে এমন আশ্চর্যজনক 'ইনারসিয়া' বা অন্তঃশক্তি সৃষ্টি হয়েছিল যা সৃষ্টির চেয়েও এনে দিয়েছিল অতিরিক্ত গতি। অন্যভাবে বলা যায় যে পদার্থিক নিয়মের সীমাকেও যেন তা' অতিক্রম করে যায়; স্রষ্টার বা ধারকের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে তা' সৃষ্টি করা শুরু করে বিপুল তরঙ্গ। নতুনের এই অভিযানের মধ্যে ছিল প্রধানত তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব, সমরাস্ত্রের অর্থনীতি, বহুজাতিক সংস্থা, বিশ্ব-ঋণদান ব্যবস্থা, পুঁজির বাজার, প্রচার মাধ্যম প্রভৃতি।

পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধ থেকে সারা বিশ্বে গড়ে প্রতি বছর নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, যা পেটেন্টভুক্ত করা হয়েছিল, তার সংখ্যা ৭,৫০,০০০-এর বেশি। এই সংখ্যা ছিল অতীতের চেয়ে গড়ে চার গুণেরও বেশি। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের পরিসরের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল চারটি : ইলেকট্রনিকস, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, সিনথেটিক কেমিস্ট্রি ও বায়ো-টেকনোলজি, যদিও এগুলির বাইরেও আরও অজস্র ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছিল। অন্যদিকে এই প্রধান চারটি ক্ষেত্রের অভ্যন্তরেও গড়ে উঠছিল এবং নিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল আরও নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট বহু ক্ষেত্র। এই ধরনের প্রতিটি আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঝটিকা গতিতে সৃষ্টি করে চলেছিল আরও নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের শর্ত। একই সাথে এইসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলি অতীতের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বহু তত্ত্বকে, ক্ষেত্র বিশেষে, পৌঁছে দিচ্ছিল বাতিল অথবা অপ্রচলিত স্তরে। এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কেবল সেইসব দিকের কয়েকটি প্রসঙ্গ, যা সামাজিক-উৎপাদনের বিকাশে নতুন ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। তাই, এখানে তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের অভ্যন্তরে প্রধানত লক্ষণীয় প্রায়োগিক-মর্মবাহী আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো।

(ক) নিউক্লিয়ার পাওয়ার

পারমাণবিক, তাপ-পারমাণবিক বোমা—অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, নাইট্রোজেন বোমা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক আবিষ্কার ও তার ফলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের বিপদ সম্পর্কে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের ফলাফলের সাধারণ ধারণা অধিকাংশ মানুষেরই আছে। নিউক্লিয়ার পাওয়ারের দ্বারা সৃষ্ট অন্যতম অবদান নিউক্লিয়ার পাওয়ার রি-অ্যাক্টর। নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম আইসোটোপসমূহের অ্যাটমিক নিউক্লিয়াসসমূহের ফিশন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরের অভ্যন্তরে যে তাপ-শক্তি সঞ্চারিত হয় তার দ্বারা সক্রিয় করা হয় টারবো-জেনারেটরগুলি। যে সমস্ত ফিশনযোগ্য বস্তু রি-অ্যাক্টরে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে সাধারণভাবে নিউক্লিয়ার জ্বালানি বলে। এই জ্বালানীগুলির অন্যতম প্রধান হলো ইউরেনিয়াম-২৩৫, প্লুটোনিয়াম-২৩৯ ও ইউরেনিয়াম-২৩৩। কতকগুলি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ফিশনের কাইনেটিক এনার্জি (গতি-শক্তি) থারমাল এনার্জিতে (তাপ-শক্তিকে) পরিণত হয়; তাছাড়াও এমন সব প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় যাতে সৃষ্টি হয় ফিশনের স্বয়ংক্রিয় ক্রমান্বয় প্রতিক্রিয়া। এইসব ব্যবস্থায় ফিশন তৈরি করে আরও নিউট্রন। ফিশন-নিউট্রন বা ফার্স্ট নিউট্রনগুলির রয়েছে প্রভূত এনার্জি। এছাড়া গৃহীত হয় আরও নানবিধ জটিল ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া। এই রি-অ্যাক্টরে অর্জিত তাপের দ্বারা জলকে বাষ্পে পরিণত করে স্টীম টারবাইনের মাধ্যমেও জেনারেটর চালানো হয়। এইভাবে কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদন মাত্র নয়, আরও বিবিধ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ এনার্জিকে অন্যান্য এনার্জিতেও রূপান্তরিত করা সহজে সম্ভব হয়। রি-অ্যাক্টরেরও নানা ধরন রয়েছে। রি-অ্যাক্টরের মাধ্যমে ইউরেনিয়াম-২৩৮কে প্লুটোনিয়াম-২৩৯এ পরিণত করা সম্ভব, যা প্লুটোনিয়াম ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর চেয়ে বেশি নিউট্রন বিচ্ছুরণ করে। অর্থাৎ ব্যবহৃত উপাদানের পুনর্নিয়োগ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্জ্য সামগ্রীকে পুনর্ব্যবহার, শক্তির অতিতেজ সৃষ্টি, রি-অ্যাক্টরের প্রয়োজনীয় জ্বালানীর স্বল্পতা ঘটলে তা' স্বয়ংক্রিয়ভাবে রি-অ্যাক্টরের মাধ্যমে অনেকটা অর্জন, স্বল্প-জ্বালানিতে

অবিশ্বাস্য ব্যাপক এনার্জি সৃষ্টি, উৎপাদন ও ব্যবহারে এনার্জি লসকে (শক্তি হ্রাস) অতীতের তুলনায় ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা ও তার দ্বারা বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতি প্রণালীতে, সারা মানব-সমাজের সামনে ভবিষ্যতে যে জ্বালানির সংকটের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান এবং সমাজের প্রতি মুহূর্তের জন্য ভিন্ন ভিন্ন এনার্জির (থারমাল, ইলেকট্রিক্যাল, ম্যাগনেটিক, হীট, লাইট, সাউন্ড, মেকানিক্যাল ইত্যাদি) যে চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তা' নিউক্লিয়ার পাওয়ার ব্যবহারের সাহয্যে পূরণ করার এক বিশাল সুযোগ নতুন বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

(খ) লেসার ও হলগ্রাফির ক্ষমতা

টেকনোলজি বা প্রযুক্তি হলো মৌলিক গবেষণার অঙ্গীভূত অধ্যায় ও প্রয়োগ, যা প্রবলভাবে উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। লেসার রশ্মি বিচ্ছুরণ এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে। লেসার-রশ্মি সামরিক প্রয়োজন থেকে শুরু করে চিকিৎসার ক্ষেত্র সহ জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে—ভ্যাকুয়াম আলট্রা-ভায়োলেট ব্যান্ড থেকে শুরু করে সাব-মিলিমিটার পর্যন্ত। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা কয়েক ডজন ধরনের লেসার সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। লেসার-ভিত্তিক প্রযুক্তির নানা শাখা গড়ে উঠেছে। লেসার-যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে থার্মো-নিউক্লিয়ার প্লাজমা তৈরি করতে ও নিরীক্ষণে, ইঞ্জিনীয়ারিং ও যন্ত্রের অংশের নিপুণতা গঠনে, ফটো-কেমিস্ট্রিতে, তথ্য মজুত করতে, প্রসেসিং ও ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রভৃতি। অতি উচ্চতায় অ্যাটমস্ফিয়ারের তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত হচ্ছে লেসার বীম। লেসার মেডিসিন ও লেসার বায়োলজি শাখা গড়ে উঠেছে। লেসারের নিত্য নতুন ব্যবহার ঘটছে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাতে। এক্ষেত্রে লেসার ব্যবহৃত হয় প্রধানত অপথালমলজি, সার্জারি ও ইন্ট্রাভিসেরাল থেরাপিতে। লেসার বিচ্ছুরণের তত্ত্বগত ধারণা প্রথমে গঠন করা হয়েছিল, তারপর লেসার যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়; পরিশেষে এটি বিভিন্ন শাখার প্রযুক্তিতে ব্যবহার হচ্ছে। উৎপাদন ও অর্থনীতিতে লেসারের ব্যবহার, তার আশ্চর্য ও ব্যাপক ফল এবং সাফল্যকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর ভূমিকার সাথে তুলনা করা যায়। লেসার ব্যবহারের সাহায্যে সাধারণ ফটো-প্লেটের উন্নত ব্যবহার, যাকে হলগ্রাফি বলা হয়, এই শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য আবিষ্কার। এটা ফটোগ্রাফিক ব্যবহার এক নিছক নতুন পদ্ধতি মাত্র নয়, বিজ্ঞান, শিল্প ও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে এই ব্যবস্থার প্রভূত গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। আলোকিত এলাকার দ্বি-মাত্রিক ফিল্ড এনার্জিকে ধরতে পারা যায় প্রথাগত ফটোগ্রাফিতে, কিন্তু হলগ্রাফি ব্যবস্থাতে অবজেক্ট বা বিষয়ের ছবির আলোর ক্ষেত্রের অ্যামপ্লিচ্যুড ও ফেজের মেমোরাইজেশন বা স্মৃতি সংরক্ষণ সম্ভব। অর্থাৎ এতে পাওয়া যায় তিনটি মাত্রা। হলগ্রাফির মাধ্যমে বস্তু বা বিষয়কে এমন জীবন্ত বাস্তব বলে মনে হয় যে সেটিকে স্পর্শ করে দেখতে ইচ্ছে করে। হলগ্রাফি ক্রমে ডিজাইনের কাজ ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার গবেষণার অটোমেশন ঘটাতে শুরু করেছে। প্রাপ্ত কোনো অতি ক্ষুদ্র ও প্রায় অসম্পূর্ণ কোন ফটোর সঠিক ও চূড়ান্ত রূপ সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ হলগ্রাফির সাহায্যে সম্ভব হচ্ছে। হলগ্রাফি ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যাকোয়াস্টিকস, রেডিও ফিজিক্স, সিসমোলজি ও সিসমিক প্রসপেকটিং-এ। বিশেষত মিনারাল প্রসপেকটিং, ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্বাভাস, সমুদ্রতলের কাঠামো নির্ণয় ইত্যাদিতেও হলগ্রাম ব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা নিচ্ছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে গণিতবিদদের সাহায্যে জেনেটিকবিদরা জেনেটিক কোডের সংকেত লিপি উদ্ধারে ও জিন সমন্বয় ঘটানোয় সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু জিনগত মিথস্ক্রিয়াতে (ইন্টার-অ্যাকশন) খুব বেশি অগ্রসর এখনো হওয়া যায়নি। (এই অসম্পূর্ণতাকে 'জুরাসিক পার্ক' চলচ্চিত্রে মনের মাধুরী মিশিয়ে সম্পূর্ণ করা হয়েছে; অবশ্য জুলে ভার্নের 'টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস আণ্ডার দা সী' পুস্তক রচনার ২৭ বছর পর সাবমেরিন আবিষ্কৃত হয়েছিল)। এই বিষয়টি প্রাথমিকভাবে ডি-অক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড (ডি. এন. এ. নামে বর্তমানে বিশ্ব-প্রচারিত)-এর মলিকিউলের (অণুর) সাথে সম্পর্কিত। হেরিডিটারি বা বংশানুক্রমিক মলিকিউলার-কেমিস্ট্রির নিয়মের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহে ও সমস্যার সমাধানে হলগ্রাফি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে।

(গ) প্লাজমার ভূমিকা

প্লাজমা প্রসঙ্গের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে লেসারের সমগুরুত্বে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্লাজমা আবিষ্কৃত হলেও, মাত্র সাড়ে তিন দশকের মধ্যে লেসার বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, শেষোক্তটির অগ্রগতি সেই পর্যায়ের নয়। সেই ইতিহাস বর্তমানে আলোচ্য নয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে একটি উদ্ভাবন ও বাস্তবে তার প্রয়োগের মধ্যে সময়ের ব্যবধানের কোনো স্থিরতা নেই। যেমন ১৭২৭ সালে ফটোগ্রাফি উদ্ভাবিত হলেও তার প্রথম প্রয়োগ ঘটেছিল ১৮৩৯ সালে অর্থাৎ ১১২ বছর পর; অন্যদিকে ট্রানজিস্টর এফেক্ট ১৯৪৮ সালে আবিষ্কৃত হলেও তার প্রথম বাস্তব প্রয়োগ ঘটে মাত্র ৫ বছর পর—১৯৫৩ সালে।

প্লাজমা হলো অংশত বা সমগ্রত আইওনাইজড গ্যাস, যার ঘনত্বে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ বাস্তবত সমান সমান; সে কারণে মোটের উপর চার্জের ফল শূন্য। প্লাজমার অবিভাজ্য গুণ (প্রপার্টি) যা ব্যতিরেকে এটির অস্তিত্ব থাকে না, তা' হলো কোয়াসি-নিউট্রালিটি বা প্রায়-নিরপেক্ষতা অর্থাৎ কখনোই কার্যকরীভাবে পজিটিভ বা নেগেটিভ চার্জের একটি অপরটির অধিক হবে না। প্লাজমা হলো ইলেকট্রো-কণ্ডাক্টিভ এবং তাপ বৃদ্ধির সাথে এই গুণ বৃদ্ধি পায়। ১০$^{\circ}$ ডিগ্রী কে (কেলভিন মাপে) প্লাজমা হলো কম তাপের প্লাজমা, ১০^{৬} থেকে ১০^{৮} ডিগ্রী কে হলো উচ্চ তাপের প্লাজমা। এটা উল্লেখ করার কারণ হলো যে প্রয়োগ-কালে এই তাপ রক্ষা করা হয়। উচ্চতাপ প্লাজমাকে বস্তুর (সাবস্ট্যান্স) চতুর্থ স্তর (অন্য তিন স্তর—গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন) বলা হয়। প্লাজমা স্তরে অ্যাটমের অভ্যন্তরের ইলেকট্রনগুলি তাদের কক্ষ-ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে নিউক্লিয়াসসমূহের সাথে বিশৃঙ্খলার স্তরে থাকে। এই উপাদানগুলির জন্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে নিয়ন্ত্রিত থার্মো-নিউক্লিয়ার ফিশনে প্লাজমা কার্যকরী ভূমিকা নেবে। ইলেকট্রিক ডিসচার্জ আর্ক, গ্লো, স্পার্ক ইত্যাদির সাহায্যে নিম্নতাপ প্লাজমা সৃষ্টি করা হয় গ্যাসে। এই অবস্থান-সঞ্জাত প্লাজমাই প্রযুক্তিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্লাজমা জেনারেটরের প্রসঙ্গই প্রথমে ধরা যাক, যা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অন্তর্গত এবং একধরনের থারমাল ইউনিট। এই ব্যবস্থায় বাইরের উৎসের বৈদ্যুতিক শক্তি (ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি) আর্ক-ডিসচার্জের দ্বারা গ্যাসীয় মাধ্যমের থার্মাল এনার্জিতে রূপান্তরিত করা হয়। প্লাজমা জেনারেটরের সাহায্যে খনিজ কাঁচামালের যথার্থ পরিস্রুতকরণ, অ-বর্জনীয় উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন, নির্ধারিত গুণাবলী-সম্পন্ন নতুন সামগ্রীর উৎপাদন, বিশেষ ধরনের পোঁচ বা আচ্ছাদন লাগিয়ে যন্ত্রসামগ্রী ও যান্ত্রিক ব্যবস্থার গুণগত মান বৃদ্ধি, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বা উৎপাদিত সামগ্রীর নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যবহারিক আয়ু বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সম্পদের সংরক্ষণ করা হয়। নিম্নতাপ প্লাজমা ছোট বা বড় যে কোন ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্পগত প্রযুক্তি হিসাবে গৃহীত হয়ে উৎপাদনের গতিতে ও স্বয়ংক্রিয়তায় নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। প্লাজমা মাইক্রোজেনারেটর থেকে নির্গত প্লাজমা জেটের সাহায্যে সিলিকেট ও ক্যাপ্রন ফ্যাব্রিক কাটা হয়। তাছাড়াও প্লাজমা জেট ব্যবহৃত হয় নানা কাজে। কোন কোন ধরনের প্লাজমা জেট দিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রসামগ্রীকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, ধাতুর অপচয় রোধ প্রভৃতিও করা যায়। যে কোন ধাতুর ক্ষয়প্রাপ্ত উপরিভাগ পুনরুদ্ধার এই ব্যবস্থার সাহায্যে ঘটে। দ্রুত ক্ষয় সম্ভব এমন নিম্নমানের ধাতুতে নির্মিত যন্ত্রপাতিতে প্লাজমা-জেটের পোঁচ লাগিয়ে অন্যান্য অত্যন্ত উন্নত ধাতুর জীবন-দৈর্ঘ্য দেওয়া যায়।

প্লাজমা-মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা চার থেকে দশগুণ বৃদ্ধি পায়। যেমন, গ্যাস ঘনীভূত উপরিভাগ সম্পন্ন টাইটানিয়াম অ্যালয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় ১৫ গুণ, তাপ-নিরোধক ও উচ্চতাপ যুক্ত স্টেইনলেস স্টিলের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ছয় থেকে সাত গুণ, প্রভৃতি। উচ্চতাপ যুক্ত অ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্লাজমা-মেকানিক্যাল মেথড খুবই কার্যকরী। নিম্নতাপ প্লাজমা বর্তমানে অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন খনিজ পাউডার ও কম্পাউণ্ডের উৎপাদনের ক্ষেত্রে—যেমন, অক্সাইড, কার্বাইড, নাইট্রাইড, বোরাইড ইত্যাদি—অত্যন্ত কার্যকরী। এইসব খনিজ পাউডারগুলির মেকানিক্যাল,

ইলেকট্রিক্যাল, থারমাল, অপটিক্যাল ও অন্যান্য এমন গুণাবলী রয়েছে যা আধুনিক শিল্পে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(ঘ) অ্যাবসলিউট জিরো বা পরম শূন্যের কাছাকাছি

বিনা দ্বিধাতেই বলা যায় যে, সুপার কণ্ডাক্টিভিটি এমনই এক দৃশ্যগোচর বাস্তব যে অদূর ভবিষ্যতেই প্রথাগত উৎপাদন ব্যবস্থাতে তা' বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা করবে। ১৯০৮ সালে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হিয়াইক কেমারলিংগ ওনেস, হিলিয়াম গ্যাসকে (-) ২৬৯° সেন্টিগ্রেড বা ৪.২° কেলভিনে তরল স্তরে রূপান্তরিত করে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিস্ফোরণ-মূলক আবিষ্কার ঘটান। তাতে দেখা যায় যে তরল হিলিয়ামের ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি পাঠানো সত্ত্বেও তরল হিলিয়াম তাতে কোন প্রতিরোধ বা রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছে না। এর মধ্য দিয়ে ১৯৫৭ সালে সুপার কণ্ডাক্টিভিটির গুণাবলী পৃথিবীতে প্রথম স্পষ্ট জানা যায়। বিজ্ঞানীরা তখন থেকে চেষ্টা চালিয়ে আসছেন এমন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য যা পরিচালনা করতে কার্যত কোন বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হবে না, এমন ধরনের হাই-ভোল্টেজ পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন বসানো যাতে কোন এনার্জি বা শক্তির বা অপচয় হবে না, বর্তমানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিপ্লবাত্মক ভূমিকা সম্পন্ন জেনারেটর তৈরি হবে ইত্যাদি।

বর্তমানে জেনারেটর নির্মাণে যে রোটর (মধ্যের ঘূর্ণায়মান অংশ) ব্যবহৃত হয় সেটি একটি অতিকায় ইলেকট্রো-ম্যাগনেট। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটের অদ্ভুত দর্শন রূপটি ছাড়াও এটিতে যে এনার্জি বা শক্তি সংযোজন করা হয়, তার সবটাই ম্যাগনেটিক ওয়াইণ্ডিং-এর রেজিস্ট্যান্স বা প্রতিরোধ খর্ব করতে ব্যয়িত হয়। ম্যাগনেটিক ওয়াইন্ডিং-এর রেজিস্ট্যান্স তাপ শক্তি সৃষ্টি করে বিপুল অপচয় ঘটায়। বর্তমানে ব্যবহৃত জেনারেটরগুলি ৪৪০, ১,০০০ অথবা ১,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে। প্রযুক্তিবিদদের সিদ্ধান্ত যে বর্তমান পদ্ধতিতে, খুব বেশী হলে, ২,৫০০ মেগা-ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর নির্মাণ করা হয়তো যেতে পারে তবে এই জাতীয় জেনারেটর নির্মাণে রোটরটি তৈরী করতে এত বিপুল ওজনের ইস্পাত লাগবে যে তা' দিয়ে নির্মাণ এবং সেটির পরিবহন ও প্রতিষ্ঠা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু সুপার-কণ্ডাক্টরের সাহায্য নিয়ে পূর্বোক্ত অপচয় রোধ করে, প্রচলিত একটি ১,৫০০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন জেনারেটরের চেয়ে অর্ধেকেরও কম ওজনের রোটরের সাহায্যে এবং বছরে ১,২০,০০০ টন ফুয়েল বা জ্বালানি বাঁচিয়ে প্রতিটি ৩,০০,০০০ কিলো-ওয়াট সম্পন্ন ১৬টি টার্বো-জেনারেটর বা প্রতিটি ৮,০০,০০০ কিলোওয়াট সম্পন্ন ৬টি জেনারেটর নির্মাণ ও ব্যবহার করা যায়। সুপার কণ্ডাক্টিভিটির সাহায্য নিয়ে পরীক্ষামূলক এ'জাতীয় প্রচেষ্টা ও প্রয়োগ শুরুও হয়েছে।

সুপার-কণ্ডাক্টিভিটির গুণাবলী থেকে এটা সহজে প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান ম্যাগনেটিক ফিল্ড-এর চরিত্র পাল্টে অতিকায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড গড়ে তোলা যাবে। দেখা যায় যে বাস্তব গুরুত্ব সম্পন্ন কোনো থার্মো-নিউক্লিয়র প্রতিক্রিয়া গঠনে যে প্লাজমার প্রয়োজন, তাতে তাপ দরকার হয় দশ লক্ষ ডিগ্রী এবং প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে কণার সংখ্যা $১০^{১৫}$। এতে প্রেসার বা চাপ সৃষ্টি হয় ১২০ অ্যাটমস্ফিয়ার। সলিড সুপার-কণ্ডাক্টারের সাহায্যে এই প্লাজমার নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়েছে।

(ঙ) সলিড ফ্লেম

এই যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটেছে কম্বাশনের (দহনের) ক্ষেত্রে। এটা সাধারণভাবে সকলের জানা যে যখন জ্বালানি জ্বলে তখন নির্গত হয় গ্যাস জাতীয় পদার্থ বা গ্যাসীয় আগুনের হল্কা। এটাও পরিচিত যে কঠিন পদার্থ বা থার্মাইট গলিত হলে জ্বলে এবং তরল উপাদান নির্গত হয়। কিন্তু কঠিন অবস্থায় জ্বলন ও তা' থেকে কঠিন পদার্থ নির্গত হবার তথ্য মানুষের বিজ্ঞানে অজানিত ছিল।

সলিড ফ্লেম প্রক্রিয়াটি কিভাবে সংঘটিত হয়? যাতে সলিড ফ্লেম তৈরি হতে পারে এমন মিশ্র পদার্থের (যেমন ট্যান্টালাম ও কার্বন) দ্বারা নির্মিত একটি সিলিণ্ডারের উপরিভাগে বৈদ্যুতিক স্পাইরাল দ্বারা সৃষ্ট থার্মাল ইমপালস প্রথমে যুক্ত করা হয়। এতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ট্যান্টালাম কার্বাইড তৈরি হয় ও তা' থেকে বিচ্ছুরিত হয় যথেষ্ট পরিমাণে তাপ। আরও কয়েকটি পদার্থগত প্রতিক্রিয়ার ফলে

সৃষ্টি হয় কঠিন কম্বাশন সামগ্রী। কম্বাশনের দ্বারা সৃষ্ট এটির তাপ এটিকে গলিয়ে ফেলার মত প্রয়োজনীয় তাপের তুলনায় নীচে থাকে; ফলে রাসায়নিক বা পদার্থগত ক্রিয়ার কালে যে তাপ বিচ্ছুরিত হয়, তা' এটিকে গলিয়ে ফেলতে পারে না।

এই মূল নীতি থেকে সৃষ্ট ব্যবস্থার নীট ফল হলো—জ্বলবে কিন্তু তাপ সৃষ্টি করবে না। ইতোমধ্যে ৪০০টির বেশি বিভিন্ন কম্পাউণ্ড এই পদ্ধতির সাহায্যে তৈরি করা গেছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে এগুলি প্রস্তুত করতে যে পরিমাণ এনার্জি ব্যয়িত হয় এবং সেগুলির মান যতটা খাটো, তার বিপরীতে, হাই-টেমপারেচার সিনথেসিস পদ্ধতি বহু বহু গুণ উন্নত ও কম ব্যয় সম্পন্ন। বৈদ্যুতিক শক্তির পরিবর্তে কম মূল্যের রাসায়নিক শক্তি এবং কম্বাশনের জন্য প্রয়োজনীয় ২,০০০°-৪,০০০° সেন্টিগ্রেড তাপকে এই হাই-টেমপারেচার সিনথেসিস পদ্ধতি ক্রমশ অপসারণ করে চলেছে। ফার্নেস বা চুল্লির সাহায্যে নির্মিত সামগ্রীগুলির অধিকাংশই এই ব্যবস্থায় করা সম্ভব এবং তাতে খরচ হয় ২০০ ভাগের এক ভাগ। বর্তমানে ওয়েলডিং করার যে পদ্ধতি রয়েছে তার চাইতে বহু উচ্চমানের, নিখুঁত, কার্যকরী ও স্বল্প-ব্যয়ী ব্যবস্থা এতে সম্ভব হচ্ছে। এই ব্যবস্থা প্রয়োগের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে খনি থেকে আকরিক লৌহ এনে ব্লাস্ট ফার্নেসে নিষ্কাশন করার পরিবর্তে, খনিজ আকরিককে সরাসরি পরিশুদ্ধ লৌহে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে। এই রকম নানাবিধ কাজে প্রচলিত সমস্ত ধরনের এনার্জির ব্যবহার ও কারখানার কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ও উৎপাদন-ব্যয়কে অস্বাভাবিক নিম্ন করে হাই-টেমপারেচার সিনথেসিস নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করতে চলেছে।

(চ) হীরকের কাঠিন্য

বৈজ্ঞানিকরা সুদীর্ঘকাল থেকেই অবগত আছেন যে কোন পদার্থের গুণ স্থির করার ক্ষেত্রে টেম্পারেচার বা তাপের মতই জরুরী প্রেসার বা চাপ। তরল ও বিশেষত কঠিন পদার্থের লক্ষণীয় পরিবর্তন আনতে প্রচণ্ড চাপের দরকার হয়। কমপ্রেসিবিলিটি বা চাপ দেবার ব্যবস্থাটি হলো আসলে অ্যাটমগুলির মধ্যে দূরত্বের ফারাককে কমিয়ে আনা এবং কমপ্রেসিবিলিটি স্বয়ং পদার্থের একটি গুণ। সমস্ত পদার্থের ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল প্রপার্টি বা গুণ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে কমপ্রেসিবিলিটির উপর। কোন একটি পদার্থের উপর প্রবল চাপ দেবার ফলে সেটির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে বস্তুটি নতুন প্রপার্টি অর্জন করে সে পরিবর্তনকে বলা হয় মেটালাইজেশন বা মেটাল-ডাইলেকট্রিক ফেজ ট্রানজিশন। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় এইভাবে সৃষ্ট প্রাকৃতিক হীরক হলো কার্বনের উপর সৃষ্ট প্রবল চাপের স্ফটিক রূপ। মানুষ কৃত্রিমভাবে হীরক তৈরি করতে অতীতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এখন তা' তৈরি করে বস্তুর অতি-কাঠিন্যের গুণ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। (প্রচণ্ড কাঠিন্যের জন্যই ড্রিল হেডে হীরক ব্যবহৃত হয়)। এই ব্যবস্থা থেকে জন্ম হয়েছে হাই প্রেসার ফিজিক্স শাখার। হাই প্রেসার যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করতে পারে ১,০০,০০০ অ্যাটমসফিয়ার চাপ এবং ২,০০০ সেন্টিগ্রেড বা তদূর্ধ্ব তাপ। কৃত্রিম হীরক ও এলবোরের সাহায্যে যে সমস্ত শিল্পে কঠিন ধাতু, মিশ্র-ধাতু প্রভৃতি কাটা, মাত্রা দান ইত্যাদি করা হয়, তাতে অনেক নিখুঁত, দ্রুত, মসৃণভাবে, স্বল্পব্যয়ে, শ্রম সাশ্রয়ে এবং কম শক্তি ব্যয় করে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। ডায়মণ্ড সিনথেসিসের আবিষ্কারের সাহায্য বৃহদায়তন ডায়মণ্ড-টেকনোলজি শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে প্রথাগত ব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

(ছ) পদার্থের নতুন গুণের অন্বেষণে

পদার্থের আরও বৃহত্তর ও কার্যকরী গুণ সৃষ্টি বা উদ্ধারের জন্য ডায়মণ্ড-সিনথেসিস বৈজ্ঞানিকদের অনুপ্রাণিত করে। পরীক্ষার সাহায্যে এটা প্রথমে জানা গিয়েছিল যে ধাতুর ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করলে তার প্লাসটিসিটি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিভিন্ন ধাতু বা সংকর ধাতুর ক্ষেত্রে এর ভিন্নতা রয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যেসব ধাতুর প্লাসটিসিটি গুণ কম, সেগুলি নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে। যেসব ধাতু আধুনিক শিল্পে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যেমন মলিবডিনাম, টাংস্টেন ও জিরকোনিয়াম ভিত্তিক অ্যালয় বা সংকর, কারবাইড, সেমি-কণ্ডাক্টর, অন্যান্য ধরনের বোরাইড ইত্যাদি সেগুলি সাধারণভাবে

যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহারযোগ্য করা খুবই কঠিন। কারণ এগুলি অত্যন্ত শক্ত, অথচ ভঙ্গুর। শিল্প ব্যবহারে এগুলির ৯০ শতাংশেরই অপচয় ঘটে। ফলে এগুলির জন্য খরচও প্রচণ্ড। সেকারণে আধুনিক ব্যবস্থায় অতীতে প্রযুক্ত চাপের চেয়ে ৮০-১০০ গুণ বৃদ্ধি করে বেশ কিছু নিদারুণ কঠোর ধাতুকে প্রায় গলিত স্তরে নিয়ে আসা এবং অতি সূক্ষ্ম তার পর্যন্ত নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে। মলিবডিনাম, টাংস্টেন, বেরিলিয়াম, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি দিয়ে এখন রোল করে তৈরি করা হচ্ছে টিউব। কতকগুলি ধাতুকে নানা পদ্ধতিতে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার দিয়ে ধাতুর স্ট্রেংথ, ম্যাগনেটিক ও সুপার কণ্ডাক্টিভ প্রপার্টি বা গুণ বহু বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। বিমান শিল্পে দীর্ঘকাল ধরে গ্যাস-টারবাইনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের স্থায়িত্ব ও নির্ভরযোগ্যতার সমস্যা এই ব্যবস্থায় দূরীভূত হয়েছে। হাইড্রোস্ট্যাটিক এক্সপ্রোশনের এই ব্যবস্থার দ্বারা টুল-নির্মাণে ঘটেছে অভূতপূর্ব অগ্রগতি। ইস্পাত শিল্পে জটিল আকৃতির বার নির্মাণ এতে সহজসাধ্য ও আরও নিপুণ হয়েছে। কোন ধাতু নির্মিত সামগ্রীর অভ্যন্তরে ফাটল বা শূন্যতা এই ব্যবস্থার সাহায্যে পুরোপুরি শোধরানো যায় সামগ্রীটির কোন ধরনের ক্ষতি সাধন না করে এবং সামগ্রীটির অখণ্ডতা বজায় রেখে। অতীতে যন্ত্রের ওপর বিভিন্ন লোড বা ভার পড়ার ফলে দ্রুত ক্ষতি ও দুর্ঘটনা ঘটতো। তা' বহুলাংশে কমিয়ে ফেলেছে এই ব্যবস্থা। বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকালের স্বপ্ন—পদার্থের গুণের পরিবর্তন ঘটিয়ে শক্ত ধাতুর দ্বারা যন্ত্র তৈরির পরিবর্তে সিরামিক বা চীনামাটি (যা দিয়ে চায়ের কাপ-প্লেট, পরিবেশন সামগ্রী, ফুলদানী ইত্যাদি নির্মিত হয়ে এসেছে) দিয়ে মেশিন বা যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরি—এখন পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এমন দিন অচিরেই আসতে পারে যখন বড় শিল্পের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ চীনামাটি দিয়ে এই পদ্ধতিতে নির্মিত হবে। হাইড্রোস্ট্যাটিক এক্সক্রুশনের সাহায্যে বস্তুতে নতুন গুণ যুক্ত করে অপ্রচলিত সামগ্রী ব্যবহার করে যন্ত্র নির্মাণের দ্বারা এক অবিশ্বাস্য বিপ্লবের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে শিল্পগত প্রযুক্তি। আরও বিশেষত এই কারণে যে, অন্য ধাতু ও সংকর ধাতুর তুলনায় সিরামিকের ব্যতিক্রমী উন্নত দিক হলো এটির তাপ ও চাপের বিরুদ্ধে অধিকতর প্রতিরোধের ক্ষমতা এবং থারমাল ইনস্যুলেশন-যোগ্যতা বা তুলনামূলক গুণমান উন্নত। ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিন তৈরিতে পর্যন্ত সিরামিক দিয়ে পরীক্ষামূলক সাফল্য পাওয়া গেছে। সিরামিকের ওজন কম হওয়ায় শক্তি-শিল্প-যন্ত্রের ওজন কমানো সম্ভব।

প্রযুক্তির সাহায্যে এই জাতীয় উদ্ভাবনী ও সাফল্য হাইপ্রেসার ফিজিক্স-এর পাশে হাইপ্রেসার কেমিস্ট্রি শাখার দ্বার উন্মেচিত করেছে এবং এই ক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণাও শুরু হয়েছে। এই ধারাতেও ধাতু, অ্যালকালি ইত্যাদির ভিতরে অনেক উল্লেখযোগ্য নতুন উপাদান গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

(জ) বিস্ফোরণ দিয়ে ধ্বংস নয়, গঠন

পূর্বের আলোচনাতে স্ট্যাটিক প্রেসার প্রসঙ্গ কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। কৃত্রিম ডায়মণ্ড তৈরিতে প্রযুক্তিবিদরা ব্যবহার করেছেন ১,৫০,০০০ অ্যাটমস্ফেরিক প্রেসার যা পৃথিবীর ২,৯০০ কিলোমিটার নীচের গর্ভের চাপের সমান। পৃথিবীর গর্ভ-কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ ৪,০০,০০০ অ্যাটমস্ফিয়ার এবং তাপ ৪,০০০° সেন্টিগ্রেড। বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখনও পূর্বে বর্ণিত, বর্তমানে প্রাপ্ত বর্ধিত প্রেসার দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়নি। অথচ আরও বহু গুণ বর্ধিত প্রেসার সৃষ্টি করা সম্ভব হলে নতুন জগৎ উন্মুক্ত হবে। যেমন ধরা যাক যে জুপিটার বা বৃহস্পতি গ্রহের অভ্যন্তর কেন্দ্রে প্রেসার হল ৪,৫০,০০,০০০ এবং নিউট্রন নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ১০^{২৮} অ্যাটমস্ফিয়ার। এই প্রেসারের পরিস্থিতিতে রাসায়নিক উপাদানের অস্তিত্ব থাকে না এবং অ্যাটমের ধারণাটাই অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। অন্য কোনভাবে নয়, বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে পৃথিবীতে কেবলমাত্র বিস্ফোরণের সাহায্যে ঐ প্রেসার অর্জন করা সম্ভব। কেননা শক্তিশালী শক-ওয়েভের সাহায্যে যে সাধারণ বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তাতে মিলিয়ন-বিলিয়ন তাপ ও থাউজ্যাণ্ড বিলিয়ন অ্যাটমস্ফিয়ার চাপ প্রতি সেকেণ্ডে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে বিস্ফোরণ মানে ধ্বংস (অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি) বলে মনে করা হয়। কিন্তু বিস্ফোরণের ফলে নির্গত এনার্জি বা শক্তিকে যদি গঠনাত্মকভাবে, যেমন নতুন বস্তুর সিনথেসাইজ করা অথবা সেটির বহিরঙ্গ পরিবর্তন বা ধাতু ঝালাই ইত্যাদিতে, ব্যবহার করা যায় তবে বিস্ফোরণ স্বয়ং টেকনোলজিক্যাল টুলে

পরিণত হতে পারে। কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে—ধরা যাক দুই মিটার ব্যাস ও পাঁচ মিলিমিটার পুরু স্টেইনলেস স্টীলের একটি গোলকের গায়ে স্ট্যামপিং করতে যেখানে ৪০০০ টন প্রেসার সৃষ্টিতে ৩,০০০ টন ওজন দরকার হবে, বিস্ফোরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাতে লাগবে মাত্র ২০০ টন এবং তাতে খরচ হবে ১/৬ ভাগ মাত্র।

মেটাল হার্ডেনিং বা ধাতুকে কঠোর করার (যা দিয়ে বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করা চলে) জন্য ধাতুর অভ্যন্তরীণ স্ফটিকের অসম্পূর্ণতা, অপূর্ণতা বা বিন্যাসে অসঙ্গতি বিস্ফোরণের সাহায্যে অর্জিত প্রেসারের দ্বারা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও নিপুণভাবে দূর করা সম্ভব হচ্ছে।

মেটাল ওয়েল্ডিং বা ধাতু ঝালাই উৎপাদন ও অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যে এক্সপ্লোশন পদ্ধতি স্টিল-টাইটানিয়াম ও স্টিল-অ্যালুমিনিয়াম বাই-মেটাল গঠন, স্টিল-কপার অ্যালয়ের তৈরি প্লেন বিয়ারিং প্রভৃতিতে যুগান্তকারী অগ্রগতি ঘটিয়েছে। এক্সপ্লোশনকে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে মাত্র এক সেকেন্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের এক্সপ্লোশনকে দীর্ঘস্থায়ী ও নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্লোশনে পরিণত করে কারিগরী ক্রিয়ায় নিয়োজিত করতে পরীক্ষা শুরু হয়েছে এক্সপ্লোশন জেনারেটের নির্মাণের। ইতোমধ্যেই ফাউন্ড্রিতে ইলেকট্রিক্যাল এক্সপ্লোশন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে। ইলেকট্রিক-পালস ও ম্যাগনেটিক-পালস মেসিন বা ইক্যুইপমেন্ট এখন বিস্ফোরণ পদ্ধতি প্রয়োগে ব্যবহৃত হচ্ছে। গড়ে উঠছে হাই-পালস্ এনার্জি ফিজিক্স-এর ধারা।

(ঝ) মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিসরে অগ্রগণ্য অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হলো মহাকাশ গবেষণা। মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয়ে মানুষের অনুসন্ধিৎসা যেমন মানব-সভ্যতার মতই প্রাচীন, অন্যদিকে মহাকাশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক চর্চাও ঘটছে আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে। এই ঐতিহাসিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসে ১৯৫৭ সালে মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ—স্পুটনিক—প্রেরণ দিয়ে শুরু করে ১৯৬১ সালে মনুষ্যবাহিত মহাকাশ-যান, ১৯৬৫ সালে মহাকাশ-যানের বাইরে মহাকাশে মানুষের বিচরণ ইত্যাদির শিহরণ-সৃষ্টিকারী সাফল্য মহাকাশের অনুসন্ধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধিকার ও উদ্ভাবনে নতুন মাত্রা দিয়েছে। অভিযানের প্রস্তুতির কালপর্বে মৌল ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—ম্যাথামেটিকস, মেকানিকস, অ্যাস্ট্রনমি, ফিজিক্স, থার্মাল ফিজিক্স, এরোডায়নামিক্স, জিওফিজিক্স প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হয়েছিল। মানুষকে মহাশূন্যে প্রেরণ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির সাথে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, ওসেনোলজি, প্ল্যানেটোলজি, ইকোলজি, ফিলজফি, থিয়োরিটিক্যাল মেকানিকস, সাইবারনেটিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ফিজিওলজি, সাইকোলজি প্রভৃতি শাখাকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করা হয়। অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে ধারণা, মহাশূন্য থেকে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মলিকিউলার বায়োলজি, জেনেটিক্স, জেনারেল ফিজিওলজি, ফিজিওলজি অব হায়ার নার্ভাস অ্যাক্টিভিটি, জেনারেল সাইকোলজি, সাইকোলজি ফর মেন্টাল প্রসেস প্রভৃতি বিজ্ঞানের শাখা সমগ্র মহাকাশ গবেষণার প্রক্রিয়ায় আরও গভীরভাবে যুক্ত হয়। আকাশে দীর্ঘ-অবস্থানকারী যানের অভ্যন্তরে মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে অ্যাপ্লায়েড মেকানিকস, থিওরি অব কম্বাশন, অটোমেটিক কন্ট্রোল থিওরি, মেটেরিয়াল সায়েন্স, মেটাল টেকনোলজি, কেমিস্ট্রি অব পলিমার, রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং, ক্রায়োজেনিক্স, পাওয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং, নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি বিজ্ঞানের মৌল বা প্রায়োগিক প্রায় সমস্ত শাখাই কেবল যুক্ত হয়ে পড়লো না, প্রয়োজন ও বিশিষ্টকরণের ভিত্তিতে গড়ে উঠলো আরও নতুন নতুন শাখাও। মহাকাশগত তৎপরতা তত্ত্ব ও প্রয়োগে বিজ্ঞানের শাখাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট অন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় ও সেগুলির মধ্যে ঘনিষ্ট ও কার্যকরী সমন্বয়ের ব্যবস্থা শুরু করে। এই ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও প্রয়োগ প্রতি মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে যাচাই করে চলেছে।

মহাকাশ অভিযানের সুবিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রকেট ও সেগুলির যন্ত্রাংশ, টেলিস্কোপ, তরল, কঠিন ও গ্যাস জ্বালানি, ক্যামেরা, কমিউনিকেশন, ট্রান্সমিশন, বিশেষত সোলার ও অ্যাটমিক

এনার্জির ব্যবহার, রেডিও আইসোটোপ জেনারেটর, কম্বাশান ব্যবস্থা, মেটালার্জির ক্ষেত্রে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ সংকর-ধাতু সৃষ্টি, অরবিটার, স্যাটেলাইট, মহাকাশ-যানের এঞ্জিনের ক্ষেত্রে সর্বময়তা অর্জন, কমপিউটারের সর্বব্যাপী উন্নয়ন, মিনিয়েচার ও মাইক্রোমিনিয়েচার ইলেকট্রনিকস ব্যবস্থার সর্বাত্মক প্রয়োগ ইত্যাদির অনির্বচনীয় বিকাশ ঘটেছে। একই সাথে এ'সব বিষয়ে পরীক্ষার সাফল্য শিল্প, উৎপাদন, পরিবহন, যোগযোগ প্রভৃতির উন্নয়নেও ব্যবহৃত হয়ে নতুন ও বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

এই দিকগুলির বাইরেও মহাকাশ গবেষণা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছে প্রযুক্তির বিভিন্ন ধারাকে। তার সামান্য কয়েকটি দিক দেখা যেতে পারে।

পৃথিবীতে ব্যবহারিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মহাকাশ অভিযানের দু'একটি অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ প্রথমে উল্লেখ দরকার। চন্দ্র থেকে সংগৃহীত লৌহ পৃথিবীর সবচাইতে প্রতিকূল পরিবেশে ব্যবহার করে দেখা গেছে যে তাতে মরচে ধরে না। চান্দ্র-লৌহের ঐ বিশিষ্ট চরিত্রকে বিশ্লেষণ এবং সে চরিত্রকে পৃথিবীর লৌহ, ইস্পাত ও ধাতু-সংকরে ব্যবহার করে শিল্প-যন্ত্র ও মহাকাশ-যানের মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যয় সংক্ষেপ করা হচ্ছে। মহাকাশ স্টেশনের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সেমি-কণ্ডাক্টর সেলের সাহায্যে সৌর আলোকশক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার ব্যাটারির ব্যবস্থা পৃথিবীর মাটিতে ব্যবহার শুরু হয়েছে। শুক্র গ্রহে সরঞ্জাম নামিয়ে সেখানকার ৫০০° সেন্টিগ্রেড তাপ, প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার ১০০ কে.জি. চাপ ও কারবন ডাই-অক্সাইডপূর্ণ পরিবেশের প্রবল প্রতিকূলতায় অভিনব ধরনের ক্যামেরার সাহায্যে ফটো তোলার সাফল্য পৃথিবীর মাটিতে ক্যামেরা-প্রযুক্তিতে নতুন যুগ এনেছে। কৃত্রিম উপগ্রহের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছাড়া কমিউনিকেশন টেকনোলজি ব্যবস্থা ও ব্যবহার বর্তমানে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অভাবনীয়। মহাকাশ উপগ্রহগুলিতে বৃহদায়তন রিলে কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে; ফলে অডিও ও ভিস্যুয়াল চ্যানেলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং খরচ কমছে। রিলে স্যাটেলাইটের সাহায্যে পৃথিবীর সমুদ্র ও আকাশের যে কোনো স্থানে জাহাজ ও বিমানের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হওয়ায় সেগুলির সাথে কমিউনিকেশন নিশ্চিত হয়েছে; সেগুলির নিরাপত্তা বেড়েছে, সেগুলির যোগাযোগ উন্নত হয়েছে ও খরচ কমেছে।

মহাকাশ অভিযান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে নতুন শাখা যুক্ত করেছে, সেটির নাম স্পেস টেকনোলজি। এখনও পর্যন্ত শৈশবের স্তরে থাকা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রটির প্রসার ইতোমধ্যেই অন্যতম বৃহত্তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে যেসব ধাতুর বা ধাতু-অক্সাইড প্রভৃতির মিশ্রণ করানো যায় না, মহাশূন্যের শূন্য-মাধ্যাকর্ষণের পরিবেশে সেই মিশ্রণ করানো যাচ্ছে। মহাকাশ-যানের অভ্যন্তরে তার পরীক্ষা সফল হয়েছে। এই ধরনের মিশ্রণে ধাতুর স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রোফিজিক্যাল ও অপটিক্যাল নতুন প্রপার্টি বা গুণ অর্জিত হচ্ছে এবং তা' দিয়ে সম্ভব হচ্ছে ইলেকট্রনিকস, রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রির সরঞ্জামের মৌলিক অগ্রগতি ঘটানো। ধাতু ও গ্যাসের সুসংবদ্ধ মিলনে তৈরি হচ্ছে শক্তিশালী ফোম-ধাতু। এইভাবে সৃষ্ট ফোম-ইস্পাত অ্যালুমিনিয়ামের মত হালকা হলেও ক্ষমতা ইস্পাতের মতই থাকছে। শূন্য মাধ্যাকর্ষণে ঢালাই কাঁচের অপটিক্যাল প্রপার্টি পৃথিবীর ঢালাইয়ের চেয়ে বহুগুণ উন্নত। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে মহাশূন্যে তৈরি সেমি-কণ্ডাক্টিং একক স্ফটিক। মহাশূন্যে নির্মিত স্ফটিক সূঁচ, পৃথিবীতে নির্মিত সূঁচের চেয়ে ১০ গুণ ভার সহ্য করতে পারে। মহাশূন্যে জীবাণুর ফার্মেন্টেশন পৃথিবীর চেয়ে অনেক বিশুদ্ধ। মহাশূন্যে নির্মিত নিরেট বা ফাঁপা ধাতু-গোলক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বল বিয়ারিং-এর কাজে দারুণ সাফল্য আনছে। মহাশূন্যে অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা নতুন পদ্ধতিতে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন, ধাতু ও ধাতু-সংকরকে যন্ত্রের কাজে ব্যবহার, ঝালাই ও ইলেকট্রনিকস কৃৎ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি এখন কল্প-বিজ্ঞান নয়, বহুলাংশে বাস্তব।

মহাকাশ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো পৃথিবীর প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার রিমোট-সেনসিং। এটি প্ল্যানেটরির ফিজিক্স শাখার অন্তর্গত। বিমান থেকে ফটো তোলার চেয়ে অনেক বেশি

দূরত্ব থেকে অনেক সূক্ষ্ম ও নিখুঁত ব্যবস্থা এটি। দুর্গম অঞ্চলের উন্মুক্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে চিহ্নিত করা ছাড়াও মৃত্তিকার গভীরে সুপ্ত খনিজ তেল, ধাতু, গ্যাস, জল ইত্যাদি নির্ধারকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে এই ব্যবস্থার সাহায্যে। এই পদ্ধতির সামনে পৃথিবীতে দুর্গম বা দূর এলাকা, পৃথিবীর প্রকাশ্য বা গোপন সম্পদ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেক্টরের কাছে কমপিউটারের সাহায্যে পৃথিবীর ইমেজ বা প্রতিচ্ছবির ডিকোডিং, ফটোগ্রাফি ও রিমোট-সেনসিং হিস্টোগ্রাম ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিমোট-সেনসিং ব্যবস্থার দ্বারা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে দুর্যোগের আশঙ্কা যেমন ঝড়, বৃষ্টি, খরা কিংবা সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান শিলা বা সমুদ্র-গর্ভে পাহাড়ের অবস্থিতি নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষকে সজাগ করা, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, সমুদ্র বা আকাশে বিচরণকারী যানবাহনকে নিরাপদ করা যায়। প্রথাগত বিজ্ঞান ও কারিগরী ব্যবস্থা যখন পৃথিবীময় অর্থনীতির বিকাশের উপযোগী হতে ক্রমশ অপারগ হচ্ছে, তখন গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিচ্ছে মহাকাশ থেকে রিমোট-সেনসিং। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের অগ্রগতি এবং ক্রমবর্ধমান ও বহুলাংশে নতুন চরিত্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণকে অনিবার্য করে তুলেছে। ভূতত্ত্ববিদদের কাছে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ-তথ্য সংগ্রহ ছিল দুরূহ ব্যাপার এখন তা' বহুলাংশে অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মহাকাশ থেকে রিমোট-সেনসিং সৃষ্টি করেছে সেই নতুন পরিস্থিতি।

মহাকাশ ফটোগ্রাফি অনেক নিখুঁতভাবে ভূমি, জল, পর্বত, মরুভূমি, বরফাবৃত এলাকা, সমুদ্র, নদী, জলাভূমি, আগ্নেয়গিরি, বন, নোনা জমি, উর্বর বা অনুর্বর জমি, পাথুরে জমি, কৃষি ক্ষেত্র, তৃণ ক্ষেত্র, জলের তলার সম্পদ, শিলাস্তর, পর্বতের প্রাচীনত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ সহ পৃথিবীর ও দেশসমূহের মানচিত্র তৈরি করে দিচ্ছে। জমির সঠিক জরিপ, ইঞ্জিনীয়ারদের পরিকল্পনার প্রয়োজনে সড়ক, পাইপ লাইন, খাল, জল বিদ্যুতের স্থান নির্ধারণে স্পেস ফটোগ্রাফি দিচ্ছে অসাধারণ সহায়তা। অরবিটাল ফটোগ্রাফী থেকে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসও নির্ণীত হচ্ছে—যেমন, কোন নদী-খাত কোন যুগে বদলেছিল প্রভৃতি। সমুদ্র-গর্ভ সন্ধানে রিমোট-সেনসিং ও স্পেস ফটোগ্রাফি ওসেনোলজিতে নবযুগ এনেছে।

(এ) মলিকিউলার বায়োলজি

অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে কোয়ান্টাম থিওরির আবিষ্কার যেভাবে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, পৃথিবীর প্রাণ-জগতের বিজ্ঞানকে তেমন মাত্রা দিয়েছে মলিকিউলার বায়োলজি। ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রীক ডি-অক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড (ডি. এন. এ.)-এর সেকেণ্ডারি স্ট্রাকচার বা মধ্যম প্রকার কাঠামো, যাকে তথাকথিত 'ডবল হেলিক্স' বলা হতো, উদ্ভাবন করেন। এই আবিষ্কারকে, ১৯১১ সালে আরনেস্ট রাদারফোর্ডের 'মডেল অব অ্যাটম'-এর আবিষ্কারের মতই, গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। ১৯৬০ সালে হরগোবিন্দ খোরানা প্রথম কৃত্রিম জিন সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালের গবেষণাগুলির মধ্য দিয়ে এমন জিন 'রচনা' করা হয়, যাতে সৃষ্টি হয় মৌলিকভাবে নতুন বংশানুক্রমিক তথ্য গঠন করার দিকে অগ্রসর হবার পরিস্থিতি। ১৯৭৩ সালে হারবার্ট বয়ার ও স্ট্যানলি কোহেন ডি. এন. এ. মলিকিউলসমূহের 'রিকম্বাইন' বা পুনঃসংযুক্তির এক কৃৎপন্থা উদ্ভাবন করেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা কৃত্রিম মাইক্রো-অর্গানিজমসমূহকে নতুন ধাঁচসম্পন্ন কুল বা বংশের সাথে (যার পূর্বে অস্তিত্ব ছিল না) জোড়া দেওয়া যায় কিংবা সৃষ্টি করা যায় এক নতুন অর্গানিজম। অতীতে এই জাতীয় কাজ অসম্ভব বলে বিবেচিত হতো। এই মূল ধারণার উপর ভিত্তি করে, জেনেটিক স্ট্রাকচার সৃষ্টির সূচনার মধ্য দিয়ে, অভ্যুদয় ঘটে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর। এই প্রয়াস বিজ্ঞানকে জিনের অপসারণ, অবস্থানের পরিবর্তন বা সংযুক্তি করার ক্ষমতা দান করেছে যা কার্যত প্রাকৃতিক নিয়ম-ভিত্তিক স্বাভাবিক প্রণালীতে মানুষের হস্তক্ষেপ করার সর্বপ্রথম উদ্যোগ ও ক্ষমতা অর্জন। অন্যভাবে বলা যায় যে পরিকল্পনামাফিক ডি. এন. এ. কাঠামোর নির্মাণ এবং পরিণামে নতুন জেনেটিক সিস্টেম ও তার ফলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ নতুন অর্গানিজম পাওয়া যায়।

মৌলিক গবেষণার স্বার্থে বংশগত মেকানিজম, কাঠামো ও ভূমিকার বিচার করা অত্যন্ত জরুরী। এই পরিসরেও প্রচণ্ড অগ্রগতি ঘটেছে। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্গানিজমসমূহ চয়ন করার ক্ষমতা অর্জন—সেইসব অর্গানিজম যেগুলির গুণাবলী মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যেমন অতি পুনরুৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রো-অর্গানিজমগুলি (অ্যামাইনো অ্যাসিডসমূহ, অ্যান্টিবাইওটিকস্ বা ফীড প্রোটিন তৈরি করে যেগুলি) কিংবা প্ল্যান্ট হাইব্রিডস্ বা উচ্চফলনশীল উদ্ভিদ, যার দ্বারা অত্যুচ্চ পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করা যায় ও যে কোন প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশেও যা নির্ভরযোগ্য হবে। তাছাড়া প্রাণীজগতের সমস্ত ধারার মধ্যে বংশগত ত্রুটি অপসারণের ক্ষমতাও অর্জন করেছে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং।

জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং বর্তমানে চিকিৎসা ও কৃষির জন্য দৈহিকভাবে জীবন্ত প্রোটিন উৎপাদন করছে। এই অগ্রগতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল ইন্টারফেরন। ইন্টারফেরন সহজাত অ্যান্টি-ভাইরাস সংবাহক, যার সাহায্যে ভাইরাস-সংক্রমণের প্রতিরোধ চালায় অর্গানিজম। এগুলি অত্যন্ত কার্যকরী। কিন্তু সমস্যা হলো প্রচুর পরিমাণে এটির উৎপাদন বর্তমানে অসম্ভব। কেননা এগুলি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হলো মানুষের রক্তের লিউকোসাইট কণাগুলি। তাই পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত মানুষের রক্ত জড়ো করলেও বেশী ইন্টারফেরন পাওয়া যাবে না।

মনুষ্য-ইনসুলিন উৎপাদনের জন্যও বায়ো-টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়, যা চিকিৎসার জন্য অতীতে অপ্রাপ্য ছিল। ইনসুলিন হলো এক ধরনের প্রোটিন হরমোন যা প্যানক্রিয়াস থেকে বের হয়। ইনসুলিনের স্বল্পতা অতিরিক্ত শর্করা সৃষ্টি করে, যা থেকে ডায়বেটিস রোগ হয়। পরবর্তী প্রচেষ্টা চলছে শিল্প-ব্যবস্থাগতভাবে মানুষের গ্রোথ হরমোন উৎপাদন করার, যা দিয়ে শরীরের পোড়া, ভাঙ্গা অংশ ইত্যাদির চিকিৎসা হবে।

কৃষিতে জেনেটিক পরিবর্তন বিপ্লবাত্মক মোড় সৃষ্টি করেছে। উদ্ভিদে এক ধরনের সেল বা কোষ পাওয়া গেছে যা দিয়ে হাইব্রিড বা উচ্চ-বৃদ্ধি ঘটানো যায়। উদ্ভিদ ও ভূমির কোন ক্ষতি না করে কৃষিতে সেল ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যবহার করে (তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের ব্যর্থতার পর) এখন উদ্ভিদের সার্বিক উন্নয়ন ও ফলনে অবিশ্বাস্য ধরনের পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হচ্ছে।

জিনের ডিকোডিং ও ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন (যার দ্বারা কার্যকালে জমির উর্বরতা প্রাকৃতিকভাবে ঘটে থাকে) বিষয়ে বর্তমানের গবেষণা চমকপ্রদ সাফল্য আনছে। মাইক্রো-অর্গানিজম ও টিউবারস অব লেগুমিজ তথা কন্দ বা ছত্রাকের গুটির সাহায্যেই কেবল মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন করা যায়। এটাকে কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে কৃষি-উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে ব্যাপকভাবে—ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে ভূমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর রাসায়নিক সার। তাছাড়া, যে কৃত্রিম কোষ গঠন করা হচ্ছে তার গুণাবলী সেটির পুরুষানুক্রমিক কোষ থেকে স্বতন্ত্র। এগুলি তৈরি করা হচ্ছে একটি লিমফোসাইট (যা তৈরি করে সংক্রমণ-রোধী অ্যান্টিবডি) ও একটি টিউমার কোষের (যার বিকাশ ঘটে অস্বাভাবিক দ্রুত) সংযোগে। এই প্রাপ্ত কোষ ব্যবহৃত হয় নিখাদ অ্যান্টিবডি-প্রোটিন পাওয়ার জন্য, যার সাহায্যে সংক্রামক জীবাণু নিরোধী হয়ে ওঠে অর্গানিজম। উদ্ভিদের স্বাস্থ্য এইভাবে সংরক্ষিত ও বিকশিত হওয়ার ফলে ফসলের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

বিজ্ঞান ও জীববিদ্যার ব্যবহারিক ক্ষেত্র হিসাবে বায়ো-টেকনোলজি এক সুসংবদ্ধ ও বিপ্লবাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে। এই ক্ষেত্রের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহ বিশ্বের খাদ্যোৎপাদন প্রভৃত বৃদ্ধি করবে এবং উন্নয়ন ঘটাবে জীবগত পুনঃসৃষ্টিকারী এনার্জি বা শক্তির সূত্রের এবং ফসিল জ্বালানি সংগ্রহের। এর সাহায্যে ভবিষ্যতে সম্ভব হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং বংশগত ভাইরাস-সৃষ্ট কিংবা ক্যানসার রোগের নিরাময়। সংক্ষেপে বলা যায় যে খাদ্য, শক্তি, কাঁচামাল ও পরিবেশের সংকটের সমাধানে এই শাখার বিজ্ঞান ও কারিগরী অগ্রগতি বিশেষ ভূমিকা নেবে।

শিল্পগত প্রক্রিয়াতে মলিকিউলার বায়োলজি যে ভূমিকা গ্রহণ করছে ও করতে চলেছে, তাকে তুলনা করা চলে নিউক্লিয়ার শক্তি, সেমি-কণ্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিকসের উদ্ভাবন এবং মহাকাশ অভিযানের

গুরুত্বের সাথে। আসন্ন একবিংশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করা হচ্ছে বায়ো-টেকনোলজিক্যাল এজ বা জীবপ্রযুক্তির যুগ হিসাবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বায়ো-টেকনোলজির গুরুত্বপূর্ণ অবদান আসন্ন হয়ে উঠেছে। যেসব ওষুধের এখনও অস্তিত্ব জানা যায়নি, তা' সহজে ও স্বল্প মূল্যে তৈরি হবে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমস্ত ধরনের রাসায়নিক উৎপন্নের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ উৎপাদিত হবে বায়ো-টেকনোলজির সাহায্যে। মিথেন *থেকে প্রাপ্ত অর্গানিক বা জৈব কাঁচামালের ১০-১২ শতাংশ বায়ো-টেকনোলজি থেকে অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে। মলিকিউলার জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং অন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলিতে (বায়ো-কেমিস্ট্রি, বায়ো-মেডিসিন, বায়ো-অর্গানিক কেমিস্ট্রি, বায়ো-ফিজিক্স, বায়ো-*মেকানিকস ও ইমিউনোলজি) বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বগত গবেষণা ও আবিষ্কার কিভাবে নতুন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োগে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে এবং জনগণের জীবনমানের পরিবর্তনে ভূমিকা নিচ্ছে তার অন্যতম নিদর্শন হলো বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং।

(ট) কমপিউটার ও কমপিউটার যুগ

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রথম দিকটা হলো কমপিউটারীয়করণ। বুনিয়াদি বিজ্ঞান থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ অটোমেটেড বা স্বয়ংসাধিত উৎপাদন প্রণালীর সর্বত্রই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে ইলেকট্রনিক কমপিউটার।

কমপিউটার সম্পর্কিত আদিম ধারণা অত্যন্ত দূরবর্তী অতীত হলেও বুলিয়েন অ্যালজেবরাই ইলেকট্রনিক কমপিউটারের তত্ত্বগত ভিত্তি রচনা করেছিল। কমপিউটারের কর্মধারার অন্তর্নিহিত ভিত্তি আবিষ্কারের কৃতিত্ব মহাকবি লর্ড বায়রনের কন্যাকে দেওয়া হয়ে থাকে। এই শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আণবিক গবেষণায় অগ্রগতি কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রয়োগের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত ও সুগম করে তোলে। কমপিউটারের আরও উন্নতকরণ ও সংহতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করে মহাকাশ অভিযানের কাজ। শিল্পে এটির ব্যবহার শুরু হওয়ায় যে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জিত হতে থাকে, তাতে এটির ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক প্রসার এবং বিবিধ ক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটাতে কমপিউটারের চাহিদা ত্বরান্বিত করে এটির বিষয়ে উন্নত গবেষণা ও নির্মাণকে। কমপিউটার গবেষণা ও নির্মাণে ব্যাপক অর্থ বরাদ্দ হতে থাকে এবং কমপিউটার হার্ডওয়ার (যন্ত্রসামগ্রী) নির্মাণ ও উন্নয়ন সৃষ্টি করতে থাকে বিপুল মুনাফা। তা' আবার পুনর্নিয়োজিত হয়ে এটির উন্নয়ন ও প্রসার ঘটিয়ে চলে।

কমপিউটার হার্ডওয়ার ইলেকট্রনিকস-নির্ভর। তার ফলে কমপিউটারের অগ্রগতি যেমন ইলেকট্রনিকস-এর অগ্রগতি ঘটাচ্ছিল, অন্যদিকে ইলেকট্রনিকস-এর অগ্রগতি পরিপূরকভাবে কমপিউটারের উন্নয়ন সাধন করছিল। এই পারস্পরিক-সমর্থক পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়া বর্তমানে এমন অধ্যায় রচনা করেছে যে অটোমেটেড ডিজাইন সিস্টেমের কমপিউটার নিজেই নতুন কমপিউটারের যন্ত্রাংশ, এমনকি সমগ্র নতুন কমপিউটারের সৃষ্টি করছে। মাত্র এক বর্গ সেন্টিমিটার বা তার চেয়েও কম আয়তনের নির্মিত মাইক্রো-কমপিউটার 'চিপস' (ইনটিগ্রেটেড সার্কিট)-এর উদ্ভাবনী থেকে বোঝা যায় এই ধারা কত জটিল, সূক্ষ্ম ও উন্নত স্তরে পৌঁছেছে।

কমপিউটারের প্রথম জেনারেশন মেশিনে ব্যবহৃত হয়েছিল ভ্যাকুয়াম টিউবস। দ্বিতীয় জেনারেশনের কমপিউটারে ব্যবহৃত হয় সেমি-কণ্ডাক্টরস ও ট্র্যানজিস্টরস; তৃতীয় জেনারেশনে সিম্পল ইনট্রিগ্রেটেড সার্কিটস (এস. আই. সি.); চতুর্থ জেনারেশনে লার্জ স্কেল ইনটিগ্রেটেড সার্কিটস (এল. আই. সি.)। পঞ্চম জেনারেশন কমপিউটার নির্মিত হয় প্রধানত সুপার-লার্জ ইনটিগ্রেটেড সার্কিটের সাহায্যে। এই সমগ্র উন্নয়ন ও বিকাশের কালপর্ব মাত্র ৪৫-৪৬ বছর জুড়ে।

সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শিল্পে প্রধানত প্রযুক্ত হতে থাকে উৎপাদনের যান্ত্রিকীকরণ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য অটোমেশন এবং নতুন টেকনোলজিক্যাল প্রসেস-এর ব্যবস্থাপনা। এগুলির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ জীবন্ত শ্রমের পরিমাণকে ক্রমশ হ্রাস করে চলে। এই কাজ প্রথমত সাধিত হতে থাকে কমপিউটারের সাহায্যে। আধুনিক কমপিউটার ব্যবস্থায় সুপার-কমপিউটার থেকে মাইক্রো-

প্রসেসর পর্যন্ত স্তর রয়েছে। অজস্রতা সত্ত্বেও কমপিউটারের প্রধান তিনটি স্তর রয়েছে। লার্জ ডিজিটাল কমপিউটার প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক কোটি অপারেশন সম্পন্ন করে; মিনি-কমপিউটার প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ অপারেশন সাধন করে; মাইক্রো-কমপিউটার করে প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত অপারেশন। এই ধরনের কমপিউটারগুলিতে রয়েছে একটি এরিথমেটিক ও লজিক প্রসেসর, একটি দ্রুত গতি মেমরি, একটি বাল্ক স্টোরেজ মেমরি (পঠন মাত্র), নিয়ন্ত্রণসমূহ এবং ডাটা এন্ট্রি ও রিট্রিভাল সিস্টেম। লার্জ ও মিনি-কমপিউটারের তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্টোরেজের জন্য রেকর্ড রাখা হয় চৌম্বক ডিস্ক ও চৌম্বক টেপ-এ, মাইক্রো-কমপিউটারের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্যারিয়ারে। বাল্ক স্টোরেজ মেমরি হলো কমপিউটেশন প্রোগ্রামের রিপোজিটরি বা ক্ষিপ্র প্রযুক্তি এবং ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল ও টেকনোলজিক্যাল প্যারামিটার বা মানদণ্ড ও কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক। এটাকে ডাটা বেস বলা হয়। অদূর ভবিষ্যতে এই ডাটা বেস রূপান্তরিত হতে চলেছে নলেজ বেসে। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অজস্র জটিল কিন্তু উন্নত থেকে উন্নততর ও বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ ব্যবস্থা কমপিউটারের জন্য গৃহীত হতে শুরু করেছে।

কমিউনিকেশন ব্যবস্থায় লার্জ ও সুপার কমপিউটার স্বয়ং নেট-ওয়ার্ক গঠন করে। সময়ের সাশ্রয়, কাজের সমবন্টন, ব্যবহারকারীদের অজস্র ধরনের তথ্য পাওয়ার সুযোগ প্রভৃতির প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং তার ফলে ঘটে সময়, শ্রম ও অর্থের বিপুল সাশ্রয়।

টেকনোলজিক্যাল প্রসেস ও উৎপাদনের উপর অটোমেটেড কনট্রোলের জন্য মিনি-কমপিউটার ব্যবহৃত হয়। একে বলা হয় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এম. আই. এস.) ও কমপিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম (সি. এ. এম.)।

মাইক্রো-প্রসেসর সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় মেশিনারি, ইক্যুইপমেন্ট ও টেকনোলজিক্যাল ব্যবস্থাপনায় এবং এটির কাজ সাধারণ হলেও নিয়ন্ত্রণ সর্বোচ্চ। বিশাল প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় উৎপাদনের ক্ষেত্র, ওয়ার্কশপ, প্রোডাকশন ইউনিট ও সেগুলিতে চালু সমস্ত যন্ত্র, উৎপাদিত সামগ্রী মজুত, নির্গমন থেকে শুরু করে ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত প্রত্যেকটি ও সমগ্র ব্যবস্থাগুলিকে মাইক্রো-প্রসেসর যুক্ত করে এবং মাইক্রো-প্রসেসরগুলিকে কেন্দ্রীয়ভাবে মিনি-কমপিউটারের সাহায্যে সমন্বয় করা হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে কমপিউটারের ব্যবহার বর্তমানে সর্বব্যাপক। কমপিউটারের অতি উচ্চগতিসম্পন্ন ভূমিকা, সুবিশাল মেমরির ব্যবস্থা এবং নির্ধারিত মানদণ্ড আগে থেকে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থার ফলে বহু জটিল সমস্যার সমাধান এটি যোগাতে পারে। মানব-সমাজের জ্ঞানের প্রসারে কমপিউটারের সাহায্যে ম্যাথামেটিক্যাল প্রসেস মডেলিং সাহায্য করছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে কমপিউটারের ব্যবহার (ফলাফল যাই হোক না কেন), বর্তমানের উন্নত ও জটিল বৈজ্ঞানিক তৎপরতার যুগে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে ঘটছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, নতুন হাই-এনার্জি পার্টিকেলস, কৃত্রিম জিনের সৃষ্টি, মেনথানল থেকে ফুড প্রোটিন উৎপাদন, বৃহদায়তন ও অতিকায় আয়তনের ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ইত্যাদি আবিষ্কার, উদ্ভাবন বা গঠন সম্পন্ন হয়েছে এই ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য নিয়ে। অতীতে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রাপ্ত তথ্য মূল্যায়ন করতে বা ফল নির্ধারণ করতে মাসাধিক কাল পর্যন্ত সময় বহু বিজ্ঞানীর লাগতো, তা' কমপিউটারের সাহায্যে বর্তমানে কয়েক ঘন্টায় ও সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। কমপিউটিং ম্যাথামেটিক্স-এর অভ্যুদয় ও উন্নতিসাধন, যার গভীর ক্ষমতা রয়েছে ডিজিটাল, গ্রাফিক ও টেক্সট ইনফরমেশন মূল্যায়নের জন্য, ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিংকে শক্তিশালী গবেষণা প্রণালীতে পরিণত করেছে।

বহু ফিজিক্যাল ল'জ বা পদার্থিক নিয়মের ডিফারেনশিয়াল বা পার্থক্যমূলক ও ইনটিগ্রাল বা সংযুক্তিমূলক কাঠামো সুদীর্ঘকাল ধরে জটিল গাণিতিক ইক্যুয়েশন বা সমীকরণকে সমাধানহীন অবস্থায় ফেলে রেখেছিল। ইলেকট্রনিক কমপিউটারের সাহায্যে সেগুলির অনেকগুলির গাণিতিক জটিলতার সমাধান পাওয়া সহজসাধ্য হয়েছে। প্রচলিতভাবে কোয়ান্টিটেটিভ মেথড বা পরিমাণগত পদ্ধতি (যেমন ফিজিক্স, জিওগ্রাফিকস, মেকানিকস ও ইকনমিকস ইত্যাদি) ব্যবহার করার স্তরেই কেবল

নয়, যেখানে কোয়ালিটেটিভ বা গুণগত অথবা ডেসক্রিপটিভ বা বিবরণাত্মক (যেমন কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, জিওলজি, মেডিসিন, লিঙ্গুইস্টিকস ইত্যাদি) পদ্ধতি অবলম্বিত হয় কলা ও বিজ্ঞানের সেইসব শাখা ও ক্ষেত্রেও ইলেকট্রনিক কমপিউটারের সহযোগিতায় সক্রিয় ও সাফল্যমণ্ডিত ফল পাওয়া যাচ্ছে।

কোন বৈজ্ঞানিক আইডিয়া বা চিন্তার স্তরের আবিষ্কারকে বাস্তবে প্রতিপাদন করতে দরকার রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (আর. এণ্ড ডি.) বা গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থাপনা। আইডিয়া থেকে উৎপাদনে তার প্রয়োগে, আর. এণ্ড ডি. এখন একটি নির্দিষ্ট ও বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। আইডিয়া একবার স্বীকৃতি অর্জন করলে, বর্তমানে ইলেকট্রনিক কমপিউটার এইডেড ডিজাইন (সি. এ. ডি. বা ক্যাড) তথা কমপিউটারের সাহায্যে তার আকল্প রচনা সম্ভব হচ্ছে। ক্যাডের কতকগুলি নির্দিষ্ট ও ক্রমিক স্তর রয়েছে, সেগুলি ধারাবাহিকভাবে সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করে তবে পরিণতি অর্জন করতে হয়। সমীক্ষা, নক্সা, নির্মাণ, প্রকল্প, প্রভৃতি ছাড়াও অটোমোবাইল, ডিজেল ইঞ্জিন, রেফ্রিজারেটর, টি. ভি সেট ইত্যাদি থেকে শুরু করে কৃত্রিম উপগ্রহ পর্যন্ত ক্যাড ব্যবস্থায় ডিজাইন বা আকল্প করা হচ্ছে।

আধুনিক কমপিউটারের সাহায্য-গৃহীত উৎপাদন-ব্যবস্থাপনাতে থাকে কমপিউটার, একটি সেনসর প্রণালী ও একটি ড্রাইভ প্রণালী। এগুলি যথার্থ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণ ও সময়ানুগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; এর ফলে উৎপাদন প্রণালীতে যথাযথ সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাস করা যায়। এই ব্যবস্থায় উৎপাদন হয়ে উঠছে অনেক নিপুণ ও সমৃদ্ধ। এতে বহুলাংশে কমছে উৎপাদনের অপচয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদনের অপটিমাইজেশন বা ক্ষমতার সর্বোচ্চতার স্তরকে ব্যবহার করা সম্ভবপর হচ্ছে।

গৃহস্থালী স্তরেও কমপিউটারের ব্যবহার ও সেটির ভূমিকা দ্রুতই নতুন মাত্রা অর্জন করছে। ইলেকট্রনিকস, বিশেষত মাইক্রো-প্রসেসর এখন সংযুক্ত করা হচ্ছে পূর্বস্থিরীকৃত বা প্রোগ্রামড ওয়াশিং মেশিনে, স্বয়ংক্রিয় টিউনিং সহ টেলিভিশন সেটে, ক্যালকুলেটর, ভি. ডি. ও., টেপরেকর্ডার ও অন্য বহু সামগ্রীতে। এটি গৃহস্থালী সামগ্রীর এক ধরনের 'ইনটেলেকচ্যুয়ালাইজেশন' বা বোধিসত্ত্বকরণ। এতে গৃহস্থালী শ্রমের সাশ্রয় ঘটছে, যা ব্যবহৃত হচ্ছে বিশ্রাম বা বিনোদনে অথবা সামাজিক উৎপাদনে।

(ঠ) অটোমেটেড কল ও যন্ত্রপাতি থেকে পরিপূর্ণ অটোমেটেড ব্যবস্থা

সভ্যতার সুদূর অতীত থেকে মানুষ যে আদিম যন্ত্রসামগ্রী নির্মাণ শুরু করেছিল, তার উদ্দেশ্য ও ব্যবহার ছিল শ্রমকে সহজতর করা। পরবর্তীকালে বায়ু, জল, বাষ্প, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবহার করে মানুষ নতুন নতুন ও উন্নত ধরনের যন্ত্র তৈরি করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে শ্রমকে সহজ করা থেকে শুরু করে শ্রমশক্তি কম ব্যবহার করে বেশী ফল পাওয়া, সময়ের সাশ্রয়, বহু ধরনের কাজ করা, সম্পাদিত কাজে নিপুণতা, স্থায়িত্ব প্রভৃতিতে অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষকে বাদ দিয়ে যন্ত্র স্বয়ং কোন ভূমিকা নেয়নি, নিতে পারেনি। এমনকি আধুনিক মালটিপারপাস বা বহুমুখী মেশিন-টুলসের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। তারপর এসেছে অটোমেটেড মেশিন-টুলস। যথার্থ ও ক্রমাগত ব্যবহারের উপযোগী উৎপাদিত পণ্যের নিয়মিত আধুনিকীকরণে দরকার হয় বিজ্ঞান ও কারিগরী অগ্রগতির। তাই এই চাহিদা ও গতির সাথে মিলিয়ে সর্বাধুনিক অটোমেটেড মেশিন-টুলসকে আরও এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে উন্নত অটোমেটেড এবং দ্রুত রি-অ্যাডজাস্টেবেল বা পুনঃসংস্থাপনযোগ্য টেকনোলজিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট ক্রমাগত উদ্ভাবন ও যুক্ত করে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু উৎপাদনের ও উৎপাদন-প্রণালীর অবিশ্বাস্য ও অবিরাম পরিবর্তন ও বিপুল চাহিদার ফলে ও পরিমাণগত বৃদ্ধির প্রয়োজনে এবং একই সাথে শ্রম ও সময় সংক্ষেপের প্রয়োজন মেটাতে উৎপাদনের সমগ্র প্রণালীতে—কাঁচামাল ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ থেকে শুরু করে নির্মিত সামগ্রীর লেভেলিং, প্যাকেজিং, স্টোরেজ ও প্রথম ডিস্ট্রিবিউশনের মুহূর্ত পর্যন্ত—অটোমেটেড ব্যবস্থার পত্তন ঘটে যায়। অবশ্য এই ব্যবস্থা কোন একটি পণ্যের দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদনের জন্য কেবলমাত্র ব্যবহৃত হতে পারে—ক্ষেত্র বিশেষে সেই হোমোজিনিয়াস প্রোডাক্ট-এর যৎসামান্য পরিবর্তনের সংস্থান রেখে। সমকালের

ম্যাস-প্রোডাকশন ও তার পরবর্তী স্তর লার্জ-সিরিজ ম্যানুফ্যাকচার অর্থাৎ অনেকগুলি পরপর জটিল স্তরের বিন্যাসে বিশাল পরিমাণ উৎপাদনে এই ব্যবস্থা ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

অটোমেটেড প্রোডাকশন সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। লার্জ-সিরিজ ম্যানুফ্যাকচারে অটোমেটেড ব্যবস্থা কঠোর, নির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃতভাবে কার্যকরী হয়। প্রোগ্রাম, প্রোগ্রাম কন্ট্রোল, সমস্ত অটোমেটেড যন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়, কমপিউটার টেকনোলজির ব্যাপক ব্যবহার, অপরিহার্য কায়িক শ্রমের অংশের ক্ষেত্রে রোবনিক্স-এর ও রোবটের তথা যন্ত্রমানবের ব্যবহার, সেল্‌ফ মনিটরিং, ফ্লেক্সিবল অটোমেশন—পণ্যের মানগত উন্নয়ন বা পরিবর্তনের প্রয়োজনে ফ্লেক্সিবল প্রোডাকশন মডেল, ফ্লেক্সিবল অটোমেড লাইন ও সেকশন, ফ্লেক্সিবল অটোমেটেড শপ এবং এমনকি ফ্লেক্সিবল অটোমেটেড এন্টারপ্রাইজেস ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে অটোমেটেড সিস্টেম। এ কথা ঠিক যে এই ব্যবস্থাতেও মানুষের উপস্থিতি ও ভূমিকা, তা' যত সামান্যই হোক, পরিপূর্ণভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে না। কেননা শুরুতেই মানুষকে ডিজাইন ও প্রোগ্রামিং যেমন সূত্রপাত করে দিতে হচ্ছে, সর্বশেষ স্তরেও মানুষের নজরদারী, এমনকি অন্তর্বর্তী অধ্যায়গুলিতে মানুষের পর্যবেক্ষণ এখনও থাকছে। তবে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মনুষ্য শ্রমশক্তির ব্যবহার ক্রমশ শূন্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কারিগরী বিপ্লবের অজস্র ও আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক সৃষ্টি হয়েছিল এই কালপর্বে। সেসব বিষয়ে বিশেষ আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। তবে সামান্য কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক চুম্বকে কেবল উল্লেখ করা যেতে পারে। ফ্রিকশন বা ঘর্ষণজনিত কারণে শক্তি ও সাধ্যের যে লোপ, ক্ষতি ও অপচয় ঘটে, তা' যথাসম্ভব অবসানের জন্য যন্ত্রে ব্যবহৃত ধাতুর উপরিভাগের নবায়ন, ঘর্ষণ যথাসম্ভব অপসারণমূলক প্রযুক্তি ও যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছে। মেটালার্জি বা ধাতুবিদ্যাতে নতুন যুগ আনছে পাউডার টেকনোলজি। ধাতু-চূর্ণ ধাতুর চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী ও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করছে। তাছাড়া ফুয়েল সেভিং বা জ্বালানি সাশ্রয়কারী প্রযুক্তি ও যন্ত্র এবং অন্যদিকে সেকেণ্ডারি এনার্জি রিসোর্সের ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানে ঘটেছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। তারই পাশে ওয়েস্ট বা বর্জ্য থেকে কাঁচামাল ও এনার্জি সৃষ্টির সাফল্যও বিশাল। বিশ্বকে একদিকে যেমন আগামী সহস্রাব্দ পর্যন্ত জ্বালানি সংকট থেকে মুক্তি দেওয়ার পথে শেষোক্ত তিনটি অবদান সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণে এগুলি উল্লেখযোগ্য উপাদান যোগাবে। বর্তমানে মোটামুটি ৮০টি ধাতু, ১০৪টি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম এলিমেন্ট এবং কয়েকশত আইসোটোপ মানুষের কাছে জ্ঞাত আছে। এগুলির নতুন নতুন সংমিশ্রণে বা সমন্বয়ে একদিকে যেমন অগ্রগতি ঘটছে, পাশাপাশি প্রকৃতিতে নেই এমন ধাতু আবিষ্কারের চেষ্টাও চলছে। ধাতু বাঁচিয়ে অবলম্বিত হচ্ছে নতুন উৎপাদন প্রণালী। প্লাস্টিক ইতোমধ্যেই নতুন যুগের সূচনা করেছে। বিশেষত প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার অপসারণ করে কৃত্রিম তন্তুর গুরুত্বপূর্ণ বিকাশসহ অজস্র নির্মাণ সামগ্রী, রঙ, ধাতুর উপরিস্তর সংরক্ষণসহ নানাবিধ কাজে এই প্রযুক্তি ও সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে।

সমকালে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান এবং বৃহত্তর বিকাশের জন্য তৎপরতা

যখন রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক স্তরে আপাত অনির্ণীত ভবিষ্যৎ ও জটিলতায় বিশ্বের তিন রাজনৈতিক শিবির—সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও তৃতীয় দুনিয়ার জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি—নিজের নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দারুণভাবে ব্যস্ত ও বিব্রত, তখন কিন্তু সমাজ বিকাশের নিয়ম অপেক্ষা করে নেই। অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তখনো আদৌ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েনি, উৎপাদিকা শক্তির সামনে সৃষ্ট বাধা অতিক্রম করার মত সুযোগ তৈরি করতে তারা সম্পূর্ণ সক্ষম এবং মূলধনের সহজাত প্রবৃত্তি—মুনাফাকে অটুট রাখাই নয়, তাকে বর্ধিত করার মত ক্ষমতাও পুঁজিবাদের যথেষ্টই ছিল। এ কারণে স্বীয় ব্যবস্থার আঙ্গিকের ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য সাম্রাজ্যবাদের প্রচেষ্টার অবধি ছিল না। এক্ষেত্রে তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব

তাদের বিশেষ সহায়ক হয়। এস. টি. আর. এবং বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ব্যবহার করে পুঁজিবাদ তথা শোষণের এই পর্যায়ে বিকাশের আলোচ্য অধ্যায়টি এবারে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বহুজাতিক সংস্থা

সমসাময়িককালে পুঁজিবাদের উল্লেখযোগ্য দিক হলো—এটির 'ফিনান্স ক্যাপিটাল' বা লগ্নী পুঁজির স্তরটির অতীতের চেয়ে অনেক উচ্চপর্যায়ে এবং বহুলাংশে নিরঙ্কুশ চরিত্র নিয়ে কেন্দ্রীভবন ও বিশ্বজনীনীকরণের প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হওয়া। দেশের অভ্যন্তর ও বিদেশ থেকে সংগৃহীত বিপুল মুনাফাকে দেশের ভেতরে পুনরায় বিনিয়োগ করার পরও যে অতিকায় উদ্বৃত্ত থাকছিল, পুঁজিবাদ সেটিকে স্থায়ী বিশ্ব-লগ্নীর প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করছিল। মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন বা বহুজাতিক সংস্থা (এম. এন. সি.) ও মালটিন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বা বহুজাতিক ব্যাঙ্ক (এম. এন. বি.) ব্যবস্থার বা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার মাধ্যমেই প্রধানত পুঁজির এই নতুন চরিত্রের কেন্দ্রীভবন ও বিশ্বায়ন সম্পাদিত হতে থাকে।

আসলে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ও মালটিন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ভূমিকাকে কেন্দ্রে রেখে নব-পর্যায়ের পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার তৎপরতা শুরু হয় তা' ছিল প্রধানত 'ফিনান্সিয়াল সেক্টর' বা টাকার বাজারের ক্ষেত্রভিত্তিক। অন্যত্র—যেমন শিল্প উৎপাদন, কৃষি উৎপাদন, শ্রম-ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তেমন ব্যাপৃত প্রথমদিকে ছিল না। কেননা, শেষোক্তগুলি পূর্বে বর্ণিত রিয়েল ইকনমির ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে তখনও সীমাবদ্ধ ছিল। সে কারণে সদ্য-উদ্ভিন্ন নতুন বিশ্ব-অর্থনীতিকে 'ফিনান্সিয়াল ইকনমি' বা মুদ্রা-প্রধান অর্থনীতি বলা হচ্ছিল। কোন দেশ বা জনগণের স্বার্থের প্রতি সামান্যতম দায়িত্ববদ্ধতার পরিবর্তে কেবলমাত্র মুনাফা এবং তা' সর্বাধিক দ্রুততার সাথে অতি-মুনাফার চরিত্র-বিশিষ্ট হওয়ায় এটিকে 'ফাস্ট ট্র্যাক ইকনমি' বা দ্রুত দৌড়ের অর্থনীতিও বলা হতো। তার অর্থ এই নয় যে রিয়েল ইকনমি যেমন ছিল, তেমনই চলছিল। ফাস্ট ট্র্যাক ইকনমি দ্রুত রিয়েল ইকনমির পরিসরে আগ্রাসন শুরু করে দেয়।

একথা সত্য যে ফিনান্সিয়াল ইকনমির কেন্দ্রে অবস্থানকারী বহুজাতিক সংস্থার মালিকানারও স্বীয় দেশ থাকে। সুতরাং সেই অর্থে সংশ্লিষ্ট জাতীয় অর্থনীতির সাথেও থাকে এদের সম্পর্ক। পাশাপাশি একথাও সত্য যে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির উৎপাদনের কাঠামো-জাল ক্রমশ বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হচ্ছিল। ফলে, সাধারণভাবে এই শক্তিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা ক্রমশ দুরূহ হচ্ছিল কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের আইন-কানুনের দ্বারা। সেই অর্থে এই অর্থনীতি ক্রমশই অন্য এক তৃতীয় বিন্দু থেকে সবল অস্তিত্ব সঞ্চয় করে নিয়ে ভূমিকা নিতে থাকে—যাকে বলা যায় 'একজিস্টস্ ফ্রম উইদাউট'। তার ফলে এই শক্তি ক্রমশই হয়ে উঠছিল স্বয়ংশাসিত। বুর্জোয়াদের নেশন-স্টেট বা জাতীয়-রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ··ত্বকে এড়িয়ে এক ধরনের সুপ্রা-স্টেট বা নতুন ধরনের অতি-রাষ্ট্রের চরিত্রের অভিমুখে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে থাকে এম. এন. সি.গুলি। বাহ্যত বহুজাতিক সংস্থার সংগঠনিক কাঠামো ও চরিত্র হলো—এটি কোন নির্দিষ্ট একটি নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় না, কোন একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এদের নিয়ন্ত্রণ করে না এবং কোন একটি নির্দিষ্ট সংস্থা এদের পরিচালিত অর্থনীতির মধ্যে সমন্বয় করে না। কিন্তু এই উপাদানগুলি থেকে ব্যবস্থাটিকে নৈরাজ্যবাদী মনে করার কারণ নেই। কেননা, নির্দিষ্ট অন্তর্নিহিত লক্ষ্য তৈরি হচ্ছিল বহুজাতিক সংস্থা-ব্যবস্থার। আর্থিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক দ্রুততার সাথে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন এই ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় চালিকা শক্তি হয়ে উঠতে থাকে।

গঠনাত্মক স্তরের এই নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কিছুটা অনুধাবন করার লক্ষ্যে বহুজাতিক সংস্থার চরিত্র সম্পর্কে বিতর্কের বিভিন্ন দিক প্রথমে কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য সত্ত্বেও এর দ্বারা প্রসঙ্গটিকে বিভিন্ন দিক থেকে বুঝবার কিছুটা সুবিধা হতে পারে।

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণে সেই সময়ে বিতর্ক

স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিভিন্ন নামে বহুজাতিক সংস্থাকে অভিহিত করা হচ্ছিল—ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন, ট্রান্সন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ, ট্রান্সন্যাশনাল ফার্ম, মালটিন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ, মালটিন্যাশনাল

ফার্ম, ইন্টারন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ, মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন প্রভৃতি। এই অর্থনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যত বিতর্ক, আলোচনা প্রভৃতি তখন চলেছিল, অন্য কোন আর্থ-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনা দেখা যায়নি। রাষ্ট্রসংঘের সেন্টার অন ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন প্রায় এক দশক কাজ করার পরও কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে স্থির করতে পারেনি। রাষ্ট্রসংঘের ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল কাউন্সিল মোটা দাগে এটিকে বলেছিল, "সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান, যাঁরা দুই বা ততোধিক দেশে সম্পদের কর্তৃত্ব করে যেমন,—কারখানা, খনি, বিক্রয় দপ্তর, এবং অনুরূপ।" সাধারণভাবে এ জাতীয় সংস্থা হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছিল সেগুলিকেই যেগুলি অন্ততঃপক্ষে বিদেশের একটি উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অবশ্য হারভার্ড বিজনেস স্কুলের মালটিন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ প্রোজেক্টের পক্ষ থেকে সেগুলিকেই বহুজাতিক বলা হয়েছিল, যেগুলির ন্যূনপক্ষে ৬টি দেশে সাবসিডিয়ারি বা সম্পূরক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। 'ট্রান্সন্যাশনাল' শব্দটি রাষ্ট্রসংঘ ব্যবহার করলেও, বিকাশের ধারাতে মালটিন্যাশনাল হলো প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী অস্তিত্ব। একটি মাত্র দেশের মালিকানাভিত্তিক ও বহু দেশে সম্পূরক প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা হলো এটির ট্রান্সন্যাশনাল স্তর; ক্রমে একাধিক দেশের মালিকানা ও বহু দেশে সম্পূরক প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন ব্যবস্থায় উপনীত কর্পোরেশনকেই মালটিন্যাশনাল চরিত্র বিশিষ্ট বলে বিবেচনা করা উচিত, যদিও এই বক্তব্য সর্বজন স্বীকৃত নয় এখনো। এটাও শুরুতে স্মরণ রাখতে হবে যে আলোচ্যকালে বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগের ও সম্পূরক সংস্থার এক-চতুর্থাংশ মাত্র ছিল তৃতীয় দুনিয়াতে, অবশ্য তা' অতি দ্রুত বাড়ছিল।

মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য দুই দিক থেকে এটিকে বিচার দরকার। প্রথমত, এটির পরিমাণগত ক্ষমতা, যেমন কোম্পানির আকার-আয়তন এবং বিশ্বের উৎপাদনে অংশ, বিদেশে বিনিয়োগ, প্রযুক্তি সৃষ্টি, আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব। দ্বিতীয়ত, গুণমানগত দিক অর্থাৎ বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রধান প্রবণতা ও উপাদানগুলির সাথে সেটির সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা ও অবদানগত ভূমিকা। তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনায় উপরোক্ত প্রবণতা দু'টি ব্যাখ্যা করার বিস্তারিত সুযোগ নেই। তবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন ঘরানা এই প্রসঙ্গে যেসব অভিমত ব্যক্ত করছিল, তার কিছু দিক উত্থাপন করলে প্রসঙ্গটি কিছুটা পরিষ্কার হবে বলে আশা করা যায়।

বহুজাতিক সংস্থার চরিত্রের বিষয়ে সমকালের থিওরিগুলি

'মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন' এবং 'মালটিন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' তথা যথাক্রমে এম. এন. সি. ও এম. এন. বি.-র চরিত্র প্রসঙ্গে বিশ্ব-অর্থনীতিবেত্তাদের মতামত উত্থাপনের পূর্বে, পুঁজিবাদের স্বাভাবিক নিয়ম সম্পর্কে মার্কসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন সামনে থাকা দরকার। 'গ্রুনডিসি' গ্রন্থে মার্কস বলেছেন যে পুঁজিবাদী উৎপাদকরা ক্রমে মনে করে যে রাষ্ট্রের সীমানা হলো সেই "প্রতিবন্ধক, যা অতিক্রম করা জরুরী"। তিনি তাঁর, 'এ কনট্রিবিউশন টু দা ক্রিটিক অব দা পলিটিক্যাল ইকনমি'তে বলেছেন যে পুঁজিপতিরা পণ্য-মালিক হওয়ায় অতি দ্রুতই "পরিণত হয় কসমোপলিটনে" (তথা বহুজাতিকে অর্থাৎ নানা দেশকে তারা স্বদেশ মনে করে)। মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের প্রধান কেন্দ্রীয় প্রবণতা ছিল এই দু'টি বিষয়ে—দেশের সীমা অতিক্রম করার ও বহুদেশীয় হওয়ার।

মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন সম্পর্কে আলোচ্যকালের অর্থনৈতিক গবেষক ও তাত্ত্বিকদের মতামতকে প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এম. এন. সি.-র ভূমিকার সমর্থনে অ-মার্কসবাদীদের (যাঁর মধ্যে প্রধানত রয়েছে রিউবার, মিয়ের, ভেরনন্, রাগম্যান, বালসুব্রামনিয়াম প্রমুখ) তত্ত্ব যা পরিচিত হয়েছিল 'নিও-ক্ল্যাসিকাল' বলে এবং মার্কসবাদীদের (যেমন ওয়ারেন, ইমানুয়েল, স্টিকার প্রমুখ) তত্ত্ব যা 'নিও-ফাণ্ডামেন্টালিস্ট' নামে পরিচিত ছিল। এম. এন. সি.-বিরোধী হিসাবে অ-মার্কসবাদীদের (বার্নেট, মূলার, স্ট্রিটেন, লাল, ডেইটস, হেলেইনার, নিউফার্মার প্রমুখ) তত্ত্ব তথা 'গ্লোবাল-রিচ' থিওরি এবং মার্কসবাদীদের (বিশেষত পল সুইজি, ব্যারান, ম্যাগডফ, গিরভান, স্যাঙ্কেল, ফ্র্যাঙ্ক, আমিন প্রমুখ) তত্ত্ব যা ছিল 'নিও-ইম্পিরিয়ালিজম' নামে পরিচিত। কাঠামোগতভাবে এই নামকরণ করা হলেও, এই

ভাগগুলির অভ্যন্তরে ঐ সব অর্থনীতিবেত্তারা স্বীয় আলোচনাতে যেসব পথ অনুসরণ করেছিলেন, সেগুলিকে বিশেষ নামে অভিহিত করেছিলেন নিজেরা। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করা দরকার, তৎকালের সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিবিদদের আলোচনাকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এখানে সাধারণভাবে চেষ্টা হয়েছে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মতামত তুল্যমূল্যে অতি সংক্ষেপে উত্থাপনের।

নিও-ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গি

এঁদের বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে এম. এন. সি. আন্তর্জাতিক স্তরে সম্পদের দক্ষ বন্টনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের আর্থিক মঙ্গলকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে। এম. এন. সি.-র মাধ্যমে বিদেশ থেকে পুঁজির আমদানিকে এঁরা 'ক্যাপিটাল ফ্লো মডেল' বলে অভিহিত করে বলেছিলেন যে, এর দ্বারা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানটির লাভ ইত্যাদি বাদ দেবার পরও আশ্রয়দাতা দেশটির জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় দুনিয়ার 'ভিসাস সার্কেল অব পভার্টি' বা 'দারিদ্র্যের ভয়ঙ্কর বৃত্ত'কে এম. এন. সি. ভেঙ্গে দেয়। এম. এন. সি.-র উপস্থিতির ফলে আশ্রয়দাতা দেশটির অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় ও বৈদেশিক মুদ্রার অপ্রতুলতা দূর হয়। নিও-ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গির মতে, আশ্রয়দাতা দেশটির সর্বাধিক লাভজনক দিক হলো কারিগরী ও ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞতা বৃদ্ধি ও দেশীয় শ্রমিকদের এম. এন. সি.গুলির দ্বারা ট্রেনিং দেওয়ার মাধ্যমে নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রাপ্তি। এম. এন. সি. অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিপূরক ভূমিকা নেয়, অব্যবহৃত সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য করে ও নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে। নিও-ক্ল্যাসিকালদের তরফ থেকে এম. এন. সি.-র মাধ্যমে পুঁজি ও সম্পদের বিশ্বজনীনীকরণ দৃষ্টিভঙ্গিকে 'ইন্টারন্যাশনালাইজেশন থিওরি', 'কনটেম্পোরারি অর্থডক্স অ্যাপ্রোচ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এইসব বক্তব্যের কেন্দ্রীয় মর্ম ছিল যে বিশ্ব-বাজারের বিকাশের অসম্পূর্ণতার জন্যই এম. এন. সি.-র উদ্ভব ঘটেছে। কারিগরী শক্তির ব্যবস্থার, সর্বাধুনিক তথ্যের সঞ্চালন প্রভৃতি ভূমিকাকে কেন্দ্রে রেখে এম. এন. সি. অনুন্নত অর্থনীতির অসম্পূর্ণতাকে দূর করে এবং অর্থনীতির বিশ্বায়ন ঘটায়। তৃতীয় দুনিয়া যেহেতু এই সব ব্যাপারে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় পিছিয়ে আছে, সুতরাং এম. এন. সি. অধিকতর মঙ্গল করে থাকে তৃতীয় দুনিয়ার। তৃতীয় দুনিয়ার কাছে বর্তমানে জ্ঞাত বা প্রাপ্ত ও সম্ভাব্য অন্য যে কোন সুযোগের চেয়ে এম. এন. সি.-র দ্বারা পুঁজির বিনিয়োগ সবচেয়ে উত্তম সুযোগ, স্বভাবতই শ্রেয়।

গ্লোবাল-রিচ্ দৃষ্টিভঙ্গি

পূর্বোক্ত নিও-ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের এম. এন. সি.'র সপক্ষে বক্তব্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলো বুর্জোয়া আর্থনীতিক পণ্ডিতদের এই অংশ। এঁরা এম. এন. সি.-র চরিত্রকে 'অলিগপলিস্টিক' (অর্থাৎ অল্প সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে ও সমন্বয় সাধন করে এক সামগ্রিক ভূমিকা পালন) বলেছিলেন। এঁদের আলোচনার ধারা পরিচিত হয়েছিল 'ন্যাশনালিস্ট অ্যাপ্রোচ', 'ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ', 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অরগানাইজেশন অ্যাপ্রোচ' প্রভৃতি নামে।

এম. এন. সি.কে তাঁরা সম্পদ প্রসারের শক্তির পরিবর্তে বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগের রণনীতিগত ব্যবস্থা হিসাবে বিচার করেছেন। বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগের রণনীতি হলো লগ্নী পুঁজির (সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির) নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানোর মাধ্যম। এম. এন. সি.-র পক্ষ থেকে বাজার দখলের ক্ষমতা এক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা নেয়। এই বাজার দখলের ক্ষমতায় বলীয়ান হওয়ার পেছনে রয়েছে এদের ক্রমবর্ধমান ও অগাধ পুঁজি অর্জনে অবাধ শক্তি, প্রযুক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞাপন ও বৈচিত্রপূর্ণ পণ্যের দ্বারা বিক্রয় করার শক্তি এবং কাঁচামাল পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী অবস্থান। কারিগরী স্তরে এইসব প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়াপনা কার্যকালে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি হিসাবে কাজ করে। ফলে এম. এন. সি. পূর্ববর্ণিত 'প্রোডাক্ট-সাইকল'-এর তথা আশ্রয়দাতা দেশটির বিকাশের কারক শক্তি হওয়ার পরিবর্তে 'মনোপলি সাইকল' বা নিজেদের পক্ষে গুছিয়ে নেওয়ার শক্তিতে পরিণত হয় এবং কার্যকালে দেশীয় পুঁজি ও শিল্পের সর্বনাশ করে। এম. এন. সি. অসম্পূর্ণ বাজার সম্পূর্ণ করার পরিবর্তে আরও অসম্পূর্ণতা ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। একচেটিয়াপনার জোরে এরা জাতীয় শিল্পের উপর নানা বাধাদানকারী শর্ত

আরোপ করে সেগুলিকে কোণঠাসা করে। ক্রেতার প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন ও সরবরাহের পরিবর্তে এরা গড়ে তোলে নিজ উৎপাদিত পণ্য-নির্ভর ক্রেতা-চাহিদা। কোন কোন ক্ষেত্রে এই জাতীয় পণ্য-উৎপাদন স্থানীয় পরিস্থিতির পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে বিকৃত ও কৃত্রিম বাজারও সৃষ্টি করে। মানুষকে সেই বাজারের ক্রেতা হতে বাধ্য করে এম. এন. সি.গুলি। এই প্রক্রিয়ায় তারা জাতীয় উৎপাদন শিল্পকে, ধীরে ধীরে চাপ সৃষ্টি করে, বি-রাষ্ট্রীয়করণ করে ফেলে। সামগ্রিকতায় বিচার করলে বলা যায় যে, স্থানীয় সম্পদের সহায়ক ভূমিকা নেওয়া অথবা অব্যবহৃত সম্পদের ব্যবহার করা বা প্রকৃত নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা যা দেশীয় জনগণের কাছে প্রকৃত প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হতে পারে, সেসব কাজ আদৌ এম. এন. সি. করে না।

নিও-ফাণ্ডামেন্টালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি

তৎকালের প্রায় এক দশক ধরে এই ধারার বিতর্কে মার্কসবাদীদের একাংশ দেখাবার চেষ্টা করছিলেন যে তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে এম. এন. সি.-র ভূমিকা হলো একান্তভাবেই ইতিবাচক। তাঁরা বলেছিলেন যে পুঁজিবাদ সর্বকালে উৎপাদনের শক্তিগুলির উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য বস্তুগত ভিত্তি সৃষ্টি করতে ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে থাকে; এম. এন. সি. পুঁজিবাদের সংশ্লিষ্ট স্তরে সেই ভূমিকা পালন করে চলেছে অর্থাৎ ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনের পথকে প্রশস্ত করছে তারা। তাছাড়া মার্কস যেভাবে ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের আগমনকে আশীর্বাদ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, সেই আলোচনার সূত্র ধরে এঁরা বলেছিলেন যে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি তৃতীয় দুনিয়ায় প্রবেশ করে অবশিষ্ট প্রাচীন সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্কের, বিশেষত সামন্ততন্ত্রের, অবসান ঘটাবে এবং দেশটির পুঁজিবাদের অসম্পূর্ণতাকে পরিপূরণ করে নতুন বিকাশের শর্ত ও ধারা সৃষ্টি করবে। পশ্চাৎপদ দেশে এম. এন. সি.-র উপস্থিতি আধুনিক শিল্পের সাথে আধুনিক শিল্প-শ্রমিক তথা সর্বহারা শ্রেণী সৃষ্টি করবে। ক্রমে শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে উঠবে বিপ্লবী সংগ্রাম। উদ্বৃত্ত পুঁজিকে পুঁজি-রপ্তানির মূল কারণ হিসাবে লেনিনের ব্যাখ্যা খারিজ করে দিয়ে এঁরা দাবী করেন যে পুঁজির প্রতিদ্বন্দ্বিতাই দেশের ভৌগোলিক সীমাকে ভেঙ্গে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ার প্রাথমিক কারণ হিসাবে কাজ করছে। এইভাবে তৃতীয় দুনিয়ার উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায় এম. এন. সি. ও কার্যকালে আশ্রয়দাতা দেশের পুঁজি, শিল্প ও উৎপাদনের "পরনির্ভরশীলতার" পরিবর্তে সেগুলিকে তারা স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। এঁরা মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের স্তরকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে এটি সাম্রাজ্যবাদের পরিমাণগত ও আগ্রাসী বিকাশের স্তর নয়, পরিবর্তে এটি হলো সাম্রাজ্যবাদের গুণগত বিকাশের অধ্যায়। তবে, তাঁদের দাবী ছিল যে তাঁদের বক্তব্যকে এম. এন. সি.-র সমর্থক বলে ভেবে নেওয়া ঠিক নয়, বরং বুর্জোয়া এম. এন. সি.-সমর্থকদের থেকে পৃথকভাবে দেখতে হবে তাঁদের। আসলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রাম করতে হলে শত্রুর শক্তিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে মালটিন্যাশনালের যথার্থ চরিত্র ও ভূমিকা সবার জানা দরকার; এই ছিল সংক্ষেপে, নিও-ফাণ্ডামেন্টালিস্টদের দাবী।

নিও-ইমপিরিয়ালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি

মার্কসবাদী এই অংশের বক্তব্য প্রধানত দাঁড়িয়েছিল লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত তত্ত্বের উপর। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখতে হবে, কমিন্টার্ন তথা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ১৯২৮ সালের কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করে কলোনী তথা পদানত দেশগুলির শিল্পোন্নয়নের সামনে সাম্রাজ্যবাদকে প্রধান বাধা হিসাবে ঘোষণা করেছিল। অবস্থার মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিও-ইমপিরিয়ালিস্ট গোষ্ঠী এম. এন. সি.কে দুনিয়ার অগ্রগতির সামনে গুরুত্বপূর্ণ বাধা এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সামনে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে মনে করেছিলেন। লেনিন পুঁজিবাদের সর্বশেষ বাস্তবতাকে দেখেছিলেন মূলধনের ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের মধ্যে এবং শিল্পের উপর একচেটিয়াপনার প্রতিষ্ঠা, পুঁজি রপ্তানি ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধনের ভিতরে। এই স্তরটির কেন্দ্রীয় উপাদান হিসাবে লেনিন দেখিয়েছিলেন যে প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শিল্প-ব্যবস্থার উপর একচেটিয়াপনার প্রতিষ্ঠা

ব্যাপক মুনাফা বাড়িয়ে যায়; কিন্তু রাষ্ট্রের নানা হস্তক্ষেপের জন্য এই সঞ্চিত মুনাফার ব্যবহার কঠিন হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতাই বিদেশে পুঁজি রপ্তানির শর্ত সৃষ্টি করে। লগ্নী পুঁজির পরগাছা চরিত্র ও একচেটিয়া পুঁজির ক্ষয়িষ্ণু অন্তর্বস্তু বিদেশে গিয়ে কার্যকালে, স্বভাবতই, কোন প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে না।

এম. এন. সি. সম্পর্কে 'নিও-ইমপিরিয়ালিস্ট'-দৃষ্টিভঙ্গি, সাধারণভাবে, লেনিনের পূর্বোক্ত বক্তব্যের কিছুটা পরিবর্তিত আকারে 'সারপ্লাস ক্যাপিটাল থিওরি' বা উদ্বৃত্ত মূলধনী তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়েছিল। এঁরা দেখিয়েছিলেন যে এম. এন. সি.-র সূতিকাগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক উদ্বৃত্তের প্রবণতা বিরাজমান। উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও পুঁজির একচেটিয়াপনা সৃষ্টির ফলে পণ্যের দাম কমে না। এই একচেটিয়াপনা মূল্যের প্রতিযোগিতা অবরুদ্ধ করে দেয়, ফলে দাম ও উৎপাদন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য বাড়তে থাকে। এর দ্বারা সমাজে নিম্ন ভোগের অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে কম পণ্য ক্রয়ের প্রবণতা বাড়ে। স্বভাবতই মন্দার প্রক্রিয়া নেয় স্থায়ী রূপ। এই পরিস্থিতি থেকে একচেটিয়া পুঁজির মধ্যে অর্থনৈতিক স্তরে দুই ধরনের বিকল্প প্রবণতা সৃষ্টি হয়— আন্তর্জাতিক স্তরে পুঁজির প্রসার অথবা অনেকগুলি একচেটিয়া পুঁজিপতির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে সংযুক্তি সাধন করে একটি সংঘবদ্ধ রূপ নিয়ে পুঁজির প্রসার। ক্ষেত্রবিশেষে এই দুই প্রবণতা ও সমন্বিত হয়। একেই তাঁরা বলেছেন মালটিন্যাশনাল ব্যবস্থা।

তৃতীয় দুনিয়ায় বিদেশী বিনিয়োগকে নিও-ইমপিরিয়ালিস্ট গোষ্ঠী 'ব্লকিং অব ডেভেলপমেন্ট' বা 'উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা', কেউবা 'ডেভেলপমেন্ট অব আনডার-ডেভেলপমেন্ট' বা 'অনুন্নয়নের উন্নয়ন' ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। পূর্বে নিও-ক্ল্যাসিকালরা যেভাবে বলেছেন যে এম. এন. সি. তৃতীয় দুনিয়ায় বিদেশী মুদ্রার সমস্যা কাটায় ও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বাড়ায়, তার বিরোধিতা করে এঁরা দেখিয়েছেন যে তৃতীয় দুনিয়ায় সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যকে (মুনাফা) এম. এন. সি. পাচার করে নিজ দেশে বা অন্য দেশের ব্যবসায়। একে তাঁরা বলেছিলেন 'ড্রেইন অব সারপ্লাস'। তার ফলে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের আরও ঘাটতি ঘটে। কখনো বা যদি অর্জিত মুনাফা আশ্রয়দাতা দেশেই এম. এন. সি. পুনর্বিনিয়োগ করে, তখন সেটা ঘটে স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিকে অপসারণ করে কিংবা গিলে ফেলে অথবা দেশের অভ্যন্তরে অন্য নতুন এলাকায় নিজেদের ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিয়ে। এর ফলে ঐ দেশের শিল্প কোণঠাসা হতে শুরু করে। স্থানীয় পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হতে হতে ক্রমে মন্দা সৃষ্টি করে। এই সমগ্র পরিস্থিতি জাতীয় পুঁজিপতিদের 'ডিপেনডেন্ট' বা নির্ভরশীল, 'কমপ্রাডর' বা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার স্থানে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অপর আর একটি যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এম. এন. সি.-র লক্ষ্য করেছিলেন তাঁরা, তা' হলো জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবনধারণের সামগ্রী উৎপাদনের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তদের জন্য বিলাস-সামগ্রী উৎপাদনে প্রধানত পুঁজি বিনিয়োগ করে এরা।

মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের সম্প্রসার স্বয়ং অসম বিকাশের এক ধরনের কারণ হিসাবে কাজ করে। তৃতীয় দুনিয়ার ব্যাপক সংখ্যক দেশগুলির মধ্যে কেবলমাত্র এক ক্ষুদ্র সংখ্যক দেশে এম. এন. সি. তৎকালে পুঁজি বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত করছিল। কেননা নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ব্যতিরেকে এম. এন. সি. তৃতীয় দুনিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগে অনিচ্ছুক ছিল তখন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্তরে স্থায়ী গ্যারান্টি তারা আগে বুঝে নিতো। অন্যদিকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির অগ্রগতির স্তর এমনিতে এক ছিল না, ছিল নানা অসমান বাস্তবতা। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে এম. এন. সি.-র এই ধরনের নির্বাচিত তৎপরতার ফলে তৃতীয় দুনিয়ার কোন কোন দেশ কৃত্রিম উন্নয়ন করে ফেলতে সক্ষম হচ্ছিল, যদিও এই উন্নয়ন ছিল বাহ্যিক এবং জনগণের সুবিপুল অংশই ছিল এই সুযোগ থেকে বাইরে। এইভাবে কোন কোন দেশ তখন অবতীর্ণ হচ্ছিল 'নিউলি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজিং কান্ট্রি' বা 'নব-শিল্পোন্নয়নরত দেশ' হিসাবে অথবা উন্নত দেশগুলির 'ইন্টারমিডিয়েট সেমি-পেরিফেরি কান্ট্রিজ' বা মধ্যবর্তী আধা-প্রান্তীয় দেশ হিসাবে। এর ফলে, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির পরস্পরের

মধ্যেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের ফারাক বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সংক্ষেপে এই ছিল নিও-ইমপিরিয়ালিস্টদের বক্তব্য।

বহুজাতিক সংস্থার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের সম্পর্ক, তৃতীয় দুনিয়ার সম্পর্ক, শ্রমের সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি আরও কতকগুলি মৌলিক নতুন দিক তখন থেকেই সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল। সেগুলি নিয়ে অর্থনীতিবেত্তাদের মধ্যে মতপার্থক্যও ঘটে। সেগুলি কিছুটা আলোচনা না করলে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন তথা ঘনায়মান নতুন বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ বিচার অনেকটাই অস্পষ্ট থেকে যায়। কিন্তু তার আগে পূর্বোক্ত তত্ত্বমূলক আলোচনাগুলির কিছু কিছু উপাদান সম্পর্কে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য, তথ্যগত বাস্তবতার দিকে কিছুটা নজর দেওয়া দরকার।

বহুজাতিক সংস্থার অর্থনৈতিক শক্তি

১৯৮০-এর দশকের শুরুর কালে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি বিশ্বের শিল্পোৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ, বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্ধেকের বেশী অংশ এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির নতুন হার্ডওয়ার ও টেকনোলজির পেটেন্টগুলির ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতো। ৪০০টির মত বহুজাতিক সংস্থা, যাদের প্রত্যেকের বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য ২ বিলিয়ন ডলারের বেশী, তারা নিয়ন্ত্রণ করতো বিশ্বের সামগ্রিক অর্থনৈতিক তৎপরতার সিংহভাগ। দেশের বিচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০টি প্রধান এম. এন. সি. সে দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের ৫০ শতাংশ, জাপানের ৪টি অতিকায় এম. এন. সি. ৯৬টি শিল্পের ৬০ শতাংশ, ৬৭টি শিল্পের ৭০ শতাংশ ও ৪৬টি শিল্পের ৮০ শতাংশ, ইতালিতে ১টি কোম্পানি মোটরশিল্পের ৯০ শতাংশ ও আর একটি কোম্পানি পিগ আয়রনের ৯৪ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৯৮৩ থেকে '৯০ সালের মধ্যে পুঁজিবাদী দুনিয়ার শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক গতির চেয়ে চারগুণ বেশি দ্রুততায় ও বার্ষিক বিশ্ব-বাণিজ্যের গতির চেয়ে তিনগুণ বর্ধিত হারে মালটিন্যাশনালরা বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল। সেই সময়ে বিশ্বের মোট ৩৫ হাজার এম. এন. সি. ও ১ লক্ষ ৭০ হাজার সাবসিডিয়ারির অর্ধেক ছিল আমেরিকা, জাপান, জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ডের। বিশ্বের উৎপাদিত মূলধনী সম্পদের ২৫ শতাংশের মালিক ছিল সর্বোচ্চ ৩০০টি এম. এন. সি.। বিদেশে এম. এন. সি.-র বিনিয়োগ বৃদ্ধির চরিত্র ছিল এই রকম ঃ ১৯৪১ সালে ৪১.৬ বিলিয়ন ডলার, ১৯৬৭ সালে ১০৮ বিলিয়ন ডলার, ১৯৮৪ সালে ৬০০ বিলিয়ন ডলার ১৯৯০ সালে ১৫০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়।

তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্প-উৎপাদনের উপর এম. এন. সি.-র মালিকানা ছিল (সত্তরের দশকে) নিম্নরূপ ঃ চিলির ২৫ শতাংশ, আর্জেন্টিনার ৩৩ শতাংশ ৩৯-৪৪ শতাংশ মেক্সিকো, ব্রাজিল, পেরু, কলম্বিয়া ও মালয়েশিয়ার;৮৩ শতাংশ সিঙ্গাপুরের। মুষ্টিমেয় কয়েকটি এম. এন. সি. নিম্নলিখিত সামগ্রীর বিশ্ব-বাজারের নিয়ন্ত্রণ করতো নিম্নোক্ত হারে ঃ চিনি ও ফস্‌ফেটের ৬০ শতাংশ; চাল, কলা, প্রাকৃতিক রবার, খনিজ তেল ও টিনের ৭০-৭৫ শতাংশ; গম, কফি, ভুট্টা, কোকো, আনারস, কাঠের গুড়ি, তুলা, তামাক, খনিজ লৌহ, বক্সাইট প্রভৃতির ৮০-৯০ শতাংশ। শিল্প বা কৃষিতে শুধু নয় পরিষেবা ক্ষেত্রে এম. এন. সি. আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক ব্যবসা শুরু করে ষাটের দশকের শেষার্ধ থেকে। ১৯৭০ সালে এই ক্ষেত্রে তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৭৭ বিলিয়ন ডলার, ১৯৮৫ সালে তা' দাঁড়ায় ৫৪০ বিলিয়ন ডলার।

এবারে মালটিন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলির শক্তি কিছুটা লক্ষ্য করা দরকার। ১৯৮৫ সালে আমেরিকার প্রধান ১০০টি এম. এন. বি.-র সম্পদের পরিমাণ ছিল ১,৭৫১ বিলিয়ন ডলার, যা আমেরিকার সর্বোচ্চ ৫০০টি এম. এন. সি.-র সম্পদের চেয়ে বেশী। নিম্নোক্ত দেশগুলি সংশ্লিষ্ট মোট ব্যাঙ্কের আমানতের উপর এম. এন. বি.-র কর্তৃত্বের চরিত্র ছিল এইরকম ঃ ব্রিটেনে ৪টি মালটিন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আমানত অন্য সব ব্যাঙ্কগুলির আমানতের ৭৫ শতাংশের বেশী, বেলজিয়ামে ৩টির ৯০ শতাংশের বেশী, জাপানে ৬টির ৬৫ শতাংশের বেশী।

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির ধাত্রী দেশগুলির মধ্যে পরিবর্তনের দিকটিও হয়ে উঠতে থাকে নতুন বিশ্বজনীন উদীয়মান অর্থনীতির একটি লক্ষণীয় দিক।

১৯৬৪ সালে বিশ্বের মোট এম. এন. সি.-র ৬০ ভাগ আমেরিকার, ৩০ ভাগ পশ্চিম ইউরোপের ও ৯ ভাগ ছিল জাপানের। ১৯৭৬ সালে তা' যথাক্রমে দাঁড়ায় ৫২, ৩১ ও ১২ ভাগে, এবং ১৯৮০ সালে ৪৭, ৩৪ ও ১৩ ভাগে। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের চিহ্নও প্রকটিত হচ্ছিল ক্রমশ।

বহুজাতিক সংস্থা কেবল অর্থনৈতিক শক্তি নয়

মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনকে কেবলমাত্র এক অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা ভুল বলে ক্রমশই অনুমিত হচ্ছিল। স্বভাবতই এটা বোঝা যাচ্ছিল উদীয়মান নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার ধারণা গঠনকে শুধুমাত্র অর্থনীতির বিচারের মধ্যে থামিয়ে রাখা এক ধরনের ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত প্রবণতা। একারণেই প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার অন্যান্য দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করার আগে বিশ্ব-অর্থনীতির প্রবণতা নিয়ে তত্ত্বগত বিরোধের যে কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ—পুঁজির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তথা কেন্দ্রীভবন—সে বিষয়ে মার্কসের একটি বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। মার্কস তাঁর 'দা পভার্টি অব ফিলজফি' পুস্তকে লিখেছেন, "বাস্তব জীবনে আমরা কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, একচেটিয়াপনা ও তাদের মধ্যে শত্রুতাই লক্ষ্য করি না, এই দু'য়ের মধ্যে সিনথেসিস বা সংশ্লেষণও দেখতে পাই, যা কিন্তু কোন ফর্মুলা (অর্থাৎ গাণিতিক সূত্র) নয়, একটি মুভমেন্ট (তথা গতি)। একচেটিয়াপনা সৃষ্টি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্ম দেয় একচেটিয়াপনার।... এই সংশ্লেষের চরিত্র এমনই যে একচেটিয়াপনা নিজের স্থিতি চালিয়ে যেতে পারে ক্রমাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে যুক্ত হয়ে।" আলোচ্য কালে গড়ে ওঠা নতুন আন্তর্জাতিক আর্থ-প্রবণতা নিয়ে নানা বিতর্ক প্রসঙ্গে এই নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

সেই সময় থেকেই ক্ষুরধার বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছিল মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ও (বুর্জোয়াদেরই সৃষ্ট) নেশন-স্টেট তথা জাতীয়-রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে। এই নিয়ে এত গভীর সব প্রশ্ন দেখা দিচ্ছিল, যা ভবিষ্যতে সত্যে পরিণত হলে চারশ' বছরের প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক রূপটাই পাল্টে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ-দার্শনিক টমাস হব্‌স, সদ্য-অভ্যুদিত বুর্জোয়া জাতীয়-রাষ্ট্রের স্বরূপ দেখে সেটিকে গ্রীক পুরাণের মহাশক্তিশালী সামুদ্রিক দানবের নামে নামকরণ করেছিলেন 'লেভিয়াথান' বলে। সেই তুলনায় আজকের একচেটিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অকল্পনীয় শক্তিধর। কিন্তু আধুনিক সেই 'লেভিয়াথান'ও নতুন বিশ্বের মুখোমুখি হয়ে অনেকটাই যেন ম্রিয়মান হতে শুরু করেছিল।

বুর্জোয়া-রাষ্ট্রের চরিত্রে স্টেট মনোপলি ক্যাপিটালিজম (এস. এম. সি.) গড়ে উঠতে শুরু করে প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) কালে। লেনিন 'রিভিশন অব দা পার্টি প্রোগ্রাম'-এ বলেছেন, "যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করেছে একচেটিয়া পুঁজিবাদ থেকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হতে।" প্রধানত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ-ভিত্তিক জাতীয়-রাষ্ট্রগুলিই বহুজাতিক সংস্থাগুলির উদ্ভবের ও শুরুর বিচরণ-ক্ষেত্র হয়েছিল। পরবর্তীকালে এম. এন. সি.-গুলি অন্য রাষ্ট্রে নিজের ভূমিকাকে প্রসারিত করতে থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রের সাথে এম. এন. সি.-র সম্পর্ক বিচারের প্রশ্নে প্রতিষ্ঠানগুলির স্বদেশী রাষ্ট্র ও বিদেশী রাষ্ট্রের, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার, সাথে সম্পর্ক বিচার শুরু হয়েছিল।

বহুজাতীয় সংস্থার রাষ্ট্রের উপর কব্জা করার কৌশলগুলি

তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রের সাথে এম. এন. সি.-র সম্পর্ক, ভূমিকা ও ক্ষমতা কি, তা' আলোচ্য কালের ইতিহাস থেকে প্রথমে আভাস নেওয়া যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক শাসকশ্রেণী তথা সাম্রাজ্যবাদের তিনটি প্রধান হাতিয়ার—কূটনীতি, সামরিক শক্তি ও গুপ্তচর বৃত্তির সাথে এম. এন. সি. চতুর্থ হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছিল। এম. এন. সি. যতখানি আর্থ-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও শক্তি, প্রায় ঠিক ততখানিই আবির্ভূত হচ্ছিল রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে। তিনভাবে এরা রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করছিল। নিজেদের প্রয়োজনীয় লক্ষ্য হাসিল করতে নিজ দেশে রাষ্ট্রের বৈদেশিক-নীতি নির্মাণে এরা কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছিল। একইভাবে স্বদেশী রাষ্ট্রের গৃহীত বৈদেশিক

নীতি বিদেশী রাষ্ট্রগুলিতে বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হচ্ছিল এম. এন. সি.গুলি; নিজেদের 'কর্পোরেট ডিপ্লোম্যাসি' বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের কূটনীতি তারা সর্বত্র—স্বদেশে ও বিদেশে, সর্বক্ষণের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন পথ ও মাধ্যমে তারা এই ভূমিকা সম্পাদন করতে থাকে। নিজেদের স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে যেসব দেশে এম. এন. সি.গুলি পুঁজি বিনিয়োগ করেছে সেইসব রাষ্ট্রের সরকারী বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও একাত্মতা স্থাপন, দেশগুলির বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে অর্থ সাহায্য, সংশ্লিষ্ট দেশে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে 'লবি' বা সমর্থক গোষ্ঠী গঠন এবং দুর্নীতিমূলক তৎপরতা, গণমাধ্যমকে ব্যবহার, পারস্পরিক আলোচনার জন্য স্থায়ী আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সরকারগুলিকে বাধ্য করা ইত্যাদি ছিল এম. এন. সি.গুলির অন্যতম কাজ।

এই ধরনের অবলম্বিত বিভিন্ন তৎপরতার প্রমাণ হিসাবে তৃতীয় দুনিয়ার কিছু ঘটনাবলী উল্লেখের দরকার। গুয়েতেমালার আরবেনজ সরকার, ইরানের মোসাদ্দেক সরকার, জ্যামাইকার ম্যানলে সরকার, চিলির আলেন্দে সরকার প্রভৃতি এম. এন. সি.-বিরোধী সরকারগুলিকে পূর্বোক্ত ধরনের তৎপরতার মাধ্যমে পতন ঘটানো হয়েছিল। গ্যাবনের রাষ্ট্রপতি অ্যালবার্ট বোঙ্গেকে একটি বহুজাতিক ব্যাঙ্কের শেয়ার হোল্ডারে পরিণত করা হয়; টোগোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট সিলভানুস অলিম্পিয়োর পুত্রকে এবং কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি জোমো কেনিয়াট্টাকে বহুজাতিক সংস্থার বোর্ডের সদস্য করা হয়েছিল; ভেনেজুয়েলার জাতীয় খনিজ তেল কোম্পানির সভাপতি অ্যান্টোনিও টেপেডিনো একটি এম. এন. সি. থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেতেন। নাইজিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য সংগ্রহ করে একটি এম. এন. সি. আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সি. আই. এ.কে সরবরাহ করতো। রাষ্ট্রসংঘের নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালের বর্ণ-বিদ্বেষী সরকারগুলিকে সর্বাত্মক সাহায্য করতো এম. এন. সি.গুলি। আন্তর্জাতিক এম. এন. সি.গুলির চাপে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড সরকার তাদের প্রস্তাবিত 'ইনকাম পলিসি' বা আয়-নীতি বাস্তবায়িত করতে পারেনি; এদের চাপে পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সের সংশ্লিষ্ট কালের সরকার স্বদেশে রূপায়িত করতে পারেনি শিল্প-ব্যবস্থাপনায় ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণের সুযোগ দেবার প্রস্তাবিত নীতিকে।

বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক ব্যর্থতা

এম. এন. সি.'র ক্ষমতা খর্ব করার জন্য বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার উদ্যোগ কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সেই তথ্যও অন্য দিক থেকে প্রমাণ করেছিল তাদের রাজনৈতিক শক্তির স্বরূপকে।

সত্তরের দশকে এম. এন. সি. সম্পর্কে আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক সমালোচনা ও বিরূপ মনোভাব এম. এন. সি. সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে আচরণ-বিধি তৈরি করার উদ্যোগ নিতে বাধ্য করছিল নানা আন্তর্জাতিক মঞ্চকে। ১৯৭২ সালে, আন্তর্জাতিক পুঁজির এক প্রতিষ্ঠান—ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্স, মূলধনের বিনিয়োগ সম্পর্কে এক আচরণ-বিধি তৈরি করে; কিন্তু তা' কার্যকালে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের বিরুদ্ধে ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির পক্ষেই যায়। ১৯৭৬ সালে ও. ই. সি. ডি. (অরগানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট)-এর ঘোষণাপত্র, যা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও বহুজাতিক সংস্থা বিষয়ক বলে পরিচিত তাও কার্যকালে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত হয়। একইভাবে এম. এন. সি.-র চাপে তাদের বিরোধী কোন প্রসঙ্গ কখনো আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়নি। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা এম. এন. সি.-র আচরণবিধি সম্পর্কে, যেমন আই. এল. ও. (সামাজিক নীতি বিষয়ে), আংটাড (নিষেধাজ্ঞামূলক বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ও কারিগরী হস্তান্তর সম্পর্কে), হু (মাতৃ-দুগ্ধের বিকল্প বাজারীকরণ সম্পর্কে) নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের 'কমিশন অন ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন' বহুজাতিক সংস্থাগুলির আন্তর্জাতিক আচরণ-বিধির জন্য ব্যাপক আলাপ-আলোচনাও চালিয়েছিল। কিন্তু সবই অকার্যকর থেকেছে।

বহুজাতিক সংস্থাগুলির পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র, হার ও পরিমাণ, শিল্পের শেয়ারের অংশীদারিত্বের স্বরূপ, লাভের হার ও পরিমাণ ও তা' বিদেশে প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে, সত্তরের দশকে, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারত, ব্রাজিল, জাম্বিয়া, ফিলিপাইনস, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো ইত্যাদি বহুবিধ

বিধি-নিষেধমূলক আইন নিজ নিজ দেশে চালু করেছিল। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে এই রাষ্ট্রগুলি সেসব প্রায় সবই তুলে দিতে বাধ্য হতে থাকে। ১৯৭০ সালে এম. এন. সি.-র বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ঘটেছিল বলিভিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু ও ভেনেজুয়েলা (শেষোক্তটি ১৯৭৩ সালে যুক্ত হয়েছিল) প্রভৃতি দেশের সম্মিলিত 'অ্যানডিয়ান প্যাক্ট'-এর 'ডিসিশন ২৪'-এর মাধ্যমে। 'কমন ট্রিটমেন্ট ফর ফরেন ক্যাপিটাল, ট্রেড মার্কস, পেটেন্টস, লাইসেন্সিং এগ্রিমেন্টস অ্যাণ্ড রয়ালটিজ' শিরোনামে যথেষ্ট কঠোর ও কার্যকরী আইন দেশগুলিতে গৃহীত হলেও, তা' সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার চাপে শেষ পর্যন্ত কার্যত উঠেই যায়।

রাষ্ট্র বনাম বহুজাতিক সংস্থার দর-কষাকষির শক্তি

এম. এন. সি.-র কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশ-ভিত্তিক আইন প্রণয়ন অথবা আইন প্রয়োগ যে সব দেশে সম্ভব হয়নি সেগুলির কোথাও কোথাও বাণিজ্যিক বা উৎপাদনের ক্ষেত্র ধরে ধরে এম. এন. সি. ও রাষ্ট্রের মধ্যে দর-কষাকষির মাধ্যমে চুক্তি করা এক ধরনের ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হতে শুরু করেছিল। দর-কষাকষির ব্যবস্থা সাধারণভাবে দুই স্বাধীন পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই, অপরের তুলনায়, কিছু সুবিধাজনক অবস্থান থাকে। তার উপরে দাঁড়িয়েই দর-কষাকষি চলে। যার শক্তি ও সুবিধা বেশী, চুক্তির মাধ্যমে সেই পক্ষই দৃঢ়তর অবস্থান পায়। উভয়ের কিছু ভাল ফল পাওয়ার সুযোগ না থাকলে কোন দর-কষাকষি বা চুক্তি হতে পারে না। কোন কোন দেশের সরকার ও এম. এন. সি.-র মধ্যে দর-কষাকষির ভিত্তিতে সম্পাদিত অজস্র চুক্তির নজির নিয়ে আর্থ-বিষয়ক পণ্ডিতরা বহু আলোচনা তখন করেছিলেন। দর-কষাকষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাড়তি সুযোগ ও ক্ষমতা মেনে নিয়ে প্রথমদিকে রাষ্ট্রের শর্তে এম. এন. সি.-র পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করার ঘটনা সাধারণভাবে ষাট ও সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঘটেছিল। কিন্তু পরবর্তী কাল থেকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ঐসব চুক্তির মধ্যে রাষ্ট্রের অনুকূল অধিকাংশ শর্তই পাল্টে যেতে শুরু করে। এম. এন. সি.গুলি নিজেদের অনুকূলে নানা শর্ত আদায় করে নিতে থাকে। আশির দশক থেকে রাষ্ট্রের চাইতে, সাধারণভাবে, অধিকতর শক্তিশালী পক্ষ হিসাবে অবতীর্ণ হয় এম. এন. সি.গুলি। এই সময়কাল থেকে সংঘটিত চুক্তিগুলি সাধারণভাবে এম. এন. সি. আরোপিত শর্তেই সম্পাদিত।

রাষ্ট্র ও মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের মধ্যে শক্তির তুল্যমূল্য বিচারের আর একটি মাপকাঠি হলো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 'ন্যাশনালাইজেশন' বা রাষ্ট্রীয়করণের নিরঙ্কুশ অধিকারের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল তা' বিচার করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবস্থান এক সময়ে তৃতীয় দুনিয়ার ওপর এম. এন. সি.-র চাপকে প্রতিহত করতো এবং বিকল্প ব্যবস্থার সংস্থান করার সুযোগ দিতো; ফলে, তৃতীয় দুনিয়ার বহু রাষ্ট্রের পক্ষে দর-কষাকষির ক্ষমতায় মোক্ষম ব্যবস্থা হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে এম. এন. সি.-র সাবসিডিয়ারি জাতীয়করণ করে নেবার দাপটকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব ছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে সারা বিশ্বে মধ্য-সত্তরের দশকে—১৯৭৪ সালে ৬৮টি মালটিন্যাশনাল সাবসিডিয়ারি ও ১৯৭৫ সালে ৮৩টি অনুরূপ সংস্থার রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল। তারপর ১৯৭৭-৭৯ সময়কালে বছরে গড়ে মাত্র ১৬টি করে জাতীয়করণ ঘটতে থাকে অর্থাৎ শুরু হয় এই ব্যবস্থা দ্রুত কমার প্রবণতা। পরে তা' শূন্যে পরিণত হয়। তবে প্রথমাবধি এম. এন. সি.গুলি রাষ্ট্রীয়করণের সময় পুরো ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতো। রাষ্ট্রীয়করণের কারণগুলি অবশ্য খুব সামান্য ক্ষেত্রেই এম. এন. সি.কে শায়েস্তা করার ক্ষমতা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পেরেছিল; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়করণ ঘটছিল এম. এন. সি.-র পরোক্ষ প্রয়োজনে অথবা রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদ সংহত করার স্বার্থে। কেননা, দেখা গেছে যে রাষ্ট্রীয়করণগুলি কেবল ক্ষতিপূরণ দিয়েই শেষ হয়নি, রাষ্ট্রীয়করণের পরও মালটিন্যাশনালদের নানা স্বার্থের সূতো সেগুলিতে জুড়ে দেওয়া হতো।

জাতীয়-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়ের সূত্রপাত

উত্থীয়মান নতুন বিশ্ব-বাস্তবতার পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রনৈতিক স্তরের কাঠামো সম্পর্কে পৃথিবীর

এক উল্লেখযোগ্য অংশের আর্থনীতিক পণ্ডিতদের অভিমত গড়ে উঠছিল যে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন প্রক্রিয়া জাতীয়-রাষ্ট্রের বর্তমান ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে অপসারণ করে এক 'ওয়ার্লড ফেডারেল গভর্নমেন্ট' সৃষ্টির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই মন্তব্যের পেছনে অন্যতম কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল যে এম. এন. সি.-র আন্তর্জাতিক স্থিতিস্থাপকতা যে কোন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত করে সারা দুনিয়া জুড়ে তাদের অর্থ ও সামগ্রীকে ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা সৃষ্টি করছে। এর ফলে রাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত ফিসকাল ও মনিটারী পলিসি ক্রমশ অকার্যকর হয়ে পড়ছে। একটি দেশের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার সমস্ত সুযোগকে এম. এন. সি.-রা কারচুপিপূর্ণ দর-স্থানান্তরের (ট্রান্সফার-প্রাইজিং) মাধ্যমে আত্মসাৎ করার ক্ষমতা রাখে। পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও জাতীয় 'কেইনসিয় নীতি'র সাফল্য তখন দ্রুত অধোগামী হচ্ছিল। মার্কসবাদীরা এম. এন. সি.-র ভূমিকা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রগুলির অবস্থানকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। একদিকে উন্নত যেসব ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এম. এন. সি.-র পীঠস্থান, সেইসব রাষ্ট্র নিজস্ব মূলধন, বিশেষত, বহুজাতিক সংস্থার পুঁজির আন্তর্জাতিক স্বার্থকে সর্বতোভাবে রক্ষা ও প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, অন্যদিকে তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি যারা বিদেশী মূলধনের দ্বারা ক্রমশ দমিত হচ্ছে। শেষোক্ত দেশগুলিতে বিদেশী পুঁজি সর্বদাই গোঁড়াপন্থী শক্তিগুলির সাথে করে থাকে প্রতিক্রিয়াশীল সমঝোতা, রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলগুলির সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে, দুর্নীতি, ঘুষ ইত্যাদির দ্বারা পক্ষে টেনে আনে দেশীয় প্রভাবশালী অংশকে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে বাগে আনতে এম. এন. সি. উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের সরকারগুলির দ্বারা তীব্র চাপ সৃষ্টি করে নানাভাবে। এইভাবে এম. এন. সি. তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে কেবল নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে না, ক্ষেত্র-বিশেষে তারা ঐসব রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠমোর পরিবর্তন করতেও বাধ্য করে। মধ্য '৬০-এর দশকে লাতিন আমেরিকা ও আরও কিছু দেশে স্বৈরশাসনের প্রতিষ্ঠা শেষোক্ত বক্তব্যের নিদর্শন। এ'কারণে সামরিক জুন্টা-সরকারগুলিকে 'মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের রাজনৈতিক দল' বলে চিহ্নিত করা হতো।

উদীয়মান বিশ্ব-ব্যবস্থায় নতুন বিভাজনের প্রক্রিয়া

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সর্বাগ্রে পুঁজিবাদের উৎপাদন-সম্পর্ক ও শ্রেণী-সম্পর্ক রক্ষা ও বিকাশের হাতিয়ার। পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক চরিত্রের একান্ত বাহক হলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এটা লক্ষ্য করা যায় তিনটি স্তরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে—উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় পুঁজি ও শ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার (দ্বন্দ্বের) মধ্যে, উদ্বৃত্ত-মূল্য বণ্টনের প্রসঙ্গে আন্তঃমূলধনী-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং আন্তঃশ্রম-প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। নিও-ইমপিরিয়ালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির মার্কসবাদীরা দেখান যে এম. এন. সি.-র ব্যাপক প্রসার কার্যকালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূলধনের আরও উন্নত ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের একটি স্তর। এটার সাথে যুক্ত হচ্ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতার আরও সংহতিসাধনের তৎকালীন পরিস্থিতি। আমেরিকার মত উন্নত 'জাতীয়-রাষ্ট্রের' শক্তির ক্রমোচ্চ সংহতকরণের উদ্দেশ্যে ও স্বার্থে যৌথভাবে (কর্পোরেট) আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজনের ব্যবস্থাও তীব্র হতে শুরু করেছিল। এই প্রক্রিয়াতে প্রয়াস নেওয়া হচ্ছিল এমনভাবে যাতে তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা দাঁড়ায় সরবরাহকারীর বা দ্বিতীয় শ্রেণীর। গবেষণা ও উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, উচ্চ দক্ষতা এবং উচ্চ মজুরির সমস্ত চাকুরী ও বৃত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রকে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির একান্ত কর্তৃত্বে ও আয়ত্তে রাখার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল। তবে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে এই চেষ্টাও শুরু হয় যাতে একটি মধ্যবর্তী স্তর তৈরি করা যায়; তৃতীয়-দুনিয়ার কিছু রাষ্ট্র আরও উন্নত হয়ে উন্নত দেশগুলির ঠিক পরের স্তরে আধা-সীমান্ত (ইন্টারমিডিয়েট সেমি-পেরিফেরি) স্তরে যাতে উন্নীত হয় এবং যারা উন্নত দুনিয়ার কাছ থেকে তুলনামূলকভাবে কিছু বেশী সুযোগ পাবে। এইভাবে তিনটি স্তরে আন্তর্জাতিক নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতা সৃষ্টির জন্য উদ্যোগ শুরু হয়েছিল।

বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই ধরনের নূতন বিভাজনের প্রস্তাবে (যা সাম্রাজ্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও অনুন্নত দেশমূলক বিভাজনের চেয়ে স্বতন্ত্র) কার্যত একই নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার তিনটি স্তর গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে সর্বনিম্ন স্তরের রাষ্ট্রগুলির জাতীয়-রাষ্ট্রের কার্যকরী অস্তিত্ব বিপন্ন

হবার সুপ্ত আশঙ্কা তৈরি হলো। অন্যদিকে এই চিত্রকল্পে এম. এন. সি.-র পীঠস্থান রাষ্ট্রগুলি সুপার-স্টেট বা অতি-রাষ্ট্র হিসাবে প্রস্তাবিত। বিতর্ক শুরু হয়েছিল যে এম. এন. সি. বা এম. এন. সি.-র পরবর্তী পরিবর্তিত রূপটি সুপার-স্টেটের সমার্থক হয়ে উঠবে কি না অর্থাৎ নেশন-স্টেট থেকে আরও বৃহদাকারে এবং আঞ্চলিক জোটমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে 'কর্পোরেট স্টেট'-এর নতুন স্তরে প্রবেশ করবে কি না। এই স্তর স্থায়ী হবে অথবা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হবে তাও আলোচিত হতে থাকে। কেননা অনেক পণ্ডিতের এটাও অভিমত ছিল যে পরিস্থিতির চাপে আঞ্চলিক এই কর্পোরেট স্টেটও শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গ্লোবাল-স্টেট তথা সুপ্রা-স্টেট বা বিশ্বরাষ্ট্রের রূপ নেবে।

বহুজাতিক সংস্থা ও তৃতীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিপ্লব

মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ও সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশনের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করা দরকার এই কারণে যে, পুঁজির তীব্র আন্তর্জাতিকীকরণের অন্যতম সর্বপ্রধান অনুঘটক হিসাবে এই সময় থেকে ভূমিকা নিচ্ছিল এস. টি. আর.। এম. এন. সি-র সাফল্য ও বিকাশের সর্বপ্রধান ভিত্তি হয়ে উঠছিল এই উপাদানটি।

টেকনোলজি বা কারিগরী প্রযুক্তি নানাভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। কেউ এটিকে বলছেন "উৎপাদনের জন্য সংগঠিত জ্ঞান", কেউ মনে করেন "আর্থনীতিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বিষয়সমূহ সম্পাদন করার জ্ঞান", কারো মতে "উৎপাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ ও আত্মসাৎ করার জ্ঞান"। 'টেকনিক' বা কৃৎকৌশল এবং 'টেকনোলজি' বা কারিগরী প্রযুক্তি স্বভাবতই এক প্রসঙ্গ নয়। 'টেকনিক' বা কৃৎকৌশল বলতে বোঝায় একটি ধারার কর্মকাণ্ডকে, আর 'টেকনোলজি' বা কারিগরী প্রযুক্তি বলতে বোঝায় একটি ধারার জ্ঞানকে। একটি 'টেকনিক'-এর বিনিময়ে অপর একটি গ্রহণ করা যেতে পারে, অন্যদিকে জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে 'টেকনোলজি' উন্নততর হতে থাকে এবং অনতিক্রমভাবে তা' গ্রহণ ও ব্যবহার করতে হয়। এইভাবে সামগ্রিকতার ভিত্তিতে বলা যায় যে কারিগরী অগ্রগতির অর্থ হলো উৎপাদন বিষয়ে জ্ঞানের অগ্রগতি। অবশ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কারিগরী প্রযুক্তি কোন মুক্ত বা স্বাধীন সামগ্রী নয়। প্রকৃত পক্ষে 'টেকনোলজি'র ব্যক্তিগত মালিকানা পুঁজির সঞ্চয় ও বৃদ্ধির অন্যতম অন্তঃশক্তি হিসাবে কাজ করে। স্বভাবতই পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে টেকনোলজিকাল চেঞ্জ বা প্রযুক্তি পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে ধরা পড়ে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (দ্বন্দ্ব) এবং পুঁজির অভ্যন্তরের বৃহত্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পাশাপাশি পুঁজির নিজের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাড়তি মুনাফা অর্জনের জন্য জোরদার চেষ্টাই নির্ধারণ করে দেয় কোন শক্তিশালী যান্ত্রিক কৃৎকৌশলকে গ্রহণ করা হবে উৎপাদন বিকাশের জন্য।

তাই, বহুজাতিক সংস্থা সম্পর্কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব ও তার প্রভাবকে অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা শুরু হয় তখনই। 'আর অ্যাণ্ড ডি' অর্থাৎ রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য এম. এন. সি.গুলি ব্যাপক অর্থ ব্যয় করা শুরু করেছিল। কেননা এগুলিও এক ধরনের পুঁজি-বিনিয়োগ ব্যবস্থা। গবেষণার দ্বারা নতুন উৎপাদন যন্ত্র ও উন্নত নতুন ধরনের সামগ্রী আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে পারলে তা' পরবর্তীকালে নতুন ও বিপুল মুনাফার সুযোগ তৈরি করে এবং প্রকৃতপক্ষে তা' ঘটছিলও। এই চেষ্টার ফলে এস. টি. আর.-এর সিংহভাগ চলে যায় বহুজাতিক সংস্থাগুলির দখলে ও নিয়ন্ত্রণে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের 'প্রোডাক্ট সাইকল থিওরি' বা 'উৎপাদন-চক্রের তত্ত্বে' একারণেই দাবী করা হচ্ছিল যে বিভিন্ন দেশের 'টেক্‌নোলজিকাল গ্যাপ' বা কারিগরী জ্ঞানের শূন্যতাজনিত অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও অদক্ষতাকে অপসারণ করে আন্তর্জাতিক স্তরে এস. টি. আর.-এর ফলে সৃষ্ট টেকনোলজি ও নতুন পণ্যের প্রসার ঘটাবে এম. এন. সি.। কিন্তু এম. এন. সি.'র স্বপক্ষে এই যুক্তি ও তত্ত্ব, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় খণ্ডিত হয়ে, কার্যকালে তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে 'টেকনোলজিকাল ডিপেনডেন্স'-এর তত্ত্বই সত্য বলে প্রমাণিত হতে শুরু করে। অর্থাৎ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ও তাদের এম. এন. সি.গুলি এস. টি. আর-এর ফলকে ব্যবহার করে (পুঁজির শক্তির প্রধান সহায়ক হিসাবে) তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনীতিকে শুধু দমিত করা শুরু করে না, তার টুঁটিও চেপে ধরে।

সে কারণে তৃতীয় দুনিয়ার সাথে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সম্পর্ককে সেই সময় থেকেই 'টেকনোলজিকাল-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-ডিপেনডেন্ট-রিলেশন' বা 'কারিগরী-শিল্পগত-নির্ভরশীলতা-সম্পর্ক' বলে অভিহিত করা শুরু হয়। প্রথম থেকেই মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিকাল রেভলিউশন ও তার ফলকে তৃতীয় দুনিয়ার কাছে অস্পর্শনীয় ও নিজেদের একান্ত সম্পদ করে রাখছিল। তারা এই দাবী করে যে অতীতে রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (আর অ্যাণ্ড ডি) তথা গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য যে ব্যয় তারা করেছে অর্থাৎ অতীতে তাদের পুঁজি বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতেই সর্বাধুনিক টেকনোলজি ও টেকনিক-জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। এই মনোভাবকে সূত্রায়িত করা হয়েছে 'ইন্টারন্যাশনালাইজেশন থিওরি'তে। স্বভাবতই এর থেকে কার্যকালে দাঁড়াল যে, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হলো পণ্য। এরও মালিকানা রয়েছে। এই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য। তা' বিশ্বের সবার (দেশ বা প্রতিষ্ঠানের) স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্য নয়। তাই লাভের বিনিময়ে টেকনোলজি বিক্রি করা হতে থাকে। সুতরাং 'ট্রান্সফার অব টেকনোলজি' বলে সারা বিশ্বে যে প্রসঙ্গ প্রচারিত হতে শুরু করেছিল তা' স্পষ্টতই ছিল ভ্রমাত্মক। আসলে যা দাঁড়ালো তা' হলো 'কমার্শিয়ালাইজেশন অব টেকনোলজি', যার প্রকৃত অর্থ দাঁড়ালো বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট ধরনের টেকনোলজি অপর দেশকে সীমিতভাবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া।

শেষোক্ত প্রসঙ্গটি অর্থনৈতিক স্তরে ছাড়াও রাজনৈতিক স্তরে বিতর্কের অন্যতম বিষয়ে পরিণত হয়। এটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশে টেকনোলজি হস্তান্তরের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ, আন্তর্জাতিকভাবে নীতিগত ব্যবস্থা প্রণয়নের চেষ্টা, তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে পেটেন্ট আইনের সংস্কারের তৎপরতা ও পেটেন্ট সম্পর্কে প্যারিস কনভেনশনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রভৃতি ঘটেছিল।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির এম. এন. সি.'র পক্ষ থেকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যাপারে চাপানো শর্ত (১৯৮১ সাল পর্যন্ত ছিল নিম্নরূপ) ঃ

দেশের নাম	প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে মোট শর্তের সংখ্যা	প্রযুক্তির সুযোগ দিয়ে তৃতীয় দুনিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর আরোপিত শর্তের সংখ্যা
আর্জেন্টিনা	পাওয়া যায়নি	৭৪
বলিভিয়া	৮৩	৮৩
ব্রাজিল	২৪	২১
চিলি	১৪	৯৩
কলম্বিয়া	৭৭	৭৯
ইকুয়েডর	৬৭	৭৫
মেক্সিকো	পাওয়া যায়নি	৯৭
পেরু	৬২	৯৯
ভারত	৫	৪৩
পাকিস্তান	৪৪	৪৪
ফিলিপাইন্স	২৬	৩২
তুরস্ক	৩০	৩৯
ইথিওপিয়া	৮৬	৭১
কেনিয়া	পাওয়া যায়নি	৬০

এই ধরনের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯৮৪ সালে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের ধাত্রী প্রধান তিনটি শক্তি তৃতীয় দুনিয়ায় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বিক্রি করেছিল ঃ আমেরিকা ১৬৩ বিলিয়ন ডলার,

পশ্চিম ইউরোপ ৮২ বিলিয়ন ডলার এবং জাপান ৭৫.৭ বিলিয়ন ডলার। ১৯৮৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র পার্সোন্যাল কমপিউটার বিক্রি করছিল ২১.৪ বিলিয়ন ডলার। ১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথাকথিত টেকনোলজি ট্রান্সফার ও ম্যানেজমেন্ট ফী বাবদ টেকনোলজির মোট মূল্যের ওপরে লাভ করছিল ঃ লাতিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে ৮১ শতাংশ হারে এবং তৃতীয় দুনিয়ার বাকী দেশগুলিতে ৮৮ শতাংশ হারে। ১৯৮১ সালে মালটিন্যাশনালগুলি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রোবট বিদেশে বিক্রি করেছিল মাত্র ১ বিলিয়ন ডলার, আর ১৯৯০ সালে করেছে ১০ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকার এম. এন. সি.গুলির অনুমোদিত ও সহযোগী যেসব প্রতিষ্ঠান অন্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে রয়েছে, তারা নতুন প্রযুক্তি হাতে পায় আমেরিকাতে চালু হবার গড়ে ৫.৮ বছর পর; লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ (এল. ডি. সি.) বা সর্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশগুলি পায় গড়ে ৯.৮ বছর পর এবং এম. এন. সি.-র লাইসেন্স প্রাপ্ত বা মিশ্র সহযোগীগুলি পায় গড়ে ১৩.১ বছর পর (অর্থাৎ তৎকালের পেটেন্ট আইন অনুযায়ী পেটেন্ট সীমা পার হয়ে যাবার পর)।

টেকনোলজির শক্তি ব্যবহার করে এম. এন. সি.গুলি উৎপাদনে বলীয়ান হবার পাশাপাশি টেকনোলজিকে অন্যতম প্রধান চাপ-সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করছিল। এইভাবে অনুন্নত দেশগুলিকে আরও অধীনস্থ করার ক্ষেত্রে প্রথাগত ব্যবস্থাগুলি অর্থাৎ অর্থ বিনিয়োগ, শিল্প তৈরি ও ঋণ দেবার ব্যবস্থার পাশে, নতুন হাতিয়ার হিসেবে যুক্ত হতে শুরু করেছিল এস. টি. আর. অর্জিত কৃৎকৌশলসমূহ।

বহুজাতিক সংস্থা ও প্রচার-মাধ্যম ব্যবস্থা

নতুন বিশ্ব-গঠনে প্রচার-মাধ্যমের ভূমিকা নানা দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকায় এম. এন. সি.-র সাথে এটির স্বার্থ, সম্পর্ক ইত্যাদিও গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হতে শুরু করে। মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের স্বার্থের প্রসঙ্গে প্রচার-মাধ্যমের ভূমিকায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক সৃষ্টি হয় ঃ (ক) নতুন বিশ্ব-অর্থনীতি তথা পুঁজির সার্বিক আন্তর্জাতিকীকরণ তথা কেন্দ্রীভবনের প্রয়োজনের স্বার্থে জনমানসে সমর্থন অর্জনের জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং (খ) মৌল ও ভারী শিল্প-পুঁজির বিকাশের চেয়েও, আরও ব্যাপক ও অধিকতর লাভজনক ক্ষেত্র হিসাবে প্রচার-মাধ্যমকে এক নয়া শিল্প-এর (ইণ্ডাস্ট্রি) চরিত্র দেওয়া এবং প্রচার মাধ্যমের বিশ্বজনীনীকরণ ঘটিয়ে তার দ্বারা মুনাফা অর্জনের সুযোগ গ্রহণ। কার্যকালে এটা প্রমাণিত যে এই কালে বিশ্বজনীনকরণের প্রক্রিয়ারত পুঁজির অপর প্রধান বাহক হিসাবে ভূমিকা নিচ্ছিল প্রচার-মাধ্যম, বিশেষত, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা বৈদ্যুতিন প্রচার-মাধ্যম। বিশ্বের সর্বত্র প্রচার-মাধ্যমের প্রসারে এম. এন. সি.-র লক্ষ্য দাঁড়ায় ট্রান্সফার অব টেকনোলজির মতোই 'ট্রান্সফার অব টেস্ট' বা রুচির হস্তান্তর। এক্ষেত্রে তথাকথিত পরোক্ষ দাবী ছিল, উন্নত রুচি কেবলমাত্র মালটিন্যাশনালদের তথা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিরই রয়েছে; সেগুলির বিশ্বায়ন করে তৃতীয় দুনিয়ার মানুষদের উন্নত রুচিশীল করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দখল করে শাসন শুরু করার সময়ও তদানীন্তন ধনতন্ত্র দাবী করেছিল যে তারা ঈশ্বরের দূত হিসাবে অসভ্য জাতিগুলিকে সভ্য করার মিশন তথা ভগবান-প্রদত্ত সনদ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে; শ্বেত-চর্মের মানুষেরা কালো ও পীতদের তুলনায় মেধা, দৈহিক গঠন ও শক্তিতে নৃতাত্ত্বিকভাবেই শ্রেষ্ঠ। ইন্টারন্যাশনালাইজেশন থিওরির প্রবক্তরাও মনে করেছিলেন যে মালটিন্যাশনালরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির, জনগণের মধ্যে রুচির তথা সংস্কৃতির অসম্পূর্ণতা বা পশ্চাৎপদতা অপসারিত করে উন্নতদের সাথে সমতা সৃষ্টি করে। মার্কসবাদী নিও-ইম্পিরিয়ালিস্ট মতবাদীরা যুক্তিসহ এই দাবীর বিরোধিতা করে একে চিহ্নিত করেছিলেন 'কালচারাল
ফলে সৃষ্ট টে- থা সাংস্কৃতিক অধীনতা সৃষ্টির প্রয়াস বলে। কেউবা একে ব্যাখ্যা করেছিলেন 'থিওরি
এই যুক্তি ও ভ, অব কালচারাল আণ্ডার-ডেভেলপমেন্ট' অথবা 'থিওরি অব কালচারাল ব্লকেড'
'টেকনোলজিকাল র-মাধ্যমকে চিহ্নিত করা হচ্ছিল 'ব্রেন ম্যানেজমেন্ট ইণ্ডাস্ট্রি' বা 'কালচারাল
দেশগুলি ও তাদের ল।
সহায়ক হিসাবে) ই ব্যবহার করে বহুজাতিক সংস্থার অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস বহু পূর্ব থেকে ঘটলেও,

বিশ্বমুখীন লক্ষ্য নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ও ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয় ৬০-এর দশকের প্রথমার্ধে। মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি মিলিতভাবে একযোগে ৯০টি দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মহাকাশে উপগ্রহের সাহায্যে টেলি-কমিউনিকেশন ব্যবস্থার দ্বারা টেলিফোন ও টেলিগ্রাম যোগাযোগের জন্য প্রতিষ্ঠা করে 'ইনটেলস্যাট'। এই 'ইনটেলস্যাটে' বৃহত্তম বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ছিল আমেরিকার 'কমস্যাট'।

'শিল্পগত বহুজাতিক সংস্থাগুলি'-র গর্ভ থেকেই 'প্রচার-মাধ্যম বহুজাতিক সংস্থা'র আত্মপ্রকাশ। এরা প্রথমে প্রচার-মাধ্যমের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র-সামগ্রী উৎপাদনের একচেটিয়া কর্তৃত্ব নিয়েছিল। ১৯৮৩ সালে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ১৫টি 'মিডিয়া মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন'গুলি, যাদের হাতে ছিল প্রচার-যন্ত্র সামগ্রীর উৎপাদনের একচেটিয়া কর্তৃত্ব, তাদের ক্ষমতার স্বরূপ ছিল নিম্নরূপ

কর্পোরেশনের নাম	বিক্রির পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার)	মোট কর্মচারীর সংখ্যা
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস (আমেরিকা)	১৪,৪৩৬	২,৮৮,৬৪৭
জেনারেল ইলেকট্রিক (আমেরিকা)	১৩,৩৯৯	৩,৭৫,০০০
ইন্টারন্যাশনাল টেলিফোন অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ (আমেরিকা)	১১,৩৬৭	৩,৭৬,০০০
ফিলিপস (নেদারল্যাণ্ডস)	১০,৭৪৬	৩,৯৭,০০০
সিমেনস (জার্মানি)	৭,৭৫৯	২,৯৩,০০০
ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক (আমেরিকা)	৬,৫৯০	১,৫২,৬৭৭
জেনারেল টেলিফোন অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকস (আমেরিকা)	৫,৯৪৯	১,৮৭,১৭০
ওয়েস্টিংহাউস (আমেরিকা)	৫,৮৬২	১,৬৬,০৪৮
এ. ই. জি. টেলিফাংকেন (জার্মানি)	৫,১৮৭	১,৬২,১০০
নর্থ আমেরিকান রকওয়েল (আমেরিকা)	৪,৯৪৩	১,২২,৭৮০
আর. জি. এ. (আমেরিকা)	৪,৭৮৯	১,১৩,০০০
মাৎশুহিতা (জাপান)	৪,৮৭৭	৮২,০০০
এল. টি. ভি. (আমেরিকা)	৪,৩১২	৬০,০০০
জেরক্স (আমেরিকা)	৪,০৯৪	৯৩,৫৩২
সি. জি. ই. (ফ্রান্স)	৪,০৭২	১,৩১,০০০

এই প্রতিষ্ঠানগুলি পুঁজিবাদী সমগ্র দেশগুলির প্রচারের মোট ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ৭৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতো। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রথম সারির শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম হয়ে উঠে সিনেমা, রেডিও, টিভি কোম্পানিগুলি। যেমন আমেরিকার ক্ষেত্রে কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেম, দি রেডিও কর্পোরেশন অব আমেরিকা এবং ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। আমেরিকাতে ইলেকট্রনিক এম. এন. সি.গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত বিশ্বের তিন প্রধান বহুজাতিক ব্যাঙ্ক—মর্গান গ্যারান্টি ট্রাস্ট, চেজ ম্যানহাটন ব্যাঙ্ক ও ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক। 'মালটিন্যাশনাল কমিউনিকেশন কোম্পানি'গুলির ভয়াবহ আর্থিক ক্ষমতার উল্লেখ করে ১৯৭৭ সালে 'ইউনেস্কো' আহূত আন্তর্জাতিক প্রকাশক ও সম্পাদকদের এক সম্মেলন থেকে পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হয়েছিল যে, এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির নিজস্ব বার্ষিক বাজেটে প্রচার-মাধ্যমগুলির জন্য বরাদ্দ মোট টাকার পরিমাণের সমান একদিনে ব্যয় করে থাকে বহুজাতিক প্রচার-মাধ্যম সংস্থাগুলি। 'ইউনেস্কো'র হিসাব অনুযায়ী মালটিন্যাশনাল কমিউনিকেশন কোম্পানিগুলি নিজেরা ব্যাপকভাবে দেশে দেশে টিভি কেন্দ্র ও রেডিও স্টেশন স্থাপন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও সিনেমা বিক্রি করে বছরে বহু বিলিয়ন ডলার লাভ করে। প্রতি মিনিটের রেডিও-সংবাদ গড়ে ৫০০ ডলার দরে এম. এন. সি.গুলি তৃতীয় দুনিয়াকে বিক্রি করতো। তাছাড়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স বছরে ২০ হাজার ঘন্টা, জার্মানির ৬ হাজার ঘন্টা এবং আমেরিকার ৩ লক্ষ ঘন্টা সংবাদ

বিক্রি করতো। এইসব বহুজাতিক প্রচার-মাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন দেশে প্রচার-মাধ্যমের যন্ত্র সামগ্রী সরবরাহ ও কৃত্রিম উপগ্রহের চ্যানেল ভাড়া দিয়ে বহু বিলিয়ন ডলার লাভ করতে থাকে। মালটিন্যাশনাল কমিউনিকেশন কর্পোরেশনগুলির সামগ্রিক তৎপরতার ফলে তৃতীয় দুনিয়ার বেশ কিছু দেশে স্বদেশীয় ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক টিভি ও রেডিও প্রতিষ্ঠান হয় উঠে যায় বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ-ব্যবসায় যেতে বাধ্য হয় অথবা সেগুলি বিদেশীরা কিনে নেয়। তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচার-মাধ্যমগুলিও এগুলির চাপে হতে থাকে প্রবলভাবে কোণঠাসা; কোথাও কোথাও তারা মালটিন্যাশনাল ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত টিভির সাথে যৌথ-মালিকানায় অথবা বি-রাষ্ট্রীয়করণে বাধ্য হচ্ছিল। স্বয়ং উন্নত দুনিয়ার পরিস্থিতিও বহুজাতিক প্রচার-মাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলির পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে একচেটিয়াপনার গতি ও চেহারাকে সুস্পষ্ট করে দিচ্ছিল। ৭০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে ৮০-র দশকের প্রথমার্ধের মধ্যে এম. এন. সি. নিয়ন্ত্রিত প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানগুলির দাপটে নতুন প্রতিষ্ঠিত পুস্তক প্রতিষ্ঠানগুলির এক-তৃতীয়াংশ তিন বছরের মধ্যে উঠে যায়, পাঁচ বছরের মধ্যে উঠে যায় প্রতি দশটির ছ'টি এবং ৮০ শতাংশ বিলুপ্ত হয় ১০ বছরের মধ্যে।

তৃতীয় বিশ্বের ডকুমেন্টারি ফিল্ম-এর বাজার প্রায় পুরোপুরি দখল করে ফেলে বিশ্বের ৫টি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান—ব্রিটিশ 'ভিসনিউজ', অ্যাংলো-আমেরিকান 'ইউ. পি. আই. টি. এন.', আমেরিকার 'সি. বি. এস. নিউজ' ও 'এ. বি. সি. নিউজ' এবং জার্মানির 'ডি. পি. এ. ই. টি. ই. এস.'। পুস্তকের বাজার দখল করে যেসব প্রকাশন কোম্পানিগুলি আবির্ভূত হয় তাদের আসল মালিক ছিল ম্যাক্‌গ্রো হিল, জেরক্স, সি. বি. এম., আর. সি. এ., প্রেন্টিস্ হল, স্কট, প্রেসম্যান অ্যাণ্ড কোম্পানি, আই. টি. টি. ওয়েস্টিংহাউস এবং জেনারেল লার্নিং কোম্পানি—সবগুলিই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান।

বহুজাতিক সংস্থাগুলি এই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা করায়ত্ত করায় বিশ্বস্তরে বৈষম্যের স্বরূপ দাঁড়ায় : প্রতি ১০ লক্ষ মানুষের জন্য লেখ্যমাধ্যমের প্রকাশনার সংখ্যা আমেরিকার ক্ষেত্রে ৪৭০টি, ইউরোপীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে ৫৪০টির বেশি, অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে মাত্র ৪৪টি। তৃতীয় দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশ বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছ থকে ৯০ শতাংশ রেডিও সংবাদ ক্রয় করতে বাধ্য হতো। টেলিভিশন প্রোগ্রাম ক্রয় করার পরিসংখ্যান দাঁড়ায় গুয়াতেমালা ৮৪%, সিঙ্গাপুর ৭৮%, মালয়েশিয়া ৭১%, জাম্বিয়া ৬৪%, নাইজিরিয়া ৬৩%, উরুগুয়ে ৬২%, ইয়েমেন আরব রিপাবলিক ৫৭%, কুয়েত ও চিলি ৫৫%, ডোমিনিকান রিপাবলিক ৫০% প্রভৃতি। এন. বি. সি. প্রতিষ্ঠান গুয়াতেমালা, এল. সালভাডোর, হণ্ডুরাস, কোস্টারিকা, পানামা, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডোর, চিলি ও আর্জেন্টিনার দেশীয় প্রচার-মাধ্যমগুলি শেয়ার দখল করে। সি. বি. এস. বহু দেশের গ্রামোফোন রেকর্ড ফার্ম-এর মালিক এবং রেডিও কর্পোরেশন অব আমেরিকা মেক্সিকো ও ভেনেজুয়েলাতে টি. ভি. স্টেশনের শেয়ার হোল্ডারে পরিণত হয়। ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা ও আর্জেন্টিনার টি. ভি. সেট তৈরির সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হলো ঐ আমেরিকান প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু এইসব তথ্যের অর্থ এটা নয় যে এম. এন. সি.গুলি তৃতীয় দুনিয়াতে ঢালাও প্রচার মাধ্যমের ব্যবস্থা করছিল। বরং এর মধ্যেও ছিল ইচ্ছাকৃত ব্যাপক বৈষম্যের ব্যবস্থা। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বিশ্ব জনসংখ্যার ৬০% (এই হিসাব তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনসংখ্যা বাদে) মানুষ বাস করতো। অথচ এই সময়ে এই ৬০% মানুষের জন্য ছিল বিশ্বের মোট রেডিও স্টেশনের মাত্র ২৫%, টি. ভি. ট্রান্সমিটারের ৪%, পুস্তক প্রকাশনার ১৭%। পঁয়ত্রিশটি পশ্চাৎপদ দেশের ছিল না নিজের কোন প্রচার এজেন্সি পর্যন্ত।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আধুনিক প্রচার-মাধ্যম ব্যবস্থা প্রভৃতির একটি অন্তর্নিহিত উপাদান হলো এগুলি প্রত্যেকটি এক ধরনের স্বয়ং সংগঠনের চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠছিল। নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গঠনে এগুলি আবির্ভূত হচ্ছিল এক ধরনের সম্পূর্ণ নতুন ও নিপুণ সংগঠনের রূপ নিয়ে। পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের সংবাহক সংগঠন হিসাবে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে।

বিশ্ব-ধনতন্ত্রের ঘুরে দাঁড়াবার প্রয়াস

চরম সংকটের মধ্যেই, সত্তরের দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদ তথা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ব্যবহার এবং উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়া ইত্যাদির নবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে সংকট থেকে মুক্তি ও বিশ্ব-শোষণ ব্যবস্থাকে আরও প্রশস্ত ও কার্যকরী করার উদ্যোগ নিয়েছিল। ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার পতন ঘটলেও, ব্রেটন-উডসের প্রধান দুই প্রতিষ্ঠান—ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফাণ্ডের আদৌ পতন ঘটেনি। বরং বিশ্ব-পুঁজিবাদের প্রসারে, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে ঋণ-জালে আবদ্ধ করতে এবং সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত অর্থনীতি গ্রহণে যথাসম্ভব বাধ্য করতে প্রতিষ্ঠান দু'টিকেঁ বৃহত্তর ভূমিকায় সামিল করতে থাকে বিশ্ব-ধনতন্ত্র। তৃতীয় দুনিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ, সুলভ শ্রম ও বাজারকে শোষণ করার বহমান পদ্ধতি ও ব্যবস্থার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও অসম বাণিজ্যকে আরও নির্মম করার প্রচেষ্টা চালানোর পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিশেষ দিককে, সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলতে থাকে প্রবলতর করে। আশির দশকের মাঝামাঝি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতিতে মন্দা কিছুটা কেটে যাওয়া ও অগ্রগতির যে লক্ষণ দেখা দিতে থাকে, তা' ছিল এই জাতীয় তৎপরতার অন্যতম ফলাফল। পূর্বে উল্লেখিত বুর্জোয়া-অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা, হতাশা ও তা' থেকে সৃষ্ট নানা অর্থনৈতিক তত্ত্ব যে সাম্রাজ্যবাদীদের সর্বকালীন ব্যবস্থা ও লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি, তার প্রমাণ মেলে নিম্নোক্ত প্রয়াসগুলি ও তার মাধ্যমে অর্জিত বৃহত্তর মুনাফা অর্জনের স্বরূপ থেকে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি স্বীয় দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের সংকট থেকে তখনও পরিত্রাণ না পাওয়ায় দেশের বাইরে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার দিকে, অধিক দৃষ্টি দিতে শুরু করে। স্বভাবতই নবায়িত ও নতুন পদ্ধতিগুলির প্রধান ভর ছিল দেশের বাইরে—আন্তর্জাতিক স্তরে। এই নতুন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ শুধু বিশ্ব-অর্থনীতির পরিবর্তন সাধনে তৎপর হয় না, নিজ খোলসের পরিবর্তনের জন্যও প্রয়াস শুরু করে দেয়। বিশ্ব-পুঁজিবাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এইভাবে সূত্রপাত ঘটে আর এক প্রস্থ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার। বিশ্ব-মানবসমাজের সামনেও সেই আগমনী ধ্বনি শোনা যেতে থাকে; সমাজ, শ্রেণী, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, জাতীয়তা, রাষ্ট্র, সংগঠন, আন্দোলন, জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে শুরু হয় প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ও প্রক্রিয়া।

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে ব্যবহার করে বিশ্ব-পুঁজিবাদের শোষণ ও অগ্রগতি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব প্রসঙ্গে কিছু তত্ত্বগত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে—বিশেষত বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত করে। বর্তমান আলোচনাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহার তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের বাস্তব কিছু দিক সম্পর্কে।

সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের দ্বারা সুনির্দিষ্ট ত্রিধারা সৃষ্টি হয়েছে। (ক) মানব-সমাজের সার্বিক উন্নয়নের সুযোগ, (খ) এটির মানব-সমাজ-বিরোধী ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ ও (গ) উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি কর্তৃক অনুন্নত দেশগুলিকে নির্ভরশীল করে রাখা এবং একই সাথে পুঁজির বিকাশ ও অতিকায় উদ্বৃত্ত সৃষ্টির অন্যতম প্রধান হাতিয়ারের ভূমিকা। শেষোক্ত দিকটি বর্তমান আলোচনায় প্রধান।

এস. টি. আর.-এর সুফল ও সুযোগ, এই কালে, প্রায় সর্বাংশে উন্নত ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ; তৃতীয় দুনিয়া ছিল এই সুযোগ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত। শেষোক্তদের সুযোগ না পাওয়ার অন্য ঐতিহাসিক কারণও থেকে গেছে। কেননা তদানীন্তন সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের সাফল্যকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার চেয়ে মহাকাশ গবেষণা ও সমরাস্ত্র উন্নয়নে উন্নতভাবে ও স্তরে ব্যবহারে সাফল্যমণ্ডিত হলেও উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহারে অযত্নবান ছিল। এই ত্রুটি বা দুর্বলতা যেমন তাদের পরবর্তীকালের সর্বনাশের অন্যতম কারণ হয়েছিল, পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয় দুনিয়ার প্রতি উল্লেখযোগ্য সহৃদয়তা প্রদর্শন ও সাহায্য দিলেও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি (উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে) দিতে তেমন সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে নিজেদের পক্ষ থেকে অর্থ, শিক্ষা, পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও গবেষণার অভাবেও নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুযোগ নিতে পারেনি তৃতীয় দুনিয়া।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থ-ব্যবস্থার সংকট থেকে পরিত্রাণে বিশ্ব-পুঁজিবাদ এস. টি. আর.-কে ব্যবহার করছিল স্বয়ং উৎপাদিকা শক্তি, পুঁজি, উৎপাদনের উপকরণ, পণ্য ও উৎপাদিত পণ্যের রূপে বিদেশে লগ্নী, উৎপাদন এবং বাজার হিসাবে।

উন্নত ধনতন্ত্র নতুন টেকনোলজি বা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছিল এক ধরনের প্রায়োগিক আর্থিক কাঠামো হিসাবে। লাইসেন্স, পেটেন্ট, টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন, নতুন মেশিনারির মডেল, ট্রেড-মার্ক, ম্যানুফ্যাকচারিং ও টেকনিক্যাল অভিজ্ঞতা, পরামর্শদাতা ও ব্যবস্থাপক ভূমিকার সার্ভিস এবং অনুন্নত দেশগুলির বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য দক্ষতাসম্পন্ন প্রফেশনাল ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসাবে এস. টি. আর-কে তারা ব্যবহার করছিল। উন্নত দুনিয়ার পক্ষ থেকে প্রযুক্তি নিয়ে ব্যবসার চরিত্রটি ইউনাইটেড নেশনসের বিশেষজ্ঞরা ১৯৮১ সালে তাঁদের রিপোর্টে—অপারেশনাল প্ল্যান ফর দা ইমপ্লিমেন্টেশন অব দা ভিয়েনা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন অন সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট-এ সবিশেষ উল্লেখ করেছিলেন। তাঁরা এটাও দেখিয়েছিলেন যে তথাকথিত 'টেকনোলজি ট্রান্সফার' কার্যত এক ধরনের মুখোশ মাত্র। উন্নত দুনিয়ার সাথে অনুন্নত দুনিয়ার রাষ্ট্রগত সম্পর্ক ও চুক্তির দ্বারা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবসা যতটা সাধিত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ঘটে বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে—যার প্রধান হলো মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি।

বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তনের অন্যতম সংঘটক হিসাবে টেকনোলজিকে ব্যবহার করা শুরু হলো। অতীতের কলোনিয়ালিজম এবং পরাধীন দেশগুলি স্বাধীনতা পাওয়ার পর ব্যবহৃত নিও-কলোনিয়ালিজমের প্রচলিত পদ্ধতিগুলি থেকে এই নতুন কাঠামো-প্রস্তাবের চরিত্রে সৃষ্টি হতে থাকল যথেষ্ট নতুনত্ব ও ভিন্নতা। পাশাপাশি, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তিশালী অস্তিত্ব ও তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির পক্ষ থেকে বিবিধ সুবিধাজনক শর্তে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি এবং বিজ্ঞান-কারিগরীতে উন্নত হবার চেষ্টা প্রতিহত করতে উন্নত আন্তর্জাতিক ধনবাদ পরিবর্তিত কৌশল ও হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা শুরু করে এস. টি. আর.-কে। আন্তর্জাতিক স্তরে পুঁজিবাদী প্রধানদের মধ্যে একচ্ছত্র প্রাধান্য কিছুটা খর্ব হওয়ায় আমেরিকা এস. টি. আর.-কে ভিত্তি করে পুনরায় প্রাধান্য অর্জনের চেষ্টাও শুরু করে। অন্যদিকে অন্যান্য অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির জাতীয় পুঁজিপতিদের উপর নিবিড় প্রাধান্য অর্জনের জন্য এস. টি. আর.-কে ব্যবহার করা শুরু হয়।

উন্নত দুনিয়া থেকে অনুন্নত দুনিয়ায় তথাকথিত ট্রান্সফার অব টেকনোলজি-র পথ মসৃণ করার প্রথম দিক ছিল উন্নত দেশগুলি থেকে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পুঁজির অনুন্নত দেশে রপ্তানি। যত বেশী মূলধন রপ্তানি করা যাবে ততই প্রযুক্তি বিক্রি করা সহজসাধ্য হবে। উন্নত দেশগুলি এই ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে 'ডেভেলপমেন্ট এইড' বলে প্রচার করে। ১৯৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০ লক্ষ মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করেছিল, ১৯৮০ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটিতে; ১৯৯০ সালে অনুমিত সংখ্যা ২৮ কোটি যার এক-তৃতীয়াংশ তারা বাইরে বিক্রি করেছে। জাপান ও জার্মানির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি-পণ্যের দেশীয় উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক বিদেশে বিক্রি হয়। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে কেবলমাত্র আমেরিকার ব্যক্তিগত মালিকাধীন পুঁজির বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) ৫.৩ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫৩.২ বিলিয়ন ডলার দাঁড়িয়েছিল। এস. টি. আর.-ভিত্তিক বাণিজ্যে আমেরিকা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে বিনিয়োগ করেছিল ১৬৭.১ বিলিয়ন ডলার, অনুন্নত দেশে করেছিল ৫৩.২ বিলিয়ন ডলার। অথচ এর থেকে আমেরিকা মুনাফা পেয়েছিল যথাক্রমে ৯৪.২ ও ৯৬.৭ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ উন্নত দুনিয়ার তুলনায় অনুন্নত দুনিয়া থেকে কারিগরী রপ্তানিজনিত লাভের হার ও পরিমাণই শুধু বেশী ছিল না, তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ ছিল বিনিয়োগের প্রায় দ্বিগুণ। বিপরীত দিক থেকে বলা যায় যে '৮০-র দশকে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করার জন্য অনুন্নত দেশগুলিকে ২০,০০০,০০,০০,০০০ বা ২০ হাজার কোটি

ডলার ব্যয় করতে হয়েছিল; এই অর্থ দেশগুলির মোট জাতীয় উৎপাদন (জি. এন. পি. বা গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট)-এর ১৩ শতাংশের সমান।

মূলধনী বিশ্ব-ব্যবস্থার অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিপ্লবের নতুন স্তরটিকে ব্যবহার করার উদ্যোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্বপ্রথম গ্রহণ করে। এবং এই ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির মধ্য দিয়ে তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে চলে ধারাবাহিকভাবে। তৃতীয় দুনিয়াকে তথাকথিত সাহায্য করার নামে, আসলে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে টেকনিক্যাল কো-অপারেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ১৯৬১ সালে এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (এ. আই. ডি.)। ১৯৭০ সাল থেকে তিনটি এজেন্সি তৈরি করে তারা 'এইড' পরিচালনা শুরু করে। ঐ বছরই ফরেন অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাক্ট রচিত হয়। প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের মধ্যে ঘোষিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্তরে রেখে প্রযুক্তি-ব্যবসা বিপুল উদ্যমে শুরু করে আমেরিকা। ১৯৭৪ সালে বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকটের কাল-পর্বের পর আমেরিকা এস. টি. আর.-এর ক্ষেত্রে তৃতীয় দুনিয়ায় যে বিনিয়োগ করেছে তার স্বরূপ এইরূপ :

বিনিয়োগ এলাকা	১৯৭৫ (মি. ডলার)	১৯৭৭ (মি. ডলার)	১৯৮০ (মি. ডলার)
এশিয়া	৫৯.৪	১৩৭.৫	১৫৮.৩
লাতিন আমেরিকা	৭৪.৬	৭৮.৮	৮৪.৬
আফ্রিকা	৬৮.৩	৮৬.৭	৯৬.১
অন্যত্র	৭৩.৩	৭৯.২	৮৪.০
মোট	২৭৬.০	৩৮২.২	৪২৩.০

এই বিনিয়োগের চরিত্রের স্পষ্ট রূপটি বোঝার জন্য ক্ষেত্রভিত্তিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যানটিও গুরুত্বপূর্ণ :

ক্ষেত্র	১৯৭৫ বিনিয়োগের পরিমাণ মি. ডলার	হার %	১৯৮০ বিনিয়োগ পরিমাণ মি. ডলার	হার %
এগ্রিকালচার	১১৩.২	৪১.০	১৭৩.০	৪১.২
প্রসেসিং অ্যাণ্ড এক্সট্রাকশন	৫.৭	২.১	১৭.৯	৪.৩
ট্রান্সপোর্টেশন	১.৩	০.২	১.৯	০.৫
হাউজিং কনস্ট্রাকশন	৩.১	১.১	১৩.৯	৩.৩
এডুকেশন	৪৩.৫	১৫.৯	৬৬.৩	১৫.৮
হেলথ	২২.৬	৮.২	৩৬.২	৮.৫
সোস্যাল সিকিউরিটি	২.৮	১.০	২.৯	০.৭
স্টেট অ্যাপারেটাস	৯.৭	৩.৫	১২.৩	৩.০
ল এনফোর্সমেন্ট	৪.৫	১.৬	—	—
প্রফেশনাল অরগনাইজেশন	৭.৭	২.৮	৮.৩	২.১
প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ	৬.৩	২.২	৭.১	১.৭
অন্যান্য	৩২.৫	১২.২	৩২.৫	৭.৭
মোট	২৭৬.৮	১০০	৪১৭.৭	১০০

ক্ষেত্রগুলির দিকে দৃকপাত করলে স্পষ্ট হবে যে সর্বাধুনিক কৃৎকৌশল সবচাইতে জরুরী ও আবশ্যক যে ভারী মৌলিক শিল্পের ক্ষেত্রে তৃতীয় দুনিয়ার সেখানে বিনিয়োগ যৎসামান্য বা নেই। তৃতীয় দুনিয়াকে

কেবলমাত্র কৃষি-ভিত্তিক ও কৃষি-প্রযুক্তি নির্ভর করে রাখার জন্য কৃষি ক্ষেত্রে ঘটেছে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ। আর ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ ঘটেছিল, তা' প্রধানত আমেরিকান (বিদেশী) পণ্য উৎপাদন ও তার সঞ্চালনের (বাজারের) সুযোগ প্রসারের জন্য।

তৃতীয় দুনিয়ার কৃষিকে আমেরিকান প্রযুক্তির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে আমেরিকা ১৯৬০-৮০ সালের মধ্যে অনুন্নত দেশগুলির ৪০,০০০ বিশেষজ্ঞকে যেমন কৃষি-প্রযুক্তিগত ট্রেনিং দিয়েছিল, তেমনি দেশগুলিতে কৃষি -বিদ্যালয় খুলেছিল ১৫০টিরও বেশী। তৃতীয় দুনিয়ায় আমেরিকান বাণিজ্য ও লাভকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা থেকে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের জন্য ডাটা-ব্যাঙ্ক তৈরি করে '৮০ সালের মধ্যে তারা স্বতন্ত্রভাবে প্রায় ৬,০০০ পরিকল্পনা তৈরি করে কাজে নামে। তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও ১৯৭৮ সালের মধ্যেই আমেরিকা জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সাহায্যে ৯,৫০০টি প্রতিষ্ঠানে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল। এইসব ব্যবস্থার দ্বারা কারিগরী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, ঋণ ও সাহায্য বাবদ যে অর্থ আমেরিকা দিয়েছিল তা' থেকে ১৫ শতাংশ বা ৯০০ মিলিয়ন ডলার লাভ করতে সক্ষম হয়।

আমেরিকার রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে কারিগরী বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়মিত বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতে থাকে। ১৯৮১ সালে তৃতীয় দুনিয়ার 'নানা উন্নয়ন' কর্মসূচীতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ১৩,৪৯৮ জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ কর্মরত ছিল—যাদের বেতন-ভাতা, আবাস, যাতায়াত ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দেশগুলি বহন করত। এইভাবে কারিগরী-বাণিজ্যের সাথে দেশের বেকারের একটা অংশকে বিদেশী অর্থে নিযুক্তির ব্যবস্থা করছিল তারা। ১৯৫০-১৯৮০ সালের মধ্যে, আমেরিকার প্রযুক্তিগত সামগ্রী ও ব্যবস্থা তৃতীয় দুনিয়ায় কার্যকরী করার জন্য অনুন্নত দেশগুলির ২,০০,০০০ মানুষকে শিল্প-বিষয়ক ট্রেনিং বা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে। ১৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় এজন্য নির্ধারিত রয়েছে আমেরিকাতে। এইভাবে টেকনোলজিক্যাল ইমপিরিয়ালিজম তথা কারিগরী সাম্রাজ্যবাদের সাথে অ্যাকাডেমিক ইমপিরিয়ালিজম বা শিক্ষা-সাম্রাজ্যবাদ হাত ধরাধরি করে চলা শুরু করে। প্রসঙ্গত আবিষ্কারের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির একচেটিয়াপনার একটি পরিসংখ্যান (যদিও কিছুটা প্রাচীন) লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় ১৯৫০-১৯৮০ সালে নোবেল পুরস্কার					
দেশ	পদার্থবিদ্যা	রসায়ন	দেশ	পদার্থবিদ্যা	রসায়ন
আমেরিকা	৪৫	১৯	জাপান	১	০
ইংল্যাণ্ড	১১	১৭	পঃ জার্মানি	২	৫

বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহদায়তন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি বাণিজ্য শুরু করছিল পেটেন্ট, লাইসেন্স, ট্রেড মার্ক, ইক্যুইপমেন্ট ও কনসালটিং সার্ভিসে। এগুলিই হয়ে দাঁড়ায় প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রধান। আমেরিকান এম. এন. সি.'গুলির কর্তৃত্বে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি থাকায় তারা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বিপুল মুনাফা করতে থাকে। সেই সময়ে সারা পৃথিবীতে মোট প্রযুক্তি হস্তান্তরের চুক্তির অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছিল এম. এন. সি. এবং অধীনস্থ বা অংশভুক্ত সাবসিডিয়ারিগুলির মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি প্রযুক্তি হস্তান্তর করে যে বিপুল লাভ অর্জন করছিল তার ৬০ ভাগ আমেরিকান কোম্পানিগুলির। এইভাবে ইনটার-ফার্ম ব্যবস্থায় রয়ালটি ও ম্যানেজমেন্ট ফী বাবদ আমেরিকা যা অর্জন করছিল তার ৮১ ভাগ লাতিন আমেরিকা এবং ৮৮ ভাগ অন্যান্য তৃতীয় দুনিয়ার দেশ থেকে। তৎকালে বিশ্বের যেসব বৃহৎ ২৮টি ঔষধ শিল্পের প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর মোট ঔষধের ব্যবসায় ৬০ ভাগ ও গবেষণার ৯০ ভাগ কর্তৃত্ব করছিল, তার ১৪টির অবস্থান ছিল আমেরিকাতে।

১৯৬৪ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গ্রুপ' গঠন করে আমেরিকা 'ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস' রপ্তানি শুরু করে। এই গ্রুপ ১৯৬৫ থেকে '৮২ সালের মধ্যে ৬০টি অনুন্নত দেশে ৫,০০০

প্রকল্প সম্পন্ন করেছে প্রযুক্তি হস্তান্তরের সাহায্যে। ৩০০টি এম. এন. সি. ও ৭০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে ৪৫০০ মানুষের ভলান্টিয়ারস ইন টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স (ভি.আই.টি.এ.) গঠন করে প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রত্যেকটি পরিসরে তথাকথিত সহায়তা দানের নামে কর্তৃত্ব অর্জন করছিল আমেরিকা। কেবলমাত্র ১৯৮২ সালে সাবসিডিয়ারিগুলি তাদের আমেরিকাস্থ প্রধান বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে মুনাফা পাঠিয়েছিল ১,১৮০ মিলিয়ন ডলার (তার মধ্যে লাইসেন্স ফী বাবদ ২৫৮ মিলিয়ন ডলার) এবং ঐ একই বছরে 'ম্যানেজমেন্ট মেথড' ও ঐ ধরনের কাজের দ্বারা অর্জিত লাভ হিসাবে পাঠিয়েছিল ৯২২ মিলিয়ন ডলার। এগুলির বাইরে, আধুনিক প্রযুক্তি, তৃতীয় দুনিয়ায় বিক্রি করে, আমেরিকান পুঁজিপতিরা যে লাভ করে চলেছিল তার চিত্র নিম্নরূপ :

(মিলিয়ন ডলারে)				
প্রযুক্তি বিক্রি পদ্ধতি	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৮০	১৯৮১
সাবসিডিয়ারি ও ডটার কোম্পানিগুলি থেকে	২৭০	৪৪৬	১,২২৭	১,৩৩১
স্বাধীন বিদেশী কোম্পানিগুলির মাধ্যমে	৩৭	৭৪	২১৫	২৬০
মোট	৩০৭	৫৬০	১,৪৪২	১,৫৯১

পাশাপাশি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি অনুন্নত দেশসমূহের মেধা ক্রয় করে নিয়ে শেষোক্তদের আরও রিক্ত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিক্রির ক্ষেত্রকে প্রসারিত এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে ক্রমান্বয়ে বেশী নির্ভরশীল করে ফেলে—ব্রেন ড্রেইন-এর এই প্রক্রিয়াকে রাষ্ট্রসংঘের দলিলগুলি বিপরীতমুখী প্রযুক্তি হস্তান্তর বলে চিহ্নিত করেছে। আংটাডের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬১ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে তৃতীয় দুনিয়া থেকে এইভাবে ১,১৯,০০০ জন বিভিন্ন বিদ্যায় মেধাসম্পন্ন মানুষ উন্নত দুনিয়ায় দেশান্তরী হয়েছিলেন, যার মধ্যে ৩৩ শতাংশ চিকিৎসাবিদ ও ৬৭ শতাংশ বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার ও টেকনিসিয়ান। ১৯৬০ থেকে '৮০ সালের মধ্যে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশান্তরী হওয়ার সংখ্যা ছিল ১,৪৩,০০০ জন এবং এদের ট্রেনিং দিতে আমেরিকা বিনিয়োগ করেছিল ৬ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এই দেশান্তরীরা তাদের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও শ্রমের বিনিময়ে আমেরিকাকে লাভ পাইয়ে দেয় ৬৩ বিলিয়ন ডলার। ১৯৮৭ সালে এ'বাবদ আমেরিকার লাভের পরিমাণ ছিল ১৮৯ বিলিয়ন ডলার। এই লাভের অর্থ হলো তৃতীয় দুনিয়ার সমপরিমাণ ক্ষতি।

এছাড়াও সামরিক সম্ভার, প্রচার-মাধ্যম, মহাকাশ গবেষণা প্রভৃতি ক্ষেত্রের তথ্য ও প্রযুক্তি বিক্রয় করে যে লাভ আমেরিকা করেছিল, তার পরিমাণও বিপুল।

(২) সমরবাদ ও সমরাস্ত্র-অর্থনীতি

পটভূমিকা : আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসে সমরবাদ ও সমরাস্ত্র-অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সমরাস্ত্র-অর্থনীতির অপর দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা ছিল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শিবিরকে সামরিক স্তরে ও সমর-অর্থনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়োজিত হতে বাধ্য করে শেষ পর্যন্ত শেষোক্তদের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেওয়া। বাড়তি এক উপাদান হিসাবে এই অবস্থা পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের পথকে সুগম করেছিল।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সমরবাদ ও সমরাস্ত্র-অর্থনীতির ভূমিকা সুদীর্ঘকালের। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার কালেও সমরাস্ত্র বিক্রি করে সমরবাদীরা যে প্রভূত লাভ অর্জন করতো তার তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই সমরবাদ ও সমরাস্ত্র-অর্থনীতি সর্বপ্রথম সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবিভাজ্য অংশ হয়ে উঠতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে শক্তিশালী সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উদ্ভব পুঁজিবাদকে সমরবাদের দিকে বিশেষত ও দ্রুত ঝুঁকতে বাধ্য করে। গড়ে উঠে অ্যানজাস, সেন্টো, সিয়াটো, ন্যাটো প্রভৃতি সামরিক জোট। সমর শক্তিতে সমাজতান্ত্রিক জোটের চেয়ে সবসময়ে শক্তিশালী থাকার চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বাজেটের উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় করতে থাকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে এবং সমরাস্ত্র উন্নয়নের বিষয়ে অর্থাৎ আর. অ্যাণ্ড. ডি. বা

গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য। নতুন বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবকে ব্যবহার, তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, অতিকায় সমরাস্ত্র শিল্প-ব্যবস্থার পত্তন, সমরাস্ত্রের অর্থনীতি ও শিল্পে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে প্রধান ভূমিকা নিতে উদ্যোগী ও সাহায্য করা ইত্যাদি হলো সমকালে সমরবাদ ও সমরাস্ত্র-অর্থনীতির পত্তনের প্রথম অধ্যায়। প্রথমদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে সমরাস্ত্র বিক্রী করার পরিবর্তে মিত্র দেশগুলিকে সামরিক সাহায্য দিতো উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি। '৬০-এর দশক পর্যন্ত আমেরিকার মিলিটারি অ্যাসিস্ট্যান্টস প্রোগ্রাম (এম. এ. পি.)-এর সুযোগ প্রধানত ন্যাটো-ভুক্ত দেশগুলি ও কিছু মিত্র রাষ্ট্র পেতো। এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যে ১০ হাজার যুদ্ধ বিমান ও ২০ হাজার ট্যাঙ্ক ও ৩০ হাজার বিভিন্ন ধরনের মিসাইল দিয়েছিল এই দেশগুলিকে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই অবস্থা মোটামুটি অব্যাহত ছিল। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদ এক প্রক্রিয়ামূলক তৎপরতা শুরু করেছিল। আমেরিকা স্বয়ং কোরিয়া-যুদ্ধ থেকে শুরু করে পর পর প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ঘিরে সামরিক বেষ্টনী গড়ে তুলেছিল। এর পর থেকে আঞ্চলিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া শুরু করে তারা। প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যে, তারপর দক্ষিণ এশিয়ায়—যেমন ভারত উপমহাদেশে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, ক্রমে আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে এবং লাতিন আমেরিকার নানা দেশে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে মদত দিয়ে যুদ্ধ/গৃহযুদ্ধ বাধাতে আরম্ভ করে। পরিণামে সমরবাদ থেকে সমরাস্ত্র-অর্থনীতিতে ভর পরিবর্তিত ও গভীর হতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদের যতই নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করুক না কেন, একদিকে তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধে বিশ্ব-বিপর্যয়ের আশঙ্কায় সারা পৃথিবীতে ব্যাপক যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত এবং অন্যদিকে '৬০-দশকের মাঝামাঝি ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে ঘরে-বাইরে তীব্র সমালোচনা ও ক্রমে গণ-বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়, '৭০-দশকের মধ্যভাগে ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয় এবং একই সাথে কেইনসিয় অর্থনীতি ও ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার পতনের সংযোগ-মুহূর্ত বিশ্ব-পুঁজিবাদের সমগ্র আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক স্তরে সংকটকে আরও গভীর করে ফেলে। স্বভাবতই আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ এই সময় থেকে অন্বেষণ শুরু করে বিভিন্ন নতুন নতুন কৌশলের। জনমানসকে ধোঁকা দিতে এবং একইসাথে পরিস্থিতির চাপে, রাশিয়ার সাথে হেলসিংকি শান্তি চুক্তি, সল্ট-১, সল্ট-২, স্টার্ট-১, স্টার্ট-২ প্রভৃতি সামরিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি করতে থাকে তারা। আন্তর্জাতিক স্তরে এই অবস্থাটা চলতে থাকলেও দেশের অভ্যন্তরে আমেরিকা 'নক্ষত্র যুদ্ধ' বা এস. ডি. আই. (স্পেশাল ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ)-এর প্রস্তুতির নামে অগ্রসর হতে থাকে এক অবিশ্বাস্য অর্থমূল্যের সমর বাজেট ব্যবস্থা নিয়ে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে নানা কায়দাতে সমরসজ্জা ও অস্ত্র ক্রয়ে প্ররোচিত করার কাজ তারা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

বিশ্ব সমরশক্তির বাস্তবতা : সমরাস্ত্র-অর্থনীতি কিভাবে পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছিল, তা' উল্লেখ করার পূর্বে দেখা দরকার, সমর-অর্থনীতির পরিণামে বিশ্বের সামরিক-শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির হাতে কি ধরনের অস্ত্র ও সরঞ্জাম মজুত হয়েছিল। এর থেকে ব্যবস্থাটির অর্থনৈতিক মাত্রা সম্পর্কে ধারণা চুম্বকে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। (পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলির সারণী দ্রষ্টব্য)

সমর সম্ভারের এই পরিসংখ্যান থেকে এটির আর্থিক স্বরূপটি যতটা স্পষ্ট হয়, তার চেয়ে বেশী বোঝা যায় সমগ্র মানব-সমাজ কি ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির মুখে এসে দাঁড়াচ্ছিল। পুঁজিবাদের বিপর্যয় নিবারক অন্যতম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—সমরাস্ত্র-অর্থনীতি শোষণের এক ভয়ানক উপাদান ছাড়াও সার্বিক ধ্বংসের সংবাহক হয়ে দাঁড়ায়। হিরোসিমাতে যে অ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তার সমতুল ১০ লক্ষ পারমাণবিক বোমা পৃথিবীতে মজুত হয়। রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে ৮০ দশকের শুরু পর্যন্ত পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি মোট ১০ ট্রিলিয়ন ডলার সামরিক খাতে ব্যয় করেছিল। তার মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের খরচ বাদে মোট ব্যয়ের মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের ভাগ ৯০ শতাংশ। অন্যান্য দেশে প্রধান ধরনের সামরিক সম্ভার রপ্তানির ৯৫ ভাগ করতো ৬টি মাত্র দেশ (১৯৮৪ সালের হিসাব) —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনুমিত সামরিক শক্তি (জুলাই ১৯৯১)

ক) ন্যাটোর কিছু দেশ

দেশ	সৈন্য সংখ্যা (হাজারে)			নৌবহর			জেট এয়ার ক্রাফট			সামরিক খাতে খরচ (১৯৯০-এর জি.এন.পি.-র শতাংশে)
	স্থলবাহিনী	নৌবাহিনী	বিমানবাহিনী	যুদ্ধবিমানবাহী জাহাজ	ডুবো জাহাজ	ডেস্ট্রয়ার/ফ্রিগেট	বম্বার এবং ফাইটার বম্বার	ফাইটার/ রেকইনসেনস	ট্যাঙ্কস	
১) কানাডা	২২.০	১৭.০	২২.৪	—	৩	৪ ডি.ডি.জি., ৬ এফ এফ.জি., ৮এফ.এফ.	১৮০ এফ., ১৮ এম. আর	—	১১৪	১.৯
২) ফ্রান্স	২৬০.৩	৬৪.৯	৯১.৭	২ সি. ভি. এস.	৮.৫ এস. এস. এন. ৪ এস. এস. বি. এন.	৪ ডি. ডি. জি. ৩৪ এফ. এফ. জি.	১৫ বি., ২৫৭ এফ. বি.	৫৪০, ৫৩ আর. ১৯ এস. আর.	১৩৪৩	২.৮
৩) জার্মানি	৩১৬.০	৩৫.২	৯৫.৮	—	২২	৩ ডি.ডি.জি., ৩ ডি. ডি, ৮ এফ. এফ.	৫৬৭ এফ. বি.	২০এফ., ৭১আর., ১৯ এম. আর.।	৭০৯০	১.৯
৪) ইতালি	২৩০.০	৪৮.০	৭৬.০	১ সি. ভি. ভি., ১ সি. জি. এইচ.	৮	১ডি.ডি.জি., ১ ডি.ডি. জি.এইচ., ৮ এফ.এফ. এইচ., ১৬ এফ.এফ.	১৭৭ এফ. বি.	৮৪এফ., ১৮আর., ১৮ এম. আর.	১২২০	১.৭
৫) হল্যান্ড	৬০.৮	১৫.৫	১২.০	—	৫	৪ ডি. ডি. জি., ১২ এফ. এফ.	১৫৭ এফ. বি.	২০ আর., ১৪ এম. আর.	৯১৩	২.৭
৬) পর্তুগাল	৩২.৭	১৫.৩	১০.৩						১২৯	২.৪
৭) স্পেন	১৪৬.০	৩৬.৯	৩৫.০	১ সি. ভি. ভি.	৮	৯ এফ. এফ. জি. ৬ এফ. এফ.	৮৮ এফ. বি.	১১৩, ২০ আর. ৭ এস. আর.	৮৩৮	১.৬
৮) তুরস্ক	৪৫০.০	৫২.৩	৫৮.০	—	১২	১৬ ডি.ডি.,৮ এফ.এফ.	৪৯০ এফ. বি.	২০, ২৬ আর.	৩৯২৪	৩.১
৯) ইউনাইটেড কিংডম	১৪৫.৪	৬২.১	৮৬.০	৩ সি. ভি. ভি.	৬, ১৩ এস. এস. এন. ৩ এস. এস. বি. এন.	১২ ডি. ডি. জি., ২৯ এফ. এফ. জি.	২৩ বি., ৩৫৬ এফ. বি.	৮৬, ১১ আর. ৩৩ এস. আর.	১৩১৮	৪.২
১০) ইউ.এস.এ.	৬৭৪.৮	৭৩৯.৬৫	৪৯৯.৩	৭সি.ভি.এন., ৭ সি.ভি. ৯ সি.জি.এন., ৩৯ সি. জি., ৭ এল. এইচ. এ., ৭ এস. পি. এইচ., ১২ এল. পি. ডি., ৩৩ এল. এস. জি.	৬৯ এস. এস. এন., ২৫ এস. এস. বি. এন., ১৮ এস. এস. জি. এন.	১৪ ডি. ডি. জি., ৩১ ডি. ডি., ৫১ এফ. এফ. জি., ৩২ এফ. এফ.	২৭০ এস. বি., ২৭৫ বি., ৪৩৫৪ এফ. বি.	২৭০৪, ১৬১ আর. ৩৩৪ এম.আর./এ., এস. ডবলিউ।	১৫৬২৯	৫.১

খ) ন্যাটো বর্জিত ইউরোপ										
১১) আলবেনিয়া	২৭.০	২.০	১১.০	—	২	—	২২ এফ. বি.	৭০	১০০	—
১২) বুলগেরিয়া	৭৫.০	১০.০	২২.০	—	৩	২ এফ. এফ.	৫৭ এফ. বি.	১৪১, ৪০ আর.	২১০০	৬.৯
১৩) চেকোশ্লোভাকিয়া	৭২.০	—	৪৪.৮	—	—	—	১৫৩ এফ. বি.	১০৯, ৪২ আর.	৩২০৮	২.৯
১৪) হাঙ্গেরি	৬৩.৫	—	১৭.৩	—	—	—	—	৫৯, ১১ আর.	১৩৫৭	২.৩
১৫) পোল্যাণ্ড	১৯৪.২	১৯.৩	৮৩.০	—	৩	১ ডি. ডি. জি., ১ এফ. এফ.	১২৪ এফ. বি.	২৫৭, ২৪ আর.	২৪৫০	২.৪
১৬) রুমানিয়া	১৬১.০	১৯.০	২০.০	—	—	১ ডি. ডি. জি., ৫ এফ. এফ.	১৪০ এফ. বি.	২৩৭, ২৪ আর.	২৪৭৫	৩.১
১৭) ইউক্রেন	১৫০	—	৫০.০	—	—	—	৯৬ বি., ২৯০ এফ. বি.	৩৪০ এফ., ৮৭ আর.	৬৩০০	—
১৮)ফেডারেল রিপাব্লিক অব যুগোশ্লাভিয়া	১০০.০	৬.০	২৯.০	২৯ সি.জি., ১ সি.জি. এইচ., ৩ সি.জি.এস., ১ সি.ভি.,৩ সি.ভি.ভি	৫	৪ এফ. এফ.	১২৬ এফ. বি.	১২৬, ৭১ আর.	১০০০	১৮.৬
১৯) রাশিয়া	১৪০০.০	৩২.০	৮০০	—	৮০, ৫৯ এস.এস.এন., ৫৫ এস.এস.বি.এন., ৩৬ এস.এস.জি.এন., ৮ এস. এস. জি.	২৬ ডি. ডি. জি., ১২৯ এফ. এফ.	১৭০ এস. বি., ৫৫৫ বি. ১৫০ এফ. বি.,	৩৭৩৫, ৩৬৫ আর. ৯০ এম. আর.	২৯০০০	১১.১
গ) মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা, সাব-সাহারান আফ্রিকা										
২০) আলজিরিয়া	১২০.০	৭.০	১২.০	—	২	৩ এফ. এফ.	৫৭ এফ. বি.	১৪৯,৩ আর.	৯৬০	১.৪
২১) ইজিপ্ট	২৯০.০	২০.০	৩০.০	—	৪	৪ এফ. এফ.	১১৩ এফ. বি.	২০৫, ২০ আর.	৩০৯০	৭.৫
২২) ইরান	৩০৫.০	১৮.০	০৫.০	—	—	৩ ডি. ডি., ৩ এফ. এফ.জি., ২ এফ.এফ.	১৩০ এফ. বি.	১২০এফ.,৮ আর.	৭০০	৭.১
২৩) ইরাক	৩৫০.০	১.৬	৩০.০	—	—	—	৬ বি., ১৩০ এফ.বি.	১৮০, ৫ আর.	২৩০০	—
২৪) ইসরায়েল	১৩৪.০/ ৫৯৪.০	১০.০/ ১০.০	৩২.০/ ৩৭.০	—	৩	—	৬০০ এফ. বি.	১৪ আর.	৩৮৯০	৯.৯
২৫) জর্ডন	৮৫.০	০.৪	১৪.০	—	—	—	৬২ এফ. বি.	৩২	১১৩১	১৪.১
২৬) লিবিয়া	৫৫.০	৮.০	২২.০	—	৬	৩ এফ. এফ.	৫ বি., ১৩৩ এফ.বি.	২৩৪, ১৩ আর.	২১৫০	—
২৭) সৌদি আরব	৭৩.০	১১.০	১৮.০	—	—	৮ এফ. এফ. জি.	৯৭ এফ. বি.	১০২, ১০ আর.	৭০০	৩৩.৮
২৮) সিরিয়া	৩০০.০	৮.০	১০০.০	—	৩	—	—	—	৪৬০০	১৩.০

ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, ওশেনিয়া

২৯) দক্ষিণ আফ্রিকা	৪১.৯	৪.৫	১০.০	—	৩	—	১১৬ এফ. বি	৪	২৫০	৩.৬
৩০) আর্জেন্টিনা	৩৫.০	২০.০	১০.০	—	৪	৬ ডি. ডি. জি., ৭ এফ. এফ. জি	৬ টি, ৮২ এফ. বি	—	২৬৬	১.৭
৩১) ব্রাজিল	১৯৬.০	৫০.০	৫০.৭	১ সি. ভি. ভি.	৪	৪ ডি এইচ., ১২ এফ. এফ. জি	৬৬ এফ. বি	১৮	—	০.২
৩২) কিউবা	১৭৫.০	১৩.৫	১৭.০	—	৩	৩ এফ. এফ.	২০ এফ. বি	১২৬	১৭০০	৫.০
৩৩) মেক্সিকো	১৩০.০	৩৭.০	৮.০	—	—	৩ ডি. ডি.	—	১১	—	০.৫
৩৪) অস্ট্রেলিয়া	৩০.৩	১৫.৩	২২.৩	—	৫	৩ ডি. ডি. জি., ৫ এফ. এফ. জি., ৩ এফ. এফ.	১৮ বি., ৫২ এফ. বি	১৯ এম. আর., ৪ আর আর	১০৩	২.৪
৩৫) চীন	২৩০০.০	২৬০.০	৪৭০.০	—	৩৮, ১ এম. এম. জি., ৫ এস. এস. এন., ১ এস. এস. এন. এন.	১৯ ডি. ডি. জি., ২৭ এফ. এফ. জি., ১০ এফ. এফ.	৬৩০ বি., ৬০০ এফ. বি	৪৬০০,৩০০ আর., ২০ এম. আর	৮০০০	৩.২
৩৬) ভারত	১১০০.০	৫৫.০০	১১০.০	২ সি. ভি. ভি.	১৫, ১ এস. এস জি এন	৫ ডি. ডি. জি ৫ এফ. এফ. এইচ., ১৫ এফ. এফ.	৩৫৪ এফ. বি	২৯৮, ১৮ আর ২২ এস. আর	৩৮০০	২.৯
৩৭) জাপান	১৫৬.০	৪৪.০	৪৬.০	—	১৭	৬ ডি. ডি. জি ২৪ এফ. এফ. এইচ.	৯৪ এফ. বি	১৩০, ১০ আর ১০৪ এম. আর	১৮০০	৩.৮
৩৮) উঃ কোরিয়া	১০০০.০	৪০.০	৯২.০	—	২২	২ এফ. এফ., ১ এফ. এফ. জি	৮০ বি ৩১০ এফ. বি	৩৭৬	৩০০০	২৬.৭
৩৯) দঃ কোরিয়া	৫২০.০	৬০.০	৫৩.০	—	—	৫ ডি. ডি. জি, ৪ ডি. ডি., ৭ এফ. এফ. জি	১৯০ এফ. বি	৯৬, ২৮ আর	১৮০০	৩.৮
৪০) নিউজিল্যাণ্ড	৪.৮	২.৪	৩.৭	—	—	৪ এফ. এফ. এইচ	২১ এফ. বি	৬ এম. আর	—	৭.০
৪১) পাকিস্তান	৫১৫.০	২০.০	৪৫.০	—	৬	১ ডি. ডি. এইচ, ৪ এফ.এ.জি.,৬ এফ. এফ.	১২৬ এফ. বি	২১৪, ১২ আর ৪ এম. আর	১৯৮০	৭.০
৪২) ভিয়েতনাম	৭০.০	৪২.০	১১৫.০	—	—	১ এফ. এফ. জি ৬ এফ. এফ.	৬০ এফ. বি	১২৫	১৩০০	—

* পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত নোট দ্রষ্টব্য

নোট : প্রদত্ত তথ্যগুলির মধ্যে প্যারা-মিলিটারি (আধা-সামরিক বাহিনী), সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা বাহিনী ও ইরেগুলার বা অনিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ধরা হয়নি। নৌ-বাহিনী সংক্রান্ত তথ্যে ১০০ টন বা তার নীচের নৌযানের সংখ্যা যুক্ত করা হয়নি।

এয়ার-ক্র্যাফ্ট ক্যারিয়ার—সি. ভি.। এয়ার ক্র্যাফ্ট ক্যারিয়ার—নিউক্লিয়ার-(সি.ভি.এন.) : ভি/এস.টি.ও. এল.। হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার—সি. ভি. ভি.। জেনারেল পারপাস অ্যাম্ফিবিয়ান (উভচর) অ্যাসাল্ট (আক্রমণকারী)শিপ—এল.এইচ.এল.।অ্যাম্ফিবিয়ান ট্রান্সপোর্ট ডক—এল.পি.ডি.।অ্যাম্ফিবিয়ান অ্যাসাল্টশিপ(হেলিকপ্টার)—এল.পি.এইচ.। ডক/ট্যাঙ্ক ল্যান্ডিং শিপ—এল. এস. ডি. টি.। ব্যাটলশিপ—বি. বি. জি.। হেলিকপ্টার ফ্রিগেড—এফ. এফ. এইচ.।

* এন উল্লেখের অর্থ নিউক্লিয়ার শক্তির দ্বারা পরিচালিত।

নিউক্লিয়ার পাওয়ার অ্যাটাক সাবমেরিন—এস. এস. এন.। ব্যালাস্টিক মিসাইল সাবমেরিন—এস. এস. বি.। গাইডেড (ক্রুইজ) মিসাইল সাবমেরিন—এস. এস. জি.। কোস্টাল সাবমেরিন—সি.।

বম্বারস—বি., ফাইটার বম্বারস—এফ. বি.। স্ট্র্যাটেজিক বম্বারস—এস. বি.। রেকনেশেনস ফাইটার—আর.। মেরিটাইম রেকনেশেনস—এম. আর.। পরিসংখ্যানের মধ্যে সমস্ত বাহিনীর মোট বিমান সংখ্যা ধরা হয়েছে।

মেইন ব্যাটল ট্যাঙ্কস এম. বি. টি.—মাঝারী বা ভারী (৩১ টন বা তদূর্ধ্ব ওজনের ট্যাঙ্ক)।

তথ্যগুলি জি. এন. পি. (গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট) বা মোট জাতীয় উৎপাদনের ভিত্তিতে। যে রাষ্ট্রগুলির উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তি আছে তার মধ্যেও বাছাই কয়েকটি দেশকে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে।

তথ্যগুলির মধ্যে স্ট্রাটেজিক রকেট ফোর্সেস (১,৪৪,০০০) এবং ওয়ার ডিফেন্স ফোর্সেস (৩,৫৬,০০০) যুক্ত রয়েছে, যদিও এই দু'টি স্বতন্ত্র বাহিনী হিসাবে বিবেচিত।

ব্রেটন-উডস ব্যবস্থা পতনের পর সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতা ও উন্নত সমরাস্ত্র সংগ্রহ তথা সমরাস্ত্রের বাজারের ও বিক্রির লক্ষণীয় দ্রুত বিকাশ দেখা যায়। প্রসঙ্গত দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৫৮ সালে অনুন্নত দেশগুলির একটির মাত্র ভূমি-থেকে-আকাশে নিক্ষেপযোগ্য মিসাইল ছিল ১৯৭৫ সালে এইরকম অস্ত্র সংগ্রহকারী অনুন্নত দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭টিতে এবং ১৯৮০ সালে এইরূপ দেশের সংখ্যা হয় ৫৩টি। ১৯৫৬ সালে মাত্র ১৩টি অনুন্নত দেশের সুপারসোনিক (শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী) যুদ্ধ বিমান ছিল, ১৯৭৫-এ ৪১টি অনুন্নত দেশ তা' সংগ্রহ করে। ডিজেল-চালিত সাবমেরিন (ডুবোজাহাজ) তৃতীয় দুনিয়ার কোন দেশের ছিল না, ১৯৭৫ সালে ৭টি দেশ এবং '৮০ সালে ২৩টি দেশ তা' সংগ্রহ করে।

সমরাস্ত্র-বাণিজ্যের সংবাহক শক্তি : এবারে সমরাস্ত্র-অর্থনীতির অন্য কিছু দিক লক্ষ্য করা যাক। এই সময়ে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষ যুদ্ধ-যন্ত্রের প্রত্যক্ষ অংশীদার হিসাবে সৈনিক থেকে সেনাধ্যক্ষ স্তর পর্যন্ত নিযুক্ত ছিল; তাছাড়া ছিল আরও ৭ কোটি মানুষ সমরসম্ভার উৎপাদনের সাথে যুক্ত। ৩০ লক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ সমরাস্ত্র উৎপাদনের অর্থনীতিতে অংশীদার—যাদের জন্য সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতে মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশ ব্যয়িত হতো।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই সমরাস্ত্র উৎপাদন প্রধানত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশেষত মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির, দ্বারা ঘটতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইরকম কোম্পানির সংখ্যা ছিল ১,২০,০০০টি, যার মধ্যে ১০০টি প্রধান। পেন্টাগনের চাহিদা পূরণ করতো প্রধানত যে ৮০টি কোম্পানি, তাতে নিয়োজিত ছিল ৫০ লক্ষ মানুষ। পশ্চিম জার্মানিতে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে নিয়োজিত কোম্পানির সংখ্যা ৫,০০০ এবং গ্রেট ব্রিটেনে ৫,০০০। ১৯৭৯ সালে ২০টি প্রধান পশ্চিমী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ফরেন মিলিটারি সাপ্লাই (এফ. এম. এস.) অর্থাৎ বিদেশে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির চরিত্র ছিল এইরূপ :

প্রধান ১০টি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান	এফ. এম. এস. (মিলিয়ন ডলারে)	প্রধান ১০টি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান	এফ. এম. এস. (মিলিয়ন ডলারে)
লকহীড ম্যাগডোনেল	১,৪০০	ড্রেসলথ ব্রিগুয়েথ (ফ্রান্স)	১,১৭০
ডগলাস	৬৩৮	এম. বি. বি. (পশ্চিম জার্মানী)	৭৫৬
জেনারেল ডায়নামিকস	৫১৮	ব্রিটিশ এয়ারোস্পেস (ইউ. কে.)	৭৩০
নরথর্প	৪৫৬	এয়ারোস্পেটেয়ালি (ফ্রান্স)	৬৫০
স্পেরি	২৪৯	রয়াল অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীজ (ইউ. কে.)	৬৩৯
রেথিয়ন	১৩২	থমসন সি. এম. এফ. (ফ্রান্স)	৬২৫
ভিনেল	১১০	ক্রাউস-ম্যাফি (পশ্চিম জার্মানী)	৫৪০
টেক্সট্রন/বেল	১০৯	ইসরায়েল এয়ারক্র্যাফ্‌ট ইণ্ডাস্ট্রি	৩৩৬
জেনারেল ইলেকট্রিক	১০১	রোলস রয়েস	২৩৬
ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক	৮৫	এম. এ. টি. আর. এ. (ফ্রান্স)	২১০

সমর-বাণিজ্যে আমেরিকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সামরিক প্রধানরা, বহুজাতিক সংস্থা এবং ক্রেতা দেশগুলির রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে সম্পর্ক ত্রিভুজের তিন বিন্দুর মতই ওতোপ্রোত। তিন ধরনের নমুনাতে বিষয়টি দেখা যেতে পারে ঃ

প্রথমত, মার্কিন প্রশাসনের নিরিখে প্রসঙ্গটি দেখা যাক। প্রেসিডেন্ট রেগন ব্যাঙ্ক অব আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোস্থ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছিলেন—যে ব্যাঙ্ক পৃথিবীর বৃহত্তম মালটিন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও অনেকগুলি সামরিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পুঁজি সরবরাহকারী। রেগন ৮ বছর চাকুরী করেছিলেন জেনারেল ইলেকট্রিকে—যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এবং পেন্টাগনের মাল সরবরাহকারী (১৯৮২ সালে ৩৭০ কোটি ডলার মূল্যের মাল সরবরাহের বরাত পেয়েছিল)। তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ সুলজ্ ও পেন্টাগন-প্রধান ক্যাসপার ওয়েনবার্গার এসেছিলেন বেখটেলের ক্যালিফোর্নিয়ার ফার্ম থেকে—যা ব্যাঙ্ক অব আমেরিকার সাথে যুক্ত।

দ্বিতীয়ত, আমেরিকার ৯৫টি সামরিক-শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ২০৭২ জন অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ, অ্যাডমিরাল ও কর্ণেল চাকুরী করতেন। তাছাড়া, যাঁরা প্রধান প্রধান পদ অলঙ্কৃত করেছেন তার সামান্য নমুনা হলো ঃ (সারণী—ক দ্রষ্টব্য)

সারণী—ক

সামরিক ব্যক্তির নাম	প্রাক্তন সরকারী পদ	সামরিক-শিল্প প্রতিষ্ঠানে পদ
জেনারেল এ. হেগ	সুপ্রীম অ্যালায়েড কমাণ্ডার, ইউরোপ	প্রেসিডেন্ট, চিফঅপারেটিং অফিসার, ডাইরেক্টর, ইউনাইটেড টেকনিক্যাল কর্পোরেশন
জেনারেল ডব্লু. ইভান্স	সি-ইন-সি, ইউ. এস. এয়ার ফোর্সেস ইন ইউরোপ	ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ইউনাইটেড টেকনোলজি কর্পোরেশন
জেনারেল আর. ডিক্সন	কমাণ্ডার, টি. এ. সি. এয়ার কমাণ্ড, জেনারেল ইউ. এস. এ. এফ.	প্রেসিডেন্ট, ফেয়ারচাইল্ড রিপাবলিক
লে. জেনারেল এ. মার্টিন	ডাইরেক্টর, ডিফেন্স ম্যাপিং এজেন্সি	প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, অ্যাডভান্স ব্যালাস্টিক রি-এন্ট্রি সিস্টেম, এস. এ. এম. এস. ও.
ভাইস-অ্যাডমিরাল আর. ক্লিন্ট	অফিস সেক্রেটারি অব নেভি এইডি টু চিফ্ ন্যাভাল অপারেশন	ভাইস-প্রেসিডেন্ট, টেলিডাইন রেয়ান এয়ারোনটিক্যাল

সারণী—ক (পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

সামরিক ব্যক্তির নাম	প্রাক্তন সরকারী পদ	সামরিক-শিল্প প্রতিষ্ঠানে পদ
এম. কুরিই	ডাইরেক্টর, ডিফেন্স রিসার্চ অ্যাণ্ড ইঞ্জি. অফিস.; সেক্রেটারি অব দা আর্মি	ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মার্টিন মারিয়াট্টা এয়ারোস্পেস
জে. পামার	আণ্ডার সেক্রেটারি, ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অব এয়ার ফোর্স; ডাইরেক্টর অব মিলিটারি প্রোগ্রাম	লকহীড মিসাইল অ্যাণ্ড স্পেস কোম্পানি

আমেরিকার মিলিটারি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (এম. এ. পি.)-এর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের আগে তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রের মানুষদের মধ্যে যাঁরা আমেরিকায় সামরিক শিক্ষা নিয়েছেন ও পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে যাঁরা স্বীয় দেশে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন, তার তথ্য নিম্নরূপ ঃ আমেরিকার আর্মি স্কুলের ২০ জন স্নাতক বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান হয়েছিলেন; ১৫৩ জন হয়েছিলেন এম. পি.; তৃতীয় দুনিয়া থেকে আগত ইউ. এস. এয়ার ফোর্স স্কুলের শিক্ষার্থীদের ১৭% জেনারেল ও ২৯% কমাণ্ডার অব এয়ার ফোর্স, এভিয়েশন কোম্পানিগুলির প্রধান, এয়ার ফোর্স বেসের কমাণ্ডার, মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত হযেছিলেন। ইউ. এস. ন্যাভাল স্কুল থেকে পাশ করা ২৫০ জন হয়েছিলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের অ্যাডমিরাল বা সমুদ্রবাহিনীর প্রধান এবং ৪২ জন হয়েছিলেন ন্যাভাল কমাণ্ডার। দেখা গেছে কতিপয় লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার রাষ্ট্রে এঁদের মধ্যে কয়েকজন রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছেন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে।

এই বাস্তব পরিসংখ্যানের অভ্যন্তরে নিহিত রয়েছে সমর-সম্ভারের বাণিজ্য কিভাবে অন্য এক ধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ও পরিপুষ্ট হয়ে চলেছিল।

সমর-বাণিজ্যের স্বরূপ ঃ রাষ্ট্রসংঘের প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে তৃতীয় দুনিয়ার সর্বোচ্চ ঋণগ্রহীতা ২০টি দেশের ঋণের বড় অংশ পশ্চিমী দেশ থেকে সমরাস্ত্র ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। এদের মধ্যে ৪টি দেশের ক্ষেত্রে তা' ৪০%-এর বেশী। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে সমরাস্ত্র বিক্রি করে বছরে গড়ে ২০০ বিলিয়ন ডলার করে লাভ করেছিল পশ্চিমী দুনিয়া।

এম. এন. সি.গুলি, ঘোষিত বিক্রয়ের বাইরে, সামরিক-সম্ভার গোপনে ব্যাপক বিক্রি করতো। গোপন অস্ত্র বিক্রি সংক্রান্ত ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি, কন্ট্রাগেট কেলেঙ্কারি ইত্যাদি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল। তাছাড়াও এক্ষেত্রে এম. এন. সি.গুলির মধ্যে যেগুলি অন্যদেশের সাথে গোপনে বিপুল আর্থিক আদানপ্রদান করতো, তার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হলো ঃ (সারণী—খ দ্রষ্টব্য)

সারণী—খ

বোয়িং	মিশর ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্র, জাপান, কানাডা, ইউ. কে., পাকিস্তান, কুয়েত, গ্রীস, হণ্ডুরাস, দক্ষিণ কোরিয়া, লেবানন, স্পেন
গ্রুম্যান	জাপান, ইরান, পেরু
হিউজেস	ইন্দোনেশিয়া
লকহীড	ইউরোপ, জাপান, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, মরক্কো, কুয়েত, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, পেরু, ভেনেজুয়েলা, স্পেন, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, লিবিয়া
ম্যাকডোনেল ডগলাস	পাকিস্তান, দঃ কোরিয়া, ফিলিপিনস, ভেনেজুয়েলা, জায়রে, জাপান, কানাডা
নরথর্প	ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, সৌদি আরব, ব্রাজিল
রেথিয়ন	জর্ডন, সৌদি আরব
টেক্সটন/বেল	ঘানা, নাইজেরিয়া, ইরান, মরক্কো, শ্রীলঙ্কা, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, কলম্বিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, জামাইকা, ফিলিপিনস

সামরিক-শিল্পের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির লাভের হার কি অবিশ্বাস্য মাত্রার ছিল, তা' অংশত বোঝা যায় আমেরিকান সেনেট কমিটির ১৯৮৫ সালের রিপোর্ট থেকে। তাতে বলা হয়েছিল সামরিক সরঞ্জামের অর্ডার-প্রাপ্ত ১৬৪টি কোম্পানি ৫০-২০০%, ৩টি কোম্পানি ৫০০% এবং ১টি কোম্পানি ২০০০% লাভ করে। যেসব এলাকায় সামরিক উত্তেজনা ছিল বা তৈরি করা হচ্ছিল আপৎকালীন ভিত্তিতে, সেইসব অঞ্চলে অস্ত্র বিক্রি করে অনেক বেশী মুনাফা করা হতো। উদাহরণ হিসাবে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পীস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিপরি বা এস. আই. পি. আর. আই.) হিসাব দিয়ে দেখিয়েছিল যে ১৯৭৮ সালের মধ্যে পশ্চিম এশিয়াতে ১৮,০০০ মিলিয়ন ডলার, দূর প্রাচ্যে ১২,০০০ মিলিয়ন ডলার, আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ৮,০০০ মিলিয়ন ডলার এবং লাতিন আমেরিকাতে ৭৫,০০০ মিলিয়ন ডলারের তথা ৭৫ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রসামগ্রীর ব্যবসা করেছিল উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি।

১৯৮০-এর দশকের প্রথমার্ধে ১৫০০ মার্কিন সামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ১০০টির বেশী দেশে অস্ত্র বিক্রির ব্যবসা করতো, যাদের মধ্যে ৫০০টির বিদেশের মাটিতে অস্ত্র-নির্মাণ পদ্ধতি বিক্রি বা নির্মাণের লাইসেন্স ছিল। ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকান পেটেন্ট অস্ত্র-নির্মাণের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎপাদনের বিদেশস্থ কারখানাগুলিতে ৬০ ধরনের মৌলিক অস্ত্র নির্মিত হতো। '৮০-এর দশকের প্রথমার্ধের মধ্যে বিদেশে প্রতিষ্ঠান গড়ার ২০০-৩০০ অনুরূপ লাইসেন্সের অনুমোদন দিয়েছিল আমেরিকা। শেষোক্ত সময়ে আমেরিকার প্রধান ১০টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান ৪৮টি উন্নত ও ৫টি অনুন্নত দেশের মোট ৫৩টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সামরিক কর্মসূচী প্রস্তুতির ভার পেয়েছিল।

সুতরাং এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হবে যে কেবল সামরিক সম্ভার বিক্রি করে নয়, সামরিক যন্ত্রপাতির পেটেন্টের লাইসেন্স লীজ দিয়ে বা বিক্রি করে, সামরিক কলাকৌশল তালিম দিয়ে ও সামরিক শিক্ষা দিয়ে, সরবরাহকৃত সামরিক সম্ভারের নবায়ন করে, যে ২৫০০টি ভৌগোলিক এলাকায় আমেরিকার ও ন্যাটোর সামরিক ঘাঁটি রয়েছে তাদের কাছ থেকে প্রহরা বাবদ টাকা নিয়ে, রাষ্ট্রসংঘের পতাকা নিয়ে বা অন্য কোন মিত্র দেশের আমন্ত্রণে অন্য দেশকে শায়েস্তা করতে আক্রমণ চালানোর খরচের নামে, মিত্র দেশগুলির কাছে তাদের শত্রুদেশের গোপন সামরিক তথ্য বিক্রি করে এবং সামরিক সম্ভার ঋণ দিয়ে মূল্য, লাভ ও সুদ মারফৎ বিশাল উদ্বৃত্ত পুঁজি অর্জন করেছিল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের শিরোমণিরা। পাশাপাশি তৃতীয় দুনিয়ার দুর্বল মিত্র রাষ্ট্রের সামরিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার ভার নেওয়া, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সমর-বিশারদদের সেই দেশের বাহিনীতে ডেপুটেশনে পাঠিয়েও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ যে বিশাল উদ্বৃত্ত পুঁজি অর্জন করছিল তাকে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলাফলজনিত বাণিজ্য ও ক্যাপিটাল মার্কেটের মুনাফা ছাড়া অন্য কোন আর্থিক তৎপরতার সাথে তার তুলনা চলে না।

তৎকালে বিশ্বের সমগ্র শিল্প-উৎপাদনের ব্যবস্থার এক বড় অংশ জুড়ে ছিল সামরিক সম্ভার উৎপাদনের শিল্প। প্রতিনিয়ত উদ্ভাবিত আরও ভয়ঙ্কর অস্ত্রগুলি বাজারের আকর্ষণ বাড়াচ্ছিল। ফলে অন্যান্য দেশগুলি থেকে সামরিক সামগ্রী ও পণ্যের চাহিদার কখনো ঘাটতি ঘটতো না। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সেনাবাহিনীতে ও সমরোৎপাদনের কাজে অজস্র মানুষের চাকুরীর সংস্থান হচ্ছিল। বেকারীর ভয়ঙ্কর চাপের মুখে এই সমর-অর্থনীতি যেমন তাদের কাছে সামাজিক সংকট থেকে পরিত্রাণের অংশত সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, অন্যদিকে স্বদেশে বা বিদেশে এই ব্যবস্থার সাথে যুক্ত কয়েক কোটি মানুষের শ্রম থেকে উদ্বৃত্ত তথা মুনাফা নিয়মিত কমিয়েও উন্নত দেশগুলির অর্থনীতি হচ্ছিল স্ফীত।

সমর-অর্থনীতির বিশালত্ব অনুধাবনের জন্য তৎকালীন পৃথিবীর কতকগুলি দেশের সামরিক খাতে ব্যয় লক্ষ্য যেতে পারে। (সারণী—গ দ্রষ্টব্য)

সারণী—গ

১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে সামরিক খাতে ব্যয় (মিলিয়ন ডলারে)

দেশ	১৯৭৬	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৮৫ সালে সামরিক খাতের মোট ব্যয়ের অংশ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,৩১,৭১২	১,৪৩,৯৪১	২,০৪,৮৯৬	৩০.৯%
ন্যাটো-ভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্র	১,০৫,৫৯২	১,১২,৩২০	১,২২,৭৮৪	১৮.৫%
মোট ন্যাটো-ভুক্ত রাষ্ট্র	২,৩৩,৩০৪	২,৫৬,৩০১	৩,২৭,৬৮০	৪৯.৪%
সোভিয়েত ইউনিয়ন	১,২৪,২০০	১,৩১,৮০০	১,৪৬,২০০	২২.০%
অন্যান্য ওয়ারশ' ট্রিটি ভুক্ত রাষ্ট্র	১১,৫৪৮	১২,৪৭৯	১৩,৯৩২	২.১%
মোট ওয়ারশ' ট্রিটি-ভুক্ত রাষ্ট্র	১,৩৫,৭৪৮	১,৪৪,২৭৯	১,৬০,১৩২	২৪.১%
ইউরোপের বাকি দেশ	১৪,০৮৪	১৫,৪২৭	১৬,৬৩৯	২.৫%
মধ্য প্রাচ্য	৩৯,১১৬	৪১,১৯০	৪৯,৬৩৪	৭.৫%
দক্ষিণ এশিয়া	৫,৭১৪	৬,৫৯৯	৯,০৮৭	১.৪%
দূর প্রাচ্য (চীন বাদে)	২১,২৭০	২৭,৩৬০	৩৪,৮০০	৫.২%
চীন	৪৪,৭০০	৪২,৭০০	৩০,০০০	৪.৫%
ওশেনিয়া	৩,৮৩২	৪,২৭৩	৫৩৫	০.৮%
আফ্রিকা (মিশর বাদে)	১২,৯৫০	১৪,৭৫৮	১২,৬৯৯	১.৯%
মধ্য আমেরিকা	১,৮৯১	২,৮৫৩	৩,৭৯৭	০.৬%
দক্ষিণ আমেরিকা	৯,৯০৭	১১,৩০৫	১৩,৩০০	২.০%
বিশ্ব (মোট)	৫,৫২,৫২০	৫,৬৭,০৫০	৬,৬৩,১২০	১০০%

সমর-অর্থনীতিতে দুর্নীতির উপাদান : উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সামরিক সম্ভার অন্য দেশে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায়, অন্যতম বিক্রি করার পথ ছিল ঘুষ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সম্মত করানো। ভারতের ক্ষেত্রে জাগুয়ার বিমান ও পরবর্তীকালে বোফর্স কামান কেনার পেছনের ইতিহাস অনেকেরই জানা। ইরানের শা'র পতনের পরও এই ধরনের ঘুষের অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। প্রিন্স শাহ্রুখকে ৭ লক্ষ ডলার ও ঐ দেশের সামরিক চক্রকে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য বিপুল অর্থ ঘুষ দিয়েছিল নরথর্প কর্পোরেশন। পাকিস্তানে সামরিক বিমান বিক্রয়ের জন্য সেখানকার রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বকে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ম্যাগডোনেল ডগলাস কোম্পানি ১৫ লক্ষ ডলারের কাছাকাছি অর্থ ঘুষ দেয়। লকহীড কোম্পানি কলম্বিয়াতে ১১ কোটি ডলার মূল্যের হারকিউলিস মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট বিমান বিক্রয়ের জন্য ঘুষ দিয়েছিল বিমান বাহিনীর কমাণ্ডার, বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীসহ উচ্চ কর্তৃপক্ষদের ৫০ লক্ষ ডলার। নাইজিরিয়াতেও অনুরূপভাবে ঘুষ দিয়ে ৬টি হারকিউলিস বিমান বিক্রয় করা হয়। কলম্বিয়াতে পশ্চিম জার্মানির হেকলার অ্যাণ্ড কচ কোম্পানি ২ লক্ষ ডলার ঘুষ দিয়ে তাদের নির্মিত রাইফেল বিক্রি করে। ডাচ পার্লামেন্টের ২ জন সদস্যকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ফরাসী মিরাজ বিমান কেনার ব্যাপারে ঘুষ নেবার জন্য। লকহীডের বিরুদ্ধে ঘুষ দেবার অভিযোগে আড়াই বছর ধরে কোর্টে যে মামলা চলেছিল তাতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে জরিমানা করা হয়েছিল ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ডলার, যদিও জানা গিয়েছিল যে ১৯টি দেশে এই প্রতিষ্ঠানটি ২ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ঘুষ দিয়েছে। অরগানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট সংস্থার সভায় অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি উত্থাপিত ঘুষ দেবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ং।

এইভাবে পুঁজিবাদের নতুন করে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টার পেছনে ঘুষ একটি অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করে চলেছিল।

সমরাস্ত্র শিল্প-ব্যবস্থা সামাজিক দিক থেকে প্রবল অপচয়মূলক হলেও, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের কাছে প্রবল লাভজনক হওয়ায় বিশ্ব-অর্থনীতির এক অনতিক্রম্য অংশ হয়ে উঠেছিল। যেসব ব্যবস্থার দ্বারা উন্নত পুঁজিবাদ স্বীয় স্বার্থে তখন অন্যান্য দেশকে ব্যাপকভাবে আসক্ত করতে এবং এক বাধ্যতামূলক স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছিল, তার প্রথমটি ছিল সমরাস্ত্র-শিল্প অর্থনীতি। তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশই নিজেদের সাধ্য ও ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে প্রলুব্ধ হয়ে আক্রান্ত হয়েছিল এই ব্যাধিতে।

সামাজিক মানদণ্ডের বিচারে সমর অর্থনীতির স্বরূপের আর একটি দিক সংক্ষেপে দেখা যাক।

সামরিক বাণিজ্যে লাভ = সামাজিক ক্ষতিঃ এই কাল-পর্বে পৃথিবীর প্রতি ১ লক্ষ মানুষে যেখানে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ৮৫ জন, সেখানে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ঐ সংখ্যক মানুষে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ৫৫৬ জন (১৯৮২ সালের হিসাব)। একটি আধুনিক বোমারু বিমানের মূল্যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষকের ১ বছরের বেতন দেওয়া কিংবা ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ৭৫টি হাসপাতাল যন্ত্রপাতিসহ নির্মাণ করা যেতো। একটি নিউক্লিয়ার শক্তি পরিচালিত ট্রাইডেন্ট সাবমেরিনের নির্মাণের খরচে তৃতীয় দুনিয়ার ১ কোটি ৬০ লক্ষ ছাত্রের ১ বছরের শিক্ষা ব্যয়-নির্বাহ করা অথবা ২০ লক্ষ মানুষের জন্য ৪ লক্ষ আবাস নির্মাণ করা সম্ভব ছিল। একটি আধুনিক ট্যাঙ্কের দামে নির্মাণ করা যেতো ৩০ হাজার ছাত্রের ১ হাজার ক্লাস রুম। আমেরিকা ও ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটির বাজেটে যেখানে গবেষণার খরচ ছিল প্রতি নাগরিক পিছু ৪৫ ডলার, সেখানে চিকিৎসা-গবেষণার জন্য ব্যয়িত হতো ১১ ডলার মাত্র। সারা পৃথিবীতে বছরে যত অ্যালুমিনিয়াম, তামা, দস্তা ও সীসা উৎপন্ন হতো তার ১১-১৪ ভাগ আমেরিকার সামরিক উৎপাদনের জন্য দরকার হতো।

(৩) মিডিয়া সুপার-হাইওয়ে

তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান অবদান দাঁড়ায় 'মিডিয়া এক্সপ্লোশন' বা প্রচার-মাধ্যমের স্তরে বিস্ফোরণ-মূলক উদ্ভাবনীসমূহ। স্বভাবতই, বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠে ও গবেষণায় এক নতুন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসাবে যুক্ত হচ্ছিল মিডিয়া। সামাজিক-মনস্তত্ত্বের গবেষণায় ও বিতর্কে মিডিয়া হয়ে উঠছিল অন্যতম ভাগীদার। মিডিয়া সম্পর্কে, মিডিয়ার সামাজিক প্রভাবের বিষয়ে, মিডিয়া ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও মিডিয়া পরিকল্পকদের ভূমিকা সম্পর্কে, মিডিয়ার ব্যবসায়িক ক্ষেত্র ও তার ফলাফল নিয়ে, মিডিয়া ও ব্যক্তি-মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে, শ্রেণী-সংগ্রামের স্তরে মিডিয়ার ভূমিকার বিষয়ে, মিডিয়া-পরিবেশ-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে, অজস্র ধারাতে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনার আলোড়ন। পুঁজিবাদের নতুন আর্থিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ও মুনাফা অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠে মিডিয়া।

কথ্য-লেখ্য-দৃশ্য সমন্বিত আধুনিক বৈদ্যুতিন প্রচার-মাধ্যম গড়ে উঠার পূর্ব ইতিহাসের গতি-তরঙ্গের দিকে প্রথমে কিছুটা নজর দেওয়া যেতে পারে। মানুষের মুখের ভাষার কিছুটা সংগঠিত রূপ সৃষ্টি হয়েছিল ৫ লক্ষ বছর আগে; ভাষাকে লেখ্য রূপে প্রকাশের কাজ শুরু হয় ৬-৫ হাজার বছর আগে; পৃথিবীতে মুদ্রণ-যন্ত্রের আবিষ্কার ঘটেছে ৫৫০ বছর আগে; টেলিগ্রাফের আবিষ্কার (সাংকেতিক ভাষায় দূরে সরাসরি বার্তা প্রেরণ) ১৬০ বছর পূর্বে; টেলিফোন বা দূরভাষ আবিষ্কৃত হয়েছে ১২০ বছর আগে; রেডিও-র উদ্ভাবনী ৯৫ বছর ছাড়িয়েছে; টেলিভিশনের গণব্যবহার শুরু হয়েছে ৫০ বছর পূর্বে এবং প্রথম কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট বা মহাকাশে যোগাযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করা হয়েছে প্রায় ৩৫ বছর আগে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রচার-মাধ্যমের উন্নত প্রণালীগুলি আবিষ্কার ও ব্যবহারে সময়ের ব্যবধান মানব-সমাজে হয়েছে ক্রমশ সংকীর্ণতর। শেষোক্ত উদ্ভাবনী দু'টি তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের অন্তর্গত। এই সময়কালে বৈদ্যুতিন প্রচার-মাধ্যমের উৎকর্ষতা ও বিন্যাস যেমন অবর্ণনীয়, অবিশ্বাস্য ও সীমাহীন বিস্তৃতি পেতে থাকে, অন্যদিকে এটি অর্জন করতে থাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পণ্য-উপাদানের রূপ। প্রচলিত পণ্য-সামগ্রীর ব্যতিক্রমী

সম্পূর্ণ এক নতুন সামগ্রী হিসাবে আবির্ভূত হয়ে বিশ্ব-বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় প্রবল ও ভয়ঙ্কর গতি সৃষ্টি করতে থাকে বৈদ্যুতিন প্রচার-মাধ্যম। মিডিয়ার উল্লেখযোগ্য এবং অনতিক্রম্য এক বিশেষ উপাদান হিসেবে গড়ে ওঠে, যা অন্য কোনো বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে ছিল না। এটির টেকনোলজি ও প্রচার-সম্ভারগুলি যেমন পণ্য-সামগ্রী, অন্যদিকে মার্কেট বা বাজারের প্রসার, প্রচার ও সংহতিকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ভূমিকা নিয়ে থাকে স্বয়ং মিডিয়া। অর্থাৎ কমোডিটি-র বাজারের সুবন্দোবস্ত ও প্রসারে সড়ক-জল-বায়ু, পরিবহন ব্যবস্থা, পাওয়ার বা শক্তি (বিদ্যুৎ), দক্ষ শ্রম-শক্তি, পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল ইত্যাদির প্রথাগত ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অপর এক অঙ্গ হিসাবে ভূমিকা নিতে থাকে মিডিয়া—বাজারের ও পণ্যের আকর্ষণ বাড়াতে বিজ্ঞাপন তথা প্রচার করার সর্বপ্রধান হাতিয়ার হিসেবে। সারা বিশ্বময় প্রচার ও তথ্যের চালাচালি এবং সর্বাধিক দ্রুততার সাথে পণ্য-সামগ্রীর গুণকীর্তন সর্বত্র পৌঁছে দেবার ব্যবস্থার নামই মিডিয়া সুপার-হাইওয়ে। প্রচলিত অন্যান্য হাইওয়ে তথা সড়ক, জল ও বায়ু পরিবহন ব্যবস্থার চেয়েও সুপার বা অতি ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে মিডিয়া হাইওয়ে।

বিশ্বে মিডিয়ার উপস্থিতির ব্যাপকতা কিছুটা অনুমান করার জন্য, এটির বিকাশের একটি পর্যায় হিসাবে, ১৯৮২ সালের কিছু তথ্য উল্লেখ করা যাক। ঐ সময়ে পৃথিবীতে মোট ৩০,০০০ রেডিও স্টেশন, ১৩০,০০,০০,০০০ রেডিও সেট, ৩৩,০০০ টি.ভি. স্টেশন, ৫০,০০,০০,০০০ টেলিভিশন সেট, ১৫০টি নিউজ এজেন্সি, ৮২৪০টি দৈনিক সংবাদপত্র ও যেগুলির সংগ্রাহক সংখ্যা ৪৫,০০,০০,০০০ এবং ৩০,০০,০০০ মত পিরিওডিক্যালস বা সাময়িক পত্রিকা ছিল। প্রতি বছর ছাপা হতো ৭,০০,০০০-এর মত স্বতন্ত্র পুস্তক, যার মোট প্রচার-সংখ্যা ছিল ৮০,০০,০০,০০০। সারা পৃথিবীতে ছিল মোট ২,৫০,০০০ স্থায়ী সিনেমা হল, যেগুলির মোট আসন সংখ্যা ৭,২০,০০,০০০ এবং সারা বছরে পূর্ণাঙ্গ দৈর্ঘ্যের সিনেমা তৈরি হতো ৩,৮০০টি। প্রত্যহ টি. ভি.-র দর্শকের সংখ্যা ছিল ২০,০০,০০,০০০ জন। সিনেমা সংক্রান্ত দিকগুলি বাদে পরবর্তীকালে বাকিগুলির বৃদ্ধির হার ছিল বছরে দ্বিগুণ থেকে চারগুণ।

১৯৮৭ সালের হিসাব ধরে প্রচার-ব্যবসার চরিত্র কিছুটা আন্দাজ করা যাক। তৃতীয় দুনিয়াতে একদিকে প্রচার চালানো ও অন্যদিকে প্রচার-ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ছাড়াও, প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। কালচারাল এক্সচেঞ্জ বা সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নামে ঘোষণা করা হলেও আমেরিকার ইউ. এস. আই. এস. (ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস) ১২৫টি দেশে, ইউনাইটেড কিংডম তথা ব্রিটেনের পক্ষে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও পশ্চিম জার্মানির গ্যাটে ইনস্টিটিউট ৯০টির বেশি দেশে কাজ চালাতো। ঐ সময়ের পশ্চিম ইউরোপের টি. ভি. কর্মসূচীর (অনুষ্ঠানের) এক-তৃতীয়াংশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত কানাডার ৮৩ শতাংশ সাময়িক পত্রিকা, প্রকাশিত পুস্তকের ৮৩ শতাংশ, ৭১ শতাংশ পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও প্রদর্শিত সিনেমার ৯৬ শতাংশ ছিল আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত। এমনকি ফ্রান্সে প্রদর্শিত ছায়াছবির ৭০ শতাংশ এবং সুইডেনের প্রচার-সামগ্রীর ৭৫ শতাংশ আসতো আমেরিকা থেকে। এই সামান্য তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিরোমণি আমেরিকা প্রচার-মাধ্যমের ব্যবসাকে কত গুরুত্ব দিয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতেও শুরু করে দিয়েছিল।

টেলিভিশন প্রদর্শনীর একচেটিয়াপনা ছিল প্রধানত চারটি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের। টি. ভি. প্রোগ্রাম বছরে বিক্রি হতো যথাক্রমে—আমেরিকার ১৬০টি কোম্পানির ২ লক্ষ ঘন্টা, ব্রিটেনের ৩০ হাজার ঘন্টা এবং এর সামান্য কিছু কম সময় ধরে পশ্চিম জার্মানি ও ফ্রান্সের। পরবর্তীকালের বিশ্বগত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৪৬টি উন্নত দেশের ভেতরে যে প্রধান সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবসা চালাতো তার প্রত্যেকটি বিদেশী। এই ধরনের ১৩৫টি প্রধান আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের এক-তৃতীয়াংশই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এশিয়া (জাপান ও চীন বাদে), আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু ও রেডিও প্রচারের মাল-মশলার ৯০ শতাংশই আসতো নিউইয়র্ক ও প্যারিস থেকে।

ইনফরমেশন বা তথ্য-চরিত্রের দিকটা লক্ষ্য করলেও মিডিয়া-ব্যবস্থার ব্যবসায়িক চরিত্র ও কাদের স্বার্থে সেই ব্যবস্থা, তা' অনেকটা স্পষ্ট হয়। জুয়ান সোমাভিয়া নামে লাতিন আমেরিকার এক গবেষক দেখিয়েছিলেন যে সংবাদ সরবরাহকারী বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান—ইউ. পি. আই.—প্রত্যহ যে সংবাদ সারা বিশ্বে বিক্রি করে থাকে তার ৭১.২ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে, পশ্চিম ইউরোপ প্রসঙ্গে ৯.৬ ভাগ, এশিয়া সম্পর্কে ৫.৯ ভাগ, লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে ৩.২ ভাগ, মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ৩ ভাগ, আফ্রিকার প্রসঙ্গে ১.৮ ভাগ এবং তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিষয়ে ১.৫ ভাগ এবং ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলি প্রসঙ্গে ০.৩ ভাগ। অর্থাৎ মিডিয়া-ব্যবসার ভরের ক্রমবিন্যাস তৈরি হচ্ছিল কোন দেশ ও অঞ্চলে প্রসারিত হলে তাদের লাভ বেশী হবে তার ভিত্তিতে।

১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান ধরে পৃথিবীর সর্বপ্রধান চারটি সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চরিত্রটি লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

প্রতিষ্ঠনের নাম	কতগুলি দেশে কাজ করে	প্রচারের চরিত্র ও সংখ্যা	কতগুলি দেশে দপ্তর চালায়	কর্মীর সংখ্যা	সাংবাদিকের সংখ্যা
এ. পি.	১০৮টি	১,৩২০টি সংবাদপত্র; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩,৪০০টি ট্রান্সমিটার; ১০০০টি গ্রাহক প্রতিষ্ঠান	৬২টি বিদেশী ব্যুরো	৩০০০ এর বেশী	৫৬০ জন
ইউ. পি. আই	৯২টি	৭,০৭৯টি সংবাদপত্র; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ২,২৪৬টি গ্রাহক প্রতিষ্ঠান; ৩৬টি জাতীয় সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	৮১টি বিদেশী ব্যুরো	১,৮২৩ জন	৫৭৮ জন
ফ্রান্স-প্রেসী	১৫২টি	১২,০০০ সংবাদপত্র; ৬৯টি জাতীয় সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	১৬৭টি দেশ; ১০৮টি বিদেশী ব্যুরো	১৯৯০ জন	১৭১ জন সাংবাদিক এবং ১২০০ জন স্বাধীন সাংবাদিক
রয়টার	১৪৭টি	৬,৫০০টি সংবাদপত্র; ৪০০টি রেডিও ও টি. ভি. স্টেশন	১৫৩টি দেশে	২০০০ জন	৩৫০ জন সাংবাদিক ও ৮০০ স্বাধীন সাংবাদিক

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির আর্থিকসহ অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণে তাদের নিজস্ব মালিকানাধীন আধুনিক প্রচার-মাধ্যমের ব্যবস্থার সুফল ছিল যৎসামান্য। ১৯৮২ সালের পরিসংখ্যানে প্রচার-মাধ্যমের ক্ষেত্রে তাদের পিছিয়ে থাকার রূপটি ছিল এই রকম ঃ তৃতীয় দুনিয়ায় বিশ্ব-জনগণের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করলেও বিশ্বের মোট টেলিভিশনের মাত্র ৫ ভাগ সুযোগ এখানে ছিল এবং টেলিভিশন সেটের ১৫ শতাংশ ও সংবাদপত্রের মাত্র ১২.৫ ভাগ। এই পশ্চাৎপদতাই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রচার-মাধ্যমের ব্যবসার ভিত্তি ও সুযোগ হয়ে দাঁড়ায়।

অন্য সব ক্ষেত্রের মত দরিদ্র দেশগুলিতে মিডিয়া-সাহায্য দেবার নাম করে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসার পত্তন হয়েছিল। আমেরিকাতে আধ ঘন্টার টি. ভি. প্রোগ্রাম তৈরি করতে ২.০ লক্ষ ডলার খরচ হলেও, তা' তখন কোস্টরিকাকে মাত্র ৬০-৭০ ডলারে ও কেনিয়াতে ২৫-৩০ ডলারে বিক্রি করা শুরু হয়। ১৯৯০ সালে এই দর বাড়তে বাড়তে ৩.৫ লক্ষ ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৭৪ সালে আমেরিকার ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রধান ২০টি সংস্থা তাদের লাভের ৪০ শতাংশ পেতো বিদেশ থেকে; ১৯৯০

সালে এই লাভের অংশ দাঁড়ায় ৬০ শতাংশে। ১৯৮২ সালে আমেরিকার পুস্তক প্রকাশনা সংস্থাগুলি ৩০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পুস্তক এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বিক্রি করতো; ১৯৯০ সালে তার অর্থমূল্য দাঁড়ায় ১৯৫০ মিলিয়ন ডলার। একই সময়কালে বিদেশে ব্রিটেনের পুস্তকের ব্যবসা ১০০ মিলিয়ন পাউণ্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড। আমেরিকার ভয়েস অব আমেরিকা বা 'ভোয়া' ১৯৮২ সালে ৩৯টি ভাষায় সপ্তাহে ৯৪০ ঘণ্টার কর্মসূচী প্রচার করতো। ঐ বছর প্রেসিডেণ্ট রেগন এটির বাজেট ১০১.৫ মিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ১৮৮ মিলিয়ন ডলার করেন; ১৯৯০ সালে ঐ বাজেট দু'গুণের বেশি বেড়েছিল। ১৯৮৩ সালে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন এজেন্সির ছিল ৮০০০ কর্মচারী এবং বার্ষিক বাজেট ৬৪০ মিলিয়ন ডলার। আমেরিকার মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি বছরে গড়ে ১৭০০টি করে টি.ভি. প্রোগ্রাম বৃদ্ধি করছিল এবং ৬৩টি ভাষায় ও বিদেশে মোট ২০০০ স্টেশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করতো। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানিগুলির ব্যয়ের বাইরে মার্কিন সরকার ৬ হাজার মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতো প্রচারের জন্য যার অর্ধেকের বেশি ছিল ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। আমেরিকার ওয়াল্ট ডিজনি প্রোডাকশনের ছবি দেখতো ১০ কোটি মানুষ, ডিজনি বই বা সাময়িকী পাঠ করতো ৮০ কোটি মানুষ, ৫ কোটি মানুষ ডিজনি গান বা যন্ত্রসংগীতের রেকর্ড ক্রয় করত এবং ডিজনি কমিকস পাঠ করতো ১৫ কোটি মানুষ। শেষোক্ত ঘটনাবলী থেকে ব্যবসা ও মিডিয়া থেকে স্বভাবতই লাভের পরিমাণ কি রকম ছিল তা' অনুমান করা যায়।

১৯৮৯ সালের ইউনেস্কোর সমীক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীতে ২০০ কোটি রেডিও ও ৯০ কোটি টি.ভি. সেট ছিল। তার মধ্যে আমেরিকাতে ছিল যথাক্রমে ৫২.৪ কোটি ও ২০.১ কোটি। টেলিভিশনে দ্বিতীয় স্থানে ছিল জাপান (১০.৭৫ কোটি) এবং রেডিও সেটে চীন দ্বিতীয় স্থানে (২০.৬ কোটি সেট)। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশনের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী আমেরিকার নিজস্ব ১২,৬৭২টি রেডিও স্টেশন ও ১,৬৯২টি টি.ভি. স্টেশন ছিল। এই সময়ে পশ্চিমী প্রধান সংবাদ-সরবরাহকারী সংস্থাগুলি ১১০টি অনুন্নত দেশে প্রত্যহ ৪,৫০,০০,০০০ শব্দ সম্বলিত তথ্য বিক্রি করতো। ১৯৯২ সালে মিডিয়া-সংক্রান্ত ব্যবসা, যাকে অর্থনীতির পরিভাষাতে 'সফ্ট ইকনমি' বলা হচ্ছিল, তাতে প্রত্যাশিত বিপুল অগ্রগতি না ঘটলেও, যেটুকু ঘটছিল তাও অভূতপূর্ব। এই বছরের 'ব্রডকাস্টিং অ্যাণ্ড কেবল মার্কেট প্রেস'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ববর্তী ৫ বছরে কেবল 'টক্-ফরমা স্টেশন' তিনগুণ বেড়ে ৮৭৫টি হয়েছিল এবং এই শিল্প আশা করছিল যে স্বল্পকালের মধ্যে অনুরূপ আরও ৫০০টি স্টেশন তৈরি হবে।

উন্নততর কারিগরী ও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একের পর এক পরিবর্তন সংঘটিত করে টেলিভিশন ব্যবস্থার পাশাপাশি মিডিয়ার বিষয়বস্তুর দ্বারা দর্শকের রুচির পরিকল্পিত পরিবর্তন ঘটানো শুরু হয়েছিল। আমেরিকার অভ্যন্তরীণ মডেলের পরিবর্তনকে বিশ্ব-মডেলের ভবিষ্যৎ রূপ হিসাবে প্রচার-মাধ্যমের দ্বারা কার্যত বিক্রয় করা শুরু হয়েছিল। তাছাড়া, বাণিজ্য ও ব্যবসায় অধিকতর মুনাফার ক্ষেত্র নির্বাচন করার জন্য এবং মানুষের মনস্তত্ত্বকে মুনাফার বাজার হিসাবে চিহ্নিত করে ব্যবহার করা শুরু হয় মিডিয়ার। ১৯৮৪ সালে আমেরিকার সর্বপ্রধান বৈদ্যুতিন প্রচার-কোম্পানিগুলির প্রচারের বিষয়বস্তু অনুযায়ী মোট প্রচারের পরিমাণের মধ্যে হারগুলি ছিল নিম্নরূপ :

বিষয়	এ.বি.সি.	সি.বি.এস.	এন.বি.সি.	গড়
(১) আন্তর্জাতিক	৩২.৩%	২০.৭%	২৩.০%	২৫.৩%
(২) অর্থনৈতিক	২১.১%	১৮.৪%	২৫.৭%	২১.৭%
(৩) সামরিক	৮.১%	৮.৬%	১২.৮%	৯.৮%
(৪) অপরাধ বিষয়ক	৯.৯%	১৪.৯%	১২.৩%	১২.৪%
(৫) প্রাতিষ্ঠানিক	১৪.৩%	১৩.২%	১০.২%	১৩.৬%
(৬) মনুষ্য প্রণোদনা	৯.৯%	১৭.২%	১২.৮%	১৩.৩%
(৭) রাজনীতি/আইন	৪.৩%	৬.৯%	৩.২%	৪.৮%

বিষয় ব্যাখ্যা :

(১) আন্তর্জাতিকের অন্তর্গত ছিল বিদেশনীতি, পূর্ব/পশ্চিম বিরোধ, সমর-আলোচনা, মধ্যপ্রাচ্য, মিত্র রাষ্ট্রগুলির বিষয় ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ

(২) অর্থনীতির অন্তর্গত ছিল আর্থিক নীতি, অভ্যন্তরীণ বাজেট, বাণিজ্যিক পরিচালনা, বাণিজ্য-মন্দা বা বাণিজ্য-অগ্রগতি

(৩) সামরিক অংশভুক্ত ছিল সামরিক নীতি ও সামরিক কার্যকলাপ

(৪) অপরাধ অংশে ছিল আইনের প্রয়োগ, প্রতিবাদ, মারদাঙ্গা ও অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা

(৫) প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগে ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতি, শিক্ষা, ধর্ম, পারিবারিক জীবন, খেলাধুলা ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

(৬) মনুষ্য প্রণোদনার অন্তর্গত ছিল স্মরণীয় অনুষ্ঠান, বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, বিশেষ ঘটনা ও মানুষের কাছে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়গুলি

(৭) রাজনীতি/আইন প্রসঙ্গে অন্তর্গত ছিল নির্বাচনী প্রচার, রাজনৈতিক নিয়োগ ও আইন

পরবর্তীকালে পূর্বোক্ত ধারার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক বিষয়ে ঢুকে পড়ে অর্থনীতির আন্তর্জাতিক বাস্তবতা এবং সেক্ষেত্রে বিশ্ব-অর্থনীতির প্রতিকূল বিভিন্ন দিকের আলোচনা। সামরিক অংশ বিপুলভাবে বাড়তে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক অংশে আন্তর্জাতিক খেলাধুলা-বিশেষত ইউরোপের প্রধান ফুটবল লীগগুলি, আন্তর্জাতিক নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিশ্ব ও মহাদেশীয় অলিম্পিক, টেনিস, মোটর ও মোটর সাইকেল রেস প্রভৃতি প্রচারের বিশাল এলাকা দখল করে ফেলে। ক্রীড়া প্রদর্শনে একচেটিয়া কর্তৃত্ব দখলের জন্য টেলিভিশন সংস্থাগুলির মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বহু মিলিয়ন ডলার লাভ এই ক্ষেত্র থেকে অর্জিত হতে থাকে। সর্বাধিক লাভজনক হওয়ায় টি. ভি. সম্প্রচারের বাড়তি সময় সংগ্রহ করে নিতে থাকে বিনোদনের মধ্যে সোপ-অপেরা, পপ-সঙ্গীত ইত্যাদি।

নব্বই-এর দশকের শুরুতে মিডিয়া-বাজারকে আরও বিনিয়ন্ত্রিত করার প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এবং টি. ভি. বনাম কেবল ইত্যাদির মধ্যে বিরোধে আমেরিকা, ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড, পর্তুগাল, জার্মানি, স্পেন প্রভৃতি দেশের পার্লামেন্টগুলি বেসরকারী শক্তির পক্ষে দাঁড়াচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট বুশ ভেটো দেওয়া সত্ত্বেও, সেনেট তা' অগ্রাহ্য করে অধিকতর মুক্ত বাজারের পক্ষে মত দিয়েছিল। এই বিরোধ/প্রতিরোধ সত্ত্বেও ঐসব দেশের প্রাইভেট কোম্পানিগুলির লাভ এই সময়ে গড়ে ১২% হারে বৃদ্ধি পায়; তার মধ্যে সর্বাধিক লাভ করছিল ফ্রান্সের টি. এফ. আই.—১৯৯১ সালে ১৩.৭ শতাংশ লাভ বাড়িয়ে অর্থমূল্যে লাভ করছিল ৩৪১ মিলিয়ন ফ্রাঁ। প্রকৃতপক্ষে খোদ ইউরোপে মিডিয়া সম্প্রচার ব্যবসাতে লাভের পরিমাণ বছরে প্রায় ১৭ হাজার মিলিয়ন ডলার দাঁড়ায়।

(৪) ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফ. ডি. আই.) বা বিদেশী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ

ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অন্য দেশে, বিশেষত উন্নতিশীল দেশগুলিতে, পুঁজি রপ্তানি ও বিনিয়োগ পুঁজিবাদের বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে নতুন এক উপাদান। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিকাশের প্রশ্নে এই ব্যবস্থা এক আবশ্যিক শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। সত্তরের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার যেসব উপাদান এবং গতি হার ছিল, পরবর্তীকালে তা' পেতে থাকে অনেক তীক্ষ্নতা ও দ্রুততা। এই ক্ষেত্রে, মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি প্রধান ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি যুক্ত হতে থাকে বহুবিধ নতুন উপাদান। সংকটাপন্ন আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের পরিত্রাণে নতুন উপাদান-যুক্ত এফ. ডি. আই. অন্যতম সোপান কেবল নয়, হয়ে ওঠে নতুন করে বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারও।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, এটির বিকাশের কালে মূল শর্তটি ছিল 'ম্যাক্সিমাম গভর্নমেন্ট'। অর্থাৎ প্রধানত তৃতীয় দুনিয়াতে পুঁজি বিনিয়োগ ও তা' থেকে লাভের নিশ্চয়তা গড়ে তোলার জন্য বিদেশী মূলধন-বিনিয়োগকারীদের নিজ সরকারগুলির সর্বাত্মক সহযোগিতা নেওয়া। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সরকারদের কাছ থেকে এই সহযোগিতা অর্জনের স্তর ছিল তিনটি। অর্থনৈতিক স্তরে অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগকারীদের নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় আর্থিক সুবিধা নেওয়া, রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তা পাওয়া ও বিশেষ ভর্তুকির গ্যারান্টি ইত্যাদি; রাজনৈতিক স্তরে অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে যেসব দেশে সেইসব দেশের সরকারের ওপর নিজ দেশের সরকারের দ্বারা কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা বিদেশী পুঁজিকে নানা ধরনের সহযোগিতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করে। এবং ক্ষেত্র বিশেষে সামরিক স্তরে, তথা যে দেশগুলি প্রতিবেশীদের সাথে সামরিক বিরোধের মুখোমুখি রয়েছে অথচ দুর্বল তাদের সামরিক দিক থেকে ব্ল্যাকমেইল অথবা সামরিক সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা। তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতা ও কোথাও কোথাও প্রত্যক্ষ বিরোধিতা থাকলেও, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এফ. ডি. আই. ব্যবস্থা ও ক্ষেত্রকে অব্যাহতভাবেই প্রসারিত করে গেছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থার পরিবর্তে এই সময় থেকে বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির এই নতুন ব্যবস্থার পত্তনের পর পুঁজির বিকাশের গতি অর্থাৎ বিনিয়োগ ও লাভের পরিমাণ বহু গুণ বাড়তে থাকে। ১৯১৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে বিদেশে প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগ যেখানে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বেড়েছিল, পরবর্তী প্রত্যেকটি দশকে তা' বেড়েছে দ্বিগুণ হারে। মধ্য '৮০-র দশকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বিদেশে মূলধন রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৭,০০,০০০ মিলিয়ন ডলারে, যা ১৯১৩ সালের তুলনায় ৩০০ গুণ বেশি।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মূলধন উদ্বৃত্ত হওয়া ও দেশে বিনিয়োগের সুযোগ কমে যাওয়াকে অনেকে পুঁজি রপ্তানির কারণ বলে ব্যাখ্যা করলেও এটা সর্বাংশে সত্য ছিল না। এটা হয়ে উঠেছিল প্রধানত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি নতুন প্রণালী। কেননা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে উদ্বৃত্ত অর্জনে ছিল যথেষ্ট তারতম্য। এফ. ডি. আই. প্রধানত ঘটছিল অতিরিক্ত লাভের প্রণোদনা থেকে—তার পেছনে বাড়তি পুঁজির ব্যবহারের জন্য চাপ যেমন থাকতে পারে, আবার ব্যবহৃত পুঁজির উদ্বৃত্তকে স্বদেশে পুনর্বিনিয়োগ না করে তা' রপ্তানির প্রবণতাও থাকতে পারে।

পুঁজি রপ্তানি করে অন্য দেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যগুলি ছিল প্রধানত এই রকম ঃ প্রথমত, তৃতীয় দুনিয়াতে শ্রমিকদের মজুরি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকদের চেয়ে ১০ থেকে ২০ গুণ কম হবার জন্য তৃতীয় দুনিয়ার বুকে বসে উৎপাদনে লেবার কমপোনেন্ট বা শ্রমের মজুরির জন্য মূল্য অনেক কম পড়ে। স্বভাবতই উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন-মূল্য কম হওয়ায় বেশি লাভ করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, তৃতীয় দুনিয়াতে কাঁচা মাল অফুরন্ত ও দাম কম। উৎপাদনের জন্য বিদেশ থেকে সেই কাঁচা মাল স্বদেশে আমদানি করতে পরিবহনের বাড়তি খরচটুকু বাঁচিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের মাটিতে বসে উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যবহার করলে উৎপাদিত পণ্যের দাম কম হয়; স্বভাবতই লাভও বেশি। তৃতীয়ত, উৎপাদনের ক্ষেত্রের সাথে লাগোয়া ও চাহিদাসম্পন্ন বাজার উৎপাদনকারীর কাছে স্বভাবতই আকর্ষণীয়। তৃতীয় দুনিয়ার নিজস্ব অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার পাশেই শিল্পোন্নত দেশগুলির এফ. ডি. আই.-সৃষ্ট উন্নত ও নিপুণ উৎপাদন দেশটির বিশাল জনসমষ্টির বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির সহায়ক হয়। চতুর্থত, তৃতীয় দুনিয়ায় বসে উৎপাদিত সামগ্রী (যন্ত্রপাতি, মালমশলা ও অর্ধ-নির্মিত পণ্য) উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে রপ্তানি করলেও তা' থেকে অনেক বেশি লাভ হয়—যা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন করলে সম্ভব হতো না। পঞ্চমত, তৃতীয় দুনিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ করে

উৎপাদন করলে উন্নত দেশগুলির উচ্চহারে কাস্টমস ব্যবস্থার প্রতিরোধ বা চাপকে এড়ানো যায়। তাতেও (অর্থাৎ উচ্চহারের কর এড়িয়ে) বেশি হয় লাভ।

পুঁজি রপ্তানি ঘটছিল প্রধানত তিন ভাবে। প্রথমত, পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট। এটা ঘটছিল নানা ভাবে অন্য দেশের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনে এবং তা' উৎপাদনভিত্তিক হলে তার থেকে লাভ (ডিভিডেন্ড) অর্জন করে অথবা কোন দেশীয় প্রতিষ্ঠানের ছেড়ে দেওয়া সিকিউরিটি কিনে। শেষোক্ত ব্যবস্থায় লগ্নী পুঁজি সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অংশীদার হতে পারে না, তবে অর্জিত লাভের ভাগ পেয়ে থাকে। অতীতে এই ব্যবস্থা প্রধান ভূমিকা নিলেও পরবর্তীকালে এইভাবে বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে অনেক কমে যায়। দ্বিতীয়ত, পুঁজি রপ্তানি ঘটছিল ঋণ দান ব্যবস্থার মধ্য দিয়েও। পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমগুলির মধ্যে এটাই হয়ে উঠছিল ব্যাপক ও সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ও লাভজনক (পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হবে)। তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ;এই বিনিয়োগ হলো এন্টারপ্রাইজ ক্যাপিটাল বা শিল্পগত মূলধনের বিনিয়োগ, যা ব্যবহৃত হয় উৎপাদনের কাজে।

'ম্যাক্সিমাম গভর্নমেন্ট'র নীতি (সত্তরের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত) যতদিন বহাল ছিল, ততদিন পর্যন্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি স্বয়ং পুঁজি রপ্তানির কাজে প্রত্যক্ষ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণের অন্যতম উপাদান ছিল স্বীয় দেশীয় পুঁজির বিদেশে বিকাশ। তাই সে সময় উন্নত দেশের সরকারগুলি গঠন করেছিল রাষ্ট্র-পরিচালিত স্পেশালাইজড ক্রেডিটিং ইনস্টিটিউশনস (আমেরিকা ও জাপানে বিশেষত এক্সপোর্ট অ্যাণ্ড ইমপোর্ট ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা)। ১৮টি শিল্পোন্নত দেশ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল যাতে স্বদেশী ফার্মের ঋণ বিদেশী যৌথ সংস্থা মেটাতে না পারলেও স্বদেশী ফার্মকে রাষ্ট্রীয় পরিপোষক গ্যারান্টি দ্বারা লাভ প্রাপক করা যায়। (সারণী-১ দ্রষ্টব্য)

সারণী-১

শিল্পোন্নত দেশগুলির এফ. ডি. আই. (বিলিয়ন ডলারে)					
সাল	ইউ. এস. এ.	পঃ ইউরোপ	জাপান	অন্যান্য	মোট
১৯৭৩	১০১.৩	৮৪.৮	১০.৩	১০.৫	২০৬.৯
১৯৭৯	১৯২.৪	১৭৮.০	২৯.৭	২১.৪	৪২১.৫
১৯৮১	২২৭.৩	২২৪.১	৪৬.৪	২৭.২	৫২৫.০
১৯৮৪	২৩২.১	—	৭১.৪	—	৬৬৭.৭

কোন কোন দেশ থেকে সারা বিশ্বের মোট এফ. ডি. আই. (শতাংশের হারে) আসছিল, তার চিত্রটিও দেখা দরকার। (সারণী-২ দ্রষ্টব্য)

সেই সঙ্গে দেখা যাক এই এফ. ডি. আই. বন্টনের বিশ্বময় রূপটি কি (শতকরা হারে)। (সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)

এফ. ডি. আই-এর ক্ষেত্রে জাপানের অগ্রগতি লক্ষণীয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো যে এফ. ডি. আই.-এর মোট পরিমাণ বেড়ে চলছিল ব্যাপকভাবে। ১৯৮৫ সালে আমেরিকার এফ. ডি. আই. ছিল ১৮২.৯ বিলিয়ন ডলার, যা আমেরিকার বিদেশীস্থ কোম্পানিগুলির মোট সম্পদের ৮০ শতাংশের সমান। ১৯৯০ সালে আমেরিকার এফ. ডি. আই.-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১৯.৫ বিলিয়ন ডলার, তার মধ্যে উন্নত দেশগুলিতে ৩১২.২ বিলিয়ন ডলার ও অনুন্নত দেশগুলিতে ১০৭.২ বিলিয়ন ডলার।

এলাকাভিত্তিক অনুন্নত দেশগুলিতে এফ. ডি. আই.-এর রূপ ছিল এইরকম (শতাংশের হারে) (সারণী-৪ দ্রষ্টব্য)

সারণী-২

এফ. ডি. আই.-কারী দেশগুলি	১৯৬০	১৯৭৩	১৯৮৯
		(শতাংশের হিসাবে)	
ইউ. এস. এ.	৪৭.১	৪৮.০	২৮.৩
কানাডা	৩.৭	৩.৭	৪.৮
ইউ. কে.	১৮.৩	১৩.০	১৬.৭
জার্মানি	১.২	৫.৬	৯.১
ফ্রান্স	৬.১	৪.২	৫.৩
নেদারল্যাণ্ডস	১০.৩	৭.৫	৬.১
ইউরোপের অন্য অংশ	৭.৭	৭.২	৯.৩
জাপান	০.৭	৪.৯	১১.৫
বাকি উন্নত দেশগুলি	৩.২	৪.৪	৫.২

সারণী-৩

এলাকা	১৯৬৭	১৯৭৩	১৯৮০	১৯৮৯
উন্নত দেশগুলিতে	৬৯.৪	৭৩.৯	৭৮.০	৮০.৮
অনুন্নত দেশগুলিতে	৩০.৬	২৬.১	২২.০	১৯.২
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সারণী-৪

ভৌগোলিক এলাকা	১৯৭১	১৯৭৮	১৯৮৪
লাতিন আমেরিকা	৫৫.৭	৫৬.৭	৫৭.২
আফ্রিকা	১৮.৬	১২.৪	১০.৫
পশ্চিম এশিয়া	৬.৪	৩.২	৩.৪
দক্ষিণ এশিয়া	৭.৫	৫.০	৪.৭
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	১১.৮	২২.৭	২৪.২

পূর্বোক্ত বণ্টনের চরিত্র থেকে এটাও স্পষ্ট হবে যে যেসব এলাকার দেশগুলি পশ্চিমী বিশ্ব-অর্থনৈতিক নীতির সরাসরি অনুসারী হচ্ছিল—লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, তাদের ও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পারস্পরিক স্বার্থে এফ. ডি. আই. ক্রমান্বয়ে সেইসব এলাকায় বেড়েছিল।

অনুন্নত দেশগুলিতে প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশগুলি অগ্রসর হচ্ছিল অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক। তারা সর্বাগ্রে লাভজনক ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে। কেবলমাত্র লাতিন আমেরিকার কতিপয় দেশে কৃষিতে প্রত্যক্ষ পুঁজি নিয়োগ এবং সামান্য কিছু দেশে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশক উৎপাদন করলেও, খনিজ তেল, শিল্প (উৎপাদনমূলক), প্রসাধনী, তরল পানীয়, তৈরি খাবার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি প্রধানত ভর আরোপ করছিল। প্রসঙ্গত এই বিষয়ে একটি পরিসংখ্যান দেখা যেতে পারে। (সারণী-৫ দ্রষ্টব্য)

সারণী-৫

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা অনুন্নত দেশে এফ. ডি. আই. (বিলিয়ন ডলারে)							
ক্ষেত্র	১৯৭৫	১৯৮০	১৯৮৪	ক্ষেত্র	১৯৭৫	১৯৮০	১৯৮৪
মোট	২৬.৩	৫৩.২	৫৩.৯	নির্মাণ-শিল্প	১০.৫	১৭.৮	২০.১
খনিজ তেল	২.৫	১০.৩	১৮.৪	অন্য শিল্প	১৩.৩	২৫.১	১৫.৩

শিল্পোন্নত দেশগুলি কেবল ক্ষেত্র বিচার করে প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগ করেনি। ব্যবসায়িক স্বার্থের সাথে রাজনৈতিক স্বার্থকে তারা সম-গুরুত্ব দিয়ে পুঁজি রপ্তানি করেছে। যেসব দেশ তাদের রাজনৈতিক মিত্র অথবা অনুন্নত দুনিয়ার মধ্যে যারা সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত অর্থনৈতিক নীতির অনুসারী ও শিল্পোন্নত দেশগুলির শিল্প বিকাশের সহযোগী ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত বা অন্যভাবে বলা যায় যে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাবসিডিয়ারি পত্তনের পক্ষে অনুকূল, সেই সব দেশগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে করা হয়েছিল এফ. ডি. আই.। প্রসঙ্গত অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে বাছাই যেসব দেশের নির্মাণ-শিল্পে এফ. ডি. আই. করছিল উন্নত পুঁজিবাদ তার একটি তালিকা দেখা যাক (মিলিয়ন ডলার হিসাবে)। *(সারণী-৬ দ্রষ্টব্য)*

সারণী-৬

দেশ	৭০-এর দশকের প্রথমার্ধে	৮০-এর দশকের প্রথমার্ধে	দেশ	৭০-এর দশকের প্রথমার্ধে	৮০-এর দশকের প্রথমার্ধে
ব্রাজিল	১,৮০২	১৩,০০৫	কলম্বিয়া	৩৪৮	৫৭২
ইন্দোনেশিয়া	১,৬২২	৪,২০২	হংকং	১৩৩	৪৩৪

মেক্সিকো	২,৩৭৭	৩,৮৬৮	মালয়েশিয়া	১৩৭	৪৩৩
সিঙ্গাপুর	৬৬৫	১,৭৭৩	থাইল্যাণ্ড	৬৮	১৯৮
নাইজেরিয়া	৫৭৫	৮৭৩	ইকুয়েডর	১০	৯৭
দঃ কোরিয়া	৮৮	৭৩৭	মরক্কো	৯	৯২
ফিলিপিনস	৪৬	৭১৬			

এশীয় দেশগুলিতে জাপানী এফ. ডি. আই. প্রবল বিক্রমে প্রাধান্য বিস্তারে অবতীর্ণ হয়েছে। এই এলাকার নব-নির্মিত শিল্পগুলিতে জাপানী লগ্নি-পুঁজি প্রাধান্য বিস্তার শুরু করে। তারা প্রধানত রেডিও, ইলেকট্রনিকস, টেলিভিশন ও রেডিও সেট নির্মাণকারী শিল্প ও টেপ-রেকর্ডার উৎপাদনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রাধান্য নিয়ে নেয়। এইসব সামগ্রীগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরে ৫৬ শতাংশ, ও মালয়েশিয়ায় ৭০ শতাংশের বেশী ও থাইল্যাণ্ডের ৩৪ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে জাপান।

দেশ হিসাবে একমাত্র আমেরিকা ১৯৬৬ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এফ. ডি. আই. করেছিল ১২০০০ মিলিয়ন ডলার; আর তা' থেকে লাভ করেছিল ৬৫,০০০ মিলিয়ন ডলার; অর্থাৎ বিনিয়োগের চেয়ে ৫ গুণ বেশী মুনাফা। ১৯৮১ সালে উন্নয়নশীল দেশে মার্কিন এফ. ডি. আই. ঘটে ২,৮০০ মিলিয়ন ডলার., তা থেকে লাভ হয়েছিল ৭,৬০০ মিলিয়ন ডলার।

এবারে সমগ্র উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সমগ্র তৃতীয় দুনিয়াতে এফ. ডি. আই.-এর পরিমাণ (১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল), সেই কারণে প্রতি বছর তৃতীয় দুনিয়া থেকে নির্গত হয়ে যাওয়া অর্থ এবং তার নীট ফল লক্ষ্য করা যাক। (মিলিয়ন ডলারে)। (সারণী-৭ দ্রষ্টব্য)

সারণী-৭

সাল	এফ. ডি. আই.	তৃতীয় দুনিয়া থেকে নিষ্ক্রান্ত অর্থ	নীট ফল
১৯৭০	১,৮৩৪.০	৫,৬৯৩.০	- ৩,৮৫৯.০
১৯৭১	২,৫৬৩.৫	৬,৬৫৯.৮	- ৩,৭৯৬.৩
১৯৭২	২,৫৮৫.১	৫,৫১০.০	- ২,৯২৪.৯
১৯৭৩	৩,৯৭৮.১	৮,১০৭.৭	- ৪,১২৯.৬
১৯৭৪	৫০৮.৭	১০,৮৫৬.২	- ১০,৩৪৭.৫
১৯৭৫	৭,৭৬৪.৫	৭,৫২৬.৫	+ ২৩৮.০
১৯৭৬	২,৮৩০.৯	৮,৭০০.৫	- ৫,৮৬৯.৬
১৯৭৭	৬,৩১৩.৯	১০,৮২১.৭	- ৪,৫০৭.৮
১৯৭৮	৭,৪৪৬.৯	১১,৯৭৯.১	- ৪,৫৩২.২
১৯৭৯	৮,৮১৯.২	১০,৫৪০.১	- ১,৭২০.৯
১৯৮০	৭,৬৫৪.৩	১৫,৮৩৩.১	- ৮,১৭৮.৮
মোট	৫২,২৯৯.১	১,০২,২২৭.৭	- ৪৯,৬৩৩.৬

এফ. ডি. আই. বিস্তারের বৈচিত্র্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে, যখন সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলি যুদ্ধ-বিপর্যয়জনিত পুনর্গঠনের জন্য বাড়তি আর্থিক চাহিদার যোগান দিতে অসমর্থ এবং জার্মানি ও জাপান যুদ্ধ-পরাজয়ের ফলে আর্থিক দিক থেকে সম্পূর্ণ নিস্তেজ, তখন আমেরিকা একাই কার্যত পৃথিবীময় ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট তথা এফ. ডি. আই. করছিল। এবং এই এফ. ডি. আই. নিরঙ্কুশ ভাবে ঘটেছিল কেবলমাত্র উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে। রাজনৈতিকভাবে কলোনিগুলি হাতছাড়া হবার পর এফ. ডি. আই. প্রসঙ্গে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অবিলম্বে নিতে পারেনি তখন। ৫০-এর দশকের শুরুতে কেবলমাত্র কিছু ঘনিষ্ঠ অনুগামী কলোনিতে

ও ৬০-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে বিভিন্ন কলোনিগুলিতে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এফ. ডি. আই. শুরু করে। ৬০-এর দশকের শুরুতে বিশ্ব-স্তরের মোট এফ. ডি. আই.তে আমেরিকার অংশ ছিল ৫৫ ভাগ। কিন্তু ৮০-এর দশকে এসে তা' কমে দাঁড়ায় ৪০ ভাগ। কেননা এফ. ডি. আই. নিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে এই সময়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। এফ. ডি. আই. স্তরে ক্রমশ প্রবল সক্রিয় হয়ে ওঠে জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলি। ক্রমে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিদারুণভাবে পেছনে ফেলে দেয় জাপান এবং বিদেশে পুঁজি রপ্তানির প্রধানতম শক্তিতে পরিণত হয়। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে জাপানী পুঁজি রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩৫ বিলিয়ন ডলার, যা আমেরিকান পুঁজি রপ্তানির (১৬.২ বিলিয়ন ডলার) তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানি ৬ গুণ বেড়েছিল—১৭.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ১১১.৪ বিলিয়ন ডলার। পশ্চিম জার্মানির পুঁজি রপ্তানি বেড়েছিল একুশ গুণ—৩ বিলিয়ন ডলার থেকে ৬৩ বিলিয়ন ডলার। পাশাপাশি অন্যান্য পশ্চিম-ইউরোপীয় বাকি দেশগুলির মধ্যে সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি ও অন্যান্যদের বিদেশে পুঁজি রপ্তানিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেও প্রত্যক্ষ পুঁজি রপ্তানির অধ্যায় ছিল। তখন সামান্য যেটুকু পুঁজি রপ্তানি করা হতো, তা' প্রধানত কলোনিগুলিতে। মহাযুদ্ধোত্তরকালে এফ. ডি. আই. নতুন মাত্রা নিলেও তার ভর তখনও থেকে যায় উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ভিতরেই। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এর দশকে এফ. ডি. আই. প্রধানত ঘটেছে পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলিতে। কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে ১৯৭০-এর মধ্য ভাগ থেকে বিশ্ব এফ. ডি. আই.-এর গতিমুখ পরিবর্তিত হয়ে বিশ্বের প্রধান এফ. ডি. আই.-কারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিমুখী হয়। ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি খোদ আমেরিকার অভ্যন্তরে অন্যান্য দেশের এফ. ডি. আই., অন্যান্য দেশে আমেরিকার এফ.ডি.আই.-এর মোট পরিমাণের দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৮৫ সালে আমেরিকার অভ্যন্তরে বিদেশের এফ.ডি.আই.-এর পরিমাণ ছিল ১৮২.৯ বিলিয়ন ডলার, যা বিদেশে আমেরিকান কোম্পানিগুলির মোট সম্পদের ৮০ শতাংশ। মোটের উপর সারা বিশ্বের মোট এফ. ডি. আই.-এর ৬৫ ভাগ কেন্দ্রীভূত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পঃ ইউরোপের দেশগুলি এবং জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যাণ্ডে; বাকি ৩৫ ভাগ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

পরবর্তীকালে এফ. ডি. আই ঘটার পরিসরে প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, এমনকি চীনও যুক্ত হয়েছে। ১৯৯২ সালে অনুন্নত, প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক এবং বর্তমান কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির যে এফ. ডি. আই. ঘটেছে, 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-১৯৯৪' থেকে তা' নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১ দেশ (১) নিম্ন আয়ী অর্থনীতি	২ দেশগুলিতে নীট এফ. ডি. আই. প্রবাহের পরিমাণ (মিলিয়ন ডলারে)		৩ পোর্ট ফোলিও ইক্যুইটি প্রবাহ (মিলিয়ন ডলারে)		৪ দেশগুলিতে মোট সম্পদ প্রবাহ (মিলিয়ন ডলারে)		৫ দেশগুলি থেকে মোট নির্গত হয়ে যাওয়া সম্পদ (মিলিয়ন ডলারে)	
	১৯৮০	১৯৯২	১৯৮০	১৯৯২	১৯৮০	১৯৯২	১৯৮০	১৯৯২
মোজাম্বিক	০	২৫	—	০	৭৬	১০৭১	৭৬	১০৬০
ইথিওপিয়া	০	৬	০	০	২১৮	১০৭৫	২০১	১০৩৩
তানজানিয়া	০	০	০	০	৮৪৮	১০২৬	৮০৪	৯৩৬
সিয়েরা লিওন	-১৯	৩৭	০	০	৫৯	১১১	৪৬	৯৯
নেপাল	০	৪	০	০	১২৭	২৫৪	. ১২৫	২২৭
উগাণ্ডা	০	৩	০	০	১২২	৪৫০	১১৮	৪৩১
ভুটান	০	০	০	০	২	৪১	২	৩৯

১	২		৩		৪		৫	
বুরুণ্ডি	০	০	০	০	৭৪	২১৭	৭২	১৯৮
মালয়	১০	০	০	০	১৭৮	৩৫২	১৩৫	৩২২
বাংলাদেশ	০	৪	০	০	১৫৯৫	১৭৩৩	১৫৪৮	১৫৬৮
চাঁদ	০	৫	০	০	২৫	২৯২	২৫	২৮৫
গিনি-বিসাউ	০	০	০	০	১০৩	৭৪	১০২	৭২
মাদাগাস্কার	-১	২১	০	০	৩৪৮	৪৩৫	৩২১	৪০১
লাওস পি ডি আর	০	৯	০	০	৫৪	১০৮	৫৩	১০৪
রুয়াণ্ডা	১৬	২	০	০	১০৯	২৪৮	৯৮	২৩৯
নাইজার	৪৯	০	০	০	৩২৪	৩৭১	২৪৮	৩৫৯
বুরকিনা ফাঁসো	০	০	০	০	১৪২	৩৮০	১২৮	৩৬৬
ভারত	৭৯	১৫১	০	২৪০	২১১৪	৪৪৬০	১৫৮৩	১৬১৪
কেনিয়া	৭৯	৬	০	০	৬৩০	৪৯৪	৩১৬	১৮৯
মালি	২	-৮	০	০	১৯৫	৩৪৬	১৯২	৩০৬
নাইজেরিয়া	-৭৪০	৮৯৭	০	০	৭৭৩	-৩৪২	-১৩৫৬	-২১১৪
নিকারাগুয়া	০	১৫	০	০	২৭৯	৭৬৬	২১৭	৭১৮
টোগো	৩২	০	০	০	১৩৯	১১৭	১১৯	৯৩
বেনিন	৪	৭	০	০	১০১	১৪৫	৯৬	২৩৫
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাব্লিক	৫	-৩	০	০	৮৫	১২৬	৮৫	১১৯
পাকিস্তান	৬৩	২৭৫	০	১১	১২৫৪	১৯৩৫	১০০০	১২৮০
ঘানা	১৬	২৩	০	০	১৮১	৭৭৫	১৩৫	৬৯০
চীন	০	১১১৫৬	০	১১৯৪	১৯৩৪	২২৬২৮	১৬১৬	১৯৭৮৩
তাজিকিস্তান	০	০	—	০	০	১০	০	১০
গায়না	০	০	০	০	৭২	৩১০	৪৯	২৭৭
মরিটানিয়া	২৭	২	০	০	১৯৭	২০১	১১৬	১৭৫
শ্রীলঙ্কা	৪৩	১২৩	০	০	৪২৫	৫০৬	৩৭৭	৩৪২
জিম্বাবোয়ে	২	৪	০	০	১২১	৬১০	১৩৩	৩৭৩
হণ্ডুরাস	৬	৬০	০	০	২৮৩	৪৯৭	১২৩	২৬৫
লেসোথো	৫	৩	০	০	৬৬	১১৩	৫৯	৭৬
মিশর	৫৪৮	৪৫৯	০	০	৩২২৯	২৯৭৯	২৮১৩	২০৯২
ইন্দোনেশিয়া	১৮০	১৭৭৪	০	১১৯	১৯০২	৭৭১১	-২৫১৪	১৭৬৪
মায়নামার	০	৩	০	০	৩৮০	১৮৩	৩৭৯	১৮৩
সোমালিয়া	০	৩	০	০	২৬৮	১১৩	২২৩	৮৭
সুদান	০	০	০	০	১০৪৬	৬৬৪	৯৯৭	৬৫৩
ইয়েমেন রিপাব্লিক	৩৪	০	০	০	৯৪৪	৩৬১	৯৩৪	৩৩৬
জাম্বিয়া	৬২	৫০	০	০	৫২৪	৬৩০	৩২৪	৪৯৫
(২) মধ্যম-আয়ী অর্থনীতি : (ক) নিম্ন-মধ্যম আয়ী								
কোটে ডি আইভরি	৯৫	৪৯	০	০	১১৩৮	৬২৯	৩৬০	১০১
বলিভিয়া	৪৭	৯৩	০	০	৪০৭	৫১১	২১৪	৩৮৫
ফিলিপিনস্	-১০৬	২২৮	০	৩৩৩	১২৬৬	৩৪০৬	৪৮৮	১৬৮৪
আর্মেনিয়া	০	০	—	০	০	২	০	২

১	২		৩		৪		৫	
সেনেগাল	১৫	০	০	০	২৬৩	৫৩৫	১৬১	৪৫৭
ক্যামেরুন	১৩০	১০	০	০	৬৫৬	৭২৯	৪২২	৬৭২
কিরঘিজ রিপাব্লিক	০	০	—	০	০	২২	০	২২
জর্জিয়া	০	০	—	০	০	০	০	০
উজবেকিস্তান	০	৪০	—	০	০	৫৬	০	৫৬
পাপুয়া-নিউগিনি	৭৬	৪০০	০	০	৪১৮	১২৭৭	১৬৩	১০০৭
পেরু	২৭	১২৭	০	০	৩৪৭	৫৯৪	(-)৫৮০	১৫৯
গুয়াতেমালা	১১১	৯৪	০	০	২১৭	১০০	১১৪	(-)৯৪
কঙ্গো	৪০	০	০	০	৫৪৮	(-)১৮	৫০৫	(-)৪৫
মরক্কো	৮৯	৪২৪	০	০	১৩৫৩	১৭৬৩	৬৪৫	৬৫৫
ডোমিনিকান রিপাব্লিক	৯৩	১৭৯	০	০	৪৫৪	২১০	২৬৭	৯৭
ইকুয়েডোর	৭০	৮৫	০	০	৮২৫	-১	৩৪৯	-৫২৭
জর্ডন	৩৪	৪১	০	০	১৪২৭	৬৪৫	১৩৪৮	৩৬৭
রোমানিয়া	০	৭৭	০	০	১৯৭৩	১১০০	১৬৪১	১০৫৬
এল সালভাদোর	৬	১২	০	০	১১১	২২৫	৩৪	১০৬
তুর্কমেনিস্তান	—	—	—	—	—	—	—	—
মলডোভা	০	০	—	০	০	২৯	০	১২
লিথুয়ানিয়া	০	১০	—	০	০	১২১	০	১২১
বুলগেরিয়া	০	৪২	—	০	৩৩৯	২৪৫	৩১৯	৬২
কলম্বিয়া	১৫৭	৭৯০	০	০	৯৭৪	-৭৮	৫৫৩	-২২৭১
জ্যামাইকা	২৮	৮৭	০	০	২৯২	১৪০	৫৭	-৮৪
প্যারাগুয়ে	৩২	৪০	০	০	১৬৮	-১৫৭	৭০	-৪৪৯
নামিবিয়া	—	—	—	—	—	—	—	—
কাজাকস্তান	০	১০০	—	০	০	১১৬	০	১১৬
তিউনিসিয়া	২৩৫	৩৭৯	০	০	৬১২	১০৩২	২৩২	৩৪১
ইউক্রেন	০	০	—	০	০	৪২৬	০	২২১
আলজেরিয়া	৩৪৯	১২	০	০	১২৯৫	১৩১	(-)৮৩০	(-)১৯৫৯
থাইল্যাণ্ড	১৯০	২১১৬	০	৪	২০৮৭	৩৮৩৬	১৫৭৬	১৬১৮
পোল্যাণ্ড	১০	৬৭৮	—	০	৩১৪৩	৯৩৩	২৪৩৯	(-)২৭
লাটভিয়া	০	১৪	—	০	০	১১৪	০	১১৪
স্লোভাক রিপাব্লিক	—	—	—	—	—	—	—	—
কোস্টারিকা	৫৩	২২০	০	০	৪২৫	২৯৮	২৩৫	১২
তুরস্ক	১৪	৮৪৪	০	০	২০৮৩	৪১০৭	১৫৪৫	৪৮৬
ইরান	০	(-)১৭০	০	০	-২৬৫	২৩২০	(-)১০৯৫	২২৫২
পানামা	(-)৪৭	(-)১	০	৮৮	১৪৯	৫৮	(-)১৭৪	-৩৭০
চেক রিপাব্লিক	—	—	—	—	—	—	—	—
রাশিয়ান ফেডারেশন	—	—	—	০	২৫২	১৪৪০১	১২৭	১৩৮৯৫
চিলি	২১৩	৭৩৭	০	১২৯	২৩১২	১৫০৬	১৩০৭	-৫২৬
আলবেনিয়া	০	০	—	০	০	৩৭৭	০	৩৭৫
মঙ্গোলিয়া	০	৬	—	০	০	১৫৯	০	১৪৯
সিরিয়ান আরব রিপাব্লিক	০	৬৭	০	০	২৫৭৪	২৮১	২৪৯৭	১১৩

১	২		৩		৪		৫	
(খ) উচ্চ-মধ্যম আয়ী								
দক্ষিণ আফ্রিকা	—	—	—	—	—	—	—	—
মরিশাস	১	১৫	০	০	৯৩	৩৯	৬৯	-৩৮
এস্তোনিয়া	০	৫৮	—	০	০	১৭৯	০	১৭৮
ব্রাজিল	১৯১১	১৪৫৪	০	১৭৩৪	৬৬২১	৭১৫১	-৬৬৫	৩৩২৫
বসনিয়া	১১২	৬১	০	০	১৮৪	১২৩	৬৯	-১৯৫
মালয়েশিয়া	৯৩৪	৪১১৮	০	৩৮৫	২০৫২	৫২৯৭	৫২৪	১৯৩৮
ভেনেজুয়েলা	৫৫	৬২৯	০	১৪৬	৪৮৪৪	১৭৯৯	৪৭	-৩১২
বেলারুশিয়া	—	০	—	০	০	১৮২	০	১৮২
হাঙ্গেরি	০	১৪৭৯	০	৩৪	৭২৪	১২৭৩	৯২	-৩৯২
উরুগুয়ে	২৯০	১	০	০	৫১৬	৩৪১	৩৯৫	১১৩
মেক্সিকো	২১৫৬	৫৩৬৬	০	৫২১৩	৪৯৯১	১০৩০৯	৩০৪৩	২৬১৩
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	১৮৫	১৭৮	০	০	৩৭২	১৯৮	-১৫৭	-১৮০
গ্যাবন	৩২	-৩৬	০	০	-৭৩	৫	-৪৬৫	-৩৮৭
আর্জেন্টিনা	৬৭৮	৪১৭৯	০	৩৯২	৩৫৩৫	৫০১৯	১৫৯৩	১৭৮২
ওমান	৯৪	৫৯	০	০	১৭৪	-১২	-১৫৬	-৬০৩
স্লোভেনিয়া	—	—	—	—	—	—	—	—
পুয়ের্তোরিকো	—	—	—	—	—	—	—	—
কোরিয়া রিপাব্লিক	৬	৫৫০	০	২৪২০	২৪৪০	৫৮৯৯	৭৪০	৩৬৭৩
গ্রীস	—	—	—	—	—	—	—	—
পর্তুগাল	১৫৭	১৮৭৩	০	১১৫	১৬২০	৪৮৩২	১০৭৪	৩২৪৮
সৌদি আরব	—	—	—	—	—	—	—	—

এফ. ডি. আই.-এ বহুজাতিক সংস্থার উদ্যোগী ভূমিকা

এই সময়ে এফ. ডি. আই.-এর বিষয়ে পৃথিবীতে প্রধান ভূমিকা পালন শুরু করে শিল্পোন্নত দেশগুলির মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ও মালটিন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলি। পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি, সংহতিসাধন ও নীতি নির্ধারণে বহুজাতিক সংস্থাগুলির কেন্দ্রীয়, প্রধান ও আক্রমণাত্মক সর্বশক্তিমান ব্যবস্থা ও সংগঠনে পরিণত হয়ে ওঠার কাল-পর্ব ছিল এই সময়; মূলধনের ঘনীভবন ও কেন্দ্রীকরণে বিপুল গতি সৃষ্টি হচ্ছিল এই কাল-পর্বে। এই উপাদানগুলির প্রধান প্রতিনিধিত্ব ও পরিস্ফুটন ঘটছিল আর্থনীতিক ও শিল্পগত ক্ষেত্রে অলিগার্কি বা নির্দিষ্ট অল্পসংখ্যক ব্যক্তির (পুঁজিবাদী মালিক) সর্বাত্মক ক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে—যেগুলি হলো আন্তর্জাতিক শিল্প ও ব্যাঙ্কের কর্পোরেশন বা বহুজাতিক শিল্প ও ব্যাঙ্কিং সংস্থা।

কিছুটা স্পষ্ট উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। মধ্য-সত্তরের দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আমেরিকার বেসরকারী মালিকানার প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগের তিন-চতুর্থাংশ ছিল সেখানকার ১৭৯টি বৃহত্তম মালটিন্যাশনাল কোম্পানির। ১০টি আমেরিকান এম. এন. সি. মেক্সিকোতে সমগ্র উত্তর আমেরিকান বিনিয়োগের অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করতো, ব্রাজিলে ১৫টি আমেরিকান কোম্পানি ৬০ ভাগের নিয়ন্ত্রণ চালাতো। ঐ সময়ে সমগ্র লাতিন আমেরিকার খনিজ উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ৯৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতো ১৩টি আমেরিকান কোম্পানি; তৈল উত্তোলনের বিনিয়োগে ১৫টি এম. এন. সি. ৮৬ শতাংশের অংশীদার ছিল; মার্কিন সর্ববৃহৎ ২৫টি এম. এন. সি. মালিক ছিল উত্তর আমেরিকার ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অর্ধেকের বেশি পুঁজি বিনিয়োগের।

বিদেশে পুঁজি রপ্তানিকারকদের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের এম. এন. সি.গুলিও ছিল ক্ষমতাধর

শক্তি। সেগুলির মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্যগুলি ছিল রয়াল ডাচ শেল, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, ইউনিলিভার (গ্রেট ব্রিটেন), ফিলিপস্ (হল্যাণ্ড), ব্রেয়ার অ্যাণ্ড বি. এ. এম. এফ (পশ্চিম জার্মানি), এলফ-এ্যাকুইতানি অ্যাণ্ড রোনে-পোলে (ফ্রান্স) প্রভৃতি। জাপানের পুঁজি-রপ্তানির শক্তিও ছিল প্রচণ্ডভাবে কেন্দ্রীভূত।

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির বড় অংশই পশ্চাৎপদতার কারণে পুঁজি, বৈদেশিক মুদ্রা, আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্পগত দক্ষতা, কলকারখানার সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য এম. এন. সি.গুলির শরণাপন্ন না হয়ে পারেনি। তারা ভেবেছিল যে বিদেশী পুঁজি পাওয়া গেলে দেশের ভেতরের অর্থনীতির প্রধান কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের সমস্যার সমাধান, আরও চাকুরীর সুযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ভিত্তির সম্প্রসারণ ইত্যাদি ঘটবে। কোথাও তারা একেবারে কিছু পায়নি, একথাও বলা যাবে না। যেমন বর্তমানে যাদের এশিয়ান টাইগার বলা হয়—হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপিনস এবং লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি, তারা কতকগুলি নির্দিষ্ট বাস্তবতা ও টি. এন. সি.গুলির নিজস্ব লক্ষ্যধর্মী প্রয়োজনের সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছিল। কিন্তু বাকি দেশগুলির ক্ষেত্রে বিপুল অসম বিনিময়-ব্যবস্থাকে স্থায়ী নির্ভরশীলতা ও শোষণের উপাদান হিসাবেই ব্যবহার করে এসেছে এম. এন. সি.গুলি। কিন্তু এইসব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বহু দেশের এফ. ডি. আই.-এর মোহ কাটেনি; তারা ক্রমাগত এম. এন. সি-র স্বার্থে সুযোগ দিয়েছে ও স্বাগত জানিয়েছে। এখন ইউরোপের মধ্যে কতকগুলি দেশ যারা তুলনামূলকভাবে অনেকটা পিছিয়ে, তাদের পরিণামও এরই কাছাকাছি গেছে।

এইসব প্রতীকী উদাহরণ থেকে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি ও এফ. ডি. আই.-এর প্রকৃত চরিত্র কিছুটা অনুমান করা যায়।

তথ্যভিত্তিক আরও কিছু দিক এই প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে। ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এম. এন. সি.গুলির তৃতীয় দুনিয়ায় এফ. ডি. আই-এর পরিমাণ ছিল ৫৩.৯ বিলিয়ন ডলার। তৃতীয় দুনিয়ায় মোট প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র লাতিন আমেরিকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এম. এন. সি.গুলি অর্ধেক বিনিয়োগ করে থাকতো। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্যারিবিয়ান দেশগুলির আর্থিক সামর্থ্য কমে যাওয়ায়, আমেরিকার এফ. ডি. আই. লাতিন আমেরিকাতে প্রভূত পরিমাণে কমে যায়। অন্যদিকে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে এশিয়াতে আমেরিকান এম. এন. সি.গুলির এফ. ডি. আই. বেড়েছিল ১৬০ ভাগ।

এম. এন. সি.গুলি তাদের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের কৌশল গ্রহণ করেছিল। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে লাতিন আমেরিকাতে যে ১৩২৫টি আমেরিকান এম. এন. সি. কর্তৃত্ব করতো সেগুলির মধ্যে ৬৩৮টি ছিল নতুন প্রতিষ্ঠিত। দেশীয় মালিকদের হঠিয়ে দিয়ে একের পর এক প্রতিষ্ঠান তারা কিনে নিচ্ছিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য তারা কৌশল পরিবর্তন করে। মার্কিন এম. এন. সি.গুলি ১৯৭১-৭৫ সালের মধ্যে এফ. ডি. আই.-এর দ্বারা বিভিন্ন দেশে যে ১৭৯টি নতুন সংস্থা তৈরি করে তাতে তাদের শেয়ার ছিল মাত্র ২৮ শতাংশ। পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় যে এই সময়ে জাপানী এম. এন. সি.গুলি প্রতিষ্ঠিত ১১৫২টি কোম্পানির মধ্যে মাত্র ২৫৮টিতে ৫০ ভাগ শেয়ার রাখে।

(৫) পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক অগ্রগতিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলির নতুন পদ্ধতিগুলি

সত্তর দশকের শেষার্ধ থেকে এম. এন. সি.গুলি দৃশ্যত, এফ. ডি. আই. কমিয়ে দিতে থাকে। মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন তথা ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন বা বর্ডারলেস কর্পোরেশন নামে ক্রমে অভিহিত এইসব প্রতিষ্ঠান তাদের শেয়ার কমানো পুষিয়ে নিতে থাকে নানা পথে। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে অপ্রত্যক্ষ কিন্তু অনেক বেশী কার্যকরী ও শক্তিশালী সেইসব ব্যবস্থা। এই পদ্ধতির অন্যতম হলো ডাইভারস প্রোডাকশন অর্থাৎ নানাভাবে উৎপাদন করা—একটি পণ্যকে বাজারে ছাড়ার আগে সেটির নির্মাণ-প্রক্রিয়া অনেকগুলি দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা। এই পদ্ধতির ফলে

পণ্য উৎপাদনের সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলি কখনোই নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে না। ফলে, পণ্যগুলির পূর্ণাঙ্গ রূপ অর্জনের জন্য এম. এন. সি.গুলির মুখাপেক্ষী থাকতেই হয়। তাছাড়া ট্রেড বা বাণিজ্য, ক্রেডিটিং বা ঋণ হিসাবে অর্থের যোগান, মার্কেটিং বা বাজারীকরণ ও অন্যান্য সূত্রে এম. এন. সি.গুলি অতীতের চেয়ে বেশি কর্তৃত্ব তথা মুনাফা করতে থাকে। তথাকথিত জয়েন্ট ভেঞ্চার বা যৌথ মালিকানার উদ্যোগগুলিতে যেসব দেশ আত্মসন্তুষ্টি বোধ করতো এই ধারণা থেকে যে তাদের জাতীয় স্বার্থ জয়েন্ট ভেঞ্চারে সুরক্ষিত হবে, কার্যকালে দেখা যেতে লাগল যে উৎপাদন, কর্তৃত্ব ও লাভের সুতো সম্পূর্ণই বাঁধা পড়ে গেছে এম. এন. সি.গুলির হাতে। মধ্য-সত্তরের দশকে উত্তর আমেরিকার এম. এন. সি.গুলি, যাদের মূল কোম্পানি মেক্সিকোয় অবস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলি বা অন্য দেশের জয়েন্ট ভেঞ্চারের কোম্পানিগুলির ঋণের চল্লিশ ভাগ ছিল মূল কোম্পানির কাছে। তাছাড়া উৎপাদনের উপকরণ ও মাল-মশলার ১৯ ভাগ মূল কোম্পানি থেকে সরবরাহ হতো। এবং বিদেশে বিক্রয়ে ৮২ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতো মূল মালটিন্যাশনাল কোম্পানিগুলি। ব্রাজিলে জয়েন্ট ভেঞ্চারের ক্ষেত্রে মূল এম. এন. সি. কোম্পানিগুলি ঋণের অর্ধেক, উৎপাদনের মাল-মশলার ১২ ভাগ ও রপ্তানির ৭৫ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো।

অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ও বাড়াতে এম. এন. সি.গুলি হাতে আরও প্রবল ধারালো অস্ত্র জমা হয়েছিল। ১৯৮০ সালের হিসাবে দেখা যায় যে তারা বিশ্ব-কৃষি উৎপাদনের ও খনিজ কাঁচা মালের বাজারীকরণের বা বাণিজ্যের ৭০-৮০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো। এই প্রসঙ্গে সারণীটি দেখা যেতে পারে ঃ (সারণী-১ দ্রষ্টব্য)

সারণী-১

বিশ্ব-পণ্য-বাণিজ্যে এম. এন. সি.-র নিয়ন্ত্রণ (১৯৮০ সাল)					
পণ্য	বিশ্ব-রপ্তানি (বি. ডলারে)	১৫টি সর্বপ্রধান এম. এন.সি.-র দ্বারা নিয়ন্ত্রণের হার (শতাংশে)	পণ্য	বিশ্ব-রপ্তানি (বি. ডলারে)	১৫টি সর্বপ্রধান এম. এন. সি.-র দ্বারা নিয়ন্ত্রণের হার (শতাংশে)
খনিজ কাঁচা মাল			তামাক	৩.৯	৮৫-৯০
খনিজ তেল	৩০৬.০	৭৫	পাট	০.২	৮৫-৯০
তামা	১০.৬	৪০-৮৫	**খাদ্য**		
খনিজ লৌহ	৬.৯	৯০-৯৫	গম	১৬.৬	৮৫-৯০
টিন	৩.৬	৭৫-৮০	চিনি	১৪.৪	৬০
ফসফেট	১.৬	৫০-৬০	কফি	১২.৬	৮৫-৯০
বক্সাইট	১.০	৮০-৮৫	ভুট্টা	১১.৯	৮৫-৯০
কৃষিজ কাঁচা মাল			চাল	৫.০	৭০
বনজ সামগ্রী	৫৪.৫	৯০	কোকো	৩.০	৮৫
তুলা	৭.৯	৮৫-৯০	চা	১.৯	৮০
প্রাকৃতিক রবার	৪.৪	৭০-৭৫	কলা	১.৩	৭০-৭৫

কাঁচা মালের এই তালিকা থেকে স্পষ্ট হবে যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির ওপর এম. এন. সি.-র কি বিশাল ও নির্ধারক কর্তৃত্ব শুরু হয়েছিল এবং ক্রমে তা' বৃদ্ধি পেয়ে কি বিপুলাকার ধারণ করে। অন্যভাবে বলা চলে যে কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ মাত্র নয়, সমস্ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার কি অপরিসীম ক্ষমতা দখল করছিল বহুজাতিক সংস্থাগুলি।

এটা ঠিক যে পরিস্থিতি সব ক্ষেত্রে একরকম ছিল না। কোন কোন সামগ্রীর বাজারীকরণে এম. এন. সি.গুলি উৎপাদন, উৎপাদন প্রণালীর অধ্যায়গুলি এবং বাজারের (বিশেষত বক্সাইট ও কলা—কলাই বাহুল্য যে লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের প্রধান সামগ্রী কলা) উপর নিয়ন্ত্রণ করছিল

এবং তার দ্বারা আন্তঃ-এম. এন. সি. চলাচল ব্যবস্থায় একচেটিয়াপনা ও নিরঙ্কুশ লাভ ছিল অব্যাহত। পাশাপাশি মালটিন্যাশনাল ট্রেড কর্পোরেশনগুলি বা বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ভূমিকাও ক্রমশ অনেক বেড়েছিল। এরা তুলা, ডাল ও দানাশস্য, কোকো ও তামাকপাতার বাজারে কর্তৃত্ব করতে থাকে। এই বহুজাতিক বাণিজ্যিক কর্পোরেশনগুলি কেবলমাত্র বিদেশী বাজার নিয়ন্ত্রণ করছিল না, ক্রেতা দেশগুলির জাতীয় অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে নিজস্ব একচেটিয়া অবস্থানকেও করছিল সংহত। বহুজাতিক সংস্থাগুলির কোন কোন শাখাকে একদা বিভিন্ন দেশ রাষ্ট্রীয়করণ করলেও তৈল-উৎপাদক দেশগুলি তখনও পর্যন্ত বাজারীকরণের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। সুতরাং খনিজ তেলের উৎপাদন রাষ্ট্রীয়করণ করা সত্ত্বেও তৈল-উৎপাদক দেশগুলি শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রধান ক্রেতাদের সাথে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আদান-প্রদান করতে পারছিল না। ফলে বহুজাতিক সংস্থাগুলির উপরই পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে হচ্ছিল। একইভাবে দেখা যায় যে উন্নয়নশীল দেশগুলির কাঁচা মাল উৎপাদন ও বাগিচা-উৎপন্ন সামগ্রীর ওপর একদা সাম্রাজ্যবাদীদের আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব চলে যাবার পর সেই কর্তৃত্বশূন্যতা পূরণ করছিল মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি —এই সামগ্রীগুলির প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারীকরণের উপর একচেটিয়াপনা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এম. এন. সি.গুলি প্রধানত ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে তৃতীয় দুনিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছিল; তার অর্থ ছিল তৃতীয় দুনিয়ার শিল্প ও শিল্প-অর্থনীতির উপর কব্জাকে শক্ত করা। '৭০-এর দশকের শেষার্ধে সিঙ্গাপুরের মোট শিল্প উৎপাদিত পণ্যের ৮৩ শতাংশ ও শ্রমবাহিনীর ৫৮ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ার যথাক্রমে ৪৪ ও ৪৩ শতাংশ এরা নিয়ন্ত্রণ করতো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে লাতিন আমেরিকার ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে এম. এন. সি.গুলির এফ. ডি. আই. ৪০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থমূল্যে এর পরিমাণ ৩৫,০০০ মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। রাসায়নিক, মোটর যান ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এরা নিয়ন্ত্রণ করে ৮০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত। তৃতীয় দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে আমেরিকার এম. এন. সি.গুলির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেখানকার অভ্যন্তরীণ বাজারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে এদের বিক্রয়ের মূল্য বেড়েছিল প্রায় ৭ গুণ; আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১,৫০,০০০ মিলিয়ন ডলার।

বহুজাতিক সংস্থাগুলি অনুন্নত দেশে নিজেদের অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথে ছোট ছোট শিল্পসংস্থাকে নিজের সাথে জুটিয়ে নিচ্ছিল। এই তৎপরতার মধ্য দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক মিত্র গঠন, জনমানসে বিরূপ ধারণার অপসারণ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে নিজেদের উৎপাদনের খরচ কমানো ও ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে প্রধানত এটা করা হচ্ছিল। এগুলি এম.এন.সি.-র সাবসিডিয়ারি সংস্থা ছিল না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ব্রাজিলে পশ্চিম জার্মানীর এম.এন.সি. ভক্সওয়াগনের ৫,০০০টি জাতীয় সাপ্লায়ার সংস্থা সৃষ্টি হয়; আর্জেন্টিনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল হারভেস্টারের ছিল অনুরূপ ১২০০টি স্থানীয় সংস্থা; মেক্সিকোতে ৯টি বিদেশী প্রধান মোটর নির্মাণকারী এম. এন. সি.-র ছিল ৫৫৭টি সংস্থা, যারা ৫৬ হাজার শ্রমিক নিয়োগ করত।

এইসব ব্যবস্থায় যে মুনাফা এম. এন. সি.গুলি অর্জন করছিল তার প্রকৃত তথ্য কখনোই জানা যায়নি। তবে আনুষ্ঠানিক-প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুনাফার চরিত্রের ব্যাপকতা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

১৯৮৩ সালে আমেরিকান কিছু এম. এন. সি. ও এম. এন. বি. (ব্যাঙ্ক)-র স্বদেশে ও বিদেশে অর্জিত মোট মুনাফার মধ্যে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার হার ছিল এইরূপ :

কোম্পানির নাম	মোট আয়ের মধ্যে বিদেশে আয়ের শতাংশ	কোম্পানির নাম	মোট আয়ের মধ্যে বিদেশে আয়ের শতাংশ
এক্সন	৭১.৪	সিটি কর্প.	৬১.০
মোবিল	৬২.০	আই. টি. টি.	৪৪.৮
টেক্সাকো	৬৬.২	ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা	৫৩.৮
স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি অব কালিফোর্নিয়া	৪৯.৩	চেজ ম্যানহাটন	৬১.০
ফাইরো-সলোমন	৬২.২	ডাও কেমিক্যাল	৫২.২
ফোর্ড মোটর কোম্পানি	৪৪.৬	জেনারেল ইলেকট্রিক	২০.২
আই. বি. এম.	৪৪.৬	সান কোম্পানি	৩১.২
জেনারেল মোটরস	২৩.৯	স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অব ইণ্ডিয়ানা	১৭.১
গালফ অয়েল	৪০.৫	অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম কোং	২৫.৪
ডুপন্ট ডে নেমাউর	৩৩.৩	সেফওয়ে স্টোর্স	২৪.৮

১৯৮৯ সালের আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য হিসাব অনুযায়ী এম. এন. সি. ও এম. এন. বি.গুলি তাদের এফ. ডি. আই. থেকে বছরে ১৫-১৬ বিলিয়ন ডলার লাভ করে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ কোনভাবেই ১০০ বিলিয়ন ডলারের কম ছিল না।

এম. এন. সি.গুলি তাদের মুনাফা নিশ্চিত ও ক্রমাগত বৃদ্ধি করার জন্য অবলম্বন করছিল নানাবিধ পন্থা। আমেরিকান এম. এন. সি.গুলির এশীয় সাবসিডিয়ারিগুলিতে একই দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের আমেরিকার শ্রমিকের চেয়ে এক-দশমাংশ মজুরি দেওয়া হতো। তাছাড়া এশীয় শ্রমিকদের কাজের সময় ছিল আমেরিকার মূল কোম্পানীর শ্রমিকদের থেকে দৈনিক ১ থেকে ১$\frac{১}{২}$ ঘন্টা বেশী।

এম. এন. সি.গুলির অপর গৃহীত পদ্ধতি ছিল বিদেশের স্থানীয় বাজার থেকে স্থানীয় উৎপাদন ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের উৎখাত করা। এই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছিল 'রেসট্রিকটিভ বিজনেস প্র্যাকটিস' বা আর. বি. পি.। এটা তারা করছিল একই সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী ও ক্রেতাদের উপর নানা কায়দাতে চাপ সৃষ্টি করে। আর. বি. পি. পদ্ধতির একটি দিক হলো 'প্রাইস ওয়ার' বা দরের যুদ্ধ ঘোষণা করা। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিধ্বস্ত করার জন্য উৎপাদিত পণ্য কম দামে, এমনকি উৎপাদন মূল্যের চেয়েও কম দামে, বাজারে ছেড়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দর নামাতে বাধ্য করে লোকসানে ফেলে সর্বনাশ করা অথবা তাদের বাধ্য করা সরাসরি আত্মসমর্পণ করিয়ে বাজার থেকে হঠে যেতে। অপর পদ্ধতি হলো 'রিজেকশন অব বিজনেস টাইজ' বা আর. বি. টি.। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যাদের সাথে কোন এম. এন. সি.-র ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল, তা' অকস্মাৎ ছিন্ন করে তাদের পুঁজি ও উৎপাদন, কাঁচামাল ও বাজার ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তাদের বসিয়ে দেওয়া।

অনুন্নত দেশে বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাবসিডিয়ারিগুলি যে লাভ করে তার একটা অংশ সংশ্লিষ্ট দেশে পুনর্বিনিয়োগ করা তাদের ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল; কেননা সেই পুঁজি থেকে আবার উদ্বৃত্ত বা মুনাফা অর্জিত হতো। এইভাবে চক্রাকারে পুঁজি বাড়ছিল এবং মুনাফাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। কিন্তু লাভ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের একটা সামান্য ভগ্নাংশ তৃতীয় দুনিয়ায় পুনর্নিযুক্ত হতো। বড় অংশ চলে যেতো মালটিন্যাশনালদের কেন্দ্রীয় অবস্থানকারী দেশে। ফলে তৃতীয় দুনিয়াতে যে মোট উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হতো, তার পূর্ণসঞ্চালন সংশ্লিষ্ট দেশে হতো না। স্বভাবতই এইসব দেশে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য বা লাভ কখনো জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক হয়নি। প্রসঙ্গত লাতিন আমেরিকার নমুনা দেখা যেতে পারে।

১৯৬৬-৮১ সালের মধ্যে লাতিন আমেরিকাতে ইউ. এস. বহুজাতির সংস্থাগুলির পুনর্বিনিয়োগের স্বরূপ : (সারণী-২ দ্রষ্টব্য)

তিনটি উপাদান এখানে লক্ষণীয়। (১) পরিমাণের দিক থেকে আয় (ক) ক্রমাগত বাড়ছে, (২) পরিমাণের দিক থেকে (খ) ও বাড়ছে; (৩) কিন্তু নীট ফলাফল তৃতীয় দুনিয়া বেশি করে (গ) -তে

পুঁজি হারাচ্ছিল। এইভাবে এম. এন. সি.গুলি বেশি বেশি মুনাফা অর্জন ও দেশে অর্থ পাঠিয়ে সেই কালে সংকটগ্রস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির উন্নতির ভবিষ্যৎ শর্ত সৃষ্টি করে চলেছিল। এই সময়ের আরও একটি উপাদান হচ্ছে এই যে, এম. এন. সি. ও এম. এন. বি.গুলির ভূমিকা দুই-তৃতীয়াংশ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে তারা পরিকল্পিত কনসেশন দিচ্ছিল পুঁজি, পণ্য ও শ্রম-মজুরিতে। কিন্তু তা' তারা পুষিয়ে নিচ্ছিল তৃতীয় দুনিয়া থেকে। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হলো, ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে ইউরোপে আমেরিকান সাবসিডিয়ারিগুলি যেখানে আমেরিকাতে ৫,০০০ মিলিয়ন ডলার আয় বাবদ পাঠিয়েছিল, তখন লাতিন আমেরিকা থেকে আয় বাবদ পাঠিয়েছিল ৯,০০০ মিলিয়ন ডলার।

সারণী-২

সাল	ইনকাম, ফী'জ ও রয়্যালটি বাবদ আয় (ক) (মি. ডলার)	সাবসিডিয়ারিগুলির পুনর্বিনিয়োগ (খ) (মি. ডলার)	দেশ থেকে বহির্মুখী পুঁজি (গ) (মি. ডলার)
'৬৬-'৬৯	৬,৬৬২	১,২০২	৫,৪৬০
'৭০-'৭৩	৭,৯৯৭	২,৪৬২	৫,৫৩৫
'৭৪-'৭৭	১৫,১৬৬	৫,৬৩৫	৮,৫৩১
'৭৮-'৮১	২৬,৪৪০	১১,৭০৫	১৪,৭৩৫

(৬) ট্রান্সফার-প্রাইজিং বা স্থানান্তরিত দর

নতুন বিশ্ব অর্থনীতি গঠনের প্রক্রিয়ায় ট্রান্সফার-প্রাইজিং এমন এক ব্যবস্থা যা অনেকটা "নেই, কিন্তু আছে" জাতীয় একধরনের ধাঁধা, স্বভাবতই এ নিয়ে আর্থনীতিক নানা তাত্ত্বিক বিতর্কও আছে। কিন্তু সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে যা আছে তা' হলো শোষণের ও মুনাফা অর্জনের এটি হলো আর এক পদ্ধতি; মুনাফাকে লুকিয়ে, কিভাবে সেই মুনাফা থেকে আর এক প্রস্থ মুনাফা করা যায় তেমন হাতসাফাই-এর এক ধারা। 'সারপ্লাস ভ্যালু' বা উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বে মুনাফাকে পুঁজি হিসাবে পুনর্ব্যবহার তথা উৎপাদনে পুনর্নিয়োগ করে মুনাফার চক্রাবর্ত গঠনের মূল ব্যবস্থা থেকে কিছুটা আলাদা এক ব্যবস্থা হিসাবে ট্রান্সফার-প্রাইজিংকে ব্যাখ্যা করা চলে। অর্থাৎ মুনাফাকে পুনর্নিয়োগ না করে আবার মুনাফা। অন্যদিকে দুর্নীতির পাহাড় বলতে মানুষের যে ধারণা তার চেয়ে অতিকায় দুর্নীতির নাম ট্রান্সফার-প্রাইজিং।

অর্থনৈতিক বিশুদ্ধ সংজ্ঞা হিসাবে ট্রান্সফার-প্রাইজিং বা স্থানান্তরিতদর বলতে বলা হয় অ্যাডমিনিস্টার্ড প্রাইজ তথা আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রিত মূল্য, যা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিভিন্ন পণ্য চলাচলের ওপর আরোপ করা হয়। স্বাধীন সংস্থাগুলির মধ্যে আদান-প্রদানে 'আর্মস লেংথ প্রাইস' বা নিকট দূরত্ব রেখে বাজারের মূল্যের ব্যবস্থার সাথে ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর পার্থক্য টানা যায়। ট্রান্সফার-প্রাইজিংকে মোটা দাগে ব্যবহার করা চলে কেবলমাত্র পণ্যের আদান-প্রদানের মধ্যেই নয়, তার সাথে কর্পোরেশনের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে পরিষেবা (রয়্যালটি ও ফী-সমূহ) এবং ফিনান্সিয়াল চার্জেসও (ইন্টারেস্ট বা সুদ) যখন তা' প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধার্য ও সংগ্রহ করা হয়। বহুধা-কারখানাসম্পন্ন কোন কর্পোরেশনের বিভিন্ন শাখার উৎপাদনের খরচের যখন স্বতন্ত্র মূল্যায়ন করা হয় তখন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিনিময়কালেও ট্রান্সফার-প্রাইজিং ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু ট্রান্সফার-প্রাইজিং প্রধানত ব্যবহৃত হয় বহুজাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা, যাদের ব্যবসা ছড়িয়ে থাকে বিভিন্ন দেশের সীমানা অতিক্রম করে এবং যাদের উৎপাদন, ব্যবসা ও বাণিজ্য সংঘটিত হয় বিভিন্ন দেশের মুদ্রার দ্বারা। শেষোক্তদের ক্ষেত্রে ট্রান্সফার-প্রাইজিং ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল। একই সাথে লাভ ও পুঁজির কারচুপির অন্যতম প্রধান প্রণালীও হয়ে ওঠে এটি।

এম. এন. সি.গুলির দ্বারা ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর মাধ্যমে ব্যাপক কারচুপির ফলে ভুক্তভোগী

দেশের (যেখানে এম. এন. সি.গুলির শাখা ব্যবসা করে) প্রবল সমস্যা নিয়ে অজস্র লেখা ও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণভাবে এই সমস্যা প্রধানত ছিল তৃতীয় দুনিয়ার সরকারগুলির। এই কারচুপি করা সম্ভব এ'কারণে যে এম. এন. সি.গুলিরই কেবল বহু দেশ জুড়ে উৎপাদন ও ব্যবসার ব্যবস্থা রয়েছে। ট্রান্সফার-প্রাইজিং প্রথা হয়ে উঠছিল এম.এন.সি.গুলির বিশ্ব-রণনীতির অন্যতম অঙ্গ এবং এটা পরিকল্পিতভাবে তৃতীয় দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছিল।

ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে আন্তঃফার্মগুলির মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার বাণিজ্য কি মাত্রায় ঘটে থাকে ভাল করে লক্ষ্য করা দরকার। ১৯৮৬ সালের হিসাব অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশে রপ্তানির এক-পঞ্চমাংশ ও আমদানির এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন দেশে ছড়ানো মার্কিন এম. এন. সি.গুলির সাবসিডিয়ারি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে কর্তৃত্বসম্পন্নদের অভ্যন্তরে ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। এটুকু তথ্য আসলে ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর সামান্য দিক। বিদেশে যে সব প্রতিষ্ঠানের মাত্র ৫ শতাংশ শেয়ার-ভোটের অধিকার ছিল, এম. এন. সি.গুলি তাদের মাধ্যমে যে আমদানি করতো, তা' আমেরিকার মোট আমদানির অর্ধেক। আন্তঃফার্ম ব্যবসাতে যে রয়ালটি এম. এন. সি.গুলি তখন পেতো, তা' দেশ-বিদেশ থেকে প্রাপ্ত আমেরিকার মোট রয়ালটির ৮০ শতাংশ। অন্যান্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রেও অবস্থা ছিল প্রায় অনুরূপ। ব্রিটেনের ক্ষেত্রে এম. এন. সি.গুলির আন্তঃফার্ম বাণিজ্য দেশটির মোট শিল্প-পণ্য রপ্তানির ৩০ ভাগের সমান, জার্মানির ক্ষেত্রে তা' ছিল ৪৩ শতাংশ।

ট্রান্সফার-প্রাইজিং ব্যবস্থার পেছনে কারণগুলি লক্ষণীয়। মূল কারণ ছিল অধিকতর মুনাফা ও তার কোন অংশ যাতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির হাত থেকে কোনভাবেই বেরিয়ে না যায় তা' নিশ্ছিদ্র করা।

(১) এম. এন. সি.গুলির ওপর আরোপিত বিভিন্ন দেশের মোট করের পরিমাণকে যথাসাধ্য কমানোর জন্য ও পৃথিবীব্যাপী কাজকর্ম চালাতে এই পথ নেওয়া হয়। তৃতীয় দুনিয়ার যেসব দেশে রাষ্ট্রীয় কর তুলনামূলকভাবে বেশী, সেইসব দেশ থেকে ট্রান্সফার-প্রাইজিং সর্বোচ্চ পরিমাণে ঘটতো। এইসব দেশে তাদের চেষ্টা ছিল মুনাফাকে কত কম করে দেখানো যায়। এই কাজে তারা 'ট্যাক্স হেভেন' বা 'করের স্বর্গ' বলে পরিচিত দেশগুলির মধ্য দিয়ে ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর দ্বারা মুনাফাকে স্বদেশে টেনে আনছিল। পৃথিবীতে ২০টির মতো দেশ ও অঞ্চলকে করের স্বর্গ বলা হয়। সেগুলির মধ্যে রয়েছে এন্টিলিস, বাহামা ও বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ, হংকং, পানামা, হেব্রাইডিস, সুইজারল্যাণ্ড, লিয়েচটেনস্টেইন, লুকসেমবার্গ প্রভৃতি। এইসব 'স্বর্গে', আয়কর বা কর্পোরেশন ট্যাক্সের হার স্বল্প কিংবা সম্পূর্ণ ট্যাক্স ও শুল্ক-বিহীন। এইসব দেশ ঘাটতি পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন ফী, ট্যুরিজম, 'অবসর' ও 'চিত্ত বিনোদন' শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসার সাহায্যে। এইসব দেশকে এম. এন. সি.গুলি নানা সুযোগ দিয়ে থাকে। এম. এন. সি.গুলির মুনাফা লুকিয়ে এইসব স্বর্গে জমা করতে, এম. এন. সি.গুলির পক্ষ থেকে একটা রেজিস্ট্রেশনই আইনী অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট। এইসব দেশ ও এলাকাতে জমা রাখা পুঁজি ইচ্ছামত অন্যত্র প্রেরণ করা চলে। তাছাড়া এইসব দেশে বসে এমন ধরনের সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক লেনদেন বা চুক্তি করা যায় যা অন্য দেশের আইনে সম্পূর্ণ অবৈধ। ট্যাক্স হেভেনের এইসব দেশ ও তাদের ব্যাঙ্কগুলি এখানে আমানতকারীদের নাম, ঠিকানা, অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি গোপন রাখার গ্যারান্টি দেয়।

(২) বিভিন্ন দেশের সরকারগুলি কর্তৃক বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির জন্য মুনাফার যে সিলিং নির্ধারণ করা থাকে, তাকে এড়াতে ও বাড়তি মুনাফা সাবসিডিয়ারিগুলি ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর পথ গ্রহণ করে মূল প্রতিষ্ঠানে বা অন্যত্র চালান করছিল।

(৩) যেসব দেশে মালটিপল এক্সচেঞ্জ রেট রেজিম বা বহুমাত্রিক বিনিময় হার অনুযায়ী মুনাফা অর্জন ও আমদানি করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন করের হার, বিশেষত নিম্নগামী হার চালু আছে, তার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ট্রান্সফার-প্রাইজিং করছিল এম. এন. সি.গুলি।

(৪) যেসব দেশে এম. এন. সি.-র সাবসিডিয়ারি বা শাখাগুলি জয়েন্ট-ভেঞ্চার বা যৌথ-মালিকানার দ্বারা স্থানীয় পুঁজিপতিসহ পরিচালিত, সেখানে ঘোষিত মুনাফা আনুপাতিকভাবে মালিকানার মধ্যে বণ্টিত হবার কথা। এইসব ক্ষেত্রে মুনাফার অংশ ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর দ্বারা সরাতে পারলে মালিকানার দেশীয় অংশীদারদের অংশত বঞ্চিত করে এম. এন. সি.গুলি অতিরিক্ত লাভবান হয়।

(৫) বহু দেশের জনগণই এম. এন. সি.গুলির দ্বারা বিনিয়োগকে ভাল নজরে দেখে না। এইসব দেশে উচ্চহারে মুনাফা জন-প্রকাশ্যে এলে তা' সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বলে অভিহিত ও চিহ্নিত হয়ে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে এম. এন. সি.গুলি কৃত্রিমভাবে নিম্ন-মুনাফা প্রকাশ্যে জানাতো এবং বাকী অংশ ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর সাহায্যে স্বদেশে চালান দিতো।

(৬) তৃতীয় দুনিয়ার কিছু দেশ স্থানীয় উৎপাদনে 'ট্যারিফ প্রোটেকশন' বা শুল্ক-সহায়তা দিয়ে থাকে এবং ফার্মগুলির দ্বারা সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যস্তর স্থির করে দেয়। এই রকম পরিস্থিতিতে এম. এন. সি.-র স্থানীয় শাখাগুলি এম. এন. সি.-র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বা অন্য দেশের শাখাগুলি থেকে আমদানির দাম ফাঁপিয়ে দেখাতো স্বদেশী সরকারের দ্বারা উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে দেবার কৌশল হিসাবে অথবা বেশী শুল্ক-সহায়তা পাওয়ার জন্য। এই কায়দাতেও ট্রান্সফার- প্রাইজিং ঘটছিল।

(৭) একটি মালটিন্যাশনালের দু'টি দেশের সাবসিডিয়ারিতে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের সরকার কর্তৃক আরোপিত ট্যাক্সের হার যদি একই রকম ও একই পরিমাণ হয় তথাপি এটা ঘটতে পারে যে, দু'টি দেশের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে একটি দেশে উৎপাদন খরচ (ব্যবস্থাপনার ব্যয়, গবেষণা ও উন্নয়ন, আর্থিক গতি ও শ্রম-মূল্যের হার, ব্যয় ও বাজারীকরণের খরচ প্রভৃতি সহ) এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি বাবদ ও অন্য দেশের কোন সংস্থাকে রপ্তানির জন্য খরচের দরুন বেশী ক্ষতি হচ্ছে। এইসব ক্ষেত্রে এম. এন. সি.গুলি তার দ্বিতীয় অপর দেশের শাখা থেকে কর-বহির্ভূত ইনকাম বা আদায় প্রথমোক্ত দেশটিতে পাঠিয়ে ঘাটতি মিটিয়ে নিতে পারে। এই জাতীয় বাস্তবতাতে ট্রান্সফার-প্রাইজিং হচ্ছিল।

(৮) যেসব দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ক্রমবর্ধমান ও মাঝে মাঝে বিদেশী মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে থাকে, সেইসব দেশে ব্যবসাকারী মালটিন্যাশনালগুলি তাদের লাভকে বছরের শেষ পর্যন্ত ফেলে রাখতো না। মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রার অবমূল্যায়নজনিত কারণে লাভের হার/পরিমাণ কমে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা ট্রান্সফার-প্রাইজিং ব্যবস্থা ক্রমাগত প্রক্রিয়া হিসাবে চালিয়ে যাচ্ছিল। এবং সব সময়ে তাদের লক্ষ্য ছিল যে কত দ্রুত হারে জমা মুনাফা দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। মুনাফা' টেকানোর জন্য এই ধরনের স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে ট্রান্সফার-প্রাইজিং করে মুদ্রা-বিনিময়ের সর্বোচ্চ সুযোগ নিচ্ছিল মালটিন্যাশনালগুলি—সংশ্লিষ্ট তৃতীয় দুনিয়ার দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের অবনমনের ফলে মুনাফার মূল্য কমে যাওয়ার শঙ্কা থাকায়।

এছাড়াও এম. এন. সি.গুলি আন্তঃফার্ম ও অন্তঃফার্ম বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর মাধ্যমে লাভ সরাচ্ছিল ও মুনাফা করছিল ঘোষিত লাভের চেয়ে অনেক বেশী।

ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর মাধ্যমে এম. এন. সি.গুলি বছরে কত বিলিয়ন ডলার লাভ করে এবং সেক্ষেত্রে তৃতীয় দুনিয়ার লোকসান কত তার সঠিক তথ্য কখনো পাওয়া যায়নি; কেননা এগুলি গোপন পথের ব্যবস্থা।

বহুজাতিক সংস্থার অন্তঃসহযোগীগুলি বা আন্তঃসহযোগীগুলি নিজেদের মধ্যে এবং মূল এম. এন. সি.গুলির সাথে সেগুলির যে লেনদেন হয়, তার একটি নমুনা দেখা যাক। ১৯৮২ সালে তৃতীয় দুনিয়ার কিছু দেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যে ইউ. এস.-এম. এন. সি.গুলি ইন্টার-কোম্পানি যে লেন-দেন করেছে তার তথ্য পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণীতে উল্লেখ করা হলো।

ট্রান্সফার-প্রাইজিং-এর অন্যতম কৌশল—প্রাইজ-ইনফ্লেশন বা দর-ফাঁপানোর পদ্ধতিতে মুনাফা

অর্জনের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা যাক। ১৯৭০-এর দশকের উদাহরণ এগুলি।

কলম্বিয়াতে এম. এন. সি.গুলি ঔষধের দর ফাঁপিয়েছিল ১৫৫ শতাংশ, বৈদ্যুতিক মালপত্রের ক্ষেত্রে ৫৪ শতাংশ, রবার পণ্যদ্রব্যে ৪৪ শতাংশ, রাসায়নিক পদার্থে ২৫ শতাংশ এবং অন্যান্য পণ্যে ৩,০০০ শতাংশ পর্যন্ত। মালের দাম ফাঁপিয়ে তারা লাভ করেছিল রয়ালটি বাবদ লাভের ৬ গুণ এবং প্রকাশ্যে ঘোষিত মুনাফার চেয়ে আসলে ২৪ গুণ বেশি। আর্জেন্টিনায় আমেরিকান এম. এন. সি.গুলি লাভ করেছিল ঔষধপত্রের ক্ষেত্রে ৩,৭০০ শতাংশ, অ্যান্টি-বায়োটিক্‌সে ৬৫০ শতাংশ, ভিটামিনে ৭৩০ শতাংশ ও সিরামে ৩৮০ শতাংশ। মেক্সিকোতে প্রোজেস্টেরন প্রতি কিলোগ্রাম ১১০ ডলারের পরিবর্তে ২৪৯৬ ডলারে, প্রতি কিলোগ্রাম এস্টাডিয়াল ৮৮০ ডলারের পরিবর্তে ৮০,০০০ ডলারে এরা দর ফাঁপিয়ে বিক্রি করছিল। ব্রাজিল পার্লামেন্টের সমীক্ষা অনুযায়ী এম. এন. সি.গুলি পণ্যের দর ৫০০ থেকে ১০০০ শতাংশ পর্যন্ত ফাঁপাতো। ইকুয়েডোরে এম. এন. সি.গুলি উত্তোলিত খনিজ তেলের ব্যারেল প্রতি দাম ১ ডলার হলেও, বিদেশী শাখাগুলিতে প্রচণ্ড ফাঁপাই দরে বিক্রি করতো। এই দেশে আমদানিকৃত ৬ রকমের পণ্য ২০ শতাংশ ও ৭ রকম পণ্য ৭৫ শতাংশ ফাঁপাই দরে বিক্রি করা হয়েছে। পেরুতে ২২টি ঔষধের মালটিন্যাশনাল অন্য শাখা থেকে আমদানিকৃত পণ্য বিক্রি করেছে ৩০০ শতাংশ ফাঁপাই করে। চিলিতে ৫০টি পণ্যের উপর সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে এম. এন. সি.গুলি ১০০ শতাংশ পর্যন্ত দর ফাঁপাই করেছিল।

(এক হাজার মিলিয়ন ডলারে)

দেশ	রপ্তানি			আমদানি		
	ইউ.এস.-এম.এন.সি.গুলির সাবসিডিয়ারিগুলিতে			ইউ.এস.-এম.এন.বি.গুলির সাবসিডিয়ারিগুলিতে		
	মোট ইউ.এস. বহির্বাণিজ্য	মোট রপ্তানি	প্রেরণ	মোট ইউ.এস. আমদানি	মোট আমদানি	প্রেরণ
সমগ্র উন্নয়নশীল দেশে	৮৫.৫	৫১.৬	১০.৬	১০১.১	...	১৭.১
মেক্সিকো	১১.৮	৬.২	২.৩	১৫.৬	...	১.৭
ভেনেজুয়েলা	৫.২	৩.৫	১.১	৪.৮	...	৩.৫
ব্রাজিল	৩.৪	২.৫	০.৬	৪.৩	...	০.৫
মালয়েশিয়া	১.৭	১.৩	১.০	১.৯	...	১.৩
সিঙ্গাপুর	৩.২	১.৮	০.৮	২.২	...	১.২
নাইজিরিয়া	১.৩	০.৭	০.১	৭.০	...	০.৭
ইন্দোনেশিয়া	২.০	১.৭	০.৩	৪.২	...	১.৯

পেটেন্ট, লাইসেন্স, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, বাজারীকরণ, প্ল্যানিং, মুনাফা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত ধরনের ট্রান্সফার-প্রাইজিং চলে। তার ফলে সহজেই অনুমান করা যায় যে কি ভয়ঙ্কর ধরনের মুনাফা এম. এন. সি.গুলি করে চলেছিল। এইভাবেই তারা মিথ্যা উদ্বৃত্ত-মূল্যকে রূপান্তরিত করছিল ব্যবহারিক সত্য পুঁজিতে।

(৭) ডেট মার্কেট / ঋণ বাজার

পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রেডিটিং বা ঋণ দেবার ব্যবস্থা যে রূপ প্রকৃতপক্ষে পরিগ্রহ করে তাকে বলা হচ্ছিল 'মুভমেন্ট অব লোন (মানি) ক্যাপিটাল' তথা 'ঋণ (টাকা) মূলধনের সঞ্চালন'। এই সময় থেকে বিশ্বের মূলধনী বাজার ও টাকার বাজারের যে ভয়ঙ্কর ও অবিশ্বাস্য বিপুলায়তন অগ্রগতি তার অন্যতম অংশ হয়ে ওঠে ঋণের বাজার। ঋণ ও ব্যালান্স অব পেমেন্টস তথা ঋণ পরিশোধের সমস্যা সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে, বিশেষত আশির দশকে, সারা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিল বিপুল বিতর্কের। বিশেষত তৃতীয় দুনিয়া কার্যত ঋণ জালে জড়িয়ে পড়ার ফলে, প্রসঙ্গটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মঞ্চে উত্তাল পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিল। লোন ক্যাপিটাল তথা ঋণদান

ব্যবস্থা বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার হাতে হয়ে ওঠে মুনাফা তথা পুঁজি-বৃদ্ধির, তৃতীয় দুনিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টির ও শেষোক্তদের আর্থিকভাবে নির্ভরশীল করে রাখার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। ইতোমধ্যে বিশাল বৈদেশিক ঋণ ও ঋণসহ সুদ পরিশোধের চাপে তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা কঠিন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। বিপরীতভাবে উন্নত দুনিয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতি এই ব্যবস্থার দ্বারা হচ্ছিল বিপুলভাবে সঞ্জীবিত।

ঋণ দেবার প্রধান সূত্রগুলি হলো : (ক) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাময়িক মুক্ত বা অব্যবহৃত অর্থ ও তাদের মুনাফার অংশ, (খ) জনগণের সমস্ত শ্রেণীগুলির ও অংশের সঞ্চয় ও আমানত এবং (গ) রাষ্ট্রীয় অর্থ। শিল্পোন্নত দেশগুলির উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধির সাথে সাথে মূলধনের ভূমিকা জাতীয় বাজারের সীমানা অতিক্রম করতে শুরু করে। এটির সাথে ও তার ফলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক চরিত্র গ্রহণ করছিল। অতীতে স্বল্প পরিমাণে ঘটলেও আলোচ্য কালে বিশ্ব-পুঁজিবাদ নতুন উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে ঋণ ব্যবস্থাকে ক্রমবর্ধমানভাবে ও বিপুলায়তনে বিশ্বায়ন ঘটিয়ে চলেছিল।

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ঋণদান প্রথা হলো নির্দিষ্ট শর্তে ও পূর্বনির্ধারিত হারে সুদসহ আর্থিক ঋণ বা/এবং পণ্যসামগ্রী মঞ্জুর করার দ্বারা আন্তর্জাতিক মনিটারি আর্থনীতিক সম্পর্কের পরিসরে লোন ক্যাপিটাল তথা ঋণ-মূলধনের বিস্তার। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ঋণ-ব্যবস্থা এক অন্যতম প্রধান উপাদান। আপাতদৃষ্টিতে ঋণ দেবার ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয় বিদেশী বাণিজ্যের প্রয়োজনে, দেশসমূহের পরস্পরের মধ্যে অর্থ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে এবং স্বদেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে এক অতিরিক্ত মূলধনের যোগান হিসাবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক তৎপরতার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা হয়ে উঠছিল গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সময়ে সারা বিশ্বে ঋণদান ব্যবস্থা ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, '৭০-এর দশকে ঋণ বৃদ্ধির হার ছিল ২০-২৫ শতাংশ। এটি ছিল ঋণগ্রহীতা দেশগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে ৫ গুণ বেশী এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির হারের থেকে ৩-৪ গুণ বেশী।

কিন্তু, আন্তর্জাতিক মূলধনী ঋণ-ব্যবস্থা এক জটিল ও পরস্পর বিরোধী প্রক্রিয়া। উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিতে ঋণদান একই সাথে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উপাদান হিসাবে কাজ করে থাকে এবং অনুরূপ ভূমিকা নেয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গঠনে। এটি উৎপাদিকা শক্তির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে, পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে ঋণ-পুঁজি পুনর্বণ্টনকে নিশ্চিত করে এবং তার দ্বারা পুনরুৎপাদনের প্রসারে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে দেয়। আন্তর্জাতিক ঋণদান ব্যবস্থা সম্ভবপর করে তোলে পুঁজির ঘনীভবন (কনসেনট্রেশন) ও কেন্দ্রীভবনের (সেন্ট্রালাইজেশন) ত্বরণকে। দেশের ভিতরে জনগণের সঞ্চয়কে ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন মেটে না— এটা যেমন ঠিক, তেমনই বৈদেশিক মুদ্রার অভাব পূরণ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকেও সম্ভব হয় না। এজন্যও বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন দেখা দেয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও একচেটিয়া ব্যবস্থা প্রবর্তনে বৈদেশিক ঋণ সহায়ক হয়। সহজ শর্তে বিদেশী ঋণ নেবার মধ্য দিয়ে স্বদেশী ব্যক্তিগত পুঁজি কর্তৃত্বের মধ্যে আনতে পারে ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে ঋণ ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ারের ভূমিকা নেয় এবং তার দ্বারা মূলধনের কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া বেড়ে যায়।

আন্তর্জাতিক আর্থিক আদান-প্রদানের স্তরে নগদ অর্থ দেবার পরিবর্তে বৈদেশিক ঋণ নেবার দ্বারা বাণিজ্যের খরচ চালানোর সাময়িক সাহায্য পাওয়া যায়। বাণিজ্যের বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় ঋণের থেকে প্রাপ্ত অর্থ অপর পক্ষের সামনে গ্যারান্টি তৈরি করে। ঋণ অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি করে বৈদেশিক বাণিজ্যকে উজ্জীবিত করে, বিদেশে প্রত্যক্ষ লগ্নি করার ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি করে, বিদেশের বাজারে পণ্যের অধিকতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তার ফলে অধিক মুনাফা নিশ্চিত করে এসবই পুঁজিবাদের পক্ষে ইতিবাচক। ঋণ সম্পর্কে এই ধরনের যুক্তিগুলিকে তখন হাজির করা হচ্ছিল।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ঋণ-ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলি ছিল এই যে, মূলধনী উৎপাদন চরিত্রের

উন্নয়নে এটির দ্বন্দ্ব ক্রমশ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়ছিল। দেশীয় অর্থনীতির উপর বৈদেশিক ঋণ সৃষ্টি করছিল বিকৃতিমূলক প্রভাব। ঋণ ব্যবস্থা অর্থনীতির কোন কোন ক্ষুদ্র অংশের উন্নয়নের গতি বাড়ানোকে সম্ভবপর করে ক্ষেত্রবিশেষে সৃষ্টি করছিল অতি উৎপাদনও; তার ফলে প্রবল আর্থনীতিক ভারসাম্যহীনতা গড়ে উঠতে থাকে; তার চেয়েও বড় কথা হলো ঋণ ব্যবস্থা নিয়মিত মন্দাসহ চক্রাবর্ত উন্নয়নের (সাইক্লিক ডেভেলপমেন্ট) ক্ষতিকর প্রভাবকে বাড়িয়ে যাচ্ছিল। ঋণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছিল খাতকদের কাছ থেকে লাভ নিংড়ে নেবার জন্য, যা খাতক দেশগুলির পুঁজির পুঞ্জীভবনের সুযোগকে কমিয়ে দিচ্ছিল, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রে। প্রায়শই ঋণ-দান ব্যবস্থা ব্যবহৃত হচ্ছিল আর্থনীতিক চাপ সৃষ্টি করে সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য।

শেষোক্ত লক্ষ্যে এক দেশের তুলনায় অন্য দেশে আন্তর্জাতিক ঋণদান ব্যবস্থায় ব্যাপক পার্থক্য করার রেওয়াজ তৈরি হয়। এই পার্থক্য নির্দেশ করার প্রধানতম মাপকাঠি ছিল রাজনৈতিক। ঋণদাতা দেশগুলি বা তাদের অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি ঋণ দিচ্ছিল সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে নিজেদের স্বার্থের স্তর, মিত্রতা, শত্রুতা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে; তার ভিত্তিতে ঋণের শর্তের মাত্রা নির্ধারিত হচ্ছিল। খাতক দেশটির ভূমিকা যত বেশি বৈরিতামূলক ছিল ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে, ঋণ ব্যবহার করা সম্পর্কে এবং শোধ করার ক্ষেত্রে, ততো আরোপ করা হচ্ছিল বেশী ক্ষতিকর শর্ত। বৈষম্য করার ক্ষেত্রে মূল বিষয়গুলি ছিল ঃ ঋণের পরিমাণের গণ্ডী নির্দেশ করে দেওয়া, সুদের হার বৃদ্ধি ও উচ্চহারে দালালি (কমিশন) খরচ ধার্য করা। তবে অতিরিক্ত গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দেবার বিনিময়ে কখনো কখনো ঋণের শর্ত লঘু করা অথবা সহজ সময়ের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া হতো। চুক্তি-শর্তে হঠাৎ কোন অছিলা তুলে ঋণ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছিল এবং বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে অধিকতর আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের ভিত্তিতে আবার চালু করা হচ্ছিল ঋণ দেওয়া। আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজি পূর্বোক্ত তৎপরতাগুলির সাহায্যে অনুন্নত দেশগুলিতে সহজ শর্তে বিদেশী পুঁজির সঞ্চালনে এবং একচেটিয়া আন্তর্জাতিক পুঁজির অনুকূলে অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহে নানা পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল।

কোণঠাসা করার মোক্ষম অস্ত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ক্রেডিট ব্লকেড বা ঋণ পাওয়া বন্ধ করে দেওয়া অথবা কোন দেশের ঋণের আবেদন নামঞ্জুর করা। ক্রেডিট ব্লকেড হলো ইকনমিক ব্লকেডেরই এক অংশ। ঋণদানকারী দেশগুলির সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে আইন পাশ বা ডিক্রী অথবা আদেশ জারি করে এগুলি করছিল। আবার কোন প্রকাশ্য ঘোষণা ছাড়াই বেসরকারীভাবে করা হচ্ছিল এই কাজ। ১৯৭১ সালে চিলিতে সালভাদোর আলেন্দের নেতৃত্বে পপুলার ইউনিটি সরকার প্রতিষ্ঠার পর আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলি ঐ দেশের বিরুদ্ধে ক্রেডিট ব্লকেড করেছিল। ১৯৮৫ সালে ইন্টার-আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অস্বীকার করেছিল নিকারাগুয়াকে ঋণ দিতে। ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পানামার বিরুদ্ধে করেছিল ক্রেডিট ব্লকেড।

অনুন্নত দেশগুলি ছিল উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির পরিসীমায় অবস্থানকারী সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও সর্বাধিক নির্ভরশীল চিহ্নিত অংশ। বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্গত হলেও তৃতীয় দুনিয়া ছিল সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ঋণ ব্যবস্থা থেকে এটি নতুনভাবে প্রতীয়মান হচ্ছিল। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলি ও তাদের ব্যাঙ্ক-একচেটিয়াদের দ্বারা অনুসৃত প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিক মনিটারি বা অর্থগত ও ফিনান্সিয়াল বা আর্থিক নীতির ফলে আক্রান্ত হতে থাকে তৃতীয় দুনিয়া। ফলে ঋণ-সম্পর্কের দ্বারা পুঁজিবাদের কেন্দ্র ও পরিসীমার মধ্যে বৈষম্যের আর এক ধরনের রূপ প্রতিফলিত হতে শুরু করলো।

যে প্রধান তিনটি ধারাতে ঋণ দেওয়া হচ্ছিল, সেগুলি ছিল ঃ (১) দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ঋণ ও অনুদান; (২) বহুমাত্রিক রাষ্ট্রীয় ঋণ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অনুমোদিত ঋণ এবং (৩) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির প্রদত্ত ঋণ।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণ, যাকে বলা হয় অফিসিয়াল গভর্নমেন্ট এইডস (ও.জি.এ) বা আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় অনুদান, তা' ছিল বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণের চেয়ে সহজ শর্তে। তবে রাষ্ট্রীয় ঋণ সাধারণত মঞ্জুর করা হচ্ছিল শিল্পোন্নত দেশগুলি থেকে পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি করার জন্য।

এজন্য, সাধারণভাবে, ঋণের ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে ঋণ-দাতা দেশ কর্তৃক যথেচ্ছভাবে (অর্থে বা পণ্যে) ব্যবহার করার শর্ত চাপান হতো। আর এই সুযোগ গ্রহণ করে ঋণদাতা দেশগুলির প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের রপ্তানি করা পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়িয়ে চলেছিল ইচ্ছামত। ১৯৬০ সালে বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ঋণ ও অনুদান ৪.৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৭০ সালে ৬.৮ বিলিয়ন ডলারে, ১৯৮০ সালে ১৮.১ বিলিয়ন ডলারে এবং ১৯৮৪ সালে ২৮.৭ বিলিয়ান ডলার পরিণত হয়েছিল; তারপর আরও বিপুলভাবে বেড়েছিল। এই বৃদ্ধির অন্যতম ফলাফল দাঁড়ায় তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে তীব্র মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রার বিনিময় মুল্যের অবনমন। এই রাষ্ট্রীয় ঋণের এক-তৃতীয়াংশ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা বন্টিত হতো। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রদত্ত ঋণের ছিল না কোন স্থিরতা। সম্পদের স্বল্পতা ঘটলে তারা তৃতীয় দুনিয়ার ঋণ কমিয়ে দিচ্ছিল। প্রথমদিকে প্রদত্ত ঋণের তেমন প্রত্যক্ষ শর্ত না থাকলেও কার্যকালে ঋণের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ বৈদেশিক পণ্য ক্রয়ে ব্যয় করতে হয়ে থাকে ঋণ-গ্রহীতাদের। রাষ্ট্রীয় ঋণের চেয়ে এইসব ঋণের চাপ ছিল অনেক কঠোর। তৃতীয় দুনিয়ার চাহিদার নিরিখে ও. জি. এ.-ঋণ ছিল প্রচণ্ড অপ্রতুল, স্বভাবতই আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারস্থ হতে হচ্ছিল তৃতীয় দুনিয়াকে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঋণের বাজারে কৃত্রিম স্বল্পতা সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি চাপ বৃদ্ধির সুযোগ নিচ্ছিল। যেমন ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (আই. বি. আর. ডি.) বা বিশ্ব ব্যাঙ্ক ১৯৮২-৮৬ সালের মধ্যে ৯০.৫ বিলিয়ান ডলার ঋণ দেবার কথা ঘোষণা করলেও পরে তা' কমিয়ে ৬১.৪ বিলিয়ান ডলারে পরিণত করে। অথচ এই সংস্থাই সমীক্ষা করে জানিয়েছিল, কেবলমাত্র শক্তি-প্রকল্পগুলির জন্য বছরে ১৩০ বিলিয়ান ডলার ঋণ তৃতীয় দুনিয়ার প্রয়োজন। এইভাবে রাষ্ট্রীয় ঋণের স্বল্পতার সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধান ঋণ-দাতা শক্তিতে পরিণত হতে থাকে; বিশ্বে মোট ঋণদানের তিন-চতুর্থাংশ এসে যায় এদের নিয়ন্ত্রণে। ঋণের বিশ্ব-বাজারে কয়েক হাজার ব্যাঙ্ক ঋণ দিলেও, এ'ব্যাপারে সর্বেসর্বা ছিল ৩০টি প্রধান ব্যাঙ্ক, যেগুলির কেন্দ্রীয় দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান ও পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থিত। এরা সমগ্র ঋণ-অর্থের অর্ধেক কর্তৃত্ব করছিল।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, প্রধানত বহুজাতিক ব্যাঙ্ক, প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের ফলে তৃতীয় দুনিয়ার পক্ষে ঋণের পরিস্থিতি ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে সুদের হার ৬.৬ থেকে ১১ শতাংশে (ব্যক্তিগত মালিকানার ঋণ ১৩ থেকে ১৬ শতাংশে) উন্নীত করা হয়। ঋণ পরিশোধের সময়কালও কমিয়ে ১৮.৬ থেকে ১৪.৪ বছর করা হয়েছিল ঐ কাল-পর্বে।

বেসিক ফ্লোটিং রেট বা মূল পরিবর্তনী হার পদ্ধতিকে মুদ্রা-বিনিময়ে গ্রহণ করার ফলে এবং ডলার বা অন্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মুদ্রামান অনুন্নত দেশগুলির মুদ্রামানের তুলনায় ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় পূর্বে প্রাপ্ত ঋণ ও সুদের পরিমাণও আপনা-আপনি বেড়ে চলছিল; তার ফলে অনুন্নত দেশগুলির ঋণ পরিস্থিতি ক্রমাগত হয়ে ওঠে বিপর্যয়কর। এইভাবে তৃতীয় দুনিয়ার ব্যাঙ্ক-ঋণের বোঝা ১৯৭২-৭৩ সালের ৫ শতাংশ হার থেকে ১৯৮২ সালে ১০ শতাংশ হারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে কেবলমাত্র লাতিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে এই কারণে পুঁজি নির্গত হয়ে যায় ১৫০ বিলিয়ন ডলার। ১৯৭৪-৮২ সালের মধ্যে লাতিন আমেরিকা থেকে নির্গত হয়ে যাওয়া জাতীয় পুঁজির পরিমাণ তাদের প্রাপ্ত মোট ঋণের ৪০ শতাংশের সমান ছিল।

ব্যালান্স অব পেমেন্টস বা ঋণ পরিশোধের বকেয়া পরিস্থিতি বলতে বোঝায় একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (ধরা যাক এক বছর) বিদেশী ঋণদাতাদের সুদসহ ঋণ পরিশোধের পরিমাণের সাথে খাতক রাষ্ট্রটি কর্তৃক প্রাপ্ত মোট বৈদেশিক ঋণের অনুপাত। এই ব্যালান্স অব পেমেন্টসের তিনটি ধরন রয়েছে : (১) বিদেশে ব্যাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি বা বকেয়া থাকা পরিস্থিতি অর্থাৎ পণ্যের রপ্তানি

ও আমদানির (যার দাম ঠিকমত মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে) মধ্যে তুল্য-মূল্য বা অনুপাত;(২) পরিষেবা ও অবাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রকৃত দাম মিটিয়ে দেবার পর বকেয়ার সাথে ব্যবধান। অর্থাৎ পরিবহন, বীমা, ডাক ও তার, দালালি, ট্যুরিজম, সাংস্কৃতিক বিনিময়, ব্যক্তিগত অর্থপ্রেরণ (মজুরি, উত্তরাধিকার, বৃত্তি ও পেনশন বাবদ), বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য ব্যয়, বিনিয়োগের উপর সুদ ও লভ্যাংশ, লাইসেন্স ও কারিগরী সহায়তার জন্য মূল্য বা ফী, বিদেশে সামরিক খরচ ইত্যাদি বিষয়ে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ও মিটিয়ে দেওয়া অর্থের মধ্যে অনুপাত। এগুলিকে বলা হয় অদৃশ্য তৎপরতা। কেননা এই ব্যবস্থায় বাণিজ্যের ব্যবধান, পরিষেবার ব্যবধান এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খাতে বাণিজ্যিক বিষয়ে ব্যবধান থেকে অব্যবসায়িক প্রাপ্য মেটানো হয়;(৩) মূলধন ও ঋণের সঞ্চালনে ঘাটতি। অর্থাৎ দেশের ভেতরে বিদেশী বিনিয়োগ ও ঋণের প্রসার, বিদেশী ঠিকাদারদের ঋণ মঞ্জুর এবং বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় ও মিটিয়ে দেওয়া অর্থের মধ্যে ব্যবধানের অনুপাত।

ঋণ-পরিশোধে ঘাটতি ছাড়াও অনুরূপ আর একটি দিক রয়েছে যাকে বলা হয় ব্যালান্স অব ক্লেইমস অ্যাণ্ড লায়াবিলিটিস বা প্রাপ্য ও দায়ের ঘাটতির মধ্যে অনুপাত। দাবী ও দায়ের মধ্যে ঘাটতির অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে (ধরা যাক এক বছর) একটি নির্দিষ্ট দেশের বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে প্রাপ্য ও তাদের কাছে দায়ের মধ্যে রেশিও বা অনুপাত। ব্যালান্স অব ক্লেইমস ও লায়াবিলিটিস ভাল অবস্থায় থাকার নিরিখে সাধারণত দেশটিকে ঋণ মঞ্জুর করা হচ্ছিল। তাছাড়া ঋণদাতারা সব সময়ে লক্ষ্য রাখছিল যে, ঋণপ্রাপ্ত দেশটি বিদেশে কি পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে অথবা পূর্বে প্রাপ্ত ঋণ কতটা শোধ করেছে। বাহ্যত অর্থনৈতিক ব্যাপার বলে মনে হলেও, প্রাপ্য ও দায়ের ঘাটতির পরিস্থিতি দেখিয়ে দিচ্ছিল কার্যকালে ঋণগ্রহীতা দেশটি সাম্রাজ্যবাদের চাপ কতটা রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম সেই অবস্থানগত শক্তিকে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ঘাটতি প্রতিফলিত করছিল ডিনামিকস অব ইনডেটেনেস তথা ঋণাত্মক গতিশীলতা ও অন্য দেশের তুলনায় দেশটির ঋণ পাওয়ার অধিকারের স্তর।

আঙ্‌টাড ১৯৮৪ সালে হিসেব করে দেখিয়েছিল যে, অনুন্নত দেশগুলি আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিকূল দামের জন্য গড়ে বছরে ১৩ মিলিয়ন ডলার হিসাবে এবং উন্নত দেশগুলি তাদের রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় বছরে গড়ে ১০ বিলিয়ন ডলার হিসাবে লোকসান করে। একের লোকসান, এইসব ক্ষেত্রে, অপরের লাভ। আঙ্‌টাড হিসাব করে দেখিয়েছিল যে, উন্নত দেশগুলি প্রোটেকশনিস্ট বা সংরক্ষণমূলক নীতি নিয়ে চলার জন্য অনুন্নত দেশগুলি ১৯৫৬ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে মোট লোকসান দিয়েছে ৭০০ বিলিয়ন ডলার। বাণিজ্যে ঘাটতির এই বাস্তবতাও অনুন্নত দেশগুলিকে বাধ্য করছিল বর্ধিত পরিমাণে ঋণ নিতে। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে তৃতীয় দুনিয়ার ঋণ বেড়েছিল আট গুণ, আর ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বেড়েছিল আঠারো গুণ। আর ১৯৫০ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে তৃতীয় দুনিয়ার মোট ঋণের পরিমাণ ধরলে তা' দাঁড়িয়েছিল এক ট্রিলিয়ন ডলারে। ১৯৮৪ সালের হিসাবে অনুন্নত দেশগুলিকে বছরে ঋণ পরিশোধ করতে হতো ১২০-১৫০ বিলিয়ন ডলার। দুর্বল অর্থনীতিসম্পন্ন তৃতীয় দুনিয়ার পক্ষে এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দম আটকানো চাপ। '৮০-এর দশকের প্রথমার্ধে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যে প্রবল মন্দা সৃষ্টি হয়েছিল নানা কৌশলে তা' তৃতীয় দুনিয়ার কাঁধে চালান দেওয়া শুরু করে তারা। তার ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির অধিকাংশই প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ১৯৮২ সালে ৩৫টি রাষ্ট্র ঋণ পরিশোধে ধার্য ১৪০ বিলিয়ন ডলার দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে পশ্চিমী ব্যাঙ্কগুলি বাধ্য হয় ২৪টি দেশের ৬৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিতে এবং 'রেসকিউ অপারেশন' বা পরিত্রাণের উদ্যোগের নামে আরও ৩০ বিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুর করে। এর পূর্ববর্তী ২৫ বছরে ২১টি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ৬০ বার মোট ৩২ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ঋণদাতারা।

পশ্চিমী দেশগুলির পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক নীতি ও ব্যবস্থার ফলে তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশ ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছিল এবং ক্রমশ প্রায় সমস্ত দেশগুলির পক্ষেই ঋণের অংশ ও সংশ্লিষ্ট পরিমাণ

সুদ ফেরত দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আশির দশকের শেষার্ধ থেকে, এই পরিস্থিতির জন্য, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নতুন কিছু কৌশল গ্রহণ করে। প্রথমত, বিদেশী ঋণের একাংশ ঋণগ্রহীতা দেশে পুনর্বিনিয়োগ; দ্বিতীয়ত, ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া এবং তৃতীয়ত, নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে নতুন ঋণ দেওয়া। এগুলি প্রয়োগ করতে ঋণদাতারা নতুন দু'টি রণনীতি গ্রহণ শুরু করে। প্রথমত, ঋণগ্রহীতাদের যে কোন বিরোধিতা সমস্ত ঋণদাতাদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়ত, নতুন করে সম্মিলিতভাবে ঋণগ্রহীতাদের ওপর কঠোর শর্ত আরোপ।

ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফাণ্ড বা আই. এম. এফ.-এর কাছ থেকে ঋণ নেবার ক্ষেত্রে চুক্তিগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, ঋণগ্রহীতা দেশে ঋণ ও সুদের একাংশ পুনর্বিনিয়োগ করার ফলে ঋণ পরিশোধ তাদের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তথাপি নতুন চুক্তিতে তৃতীয় দুনিয়াকে ব্যাঙ্কগুলিকে বাড়তি কমিশন দিতে হয় (যাকে বলা হয় স্প্রেড) এবং ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সালের এই স্প্রেড ছিল 'লিবর'-এর (লণ্ডন ইনটার-ব্যাঙ্ক রেট) ১.৯৫ এবং কমিশন ১.০৫ শতাংশ বেশি। ১৯৮৬-'৮৭ সালে এই হার কিছুটা কমাতে বাধ্য হয়েছিল আই. এম. এফ.।

দ্বিতীয়ত, রি-ফাইনান্সিং বা পুনর্বিনিয়োগের জন্য ব্যবস্থা তিন বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা। এই ব্যবস্থায় গ্রহীতা দেশের ঋণ পরিশোধ কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল এবং তাদের নিয়মিত যে কোন ঋণ নেবার বিষয়ে আই. এম. এফ.-এর সাথে আলোচনা করতে বাধ্য করা হতো।

তৃতীয়ত, ঋণের চাপ কমানোর বিষয়ে আলোচনা প্রাপ্ত-মূলধনের উপর সীমাবদ্ধ থাকে; সুদ কখনো কমানো বা বাতিল করা হতো না।

চতুর্থত, তৃতীয় দুনিয়ার প্রাইভেট সেক্টর বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্র যেহেতু বেশি বেশি করে ঋণ নেওয়া শুরু করেছিল সেকারণে এখন আই. এম. এফ. তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের গ্যারান্টি দাবী করছিল।

বহুজাতিক ব্যাঙ্কগুলি ডেট মার্কেট বা ঋণের বাজারে যে ধরনের অতিকায় লাভ করে থাকে, তাতে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তৃতীয় দুনিয়াকে দেওয়া তথাকথিত কনসেশন এম. এন. বি.গুলির কোনই ক্ষতি করে না। বরং দেখা গেছে যে, ১৯৮৩ সালে লাতিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে তারা স্প্রেড, কমিশন চার্জ, বাড়তি সুদের হার ও অন্যান্য পদ্ধতিতে ৭০-১৩০ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত লাভ করেছিল। তাছাড়া এইসব তথাকথিত কনসেশন দেবার পরও ঋণ পরিশোধে কোন দেশের ব্যর্থতা ঘটলে, ব্যাঙ্কগুলি নানাভাবে তাদের ব্ল্যাকমেইলও করছিল। আশির দশকে বেশ কয়েকটি দেশকে ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রীয় ঋণ বন্ধ করে দিয়ে, পরে তাদের আরও নানাবিধ শর্ত মানতে বাধ্য করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ তাদের বিস্তার ও বিকাশের অন্যতম সুযোগ হিসাবে ঋণ-পুঁজি (লোন-ক্যাপিটাল) নিয়োগ করার বিষয়ে, পরবর্তীকালে, আরও প্রসারিত বাজার সামনে পেয়ে যায়। '৮০-এর দশকের প্রথমার্ধে ঋণজালে আক্রান্ত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি সম্মিলিতভাবে সমগ্র ঋণ-পদ্ধতির ও ঋণের ফলে তাদের উপর প্রবল চাপের বিরোধিতা শুরু করায় বিশ্ব-পুঁজিবাদ, আন্তর্জাতিক ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও মালটিন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলি কিছুটা থমকে দাঁড়িয়েছিল। '৭০-এর দশক থেকে নির্জোট আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থনে, যে নতুন বিশ্ব-অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের দাবী তোলে, তাতে অবশ্য ঋণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ততটা সোচ্চার বক্তব্য ছিল না। কিন্তু '৮০-এর দশকের শুরু থেকে ঋণ-পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তারা প্রচণ্ড সোচ্চার এবং তুমুল বিরোধিতা শুরু করে দেয়। এতে ঋণ-পুঁজিকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় লগ্নি করার প্রশ্নে বিশ্ব-পুঁজিবাদ সাময়িক ও কৌশলগতভাবে কিছুটা সংশোধন করে নেয়, যদিও ইতোমধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটা শুরু হয়েছিল। ষাটের দশক থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়া এবং সত্তরের দশকে দুই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—রোমানিয়া ও পোল্যাণ্ড এবং আশির দশকের প্রথমার্ধে সমাজতান্ত্রিক চীন পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক ঋণ-পুঁজি গ্রহণ করা শুরু করেছিল। ফলে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ যখন প্রচলিত তৃতীয় দুনিয়ার ঋণের বাজারে কিছুটা সমস্যায়

পড়েছিল, ঠিক তখনি তৎকালীন কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশে তাদের ঋণের বাজার ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছিল। কিছুটা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যমূলক অর্থনীতি ছিল তার সাথে এইভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কেবল সংযোগই স্থাপিত হওয়া শুরু হয়নি, ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ঋণ-মূলধনের সাহায্যে গভীরে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ করে নিতে শুরু করে। ১৯৭৮-'৭৯ সালে চীন সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি (তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে ও স্পষ্ট করে এই অর্থবোধক শব্দ তারা ব্যবহার করতে শুরু করেনি) চালু করার ব্যবস্থা করে যাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নানা উপাদান যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এযাবৎ অনুপস্থিত ছিল, তা' কিছুটা যুক্ত হওয়া শুরু হয়। ১৯৮৫ সালে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে পেরিস্ত্রৈকার নামে যেসব ব্যবস্থা অর্থনৈতিক স্তরে পত্তন করা শুরু করে, তাতে উৎসাহিত হয়ে পূর্ব-ইউরোপের বাকি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বহু ব্যবস্থা চালু করতে উদ্যোগ নেয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভ্যন্তরের এইসব নতুন উদ্যোগ অচিরেই পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বহির্বাণিজ্যের স্তরে তাদের সংযোগ স্থাপনের ইচ্ছাকে দুর্বার করতে থাকে। স্বভাবতই এই বাণিজ্য প্রচেষ্টায় তাদের কাছে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত প্রধান মুদ্রাগুলি—ডলার, পাউণ্ড, ডয়েসমার্ক, ইয়েন, লিরা, ফ্রাঁ প্রভৃতির চাহিদাও বেড়ে ওঠে। এই চাহিদা পূরণে প্রথমে ঋণ-পুঁজির লগ্নি এইসব দেশে অনুপ্রবেশ শুরু করে। আই. এম. এফ.-এর সদস্য হবার জন্য কিছুটা তাড়াহুড়ো শুরু করে দেয় এই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। ১৯৮৮-৮৯ সাল থেকে পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলি ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের কাছে উন্মুক্ত হয় সম্পূর্ণ নতুন ও ব্যাপক বাজার। ঋণ-মূলধনের বাজারও স্বভাবতই আরও প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

এবারে আমরা অনুন্নত দেশগুলিতে মোট বৈদেশিক ঋণের পরিস্থিতি (দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, স্বল্প-মেয়াদী ঋণ ও আই. এম. এফ. প্রদত্ত ঋণ সহ) উল্লেখ করবো। এগুলি থেকে আরও স্পষ্ট হবে যে, ঋণের বিশ্ব-বাজারে ঋণ-মূলধনের রপ্তানি ও লগ্নি কি বিপুলায়তন চেহারা নিয়েছিল এবং পুনরুজ্জীবনসহ এক সম্পূর্ণ নতুন শক্তি নিয়ে সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আবির্ভূত হবার ক্ষেত্রে ঋণ-মূলধন কি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

	দীর্ঘমেয়াদী ও আই.এম.এফ. সহ মোট বিদেশী ঋণ (মি. ডলারে)		ঘোষিত ও প্রদত্ত ঋণের বকেয়া (মূল ও সুদ সহ) (মি. ডলারে)			দীর্ঘমেয়াদী ও আই.এম.এফ. সহ মোট বিদেশী ঋণ (মি. ডলারে)		ঘোষিত ও প্রদত্ত ঋণের বকেয়া (মূল ও সুদ সহ) (মি. ডলারে)	
দেশগুলি	১৯৮০	১৯৯২	১৯৮০	১৯৯২	দেশগুলি	১৯৮০	১৯৯২	১৯৮০	১৯৯২
১	২	৩	৪	৫	১	২	৩	৪	৫
মোজাম্বিক	০	৪৯২৯	০	১৭০৮	লাওস রিপাব্লিক	২৯৬	১৯৫২	৬	২৩
ইথিওপিয়া	৪২৪	৪৩৫৪	১	৭১৮	রুয়াণ্ডা	১৯০	৮৭৩	০	২৮
তানজানিয়া	২৪৭৬	৬৭১৫	২৩	১১৫৫	নাইজার	৮৬৩	১৭১১	২	১০৫
সিয়েরা লিওন	৪৩৫	১২৬৫	২৫	১৫৪	বুরকিনা ফাসোঁ	৩৩০	১০৫৫	০	৪৩
নেপাল	২০৫	১৭৯৭	০	১৩	ভারত	২০৫৮২	৭৬৯৮৩	০	০
উগাণ্ডা	৬৯৭	২৯৯৭	১০৩	৪৩৭	কেনিয়া	৩৩৯৪	৬৩৬৭	৬	৪৩০
ভুটান	০	৮৪	০	৪	মালি	৭৩২	২৫৯৫	৭৬	২৮৭
বুরুণ্ডি	১৬৬	১০২৩	০	৭	নাইজেরিয়া	৮৯৩৪	৩০৯৫৯	০	৩৪২২
মালয়েশিয়া	৮২১	১৬৯৯	৪	৭	নিকারাগুয়া	২১৯২	১১১২৬	৪৪	৪৪৯০
বাংলাদেশ	৪০৫৩	১৩১৮৯	০	১১	টোগো	১০৪৫	১৩৫৬	৪২	৫৩
চাঁদ	২২৯	৭২৯	৩৫	৪১	বেমিন	৪২৪	১৩৬৭	১৯	২৬
গিনি বিসাউ	১৩৪	৬৩৪	৬	১২৩	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাব্লিক	১৯৫	৯০১	৪	৯৬
মাদাগাস্কার	১২২৩	৪৩৮৫	২০	১১৪৬					

১	২	৩	৪	৫	১	২	৩	৪	৫
পাকিস্তান	৯৯৩৬	২৪০৭২	০	০	কলম্বিয়া	৬৯৪১	১৭২০৪	২৮	৩৯২
ঘানা	১৪০৭	৪২৭৫	৯	৮৮	জামাইকা	১৯০৪	৪৩০৩	২	২৩১
গুয়ানা	১১১০	২৬৫১	১২২	২৬৮	প্যারাগুয়ে	৯৫৪	১৭৪৭	—	—
মরিটানিয়া	৮৪০	২৩০১	৫৪	৫১৬	নামিবিয়া	—	—	০	০
শ্রীলঙ্কা	১৮৪১	৬৪০১	০	০	টিউনিশিয়া	৩৫২৬	৮৪৭৫	০	০
জিম্বাবোয়ে	৭৮৬	৪০০৭	০	০	আলজিরিয়া	১৯৩৫৯	২৬৩৪৯	০	০
হণ্ডুরাস	১৪৭২	৩৫৭৩	৩	১৫৬	থাইল্যাণ্ড	৮২৯৭	৩৯৪২৪	৩৩৪	৬১৩৯
লেসোথো	৭১	৪৭২	০	৯	লাটভিয়া	০	৬১	—	—
মিশর	২০৯১৫	৪০০১৮	৪৫৭	১৫৮২	কোস্টারিকা	২৭৪৪	৩৯৬৩	২৬	০
ইন্দোনেশিয়া	২০৯৪৪	৮৪৩৮৫	০	১	তুরস্ক	১৯১২৩	৫৪৭৭২	১	৮২
মায়নামার	১৪৯৯	৫৩২৬	০	১১০৩	ইরান	৪৫০৮	৯৪৯৬৭	০	৩২০২
সোমালিয়া	৬৬০	২৪৪৭	২১	১০৬৯	পানামা	২৯৭৪	৬৫০৫	—	—
সুদান	৫১৬৩	১৬১৯৩	২৪৫	১০১৬০	চিলি	১২০৮১	১৯৩৬০	০	৩৬
ইয়েমেন	১৬৮৪	৬৫৯৮	৮	১৩৩৭	আলবেনিয়া	০	৬২৫	০	১৪
জাম্বিয়া	৩২৬১	৭০৪১	৩৯	১২৮১	সিরিয়ান আরব রিপাব্লিক	৩৫৪৯	১৬৪৮১	০	১৭৫৩
কোটে ডি আইভবি	৭৪৪৫	১৭৯৯৭	০	৩৩৬১	দক্ষিণ আফ্রিকা	—	—	—	—
বলিভিয়া	২৭০২	৪২৪৩	২৪	২৯	মরিশাস	৪৬৭	১০৪৯	২	১৩
ফিলিপিনস্	১৭৪১৭	৩২৪৯৮	১	১২	ব্রাজিল	৭১০১২	১২১১১০	৪৬৮	৯৮৪৪
সেনেগাল	১৪৭৩	৩৬০৭	০	১৫৩	বসনিয়া	১৩৩	৫৪৫	০	১১
ক্যামেরুন	২৫১৩	৬৫৫৪	৬	৪৬২	মালয়েশিয়া	৬৬১১	১৯৮৩৭	০	০
পাপুয়া নিউগিনি	৭১৯	৩৭৩৬	০	৬৬৯৮	ভেনেজুয়েলা	২৯৩৪৫	৩৭১৯৩	৫১	৬২০
পেরু	৯৩৮৬	২০২৯৩	০	৫১৭	উরুগুয়ে	১৬৬০	৫২৫৩	০	০
গুয়াতেমালা	১১৬৬	২৭৪৯	১৪	১৫২০	মেক্সিকো	৫৭৩৭৮	১১৩৩৭৮	০	০
কঙ্গো	১৫২৬	৪৭৫১	৬	৩৪৪	ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	৮২৯	২২৬২	০	২
মরক্কো	৯৭১০	২১৩০৫	২০	৮৫৫	গ্যাবন	১৫১৪	৩৭৯৮	০	৭০৭
ডোমিনিকান রিপা.	২০০২	৪৬৪৯	১	৪২০৫	আর্জেন্টিনা	২৭১৫৭	৬৭৫৬৯	০	১৪৬৫৭
ইকুয়েডোর	৫৯৯৭	১২২৮০	৩০	১০৮৭	ওমান	৫৯৯	২৮৫৫	০	০
জর্ডন	১৯৭১	৭৯২৯	০	০	পুয়ের্তোরিকো	—	—	—	—
এল সালভাদোর	৯১১	২১৩১	—	—	পর্তুগাল	৯৭২৯	৩২০৪৬	০	০

(৮) ক্যাপিটাল, ক্রেডিট অ্যাণ্ড মানি মার্কেট বা মূলধনী, ঋণ ও টাকার বাজার

টাকা, ঋণ ও মূলধনের বাজার পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক তৎপরতার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধানতম দিককে চিহ্নিত করছিল। আর্থিক বাজারের (ফিনান্সিয়াল মার্কেট) বিভিন্ন ও বহুধাবিস্তৃত ব্যবস্থাবলী টাকা, ঋণ ও মূলধনের বাজার আর্থনীতিক চরিত্রকে চিনিয়ে দেয়। এই উপাদানগুলি সামগ্রিক ফিনান্সিয়াল মার্কেটের ধারা গঠনে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছিল। আর্থিক বাজার সেইসব কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কার্যকে সাহায্য করছিল যেমন উৎপাদন ও ব্যবসা, উপার্জন ও ব্যয় করা, আমানত ও বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও সরে আসা (রিটায়ারিং), বদল ও অর্জন করা প্রভৃতি। সাধারণভাবে, আর্থিক বাজারের উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হতে থাকে।

মানব-সভ্যতার আদিম কাল থেকেই কোন না কোন রূপে পুঁজির অস্তিত্ব ছিল এবং একই সাথে আদিম চরিত্রের বাজারের অস্তিত্বও ছিল। বাজারের অভিধানগত অর্থ হলো : বাজার বলতে সেই ব্যবস্থামূলক ক্ষেত্রকে বোঝায় "যেখানে ক্রয় করার ও বিক্রয় করার পরিস্থিতি বিদ্যমান।" বাজারে

"অফারিং" বা "প্রদানের" ব্যবস্থা ও "চয়েজ" বা "পছন্দের" সুযোগ রয়েছে। কার্ল মার্কস সর্বপ্রথম উন্মোচন করে দেখিয়েছিলেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজারের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রাধান্যের মূল দিকগুলি। পরবর্তীকালে আর্থ-ইতিহাসবিদ ও নৃতাত্ত্বিক কার্ল পলিয়ানি তাঁর ধ্রুপদী রচনা 'দা গ্রেট ট্রান্সফরমেশন' (১৯৪৪) পুস্তকে এবং তাঁর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৭-৫৩ সাল—সাত বছরব্যাপী 'জেনারেল ইকনমিক হিস্ট্রি' শীর্ষক বক্তৃতায় বাজার ব্যবস্থার পূর্বাপর ইতিহাসসহ আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেটির ভূমিকাকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেন।

পলিয়ানি দেখিয়েছেন যে, সমাজের গঠনের তিন প্রধান উপাদান হলো—ভূমি, মূলধন ও শ্রম। এগুলি মানুষের বাঁচার এবং পরিবার, সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থার চলিষ্ণুতার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু এগুলি (ভূমি, মুলধন ও শ্রম) যখন পণ্যে পরিণত হয় তখন সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা—ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, নৈতিক মূল্যবোধ ও ব্যবস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয় বাজার-শক্তিগুলির দ্বারা। বাজার-অর্থনীতি রূপান্তরিত হয় বাজারী-সমাজে। পলিয়ানি আরও দেখিয়েছেন যে, আধুনিক "বাজারী-সমাজের" সুনির্দিষ্ট "আর্থনীতিক" উদ্দেশ্য রয়েছে; আর এই ধরনের সমাজে রয়েছে সুনির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ক যাকে অন্-অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। দর বিষয়ক প্রক্রিয়ার (প্রাইস মেকানিজম) বন্দোবস্তের দ্বারা পরিচালিত বাজারের স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা মানুষ ও প্রকৃতিকে (শ্রম ও ভূমির রূপে), কৃত্রিমভাবে হলেও, পণ্য হিসাবে বিবেচনা করে। সেহেতু সমাজ পরিণত হয় বাজারের আনুষঙ্গিক (অ্যাড্‌জাংক্ট) বস্তুতে। স্বাভাবিকভাবে বাজার অর্থনীতি কেবল থাকতে পারে বাজারী-সমাজে, অর্থাৎ এমন সমাজ যেখানে সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা অর্থনীতি থিতু থাকার পরিবর্তে, সামাজিক সম্পর্কই থিতু হয় অর্থনীতির দ্বারা।

পলিয়ানির এই ঐতিহাসিক মূল্যায়নের আরও উন্মোচনকারী রূপ অর্জিত হতে থাকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে—যাতে প্রধান ক্ষেত্র ও শক্তি হয়ে উঠতে থাকে টাকা, ঋণ ও মূলধনের বাজার। এতে সৃষ্ট নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম প্রধান দিক ছিল ঃ নৈরাজ্য ও সংকটে তৎকালীন বিশ্ব-পুঁজিবাদ অব্যাহতভাবে আক্রান্ত ও জরাজীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই তিন প্রধান ক্ষেত্র (মূলধন, টাকা ও ঋণ-এর বাজার) ও তৎপরতার দ্বারা মুনাফাকে শুধু রক্ষা করাই নয়, ক্রমাগত বাড়িয়েও চলছিল। চরম ঝুঁকি সর্বক্ষণের সাথী হলেও, এই তিন ক্ষেত্র সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। দেশে দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর্থিক কাঠামো ও বিকাশে বিভিন্নতা ও তারতম্য ছিল। এই দুর্বলতা কাটানোর লক্ষ্যে, উপর থেকে কাঠামোগতভাবে চাপিয়ে দিয়ে কৃত্রিম ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য এই তিন ব্যবস্থাকে তীব্র ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয়। অর্থনীতির বিশ্বায়নে ভবিষ্যতের সর্বজনীন মডেল ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রে স্থাপন করা শুরু হয়েছিল এই তিন বাজারী ব্যবস্থাকে।

গত শতাব্দীতে এই তিন ব্যবস্থার উদ্ভব ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে ঘটেছিল; এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এশিয়া ও লাতিন আমেরিকাতে শুরু হয়; কিন্তু যেখানে এই তিন ব্যবস্থার কোন অস্তিত্বই ছিল না সেই আফ্রিকার দেশসমূহেও এগুলির সূত্রপাত হয় এই শতাব্দীর ষাটের কাল-পর্বে। এই তিন ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যাচ্ছিল যে, এই অর্থনীতি বস্তুগত উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয় বললেই চলে। অনুৎপাদক চরিত্রের এই তিন ব্যবস্থা কার্যত ও বহুলাংশে ফাটকা এবং ভয়ঙ্কর ঝুঁকি-নির্ভর। একে লটারির সাথে তুলনা করলে সরলীকরণ করা হবে ঠিকই, কিন্তু আশির দশকে বিশ্বের প্রধান প্রধান শেয়ার মার্কেটের 'ক্রাশ'-র বা ধসের ঘটনা ও তার বিধ্বংসী ফলাফল থেকে এই অতিকায় অর্থব্যবস্থার বেলোয়ারি চরিত্র ও গভীর অনিশ্চয়তা অনেকটাই বোঝা যায়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের ভাষায় এই তিন ক্ষেত্রকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে অতি সংক্ষেপে তা' অনেকটা নিম্নরূপ ঃ

মূলধনের বাজার ঃ যে কোন অর্থনীতির উৎপাদিকা প্রক্রিয়া থেকে নির্গত হয় একটি মূলধনী-বাজার থাকার প্রয়োজনীয়তা। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করতে

দরকার পুঁজি ও শ্রম। পুঁজি থাকতে গেলে তার মালিকানাও থাকতে হবে। উৎপাদনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য পুঁজি অপরিহার্য; সেক্ষেত্রে মূলধনী-বাজারের প্রাথমিক আশু দায়িত্ব ও ভূমিকা হলো মালিকানার হেফাজতে পুঁজির সংরক্ষণের শর্তগুলি নির্ণয় করে দেওয়া। মূলধনের বাজার পুঁজির জন্য এমন শর্ত সৃষ্টি করে যাতে উৎসাহদায়ক অনুকূল পরিবেশে পুঁজি ক্রমাগত আরও বাড়তে পারে, নতুন করে আরও পুঁজি সৃষ্টি হয়, সময়ের সাথে সাথে পুঁজির বাজার বাড়তি ভূমিকা পালন করতে পারে। মূলধনের বাজার তেমন ভূমিকা নেয় যাতে যুক্তিসঙ্গতভাবে স্থির করতে পারে অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় পুঁজির পরিমাণ এবং তার দ্বারা পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদনে অন্তঃশক্তি যোগাতে পারে।

ঋণের বাজার : অংশীদারদের ক্ষমতার বিভিন্নতা বাজার অর্থনীতির অন্যতম কারণ; ঋণের বাজারের অর্থনৈতিক যুক্তি এ থেকে সৃষ্টি হয়। ঋণের বাজারের প্রাথমিক ও আশু ভূমিকা হলো : ঋণ করা ও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাকে সুগম করা অর্থাৎ হস্তান্তরের দ্বারা ক্রয়-ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো। এটা করা হয় মুদ্রা-কেন্দ্রিক-ঋণ দেবার ও সংগ্রহ (এবং ব্যবসায় সাহায্য) করার ব্যবস্থা সুগম করার মধ্য দিয়ে। এই ধরনের হস্তান্তর কার্যকরী করার শর্ত নির্ধারণের মধ্য দিয়ে অর্থনীতির সম্পদ বণ্টনের পথ দেখিয়ে দেয় ঋণের বাজার। মূলধনী বাজার যে ভূমিকা নেয়, এই ব্যবস্থা সেটির সমান্তরাল।

টাকার বাজার : টাকার বাজার যে আর্থিক ভূমিকা পালন করে তা' মূলধনী বাজার বা ঋণের বাজারের মত সহজে ব্যাখ্যা ও প্রতিপন্ন করা যায় না। কেননা অংশত একথা সত্য যে, 'টাকা'কে সরাসরি সংজ্ঞায়িত করা যায় না। অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ নন এমন মানুষেরা যেভাবে টাকাকে ব্যাখ্যা করেন তাতে টাকার অর্থ দাঁড়ায় স্বল্প মেয়াদী ঋণ; অর্থাৎ টাকার বাজার আসলে ঋণের বাজারের সেই অংশ যার ভূমিকা হলো স্বল্প-মেয়াদী ঋণের আদান-প্রদান করা; আর টাকার হার হলো টাকার বাজারের ইনস্ট্রুমেন্ট বা সাধিত্র-র সংশ্লিষ্ট 'নমিনাল' বা নামমাত্র সুদের হার। বিপরীত পক্ষে, অর্থনীতিবিদরা পরম্পরাগতভাবে টাকাকে ঋণ থেকে সুনির্দিষ্ট আলাদা হিসাবে বিবেচনা করে এসেছেন। শেষোক্তরা "ম্যাক্রো-ইকনমিক অ্যানালিসিস" বা সর্বময় অর্থনৈতিক মূল্যায়নে টাকাকে কেন্দ্রীয় স্থান দিয়েছেন। এঁরা মনে করেন টাকার ভূমিকা হলো বিনিময়ের; স্বভাবতই অন্যান্য যেসব সম্পদকে 'পেমেন্ট' বা দায় মেটানোর জন্য ব্যবহার করা যায়, টাকাও তদনুরূপ। এবিষয়ে বিস্তৃত তাত্ত্বিক বিতর্কের কোন উল্লেখ না করে, সাধারণভাবে, বলা যায় যে, রিয়েল ইকনমি বা যথার্থ অর্থনীতিতে, টাকার বাজার একদিকে ব্যাপকভাবে আর্থিক মাধ্যম হিসেবে এবং অন্যদিকে উভয়ত ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানের বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা নেয়। টাকার বাজারের ভূমিকাতেও রয়েছে বহুধা বিস্তৃতি। টাকার বাজারের সম্পদের রূপ হলো : নির্ভরযোগ্য ও অ-নির্ভরযোগ্য আমানত, চাহিদা-আমানত এবং নানা নির্দিষ্ট কালপর্বভিত্তিক মেয়াদী আমানত, নির্দিষ্ট ও পরিবর্তনযোগ্য প্রত্যর্পণমূলক আমানত প্রভৃতি। তদুপরি, বাজার-অংশগ্রহণকারী অধিকাংশের দৃষ্টিতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ-বাজারের স্বত্বসমূহ হলো মধ্যবর্তী আমানতের (কমার্শিয়াল পেপার) জন্য নিবন্ধীকৃত পোর্টফোলিও বিকল্প; সেগুলি একইসাথে টাকার বাজারেরও ইনস্ট্রুমেন্ট বা সাধিত্র।

একথা ঠিক যে, গত শতাব্দীর শেষ-চতুর্থাংশ ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লণ্ডন শহর ক্যাপিটাল ও মানি-মার্কেটের অদৃষ্টপূর্ব স্ফীতায়ন দেখেছিল। পাশাপাশি পূর্বে উল্লেখিত দেশগুলিতে পূর্বোক্ত ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সবল আবির্ভাবের সংবাদ শোনাও যাচ্ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও এই কাল-পর্বটা ছিল নিছক শৈশব অবস্থা। কিন্তু ১৯৮০-এর দশক থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্যোগের ফলে এবং তার সাথে নতুন বৈদ্যুতিন ও যোগাযোগ-কারিগরীর সহায়তায় আর্থিক বাজারের এক সম্পূর্ণ নতুন স্তর সৃষ্টি হচ্ছিল এ হলো "সর্বাপেক্ষা স্বাধীন প্রবাহ এবং সর্বাপেক্ষা নিপুণ (অর্থাৎ জটিলতম) অর্থনৈতিক বাজার, পৃথিবীতে যা কখনো জ্ঞাত ছিল না। মুদ্রা, পণ্য, সরকার ও কর্পোরেট বণ্ড—এসবই এখন ছাড়া হচ্ছে ও বাণিজ্য হচ্ছে সারা বিশ্বময় এবং ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের সাথে।" (দা ইকনমিস্ট, এপ্রিল ২৭, ১৯৯১)।

১৯৮০-এর কাল-পর্ব থেকে লক্ষ্য করা যায় ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন বা

আন্তর্জাতিক আর্থগত মাধ্যমমূলক ব্যবস্থাতে এক মৌলিক ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে ভর পরিবর্তিত হচ্ছিল সিকিউরিটি মার্কেটে—যাকে বলা হচ্ছিল 'সিকিউরিটাইজেশন' বা সিকিউরিটিকরণ। পাশাপাশি ধীরগতি করে দেওয়া হচ্ছিল আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক-ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাকে। তার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক অর্থপ্রবাহ ও আদান-প্রদানের ভর গিয়ে পড়তে থাকে সিকিউরিটি ও বন্ডে। কিন্তু পাশাপাশি ব্যাঙ্কের অতীত ভূমিকারও রূপান্তর শুরু হলো। ব্যাঙ্কের 'ক্রস বর্ডার রোল' বা বিদেশে সঞ্চালন (প্রধানত ঋণ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে) ব্যবস্থার দ্বারা বিদেশী অর্থনীতিকে প্রভাবিত করার ভূমিকা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। পাশাপাশি দারুণ তীব্র হলো গতিও। মধ্য '৮০-এর দশকে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং তৎপরতা বিশ্ব-জি. ডি. পি. বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট-এর ২০%-এ পরিণত হয়। মধ্য '৬০-এর দশকে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং তৎপরতা যেখানে বিশ্ব বাণিজ্যের ১০% শতাংশের কাছাকাছি ছিল, মধ্য '৮০-র দশকে 'ক্রস-বর্ডার ব্যাঙ্কিং' ভূমিকা মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণকে অতিক্রম করে যায়।

প্রচলিত ভূমিকাকে অতিক্রম করে, বিশ্ব-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা স্বয়ংসৃষ্ট এক অতিকায় আর্থিক শক্তিতে পরিণত হয়—এটির প্রসার, প্রভাব ও কর্তৃত্বের অবিশ্বাস্য বিস্তৃতি ঘটিয়ে। সুতরাং এটা মোটেই আশ্চর্যজনক ছিল না যে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার এই মহাস্ফীতির সাথে যুক্ত হচ্ছিল স্পেকুলেশন বা ফাটকা ও ম্যানিপুলেশন বা কারচুপিমূলক অজস্র নতুন ব্যবস্থা ও প্রথা।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ঋণ দেবার পরিমাণ নিম্নগামী হলেও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল সিকিউরিটি ও বন্ডের দ্বারা আদান-প্রদান। এই ব্যবস্থার কিছু মূলগত ফলাফল ছিল। প্রথমত, এর দ্বারা আন্তর্জাতিক আর্থিক আদান-প্রদান ব্যাপক ও বহু গুণ বৃদ্ধি পায়—ব্যাঙ্কিং ঋণের ব্যবস্থা শ্লথ হওয়া সত্ত্বেও। প্রসঙ্গত দা ইকনমিস্ট পত্রিকা (সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৯২) এবিষয়ে যে তথ্য দিয়েছিল তা' থেকে এর অবিশ্বাস্য বিপুলতা কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

(১) ১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ঋণের স্টক ছিল ৩২.৪ বিলিয়ন ডলার। ১৯৯১ সালে তা' দাঁড়ায় ৭.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে (১০০০ বিলিয়নে ১ ট্রিলিয়ন)। অন্যভাবে বলতে গেলে, ১৯৮০ সালে এটা ছিল অরগানাইজেশন অব ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ও. ই. সি. ডি.) ভুক্ত দেশগুলির মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪ শতাংশ, ১৯৯১ সালে তা' দাঁড়ায় ৪৪ শতাংশে।

(২) ১৯৮২ সালে আন্তর্জাতিক বন্ডের অনাদায়ী মোট মূল্য ছিল ২৫৯ বিলিয়ন ডলার; ১৯৯১ সালে তা' দাঁড়ায় ১.৬৫ ট্রিলিয়ন ডলারে।

(৩) ১৯৭১ সালে বিদেশের সাথে আমেরিকার সিকিউরিটি আদান-প্রদান নিজ দেশের জি. ডি. পি.-র ৩ শতাংশ ছিল, তা' বেড়ে ১৯৮০ সালে দাঁড়ায় ৯ শতাংশে, ১৯৯০ সালে ৩৯.৩ শতাংশে। ১৯৯৩ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, আমেরিকা থেকে বহির্গামী প্রতি ১০ ডলারের মধ্যে ৯ ডলারই নিযুক্ত হচ্ছে সিকিউরিটি, বন্ড, শেয়ার প্রভৃতি ক্ষেত্রে। ঐ বছরগুলিতে জার্মানিতে অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৩ শতাংশ, ৮ শতাংশ ও ৫৮ শতাংশ এবং জাপানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২ শতাংশ (১৯৭৫), ৭ শতাংশ ও ১১৯ শতাংশ। হারের এই বৃদ্ধি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে যে, কিভাবে অর্থনীতির ভর ক্রমশ মূলধন, ঋণ ও টাকার বাজারে ভয়ঙ্কর গতিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এই গতির চরিত্র একই সাথে প্রমাণ করে যে, উচ্চহারে ও নিশ্চিত মুনাফাই এই ত্বরণ ঘটিয়ে চলেছিল।

(৪) কারেন্সি ট্রেডিং বা মুদ্রায় বাণিজ্য ১৯৯১ সালে ছিল মোটামুটি দৈনিক ৯০০ বিলিয়ন ডলার বা বছরে ৩২৮.৫ ট্রিলিয়ন ডলার—অর্থাৎ প্রকৃতই নক্ষত্র-গাণিতিক সংখ্যার অনুসারী।

(৫) এর পাশাপাশি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফ. ডি. আই.) ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে তিন গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে।

সিকিউরিটি মার্কেটে (ক্যাপিটাল, মানি অ্যান্ড ক্রেডিট মার্কেট) এই পর্বতপ্রমাণ পরিমাণে অর্থের উপস্থিতির কারণ হলো, অব্যাহতভাবে কেনা-বেচার ব্যবস্থা। বিভিন্ন দেশের সিকিউরিটির মূল্য সেই দেশের মুদ্রার মানের ভিত্তিতে ঘোষিত হয়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানের দ্বারা বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-

মান নিত্য ওঠা-নামা করে পরিবর্তন ঘটায় সিকিউরিটির মূল্যও। আর মুদ্রামূল্যের ওঠা-নামাজনিত সিকিউরিটির দামের ওঠা-নামা সিকিউরিটি থেকে লাভের আশা বা লোকসানের আশঙ্কা ক্রমাগত ক্রয়-বিক্রয় তৎপরতাকে অব্যাহত রাখে। বিপরীত দিক থেকে সিকিউরিটির ক্রমাগত কেনাবেচা অব্যাহতভাবে প্রভাবিত করে একটি দেশের মুদ্রার দামের ওঠা-নামাকে। এইভাবে চলে এক পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়া। 'ফিক্সড কারেন্সি' বিনিময় ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর (ডলারের পতনের ফলে) 'ফ্লোটিং কারেন্সি' ব্যবস্থার পত্তন হওয়াতে পূর্বোক্ত ঘটনা স্থায়ী রূপ পাচ্ছিল। মার্কেট ফোর্সেস বা বাজারী শক্তির স্বচ্ছন্দ বিহারের প্রমাণও এটি। অন্যদিকে ধনী দেশগুলির শক্তিশালী মুদ্রার কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখা, দুর্বল মুদ্রাগুলির ওপর কর্তৃত্ব ফলানো, এমনকি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে কোন দেশকে শায়েস্তা করতে সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়নসহ কোণঠাসা করার কলাকৌশলও নিহিত ছিল এই ওঠা-নামার চক্রে।

১৯৮০-এর কালপর্বে পণ্য ও পরিষেবার বিশ্ব-বাণিজ্যে আর্থিক আদান-প্রদানের বা আর্থনীতিক তৎপরতার তুলনায়, স্পেকুলেটিভ অ্যাকটিভিটিজ বা ফাটকা তৎপরতা দ্বারা পূর্বোক্ত ধরনের আর্থিক আদান-প্রদানের প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক প্রতিফলন ধরা পড়ে জাতীয় মুদ্রামানের বিনিময় হারের ওঠা-নামার মধ্যে। অন্যভাবে বলা যায় যে, অতীতের 'রিয়েল ইকনমি' বা 'প্রকৃত অর্থনীতি', যার ভিত্তি ছিল উৎপাদন, বাণিজ্য ও ভোগ, তা' থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিচ্ছিন্ন ও সমান্তরালে এই নতুন ধারা গড়ে উঠছিল। 'প্রকৃত অর্থনীতি'-র পরিপোষক হবার অতীত ভূমিকা থেকে ফিনান্স বা পুঁজি তখন স্বয়ম্ভু রূপ নিচ্ছিল। এমনকি একথাও বলা চলে যে, ফিনান্স তখন 'প্রকৃত অর্থনীতি'-র উপর শুরু করছিল খবরদারী। এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় ১৯৮০ ও ১৯৮৭ সালের মধ্যে যখন মোট বিশ্ব উৎপাদনের তুলনায় বিশ্ববাণিজ্য বেড়েছিল দ্রুততার সাথে—২,৫০০ বিলিয়ন ডলারে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনায় ব্যাঙ্কিং অর্থ সঞ্চালন বেড়েছিল দ্বিগুণ—৪,০০০ বিলিয়ন ডলারে। এই উপমাগুলি অবশ্য আংশিক রূপ, কেননা সিকিউরিটি ট্র্যানজ্যাকশন বা সিকিউরিটির মাধ্যমে আর্থিক আদান-প্রদান বিশ্বে বেড়েছিল ব্যাঙ্কিং-এর চেয়েও দ্রুত গতিতে। ফিনান্সিয়াল মার্কেটের এই ছিল নতুন চেহারার কিছু দিক।

বিশ্বময় আকাশচুম্বী ঋণের চাহিদা মেটাতে টাকার বাজারের আয়তন ও বহুবিধতাও অবিশ্বাস্য মাত্রা নিচ্ছিল। নতুন ধরনের ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট বা আর্থিক সাধিত্র লাগু ও ব্যবহার করার দ্বারা প্রসারিত করা হচ্ছিল ঋণের ব্যবস্থার বেদীকে। তার ফলে ফাটকাবাজির আরও বৃহত্তর ক্ষেত্র খুলে যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে যে, ফিনান্সিয়াল ফিউচারস মার্কেট (বা আর্থিক সেই ধরনের বাজার, যেখানে পরবর্তী সময় থেকে সুদের হার কি হবে তা' আগে থেকেই স্থির করে দেওয়া হয়,) ১৯৭০-এর প্রথমার্ধে প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ক্রমে লণ্ডন ও সিডনিতে এবং তার পরবর্তীকালে একে একে টোকিও, প্যারিস ও ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ চালু হয়। পরবর্তীকালে অন্যত্রও চালু হতে থাকে। জন্মলগ্নে ফিনান্সিয়াল ফিউচারস মার্কেটকে অতি নিরীহ মনে হলেও, ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স বা বিশ্ব-অর্থব্যবস্থাতে এটি অচিরেই হয়ে ওঠে অন্যতম দানব-সদৃশ শক্তি। ১৯৯০ সালের প্রথমের দিকে ফিউচারস বিশ্ব-বাজারে যে বাণিজ্য করেছিল তার ঘোষিত সুদের পরিমাণই ছিল ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার। এর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল যে ঋণের মোট মূল্যের পরিমাণ ছিল কত অতিকায়। এমনকি এর চেয়েও দ্রুত গতিতে বেড়েছিল, যাকে বলা হয় সুদ ও মুদ্রার 'সোয়াপস্' বা বিনিময়। বিনিময়ের এই অভিনব আর্থিক ব্যবস্থা সম্পাদিত হচ্ছিল তেমন দুই পক্ষের মধ্যে যাদের হেফাজতে ছিল সুদ-প্রাপ্য সিকিউরিটিসমূহ বা ভবিষ্যৎ-মুদ্রা চুক্তিগুলি। এই পদ্ধতিতে বিনিময়ের উদ্দেশ্য হলো অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন এবং/অথবা অন্যের মুনাফা আটকানোর ব্যবস্থা করা। মূলধন, টাকা ও ঋণের বাজারে এই ধরনের কারচুপির মাধ্যমে বিপুল স্ফীতি ঘটিয়ে যাওয়া ও মুনাফা করার কার্যত কোন সীমা-পরিসীমা থাকছিল না। যেমন ধরা যাক ১৯৮০ সালের পূর্বে, অর্থনীতিতে সোয়াপস্ প্রায় সম্পূর্ণ অজানিত ছিল। অথচ ১৯৯১ সালেই বিশ্ব-আর্থিক বাজারে অনুরূপ পদ্ধতিতে চুক্তিবদ্ধ অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার।

সংক্ষেপে বলতে গেলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ফিনান্সিয়াল সেক্টর—প্রধানত মূলধন, টাকা ও ঋণের বাজার, জীবন পেয়েছিল নতুনভাবে। এই সাফল্য ও উন্নতি এসেছিল আর্থিক উদ্বৃত্তের প্রসারিত ও ত্বরান্বিত সঞ্চালন করে। পণ্য ও পরিষেবার দর এবং সম্পদের মূল্যের কৃত্রিম স্ফীতির দ্বারা এই সম্প্রসার সংঘটিত হয়েছে। পরিণামে সম্পদের বাধ্যতাসম্পন্ন পুনর্বন্টনমূলক প্রবাহ ঘটেছে নিম্ন-আয়ী দেশগুলি থেকে ধনী দেশগুলিতে, বিশেষত বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলিতে।

প্রথমদিকে, আন্তর্জাতিক স্তরে এই অর্থগত স্ফীতি সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মুদ্রার যথোপযুক্ত সরবরাহে আমেরিকা, বিশেষত, সেখানকার বহুজাতিক সংস্থাগুলি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বপ্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। ব্যাপক ও বেপরোয়া ডলার সরবরাহ শুরু করেছিল তারা—ব্রেটন-উডসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডলার তখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সোনার সমতুল। ১৯৭১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সন সোনাকে ডলার থেকে বিযুক্ত করলেও তার আগে থেকেই ডলার আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে কায়েম করে ফেলেছিল তার প্রবল অস্তিত্ব। ফলে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যে ডলার সঞ্চালিত ছিল, বছরে তা' বেড়েছে ৪.৫ গুণিতকে এবং তারপরও বেড়ে চলেছিল। এইভাবে ডলারের কর্তৃত্বের পতন সত্ত্বেও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্ব-আর্থিক বাজারে এই সময়ে যেমন কর্তৃত্ব রক্ষা করেছে, অন্যদিকে অর্জন করছিল বিপুল মুনাফা।

বিশ্ব-স্তরে প্রকৃত মূলধনের পুঞ্জিভবন ও ফিনান্স তথা অর্থের পুঞ্জিভবনের মধ্যে তুলনা করলে প্রকৃত অবস্থা আরও কিছুটা পরিষ্কার হয়। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে বিশ্ব-আর্থিক সম্পদের স্টক বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩,৮০০ বিলিয়ন ডলার হিসাবে, পাশাপাশি ঐ সময়ে 'ওয়ার্ল্ড ফিক্সড ক্যাপিটাল ফরমেশন' বা বিশ্ব সংস্থাপিত মূলধন গঠন ঘটেছে বছরে গড়ে ২,৩০০ বিলিয়ন ডলার হিসাবে। পণ্য ও পরিষেবায় বিশ্ব-বাণিজ্য বাড়ছিল বছরে ২.৫ থেকে ৩ ট্রিলিয়ন ডলার। কিন্তু লণ্ডনের ইউরো-ডলার বাজারে, যেখানে বিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের কাছ থেকে ধার নেয় ও ধার দেয়, সেখানে প্রত্যেক কর্মদিবসে বিনিময় হতো ৩০০ বিলিয়ন ডলার বা বছরে ৭৫ ট্রিলিয়ন ডলার—এটা ছিল সারা বিশ্বের এক বছরের সর্বমোট বাণিজ্যের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি। তদুপরি বিশ্বের প্রধান টাকার বাজারগুলিতে, যেখানে এক দেশের মুদ্রা অপর দেশ ক্রয় বা বিক্রয় করে, তার দৈনিক পরিমাণ ছিল ১৫০ বিলিয়ন ডলারের সমতুল বা বছরে ৩৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যা আবার সারা বিশ্বের পণ্য ও পরিষেবায় বাণিজ্যের ১২ গুণের সমান। তাছাড়া, বছরে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং-এর বৃদ্ধির আয়তন ছিল, সারা পৃথিবী জুড়ে দেশসমূহের সীমানার বাইরে অন্য দেশে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মোট পরিমাণের চেয়ে ৯ গুণ বেশি।

এই সমগ্র কর্মকাণ্ডের মূল উদ্যোক্তা উন্নত দেশগুলির বহুজাতিক সংস্থাগুলি। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফার তুলনায় এই ধরনের 'বাজারী' ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগে বেশী মুনাফা সংগৃহীত হচ্ছিল। ফলে স্বল্পকালে অর্জিত মুনাফা (একে প্রকৃত অর্থে উদ্বৃত্ত-মূল্য বলা যায় না, কেননা এটা উৎপাদনে নিযুক্ত পুঁজি নয়) পুনরায় অতিরিক্ত পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করে আবারও বাড়তি মুনাফা আসছিল; এইভাবে চক্রাকারে অতিকায় মুনাফা গড়ে ওঠে—পরিণামে বিস্তৃতি ঘটে মূলধন, টাকা ও ঋণের বাজারের। এবং পরিস্থিতি এমন সৃষ্টি হয় যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংজ্ঞাতে 'বাজারে'র তাৎপর্য, বিশেষত আন্তর্জাতিক মাত্রাতে, একমাত্র হয়ে দাঁড়াতে থাকে সিকিউরিটি ও কারেন্সির বাজার, কেননা এই স্তরেই বাণিজ্য ও আদান-প্রদান প্রধানত ঘটতে থাকে।

আর্থিক বাজারের এই অবিশ্বাস্য সাফল্য ও অতিকায় রূপ যদিও বুদ্বুদের চরিত্রের মতো এবং যে কোন মুহূর্তে এই ব্যবস্থার সমূহ বিপদও সর্বক্ষণ আশঙ্কিত থাকে এবং তেমন ঘটলে তা' পুঁজিবাদের আরও ভয়ঙ্কর সংকট ঘনিয়ে তুলবে, এতদসত্ত্বেও ফিনান্সিয়াল মার্কেটের মাধ্যমে পুঁজিবাদের তখন সঞ্জীবন চলছিল। পরবর্তীকালে অর্থনীতির বিশ্বায়নের যে কথা প্রচার করা হতে থাকে তা' ছিল প্রধানত জাতীয় অর্থনীতিগুলিকে এই আর্থিক বাজারের অর্থনীতির সাথে যুক্ত করার ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির

প্রধানতম ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেকটি দেশে আর্থিক বাজারের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, জাতীয় অর্থনীতির ভরকে সেই অভিমুখী করা।

তৃতীয় দুনিয়ার কতকগুলি দেশে শিল্পোন্নয়নের নতুন উদ্যোগ

সংকট অথবা মুক্তি—এই ভাঙা-গড়ার সংগ্রামে যখন উন্নত ধনতান্ত্রিক দুনিয়া আকণ্ঠ নিমজ্জিত তখন তৃতীয় দুনিয়ার একাংশ দেশে, পুঁজিবাদী রকম-ফের ব্যবস্থার মধ্যেই, অগ্রগতির জন্য শুরু হয়েছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শেষোক্ত প্রয়াস কোন বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ ছিল না, ছিল বিশ্ব-পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার অন্যতম দিক। তথাপি এই প্রচেষ্টায় অগ্রগতি উল্লেখের দাবী রাখে। লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার সংশ্লিষ্ট কিছু দেশের ক্ষেত্রে আমেরিকা ও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি এবং পূর্ব-এশিয়ার ক্ষেত্রে জাপান প্রধানত এই প্রক্রিয়ার নেপথ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল। পুঁজির নতুন বিস্তারের জন্য বিশ্ব-ধনতন্ত্রের পক্ষ থেকে ভূমিকা গ্রহণের দিক ছাড়াও, সামরিক ও রাজনৈতিক স্তরে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধির এবং তৃতীয় দুনিয়ার কিছু দেশের সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারের জন্য এক সমন্বিত উদ্যোগ এর মধ্যে ছিল। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে এই প্রক্রিয়া একান্ত সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট বা একমাত্র তাদের মদতে সাধিত হচ্ছিল। আলোচ্য অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূমিকাও ছিল দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এই প্রসঙ্গ বিবৃত করার আগে অন্যতম উন্নত পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে জাপানের অগ্রগতির স্বরূপ রেখাচিত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা, অন্যান্য ধ্রুপদী উন্নত পুঁজিবাদী অধিকাংশ দেশকে জাপান দ্রুততার সাথে, ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। কেবল তাই নয়, পাশ্চাত্যের উন্নয়ন ও বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রচলিত তত্ত্ব ও ব্যবস্থার থেকে অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে নিজ তৎপরতায়, সামরিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও, পূর্ব-এশিয়ার বেশ কিছু দেশে নিজের অর্থনৈতিক প্রভাব, এমনকি অংশত অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব পর্যন্ত কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল জাপান। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে তুলনামূলকভাবে উন্নত করার নামে জাপান দেশগুলিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে স্বীয় স্বার্থ আরও প্রশস্ত ও সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করেছিল। ফলে সেইসব দেশের সরকারগুলি গ্রহণ করেছিল এক অর্থে বিশিষ্ট ধরনের উদ্যোগ।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর জাপানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম মতাদর্শটি ছিল স্বীয় দেশের জনগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্র উপাদান সৃষ্টি করা। শিক্ষার ভিত্তিকে সম্প্রসারণ করা ছাড়াও, নার্সারি স্তর থেকেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিমণ্ডল গঠন করার সাথে ব্যাপক প্রসার ঘটানো হয়েছিল সমস্ত ধরনের কারিগরী শিক্ষার। বৃত্তিগত ক্ষেত্র শুরু থেকে চাকুরীর শেষ জীবন পর্যন্ত, উৎপাদনের নব নব প্রয়োজন মেটানো ও পণ্যের উৎকর্ষতা সৃষ্টির স্বার্থে, প্রত্যেক শ্রমিককে বারংবার শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো জাপানে। প্রথম পর্যায়ে জাপান উদ্যোগ নিয়েছিল নিজ শিল্প-ভিত্তিকে পুনর্গঠিত ও প্রশস্ত করার; মূলধনের ব্যাপক বিনিয়োগ করেছিল বৃহদায়তন, শ্রম-নিবিড় শিল্পগুলিতে, যেমন ইস্পাত উৎপাদন ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় ও বিপর্যয় থেকে পুনর্জাগরণের জন্য জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা জনগণের মধ্যে সৃষ্টি এবং জাপানের পরম্পরাগত সামরিক-সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর পুনরায় বিশ্বে প্রতিষ্ঠা নেওয়ার জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগে জাপানের শাসকশ্রেণী সংঘবদ্ধ করতে পেরেছিল জনগণকে। এর মধ্য দিয়ে জাপানের বিপুল সাফল্য, যাকে বলা হয়েছে 'জাপানীজ ইকনমিক মিরাকল', তা' অর্জনের অন্যতম শর্ত সৃষ্টি করেছিল।

এক সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে বিশ্ব-অর্থনীতিতে জাপানের অর্থনীতি ক্রমাগত এগিয়ে যায়। বিশ্বের তদানীন্তন প্রধান প্রধান দেশগুলির 'গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট' (জি. এন. পি.) বা মোট জাতীয় উৎপাদনে জাপানের যে অংশ দাঁড়ায় তা' নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে পরিস্ফুট হবে।

দেশ	১৯৫৫ %	১৯৬০ %	১৯৭০ %	১৯৭৮ %	১৯৮০ %
জাপান	২.২	২.৯	৬.০	১০.০	৯.০

	%	%	%	%	%
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৬.৩	৩৩.৭	৩০.২	২১.৮	২১.৫
ই.ই.সি.	১৭.৫	১৭.৫	১৯.৩	২০.২	২২.৪
সোভিয়েত রাশিয়া	১৩.৯	১৫.২	১৫.৯	১৩.০	১১.৬
সমাজতান্ত্রিক চীন	৪.৪	৪.৭	৪.৯	৪.৬	৪.৭
অন্যান্য দেশ	২৫.৭	২৬.০	২৩.৭	৩০.৪	৩০.৮
বিশ্বে মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
বিলিয়ন ডলারে	১,১০০	১,৫০০	৩,২৫০	৯,৬৬০	১২,২১৫

১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে জাপানের শিল্পোৎপাদন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যে হারের কাছাকাছি অন্য কোন উন্নত দেশ ছিল না। আন্তর্জাতিক বাজারে মোটর গাড়ি, ইস্পাত ও জাহাজের ব্যবসা দিয়ে প্রধানত আগ্রাসন শুরু করে জাপান; ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রনিকস্, অ্যাসেম্বলিং অ্যাণ্ড প্রসেসিং ইণ্ডাস্ট্রি, পেট্রোকেমিকেলস, ফিফ্‌থ জেনারেশন কমপিউটার ইত্যাদি শিল্পে সারা বিশ্বে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে নেয়। অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে জাপানের অগ্রগতির চিত্রটি ১৯৮০ সালে দাঁড়িয়েছিল নিম্নরূপ (মিলিয়ন ডলারে) ঃ

দেশ		কেমিকেল প্রোডাক্টস	মেশিনারি/ ট্রান্সপোর্টেশন ইক্যুইপমেন্টস	আদার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস
জাপান	রপ্তানি	৬,৬১৯	৭৫,৭৮০	৪২,০১২
	আমদানি	৫,৯২৮	৮,৩৯০	১৫,১১৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	রপ্তানি	২২,৪৩০	৮২,৮১০	৩৮,৮৫৪
	আমদানি	৮,৯৫৬	৬৩,৮৩৭	৫৯,১৪৭
পশ্চিম জার্মানী	রপ্তানি	২৪,৩১৮	৮৫,৪১৪	৫৭,১৯১
	আমদানি	১৩,৩১৪	৩৫,০৪১	৫৫,৩৯৫
ফ্রান্স	রপ্তানি	১৩,২৪৯	৩৬,৮৩০	৩৩,৯১৪
	আমদানি	১২,১৬৯	২৮,৮১৪	৩৫,৬৯৬
ব্রিটেন	রপ্তানি	১২,৩০৩	৩৯,৫৫৯	৩৪,১৬৭
	আমদানি	৭,৩১০	৩০,৩০১	৩৯,৪৮৪
ইতালী	রপ্তানি	৫,৫০৫	২৫,২৫৪	৩৫,১১২
	আমদানি	৭,৯৯৩	২০,০৪৯	১৯,৬৩১

জাপানের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে এক্ষেত্রে প্রথমে উল্লেখের অন্যতম কারণ হলো যে ষাটের দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলির পদ্ধতিকে একমাত্র মডেল হিসাবে বিবেচনা ও অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল অনুন্নত দেশগুলি, বিশেষত এশিয়ার দেশগুলি। কিন্তু এর পর থেকে জাপানের উন্নয়ন তাদের ক্রমশ আকৃষ্ট করতে থাকে। সত্তরের দশকের প্রথম থেকে পূর্ব এশিয়ার কিছু কিছু দেশ জাপানের কাছাকাছি যাওয়ার যেমন চেষ্টা শুরু করে, জাপানী পদ্ধতি নিয়ে এশিয়ার অন্য কিছু দেশেও শুরু হয়েছিল কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তৃতীয় দুনিয়ার মধ্যে যেসব দেশে কিছুটা শিল্পোন্নয়ন বা আর্থিক অগ্রগতি শুরু হয়, তারা, এক অর্থে, কোন সর্বজনীন মডেল গ্রহণ করেনি। স্বদেশীয় বাস্তবতা, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এবং নিজ অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার সাথে উন্নত দেশগুলির সহায়তা ও বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ এবং বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা পথে ও পদ্ধতিতে স্বীয় অগ্রগতির জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল শেষোক্ত দেশগুলি।

কিন্তু, এগুলি ছিল বাহ্যিক প্রকরণ। আসলে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের পক্ষ থেকে নতুনভাবে মূলধনের

বিশ্বময় প্রসার ও বহুজাতিক স্তরে উৎপাদন প্রচেষ্টার অন্যতম পরিণাম প্রকট হছিল আলোচ্য তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির প্রয়াসের মধ্যে। আর সেজন্য দেখা গেছে যে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক গঠনের ক্ষেত্রে সরকারগুলিকে দিয়ে দমনমূলক নানা পদ্ধতি গ্রহণ করাতে হচ্ছিল—যাতে জনগণ নতুন তৎপরতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। দেশের জনগণকে শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে এবং উৎপাদনে ঈপ্সিত শ্রম দিতে বাধ্য করার জন্য দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রকৃত শ্রমশক্তিকে জড়ো করতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিচ্ছিল।

বিশ্ব-ধনতন্ত্রের উৎপাদনের বিশ্বায়নের নিয়ম দাবী করছিল শ্রমের বিশ্ব-বাজার গঠন ও উন্নয়ন। আর সেকারণে তাদের প্রয়োজন পড়ে উন্নয়নমুখীন দেশগুলির সরকারকে দমনাত্মক চরিত্র গ্রহণে মদত দেওয়ার। কেননা, আন্তর্জাতিক পুঁজির গতিময়তা রাষ্ট্রগুলিকে এই সংকেত পাঠাচ্ছিল যে সংশ্লিষ্ট দেশে শ্রমের খরচ কমানো এবং উৎপাদনে শ্রমিকদের মনোযোগী ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার মধ্য দিয়েই বিদেশী পুঁজিকে বিনিয়োগের জন্য আকৃষ্ট করতে পারে দেশগুলি। কার্যকালে এর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক তত্ত্বটি দাঁড়ায় যে, শ্রমিকদের ওপর মূলধন ও রাষ্ট্রের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই নতুন শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হবে।

এই কাল-পর্বে বিশ্ব-অর্থনীতির সাথে আলোচ্য জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। পাশাপাশি, আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি। এটা হয় মূলত সংশ্লিষ্ট দেশের শাসকশ্রেণীর শ্রেণী-চরিত্র ও শ্রমের বিশ্ব-বাজারের পুরাতন ও নতুন বিভাজন ব্যবস্থাতে দেশগুলির অবস্থানের ভিত্তিতে। এই নিরিখে, আলোচ্য দেশগুলির রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চরিত্রকে প্রধানত নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করা চলে। (ক) নিও-কলোনিয়াল রেজিম বা নয়া-উপনিবেশবাদী শাসনতন্ত্র। অর্থাৎ যেসব দেশের সরকার নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখছিল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রচণ্ড সমর্থনে (জায়রে, থাইল্যাণ্ড, গ্যাবন); (খ) ডিপেনডেন্ট ডেভেলপমেন্ট রেজিম বা নির্ভরশীলতাভিত্তিক কিন্তু উন্নয়নকামী শাসনতন্ত্র। অর্থাৎ সেইসব সরকার যারা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ওপর প্রধানত নির্ভরশীল ছিল এবং পরম্পরাগত রপ্তানির মধ্য দিয়ে শিল্পায়ন সংঘটিত করে এলেও, আর্থনীতিক সম্প্রসারকে দ্রুততর করার জন্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থ ও বিনিয়োগের উপর ছিল নির্ভরশীল (কেনিয়া, আইভরি কোষ্ট, কলম্বিয়া); (গ) স্টেট ক্যাপিটালিস্ট রেজিম বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের শাসনতন্ত্র। অর্থাৎ সেইসব দেশের সরকার যারা খনিজ তেল বিদেশে রপ্তানি করে পুঁজি সংগ্রহের মধ্য দিয়ে নব নব প্রকল্প গঠন করছিল। দেশগুলিতে ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও শিল্প, যদিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তখন পর্যন্ত তারা তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেনি (আলজিরিয়া, লিবিয়া, ইরান ও নাইজিরিয়া); (ঘ) ডি-ফ্যাক্টো মিলিটারি রেজিম বা কার্যত সামরিক শাসনতন্ত্র। অর্থাৎ যেসব দেশ শাসন করছিল সরাসরি বা পরোক্ষে দেশের সামরিক বাহিনী, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা সরকারগুলি ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষিত এবং সামরিক একনায়কত্বের তত্ত্বাবধানে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য (তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা); (ঙ) রেভলিউশনারি রেজিম বা বিপ্লবী শাসনতন্ত্র, যেগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু কার্যকালে দেশগুলি ছিল তৃতীয় দুনিয়ার অন্তর্গত। এইসব দেশ পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল কিন্তু এরা অন্যান্য উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ওপর বিভিন্ন বিষয়ের সাথে অর্থনীতি ও শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে ছিল বহুলাংশে নির্ভরশীল (কিউবা, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম)। এছাড়াও বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমের বাজারে অনেকটা উল্লেখযোগ্যভাবে যেসব রাষ্ট্র ভূমিকা নিচ্ছিল, সেগুলির আরও কিছু চরিত্রায়ণ করা চলে। যেমন কলোনিয়াল বা উপনিবেশীয় (হংকং) এবং সেট্‌লার কলোনিয়াল বা বসতিমূলক উপনিবেশ (দক্ষিণ আফ্রিকা) দেশগুলি। বিদেশে শিল্প-পণ্য রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে শেষোক্তদের স্থান দেওয়া যায়। তাছাড়াও ডিপেনডেন্ট ডেভেলপমেন্ট রেজিমের আরও কিছুটা রকম-ফের ছিল। এই দেশগুলি বিশ্ব-বাজারের দিকে দৃষ্টি রেখে উন্নয়নের প্রয়াস চালাচ্ছিল, যেমন শ্রীলঙ্কা,

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি। এমনকি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও মাও-উত্তর সমাজতান্ত্রিক চীন বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধ্যমত অংশীদার হয়ে নিজ উন্নয়ন ও বহির্বাণিজ্যকে শক্তিশালী করার জন্য তৎপর ভূমিকা নিতে শুরু করে এই সময়ে।

পূর্বোক্ত 'ঙ' অংশ বাদে উন্নয়ন প্রয়াসে প্রান্তিক এই দেশগুলি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছিল কতকগুলি বিশেষ দিকে। প্রধানত, আন্তর্জাতিক শ্রমের বাজারের বিভাজনের অভ্যন্তরে কিভাবে নিজের দেশ স্থান করে নিতে পারে এবং তদনুযায়ী উৎপাদনের শক্তিকে, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীকে, গড়ে তোলা যায়। এই প্রয়াসে সাফল্যমণ্ডিত হতে সর্বাগ্রে শ্রমের মূল্য অর্থাৎ মজুরিকে সর্বনিম্ন স্তরে রাখা, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রপ্তানিধর্মী উৎপাদনের জন্য প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ, রপ্তানিতে উৎসাহ দেবার জন্য ভর্তুকি ও কর ছাড়, শিল্পোন্নয়নের কাজে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা, শ্রম-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে শ্রমিকদের অধিকারহীন করা থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক নিপীড়ন চালানো পর্যন্ত ইত্যাদিতে উদ্যোগী হয়।

এই সময়ে তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে এক নতুন তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। বলার চেষ্টা করা হয় যে অনুন্নত দেশে পশ্চিমী গণতন্ত্র অচল। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই দেশগুলির উন্নয়ন ঘটেনি। গণতন্ত্রে জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে গণতন্ত্র ভেঙে পড়ছে। অথচ তৃতীয় দুনিয়াতে যেখানে স্বৈরতন্ত্র বা সামরিক শাসন দীর্ঘকাল চালু আছে সেখানে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। উদাহরণ হিসাবে এরা তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চিলি আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের নজির তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল। অথচ এই তত্ত্বে বর্ণিত উদাহরণের পাশাপাশি দেখা গেছে যে, পাকিস্তান, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ, বার্মা (মায়নামার), উপসাহারীয় আফ্রিকার দেশগুলি, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে স্বৈরতান্ত্রিক বা সামরিক সরকার দীর্ঘকাল থাকা সত্ত্বেও, দেশগুলি স্বীয় অনুন্নত স্তরকে অতিক্রম করতে পারেনি।

বিশ্বের প্রান্তিক আলোচ্য দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের উন্নয়ন, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যাশার চেয়ে, দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছিল। বামপন্থীদের পক্ষ থেকে এই ধরনের উন্নয়নকে চরিত্রায়িত করা হয়েছিল 'থিওরি অব ডিপেনডেন্সি' বা নির্ভরশীলতার তত্ত্ব নামে। কিন্তু কার্যকালে এই তত্ত্বকে অস্বীকার করে দেশগুলির অগ্রগতি চলতে থাকে। নির্ভরশীলতার তাত্ত্বিকরা বলতে চেয়েছিলেন যে এইসব উন্নয়ন দেশের অভ্যন্তর থেকে ঘটছে না, ঘটছে বাইরে থেকে। অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশগুলি এই উন্নয়নের একমাত্র বা প্রধান কারক শক্তি। প্রসঙ্গত এই কাল-পর্বের বাস্তবতাকে স্মরণে রাখা দরকার। 'পেরিফেরিয়াল স্টেটস্' বা প্রান্তিক দেশগুলিকে কোনভাবেই 'কোর' বা কেন্দ্রের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে তুলনা করার প্রশ্ন ছিল না। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ধ্রুপদী পথে পুঁজিবাদের আবির্ভাব, বিস্তার ও সংহতিকরণ ঘটেছিল—সমাজ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুঁজিবাদ সেখানে গভীর প্রতিষ্ঠা নিয়েছিল। অন্যদিকে প্রান্তীয় দেশগুলিতে পুঁজিবাদ প্রথমাবধি আরোপিত ছিল। বাইরে থেকে পুঁজির অনুপ্রবেশ এবং সামান্য কিছু পুঁজির অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিকাশ প্রমাণ করে যে দেশীয় বুর্জোয়ারা সবেমাত্র উদ্ভিন্ন স্তরে ছিল। প্রান্তিক দেশগুলির সামাজিক গঠনে বহিঃস্থ পুঁজিবাদের সামান্য প্রভাব এবং দেশীয় বুর্জোয়াদের অনুন্নত অবস্থা পুঁজিবাদের নতুন বিকাশে বিশেষ ধরনের শর্ত, স্বভাবতই, দাবী করছিল। কিন্তু সেইসব শর্তগুলিকে স্থানীয় বুর্জোয়াদের বিকাশের কিছু যান্ত্রিক চাহিদা বলা যেমন ঠিক নয়, তেমনি শর্তগুলি জাতীয় বুর্জোয়াদের ইচ্ছা ও ভূমিকা নিরপেক্ষ ছিল। তবে সেগুলিকে কেবলমাত্র উন্নতদেশগুলির প্রয়োজন ও ভূমিকার ফল বলেও দাবী করা যায় না। তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণীগুলির চরিত্র ছিল অতীব জটিল ও শ্রেণীগুলির ছিল বিভিন্ন ধরনের, এমনকি পরস্পরবিরোধী ভূমিকা। তাছাড়া আরও কিছু উপাদান, যেমন আমলাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অনুপ্রবেশ ও ভূমিকা গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ ও ক্ষমতা অব্যাহত ছিল। সুতরাং পরিসীমার দেশগুলির উন্নয়ন বহিরাগত এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতির প্রশ্নে কোন স্বাধিকার নেই—ডিপেনডেন্সি তত্ত্বের এই প্রতিপাদ্য প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে শুরু করেছিল।

তৃতীয় দুনিয়ার আলোচ্য দেশগুলির রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে অনেকটা একই ধরনের ভূমিকা নিয়েছিল যা উন্নত দেশগুলির রাষ্ট্র পুঁজির বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য করে থাকে। এই তৎপরতার মধ্যে ছিল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের (বস্তুগত ও সামাজিক পরিকাঠামো) জন্য প্রয়োজনীয় ও সর্বজনীন শর্তগুলি গড়ে তোলার চেষ্টা, যদিও দেশভেদে ছিল এর যথেষ্ট তারতম্য। প্রান্তিক দেশগুলির বুর্জোয়ারা যেহেতু দুর্বল ছিল সেহেতু রাষ্ট্রশক্তি সেই দুর্বলতা পূরণ করার উদ্যোগ নিতে থাকে। এর অর্থ হলো উন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রের তুলনায় প্রত্যক্ষ ও ফলদায়ী ভূমিকা নিচ্ছিল আলোচ্য দেশগুলির রাষ্ট্র।

কোন কোন সূত্রকারের মতে উন্নত দেশগুলির রাষ্ট্র প্রধানত হস্তক্ষেপ করে শ্রমের পুনরুৎপাদনের স্তরে, কিন্তু কম ভূমিকা নেয় উৎপাদনমূলক ক্ষেত্রে। বিপরীতটি ঘটছিল আলোচ্য প্রান্তিক দেশগুলিতে। স্বভাবতই দেশগুলিতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখীন তৎপরতা হয়ে উঠছিল অতীব নির্ধারক। আরেক অংশের সমাজতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছিলেন যে নতুন উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য দেশগুলির শ্রমের পুনরুৎপাদনের স্তরে সরকারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছিল। তথ্যসহ তাঁরা দেখিয়েছেন যে লাতিন আমেরিকার কতকগুলি দেশে আমদানি অপসারক উন্নয়নের রণনীতি (ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজি) সত্তরের দশকে "সংঘবদ্ধ করেছিল স্বশাসিত স্থানীয় মূলধন, তুলনামূলকভাবে ব্যাপক-লভ্য শহুরে মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞ কোষ-শক্তিকে।" এর মধ্য দিয়ে সমন্বয় ঘটানো হচ্ছিল পুঁজির নিবিড় সঞ্চয় ও প্রসারমান ভোগের চরিত্রের মধ্যে। একে বলা হয়েছিল 'পেরিফেরিয়াল ফোর্ডিজম' তথা তৃতীয় দুনিয়ার ধরনের ফোর্ডবাদ। (ফোর্ডবাদসহ উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হবে)। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে নির্মিত অখণ্ড কারখানাগুলিতে (ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যান্ট) প্রযুক্ত জটিল যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন প্রণালী শ্রমিকরা যাতে গ্রহণ ও আত্মীকরণ করে সেজন্য আলোচ্য প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি সরাসরি ভূমিকা নিতে থাকে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য শ্রমশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ করা এইসব রাষ্ট্রের কাছে জরুরী ছিল না, আসলে আন্তর্জাতিক পুঁজির নিয়মিত বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ বাতাবরণ গড়ে তোলার স্বার্থে এবং স্বভাবতই জাতীয় স্তরের শিল্পোন্নয়নের উদ্যোগকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে রাষ্ট্র শ্রম-পরিস্থিতি ও শ্রম-পুনরুৎপাদনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছিল।

রপ্তানি-ভিত্তিক শিল্পায়নের উদ্যোগ যেসব দেশ গ্রহণ করে, সেখানেও মূলধন-শ্রম সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছিল অবিরাম। এই হস্তক্ষেপ নিছক আইনি, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ছিল অনেক প্রত্যক্ষ। কেননা বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বৃত্তাংশে (সেগমেন্ট) উৎপাদনের জন্য যথার্থ ও উপযুক্ত দেশ নির্বাচন দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিল সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রমের বাজারের পরিস্থিতির উপর অর্থাৎ শ্রমিকদের মজুরির স্তর, শ্রমিক-নিয়োগের পদ্ধতি এবং শ্রমশক্তির শিক্ষাগত ও যোগ্যতার মানের উপর। বিশ্ব-অর্থনীতি গঠনে, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষ থেকে তৃতীয় দুনিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগের সময় দেশ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল—বিশেষত ফ্রি ট্রেড জোনগুলিতে শ্রমিকদের ধর্মঘট, আন্দোলন বা রাজনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ, এমনকি প্রয়োজনে নিরাপত্তাবাহিনীকে নিয়োগ করতে বাধ্য করেছিল উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যেহেতু তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, তাই রপ্তানিভিত্তিক শিল্পায়নের তৎপরতায় স্বীয় উদ্যোগে কঠোরতর শ্রম-নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যাচ্ছিল আলোচ্য অনুন্নত দেশের রাষ্ট্রগুলিকে। অনেক ক্ষেত্রে দেশগুলিতে প্রত্যক্ষ দমনমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু ছিল। যেমন সিংম্যান রী-র দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং মার্কোসের অধীন ফিলিপিনস।

সংক্ষেপে বলা যায় যে পূর্বোক্ত প্রান্তিক দেশগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরে (এবং একই সাথে শ্রমের বাজার নিয়ন্ত্রণে) রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সর্বপ্রধান ও প্রথম বিষয় হয়ে ছিল।

এবারে দেশগুলির শিল্পায়নের চরিত্র এবং মূলধনের আন্তর্জাতিকীকরণের রূপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় উন্নয়নের চরিত্র কিছুটা দেখা যেতে পারে।

প্রান্তিক দেশগুলির শিল্পায়নের ধরন

পূর্ববর্তী অংশের আলোচনাতে শিল্প-উন্নয়নের উদ্যোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির বিন্যাস তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে একদিকে মূলধনের আন্তর্জাতিকীকরণ ও প্রান্তিক দেশের রাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপ এবং অন্যদিকে শিল্প ও শ্রম-বাজারের মৌল কাঠামোর মধ্যে সম্পর্কের কিছু দিক। এবারে শিল্পায়নের ধরন ও শ্রম-বাজারের মধ্যে সম্পর্কের কয়েকটা দিক লক্ষ্য করা যাক।

শিল্পায়নের ধরন বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ও সক্রিয় ভূমিকার দ্বারা সুনির্দিষ্ট শিল্পায়নের রণনীতিকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট যে আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়িত করা হচ্ছিল। তৃতীয় দুনিয়ার আলোচ্য দেশগুলির শিল্পায়নের ধরনকে দু'টি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রথম মাপকাঠি ছিল এই ধরনের শিল্পায়নে উৎপাদনের লক্ষ্য কি হবে—অভ্যন্তরীণ বাজার (ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন) অথবা রপ্তানি (এক্সপোর্ট-লেড)। দ্বিতীয় মাপকঠি ছিল, উৎপাদনের প্রণালীতে প্রযুক্তিগত জটিলতা ও নিপুণতা কোন স্তরে থাকবে। দ্বিতীয় মাপকাঠিটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে উৎপাদন-প্রযুক্তির রূপের ওপর শ্রমের চাহিদা অনেকটা নির্ভরশীল। প্রথম মাপকাঠিও কিছু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। যথার্থ বাজার বা পুঁজির আবর্তনের পরিসর আপনা-আপনি নির্ধারক নয়। বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিভিন্ন পরিস্থিতি অভ্যন্তরীণ বাজার বা রপ্তানির জন্য উৎপাদন রণনীতিতে মূলধন-শ্রমের সম্পর্কের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা সৃষ্টি করে। যেমন অভ্যন্তরীণ বাজারের (ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন বা আমদানির বিকল্প সৃষ্টি) জন্য শিল্পায়ন, কার্যকালে আমদানিকৃত পণ্যর বিরুদ্ধে নিরোধমূলক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণের চরিত্র গ্রহণ করে। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে রূপায়িত করা হয় উচ্চ আমদানি শুল্ক চাপিয়ে এবং আমদানি-লাইসেন্স ও আমদানির কোটা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে। অবশ্য আমদানিযোগ্য পণ্যের উপর এই জাতীয় বিধি-নিষেধের অর্থ এই নয় যে বিদেশী পণ্য দেশে ঢুকতে না দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুপস্থিতি। কেননা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দেশীয় বাজারে প্রবেশ করার নির্দেশাত্মক শর্ত বলবৎ করার ক্ষমতা রাখে আন্তর্জাতিক মূলধন এবং তা' করেও। তাছাড়া, এই মূলধন স্বয়ং দেশের অভ্যন্তরে নিজ মালিকানার দ্বারা গতিশীল শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। তার ফলে, দেশের অভ্যন্তরে বিশিষ্ট ধরনের পণ্য উৎপাদন ও উৎপাদনের প্রযুক্তিগত পরিস্থিতিকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণও করে।

অন্যদিকে রপ্তানিভিত্তিক শিল্পায়নের রণনীতি বিশ্ব-বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। দেশে উৎপাদিত পণ্যকে অন্য দেশের সংশ্লিষ্ট ধরনের পণ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। পাশাপাশি রপ্তানিভিত্তিক উৎপাদনের দেশগুলিকে নিজেদের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক পুঁজিকে নিজ নিজ দেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য।

শিল্পায়নের ধরনের প্রসঙ্গ ছাড়াও, সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের জন্য আর একটি ঐতিহাসিক দিকও বিবেচনার অন্তর্গত রাখা একান্ত জরুরী; অর্থাৎ কার্যকরী চরিত্রের শিল্পায়ন সংঘটিত হচ্ছে সঞ্চয়ের কোন কাঠামোতে। এটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে সঞ্চয়ের কাঠামো নিজেই বহুলাংশে শর্ত স্থির করে দেয় কোন ধরনের শিল্পায়নের মধ্যে নিহিত রয়েছে দেশের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সাফল্য—অর্থাৎ অর্থনীতির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের সামগ্রিকতা ও সমাজের শ্রেণীগুলির উন্নয়নের ভবিষ্যৎ। সুতরাং তৃতীয় দুনিয়ার কিছু দেশে এই সময়ে যে পুঁজিবাদী উন্নয়নের প্রক্রিয়া চলছিল, সেটির সাফল্য বা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করার প্রশ্নে এইসব দেশগুলির সঞ্চয়-কাঠামোর উপাদানগুলি কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

(ক) কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও আলোচ্য তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির কৃষিতে প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু ছিল। ধ্রুপদী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজির আদিম সঞ্চয় থেকে শুরু করে পরবর্তী স্তরগুলি অর্জনের ও সাফল্যের প্রাথমিক ভিত্তি হয়েছিল পুঁজিবাদী চরিত্রের ভূমি-সংস্কার। কিন্তু আলোচ্য প্রান্তিক দেশগুলির ক্ষেত্রে সেই

ঐতিহাসিক বাস্তবতা গড়ে ওঠেনি। ফলে সৃষ্টি হতে পারেনি শিল্প গঠনের জন্য পুঁজির সঞ্চয়, বৃহত্তর বাজার, শিল্পের কাঁচামাল ও শ্রমের প্রশস্ত সুযোগ। কেননা দেশগুলি মূলত ছিল কৃষি-ভিত্তিক। এই অবস্থা ছিল উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর সংহত রূপ পাওয়া ও শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। প্রবহমান সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের সাথে উত্থিয়মান পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন বিরোধ-সংঘর্ষ ছিল অবিরাম। ফলে, সমগ্র অর্থনীতিতে বিভীষিকাময় চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হতো। রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরেও ছিল এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে ধন ও সুযোগ-সুবিধার বিপুল বৈষম্য এবং তার ফলে সামাজিক উত্তেজনা ছিল অবিরত। পরিণামে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন শক্তিগুলির উত্থান-পতন ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। পুঁজিবাদী ন্যূনতম অগ্রগতিও এতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ষাটের দশক থেকে সত্তরের দশকের মধ্যে আলোচ্য দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ভূমি-সংস্কারের কাজ শুরু হয়। জনগণকে যুক্ত করে এই কাজ হয়নি। রাষ্ট্রীয় আইন ও কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা এটা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে আলোচ্য দেশগুলিতে ভূমি-ব্যবস্থার বাস্তবতার মধ্যে যেমন ব্যাপক পার্থক্য ছিল, ভূমি-সংস্কারের চরিত্রও ছিল বিভিন্ন ধরনের। তাছাড়া সমস্ত দেশগুলিতে চূড়ান্ত স্তর পর্যন্তও ভূমি-সংস্কার হয়নি; বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত অগ্রগতি ঘটে। এই সমস্ত বাস্তবতার ফলে ভূমি থেকে যথোপযুক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হতো না। কিন্তু সুবিশাল সংখ্যক কৃষক ভূমি-চ্যুত হয়ে শিল্পের যোগানের জন্য উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি সৃষ্টি করে। দেশগুলির পরবর্তীকালের শিল্পায়নের ধরন নির্বাচন ও অগ্রগতি অনেকটাই নির্ধারক হয় এর ভিত্তিতে।

(খ) উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ক : ভূমি-সংস্কার পূর্ব বাস্তবতায় উৎপাদন ও ভোগের চরিত্রও ছিল প্রধানত প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক অথবা আধা-সামন্ততান্ত্রিক। ভূমি-সংস্কারের দ্বারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গতি পাওয়ার ফলে উৎপাদনের চরিত্রের ভর যেমন পরিবর্তিত হতে শুরু করে, অন্যদিকে নিয়মিত মজুরিভোগী ও শহুরে-আধাশহুরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; ভোগের চরিত্রের বিবর্তনও ঘটতে শুরু করে। ভোগের চরিত্রের পরিবর্তন ধীরে ধীরে গ্রামাঞ্চলেও অনুপ্রবেশ করে। অতীতের উৎপাদন ছিল 'সাবসিস্টেন্স প্রোডাকশন' বা বেঁচে থাকার মত উৎপাদন; কিন্তু নতুন পুঁজিবাদী বিকাশের সাথে সাথে 'কমোডিটি প্রোডাকশন' বা পণ্য উৎপাদন বাড়তে থাকে এবং তা' স্থান করে নিতে থাকে মানুষের চাহিদাতে। পণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্পের দ্বারা যোগানের প্রয়োজনীয়তাও বাড়তে থাকে। এইভাবে শিল্প-উৎপাদনের অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার শুরু হয়। অগ্রগতির স্তর অনুযায়ী লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, যেগুলি দ্রুততর উন্নয়ন অর্জন করছিল, সেগুলির কোন কোন দেশে পাশ্চাত্যের ফোর্ডবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাপনাও ক্রমশ গৃহীত হচ্ছে। উৎপাদনের চরিত্রের পরিবর্তন ও ভোগের সাথে উৎপাদন-সম্পর্কের উন্নতির মধ্য দিয়ে জাতীয় বুর্জোয়াদের শক্তিশালী হওয়া এবং কোন কোন দেশে একচেটিয়াপনার শিল্প-শ্রমিক, পরিষেবার মধ্যবিত্ত, শহুরে আধা-শ্রমজীবী ইত্যাদি শ্রেণী-উপশ্রেণীর আবির্ভাব ও প্রসার এবং কিছুটা সংহতকরণ ঘটতে থাকে। কেবলমাত্র শিল্পায়ন ও শিল্পোন্নয়ন নয়, শিল্পের ধরন গঠনেও, সৃষ্টি করে দিতে থাকে এই বাস্তবতা বিকাশের শর্ত।

(গ) শ্রমের পুনরুৎপাদন : প্রসঙ্গটি শিল্প-গঠন ও উন্নয়নের প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ও অস্তিত্বের পাশাপাশি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের অন্যতম বাস্তবতা নির্ধারিত হয় সমাজের অন্যান্য শ্রেণীগুলির সাথে শিল্প-শ্রমিকদের সম্পর্ক, শ্রমিকশ্রেণীসহ জনগণের শিক্ষার মান, শিল্প-শ্রমিক বাহিনীর স্থায়িত্ব/অস্থায়িত্বের পরিস্থিতি, শ্রেণীটির গঠন-প্রকৃতি এবং মজুত শ্রম-শক্তির পরিমাণ ও চরিত্র ইত্যাদির দ্বারা। তাছাড়া, শিল্পের উন্নয়ন ও বিস্তারের সমান্তরালে শ্রমের পুনরুৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ একান্ত অপরিহার্য। সামাজিক নিয়মের ভিত্তিতে এটি প্রক্রিয়া হিসাবে গড়ে উঠলেও পুঁজিবাদের পক্ষ থেকেও পরিকল্পিত সহায়তা এক্ষেত্রে জরুরী। এই উপাদানগুলিতে লক্ষণীয় অগ্রগতির মধ্যে আলোচ্য দেশগুলিতে শ্রমের পুনরুৎপাদনের অগ্রগতির স্তর প্রতিফলিত

হচ্ছিল। স্বভাবতই বলা যায় যে দেশের শিল্পের ধরন ও স্তর নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এই দিকটি একটি শর্ত হয়েছিল।

(ঘ) রাষ্ট্রের ভূমিকা : আলোচ্য প্রান্তিক দেশগুলির শিল্পোন্নয়ন ও শিল্পের ধরন স্থির করার ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই দেশী পুঁজিপতিশ্রেণীর ভূমিকার চেয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল বেশী গুরুত্বপূর্ণ। একথা ঠিক যে রাষ্ট্র কোন নিরপেক্ষ শক্তি ও ব্যবস্থা নয়। সংশ্লিষ্ট দেশের শাসকশ্রেণী/শ্রেণীগুলি রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব করে। অনুন্নত দেশে পুঁজিবাদ দুর্বল হওয়ায় পুঁজিপতিরাও শ্রেণী হিসাবে দুর্বল। তাছাড়া, আলোচ্য অধিকাংশ দেশে সামন্ত, আধা-সামন্তশ্রেণী, সামরিক ও আমলাবাহিনী সম্মিলিতভাবে শাসকশ্রেণী হিসাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কোন কোন দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারাও। ফলে, এই ধরনের কিছু দেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। পূর্বোক্ত মাপকাঠি দু'টি এবং তিনটি উপাদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রশক্তির সদিচ্ছা, আন্তরিকতা, পরিকল্পনা, সহযোগিতা, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান পুঁজিবাদী শিল্পোন্নয়নে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

এবারে, আলোচ্য প্রান্তিক দেশগুলির শিল্পায়নের ধরনগুলি কিছুটা লক্ষ্য করা যাক :

(ক) সিম্পল ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তথা আমদানির বিকল্প সাধারণ ধরনের শিল্পায়ন : তৃতীয় দুনিয়ার আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে উন্নয়নের নিম্নস্তরে অবস্থানকারীদের পক্ষ থেকে এই রণনীতি গ্রহণের উদ্যোগ গড়ে উঠেছিল। এই ধরনের শিল্পায়নের চারিত্রিক দিকটি ছিল, অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য অ-টেকসই ভোগ্যপণ্যের (নন-ড্যুরেবল কনজিউমার গুড্স) এবং আধা-নির্মিত হাল্কা সামগ্রীর উৎপাদন। বিশ্ব-বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে এই উৎপাদনকে নানাভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। পুঁজির যোগান আসছিল কৃষি-ক্ষেত্রের উদ্বৃত্তের পাশাপাশি বিদেশী পুঁজি-লগ্নীর মাধ্যমে। যেসব দেশ এই পথ গ্রহণ করছিল তাদের সামনে দু'টি প্রধান বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল। প্রথমত, কোন দেশের আমদানির প্রয়োজনীয়তা, চরিত্র ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় অভ্যন্তরীণ শিল্প-ক্ষেত্রের গতিশীলতার মাত্রার ওপর। পাশাপাশি আমদানি করার ক্ষমতা নির্ভর করে কৃষি ও কাঁচামাল রপ্তানি করে বিদেশী অর্থ উপার্জনের ক্ষমতার উপর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রপ্তানির পরিমাণ কমে যাওয়া বা বাণিজ্যের শর্তে অবনতি ঘটলে এই ধরনের শিল্পায়নের সামনে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথমদিকে এই শিল্পায়নে সুফল পাওয়া গেলেও, আশির দশকের শুরু থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে যথেষ্ট মন্দা সৃষ্টি হচ্ছিল। আশির দশকের শেষ থেকে আবার উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, দেশগুলির উন্নতির স্তর যথোপযুক্ত না হওয়ায়, অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদাতে মন্দাও শিল্পায়নের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল মাঝে মাঝে। তাছাড়া, এই ধরনের শিল্পায়নের প্রক্রিয়া মূলধন-শ্রমের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় অস্থিরতা সৃষ্টি করে থাকে এবং এইসব দেশে তা' ঘটছিল। কেননা, এই ধরনের শিল্পায়নের দুর্বল প্রভাব রয়েছে মূলধন ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

(খ) অ্যাডভান্সড ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তথা আমদানির বিকল্প উন্নত শিল্পায়ন এই ধরনের শিল্পায়নকে এক অর্থে সাধারণ ধরনের আমদানির বিকল্প শিল্পায়ন রণনীতির সামনে উদ্ভূত পূর্বোক্ত সীমাবদ্ধতা ও সমস্যাগুলির সমাধানের এক মডেল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই আদলের শিল্পোন্নয়নে টেকসই ভোগ্যপণ্য (ড্যুরেবল কনজিউমার গুড্স) ও সহযোগী শিল্পে উৎপাদন করে পুঁজির সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ার অভিমুখকে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী করা হচ্ছিল। এই উৎপাদন-প্রণালীকে ক্রমশ সম্প্রসারিত করে তাতে যুক্ত করা হতে থাকে ক্যাপিটাল গুড্স সেক্টর ও আধা-নির্মিত মৌল পণ্যকে। তবে এই রণনীতিতে কারিগরী জ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছিল, বিশেষত বহুজাতিক সংস্থাগুলি থেকে। এই রণনীতি গ্রহণকারী দেশগুলিতে, কিছুটা কৃত্রিম ও সীমাবদ্ধভাবে হলেও, ব্যবস্থা করা হচ্ছিল বাজারে চাহিদা সৃষ্টির। এটা সংঘটিত হচ্ছিল মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে আয়ের ঘনীভবন, উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য ক্রয়ক্ষমতা-সম্পন্ন সামাজিক স্তরের গঠন ও দক্ষ শ্রমিক অংশ সৃষ্টি এবং ক্রেতাকে ঋণের সুবিধা দিয়ে।

এই ধরনের শিল্পোন্নয়নে, উৎপাদনের স্তরে, মেকানাইজেশন/অটোমেশনের (উচ্চ পুঁজি-নিবিড়) সাহায্যে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন করে শ্রমের একক (ইউনিট) খরচ কমানো হচ্ছিল। এইভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে, শ্রমের ওপর মূলধনের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে (প্রোডাকশন-প্রসেস) রাখা হচ্ছিল ধারাবাহিক ও মসৃণ। বিনিময় সম্পর্কের দিকটি মাথায় রেখে শ্রমের মজুরি এমন নিম্নস্তরে নামানো হয়নি, যাতে শ্রমিকের পক্ষে টেকসই ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষমতার হানি ঘটে। তাছাড়া শ্রমিককে তুলনামূলক উচ্চ মজুরি দিয়ে বিদ্যমান কর্মপ্রণালীতে তাদের অভ্যস্ত করে তোলার করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল। রাষ্ট্রকেও এ বিষয়ে নজর রাখতে দেখা গেছে। শিল্পোন্নয়নের জন্য গৃহীত রণনীতি যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং সেক্ষেত্রে শ্রম-সম্পর্ক যাতে স্বাভাবিক থাকে, তদনুযায়ী ভূমিকা নিচ্ছিল দেশের রাষ্ট্র।

(গ) সিম্পল এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তথা রপ্তানি-ভিত্তিক সাধারণ শিল্পায়ন এই ধরনের শিল্পোন্নয়নের রণনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তৃতীয় দুনিয়ার সেই সমস্ত দেশগুলিতে যেখানে অভ্যন্তরীণ বাজার ও চাহিদা স্বল্প এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সীমাবদ্ধ। এই ধরনের শিল্পায়নের রণনীতি উৎপাদিত শিল্প-সামগ্রী দেশের বাইরে রপ্তানি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে থাকে। আমদানির বিকল্প দেশে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে আমদানি করার বাধ্যতা অনেকটা কাটানো হচ্ছিল। কৃষি-পণ্য বিদেশে রপ্তানির দ্বারা অংশত সমাধান করা হচ্ছিল বিদেশী মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে ওঠা-নামার সমস্যাও। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ চাহিদার সীমাবদ্ধতাকে সমাধান করা হচ্ছিল দেশীয় উৎপাদনকে দেশ-বহির্ভূত চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে তুলে। এই ধরনের উৎপাদনে, উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীগুলি প্রায় একই ধরনের হয়, যা উৎপাদন করা হয় সাধারণ আমদানির বিকল্প হিসাবে। অধিকন্তু, পণ্যের বাজারের বিশ্বময় বিভাজনের দিকে লক্ষ্য রেখে দেশে কোন পণ্য রপ্তানির জন্য উৎপাদন করা হবে তা' স্থির করা হচ্ছিল। উৎপাদনে গৃহীত হচ্ছিল শ্রম-নিবিড় ব্যবস্থা।

অন্যান্য তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য, এই রণনীতিতে উৎপাদনের স্তরে শ্রমের এককের খরচ অত্যন্ত নীচে রাখা হচ্ছিল। কিন্তু এর ফলে সম্ভব হচ্ছিল না উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন করা। এটা করা হচ্ছিল দ্বিগুণ শ্রম-শক্তি নিংড়ে নিয়ে;অর্থাৎ শ্রমিকের কাজের গতিকে এবং কাজের সময়কে বাড়িয়ে দিয়ে। শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা হচ্ছিল প্রধানত এই লক্ষ্য ও ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য। কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণে, দেশ ভেদে পার্থক্য ঘটলেও, উচ্চ উৎপাদনশীলতার স্বার্থে একঘেয়ে কাজ থেকে শ্রমিককে বিরত রেখে চালু করা হচ্ছিল পালা (শিফ্‌ট) প্রথা। এটাও শ্রমের উপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। শ্রমের মজুরি যেমন নিম্নস্তরে রাখা হচ্ছিল, অন্যদিকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল অপ্রত্যক্ষ সমস্ত ধরনের মজুরি (ওভারটাইম, নাইট শিফ্‌ট ভাতা ইত্যাদি)। শ্রমের পুনরুৎপাদনের প্রসঙ্গে শ্রমিকের পরিবারের মানুষদের নানাভাবে শ্রমে যুক্ত করে নেওয়ার ব্যবস্থাও এই ধরনের উন্নয়নে হয়ে উঠছিল অন্যতম অংশ।

এই ধরনের শিল্পোন্নয়নে শ্রমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শ্রমবাহিনী থেকে তাদেরই সংগ্রহ করা হচ্ছিল যাদের দ্রুত ও সহজে প্রশিক্ষণ দিয়ে সাধারণ কাজে নিয়োগ করা যায়। একঘেয়ে, পুনরাবৃত্তিমূলক ও নিস্তরঙ্গ শ্রম-প্রক্রিয়ার জন্য শ্রমিক হিসাবে যুবক ও নারীদের চাহিদা বাড়ছিল।

(ঘ) অ্যাডভান্সড এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তথা রপ্তানি-ধর্মী উন্নত শিল্পায়ন এই রণনীতিতে নতুন ধরনের পণ্যের জন্য দেশীয় উৎপাদনের পুনর্গঠন করা হয়। নতুন ধরনের পণ্যের রূপ স্থির করতে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হচ্ছিল এবং উৎপাদন হয়ে উঠছিল উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞান-নিবিড় (যেমন মেশিন টুলস, ইনডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিকস্‌ ও কমপিউটার ইত্যাদির ব্যবহার)। পরম্পরাগত রপ্তানিমুখীন শ্রম-নিবিড় শিল্পকে (যেমন পরিচ্ছদ ও বস্ত্র) সংকুচিত করা হচ্ছিল এবং র‍্যাশনালাইজেশন ও অটোমেশন ব্যবস্থার দ্বারা ভেঙে ফেলা হচ্ছিল শ্রম-নিবিড়তাকে। সত্তর দশকের শেষার্ধে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার মন্দা এবং অগ্রসর সহ বহু দেশ কর্তৃক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ

করার ফলে সিম্পল এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের সামনে গভীর সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায়, অধিক প্রযুক্তি-নির্ভর 'অ্যাডভান্সড' এই ব্যবস্থা দেশগুলি গ্রহণ করতে শুরু করে।

এই চার ধরনের শিল্পোন্নয়নের দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক দেশগুলির অগ্রগতির চিত্র এবারে কিছুটা লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমে শিল্পোন্নত দেশগুলির সাথে তুলনামূলক অবস্থান দেখা যাক।

শিল্প-উৎপাদনের ইনডেক্স নাম্বার (১৯৭৫ = ১০০)

শিল্পের শাখা	উন্নত বাজার অর্থনীতি		উন্নয়নশীল প্রান্তিক দেশগুলির অর্থনীতি	
	১৯৭০	১৯৮০	১৯৭০	১৯৮০
ম্যানুফ্যাকচারিং	৯০	১২২	৬৯	১৩৪
হাল্কা ঐ	৯১	১১৬	৭৭	১২৭
ভারী ঐ	৯০	১২৫	৬৫	১৪০
ফুড অ্যাণ্ড বিভারেজ	৮৬	১১৬	৭৯	১৩৮
টেক্সটাইলস	৯৬	১০৯	৮০	১১১
ক্লোদিং	৯৫	১০২	৭০	১১৩
উড্ প্রোডাক্টস	৯২	১০২	৭০	১১৩
পেপার অ্যাণ্ড পাবলিশিং	৯৭	১২৬	৬৬	১৩২
কেমিক্যাল, পেট্রোলিয়াম অ্যাণ্ড প্লাস্টিক প্রোডাক্টস	৮৫	১২৮	৬৮	১৩৪
নন-মেটালিক মিনারাল প্রোডাক্টস	৯২	১২১	৬৯	১৪৩
বেসিক মেটাল ইনডাস্ট্রি	১০২	১১৩	৭৫	১৫০
মেটাল প্রোডাক্টস	৮৮	১৪২	৫৫	১৪১
ইলেকট্রিক্যাল মেশিনারি	৮৫	১৪২	৫২	১৩৪
ট্রান্সপোর্ট ইকুইপমেন্ট	৮৬	১১৮	৫৩	১৩৪
মাইনিং	৯৭	১২৫	৯০	১১০

পূর্বোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে যে শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে নতুন উন্নয়নের পথ গ্রহণকারী তৃতীয় দুনিয়ার সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ক্ষেত্রে শিল্প-উৎপাদনের গতি অনেক বেশী ছিল। অন্যদিকে পরবর্তী পরিসংখ্যানে দেখা যাবে যে উন্নত দেশগুলিতে শিল্প-শ্রমিকের হার যখন কমে যাচ্ছিল, তখন নতুন শিল্পোন্নয়নের পথ গ্রহণকারী উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তা' প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বাড়ছিল।

শিল্পগত শ্রম-নিয়োগের ইনডেক্স নাম্বার (১৯৭৫ = ১০০)

শিল্পের শাখা	উন্নত বাজার অর্থনীতি		উন্নয়নশীল প্রান্তিক দেশগুলির অর্থনীতি	
	১৯৭০	১৯৮০	১৯৭০	১৯৮০
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০৩	৯৯	৭৩	১২২
হাল্কা ঐ	১০৪	৯৬	৭৪	১২৩
ভারী ঐ	১০২	১০১	৭০	১২১
ফুড অ্যাণ্ড বিভারেজ	১০১	১০০	৭৪	১২৫
টেক্সটাইলস	১১৬	৮৪	৭৭	১০৯
ক্লোদিং	৯২	১০৯	১০০	৯৬
উড্ প্রোডাক্টস	৯৪	১১৬	১০৮	১১৬
পেপার অ্যাণ্ড পাবলিশিং	৯৫	১২১	১১৪	১১২

কেমিক্যাল, পেট্রোলিয়াম অ্যাণ্ড প্লাস্টিক প্রোডাক্টস	৮৬	১২৯	১১৫	১০৬
নন-মেটালিক মিনারাল প্রোডাক্টস	৯১	১২৩	৯০	১০৪
বেসিক মেটালস	৯৬	১২৭	১২৬	১২০
মেটাল প্রোডাক্টস	৮৯	১২০	৮৫	১১৮
মাইনিং	৯৭	১০৫	৯৯	১০৯

এই কালে সর্বাধুনিক যান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শিল্প-শ্রমিক সংখ্যা কমে যাচ্ছিল। অন্যদিকে কিছুটা শ্রম-নিবিড় ও কিছুটা পুঁজি-নিবিড় শিল্প-ব্যবস্থার জন্য অনুন্নত দেশগুলিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল শ্রমিক সংখ্যা। অর্থাৎ উন্নত দেশগুলিতে যখন বেকারী বাড়ছিল, তখন শেষোক্ত দেশগুলিতে বেকারী কিছুটা কমছিল। নতুন উন্নয়নের দ্বারা এইভাবে শেষোক্ত দেশগুলি অর্জন করছিল বাড়তি সুযোগ।

উন্নয়নের এই চেষ্টার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক দেশগুলির শ্রমিকদের গড় মজুরির হারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কতকগুলি দেশের নমুনা এখানে দেখা যাক।

এশিয়ার কয়েকটি দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে ঘন্টায় গড় মজুরির হার		
দেশ	১৯৮৩ (মার্কিন ডলারে)	১৯৭৮-৮৩তে শতাংশ বৃদ্ধি
সিঙ্গাপুর	২.০৫	—
তাইওয়ান	১.৫১	৬০.২
দক্ষিণ কোরিয়া	১.৪৭	৫১.৫
হংকং	১.৩৯	১৮.৭
থাইল্যাণ্ড	১.১৫	—
মালয়েশিয়া	০.৯১	—
ইন্দোনেশিয়া	০.৫০	—
ফিলিপিনস	০.৪৬	১২১.৪

সংশ্লিষ্ট কালের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের আলোচনা প্রায় সর্বক্ষেত্রে এইসব দেশগুলির উন্নয়নের, বিশেষত, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের দিকটাকেই তুলে ধরেছে মাত্র কিন্তু এইসব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রকৃত বাস্তবতার এক বিপরীত মেরুধর্মী প্রতিক্রিয়া। এই উন্নয়নকে নির্ভরশীলতার উন্নয়ন (থিওরি অব ডিপেনডেন্সি) ও ভবিষ্যৎ নেই বলে বামপন্থী একাংশ বুদ্ধিজীবীদের বিপরীতে 'টেক্‌নো-প্রোডাক্টিভিস্ট থিয়োরিস্ট' তথা প্রযুক্তি-উৎপাদনবাদী তাত্ত্বিকরাও এক অন্ধ গলিতে পথ হাতড়াচ্ছিলেন। কেননা, এঁরা উভয়েই উপেক্ষা করেছিলেন উন্নয়নশীল সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জনগণের বিপুল স্বার্থের দিকটি। অথচ জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে শিল্পোন্নয়নে এই সাফল্য এনে বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদের পুনর্জাগরণ

এই শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল দেশগুলির অভ্যন্তরীণ জনগণের মধ্যে, স্বভাবতই, সমভাবে বণ্টিত হয়নি। কেননা, এই উৎপাদন ব্যবস্থা মৌলিকভাবেই ছিল ধনতান্ত্রিক। ধনবৈষম্যের চরম প্রকাশ দেশগুলিতে ঘটেছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পোন্নয়নকামী এই নতুন দেশগুলিতে, বিশেষত লাতিন আমেরিকাতে, যেখানে শিল্প উৎপাদন বিশেষত পুঁজি-নিবিড়, সেখানকার শহরগুলিতে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে। পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে এই চিত্র অবশ্য সামান্য কিছু ভিন্ন। এখানে প্রথমদিকে ভূমি-সংস্কার এবং শ্রম-নিবিড় হাল্কা শিল্পের বিকাশ ও তার ফলে শিল্প-ক্ষেত্রে শ্রম-নিয়োগে উন্নত হার সম্পদের কিছুটা সমবণ্টন ঘটিয়েছিল। যদিও শেষোক্ত দেশগুলিতে নতুন নিযুক্ত শ্রমিকদের সুবিশাল অংশই ছিল যুবক। অবিবাহিতা নারীদের কম মজুরি ও নিম্ন দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রধানত

নিয়োগ ঘটেছিল। শ্রমের পরিবেশ ছিল দারুণ কঠোর এবং দমনমূলক শৃঙ্খলার মধ্যে তাদের কাজ করতে হতো। দারুণ চাপ ও ধকলের শ্রম হওয়া সত্ত্বেও, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা এসব দেশে ছিল অতি নিম্ন মানের।

তদুপরি, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্তরে রাষ্ট্রশক্তির প্রবল দাপট সবসময় প্রতিফলিত হচ্ছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উপর ভয়ানক দমন-পীড়ন এবং মানব-অধিকার লঙ্ঘন করার ঘটনাবলীতে। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য ছিল চিলি, আর্জেন্টিনা ও দক্ষিণ কোরিয়া। অধিকাংশ দেশে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল শিল্প-শ্রমিকবাহিনী। স্বভাবতই এই কাল-পর্বে, সংশ্লিষ্ট লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে রাজনৈতিক সচেতন শ্রমিকশ্রেণী প্রবল সংঘর্ষ করেছিল স্বৈরতান্ত্রিক বা সামরিক জুন্টার সরকারের সাথে। শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গীপনা বন্ধ করতে ভয়ঙ্কর ধরনের দমন-পীড়ন এবং ইউনিয়ন ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্র বা মালিক পৃষ্ঠপোষিত ইউনিয়ন চাপিয়ে দেওয়া হতো। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য শ্রমিকদের মজুরি সর্বনিম্ন স্তরে রাখতে অনেক সময়ে একই পথ নিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি। অনুরূপ দেশগুলিতে ধর্মঘট বেআইনী করা হচ্ছিল এবং শাসকদলের ছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি দেওয়া হতো না।

সুতরাং তথাকথিত নতুন ধরনের উন্নয়ন প্রয়াস চললেও শোষণ, শাসন ও দমনের চরিত্রে কোন পরিবর্তন এসব দেশে ঘটেনি, বরং নতুন ধাঁচের উন্নয়নে পুরোনো ধাঁচের দমন চলছিল অব্যাহতভাবে।

বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ইতিহাসে, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন-আমেরিকার সদ্য স্বাধীন ও পশ্চাৎপদ দেশগুলির পূর্বোক্ত একাংশের অর্থনৈতিক এই উত্থান এক ঐতিহাসিক ঘটনা। দৃষ্টি ও গুরুত্ব প্রদানের অনেকটাই আগোচরে প্রান্তিক এইসব দেশের বিশ্ব আর্থনীতিক আসরে স্থান করে নেওয়ার ঘটনা সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল। বামপন্থী সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই সমকালে এই ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। এমনকি উন্নত পুঁজিবাদও আন্দাজ করতে পারেনি যে তাদের উপর অনেকাংশ নির্ভরশীল ঐ অর্থনীতির নতুন বিকাশের চেষ্টা পরবর্তীকালে তাদের অর্থনীতির সামনে কিছুটা চ্যালেঞ্জ আকারে উপস্থিত হবে। তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমর্থনপুষ্ট তৃতীয় দুনিয়ার তথাকথিত মিশ্র-অর্থনীতির দেশগুলির সামনেও আলোচ্য দেশগুলির প্রয়াস এক ধরনের চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করছিল; তা' কেবল অর্থনৈতিক নয়, মতাদর্শগত স্তরেও। ঐসব দেশের তুলনায় বহুদূর পেছনে পড়ে যাচ্ছিল মিশ্র অর্থনীতির দেশগুলি। কেননা দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ অনেকটা অবিশ্বাস্য দ্রুততায় অগ্রগতি ঘটায়। পুঁজিবাদ যে অন্তঃশক্তিশূন্য হয়ে পড়েনি, তার অন্যতম প্রমাণ দিচ্ছিল এইসব দেশের অগ্রগতি। একদা নির্ভরশীল পরিস্থিতিতে বিকশিত হওয়ার উদ্যোগ নিয়ে এইসব দেশগুলি নিজেরা যেমন অনেকটা স্থিতিশীল হতে থাকে, পাশাপাশি তৈরি করতে থাকে তৃতীয় দুনিয়ার অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলিকে তাদের উপর কিছুটা নির্ভরশীল করার পরিস্থিতি। উন্নত দেশগুলির তুলনায় যথেষ্ট কম হলেও তৃতীয় দুনিয়ার অন্যান্য অনুন্নত দেশে পুঁজি লগ্নী করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানির তুল্যমূল্যে ক্রমবর্ধমান লাভ অর্জন, বহুজাতিক সংস্থাগুলির তালিকাতে নিজেদের দেশ থেকে বর্ধিত সংখ্যায় সংযোজন, অন্যান্য অনুন্নত দেশে প্রযুক্তি ও কারিগরী জ্ঞান রপ্তানি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সাফল্য এইসব দেশে একে একে অর্জন করা শুরু করছিল। লক্ষণীয় ঘটনা হলো এই সব দেশের অধিকাংশই জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের শরিক ছিল না, বরং সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ক্রমাগত বিরোধিতা করে গেছে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয়ে নীতিগত প্রশ্নে প্রবল শক্তিশালী ভূমিকা পালন করলেও, জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অধিকাংশ দেশ অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে তেমন সবল করতে পারেনি। অথচ আন্তর্জাতিক স্বার্থের সামান্যতম তোয়াক্কা না করে, জাতীয়তাবাদী একান্ত স্বার্থে, পূর্বোক্ত পথে পুঁজিবাদকে অনেকটাই সুদৃঢ় করছিল আলোচ্য দেশগুলি।

শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজনে কিছুটা নতুন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত

বিশ্ব-পুঁজিবাদের পূর্ববর্ণিত ভূমিকা থেকে একটি বিষয়ে স্বীকৃতি সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল। তাহলো মূলধনের সঞ্চয় ও বিকাশের ক্ষেত্রে নানা ধরনের মূলগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে বিশ্ব ঐতিহাসিক মাত্রায়। এক্ষেত্রে বিশেষত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল সেই সমস্ত উপাদানগুলিতে যেমন, উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণ, বহুজাতিক সংস্থাগুলির নেতৃত্বে পুঁজির অধিকতর ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবন এবং আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে মূলধনের বর্ধিত গতিশীলতার উপর। লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে আন্তর্জাতিক শ্রমের ধ্রুপদী বিভাজন ব্যবস্থা থেকে বিশ্ব-ধনতন্ত্র এক অন্তর্বর্তী স্তরে প্রবেশ করছে। বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে অনুন্নত দেশগুলি অতীতে যুক্ত ছিল নিছক ও প্রধানত খনিজ ও কৃষিজ কাঁচামালের সরবরাহকারী হিসাবে। কিন্তু পরিবর্তনমুখীন নতুন যে ব্যবস্থা দ্বারা পুনর্গঠিত হচ্ছিল বিশ্ব-অর্থনীতি, তাতে তৃতীয় দুনিয়ার কিছু কিছু বিশিষ্ট দেশকে অংশত সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল শিল্পস্থাপনের জন্য, যারা উৎপন্ন করবে বিশ্ব-বাজারে বিক্রয়ের জন্য।

উৎপাদনের বিশ্বায়ন এবং বিশ্ব-বাজারের গঠনের এই নতুন গতি বিশ্ব-শ্রম বাস্তবতাকে যথেষ্ট সচকিত ও শশব্যস্ত করে তুলতে থাকে, কেননা বিশ্বব্যাপী উদ্বৃত্ত জনসংখার ফলে এটা অনুমিত হচ্ছিল যে, শ্রমের দর-কষাকষির ক্ষমতা সংকটজনকভাবে হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

এই কাল-পর্বে মূলধনের আন্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়া গঠন করছিল নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন অব লেবার (এন.আই. ডি. এল.) তথা শ্রমের নতুন আন্তর্জাতিক বিভাজন। এর মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল মূলধনের সেই সমস্ত অঞ্চলে সরে আসার তৎপরতা যেখানে শ্রমের মূল্য সুলভ এবং সেইসব প্রান্তিক দুনিয়ার দেশগুলিতে যেখানে নতুন শিল্পায়ন সংঘটিত হচ্ছে। সমান্তরালে উন্নত পুঁজিবাদী কেন্দ্রে শুরু হয়েছিল বি-শিল্পায়নের প্রক্রিয়া। ফ্রবেল, হেইনরিকস্ ও ক্রেয়ী এই প্রসঙ্গে তাঁদের মূল্যায়নে যে বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন সেগুলির মর্মার্থ ছিল নিম্নরূপ ঃ

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কাল জুড়ে, বিশেষত ষাটের দশক থেকে, বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামো ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল বহুজাতিক সংস্থাগুলির সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব-উৎপাদন ও বিনিময়ের ওপর সেগুলির (বহুজাতিক সংস্থাগুলির) ক্রমাগত কর্তৃত্ব অর্জন করে যাওয়ার ফলে। আর এর কারণে জাতীয় অর্থনীতির উপর সরকারগুলির কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। সেই কর্তৃত্ব চলে যাচ্ছিল বহুজাতিক আর্থিক ঘনীভূত শক্তিগুলি (ট্রান্সন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল কনগ্লোমারেটস) এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির (ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস্) হাতে।

শ্রমের নতুন আন্তর্জাতিক বিভাজন বিষয়ক তাত্ত্বিকরা বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল যে বিকাশ (গ্রোথ), সংযুক্তি (মার্জার) ও অধিগ্রহণ (অ্যাকুইজিশন) ইত্যাদি নানাবিধ তৎপরতার মাধ্যমে বহুজাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট ঘনীভবন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন ভয়ঙ্কর রূপ পাচ্ছে; ফলে, বিশ্ব-বাজার করতলগত হয়ে পড়ছে বহুজাতিক সংস্থার।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বহুজাতিক সংস্থাগুলির (এম. এন. সি.) গতির সাথে গভীর সঙ্গতি রেখে 'মালটিন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল কনগ্লোমারেটস' (এম. এফ. সি.) বা বহুজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানপুঞ্জগুলির দ্রুততম প্রসার ও নিজেদের ভূমিকার মধ্যে সমন্বয়ের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ (ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স, সিকিউরিটিজ ব্রোকিং, ফিউচারস অপারেশনস, ক্রেডিট কার্ড অপারেশনস) সেগুলিকে বিশ্ব-বাজারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত করছিল। ওঠা-নামামূলক বিনিময়ের হার ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির সুযোগে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ ও সম্পদ স্থানান্তর করে বিপুল আর্থিক কারচুপি চালাচ্ছিল এম. এফ. সি. ও এম. এন. সি.গুলি। এই জাতীয় তৎপরতার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে সংস্থাগুলি বিভিন্ন জাতীয় সরকারকে বাধ্য করছিল নানা শর্ত মানতে—বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায়। এম. এন. সি.গুলির দ্বারা তৃতীয় দুনিয়ার উৎপাদনের কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য

চাপ সৃষ্টি ও ব্যবস্থাগ্রহণও এই সময় থেকে লক্ষ্য করা যায়। প্রায় দুই দশক ধরে তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশ আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য অন্যতম প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল 'ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন (আই. এস. আই.) বা আমদানি করার সামগ্রীগুলি স্বদেশে উৎপাদনের জন্য শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়ে। তার পরিবর্তে এই সময় শুরু হয় 'এক্সপোর্ট অরিয়েন্টটেড ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন' (ই. ও. আই.)। অবশ্য অনেকে তখন এই ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন যে উন্নত দুনিয়ার বহুজাতিক সংস্থাগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাকে সর্বব্যাপী ও সুদৃঢ় করার স্বার্থে এই জাতীয় শিল্পোন্নয়ন গ্রহণ করা হয়েছিল। কেননা, এই ব্যবস্থায় জনগণের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ভোগের স্বার্থ আদৌ গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। আসলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এই ধরনের উৎপাদন করাতে প্রলোভিত করা হচ্ছিল দেশগুলিকে। এই তাত্ত্বিকদের মতে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির উৎপাদন ও আর্থনীতিক কাঠামোগত পরিবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক পুঁজির মুনাফার হারকে বৃদ্ধি করা।

পুঁজিবাদী উন্নত ব্যবস্থার মত তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব ও সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। তাই উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন অক্ষুণ্ণ রাখা ও বিকাশের সামনে সৃষ্ট সংকট কাটাতে তাদের নতুন প্রযুক্তি-ব্যবস্থার এবং উৎপাদনে শ্রমের খরচ কমানো তথা শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি নিম্নস্তরে রাখার জন্য প্রথমাবধি চেষ্টা শুরু করতে হয়। এই প্রয়াসের ফলে অতি-উৎপাদনের সংকটও সৃষ্টি হচ্ছিল মাঝে মাঝে। একাংশ এন. আই. ডি. এল. তাত্ত্বিক এমনও মনে করছিলেন যে তৃতীয় দুনিয়ায় এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন-এর ব্যবস্থা, মুনাফার হারকে নামিয়ে এনে ভবিষ্যতে উন্নত দুনিয়ার সংকট সৃষ্টি করবে।

প্রযুক্তিগত অবিশ্বাস্য উন্নতির ফলে বিশ্বব্যাপী মূলধনের প্রসার ও সঞ্চয়ের পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তিত হচ্ছিল। উৎপাদনের বিশ্লিষ্টকরণ ঘটাচ্ছিল এই কারিগরীগত উন্নয়ন এবং বিশ্বে সর্বত্র ছড়িয়ে উৎপাদন করার উৎস ও ক্ষেত্র অর্জনে দিচ্ছিল সহায়তা। আন্তর্জাতিক শ্রমের নতুন বিভাজনের (নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন অব লেবার বা এন. আই. ডি. এল.) প্রক্রিয়ায় শ্রম-নিবিড় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি (বিশেষত পরিচ্ছদ, সূতি বস্ত্র, জুতা-নির্মাণ, ইলেকট্রনিকস্ ইত্যাদি) স্থানান্তরিত হচ্ছিল উন্নত দেশগুলি থেকে অনুন্নত দেশগুলিতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক অগ্রগতি, বিশেষত পরিবহন, তথ্য-ব্যবস্থা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে, ভৌগোলিক এলাকা ও সময়ের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে ফেলতে শুরু করে। বিপুল পরিমাণ ও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এমন ধরনের পণ্যও দ্রুত ও কম খরচে পরিবহনের ব্যবস্থা করে, দূরতম বাজারে সেগুলির প্রবেশকে সহজসাধ্য করছিল আধুনিক প্রযুক্তি। অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রের মধ্যে ঘটাচ্ছিল নিবিড় সমন্বয় ও সংযুক্তি।

উৎপাদন কেন্দ্রের এলাকাগত স্থানান্তর সম্ভব ও সহজসাধ্য হচ্ছিল প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনী ও ব্যবহারের ফলে। নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে সম্ভব হচ্ছিল অদক্ষ বা অর্ধদক্ষ শ্রমিকের দ্বারা উন্নত উৎপাদন। কর্মের বিশ্লিষ্টকরণের ফলে কম খরচের শ্রমের দ্বারা বেশি খরচের শ্রম অপসারণ করা সম্ভব হচ্ছিল। এবং এই পদ্ধতির জন্য শিল্প ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হচ্ছিল উচ্চ-মজুরির দেশ থেকে নিম্ন-মজুরির দেশগুলিতে।

এইভাবে, আঞ্চলিক বা লোকেশনাল 'ফ্লেক্সিবিলিটি' এবং শিল্প-উৎপাদনের বহুজাতিক গতিময়তা যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল ততই অতীতের শিল্পোন্নত ও শিল্পোন্নত-নয়—এই দুই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে বিশ্ব-শ্রম ব্যবস্থার পূর্বের বিভাজন পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। তার পরিবর্তে সৃষ্ট হচ্ছিল নতুন বিশ্ব-শ্রম বাজারের বিভাজন—অতি উচ্চ পরিশীলিত উৎপাদনের (উন্নত কারিগরী, সফ্টওয়ার প্রভৃতি ব্যবহারের দ্বারা) এলাকা/দেশ এবং সর্বজনীনভাবে প্রচলিত মানের প্রযুক্তি ব্যবহারকারী শিল্প উৎপাদনের এলাকা/দেশ। তবে এই নতুন বিভাজন প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরেও সৃষ্টি হচ্ছিল বৈপরীত্যমূলক নতুন উপাদান। দেখা যাচ্ছিল যে তৃতীয় দুনিয়ার নিম্ন মজুরির শ্রমও বহুজাতিক সংস্থার কাছে ক্রমশ ও ক্ষেত্র-বিশেষে অগ্রহণীয় হচ্ছে। কেননা প্রযুক্তির ক্রমাগত উদ্ভাবন, উন্নয়নের ও ব্যবহারের দ্বারা পণ্যের

নিপুণতর রূপ অর্জনে নব নব যন্ত্রাংশজনিত খরচ বাড়ছিল ও প্রয়োজন হচ্ছিল বেশি মূলধনের। প্রযুক্তিগত জটিলতা বৃদ্ধি ও নিপুণতার জন্য কোন কোন ধরনের উৎপন্ন পণ্যের বাড়তি চাহিদা, উৎপাদনকে উচ্চ-মজুরির শিল্পোন্নত দেশের দিকে পুনরায় ফিরতে উদ্যত করছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ঘড়ি, অফিসের জন্য যন্ত্রপাতি, ইস্পাত, অটোমোবাইল প্রভৃতি শিল্পে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল এই নতুন প্রবণতা।

বিপরীতপক্ষে শ্রমের নতুন বিশ্ব-বাজার বিভাজনের দ্বারাও উৎপাদনের বিশ্বায়নের তৎপরতা রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। কেননা, শ্রমের আন্তর্জাতিক নতুন বিভাজনের এই অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হচ্ছিল উদ্বৃত্ত শ্রম। শিল্পোন্নত দেশগুলির উৎপাদনশিল্পের শ্রমের অতীত ঘনীভবন পরিস্থিতি ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছিল পুঁজির ক্রমবর্ধমান গতিময়তার ফলে; অধিকন্তু উন্নত দেশের শ্রমিকদের এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল তৃতীয় দুনিয়া থেকে কর্মের সন্ধানে আগত শ্রমিকদের কাছ থেকে। কেননা, বিশ্ব-অর্থনীতিতে তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনীতি ক্রমবর্ধমানভাবে যুক্ত হওয়ায় সৃষ্ট চাপের ফলে তৃতীয় দুনিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে বাড়চ্ছিল দেশান্তরের প্রবণতা। বহুজাতিক সংস্থা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয় প্রক্রিয়ায়, প্রবল অন্তঃশক্তিসম্পন্ন সীমাহীন এই শ্রমবাহিনীর অবদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছিল অন্যদিকে প্রান্তিক দেশগুলির নতুন শিল্পায়নেও প্রবল সহায়ক হচ্ছিল এই শ্রমশক্তি।

ঐতিহাসিকভাবে তৃতীয় দুনিয়ায় এত নিম্ন মজুরি প্রধানত দু'টি কারণে উদ্ভূত হয়েছিল। উন্নত দুনিয়ার শ্রমিকরা উন্নত মজুরির জন্য আন্দোলন করে ও সংগঠনের দ্বারা সক্ষম হয়েছিল মূলধনের বিপুল উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে কিছুটা ভাগ বসাতে। শ্রমিকদের এই উচ্চ মজুরি মালিকরা পুষিয়ে নিতো মুনাফাকে আরও বাড়িয়ে। এর সাথে যুক্ত ছিল পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক, ব্যাপক ও নব নব অগ্রগতি। পুঁজিবাদ জাতীয়-রাষ্ট্রকে (নেশন-স্টেট) ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে নিজ রাষ্ট্র-সীমানার বাইরে শ্রমের গতিময়তাকে রোধ করতো। এই পথে নিজেই কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করে রেখেছিল এক ধরনের শ্রম-স্বল্পতা। তার ফলে, আন্তর্জাতিক শ্রমের ধ্রুপদী বিভাজনে একটি দেশের অবস্থান এবং দেশটির বিশিষ্ট ধরনের শ্রম-দক্ষতার চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছিল সংশ্লিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাতে। এই ঐতিহাসিক কাল-পর্বে পৃথিবীর বাকি সমস্ত দেশ ছিল সাম্রাজ্যবাদ কবলিত, ফলে তারা ছিল ভয়াবহ পশ্চাৎপদ। তাদের অবস্থা ছিল উন্নত দেশগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। তদুপরি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ মজুরিকে সর্বনিম্ন স্তরে রেখেছিল। দ্বিতীয়ত, উন্নত পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়ার (প্রোডাকশন প্রসেস) বিকাশ ও সারা বিশ্বকে বাজারী-সম্পর্কে যুক্ত করা, ঐতিহাসিকভাবে, পরাধীন দেশের প্রাক্-পুঁজিবাদী পদ্ধতির উৎপাদন ব্যবস্থাকে চূর্ণ অথবা অধীনস্থ করে ফেলছিল। ঐতিহাসিক একটি পর্যায়ে পৌঁছে, এই প্রক্রিয়া (অতীতের মতই) জমি থেকে ক্রমান্বয়ে মানুষকে উৎখাত করছিল (বিশেষত যেখানে যত বেশী পুঁজিবাদী ভূমি-সম্পর্ক গড়ে উঠ ছিল, সেখানে তত বেশী গ্রামীণ মানুষ ভূমিতে প্রবেশাধিকার হারাচ্ছিল); পরবর্তী ঐতিহাসিক স্তরে, এই সমগ্র প্রক্রিয়া, মূলধনকে উৎসাহিত করছিল শেষোক্ত দেশগুলির শ্রমের সামাজিক পুনরুৎপাদনের মূল্যের চেয়েও কম মজুরি দিতে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশের আক্রমণ অনুন্নত দেশগুলিতে বৃহত্তর আকারে নেমে এসেছিল মজুরি স্তরকে আরও নিম্নগামী করার মধ্য দিয়ে।

শ্রমের নতুন আন্তর্জাতিক বিভাজনের উদ্ভব তৃতীয় দুনিয়ার শ্রম-সরবরাহের তিনটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করছিল। প্রথমত, আন্তর্জাতিক পুঁজির সঞ্চয়-কাঠামোর পুনর্গঠন সৃষ্টি করেছিল পরিসীমা (তৃতীয় দুনিয়া) থেকে শ্রমের দেশান্তরের উদ্যোগ। ধ্রুপদী উপনিবেশবাদের কালে জবরদস্তি করে শ্রমিক সংগ্রহ ও উন্নত দেশ বা অন্য কলোনিতে পাঠানোর ব্যবস্থা হতো। তার পরিবর্তে, এই পর্বে, শ্রম-দেশান্তর প্রক্রিয়ার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মূলধনের বিশ্বব্যাপী প্রসারের অনুপাত। একে কেউ কেউ বলেছেন ডি-কলোনাইজেশন বা বি-উপনিবেশবাদী এক ধরনের প্রক্রিয়া। তবে শ্রমের দেশান্তর সব সময়েই 'কোর' বা কেন্দ্রের (উন্নত দেশগুলি) দিকে ধাবিত হচ্ছিল তা'

নয়। মূলধনের বিশ্বময় প্রসারের প্রক্রিয়ায়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ও তদনুযায়ী দেশের গুরুত্বের ভিত্তিতে, সংশ্লিষ্ট ধরনের শ্রমের সংশ্লিষ্ট দেশে দেশান্তর ঘটছিল। এই নতুন দেশান্তর প্রক্রিয়াকে উপনিবেশীকরণের ব্যবস্থা থেকে বি-উপনিবেশীকরণ বলে মনে হলেও, এই প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে নিহিত ছিল এক নতুন ধরনের পুনঃউপনিবেশীকরণের উপাদানও। অতীতের উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে বলপ্রয়োগের দ্বারা দেশান্তরের পরিবর্তে, এই অধ্যায়ে বিশ্বায়িত পুঁজির পরোক্ষ কিন্তু অতীব কার্যকরী অভিঘাত শ্রমের দেশান্তরকে সংঘটিত করছিল। শ্রমের দেশান্তরের ক্ষেত্রে অন্যতম লক্ষণীয় দিক ছিল কেবল কায়িক শ্রম নয়, তৃতীয় দুনিয়া থেকে অতি মূল্যবান মানবিক মূলধনের বিদেশে প্রেরণ—'ব্রেন-ড্রেন' বা মস্তিষ্ক-পাচারের দ্বারা। তবে কায়িক শ্রমের দেশান্তরের সাধারণ চরিত্রে ছিল সেই ধরনের কায়িক শ্রমের দেশান্তর যা আগত দেশের নিজ শ্রমিকদের কাছে কম আকর্ষণীয় অথবা অতীব নিম্ন মজুরির। তবে শ্রমের এই নতুন আন্তর্জাতিক দেশান্তর ব্যাপকভাবে ঘটছিল প্রধানত তৃতীয় দুনিয়ার অভ্যন্তরে। এই ধরনের দেশান্তর বহুজাতিক মূলধনের স্বার্থে খুবই কার্যকরী হচ্ছিল। কেননা, একটি দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রম-বাজারের অভ্যন্তরেও বিদেশাগত এই শ্রমবাহিনী দেশীয় শ্রমিকদের সাথে সুনির্দিষ্ট বিভাজন (আবাসনের ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, মজুরি, অর্থনীতির ক্ষেত্র ও ভাষার দ্বারা) গড়ে দিচ্ছিল। এই বিভাজন ব্যবহার করে দেশীয় শ্রমিকদের দিয়ে পণ্য উৎপাদন করতে শ্রম-ব্যয়ের চেয়ে বিদেশাগতদের দিয়ে কম ব্যয়ে মূলধনের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করা হচ্ছিল। বিদেশাগত শ্রমিকরা সাধারণভাবে অসংগঠিত থাকায় মূলধনের পক্ষে তাদের নিয়ন্ত্রণ করাও সহজসাধ্য হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, দেশান্তরিত শ্রমিকদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পুরুষ হলেও দেশান্তরিত নারী শ্রমিকদের বিশেষত পছন্দ করা হচ্ছিল সুনির্দিষ্ট ধরনের কিছু শিল্পে—যেমন বয়ন, পোষাক-পরিচ্ছদ, ইলেকট্রনিকস সরঞ্জাম অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি। কেননা, এই জাতীয় কাজের জন্য নারীদের সহজাত কর্মনিপুণতা এবং কাজের বিশেষ ধরনের জটিলতায় নারীদের দক্ষতা মূলধনের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী ও লাভজনক হচ্ছিল। অবশ্য যাকে নারীদের সহজাত দক্ষতা বলে প্রচার করা হতো তা' নারীদের লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের কোন প্রতিফলন নয়। নারীরা এগুলি অর্জন করে থাকে গৃহস্থালী কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার ফলে। শিল্পগত প্রয়োজনীয় স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন বা মানককরণ, ক্রমান্বয়ে একই ধরনের কাজ বারবার করে যাওয়া (যদিও এগুলি সবসময় অদক্ষতামূলক কাজ নয়) এবং উচ্চ শ্রম-নিবিড় কাজে নারীরা অধিক একাত্মতা প্রদর্শন করে থাকে। শ্রমের ক্ষেত্রে নারী নিয়োগ মূলধনের পক্ষে সবচাইতে আকর্ষণীয় একারণে যে নারীদের মজুরি, সর্বস্তরের পুরুষদের তুলনায়, প্রায় সর্বত্রই অত্যন্ত কম। অথচ নারীদের কাজের ফলাফল পুরুষদের তুলনায় কম নয়। তদুপরি, নারীদের প্রায় সর্বত্রই যেহেতু লিঙ্গগতভাবে অধীনস্থ রাখা হয়, সেহেতু তাদের দিয়ে ইচ্ছেমত কাজ করানো যায়। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকারা পুরুষদের তুলনায় অসংগঠিত। নারীদের মধ্যে বেকারী ব্যাপক হওয়ায় তাদের সহজেই যেমন নিয়োগের জন্য পাওয়া যায়, আবার সহজেই ছাঁটাই করা যায়। এই কাল-পর্বে থেকে পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ায় যেহেতু ফ্লেক্সিবিলিটি উৎপাদনে ব্যাপকভাবে গৃহীত হচ্ছিল, শ্রমের ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য সেহেতু আদর্শ হয়ে উঠেছিল নারী-শ্রম।

তৃতীয়ত, নতুন প্রণালীর উৎপাদন ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় তৃতীয় দুনিয়ার শ্রম-শক্তিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গভীরতর দারিদ্রায়নের পথে। নতুন বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তীব্রতর শোষণের প্রধানতম ফলাফল ঘটছিল যেহেতু দারিদ্রায়নে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায়, তাই দেখা গেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমগ্র ইতিহাসের তুলনায় এই সময়ে গ্রামাঞ্চল থেকে চাকুরীর সন্ধানে ক্রমপ্রসারমান শহর ও শহরতলীতে মানুষের আগমন প্রবল ব্যাপকতা ও গতি পাচ্ছিল। শহর ও শিল্পাঞ্চলে এই উদ্বৃত্ত শ্রমের এই চাপ, শ্রমজীবীদের ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষিত মজুরি-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছিল। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দারিদ্র্য কবলিত এই মানুষ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমের বাজারে আবির্ভূত হচ্ছিল নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিসাবে। 'আনডার-এমপ্লয়মেন্ট' বা নিম্ন নিয়োগের প্রচলিত উৎপাদন-

প্রণালীর মধ্যে এই শ্রমশক্তি 'ওভার-এমপ্লয়মেন্ট'-এর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করছিল। এই 'ওভার-এমপ্লয়মেন্ট'-এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল বহুধা চরিত্রের শ্রমে, পারিবারিক শ্রমে, দীর্ঘ সময়ের শ্রমে এবং অনিয়ন্ত্রিত শ্রমে। এই ধরনের শ্রমের ব্যবস্থায় বিশেষীকৃত ও ব্যাপকতা অর্জন করছিল কতকগুলি ভিন্নধর্মী কাজ; যেমন রাস্তায় ফেরি করা, বাজারে দোকানি ও বিক্রেতা, গা-মালিশের কাজ, দেহোপজীবিনী, ছোট কারখানার মালিক ও শ্রমিক, সামাজিক দৈনন্দিন কাজের জন্য নানা ধরনের কারিগর, ঝি-চাকরের কাজ ইত্যাদি। এই ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট শ্রমের উদ্বৃত্ত, মূলধনের বৃত্তেই শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়ছিল এবং একই সাথে গ্যারান্টি সৃষ্টি করছিল শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনও।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অসম বিবর্তন যেমন সংঘটিত হচ্ছিল, পাশাপাশি সংযোজন করে যাচ্ছিল আন্তর্জাতিক শ্রম-বাজারের নতুন বিভাজনে বাড়তি উপাদানও। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তৃতীয় দুনিয়ার তুলনামূলক উন্নত দেশগুলির পরিশীলিত শিল্প-উৎপাদনের প্রয়াস সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর অসম বিবর্তন ঘটাচ্ছিল। উন্নত ও অনুন্নত শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল ফারাক। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে শিল্পনিয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন বা অনুপযুক্ত ও গ্রামাঞ্চল থেকে উৎখাত দরিদ্র শ্রমজীবীদের বিশাল বাহিনীর পাশাপাশি গড়ে উঠছিল উত্তরোত্তর সুদক্ষ, শিক্ষিত ও সংগঠিত শ্রমবাহিনী। পূর্ব এশিয়ার 'নিউলি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজিং কান্ট্রিজ'-এর (এন. আই. সি.) শ্রম-নিবিড় শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমের ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতা ও জ্ঞান-নিবিড়তা বাড়ছিল। তার ফলে, শ্রমবাহিনীর মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল নতুন করে স্তরীভবন ও বিভাজন। একাংশ সংখ্যালঘু সুশিক্ষিত ও অধিক দক্ষ শ্রমিক অর্জন করছিল উন্নত মজুরি ও উন্নত শ্রম-পরিবেশ, অন্যদিকে পরম্পরাগত ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের সুবৃহৎ অংশ নিমজ্জিত হচ্ছিল নিম্ন-মজুরি ও নিম্ন-দক্ষতার স্তরে অথবা বাধ্য হচ্ছিল পরিষেবা ক্ষেত্রে চলে যেতে। শ্রমশক্তির ক্রমবর্ধমান এই দ্বিধা-বিভক্তি দ্বিবিধভাবে উভয়ের অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছিল। বিশ্ব-পুঁজিবাদের কাঠামোগত সংস্কারের পরিসরে বৃহত্তম সংখ্যক শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল দক্ষ, সুশিক্ষিত ও উন্নত মজুরির শ্রমিকরা। অন্যদিকে অদক্ষ বিশাল শ্রমবাহিনী বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল নেতৃত্বদায়ী অন্তঃশক্তিসম্পন্ন দক্ষ শ্রমিকদের থেকে। আন্তর্জাতিক মূলধনের প্রসারের স্বার্থে দেশে দেশে উৎপাদনের জন্য, উভয় অংশ থেকেই দেশান্তর ঘটছিল। আগত দেশে উভয় অংশের নিয়োগ হচ্ছিল সংশ্লিষ্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে। এইভাবে, স্বদেশে-বিদেশে শ্রমের নতুন বিভাজন পাচ্ছিল স্থায়ী চরিত্র ও রূপ।

অবশ্য শ্রমের এই নতুন আন্তর্জাতিক বিভাজন কতখানি স্থায়ী চরিত্র নিচ্ছিল তা' বলা শক্ত। কেননা, শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজনের সমস্ত স্তরের সুনির্দিষ্ট স্বরূপ এইকালে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি। অতীত যে বিভাজন ছিল, তা' সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়ে বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছিল। তাছাড়া ৩০-এর দশকের বিশ্ব মহামন্দা ও পুঁজির সঞ্চয়ে প্রবল সংকটের কালে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে আমদানির বিকল্প (ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন) ব্যবস্থা হিসাবে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর এক ধরনের বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল এবং তার ফলে এই দেশগুলি সক্ষম হয়েছিল কিছুটা শিল্প-কাঠামো গঠন করে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বাণিজ্যকে বহুমুখী করে তুলতে। সুতরাং অতীতের সাথে বিচার করলে ষাট ও সত্তরের দশকে প্রান্তিক দেশগুলির শিল্পোন্নয়ন ও বিকাশকে একেবারে নতুন বলে গ্রহণ করা যায় না। তবে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের কাল-পর্বে পশ্চাৎপদ দেশে এই ধরনের অগ্রগতি, নিঃসন্দেহে হয়ে উঠছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, ১৯৬০-৭৮ সালের মধ্যে এই প্রান্তিক দেশগুলি নিজেদের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জি. ডি. পি.) তথা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ইণ্ডাস্ট্রি ও ম্যানুফ্যাকচারিং-এর অংশভাগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছিল। ১৯৬০-৭৫ সালের মধ্যে ৮৫টি অনুরূপ দেশ বিশ্ব-ম্যানুফ্যাকচারিং-এ তাদের অংশ ৬.৯ থেকে ৮.৬ শতাংশে উন্নীত করে। ১৯৬০-৭৯ সালের মধ্যে 'লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ' (এল. ডি. সি.) বা সর্বনিম্ন উন্নত দেশগুলিও বিশ্ব-ম্যানুফ্যাকচারিং-এ বিশ্ববাণিজ্যে তাদের অংশ ৬ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে পরিণত করতে

পেরেছিল, যদিও এই অগ্রগতিতে এলাকায় এলাকায় ঘটেছিল যথেষ্ট বৈষম্য। যেমন লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ৪.৮%, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়াতে ২.৫%, এবং পশ্চিম এশিয়াতে ০.৫%; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তম অগ্রগতি হয়। অবশ্য সমকালে তৃতীয় দুনিয়াতে এমন বহু দেশ ছিল, যেখানে শ্রমের চিরাচরিত বিভাজন বহাল ছিল। ১৯৭৯ সালের বিশ্ব-ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী এক্সপোর্ট-লেড ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের মাধ্যমে অ-ইউরোপীয় যে দেশগুলির অগ্রগতি ঘটে সেগুলির অন্যতম ছিল আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ফিলিপিনস, দক্ষিণ কোরিয়া, নাইজিরিয়া, ইরান, কেনিয়া প্রভৃতি।

তবে ১৯৭০-এর দশকের কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—যেমন তৈল সংকট, প্রান্তিক দেশগুলি থেকে আমদানি করা পণ্যসামগ্রীর উপর উন্নত দেশগুলির নিষেধাজ্ঞা ও সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা, বৈদেশিক ঋণের ব্যাপকতা ইত্যাদি থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে আলোচ্য শিল্পায়নমুখী দেশগুলির অর্থনীতির ভিত্তি আদৌ সুদৃঢ় নয়।

ম্যানুফ্যাকচারিং-এ তৃতীয় দুনিয়ার অবদান বাড়ছিল। তবে একমাত্র এই নিরিখেই দেশগুলির সামাজিক পরিবর্তনের সব দিক বিচার করা যেমন কঠিন, অন্যদিকে বিশ্ব শ্রম-ব্যবস্থার নতুন বিভাজনের সঠিক ব্যাপ্তি ও মাত্রা নির্ণয় করাও দুরূহ। কেননা, তখনও পর্যন্ত তৃতীয় দুনিয়া ছিল প্রধানত কাঁচামালের সরবরাহকারী। ১৯৮০ সালে, তৃতীয় দুনিয়ার ৫৯টি দেশের মধ্যে ৪২টি দেশের রপ্তানির ৭০ ভাগের বেশী ছিল এই সামগ্রী। সুতরাং এই বিচারে বলা যায় যে বিশ্ব-অর্থনীতির সাথে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সম্পর্কের অতীতের সাধারণ বাস্তবতাকে শেষোক্তরা অতিক্রম করতে পারেনি। ফলে শ্রমের আন্তর্জাতিক নতুন বিভাজনের অভ্যন্তরে পুরানো বিভাজনের প্রাধান্যই ছিল বেশী। তাছাড়া বিশ্ব শ্রম-ব্যবস্থার নতুন বিভাজনের অভ্যন্তরে তৃতীয় দুনিয়ার অংশীদারীত্বের সামনে বৃহত্তর সমস্যা ছিল উন্নত দুনিয়ার শিল্পের বাজারে প্রবেশের অতি সীমিত সুযোগ, শিল্প উন্নয়নে পুঁজি বিনিয়োগের অভাব এবং উন্নত প্রযুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রতিবন্ধকতা।

সর্বশেষ দিকগুলি লক্ষ্য করলে এটা বোঝা যায় যে নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের তত্ত্ব সর্বাংশে সঠিক ছিল না। এই তত্ত্ব প্রধানত ব্যর্থ হয়েছিল তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরের ব্যাখ্যা করতে ও সেগুলির মধ্যে যথার্থ পার্থক্য নির্ধারণে। সেগুলি হলো ঃ পুঁজিবাদের বিমূর্ত ব্যাখ্যা, বিশ্ব-অর্থনীতির সঠিক বাস্তব অবস্থার মূল্যায়ন এবং ক্ষমতা ও সম্পদের বিশ্ব-বৈষম্যের অভ্যন্তরে বিশিষ্ট সামাজিক গঠনগুলির ও অভ্যন্তরীণ শ্রেণী শক্তিগুলির অবস্থান। এই তিনটি স্তরে বহুবিধ জটিল ও বৈচিত্রপূর্ণ বিশ্ব-বাস্তবতা বিদ্যমান ছিল। সেই জটিলতা ও বৈচিত্র্যের অন্যতম উপাদান ছিল ঃ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের নতুন অবস্থাটি; তৃতীয় দুনিয়ার সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের পরম্পরার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ও অবিশ্বাস্য ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি; সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাহ্যিক দাপট থাকলেও মতাদর্শ ও অর্থনৈতিক স্তরে তৃতীয় দুনিয়ার ওপর প্রভাব ক্রমাগত কমে যাওয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া; বিভিন্ন দেশের সামাজিক গঠনের ওপর পুঁজিবাদের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অভিঘাত; পুরানো শ্রেণী-উপশ্রেণীগুলির ক্ষয়, পরিবর্তন, বিবর্তন ও নতুন ধরনের শ্রেণী-উপশ্রেণীর আবির্ভাব শ্রেণী-সংগ্রামের স্তর প্রভৃতি। যাই হোক, বিশ্ব-অর্থনীতির পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার প্রভাবে বিশ্ব শ্রম-বাজারে কিছুটা যে পরিবর্তনমুখিনতা সৃষ্টি হচ্ছিল তা' বলাই। এক বাক্যে সমগ্র পরিস্থিতিকে 'নতুন' বলে ঘোষণা করার সময় তখনও সৃষ্টি হয়নি ঠিক, তবে এই পরিবর্তনমুখিনতা উপেক্ষণীয় ছিল না।

'ড্যুয়াল লেবার-মার্কেট' বা দ্বৈত শ্রম-বাজার

বিশ্ব-শ্রম-বাজারের নতুন বিভাজন সম্পর্কে পূর্বোক্ত আলোচনাকে এবারে সামান্য ভিন্ন দিক থেকে লক্ষ্য করা যাক।

অস্পষ্ট ও অনির্ধারিতভাবে হলেও দ্বৈত শ্রম-বাজারের উদ্ভব দীর্ঘকাল পূর্বেই। ষাটের দশকের শেষার্ধ থেকে অর্থনীতিবিদরা প্রথম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে অ-প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক উপ-শ্রম-বাজারের দ্বারা জাতীয় বাজার গঠিত হচ্ছে। দ্বৈত শ্রম-বাজারের মডেলের ভেতরে থাকে 'প্রাইমারি'

বা প্রথম স্তরের এবং 'সেকেণ্ডারি' বা দ্বিতীয় স্তরের শ্রম-বাজার। 'প্রাইমারি লেবার মার্কেট' সেই ধরনের বৃত্তির শ্রমজীবীদের দ্বারা গঠিত যারা উচ্চ মজুরি, সমগ্র চাকুরী জীবনে উত্তরোত্তর অগ্রগতি (অবশ্য কায়িক শ্রমদায়ীদের ক্ষেত্রে ততটা নয়), কর্মে বৃত্তিগত দক্ষতা অর্জন এবং স্থায়ী ও নিরাপদ চাকুরীর সুযোগ-ভোগী। অভ্যন্তরীণ শ্রম-বাজারের প্রায়শই হলো যে একজন শ্রমজীবীর বৃত্তিতে শুরুর নিয়োগ সেখান থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলি অভ্যন্তরীণ শ্রমের বাজার থেকে প্রায় সর্বনিম্ন স্তরের কর্মী প্রথমে সংগ্রহ ও নিয়োগ করে এবং তাদের কাজে দক্ষ করে উর্ধতম পদে উন্নত করে। অন্যদিকে 'সেকেণ্ডারি লেবার-মার্কেট' সেই ধরনের শ্রমবাহিনীর দ্বারা গঠিত যাদের মজুরি নিম্ন স্তরের, চাকুরীতে অগ্রগতির বা দক্ষতা অর্জনের সুযোগ কম এবং বৃত্তিগত অবস্থা অস্থায়ী ও অনিশ্চিত। প্রথমদিকে দেখা গেছে যে দ্বৈত শ্রম-বাজার গড়ে উঠেছিল দ্বৈত অর্থনীতির অনুষঙ্গ হিসাবে। 'কোর' ফার্মগুলি বা যন্ত্রব্যবস্থায় উন্নত বৃহদায়তন শিল্পগুলির জন্য প্রয়োজন হচ্ছিল 'প্রাইমারি লেবার-মার্কেট', আর পেরিফেরি ফার্মগুলি বা প্রান্তিক শিল্পগুলির চাহিদা পূরণ হচ্ছিল সেকেণ্ডারি লেবার-মার্কেট থেকে। অবশ্য এইভাবে সুনির্দিষ্ট বিভাজন বাস্তবে ছিল না। কেননা 'কোর' ফার্মগুলির একই সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের শ্রম-বাজারের দরকার পড়ে। সত্তরের দশক পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে দ্বৈত শ্রমের বাজার যথেষ্ট উন্নত ও স্থিরীকৃত ছিল, সেখানে কয়েক ধরনের শ্রমিক যেকোন একটি বাজারের সুযোগ পেতো। এদের ক্ষেত্রে প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারির পূর্বোক্ত সংজ্ঞা সবটা কার্যকরী ছিল না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে সংখ্যালঘু জাতি ও নারীরা, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, 'সেকেণ্ডারি লেবার-মার্কেট' থেকে দ্বিতীয় স্তরের কাজের জন্য সংগৃহীত হতো, অন্যদিকে শ্বেত-পুরুষরা প্রাধান্য পেতো প্রথম স্তরের কাজের জন্য।

পি. বি. ডোয়েরিংগার ও এম. জে. পিয়োরি (ইন্টারনাল লেবার মার্কেটস অ্যাণ্ড ম্যানপাওয়ার অ্যানালিসিস, ১৯৭১) শ্রমের বাজারের দ্বৈততার কারণ হিসাবে প্রযুক্তিগত দিকটিকে প্রধান উপাদান হিসাবে দেখালেন। এঁরা বললেন যে কারখানার চরিত্র অনুযায়ী আধুনিক ও অগ্রসর প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রয়োজন দক্ষ ও সংহত শ্রম-বাহিনী। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই শ্রম-শক্তিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, উচ্চ বেতন, চাকুরীর উন্নতির সুযোগ ও ভাল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কাজে আত্মগত করানো হয়। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সমস্ত ধরনের কর্মের জন্য প্রযুক্তিগত চাহিদা সমান ও সর্বক্ষণের নয়। তাই প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি লেবার মার্কেটের মিশ্রণে প্রতিষ্ঠানকে কাজ চালাতে হয়। প্রযুক্তির নিয়োগের প্রশ্নে নারী ও সংখ্যালঘু জাতির শ্রমিকদের নতুনত্বহীন (স্টিরিওটাইপড) দক্ষতার ক্ষেত্রগুলি বিবেচনা করা হয়; কেননা, তারা নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধি-নির্ভর কাজের অনুপযুক্ত। সেকারণে তাদের প্রতি বৈষম্য থাকে ও উন্নত কর্মের সুযোগ দেওয়া হয় না। ঘন ঘন বৃত্তির পরিবর্তন ও কাজে অনুপস্থিতির জন্যও এদের প্রতি পূর্বোক্ত মনোভাব গড়ে উঠেছে মালিকদের। ডোয়েরিংগার ও পিয়োরির শেষোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে অপরাংশ সমাজতাত্ত্বিকদের মন্তব্য ছিল যে 'সেকেণ্ডারি লেবার মার্কেটে' নিম্ন স্তরের কাজে সুযোগ থাকার ফলেই শ্রমিকদের কর্ম-একাত্মতা সৃস্টি হয় না; এটাই আসল বিষয়। সুতরাং পূর্বোক্ত শ্রমিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয় 'সেকেণ্ডারি লেবার মার্কেট'। পরবর্তীকাল থেকে ক্রমশ আরও স্পষ্ট হচ্ছিল যে শ্রমবাহিনীতে নারীদের যোগদানের চরিত্র পাল্টাচ্ছে। কেননা, অতীতে, সারা জীবনে প্রকাশ্য বৃত্তিতে তাদের যুক্ত থাকার মোট সময়ের তুলনায় এইকালে তাদের কাজে লেগে থাকার সময় ক্রমাগত বেড়ে চলছিল; পুরুষদের তুলনায় ঘন ঘন কাজ পরিবর্তন করাও তারা ত্যাগ করছিল। শ্রমবাহিনীতে সুবিধাভোগী অংশ গঠনের জন্য উৎপাদনে যে বাড়তি ব্যয় হচ্ছিল তা' পুষিয়ে নিতে প্রতিষ্ঠানের দরকার পড়ছিল পণ্যের একচেটিয়া ও স্থায়ী বাজার। সত্তর দশক থেকে বহুজাতিক সংস্থাগুলির জন্য এই সুযোগ যখন গড়ে উঠছিল তখন শ্রমের বাজারেও এই ধরনের সুনির্দিষ্টকরণের কাজ শুরু হয়েছিল।

এম. রিচ্., এম. ডি. গর্ডন ও আর. সি. এডওয়ার্ডস (এ থিয়োরি অব লেবার মার্কেট সেগমেন্টেশন, ১৯৭৩) 'ড্যুয়াল' শব্দের পরিবর্তে 'সেগমেন্টেড' বা খণ্ডিকৃত শ্রম-বাজারের তত্ত্ব উত্থাপন করেন।

এঁদের মতে দ্বৈত-র পরিবর্তে বহুস্তরীয় শ্রম-বাজারের সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁরা বললেন যে শ্রমের বাজরের এই খণ্ডিকরণ আসলে ম্যানেজারিয়াল স্ট্র্যাটেজি বা ব্যবস্থাপনার রণনীতির অংশ—শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত করে কর্তৃত্ব চালানোর স্বার্থে। কেননা পুঁজিবাদ একচেটিয়াপনার স্তরে সৃষ্টি করেছে বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান, স্ট্যাণ্ডার্ডাইজড তথা মানকৃত উৎপাদন প্রণালী এবং ক্রাফট্ কাজের দক্ষতাহানি; তার ফলে শ্রমিকশ্রেণী অধিকতর সমপ্রকৃতিসম্পন্ন (হোমোজিনিয়াস) হয়ে উঠছে এবং অর্জন করছে মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ার ক্ষমতা। সেকারণে ব্যবস্থাপনা কৃত্রিমভাবে এই বিভাজন সৃষ্ট করছে এবং সংগঠিত শ্রেণী-সংগ্রাম প্রতিহত করার জন্য একাংশকে সুবিধা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-বাহিনী থেকে বের করে আনার ব্যবস্থা নিচ্ছে। ইতোমধ্যে সৃষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন ও পেশাদারদের সংগঠনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার জন্য বামপন্থী সমাজতাত্ত্বিকদের পূর্বোক্ত বক্তব্য কার্যকালে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি, বরং উল্টোটাই ঘটতে থাকে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন অভ্যন্তরীণ শ্রমের বাজারের বিভাজনকে কার্যত মেনে নেয় এবং পরোক্ষে সহায়তা করতে থাকে। তারা প্রচার করা শুরু করে যে কোম্পানির এই ধরনের নিয়োগ পদ্ধতি সদস্যদের পক্ষে লাভজনক এবং এই পদ্ধতির শ্রমের বাজারে নবাগতদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে কর্মরতদের রক্ষা করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও বামপন্থী অর্থনীতিবিদরা লেবার মার্কেট-এর অভ্যন্তরের উর্ধ্ব ও নিম্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছিলেন। নিম্ন অংশের অন্তর্গত হলো কায়িক শ্রমদায়ী ও নিম্ন স্তরের অফিস কর্মচারী, যারা পরিবর্তনযোগ্য দক্ষতায় পটু নয় এবং স্বভাবতই মালিকদের উপর নির্ভরশীল। আর উর্ধ্বতন অংশের অন্তর্গত হলো ম্যানেজার, প্রফেশনাল ও কিছু দক্ষ কারিগর অংশ, যারা পরিবর্তনযোগ্য দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারে। সুতরাং শেষোক্তরা কোন একক মালিকের কাছে বাধ্য হয়ে যুক্ত থাকে না, বরং তারা নিজেদের উন্নতির সুযোগ বাড়ানোর জন্য এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে বিচরণ করে।

আর. এডওয়ার্ডস (কনটেসটেড টেরেইন, ১৯৭৯), এ. এইচ. এমস্ডেন (ইকনমিকস অব উইমেন অ্যাণ্ড ওয়ার্ক, ১৯৮০), আই. বার্গ (সোসিওলজিকাল পারস্পেকটিভস অব লেবার মার্কেট, ১৯৮১), এবং এম. ডি. গর্ডন, আর. সি. এডওয়ার্ডস, এম. রিচ্ (সেগমেন্টেড ওয়ার্ক, ডিভাইডেড ওয়ার্কস, ১৯৮২) প্রমুখের আলোচনা পূর্বোক্ত ধারাকে অনুসরণ করে আরও অনেকটা এগিয়েছিল। কিন্তু এর পর থেকে আলোচনা অন্য দিকে মোড় নেয়। মধ্য আশির দশক থেকে উন্নত দেশগুলি ছাড়াও, সারা বিশ্বেই উৎপাদনে যে ধরনের নতুন প্রক্রিয়া কম-বেশী ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে, তাতে সমাজতাত্ত্বিকরা 'ড্যুয়াল মার্কেট' বা 'সেগমেন্টেড মার্কেট' সম্পর্কিত প্রতিপাদ্যের কেন্দ্রে স্থাপন করতে শুরু করেন শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা নতুন স্তরীকরণের উপাদানকে। এই স্তরীকরণের স্বরূপের মূল্যায়নে নারী শ্রমজীবীদের অবস্থা, নিয়োগে জাতিগত সংখ্যালঘুদের অবস্থান, কাজের বিশ্লেষণ, শিল্প-সম্পর্ক প্রসঙ্গ যেমন উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে বিশ্লেষিত হতে শুরু করে, পাশাপাশি আলোচনা শুরু হয় অনুন্নত দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ শ্রম-বাজারে অনুরূপ উপাদানগুলি, উন্নত দেশগুলির দ্বৈত শ্রম-বাজারের সাথে অনুন্নত দেশগুলির শ্রমের বাজারের সম্পর্ক, সর্বোপরি অভ্যন্তরীণ বাজারের সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব-শ্রম-বাজারে দ্বৈত চরিত্রের উপস্থিতি সম্পর্কে। প্রথমদিকে উন্নত-অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে শ্রম-বাজারের দ্বৈত চরিত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদের দিকটি সমভাবে প্রতিপন্ন হলেও, 'প্রাইমারি মার্কেট'-এর ধ্রুপদী অস্তিত্ব তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে দেখা যায়নি। কিন্তু এই পরিস্থিতিও টিকে থাকেনি। অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায়, উন্নত দুনিয়ার সাথে মাত্রার দিক থেকে বিপুল হেরফের থাকলেও, অনুন্নত দেশগুলিতে তথাকথিত প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি লেবার-মার্কেটের আবির্ভাব ঘটে যায়। সমাজতাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণের অন্তর্গত হতে থাকে অভ্যন্তরীণ বাজারে মজুরি, চাকুরী জীবনের সুযোগ, দক্ষতা ইত্যাদির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে স্তরীকরণের প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ।

সমকালে বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক-আন্দোলনের পরিস্থিতি

সত্তর ও আশির দশকের বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস একই সাথে উত্থান ও বিজয় অর্জন এবং পতন ও পরাজয়ের ইতিহাস। উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে, সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই একথা সাধারণভাবে সত্য। দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সত্তরের দশকে তীব্রতা ও ব্যাপকতা অর্জন করলেও, ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে যে প্রতিকূলতা গড়ে উঠছিল তা' অনেকটাই উপলব্ধি করতে পারেনি। আশির দশকের শুরুতে আন্দোলনের রেশ বজায় রাখতে গিয়ে এটা শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল যে চোরাবালিতে অনেক কিছুই আটক পড়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দ্বারা অর্জিত মতাদর্শ, শ্রেণী, শ্রেণী-কাঠামো, শ্রেণী-ঐক্য, দাবী-দাওয়ার চরিত্র, মজুরি, বৃত্তির নিরাপত্তা, নিয়োগের সুযোগ, সংগঠন, গণ-সমর্থন, রাজনৈতিক সম্পর্ক, শ্রম-আইন, রাষ্ট্রের ভূমিকা ইত্যাদি উপাদান ও সম্পর্কগুলির পরিস্থিতি এতটাই পাল্টে যাচ্ছিল সেগুলিকে যেন চেনাই যাচ্ছিল না। পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধ থেকে ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা ব্যবহৃত বহু পদ্ধতিও অকার্যকর হয়ে পড়ছিল; শ্রমিকশ্রেণীর কাছে গতানুগতিক বলে প্রতিপন্ন হচ্ছিল অতীত থেকে অব্যাহতভাবে গৃহীত আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ। সব চাইতে বড় বিপর্যয় অনুভূত হতে থাকে পরম্পরাগত শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকায় এবং পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যভুক্তির হার দ্রুত নিম্নগামী হওয়ায়। তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলন অতীতে অতীব দুর্বল থাকলেও, সত্তরের দশক থেকে সেগুলির যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি শুরু হয়েছিল আশির দশকে পৌঁছে সেখানেও ক্রমাবনতি শুরু হয়। পূর্বের রক্ষণাত্মক অবস্থান ভেদ করে রাষ্ট্র, বহুজাতিক সংস্থা ও মালিকশ্রেণী সর্বাত্মক আগ্রাসী ভূমিকা নিতে শুরু করে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। মাত্র দু'টি দশকের ব্যবধানে শ্রমিক-আন্দোলনের সামনে পরিস্থিতির এমন মেরুপ্রমাণ বৈপরীত্য অতীত ইতিহাসে কমই দেখা গেছে। সমগ্র প্রবাহ থেকে যে পরিণাম শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তা' হলো বিপুল বিভ্রান্তি এবং আস্থার সংকট। তা' থেকে কোন কোন দেশে ও ক্ষেত্রে শ্রমিক-আন্দোলনে দেখা দিয়েছিল আকস্মিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও বেপরোয়াপনা। এগুলির যা পরিণাম ঘটার কথা, কার্যকালে তাই ঘটেছিল।

ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার পতন-জনিত বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট এবং অন্যদিকে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রভাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে অদৃষ্টপূর্ব পরিবর্তনের প্রবণতা ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর চরিত্র ও আন্দোলনের সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচীর বিষয়ে গভীর সংকটে ফেলে। তার সাথে 'ইউরো-কমিউনিজম'এর মতাদর্শগত প্রভাব উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির বামপন্থী শ্রমিক-আন্দোলনকে ফেলেছিল বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরো-কমিউনিজমকে প্রকাশ্যে তখন অস্বীকার করেছিল; তার ফলে, বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিশ্ব-কেন্দ্র 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস' (ডব্লু. এফ. টি. ইউ.) স্বীকৃতি দেয়নি ইউরো-কমিউনিজমের দ্বারা প্রভাবান্বিত পশ্চিমী ট্রেড ইউনিয়নগুলির কোন কোন ধরনের তৎপরতাকে। এর মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর কিছুটা বিচ্ছিন্নতাও সৃষ্টি হচ্ছিল। ডব্লু. এফ. টি. ইউ. নিজেও উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ করার পরিবর্তে পূর্ববর্তী ধারণা ও কর্মসূচীর যান্ত্রিক প্রয়োগের স্তরে দাঁড়িয়ে থাকে, সেকারণে নিজ প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির দ্বারাও উপেক্ষিত হতে শুরু করে। ইউরোপীয় বাম ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনে 'ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম', 'নিউ লেফট' প্রভৃতি ধারাও মতাদর্শগত স্তরে এই সময় প্রভাব সৃষ্টি করছিল। চীনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল ডব্লু. এফ. টি. ইউ. থেকে। আন্তর্জাতিক স্তরে চীনের ট্রেড ইউনিয়নের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা না গেলেও, তৃতীয় দুনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ওপর প্রভাব পড়ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমাজতন্ত্রী চীন বা ইউরো-কমিউনিজম'এর কোন না কোন ধারার। ফলে পরোক্ষে প্রভাবিত হচ্ছিল সংশ্লিষ্ট দেশের ট্রেড ইউনিয়নও। সত্তরের দশকে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সংকট তৃতীয় দুনিয়ায় তীব্রভাবে অনুভূত হলেও সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী

বিপ্লব এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা সৃষ্ট সমস্যায় তখনই আক্রান্ত হয়নি শেষোক্ত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী, যদিও বিশ্ব-পুঁজিবাদের নতুন নতুন পদ্ধতি, ঋণ দেবার ব্যবস্থা, সেগুলির শর্তাবলী ও তার ফলে উৎপাদনের পুনর্বিন্যাসে প্রান্তিক দেশগুলি কোণঠাসা হয়ে পড়তে থাকে। সমকালে মতাদর্শগত স্তরে পাশ্চাত্যে যে ঘাত-প্রতিঘাতই থাক না কেন, তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলি চলছিল চিরাচরিত ধারাতেই। তবে উন্নয়নশীল দেশের এক বৃহদাংশ জুড়ে স্বৈরশাসন ব্যবস্থা ও নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক উপাদানকে যুক্ত রাখছিল। বহু দেশেই ট্রেড ইউনিয়ন অবৈধ এবং সংগঠন-আন্দোলনের উপর তীব্র আক্রমণ ও অত্যাচার অব্যাহত থাকায়, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রতিরোধের উপাদানের স্পষ্ট উপস্থিতি এই সময়ে দেখা যায়। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও অধিকারের প্রসঙ্গ আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে এইসব দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে। এসব বিষয়ে ডব্লু. এফ. টি. ইউ. উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক ভূমিকা ও 'সলিডারিটি' তথা সৌভ্রাতৃত্বমূলক কর্মসূচীও চালিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষত এই উপাদানটির জন্য সংস্কারবাদী বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়নগুলি, বিশেষত আই. সি. এফ. টি. ইউ., কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিল তৃতীয় দুনিয়ায়। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রসারে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর ভূমিকা কিছুটা সহায়ক হচ্ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থক না হলে কমিউনিস্ট বা বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নকে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-র স্বীকৃতি না দেওয়া বা অন্তর্ভুক্ত না করায়, তৃতীয় দুনিয়ার বেশ কিছু দেশের বামপন্থী ও জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে ডব্লু. এফ. টি. ইউ. যেমন স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছিল, অন্যদিকে দেশভিত্তিক শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়ে উঠার পথে পরোক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। অনুন্নত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছিল এমনিতেই সব দিক থেকে দুর্বল। তদুপরি ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর এই সংকীর্ণতা, শ্রমিকশ্রেণীর সামনে প্রাপ্ত সুযোগকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, পরোক্ষ প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির সাথে ঘনিষ্ঠ তৃতীয় দুনিয়ার গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে স্বৈরশাসকদের, শ্রমিক-বিরোধী ভূমিকাকে এবং শাসকশ্রেণীর অনুগামী ট্রেড ইউনিয়নকে, কখনো কখনো, ডব্লু. এফ. টি. ইউ. সমর্থন দিয়েছে। এর দ্বারাও ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর ব্যবধান সৃষ্টি হয় কোন কোন দেশের বামপন্থী বা গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে। অন্যদিকে চীনের শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক স্তরে কার্যত তেমন কোন ভূমিকা নেয়নি এই কাল-পর্বে। যেসব দেশের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে তাদের কিছু সম্পর্ক ছিল, বিশেষত আফ্রিকার, সেখানে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির অনৈক্য দূর করতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেনি তারা। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলির আদর্শগত ও সাংগঠনিক গ্রানাইট-সম ঐক্যেও, সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে, চিড় ধরতে থাকে। এর প্রথম আঘাত আসে পোল্যান্ডে—'সলিডারিটি ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন'-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। এই সময়ে, ঐ এলাকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টার প্রভাব পড়তে থাকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের উপর। নেপথ্যে সৃষ্টি হতে থাকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে অনৈক্য। অতীত থেকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে শাসকশ্রেণীগুলির পক্ষে, কমিউনিজমের বিরোধিতায় ও শ্রেণী-আন্দোলনের বিপক্ষে চার্চ ও খ্রীস্টান ট্রেড ইউনিয়নগুলি সফল ভূমিকা নিয়েছিল। সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ও ধীরে ও অতি সন্তর্পণে চার্চের অনুপ্রবেশ ও ভূমিকা বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপর্যয়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল শেষোক্ত উপাদানটি।

পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর ফলে সর্বাগ্রে আক্রান্ত হতে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐক্য। সমস্যা ও সংকটের কারণের প্রতি দৃষ্টি দেবার পরিবর্তে, বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি উপসর্গসমূহ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র প্রক্রিয়া ঊর্ণনাভ চরিত্র গ্রহণ করে। দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎপরতা আবর্তিত হতে থাকে স্ব স্ব দেশের জাতীয়তাবাদী গণ্ডীর অভ্যন্তরে। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি কার্যকালে হয়ে উঠতে থাকে জাতীয়তাবাদী; ট্রেড ইউনিয়নের আন্তর্জাতিকতাবাদ ধীরে ধীরে শূন্যে নেমে যায়।

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস-এর ভূমিকা

এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর চেতনাকে শ্রেণী-চেতনায় রূপান্তরের কাজ যে বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের দ্বারা কিছুটা সম্পন্ন হচ্ছিল, সেই সংগঠন হলো 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্' (ডব্লু. এফ. টি. ইউ.)। আলোচ্য কাল-পর্বের প্রথমদিকে সেই ভূমিকার তেমন কোন ঘাটতি দেখা যায়নি। দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী সংগ্রামের নেতৃত্ব দানে বা সেগুলির সক্রিয় সমর্থনে বারে বারে দাঁড়িয়েছিল এই সংগঠন। এই সময়ে ডব্লু. এফ. টি. ইউ. গঠিত ছিল আফ্রিকার ১৪টি দেশের ১৫টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ২২টি দেশের ২৪টি, এশিয়া ও ওশেনিয়ার ১৬টি দেশের ২২টি, মধ্য-প্রাচ্যের ১২টি দেশের ১৩টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমর্থন এবং শিল্পের শাখাভিত্তিক ১১টি ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল (টি. ইউ. আই.)-এর দ্বারা। ১৯৭৩ সালে এটির সদস্য সংখ্যা ১৯০ মিলিয়ন থেকে ১৯৮২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ২০৬ মিলিয়নে। এটির অন্তর্ভুক্ত ১১টি ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনালের অবস্থা ছিল এই রকম : (১) টি. ইউ. আই. অব এগ্রিকালচারাল, ফরেস্ট্রি অ্যাণ্ড প্ল্যানটেশন ওয়ার্কার্স (এগ্রিকালচার টি. ইউ. আই., সদর দপ্তর—প্রাগ, চেকোশ্লোভাকিয়া) গঠিত ছিল ৬১টি দেশের ৯৮টি সংগঠনের ৬০ মিলিয়ন সদস্যের দ্বারা। (২) টি. ইউ. আই. অব ওয়ার্কার্স ইন ফুড, টোব্যাকো, হোটেল অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ইণ্ডাস্ট্রিজ (ফুড টি. ইউ. আই., সদর দপ্তর—সোফিয়া, বুলগেরিয়া) ৫৪টি দেশের ৯৪টি জাতীয় সংগঠনের ২০ মিলিয়ন সদস্যের দ্বারা গঠিত ছিল। (৩) টি. ইউ. আই. অব কেমিক্যাল, অয়েল অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স (কেমিক্যাল টি. ইউ. আই., সদর দপ্তর—বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি ৫০টি দেশের ১০০টি সংগঠনের ১৩ মিলিয়ন সদস্যের দ্বারা ছিল পুষ্ট। (৪) টি. ইউ. আই. অব ওয়ার্কার্স ইন কমার্স (কমার্স টি. ইউ. আই., কেন্দ্র—প্রাগ, চেকোশ্লোভাকিয়া) সংগঠিত ছিল ৬১টি দেশের ৭০টি জাতীয় সংগঠনের ২০ মিলিয়ন সদস্যের দ্বারা। (৫) টি. ইউ. আই. অব ওয়ার্কার্স অব দা বিল্ডিং, ফুড অ্যাণ্ড বিল্ডিং মেটেরিয়াল ইণ্ডাস্ট্রিজ (বিল্ডিং টি. ইউ. আই., সদর দপ্তর—হেলসিংকি, ফিনল্যাণ্ড)-এর অন্তর্গত ছিল ৫৭টি দেশের ৭৩টি সংগঠনের ১৭ মিলিয়ন সদস্য। (৬) টি. ইউ. আই. অব ফিটার্স ইউনিয়নস্ (এফ. আই. এস. ই. বা ফিস্, সদর দপ্তর—বার্লিন, পূর্ব জার্মানি) গঠিত ছিল ৮২টি দেশের ১২১টি জাতীয় সংগঠনের ২০ মিলিয়ন সদস্যের দ্বারা। (৭) টি. ইউ. আই. অব পাবলিক অ্যাণ্ড অ্যালায়েড এমপ্লয়িজ [পাব্লিক এমপ্লয়িজ টি. ইউ. আই., সদর দপ্তর—বার্লিন, পূর্ব জার্মানি। প্রথমে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন অব পোস্টাল, টেলিফোন অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কার্স (টি. ইউ. আই.-পি.টি.টি.) নামে গঠিত হয়েছিল] ৪৪টি দেশের ১০৪টি জাতীয় সংগঠনের ২৯ মিলিয়ন ওয়ার্কার্স দ্বারা গঠিত ছিল। (৮) টি. ইউ. আই. অব ওয়ার্কার্স ইন দা মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (মেটাল টি. ইউ. আই., সদর দপ্তর—মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন)-র অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪২টি দেশের ৫৮টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের ২২ মিলিয়ন সদস্য। (৯) টি. ইউ. আই. অব এনার্জি ওয়ার্কার্স (এনার্জি টি. ইউ. আই., সদর দপ্তর—ওয়ারশ, পোল্যাণ্ড) ৩৯টি দেশের ৫৫টি জাতীয় সংগঠনের ১৪ মিলিয়ন সদস্যের দ্বারা গঠিত ছিল। (১০) টি. ইউ. আই. অব ওয়ার্কার্স অব টেক্সটাইল, লেদার অ্যান্ড ফার ইণ্ডাস্ট্রি (টেক্সটাইল টি. ইউ. আই., সদর দপ্তর—প্রাগ, চেকোশ্লোভাকিয়া) গঠিত ছিল ৫৮টি দেশের ৭৫টি সংগঠনের ১২ মিলিয়ন সদস্যের দ্বারা। (১১) টি. ইউ. আই অব ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স (ট্রান্সপোর্ট টি. ইউ. আই., কেন্দ্রীয় দপ্তর—বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি) ৭২টি দেশের ১৪৫টি সংগঠনের ১৮ মিলিয়ন সদস্যের দ্বারা গঠিত ছিল। এবং (১২) স্ট্যাণ্ডিং কমিটি অব ট্রেড ইউনিয়নস অব গ্রাফিক ইণ্ডাস্ট্রিজ (সদর দপ্তর—বার্লিন, পূর্ব জার্মানি) গঠিত ছিল ৫৮টি দেশের ৬৫টি জাতীয় সংগঠনের দ্বারা।

এই বিশাল সাংগঠনিক জাল ও সদস্যসংখ্যা স্বয়ং প্রমাণ করে এটির ভূমিকা ও ক্ষমতার প্রসারকে। তথাপি, বলা যায় যে, ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও ছিল প্রবল। দেশ ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যার বিচারে এটির বিস্তৃতিকে বিশাল মনে হলেও, শ্রমিক সদস্য সংখ্যার ৮০ ভাগই ছিল তদানীন্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে (চীন বাদে, কেননা চীনের ট্রেড ইউনিয়ন ৬০-এর দশকেই

ডব্লু. এফ. টি. ইউ. ছেড়ে যায়)। সুতরাং উন্নত ও অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর ভূমিকা ছিল বহুলাংশে সীমিত।

সত্তরের দশকের শুরুতে পুঁজিবাদের প্রবল সংকটকে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর অষ্টম বিশ্ব-কংগ্রেস বিচার করেছিল এই মর্মে : "এটা অন্তবর্তীকালীন বা অঞ্চলে নিবদ্ধ নয়, বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সার্বিক সংকটের এক অধ্যায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেওয়া এই সংকটের মুখে পড়ে একচেটিয়া পুঁজি ও রাষ্ট্র চেষ্টা করছে সংকটকে শ্রমজীবী, বিশেষত মজুরি-ভোগীদের ঘাড়ে চাপাতে।" সমসাময়িক কালে সঠিক বলে এই বক্তব্য প্রতিভাত হয়েছিল। স্বভাবতই বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অংশের শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ভূমিকাও নিয়েছিল। যদিও ঘটনাবলীর পরবর্তী বিকাশ থেকে এটা এখন অনুভূত হচ্ছে যে ঐ বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ সঠিক হলেও প্রথম অংশ সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না। পুঁজিবাদকে দুর্বল ভাবা ছিল এই মূল্যায়নের প্রধান দুর্বলতা। বিশ্লেষণের এই ভ্রান্তির পরিণামে পরবর্তীকালে ভুগতে শুরু করে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন। পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে এই সংগঠনের অন্তর্গত সর্ববৃহৎ দু'টি জাতীয় সংগঠন ছিল—'ইতালিয়ান জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার' (সি. জি. আই. এল.) এবং 'ফ্রেঞ্চ জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার ট্রেড ইউনিয়ন' (সি.জি.টি.)। ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-ভুক্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সদস্য সংগঠনগুলি তখন ইউরো-কমিউনিজমের দ্বারা আক্রান্ত এবং এমন সব ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত যে পাশ্চাত্যের বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে বহুজাতিক সংস্থার বিপদ কার্যত কোন গুরুত্ব দিয়ে আলোচিতই হয়নি। বহুজাতিক সংস্থা সম্পর্কে ডব্লু. এফ. টি. ইউ. প্রাথমিক আলোচনা আগে শুরু করলেও ১৯৭৬ সালে 'কমিশন অন দা অ্যাক্টিভিটিজ অব টি. এন. সি'জ', গঠন করার পূর্ব পর্যন্ত ঘনায়মান বিপদ সম্পর্কে কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি। আশির দশকের শুরুতে ডব্লু. এফ. টি. ইউ. বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিপদ সম্পর্কে প্রথম মনযোগী আলোচনা শুরু করে। তারপর থেকে ডব্লু. এফ. টি. ইউ., বহুজাতিক সংস্থাগুলির শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে জাতীয়স্তরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরামর্শ দেয়। আন্তর্জাতিক স্তরে আই. সি. এফ. টি. ইউ., ডব্লু. সি. এল., ই. টি. ইউ. সি. প্রভৃতি বিশ্ব-সংগঠনগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা (ইউনিটি অ্যাপ্রোচ) গ্রহণের আহ্বানও জানায় ডব্লু. এফ. টি. ইউ.। কিন্তু সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত বিরোধিতার আবহমানকালের মনোভাব থেকে শেষোক্ত কোন সংগঠন সেই ডাকে সাড়া দেয়নি। তাছাড়া বহুজাতিক সংস্থা নিয়ে সক্রিয় উদ্যোগ যথার্থভাবে নেওয়ার আগেই ডব্লু. এফ. টি. ইউ. মতাদর্শ ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বিপন্ন হতে শুরু করেছিল। নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর উপলব্ধিতে ঘাটতিই প্রধান দুর্বলতা বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ব-পুঁজিবাদের সংকট পরিত্রাণে এস. টি. আর. কোন ভূমিকা নিতে পারবে না এবং এস. টি. আর.-এর প্রভাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া প্রভাবিত হবে না—এমন ভয়ঙ্কর ভুল প্রতিপাদ্যকে সংগঠনটি কার্যত হাজির করেছিল।

পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ডব্লু. এফ. টি. ইউ. লাগাতার ভূমিকা নিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ, বর্ণ-বিদ্বেষবাদ, স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং শ্রমিক আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সংহতির পক্ষে।

ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-র অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে স্পেনে ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো-সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে, উরুগুয়েতে সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে, ফরাসী দেশে কল-কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে, দক্ষিণ আফ্রিকায় মজুরি রক্ষা ও উন্নত শ্রম-পরিস্থিতির দাবীতে বিশাল বিশাল সংগ্রাম, ধর্মঘট হয়। ১৯৭৪ সালে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে চলে ধর্মঘটের প্রবাহ, বিশেষত ব্রিটেনে খনি শ্রমিকদের এবং পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালে সরকারী কর্মী ও রাষ্ট্রায়ত্ত শ্রমিকদের আন্দোলন চলে। ১৯৭৫ সালে বলিভিয়ার খনি শ্রমিকদের, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বকে শাস্তি প্রদানের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে স্পেনের শ্রমিকশ্রেণীর, পশ্চিম জার্মানির সরকার কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের

অধিকার হরণের চেষ্টায় পার্লামেন্টে উত্থাপিত 'বারুফস্ভারবোট' আইনের বিরুদ্ধে একটানা ধর্মঘট চলে কর্মচারীদের। অনুরূপভাবে ১৯৭৬ সালে সুবিশাল ধর্মঘট করে স্পেন, বলিভিয়া ও ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী। ১৯৭৭ সালে তুরস্ক ও কলম্বিয়াতে সংঘটিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর উত্তাল আন্দোলন। ১৯৭৮ সালে ডব্লু. এফ. টি. ইউ., আই. সি. এফ. টি. ইউ., ডব্লু. সি. এল. প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংগঠন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদ জানায়। নিকারাগুয়ায় তীব্র ও জঙ্গী আন্দোলন চলে সোমাজো সরকারের অবসানের জন্য। দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট চলে ইরানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খনিতে, ব্রাজিলের ধাতু শিল্পে।

এই সময়কালে ডব্লু. এফ. টি. ইউ. প্রভাবাধীন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অন্যতম কারণে পতন হয় গ্রীস ও পর্তুগালের ফ্যাসিস্ত সরকারের। পর্তুগালের কলোনিগুলির অবসান ঘটে এবং ইথিওপিয়াতে বিপ্লবী আন্দোলনের পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। ভিয়েতনামের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বক্ষণ সংহতি জ্ঞাপন ও সাহায্য প্রসারিত করে ডব্লু. এফ. টি. ইউ. ও সেটির প্রভাবিত বিশ্বের শ্রমিক-কর্মচারীরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত সামরিকভাবে পরাজিত হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মিলন ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

১৯৭৯ সালে ফরাসী জাহাজঘাটার শ্রমিক, ১৯৮০ সালে ব্রিটেনের এবং জার্মানির ইস্পাত শিল্পের শ্রমিক, ১৯৮১ সালে চিলির খনি শ্রমিক, দক্ষিণ কোরিয়ার ধাতু শ্রমিক, দক্ষিণ আফ্রিকার বস্ত্র ও ধাতুর শিল্পের শ্রমিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের লাগাতার ও বিশাল বিশাল ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনগুলি ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-প্রভাবিত না হলেও, এগুলির প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি জানিয়েছিল সংগঠনটি।

এই সমগ্র কাল-পর্ব জুড়ে ডব্লু. এফ. টি. ইউ. প্রতি বছর আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে মে দিবস বিশ্বময় পালন করেছে; ১লা সেপ্টেম্বর তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা রোধ, নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির দাবীতে বিশ্বময় পালন করেছে 'বিশ্ব শান্তি দিবস'—লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল সমাবেশের মাধ্যমে।

এই অগ্রগতির পথে প্রথম ধাক্কা আসে অভ্যন্তর থেকেই। ১৯৮০ সালে পোল্যাণ্ডে প্রতিক্রিয়ার শক্তি সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলে। সমাজতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধেও তারা আন্দোলন ও ধর্মঘট করা শুরু করে। ডব্লু. এফ. টি. ইউ. এবং পোল্যাণ্ডের অনুমোদিত সংগঠন একে প্রতিহত করতে কেবল ব্যর্থই হয়নি, নিজেরাই ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। ক্রমে এই প্রবণতা চেকোস্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশেও কিছুটা ছড়াতে থাকে, যদিও তখনই সেগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। কিন্তু এটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে যে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর মূল কেন্দ্রীয় শক্তিতেই ফাটলের সূত্রপাত ঘটেছে।

পুঁজিবাদপন্থী বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও শ্রমিক-আন্দোলন

পুঁজিবাদের সার্বিক সংকটের ফলে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী এই সময় যেমন জর্জরিত হচ্ছিল, তারা ততোধিক আক্রান্ত হতে শুরু করেছিল বহুজাতিক সংস্থার নতুন শিল্প-বিন্যাস ও শ্রম-কাঠামোর আকস্মিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায়। এমনিতেই দেশগুলির প্রধান ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঐতিহ্যগতভাবে কেবল সংস্কারবাদী ছিল না, ছিল পুঁজিবাদের পরোক্ষ তোষকও। ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার পতনের মধ্য দিয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যাপক ভাবে সৃষ্টি হয় বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, কল-কারখানা বন্ধ, মজুরি হ্রাস প্রভৃতি উপসর্গ। বহুজাতিক সংস্থাগুলি কর্তৃক স্বীয় দেশে উৎপাদন কমানো ও বিদেশে সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠা, তার ফলে স্বদেশে নিয়োগের সুযোগ হ্রাস পাওয়া, বৃত্তির স্থিতিশীলতায় অনিশ্চয়তা, নতুন নতুন ধরনের যন্ত্র-ব্যবস্থার ফলে শ্রম-কাঠামো, শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের মজুরির মধ্যে নতুন তারতম্য সৃষ্টি, জনগণের আয়ে অসমতা ও জীবনমানে নিম্নগামিতা সৃষ্টি, একটি প্রতিষ্ঠানের বহু দেশে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত শ্রমজীবীকে দাবী-দাওয়া অর্জন ও সমস্যার সমাধানে ঐক্যবদ্ধ করার সমস্যা ইত্যাদি ধরনের অপরিচিত পরিস্থিতির

মুখোমুখি হতে থাকে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিশ্বের মোট শিল্প-শক্তির অর্ধেক এবং বাণিজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল বহুজাতিক সংস্থার কর্তৃত্বে। স্বভাবতই সংগঠিত ও শিল্প-শ্রমিকদের ব্যাপক অংশের রুটি-রুজির ভাগ্য জড়িত ছিল বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাথে। সেকারণে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের সমস্যা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল প্রধানত বহুজাতিক সংস্থার পরিমণ্ডলে।

তবে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান বিকাশের এই কাল-পর্বে, সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলিই ভবিষ্যতের প্রবণতা ও আশঙ্কাগুলি থেকে সম্ভাব্য পথ অনুসন্ধানের প্রাথমিক চেষ্টা শুরু করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন 'ইউনাইটেড অটোমোবাইল, এয়ারোস্পেস অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল ইমপ্লিমেন্ট ওয়ার্কার্স'-এর সভাপতি ওয়াল্টার রুথার (১৯৪৪-৭০), ষাটের দশকের শেষার্ধেই বহুজাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা সৃষ্ট শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। অটোমোবাইল শিল্পে যেহেতু সর্বাধিক আধুনিক যন্ত্রব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা ও শ্রম-কাঠামো গঠন এবং বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে উৎপাদন শুরু হয়েছিল, তাই এই শিল্পের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পূর্বোক্ত প্রস্তাব রূপায়িত করার প্রথম প্রয়াস নিয়েছিল ঐ সংগঠনটি।

সত্তরের দশক থেকে, বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকায় পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর সামনে উদ্ভূত বিবিধ সমস্যা প্রসঙ্গে যে প্রধান আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি নানাভাবে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছিল সেগুলির অন্যতম ছিল 'ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস' (আই. সি. এফ. টি. ইউ.), ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন অব লেবার' (ডব্লু. সি. এল.) এবং 'ইউরোপীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন' (ই. টি. ইউ. সি.)।

ব্রাসেলসে সদর-দপ্তরভিত্তিক আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর এই সময়ে ১৪০টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের অনুমোদনসহ ৯৯টি দেশে অস্তিত্ব ছিল এবং মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪২ মিলিয়ন। তাছাড়া ছিল আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকাতে 'রিজিওনাল' বা আঞ্চলিক সাংগঠনিক কেন্দ্র। এম. এন. সি-গুলির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতার জন্য এই সংগঠনের দ্বারা নতুন ও বিশেষভাবে গঠন করা হয়েছিল 'মালটিন্যাশনাল ফ্রন্ট'। বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ভূমিকা নেওয়ার জন্য আই. সি. এফ. টি. ইউ. ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেক্রেটারিয়েটের (আই. টি. এস.) সাথে সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলেছিল 'ওয়ার্কিং পার্টি'। আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর দ্বাদশ কংগ্রেস থেকে (নভেম্বর, ১৯৭৯) বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ, বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রসঙ্গে সরকারগুলির উপর চাপ সৃষ্টি এবং এম. এন. সি.গুলি সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান করা এবং এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়। এম. এন. সি.গুলির বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে যাতে 'কোড অব কণ্ডাক্ট' স্থির করা হয়, সেজন্যও এরা তৎপর ভূমিকা নিয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী যেসব 'ক্রিশ্চিয়ান' বা 'কনফেশনাল' ট্রেড ইউনিয়ন ছিল, সেগুলির আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো 'ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন অব লেবার' (ডব্লু. সি. এল.)। এটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ মিলিয়নের মত। শক্তি কম হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় দুনিয়া ও 'ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি'তে সংগঠনটির প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। 'ইউরোপীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন'-এর (ই. সি. টি. ইউ.) সাথে সংগঠনটি বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে ও দেশান্তরী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে কিছুটা ভূমিকা এই সময়ে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালে পুনর্গঠিত ও প্রসারিত 'ইউরোপীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনে'র (ই. টি. ইউ. সি.) অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশগুলির জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকায় বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে সম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তখনই কোন বড় রকমের ভূমিকা নিতে পারেনি ট্রেড ইউনিয়নগুলি।

পূর্বোক্তগুলির বাইরে আরও কতকগুলি শক্তিশালী পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল। শ্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক ১৬টি 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট' আই. সি.

এফ. টি. ইউ.-এর অন্তর্গত হলেও, সেগুলি কাজ করে স্বাধীনভাবে। এই ১৬টি আই. টি. এস. হলো, 'ইন্টারন্যাশনাল মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন' (আই. এম. এফ.), 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব কেমিক্যাল, এনার্জি অ্যাণ্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (আই. সি. ই. এফ.), ইন্টারন্যাশনাল ফুড অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনস' (আই. ইউ. এফ.), 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন' (আই. টি. এফ.), 'ইন্টারন্যাশনাল টেক্সটাইল, গারমেন্ট অ্যাণ্ড লেদার ওয়ার্কার্স ফেডারেশন' (আই. টি. জি. এল. ডব্লু. এফ.), 'মাইনারস ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন' (এম. আই. এফ.), 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব বিল্ডিং অ্যাণ্ড উড ওয়ার্কার্স' (আই. এফ. ই. ডব্লু. ডব্লু.), 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফ্রি টিচার্স ইউনিয়নস' (আই. এফ. এফ. টি. ইউ.), 'ইন্টারন্যাশনাল গ্রাফিক্যাল অ্যাণ্ড টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ' (এফ. আই. ই. টি.), 'পোস্টাল, টেলিগ্রাফ অ্যাণ্ড টেলিফোন ইন্টারন্যাশনাল' (পি. টি. টি. আই.), 'পাবলিক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল' (পি. এস. আই.), 'ইউনিভার্সাল অ্যালায়েন্স অব ডায়মণ্ড ওয়ার্কার্স' (ইউ. এ. ডি. ডব্লু.), 'ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েট অব এনটারটেনমেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন' (আই. এন. এস. ই. টি. ইউ.), 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব প্ল্যানটেশন, এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স' (আই. এফ. পি. এ. এ. ডব্লু.) এবং 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব পেট্রোলিয়াম অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স' (আই. এফ. পি. সি. ডব্লু.)।

এই ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েটগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি বহুজাতিক সংস্থার শ্রম-বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিল।

বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকার বিরুদ্ধে যেসব দেশভিত্তিক প্রধান প্রধান সংগঠনগুলি ভূমিকা নিয়েছিল, সেগুলির অন্যতম ছিল ব্রিটেনের 'অ্যামালগ্যামেটেড ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিয়ন' (এ. ই. ইউ.), 'ট্রান্সপোর্ট অ্যাণ্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (টি. জি. ডব্লু. ইউ.) ও 'জেনারেল অ্যাণ্ড মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (জি. এম. ডব্লু. ইউ.), জার্মানির আই. জি. মেটাল, ইতালির মেটাল ইউনিয়ন, জাপানের 'কাউন্সিল অব মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন', 'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান মেটাল ইউনিয়নস', ফ্রান্সের 'কনফেডেরেশন ফ্রাঁকাসি ডেমোক্রাটিক ডু ট্রাভেইল' (সি. এফ. ডি. টি.) এবং 'ফোর্স অউরভেইরি' (এফ. ও.), 'আমেরিকান অ্যাণ্ড কানাডিয়ান অটো ওয়ার্কার্স' (ইউ. এ. ডব্লু.), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউনাইটেড স্টীল ওয়ার্কার্স অব আমেরিকা', এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব মেকানিস্ট' প্রভৃতি। বহুজাতিক সংস্থার বিষয়ে শিক্ষিত ও পরিচিত করানোর জন্য ইন্টারন্যাশনাল মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট) পূর্বোক্ত সংগঠনগুলির আনুকূল্যে সারা বিশ্বে বছরে গড়ে ৪০টির মত সভা, সমাবেশ, সম্মেলন, আলোচনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠান করতো। অনেকগুলি বহুজাতিক সংস্থাকে শ্রমিকদের দাবী মেটাতে ও সমস্যার সমাধানে বাধ্য করেছিল সংগঠনটি। 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ফুড অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন'ও দাবী মেটাতে বাধ্য করে নেসলে, ইউনিলিভার, কোকাকোলা প্রভৃতি এম. এন. সি.গুলিকে।

বিভিন্ন দেশের সংস্কারবাদী যেসব ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের সমস্যা ও দাবী-দাওয়ার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় সেগুলির অন্যতম ছিল ইউনাইটেড কিংডমের (ইংলণ্ড) 'ট্রান্সপোর্ট অ্যাণ্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (টি. জি. ডব্লু. ইউ.), 'অ্যামালগ্যামেটেড ইউনিয়ন অব ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কার্স' (এ. ইউ. ই. ডব্লু.) এবং মধ্যবিত্ত শ্রমজীবীদের 'অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্টিফিক টেকনিক্যাল অ্যাণ্ড ম্যানেজারিয়াল স্টাফস' (এ. এস. টি. এম. এস.) ইত্যাদি। জার্মানিতে (তদানীন্তন পশ্চিম জার্মানি) 'জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন'-এর নেতৃত্বে এম. এন. সি. সহ শিল্প-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা' পরিচিত হয়েছিল 'মিটবেস্টিস্মগ' বা শ্রমিক-মালিকদের সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারের আন্দোলন বলে। এই আন্দোলনের প্রভাব পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশেও কম-বেশি পড়েছিল। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি একেই ভিন্ন নামে বলেছিল 'ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ইন ম্যানেজমেন্ট' বা ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ (পরবর্তী কালে আলোচিত হয়েছে)। ইতালিতে 'কনফেডেরাজিওনি ইটালিয়ানা সিণ্ডিকেটি ল্যাভাটোরি' (সি. আই. এস. এল.) 'ফিয়াট' প্রতিষ্ঠানের

বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন চালায়। ফ্রান্সে 'কনফেডেরাজিওনি ফ্রাঁকাসি ডেমোক্রাটি ডু ট্রাভেইল' (সি. এফ. ডি. টি.) ও 'কনফেডেরেশন জেনারেলি ডু ট্রাভেইল-ফোর্স অউরভেরি' (সি. জি. টি. এফ. ও.) স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে কিছু সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়। ছোট দেশ হলেও হল্যাণ্ড হলো অন্যতম শক্তিশালী বহুজাতিক সংস্থাগুলির কেন্দ্রীয় দেশ। স্বভাবতই এম. এন. সি.-সৃষ্ট সমস্যার অন্যতম প্রধান ভুক্তভোগী ছিল সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী। এই পরিস্থিতিতে সেখানকার তিনটি জাতীয় ফেডারেশন—এন. কে. ডি., নেদারল্যাণ্ডস ক্যাথোলিয়েক ভ্যাক্‌ভারবণ্ড ও ক্যাথলিক অরগানাইজেশন—সম্মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছিল 'নেদারল্যাণ্ডস ভেরবণ্ড ভ্যান্ ভ্যাকারেনিগিনগেন' (এন. ভি. ভি.)। পরবর্তীকালে আরও উন্নত চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠে 'ফেডারেটি নেদারল্যাণ্ডসে ভ্যাক্‌বিউয়েগেগিং' (এফ. এন. ভি.)। এই সংগঠন অনেকটা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল এম. এন. সি.গুলির বিরুদ্ধে। কিন্তু অপর শক্তিশালী সংগঠন 'ক্রিস্টেলেজেকি ন্যাশনালে ভ্যাক্‌বারবণ্ড' (সি. এন. ভি.) এম. এন. সি.গুলির সাথে সহযোগিতা করার দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তেমন কোন সাফল্য সেখানে পায়নি। সুইডেনের মধ্যবিত্ত শ্রমজীবীদের ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন—'ল্যাণ্ডসরগা-নাইশনেজ' এবং 'সুইডিশ কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্', সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সরকারের কালে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাথে প্রথমদিকে মুখোমুখি সংঘর্ষ চালালেও, শেষ পর্যন্ত শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের কিছু অধিকার পাওয়ার সুযোগ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো-সরকারের পতনের পর স্পেনে কমিউনিস্টদের প্রভাবিত 'কনফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স কমিশনস্' (সি. সি. ও. ও.) ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। কিন্তু ইউরো-কমিউনিজমের প্রধান প্রবক্তা দেশের কমিউনিস্ট পার্টি হওয়ায় এবং সেটির প্রভাবে ঐ ট্রেড ইউনিয়ন এম. এন. সি.গুলির বিরুদ্ধে তেমন মাথা ঘামায়নি। অথচ ফ্রাঙ্কোর সময়কাল থেকে সেখানে শিল্প ও অর্থনীতিতে অনেকগুলি বিদেশী এম. এন. সি. গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা নিয়েছিল। সি. সি. ও. ও. ছাড়া অপর সংগঠনটি—জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বারে বারে ধর্মঘট করেছে। তবে আন্দোলনে হঠকারিতার ফলে, এম. এন. সি.-র কাছ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন কোন সুবিধা আদায় করতে পারেনি। পর্তুগালে ফ্যাসিস্ত সালাজার সরকার পতনের পর ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামনে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, স্পেনের মত, এখানকার ট্রেড ইউনিয়নগুলিও সেই অবস্থা সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হয়। এই কাল-পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বিশাল বিশাল ও দীর্ঘমেয়াদী ধর্মঘট চলে অটোমোবাইল, অ্যাভিয়েশন, সিনেমা, টেলিফোন প্রভৃতি শিল্পে। 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার—কংগ্রেস অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অরগানাইজেশনস' (এ. এফ. এল.—সি. আই. ও.)-এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির অধিকাংশ শ্রমিক আন্দোলন-ধর্মঘটগুলিতে অংশ নিলেও, এম. এন. সি.গুলি পরিকল্পিতভাবে, আন্দোলনগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী করিয়ে, ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। কানাডার ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়নগুলির অন্তর্গত বা সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। আমেরিকার ধর্মঘটের সময় কানাডাতেও অনুরূপ শিল্পে কিছু কিছু ধর্মঘট হলেও, আমেরিকান শ্রমিকশ্রেণীর ব্যর্থতার ফল তাদের ভোগ করতে হয় একইভাবে। এই সময়ে জাপানের বহুজাতিক সংস্থাগুলির সবে উত্থানের কালপর্ব শুরু হয়েছে। তথাপি, রাষ্ট্রসংঘের তদানীন্তন হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের সর্ববৃহৎ ২১৭টি এম. এন. সি.-র মধ্যে জাপানের ছিল ২৫টি মাত্র। এই সময়ে জাপানের মোট ৫৫ মিলিয়ন শ্রমজীবীর ১২.৫ মিলিয়ন ৩৪ হাজার ইউনিয়নে সংগঠিত ছিল। ঢিলেঢালা অবস্থায় তিনটি প্রধান কনফেডারেশন ছিল এই সময়ে—'সোইহো' (জেনারেল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস অব জাপান), 'ডোমেই' (জাপানীজ কনফেডারেশন অব লেবার) এবং 'সিনসানবেটসু' (ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অরগানাইজেশন)। জাপানের ট্রেড ইউনিয়নগুলি সাধারণভাবেই গোঁড়াপন্থী, সংস্কারবাদী তো বটেই। কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থায় ছোটখাটো আন্দোলন হলেও, জাপানের ট্রেড ইউনিয়ন বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিষয়ে কোন সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও পথ নির্দেশ করার চেষ্টা করেনি।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ভৌগোলিক দিক থেকে ইউরোপের বহু দূরে অবস্থান সত্ত্বেও, বহুজাতিক

সংস্থাগুলির প্রবল প্রভাবের অন্তর্গত ছিল। ফলে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল দেশ দু'টির শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন। দুই দেশই ১৯৮২-৮৪ সালে ব্যাপক মন্দার কবলে পড়েছিল। দুই দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ১১ ও ১৫ শতাংশ এবং বেকারী দশ শতাংশের অধিক। অস্ট্রেলিয়াতে শ্রমিকদের ইউনিয়নভুক্তির হার এই সময়ে ছিল উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন—'অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস (এ. সি. টি. ইউ.)-এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২ মিলিয়ন এবং নিউজিল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় সংগঠন—'নিউজিল্যাণ্ড ফেডারেশন অব লেবার (এন. জেড. এফ. এল.)-এর সদস্য সংখ্যা ৪ লক্ষ। উভয় সংগঠনই ছিল আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর অন্তর্ভুক্ত।

বহুজাতিক সংস্থাগুলির (বিশেষত জাপানী) বিরুদ্ধে অনেকগুলি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় অস্ট্রেলিয়াতে। নিউজিল্যাণ্ডের ট্রেড ইউনিয়নগুলি বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে নানা ধরনের আন্দোলন করলেও ধর্মঘট পর্যায়ের আন্দোলন করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়াতে আশির দশকের শুরুতে 'আরবিট্রেশন অ্যাক্ট'এর সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক কনজারভেটিভ সরকারগুলি ধর্মঘট নিষিদ্ধ করতে শুরু করে। অস্ট্রেলিয়ার ফেডারাল সরকার লেবার দলের হওয়া সত্ত্বেও, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন রুখতে 'শিল্প পুলিশ বাহিনী' গঠনের উদ্যোগ নেয়। আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত তা' তখন বাস্তবায়িত হয়নি।

পাশ্চাত্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির অভ্যন্তরে প্রবণতাসমূহ

সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণী প্রথাগত ও প্রচলিত দাবী-দাওয়া নিয়ে আবর্তিত ছিল। মজুরি ও দৈনিক কাজের ঘন্টা ছিল মূল প্রসঙ্গ। ধীরে ধীরে প্রথাগত দাবীর সীমানা ভেঙে পড়ছিল। দাবীতে অন্তর্গত হচ্ছিল মালিকদের মূলধন বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বন্টনের সাধারণ শর্তাবলী, নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্রের ব্যবহার, ট্রেনিং ইত্যাদি। মালিকশ্রেণীর আক্রমণের চরিত্রের মধ্যে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া এই সময় শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিবাদী আন্দোলনের অন্যতম উপাদান হয়ে উঠছিল। এই আন্দোলনে নতুন উপাদানও সৃষ্টি হয়েছিল—কারখানা দখল করে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদন ও ব্যবসার উদ্যোগ। জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও ছিল এই ধরনের অভিনব আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ১৯৭৩ সালে ফ্রান্সের বিসার্কতে শ্রমিকদের দ্বারা ঘড়ির কারখানা দখল, সম্ভবত, প্রথম ঘটনা ছিল। সংকটের এই সময়কালে শ্রমিকদের দ্বারা শত শত কারখানা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে দখলে রাখার ঘটনা ঘটে পশ্চিম ইউরোপে। ১৯৭৬ সালে ইতালিতে ৮০০ কারখানা, ১৯৭৮ সালে ফ্রান্সে ২০০ কারখানা, সমসাময়িককালে স্পেন, পর্তুগাল, লুক্সেমবার্গ ইত্যাদি দেশে অনুরূপ অজস্র ঘটনা ঘটেছিল। লাতিন আমেরিকার কিছু কিছু দেশেও অনুরূপ নজির রচিত হয়। কোথাও কোথাও চেষ্টা হয়েছিল শ্রমিক সমবায় ব্যবস্থার দ্বারা কারখানা চালু রাখার। কিন্তু সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে, শ্রমিকদের এই ধরনের প্রয়াস, শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই সময়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির মালিকশ্রেণী শিল্পক্ষেত্রে শুরু করে 'প্রোগ্রাম অব র‍্যাশনালাইজেশন' এবং কোথাও 'প্রোগ্রাম অব মডার্নাইজেশন'। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে শ্রমের নির্ঘন্ট কমানো ও সুসংবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে বাড়তি শ্রম-শক্তি শোষণ করা, পরম্পরাগত উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের দক্ষতা অপহরণ, মধ্যস্তরের কর্মীদের ভূমিকা ও কর্তৃত্ব সংকুচিত করা এবং কর্মরত শ্রমিকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে নিম্ন-হারের মজুরিভোগীদের স্তরে বদলি করে দেওয়া হচ্ছিল সরাসরি। এই পরিস্থিতি, অনুরূপ কর্মসূচীর অন্তর্গত কারখানাগুলিতে, আধুনিক প্রযুক্তি-বিরোধী ভূমিকাতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল শ্রমিকদের। শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি নিয়োগের সমস্ত ধরনের প্রয়াসের প্রতিরোধে অবতীর্ণ হচ্ছিল শ্রমিকরা—যাতে নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্র-সামগ্রী কারখানায় ঢুকতে না পারে। কল-কারখানা ঘিরে রাখা, উৎপাদন শ্লথ করে দেওয়া, ধর্মঘট ইত্যাদি ধরনের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কেবল উন্নত দেশগুলিতে নয়, অনুন্নত দুনিয়ার কিছু কিছু দেশেও 'র‍্যাশনালাইজেশন' এবং 'মডার্নাইজেশন'-বিরোধী আন্দোলনের প্রসার দেখা যায়। কিন্তু অর্থনীতি তথা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মের বিধানের বিরোধিতা করে শ্রমিক আন্দোলন, শেষ পরিণামে, জয়ী হতে পারেনি। সত্তরের দশকের শেষার্ধের মধ্যেই এই আন্দোলনের ধারা নির্বাপিত হয়ে যায়।

পাশাপাশি উদ্ভূত হতে দেখা যাচ্ছিল 'ওনারশিপ ইনিসিয়েটিভ' বা শ্রমিকদের কারখানার মালিকানার অংশীদারিত্ব অর্জনের জন্য আন্দোলন। পাশ্চাত্যের সংস্কারবাদী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রভাবাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে তত্ত্বগতভাবে এই আন্দোলনের সূচনা ঘটলেও, বুর্জোয়াবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি অচিরেই এই আন্দোলনে নেমে পড়েছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে মালিকদের কাছে দাবী তোলা হয় যে প্রতিষ্ঠানের মুনাফার একটা অংশ দান করতে হবে 'ওয়ার্কার্স বিজিনেস ফাণ্ডে' বা শ্রমিকদের ব্যবসার তহবিলে । কারখানার শ্রমিকদের নিজস্ব দান থেকে গড়ে তোলা হতে থাকে 'ওয়ার্কার্স ফাণ্ডস', কোন কোন দেশে একে বলা হয়েছিল 'মেইডনার ফাণ্ডস'। ট্রেড ইউনিয়নগুলির বক্তব্য ছিল এই টাকা দিয়ে শ্রমিকরা কারখানার 'শেয়ার' কিনতে থাকবে। এইভাবে উত্তরোত্তর শেয়ার ক্রয়ের মধ্য দিয়ে এক সময়ে কারখানার মালিকানা হবে শ্রমিকদের হস্তগত। ইউরো-কমিউনিজমের প্রভাবাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রচার করেছিল যে, এই ফাণ্ড পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানার উদ্যোগকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাবে এবং "যৌথ-সমাজতন্ত্রের পথকে উন্মুক্ত" করবে। "এই ধরনের তৎপরতা হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ অর্জনের পথে প্রথম পদক্ষেপ—যখন ট্রেড ইউনিয়নগুলি কারখানার উপর কর্তৃত্ব করবে।" মালিক-স্বার্থ-বিপন্নকারী এই দাবী ও প্রচেষ্টা স্বভাবতই মালিকদের অনুগ্রহ পায়নি। সার্বিক সংকটাপন্ন শ্রমিকশ্রেণীকে এই আবেদন প্রথমে স্বপ্ন দেখালেও, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে তাদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছিল। কোন দেশের একটি কারখানাতেও এই প্রকল্প সাফল্য আনেনি।

এই সময়ে শ্রমিক-আন্দোলনের অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হলো 'ন্যাশনালাইজেশন কন্‌সেপ্ট' তথা বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ধারণা। প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এব্যাপারে তত্ত্বগত বক্তব্য উত্থাপন করেছিল এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়োজিত করেছিল এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে। কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রেট ব্রিটেন তাদের 'দা ব্রিটিশ রোড টু সোস্যালিজম' শীর্ষক দলিলে বলেছিল, "নতুন ধরনের রাষ্ট্রীয়করণের উন্নয়ন ও বিকাশের মধ্য দিয়েই শিল্প-গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে।" সুতরাং সচেতন শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বেসরকারী শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর কিছুকাল পূর্বে 'কমিউনিস্ট পার্টি অব ইউ. এস. এ' তাদের গৃহীত কর্মসূচীতে উল্লেখ করে যে সমাজতন্ত্র যেহেতু শিল্প ও অর্থনীতির প্রধান শাখাগুলির রাষ্ট্রীয়করণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, সেহেতু শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে, কোন সুযোগ পেলে, এই উদ্দেশ্যকে যথাসম্ভব সফল করে ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করতে হবে। এরপর কমিউনিস্ট পার্টি অব ডেনমার্ক তাদের পঞ্চবিংশ কংগ্রেসে অনুরূপ বিষয়ে অন্যতম কর্মসূচী গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রীস, কমিউনিস্ট পার্টি অব কানাডা-র 'দা কানাডিয়ান রোড টু সোস্যালিজম' দলিলে, কমিউনিস্ট পার্টি অব জাপান তাদের চতুর্দশ কংগ্রেসে বেসরকারী শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কিত পূর্বোক্ত ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। কেবল উন্নত দেশগুলিতে নয়, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বহু কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কর্মসূচীতে পূর্বোক্ত লাইনে সিদ্ধান্ত নেয়। দেশীয় বাস্তবতার প্রভেদ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বক্তব্যের মাত্রায় নানা পার্থক্য থাকলেও মর্মের দিক থেকে এবিষয়ে প্রতিপাদ্য প্রায় একই ছিল। তৃতীয় দুনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি জাতীয়করণের প্রথম লক্ষ্য স্থির করেছিল বিদেশী পুঁজি এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি ছিল যে বিদেশী পুঁজি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাতে দেশের স্বনির্ভরতা হ্রাস পায় এবং দেশের শিল্পোৎপাদনের লাভ বিদেশে চালান হয়ে যাওয়ায় জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া শুধু নয়, বিদেশী পুঁজির অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদ অনুপ্রবেশ করে।

চেতনার মান নিম্ন হওয়ায় অধিকাংশ দেশের শ্রমিকশ্রেণীর প্রসঙ্গটিকে দেখেছিল প্রধানত স্বীয় স্বার্থের ভিত্তিতে। স্বদেশী বা বিদেশী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বা বহুজাতিক সংস্থায় শ্রমিকের বৃত্তির নিরাপত্তাহীনতা সাংঘাতিক এবং শোষণ তীব্র। সুতরাং তারা কিছুটা পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল এইসব প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয়করণের মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার উপাদান, সমাজতান্ত্রিক

দেশগুলির অনুন্নত দুনিয়াকে শিল্প-গঠনে সাহায্য ইত্যাদি বাতাবরণ রাষ্ট্রীয়করণের আন্দোলন ও সাফল্যের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। ফলে, এই সময়ে তৃতীয় দুনিয়ায় স্বদেশী-বিদেশী মালিকানাধীন ছাড়াও কিছু কিছু বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয়করণ ঘটে। উন্নত দেশগুলিতে, যেখানে লিবারাল বা সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সরকার ছিল, সেখানেও কিছু কিছু শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ ঘটেছিল। রাষ্ট্রীয়করণ ঘটার পর দেখা গেল যে তাতে পুঁজিবাদের কোন ক্ষতি দূরের কথা, লাভই হচ্ছিল। লোকসানী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করিয়ে মালিকরা দায়মুক্ত হচ্ছিল ও সরকারের মাধ্যমে লোকসানকে চাপাচ্ছিল জনগণের ঘাড়ে। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদও শক্তিশালী হতে থাকে। ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প পুষ্ট করতে ব্যবহার করা হচ্ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে এবং ভারী শিল্পের জন্য বৃহৎ পুঁজি লগ্নীর দায় মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রায়ত্ত করণের মাধ্যমে সরকার তথা জনগণের উপর চাপছিল। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে মুক্ত বাজার বিশ্ব-অর্থনীতির জন্য তৎপরতা, বহুজাতিক সংস্থাগুলির চাপ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নানা দুর্বলতা ও দুর্নীতি এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের উৎপাদনে উদ্যোগ ক্ষুণ্ণ হওয়া প্রভৃতির ফলে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আন্দোলন কেবল দুর্বল হতে থাকে তাই নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণের নতুন প্রক্রিয়ার জন্ম হয়।

এই সময়ের ট্রেড ইউনিয়নগুলির অপর প্রবণতা হলো রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কাঠামোতে যেমন, পার্লামেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, কাউন্সিল ইত্যাদিতে নিজ নিজ প্রতিনিধি পাঠানো বা রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী প্রার্থীদের মধ্যে বর্ধমান সংখ্যাতে নিজেদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা। এবিষয়ে দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থীদের ভূমিকার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। ইউরোপের কোন কোন দেশে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার চেষ্টাও হয়। যদিও এ'জাতীয় চেষ্টা প্রায় সর্বত্রই ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে এই চেষ্টা অব্যাহত থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে যৎসামান্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারক সংস্থাগুলিতে প্রেরিত হলেও সমগ্র রাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রভাবিত করার মত ক্ষমতা তারা কোন দেশে অর্জন করতে পারেনি। বরং সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক ও বুর্জোয়া দলগুলির প্রতিনিধিরা, শ্রমিকদের বিষয়ে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের দাবী উত্থাপন ও অর্জন করার মধ্য দিয়ে, ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়াসের পালের হাওয়া কেড়ে নেয়।

পরিচালন-ব্যবস্থাপনায় ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণ

এই সময়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে মতাদর্শগত ও তৎপরতার স্তরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছিল 'ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ইন ম্যানেজমেন্ট' তথা শিল্প-ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ। এই 'পার্টিসিপেশন' বা অংশগ্রহণের প্রসঙ্গকে নানা তত্ত্বগত বাক্যসম্ভারে দেশে দেশে উত্থাপন করা হয়েছিল—'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্র্যাসি', 'সোস্যাল-পার্টনারশিপ', 'ডেমোক্র্যাটিক কন্ট্রোল', 'ওয়ার্কার্স কন্ট্রোল', 'কো-পার্টিসিপেশন', 'কো-ডিটারমিনেশন' ইত্যাদি শিরোনামে। পশ্চিম জার্মানিতে বলা হলো 'মিট্‌বেসটিমুঙ' তথা সম-অংশগ্রহণ বা যৌথ-সিদ্ধান্ত। আরও বৃহত্তর শ্রমিক-ক্ষমতা সম্বলিত 'টেইলানহেমি' ব্যবস্থারও দাবী উঠে সেখানে। ফ্রান্সে দাবী উঠে 'পার্টিসিপেশিয়ঁ' এবং 'কোগেস্তিয়ঁ'। ইংল্যাণ্ডে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্র্যাসির' ধারণা।

প্রসঙ্গটি নিয়ে পশ্চিমী কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে মতাদর্শগত বিতর্ক শুরু হয়েছিল সত্তরের দশকের শুরু থেকে। পশ্চিম জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট অন দা মেইম শহরের 'ইনস্টিটিউট ফর মার্কসিস্ট রিসার্চ' ১৯৭২ সালে প্রকাশ করে 'পার্টিসিপেশন অ্যাজ অ্যান এইম অব স্ট্রাগল' শীর্ষক দলিল। তাতে এই অংশগ্রহণকে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামের ও শ্রেণী-রণনীতির অবিভাজ্য অংশ বলা হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি প্রসঙ্গটির বিভিন্ন দিক নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চালাতে থাকে। অন্যান্য পশ্চিমি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও অনুসরণ করে একই পথ। ফ্রান্সের ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে এ'বিষয়ে সোৎসাহী-সমর্থক হলেও, কয়েক বছরের মধ্যেই প্রসঙ্গটিকে জড়িয়ে প্রবল সমস্যায় বিব্রত হতে থাকে; যদিও তখনও তারা এই প্রসঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর যোগদানকে ঠিক

বলেই মনে করছিল। 'ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই পথের সমর্থনে ক্রমাগত আলোচনা প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায়, 'কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন' পুঁজিবাদী দেশে এই ব্যবস্থা চালুর জন্য শ্রমিকশ্রেণীর উদ্যোগের সমর্থক ছিল। ১৯৭৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি ৪৫টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে 'দা ডাইলেকটিকস অব ইকনমিকস অ্যাণ্ড পলিটিকস ডিউরিং দা স্ট্রাগল ফর রেভলিউশনারি ট্রান্সফরমেশন অব সোসাইটি' শীর্ষক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে। সেখানে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলি 'পার্টিসিপেশন'-এর প্রশ্নে তাত্ত্বিক বিতর্ক চালালেও ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণকে প্রয়োজনীয় বলে মোটামুটি স্বীকার করে। ১৯৭৯ সালে 'ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ' পত্রিকা ও পশ্চিম জার্মানির লেভারকুলশেন শহরের কমিউনিস্ট পার্টি যৌথভাবে 'দা কমিউনিস্ট ভিউ অব ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন' শিরোনামে, অংশগ্রহণকে সমর্থন ক'রে, এক সেমিনার করে। তবে ১৯৮০ সালে, এই ধরনের ব্যবস্থায় শ্রেণী-আন্দোলনের বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রথম হুঁশিয়ারি দেয় ফ্রান্স ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু পার্টিসিপেশনের প্রবণতা থামেনি। কমিউনিস্ট পার্টি অব কানাডা 'দা রোড টু সোস্যালিজম ইন কানাডা' শীর্ষক দলিলে শিল্প-অর্থনীতিতে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের নিরঙ্কুশ হস্তক্ষেপের অধিকারের মনোভাব ব্যক্ত করে। কমিউনিস্ট পার্টি অব জাপান 'প্রপোজাল ফর দা জাপানীজ ইকনমি' শীর্ষক দলিলেও উত্থাপন করে অনুরূপ বক্তব্য। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়ার ১১টি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন থেকেও 'সায়েন্টিফিক্ অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস অ্যাণ্ড দা ওয়ার্কিং ক্লাস অব দা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজড ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিজ' শীর্ষক আলোচনা-সভাতে পার্টিসিপেশনের পক্ষে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রেট ব্রিটেন, কমিউনিস্ট পার্টি অব বেলজিয়াম, কমিউনিস্ট পার্টি অব আর্জেন্টিনা, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইরাক, কমিউনিস্ট পার্টি অব চিলি ইত্যাদিও গ্রহণ করে ঐ লাইন। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি অব ডেনমার্ক, লেফট পার্টি অব সুইডেন (কমিউনিস্ট পার্টি), কমিউনিস্ট পার্টি অব নরওয়ে ইত্যাদি 'পার্টিসিপেশন'-এর প্রসঙ্গে যথেষ্ট সতর্কতামূলক মনোভাব নেয়।

এরই সমান্তরালে পূর্বোক্ত দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি-প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহও সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। বুর্জোয়াপন্থী ও সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি দৃঢ়ভাবে পার্টিসিপেশনের পক্ষে ছিল। ফ্রান্সের 'জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার', ইতালির 'জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার', ব্রিটেনের 'ব্রিটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস', 'ইউরোপীয়ান কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস', 'ইউরোপীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ইনস্টিটিউট', পশ্চিম জার্মানির 'ফেডারেশন অব জার্মান ট্রেড ইউনিয়নস' সহ বহু ট্রেড ইউনিয়ন, এমনকি চরম দক্ষিণপন্থী 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন' (সি. ডি. ইউ.) ও 'ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল ইউনিয়ন'(সি. এম. ইউ.), 'সুইডিশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন' (এস. টি. ইউ. সি.), জাপানের 'ডোমেই' (জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার) এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্দোলন এবং সরকার ও মালিকশ্রেণীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

ইতোমধ্যে শিল্প-ব্যবস্থাপনায় বেলজিয়াম, পানামা, পেরু, চিলি প্রভৃতি সহ আরও কতকগুলি দেশের ট্রেড ইউনিয়ন অংশগ্রহণ করে বটে কিন্তু মালিকপক্ষের ক্ষতির দায়ভার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে শুরু করে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এইকালে মালিক পক্ষও শিল্প-ব্যবস্থাপনায় ট্রেড ইউনিয়নের আংশিক অংশগ্রহণের পক্ষে সমর্থক হয়ে উঠছিল। স্বীয় ব্যবস্থার সংকট কাটানোর জন্য কারণ ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়নকে ব্যবস্থাপনায় আংশিকভাবে অংশগ্রহণ করিয়ে উৎপাদনে কমপিউটার, রোবট ইত্যাদির বর্ধিত প্রয়োগ এবং শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা কমানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি সিদ্ধ করে নেওয়া ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে মালিকদের সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য কয়েকটি নজির উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৬৫ সালে 'সুইডিশ অ্যাসোসিয়শন অব এমপ্লয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে, ১৯৭৫ সালে ভার্সেলিজ

শহরে ২৩টি দেশের ৬০ জন শিল্প-প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত 'অরগানাইজেশন অব ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট'এর (ও. ই. সি. ডি.) ম্যানেজমেন্ট সেমিনারে, ঐ বছরই ফরাসী সরকারের 'সুদ্রেউ রিপোর্টে', ১৯৭৭ সালে ফ্রান্সের 'কনফারেন্স অব এন্ট্রেপ্রেনিউয়ারস'-এর চতুর্থ জাতীয় কংগ্রেসে, ঐ বছরই ব্রিটিশ সরকার গঠিত 'লর্ড বুলক্ কমিটির রিপোর্ট' ইত্যাদিতে শিল্প-ব্যবস্থাপনায় ট্রেড ইউনিয়নের পার্টিসিপেশনের পক্ষে মত প্রকাশিত হয়েছিল।

এই পটভূমিকায়, আনুষ্ঠানিক ও পুরোপরি আইনি ব্যবস্থা হিসাবে না হলেও, কিছু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শিল্প-ব্যবস্থাপনাতে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ স্বীকৃত হয়। কিন্তু এবিষয়ে তৃণমূলের শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষণও প্রকাশ পেতে থাকে অচিরেই। সত্তরের দশকে পশ্চিম জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ব্রিটেনের কতকগুলি সংস্থার সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি শ্রমিক শিল্প-ব্যবস্থাপনায় ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণ সমর্থন করছে। কিন্তু আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে গিয়ে এই সমর্থন ৫০ শতাংশের নীচে নেমে যায়। এর কারণ ছিল সুস্পষ্ট। প্রথমত, শিল্প-ব্যবস্থাপনায় ট্রেড ইউনিয়নগুলির অংশগ্রহণ সত্ত্বেও, শ্রমিকরা দেখেছিল যে তাদের সমস্যা কমে যাওয়ার পরিবর্তে উত্তরোত্তর বাড়ছে। বরং ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা অনেকটা মালিক-ঘেঁষা ও উত্তরোত্তর আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠছে। দ্বিতীয়ত, শিল্প-ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দেশান্তর এবং ব্যাপক ছাঁটাই, লে-অফ ইত্যাদির ফলে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী এতই দিশেহারা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যে তাদের পক্ষে ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দৃষ্টি দেবার সামান্য উৎসাহ পর্যন্ত তিরোহিত হতে থাকে। তৃতীয়ত, এই শিল্প-পরিস্থিতির মুখে ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে শ্রমিক-স্বার্থের পক্ষে সুরাহা করার মত কোন পথ নির্ণয় ও আন্দোলন করা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি হারাচ্ছিল শ্রমিক সমর্থন। চতুর্থত, এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে শিল্পপতিরা তাদের নতুন পদ্ধতি এবং মুনাফা দ্রুততার সাথে বাড়িয়ে, অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু করেছিল নিজেদের সংকটের পরিস্থিতিকে।

মার্কস উল্লেখ করেছিলেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'ম্যানেজমেন্ট' বা ব্যবস্থাপনা "সামাজিক শ্রম-প্রক্রিয়ার (সোস্যাল লেবার-প্রসেস) এবং এই প্রক্রিয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য (পুঁজিবাদের) কেবলমাত্র একটি বিশিষ্ট ক্রিয়া মাত্র নয়, বরং একই সাথে শোষণের একটি ক্রিয়া।" (ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৩)। ১৮৪৪ সালে এঙ্গেলস তাঁর 'দা কনডিশন অব দা ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড' গ্রন্থে শিল্প-ম্যানেজমেন্টে তৎকালীন ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা ও আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "... শ্রম-বাজারের চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয় যে অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা তাকে পরিবর্তন করতে পারে না (শ্রমিকদের) এইসব তৎপরতা। কেননা যেসব প্রবল শক্তি এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, তাদের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন অক্ষম থাকে।" কার্ল মার্কস ব্রিটিশ শ্রমিকদের আইনি ১০ ঘন্টার শ্রম-দিবস অর্জনকে "নীতিগত বিজয়" বলেছিলেন। ১৮৮০ সালের ফরাসী দেশের নির্বাচনে তিনি ফ্রেঞ্চ ওয়ার্কার্স পার্টিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন শ্রমিকদের শ্রম-আইন প্রণয়নে শ্রমিকদের নিজস্ব অধিকারের দাবী তুলতে। কিন্তু এগুলিকে শ্রেণী-সংগ্রামের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা এবং এগুলির উপর একান্ত নির্ভরশীলতাকে তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করতে বলেছিলেন।

ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ইন ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থাকে শ্রেণী-লক্ষ্যে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শ্রেণী-মতাদর্শ ও ভূমিকাতে স্বভাবতই সুদৃঢ় থাকা অনিবার্য ছিল। কিন্তু সংস্কারপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির মূল ঘাটতি ছিল সেখানে। ফলে এই দাবী ও প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থে কোন সুফল এনে দেয়নি।

হোয়াইট কলার সিনড্রোম

ষাটের দশকে উদ্ভূত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন থিসিস' (সি. কার, জে. টি. ডানলপ, এফ. এইচ. হারবিসন এবং সি. এ. মেয়ারস রচিত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যান'), কার্ল মার্কসের সূত্রাবলী অনুসরণ না করলেও, এটা তথ্যসহ প্রমাণ করে যে পুঁজিবাদী নতুন শিল্পায়নের প্রক্রিয়াতে

শ্রম-শক্তির বিন্যাসের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। মধ্য-সত্তরের দশক থেকে শ্রম-শক্তির অবস্থানগত বিন্যাসের পরিবর্তন ছাড়াও শ্রম-শক্তির বাহ্যিক রূপে পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়—নতুন চরিত্রের উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও পরম্পরাগত শ্রম-প্রক্রিয়ার উপর আকস্মিক ও দুর্বার অভিঘাত সৃষ্টি হওয়ার ফলে।

সত্তরের দশকের শুরু থেকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতির প্রাইমারি তথা প্রথম, সেকেন্ডারি তথা দ্বিতীয় ও টারসিয়ারি তথা তৃতীয় ক্ষেত্রে শ্রম-শক্তির অবস্থানগত বিন্যাসে পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যেতে থাকে। প্রাইমারি তথা কৃষি ক্ষেত্রে শ্রম-শক্তির মোট সংখ্যা দ্রুত নীচের দিকে নামতে থাকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহারের ফলে। শিল্পে যে নব-প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় তাতে প্রচলিত শিল্প-ব্যবস্থায় শ্রম-শক্তির সংখ্যা হ্রাস প্রথম দিকে খুব ক্ষীণভাবে চোখে পড়ছিল। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্র তথা সার্ভিস সেক্টর বা পরিষেবা ক্ষেত্রে বাড়ছিল শ্রম-শক্তির ভর। মধ্য আশির দশকের সমস্ত ক্ষেত্রগুলির মোট শ্রমিক সংখ্যার অনুপাতে পরিষেবা ক্ষেত্রে শ্রম-শক্তির শতকরা হার দাঁড়ায় ব্রিটেনে ৬০ ভাগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ ভাগ, কানাডাতে ৫২ ভাগ, নিউজিল্যান্ডে ৪৩ ভাগ, অস্ট্রিয়াতে ৪৩ ভাগ, জাপানে ৪৪ ভাগ, সুইডেনে ৫৪ ভাগ, পশ্চিম জার্মানি ও আয়ারল্যান্ডে ৪০ ভাগ, ইতালিতে ৩৫ ভাগ ইত্যাদি। তখন স্বীকৃত না হলেও পরবর্তীকালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে পরিষেবা ক্ষেত্রের অগ্রগতি স্বয়ং ছিল আধুনিক শিল্পায়ন ব্যবস্থার দেশভিত্তিক অগ্রগতির অন্যতম সূচক। তাই শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এর প্রথম প্রতিফলন ঘটেছিল। যেসব উন্নত দেশ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের সুযোগ যত বেশি ব্যবহার করছিল, সেখানে সমানুপাতিকভাবে পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমশক্তি বাড়ছিল; যত দ্রুততার সাথে নব নব প্রণালী ও প্রথা উৎপাদনে যুক্ত হয়েছে, সমান্তরাল দ্রুততায় বেড়েছে পরিষেবার শ্রম-শক্তির হার। প্রথমদিকে তৃতীয় দুনিয়াতে এই পরিবর্তনমুখীনতার তেমন কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়নি, কেননা সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের ঢেউ তখনও এই দেশগুলির তটভূমিকে স্পর্শ করেনি।

শ্রম-শক্তির আঙ্গিকের পরিবর্তনের বিচারে বলা যায় যে এই পরিবর্তন ঘটছিল 'ব্লু কলার ওয়ার্কার' বা কালিঝুলি-মাখা কায়িক শ্রমদায়ী থেকে 'হোয়াইট কলার এমপ্লয়ী' বা জামা কাপড়ে ফিট্‌ফাট মস্তিষ্কজাত শ্রমদায়ী কর্মজীবীতে। শেষোক্ত আঙ্গিকের শ্রমজীবীর সংখ্যা কেবল পরিষেবাক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছিল না, শিল্পক্ষেত্রেও প্রথাগত শ্রমিকশ্রেণীকে অপসারিত করে এই অংশ স্থান করে নিচ্ছিল। এ. এলিয়ট তাঁর 'হোয়াইট কলার ওয়ার্কার্স' বিষয়ক গবেষণাতে এটাও দেখিয়েছিলেন যে এই সময় 'হোয়াইট কলার' পুরুষ নিযুক্তির অপসারণ ঘটিয়ে সেখানে স্থান করে নিচ্ছিল 'হোয়াইট কলার' নারীরা। প্রথমোক্ত পরিবর্তন ঘটছিল নতুন প্রযুক্তির দ্বারা উৎপাদনের জন্য, দ্বিতীয়োক্ত পরিবর্তন ঘটছিল পূর্বোক্তটির অভ্যন্তরে কম মজুরিতে অধিক মুনাফার লক্ষ্যে। প্রধানত মস্তিষ্কজাত এই ধরনের শ্রম-শক্তির বৃহত্তম বিকাশ ঘটে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে, বিশেষত অর্থনীতির ফিনান্স, ইনসিওরেন্স, ব্যাঙ্কিং, রিয়েল এস্টেট ইত্যাদি শাখাতে। 'হোয়াইট কলার' শ্রম-শক্তি সম্পর্কিত সমকালের গবেষণাগুলি থেকে এটা বোঝা যায় যে শ্রম-শক্তির এই কাঠামোগত পরিবর্তন অলক্ষ্যে ঘটাচ্ছিল সামাজিক নতুন স্তরীকরণ ও সামাজিক পরিবর্তন। অর্থাৎ শ্রমজীবী ক্লাস বা শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীগুলি তখন থেকেই প্রবেশ করতে শুরু করেছিল রূপান্তরের প্রক্রিয়ায়।

এই পরিস্থিতি চিরাচরিত ও সামগ্রিক ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থার সামনেও নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে। প্রথাগত কায়িক-শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হওয়া এবং মস্তিষ্কজাত শ্রমদায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ও হার কমে যাওয়ার উপাদানই, নিছক সৃষ্টি করছিল না, গভীর সমস্যা গড়ে দিচ্ছিল ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন ও প্রতিরোধাত্মক অন্তর্বস্তুতেও। এর প্রধান কারণ হলো যে ক্রমবর্ধমান নতুন ধরনের এই শ্রমজীবীদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও একাত্মতার মনোভাব গড়ে ওঠেনি; ফলে এরা সাধারণভাবে সংগঠন, বিশেষত কায়িক শ্রমজীবী অধ্যুষিত ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে, সেই সময়, কোন আকর্ষণ বোধ করছিল না। তাছাড়া, 'হোয়াইট কলার' শ্রমিকদের সামাজিক ও মানসিক গঠন ছিল কায়িক শ্রমজীবীদের থেকে স্বতন্ত্র। স্বভাবতই 'হোয়াইট কলার'

শ্রমজীবীরা প্রতিবাদ বা উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তনের জন্য তখনই সক্রিয় হওয়ার মত মানসিক প্রস্তুতি অর্জন করেনি। সত্তরের দশকের প্রথমার্ধেই সমাজতত্ত্ববিদদের অনেকে এ'কারণে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে হোয়াইট কলারের দ্রুত বর্ধমান সংখ্যাশক্তি, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান এবং প্রবণতা, প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়নের সামাজিক 'ফোর্স মেজিউরি' বা প্রধান শক্তির ভূমিকার গভীর ক্ষয়সাধন করতে পারে।

দূর অতীতে, উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না হোয়াইট কলার শ্রমজীবীদের, ফলে ছিল না আঘাতধর্মী শক্তিও। তাই কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, হোয়াইট কলার শ্রমজীবীদের স্বতন্ত্র ইউনিয়ন থাকলেও শ্রেণী-আন্দোলনে সেগুলির তেমন ভূমিকা ছিল না। শিল্পের সাথে যুক্ত যৎসামান্য সংখ্যক হোয়াইট কলার কর্মী প্রচলিত শিল্প-ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য থাকতো আনুষ্ঠানিকভাবে। তবে অতীতের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও তত্ত্বকে উপেক্ষা করে আলোচ্য কালপর্বে হোয়াইট কলার কর্মজীবীদের ব্যাপক সংখ্যায় সংগঠনের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটতে থাকে। এর ফলে প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়নের সামনে, কার্যত, এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন ও শক্তির আবির্ভাব ঘটে। যদিও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার ট্রেড ইউনিয়নগুলির চরিত্র, শক্তি ও ভূমিকার নানা ধরনের পার্থক্য ছিল অতীত থেকেই, তথাপি সাধারণভাবে বলা যায় যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সংগঠনগুলি ছিল তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ও শক্তিশালী, অন্যদিকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রে সংগঠন ছিল সংকীর্ণ ও দুর্বল। কার্যকালে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রেই হোয়াইট কলারদের সংগঠনের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে। এই সংগঠনগুলি তৎপর ও কার্যকরী ভূমিকাও গ্রহণ করতে থাকে। তারফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পরম্পরাগত ট্রেড ইউনিয়নগুলি আরও কিছুটা কোণঠাসা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

আর. লুমলে তাঁর গবেষণাতে মস্তিষ্কজাত শ্রমজীবীদের সমকালের সংগঠনগুলিকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছিলেন—'হোয়াইট কলার ট্রেড ইউনিয়ন' এবং 'প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন'। কিন্তু তিনি বলেছেন যে এইভাবে বিভাজনও যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। তাঁর মতে চার ধরনের মৌলিক প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে—'প্রেস্টিজ অ্যাসোসিয়েশন', 'স্টাডি অ্যাসোসিয়েশন', 'কোয়ালিফায়িং অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'অকুপেশনাল অ্যাসোসিয়েশন'। এগুলির ভূমিকাকে তিনি প্রধানত দু'ভাগে দেখেছিলেন—'কো-অর্ডিনেটিং অ্যাসোসিয়েশন', এবং 'প্রোটেকটিভ অ্যাসোসিয়েশন'। ব্ল্যাকবার্ন অবশ্য হোয়াইট কলার সংগঠনকে অন্তর্বস্তুর দিক থেকে বিচার করে পার্থক্য টেনেছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন ও প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যেই কেবল নয়, উপরন্তু প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশনগুলির মধ্যে যেগুলি চিরায়ত ট্রেড ইউনিয়নের মর্ম বহন করে এবং যেগুলি তা' করে না—এই দু'ধরনের মধ্যে।

অ্যাকাডেমিক আলোচনা সে সময়ে যে ধরনের ব্যাখ্যাই উপস্থিত করুক না কেন, কালক্রমে হোয়াইট কলার কর্মীদের এইসব সংগঠনগুলি অর্থনীতির সমস্ত শাখাতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। নিজস্ব বৃত্তি নিয়ে এরা শুরু করে দিয়েছিল কার্যকরী তৎপরতা, ধীরে ধীরে মালিকশ্রেণী ও নিয়োগকারীদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জও দিতে শুরু করেছিল। ফলে চিরায়ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির পাশাপাশি সৃষ্টি হতে থাকে এক সমান্তরাল ধারা।

শপ-ফ্লোর থেকে ট্রেড ইউনিয়নের সামনে চ্যালেঞ্জ

শপ-ফ্লোর বা কারখানার কর্মক্ষেত্রে সংগঠন ও দর-কষাকষির ইতিহাস শ্রমিক-আন্দোলনের পরম্পরায় আবহমান কালের। ইতিহাসে ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভবই ঘটেছিল শপ-ফ্লোর সংগঠন ও আন্দোলন থেকে। বিবর্তনের পথে শপ-ফ্লোরের ঐ ভূমিকা প্রায় লুপ্ত হয়ে ট্রেড ইউনিয়নের সামগ্রিক চরিত্র অর্জিত হয়েছিল। শিল্পে সংকট, ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতার ক্ষীয়মাণতা ও মালিকশ্রেণীর কৌশলে সত্তরের দশক থেকে শপ-ফ্লোর সংগঠন এই স্তরেও দর-কষাকষির ভূমিকার পুনরুন্মেষ ঘটতে শুরু করে। ব্রিটেনে ডেনোভান কমিশনের রিপোর্ট, যা 'রয়াল কমিশন অন ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাণ্ড এমপ্লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, রিপোর্ট ১৯৬৫-১৯৬৮' নামে পরিচিত, সেটির প্রভাব সারা ইউরোপে শপ-ফ্লোর

ইউনিয়ন করার প্রবণতাকে অনেকটা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। এমনিতেই শপ-ফ্লোরের ভূমিকা কেবল ব্রিটেনে সীমাবদ্ধ ছিল না, ইতালি, বেলজিয়াম, সুইডেন, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এর নতুন প্রসার হচ্ছিল। আসলে মালিকশ্রেণীর পক্ষ থেকেই দুই ধরনের শ্রম-সম্পর্ক ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পিত চেষ্টা এই সময়ে শুরু হয়। ফর্মাল বা আনুষ্ঠানিক শ্রম-সম্পর্ক ছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে কেন্দ্রীয় স্তরে; মালিকরা শপ-ফ্লোর স্তরে ইনফর্মাল বা অ-আনুষ্ঠানিক শ্রম-সম্পর্ক উৎসাহিত করতে শুরু করেছিল।

শপ-ফ্লোরে কর্মীগোষ্ঠীর গঠন, সেগুলির স্বরূপ, সাংগঠনিক চরিত্র, লক্ষ্য, নিজেদের মধ্যে সংহতি ইত্যাদির কোন ধরাবাঁধা ছক থাকে না। আবার শপ-ফ্লোর তৎপরতা মানেই তা' মূল ট্রেড ইউনিয়ন থেকে স্বতন্ত্র কিছু, এমন সাধারণ মন্তব্যও করা চলে না। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যেতো যে শপ-ফ্লোর সংগঠন ও তৎপরতা ট্রেড ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত ও সহযোগিতাতেই গড়ে উঠেছে। আবার কোথাও কোথাও ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধিতা সত্ত্বেও তৈরি হয়েছিল সেগুলি। এটাও ঘটেছে, জন্মকালে ট্রেড ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষণায় শপ-ফ্লোর সংগঠন গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে মূল ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চলে গেছে সেগুলি। শেষোক্ত দুই প্রবণতাই এই সময়ে বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক সংকটজনিত শ্রমিকদের সমস্যা, প্রতিষ্ঠানটির আয়তন, শপ-ফ্লোরের কাজের চরিত্র, নতুন টেকনোলজির প্রভাব, কাছাকাছি কাজ করার জন্য শপ-ফ্লোরের শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য ও পরস্পরের সমস্যায় সহানুভূতি, সংশ্লিষ্ট মূল ট্রেড ইউনিয়নের সাথে দূরত্ব ইত্যাদি কারণে শপ-ফ্লোর সংগঠন ও সেগুলির ভূমিকা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল। এই প্রবণতার মধ্যে সুবিধাবাদের উপাদান, অংশত হলেও, ছিল। মালিক বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা করে দ্রুত সমস্যার সমাধান ও দাবী আদায়, নিজেদের বেশী শক্তি থাকলে বা প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন শাখা শপ-ফ্লোরের বাড়তি ভূমিকা বা গুরুত্ব থাকলে সেটিকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার, সমগ্র প্রতিষ্ঠানের তাবৎ শ্রমিকদের সম-স্বার্থ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ভেবে নেওয়া এবং অতিরিক্ত সুযোগ পাওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি পরিস্থিতি শপ-ফ্লোর সংগঠনের বাড়তি উদ্যোগ সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে উঠছিল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মালিকপক্ষ ঐসব প্রবণতায় ইন্ধন যোগাতে থাকে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগঠিত চাপ এড়াতে এবং সেগুলিকে দুর্বল করার অন্যতম লক্ষ্য থেকে। এই সময়ে বহু দেশে ব্যাপকভাবে শপ-ফ্লোর ধর্মঘটও হয়েছে। অন্যত্র শপ-ফ্লোর সংগঠন গড়তে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে ধর্মঘটের ফলে অর্জিত সাফল্য। দেখা যাচ্ছিল যে এইসব ক্ষেত্রে শ্রমিকরা মূল ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ ব্যাপকভাবে ছেড়ে দিচ্ছে। যেসব ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন শপ-ফ্লোর সংগঠন ও তৎপরতার বিরোধিতা করেছে, অথচ যেখানে শপ-ফ্লোর আন্দোলনে সাফল্য এসেছে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ ত্যাগ সর্বাধিক ব্যাপক হচ্ছিল। অবশ্য বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিশিষ্ট চরিত্রের জন্য শপ-ফ্লোর সংগঠন ও আন্দোলনের অস্তিত্ব সাধারণভাবে ছিল না। কিন্তু এই উদ্ভূত পরিস্থিতি ও প্রবণতার ফলে ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ভাঙতে থাকে এবং নিম্নগামী হতে থাকে মালিকশ্রেণীর উপর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতাও।

কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থার প্রতিঘাত

বিংশ শতাব্দীর শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের অগ্রগতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল 'কালেকটিভ বার্গেনিং' বা শ্রমিক-মালিক দর-কষাকষির ব্যবস্থা, যদিও ব্রিটেনের শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও 'কালেকটিভ বার্গেনিং'-এর নজির পাওয়া যায়। এই শতাব্দীতে জার্মানিতে ১৯১৮ সালে, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সে ১৯১৯ সালে, ফিনল্যান্ডে ১৯২৪ সালে, নেদারল্যান্ডসে ১৯২৭ সালে, সুইডেনে ১৯২৮ সালে, পর্তুগালে ১৯৩৩ সালে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রীসে ১৯৩৫ সালে 'কালেকটিভ বার্গেনিং' আইনানুগ স্বীকৃত ব্যবস্থা হিসাবে চালু হয়েছিল। শ্রমিক-আন্দোলনের দ্বারা উৎপাদন বন্ধ করার হুমকি কমাতে, শিল্পে শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে এবং শ্রম-সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করার পরোক্ষ পদ্ধতি হিসাবে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির সরকারসমূহ উদ্যোগ নিয়েছিল 'কালেকটিভ

বার্গেনিং'-কে আইনানুগ স্বীকৃতি দিয়ে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ব্রিটেনে 'হুইটলি কমিটি', তিরিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ভাগনার অ্যাক্ট', ফ্রান্সে 'মাতিগঁ এগ্রিমেন্ট', সুইডেনে 'কালেকটিভ বার্গেনিং অ্যাক্ট' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে এই ধরনের আইন হয়েছিল। পশ্চিমি দুনিয়ায় এই ব্যবস্থা থাকলেও বার্গেনিং পদ্ধতির ভিন্নতা ছিল দেশে দেশে, ছিল বার্গেনিং-এর ক্ষেত্র ও অংশীদারদের ক্ষমতার মধ্যে তারতম্যও। এই ব্যবস্থার অগ্রগতি, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের কালপর্বে এসে, আক্রান্ত হচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়নের কর্তৃত্ব খর্ব করার জন্য মালিকপক্ষ 'কালেকটিভ বার্গেনিং'-এ অস্বীকৃতি, ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রত্যাহার, শ্রমিকদের ইউনিয়নে যোগদানে বাধা দান, নিজেদের অনুগামী 'কোম্পানি ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করছিল। পাশাপাশি মালিকরা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক বিষয়ে চুক্তি করছিল নিজেদের মনোনীত শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে—যাকে বলা হতো 'ইয়োলো ডক কন্ট্রাক্ট'। তবে 'কালেকটিভ বার্গেনিং' ব্যবস্থার অগ্রগতি বা অধোগতির ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের যতখানি ভূমিকা ছিল, তার চেয়েও অনেক বেশি ছিল সরকারের ভূমিকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থা পুনরায় সম্প্রসারিত হতে থাকে। পুঁজিবাদী দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিশ্বাস করতো যে কালেকটিভ বার্গেনিং-এর অন্যতম পথে শ্রমিকদের মজুরি ও সুখ-সুবিধার অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব। কিন্তু সত্তরের দশকের মধ্যভাগে পৌঁছে, নেপথ্যে দীর্ঘ-সঞ্চিত প্রতিকূলতা ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। ১৯৭৬ সালে, এইচ. এ. ক্লেগ তাঁর কালেকটিভ বার্গেনিং বিষয়ক তত্ত্বে স্পষ্ট করে দেখিয়েছিলেন যে শ্রমিকদের নিয়োগের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন যখন কালেকটিভ বার্গেনিংকে প্রধানতম পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করে, তখন তার দ্বারা কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থার অগ্রগতি ও উন্নয়নকেই কেবল আক্রমণ করা হয় না, উপরন্তু বার্গেনিং ব্যবস্থা নিজেই বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করে ট্রেড ইউনিয়নকে। তত্ত্বগতভাবে ক্লেগ তাঁর মতের পক্ষে কিছু যুক্তি তখন তুললেও পরবর্তীকালে প্রসঙ্গটির মর্ম বাস্তব অভিজ্ঞতাতে দ্রুত স্পষ্ট হচ্ছিল।

সত্তরের দশকে ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে একদিকে যেমন বিশাল বিশাল আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছিল, অন্যদিকে বহু ক্ষেত্রে সেগুলি ভোগ করছিল ব্যর্থতার পরিণাম। ফলে আন্দোলনের পথ থেকে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সরে এসে 'কালেকটিভ বার্গেনিং'-এর পথ গ্রহণ এবং এই ব্যবস্থাকে নির্ধারক করে তুলতে থাকে। মালিকপক্ষের এটা কাঙ্ক্ষিত ছিল। এই সময় শ্রমিকশ্রেণীর চরম আর্থিক সংকটের পটভূমিকায়, কালেকটিভ বার্গেনিং-এ কার্যত একমাত্র প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় মজুরির উন্নয়ন। এই সময়ের নির্দিষ্ট বাস্তবতার মূল্যায়ন থেকে ফেলেপস ব্রাউন এক উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে বার্গেনিং-এর ব্যবস্থার ফলে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের পরিস্থিতি। প্রথমত, অনুকূল পরিস্থিতিতে কালেকটিভ বার্গেনিং-এর মাধ্যমে সদ্য-গঠিত ইউনিয়ন যেসব সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে সেগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব হয়। একে তিনি বলেছিলেন 'ইমপ্যাক্ট এফেক্ট'।

দ্বিতীয়ত, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থার দ্বারা, ইউনিয়নভুক্ত নয় এমন শ্রমিকদের তুলনায়, ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ছাঁটাই আটকাতে যখন সক্ষম হয় ট্রেড ইউনিয়ন তখন এই সাফল্য মালিকের স্বার্থের চেয়ে অসংগঠিত শ্রমিকদের অধিক স্বার্থ বিসর্জনের বিনিময়ে অর্জিত হয়। একে তিনি বলেছিলেন 'র‍্যাট্‌চেট এফেক্ট'। তাঁর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য ছিল 'ওয়েজ রিজিডিটি এফেক্ট'। কালেকটিভ বার্গেনিং প্রথায় মালিক-শ্রমিকে মজুরির বিষয়ে চুক্তি হয় একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (ধরা যাক তিন বছর)। এই চুক্তির অন্তর্গত সময়ে মন্দা হলে, মালিক ঐ চুক্তির জন্য মজুরি ছাঁটাই করতে পারে না। অন্যদিকে ঐ কাল-পর্বে যদি মুদ্রাস্ফীতি হয়, তাহলে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধিও ঐ চুক্তির জন্য হতে পারে না। কিন্তু আলোচ্য কাল-পর্বে একদিকে শিল্পে মন্দা ও অন্যদিকে অর্থনীতিতে বিপুল মুদ্রাস্ফীতি চলছিল (যাকে তখন 'স্ট্যাগফ্লেশন' বা 'মন্দাস্ফীতি' বলা হয়েছিল)। অর্থাৎ এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের সমাহার ঘটেছিল। শ্রমিকরা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হচ্ছিল বেপরোয়া মূল্যবৃদ্ধির জন্য; তাদের প্রকৃত মজুরি বিপুলভাবে হ্রাস পাচ্ছিল। কিন্তু কালেকটিভ বার্গেনিং প্রথায় ট্রেড

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চুক্তির ফলে শ্রমিকের মজুরির হাত-পা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। এই সমগ্র প্রতিক্রিয়াতে শ্রমিকরা কেবল কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ক্ষুব্ধ হচ্ছিল না, বিরূপ হয়ে উঠছিল নিজ ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্কেও।

চতুর্থত, কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থায় ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকদের মজুরির স্থিতাবস্থা বা বৃদ্ধির পাশাপাশি অসংগঠিত অংশের মজুরির ছাঁটাই বা স্থিতাবস্থা—উভয় অংশের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টির জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল ট্রেড ইউনিয়নকে। অন্যদিকে সংগঠিতদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধায় ব্যয়িত মোট অর্থ মালিকশ্রেণী পুষিয়ে নিচ্ছিল অসংগঠিতদের না দেবার বিনিময়ে। ফলে, ওয়েজ এগ্রিমেন্টের ব্যবস্থায় মালিকদের কোন লোকসান হচ্ছিল না, অথচ ক্ষতি হচ্ছিল শ্রমিকদের। কার্যকালে সবচাইতে বেশি ক্ষতি হচ্ছিল ট্রেড ইউনিয়নের; তারা হারাচ্ছিল ঐক্য, শ্রমিক-স্বার্থ ও সমর্থন।

পঞ্চমত, মজুরির প্রসঙ্গ ছাড়াও শিল্পে মন্দা এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবস্থায় নতুন চরিত্রের শিল্প-ব্যবস্থা পত্তনের জন্য পুরানো কলকারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে-অফ ইত্যাদি অর্থাৎ চাকুরীর নিরাপত্তার প্রশ্ন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল শ্রমিকশ্রেণীর কাছে। মালিকপক্ষও প্রতিরোধ চালিয়ে প্রসঙ্গগুলিকে যৌথ আলোচনায় আনতে দেয়নি ও চুক্তিবদ্ধ হয়নি ট্রেড ইউনিয়নের সাথে। ফলে শ্রমিকের বৃত্তির নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছিল কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থা।

মোটের উপর এইভাবে কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করছিল ট্রেড ইউনিয়নকে।

'সোস্যাল কন্‌ট্রাক্ট' বা সামাজিক চুক্তির ফলাফল

সত্তরের দশকের সার্বিক পরিস্থিতিতে অনেকটাই দিশেহারা পাশ্চাত্যের ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণীকে কিছুটা রিলিফ দিতে এবং নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য নানা পথ খুঁজতে শুরু করেছিল। বিশ্ব-পুঁজিবাদের 'নিও লেজে-ফেয়ার ইকনমিকস' বা নয়া মুক্ত-বিহঙ্গ অর্থনীতি এইসময় সক্রিয় ছিল। পুঁজির বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে তথাকথিত 'ইনকাম পলিসি'র নামে, বিশেষত মজুরিভোগীদের, মজুরির মান অচল রাখার জন্য সরকারগুলি রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিচ্ছিল। স্বয়ং সরকার মালিকদের বাধ্য করছিল কোন মজুরি বৃদ্ধির চুক্তি না করতে।

সংকটের ধুয়ো তুলে দেশকে বাঁচাবার তথা উৎপাদনকে রক্ষা করার জন্য দেশে দেশে মালিকশ্রেণী ও সরকার আবেদন জানাতে থাকে। শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে আবেদন করা হতে থাকে কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে-অফ মেনে নিয়ে এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবী না তুলে দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য। বিভ্রান্ত শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের নেতৃত্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলি মালিকদের এই আবেদনে সাড়া দেওয়া শুরু করে। স্বভাবতই, এই ভূমিকার সপক্ষে নতুন তত্ত্বও দাঁড় করাতে শুরু করেছিল কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা। প্রচার শুরু করা হয় দেশ আগে, শ্রেণী-স্বার্থ পরে। গোপন রাখা হয় যে, দেশ যেখানে মালিকদের কব্জায় সেখানে দেশের স্বার্থ মানে মালিকের ও মুনাফার স্বার্থ। শ্লোগান উঠে দেশ গঠনে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থত্যাগের, তবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় শ্রমিকদের সামাজিক স্বার্থ যাতে, সুরক্ষিত থাকে তা' ট্রেড ইউনিয়ন দেখবে।

১৯৬৯ সালে ব্রিটেনে লেবার পার্টির সরকার শিল্প-সম্পর্ক বিষয়ে এক 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশ করেছিল—'ইং প্রেস অব স্ট্রাইফ' বা বিরোধের পরিবর্তে। দেশের অর্থনীতির কল্যাণের জন্য সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে জাতীয় স্তরে এক ধরনের সামাজিক শান্তি চুক্তির পরোক্ষ প্রস্তাব করা হয়েছিল এই হোয়াইট পেপারে। ১৯৭১ সালে সেখানে গৃহীত হয় 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অ্যাক্ট'। সরকারের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের সার্বিক সমঝোতার সুযোগের সংস্থান করা হয়েছিল এই আইনে। আসলে ব্রিটিশ লেবার পার্টির সাথে ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন—ব্রিটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর সুদীর্ঘকাল সম্পর্ক ও সহাবস্থান এবং ঐ টি. ইউ. সি.-এর পক্ষ থেকেই সরকারের সাথে সমঝোতার প্রস্তাব, এইভাবে সরকারী আইনে গৃহীত হয়েছিল। অথচ সরকারের সাথে সমঝোতার প্রবণতা যখন ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নে অন্যতম মর্ম হয়ে উঠছে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রিয়াতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিক-মালিক বিরোধে সরকারের অযাচিত ও বর্ধিত হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে যাচ্ছিল। কিন্তু

ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়নের এই প্রবণতা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নে অচিরেই সংক্রমিত হতে শুরু করে, বিশেষত সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক বা লিবারাল চরিত্রের সরকারগুলি যেসব দেশে ছিল। এইসব সরকারগুলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশের অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মনোভাবও ছিল সহযোগিতামূলক।

ব্রিটেনে এই উদ্যোগকে নিজেদের শক্তির প্রকাশ বলে প্রচার করেছিল ট্রেড ইউনিয়ন। তারা দাবী করছিল, ট্রেড ইউনিয়ন সরকারের কাছ থেকে বর্ধিত সুযোগ আদায় করে নেবে মজুরিতে সংযমের বিনিময়ে। কিন্তু কার্যকালে সরকারের কাছ থেকে এমন সব তথাকথিত সামাজিক সুবিধা ট্রেড ইউনিয়ন অর্জন করে, যেগুলি অতীতে কখনো উত্থাপন করেনি অতি সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলিও।

১৯৭৪ সালে, ব্রিটেনে লেবার পার্টি তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার 'সোস্যাল কন্ট্রাক্ট'-এর বক্তব্য উত্থাপন করে এবং জয়ী হয়। সরকারের সাথে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে চুক্তি হয় তাতে শ্রমিকদের মজুরি সঙ্কোচনের ব্যবস্থা হয় সরকার তথা মালিকশ্রেণীর চরম স্বার্থানুকুল 'ইনকাম পলিসির' দ্বারা। এর বিনিময়ে সরকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস লেজিসলেশনের কতকগুলি ধারা বাতিল, নতুন আর্থনীতিক রণনীতি চালু এবং সামাজিক পরিষেবার ব্যবস্থামূলক কতকগুলি আইন প্রণয়নে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কার্যকালে প্রধান বিষয় হয়ে যায় 'ওয়েজ ফ্রীজ'। তথাকথিত 'সামাজিক চুক্তি' সর্বনাশ করে শ্রমিকশ্রেণী এবং পরিণামে ট্রেড ইউনিয়নের। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ ছাড়তে শুরু করে।

নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম ও ফিনল্যাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অনতিকালের মধ্যে এই ধরনের চুক্তি করেছিল সরকারের সাথে। এমনকি ফ্রান্সের ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন দু'টি ট্রেড ইউনিয়ন—সি. জি. টি.দ্বয়, অনুরূপ চেষ্টা শুরু করে। এর কিছু কাল পরই উদ্যোগ দেখা যায় গ্রীস, পর্তুগাল ও স্পেনের বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে এবিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয় পুনর্গঠন, স্ব স্ব দেশের বৈশিষ্ট্যভিত্তিক স্বাধীনভাবে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের পরিচালনা, জাতীয় সহমত, পার্লামেন্টারি পথে সমাজের পরিবর্তন ইত্যাদি সদ্য প্রচারিত তত্ত্ব জাতীয় সরকারের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের চুক্তি সম্পাদনের পথ প্রশস্ত করছিল। তবে প্রথমোক্ত আটটি দেশ ছাড়া আর কোন দেশের সরকার চুক্তি করতে এগিয়ে আসেনি। অথচ বিস্ময়কর ঘটনা হলো সরকার চুক্তিভঙ্গ করা সত্ত্বেও প্রায় সর্বত্র ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ, মজুরির প্রসঙ্গকে সামনে না আনা এবং সামাজিক চুক্তির পক্ষে ব্যাপক প্রচার করেছিল।

'সোস্যাল কন্ট্রাক্ট' ব্যবস্থাকে অভিহিত করা হয়েছিল 'সোস্যাল কমপ্যাক্ট', 'কন্টিনিউয়াস পার্টনারশিপ', 'বার্গেনিড্ কর্পোরেটিজ' ইত্যাদি নামেও। এই প্রবণতাকে বামপন্থী ও উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীদের কোন কোন অংশ নানা কোণ থেকে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। আলোচনাগুলির কিছু ছিল তত্ত্বগত, কতকগুলি ছিল ব্যবস্থাটির কাঠামো ও প্রয়োগের প্রসঙ্গ নিয়ে। আর. টাইলর যুক্তি তুলেছিলেন যে সমাজ ও অর্থনীতি প্রসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকারের মধ্যে মোটা দাগে চুক্তি হলেও, কার্যকালে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ট্রেড ইউনিয়নের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। মার্কসবাদীরা যথার্থভাবে ঘোষণা করেছিল যে এই ব্যবস্থা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্থিতাবস্থাকে সমর্থন করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়; শ্রেণী-সচেতনতা ও সংগ্রাম বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে বাধাপ্রাপ্ত হবে এর ফলে। হাইমান ও ব্রাও মনে করেছেন, এই ব্যবস্থা মূলধনের ক্ষমতাকে প্রান্তিকভাবে সামান্য আঘাত করলেও করতে পারে হয়তো, কিন্তু তাতে পুঁজির শক্তির কোন ইতর-বিশেষ ঘটবে না। গভীর আশঙ্কা থেকে অন্য বুদ্ধিজীবীদের কোন কোন ব্যক্তি বলেছিলেন যে এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের বিপর্যয় ঘনাবে। এইচ. এ. ক্রেগ মত প্রকাশ করেন যে 'সোস্যাল কন্ট্রাক্ট'কে যদি মালিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধ অংশ হিসাবেও বিবেচনা করা হয়, ট্রেড ইউনিয়নের উপর ক্ষতিকর ফল মালিকদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশী হবে। এটিকে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে স্থায়ী

জালে জড়িয়ে যাওয়া হিসাবে বিবেচনা করাই ভাল। তিনি আরও বলেছিলেন, "ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকারের মধ্যে অংশীদারীত্বের মডেলে ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। কেননা, এই ব্যবস্থায় বিপজ্জনকভাবে নিহিত রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের রাষ্ট্রের এজেন্সিতে রূপান্তরিত হওয়ার উপাদান।" উনবিংশ শতকে রোমান ক্যাথলিক ধারণাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক শক্তিগুলির গভীর সংযোগ সাধনের দ্বারা কর্পোরেট রাষ্ট্রের প্রস্তাবনা হয়েছিল। কোন কোন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এই সময়ে প্রস্তাবিত ও গৃহীত 'সোস্যাল কন্ট্রাক্ট'কে তদনুসারী বলেছিলেন; তাঁরা ভেবেছিলেন পুঁজির কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ করতেই এই প্রস্তাব।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ব্রিটেনে কনজারভেটিভ পার্টির জয় এবং অন্যান্য দেশে সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তি-ভঙ্গ করার ঘটনা ঐসব দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং ট্রেড ইউনিয়নকে গভীর সংকটের আবর্তে নিক্ষেপ করে। ফলে কোথাও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে, আবার কোথাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা ও আন্দোলন হলেও তা' শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। সমগ্র ঘটনাবলীতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর শ্রমিকদের আস্থা আরও নিম্নগামী হয়। এই পথ বেয়ে ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের 'থ্যাচারিজম' প্রতিক্রিয়া এগিয়ে আসে। আমেরিকায় 'রেগনমিকস্' ও অন্যান্য দেশে আরও চরম শ্রমিক-বিরোধিতার কাল-পর্ব শুরু হয়।

ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও ক্ষমতা হ্রাস

সত্তরের দশক থেকে সংঘটিত পূর্বোক্ত সমগ্র প্রক্রিয়ার ফলে আশির দশকের প্রথমার্ধ থেকে সারা উন্নত দুনিয়াতে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকে। কেবল ব্যতিক্রম ছিল কানাডা ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয় দেশগুলি। আশির দশকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন-ভুক্তির চিত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ

দেশের নাম	বছর	সদস্য সংখ্যা	মোট শ্রমশক্তির তুলনায় হার
অস্ট্রেলিয়া	১৯৮৪	৩০,২৮,৫০০	৫৫.০
বেলজিয়াম	১৯৮১	২৬,০০,০০০	৭৩.০
কানাডা	১৯৮২	৩৬,২০,০০০	৩৮.০
ফ্রান্স	১৯৮২	৩৮,৭৫,০০০	২২.৯
পশ্চিম জার্মানী	১৯৮২	৯০,০০,০০০	৪০.০
আয়ারল্যাণ্ড	১৯৮২	৬,৪১,০০০	৬০.৭
ইতালি	১৯৮২	৮৩,৯৯,০০০	৪৩.১
নেদারল্যাণ্ডস	১৯৮২	১২,৭৭,০০০	৩১.২
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৮৪	৪,৮৫,৪৮৪	৪২.১
নরওয়ে	১৯৮২	৬,৮০,০০০	৩৭.৬
সুইডেন	১৯৮০	৩৩,৬৪,৮২৪	৮১.৮
ব্রিটেন	১৯৮৫	১,০৭,১৬,০০০	৪৩.৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯৮৪	১,৭৩,৩২,৪৭২	১৮.৮

সদস্যভুক্তি কমে যাওয়া ছাড়াও, ট্রেড ইউনিয়নের ঐতিহাসিক প্যাটার্নের মধ্যেও ভাঙ্গন এই সময় সৃষ্টি হয়। ট্রেড ইউনিয়নের গঠন ও ভূমিকার মধ্যে দু'টি করে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক মিল ছিল। যেমন ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা, পশ্চিম জার্মানি ও সুইডেন প্রভৃতি এই পর্বে তা' সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। এই সময় থেকে ঐ জোড়া জোড়া দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্ব স্ব দেশের বাস্তবতার আদল গ্রহণ করে অর্জন করতে থাকে স্বকীয়তা। তাছাড়া, শ্রমিকশ্রেণীর বিন্যাসে পার্মানেন্ট ওয়ার্কারের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়া এবং 'পার্ট-টাইম ওয়ার্কার', 'সেলফ-এমপ্লয়েড ওয়ার্কার' ইত্যাদির উপাদান ও সংখ্যা বৃদ্ধি ট্রেড ইউনিয়নের ঐতিহাসিক পরম্পরার মধ্যে দারুণ সমস্যা সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল।

সদস্য-সংখ্যা কমে যাওয়া, ট্রেড ইউনিয়নের চিরায়ত প্যাটার্নের ভাঙ্গন, ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক ও ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গ নিয়ে নতুন ধরনের বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল এই সময়ে। বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদদের একাংশ বলেন যে উৎপাদনের রূপের পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রভাব, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্র্যাসির ব্যবস্থা, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, রাষ্ট্রীয় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপক প্রবর্তন ইত্যাদির ফলে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বই সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। একে বলা হচ্ছিল ট্রেড ইউনিয়নের 'টোটাল ইরেলিভ্যান্স থিওরি' অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। আসলে এটা ছিল, সর্বকালের মত, এই সময়ের মালিকশ্রেণীর উদগ্র কামনার অভিব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে এই লক্ষ্যে মালিকপক্ষ নানা কৌশল নিতে শুরু করেছিল যাতে শ্রমিকদের সামনে নিজেদের 'গুড এমপ্লয়ার'-এর চেহারা তুলে ধরা যায়, এবং শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের শরণাপন্ন না হয়ে মালিকের অনুগামী হয়। অপর এক ধরনের সংস্কারবাদী ধারা উত্থাপন করছিল ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে 'পলিটিকাল ইরেলিভ্যান্স থিওরি' (এস. এম. সিপেস্ট সম্পাদিত 'ট্রেড ইউনিয়ন ইন ট্রানজিশন')। এঁদের মতে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক শিল্পে এক ইউনিয়ন, 'নো-স্ট্রাইক এগ্রিমেন্ট', ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক ইত্যাদি মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। এডওয়ার্ডস, গারকোনা, টড্লিং প্রমুখ মনে করেছেন একমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে না। 'ফাংশোনালিস্ট থিসিস' দাবী করে যে নতুন শিল্পায়ন সবসময় নতুন চাহিদা সৃষ্টি করে এবং তা' পূরণে অন্যতম ভূমিকা পালন করার স্বার্থেই ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজন হয়; কিন্তু ইতিহাসে পরিচিত শিল্প-বিকাশের চরিত্র বহন করে না পুঁজির বর্তমান কালের বিকাশ ধারা বরং ভিন্ন ইঙ্গিত দেয় এবং এই নতুন বিকাশ নিজেই নতুন চাহিদা পূরণে সক্ষম। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ন, অন্ততপক্ষে প্রচলিত চরিত্রের ট্রেড ইউনিয়ন, এখন আর অনিবার্য প্রয়োজন নয়। 'ফাংশোনালিস্ট থিসিস'-এর অভ্যন্তরেই গড়ে ওঠে 'সিস্টেমস্ থিওরি' (পার্সনস ও স্মেলসার)। এই মতের প্রবক্তারা বলেছিলেন যে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন অংশের দ্বারা সমাজে এক ধরনের ব্যবস্থা (সিস্টেম) গঠিত হয়ে থাকে। কোন কারণে এই ব্যবস্থার (সিস্টেম) অংশীদার কোন অংশের যদি পরিবর্তন ঘটে, তবে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য অন্যান্য অংশের পরিবর্তন ঘটাতে হয়। পুঁজি, মালিকশ্রেণী, শিল্প প্রভৃতির যেহেতু বর্তমানে পরিবর্তন ঘটেছে, ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তন না করলে ভারসাম্যের স্বাভাবিকতা অর্জিত হবে না। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়নের বর্তমান চরিত্রের পরিবর্তন আবশ্যিক। আর একদল প্রবক্তা উত্থাপন করেন 'ট্রেড ইউনিয়ন কস্ট-বেনিফিট থিওরি'। এঁদের মতে শ্রমিকরা যখন দেখে যে ট্রেড ইউনিয়নের জন্য তাদের ব্যয়, অর্থাৎ চাঁদা দেওয়া, সভা-সমিতি বা মিছিল-মিটিং-এর জন্য সময় ও শ্রম ব্যয়, সংগঠনভুক্ত হওয়ার জন্য শ্রমিকের প্রতি মালিকের মনোভাব ও বৃত্তিজীবনে তার ফলাফল ইত্যাদি ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা অর্জিত আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার চেয়ে কম কেবল তখনই ট্রেড ইউনিয়নে সদস্য হয় তারা। বিপরীতটি ঘটলে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে চাইবে না শ্রমিকরা। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হলে যদি শ্রমিকের মজুরি ও চাকুরীগত বিষয়গুলিতে লোকসান হয় তবে তারা সংগঠনের সদস্য হবে না। এখন যেহেতু শেষোক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও শ্রমিকের লোকসান ঘটবে, সেহেতু ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যশূন্য হয়ে ধীরে ধীরে বিলীন হবে। এই ধারার সামান্য পরিমার্জন করে তৈরি হয়েছিল 'প্রসপারিটি থিওরি অব ট্রেড ইউনিয়ন গ্রোথ' (এইচ. বি. ডেভিস রচিত 'থিওরি অব ট্রেড ইউনিয়ন গ্রোথ' শীর্ষক আলোচনা; ডব্লু. ই. জে. ম্যাকার্থি সম্পাদিত ' ট্রেড ইউনিয়নস')। এই তত্ত্বে বলা হয়েছিল যে ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ সমান্তরালে নির্ভর করে সমকালে সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক তৎপরতা ও উন্নয়নের (প্রসপারিটি) স্তরের উপর। অর্থনৈতিক-ভাবে উন্নত দেশে এবং শ্রমিকদের উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থান থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনে যোগদানের ঝুঁকি নিতে পারে শ্রমিকরা; কেননা এই পরিস্থিতিতে শ্রম-বাজারে বিকল্প বৃত্তির সুযোগ অনেক বেশি থাকে (ওলম্যান)। আলোচ্য কাল-পর্বে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে

যেহেতু সংকট ছিল ব্যাপক এবং মুদ্রাস্ফীতি ও ছাঁটাই-এর জন্য শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থান নীচে নেমে যাচ্ছিল, তাই ট্রেড ইউনিয়নে ও আন্দোলনে শ্রমিকের যোগদানের বাস্তবতা কমে যাচ্ছে বলে 'প্রসপারিটি'-তাত্ত্বিকরা দাবী করেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও ক্ষমতা ক্ষয়ের পেছনে এই ধরনের বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করেছিলেন পূর্বোক্ত তাত্ত্বিকরা।

কিন্তু এইসব তত্ত্ব রচনা করা হয়েছিল উৎপাদন ব্যবস্থার নির্দিষ্ট চরিত্র ও রূপ নিয়ে গভীরভাবে আলোচনার পরিবর্তে এবং সৃষ্ট সমস্যার কার্যকারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে, নিছক ফলাফলের স্বরূপ থেকে। ফলে সমস্ত আলোচনা 'সাবজেকটিভ' চরিত্র নেয়। ট্রেড ইউনিয়নের ঘনায়মান বিপর্যয় সম্পর্কে এঁরা সবাই ঐকমত্য ছিলেন; তাই ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থার কেন বিলোপ হবে একমাত্র সে ব্যাপারে পথ হাতড়াচ্ছিলেন। তত্ত্বগুলির কিছু কিছু উপাদান অংশত হয়তো ঠিক ছিল। কিন্তু মূলত, যা বেঠিক ছিল, তা' হলো ট্রেড ইউনিয়ন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে বিলুপ্ত হওয়ার নয় আশঙ্কা মত, সেকালে এবং শেষ পর্যন্ত তা' ঘটেওনি।

শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজনের ফলাফল ও ট্রেড ইউনিয়ন

এই কাল-পর্বে শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজনের নতুন পরিবর্তনমুখীন প্রক্রিয়ায় (চেঞ্জিং ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন অব লেবার বা সি. আই. ডি. এল.) চারটি প্রধান দিক গড়ে উঠছিল, যা দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামনে হাজির করেছিল নতুন চ্যালেঞ্জ। সেগুলি হলো : (ক) বিশ্ব-ব্যাপী শিল্প-শ্রমের বিশাল মজুতবাহিনী সৃষ্টি হওয়া; (খ) বিশ্বের সমগ্র শ্রম-শক্তিকে খণ্ড খণ্ড ও বিভক্ত রাখা ও ব্যবহার (গ) প্রত্যক্ষ দমনাত্মক ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত রাষ্ট্রশক্তির নেতৃত্বে তৃতীয় দুনিয়াতে নতুন শিল্পায়ন এবং (ঘ) উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে বিশ্বব্যাপী সর্বহারাকরণ।

(ক) বিশ্বব্যাপী শ্রমের মজুত বাহিনী ও ট্রেড ইউনিয়ন

১৯৮৭ সালের এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল যে বিশ্বে বেকারের সংখ্যা জনসংখ্যা বা শ্রমবাহিনীর বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর গতিতে বাড়ছে। ১৯৮৭ থেকে এই শতাব্দীর শেষের মধ্যবর্তীতে বিশ্ব-জনসংখ্যা ৩১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৬০০ মিলিয়ন থেকে ৬,০৫০ মিলিয়নে পরিণত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছিল। সম-সময়ের মধ্যে শ্রমবাহিনী ৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৪০০ মিলিয়ন থেকে ৩,৬০০ মিলিয়ন হবে। কিন্তু তৎকালের চলতি অর্থনীতির প্রবণতা ভবিষ্যতে যদি একই থাকে, তবে বৃত্তির বা কর্মের সুযোগহীন মানুষের সংখ্যা (বেকারি) ৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯০০ মিলিয়ন থেকে ১,৫৪০ মিলিয়নে দাঁড়াবে। উদ্বৃত্ত শ্রম-শক্তির এই চিত্র, স্বভাবতই ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছিল যে, বিশ্বব্যাপী শ্রমের শক্তি নেতির প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে। এর ভিত্তিতে কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক তখন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রকৃত মজুরির উপর চাপ সর্বত্র, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায়, বাড়তে শুরু করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রায় সমস্ত বেকারদের উপার্জনশীল শ্রমের সুযোগ প্রাপ্তির ফলে শিল্পস্তরে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী সুদৃঢ় হয়েছিল। কিন্তু ষাটের দশকের শেষার্ধ থেকে মুনাফার হারে পতন শুরু হলে সত্তরের দশক থেকে বেকারদের পূর্ণ নিয়োগ অথবা ভর্তুকি দানের ব্যবস্থা সরকার ও মালিক শ্রেণী পরিত্যাগ করা শুরু করে। শুরু হয় স্বদেশ থেকে তৃতীয় দুনিয়ায় পুঁজি ও শিল্প অপসারণ করা, যাতে মুনাফার হারকে রক্ষা করা যায়। শ্রমিকশ্রেণীর উপর ব্যাপক আক্রমণ (১৯৮৪-৮৫ সালে ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচার সরকারের ভূমিকা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্মরণীয়) শুরু হয়। শ্রম-শক্তির তুলনায় ক্রমবর্ধমান কাঠামোগত বেকারি, পশ্চিমি ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দাবী ও আন্দোলনের অগ্রাধিকার পরিবর্তনে বাধ্য করতে থাকে। মজুরি বৃদ্ধির দাবীর পরিবর্তে শ্রমিকদের বৃত্তির নিরাপত্তার দাবী প্রধান হয়ে ওঠে।

তৃতীয় দুনিয়ার যেসব দেশ শিল্পায়নের উদ্যোগ নিয়েছিল, সেখানে প্রথমদিকে অবশ্য কিছুটা সৃষ্টি হচ্ছিল ভিন্ন পরিস্থিতি। পুঁজির সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি ঘটছিল সক্রিয় মজুরিভোগী শ্রমিকের সংখ্যা। তবে এটাও ঠিক যে প্রচণ্ড সীমাবদ্ধ বাজারের জন্য দেশের সীমানার ভেতরের বা বাইরের উদ্বৃত্ত

শ্রম-শক্তির কর্মের সংস্থান করা সম্ভব হচ্ছিল না। এর প্রভাব বিশেষত অনুভূত হচ্ছিল সেইসব দেশে, যারা বিদেশে শ্রম-শক্তি রপ্তানি করার বা দেশের ভেতরে শিল্প-ক্ষেত্র গঠনের দ্বারা নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির রণনীতি গ্রহণ করেছিল। এদিকে আন্তর্জাতিক শ্রমের বাজারে শ্রম-বিক্রয়ের সীমানা সংকুচিত হতে শুরু করেছিল এই সময়। বেকারীর এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কিভাবে মোকাবিলা করা হবে তা' প্রথম ও তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামনে হয়ে দাঁড়াচ্ছিল অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। উন্নত দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলি কিছুটা সংরক্ষণবাদী পথ নেয়, দাবী করতে থাকে যে দেশ থেকে শিল্প ও পুঁজি বিদেশে স্থানান্তরিত করা যাবে না। উন্নত দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে মালিকদের মুনাফাশীলতা বিকাশের স্বার্থে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং র‍্যাশনালাইজেশন, শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস, মজুরি অচল রাখা বা কমানো ইত্যাদি মেনে নিতে শুরু করেছিল। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং বাড়ছিল।

(খ) বিশ্ব-বাজারে শ্রমবাহিনীর খণ্ডিকৃতভাবে সংস্থাপন ও ট্রেড ইউনিয়ন

বিশ্ব-পরিসরে মজুত শ্রমবাহিনীর আবির্ভাব সম্পর্কযুক্ত হচ্ছিল বিশ্ব-বাজারের পরিবর্তনের সাথে—যে বাজার রচিত হচ্ছিল আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমিকবাহিনীকে খণ্ড খণ্ড ভাবে সংস্থাপনের দ্বারা। পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক শ্রমের বিভাজনের (চেঞ্জিং ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন অব লেবার তথা সি. আই. ডি. এল.) দুই রূপ যা উত্তরে (উন্নত দুনিয়ায়) উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পকে উৎসাহিত করছিল এবং দক্ষিণে (অনুন্নত দেশগুলি) শ্রম-নিবিড় শিল্পকে সহায়তা দিচ্ছিল, তা' প্রথম ও তৃতীয় দুনিয়ার শ্রমিকদের বহমান সামগ্রিক বাস্তবতার অভ্যন্তরে গভীর বিভাজন আনছিল। উন্নত দেশগুলিতে উচ্চ মজুরীর ও অধিকতর দক্ষ শ্রমিক এবং অনুন্নত দুনিয়ায় নিম্ন-মজুরির, নিম্ন-দক্ষতার প্রান্তিক শ্রমিক ও বেকার শ্রমিক। তাছাড়াও খণ্ডিকরণ ঘটছিল বর্ণ ও শিক্ষার ভিত্তিতে। শেষোক্তরা সর্বত্র সাধারণভাবে ছিল অসংগঠিত অর্থাৎ ইউনিয়নভুক্ত নয়। খণ্ডিকরণের আর এক রূপ দেখা যায় প্রথম ও তৃতীয় দুনিয়া নির্বিশেষে। শ্রমের বাজার সুস্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত হতে থাকে—প্রাইমারি বা প্রধান এবং সেকেণ্ডারি বা অধীনস্থ হিসাবে। প্রাথমিক শ্রমের বাজার প্রযুক্তিবিদ, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ শ্রমিক এবং বৃত্তিতে উন্নতির সুযোগ-সুবিধা, স্বীয় উদ্যোগের অধিকার ইত্যাদি দ্বারা নির্দিষ্ট হচ্ছিল। অন্যদিকে অধীনস্থ শ্রমের বাজার গঠিত হচ্ছিল নিম্ন-মজুরি, বৃত্তির নিরাপত্তাহীনতা, দুর্বল শ্রম-পরিবেশ, প্রাথমিক ধরনের কাজ বা উৎপাদনমূলক নয় এমন শ্রমের দ্বারা। শেষোক্তরা অসংগঠিত ছিল অধিকাংশ দেশে এবং ক্ষেত্রে। এই সমগ্র পরিস্থিতিও ট্রেড ইউনিয়নের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ হাজির করে।

(গ) তৃতীয় দুনিয়ায় নির্দয়-শিল্পায়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন

'লেবার কন্ট্রোল' তথা শ্রম-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি 'লেবার-প্রসেস' বা শ্রম-প্রক্রিয়ার চাহিদার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; কিন্তু উৎপাদনের শর্তাবলী (কণ্ডিশনস অব প্রোডাকশন) গঠিত হয় কর্মক্ষেত্রের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ আরোপের দ্বারা—বাজার ও সরবরাহ ব্যবস্থায় মালিকের মুনাফার একান্ত প্রয়োজনে। 'অরগানাইজেশন অব ওয়ার্ক' বা শ্রম-নিষ্কাশনের কাঠামো যুক্ত থাকে 'পলিটিকস অব প্রোডাকশন' তথা উৎপাদনের রাজনীতির সাথে, যা প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র-শক্তি। আলোচ্যকালে লক্ষ্য করা গেল যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটছে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না করার মধ্য দিয়ে। মূলধনের আন্তর্জাতিক গতিশীলতার ফলে শিল্পে র‍্যাশনালাইজেশন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও শ্রম-নিষ্কাশনের তীব্রতার মুখে শ্রমিকশ্রেণী যখন অসহায় পরিস্থিতিতে পড়েছে, তখন রাষ্ট্র নির্বাক ভূমিকা নিতে থাকে। রাষ্ট্র এইভাবে পরোক্ষে ভূমিকা নিচ্ছিল মালিকশ্রেণীর পক্ষে। এর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত, পুঁজির বিকাশে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ক'রে, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দ্বারা শ্রমকে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে শ্রমকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছাড়তে বাধ্য করা কেবল নয়, মূলধনকে বাড়তি সুযোগ দিতে সহায়তা করছিল রাষ্ট্র-শক্তি। অতীতে শ্রমিকের সামনে চাকুরীচ্যুত হওয়ার কদাচিৎ আশঙ্কা, এইসময়ে পুঁজির দেশান্তর, কারখানা বন্ধ, উৎপাদনের পরিবর্তন বা পুঁজি বিনিয়োগ বন্ধের পদ্ধতির দ্বারা স্থায়ী ভীতিতে পরিণত হচ্ছিল। অন্যদিকে আধা-প্রান্তিক দেশগুলির

মধ্যে, যেমন ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকায়, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদনে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি-বহির্ভূত দমনের পথ গ্রহণ করে। নতুন করে শিল্পোন্নয়নে উদ্যোগী প্রান্তিক দেশগুলি, বিশেষত যারা নির্ভর করছিল 'এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন'-এর উপর, তারা গ্রহণ করতে থাকে সরাসরি রাষ্ট্রীয় স্বৈরতান্ত্রিক পথ। এইভাবে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্বয়ং 'পলিটিকস অব প্রোডাকশন'-এর অন্যতম রূপ হিসাবে আবির্ভূত হয়।

সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের সামনে এই উপাদান প্রবল সমস্যার কারণ হচ্ছিল।

(ঘ) বিশ্বব্যাপী সর্বহারাকরণের প্রক্রিয়া ও ট্রেড ইউনিয়ন

মূলধনের ও উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট হতে থাকে যে উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সমস্ত সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের অভিজ্ঞতায় এক ধরনের সমতা সৃষ্টি হচ্ছিল;এই সম-অভিজ্ঞতার প্রধানতম দিক ছিল সারা বিশ্বে শ্রমের বাজারে শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার আমানত বৃদ্ধি। এই অবস্থাকে, প্রাথমিকভাবে, চিহ্নিতও করা হচ্ছিল 'গ্লোবাল-প্রলেটারিয়ানাইজেশন' বা বিশ্ব-সর্বহারাকরণ প্রক্রিয়া হিসাবে। কিন্তু উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণের যে সমস্ত উপাদানের প্রভাবে দুনিয়াময় সর্বহারাকরণ ঘটছিল, তাতে সৃষ্টি হচ্ছিল সংশ্লিষ্ট দেশ ও সমাজের অসম বিকাশ। বিশ্ব-ধনতন্ত্রের নতুন অভিঘাত শ্রমিকশ্রেণীর গঠন ও চেতনাকে জাতীয়তার স্তরেই আবদ্ধ এবং তার ভিত্তিতে পরিপুষ্ট ও গঠন করছিল।

বিশ্বময় গড়ে ওঠা বিপুল প্রতিকূলতার অভ্যন্তরে পূর্বোক্ত চারটি উপাদান, সততই দাবী করছিল সংগঠিত বিশ্ব-মূলধনের আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্য ও ভূমিকা। কিন্তু সেই প্রয়াস তখন কার্যত কোন বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র থেকে নেওয়া হয়নি কিম্বা নেওয়ার মতো সামর্থ ট্রেড ইউনিয়ন হারিয়ে ফেলেছিল।

শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ট্রেড ইউনিয়ন

ষাটের দশক থেকে শ্রমকে তথা শ্রমিককে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা (লেবার-কন্ট্রোল) বিশ্ব-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাতে হয়ে দাঁড়াচ্ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের (সোস্যাল রিলেশনস অব প্রোডাকশন) অভ্যন্তরে এটি একটি স্বতন্ত্র দিক। উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয় একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের উৎপাদন ব্যবস্থার (দাস ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ইত্যাদি) উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। অর্থাৎ পণ্য বা সামগ্রী অথবা পরিষেবা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তি বা বস্তুগত পদ্ধতি এবং তার সাথে যুক্ত 'সোস্যাল রিলেশনস' (সামাজিক সম্পর্ক) বা 'পাওয়ার রিলেশনস' (ক্ষমতা-সম্পর্ক)। অর্থাৎ শোষক ও শোষিতের মধ্যে, শোষক শ্রেণীগুলির নিজেদের মধ্যে এবং শোষিত শ্রেণীগুলির নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমগ্র সামাজিক সম্পর্ক এবং তার সাথে উৎপাদনের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে শ্রেণীগুলির অবস্থান। যে কোন শোষণভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের মালিকরা থাকে কর্তৃত্বকারী, অন্য অংশগুলি থাকে অধীনস্থ। এই ক্ষমতাধর ও ক্ষমতাহীনদের মধ্যে সম্পর্ক একই সাথে সামাজিক সম্পর্ক ও ক্ষমতা-সম্পর্ক। কিন্তু শ্রম তথা শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণে (লেবার-কন্ট্রোল) রাখার সমগ্র প্রণালীটি হলো উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি, উদ্বৃত্ত মূল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, রণনীতি ও প্রযুক্তির প্রয়োগ। এই প্রণালীগুলির সাহায্যে শ্রমের ওপর কর্তৃত্ব ও শ্রমকে উদ্যোগী করাকে বলা হয় লেবার-কন্ট্রোল বা শ্রম-নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপক প্রসঙ্গের তুলনায় শ্রমের নিয়ন্ত্রণ অতীব সীমাবদ্ধ প্রসঙ্গ,কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি ও শোষণ তীব্রতর করার বিষয়ে উৎপাদনের মালিকদের হাতে অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। অবশ্য উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সবসময় নিহিত থাকে কোন না কোন পদ্ধতির শ্রম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। সমস্ত ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থাতেই সংশ্লিষ্টকালের শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে পুঁজিবাদের পক্ষ থেকে শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার

পরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া শুরু হয়। এই নতুন পর্ব শুরু হয়েছে ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পায়নের কালে, বিশেষত বিদ্যুতের আবিষ্কার ও শিল্প-উৎপাদনে বিদ্যুতের ব্যবহারের সময় থেকে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে লেবার-কন্ট্রোল বা শ্রম-নিয়ন্ত্রণের সাথে লেবার-ম্যানেজমেন্ট বা শ্রম-ব্যবস্থাপনার পার্থক্য রয়েছে। লেবার-ম্যানেজমেন্ট এক সামগ্রিক ধারণা ও ব্যবস্থা; শ্রম-নিয়ন্ত্রণ তার এক অংশ। শ্রম-নিয়ন্ত্রণ থেকে ধীরে ধীরে শ্রম-ব্যবস্থাপনার ধারণার আবির্ভাব ঘটেছিল। বলা যায় যে লেবার-ম্যানেজমেন্টকে সুচতুর, ব্যাপক, নিপুণ ও নিখুঁত করার মধ্য দিয়ে শ্রম-নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত ও পরিচিত সমস্ত কর্কশ ও নগ্ন রূপকে অনেকটা ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য এই শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সুনির্দিষ্ট ধরনের ম্যানেজারিয়াল ক্লাস বা ব্যবস্থাপক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। তারপর থেকে কার্যত সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের 'ম্যানেজারিয়াল রেভলিউশন' বা ব্যবস্থাপনার বিপ্লব। শিল্প-উৎপাদনে তৃতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ব্যবহার ও চমকপ্রদ সাফল্যের পাশাপাশি নতুন ধরনের ম্যানেজারিয়াল ব্যবস্থা বিকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্ভবত সর্বাধিক। অবশ্য আলোচ্য কালে 'ম্যানেজারিয়াল ক্লাস'-এর ভূমিকা প্রধানত লেবার-ম্যানেজমেন্ট প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় শক্তি হয়ে দাঁড়াল এই 'ম্যানেজারিয়াল ক্লাস'। তার অর্থ এই ছিল না যে উৎপাদনে মালিকদের কর্তৃত্ব ও ভূমিকা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তবে সেই শক্তি খানিকটা সীমাবদ্ধ হতে শুরু করেছিল এবং খর্বিত শক্তি ধীরে ধীরে অর্পিত হচ্ছিল ম্যানেজারিয়াল ক্লাসের উপর; ফলে নতুন ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাতে কিছুটা ভগ্নাংশ শক্তি হিসাবে অবস্থান নিতে শুরু করে মালিকরা। (এখানে 'ক্লাস' বলতে মার্কসবাদী ধ্রুপদী ধারণা ব্যবহৃত হচ্ছে না)। শোষকশ্রেণীর সার্বিক স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধি হলো শ্রম-নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ। ম্যানেজারিয়াল ক্লাসের দ্বারা শ্রম-নিয়ন্ত্রণের ভূমিকার বাহ্য লক্ষ্য স্থির হয়েছিল শ্রমিকের কাছ থেকে উচ্চতর উৎপাদনশীলতা ও শ্রম নিংড়ে নেওয়া কিন্তু তার চেয়েও বড় লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল—যে কোন উপায়ে পুঁজির মুনাফা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি। তাছাড়া, ম্যানেজারদের বিশেষ দায়িত্ববদ্ধ করা হচ্ছিল প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারের সমস্ত পূর্বশর্ত প্রস্তুত এবং প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ স্থায়িত্ব গঠনে।

দেশীয় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার জন্য গড়ে ওঠা ম্যানেজারিয়াল ক্লাসের পাশাপাশি সত্তরের দশক থেকে বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে আর এক ধারার ম্যানেজারিয়াল ক্লাসের উদ্ভব ও বিকাশ হতে থাকে, যাদের লক্ষ্য ও ভূমিকা নির্ধারিত হচ্ছিল আন্তর্জাতিক স্তরে ভূমিকা গ্রহণের জন্য। একটি বহুজাতিক সংস্থার জন্য আনুষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করলেও আসলে এরা গ্রহণ করছিল সরকারী বা আধা-সরকারী চরিত্রের অবিভাজ্য আন্তর্জাতিক সংগঠিত শক্তির রূপ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভূমিকা পালনকারী এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্সি হিসাবে। এই উদ্ভিন্ন উপাদানটি ছিল শ্রম-নিয়ন্ত্রণের বিশ্ব-রণনীতিগত এক অংশ।

কোন সমাজের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য এবং আয় ও সম্পদের বন্টনের অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে, শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমকে উদ্যোগী করা ম্যানেজারিয়াল গোষ্ঠীর সর্বক্ষণের দায়িত্বের অন্তর্গত করা হয় এই সময়। সর্বত্রই উৎপাদনে শ্রমের খরচ কমানোর জন্য সর্বপ্রযত্ন প্রয়াস চালানো শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রধানতম উদ্দেশ্য থাকে। এক্ষেত্রে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির শ্রম সর্বপেক্ষা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তার ফলে লেবার-কন্ট্রোল পদ্ধতির ভর উন্নত দুনিয়া থেকে এইসময়ে সরে আসতে থাকে তৃতীয় দুনিয়ায়।

দমনমূলক পথে অথবা চাপ সৃষ্টি করে বা নানাভাবে বাধ্য করে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ও সর্বজনীন পদ্ধতির মধ্যে নতুন এক উপাদান যুক্ত হচ্ছিল গত শতাব্দী থেকে। এই নতুন উপাদানটি হলো বস্তুগত উৎসাহদানকারী ব্যবস্থা। তৃতীয় ব্যবস্থা হিসাবে আসে শ্রমিককে দিয়ে উৎপাদনে আদর্শ স্থাপন করানোর (মরাল বা নরমাটিভ) ব্যবস্থা। যদিও শেষোক্তটি যতটা লেবার-কন্ট্রোলের অন্তর্গত, তার চেয়ে বেশি গৃহীত হতে শুরু করে লেবার-ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে।

শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে 'কোয়ারশন' বা দমনমূলক পথ দু'ধরনের—দৈহিক ও আর্থনীতিক।

শ্রমিক যথোপযুক্তভাবে কাজ করে প্রয়োজনীয় উৎপাদন ও মুনাফা সৃষ্টি করতে না পারলে তাকে মারধোর করা, আটকে রাখা, জেল খাটানো ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হতো দৈহিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গৃহীত হতো মজুরি কেটে নেওয়া, কমিয়ে দেওয়া, জরিমানা করা, ছাঁটাই প্রভৃতি। বস্তুগত উৎসাহ দানের দ্বারা শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 'কোয়ারশন'-এর নেতিবাচক প্রয়াসের পরিবর্তে ইতিবাচক তৎপরতা। ভাল কাজ করার জন্য শ্রমিককে থোক টাকা পুরস্কার দেওয়া, বাড়তি আর্থিক সুযোগ দান, পদোন্নতি প্রভৃতি এই পদ্ধতির অন্তর্গত হচ্ছিল। 'মরাল' বা 'নরমাটিভ' তথা আদর্শ স্থাপন করতে শ্রমিককে উদ্যোগী করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছিল মনস্তাত্ত্বিক ও আদর্শগত স্তরে।

শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণের মূলত চার ধরনের পদ্ধতি গৃহীত হচ্ছিল। প্রথম পদ্ধতি হলো 'অ্যাগ্রেরিয়ান কোয়ারশন' বা কৃষি ক্ষেত্রে দমন-মূলক পদ্ধতিতে (কৃষি) শ্রমজীবীদের নিয়ন্ত্রণ। এই প্রসঙ্গ উল্লেখের কারণ হলো যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ এইসময়ে ছিল অনুন্নত ও কৃষি-প্রধান। সুতরাং ভূস্বামী, কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ীরা কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য উৎপাদন ও মুনাফা নিংড়ে নিতে যে শ্রম-নিয়ন্ত্রণ চালাতো, তা' ছিল দমনমূলক। এজন্য ভাড়াটে গুন্ডা, পুলিশ ইত্যাদি ব্যবহার ছিল সর্বজনীন ব্যবস্থা। দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল 'এমপ্লয়ার ডমিনেশন' বা মালিকের প্রভুত্ব। প্রধানত এই পদ্ধতি তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে অবলম্বিত হয়ে আসছিল। শিল্পে পরাম্পরাগত, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মালিকানা ও তাদের দ্বারা সর্বময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এসব দেশে সর্বজনীন ব্যবস্থা হিসাবে চালু ছিল। দৈহিক দমন-পীড়নের পথ ছাড়াও এক্ষেত্রে অবলম্বিত প্রথা ছিল 'ইকনমিক কোয়ারশন' বা আর্থনীতিক দমন-পীড়ন। এটা অবলম্বিত হতো প্রধানত চাকুরী থেকে ছাঁটাই বা নিয়োগ বন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে। তৃতীয় পদ্ধতি হলো 'পাওয়ার বার্গেনিং' বা ক্ষমতার দর-কষাকষি। এই ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছিল বস্তুগত পুরস্কার প্রদানের দ্বারা শ্রমিককে উদ্যোগী করার ব্যবস্থাপনার প্রণালীতে। এটাকে পাওয়ার বার্গেনিং বলা হচ্ছিল এই কারণে যে এই পুরস্কারের—তা' থোক টাকা, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট, অন্যান্য আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির—চরিত্র, স্তর, পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারিত হতো শ্রমিকরা কতটা উৎপাদনে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা বা সংগঠিত বা ব্যক্তিগতভাবে মালিকের শক্তির বিরুদ্ধে দর-কষাকষির ক্ষমতা রাখে তার উপর। চতুর্থ পদ্ধতি হলো 'সেন্ট্রাল প্ল্যানিং' বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে 'মরাল' বা 'নরমাটিভ ইনসেনটিভস' বা শ্রমিককে দিয়ে উৎপাদনে নৈতিকতা তথা আদর্শ স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়। এই পদ্ধতি, যেসব রাষ্ট্রে কেন্দ্রিকতাভিত্তিক পরিকল্পনা চালু ছিল, সেইসব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। প্রকৃত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পদ্ধতির প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশেই ঘটতো। কিন্তু অনেকটা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পদ্ধতি তৃতীয় দুনিয়ার কয়েকটি দেশও মিশ্র-অর্থনীতির নামে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেইসব দেশে স্থায়ীভাবে আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ করে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা তেমন কার্যকরী হয়নি। শেষোক্ত দেশগুলিতে আদর্শের প্রশ্নে জাতীয়তাবাদ বা ক্ষেত্র বিশেষে উগ্র জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে সাময়িক সাফল্য কখনো এলেও তা' আদৌ স্থায়ী হয়নি। কেননা দেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থা মূলগতভাবেই ছিল ধনতান্ত্রিক তথা শোষণভিত্তিক।

শ্রম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ও যে সুনির্দিষ্ট দিকগুলি উল্লেখ করা হলো, তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের উপর সেগুলির প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা যেতে পারে। এইসময়ে, অর্থাৎ বিশ্ব-পুঁজিবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী স্তরে শিল্পোন্নত দেশগুলির ও আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয় ম্যানেজারিয়াল ক্লাসের ভূমিকার কি প্রভাব তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের উপর পড়ছিল, সেটাই অংশত বিবেচ্য।

পুঁজিবাদের বিগত বিগত দু'শ বছরের ইতিহাসে দেখা গেছে, ধ্রুপদী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোন ধরনের শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, দেশটি নিজ প্রভাবিত বা অধীনস্থ অথবা অন্য যে দেশে লগ্নী করে বা বাণিজ্য করে, সেইসব দেশে নিজেদের শ্রম-নিয়ন্ত্রণও রপ্তানি করে এসেছে। বিশেষত যেকালে বিশ্ব-অর্থনীতিতে যে দেশ প্রাধান্য বিস্তার করতো সেকালে সেই দেশের শ্রম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার 'মডেল' অনুকরণ করার চেষ্টা করতো অন্য দেশ। তার ফলে নতুন শ্রম-নিয়ন্ত্রণ

ব্যবস্থার মডেল যেমন উদ্ভাবিত দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতো, রপ্তানিকৃত দেশেও অংশত সেই ধরনের প্রক্রিয়া গড়ে উঠতো। এই শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী স্তর থেকে শুরু করে উপনিবেশবাদী স্তর পর্যন্ত এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে উন্নত ধনতন্ত্র তাদের অধীন, আধা-অধীন বা প্রভাবিত দেশগুলিতে শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রপ্তানি করার সময়, সংশ্লিষ্ট দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই মডেলের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নিচ্ছে, যাতে তা' রপ্তানিকৃত দেশে সর্বাধিক কার্যকরী হতে পারে। এটাও দেখা গেছে যে পুরাতন শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থেকে নতুনে প্রবেশ সংশ্লিষ্ট দেশের ট্রেড ইউনিয়নের চিরাচরিত পরিস্থিতি ও অবস্থার সামনে প্রবল সমস্যা সৃষ্টি করেছে।পরিস্থিতির এই ধরনের পরিবর্তনের সাথে ট্রেড ইউনিয়ন, সচেতন ও অসচেতনভাবে, সঙ্গতিপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য দাবী ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয় সংস্কারও করে নিতো। সেকারণে অতীতে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা তেমন দুর্বল হয়নি।

ষাটের দশক পর্যন্ত তৃতীয় দুনিয়ার কোন কোন দেশে রেলওয়ে, খনি, সরকারী প্রতিষ্ঠান, কখনো কখনো বাগিচাতে 'পাওয়ার বার্গেন' ব্যবস্থার সংহতকরণ, কোন কোন দেশে রাষ্ট্রীয়-কর্পোরেটবাদের এক ধরনের প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-পদ্ধতির ধরনে আর্থিক ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সত্তরের দশকের শুরু থেকে অনুন্নত দেশগুলিতে উৎপাদনে শ্রম-ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উৎসাহী হতে থাকে পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা। পুঁজি-নিবিড় চরিত্রের আধুনিক উৎপাদনের উদ্যোগও তারা শুরু করে। বিনিয়োগের ঝুঁকি কমানোর জন্য শ্রম-ব্যয় কমানোর চেষ্টার সাফল্যের স্বার্থে শ্রমিকদের দর-কষাকষির শক্তিকে সংকুচিত বা বিলোপ করা এবং বিপরীতদিকে অন্ততপক্ষে মালিকের প্রাধান্য সর্বোচ্চ করার জন্য উদ্যোগ শুরু হয় তাদের পক্ষ থেকে। কেননা তারা এটা বুঝেছিল যে দর-কষাকষির ব্যবস্থা বহাল থাকলে শ্রমিকের মজুরি শ্রম-বাজার নিরপেক্ষ হবে, ফলে শ্রমিকদের চাপের মুখে উৎপাদনের ব্যয় বাড়বে। তাই এ'সময় থেকে শ্রমিকের সংঘশক্তিকে খর্ব করার লক্ষ্য লেবার-কন্ট্রোলের ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাকে খর্ব করা।

সমকালের 'পাওয়ার বার্গেন' ব্যবস্থা অন্যদিক থেকে এক সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছিল। সংকটজনিত কারণে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দর-কষাকষির ধরন ঝুঁকতে থাকে আর্থিক দাবীর পরিবর্তে বৃত্তির নিশ্চয়তা এবং উন্নত কাজের পরিবেশের দাবীগুলির দিকে। দাবীর চরিত্রের এই পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনে শ্রম-ব্যয় বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কারখানার পরিবেশ ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধের বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নের দাবীর চাপে মালিকদের অনুৎপাদক খাতে ব্যয় বাড়তে থাকে। পাশাপাশি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণকে মালিকশ্রেণী বিবেচনা করতে থাকে শ্রমিকদের বিশৃঙ্খল হওয়ার এবং তাদের (মালিকদের) ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার উপাদান হিসাবে। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল দুই বিপরীতের সংযোগ মুহূর্ত। আর এই পরিস্থিতির ফলে তৃতীয় দুনিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও দুই মেরুর সংযোগ ঘটে। প্রথমদিকে জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কিছুদিন অব্যাহত থাকে, কোথাও বা সাময়িকভাবে জ্বলে উঠে; পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন ধীরে ধীরে ক্ষমতা হারাতে শুরু করে। সংকটের ফলে, ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণকারী রাষ্ট্রের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থাও, দ্রুত এগিয়ে যায় ক্ষয়ের দিকে। ফলে রাষ্ট্রও শ্রমিক-আন্দোলনের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে ট্রেড ইউনিয়নের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ শুরু করে দেয়। শুরু হয়ে যায় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ, ট্রেড ইউনিয়ন অবৈধ ঘোষণা, ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ, সংগঠন ভাঙ্গা, শ্রম-আইনের সুযোগ-সুবিধা অপহরণ, মালিকদের ছাঁটাই-বরখাস্ত-লক-আউট করার অধিকার প্রদান ইত্যাদি। কার্যকালে সমগ্র পরিস্থিতি তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে নয়া-উপনিবেশবাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার পথ সুগম করে। অন্যভাবে বলা যায় রাষ্ট্রের দ্বারা গৃহীত শেষোক্ত ব্যবস্থাগুলি স্বয়ং শ্রম-নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে।

এই সময়ে শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থার কার্যত নিয়ন্ত্রণ। কেননা

তৃতীয় দুনিয়ায় এই কাল-পর্বের শুরু ছিল আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনের উত্থান-পর্ব। এর অব্যবহিত পরে সৃষ্টি হয় বিশ্ব-পুঁজিবাদের সংকট। এই সংকট বিপরীত দিক থেকে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনকে সঞ্জীবিত করতে শুরু করেছিল। শেষোক্ত ভূমিকাও পুঁজিবাদের সংকটকে তীব্রতর করছিল। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদ প্রধানত শ্রম-নিয়ন্ত্রণকে গ্রহণ করে তাদের রক্ষণাত্মক পরিস্থিতি থেকে আক্রমণাত্মক অবস্থান অর্জনের প্রধান রণনীতি হিসাবে। অন্যান্য দিকগুলির সাথে, এক্ষেত্রে মালিকদের অর্জিত সাফল্য ধীরে ধীরে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনকে আক্রমণাত্মক থেকে রক্ষণাত্মক অবস্থানে নিয়ে ঠেলে যেতে থাকে।

নতুন শিল্পায়নের প্রভাব নিয়ে তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের ভাবনা

তৃতীয় দুনিয়ার কিছু কিছু দেশের শিল্পায়ন সংশ্লিষ্ট দেশের ট্রেড ইউনিয়নের সামনে, শিল্পোন্নত দেশগুলি থেকে যথেষ্ট স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমমূলক, সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গ ও উপাদান হাজির করছিল। ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল প্রান্তিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের কাছে যে প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকে, তা' হলো শিল্পায়নের নতুন বাস্তবতাকে শ্রমিক আন্দোলনে কিভাবে ব্যবহার করা যায়। তৃতীয় দুনিয়ার কোন কোন ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে এবিষয়ে যে ধরনের ভাবনার অভ্যুদয় ঘটে প্রথমে তা' কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের ভাবনা অবশ্য সমস্ত প্রান্তিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ছিল না। সর্বজনীনভাবে সমাজ-জীবনের আর্থ-রাজনৈতিক দ্রুত পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে কিছুটা নতুন ও কার্যকরী পথ নির্ধারণের জন্য নতুন ভাবনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

অধিকাংশ প্রান্তিক দেশগুলিতে সুবিপুল গ্রামীণ উৎপাদক, খুচরো-পণ্য সরবরাহকারী ও বিক্রেতা এবং অজস্র ধরনের ক্ষুদ্র গৃহস্থালী ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের পরম্পরাগত উপস্থিতির মধ্যে নতুন শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল। তার ফলে নতুন শিল্পে অধিকাংশ নতুন শ্রমিকরা যোগ দেয়, তারা গ্রামাঞ্চল থেকে আগত এবং স্বীয় গ্রামীণ পরিবার ও ভূমি-সম্পর্কের সাথে যুক্ত ছিল। সুতরাং এইরকম পরিস্থিতিতে, যেখানে শিল্পায়নের ভিত্তি ও পরিসর সংকীর্ণ এবং শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যাও যথেষ্ট নগণ্য, সেখানে সমাজের অন্যান্য স্তরগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও রাজনৈতিক স্তরে সক্রিয় হওয়া ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে জরুরী বলে বিবেচিত হচ্ছিল। এই আশঙ্কা বাড়ছিল যে ট্রেড ইউনিয়ন শুধুমাত্র শ্রম-মাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কারখানা ও সংগঠনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে অন্যান্য শ্রমজীবী সামাজিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং দমনের শক্তির সহজ শিকার হবে। স্বভাবতই সামাজিক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরের সাথে সহযোগ ও সমন্বয় গঠন করার প্রয়োজনীয়তা ট্রেড ইউনিয়নে বিবেচিত হতে থাকে। স্তরগুলি হলো : গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র উৎপাদক, আধা-শহর ও শহরের ক্ষুদ্র উৎপাদক ও বণ্টনকারী এবং শহরের বেকার-বাহিনী। এই ঐক্য গঠনের পথে প্রভূত সমস্যা ছিল। কেননা গণদাবী-ভিত্তিক সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে অনভ্যস্ত তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের অনিবার্যভাবে যুক্ত হওয়ার প্রশ্ন ছিল। তবে সর্বজনীন সমস্যাগুলি ছিল এত তীব্র যে সেগুলির ভিত্তিতে ঐক্য গঠনের বাস্তব চাহিদাও ছিল তীব্র। তৃতীয় দুনিয়ার জনগণ জর্জরিত হচ্ছিল বাসস্থান, পরিষেবা, যানবাহন, যোগাযোগ, পয়ঃপ্রণালী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয় জল, ইত্যাদি সমস্যায়—গ্রাম-শহরে সমানভাবে। এইসব সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ক গণসংগঠনগুলির সাথে যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ ছিল ট্রেড ইউনিয়নের। সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণী পূর্বোক্ত অংশগুলির সাথে কাজ করতে পারে। অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন পারে ঐসব স্তরের সমর্থনকে প্রয়োজনে স্বীয় আন্দোলনের পেছনে সমবেত ও যুক্ত করতে। এটা ঘটাতে পারলে শ্রমিক-ধর্মঘট ভাঙ্গতে বেকারদের নিয়োগ করে উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হবে না মালিকদের পক্ষে।

প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র উৎপাদকদের অনেক সময়েই শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হতো উভয়ের মধ্যে আয় এবং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ব্যবধান ও বৈষম্যকে প্রচার ও ব্যবহার করে। দেশীয় শাসক-শোষকশ্রেণীর দ্বারা জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ব্যবধান ও বৈষম্য গড়ে তোলা হলেও এর দায় শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে চাপিয়ে প্রচার করা হতো। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের এই

প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল যাতে ঐ অংশগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা ও তাদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়িয়ে সরকার ও মালিকের এই ধরনের অপপ্রয়াস ব্যর্থ করা যায়। ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে আলোচনা হচ্ছিল যে গ্রামীণ ক্ষুদ্র উৎপাদক ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপূরক এমন ধরনের সমবেত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেমন উৎপাদক ও ক্রেতা সমবায়, প্রভৃতির মাধ্যমে উভয় অংশের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভবপর। সুতরাং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের সুযোগও নেওয়া উচিত।

সংখ্যায় নগণ্য হলেও আদর্শগত স্তরে শ্রমিকশ্রেণীকে দিয়ে জনগণের নেতৃত্ব প্রদানও সম্ভব। শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলে ট্রেড ইউনিয়ন সমস্ত শ্রমজীবীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে পারে;এইভাবে পারে সমস্ত অংশের জনগণের রাজনীতিকীকরণের কাজও চালাতে। এতে শিল্প মালিকসহ সমস্ত ধরনের মালিকানার বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে দৃঢ়তর করা যায়। যথার্থভাবে এই কাজ করতে পারলে স্বীয় ভূমিকা বিচ্ছিন্ন নিছক রাজনৈতিক শক্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন পরিণত হয় না, ট্রেড ইউনিয়নের স্বকীয়তাও নষ্ট হয় না এবং দুর্বল হয়ে পড়ে না শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কাজও। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলির ছিল এই মনোভাব।

এই সময়ে এই ধরনের ভাবনার উদয় ও কিছুটা তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল প্রান্তিক দেশগুলির কোন কোন ট্রেড ইউনিয়নে।

দ্রুত শিল্পায়নের প্রভূত নেতিবাচক উপাদান ছড়িয়ে পড়ছিল সংশ্লিষ্ট সমস্ত দেশেই। ব্যাপক প্রাকৃতিক দূষণ, ভোক্তা সংরক্ষণের ব্যবস্থাহীনতা, পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের ফলে বিপদ, ক্রমবর্ধমান হিংসা ও সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, চোরা-চালান ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যায় শ্রমিকশ্রেণী সহ সর্বাংশের জনগণ সমস্যা জর্জরিত হচ্ছিল। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে কোন কোন দেশের গণ-আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর সীমাবদ্ধ কিছু ভূমিকা, ট্রেড ইউনিয়নকে এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া শুরু করেছিল।

কিন্তু ভাবনা ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে প্রভেদ ছিল দুস্তর। তৃতীয় দুনিয়ায় নতুন শিল্পায়ন, শ্রমের পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক বিভাজন, নতুন শ্রম-নিয়ন্ত্রণ তৎপরতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে থাকে তাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কি ভূমিকা নিচ্ছিল? যে রণনীতি ট্রেড ইউনিয়নগুলি গ্রহণ করছিল সেগুলি কি সঠিক ছিল? যে সংগ্রাম সামনে উদ্দিষ্ট ছিল, সেই কর্তব্য পালনে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কতটা প্রস্তুত ছিল? কৃষি-সমাজের প্রাধান্যের উপর গড়ে ওঠা নতুন শিল্পোন্নয়নমুখী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর ভিত্তি কতটা সবল ছিল—দমনমুলক রাষ্ট্র এবং দেশী-বিদেশী পুঁজির মোকাবিলা করতে? এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। তৃতীয় দুনিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক-আন্দোলনের যেটুকু অগ্রগতি এই সময়ে লক্ষ্য করা যায়, তার উপর কম-বেশি প্রভাব ছিল নিম্নোক্ত উপাদানগুলির :

(ক) শিল্পায়নের স্তর, চরিত্র, ব্যাপকতা ও নিবিড়তা এবং ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামোর উপর সেগুলির চাপ;

(খ) রাষ্ট্র ও দেশের অভ্যন্তরে প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের যে সম্পর্ক বজায় ছিল;

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর পরম্পরাগত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, প্রলেতারিয়করণের স্তর, শ্রমজীবীদের বিভিন্ন অংশের অসম অবস্থান, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পার্থক্যসমূহ, মতাদর্শের যে অন্তর্বস্তু ও প্রভাবের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছিল;

(ঘ) মালিকশ্রেণীকে প্রত্যাঘাত করতে সক্ষম এমন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-ক্ষেত্রে (খনি, উন্নত বা সাধারণ ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্র, কৃষি অথবা পরিষেবা) ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থান এবং ইউনিয়নের সদস্যভুক্তির স্বরূপ ও চরিত্র (পুরুষ / নারী, শ্রমবাহিনীতে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর তুলনামূলক অংশ, ঐক্যের ব্যাপকতা ও চরিত্র);

(ঙ) শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভূমিকা ও যোগাযোগের পরিস্থিতি, ট্রেড

ইউনিয়ন নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা এবং সাংগঠনিক গণতন্ত্রের ব্যবহারিক দিকটির প্রকৃত অবস্থা;

(চ) শপ-ফ্লোর আন্দোলন, প্রগতিশীল রাজনৈতিক মঞ্চ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রসঙ্গে এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগে ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি ও একাগ্রতা;

(ছ) আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির দ্বারা দেশীয় ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে শেষোক্তগুলির স্বাধীনতা বজায় রাখা বা নির্ভরশীলতা প্রভৃতি।

এই উপাদানগুলির প্রভাব সামনে রেখে তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনটি ধারার আলোচনা এই সময়ে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। একটি ধারা ছিল আশাবাদী, আর একটি নিরাশাবাদী এবং তৃতীয়টি মধ্যপন্থী। আশাবাদীরা ট্রেড ইউনিয়নের নতুন জাগরণ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। নিরাশাবাদীরা ট্রেড ইউনিয়নের কোন ভবিষ্যৎ খুঁজে পাননি। মধ্যপন্থীরা বহু 'যদি', 'কিন্তু'-র দ্বারা আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান ছিলেন।

একথা সত্য যে মধ্য-আশির দশক থেকে উন্নত দুনিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যখন বিভ্রান্ত, ক্ষীয়মাণ ও অনেক ক্ষেত্রেই মালিকশ্রেণীর সহযোগী হয়ে উঠছিল, তখনও তৃতীয় দুনিয়ার শ্রমিক-আন্দোলনের দুর্বলতা ততটা প্রকট হয়নি। বরং এটাই অনুমিত হচ্ছিল যে বিশ্ব-শ্রমিক-আন্দোলনের ভর ক্রমশ তৃতীয় দুনিয়ায় স্থানান্তরিত হচ্ছে। এমনকি সদ্য শিল্পোন্নয়নমুখী দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বেশ কিছুটা তীব্রতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে এটাও সত্য যে তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নই সংস্কারবাদী, বহুক্ষেত্রে ছিল সরকার ও মালিক পৃষ্ঠপোষিত। তদুপরি অধিকাংশ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যত অস্তিত্ব ছিল না। অথচ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির অনুপস্থিতির অর্থ হলো, পরিস্থিতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে, শ্রমিক আন্দোলনকে যথার্থভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে সর্বপ্রথম শর্তের অনুপস্থিতি। বহু দেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে, এই কাল-পর্বে, পুরোপুরি বেআইনি বা আধা-বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্যাপক রক্তাক্ত আক্রমণ চলেছে কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে। প্রান্তিক যেসব দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ছিল, তাদের প্রভাবও ছিল নগণ্য বা সীমিত। স্বৈরতান্ত্রিক বা সামরিক জুন্টা শাসিত দেশগুলি তো বটেই, যেসব দেশের সরকার সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতো বা উন্নয়নে সাহায্য গ্রহণ করতো, সেইসব ধরনের বহু দেশেও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনের উপর আক্রমণের প্রকোপ আদৌ কম ছিল না। আবার বহু দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল শ্রেণীসংগ্রাম বিমুখ। মতাদর্শগত স্তরে এই দুর্বলতা ছাড়াও, সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে নিজ দেশের রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে, কোন কোন কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক-আন্দোলনের রণনীতি ও কৌশল অবলম্বন করতো। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বকলমে সেইসব দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন বা আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নকে পরামর্শ দেওয়ার বা আন্দোলনে হস্তক্ষেপের ঘটনাও ঘটছিল। এগুলি সবসময় শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত স্বার্থের অনুকূলে ছিল এমনও নয়।

অন্যদিকে তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ পৃষ্ঠপোষিত আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গভীর ও ক্ষতিকর। বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রতি এই সংগঠনের সহানুভূতি সহজাত। তৃতীয় দুনিয়ার উন্নয়ন প্রয়াস উন্নত দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সামনে যেহেতু নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করছিল, স্বভাবতই প্রান্তিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিকশ্রেণী ও আন্দোলনকে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা ছিল আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস-এর (ডব্লু. এফ. টি. ইউ.) প্রভাবের তুলনায় প্রান্তিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের উপর আই. সি. এফ. টি. ইউ. বা সেটির সহযোগী ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েটগুলির প্রভাব কিছুটা বেশি ছিল প্রথমাবধি; মধ্য আশির দশক থেকে তা' দ্রুত বাড়তে থাকে। তাছাড়া প্রান্তিক দেশগুলির সরকার (এমনকি যেগুলি ছিল জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে অংশীদার ও দৃশ্যত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী) আই. সি. এফ. টি. ইউ.-কে প্রশ্রয় দিচ্ছিল নানাভাবে।

তাছাড়া প্রান্তিক দেশগুলির এক উল্লেখযোগ্য অংশের ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবে

গড়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। এই উত্তরাধিকারের ফলে, এই সময়ে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জাতীয় উন্নয়নের প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মালিকশ্রেণীর স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে, ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ। এমনিতেই অনুন্নত দুনিয়ায় শ্রমজীবীদের ট্রেড ইউনিয়নে সদস্যভুক্তির হার দুঃখজনক রকমের কম ছিল। কোন কোন দেশে সদস্যভুক্তি ছিল পাঁচ শতাংশেরও নীচে। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বহুক্ষেত্রে ন্যূনতম দায়িত্ব পালনেও ব্যর্থ হচ্ছিল। তারই মধ্যে যেসব আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছিল সেগুলি ছিল খণ্ড খণ্ড এবং প্রধানত স্বতঃস্ফূর্ত। ফলে আন্দোলনের প্রভাব পরবর্তীকালে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারছিল না।

তৃতীয় দুনিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক-আন্দোলনের ঘটনাবলী

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিক-আন্দোলন এইসময়ে সব চাইতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বর্ণ-বৈষম্যবাদী সরকারের কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে, কমিউনিস্ট পার্টি, আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসসহ আরও কতকগুলি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে, সমস্ত মানুষের জন্য বর্ণ-শর্তহীন নাগরিক ও ভোটের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে, শিল্পে স্বদেশী-বিদেশী, বিশেষত এম. এন. সি.গুলির, শোষণের বিরুদ্ধে সেখানে চলছিল রক্তাক্ত সংগ্রাম। একদা সর্ববৃহৎ সংগঠন—'ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল অব সাউথ আফ্রিকা' (টি. ইউ. সি. এস. এ.) মালটিরেশিয়াল তথা বহু-জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললেও সেটির অভ্যন্তরে শ্বেত, আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ ও ভারতীয় কৃষ্ণাঙ্গদের স্বতন্ত্র ইউনিয়ন ছিল এবং শেষোক্ত দু'টি ইউনিয়ন তহবিলের ব্যাপারে নির্ভরশীল ছিল মূল সংগঠনের উপর। ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের পূর্বোক্ত পরিস্থিতি এবং বিপরীত দিকে এই কেন্দ্রীয় প্রধান ট্রেড ইউনিয়নটি বহুলাংশে সরকারের অনুগামী হওয়ায়, এইসময়ে ইনডিপেণ্ডেন্ট বা স্বতন্ত্র অনেকগুলি ট্রেড ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটে। সেগুলির মধ্যে বৃহত্তম ছিল 'ফেডারেশন অব সাউথ আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নস' (এফ. ও. এস. এ. টি. ইউ.)। শেষোক্তটি 'নন-রেশিয়াল' বা অ-বর্ণবাদী বলে নিজেদের দাবী করতো। এটির অধীনে ছিল মেটাল, ট্রান্সপোর্ট, টেক্সটাইল ও ফুড শাখার বিভিন্ন সংগঠন। আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল এটি। জুলু উপজাতিদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কৃষ্ণাঙ্গদের 'ইনকাথা' রাজনৈতিক সংগঠনের ট্রেড ইউনিয়নটি নাম হয় 'ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা' (ইউ. ডব্লু. ইউ. এস. এ.)।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত শাসকবর্গ পূর্বোক্ত সমস্ত সংগঠনগুলিকে বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত এবং মূল সমস্যাগুলি থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে এসেছে। এই প্ররোচক পরিস্থিতিতে শ্রমিক-আন্দোলনে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার উপাদান নিয়ে,—'ব্ল্যাক কনসাসনেস' বা কৃষ্ণকায় চেতনার মতবাদের ভিত্তিতে আবির্ভূত হয় কেবলমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের জন্য গঠিত 'কাউন্সিল অব সাউথ আফ্রিকান ইউনিয়নস (সি. ইউ. এস. এ. বা কুসা)। কিন্তু প্রবল অত্যাচার ও সংকটের মধ্যে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ এবং দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সুস্পষ্ট নীতিগত বক্তব্য তুলে ধরে গঠিত হয় 'কংগ্রেস অব সাউথ আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নস' (সি. ও. এস. এ. টি. ইউ. বা কোসাটু)। প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এবং 'কমিউনিস্ট পার্টি অব সাউথ আফ্রিকা' সম্মিলিতভাবে এই ট্রেড ইউনিয়ন শক্তিকে গড়ে তোলে। অচিরেই এটি বৃহত্তম ফেডারেশনে পরিণত হয়, যেটির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে চার লক্ষ। এটির অন্তর্গত ছিল ৩৪টি ইউনিয়ন। 'ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট—ব্ল্যাক অর হোয়াইট' মূল শ্লোগান ছাড়াও এই সংগঠনের নেতৃত্বে প্রকৃত, ব্যাপক ও জঙ্গী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং টি. ইউ. অধিকার ও এম. এন. সি.গুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন চলতে থাকে। সংগ্রামের প্রবল চাপে বহুজাতিক সংস্থাগুলি বাধ্য হয় নিজেদের প্রতিষ্ঠানে বর্ণভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ ও কৃষ্ণাঙ্গদের কিছুটা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে। আন্দোলনের এই চাপ আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রভাব ফেলে। নর্ডিক দেশগুলি এবং কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি স্বীয় বহুজাতিক সংস্থায়, (যেগুলির দক্ষিণ আফ্রিকাতে সাবসিডিয়ারি ছিল) বর্ণ-বিদ্বেষ বন্ধ করার আইন করতে বাধ্য হয়।

ব্রাজিলে আই. সি. এফ. টি. ইউ. অনুমোদিত সর্ববৃহৎ তিনটি ফেডারেশন—'ন্যাশনাল জেনারেল ওয়ার্কার্স' (সি. এন. টি. সি.), 'ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন' (সি. এন. টি. টি. টি.) ও 'পাবলিক ওয়ার্কার্স কনফেডারেশন' (সি. ও. এন. টি. সি. ও. পি.) ছাড়াও 'মেটাল, মেশিন অ্যাণ্ড ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কার্স অব সাও পাওলো' ইত্যাদি—আই. বি. এম., বুরগ্‌স, ভকস্‌ওয়াগন, ফিয়াট, অলিভেট্টি, ফোর্ড, জেনারেল মোটরস, ক্রুপ ও স্যাব-এর মত বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বারে বারে আন্দোলন চালিয়ে কালেকটিভ বার্গেনিং-এর অধিকারসহ বেশ কিছু দাবী অর্জন করেছিল এইসময়ে। এম. এন. সি.গুলির কিছুটা কোণঠাসা এই পরিস্থিতিতে সরকার এগিয়ে আসে এম. এন. সি.গুলির সমর্থনে। কালেকটিভ বার্গেনিংকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার।

বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে আর্জেন্টিনা স্বর্গ-রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত ছিল। সত্তরের দশক থেকে বহুজাতিক সংস্থাগুলি এবং সরকারের বেপরোয়া দমন-পীড়ন ছিল সেখানকার প্রাত্যহিক ঘটনা। জুয়ান পেরঁ-র একনায়কত্বের কালে ট্রেড ইউনিয়নের কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকলেও, ১৯৭৬ সালে সামরিকবাহিনীর অভ্যুত্থানের পর ট্রেড ইউনিয়নের উপর আক্রমণ ব্যাপকতর হয়। শত শত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীসহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষের গ্রেপ্তার, বর্বরোচিত নির্যাতন, খুন এবং অপহরণ অস্বাভাবিক মাত্রা গ্রহণ করে। এগুলির বিরুদ্ধে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় 'ডিস্‌এপারেসিওনিজ' বা মানুষকে অপহরণ ও গুম করার বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলন একই সাথে গ্রহণ করে সরকার ও বহুজাতিক সংস্থা-বিরোধী চরিত্র। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল 'জেনারেল ওয়ার্কার্স কনফেডারেশন অব দা রিপাবলিক অব আর্জেন্টিনা', 'মেটাল ওয়ার্কার্স লেবার অরগানাইজেশন', 'ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন', 'ন্যাশনাল মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' ইত্যাদি। এই আন্দোলনের ফলে ১৯৮৩ সালে সামরিক সরকারের পতন ঘটে।

ব্রাজিলের মত লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে, এই সময়ে, বহুজাতিক সংস্থা-বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার লক্ষ্য করা যায়। ভেনেজুয়েলাতে ফিলিপস, জেনারেল ইলেকট্রিক, ফিয়াট, ফোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-শোষণের বিরুদ্ধে সেখানকার কনফেডারেশন অব লেবার (সি. টি. ডি.), মেক্সিকোতে এরিকসন লিমিটেড, জেনারেল মোটরস, ফিলিপস, ইউনিয়ন কার্বাইড, আই. টি. টি., জেনারেল ইলেকট্রিক ইত্যাদি এম. এন. সি.গুলির বিরুদ্ধে কনফেডারেশন অব মেক্সিকান ওয়ার্কার্স (সি. টি. এম.) এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস অনুমোদিত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কলম্বিয়াতে কনফেডারেশিওন ডি ট্রাবাজাডোরেস ডি কলম্বিয়ার নেতৃত্বে, চিলিতে অনুরূপ বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কনফেডারেশন অব ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং, মাইনিং অ্যাণ্ড অটোমোটিভ ওয়ার্কার্স, চিলিয়ান কপার ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ইউনিয়নস ডেমোক্রাটিকা ডি ট্রাবাজাডোরেস, কম্যানডো নাশিওনাল ডি ট্রাবাজাডোরেস প্রভৃতি ইউনিয়ন দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়েছিল।

এশীয় দেশগুলির মধ্যে ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান অথবা মধ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে নাইজিরিয়া, ঘানা, কেনিয়া, টিউনিসিয়া, সিয়েরা লিওন, জিম্বাবোয়ে প্রভৃতি দেশে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটা সত্ত্বেও, এম. এন. সি.-বিরোধী সুনির্দিষ্ট কোন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ বা আন্দোলন কার্যত দেশগুলির কোন ট্রেড ইউনিয়ন করেনি। কল-কারখানায় লে-অফ্, লক আউট, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে এবং উন্নত মজুরির দাবীতে দেশগুলিতে এই সময়ে কিছুটা ব্যাপক আন্দোলন এমনকি লাগাতার ধর্মঘটও হয়েছে। সত্তরের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে রেল, খনি, ইঞ্জিনীয়ারিং, টেক্সটাইল, জুট প্রভৃতি শিল্পে ব্যাপক আন্দোলন চলেছিল। ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা ও দমন-পীড়ন চালিয়ে অন্যান্য গণ-আন্দোলনসহ শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করতে না পেরে, ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। এই জরুরী অবস্থাকে কার্যত সমর্থন করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব-ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস। দেশের কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নও সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।

বহু সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা এবং আন্দোলন বন্ধে সমগ্র দমনযন্ত্রকে ব্যবহার করা ছাড়াও অন্তরীণ, বরখাস্ত ও ছাঁটাই করা হয় বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়নের হাজার হাজার কর্মীকে। পরিস্থিতির চাপে ১৯৭৭ সালে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত এবং নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসী সরকারের পতন ও নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর আবার সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। আশির দশকের শুরু থেকে ভারতে আবার শ্রমিক-আন্দোলন, বিশেষত ধর্মঘট-সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সময়ের শ্রমিক-আন্দোলনের লক্ষণীয় উপাদান ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও রাজ্যে রাজ্যে প্রশাসনিক শ্রমিক-কর্মচারীদের বিশাল বিশাল ধর্মঘট। এই সব আন্দোলনগুলি বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক চরিত্র ও পেয়েছিল।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশের বন্দর, পাট-শিল্প ও সরকারী কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয়েছিল। পাকিস্তানে স্বল্পকালের জন্য গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও সত্তর ও আশির দশকের অধিকাংশ সময়েই সামরিক শাসন ছিল। ফলে কোনভাবেই মাথা তুলতে দেওয়া হয়নি শ্রমিক আন্দোলনকে। শ্রীলঙ্কাতে বাগিচা শ্রমিক ও এক্সপোর্ট-লেড জোনগুলিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট হয় এই সময়ে। সমগ্র আরব দুনিয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের কার্যত কোন অস্তিত্বই ছিল না। মায়নামারে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানেও সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়ে যায় জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন।

সামরিক শাসনের অধীন আর্জেন্টিনার শিল্পায়ন ও শ্রম-কাঠামোর নতুন গঠন-প্রক্রিয়া সেখানকার ট্রেড ইউনিয়নকে শুধু নয়, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের ট্রেড ইউনিয়নকেও অনেকটা প্রভাবিত করছিল। আমদানির বিকল্প শিল্পায়নের রণনীতিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর হাতিয়ার হিসাবে। তাই আর্জেন্টিনীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই প্রয়াসকে যেমন সমর্থন জানাচ্ছিল, অন্যদিকে সামরিক সরকারের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও গড়ে তুলছিল আন্দোলন। এই ধরনের তৎপরতা লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের ট্রেড ইউনিয়নেও দেখা যায়। ফলে লাতিন আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা এই কাল-পর্বে গ্রহণ করেছিল ব্যাপক রাজনৈতিক চরিত্র। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ও সমাজের অন্যান্য বর্গের সংগ্রামের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন যুক্ত হচ্ছিল। কোন কোন লাতিন আমেরিকার দেশে আধা-রাজনৈতিক চরিত্রের মঞ্চ গড়ে উঠেছিল সমাজের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে, যাতে শক্তিশালী অংশীদার হওয়া শুধুমাত্র নয়, ক্ষেত্র বিশেষে নেতৃত্ব দিচ্ছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলি। অজস্র রাজনৈতিক মতবাদে লাতিন আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিভক্ত থাকলেও, দেখা গিয়েছে যে সর্বজনীন প্রশ্নে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে ঐক্য ও সংগ্রাম। বেশ কিছু দেশে মার্কসবাদী, নয়া-বামপন্থী, ট্রটস্কিবাদী ইত্যাদি শক্তির প্রভাবও ছিল এই ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে। অনেক সমস্যা, জটিলতা, ঘাত-প্রতিঘাত ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও, এটা ঘটনা যে তৃতীয় দুনিয়ার মধ্যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কেননা, সেখানে দেশে দেশে পরবর্তীকালে একে একে সামরিক সরকারের পতন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অনেকটাই গড়ে দিয়েছিল। এই ধাঁচের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের রাজনৈতিক সাফল্যের অনেকটা তুলনা করা চলে সমকালে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে। শেষোক্ত দেশে সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ও ভূমিকার বিরুদ্ধে এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অবদান ন্যূন ছিল না। ভারতে শাসকশ্রেণী প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রভাব শ্রমিকদের সুবৃহৎ অংশের মধ্যে থাকলেও বামপন্থী ও কিছু বুর্জোয়াপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন অনেকক্ষেত্রে ঐক্য ও সংগ্রাম গড়ে তোলার নজির রাখছিল। এক্ষেত্রে মার্কসবাদী ট্রেড ইউনিয়নের নীতিগত ও প্রভাব-সঞ্চারী ভূমিকা ছিল প্রধান।

আফ্রিকার শ্রম-শক্তির পরিস্থিতি (দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে) আদিম চরিত্রের থেকে গিয়েছিল এবং আফ্রিকা ছিল উন্নত দেশগুলির কাঁচামালের প্রধান সরবরাহকারী। বহুজাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা ছিল, আফ্রিকায় শিল্প-গঠনের পরিবর্তে, প্রধানত কাঁচামাল অন্যত্র পাঠানোর ব্যবসাদারী করা। কিন্তু এই

ভূমিকা থাকলেও বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশ আফ্রিকার অর্থনীতিতে তীব্রভাবে ঘটেছিল। আফ্রিকা মহাদেশের শ্রম-শক্তির কাঠামো ও বিন্যাসে এই পশ্চাৎপদতা, স্বভাবতই, চরম দুর্বল করে রেখেছিল ট্রেড ইউনিয়নকে। সত্তরের দশকের প্রারম্ভে ট্রেড ইউনিয়ন সামান্য বিকশিত হতে শুরু করে, যদিও আফ্রিকার কোন কোন দেশের সরকার প্রায় তৎক্ষণাৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলির কণ্ঠ রুদ্ধ করা শুরু করে। ১৯৭৬ সালে, তৈল-সমৃদ্ধ নাইজিরিয়াতে সামরিক জুন্টা সরকার দেশের প্রধান চারটি প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়নকে জবরদস্তি করে একত্রিত করে এবং নবগঠিত সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়নকে বাধ্য করতে থাকে সরকার ও মালিকশ্রেণীর সমস্ত ব্যবস্থা মানতে।

মালয়েশিয়ার ওপর জাপানী পুঁজির প্রভাব বৃদ্ধি ও শোষণের বিরুদ্ধে এই সময়ে কিছু কিছু আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছিল পুরোপুরি সংস্কারবাদী। ফলে এগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল কেবল আইনি পথে প্রচেষ্টা। তার ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে, বিশেষত আই. এল. ও.-তে, এরা অবিরাম দরবার চালিয়েছে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে এবং সামান্য হলেও শ্রমিকদের কিছুটা সুযোগ এনে দিতে পেরেছিল।

ইরানের ইসলামীয় বিপ্লব এই সময় ইরানে শুধু নয়, উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করছিল পার্শ্ববর্তী ইসলাম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলির উপর। সমগ্র এলাকার দেশগুলি বিপুলভাবে তৈল-সমৃদ্ধ। ফলে তেল ও তেল-ভিত্তিক আধুনিক শিল্পের বিকাশ সেখানে দ্রুত ঘটছিল এবং দেশের পরম্পরাগত শ্রমিকশ্রেণী দ্রুত হয়ে উঠছিল আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী। ইরানের ধর্মীয় বিপ্লবের পর সেখানে গঠিত হয়েছিল 'রেভলিউশনারি ওয়ার্কার্স কাউন্সিল'। ট্রেড ইউনিয়নকে অপসারণ করার ভূমিকা গ্রহণ করে এই নতুন ব্যবস্থা। ধর্মীয় ও জাতীয় উগ্র উন্মাদনা সৃষ্টির ভিত্তিতে এই কাউন্সিল দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে উৎপাদনে সক্রিয় করে তোলে। অতীতের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা হয়। ঠিক একই রকম না হলেও, পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতেও গৃহীত হয়েছিল অনুরূপ ব্যবস্থা।

শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রেণী কাঠামো নিয়ে বিভ্রান্তি ও বিতর্ক

পূর্বের অধ্যায়গুলিতে একদিকে সার্বিক সংকট ও অন্যদিকে নতুন পরিস্থিতির প্রথম উন্মেষের কতকগুলি দিক বলা হয়েছে। এর ফলে বিপুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী, শ্রেণী-কাঠামো, শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ও লক্ষ্য, অন্যান্য শ্রমজীবী অংশ প্রভৃতি সম্পর্কে। বুর্জোয়া-সমাজতত্ত্ববিদদের একপেশে ও সরলীকৃত বক্তব্য নিয়ে এখানে আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা সুদূর অতীত থেকেই শ্রেণী, শোষণ, শ্রেণী-সংগ্রাম ইত্যাদির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও ভূমিকাকে নানা যুক্তিতে অস্বীকার করা হয়ে এসেছে বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে। এই কাল-পর্বে এসে তাঁদের এ-বিষয়ে প্রস্তাবের প্রধান মর্ম দাঁড়িয়েছিল যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও শোষণের অস্তিত্বই অবসিত হয়ে নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। অনৈতিহাসিক, অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক এই প্রতিপাদ্য দিয়ে, স্বভাবতই, আলোচনার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু যে বিভ্রান্তি ও বিতর্কের এখন উল্লেখ করা দরকার তা' প্রধানত ঘটেছিল সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। এই আলোচনাগুলি চলেছিল নতুন পরিস্থিতির নামে, মার্কসবাদকে ক্ষেত্র-বিশেষে অস্বীকার বা সংশোধন করার প্রস্তাব করে।

প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য প্রসঙ্গের সাথে শ্রেণী বিষয়ে মার্কসবাদী বির্তক শুরু হয়েছিল মার্কসের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকেই। লেনিনবাদী ধারার পাশাপাশি আরও অনেকগুলি ধারা ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠে। সেইসব ধারাগুলির মধ্যে বিশেষত 'ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম' বা পশ্চিমি মার্কসবাদ বারংবার শ্রেণী, শ্রেণী-কাঠামো, শ্রেণী-সম্পর্ক, শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভৃতি নিয়ে বিপুল বিতর্ক চালিয়েছিল এবং হাজির করেছিল নানা তত্ত্ব। আলোচ্য কালের বিতর্ককে অতীতের পশ্চিমি মার্কসবাদের এক ধরনের পরম্পরা বলে ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্য নতুন জটিল বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস হিসাবে সৃষ্টি হয়েছিল এই বিতর্ক।

শ্রেণী বিষয়ে আলোচ্য বিতর্ককে দু'টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। অজস্র ধারা ও ক্রমাগত আলোচনার পরিস্থিতিকে সুনির্দিষ্ট দু'টি অধ্যায়কে চিহ্নিত করে স্বতন্ত্র করে নেওয়ার কারণ ও পটভূমিকা

রয়েছে। এই বিতর্কের প্রথম অধ্যায়টি ছিল মধ্য-সত্তরের দশক। একালে ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার পতন ঘটে, পুঁজিবাদ সংকটাপন্ন এবং ইউরো-কমিউনিজমের অভ্যুদয় হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি ছিল মধ্য-আশির দশক। পুঁজিবাদের নতুন ধরনের বিকাশের সূত্রপাত ঘটেছে, পশ্চিমি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি অধ্যায় সমাপ্ত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে আবির্ভাব ঘটছে পেরিস্ত্রৈকার তত্ত্ব।

শ্রেণী, শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণী-সংগ্রাম হলো মার্কসবাদের কেন্দ্রীয় বিষয়। বাম-হেগেলপন্থীদের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক বিরোধিতার ভিত্তিতে রচিত 'দা জার্মান ইডিওলজি', বিপ্লবী সংগঠন ও আন্দোলনের দলিল 'দা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো', রাজনৈতিক ব্যাখ্যামূলক 'দা ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স', অর্থনৈতিক তত্ত্বের আধার 'গ্রুনডিসি' ও 'ক্যাপিটাল', প্রভৃতি গ্রন্থে মার্কস শ্রেণী, শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণী-সংগ্রামের অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতিকে প্রমাণ করেছিলেন। মার্কসের সমস্ত আলোচনাতে ধারাবাহিক ভাবে প্রসঙ্গ গুলি কেবল উত্থাপিতই হয়নি, উন্নত থেকে উন্নততর ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছিল। ইতিহাস, সমকাল ও পরবর্তী বিশ্বের ঘটনাবলী ও বিকাশে সেগুলি প্রমাণিত হয়ে এসেছে।

আলোচ্য কালের বিতর্ক স্বয়ং ছিল শ্রেণী, শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণী-সংগ্রামের এক ধরনের প্রতিফলন, বিতর্ককারীরা নিজেদের অজান্তে সে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশীদার ও শিকার হয়েছিলেন।

১৯৭৫-৭৬ সালে অনুষ্ঠিত বিতর্কে প্রধানত অংশীদার ছিল কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রেট ব্রিটেন (সি. পি. জি. বি.), গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক ও বাম-বুদ্ধিজীবীরা। শ্রমিকশ্রেণী, শ্রেণী-কাঠামো প্রভৃতি প্রসঙ্গের চেয়ে মার্কসীয় তত্ত্বের মৌলিক কতকগুলি উপাদানকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এই বিতর্কে। এই আলোচনা প্রধানত প্রভাবিত হয়েছিল জর্জ লুকাস, অ্যান্টনিও গ্রামসি ও আলথুসারের তত্ত্বের দ্বারা। এই আলোচনা ও বিতর্ককে বলা হয়েছিল 'কনটেমপোরারি মার্কসিজম' বা সমকালীন মার্কসবাদ। এই তার্কিকদের ঐক্যের মূল দিক ছিল, "কয়েকদশক ধরে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনে যে মার্কসবাদ তথাকথিত কর্তৃত্ব করে এসেছে", তার বিরোধিতা। এদের ভাষায় পূর্বোক্ত ঐতিহ্য সম্পন্ন তথা "গোঁড়ামিপূর্ণ মার্কসবাদ" আসলে ছিল 'রিডাকশনিজম' বা হ্রস্বকরণবাদ এবং 'ইকনমিজম' বা অর্থনীতিভিত্তিবাদ (এক্ষেত্রে অর্থনীতিবাদ শব্দ অনুপযুক্ত)। এদের ব্যাখ্যাত হ্রস্বকরণবাদের তাৎপর্য ছিল "মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নামে ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত বিশ্ব বা বিষয়কে (ফেনোমেনা) আর্থনীতিক ভিত্তির দ্বারা হ্রস্বকরণ" ও ব্যাখ্যাযোগ্য করে তোলা। সুতরাং, এদের অভিযোগ ছিল যে মার্কসবাদ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সামাজিক মতাদর্শকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শক্তিগুলির প্রতিফলন বলে ব্যাখ্যা করে। তার ফলে, এদের মতে, "মার্কর্সবাদ একগুচ্ছ তুলনামূলকভাবে সহজ ও হ্রস্বপ্রাপ্ত বিশ্বজনীন গোঁড়ামিপূর্ণ 'নীতি'তে পরিণত হয়েছে।"

এই সময়ের বিতর্কের মধ্যে যথেষ্ট পরস্পর বিরোধিতা থাকলেও তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে মার্কসবাদকে 'রিডাকশনিজম' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কেননা এঁরা মনে করেছিলেন যে অর্থনীতিকে ভিত্তি হিসাবে মার্কসবাদে প্রাধান্য দেওয়ার (যাকে 'রিডাকশনিজম' বলা হয়েছে) অর্থ হলো রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাকে অর্থনীতির বাস্তবতার দ্বারা "পাঠ করা"। এর পরিণাম হলো কেবলমাত্র ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল্যায়ন করা এবং কেবলমাত্র তার দ্বারাই সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত বস্তু বা বিষয়কে বিচার করার ব্যবস্থা। মার্কসবাদের এই বিচার পদ্ধতি, তাঁদের মতে, বিশ্বাস করায় যে সমস্ত সামাজিক ঘটনা বা প্রসঙ্গের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় উপাদানের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রয়েছে অর্থনীতি। এঁরা মনে করেছিলেন, মার্কসবাদে এই ধরনের বিচার পদ্ধতি এক ধরনের 'এসেনসিয়ালিজম' বা অপরিহার্যতাবাদ;অর্থাৎ এই অপরিহার্যতাবাদের দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা যে সমস্ত সামাজিক ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু বা ঘটনায় মূর্ত রয়েছে অর্থনীতি, যা সামাজিক জগতে নিছক স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে বা করানো হচ্ছে।

এই তার্কিকরা তাঁদের 'কনটেমপোরারি মার্কসিজম'-এর দ্বারা মার্কসবাদের তথাকথিত "সরলীকৃত ও যান্ত্রিক পদ্ধতিকে" চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে, মার্কসবাদের তথাকথিত স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও তত্ত্বকেও

চ্যালেঞ্জ করা প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। এরা এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে মার্কসবাদের পূর্বাপর আলোচনার অভ্যন্তরে আলোচ্য তার্কিকদের প্রস্তাবের বীজ নাকি বহু আগেই উপ্ত হয়েছিল, কিন্তু স্তালিনবাদ ও স্তালিন-যুগের জন্য তা' বিকশিত হতে পারেনি। তাঁদের প্রস্তাবিত এই ধারণাসমূহ অগ্রসর হতে পারেনি আরও এই কারণে যে উদ্ভাবিত মার্কসবাদের সংস্কারের তত্ত্বগুলি অত্যন্ত জটিল ও বিমূর্তভাবে গঠিত হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট কালে সেগুলির ছিল না তেমন রাজনৈতিক তাৎপর্য, এমনকি ষাটের দশকে আলথুসারের তত্ত্বও এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে, বিতর্কের অন্তর্গত হয়েছিল সমাজে তত্ত্বের অবস্থান ও গুরুত্ব। এঁরা বলেছিলেন যে যদিও মার্কসবাদীরা যথার্থভাবেই তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংযোগ ও সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, কিন্তু গোঁড়াপন্থী মার্কসবাদ কার্যকালে এই সংযোগ ও সমন্বয়ের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে সরল বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে তত্ত্বকে প্রয়োগের অধীনস্থ করে এসেছেন। তার ফলে 'গোড়াপন্থী মার্কসবাদীরা' প্রতিটি তত্ত্বগত অবস্থানকেও বিচার করেছেন দৃষ্টিগোচর রাজনৈতিক তাৎপর্যের দ্বারা। আলোচ্য বিতর্ককারীদের মতে তত্ত্ব ও প্রয়োগ—উভয়ে কখনো সরল বা প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত নয়। একটি থেকে অপরটিকে নির্ধারণ বা পরিবর্তন করা যায় না।

এঁরা স্বীকার করেছিলেন মার্কসীয় তত্ত্বে শ্রেণী, শ্রেণী-কাঠামো এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণা কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়ে রয়েছে। এটা কেবল তত্ত্বগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর শক্তিশালী রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। তাই যে কোন ঐতিহাসিক বা সমকালীন পরিস্থিতিতে শ্রেণী ও শ্রেণী কাঠামো সম্পর্কে বিশ্লেষণ মার্কসবাদীদের কাছে অপরিহার্য, বিশেষত যুগ-সন্ধিক্ষণে। এই বুনিয়াদি কাজ করার মধ্য দিয়েই বিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের রণনীতি গড়ে ওঠে। কিন্তু আলোচ্য তার্কিকরা মনে করেছিলেন যে শ্রেণী-বিশ্লেষণ থেকে রণনীতি স্থির করা যাবে না, বরং এই বিশ্লেষণ থেকে সৃষ্টি হবে রাজনৈতিক রণনীতি সৃষ্টির পটভূমিকা।

শ্রেণী প্রসঙ্গে প্রবল মতপার্থক্য ছিল এই বিতর্কে। বিশেষত যে বিষয়টি নিজেদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে তা' হলো, মার্কসবাদ অনুযায়ী সমাজ ও সমাজ-প্রক্রিয়ার ভিত্তি অর্থনীতি—এই প্রতিপাদ্য যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে একদিকে অর্থনৈতিক এবং অন্যদিকে রাজনীতি ও মতাদর্শের মধ্যে সম্পর্ক কি?

এঙ্গেলস কর্তৃক ব্লক, স্মিড, মেহরিং ও স্টার্কেনবার্গের কাছে লিখিত পত্রে রাজনীতি ও মতাদর্শের "তুলনামূলক স্বাধীনতা"র (অর্থনীতি থেকে) বক্তব্যকে, বিতর্ককারীদের একাংশ নিজেদের বক্তব্যের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। এঁরা মার্কসের শ্রেণী-বিষয়ক পূর্বাপর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, চেষ্টা করেন মার্কসের প্রথম দিকের আলোচনার সাথে পরবর্তী কালের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে। তাঁদের মতে, মার্কস প্রথমদিকে শ্রেণীকে হাজির করেছিলেন সরলভাবে, বিবদমান পক্ষের প্রতীক হিসাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রেণী-সংগ্রামকে শ্রেণী-স্বার্থের রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ প্রতিফলন না বলে তার পরিবর্তে মার্কস রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই ধরনের প্রতিপাদ্য থেকে অপরাংশের বিতর্ককারীরা যে বক্তব্য প্রস্তাব করেছিলেন তা' হলো, মার্কস বর্ণিত শ্রমিকশ্রেণী বা সর্বহারাশ্রেণী বলতে শিল্প-শ্রমিকের যে ধারণা তা' এখন ক্রমশ বাতিল হচ্ছে। আজকের শ্রমিকশ্রেণী অনেক বেশি প্রশস্ত এবং অভ্যন্তরীণ প্রবল জটিল সম্পর্কসমূহের দ্বারা গঠিত। সুতরাং আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও চেতনাকে যদি যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় তবে প্রথমে সমাধান করতে হবে বর্তমান শ্রমিকশ্রেণীর জটিল ও সেটির বিশ্লিষ্টকরণের প্রক্রিয়ার এবং পূর্বতনের সাথে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর পৃথকীকরণের বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যার। এঁরা বলেছিলেন যে প্রথমে চিহ্নিত করা দরকার বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট শ্রমের বাজারের চরিত্রকে, যার মাধ্যমে মজুরিভোগী শ্রমিক তাদের শ্রম-শক্তিকে বিক্রি করে। আর এই বিভিন্ন শ্রম-বাজারের মধ্যে নিহিত রয়েছে শ্রমিকের বিভিন্ন ধরন ও দক্ষতার স্তরগুলি এবং নিয়োগকারীর সাথে শক্তি-সম্পর্কের (পাওয়ার-রিলেশনস) বৈশিষ্ট্যসমূহ। বিভিন্ন শ্রম-বাজার কেবলমাত্র আর্থনীতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না; কেননা

বাজারগুলি মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত। এই ব্যাখ্যা থেকে এটাও নির্গত হয়, এঁরা বললেন, যে একটি শ্রমের বাজারের অভ্যন্তরে ও বাজারগুলির পরস্পরের মধ্যে মজুরিভোগী শ্রমিকদের মধ্যে কেবলমাত্র উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়, মতবাদ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য থাকে। সুতরাং এই জাতীয় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের অভ্যন্তরে শ্রেণী সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর ও রূপসমূহ এবং শ্রেণী চেতনার স্তরগুলিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। এই বিশ্লেষণ থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অ-কায়িক শ্রমজীবীদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ ঘটছে। সুতরাং সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ব্যাপকতম বর্গসমূহের সমন্বয়ে গঠিত সমগ্র মজুরিভোগী বাহিনীর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে নতুন ও বৃহত্তর সংগ্রাম গড়ে তোলার শর্ত। এই ধারার আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে প্রয়োজনীয় বিযুক্ত-সম্পর্ক রয়েছে।

গ্রীস কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা পৌলানতাজাস রচিত 'ক্লাস ইন কনটেমপোরারি ক্যাপিটালিজম', 'পলিটিকাল পাওয়ার অ্যাণ্ড সোস্যাল ক্লাসেস', প্রভৃতি সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে বাম-বুদ্ধিজীবী ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের মধ্যে অনেকটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আলোচ্য বিতর্কে তিনি ছিলেন অন্যতম অংশীদার। তাঁর আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্মটি ছিল এই রকম যে কেবলমাত্র মজুরিভোগীদের শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা মৌলিকভাবেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক চরিত্রের। কেননা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের অভ্যন্তরে মজুরি হলো সামাজিক সম্পদের এক ধরনের বণ্টন। তিনি দাবী করেছিলেন যে মার্কসবাদে বলা হয়েছে যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে সেই শ্রমিক— এই মাপকাঠিতে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। তাছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর সীমানা নির্ধারণ করার জন্য উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য টানতে হবে। এই যুক্তির ভিত্তিতে তিনি কার্যত যা প্রস্তাব করেন তা' হলো যে অনুৎপাদক শ্রমজীবীরা শ্রমিকশ্রেণীর অংশ নয়। এক্ষেত্রে বিতর্ককারী অন্য অংশের যুক্তি ছিল যে, কোন অংশ শ্রমিকশ্রেণী, কোন অংশ নয়, তা' নির্ভর করে রাজনৈতিক ও আদর্শগত উপাদানের উপর, বিশেষত শ্রম-প্রক্রিয়ার (লেবার-প্রসেস) উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মাত্রার এবং একই সাথে মস্তিষ্কজাত শ্রমের ভূমিকার দ্বারা। অনুৎপাদক শ্রমজীবীদের পৌলানতাজাস চিহ্নিত করেন 'নিউ পেটি-বুর্জোয়া' হিসাবে। এই বক্তব্যের বিরোধীদের মন্তব্য ছিল যে বেতনভোগী (মজুরিভোগী নয়) কর্মচারীরা যদি ভিন্ন এক শ্রেণী হয় তবে শ্রমিকশ্রেণী ও 'নিউ পেটি-বুর্জোয়া'দের মধ্যে শ্রেণী ঐক্য গড়ে তুলতে হলে শ্রেণী দু'টির সুনির্দিষ্ট স্বার্থকে বিবেচনায় রাখতে হবে; কেননা এটা ধরে নিতে হবে যে শেষোক্ত শ্রেণীটির স্বার্থ শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের মত এক নয়। সমালোচকদের আরও বক্তব্য ছিল যে সমকালে বেতনভোগীদের যে যে অংশের শ্রমিকশ্রেণীর দিকে ক্রমান্বয়ে মেরুকরণ ঘটছে, তাদের সংঘবদ্ধ করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে তৎপরতা চালানোর প্রশ্ন আসে। স্বতন্ত্র শ্রেণী হওয়ার জন্য নিউ পেটি-বুর্জোয়াদের সংগঠন, স্বভাবতই, শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়নের চরিত্রের হবে না। তাদের সংগঠন হতে হবে স্বতন্ত্র চরিত্রের। তবে পৌলানতাজাস-ই স্পষ্টভাবে দাবী করেছিলেন যে সমাজতন্ত্র অর্জনের পথে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সুনির্দিষ্টভাবেই প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রের ধারণা ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের বিষয়ে অন্যান্য তার্কিকদের বক্তব্য ছিল স্বতন্ত্র।

অপর একাংশ বিতর্ককারী শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে "মার্কসের সংকীর্ণ সংজ্ঞা"র পরিবর্তে বর্তমানকালে শ্রেণীটিকে আরও প্রশস্ত পরিসরে বিবেচনা করা এবং তার ভিত্তিতে সমগ্র শ্রমজীবীদের ভবিষ্যৎ রণনীতিগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এঁরা সমস্ত অনুৎপাদক শ্রমজীবীকে শ্রমিকশ্রেণী থেকে আলাদা করার যুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন মার্কসের "উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক"-র তত্ত্বের ভিত্তিতে। কিন্তু অনুৎপাদক শ্রমজীবীরা শ্রমিকশ্রেণী কিনা তা' নির্ধারণ করার জন্য এঁরা শর্ত দিয়েছিলেন উৎপাদনের বিশিষ্ট স্তরকে হিসাবের অন্তর্গত করার। অবিলম্ব (ইমিডিয়েট) সামাজিক সম্পর্ক ও উৎপাদনের শ্রেণী সম্পর্ককে এঁরা দু'টি স্বতন্ত্র স্তর হিসাবে বিবেচনা করেন। এঁরা দেখাতে চাইলেন, 'অর্থনৈতিক' স্তর সুনির্দিষ্টভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সীমানা বা মানকে স্থির করে (শ্রম শক্তির বিক্রেতা/উৎপাদনের উপায়ে অ-মালিকানা), অন্যদিকে "শ্রেণী-সম্পর্কর" মধ্যে বিধৃত থাকে রাজনীতি

ও মতাদর্শের উপাদান। দ্বিতীয়টির সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণীর বিশিষ্ট অংশ বা ভগ্নাংশের ব্যবহারিক দিকগুলিকে চিহ্নিত করা চলে।

এঙ্গেলসের বক্তব্যের ভিত্তিতে রাজনীতিকে অর্থনীতি থেকে "তুলনামূলক স্বাধীন" হিসাবে উত্থাপন করে যাঁরা মত প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মতকেও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন আর এক অংশ। শেষোক্তদের মতে এঙ্গেলসের এই বক্তব্য বিভ্রান্তিকর ও এক ধরনের সমঝোতা। এঁদের মতে এঙ্গেলসের এই বক্তব্যে দুই দিকই বজায় রাখা হয়েছে। এতে একদিকে রয়েছে অর্থনীতিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে যোগাযোগকে স্বীকার, অন্যদিকে ঐ বক্তব্যের দ্বারা রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংগ্রামের বিশিষ্টতা স্বীকৃত হচ্ছে। এঁদের মতে মার্কসবাদ যে কেন্দ্রীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা' হলো, যে কোন একটিকে গ্রহণ ও অপরটিকে বর্জন করতে হবে—হয় অর্থনীতি-ভিত্তিকতা অথবা রাজনৈতিক শক্তিসমূহ ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কহীনতা। এদের মূল অভিমতটি ছিল যে শ্রেণীগুলি সরাসরি শ্রেণী সংগ্রাম করে না, বরং সংগ্রাম করে রাজনৈতিক শক্তিগুলি এই রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে শ্রেণী-প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে প্রমাণ করা যায় না। সেজন্য এদের মতে, মার্কসবাদীদের উচিত, সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা ; কেবলমাত্র এই পথের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য যথার্থ রাজনৈতিক রণনীতি গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে।

সত্তরের দশকে ইউরো-কমিউনিজমের মতবাদ ছাড়াও মূল মার্কসবাদ নিয়ে ইতালি, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, পর্তুগাল, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বিভিন্ন ধারায় আলোচনা শুরু করেছিল। সেগুলির মধ্যে ছিল শ্রেণী, শ্রেণী কাঠামো ও শ্রেণী সংগ্রাম বিষয়ে আলোচনা। এখানে সেগুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এখানে উত্থাপনের চেষ্টা হয়েছে—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিত্তি নিয়ে প্রধানত যেসব আলোচনা চলেছিল, তার কিছু দিক। পূর্বোক্ত আলোচকরা শ্রমিকশ্রেণীর সামনে উদ্ভুত সমস্যার কার্যকারণ অনুসন্ধানের পরিবর্তে সমস্যার কারণ অনেকটাই ও প্রথমে খোঁজা শুরু করেছিলেন মার্কসবাদের মধ্যে। মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রয়োগ করে বা কর্মসূচী রূপায়ণে তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি গোলমাল বাধতো, তবে মার্কসবাদের সমস্যা বিবেচনা করাই ছিল সঠিক পন্থা। কিন্তু সেপথে তাঁরা যাননি। তার ফলে এই বিতর্ক কোন ফলপ্রসূ পথ দেখাতে পারেনি, বরং বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতাকে বাড়িয়েছিল।

আশির দশকে আরও বিভিন্ন দিক থেকে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছিল। উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে দেশে দেশে মালিকশ্রেণীর আক্রমণ যেমন তীব্র হতে থাকে, রাজনৈতিক স্তরে কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট ও সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি নির্বাচনে ব্যর্থ হচ্ছিল অতীতের অবস্থান রক্ষা করতে। ১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে ব্রিটেনে লেবার পার্টি পর পর পরাজিত হয়। মধ্যপন্থী ও বামপন্থীদের এই নির্বাচনী বিপর্যয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিরূপতার প্রভাব খুব কম ছিল না। পরম্পরাগত শ্রমিকশ্রেণীর ভোট মোটামুটি অক্ষুণ্ণ থাকলেও নতুন শিল্পের শ্রমিকদের ভোট ব্যাপকভাবে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যায়। পুরানো শিল্পের বদলে যেসব ভৌগোলিক অঞ্চলে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, সেইসব এলাকায় এই প্রবণতা ছিল সুস্পষ্ট। ফ্রান্স, ইতালি, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে লক্ষ্য করা যায় অনুরূপ প্রবণতা। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যে ও আমেরিকায় বিশাল বিশাল শ্রমিক-ধর্মঘটের একের পর এক পরাজয় ঘটতে থাকে। বিশেষত ১৯৮৪-৮৫ সালে ব্রিটেনের খনি-শ্রমিকদের লাগাতার ঐতিহাসিক ধর্মঘটের পতন, বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘ অধ্যায়ের ছেদের মুহূর্তকে ঘোষণা করে দেয়। স্বভাবতই সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে শ্রেণীর প্রসঙ্গের বিচার নতুন স্তর অর্জন করে। সমগ্র আশির দশক জুড়ে শ্রেণীর প্রশ্ন প্রধান রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট, বামপন্থী ও বাম-ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামনে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গরবাচভের 'পেরিস্ত্রৈকা'র তত্ত্ব বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনে আরো জটিলতা (পরবর্তীকালে আলোচিত হবে) সৃষ্টি করে।

শ্রেণী ও শ্রেণী-কাঠামো প্রসঙ্গে এই সময়ে যে বিতর্ক শুরু হয়, তাতে উল্লেখযোগ্য অংশীদারদের অন্যতম ছিলেন ই. ও. রাইট (ক্লাস স্ট্রাকচার অ্যাণ্ড ইনকাম ডিটারমিনেশন, ১৯৭৯), জে. স্কট

(কর্পোরেশনস, ক্লাসেস অ্যাণ্ড ক্যাপিটালিজম, ১৯৭৯), এম. পি. কেলী (হোয়াইট কলার প্রলেতারিয়েত, ১৯৮০), জে. গোল্ড থ্রপ ও অন্যান্যরা (স্যোস্যাল মবিলিটি অ্যাণ্ড ক্লাস স্ট্রাকচার ইন মডার্ন ব্রিটেন, ১৯৮০), এন. নিকলসন, জি. আরসেল ও পি. ব্লাইটন (দা ডিনামিকস অব হোয়াইট কলার ট্রেড ইউনিয়নিজম, ১৯৮১), জি. ই. এম. ডি. স্টিক্রোইক্স (দা ক্লাস স্ট্রাগল ইন অ্যানসিয়েন্ট গ্রীক ওয়ার্ল্ড, ১৯৮১), এ. গিড্ডেন (দা ক্লাস স্ট্রাকচার অব অ্যাডভান্সড সোসাইটিজ, ১৯৮১), ডি. এম. গর্ডন ও অন্যান্য (সেগমেন্টেড ওয়ার্ক, ডিভাইডেড ওয়ার্কার্স, ১৯৮২), আর. ভারো (সোস্যালিজম অ্যাণ্ড সারভাইভাল, ১৯৮২), জে. স্কট (দা আপার ক্লাসেস, ১৯৮২), জে. বোয়েমার (এ জেনারেল থিওরি অব এক্সপ্লয়টেশন অ্যাণ্ড ক্লাস, ১৯৮২), টনি ক্লিফ (নাইদার ওয়াশিংটন নর মস্কো, ১৯৮২) প্রমুখ। এইসব আলোচনাতে কোন কোন লেখক শ্রেণী-বিষয়ে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে কিছুটা সমর্থন করলেও, নতুন পরিস্থিতির নাম করে, তাঁদের পক্ষ থেকে শ্রেণী-সংজ্ঞার সংস্কারের প্রস্তাবগুলি ছিল প্রধান। কিন্তু এই ধরনের আলোচনা থেকে ধীরে ধীরে শ্রেণী-বিষয়ে মার্কসবাদী সংজ্ঞার উপরই প্রত্যক্ষ আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। বলা চলে এবিষয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয় ফরাসী বাম-বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে গরজ্ রচিত 'ফেয়ারওয়েল টু দা ওয়ার্কিং ক্লাস' শিরোনামের পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর। এরপর 'মার্কসিজম টুডে' পত্রিকাতে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ঐতিহাসিক এরিক হবস্‌বম, নিউ লেফট রিভিউ পত্রিকা, ফিলিপ বার্সেট-এর 'স্ট্রাইক-ফ্রি নিউ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইন ব্রিটেন' ইত্যাদি আলোচনাতে বিতর্ক তীব্র হয়ে ওঠে।

এই বিতর্কে প্রধানত যে প্রশ্নগুলি তুলে ধরা হয়েছিল সংক্ষেপে সেগুলির বিষয়বস্তু ছিল ঃ প্রথমত, মার্কসের মৃত্যুর পর ধনতন্ত্রের যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তাতে বর্তমান বিশ্বের সামাজিক কাঠামোতে মূলধন ও মজুরিভোগী শ্রমিকের মধ্যে সহজাত শত্রুতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে কিনা। দ্বিতীয়ত, সত্তরের দশকের বিশ্বমন্দার ফলে বি-শিল্পায়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা' কার্যকরীভাবে পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটাচ্ছে কিনা। তৃতীয়ত, নতুন ধরনের শিল্পায়নের ফলে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ও সুবিধাভোগী শ্রমিকদের দ্বারা এক ধরনের 'কোর' বা কেন্দ্রীয় স্তর গঠন এবং অস্থায়ী ও সাময়িক সময়ের জন্য নিযুক্ত কর্মীরা 'নিউ সার্ভেন্ট ক্লাস' হিসাবে পেরিফেরি বা প্রান্তসীমা গঠিত হয়ে উভয় অংশের মধ্যে যোজন-প্রমাণ প্রভেদ ও ভেদ সৃষ্টি করছে কিনা। চতুর্থত, শ্রেণী কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে কিনা, ইত্যাদি।

. এইসব প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কসবাদ থেকে লেনিন, ট্রটস্কি, গ্রামসি, লুকাস, রোজা লুক্সেমবার্গ, আলথুসার, পৌলানতাজাস প্রমুখের তথাকথিত ভিন্নমতকে যেমন ব্যবহার করা হচ্ছিল, অন্যদিকে শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসের মতবাদকে অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ করার চেষ্টায় উদ্ভাবিত হচ্ছিল নতুন নতুন তত্ত্ব।

তাত্ত্বিক কথা অনেক বললেও, কার্যকালে এঁরা অনেকেই 'কমনসেন্স ভিউ' বা সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নেন। আসলে পরিশীলিত বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এই 'কমনসেন্স ভিউ' মার্কসবাদী শ্রেণী-বিষয়ক সংজ্ঞাকে অপসারণ করার চেষ্টা করেছিল। শ্রেণীর অবস্থান, শ্রেণী-চরিত্র ও শ্রেণী-বিভাজনকে এঁরা বিচার করেছিলেন প্রধানত 'স্ট্যাটাস' বা মর্যাদার স্তর, 'অকুপেশন' বা পেশা ও 'ইনকাম' বা আয়ের মাপকাঠিতে।

'স্ট্যাটাস' বলতে বোঝানো হচ্ছিল মানুষ কিভাবে নিজের সামাজিক অবস্থানকে সর্বোপরি বিবেচনা করে এবং অন্যরাই বা কি দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। স্ট্যাটাস-ধারণার ভিত্তি ছিল সংশ্লিষ্ট মানুষের জীবনযাত্রার মান ও ভোগের চরিত্র। পঞ্চাশের দশকে একাংশ সমাজতাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রস্তাবিত ভারী শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর 'এমবুর্জোয়াইসমেন্ট' বা বুর্জোয়াকরণের তত্ত্ব, এই সময়ে, অনেকটা স্ট্যাটাস তত্ত্বের অন্তরালে ফিরে আসে। আলোচ্য কালের নতুন শিল্পে মস্তিষ্কজাত শ্রমের বৃদ্ধি ও উন্নত মজুরির সুযোগের সাথে পরম্পরাগত শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক

তথ্য ও গতিকে প্রমাণ হিসাবে খাড়া করে বস্তুগত সুযোগ-সুবিধায় উন্নত নতুন শ্রমজীবী অংশকে শ্রমিকশ্রেণী বহির্ভূত এবং তারা আন্দোলনে অংশীদার হবে না বলে দাবী করেছিলেন স্ট্যাটাস-বাদীরা।

'অকুপেশন'-ভিত্তিক শ্রেণী বিচার তাৎপর্যপূর্ণ ছিল অন্য কারণে। 'অকুপেশন' বা বৃত্তিগত অবস্থানের বিচার করার ভিত্তি ছিল একজন শ্রমজীবী সুনির্দিষ্ট কি কাজ করে ও শ্রমের চরিত্র কি—অদক্ষ, আধা-দক্ষ, দক্ষ, অতি-দক্ষ, কায়িক বা মস্তিষ্কজাত, প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গের আলোচকরা কেবলমাত্র কায়িক শ্রমদায়ীদেরই শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে স্বীকারের পক্ষপাতী ছিলেন। তদানীন্তন উন্নত ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতে যেহেতু কায়িক শ্রমদায়ীর সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাচ্ছিল, এই বিষয়গত (সাবজেক্টিভ) বাস্তবতা থেকে এঁরা বলেছিলেন যে বর্তমান বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণী ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে। আর শ্রমিকশ্রেণীই যদি অবলুপ্ত হয় তবে মার্কসবাদের শ্রেণী, শ্রেণী কাঠামো, শ্রেণী সংগ্রাম ইত্যাদি তত্ত্বের ভিত্তি থাকছে না। স্বভাবতই লয়ের পথে চলেছে ট্রেড ইউনিয়ন।

'ইনকাম' বা উপার্জন-ভিত্তিক শ্রেণী চরিত্র নির্ধারণ অনেকটাই ছিল স্ট্যাটাস-তত্ত্বের কাছাকাছি। ইনকাম-বাদীদের বক্তব্য ছিল যে শোষণের প্রসঙ্গ এখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়; কেননা উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে গোষ্ঠী বা গণতান্ত্রিক মালিকানা (কর্পোরেট) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে শোষণ নির্বিষ হচ্ছে এবং মুনাফার উল্লেখযোগ্য বন্টন ঘটছে শ্রমিকদের মধ্যে। এই বন্টনের মাত্রা প্রতিফলিত হচ্ছে একজন কর্মজীবীর কাজের স্তর, গুরুত্ব ও উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে প্রদত্ত মজুরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে। ফলে নতুন শ্রমিকদের উপার্জন বাড়ছে। এই সময়ে নতুন শ্রমিকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ, অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায়, অনেক বেশি আর্থিক সুযোগ পেতে শুরু করে। তাত্ত্বিকদের মতে, এর দ্বারা ধীরে ধীরে নতুন ধরনের কর্মজীবীরা বাইরে চলে যাচ্ছে প্রচলিত শ্রমিকশ্রেণীর গণ্ডী থেকে। এঁদের মতে আধুনিক পুঁজিবাদে এই প্রবণতা এক প্রক্রিয়া এবং তা' ক্রমবর্ধমান। সুতরাং এখন থেকে নতুন ধরনের শ্রমিকদের উপার্জন ক্রমান্বয়ে বাড়বে ও শ্রমিকশ্রেণীর বৃত্ত থেকে বাইরে চলে যাবে। তাছাড়া এঁরা বললেন যে 'হোয়াইট কলার' শ্রমজীবীরা শ্রমিক নয়। শিল্প-শ্রমিকের পরিবর্তে হোয়াইট কলার শ্রমিক সংখ্যা যেমন বাড়ছে, অন্যদিকে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই হোয়াইট কলার শ্রমজীবীরা উৎপাদনে বৃহত্তর ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে এদের আর্থিক উপার্জনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ইনকামের মাপকাঠিতে হোয়াইট কলারদের প্রথাগত শ্রমিকশ্রেণীর বাইরে চলে যাওয়া ছাড়াও শ্রমজীবীদের বৃহৎ অংশের হোয়াইট কলারে রূপান্তরের প্রক্রিয়া প্রচলিত শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের অবসানকে চিহ্নিত করছে। পড়ে থাকা অবশিষ্ট শ্রমজীবী অংশ যে শ্রেণীর অন্তর্গতই হোক না কেন, উৎপাদনে তাদের ভূমিকা হতে থাকবে ক্রমশ আরও দুর্বল। সুতরাং প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে তারা চিহ্নিত হবে না। আর শ্রমিকশ্রেণী না থাকলে মার্কসবাদে সমগ্র শ্রেণী-প্রসঙ্গ অকার্যকর হয়ে পড়বে।

কিন্তু পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে আশির দশকে উত্থাপিত পূর্বোক্ত প্রধান চারটি প্রশ্নে কোন সঠিক জবাব দিতে পারেনি 'কমনসেন্স ভিউ'। কেননা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী দশ বছরে শ্রমিকশ্রেণী অবলুপ্ত হয়নি, অবলুপ্ত হয়নি ট্রেড ইউনিয়নও। ফলে সত্তর দশকের বিতর্কের মতই, এই অধ্যায়ের পরিণতি একই ঘটে। তবে তত্ত্বের নিম্নগামিতা ও নিম্নগামী শ্রমিক আন্দোলনের উপর প্রবল আঘাত আসে এর অনতিকালের মধ্যে।

বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে শ্রেণী-হাতিয়ার কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ

১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গরবাচভ 'পেরিস্ত্রৈকা' তথা কাঠামোগত সংস্কারের নীতি ঘোষণা করেন। গরবাচভের ঘোষিত পেরিস্ত্রৈকার নীতি নিছক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তথাকথিত সার্বিক সংস্কারের জন্য যে ছিল না, ধীরে ধীরে নানাভাবে তার প্রমাণ পাওয়া যেতে থাকে। এই সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য ছিল মার্কসবাদকে বর্জন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে প্রধান এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বদায়ী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার কমিউনিস্ট পার্টির এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিণাম যা ঘটার

তা' দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে। এর প্রভাব দেশের সীমাকে অতিক্রম করে অচিরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে গোটা পৃথিবীতে।

মার্কসবাদকে পরিত্যাগ করা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রশ্নে পেরিস্ত্রৈকা যে নীতি ঘোষণা করে, সামান্য কিছু উল্লেখ থেকে তা' স্পষ্ট হবে। ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসের পরবর্তীকালে গৃহীত অন্যান্য বহু দলিলের কথা বাদ দিলেও, জুলাই, ১৯৯০-তে অনুষ্ঠিত সি পি এস ইউ তথা কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়নের ২৮-তম কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গরবাচভের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, "নতুন রাজনৈতিক চিন্তা আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে নতুন করে দেখতে ও বাস্তবসম্মতভাবে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করছে, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সংঘাতমূলক মনোভাব থেকে আমাদের অব্যাহতি দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠেছে এমন একটি দেশ যা বিশ্বের কাছে সহযোগিতার জন্য উন্মুক্ত। এ ভীতি সঞ্চার করে না, বরং সম্মান ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে।"

রিপোর্টের অন্যত্র বলা হয়েছিল "নতুন চিন্তাধারা ও পেরিস্ত্রৈকার পরিণাম স্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অনেকখানি উন্নত হয়েছে—সংঘাত ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পাল্লা দেওয়ার থেকে অনেকগুলি প্রশ্নে পারস্পরিক সহমর্মিতার দিকে এবং এমনকি সহযোগিতার দিকে এগিয়েছে। এর ফলে সারা দুনিয়ার পরিস্থিতি ভাল-র দিকে পরিবর্তিত হয়েছে এবং মানব জাতির জীবনে অভূতপূর্ব শান্তির কালপর্ব অভিমুখে অন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছে।..."

মিখাইল গরবাচভ রিপোর্টে ঘোষণা করলেন, "আমি মনে করি, আমাদের সকলেরই পেরিস্ত্রৈকা-পূর্ব সমাজের উপর মতাদর্শগত প্রভাবের কথা মনে আছে, যে মতান্ধতা ও সেকেলে ধ্যান-ধারণা গণ-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই প্রথম কাজ হলো চিন্তাকে স্বাধীনতা দেওয়া, মননকে মুক্তি দেওয়া। এটাই পেরিস্ত্রৈকার রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।" পেরিস্ত্রৈকা-পূর্ব সমাজের উপর কোন্ মতাদর্শের প্রভাবের কথা তিনি বলেছিলেন? কি সেই "মতান্ধতা ও সেকেলে ধ্যান-ধারণা", যা "গণ-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল"? গরবাচভ নিজেই জবাব দিয়েছিলেন ঐ রিপোর্টে। তিনি বলেছিলেন, "মার্কস ও এঙ্গেলস যে সামাজিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন তা' ঊনবিংশ শতাব্দীর বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং লেনিনের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দশকগুলির ভিত্তিতে রচিত। তারপর থেকে অক্টোবর বিপ্লব এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাবে পৃথিবী, বিশেষ করে মার্কসবাদ, এত বদলে গেছে যে আর চেনা যায় না।"

কেবলমাত্র সময়ের ব্যবধানের সরলীকৃত মাপকাঠিতে সেভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অস্বীকার করার স্বাভাবিক পরিণাম, অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে, শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের উপর অচিরেই ঘনায়মান হয়েছিল। ঐ রিপোর্টে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, যেটি ছিল বিশ্ব সংগ্রামী-শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, সম্পর্কে মন্তব্য করা হলো ঃ "...তারা (ট্রেড ইউনিয়ন—লেখক) প্রধানত সরকারী হিসাবে কাজ করেছে এবং তাদের রাখা হয়েছে অধস্তন করে। ট্রেড ইউনিয়নের সনাতন ভাবমূর্তির সাথে এটা মিলেও যাচ্ছে, অর্থাৎ এ হলো লিভার, ড্রাইভিং বেল্ট, 'কমিউনিজমের পাঠশালা' ইত্যাদি।

"স্বভাবতই, এভাবে দেখলে ট্রেড ইউনিয়নের আসল উপযোগিতা অনেকটাই হ্রাস পায় এবং সমাজে যখন রূপান্তর ও গণতন্ত্রীকরণ চলছে তখন এটা মেনে নেওয়া যায় না।"

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ভূমিকার পরিবর্তনের প্রস্তাব করতে গিয়ে যুগ অবস্থার তথাকথিত পরিবর্তনের যে উল্লেখ করা হয়েছিল যুক্তি হিসাবে সেটাই যেহেতু যথেষ্ট ছিল না, সেইহেতু শ্রমিকশ্রেণীর চরিত্র ও তাঁদের ভূমিকা-লক্ষণের পরিবর্তনের কথাও গরবাচভকে পেশ করতে হলো। প্রসঙ্গটা তিনি প্রধানত আলোচনা করেছিলেন, রুশ বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সভাতে।

'অক্টোবর বিপ্লব এবং পেরিস্ত্রৈকা ঃ বিপ্লব অব্যাহত' শীর্ষক ভাষণে গরবাচভ বলেছিলেন, "...বিশেষত নিউক্লিয়ার যুগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের পক্ষে এক শর্ত হয়ে উঠেছে।" সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও পুঁজিবাদের সহজাত চরিত্রের মূল উপাদানগুলিকে

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিকল্প দ্বারা পরিবর্তন করা সম্ভব, তেমন বক্তব্যও মিখাইল গরবাচভ উত্থাপন করলেন। তার পাশাপাশি এটাও বললেন, "ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি ছিন্ন করার ডাক দেওয়া বিপজ্জনক এবং এর দ্বারা সমস্যার কোন সমাধান হয় না।" অর্থাৎ পুঁজিপতিরা শ্রমজীবীদের শোষণ করে, পদানত বা সদ্য-স্বাধীন দুর্বল দেশগুলিকে নয়া-উপনিবেশবাদ বা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল করে রাখে, ভয়াবহ অর্থনৈতিক শোষণ চালায়, সাম্রাজ্যবাদ তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য সমরবাদ ও সামরিক অর্থনীতির উপর নির্ভর করে, বিশ্বকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সামরিক জোট গঠন করে, এমনকি সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালায় ইত্যাদি হলো গরবাচভের মতে "ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি" এবং "এগুলিকে ছিন্ন করার ডাক দেওয়া বিপজ্জনক এবং এর দ্বারা সমস্যার কোন সমাধান হয় না।" তাঁর মতে যেহেতু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব নিজেই উৎপাদিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং কায়িক শ্রমের পরিবর্তে মানসিক শ্রমে ভর তৈরি হয়েছে সুতরাং পরোক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীও। গরবাচভ স্বীয় প্রতিপাদ্যকে সর্বাগ্রে প্রয়োগ করলেন নিজ দেশের ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন তথা দেশগত বিচারে তদানীন্তন বিশ্বের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন 'অল ইউনিয়ন সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস অব সোভিয়েত ইউনিয়ন'-এর (এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ.) ১৯-তম কংগ্রেস পূর্বোক্ত পটভূমিকায় ২৩-২৭শে অক্টোবর '৯০ মস্কোর 'ক্রেমলিন প্যালেস অব কংগ্রেস'-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের ১৪ কোটি শ্রমিকদের থেকে ২,৩০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। এই সুবিশাল ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগঠনটি সম্পর্কে পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রধানত যে সমালোচনাগুলি সম্মেলনে উত্থাপন করা হয়েছিল তা' সংক্ষেপে ছিল নিম্নরূপ ঃ

—শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থরক্ষার নির্ধারিত চরিত্র হারিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আধা-নাগরিক, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে ; এটি অধিকাংশ সময়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থেকেছে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ দেখেনি;

—১৯৮৫ সালে রাশিয়াতে যে পুনর্গঠনের (পেরিস্ত্রৈকার)কাজ শুরু হয়েছে, সেক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

—জনজীবনের প্রকৃত বাস্তবতায় যে সুগভীর পরিবর্তন ও সমাজ জীবনের সূক্ষ্ম ও জটিল পরিবর্তন চলছে, তার সাথে সমতা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে এই সংগঠন। তার ফলে জনসাধারণ, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণী, এটির ভূমিকার উপর আস্থা হারিয়েছে;

—বর্তমান বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, প্রমাণিত হয়েছে যে "ট্রেড ইউনিয়ন সাম্যবাদের পাঠশালা" নয়, প্রভৃতি।

সংগঠনের চেয়ারম্যান ভ্লাদিমির পাবলোভিচ সেচারব্যাকেভ বললেন, "এই বিশেষ কংগ্রেসের কর্তব্য হলো বর্তমান সময়ের উপযোগী করে এক নতুন ট্রেড ইউনিয়ন ধারণার উদ্ভাবনা ঘটানো, যাতে ট্রেড ইউনিয়নের বৈপ্লবিক (!) পুনর্জাগরণের পথ নির্ণয় করা যায়"। সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি মিখাইল গরবাচভ, সুপ্রিম সোভিয়েতের চেয়ারম্যান আনাতোলি লোকিয়ানভ, মন্ত্রিসভার চেয়ারম্যান নিকোলাই রিয়াজকভ প্রমুখও সম্মেলনে ভাষণ দেন। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে নিজেদের আলাদা রেখে, প্রধানত শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং উন্নয়ন ও পরিকল্পনাতে শ্রমিকশ্রেণীকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এঁরা ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলন থেকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রধানত যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছিল সংক্ষিপ্তাকারে তা' হলো ঃ

—অল ইউনিয়ন সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নসকে ভেঙ্গে দেওয়া হলো; অর্থাৎ বিলোপ করা হলো অবিস্মরণীয় শক্তির আধার সেই সংগঠনটির যা ছিল লেনিন-স্তালিন সৃষ্ট ও পরিচালিত,

সোভিয়েত সমাজ ও অর্থনীতি নির্মাণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী, ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার মহত্তম অবদান সৃষ্টিকারী, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুরোধা, রুশ শ্রমিকশ্রেণীর নিরঙ্কুশ প্রতিনিধিত্বকারী ও নেতৃত্বদানকারী এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের এবং শ্রমিকশ্রেণীর কেন্দ্রীভূত শক্তির অন্যতম আধার।

—তার পরিবর্তে গঠন করা হলো চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও যে কোন মতাবলম্বী কিন্তু নতুন সংগঠনের নীতিতে অনুগত এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছার ভিত্তিতে যোগদান বা চলে যাওয়ার অধিকারী শ্রমজীবী ও ছাত্রদের নিয়ে এক সমবায় চরিত্রের 'দা জেনারেল কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস অব দা ইউ এস এস আর';

—এই কনফেডারেশন সরকারী অথবা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব থেকে ও রাজনৈতিক জন-প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের মুক্ত বলে ঘোষণা করলো;

—নতুন পরিস্থিতির ভিত্তিতে ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের স্তরে ট্রেড ইউনিয়নে প্রয়োজনের স্বার্থের চেয়ে অত্যধিক রাজনীতিকরণ ও নানা শ্রমিক-সংস্থার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা কনফেডারেশন ঘোষণা করলো; 'মানবতাবাদ'-এর লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য, 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস' (ডব্লু. এফ. টি. ইউ.)-এর আসন্ন দ্বাদশ সম্মেলনের উদ্দেশে, যৌথ ধারা গড়ে তোলার জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানালো।

—সংগঠনটি ইউ এস এস আর-এর সংবিধানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়াও 'ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস', মানবাধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য আইন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ও সেটির কনভেনশনগুলির কাঠামোর মধ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান গণসংগঠন—ট্রেড ইউনিয়নকে একদিকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে বিযুক্তিকরণ এবং অন্যদিকে বিশ্ব-বুর্জোয়া ধারার রীতি ও নীতিভিত্তিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ, আই এল ও প্রভৃতির সিদ্ধান্ত অনুসরণের নির্দেশ স্বভাবতই ভয়াবহ বিপদের ইঙ্গিত বহন করে আনলো। এইসব সিদ্ধান্তের অবিলম্ব ও প্রত্যক্ষ প্রতিফলন পড়ল ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-র পরবর্তী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।

ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর দ্বাদশ কংগ্রেস ১৩-২০শে নভেম্বর'৯০ মস্কো শহরে অনুষ্ঠিত হলো। ঐ সম্মেলনে গৃহীত মূল দলিলটির শিরোনাম ছিল "ট্রেড ইউনিয়ন স্ট্র্যাটেজিস ফর দি নাইনটিন নাইনটিজ : ডেমোক্র্যাটিক অলটারনেটিভ ইন দা ইন্টারেস্টস অব ওয়ার্কার্স এবং হিউম্যান কাইণ্ড থ্রু ট্রেড ইউনিয়ন ডায়ালগ অ্যাণ্ড অ্যাকশন।" অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলির জন্য নব্বই-এর দশকের রণনীতিগুলি স্থির করা হলো—আলোচনা ও কর্মধারার মাধ্যমে শ্রমজীবী ও মানবসমাজের স্বার্থের জন্য গণতান্ত্রিক বিকল্প গঠন। লক্ষণীয় যে শিরোনামের মধ্য দিয়েই সংগ্রামের পথকে বাতিল করে আলোচনা ও তৎপরতার পথ বাতলানো হলো। রিপোর্টটির ভূমিকাতে বলা হয়েছিল "নব্বই-এর দশকের উষালগ্নে বিশ্বব্যাপী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মুখোমুখি হয়েছে এক বিশাল পরিবর্তনের, এক নতুন চ্যালেঞ্জের। এই পরিবর্তনসমূহ ও চ্যালেঞ্জগুলি আগামী দিনে, প্রকৃতপক্ষে নব্বই-এর দশককে অতিক্রম করে, লক্ষণীয় প্রভাব রাখতে চলেছে। বর্তমানের সামাজিক আন্দোলনগুলির মধ্যে এখনই তার লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে। সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষায় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য যেগুলি জনগণের চাহিদা পুরণের প্রয়োজনে কার্যকরী হবে, সেইসব ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ক্রমবর্ধমান।" শোষণভিত্তিক বনাম সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য ও সেক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের করণীয়সমূহের মধ্যে কোন প্রভেদ না দেখিয়ে সবটা একাকার করে রিপোর্টে বলা হয়েছিল, "উন্নয়নের প্রসঙ্গই বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন।" এটাকে আরও পরিষ্কার করে অন্যত্র বলা হলো, "...এই প্রসঙ্গে, ট্রেড ইউনিয়নকে তার ক্ষমতার মধ্যে সব কিছুই করতে হবে যাতে সহযোগিতা ও নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি পারস্পরিক স্বার্থ ও ন্যায়ের

ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।" শ্রমজীবীদের লক্ষ্য শোষণের মুক্তি ও সমাজতন্ত্র নয়, রিপোর্টের মতে, "এক সর্বজনীন লক্ষ্য সর্বত্রই আবির্ভূত হচ্ছে—গণতন্ত্র, শব্দটির সর্বব্যাপক স্বার্থে...।" এইসব প্রতিপাদ্যের পটভূমিকা উল্লেখ করতে গিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছিল, "এটা অত্যুক্তি হবে না, যদি বলা হয় যে, ১৯৮০-এর দশকের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের পেরিস্ত্রৈকা, যার মূল লক্ষ্য হলো হস্তক্ষেপকারী কর্তৃত্বমূলক প্রথার অপসারণ এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মানবাধিকারসমূহের কার্যকরী ও পরিপূর্ণ রূপায়ণ। ...নিরস্ত্রীকরণ ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের লক্ষ্যে পেরিস্ত্রৈকা হাত ধরাধরি করে চলেছে।..." অতঃপর ট্রেড ইউনিয়নের করণীয় প্রসঙ্গে প্রস্তাব করা হলো..."আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নতুন ধারণার আবির্ভাবকে বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিবেচনার মধ্যে রাখছে এবং সকলের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সারা দুনিয়ার নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী করতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলির গণতান্ত্রিকীকরণের আদর্শকে (ট্রেড ইউনিয়নগুলি) স্বীকৃতি দিচ্ছে।"

রিপোর্টে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির শোষণের কথা বলা হলেও সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি একবারও উচ্চারিত হয়নি; উচ্চারিত হয়নি শ্রেণী-সংগ্রামের কথা। শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও ধর্মঘট এবং সেইসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্বের আহ্বান রিপোর্টের কোথাও জানানো হলো না।

প্রসঙ্গত, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস-এর অতীত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, ১৯১৮ সালের জানুয়ারীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন থেকে গৃহীত হয় বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিপ্লবী আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গঠনের প্রস্তাব। বিভিন্ন দেশ থেকে অতি দ্রুত এ ব্যাপারে সাড়া পাওয়া যায়। এই সূত্র ধরে অন্যান্য দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ আলোচনা শুরু করেছিল। আলোচনার ভিত্তিতে সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন, দি জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার অব ইতালি, দি ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব লেবার অব স্পেন, দি সিন্ডিক্যালিস্ট ইউনিয়ন অব বালগেরিয়া এবং ফ্রান্স ও জর্জিয়ার কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলি নতুন সংগঠন গড়ার জন্য এক আবেদন প্রকাশ করেছিল আন্তর্জাতিক স্তরে। এই আবেদনকে সাড়া দেয় ব্রিটিশ শপ-স্টিউয়ার্ডস্ মুভমেন্ট, দি ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স অব হল্যান্ড অ্যান্ড ডাচ ইন্ডিস, দি জার্মান সিন্ডিক্যালিস্ট ইউনিয়ন, দি সিন্ডিক্যালিস্ট ইউনিয়ন অব ইতালি ও নরওয়েজিয়ান ইউনিয়নগুলি। আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে প্রচার অভিযান শুরু করার জন্য একটি কাউন্সিল গঠিত হয়। এইসব সংগঠনগুলির দ্বারা গঠিত 'দি ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব ট্রেড অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নস', ১৫ই জুলাই, ১৯২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভা থেকে, শ্রেণী-সমন্বয়বাদিতার বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের কর্মসূচী নেয়। একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠনের জন্য শুরু হয় প্রস্তুতি। জুলাই, ১৯২১-এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'রেড ইন্টারন্যাশনাল অব লেবার ইউনিয়নস' বা আর. আই. এল. ইউ.—ইতিহাসে যা 'প্রফিন্টার্ন' নামে পরিচিত। লক্ষ্য হিসাবে এই আন্তর্জাতিক সংগঠন ঘোষণা করেছিল :

"(ক) পুঁজিবাদের অবসানের জন্য, নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মেহনতিদের মুক্তি অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক গণ-মঙ্গলকারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সারা বিশ্বের ব্যাপকতম শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করা

"(খ) বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজ-বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের নীতিসমূহ নিয়ে ব্যাপক প্রচার ও শিক্ষাদান এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র অবসানের লক্ষ্যে বিপ্লবী গণ-সংগ্রাম পরিচালনা;

"(গ) বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনকে ভিতর থেকে নিঃশেষকারী দুর্নীতি ও পচনের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াদের সাথে সমঝোতামুখিনতার বিরুদ্ধে, শ্রেণী-সমঝোতা ও শোষণ-ভিত্তিক সমাজে তথাকথিত সামাজিক

শান্তির ধারণার বিরুদ্ধে এবং পুঁজিবাদ থেকে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের অলীক প্রচারের বিরুদ্ধে এই সংগঠন কাজ করবে;

"(ঘ) বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী শ্রেণী-উপাদানগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং...আমস্টারডাম ইন্টারন্যাশনাল অব ট্রেড ইউনিয়নস [সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট সংগঠন—লেখক], যাদের কর্মসূচী ও কৌশলগুলি হলো বিশ্ব-পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা, তাদের বিরুদ্ধে নির্ধারক সংগ্রাম চালানো।"

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (আগস্ট, ১৯২০) লেনিনের 'কলোনিয়াল কোশ্চেন' প্রসঙ্গে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে, কলোনি ও আধা-কলোনিগুলিতে, জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'প্রফিনটার্ন'-এ।

প্রফিনটার্নের অবসানের পরবর্তীকালে গঠিত 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস'-এর ইতিহাসের পাতায় এবারে, এক ঝলক চোখ বোলানো যাক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন ভয়ঙ্কর গতিতে চলছে। তারই মধ্যে দেশে দেশে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে একটি আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ৬-১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫-এ লন্ডনের কান্ট্রি হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক সম্মেলন। একই সময়ে ইয়াল্টাতে মিত্র শক্তির তিন প্রধানদের (সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেন) এক সম্মেলন চলছিল। তাঁদের পক্ষ থেকে বার্তা পাঠানো হয় এই সম্মেলনকে অভিনন্দিত করে। বিশ্ব পরিস্থিতির চাপে সাম্রাজ্যবাদ-পৃষ্ঠপোষিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি একটি আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্তে সম্মতও হয়। কিন্তু ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ থেকে প্যারিসের প্যালাইস দা চ্যাইল্লট-এ অনুষ্ঠিত ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসে আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতা করা হয় খসড়া সংবিধান সম্পর্কে। অনতিকালের মধ্যে শেষোক্ত সংগঠন ঐক্যবদ্ধ সংগঠনে থাকেনি শুধু নয়, পঞ্চাশের দশক থেকে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-র প্রবল বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল এটি। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর নিষ্ক্রান্ত হওয়া এবং পরবর্তীকাল থেকে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর তীব্র বিরোধিতা, নির্ধারকভাবে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে জানান দিল যে, ডব্লু. এফ. টি. ইউ. বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সৃষ্ট। পরবর্তী ইতিহাসে ডব্লু. এফ. টি. ইউ. নিজ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তা' প্রমাণ করেও চলেছিল।

কিন্তু ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর পূর্বে উল্লেখিত দ্বাদশ সম্মেলন থেকে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হলো তা' পূর্বের সংবিধানের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এটির ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূমিকার সম্পূর্ণ বিপরীত।

পূর্বতন সংবিধানের 'লক্ষ্য' শীর্ষক অংশে বলা হয়েছিল—

"সুতরাং ডব্লু. এফ. টি. ইউ. ঘোষণা করছে যে এটির প্রধান লক্ষ্য হবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অর্জন ঃ

"(ক) পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো এবং সমস্ত শ্রমিকের জন্য বাঁচার ও কাজের পরিবেশ অর্জন করা ও নিশ্চয়তা বিধান—যা তাঁদের শ্রমের ফল থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুযোগ এনে দেবে; বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ও কারিগরীর তীক্ষ্ণ অগ্রগতির উপযোগী করে শ্রমিকশ্রেণী ও তাঁদের পরিবারদের জন্য কর্মের সময় ও উপায় অর্জন করা;

"—সকলের জন্য কাজের অধিকার এবং এই অধিকারের নিশ্চয়তা অর্জন;

"(খ) অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও বার্ধক্যের সময়ে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারবর্গের রক্ষার জন্য পূর্ণ ও যথেষ্ট সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ধরনের সাহায্য ও সামাজিক নিরাপত্তা

"(গ) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও সমস্ত ধরনের ফ্যাসিবাদ ও বর্ণ-বিদ্বেষবাদের পরিপূর্ণ অবসানের জন্য, সমস্ত জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য, উন্নয়নহীনতার অবসান এবং নতুন ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ করা;

"(ঘ) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্জনের জন্য, শ্রমিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার অগ্রগতির জন্য, মানবিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও 'ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন রাইটস'-এর প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা;

"(ঙ) আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ, ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, সমস্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সমস্ত জনগণের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে সহযোগিতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতার সমাপ্তি—বিশেষত তাপ-পারমাণবিক অস্ত্র এবং সর্বজনীন ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে অস্ত্র সীমিতকরণ।"

এই ধরনের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর সংবিধানে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, বলা হয়েছিল আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ার কথা। সরকার বা মালিকের দ্বারা আক্রান্ত শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের পাশে দাঁড়ানো, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, ফ্যাসিবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদের দ্বারা আক্রান্ত ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সহায়তা করা, শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা এসেছে এমন দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য শ্রমিকদের ভূমিকাকে সাহায্য করা, যেসব অনুন্নত দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ শোষণ থেকে পরিত্রাণের জন্য সংগ্রাম করছে তাদের এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যেসব দেশের শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য গ্রহণ করেছে তাদের সহযোগিতা করা প্রভৃতি ছিল সংগঠনের সর্বক্ষণের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা।

এই ঐতিহাসিক সংগঠন ও সেটির ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র রচনার প্রধান কৃতিত্ব ছিল তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নের। তাছাড়া প্রফিনটার্ন ছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নসের আদর্শগত ও সাংগঠনিক পূর্বসূরি। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক গঠন ও পুনর্গঠনে সেখানকার ট্রেড ইউনিয়নের অবদান ছিল যেমন অসামান্য, অন্যদিকে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনকে যথার্থ পথে গড়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব ছিল 'প্রফিনটার্নের'। পেরিস্ত্রৈকার নীতি ও কর্মসূচীর দ্বারা সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন ও ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা এইভাবে পরিত্যক্ত হলো। ইতিহাসের বিকৃতি সাধন করে এই সময়ে সমাজতন্ত্রের মর্মকে তথাকথিত 'সৃজনশীল' পরিবর্তনের নামে শ্রেণী-বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করা এক অঙ্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হয়েছিল হুবহু সেই লাইনই। সমাজতান্ত্রিক, উন্নত ধনতান্ত্রিক বা অনুন্নত দেশের অধিকাংশ সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়নের উপর এই নতুন রোগ গভীরভাবে চেপে বসে।

আলোচ্য প্রবণতা ও ঘটনাবলীকে শতাধিক বর্ষ পূর্বে কার্ল মার্কস কিভাবে বিশ্লেষণ ও বিচার করেছিলেন, প্রসঙ্গত, তার সামান্য কিছু উল্লেখ করা যাক। কার্ল মার্কস আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি তথা প্রথম আন্তর্জাতিকের উদ্বোধনী ভাষণে (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪) পুঁজিবাদী শোষণের চরিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, "প্রত্যেক জায়গাতেই শ্রমজীবী জনগণের অধিকাংশ নীচে নেমে যাচ্ছে, অন্তত সেই হারেই যে হারে তাদের উপরতলায় লোকদের সামাজিক জীবনে উন্নতি হচ্ছে। যন্ত্রের উন্নতি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নতুন উপনিবেশ সৃষ্টি, দেশান্তর গমন, নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা, অবাধ-বাণিজ্য—এইসব কোন কিছুই, এমনকি সব ক'টি একত্র করেও মেহনতী জনগণের দুর্দশা যে দূর হবে না, বরং বর্তমানের মিথ্যা ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে শ্রমের উৎপাদন শক্তির প্রতিটি নতুন বিকাশের প্রবণতাই যে সামাজিক বৈষম্য গভীরতর করার ও সামাজিক বৈরীভাব তীক্ষ্ণতর করার দিকেই—এই সত্য আজ ইউরোপের সকল দেশের প্রত্যেকটি সংস্কারমুক্ত লোকের কাছে প্রমাণিত হয়ে উঠছে। এই সত্যকে অস্বীকার করে শুধু তারাই যারা অপরকে মূর্খের স্বর্গে ঠেলে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়।..." স্বভাবতই, মার্কস বললেন, "অতএব রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এক মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।..." রাজনীতি ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়ের কোন প্রশ্নই আসে না এবং সেই শর্ত শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবেই থাকে। "সাফল্যের একটা উপাদান শ্রমিকশ্রেণীর আছে—সংখ্যা; কিন্তু সংঘের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হতে পারলে তবেই সংখ্যার পাল্লা ভারী হয়।..." এক্ষেত্রে, ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকার কথা সংঘের

নিয়মাবলীতে মার্কস বলেছিলেন ঃ "অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিগুলির যে জোট (অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন) অর্জিত হয়েছে, তাকে এই শ্রেণী তাদের শোষণকারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে হাতল হিসাবে অবশ্য ব্যবহার করবে। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠন না হলেও শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-রাজনীতি ও সংগ্রামের এক হাতল হিসাবে এটিকে ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি বর্জিত হবে না, ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি বর্জিত হবে না।"

কেন? "যেহেতু—

"শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিকশ্রেণীকেই জয় করে নিতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম, তার অর্থ শ্রেণীগত সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সমান অধিকার ও কর্তব্যের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী-আধিপত্যের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম;

"শ্রমের উপায়ের অর্থাৎ জীবনধারণের বিভিন্ন উৎসের একচেটিয়া মালিকের কাছে শ্রম করে যে মানুষ, সেই মানুষের অর্থনৈতিক অধীনতাই রয়েছে সকল রকম দাসত্বের, সব ধরনের সামাজিক দুর্গতি, মানসিক অধঃপতন ও রাজনৈতিক পরাধীনতার মূলে;

"সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তিই হচ্ছে সেই মহান লক্ষ্য, যা সাধনের উপায় হিসাবে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনকে তার অধীনস্থ হতে হবে; [স্মরণ রাখতে হবে, মার্কসের মৃত্যুর পর এই অংশকে সংশোধনবাদীরা বিকৃতভাবে বার বার ব্যাখ্যা করেছিল। "অর্থনৈতিক মুক্তি"কে "অর্থনৈতিক সংগ্রাম" হিসাবে বসিয়ে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের অধীনস্থ করতে চেয়েছিল তারা—লেখক]

"সেই মহান লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা হয়েছে তা' সবই ব্যর্থ হয়েছে প্রত্যেক দেশের শ্রমিকদের মধ্যকার বহুবিধ শাখার মধ্যে সংহতির অভাবে এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্যবন্ধন না থাকায়;

"শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সমস্যাটি কোন স্থানীয় সমস্যা নয়। এ সমস্যা হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা, বর্তমান সমাজব্যবস্থাধীন সমস্ত দেশকে নিয়ে। আর এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক সহযোগের উপর।"

প্রসঙ্গত, পেরিস্ত্রৈকায় বর্ণিত শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মর্ম বনাম শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপকে উপলব্ধি করতে মার্কসের মতামতকে আরো কিছুটা লক্ষ্য করা যেতে পারে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসঙ্গটি কিভাবে বিচার্য। "শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য যদি তাদের ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্য প্রয়োজন হয়, তাহলে অপরাধমূলক মতলব হাসিল করার জন্য অনুসৃত যে পররাষ্ট্র নীতি জাতিগত কুসংস্কার ব্যবহার করছে, দস্যু-যুদ্ধে জনগণের রক্ত ও সম্পদ অপচয় করছে, সেই নীতি বজায় থাকলে এই মহান ব্রতটি কিভাবে পূর্ণ করা যাবে? শ্রমিকশ্রেণী শিখেছে যে, তার কর্তব্য হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতির রহস্য আয়ত্ত করা, নিজ নিজ সরকারের কূটনৈতিক কার্যকলাপের উপর নজর রাখা, প্রয়োজন হ'লে সর্বশক্তি দিয়ে সেই কার্যকলাপের প্রতিরোধ করা, তাকে ব্যর্থ করতে অক্ষম হলে অন্তত সকলে একসঙ্গে তার প্রকাশ্য নিন্দা করা এবং জাতিসমূহের মধ্যেকার যোগাযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি ও ন্যায়ের যেসব সহজ নিয়ম দিয়ে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক শাসিত হওয়া উচিত, সেগুলিই প্রতিষ্ঠা করা।

"এইরকম পররাষ্ট্র নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম হলো শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য সাধারণ সংগ্রামের অংশ।"

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের ফলে যখন মানব-সমাজের সামনে অভূতপূর্ব অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে মার্কসবাদকে সেকেলে বলে অভিহিত করা, ট্রেড ইউনিয়নকে 'সমাজতন্ত্রের পাঠশালা'র স্বীকৃতি না দিয়ে নয়া-চিন্তায় মুগ্ধ করা প্রভৃতি যেসব প্রস্তাব পেরিস্ত্রৈকায় করা হচ্ছিল, সে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে মার্কস নিজে একদিন 'ট্রেড ইউনিয়নের অতীত' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

রাজনীতি বর্জিত, তথাকথিত স্বাধীন এবং সংঘর্ষের পথ পরিহার করে কেবলমাত্র মজুরি আর আইনসঙ্গত অধিকার অর্জনের জন্য সহযোগিতার নীতি প্রভৃতিকে মার্কস দেখেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও উনবিংশ শতকে সদ্য-উদ্ভূত ট্রেড ইউনিয়নের 'ফেনোমেনা' হিসাবে। তিনি ট্রেড ইউনিয়নের এই স্তরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে লিখেছিলেন, "পুঁজি হলো পুঞ্জিভূত সামাজিক শক্তি, যে ক্ষেত্রে শ্রমিক শুধু শ্রম-শক্তির অধিকারী। সুতরাং পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে ন্যায্য ভিত্তিতে চুক্তি কখনোই হতে পারে না, এমনকি যে সমাজে জীবনধারণ ও শ্রমের বাস্তব উপায় জীবন্ত উৎপাদন শক্তির বিরোধী, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ন্যায্য হলেও। শ্রমিকদের সামাজিক শক্তি নিহিত কেবল তাদের সংখ্যায়। কিন্তু সংখ্যায় শ্রেষ্ঠতার শক্তি ধ্বংস পায় তাদের ঐক্যহীনতায়। শ্রমিকদের ঐক্যহীনতা গড়ে ওঠে ও টিঁকে থাকে তাদের নিজেদের মধ্যেই অনিবার্য প্রতিযোগিতার ফলে।

"অন্তত সাধারণ দাসের অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দেবে, চুক্তিতে এইরূপ শর্ত আদায়ের জন্য এই প্রতিযোগিতা দূর করা অথবা নিদেনপক্ষে হ্রাস করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস থেকে প্রথম উদ্ভব হয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির। তাই ট্রেড ইউনিয়নগুলির অব্যবহিত কর্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল দৈনন্দিন প্রয়োজনে, পুঁজির অবিরাম আক্রমণ থামাবার প্রয়াসে, এক কথায়—মজুরি ও শ্রম-সময়ের প্রশ্নে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির এরূপ ক্রিয়াকলাপ শুধু আইনসম্মত নয়, আবশ্যিকও। যতদিন উৎপাদনে বর্তমান পদ্ধতি টিঁকে থাকছে, ততদিন তা' এড়িয়ে যাওয়া চলে না। শুধু তাই নয়, সমস্ত দেশে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ও ঐক্যবদ্ধ করে এই ক্রিয়াকলাপের সার্বিক প্রসার হওয়া উচিত।" এই স্তর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করার পর মার্কস দেখালেন পরবর্তী স্তরটি। "অন্যদিকে নিজেদের অজ্ঞাতেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকশ্রেণীর সাংগঠনিক কেন্দ্র, ঠিক যেমন মধ্যযুগের মিউনিসিপ্যালিটি ও কমিউনগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়াদের কাছে সাংগঠনিক কেন্দ্র। ট্রেড ইউনিয়ন যদি প্রয়োজনীয় হয় পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের জন্য, তাহলে খোদ মজুরি প্রথাটাকেই ও পুঁজির ক্ষমতা ধ্বংসের জন্য সংগঠিত শক্তি হিসাবে তা' আরও বেশি দরকার।"

যতদিন পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়নের আদর্শগত হাতিয়ার ছিল না ও শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী হিসাবে ঐতিহাসিক কর্তব্য অজানিত ছিল এবং তার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে রাজনৈতিক লক্ষ্য সুস্পষ্ট ছিল না, সেই পর্যায় সম্পর্কে মার্কস তাঁর 'মজুরি, দাম, মুনাফা' পুস্তিকাতে বলেছিলেন, "পুঁজির হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঘাঁটি হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভাল কাজ করে। তাদের আংশিক ব্যর্থতা এজন্য যে, স্বীয় ক্ষমতা তারা বিবেচকের মতো ব্যবহার করে না। তাদের সাধারণ ব্যর্থতা এজন্য যে, প্রচলিত ব্যবস্থাকে একই সঙ্গে পাল্টানোর চেষ্টার বদলে, শ্রমিকশ্রেণীর চরম মুক্তির জন্য অর্থাৎ মজুরি প্রথার চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য আপন সংগঠিত শক্তিটাকে চালকের দণ্ড হিসাবে প্রয়োগ করার বদলে এই ব্যবস্থার ফলাফলের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানোর মধ্যেই তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে।" ট্রেড ইউনিয়নকে পেরিস্ত্রৈকার দর্শনে "নতুন মাত্রা দেবার" প্রচেষ্টার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের স্থান থেকে অপসারণের ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে ছিল। মার্কস তাঁর জীবদ্দশাতেই এক্ষেত্রে যাতে কোন বিভ্রান্তি না ঘটে সেজন্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "মজুরি প্রথার ভিতরে সাধারণভাবে যে দাসত্ব নিহিত রয়েছে তার কথা বাদ দিলেও শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফলাফল নিজেদের মধ্যে অতিরঞ্জিত করে দেখা উচিত নয়। তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা লড়ছে ফলাফলের সঙ্গে, ঐ ফলাফলের হেতুর সঙ্গে নয়; তারা নিম্নগতি মন্দীভূত করছে, সে গতির দিক পরিবর্তন করছে না, তারা উপশমের ওষুধ লাগাচ্ছে, রোগ সারাচ্ছে না। সুতরাং পুঁজির অনিবার্য আক্রমণ ও বাজারের হেরফের থেকে অনবরত এইসব অনিবার্য গেরিলা যুদ্ধের যে উদ্ভব হচ্ছে তার মধ্যেই নিজেদের একান্তভাবে ডুবিয়ে রাখা তাদের উচিত নয়। তাদের বোঝা উচিত যে, বর্তমান ব্যবস্থা যত দুর্গতিই তাদের উপর চাপাক না কেন, সেইসঙ্গে এই ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক অবস্থা ও সামাজিক রূপ সৃষ্টি করেছে। 'দিনের ন্যায্য খাটুনির জন্য ন্যায্য দিনমজুরি।'—এই রক্ষণশীল নীতির বদলে তাদের উচিত পতাকায়

এই বিপ্লবী মন্ত্র মুদ্রিত করা—'মজুরি প্রথার অবসান চাই।"

শেষ পংক্তিতে, পুঁজির সংগ্রামের অন্তিম নিহিত লক্ষ্য সাধনের জন্য মার্কস ভবিষ্যতের ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে তাই বলেছিলেন, "নিজেদের প্রাথমিক লক্ষ্য যাই থাকুক, এখন এগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর পূর্ণ মুক্তির মহাকর্তব্য নিয়ে তাদের সাংগঠনিক কেন্দ্র হিসাবে সচেতনভাবে কাজ করতে শিখতে হবে। সর্ববিধ যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এই অভিমুখে চলেছে তাকে সমর্থন করতে হবে তাদের।... ট্রেড ইউনিয়নগুলির উচিত সারা বিশ্বকে এইটা দেখানো যে তারা লড়ছে সংকীর্ণ আত্মপরায়ণ স্বার্থের জন্য নয়, কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য।"

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যথার্থ বিকাশের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক যে অঙ্গাঙ্গী এবং ইচ্ছা করলেই এই সম্পর্ক তুলে নেওয়া যায় না তা' প্রুধোঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন'-এর জবাবে মার্কস তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' পুস্তকে লিখেছিলেন, "...পুঁজির সংঘবদ্ধ ক্রমাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে, মজুরি রক্ষার চাইতে সংগঠনকে রক্ষা করা অনেক বেশি দরকারী। ...এই সংগ্রামে—যা' প্রকৃতই এক গৃহযুদ্ধ—ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় সংঘবদ্ধতা ও উপাদানগুলি গড়ে ওঠে। এইরকম একটা পর্যায়ে পৌঁছুবার পর সমিতি একটা রাজনৈতিক চরিত্র পরিগ্রহ করে"। অর্থনীতিবাদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আটকে রাখার প্রস্তাব করে সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন ও ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর সম্মেলন আদর্শ হিসাবে কার্যত প্রস্তাব করেছিল 'শ্রেণী-সমতা'র ধারণা। মার্কস শ্রমজীবীদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিকদের 'শ্রেণী-সাম্য' নয়, 'শ্রেণী-বিলোপ'-এর জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে বৈজ্ঞানিক পথে অগ্রসর হওয়ারই নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই পথে অগ্রসর হতে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-রাজনীতি, যার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, তাকেই অবলম্বন করার কথা বলেছেন, সেকারণেই ট্রেড ইউনিয়নকে বলেছিলেন, 'সাম্যবাদের পাঠশালা'।

ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর ক্ষেত্রে বিচ্যুতি বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকে শুরু হয়েছিল। ডব্লু. এফ. টি. ইউ. অতীতে প্রতি বছর 'মে দিবসে' ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীকে তা' ব্যাপকভাবে পালন করার আবেদন জানাতো। তাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, পুঁজিবাদ-বিরোধী, বর্ণবিদ্বেষবাদ-বিরোধী, সমরবাদ-বিরোধী বক্তব্য ছাড়াও জানানো হতো শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান। কিন্তু ১৯৮৭ সালের পর থেকে এই কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যায়। সংগঠনটি সারা পৃথিবীব্যাপী 'বিশ্ব শান্তি দিবস' পালনের ডাক দিতো ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে, যাতে সাড়া দিতো বিশ্বের শ্রমজীবীরা ব্যাপকভাবে। ৮০-এর দশকের বিশ্ব-শান্তি আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টিতে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু ১৯৮৮ সাল থেকে এ'ধরনের সমস্ত তৎপরতা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

একবার তত্ত্বগত স্তরে সংকট সৃষ্টি হলে তা' থেকে সংগঠনের অস্তিত্ব ছাড় পায় না। তাই দেখা গেল যে পূর্বোক্ত নবগঠিত পূর্বোক্ত সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন জন্মের পরই কার্যত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। ক্ষেত্র-ভিত্তিক নতুন নতুন বিচ্ছিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সৃষ্টি হতে থাকে যেমন, অন্যদিকে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ দেশগুলিতেও আবির্ভাব ঘটতে থাকে নতুন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের। শেষোক্তগুলি নবগঠিত সোভিয়েত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া শুরু করে। অন্যদিকে গভীর সঙ্কট দেখা দিতে থাকে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর অস্তিত্বের সামনেও। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একে একে অবসান শুরু হওয়ায় সেখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলি গিয়ে পড়তে থাকে আন্দোলন-বিরোধী শক্তিগুলির হাতে। এই দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর সদস্যপদ ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করতে থাকে আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর সদস্যপদ। স্বভাবতই দ্রুত দুর্বল হতে থাকে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর গণভিত্তি ও শক্তি। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ থেকে এটির সদর দপ্তর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐ সরকারের হুকুম জারি হয়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এই পরিস্থিতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরেও অন্যান্য বিষয়ের সাথে আর্থিক সঙ্কট তীব্রতর হওয়ায় এবং পুরোনো ট্রেড

ইউনিয়নের পরিবর্তে সেখানে ঐচ্ছিক ও সমবায়মূলক ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হওয়ায় অচিরে বিঘ্নিত হয়ে পড়ে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর আর্থিক যোগানের প্রধান সূত্রও। তার ফলে এবং সমগ্র পরিস্থিতির জন্য ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর ১২টি ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনালও দ্রুত আক্রান্ত হয়। এই সংগঠনগুলির সদর দপ্তর ছিল পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে। অর্থের অভাবে কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলি কার্যত অকার্যকর বা বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করে। পদত্যাগ করা শুরু করেন কোন কোন টি. ইউ. আই.-এর প্রধান সংগঠক ও পদাধিকারীরা। সংশ্লিষ্ট দেশের কোন কোন সরকার সেই দেশে অবস্থিত টি. ইউ. আই. সদর দপ্তরের কাজে নানা নিষেধাজ্ঞা জারি করে, কোন কোন সরকার চাপ দিতে শুরু করে দপ্তর তুলে দেওয়ার জন্য। ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর এই সঙ্কটের মুহূর্তে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের পক্ষ থেকেও আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে। এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তৃতীয় দুনিয়ায় ডব্লু. এফ. টি ইউ.-অনুমোদিত যেসব সংগঠন ছিল, কোন কোন দেশের সরকার অতীতে সেগুলির সাথে সহযোগিতা করলেও, এই পরিস্থিতির সুযোগে প্রত্যাহার করতে থাকে সেই সহযোগিতা। ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর অনুমোদিত তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলি কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ হারাতে থাকে; কোন কোনটি নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়; আবার কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন অনুমোদন নেয় আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মঞ্চে, বিশেষত আই. এল. ও.-তে, ডব্লু. এফ. টি. ইউ. দুর্বল ও একঘরে হয়ে পড়ে। অতীতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির যে সমর্থন ডব্লু. এফ. টি. ইউ. পেতো, তা' সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রমিকশ্রেণীর সুদীর্ঘকালের পরিচিত রূপের সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এইভাবে, এক ছেদের মুহূর্ত সংঘটিত হলো। এই ঘটনাবলীর পাঁচ বছর আগে থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা-বহির্ভূত দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছিল, সমাজতান্ত্রিক অধিকাংশ দেশে ১৯৯০ সালে তা' প্রায় একই পরিণতি পেল। এটাও প্রতীয়মান হলো যে এই পরিণতি এক বিশ্বব্যাপী 'ফেনোমেনা'। সামাজিক বিকাশের অভ্যন্তরে এই পরিণতির সর্বজনীন কারণ ও উপাদানগুলি পূর্ব থেকেই গঠিত হয়ে এসেছিল। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও শক্তির ভূমিকা সেগুলিকে বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করছিল মাত্র। এই প্রতিপাদ্যের অর্থ সমাজ বিকাশের নিয়মকে অস্বীকার করা নয়। বরং বলা যায় সমাজ বিকাশের অমোঘ বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে উপরিসৌধের প্রয়োজনীয় নবায়ন যথাসময়ে না করার ফলে এই বিপর্যয় ঘটলো। পরিস্থিতির অভ্যন্তরে তিলে তিলে দীর্ঘকাল ধরে জমে ওঠা নানা উপাদান ও প্রতিকূলতা ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক-আন্দোলনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দাবী করেছিল। এটা কেবল মাত্র শ্রমিক-আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে সত্য ছিল না, সমাজের সমস্ত দিক সম্পর্কেই সত্য হয়ে উঠেছিল।

পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে শ্রমিক-আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নের বিপর্যয় জনগণ, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর, পূর্ণ বিপর্যয় ছিল না, ছিল পরবর্তী বৃহত্তর বিপর্যয়ের পূর্ব-অধ্যায়। পূর্ণ বিপর্যয় এসেছিল অনতিকালের মধ্যে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়

পূর্বে আলোচিত বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভিনব তৎপরতা ও বিকাশের সমান্তরালে আর একটি প্রক্রিয়া ও ধারার সৃষ্টি হয়েছিল পঞ্চাশের দশক থেকে। তা' হলো বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার 'নবায়ন'-এর চেষ্টা। এই প্রয়াসে, তাত্ত্বিক বিতর্কের ও সংঘাতের একটি পর্ব পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও প্রসঙ্গ নানা দিক থেকে উপস্থিত করা হচ্ছিল। দেশগুলির বাস্তবতা সম্পর্কে বহির্বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কোন স্পষ্ট ধারণার অভাবে নবায়নের ঐসব প্রচেষ্টাকে তারাও প্রথাগত ধারণা দিয়ে বিচার করেছিল এবং ঠিক বা বেঠিক বলে ছাপও দিচ্ছিল। কিন্তু সত্তরের দশকের শেষ পাদ থেকে আশির দশকের শুরুতে এইসব নবায়নের প্রয়াসের মধ্যে বাহ্যত কিছু মিল দেখা যেতে থাকে। তথাপি এগুলির তাৎপর্য ও এগুলির মর্ম বাইরে থেকে উপলব্ধি

করা যায়নি। সমাজতান্ত্রিক দেশে দেশে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দেখানো হলেও সেগুলির পেছনে প্রকৃত যেসব কারণ কাজ করেছিল, সেগুলি যেমন চেনা যায়নি এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচী দেশগুলির থাকলেও সেগুলির পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের অবিশ্রান্ত ভাবাদর্শগত যোগসূত্র যে ছিল তা' নির্ণয় করা যায়নি। অন্যদিকে নির্ণয় করা যায়নি পুঁজিবাদের পূর্বে বর্ণিত তৎপরতাগুলির সাথে এগুলির সম্পর্ক বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর তৎকালীন তৎপরতার ফলাফলের কোন দিক। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহসা ধসে পড়া এবং চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও নতুন ধরনের ব্যবস্থাবলী গ্রহণ এবং সেগুলির ফলাফলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দিকগুলি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু করে।

পটভূমিকা

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঘটনাবলীর বিকাশের দিকটি অতি সংক্ষেপে প্রথমে তথ্যগতভাবে লক্ষ্য করা যাক। ১৯১৭ সালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পর থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের জন্য প্রথমাবধি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল সেখানে। সেকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করলে এখন এটা বোঝা যায় যে সম্পূর্ণ অচেনা এক সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রবল সমস্যা তো ছিলই, তাছাড়াও ঐতিহাসিক কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক নেপথ্যে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল। তবে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নানা ধরনের, বিশেষত অর্থনৈতিক স্তরে, যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে সেগুলির মোকাবিলা করে অগ্রগতিও ঘটছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের। মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী সমরশক্তিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন বিধ্বংসী আঘাত হেনে পরাজিত করেছিল, অন্যদিকে নিজের দেশে বরণ করতে হয়েছিল অভূতপূর্ব ধ্বংসকেও। সুতরাং এই পর্বে, স্বদেশের পুনর্গঠন ছিল তাদের সামনে প্রধান কাজ। এই সময়েই পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বালগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিপ্লব সাফল্য লাভ করে। এই দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে বিপুল ও সর্বাত্মক সাহায্য প্রথম থেকেই দিতে হচ্ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে। ১৯৪৯ সালে চীনের মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়; তারপর ভিয়েতনামে। তার পাশাপাশি এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার পরাধীন দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য ব্যাপক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ শুরু এবং একের পর এক দেশ স্বাধীনতা লাভ করায়, এদেরও ব্যাপক ও সর্বাত্মক সাহায্য দেওয়া শুরু করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন—বিপ্লব ও স্বাধীনতার সাফল্যকে রক্ষা করার জন্য। সাম্রাজ্যবাদী জোটের পক্ষ থেকে সামরিকভাবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে, সর্বক্ষণের হুমকি ও চাপের মুখে সর্বাধুনিক ও শক্তিশালী পাল্টা সামরিক প্রস্তুতিও গড়ে তুলতে হচ্ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও জনগণের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান ও শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পৃথিবীর প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুদীর্ঘকালের এক গভীর সমস্যা—জাতি সমস্যার সমাধান করেছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, যা কয়েক শ' বছরে পুঁজিবাদ পারেনি। কিন্তু বস্তুগত ও ভাবগত স্তরে এই ধরনের অগ্রগতির অন্তরালে কি ধরনের সমস্যা প্রকৃতই জমে উঠছিল, তা' ঐ দেশগুলি নিজেরা চিহ্নিত করার তেমন চেষ্টা করেনি বা করতে পারেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু ইঙ্গিত থেকে, সমস্যা যে হচ্ছে তা' অনুমান করা যাচ্ছিল। পূর্ব ইউরোপের পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সময়ে ও বারে বারে নানা ধরনের বিক্ষোভ বা অভ্যুত্থান ঘটেছে। এগুলি সাম্রাজ্যবাদী ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির চক্রান্তের প্রতিফলন হলেও, দেশের অভ্যন্তরের নানা সমস্যা, কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারগুলির নানাবিধ ত্রুটি-দুর্বলতা প্রভৃতিও যে ছিল, তা' এখন অনেকটা নিশ্চয় করে বলা যায়। দেখা গেছে অন্যতম কারণ এইসব ঘটনার আগে বা পরে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বা অর্থনীতিতে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধও সামনে আসছিল। বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসগুলিতে প্রায়

প্রত্যেকবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভূমি ও কৃষি সমস্যা বারে বারে আলোচিত হয়েছে, সমাধান-সূত্র গৃহীত হয়েছে। কিন্তু উদ্ভূত সমস্যাগুলির কতটা সমাধান ঘটেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ জানা যায়নি। ১৯৫৬ সাল থেকে শুরু করে নিকিতা খ্রুশ্চভের কালে সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে প্রচলিত ব্যবস্থাবলীর কিছুটা পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল। লিওনিদ ব্রেজনেভের কালে আবার অনেকটা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এইসব পরিবর্তন কোন ইতিবাচক ফল দিয়েছিল কিনা এবং দিয়ে থাকলে তার চরিত্র কি ছিল তা' তখন সঠিকভাবে জানা যায়নি। কেননা প্রতি সংস্কারের পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন সাফল্যের কথা প্রচার করেছিল। আবার পরবর্তী সংস্কারের কাজ যখন হাতে নেওয়া হয়েছে তখন পূর্বের সংস্কারকে ভুল বা ব্যর্থ বলা হয়েছে। এইভাবে এক ধরনের বিভ্রান্তিও তারা বিশ্ব-সমাজে ছড়িয়েছিল।

১৯৬৫ সালে কিউবার রাজধানী হাভানাতে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা ১৫ দিন ধরে চলেছিল। বহু নতুন উপাদান আলোচনাতে আসে। সেখানে আলোচিত হয় পৃথিবীতে যে পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র গড়ার প্রয়াস চলছে তা' কতখানি বাস্তবিকপক্ষে উপযোগী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রচলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ইনসেনটিভ বা উদ্যোগ-পুরস্কার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কতখানি জরুরী বা কার্যকরী, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার রূপ কি হবে, রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিফলন কিভাবে ঘটবে ইত্যাদি ব্যাপক বিষয়। আলোচনার সমাপ্তি ঘটাতে গিয়ে কিউবার তদানীন্তন শিল্পমন্ত্রী চে গুয়েভারা বলেছিলেন, "সমাজতন্ত্রের সমস্যা সমাজতান্ত্রিক পথেই সমাধান করতে হবে।" এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নিজ দেশে কিছু সত্যিই চেষ্টা করেছিল কিনা, তা' অজানিত রয়ে গেছে।

বিপর্যয়ের আশঙ্কার মেঘ

১৯৭১-৭৪-এর পর আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ যখন সংকটের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও এক ধরনের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকাশ্যে এটা ঘোষণা না করা হলেও, তাদের বিচিত্র উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এর লক্ষণ ধরা পড়ে। চীনের যে কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক পরিবর্তনগুলিকে ১৯৬০ সাল থেকেই আক্রমণ শুরু করেছিল, তারাই ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় প্লেনাম থেকে, "চীনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অগ্রসর অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উপযুক্ত করার স্বার্থে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরে সংস্কার" ঘটানোর প্রয়োজনীয়তাকে ঘোষণা করে। এই বক্তব্যকে যতটা নির্ভেজাল মনে হয় তা' ততটা ছিল না। কেননা পরবর্তী কালের ঘটনাবলী থেকে বোঝা গেছে যে চীনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও কঠিন সংকটের মুখে পড়েছিল। এই সংকট নিছক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফল ছিল না। পটভূমিকা হিসাবে যে কথা একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছিল তা' হলো যে পূর্বতন নেতৃত্বের ভ্রান্ত নীতির ফলে সেখানকার সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থায় একটি অচলায়তন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের জীবনযাত্রার মানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আধুনিক ও সম্মুখবর্তী করতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টি করতে হবে 'কমোডিটি ইকনমি' বা পণ্য অর্থনীতি। উৎপাদনের শক্তির আরও বিকাশই হবে সংস্কারের লক্ষ্য। এই বন্ধ্যাত্ব এসেছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সাফল্য ব্যবহার না করতে পারার ফলেও। তাই চীন 'ওপেন ডোর পলিসি' বা বিশ্বের কাছে তার দ্বার উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এক সম্পূর্ণ নতুন ও ব্যতিক্রমী বক্তব্য এইভাবে প্রস্তাবিত হয়েছিল। এইভাবে এক নতুন ধরনের পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটে চীনে। ক্রমে এই মূল সিদ্ধান্ত আরও বিশ্লেষিত ও বিকশিত হতে থাকে।

চীনের পূর্বোক্ত ব্যবস্থাবলী যখন ধীরে ধীরে লাগু হতে শুরু করেছে, তার অল্পকাল পর কিছুটা অনুরূপ ধরনের ভাবনার অভ্যুদয় ঘটতে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নেও। ১৯৮২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর অন্যতম সদস্য মিখাইল গরবাচভ এক প্রবন্ধ লেখেন "পেরিস্ত্রৈকা : উৎস, প্রতিবাদ ও বিপ্লবের চরিত্র"। তাতে তিনি বলেছিলেন যে সমাজতন্ত্রের নবায়ন

ও পুনর্নবীকরণ এক জরুরী এবং ধারাবাহিক কাজ। এই কাজে অতীতের মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন যেমন জরুরী, সঙ্গে সঙ্গে বিকাশের স্বার্থে কাঠামোগত সংস্কারও চালিয়ে যেতে হবে। প্রবন্ধটির একটি অংশে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে পেরিস্ত্রৈকাকে তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করেন। অন্যদিকে পেরিস্ত্রৈকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপযাচক হয়ে কিছু কথাও বলেন। সেই অংশে বক্তব্য ছিল, "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পেরিস্ত্রৈকা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন। কারো কারো মতে পেরিস্ত্রৈকা অবলম্বন করার অর্থ হলো সমাজতন্ত্রকে উপেক্ষা করা, নিদেনপক্ষে সমাজতান্ত্রিক কতকগুলি মৌলিক নীতি পরিত্যাগ করা। কিন্তু সমাজতন্ত্র থেকে দূরে সরে যেতে চাই না আমরা, উন্নত সমাজতন্ত্র আমরা চাই।"

১৯২৪ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক দলিলে পেরিস্ত্রৈকার যে নীতি গৃহীত হয়েছিল তাতে অকার্যকর চরিত্রের সমস্ত নীতির অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলির বিকাশ ঘটিয়ে আরও জনব্রতী করার জন্য নতুন নীতি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু গরবাচভের বক্তব্যের মধ্যে ছিল যথেষ্ট প্রহেলিকা; তার প্রমাণ মিলেছিল আর কিছুকাল পরে।

গরবাচভ সাধারণ সম্পাদক হবার পর কমিউনিস্ট পার্টি এপ্রিল, ১৯৮৫-তে পেরিস্ত্রৈকার নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। ১৯৭৮ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত নীতির মত এখানেও বলা হল যে সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের সুফলগুলিকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে ব্যবহারের জন্য পেরিস্ত্রৈকা বা কাঠামোগত সংস্কার হবে। অতীত রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার সমালোচনা করে গণতন্ত্রের আরও প্রসার ও মানুষ যাতে খোলাখুলি মতামত দিতে পারেন তার জন্য চালু করা হয় "গ্লাসনস্ত"। এরপর ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ সালে পার্টির ২৭তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে পার্টির নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচী ও রাজনৈতিক প্রস্তাব ছিল অতি সূক্ষ্মভাবে পরস্পরবিরোধী। কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল যে তৃতীয় কর্মসূচীর (১৯৬১ সালে গৃহীত) প্রধান তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যের নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান কর্মসূচী হবে সোভিয়েত সমাজকে কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী। অথচ এই মূল প্রস্তাবনাকে বিরোধিতা করে রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তিসমূহের মধ্যে সঙ্গতি নেই। এই অসঙ্গতি দূরীকরণের পথ হলো পুরানো পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন পদ্ধতি চালু করা।

এই বক্তব্য ছিল যথার্থ অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার এক ধরনের প্রকাশ। ১৯৮৬ সালে জানুয়ারীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে সর্বপ্রথম জাতিগত দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এরপর গোর্নি কারাবাখ-এর উপর কর্তৃত্ব নিয়ে উজবেকিস্থান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ট্রান্স-ককেশিয়ান তৃতীয় রিপাব্লিক জর্জিয়ায় ও বাল্টিক অঞ্চলের তৃতীয় রিপাব্লিকে জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ ও রক্তাক্ত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রভাব সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর পড়ে। সেগুলির মধ্যে নানা ধরনের দোলাচলতার প্রকাশ ঘটতে শুরু করে। সামাজিক ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন দারুণভাবে কমে গিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। ফলে সাধারণ মানুষের দৈনিক চাহিদার যোগান দ্রুত কমে যাচ্ছিল। কমে গিয়েছিল শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতাও। বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল বিক্ষোভ ধূমায়িত হওয়ার প্রবণতা। সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টির সংহতিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল ব্যাপক ঘাটতি।

১৯৮৭ সালে, 'নভেম্বর বিপ্লব'-এর ৭০তম বার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোতে আগত পৃথিবীর বহু দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিদের সামনে মিখাইল গরবাচভ যে ভাষণ দেন, তা' ছিল বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভবিষ্যতে নিশ্চল করে দেবার ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র। তাতে সূত্রায়িত মূল বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ :

(ক) বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন সুদীর্ঘকাল ধরে যে চারটি মৌলিক দ্বন্দ্বের কথা বলে আসছে

(সমাজতন্ত্র বনাম সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজি বনাম শ্রম, সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের মধ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদ বনাম তৃতীয় দুনিয়ার জনগণের দ্বন্দ্ব), সেগুলির পরিবর্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী পরিণত হয়েছে দেশসমূহের পরস্পর নির্ভরশীল ও এক অখণ্ড চরিত্রে;

(খ) এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রধান কারণ পৃথিবী ধ্বংসের অভিন্ন আশঙ্কা;

(গ) এই অখণ্ড পৃথিবী পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বগুলির গভীর সংশোধন ঘটিয়েছে;

(ঘ) এই সংশোধন তথা দ্বন্দ্বসমূহের তীব্রতা হ্রাসের অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায় গত ৪০ বছরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়ায়;

(ঙ) যেহেতু উভয় দিক থেকে (সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র) ধ্বংসের ভয় রয়েছে, তাই যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি নিশ্চিত করে সমস্ত দেশকে অগ্রগতির পথে সহজেই নিয়ে যাওয়া যেতে পারে;

(চ) উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের প্রধান মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে সমরবাদ থেকে নিজেদের মুক্ত করার কাজে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্যান্য দ্বন্দ্ব, সংকট, বেকারী প্রভৃতিকে গরবাচভ হয় অনুল্লেখিত রাখেন অথবা শান্তির সংগ্রাম থেকে পৃথক করে দেখান। পুঁজিবাদী দেশসমূহে তীব্র হয়ে ওঠা সামাজিক-দ্বন্দ্ব প্রযুক্তির অগ্রগতি ইত্যাদির কারণে দুর্বল হয়ে গিয়েছে বলে গণ্য করা হয় তাঁর ভাষণে;

(ছ) পশ্চিম জার্মানি ও জাপানের অগ্রগতির তথাকথিত 'যাদুর' উদাহরণ খাড়া করে রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে সমরবাদ ছাড়াও ধনতন্ত্র টিঁকে থাকতে ও বাড়তে পারে;

(জ) তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে বলা হলো যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এত কালের আবেগ আর নেই, নতুন কোন আবেগ সৃষ্টি হয়নি এখনও। বিশ্বাঙ্গনে তৃতীয় দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূমিকাকে নাকচ করা হলো এইভাবে। প্রস্তাবিত হলো যে সাম্রাজ্যবাদী ফাঁসের বিরুদ্ধে তৃতীয় দুনিয়ার কোন ভূমিকা পালন করা উচিত নয়। দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিরুদ্ধে তৃতীয় দুনিয়ার জনগণের শক্তিশালী আন্দোলনগুলির প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা হলো ঐ বক্তব্যে। বরং নানা যুক্তিতে আস্থা জ্ঞাপন করা হলো ঐসব দেশের সরকারগুলির উপর

(ঝ) সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে যান্ত্রিকভাবে পারমাণবিক যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে সমার্থক হিসাবে চিহ্নিত করা হলো এবং বলা হলো যে যদি পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানো যায় তবে সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বও আর থাকবে না; প্রভৃতি।

এগুলি নিছক রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত কিছু বক্তব্য ছিল না। এগুলিতে বিশ্ব-কমিউনিজমের মৌলিক নীতিগুলি এবং প্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। 'অখণ্ড বিশ্বের' তত্ত্ব ছিল পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্যকে মুছে দেবার ঘোষণা। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ যে অখণ্ড বিশ্বের কথা বলেছিলেন, মর্মের দিক থেকে মিখাইল গরবাচভের বক্তব্য সেটাকেই স্পর্শ করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নে এসে যায় মুক্ত-বাজার অর্থনীতির ব্যবস্থা চালু করার প্রসঙ্গ। অবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাজার খুলে দেওয়া হয় বিশ্ব-পুঁজিবাদের কাছে। বিদায় দেবার ব্যবস্থা হয় পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে। ব্যক্তিগত মালিকানা শ্রেয় হিসাবে ঘোষিত হয়। এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে জুন ১৯৮৮তে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির ১৯-তম কনফারেন্স বা সম্মেলন থেকে। এই সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার কার্যকর করার জন্য জরুরী কর্তব্য শিরোনামে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে দেশব্যাপী সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন সহ স্বীকৃত হয় বহুমত-বিশিষ্ট ও কার্যত সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার। সোভিয়েত ব্যবস্থা বাতিল ও নির্বাচিত স্বশাসিত সরকার গঠনের সিদ্ধান্তও হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্বীকৃত ব্যবস্থাগুলি বাতিল করে তার পরিবর্তে ঘোষণা করা হলো যে পেরিস্ত্রৈকার মূল লক্ষ্য হবে মানবিক ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। অতীতের কেবল মাত্র কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে এই মানবিক ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ সমাজের অন্যান্য শক্তির হাতেও থাকতে হবে। সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৯৮৯ সালের

সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম সোভিয়েত সংবিধানের ৬ নং ধারা বাতিল করে কমিউনিস্ট পার্টির একচ্ছত্র অধিকারের অবসান ঘটায়। এইভাবে অ-সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলো। শ্রেণী, শ্রেণী-সংগ্রাম, সর্বহারার একনায়কত্ব, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতির সমস্ত ধারণা পরিত্যক্ত হলো 'নতুন চিন্তা'র নামে। শ্রেণী মূল্যবোধের চেয়ে 'সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ' ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির ধারণাকে স্থাপন করা হলো কমিউনিস্ট পার্টির ধারণার পরিবর্তে। এই ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন এক অবস্থার জন্য পটভূমিকার পত্তন করা হলো।

পোল্যাণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠছিল। আগের ইতিহাস বাদ দিলেও ১৯৮০ সাল থেকে সমাজতান্ত্রিক সরকার-বিরোধী শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয় সেখানে। দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক রূপ নিচ্ছিল মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি। ১৯৮১ সালে পোল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির অভ্যন্তরে যেমন মতাদর্শগত বিরোধ সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও চার্চের পৃষ্ঠপোষণায় "স্বাধীন মতামত প্রকাশ", "স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গড়া"-র অধিকার প্রভৃতি দাবী উত্থাপনসহ নানা সামাজিক অংশের আন্দোলন বিক্ষিপ্তভাবে ঘটতে থাকে। অনেক আগে থেকে দ্বিধা ও জড়তায় আসক্ত ছিল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৭৬ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলনে পোলিশ পার্টির পক্ষ থেকে সর্বহারার রাষ্ট্রের পরিবর্তে জনগণের রাষ্ট্র, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়, প্রভৃতি প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল। ১৯৮২ সালে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করে জারুজালেস্কির সরকার। তা' সত্ত্বেও মূল্য বৃদ্ধির হার ১০৯% পৌঁছয়। ১৯৮৭ সালে সিদ্ধান্ত হয় : (১) অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকারী কর্মসূচী গ্রহণ ও (২) রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ করার। ১৯৮৮ সালে পার্টিতে তুমুল বিতর্ক শুরু হয় দেশে পুরোপুরি বাজার অর্থনীতির প্রবর্তন ও ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলে পোল্যাণ্ড।

চেকোশ্লোভাকিয়াতে 'সমাজতন্ত্র নয়, ধনতন্ত্র চাই', শ্লোগান দিয়ে জানুয়ারী ১৯৭৭ সালে আবির্ভূত হয়েছিল 'চার্টার-৭৭' নামে কট্টর কমিউনিস্টবিরোধী গোষ্ঠী। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, ধীরে ধীরে তারা আন্দোলন শুরু করে। দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার জনগণের প্রকৃত সমস্যা বা বিরোধীদের তৎপরতার প্রতি তেমন গুরুত্ব প্রথমে দেয়নি। যদিও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া প্রথমাবধি শিল্পোন্নত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের তথাকথিত উদারনীতির হাওয়া দ্রুতই চেকোশ্লোভাকিয়াতে পৌঁছেছিল। ১৯৮৫ সালে চেক সরকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে দেশের ভিতরে যৌথ-প্রকল্প গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাছাড়া সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ ও শিল্প স্থাপনের অনুমতিও দেওয়া হতে থাকে পশ্চিমী দেশগুলিকে। ১৯৮৬ সালের মার্চে কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেস থেকে দেশে বহুদলীয় নির্বাচন ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ফ্রন্ট গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা ভবিষ্যত বিপর্যয়ের দ্বারকে উন্মুক্ত করে দেয়। পরবর্তী নির্বাচনে তিন দলের দ্বারা গঠিত ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট জয়ী হওয়ার পরই, 'চার্টার-৭৭' রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবীকে তীব্র করে তোলে জনগণের মধ্যে। শুরু হয় আন্দোলনও। কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরেও একাংশে এই দাবীতে সোচ্চার হয়। ক্রমশ ঘনীভূত হতে শুরু করে রাজনৈতিক সংকট। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী সভাতে গুস্তাভ হুসাক সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। নতুন হাওয়াপন্থী সিলোস জেক্স সাধারণ সম্পাদক হন।

চীনে সংস্কারের যে উদ্যোগের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তা' চালু হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মতো চীনও দারুণ সংকটের মুখোমুখি হচ্ছিল। আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়নের তৎপরতায় দক্ষিণের সমুদ্র-উপকূলবর্তী বন্দর ও ভৌগোলিক এলাকাগুলিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য মুক্ত এলাকা হিসাবে ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল চীনে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী কুপ্রবণতাগুলি চীনে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে বিদেশী পুঁজি ও শিল্পের আগমনের সাথে। প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক চীনা ছাত্রের পশ্চিমী দেশে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে,

গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুবাদে পশ্চিমী প্রবণতা বেড়েছিল এইসব ছাত্রদের মধ্যে। কমিউনিস্ট পার্টির একাংশেরও বুর্জোয়া ভাবধারায় আচ্ছন্ন হওয়া ও তদনুযায়ী তৎপরতা শুরু হয়। দেশের অনান্য প্রদেশের তুলনায় বিদেশী পুঁজির অন্যতম প্রভাবে দক্ষিণ সীমান্ত এলাকার অর্থনীতিতে অগ্রগতি ঘটতে থাকে। তার ফলে উন্নত এলাকার প্রতি পশ্চাৎপদ প্রদেশগুলির জনসাধারণের মধ্যে আকর্ষণ বৃদ্ধি ও বৃত্তির জন্য ক্রমবর্ধমান স্থানান্তরের ভীড় বাড়তে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান মোহের প্রতিফলন ঘটতে থাকে এই স্থানান্তরে।

১৯৮৫ সালের শেষার্ধ থেকে চীনে সংস্কারের দাবীতে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন প্রদেশে ছাত্র-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। এঁদের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন চীনের কিছু বুদ্ধিজীবী—তাঁদের অন্যতম ছিলেন চায়না ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজির ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং চাইনীজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সাধারণ পরিষদের অন্যতম সদস্য, বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী কাঙ লিঝি, বিজ্ঞানী লি মুঝিয়ান, পিপলস ডেইলির রাজনৈতিক সংবাদদাতা লিউ বিনিয়ান প্রমুখ। ১৯৮৪ সাল থেকে এঁরা বর্জোয়া উদারনীতিবাদী বক্তব্য প্রচার শুরু করেছিলেন। কাঙ লিঝি যে তত্ত্ব প্রচার করেন তাতে তিনি চীনের উন্নতির জন্য এবং সমাজ-চেতনার রূপান্তরের জন্য উন্নত দেশগুলির সাহায্য গ্রহণের দাবী করেন শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করে তিনি দাবী করেন যে বুদ্ধিজীবীরা হলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার ও স্রষ্টা, তাঁরাই হলেন উৎপাদিকা শক্তিগুলির পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধনের কারক শক্তি বুদ্ধিজীবীরা হলেন অগ্রসর শ্রেণী ও তাঁদের আদর্শ হলো বুদ্ধিজীবীগত মতাদর্শ, সমাজতন্ত্র নয়। লিউ বিনিয়ান দাবী করেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ কেননা এই সমাজে মানুষের চিন্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে না। এদের এই ধরনের মনোভাবের প্রতি দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক স্বয়ং হু ইগাও কাঙ-এর। ১৯৮৬ সালে চীনে বড় রকমের ছাত্র-বিক্ষোভ সংঘটিত হয়।

১৯৮৭ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে কিছুটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত হন হু ইগাও কাঙ। প্রশাসনিক পদ ও পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন পূর্বোক্ত বুদ্ধিজীবীরা। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন সেনেট চীনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠরত দু'হাজার চীনা ছাত্র পূর্বোক্তদের পুনর্বহাল করার দাবী জানিয়ে পত্র দেয় চীন সরকারের কাছে। বিদেশে বসবাসকারী ৩৬ জন চীনা বুদ্ধিজীবী চীনের শীর্ষ নেতা দেঙ জিয়াও পিঙকে প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র পাঠান। এইভাবে চীনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে জটিলতর করতে আন্তর্জাতিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়ে যায়।

পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তনের হাওয়া চীনে ধীরে ধীরে ছড়াতে শুরু করে। অতি সংগোপনে সেখানে নানা সংগঠন গড়ে ওঠে, যেগুলির অন্যতম ছিল 'ইণ্ডিপেনডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব ওয়ার্কার্স', 'টাইগার কন্টিনজেন্ট', 'আর্মি অব ভলান্টিয়ারস', 'ডেয়ার-টু-ডাই কর্পস' প্রভৃতি। তারা একটি 'গণতন্ত্রের বিশ্ববিদ্যালয়' চালু করে এবং নাম দেয় 'নতুন ঐতিহাসিক যুগের ইয়াঙ দু সামরিক আকাদেমি'। এরা তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে এক মূর্তি বসায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে প্রথমে এটির নামকরণ করে 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি', পরে পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় 'গডেস অব ডেমোক্র্যাসি'।

১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ছাত্ররা দখল করে নেয় বেজিং-এর তিয়েন আন মেন স্কোয়ার। ক্ষমতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সরে আসা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অবাধ নির্বাচন, পূর্বোক্ত বুদ্ধিজীবীদের পুনর্বহাল প্রভৃতি দাবী নিয়ে ধীরে ধীরে ব্যাপক উত্তেজনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে তারা। অবস্থানকারীদের শান্তিপূর্ণভাবে সরে যাওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিক্ষুব্ধদের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা ও আবেদন-নিবেদন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। পুলিশ ও সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে তাদের সুশৃঙ্খল ভাবে সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় ক্রমশ অধিকাংশ ছাত্র সেখান থেকে চলে গেলেও একটা অংশ সেখানে থেকে যায়। ৩-৪ জুন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চরম রূপ নেয়। বিক্ষোভকারীদের উন্মত্ত তাণ্ডবে তার আগেই ১৮০টি সামরিক গাড়ি, ৪০টি অস্ত্র বোঝাই মোটর গাড়ি, ৯০টির বেশী পুলিশের গাড়ি, ৮০টি বাস, ৪০টি অন্যান্য ধরনের গাড়ি, হয় জ্বালানো, নয় ধ্বংস করা হয়। তাদের আক্রমণে

শতাধিক সৈন্য ও পুলিশকর্মী নিহত ও হাজার হাজার পুলিশ ও সৈন্য আহত হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগে বাকীদের সরিয়ে দেওয়া হয়; কিছু ব্যক্তি নিহতও হন পুলিশের গুলি চালনায়। এই বিদ্রোহের নেতা কাঙ লিঝি ও তাঁর স্ত্রী লি মুঝিয়ান বেজিং-এর মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন।

আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছিল তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ঘটনাবলী নিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী দুনিয়া চীনের উপর সর্বাত্মক আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ দেবার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল দীর্ঘকালব্যাপী।

সত্তরের দশকের ইউরো-কমিউনিজমের প্রত্যক্ষ প্রভাব পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে যে দেশটির উপরে পড়েছিল সেটি হলো রোমানিয়া। আই. এম. এফ. ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া এবং তাদের দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে বেশ কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ সেখানে শুরু হয়েছিল সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকেই। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ ও ক্ষেত্র বিশেষে যৌথ উদ্যোগ—রাষ্ট্রীয় ও বিদেশী ব্যক্তিগত মালিকানার সমন্বয়ে—আশির দশকের শুরু থেকে সেখানে দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে। এই সময় থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করে রোমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি; ওয়ারশ প্যাক্ট-এর বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিরোধিতা শুরু হয় সেখানে। "স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি" হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেবার চেষ্টা করে সেখানকার পার্টি ও সরকার যেসব ব্যবস্থাদি ক্রমাগত নিয়েছিল তা' অনেকটাই ছিল পুঁজিবাদী চরিত্রের। রোমানিয়াতে বিপ্লবের সময় জমির মালিকানার প্রধানটাই ছিল চার্চের। চার্চের মালিকানা থেকে জমি উদ্ধার করা হলেও, রোমানিয়াতে ভূমি-সংস্কারের কাজে প্রথমের দিকে যথেষ্ট হঠকারিতা ঘটেছিল। পরবর্তী-কালে সংশোধিত হলেও সমগ্র ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থা ভূমি সম্পর্কের মধ্যে প্রাথমিক ধরনের সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল বলে দাবী করা যায় না। তার ফলে সেখানে কৃষক সমাজ, চার্চ ও প্রাক্তন ভূস্বামীদের নিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নেপথ্যে থেকেই গিয়েছিল। অন্যদিকে দু-একটি বিশিষ্ট শিল্প ছাড়া রোমানিয়ায় শিল্পেরও খুব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি; দেশটি ছিল কৃষিপ্রধান। এইরকম পরিস্থিতিতে শিল্পের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী দেশগুলির সাথে যখন সহযোগিতা শুরু হয়েছে, তখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার বিরোধী প্রধান শক্তি হিসাবে চার্চ কেবল অটুট থাকেনি সময় সুযোগ মত মাঝে মাঝেই সমস্যা সৃষ্টি করছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ প্রতিবেশী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করলে দ্রুত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এইসব শক্তি ও প্রকশতাগুলি। অক্টোবর '৮৯তে রোমানিয়া-হাঙ্গেরি সীমান্ত শহর তিমিশেরায়, রোমান ক্যাথলিক চার্চের উদ্যোগে কমিউনিস্ট-বিরোধী কতকগুলি শক্তির এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। 'তিমিশেরা ঘোষণাপত্র' নামে পরিচিত দাবী-সনদে তারা চার্চের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার, রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী তথাকথিত নাগরিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রবর্তন ও বৃহৎ ভূস্বামীদের রাষ্ট্রায়ত্ত জমি ফিরিয়ে দেবার দাবী জানায়। নিকোলাই চসেস্কুর সরকার এটিকে বেআইনী ঘোষণা করলেও, ইতোমধ্যে পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে চলে যেতে শুরু করেছিল।

হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন-বিরোধী ও প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা পঞ্চাশের দশকে দমন করা হলেও এবং পরবর্তীকালে বাহ্যত সেখানে শান্তির বাতাবরণ টিঁকে থাকলেও এই পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তিত হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নেরও আগে ও স্বতন্ত্রভাবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবী উঠেছিল হাঙ্গেরীর শাসকদল সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস (মার্চ '৮৫) থেকে। তথাকথিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নামে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৬-৯০) পার্টি গ্রহণ করেছিল তা' আসলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অগ্রগতিমূলক সংস্কারের বিষয়ে ছিল না, ছিল পুঁজিবাদী বাজার-অর্থনীতির অংশত প্রয়োগের চেষ্টা এবং পুঁজির জন্য পশ্চিমী ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ঋণ সংগ্রহের উদ্যোগ। কিন্তু বাজারী অর্থনীতি কোন উন্নতি ঘটানোর পরিবর্তে আরো বেশি সমস্যা ডেকে আনে হাঙ্গেরিতে। বিপুল বৈদেশিক ঋণ ও সুদের চাপ, ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি

এবং বেকারী, বিশেষত যুব-সমাজের মধ্যে, জনগণ থেকে পার্টির বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে চলে। ১৯৮৭ সালে জুন মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাতে বিরোধীদের দ্বারা সাধারণ সম্পাদক জানোস কাদারকে অপসারণ করার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও, পার্টির অভ্যন্তরে তিনটি ফোরাম গড়ে ওঠে। এগুলি আসলে ছিল সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তি ও পুঁজিবাদের পক্ষে। অনুরূপ সংগঠন গড়ে ওঠে যুব-সমাজের মধ্যেও। গোপনে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা শুরু হয়। মে, ১৯৮৮ সালের পার্টি সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদারনীতিক তৎপরতাগুলিকে সামনে রেখে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে সমস্ত বিরোধীরা পার্টি অভ্যন্তরে ঐক্যবদ্ধ হয়। সম্মেলন থেকে কাদারকে সাধারণ সম্পাদক পদসহ কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেও অপসারণ করা হয়। সমাজতন্ত্রের অনুসারী এবং ক্ষমতাসীন হাঙ্গেরিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টির নাম ও সংবিধান পরিবর্তন করে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ধাঁচে গঠিত হয় হাঙ্গেরিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি।

পূর্ব জার্মানি তথা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী জার্মানিতে সুদীর্ঘকাল ধরে সমস্যা ও অসন্তোষ তৈরির জন্য পশ্চিমী শক্তিগুলি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। পূর্ব জার্মানি থেকে মানুষকে দেশান্তর গমনে প্ররোচিত করার জন্য নানা ঘটনা অব্যাহতভাবে অতীতে ঘটেছে। বাধ্য হয়ে 'বার্লিন ওয়াল' পূর্ব জার্মানি তৈরি করেছিল। তাছাড়া দেশের চার্চ সমাজতন্ত্রের প্রতি শত্রুতার মনোভাব নিয়ে কাজ করছিল। ন্যাটো জোটের সীমান্তের পুরোভাগে পূর্ব জার্মানির অবস্থানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে সবল ও কার্যকরী অস্তিত্ব এবং ভূমিকা বহাল রাখতে হয়েছিল দেশটিকে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ধরনের উপস্থিতি সেখানকার জনমানসে সুখকর হয়নি। প্রতিক্রিয়ার শক্তি জনসাধারণের এই মনোভাবকে উত্তেজিত ও সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। সত্তরের দশকের শেষ ভাগ থেকে চার্চ অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিসমূহকে সংগঠিত করার চেষ্টা চালায়। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে চার্চের নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'শান্তির আন্দোলন' নামে একটি সংস্থা। তারা সামরিক উৎপাদন হ্রাস, স্কুলে সামরিক শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষার প্রবর্তন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দাবী তোলে। এটি "বার্লিন আবেদন" বলে পরিচিত। এই সনদের ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরের সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে সমবেত করার বৃহত্তর উদ্যোগ শুরু হয়। সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি—জার্মান সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি ও সরকার এই প্রচেষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৮৭-৮৮ সালে প্রতিবিপ্লবী তৎপরতার বিরুদ্ধে পার্টি ও সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক অভিযানও চালানো হয়, কিন্তু তখন সময় হাত থেকে পিছলে গিয়েছিল।

এইভাবে বিশ্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সমাজতান্ত্রিক দেশে ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের সুস্পষ্ট পরিস্থিতি গড়ে উঠছিল।

ঝোড়ো হাওয়ার মুখে তাসের ঘর

সমাসন্ন ভবিষ্যতের দেয়ালের লিখন পূর্বোক্ত দেশগুলির মধ্যে চীন ছাড়া বুঝি আর কেউই আন্দাজ করতে পারেনি। সুদীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ভ্রান্তিসমূহ এই মহাবিপর্যয়ের অভিমুখকে নির্দেশ করে দিয়েছিল। নির্দিষ্ট মুহূর্তে পৌঁছে সেই অনিবার্যতা ত্বরণ ও নির্ধারক স্তর পায়। অন্তিম মুহূর্তে পচনের চরম বহিঃপ্রকাশ দেখিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব কেবল স্বদেশের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে পরোক্ষ ইন্ধন দিয়ে বা নিস্পৃহ থেকে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবিপ্লবীদের বর্ধিত তৎপরতার মুখে সংশ্লিষ্ট দেশটি থেকে সোভিয়েত সাহায্য ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রতিবিপ্লবকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির বিপর্যয়কে স্বাগতও জানিয়েছিল। কিন্তু শেষ পরিণামে কেউই রক্ষা পেল না।

বিপর্যয়ের রঙ্গমঞ্চে প্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ট্রাজেডির শেষ রিহার্সাল হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ২৮তম পার্টির কংগ্রেসকে, সম্ভবত, চিহ্নিত করা যায়। জুলাই '৯০ মাসে অনুষ্ঠিত ঐ কংগ্রেস থেকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'কে সরাসরি বাতিল করে দিয়ে 'মানবিক সমাজতন্ত্র'-র নীতি এবং

শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিকে খারিজ করে দিয়ে 'সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ'-এ আস্থা, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রের পরিবর্তে 'জনগণের রাষ্ট্র' ঘোষণা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকাকে অস্বীকার এবং সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদকে। পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বকেও কার্যত অস্বীকার করা হয়, তার পাশাপাশি তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ যাতে না ঘটে সেজন্য সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতা ও 'ভারসাম্যমূলক সমস্বার্থ'-র নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি', রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত মালিকানা, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়।

দেশের মূল চালিকাশক্তি—কমিউনিস্ট পার্টি ও কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ঘটানোর প্রক্রিয়ায় এই সিদ্ধান্তগুলি ছিল নিছক আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মাত্র, কেননা পচন ও পতনের প্রক্রিয়া পার্টি ও রাষ্ট্রের কেন্দ্র ও পরিসীমা জুড়ে তখন তুমুল সক্রিয় হয়েছে। ডিসেম্বর '৮৯ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত লিথুয়ানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি, নিজেদের পার্টি কংগ্রেস থেকে নিজেদের স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অর্থাৎ সি. পি. এস. ইউ. বা কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তারা বেরিয়ে যায়। এর পরই আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও আজারবাইজানে অনুরূপ স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়। এইসব সিদ্ধান্ত দাবানলের মত একের পর এক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে থাকে। কিন্তু অচিরেই এই স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির হাত থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চলে যেতে থাকে ঐ রিপাব্লিকগুলিতে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী পপুলার ফ্রন্টগুলির হাতে। স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এবার দাবী তুলতে থাকে নিজ নিজ রিপাব্লিকের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার। ১৯৯১ সালের মার্চের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি রিপাব্লিকের মধ্যে ১৩টিই স্বাধীনতা ঘোষণা করে আলাদা হয়ে যায়, যদিও ১৭ই মার্চ '৯১ দেশব্যাপী যে গণভোট নেওয়া হয়েছিল তাতে ৭৬ শতাংশ মানুষ ঐক্যবদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়ন বজায় রাখার পক্ষে সম্মতি জানিয়েছিল। আসলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়ে। ১৮ই জুন '৯১ নতুন এক চুক্তি করে রিপাব্লিকগুলিকে নাম-কো-ওয়াস্তে যুক্ত রাখার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয় মাত্র। অন্যদিকে ১২ই জুন '৯১ দেশের একক বৃহত্তম রিপাব্লিক—রুশ ফেডারেশনের (পরবর্তীকালে যার নাম হয়েছে রাশিয়া) নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য বোরিস ইয়েলেৎসিন তাঁর নিজস্ব দল ডেমোক্র্যাটিক ফোরামের প্রতিনিধি হিসাবে কার্যকরী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে গরবাচভ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কয়েকদিনের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে যে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ধীরে ধীরে বাড়ছিল, এবারে তা ভীষণাকার ধারণ করে। জঙ্গী রূপ ধারণ করে তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী। কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধীদের ডাকে মিছিল-সমাবেশ-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হতে থাকে বড় বড় শহরে। প্রেসিডেণ্ট হলেও গরবাচভ ক্রমশ ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হতে থাকেন। রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে ও আবেগ-তাড়িত জনগণের নেতা হিসাবে সামনে চলে আসতে শুরু করেন বোরিস ইয়েলেৎসিন। সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঠেকাবার জন্য শেষ চেষ্টা করে সেনাবাহিনীর প্রধানদের একাংশ সাময়িক ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু দৃঢ়তা ও পরিকল্পনার অভাব, জনগণের সমর্থনশূন্যতা, সামরিক বাহিনীকে সক্রিয় করতে না পারা এবং জনগণের বিরোধিতার মুখে সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। অমিত শক্তিধর ৭৪ বছরের সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এইভাবে পতন ঘটে।

পূর্ব জার্মানিতে পরিস্থিতির অবনতি ইতোপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবী নিয়ে জানুয়ারী '৮৯-তে পত্তন হয় 'ইনিসিয়েটিভ ফর দা ডেমোক্র্যাটিক রিনিউয়াল অব আওয়ার সোসাইটি' নামে সংগঠনের। এই সংগঠন ও দাবীগুলির সমর্থনে জনগণ সমবেত হতে থাকেন ব্যাপকভাবে। তথাকথিত সংস্কারে উদ্যোগী সমাজতন্ত্র-বিরোধীদের সাথে পার্টির অভ্যন্তরে শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ চালিয়ে সাধারণ সম্পাদক এরিক হোনেকার কেন্দ্রীয় কমিটিতে পরাজিত হবার পর পদত্যাগ করেন। পার্টি থেকে তাঁকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়। নব-

নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ইগন ক্রেনেজ পূর্ব জার্মানির সীমান্ত খুলে দেবার পক্ষে প্রকাশ্য মত জানান। এই ঘোষণার সাথে সাথে ১৯৮৯-এর ৯ই ডিসেম্বর থেকে বার্লিন প্রাচীর ভাঙ্গার কাজে উন্মত্ত জনতা নেমে পড়ে। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে ক্রেনেজকে অপসারিত করে সাধারণ সম্পাদক হন গ্রেগর গিনি। তিনি ক্ষমতায় বসেই বাজার অর্থনীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি—সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'পার্টি অব ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম'। ১৯৯০ সালের জানুয়ারীতে মিখাইল গরবাচভ পশ্চিম জার্মানির সরকারকে জানান যে তিনি দুই জার্মানির মিলনের পক্ষে। ক্যানসার রোগে আক্রান্ত এরিক হোনেকারকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৯০ সালের মার্চে বহুদলীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে পূর্ব জার্মানির নির্বাচন হয়। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে তৎপরতা শুরু করে দুই জার্মানির মধ্যে অর্থনৈতিক সমঝোতার চুক্তি নিয়ে। ৩রা অক্টোবর '৯০ দুই জার্মানির মিলনের সিদ্ধান্ত এবং তারপর চুক্তি সম্পাদন করে সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানির অবলুপ্তির কাজ সমাধা করে নতুন সরকার।

রোমানিয়ায় ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৯ তারিখে চার্চের নেতৃত্বে সংঘটিত সমাজতন্ত্র-বিরোধীদের বিক্ষোভ-জমায়েতে চসেস্কুর পদত্যাগের দাবী ওঠে। সমাজতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী পর পর দু'দিন বিক্ষোভকারীদের সাথে প্রবল সংঘর্ষ চালায়। এতে নিহত হন বহু মানুষ। এই ঘটনা নিয়ে, পরিকল্পিতভাবে দেশে ও পশ্চিমী দেশগুলিতে তুমুল অপপ্রচার শুরু হয়ে যায়। বিদেশ সফর থেকে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে প্যালেস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে সমাজতন্ত্র রক্ষা ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রতিরোধ করার জন্য ডাক দেন (২১শে ডিসেম্বর) চসেস্কু। কিন্তু সেই বিশাল জমায়েতই তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। এর পর সারা দেশে ছাত্র-বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় এবং সেনাবাহিনী সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলির পক্ষ নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে চসেস্কু সাহায্য চেয়ে পাঠান; কিন্তু সাহায্য-সমর্থন তো আসেইনি, বরং রোমানিয়াতে অবস্থানকারী সোভিয়েত বাহিনী সামরিক ছাউনিতে ঢুকে গিয়ে তথাকথিত নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে বসে থাকে। চসেস্কু ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তারের পর বিচারের প্রহসন করে কার্যকরী করা হয় মৃত্যুদণ্ড। 'ন্যাশনাল স্যালভেশন ফ্রন্ট' সরকার গঠন ক'রে ঘোষণা করে সমাজতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করার কথা। ১৯৯০ সালে সেখানে বহুদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করার পর গ্রহণ করা হয় নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি।

পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে পূর্বে বর্ণিত রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকট গভীরভাবে জাঁকিয়ে বসে। ১৯৮৮ সালে সেখানে মুদ্রাস্ফীতি ১৬৩ শতাংশে এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৩৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। সলিডারিটির চাপের মুখে পিছু হঠতে থাকে সরকার। সলিডারিটিকে আইনি স্বীকৃতি, নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি, রোমান ক্যাথলিক চার্চের ভূমিকায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ না করা এবং সরকার বিরোধী সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচারের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালের জুন মাসের নির্বাচনে সলিডারিটি বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সরকার দখল করে নেয়। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সলিডারিটির প্রধান লেচ ওয়ালেসা বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সমাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করেন ও সিদ্ধান্ত নেন ধনতান্ত্রিক পথ গ্রহণের।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় একদা সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাব সংগঠিত করতে ব্যর্থ নেতা আলেকজাণ্ডার ডুবচেক পুনরায় ১৯৮৬ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে নতুন ভাবে অবতীর্ণ হন। রাজনৈতিক সংস্কারের দাবীতে ভ্যাসলাভ হ্যাভেলের নেতৃত্বে গঠিত 'সিভিক ফোরাম' ১৯৮৯ সাল থেকে আন্দোলন শুরু করে। পাশাপাশি বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে; পদত্যাগ করে পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও সমগ্র পলিটব্যুরো। তারপরই, একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির দেশ শাসনের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার বাতিল করে পার্লামেন্ট। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে এক বৃহৎ অংশের কমিউনিস্টরা ভোটও দেন। ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলে। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে গুস্তাভ হুসাক পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট হন ভ্যাসলাভ হ্যাভেল। ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেরও। ল্যাডিস্লাভ অ্যাডামেক পার্টির চেয়ারম্যান হন। ১৯৯০ সালের জানুয়ারীতে কমিউনিস্ট পার্টি ও সিভিক ফোরাম-এর কোয়ালিশন

সরকার তৈরি হয়। সোস্যালিস্টিক রিপাব্লিক অব চেকোশ্লোভাকিয়ার পরিবর্তে দেশের নাম হয় 'চেক অ্যাণ্ড শ্লোভাক ফেডারাল রিপাব্লিক'। বছরের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নিদারুণভাবে পরাজিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি। জনগণকে প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা একে একে প্রত্যাহার শুরু হয়; শুরু হয় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিক্রি বা বন্ধ করে দেওয়া। মুদ্রামান ৭৫ শতাংশ অবমূল্যায়ন করা হয়। দ্রুত বেকারী বাড়তে শুরু করে। অন্যদিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলি ও নেতৃত্ব ১৯৯১ সালে হাঙ্গেরি ও পোল্যাণ্ডের সরকারের সাথে একাধারে কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান চালানো ও অন্যদিকে পশ্চিমী দেশগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তারপর : সমাজতন্ত্র-বিরোধী রথের চাকার গতি আরও দ্রুত হয়। আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বালগেরিয়া প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্টরা প্রথমে কঠোরভাবেই প্রতিরোধ করে সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও রক্ষিত হলো না। চেকোশ্লোভাকিয়া চেক ও শ্লোভাক দুটি রাষ্ট্রে খণ্ড হয়ে যায়। আলবেনিয়ায় অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলে। রাশিয়াতে গরবাচভের পতন ঘটে এবং বোরিস ইয়েলৎসিন ক্ষমতায় চলে আসেন এবং কট্টর কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান শুরু হয়ে যায়। কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথ-প্রদর্শকদের—মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন প্রমুখের মূর্তি ভাঙা ও অপসারণ, পূর্বোক্ত দেশগুলির সর্বত্র কার্যত, কর্মসূচী আকারে গ্রহণ করা হলো। কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান প্রধান গণসংগঠনগুলি, বিশেষত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বেশ কিছুকাল ধরে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছিল। সমস্ত দেশগুলিতে যখন প্রতিক্রিয়ার তৎপরতা চলে তখন কোথাও ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতিরোধ করার জন্য ডাক দেয়নি, শ্রমিকশ্রেণীও কোথাও সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেনি। বরং বহুক্ষেত্রেই শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করে বিপ্লব-বিরোধী শিবিরে সমবেত করা হয়েছিল। পূর্বোক্ত সমাজতন্ত্র-বিরোধী সমস্ত তৎপরতাগুলিতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও যুবকেরা, বিশেষত বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষরা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে রাশিয়ার ও দ্বিতীয় বৃহত্তর রাষ্ট্র ইউক্রেনের মধ্যে সম্পদ ও সমরশক্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যেমন বিরোধ বাধে, অন্যদিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের দেশগুলিতে মৌলবাদী ও জাতিগত বিরোধ ফেটে পড়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের আকারে। এইসব দেশে শুরু হয়ে যায় গৃহযুদ্ধ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের কারণ প্রসঙ্গে

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের ঘটনা বিপরীত দিক থেকে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাতে পরিণত হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের চরমতম শত্রুরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের জন্য দীর্ঘ ৭৪ বছর ধরে রুদ্ধশ্বাস সর্বাত্মক তৎপরতা চালিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু কখনো সাফল্য পায়নি। বরং তাদের প্রতিটি শত্রুতা সমাজতন্ত্রকে সবল করেছিল বারে বারে। এমন কি বিপর্যয় ঘটার কালে শত্রুদের প্রাপ্ত সুযোগ, রুশ সমাতজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর বা নাজি জার্মানির সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের কালের চেয়ে বেশি অনুকূল ছিল না। তা'সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে ভেঙ্গে পড়লো, তা' স্বভাবতই শত্রুদেরও কম আশ্চর্যান্বিত করেনি; পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জনগণের, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর, তো কথাই নেই।

রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পর তার কারণ নিয়ে সারা দুনিয়ায় ব্যাপক আলোচনা, মূল্যায়ন, গবেষণা, বিতর্ক প্রভৃতি চলেছিল। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটলো কেন, তাও এখন বিশ্বের মানুষের কাছে অন্যতম বৃহত্তম ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াতে সৃষ্টি হয়েছে অজস্র ও পরস্পরবিরোধী ধারাও। অতীত থেকে ও বিভিন্ন সময়ে, শত্রুরা সমাজতন্ত্রের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছিল, যদিও ইতিহাস সেই ইচ্ছা তখন পূরণ করেনি। অথচ যখন অমিত শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের সামান্যতম বিনষ্টির কোন সম্ভাবনা প্রতিপক্ষদের মনে সম্পূর্ণ বিলীন হয়েছিল, ঠিক তখন আকস্মিকভাবে ঘটলো এই বিপর্যয়। বিপর্যয়ের ফলাফল যেহেতু তাদের অনুকূলে গেল তাই দ্রুত মাটি দখল

করার উদ্যোগ নেয় তারা। তৎক্ষণাৎ তারা দাবী করে যে এই বিপর্যয় তাদের অর্থাৎ বিশ্ব-পুঁজিবাদের লড়াইয়ের ফলশ্রুতি—তাদের ঐতিহাসিক বিজয়; মানব-সমাজের বিকাশের পথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল এক আকস্মিক ঘটনা ও এক বিকৃতি—তাই ইতিহাস কর্তৃক সমাজতন্ত্র পরিত্যক্ত হয়েছে। পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র জয়ী হয়েছে। কেননা, শেষোক্ত ব্যবস্থাই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। তারা তাদের অতীতের ভবিষ্যদ্বাণীর পেছনে যুক্তি ও বিশ্বাসের প্রমাণ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়কে দেখাতে শুরু করে।

প্রকৃতপক্ষে সমাজ বিকাশের নিয়মে সমাজতন্ত্র যে অনিবার্য তা' কমিউনিস্টদের চেয়ে পুঁজিবাদীরা কম জানতো না। কেননা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুর্বলতা, ব্যর্থতা, নৈরাজ্য এবং ক্রমবর্ধমান মুমূর্ষুতার পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সবলতার প্রমাণ জন্মলগ্ন থেকে পেতে শুরু করেছিল তারা। নিজের সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে এই শতাব্দীতেই দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করা ছাড়াও কয়েক শত ছোট-বড় যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েও পরিত্রাণ পাচ্ছিল না বিশ্ব-পুঁজিবাদ। বরং সমস্যা বেড়েছিল ক্রমাগত। ধনতন্ত্র নিজস্ব রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, পররাষ্ট্রনীতিক বিষয়ের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অজস্র পরিবর্তন ও সংস্কার চালিয়েও স্বীয় বিশ্ব-অভিযানের নিম্নগামিতাকে রুখতে পারছিল না। তদুপরি, তাদের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অস্তিত্বগতভাবে নির্মূল করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লব সাধিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিল তারা। এতে পরাজিত হবার পর, এগারোটি দেশ মিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণও করেছে। তাতেও ব্যর্থ হবার পর, সাম্রাজ্যবাদেরই একাংশ—ফ্যাসিবাদ ভয়ঙ্কর সামরিক অভিযান চালিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে। তাতে পুনর্বার পরাস্ত হবার পর সর্বক্ষণ আণবিক আক্রমণের হুমকির মুখে রেখেছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সামরিক জোট ও আক্রমণাত্মক সমর-বলয় দিয়ে ঘিরে রেখেছে তারা; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সমাজতন্ত্রকে অবরোধ করেছে সর্বক্ষণ; তারা ঠাণ্ডা যুদ্ধও চালিয়েছে সুদীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু সবই তখন ব্যর্থ হয়েছিল। সুতরাং সমাজতন্ত্রের ধ্বংস সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণীই তারা অতীতে করে থাক না কেন, আসলে তারা নিশ্চিতভাবে জেনেছিল যে সেই আশা বাস্তব হবে না। তাদের এই জাতীয় প্রত্যেকটি চেষ্টার বার বার ব্যর্থতাই তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে সমাজতন্ত্র বিপর্যস্ত হবার নয়। সুতরাং সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয়ের পেছনে বিশ্ব-পুঁজিবাদের ভূমিকাকে মূল কারণ হিসাবে দাঁড় করানোর কোন ঐতিহাসিক বা বাস্তব প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অবশ্য তার অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে শত্রুদের ভূমিকার কোন মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই। বরং এ'বিষয়ে গভীর অন্বেষণ করতে হলে শত্রুদের ভূমিকার দিকও বিবেচ্য।

একথা ঠিক যে বিপর্যয় ঘটার এত স্বল্পকালের মধ্যে এবং সমস্ত ধরনের তথ্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত বিপর্যয়ের কারণগুলি সম্পর্কে কোন গভীর ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাছাড়া বহু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলির যথার্থ সন্ধান পাওয়া যায় সুদীর্ঘকাল পর। কেননা সমাজ-বিকাশের নিয়মাবলীর চরিত্রে বহু জটিলতা থাকে, থাকে বহু অজানিত দিকও। এমনকি সুদূর ইতিহাসের নানা গ্রন্থি অলক্ষ্যে জড়িয়ে থাকে পরবর্তী ইতিহাসের ঘটনাবলীতে। তাছাড়াও সমস্যা হলো মার্কসবাদ নিয়ে নানাবিধ যান্ত্রিক ও প্রচলিত ধারণা ও প্রয়োগের প্রবহমান বাস্তবতা। এসব সত্ত্বেও, বিপর্যয় নিয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর ফেলে রাখা যায় না, তাই নানা দিক নিয়ে এই আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক সংগঠিত হচ্ছে। সংক্ষেপে সেগুলির কিছু দিক পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

অতীতের সূত্র ধরে বিতর্ক

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব বলে বলেছিলেন। অনেকগুলি দেশে বিপ্লব সংঘটিত না হলে বিপ্লবের সাফল্য ও অস্তিত্ব রক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু কার্যকালে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে তুলনামূলক অনুন্নত দেশ—রাশিয়াতে এবং একটি মাত্র দেশেই লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লব সম্পন্ন করে, প্রতিষ্ঠা করে সর্বহারার একনায়কত্বের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে আরও কতকগুলি দেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও ক্রমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে এবং লেনিনের পরবর্তীকালে স্তালিনের নেতৃত্বে একটি দেশে অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে সাফল্যের সাথে রক্ষা ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করতেও কমিউনিস্ট পার্টি সক্ষম হয়। রুশ বিপ্লবের সময়ে বলশেভিক পার্টির অভ্যন্তরে এবং ইউরোপের কিছু কমিউনিস্ট পার্টি, বিশেষত জার্মানির পার্টিতে, মার্কসের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে বিতর্কও চলেছিল। বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবার পরও কেউ এমন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে এই বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, তার পূর্ববর্তী এবং অসমাপ্ত বুর্জোয়া-বিপ্লবেরই একটি ধরন। লেনিন প্রথমে তত্ত্বগতভাবে এই প্রসঙ্গে তীক্ষ্ণ যুক্তিসহ নির্ধারকভাবে বলেছিলেন যে এই বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক। বিপ্লব সম্পাদন ও বিপ্লব-পরবর্তী কর্মসূচীগুলি গ্রহণ ও রূপায়ণের প্রত্যেকটি নীতি ও পদ্ধতিকে লেনিন বলেছিলেন সমাজতান্ত্রিক। সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর পুনরায় সেই বিতর্ক ফিরে এসেছে। মার্কসের বক্তব্যের অনুসরণে সাম্প্রতিক আলোচকদের কোন কোন ব্যক্তিত্ব বলার চেষ্টা করছেন যে রুশ বিপ্লবকালে সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণী প্রথমে শহরগুলি দখল করে নিলেও, শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান বিপ্লবী মিত্র— কৃষকসমাজ বিপ্লবে তেমন কোন ভূমিকা নেয়নি। ফলে বিপ্লবের শ্রেণী-শক্তির শিবির গঠন ও বিপ্লবী ভূমিকার মধ্যে অসম্পূর্ণতা ছিল। তাঁদের মতে সে কারণে জন্মলগ্নের এই গূঢ় দুর্বলতা, সমাজতন্ত্র গঠনের বিভিন্ন স্তরে, অন্যান্য দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির সাথে ধারাবাহিকভাবে ও অন্তর্লীন চরিত্র নিয়ে পরবর্তীকালে বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হয়েছিল। এদের মধ্যে কেউবা অবশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আত্মরক্ষার জন্য অনেকটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গ্রহণের নজির দেখিয়ে নিজেদের যুক্তিকে হাজির করেছেন। এঁদের মোটের উপর প্রতিপাদ্য হলো যে রুশ বিপ্লব থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সমস্ত ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে বিশ্ব-মানব-সমাজে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তবতা এখনো পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। সমাজতন্ত্রের বিরোধী মনোভাব থেকে তাত্ত্বিকেরা এই বক্তব্য বলেননি। বরং এঁরা মার্কসবাদকে যথার্থ বলে দাবী করে পশ্চাৎপদ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যথার্থতার বিরোধিতা করেছেন।

বিপ্লবের পর অল্পকালের মধ্যে লেনিন 'নেপ' বা 'নিউ ইকনমিক পলিসি' হিসাবে অর্থনৈতিক স্তরে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা' অনেক ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর পূর্ববর্তী গৃহীত ব্যবস্থা— 'ওয়ার কমিউনিজম' থেকে ভিন্ন। 'নেপ' প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে লেনিন তখন বলেছিলেন যে, কেউ যদি মনে করে যে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদ কায়েম করছেন, তবে তিনি তা' স্বীকার করবেন, কিন্তু তিনি তা' করছেন সমাজতন্ত্রের জন্য। 'নেপ' প্রসঙ্গ নিয়ে তখন বলশেভিক পার্টিতে তীব্র বিতর্ক চলেছিল। এখন আবার ফিরে এসেছে সেই বিতর্ক। লেনিনের ভূমিকা সমর্থন করে একাংশ আলোচক পূর্বোক্ত বক্তব্য টেনে এনেছেন, অর্থাৎ রুশ-বিপ্লবের চরিত্রকে—ঐ বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক ছিল না, যে কারণে লেনিনকে অসমাপ্ত বুর্জোয়া বিপ্লবের স্তর সম্পন্ন করতে 'নেপ'গ্রহণ করতে হয়েছিল। এঁদের মতে, বিশের দশকের শেষার্ধে 'নেপ' পরিত্যাগ করে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য ভিন্ন নীতি নিয়ে ভুল কাজ করেছিলেন স্তালিন। স্তালিনের এই পথ নেওয়ার জন্য পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করার বৈষয়িক শর্ত সৃষ্টি হলেও, এই 'জবরদস্তি বিকাশ' সময়কালে সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে 'বুমেরাং' হয়েছিল। এই যুক্তি অনুসরণ করে বলা হয়েছে যে অনুন্নত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে বিপ্লবের পর লেনিন নির্দেশিত পথ নেওয়া হয়নি; উপরি যান্ত্রিকভাবে সোভিয়েত মডেলের অনুকরণ করার ফলে দেশীয় বাস্তবতা থেকে সমগ্র কর্মসূচী ও ব্যবস্থাবলী প্রথম থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, ফলে বিপর্যস্ত হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের যেসব দেশে অসমাপ্ত বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য সংস্কার বা উদারনীতিক ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, সেগুলি সংশ্লিষ্ট সময়ের সোভিয়েত নেতৃত্বের চাপের জন্য সম্ভব হয়নি। চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশও অনুকরণ

করার পথ নেওয়ার ফলে কঠিন সমস্যায় পড়েছিল; এখন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন পথ নিয়েছে এবং বিপর্যয় ঠেকিয়েছে।

মার্কসবাদে পুঁজিবাদের পরবর্তী স্তর হিসাবে সমাজতন্ত্রকে নির্দেশ করা হয়েছে। মার্কস তাঁর সমগ্র আলোচনাতে সমাজতন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ব্যাপক চরিত্রায়ণ করে যাননি। এ বিষয়ে ধারণাকে অনেকটা পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছেন লেনিন ও স্তালিন। তবে একটি বিষয়ে তিনজনের মত ছিল অভিন্ন তা'হলো, সাম্যবাদে পৌঁছুতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দীর্ঘ সময় লাগবে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে নানাবিধ পরিবর্তন, নবায়ন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রভৃতিও চালিয়ে যেতে হবে। পরবর্তীকালের বিপ্লবগুলিতে, অসমাপ্ত বুর্জোয়া-বিপ্লব সম্পূর্ণ করার কর্মসূচী সুনির্দিষ্টভাবে গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে বিপ্লবের নতুন স্তরও স্বীকৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মাও জে দঙ্-এর 'নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' ও 'নয়া-গণতন্ত্র' সম্পর্কিত তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কিন্তু স্তালিন, মাও জে দঙ্, হো চি মিন প্রমুখ বলেছিলেন যে এই জাতীয় নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পরবর্তী স্তরে (সমাজতন্ত্রে) পৌঁছুতে মাঝখানে কোন চীনের প্রাচীর নেই। নতুন বিতর্ক এই শেষ অংশটিতেও ঘন হয়েছে। অতীতে কোন কোন আলোচক এমন কথাও বলার চেষ্টা করেছিলেন যে বুর্জোয়া সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে পৌঁছনোর মধ্যবর্তী এক নির্দিষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী স্বতন্ত্র স্তর রয়েছে। এই বিচারে রুশ বিপ্লব স্বয়ং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না। বিপ্লবের পরে ছিল প্রাক-সমাজতান্ত্রিক এক স্বতন্ত্র স্তর। সুতরাং প্রাক-সমাজতান্ত্রিক স্তর ব্যতিরেকে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করাই ছিল ভ্রান্ত কাজ। সেই সূত্র ধরে অনেক আলোচক সম্প্রতি বিপর্যয়ের পর চীন ও ভিয়েতনাম যেভাবে তাদের বর্তমান কর্মসূচী ও স্তরটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন, সেগুলিকে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরে নতুন করে বলছেন যে পুঁজিবাদের পর জনগণতান্ত্রিক স্তরটি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক স্তর। এবং এই স্তরও নিদারুণ দীর্ঘস্থায়ী। তাঁদের মতে এই স্তরটি নির্ধারণ করতে লেনিন পেরেছিলেন; কিন্তু পরবর্তী নেতৃত্ব তা' উপেক্ষা করেছেন। তাই বিপর্যয় ঘটেছে পূর্ব-ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও। এশীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও উভয় স্তরের মধ্যে পার্থক্যকে লঘু ও সরলীকরণ করে যান্ত্রিকভাবে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করার চেষ্টায় বিপাকে পড়েছিল। অর্থাৎ সমগ্র বিতর্কে একটি সম্পূর্ণ উপাদান এখন প্রস্তাবিত হয়েছে; তা' হলো পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মাঝে একটি নতুন ও দীর্ঘস্থায়ী স্তর রয়েছে, যা এই পর্যন্ত ব্যাখ্যাত অসমাপ্ত বুর্জোয়া বিপ্লবের স্তর মাত্র নয়।

এই বিপর্যয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অথবা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট মডেলের—এই বিষয়টিও কারণ অনুসন্ধান ও বিতর্কের একটি দিক। এক্ষেত্রে অনেকেই সমস্ত দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলীকেই 'অ্যাটেইণ্ড সোস্যালিস্ট মডেল' বা প্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক আদল বলেছেন। এঁদের বক্তব্য হলো যে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হয়েছে সমাজতন্ত্রের একটি মডেল। তার অন্যতম কারণ হলো পথ অজানিত এবং এটা ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর। সুতরাং ব্যর্থ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

সত্তরের দশকে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা করেছিলেন বহু আলোচনা, যেগুলিতে অন্যতম মন্তব্য ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে। বর্তমানে সোভিয়েত সমাজের বিপর্যয়ের কারণ চিহ্নিতকরণে তিন ধারার আলোচনা চলেছে। একদল বুদ্ধিজীবী সমস্ত দায় চাপিয়েছেন স্তালিনের উপর, একদল নিকিতা খ্রুশ্চভের উপর, আর একদল স্বয়ং লেনিনের কাল থেকে সমাজতন্ত্রের সংকট দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যেই 'সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্র' প্রসঙ্গ বিবেচিত হয়েছে। অধিকাংশই বলার চেষ্টা করেছেন যে সমাজতন্ত্রের এই 'মডেল' ছিল ভ্রান্ত। এঁদের বক্তব্য হলো যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে কোন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটেনি; বিপর্যয় হয়েছে এমন এক ব্যবস্থার যা ঠিক সমাজতান্ত্রিকও নয়, আবার পুঁজিবাদীও নয়।

বিতর্কে সর্বজনীন চরিত্রের কিছু দিক

পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়নে ভ্রান্তি এবং তার ফলে দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও কর্মসূচী গ্রহণে অসম্পূর্ণতা

বা ত্রুটি তথা সমাজতন্ত্রের নবায়নে সৃজনশীলভাবে মার্কসবাদের প্রয়োগে ব্যর্থতাই হলো সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ—বিশ্বের কোন কোন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম মূল্যায়ন এই ধরনের। রুশ বিপ্লব ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে পরপর অনুষ্ঠিত বিপ্লবসমূহ, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপক সাফল্য, পুঁজিবাদের প্রবল অভ্যন্তরীণ সংকট ইত্যাদি বাস্তবতা থেকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা সমাজতান্ত্রিক শিবির পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধে মূল্যায়ন করেছিল যে পুঁজিবাদের বিপর্যয় সমাসন্ন; পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী সাফল্যও ঘনায়মান। যুগ সম্পর্কিত এই মূল্যায়ন এক ধরনের আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করেছিল সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির মধ্যে। শত্রুর শক্তিকে লঘু করে দেখার ফলে পুঁজিবাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অর্থনীতিসহ সমগ্র ব্যবস্থাকে ক্রমাগত সবলতর করার জন্য যে নিরন্তর প্রস্তুতি, সতর্কতা, আত্মসমীক্ষা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত ছিল, সে ব্যাপারে কার্যকরী তৎপরতা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি দেখায়নি। অথচ অর্থনীতির প্রধান দুই ক্ষেত্র—কৃষি ও শিল্প নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি পার্টি কংগ্রেসে ব্যাপক আলোচনা চলেছে। তার মধ্যে কৃষি প্রসঙ্গের আলোচনাকে কার্যত সংকটের প্রথম লক্ষণ হিসাবে এখন চিহ্নিত করা চলে। অনুরূপ প্রতিফলন পাওয়া গিয়েছিল চীন ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কংগ্রেসেও। তাছাড়া শিল্প প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচীর নানা পরিবর্তনও সেখানে ঘটেছে বারে বারে। বৃহত্তর অগ্রগতির লক্ষ্যের দাবী জানিয়ে এইসব পরিবর্তন কার্যকালে সত্য বলে প্রমাণিত হলে সমাজতন্ত্রের নবায়নের কর্তব্য অনেকটাই সাধিত হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। বরং পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীরা ষাটের দশক থেকে সোভিয়েত উৎপাদনের সমস্যা ও সংকটের কথা বলছিলেন। সেগুলিকে তখন নিছক সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েত সামরিক শক্তির প্রবল সাফল্যকেই সমাজতন্ত্রের বিপুল অগ্রগতি বলে বিশ্বের মানুষ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিন দশক আগে শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্রের আর্থিক ও সামাজিক সংকট। এসব চাপা দেওয়ার জন্য সমাজতন্ত্রের 'অনুন্নত স্তর', 'উন্নত স্তর' প্রভৃতি মূল্যায়নমূলক নানা ব্যাখ্যা ও কর্মসূচী গ্রহণ দেশগুলির প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমগ্র উৎপাদিকা-শক্তির পরিস্থিতির প্রকৃত বিশ্লেষণের পরিবর্তে যান্ত্রিকভাবে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সমাজের রুচি ও চাহিদার বিকাশমান চরিত্র অনুধাবন না করে রাষ্ট্রক্ষমতায় কর্তৃত্বকারীদের দৃষ্টিভঙ্গিমত মোটামুটি একই ধরনের পণ্যের দ্বারা জনগণের চাহিদা পূরণের ক্ষমতাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান উৎপাদন-লক্ষ্য হিসাবে ধরে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যকালে এ বিষয়েও ব্যর্থতা ঘটেছিল প্রবলভাবে। কেননা সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদনে মন্দা সৃষ্টি হতে থাকে এবং উত্তরোত্তর তা' বেড়ে চলে। মানুষের রুচি ও চাহিদা পূরণ হওয়া দূরের কথা ধীরে ধীরে দেশগুলিতে গণ-ভোগ্য পণ্যের অভাবও ঘটছিল। ফলে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও অর্থনীতিকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে অনুভব ও গ্রহণ করার পরিবর্তে মানুষের মনে অসচেতনভাবে ধীরে ধীরে অনীহা গড়ে উঠেছিল সমাজতন্ত্র সম্পর্কে। পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে বলয় করে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-মাধ্যমগুলির ধনতান্ত্রিক দেশগুলির জীবনযাত্রার বাহুল্য ও প্রগলভতার বিপুল প্রচার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মানুষদের ধীরে ধীরে পুঁজিবাদের প্রতি আকৃষ্টও করতে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক মানুষ গঠনে ব্যর্থতা

বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীরা তথ্য-প্রমাণসহ এখন দেখাচ্ছেন যে সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ার কাজ কার্যত দেশগুলিতে ধীরে ধীরে অবহেলিত হতে হতে শূন্যে পৌঁছেছিল। স্কুল-কলেজে ঘটা করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়ানো দাঁড়িয়েছিল নিছক আনুষ্ঠানিকতায়; এ বিষয়ে শিক্ষাদান এক ধরনের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল। ছাত্রদের অধিকাংশ ক্যারিয়ার তৈরির অন্যতম শর্ত হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিল। কেননা এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রিক; চাকুরী, উন্নতি ইত্যাদির অন্যতম পরোক্ষ শর্ত হয়ে উঠেছিল এই ধরনের কোর্সগুলি। এই শিক্ষার কোন কার্যকরী সামাজিক প্রয়োগ ছিল না। মার্কসবাদী শিক্ষাকে জীবন ও সমাজে সর্বাত্মকভাবে প্রয়োগের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকেও সক্রিয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। জীবনের সর্বন্যূন চাহিদা—খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা,

শিক্ষা, আবাসন, বৃত্তি প্রভৃতি মিটেছিল সাধারণ মানুষের। কিন্তু মানুষের জীবনের চাহিদা কেবল জৈবিক নয়, একই সাথে মানসিকও বটে। জৈবিক চাহিদা পূরণ যত হতে থাকে, মানসিক চাহিদা তত বৃদ্ধি পায় সাধারণত। প্রথমদিকে সমাজতন্ত্র যথার্থভাবে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিগত চাহিদা ক্রমাগত সৃষ্টি করতে সক্ষমও হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ার কাজে তাই তখন ছিল লক্ষণীয় অগ্রগতি। সমাজতন্ত্রকে রক্ষা ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য দেশগুলির মানুষেরা যেমন অকাতরে আত্মত্যাগ করেছিলেন, অন্যদিকে সৃষ্টির সর্বাত্মক কাজে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছিলেন। কিন্তু, পঞ্চাশ দশকের পরবর্তীকালে পার্টি, গণসংগঠনগুলি ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানসিক চাহিদা মেটানো তথা উন্নত বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার কাজ ক্রমাগত নিম্নগামী হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিম্নগামী হয়েছে সমাজতান্ত্রিক মানুষ হয়ে উঠার জন্য প্রবণতা ও উদ্যোগ। এদিকে এই শূন্যতা ও অন্যদিকে ব্যবস্থা হিসাবে দেশের জনগণকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে সমাজতান্ত্রিক মানুষদের মানসিক চাহিদার তাড়না অনিবার্যভাবেই বহির্বিশ্বের তথা পুঁজিবাদের দিকের আকর্ষণকে দুর্নিবার করেছে। একেও পরিপূর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছিল বিশ্ব-পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদ। ভেতরে ও বাইরে থেকে তারা আধুনিক ও অন্তর্ভেদী প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে ক্রমাগত আগ্রাসন চালিয়ে গেছে। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মানুষের মধ্যে পুঁজিবাদী মানুষ হওয়ার আকাঙক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছিল; পাশাপাশি অর্থনীতির সংকট সমাজতন্ত্রে যতই বেড়েছে পরোক্ষে তা' সমাধানের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে রসদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা রাষ্ট্র ও পার্টির পক্ষ থেকেও চলেছে। এইরকম পৌন:পুনিক প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক মানুষ গঠনের বিরুদ্ধেই গড়ে উঠছিল একধরনের অন্তর্লীন স্রোত।

ভিত্তি ও উপরিসৌধের মধ্যে বিরোধের ফল

কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর একটি সংস্করণের মুখবন্ধে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস সমাজের ভিত্তি হিসাবে অর্থনীতিকে একমাত্র নির্ধারক ও তদনুযায়ী গুরুত্ব দেবার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কালে যে অনিবার্য প্রয়োজন থেকে লেনিন অর্থনীতিকে তত্ত্ব ও কর্মে গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সে বিষয়ে এবং এঙ্গেলসের সতর্কীকরণের তাৎপর্য যথার্থভাবে অনুধাবন ও তার ভিত্তিতে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। তিরিশের দশক থেকে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ একে 'ইকনমিক ডিটারমিনিজম' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, উপরিসৌধও কোন কোন সময় শক্তিশালী ভূমিকা নিয়ে বেদীকে তথা অর্থনীতির উপর প্রবল প্রতিফলন ঘটাতে পারে। বিপর্যয়ের পর এখন এক উল্লেখযোগ্য অংশের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা সেই আলোচনা-সমালোচনাকে হাজির করেছেন। তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য হলো অর্থনীতিতে উৎপাদনের পরিমাণ জাহির করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি উপরিসৌধ তথা সমাজের অন্যান্য সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলিকে উপেক্ষা করে গিয়েছে—যেমন রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজিক সম্পর্ক, জাতিসত্তা, মানবিকতা, উপজাতি, নারী সমাজ প্রভৃতি। সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপরিসৌধে জমে ওঠা সমস্যা ও সংকট, যা কার্যত উপেক্ষিত হয়েছে, তাও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে তথা অর্থনীতিকে সংকটাপন্ন করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কংগ্রেসগুলির রিপোর্ট ও আলোচনা এখন গভীরভাবে অনুসরণ করলে বোঝা যাবে যে উপরিসৌধের যথার্থ সমস্যা বা সংকট সমাধান দূরের কথা, তেমনভাবে চিহ্নিতও হয়নি। বরং ফর্মুলামাফিক, বেদীর সবলতার সাফল্যের ভিত্তিতে বর্ধিত বাগাড়ম্বর করা হয়েছে উপরিসৌধ সম্পর্কে। তার চেয়েও বড় কথা উপরিসৌধ নির্মাণে অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা বা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা' নিছক দৃশ্যমান বাস্তবতার ভিত্তিতে। আসলে উপরিসৌধের ক্ষয় নির্ধারণ করা অর্থনীতির ক্ষয় নির্ধারণের চেয়ে অনেক বেশি জটিল ও কঠিন কাজ। কেবল পরিসংখ্যানগতভাবে তা' নির্ণয় করা যায় না। যে নিবিড় ও ব্যাপকভাবে উপরিসৌধকে অবলোকন ও পরিচর্যা করতে হয়, কমিউনিস্ট পার্টির তাতে ভাঁটা পড়ছিল অনেক আগে থেকে। অথচ সংকট এখানে বাড়ছিল জ্যামিতিক হারে। তাই বিপর্যয়কালে উপরিসৌধ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে বেদীকে চূর্ণ করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দুর্বলতা

বিপর্যয় সম্পর্কে মূল্যায়নে সচেষ্ট অনেকের অভিমত হলো যে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র হওয়ার পরিবর্তে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্রতার বিকল্প হতে পারে না। তাছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্বরূপ স্থির নয়; পরিস্থিতি ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও অগ্রগতির সাথে পরিবর্তনশীল এবং ক্রমশ উন্নত চরিত্রের হয়ে ওঠার কথা। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্বরূপ ও পরিবর্তন, বহুলাংশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেণী-শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। এটা সত্য যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে কমিউনিস্ট পার্টিই রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু ক্রমে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যক্ত হয়েছিল। কেবলমাত্র পার্টির দ্বারা সরকার পরিচালনার ব্যবস্থার পরিণামে সরকার পরিণত হয়েছিল পার্টির একনায়কত্বে। পার্টির নেতারা হয়ে উঠেছিলেন সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীয় শক্তি ও আধার। অথচ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে ভিন্ন মত পোষণের অধিকার স্বীকৃত থাকার কথা। কেননা এটি হলো সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্যতম উপাদান। লেনিনের কাল পর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগের চেষ্টা চলেছিল। তাঁর কালে গণতন্ত্রের এই সুযোগ নিয়ে পার্টি ও সরকারে নানা চরিত্রের শক্তি, এমনকি প্রচ্ছন্ন সমাজতন্ত্র-বিরোধীরা মাথা তোলার চেষ্টা করলেও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহার করে লেনিন তাদের পরাস্ত ও বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলেন গণতান্ত্রিক পথেই। ভিন্নমত থাকার জন্য বিপ্লব, পার্টি, সমাজ ও সরকার দুর্বল তো হয়ইনি, বরং শক্তিশালী হয়েছিল। সমাজতন্ত্র গঠনে স্তালিনের অবিস্মরণীয় অবদান সত্ত্বেও সোভিয়েত রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত কর্তৃত্বের অধিকার ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ক্ষয়ের প্রবণতা শুরু হয়। পরবর্তীকালে, এমনকি যাঁরা স্তালিনকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন, তাদের হাতেও এই ভ্রান্ত প্রবণতা বেড়ে চলেছিল। ফলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় স্তরে জনগণের স্বেচ্ছা-অংশগ্রহণের উদ্যোগ ও সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। এই বাস্তবতা নানা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে বিকৃতি বাড়িয়ে চললো। কমিউনিস্ট পার্টিতে ক্রমবর্ধমান ও শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন ও রাষ্ট্রীয় স্তরে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব, সমাজতান্ত্রিক আইন-ব্যবস্থার লঙ্ঘন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকার খর্বিত হওয়া প্রভৃতি ছিল পূর্ব-সৃষ্ট প্রক্রিয়ার ফলাফল। কমিউনিস্ট পার্টির উর্ধ্বতনসহ একটা স্তরের নেতৃত্ব, সরকারী আমলা, পরিকল্পক, অর্থনীতিবিদ, ব্যবস্থাপক, সামরিক বাহিনীর কমাণ্ডার প্রভৃতি অংশ সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা সুবিধাভোগী গোষ্ঠীতে পরিণত হতে হতে কার্যকালে এক নতুন ধরনের শ্রেণীতে যেন পরিণত হয়ে যায়। জনগণের কাছে এদের চরিত্র শোষক হিসাবে প্রতিভাত হতে থাকে। এই তথাকথিত নতুন শ্রেণীর প্রাপ্ত বস্তুগত, রাজনৈতিক, অধিকারগত প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধাগুলির সাথে জনগণের প্রাপ্ত সুযোগ, অধিকার ও কর্তৃত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বিপ্লবের অব্যবহিত পর সাফল্যকে রক্ষা ও সংহত করার সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কঠোরতার জন্য সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সুযোগ রুদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তাকে কিছুকালের জন্য স্বীকার করে নেওয়া যায়। কঠোরতার নীতিকে এই পর্বে জনগণ স্বীকারও করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পর্ব শেষ হওয়ার পর বিশেষত জার্মানির আক্রমণকে পরাস্ত করার পর পরিকল্পিতভাবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটানো অনিবার্য ছিল। কিন্তু সেই পরিবর্তনে কোন কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই বিচ্যুতিগুলি রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জনগণের বিচ্ছিন্নতার অন্যতম প্রধান কারণে পরিণত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে আত্মীয়তা ও শ্রদ্ধা গভীরতর হওয়ার পরিবর্তে জনগণের মনে প্রথমে বিচ্ছিন্নতা, তারপর অনীহা, ক্রমে বিরূপতা এবং পরিশেষে সৃষ্টি হয়েছিল বিরুদ্ধতা। সমাজতন্ত্রের সবল অস্তিত্বকালের শেষের দিক পর্যন্ত জনগণের মধ্যে যে আনুগত্য দেখা যেতো, তা' আসলে ছিল ভীতির মানসিকতা এবং যান্ত্রিকতার বহিঃপ্রকাশ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এই বিকৃতি এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সহজাত আকর্ষণ, কার্যকালে অপকৃষ্ট বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও ব্যবস্থার প্রতি টানকে দারুণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমি সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণও বাড়ছিল। এইভাবে পুঁজিবাদী

ব্যবস্থার দর্শন, সবার অলক্ষ্যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্থান করে নিয়েছিল। পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বারে বারে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ ছিল এগুলি। ফলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আকর্ষণে প্রথম সুযোগেই সোভিয়েতসহ পূর্ব ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশে মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। প্রতিবিপ্লবী শক্তি যখন চক্রান্ত করেছে, সরকার দখল নেবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং তা' রূপায়ণ শুরু করেছে তখন মানুষ সেগুলির সহযোগী হয়ে পড়েছেন;আক্রান্ত সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণী বা সমাজের কোন অংশের মানুষকে পাওয়া যায়নি।

পার্টি ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাবলীতে গোঁড়ামি বা বিপরীত দিকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি কেবল অন্তঃশক্তিকেই বিনষ্ট করছিল না, নেতৃত্বদায়ী শক্তির এই পচন সমগ্র সমাজে সংক্রামিত হয়েছিল নানা পর্বে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পার্টি সদস্য সংখ্যা পরিমাণগত দিক থেকে ক্রমাগত বেড়ে চললেও গুণমানের বিচারে তা' গণ-চরিত্র গ্রহণ করে চলেছিল। সমগ্র সমাজের নেতৃত্বদায়ী শক্তি, সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে আত্মত্যাগী এবং সাধারণ মানুষের নির্ভরতা ও আস্থার শক্তি হওয়ার পরিবর্তে কমিউনিস্ট পার্টি গণ-মানসে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছিল। পার্টি ও সরকার হয়ে উঠেছিল সমার্থক। ফলে সরকারের সমস্ত ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার জন্য জনগণ মানসিকভাবে দায়ী করছিল পার্টিকে। ধীরে ধীরে নিজস্ব ভূমিকা ও স্বকীয়তা অপসারিত হয়ে, সরকারী কর্মসূচী প্রণয়ন ও রূপায়ণের এজেন্টে পার্টি পরিণত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিশাল কর্মযজ্ঞে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, প্রযুক্তিবিদ, ব্যবস্থাপক ইত্যাদি বুদ্ধিজীবী অংশের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সরকার তথা পার্টির নেতৃত্বে উঠে এসেছিল এইসব অংশই, যাদের অনেকেরই অতীত জীবনে জনগণের সাথে উল্লেখ্যযোগ্য সংযোগ ছিল না, ছিল না পরিচিতি। এইভাবে বহু ক্ষেত্রে প্রকৃত কমিউনিস্টরা পিছনে পড়ে যাচ্ছিল। ফলে কেবল সংখ্যার দিক থেকে নয়, মর্মবস্তুর দিক থেকেও কমিউনিস্ট পার্টি প্রবেশ করেছিল রূপান্তরের প্রক্রিয়ায়। এই প্রসঙ্গে কিছু বাম-বুদ্ধিজীবী সম্প্রতি মার্কসের অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বের সম্প্রসারণ করে বলার চেষ্টা করেছেন যে, পুঁজিবাদী উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেও শোষণের পরাক্রমে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রমজীবী যেমন একাকীত্বে আত্ম-নির্বাসিত হয়, তেমনি পার্টির প্রতি একদা সার্বিক সমর্থন দেওয়ার মধ্য দিয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেও পার্টির এই পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে পার্টি থেকে অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতা গড়ে দিচ্ছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই অ্যালিয়েনেশন অব লেবার যেমন বিপ্লবের প্রতিমূর্তিতে ফিরে আসে, সমাজতান্ত্রিক দেশে পার্টি ও সরকার থেকে জনগণের বিচ্ছিন্নতা অনেকটা যেন ফিরে এসেছিল প্রতিবিপ্লবের রূপ নিয়ে—তবে নিঃশব্দে। সশস্ত্র বিপ্লবের চেয়েও এটা অনেক বেশি তীব্র ও ভয়ঙ্কর ছিল; কেননা সশস্ত্র বিপ্লব জানান দিয়ে আসে কিন্তু শেষোক্তটি এসেছিল কোন প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই—নিঃশব্দে।

আদর্শগত চেতনার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ব্যবস্থা হিসাবে পার্টি সদস্যদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাটুকু ছাড়া কালক্রমে রাজনৈতিকতা, জনগণের প্রতি আচার-আচরণ, জনগণের সাথে একাত্ম থেকে কাজ করা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে অবদান সৃষ্টি, নিজ নিযুক্তিগত দায়িত্ব পালন প্রভৃতিতে পার্টি সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। পার্টি সদস্যদের কাজের সার্বিক বিচার, মূল্যায়ন প্রভৃতি পার্টিতে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। লেনিনবাদী পার্টির প্রধান সাংগঠনিক নীতি—গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে প্রায় একটানা চলেছে গণতন্ত্রহীন কেন্দ্রিকতা। পার্টিতে কার্যত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির গুণকীর্তন প্রত্যেকটি পার্টি কংগ্রেসে করা হলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রায় বিলুপ্ত করা হয়েছিল ধীরে ধীরে। ফলে জো-হুকুমের ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যই পার্টিতে প্রধান হিসাবে বিবেচিত ও পুরস্কৃত হতে শুরু করেছিল কার্যকালে। আবার পূর্ব ইউরোপীয় কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের পার্টিতে মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়েছে কেন্দ্রিকতাহীন অবাধ গণতন্ত্র। পূর্ব ইউরোপীয় কোন কোন দেশের পার্টিতে এবং গরবাচভের

কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে। কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী সাংগঠনিক মর্ম এইভাবে দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল। পরিমাণগত ক্ষয়ের চিহ্ন পার্টিতে না থাকায় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে পার্টি সদস্যদের কর্তৃত্ব ও দাপট ক্রমাগত বেড়ে চলায় পার্টির অন্তর্লীন গভীর ও ব্যাপক ক্ষয় ধরা পড়েনি ধসে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত। পার্টির নেতা ও সদস্যদের সাধারণ মানুষের সাথে আমলাতান্ত্রিক আচরণ, কমিউনিস্টদের জীবনযাত্রার মানে কিছুটা ভোগবাদিতার চিহ্ন ও আড়ম্বর অথচ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-সামাজিক কাজে কমিউনিস্টদের যোগ্যতার অভাব, জনগণের সমালোচনার প্রতি উপেক্ষা, জনগণের সাথে নিত্য ঘনিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে যাওয়া, হুকুমদারী করার প্রবণতা, ক্ষেত্র বিশেষে দুর্নীতি ও সুবিধাবাদ, কমিউনিস্টরা অন্যায় করলেও শাস্তি না পাওয়া প্রভৃতি ভয়ঙ্কর উপসর্গগুলির পার্টির সর্বস্তরে আত্মপ্রকাশ ক্রমে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা ও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ঘৃণার মনোভাব জনগণের মধ্যে গড়ে তুলেছিল।

শ্রমিকশ্রেণী, শ্রম-শৃঙ্খলা, কাজের সময়ের ব্যবহার প্রভৃতি দিকের প্রভাব

সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী, শ্রম-শৃঙ্খলা ও কাজের সময়ের ব্যবহার-এর নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও বুর্জোয়া উদারনীতিক সমাজ-তাত্ত্বিকদের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধ থেকে (উদাহরণ হিসাবে সলোমন স্চাওয়ার্জ রচিত 'লেবার ইন সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫১', পুস্তকটিকে প্রথম পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আলোচনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়) শুরু হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের ক্ষেত্রে উৎপাদনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা প্রসঙ্গে বর্তমান আলোচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে চিন্তা-উদ্রেককারী উপাদান। এ বিষয়ে ডোনাল্ড ফিল্টজার, সেইলা ফিটজপ্যাট্রিক, উইলিয়ম জি. রোজেনবার্গ ও লিউইস, এইচ. সেইগেলবাউম, সারা ডেভিস, ডেভিড ওস্ট, ডরোথি উইয়ারলিং, মিচেল বুরাভয়, ওয়াস্টার ল্যাকয়ার, রোনাল্ড, গ্রিগর সানি প্রমুখের ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রকাশিত আলোচনা ও পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য।

রুশ-বিপ্লবে, পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুরু কালের নির্মাণে, নারীবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে দেশে ও আন্তর্জাতিক স্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুবিশাল ভূমিকাতে সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। এই সত্যকে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে উৎপাদনে ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বলতা, যা ক্রমে ক্রমে ব্যবস্থার অংশে এবং সমস্যা থেকে সংকটে পরিণত হয়েছিল, সে বিষয়ে খুব কার্যকরী দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, ভূমিকাও নেওয়া হয়নি। প্রাক-বিপ্লব রুশ সমাজের অভ্যন্তরেই এই দুর্বলতা ও সমস্যার কারণ অনেকাংশে নিহিত ছিল। সেভিয়েত-বিপ্লবের প্রথম পর্ব সামান্য কিছু শহর এলাকা জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিপ্লব-পূর্বকালে বলশেভিক পার্টির কাজের এলাকাভুক্ত অংশে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাও তেমন বিশাল ছিল না। বিপ্লব ক্রমশ দীর্ঘসময় জুড়ে প্রসারিত হতে হতে দেশের ব্যাপকতম শ্রমিকশ্রেণীকে যুক্ত করেছিল। ফলে বিপ্লবের প্রক্রিয়াতেই শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে বিপ্লবী চেতনা ও রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে থেকে গিয়েছিল ব্যবধান। তাছাড়া বিপ্লব-পূর্বকালে রাশিয়া পশ্চাৎপদ দেশ হওয়ায় শিল্প-শ্রমিকের মোট সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট নগণ্য। ফলে পুরাতন ও পরবর্তীকালে প্রসারিত শ্রমিকশ্রেণীর মানসিকতায় ও গঠনে তৈরি হয়েছিল নানা পার্থক্য। বিশের দশকের শেষার্ধে কৃষিতে বাধ্যতামূলক যৌথকরণকে (কালেক্টিভাইজেশন) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষক বিরোধিতা করেছিল। নতুন করে শিল্প গঠন ও প্রসারের প্রত্যেকটি স্তরে এই কৃষক-সমাজ থেকেই ক্রমান্বয়ে শ্রমিকরা এসেছিল। ফলে বিরোধিতার পূর্বতন মানসিক উপাদান, অংশত হলেও, এদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। শিল্পায়নের শুরু থেকে সেই বিরোধিতার কিছু লক্ষণ শ্রমিকদের মধ্যে দেখা গেছে। ফলে বিপ্লবোত্তর শ্রমিকশ্রেণীর গঠনের প্রক্রিয়াতে সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল এই নেতিবাচক উপাদান।

উৎপাদন ও শ্রম-শৃঙ্খলার স্তরে ১৯২৮ সালের পরবর্তীকাল থেকে যে লক্ষণগুলি ক্ষুদ্রাকারে ফুটে উঠছিল তা' হলো শিল্প-ব্যবস্থায় যন্ত্রব্যবস্থার পশ্চাৎপদতার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ একদিকে, অন্যদিকে ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিত হওয়ার (অ্যাবসেন্টিজম) অভ্যাস; তার সাথে শ্রমিকদের কিছু অংশের মধ্যে মদের নেশা, উৎপাদন ও কাজের গতির মধ্যে প্রচণ্ড উত্থান-পতন, কখনো কখনো নিবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী ওভার-টাইম, এই ধরনের পরিস্থিতিতে শ্রমের সময় নষ্ট হওয়া, উৎপাদনের মানের ব্যাপারে সাধারণভাবে উপেক্ষার মনোভাব ইত্যাদি। প্রথম থেকে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে শ্রমিকদের সচেতন ও রাজনীতিকীকরণের চেয়েও বেশি ভর পড়ে যায় রাষ্ট্রীয় আইনি পথ ও দমনমূলক ব্যবস্থাপনার উপর। শিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়ায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকদের সামনে বড় সুযোগ ছিল এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যোগদানের। এই সমস্ত দিকগুলির বিরুদ্ধে যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রথম দিক থেকে গৃহীত হচ্ছিল তার কিছু হলো ঃ ২০শে অক্টোবর, ১৯৩০, ডিক্রি ঘোষণা করে যেসব শ্রমিকরা অন্য প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে এসেছে তাদের নিয়োগ বেআইনি করা হয়; ১৫ই নভেম্বর, ১৯৩২ তারিখে ডিক্রি জারি করে অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত শ্রমিককে কাজ থেকে বরখাস্ত, প্রতিষ্ঠানের আবাসন থেকে উচ্ছেদ ও র‍্যাশন কার্ড বাতিল এবং নভেম্বর ১৯৩২-এ ও ডিসেম্বর ১৯৩৮-এ অনুপস্থিতি-প্রবণতার বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হলো আরও কঠোর ব্যবস্থা। ২৬শে জুন, ১৯৪০-এ অনুপস্থিতি প্রবণতা ও প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাওয়াকে দুষ্কৃতিমূলক কাজ ঘোষণা করে কঠোর শাস্তির নির্দেশ জারি হলো। বারবার ও মার্ক হ্যারিসন তাঁদের আলোচনাতে দেখিয়েছেন যে ১৯৪১-৪৫ সালের মধ্যে বছরে ১০ লক্ষ শ্রমিককে অনুপস্থিতি-প্রবণতার জন্য এবং প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাওয়ার জন্য আরও ২ লক্ষ শ্রমিককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। শেষোক্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে প্রাভদা, ত্রুদ ও ইজভেস্তিয়া পত্রিকা থেকে। এই আইনগুলি প্রয়োগ ও ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে পূর্বোক্ত সমস্যাগুলির যেমন চিহ্ন রয়েছে, তার চেয়েও বড় বিষয় হলো যে সোভিয়েত উৎপাদনে একাংশ শিল্প-শ্রমিকের মানসিক ও কার্যকরী বিরোধ প্রতিফলিত হচ্ছিল।

স্তালিনের নেতৃত্বকালে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় (১৯২৮-৩২) দ্রুত শিল্পায়নের তাগিদে শ্রম-শক্তির বৃহত্তম অংশকে সংগ্রহ করা হয়েছিল কৃষকসমাজ থেকে এবং যাদের অধিকাংশ তখনো পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও পূর্ববর্ণিত কারণে বহুলাংশে মানসিকভাবে বিরোধী ছিল। তাছাড়া শিল্প-ব্যবস্থার কঠোর ধরনের শ্রম তাদের কাছে কেবল অপরিচিতই ছিল না অনেকটাই অসহনীয় ছিল। তদুপরি লেনিনের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টি ও রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে স্তালিনকে দারুণ জটিল ও প্রতিকূল ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল, যার প্রভাব পড়েছিল সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রসহ শ্রমিকশ্রেণীর উপর ও উৎপাদনে। এই সময়ে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় শ্রমবাহিনীর স্বল্পতার সাথে যুক্ত হয়েছিল জনগণের জীবনযাত্রার মানের অধোগতি। তার ফলে, কিছুটা উন্নত মজুরি, বাসস্থান, র‍্যাশন ও কাজের পরিবেশের অন্বেষণে গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু হয়েছিল ব্যাপক সংখ্যক মানুষের শহরে গমনের প্রক্রিয়া। সেভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পে এই সময়ে যুক্ত হতে থাকা নতুন শ্রমিকরা সামাজিক শ্রেণী-উদ্ভবের বিচারে কৃষক, গ্রামীণ ও পশ্চাৎপদ এবং তার ফলে গ্রামীণ জীবনের বন্ধনহীন পরিবেশের প্রভাবে বহুলাংশে উচ্ছৃঙ্খল ছিল। এইরকম প্রতিকূল ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন শ্রমিকশ্রেণীকে মতাদর্শ-ভিত্তিক উদ্যোগী করার ক্ষেত্রে সমস্যা ও ব্যর্থতাকে সামাল দিতে আইনি ও দমনমূলক পথ নিতে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছিল। শুরুর এই রেশ, কমবেশি, শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। এই ঘটনাবলী থেকে যে উপাদানটি গ্রহণ করা চলে তা' হলো সমাজের নেতৃত্বদায়ী শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক সচেতন করার ক্ষেত্রে শুরু থেকে কিছু ব্যর্থতা সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির ছিল।

স্তালিনের জীবনের শেষ দিকে (১৯৫১-৫২) পূর্বোক্ত সরকারী আইনগুলি শিথিল করা হয় ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যোগদান বৃদ্ধি পায় এবং শাস্তিদানের সংখ্যাও নেমে যায়।

তার অন্যতম কারণ হলো, এই পর্বে সোভিয়েত শিল্প যথেষ্ট সংহত হয়ে উঠেছিল, শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম প্রজন্মের অবসান হয়েছে এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানও বহুলাংশে হয়েছিল উন্নত। ১৯৫৬ সাল থেকে খ্রুশ্চভের নেতৃত্বে এবং নি-স্তালিনীকরণের প্রক্রিয়ার কালপর্বে, যদিও বছরে ১৭ শতাংশ শ্রমিক কাজ পরিবর্তন করতো, তথাপি শ্রম-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছিল। শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল যে তাদের দুর্দশার কারণ স্তালিন ও তাঁর সৃষ্ট দমনমূলক ব্যবস্থাসমূহ। এটা প্রমাণ করার অন্যতম উদ্দেশ্যে পূর্বের আইনগুলি প্রত্যাহার করে, বরখাস্ত করার আগে শ্রমিককে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকতর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ব্যবস্থাগুলির ফলে কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও, ভিন্ন দিক থেকে সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে উঠতে থাকে। সাইবেরিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের উন্নয়নের জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, টেকনিসিয়ান ইত্যাদি পাঠানো হয়েছিল, সেখানে পাকা রাস্তা, বাসস্থান ও অন্যান্য পরিকাঠামোর অভাব ও সমস্যার ফলে, তারা কাজ ছেড়ে চলে যেতে থাকে ব্যাপক সংখ্যায়। অতীতে এইসব এলাকার শিল্প গঠন ও উৎপাদন প্রধানত নির্ভরশীল ছিল শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষদের দ্বারা বাধ্যতামূলক শ্রমে। কিন্তু শেষোক্ত ঘটনাবলী কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে। দ্বিতীয়ত, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে খ্রুশ্চভের নতুন মজুরি-নীতি (১৯৫৬-৬২) মেশিন টুলস অপারেটরদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি করে, যার ফলে ব্যাপকভাবে কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া শুরু করে এই শ্রমিকরা। এইভাবে জাতীয় অর্থনীতির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় কঠিন প্রতিবন্ধকতা। তৃতীয় সমস্যা দাঁড়ায়, স্তালিনীয় নীতি থেকে সরে আসার নামে খ্রুশ্চভ শ্রম-বাজার গঠনের ব্যবস্থা প্রত্যেক শ্রমজীবীকে কাজে নিযুক্ত থাকার অধিকারের নিশ্চিত সুযোগ দেওয়ায় শ্রমিকদের ইচ্ছামত ও যখন তখন কাজ ছেড়ে নতুন কাজে যাওয়ার প্রবণতা প্রচণ্ড মাত্রা অর্জন করে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবে প্রায় প্রত্যেকটি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ফলে দারুণ দুর্বল হয়ে যায় 'ওয়ার্কার্স-ম্যানেজমেন্ট রিলেশনস' তথা শ্রমিক-ব্যবস্থাপক সম্পর্ক। বিশাল সোভিয়েত শিল্প-ব্যবস্থায় শ্রমিকের অব্যাহত অনিশ্চয়তা বা স্বল্পতার সুযোগ নিতে থাকে শ্রমিকদের কোন কোন সুবিধাবাদী অংশ, নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে।

ব্রেজনেভের নেতৃত্বের কালে পরিস্থিতির কিছুটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু হয়েছিল পূর্ব অবস্থায় ফিরে গিয়ে। কিন্তু এই সময়ে দেখা দিতে থাকে নতুন ধরনের উপসর্গ। উৎপাদন ও বণ্টনের স্তরে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এটা ঘটতে থাকে নির্মাণের সামগ্রী ও যন্ত্রাংশের সরবরাহে ঘাটতি, কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ 'ব্যাচেস অব প্রোডাকশন' ও সরবরাহকৃত নির্মাণ যন্ত্রের নিম্নমান ও গণ্ডগোল, মাঝে মাঝেই নির্মাণযন্ত্র অকেজো হয়ে যাওয়া, যন্ত্রর ত্রুটি সারাই-এর কাজে বিপুল সময়ের অপচয়, কোন কোন শিল্পে ত্রুটিপূর্ণ ও নিম্নমানের পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন প্রভৃতির ফলে। এই ধরনের অবস্থার জন্য তিনটি প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটতে থাকে : প্রথমত, প্রতি একক উৎপাদনের জন্য বেশি শ্রম-শক্তির দরকার দেখা দেয়; দ্বিতীয়ত, উৎপাদন অনিয়মিত হওয়ার আশঙ্কায় এবং নির্ধারিত উৎপাদন-লক্ষ্য পূরণ করার জন্য প্রতিটি শিল্পে রাখতে হয় বাড়তি স্থায়ী শ্রমিক এবং তৃতীয়ত, সব সময়ে শ্রম-সরবরাহে ঘাটতি থাকার ফলে 'লেবার-প্রসেস' বা শ্রম-প্রক্রিয়াতে ও 'প্রোডাকশন-প্রসেস' বা উৎপাদন-প্রক্রিয়াতে, নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থের ভিত্তিতে শ্রমিকরা হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করার কিছুটা সুবিধাবাদী মনোভাব হাসিল করার সুযোগ পেয়ে যায়।

গরবাচভের 'পেরিস্ত্রৈকা'র অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতিতে পূর্বোক্ত সমস্ত নেতিবাচক দিকগুলির অপসারণ এবং ব্যবস্থাপক-শ্রমিক সম্পর্কের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে শ্রম-গতিশীলতা সৃষ্টি ও অপ্রতিহত শ্রম-বাজার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থায় বেকারীর সম্ভাবনা ও তা' নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিরোধক রণনীতিও গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সমস্যাগুলি সমাধানের পরিবর্তে বৃহত্তর সমস্যা নেমে আসে। কারখানা থেকে উদ্বৃত্ত-শ্রম ছাঁটাই করার পরিকল্পনাতে দেখা গেল যে তেমন উদ্বৃত্ত-শ্রম নির্ণয় করা গেল না, ফলে পূর্বাবস্থা বহাল থাকলো; যারা উদ্বৃত্ত বলে ঘোষিত হলো, পরবর্তীকালে তাদের একই কারখানায় করা হলো পুনর্নিয়োগ। অল্প অল্প করে যাও বা ছাঁটাই করা

হচ্ছিল, তাতে ১৯৯০ সাল নাগাদ শিল্পে শ্রমিকের ঘাটতি নিয়মিত চরিত্র নিল। তাছাড়া দু'টি উপাদান সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রথমত, রাষ্ট্রের দ্বারা ব্যক্তিগত কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা আইনি বলে স্বীকৃত হওয়ায় এবং সেগুলিতে উন্নত মজুরি বা উন্নত চাকুরীর শর্তাবলীর সুযোগ নিতে দক্ষ ও অদক্ষ শিল্প-শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে ঐসব ক্ষেত্রে যোগ দিতে শুরু করেছিল। তার ফলে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে দারুণ সংকট সৃষ্টি হতে থাকে শ্রমিক ঘাটতির জন্য। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের পুঁজিসংগ্রহ, সমস্ত ব্যয় নির্বাহ ও পুনর্বিনিয়োগ করে উৎপাদন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ফলে শ্রমিকের স্বল্পতা কাটাতে এবং পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে উন্নত উৎপাদন করে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও লাভ করার উদ্দেশ্যে শ্রম-সাশ্রয়কারী উন্নত যন্ত্র ক্রয় করার জন্য পুঁজির দরকার হয়। শিল্প-সংস্থাগুলিতে তার টান পড়ে। অন্যদিকে এই ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রের মান সোভিয়েত ইউনিয়নে নিম্ন হওয়ায়, ব্যবস্থাপকরা ঐ ধরনের যন্ত্র ক্রয়ে টাকা বিনিয়োগ করে কোন সুফল পাবে না মনে করে বিনিয়োগে উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু এইগুলির থেকেও বড় কারণ নিহিত ছিল অন্যত্র। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বনির্ভর হওয়ার নীতি রূপায়িত করতে ব্যবস্থাপকরা প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়াতে উৎপাদন ছাঁটাই ও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করার পথ নেয়। প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হওয়ায় বেশি মজুরি দিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ ও রক্ষণ শুরু হয়। এজন্য আয়ের বড় অংশ ব্যয়িত হতে থাকে। অন্যদিকে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জনগণসহ শ্রমিকদের মধ্যে বিরূপ মনোভাবও বাড়াচ্ছিল। মূল্যবৃদ্ধির জন্য শিল্প-উৎপাদনের মজুরির খাতে চাপ বাড়ে। পেরিস্ত্রৈকার নীতি গ্রহণের পরও বেকার হওয়ার ভীতি না থাকায়, শ্রমিকদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করার প্রত্যাশিত শর্তও অর্জিত হলো না।

শিল্পে কর্ম-সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহারের ব্যর্থতাও ঘটছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। শ্রমিকদের কর্ম-সময়সূচী ছিল প্রায় প্রথম থেকে অনেকটা ঢিলেঢালা। শ্রমিকদের মধ্যে উৎপাদন চলাকালে কারখানায় ঘুরে বেড়ানো, নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করা, সিগারেট খেতে বাইরে যাওয়া, মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ের আগে কারখানা থেকে বেরোনো, ছুটির সময়ের আগে বাড়িতে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো প্রভৃতি বিষয়ে রিপোর্ট অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায়। তিরিশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত দুর্বলতাগুলি কম ছিল; পরে তা' কিছুটা শুরু হয়। পঞ্চাশের দশক থেকে এইসব প্রবণতা বেড়ে চলে।

শিল্পের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায়, সমগ্র কাজের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধরনের কাজে এক এক জন শ্রমিকের নিয়োগ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই খণ্ড কাজগুলির মধ্যে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে এটা দেখা যাচ্ছিল যে যারা উদ্যোগ নিয়ে ভাল কাজ করছিল, তার ফল সমগ্র উৎপাদনের ফলের মধ্যে সব সময় পাওয়া যাচ্ছিল না। ভাল কাজ করা শ্রমিকদের কাজের ফল পরিণত হচ্ছিল উদ্বৃত্ত যন্ত্রাংশের বা পণ্যের মজুত হিসাবে। এই প্রবণতা, অন্যদিক থেকে, ব্যাবস্থাপকদের মধ্যেও সত্য ছিল। একমাত্র টার্গেট-পূরণকে তারা মোক্ষ ধরে নিয়ে সেইসব যন্ত্রাংশ বা পণ্য উৎপাদনে জোর দিতো যা সহজে উৎপাদন করা যায়; কিন্তু যেসব উৎপাদন জটিল, নিপুণ বা ব্যয়সাধ্য কিন্তু ফাইন্যাল অ্যাসেম্বলির জন্য একান্ত জরুরি সেগুলি সাধারণভাবে ফেলে রাখা হতো। এই সমগ্র দিকটির মধ্যে শ্রমিকদের শৃঙ্খলার প্রসঙ্গ বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো সমগ্র প্রক্রিয়ার ত্রুটি। এর ফলে উৎপাদনের যে ক্ষতি হতো, তা' পূরণ করা হতো কখনো কখনো ব্যাপকভাবে ওভারটাইম চালু করে। খ্রুশ্চভের সময় 'সিফট পরিবর্তনে' শ্রমিকদের শ্রম সময় নষ্ট হতো ১৩-১৪ শতাংশ, যার অর্থ ছিল সারা বছরে ৩০-৩৩ দিনের কাজ নষ্ট হওয়া। তদুপরি অনুমোদিত ছুটি, প্রসবকালীন ও অসুস্থতার জন্য ছুটি ও অন্যান্যভাবে কাজের সময় নষ্ট প্রভৃতি মিলিয়ে শ্রমিক পিছু সারা বছরে নষ্ট সময়ের পরিমাণ ছিল ২৬-২৭ দিনের মতো। পঁচিশ বছর পর, আশির দশকের তথ্য অনুযায়ী, এই পরিস্থিতির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনের সমগ্র প্রণালীর মধ্যে গুরুতর কিছু ত্রুটি ছিল। তার অন্যতম হলো উৎপাদনের অব্যাহত 'আনডার-মেকানাইজেশন' বা নিম্ন-যান্ত্রিকীকরণ। সে কারণে সোভিয়েত

ইউনিয়নের শিল্প ব্যবস্থায় ব্যাপক কায়িক শ্রমজীবীদের উপস্থিতি দেখা গেছে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে 'রিপেয়ার অ্যাণ্ড মেইনটেনেন্স'-এ দক্ষ শ্রমিকের হার ছিল মাত্র ১৪ শতাংশ, বাকি সবাই অদক্ষ। অক্সিলিয়ারি বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানে, যার উপর শিল্প-উৎপাদনের অধিকাংশ দিক নির্ভরশীল, সেখানে বিশেষত ছিল অদক্ষ কায়িক শ্রমিকরা। এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রটিতে প্রায় সর্বাংশে ছিল অযান্ত্রিকীকৃত শ্রম। সোভিয়েত শ্রমিকদের তুলনামূলক নিম্ন মজুরি এবং 'অক্সিলিয়ারি' স্তরে নিরঙ্কুশভাবে নারীদের নিয়োগের সুযোগ দানের ফলে, এই ক্ষেত্রটিতে যান্ত্রিকীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফল দাঁড়িয়েছিল যে শিল্পের মূল উৎপাদনে যতখানি যান্ত্রিকীকরণ হয়েছিল, তার সাথে সঙ্গতি রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল অক্সিলিয়ারি ক্ষেত্র। এটি নিছক শিল্পের সমস্যা থাকেনি; যান্ত্রিক শ্রমে যুক্ত ও কায়িক শ্রমে যুক্ত—দুই চরিত্রের শ্রমিকশ্রেণীর গঠন, শ্রেণী সংহতকরণের প্রক্রিয়াতে এক বিরূপ উপাদান হিসাবে থেকে গিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদী দেশগুলির মত 'কালেকটিভ বার্গেনিং' বা যৌথ দর-কষাকষির ব্যবস্থা চালু ছিল না। শ্রমিকের মজুরির হার ও উৎপাদনের পরিমাণ রাষ্ট্রের দ্বারা স্থিরীকৃত ও ব্যবস্থাপকদের দ্বারা প্রযুক্ত হতো। শ্রমিকরা এই দু'টি বা তার একটি বিষয়ে সন্তুষ্ট না হলেও, তাদের করণীয় কিছু ছিল না। স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন বা ফ্যাক্টরির পার্টিরও শ্রমিকদের এই সমস্যার ব্যাপারে তেমন ভূমিকা ছিল না, বড় জোর ঊর্ধ্বতন স্তরে সংবাদ বা তথ্য পৌঁছে দেওয়া ছাড়া। অন্যদিকে আন্দোলন-ধর্মঘট দূরের কথা, শ্রমিকদের ক্ষোভ প্রকাশের কোন মাধ্যম ছিল না। ফলে শ্রমিকদের কোন কোন অংশের মধ্যে তৈরি হয়েছিল নানা বিপথগামিতার প্রবণতা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে এইসব প্রবণতার সাথে সোভিয়েত শ্রমিকদের প্রবণতার তেমন মৌলিক ফারাক খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রবণতার কিছু দিক ছিল ঃ এক কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অন্য কর্মক্ষেত্রে চলে যাওয়া; ফোরম্যান/সেকশন হেডের সাথে সমঝোতা করা; শ্রমিকরা নিজের কাজের পরিমাণকে ঠিক সেই মাত্রায় বেঁধে রাখার চেষ্টা করতো যাতে তাদের মজুরি ছাঁটাই না হয় বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকরা কাজের পরিমাণ না বাড়িয়ে দেয়; সারা মাসের জন্য নির্ধারিত কাজের মধ্যে কিছু অংশের কাজের পরিমাণকে গোপন রাখা, যাতে পরবর্তীকালে সেই অংশ দেখিয়ে এবং ওভারটাইম করে বাড়তি মজুরি সংগ্রহ করা যায়; মজুরিকে সমান রাখার জন্য লাভজনক ও অলাভজনক শ্রমের মিশ্রণে কাজের টীম গঠন করে নেওয়া—যেখানে চাপ দেওয়ার সুযোগ থাকতো সেখানে অলাভজনক শ্রম করতে তারা অস্বীকার করতো। বার্গেনিং ব্যবস্থার এই ধরনের বিকল্প অনুসরণ করা শুরু করেছিল শ্রমিকশ্রেণীর এক অংশ। ক্রুশ্চভ বা গরবাচভের কালে উৎসাহদান মজুরি বা কাজের উপযোগী মজুরির কথা ঘোষণা করা হলেও, তা' শ্রমিকদের প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষার স্তরে যায়নি। সর্বোপরি উৎপাদন-প্রক্রিয়া, শ্রম-প্রক্রিয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর গঠনের মধ্যে অব্যাহত সমস্যা ও সুপ্ত বিরূপতা, তার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টিকে সমস্যার জন্য মনে মনে দোষী সাব্যস্ত করা, শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিকীকরণে ব্যর্থতা, শ্রমিকশ্রেণীকে উৎপাদনে যথার্থ ভূমিকা নেওয়ার সুযোগদানে উপেক্ষা প্রভৃতি পরম্পরাগত অবস্থা শেষ পর্যায়ে সংকট ও বিপর্যয়ের এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল।

শুরুর কালপর্বে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শিল্প-উৎপাদন ও শ্রমিকশ্রেণীর গঠনে নানা পার্থক্য ছিল কোন সন্দেহ নেই। পূর্ব জার্মানি ও চেকোস্লোভাকিয়া শিল্পে অনেকটাই উন্নত ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পের পূর্বোক্ত আদল থেকে দেশগুলির একটিও, সাধারণভাবে, বাইরে থাকেনি। পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানি ও অন্য দেশগুলির সর্বজনীনভাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া এবং সেগুলির সমস্যা সম্পর্কে ১৯৯৬ সালে উল্লেখযোগ্য আলোচনা পাওয়া যায় যথাক্রমে ডেভিড ওস্ট, ডরোথি উইয়ারলিং ও মিচেল বুরাভয় প্রমুখের আলোচনাতে। সেসব দিক এখানে উল্লেখের তেমন প্রয়োজন নেই। কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিষয়ে পূর্বোক্ত আলোচনার মধ্যে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংশ্লিষ্ট বিষয়ও প্রায় সর্বাংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

মজুরির প্রসঙ্গে ভ্রান্তি

সমাজতান্ত্রিক মজুরি সম্পর্কিত বিভিন্ন সময়ে গৃহীত নীতিগুলি প্রথম থেকে বহির্বিশ্বের জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের পরস্পরবিরোধী মতামতের সম্মুখীন হয়েছিল। কোন কোন সমালোচক নতুন গৃহীত মজুরি নীতিগুলিকে নানা যুক্তি দিয়ে সমাজতন্ত্র-বিরোধী, মার্কসবাদবিরোধী বলে অভিহিত করার চেষ্টা করেছেন। স্তালিন, খ্রুশচভ, ব্রেজনেভ, বা গরবাচভের নেতৃত্বকালে সংস্কারের প্রস্তাবগুলি কোন না কোন দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারাও। সেইসব সংস্কার বা সংস্কার সম্পর্কে সমালোচনাগুলির কতখানি যথার্থতা রয়েছে বর্তমান বিপর্যয়ের পিছনে তা' এখনি বলা কঠিন। তবে একথা বলা যায় যে স্তালিন বা খ্রুশচভ বা অন্য যে কোন একজন এবং তাঁর কার্যাবলীকে মজুরি প্রসঙ্গে ভ্রান্তির জন্য একমাত্র দায়ী করা যায় না। সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকে জনগণের প্রাপ্যের, বিশেষত শ্রমের ফল হিসাবে প্রাপ্যের মধ্যে, মার্কস সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের শ্রেষ্ঠতম শ্রম দেবেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত চাহিদা অনুযায়ী পাবেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে যেমন শ্রম দেবেন, সেই অনুযায়ী তিনি পাবেন। অর্থাৎ যিনি উন্নত ও দক্ষ শ্রম দেবেন, তিনি তদনুপাতে উন্নত মজুরি পাবেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মত সমাজতন্ত্রে মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির মধ্যে যোজন-পরিমাণ পার্থক্য থাকবে না ঠিকই, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজুরি ও সুযোগ-সুবিধায় মানুষে মানুষে আবশ্যিক পার্থক্য থাকবে। এবং এই পার্থক্য যান্ত্রিক ও কৃত্রিম নয়, প্রকৃত ক্ষেত্রবিশেষে। পার্থক্য কিছুটা উল্লেখযোগ্যও হবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এক্ষেত্রে ব্যাপক বিকৃতি ঘটেছিল প্রথমাবধি। কারখানার অদক্ষ শ্রমিক ও সর্বোচ্চ পদাধিকারী ম্যানেজার বা পরিকল্পকের মধ্যে মজুরির অনুপাত ১:১.৫ বা ২, মহাকাশ বিজ্ঞানী ও সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে মজুরির অনুপাত ৩:১ ইত্যাদি ছিল এই ব্যবস্থার পরিণাম। তার ফলে, একদিকে শ্রমের মূল্যায়ন উপেক্ষিত হয়েছে, পাশাপাশি যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে বিরূপতা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মত এখানেও এক ধরনের শ্রমের বিচ্ছিন্নতার (অ্যালিয়েনেশন অব লেবার) প্রক্রিয়া গড়ে উঠছিল সঙ্গোপনে। শ্রমের মূল্যের মধ্যে শ্রম-বিষয়ক মর্যাদাবোধ (ডিগনিটি অব লেবার) সৃষ্টির অন্যতম উপাদান রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ার অন্যতম উপাদানও হলো মানুষের মধ্যে 'ডিগনিটি অব লেবার' বোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা। কিন্তু তার পরিবর্তে যোগ্য ও দক্ষদের মধ্যে হীনম্মন্যতা গড়ে উঠতে থাকায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনাসক্তি বেড়ে চলছিল; পরিণামে উৎপাদন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, ক্ষুণ্ণ হয়েছিল উৎপাদনের মান। তদুপরি যান্ত্রিকভাবে বেকারী দূরীকরণ নীতিতে নিষ্কর্মাকেও অনাবশ্যক শ্রমে নিযুক্ত রেখে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল; উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি ক্রমশ কমে গিয়ে লোকসান বেড়ে গিয়েছিল ক্ষেত্রবিশেষে। পাশাপাশি পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বোধিগতভাবে উন্নত কর্মজীবীদের জন্য বর্ধিত সুযোগ-সুবিধার সংবাদ ও তথ্য দক্ষ, কৃতী ও সৃজনশীল শ্রমদায়ীদের মধ্যে ক্রমশ বিক্ষোভ বাড়িয়ে দিয়েছিল। যে কোন সুযোগে এই অংশ থেকে দেশান্তরী হওয়া, অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়া, বিশেষত পূর্ব জার্মানি থেকে শত শত বিজ্ঞানী, গবেষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে যাওয়া, প্রভৃতি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল। এইভাবে মজুরির প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক নীতি থেকে বিচ্যুতি, দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, বিপর্যয়ের অন্যতম পথ সুগম করেছিল।

ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকার অধোগতি

বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ মূল্যায়নে সমাজতান্ত্রিক দেশের গণসংগঠনগুলির (সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাই এক্ষেত্রে প্রধানত বিবেচনা করতে হবে) ভূমিকা নিয়েও আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনা চলেছে। প্রাক্-বিপ্লব বলশেভিক পার্টি শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও সেটির মধ্য দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় সংগঠন ও আন্দোলন সম্পর্কে প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কস ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং সংগঠন ও আন্দোলনগত বিষয়ে পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে বীজ আকারে গণ সংগঠনের

বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র সম্পর্কে যে নীতিগুলি গৃহীত হতে শুরু করেছিল, পরবর্তীকালে লেনিন তুলে ধরেছিলেন সেগুলির বিশ্লেষণাত্মক ও গভীরতর দিকগুলি। ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বলশেভিক পার্টি বিপ্লবের অব্যবহিত পর গড়ে তোলে খেতমজুর, কৃষক, যুব, নারী, ছাত্র, সংস্কৃতি, কিশোর প্রভৃতি অংশের গণ সংগঠন। বিপ্লব-পূর্ব বা পরবর্তীকালের প্রয়োজনে জনগণের বিভিন্ন শ্রমজীবী অংশকে সংগঠিত করা এবং সেগুলির মাধ্যমে পার্টির নীতি ও কার্যাবলী ছড়িয়ে দেওয়া ও রূপায়িত করার জন্য এই জাতীয় গণ-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছিল। গণ সংগঠনকে রাজনৈতিক সংগঠন তথা পার্টি থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা, গণ সংগঠনের স্বকীয়তা ও গণতন্ত্র এবং গণ-সংগঠন ও পার্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিগুলি প্রথম থেকে স্পষ্ট করা হয়েছিল। তারপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন ও সংহতকরণের কাজে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও ফ্যাসিবাদী জার্মানির ভয়ঙ্করতম আগ্রাসনের মোকাবিলায়, দেশরক্ষা ও সমর-সামগ্রী উৎপাদনে এবং যুদ্ধোত্তরকালে বিপুল ধ্বংস থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে এবং তারপর দ্রুত আর্থিক বিকাশে পার্টির পরিকল্পনামত সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে সমবেত ও স্বেচ্ছা-উদ্যোগী করে সাফল্য অর্জনে ট্রেড ইউনিয়ন অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময় থেকে এই ভূমিকার অবনমন শুরু হলো, তা' নির্ধারণ করা না গেলেও, এটা দেখা গেছে যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শেষ পর্যন্ত স্বকীয়তা পরিপূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছিল, পরিণত হয়েছিল কার্যত সরকারী উপাঙ্গে। পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ঘুচে গিয়েছিল পার্থক্য। যদিও আনুষ্ঠানিক শপ-ফ্লোর কমিটি থেকে শুরু করে স্তরে স্তরে শিল্পভিত্তিক সংগঠন, আঞ্চলিক ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন প্রভৃতি অব্যাহতভাবেই ছিল। নিয়মিত নির্বাচন, কমিটি সভা, উৎপাদনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাতে প্রতিনিধিত্ব, শিল্প-পরিচালকদের সাথে শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা, শিল্পগত ট্রেনিং, কাজের পরিবেশ, বৃত্তিগত সুযোগ-সুবিধা, আবাসন, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সামাজিক নিরাপত্তা ও বীমার বিভিন্ন ব্যবস্থা, বিনোদন, ভ্রমণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে ব্যাপক কাজ করে যেতো ট্রেড ইউনিয়নগুলি। সন্দেহ নেই একটা পর্যায় পর্যন্ত শ্রমিকদের জীবন-মানের অব্যাহত উন্নতিও ঘটেছিল। ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ছিল সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর প্রায় শতভাগ। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুগত সুযোগ-সুবিধাগুলি অর্জিত হওয়ার দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর আনুগত্য নির্ধারক হয়ে ওঠে না। শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ করতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ব্যর্থ হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে সুবিধাবাদ ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ রাখার পরিবর্তে অধিকতর প্রধান করে তুলেছিল কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ককে। পার্টি-সিদ্ধান্তকে ট্রেড ইউনিয়নের উপর সরাসরি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়ন, উৎপাদন, সামাজিক মঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মতামত দেবার সুযোগও এইভাবে বিলুপ্ত হচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-সংগঠকদের আচার-আচরণে আমলাতান্ত্রিকতা, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক বাড়তি সুবিধা ভোগ করা, জীবনযাত্রার পরিবর্তন প্রভৃতি প্রবণতাগুলি একসাথে মিলে-মিশে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও সেগুলির সংগঠকদের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর ঘটিয়ে দিয়েছিল বিচ্ছিন্নতা। এ নিছক বিচ্ছিন্নতাও ছিল না, শেষ পর্যন্ত সম্ভবত ঘৃণা ও বিরোধিতায় পরিণত হয়েছিল। রাষ্ট্রিক স্তরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব সম্পর্কে ভীতির মনোভাব শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছিল। তাই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলি যখন প্রতিবিপ্লবের দ্বারা আক্রান্ত হতে শুরু করলো, তখন ট্রেড ইউনিয়ন এক মুহূর্তের জন্যও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। কেননা ট্রেড ইউনিয়নের তখন মাটিতে পা রাখার জায়গা ছিল না।

জাতি ও জাতিসমস্যার প্রভাব

বহুভাষী-বহুজাতিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অত্যন্ত জটিল জাতি-সমস্যার সমাধানে জাতিগুলির সত্তার বিকাশের সুযোগকে ব্যাপকভাবে অবারিত করেছিল রুশ বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বিপ্লবের

সাফল্য অর্জনের অন্যতম শর্ত হিসাবে বিপ্লব-পূর্ব কাল থেকেই বলশেভিক পার্টি কর্মসূচী নিয়েছিল রাশিয়ার 'প্রিজন হাউস অব ন্যাশনালিটি'-এর অবস্থার পরিবর্তনের;বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পর পূর্বগৃহীত কর্মসূচী রূপায়ণ শুরু করে পার্টি ও সরকার। সংবিধানে সংস্থান করা হয় জাতিসমূহের সমানাধিকার ও বিকাশের সমান সুযোগ। স্তালিনের কাল পর্যন্ত পশ্চাৎপদ জাতিগুলির আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত প্রভৃতি দিকের উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয়েছিল নানা ধরনের ব্যবস্থা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কালে এবং ঠিক তারপর একে একে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসম্বলিত এলাকাগুলি (দেশসমূহ)-র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে এই প্রশ্ন গভীরভাবে দেখা দিয়েছে যে জাতি সমস্যার সমাধানে বলশেভিক পার্টির কর্মসূচী আদৌ যথার্থভাবে পালিত হয়েছিল কি? জাতিগুলির বৈষয়িক ও সামাজিক অগ্রগতির পরিসংখ্যান দেওয়া হলেও, পাশাপাশি সত্য হলো যে অধিকাংশ পশ্চাৎপদ জাতিগুলি সমস্ত ক্ষেত্রে শ্বেত রাশিয়ানদের (বর্তমান রাশিয়ার অন্তর্গত মানুষদের) থেকে বহু পিছনে পড়েছিল। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে আনুপাতিক হারের বিচারে দেশের উচ্চতর পদসমূহে বিশেষত, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, সামরিক পদাধিকারী, শিক্ষাবিদ, প্রশাসনিক প্রধান, শিল্পের ব্যবস্থাপক, অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি পদে শ্বেত রুশদের তুলনায় অন্যান্য পশ্চাৎপদ প্রদেশগুলির মানুষদের প্রতিনিধিত্ব ছিল নিতান্তই নগণ্য। শিল্পের বিন্যাসও ছিল প্রধানত রাশিয়া ও ইউক্রেন অঞ্চলে, অন্যত্র তুলনামূলকভাবে অনেক কম; কিন্তু নীচুতলার শ্রমিকরা অধিকাংশ ছিলেন পশ্চাৎপদ জাতিগুলি থেকে। এমনকি পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির শিল্প, বাণিজ্য, প্রশাসন, সামরিক দপ্তর প্রভৃতিতেও প্রধান কর্তৃত্ব ছিল শ্বেত রুশদের। দু'জন পশ্চিমি বুদ্ধিজীবী কিছু পরিসংখ্যান ও তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় স্তরের নেতৃত্ব ও সরকারের সর্বোচ্চ পদগুলিতেও এই বৈষম্যের প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া পশ্চাৎপদ জাতিগুলির মধ্যে এক ঐতিহাসিক ধারণা সুপ্ত থাকাই ছিল স্বাভাবিক, তা' হলো তাদের উপর জার তথা শ্বেত রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদের সুদীর্ঘকালের শোষণ ও বঞ্চনা। দ্বিতীয়ত, শ্বেত রাশিয়ানরা যেখানে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী, এইসব পশ্চাৎপদ জাতিগুলি অধিকাংশই মুসলিম অথবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তৃতীয়ত, রাশিয়া ভূখণ্ডে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে সেই বিপ্লবকে অনেকটাই প্রশাসনিকভাবে এইসব অঞ্চলে প্রসারিত করা হয়েছিল। এই রিপোর্টও এখন পাওয়া যাচ্ছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন টিঁকে থাকা কালে প্রদেশগুলির বঞ্চনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে, মৃদুভাবে হলেও, বিরোধ করেছে বিভিন্ন সময়ে। সংকটের মুহূর্তে, সামগ্রিক এই বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে জাতিগুলির মধ্যে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, মানসিকভাবে নিস্পৃহতার স্তর থেকে, দ্রুতই বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়েছিল। অনতিকালের মধ্যে এই বিস্ফোরণ ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীগত দাঙ্গার চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে সশস্ত্র ও উন্মত্ত গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। এই ঘটনা কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ঘটেনি, প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়া এবং অংশত চেকোশ্লোভাকিয়াতেও সংঘটিত হলো।

প্রজন্মের ব্যবধান

বিপ্লব-পূর্ব জার শাসিত রাশিয়া বা ফ্যাসিবাদ শাসিত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির ভয়াবহ বাস্তবতা সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটেনি। পূর্বতন ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতৃত্বে জনগণের অপরিমেয় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ঘটনাবলী ও সে বিষয়ে যথার্থ আত্মীকরণও ঘটেনি শেষোক্তদের। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জন্মগ্রহণ করা ও বেড়ে ওঠা প্রজন্ম জানতে পারেনি পুঁজিবাদী-ব্যবস্থা ও শোষণের চরিত্রের নির্মমতা। তাদের পক্ষে সামান্যতম অনুমান করাও কষ্টকর দারিদ্র্য ও বেকারীর যন্ত্রণা। জন্মের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিমণ্ডলে খাদ্য, আবাস, চিকিৎসা, শিক্ষা, বৃত্তি, বিনোদন প্রভৃতি চাহিদা পূরণ হয়েছিল তাদের জীবনে। সুতরাং নতুন প্রজন্মের চাহিদার সূত্রপাত ঘটেছিল এমন স্তর থেকে যেখানে সারা পৃথিবীর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এখন পৌঁছানো দূরের কথা, ভাবতেও পারে না। সমাজতন্ত্রে প্রাপ্ত সুযোগগুলির পিছনের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা না থাকায়, সাধারণভাবে এ ধারণাই বলবৎ হয়েছে (বিশেষত সমাজতান্ত্রিক

মানুষ গড়ার কাজে ব্যর্থতার জন্য), যে প্রাপ্ত সুযোগগুলি যেন স্বাভাবিক প্রাপ্তি ও আপনা-আপনি অর্জিত হয়েছে। তবে জনজীবনের চাহিদাগুলি পূরণ করা সত্ত্বেও এটা ঘটনা যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঘাটতি ছিল আরও উন্নত বৈষয়িক ও মানসিক চাহিদা পূরণে। তাছাড়া উন্নত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের প্রশ্নেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কার্যত এক ধরনের গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। সম্ভবত একটা ধারণা পরিকল্পকদের ছিল যে সর্বাধুনিক ভোগ্য-পণ্য উৎপাদন এক ধরনের বিলাসিতা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে তা' সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অথচ সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-মাধ্যমের দৌলতে কেবল উন্নত ভোগ্য-পণ্য সম্পর্কে নয়, বিলাস-সামগ্রী ও পাশ্চাত্য আধুনিক প্রগলভ জীবনযাত্রার সংবাদ নিত্য পৌঁছে যাচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের কাছে। তাছাড়া সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে দেশের ভেতরে বিদেশী পত্র-পত্রিকাগুলির প্রবেশ ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়। স্বভাবতই সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষের মধ্যে চাহিদা অনেক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল লোলুপতায়। আর এই লোলুপতার নিবৃত্তি না ঘটায় মনে মনে তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে, দোষী সাব্যস্ত করেছে সরকার, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে; বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উন্নততর এবং আকাঙ্ক্ষিত।

পূর্ব-ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিশেষ বাস্তবতার কতকগুলি দিক

শুরু থেকেই পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র গঠনের বাস্তবতা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সমাজ-বিকাশের ধ্রুপদী নিয়মে দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪০ সালের পূর্বে, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। পরবর্তীকালে দেশগুলি একে একে নাজিবাদী জার্মানীর আগ্রাসনের শিকার হয়ে পদানত হয়। নৃশংস অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দেশগুলিতে, ক্ষুদ্র আকারে হলেও, গেরিলা সংগ্রাম গড়ে ওঠে। দেশগুলির মধ্যে জার্মানি ও পোল্যাণ্ড ছাড়া অন্যত্র কমিউনিস্ট পার্টি যথেষ্ট দুর্বল ছিল প্রথম থেকে। ফ্যাসিস্ত কর্তৃত্ব কায়েম হবার সাথে সাথে অধিকাংশ কমিউনিস্টদের খুন করা হয়, 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' আটক হন বাকীরা প্রায় সবাই, একাংশ পালিয়ে দেশান্তরী হন। ফলে নাজি জার্মানির শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এইসব দেশে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে ওঠে তার নেতৃত্বে প্রধানত ছিলেন সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট, লিবারাল প্রভৃতি অংশের মানুষ। এই বিপ্লবী প্রতিরোধ সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাস্তব ও মানসিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। তার ফলে এই প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট পার্টি ও স্তালিন সম্পর্কে শ্রদ্ধা। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজ ফ্যাসিবাদী জার্মানিকে সামরিক রণাঙ্গনে পরাজিত এবং দেশগুলিকে মুক্ত করে। এতে দেশগুলির সাধারণ মানুষের মধ্যেও গড়ে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিপুল শ্রদ্ধা ও আস্থা। এই পরিস্থিতির মধ্যে দেশগুলিতে কার্যত এক ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হয়। প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা এইসব দেশে সরকার গঠন করেন; এঁদের অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন নতুন করে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে, সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই সমস্ত দেশগুলির সামাজিক বিকাশের বাস্তবতাতে নানা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতা থাকলেও, পূর্বোক্ত পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রায় এক চরিত্রের বিপ্লব সংঘটিত হয়। বলাই বাহুল্য যে এই বিপ্লবগুলি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে, নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের কর্মজীবী অংশকে নিয়ে এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়নি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পশ্চিমী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কিছু বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে পূর্ব ইউরোপের বিপ্লবগুলির অসম্পূর্ণতা ও ভবিষ্যৎ পরিণাম নিয়ে আলোচনা চলেছিল। কোন কোন দেশে প্রতিবিপ্লবী ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ঘটনাবলী ও সেক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাকে অভিযুক্ত করা ছাড়াও, দেশগুলির বিপ্লব সংক্রান্ত প্রসঙ্গটির মূল্যায়ন প্রধান স্থান পেয়েছিল তাঁদের আলোচনাগুলিতে। বর্তমান বিপর্যয়ের পর আবার আলোচনা শুরু হয় ঐ প্রসঙ্গ অনুসরণ করে। তাঁদের মতে পূর্ব ইউরোপের বিপ্লবগুলির চরিত্র আদৌ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারে কাছে ছিল না। কেননা অধিকাংশ দেশই ছিল পশ্চাৎপদ ও কৃষিপ্রধান। অথচ বিপ্লবের পর রাষ্ট্র, সংবিধান ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যবস্থাকেই প্রায় হুবহু অনুকরণ করে দেশগুলি। ভূমি ও

কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার, শিল্পায়ন প্রভৃতি শুরু করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে দেশগুলি ও সমাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্য রুশ লালফৌজ ঘাঁটি বজায় রাখে দেশগুলিতে। পরবর্তীকালে পশ্চিমী সমর-শক্তি 'ন্যাটো'র বিরুদ্ধে পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তোলে সামরিক প্রতিরক্ষামূলক জোট 'ওয়ারশ প্যাক্ট'। সীমান্ত জুড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও। দেশগুলির বৈষয়িক উন্নয়নে সর্বাত্মক সাহায্য দেওয়া ছাড়াও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্থায়ী পরামর্শ দেবার নীতি চালিয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতায় দেশগুলির উল্লেখযোগ্য বৈষয়িক উন্নতি ঘটতে থাকে। কিন্তু দেশগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে, নেপথ্যে বা প্রকাশ্যে, ক্ষোভ ও অস্থিরতা প্রায় প্রথমাবধি সৃষ্টি হচ্ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের "বাড়তি হস্তক্ষেপে"! দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিতে নবাগত কমিউনিস্টরা ছিলেন অনভিজ্ঞ। রাজনৈতিক ও মতাদর্শে পরিপক্কতার অভাব তো ছিলই। তাই, কেবল আর্থিক ও রাষ্ট্রিক বিষয়ে নয়, মতাদর্শের প্রশ্নেও তাঁরা ছিলেন পরনির্ভরশীল। সামাজিক বাস্তবতার সাথে গৃহীত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গতি ঘটছিল না অনেক ক্ষেত্রেই। ফলে জার্মানির দখলদারীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকায় একদা সমর্থন ও সন্তুষ্টি, কালক্রমে দেশগুলির জনগণের মধ্যে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। পার্টি, সরকার ও জনগণের মধ্যে এই ধরনের শূন্যতা ও দুর্বলতার সুযোগ চার্চ ও সাম্রাজ্যবাদীরা নানাভাবে নেওয়ার চেষ্টা করেছে—প্রথমদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জনগণকে প্ররোচিত করে, পরবর্তীকালে দেশীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পুতুল বলে প্রতিপন্ন করতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার ও প্ররোচনা ছড়িয়ে এবং শেষ পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বৈরতন্ত্রী প্রতিপন্ন করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্য জনগণকে উত্তেজিত করে।

ধর্ম ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রভাব

ধর্ম সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করার জন্য কমিউনিস্টরা প্রথমাবধি ব্যাপক আলোচনা চালিয়েছে। ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে চিনিয়ে দেবার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নির্দেশ করে দিলেও কমিউনিজমের পুরোধারা ধর্মের প্রবল ক্ষমতা ও মানবসমাজে এটির ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত অস্তিত্ব ও ভূমিকার কথাও সতর্কভাবে স্মরণ রাখতে বলেছিলেন। ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির কার্যকরী প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে; বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্র আইনসম্মত পথে চার্চকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউন পুনরায় রাষ্ট্র থেকে চার্চকে স্বতন্ত্র করে এবং চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করেছিল। ১৯১৭ সালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরও গৃহীত হয়েছিল অনুরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু অনুরূপ ধরনের প্রত্যেকটি কালপর্বে চার্চ যেমন প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছিল, রুশ বিপ্লবের পরও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাশিয়ার সমস্ত ধরনের চার্চ, বিশেষত অর্থডক্স চার্চ, যেমন প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে, অন্যদিকে দেশী-বিদেশী সমস্ত প্রতিক্রিয়ার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছে প্রকাশ্যে বা গোপনে।

পূর্ব ইউরোপের কতকগুলি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবার পর চার্চ একই ভূমিকা নিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশ্যে দীর্ঘকাল মাথা তোলার সুযোগ না পেলেও, পঞ্চাশের দশক থেকে পূর্ব ইউরোপীয় কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশে চার্চ প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে থাকে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজ প্রতিষ্ঠার পর মানুষের উল্লেখযোগ্য অংশ স্বেচ্ছায় ও মোহমুক্তভাবে ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। প্রকাশ্যে ঘোষণা না করলেও ধর্ম-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে তারা ধর্ম-নিপীড়ন ও ধর্মের অধিকারের ওপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মনে করেছে। এই সুপ্ত প্রবাহকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন গরবাচভ স্বয়ং রাশিয়াতে চার্চের সহস্র বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে ভ্যাটিকানের পোপকে স্বদেশে আমন্ত্রণ করে এনে এবং তার বক্তৃতা টেলিভিশনের মাধ্যমে রাশিয়ার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে। তারপর পূর্ব ইউরোপসহ রাশিয়াতে চার্চ প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হয়। চার্চ পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন

স্তরে সরাসরি প্রভাব বিস্তারে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলিকে মদত দেওয়া শুরু করে। রেডিও ও টেলিভিশনে তারা সরাসরি সমাজতন্ত্র ও সরকার-বিরোধী প্রচার শুরু করে দেয়, এমনকি নিজেরা রাজনৈতিক দল গড়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভোট পেতে থাকে এবং কোন কোন দেশে তারা অর্জন করে সরকার গঠনে পরামর্শ বা নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতাও। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের অন্তিম মুহূর্তে চার্চগুলি- হয়ে উঠেছিল গণ-জমায়েতের অন্যতম প্রধান শক্তি।

আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য পালনের জন্য সংকট

সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা কতকগুলি জরুরী প্রয়োজনে প্রথমাবধি ভারাক্রান্ত ছিল। সামরিক সামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিপুল বিনিয়োগ করতে হয়েছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে প্রথম থেকে রক্ষা করার জন্য। জার্মানির ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের কালে বিনিয়োগের প্রধান অংশই ঘটেছিল সমর-খাতে। তারপর পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তাদের প্রতিরক্ষার প্রধান দায়ভার বহন করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর পাশাপাশি চীন ও উত্তর ভিয়েতনামের বিপ্লবেও সোভিয়েত ইউনিয়ন দিয়েছে সর্বাত্মক বস্তুগত সহায়তা। ১৯৫০ সাল থেকে উত্তর কোরিয়ায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে আক্রমণ ও দীর্ঘ ৩ বছরের অধিককাল ধরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের প্রধান সামরিক ও অন্যান্য দায়িত্ব বহন করেছে তারা। এই সময় থেকে আমেরিকা পরমাণু অস্ত্রসজ্জা এবং মহাকাশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি প্রভৃতি ব্যাপকভাবে শুরু করলে, তার পাল্টা ব্যবস্থা নিতে সোভিয়েতের বিপুল বাড়তি ব্যয় শুরু হয়ে যায়। চীন ও ভিয়েতনামের পুনর্গঠনের কাজে, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামে, ১৯৫৯ সালে কিউবার বিপ্লবের পর সেটিকে রক্ষায় ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনে রাশিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে বস্তুগত ব্যাপক সাহায্য দিতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী, নয়া-উপনিবেশবাদী অর্থনীতি ও তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং ব্ল্যাকমেইল থেকে রক্ষা করার জন্য তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে বিপুলভাবে সাহায্য ও অনুদান দিয়ে যাচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক শিবির। ষাটের দশকের শেষার্ধ থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভিয়েতনামের যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজ আর্থিক বিনিয়োগের বিপুল পরিমাণ অংশ সামরিক খাতে ব্যয় করতে বাধ্য হয়। অ্যাঙ্গেলা, নিকারাগুয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের বিপ্লবকে রক্ষা এবং দেশগঠনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে বহন করতে হয় অপরিমেয় দায়িত্ব। ফলে স্ব স্ব দেশের সমাজতন্ত্রের বিকাশের জন্য সম্পদকে যতখানি ব্যবহার করার সুযোগ ও প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ছিল, তা' করা সম্ভব হয়নি এইসব ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিকতাবাদী বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করার জন্য। সত্তরের দশক থেকে সোভিয়েত অর্থনীতিতে প্রকটিত হতে থাকে মন্দা ও অন্যান্য দুর্বলতার লক্ষণগুলিও। তা'সত্ত্বেও এই ধরনের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন থেকে তারা বিরত থাকেনি। প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণ না হওয়ার জন্য সোভিয়েত জনসমাজে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তার পিছনে অন্যতম এই দিকটি জনগণের উপলব্ধিতে আনতে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি, গণসংগঠনগুলি ও সরকার ব্যর্থ হয়। ফলে জনগণের মধ্যে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়নি। বরং তার পরিবর্তে গড়ে উঠছিল আন্তর্জাতিকতাবাদী ভূমিকা পালনকে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় মনে করার মানসিকতা। বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করেও এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্র নিজ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল। গরবাচভের কালে এসে এই জাতীয় বিপ্লবী দায়িত্ব পালন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ সরে আসে। তার পরিণাম দাঁড়ায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। আন্তর্জাতিক স্তরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আস্থা, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা নষ্ট হতে থাকে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জনগণ থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সোভিয়েত পার্টি ও সরকার।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বিরোধ ও আত্মঘাতী বিকাশ

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যন্তরে আদর্শগত বিরোধ থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক-ছিন্নতা এবং অন্তিম পরিণামে পারস্পরিক শত্রুতা পরবর্তীকালে বিপর্যয়কে আহ্বান করে নিয়ে আসার অন্যতম ভিত্তি রচনা করেছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে

যুগোশ্লাভিয়ার নিষ্ক্রান্ত হবার যুক্তি হিসাবে স্তালিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের তথাকথিত "কর্তৃত্ববাদিতার" অভিযোগ এবং নিজ দেশের বাস্তবতা অনুযায়ী সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার অধিকার দাবী করা থেকে এই বিভেদের সূত্রপাত। যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো পরবর্তীকালে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে আবির্ভূত হলেও, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদকে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এইভাবে কমিউনিস্ট শিবিরের ঐক্যের মধ্যে অংশত বিভ্রান্তি সৃষ্টির অন্যতম ভিত্তি যুগোশ্লাভিয়া সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫৬ সালে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নি-স্তালিনীকরণ প্রক্রিয়া শুরু ক'রে মতাদর্শের স্তরে বিভ্রান্তির নতুন উপাদান আমদানি করেন খ্রুশ্চভ। বিশ্বের স্তালিন-বিরোধী সমস্ত প্রবণতা তথা সোভিয়েত-বিরোধী শত্রু ও মিত্র শিবিরকে উস্কে দিয়েছিলেন তিনি। সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বৃহত্তম ফাটলের সূচনা হয় এতে। রাশিয়ার জনগণের সুদৃঢ় আস্থার ভিতেও বিভ্রান্তি ও দুর্বলতার বীজ উপ্ত হয়ে যায়। রাশিয়ার জনগণের মানসিক ঐক্যে চিড় ধরিয়ে কর্মের ঐক্যে সৃষ্টি হয় অস্থিরতা। কমিউনিস্ট শিবিরে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার ভিত্তিও এই কংগ্রেস তৈরি করে দেয়। প্রথমে চীন ও কিছু পরে আলবেনিয়া সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করে। আলোচনার মাধ্যমে আদর্শগত পার্থক্য সমাধান করার পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬২ সালে চীনকে সমস্ত সাহায্যদান বন্ধ ও বিশেষজ্ঞদের প্রত্যাহার করে নিয়ে বিচ্ছেদের শর্ত পূরণ করে। এর ফলে কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্যই ভেঙ্গে পড়লো না, খাড়াখাড়ি ভাগ হয়ে গেল সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট আন্দোলন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাইরের অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে দুই প্রধান পার্টির নীতির অনুসারী হিসাবে ভাঙ্গন এলো। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি যখন ইউরোপে ইউরো-কমিউনিজমের জন্ম হচ্ছে, কেবলমাত্র সোভিয়েত-বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চীন তাকে সমর্থন দিল, অথচ ইউরো-কমিউনিজমের মূল সমস্ত বক্তব্যগুলি ছিল খ্রুশ্চভ-প্রস্তাবিত লাইনের এক ধরনের পরিণতি ও চীনের লাইনের সম্পূর্ণ বিরোধী। ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষের দিকে চীন স্বীয় দেশের ভিতর দিয়ে সোভিয়েত সাহায্য পাঠানোর বিষয়ে নানা সমস্যা তৈরি করতে থাকে। ভিয়েতনামে যুদ্ধ শেষে, ভিয়েতনাম সীমান্তে সামরিক আক্রমণ চালায় চীন তথাকথিত চীনাদের স্বার্থ রক্ষার নামে। চীন-সোভিয়েত সীমান্তে সীমানা নিয়ে চলে সামরিক সংঘর্ষ। সুবিধাবাদ, সংকীর্ণতা, সংশোধনবাদ, দ্বেষ-পরায়ণতা প্রভৃতি ধীরে ধীরে সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ঘিরে ধরে। এইভাবে আদর্শগত এবং সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও সাফল্য সম্পর্কে মত বিনিময় ও সহযোগিতার সুযোগ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। সাম্রাজ্যবাদ পুরোপুরি এই বিরোধের সুযোগকে গ্রহণ করে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরোধ বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ইন্ধন যোগাতে থাকে। পরবর্তী বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এই অনৈক্য।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোয়

মানব সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের অধ্যায়গুলি মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীদের একাংশ দেখিয়েছেন যে, দাস সমাজের অস্তিত্ব ছিল মোটামুটি ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার বছর, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ছিল দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আর পুঁজিবাদের বয়স হয়েছে পাঁচশ বছরের মতো। ইতিহাসগত পরিসংখ্যানের মূল্যায়নে উন্নততর সমাজব্যবস্থাগুলির অস্তিত্বকাল ক্রমশ কমেছে এবং পূর্বতনটি থেকে পরবর্তীটির আয়ুষ্কাল প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। এই তথ্য থেকে যান্ত্রিকভাবে বলা হয়েছে যে পুঁজিবাদের আয়ুষ্কাল এখনও পূর্ণ হয়নি। তবে এই যান্ত্রিক পরিসংখ্যানবাদের বাইরে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিসংখ্যানগত দিক থেকে আর একটি সত্য রয়েছে। এটা লক্ষণীয় যে অতীতের প্রত্যেকটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা যে কোন দেশে একটি মাত্র বিপ্লবের দ্বারা কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের পালায় এক অন্তিম-মুহূর্তে পৌঁছে বিপ্লবের দ্বারা নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা তথা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস উল্লেখ করা যায়।

ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতকে লেভেলারস ও ডিগারস আন্দোলন, ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে বুর্জোয়া বিপ্লব,

লং-রেভলিউশন, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধব্যাপী শিল্প-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জার্মানিতে ষোড়শ শতাব্দীতে রিফরমেশন ও কৃষক-যুদ্ধ, ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লব, বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানির ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা ঊনবিংশ শতকে বুর্জোয়া বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ফ্রান্সে ১৭৮৯, ১৭৯৩, ১৭৯৯ ও ১৮৪৮-৫০ সালগুলিতে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটেছে। আমেরিকার বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে দু'দফায় ১৭৭৬ থেকে ১৭৮২ ও ১৮৬০-৬১ সালে। রাশিয়াতে ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে, ১৯০৫ সালে ও ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ সালে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একটি বুর্জোয়া বিপ্লবের সাফল্যের পর, যাকে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল "রেস্টোরেশন" তথা পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়েছে; তারপর আবার বিপ্লব হয়েছে। কিন্তু অনুরূপ উত্থান-পতন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ছাড়া। বরং এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একবার সম্পন্ন হওয়ায় তা' অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন। অথচ মার্কসবাদী সমাজ বিজ্ঞানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরও প্রতিবিপ্লবী শক্তির অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে থাকার কারণে শ্রেণী সংগ্রাম অব্যাহত রাখা, রাষ্ট্রকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে পরিণত করা এবং পুঁজিবাদী সমস্ত অবশেষের অবসান ঘটানোর দায়িত্ব থেকে যায়। এমনকি এইসব তৎপরতা চালানো সত্ত্বেও তার সাফল্য সব সময়েই নিশ্চিত ও ধ্রুব নয়।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বর্তমান পতন ইতিহাসের পূর্বোক্ত পুনরাবৃত্তিকে দেখিয়ে দিচ্ছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখনও সবল থাকায় সমাজতন্ত্র স্থায়ীভাবে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেনি। সুতরাং বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের পথে সমাজতন্ত্রকে ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে জয়ী হতে হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

নতুন যুগ

পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া

পুঁজিবাদ স্বীয় ব্যবস্থাকে 'গ্রোথ-অরিয়েন্টেড সিস্টেম' বা বিকাশ-আবর্তিত ব্যবস্থা হিসাবে দাবী করে এসেছে। এই প্রণালীকে সচল রাখার মূল দিক হলো ঃ পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ নিত্য খুঁজে বের করা ও ব্যবহার করা এবং তার মধ্য দিয়ে মুনাফাকে কেবল অব্যাহত রাখা নয়, তা' উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যাওয়া। পুঁজিবাদের ইতিহাস সেই অর্থে বার বার প্রমাণ করেছে যে, পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগে ঘাটতি তথা সংকট সৃষ্টির জন্যই তাদের নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার জন্য তৎপরতা চালাতে হয়েছে। অর্থাৎ পুরানো ব্যবস্থাতে আর চলছে না; সুতরাং, তথাকথিত 'নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা' দরকার হয়ে পড়েছে পুঁজিবাদের। তবে, পুঁজিবাদের পক্ষ থেকে গৃহীত বিভিন্ন সময়ের নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি, কিছুকাল পরই পরিণত হতো 'নতুন বিশ্ব-অব্যবস্থায়'। এই ঐতিহ্যের সর্বশেষ নজির 'ব্রেটন-উডস'-এর বিশ্ব-ব্যবস্থার পরিণাম।

প্রথম খণ্ডে বর্ণিত সমগ্র পৃষ্ঠপটের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পরিস্থিতিতে, প্রস্তাবিত 'নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার' কেন্দ্রীয় উপাদান হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে গ্লোবাল ইকনমি বা বিশ্বায়িত অর্থনীতিকে। 'গ্লোবাল ইকনমি' সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো ঃ এ এমন এক ব্যবস্থা যা নির্দিষ্ট সময়ে 'ইউনিট' বা একক হিসাবে বিশ্বময় ভূমিকা নেয়। এই ব্যবস্থায় মুলধনের অব্যাহত প্রবাহ, সঞ্চালন ও পুনরায়ন ঘটে চলে এবং শ্রমের বাজার, পণ্যের বাজার, তথ্য, কাঁচামাল ও সামগ্রী, ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের বিশ্বায়ন ঘটে। এই 'গ্লোবাল ইকনমি'তে শেষোক্ত উপাদানগুলি সর্বক্ষণ ও সারা বিশ্ব জুড়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তবে এই সংজ্ঞাতে পুঁজিবাদের মর্মগত পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব নেই; প্রস্তাবগুলি কাঠামো ও প্রণালীগত। সন্দেহ নেই এগুলিতে অভিনবত্ব, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অবশ্যই রয়েছে, রয়েছে অতীতের অনুরূপ প্রয়াসের সাথে বিপুল পার্থক্যও। তাই অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে, বর্তমানের নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার দাবী ও তৎপরতাকে সরলীকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না।

আমেরিকার সেক্রেটারি অব লেবার ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক মিস্টার রবার্ট বি. রাইখের পুস্তক 'ওয়ার্ক অব নেশনস'-এর একটি উদাহরণ, বিশ্বায়নের বিষয়ে সাধারণ ও প্রাথমিক ধারণা গঠনে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "একজন আমেরিকান যখন জেনারেল মোটরস কোম্পানির 'পন্টিয়াক লী মানস' (একটি মডেলের মোটর গাড়ির নাম) ক্রয় করেন, তখনই তিনি আন্তর্জাতিক লেনদেনে যুক্ত হয়ে পড়েন। যে ২০ হাজার ডলার জেনারেল মোটরসকে তিনি দিলেন (মোটর গাড়ি ক্রয় করা বাবদ) তার থেকে প্রয়োজনীয় শ্রম-খরচ ও যন্ত্রাংশ যুক্ত করার জন্য ৬ হাজার ডলার চলে যায় দক্ষিণ কোরিয়াতে, অগ্রসর যন্ত্রাংশের (এঞ্জিন, ট্রানজ্যাক্সলেস ও ইলেকট্রনিকস্) জন্য ৩,৫০০ ডলার চলে যায় জাপানে, স্টাইলিং ও ডিজাইন ইঞ্জিনীয়ারিং বাবদ ১,৫০০ ডলার যায় পশ্চিম জার্মানিতে, ছোট যন্ত্রাংশের খরচ বাবদ ৮০০ ডলার যায় তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও জাপানে, বিজ্ঞাপন ও বাজারীকরণের জন্য ৫০০ ডলার যায় ব্রিটেনে এবং ডাটা প্রসেসিং-এর জন্য ১০০ ডলার যায় আয়ারল্যাণ্ড ও বারবাডোজে। বাকি ৮ হাজার ডলার যায় ডেট্রয়েটের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) মোটর গাড়ির কোম্পানির মূল মালিক, নিউইয়র্কের আইনজ্ঞ ও ব্যাঙ্কার, ওয়াশিংটনের সরকারী মহলে তদ্বিরকারী, সারা আমেরিকাতে ছড়ানো বীমা ও স্বাস্থ্য-রক্ষার কর্মী এবং জেনারেল মোটরস-এর শেয়ার হোল্ডারদের কাছে, যারা প্রধানত বাস করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও যাদের মধ্যে বিদেশীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, তাদের কাছেও।"

এই উদাহরণ থেকে অর্থনীতি তথা উৎপাদনের বিশ্বায়নে কাঁচামাল ও নির্মিত সামগ্রী, পুঁজি, বাজার,

শ্রম, তথ্য, ভোক্তা ও ক্রেতা, রুচি ও চাহিদা, মালিকানা, অর্থনীতি ইত্যাদির বহুজাতিকতার স্বরূপ অনেকটাই স্পষ্ট হয়।

'গ্লোবালাইজেশন' তথা বিশ্বায়ন শব্দ ও প্রসঙ্গটি এখন এক ধরনের বিশ্ব-গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। যে কোন আর্থিক আলোচনা বা সেবিষয়ে রিপোর্ট, দক্ষিণ বা বামপন্থী রাজনীতি বা রাজনৈতিক আলোচনা, মালিকশ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন বা কাজকর্ম, সরকার বা যে কোন সামাজিক সংগঠনের আলোচনা, নীতি নির্ধারণ বা ভূমিকা, সমাজ বা সাংস্কৃতিক যে কোন তৎপরতায় 'বিশ্বায়ন' শব্দ ও প্রসঙ্গটি বর্তমানে, সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত—তা' পক্ষে বা বিপক্ষে যেভাবেই হোক। এই জাতীয় সমস্ত তৎপরতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যা কার্যত স্বীকৃত হচ্ছে তা' হলো বিশ্বায়ন অপ্রতিরোধ্য।

এই নতুন স্তর গঠন সম্পর্কে বক্তব্য হলো যে, বর্তমানে যে অধ্যায়টি সৃষ্টি হচ্ছে তা' ঘটছে উৎপাদন ও বাজারের বিশ্বায়নের ফলে। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় উৎপাদন, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলি 'বিশ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র সম্মুখীন হয়ে, বিদেশে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর, প্রধানত ও প্রায় সর্বাংশে, নির্ভরশীল হতে শুরু করেছে। ব্যবস্থাটির উদ্যোক্তারা মনে করেন যে অর্থনৈতিক স্তরে এই নতুন চ্যালেঞ্জ সাফল্যমণ্ডিতভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব প্রত্যেক দেশের জাতীয়-রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানাকে উপেক্ষা করে, উৎপাদনকে আন্তর্জাতিকভাবে সংঘটিত করে ও উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানকে বহুজাতিক সংস্থায় রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে। কেননা, এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারলে পুঁজিবাদ যে কোন দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরের জাতীয় রাষ্ট্রের সমস্ত ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ও তৎপরতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর চাপ ও প্রতিরোধকে এড়িয়ে মুক্ত ভূমিকা নিতে পারবে। উৎপাদনের এই নতুন ধারা সৃষ্টির জন্য স্থান নির্বাচনে পুঁজিবাদ সেইসব দেশ বা অঞ্চলকেই উপযুক্ত বলে বিচার করছে যেখানে শ্রমিকের মজুরি ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ তুলনামূলকভাবে কম।

পুঁজিবাদের নয়া-উদারনীতিবাদীরা বিশ্বায়নের উদ্যোক্তা ও প্রচারক। এঁদের বক্তব্য হলো, এই নতুন বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেইনসীয় পদ্ধতি বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণ দূরের কথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে সক্ষম। তাঁদের আরও অভিমত হলো যে এই নতুন উদ্ভাবিত বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উপেক্ষা বা কোনভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হলে তা' বিশ্ব-অর্থনীতিতে বৃহত্তর বিপর্যয় ডেকে আনবে।

এ. ডি. চ্যাণ্ডলার (সেল অ্যাণ্ড স্কোপ ঃ দা ডাইনামিক্স অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম, ১৯৯০), ডব্লু. ল্যাজনিজ (বিজিনেস অরগানাইজেশন অ্যাণ্ড দা মিথ অব দা মার্কেট ইকনমি, ১৯৯১) প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদের বর্তমান অধ্যায়ে পৌঁছনোর স্তরগুলিকে ব্যবস্থাপনার আদলের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে চরিত্রায়ণ করার চেষ্টা করেছেন। শিল্প-পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশের কাল-পর্ব থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত পরিসরকে এঁরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলির প্রোডাকশন-প্রসেস বা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বে এঁরা দেখিয়েছেন, যথাক্রমে (ক) ব্রিটিশ প্রথা অনুসারী মালিকদের কর্তৃত্ব-ভিত্তিক উৎপাদন, (খ) 'ম্যানেজমেন্ট' বা ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্বাধীন আমেরিকান প্রথা অনুসারী বিশ্ব-উৎপাদন প্রণালী এবং (গ) অজস্র প্রতিষ্ঠানের জালে সংযুক্ত, 'সাব-কন্ট্রাক্টিং' বা উপ-ঠিকাদারী প্রথায় উৎপাদন ব্যবস্থাসম্পন্ন জাপানী ব্যবস্থার অনুগামী বর্তমান সর্বাধুনিক উৎপাদন প্রণালী। এই তিনটি স্তরকে চিহ্নিত করা হয়েছে যথাক্রমে 'প্রোপ্রাইটরি ক্যাপিটালিজম' বা মালিকানামূলক ধনতন্ত্র, 'ম্যানেজারিয়াল ক্যাপিটালিজম' বা ব্যবস্থাপনামূলক পুঁজিবাদ এবং 'কালেকটিভ ক্যাপিটালিজম' বা যৌথকৃত ধনতন্ত্র। অবশ্য এই ধরনের নামকরণ কিছুটা বিভ্রান্তিকর। এই বিভাজনে আসলে 'প্রোডাকশন-প্রসেস', বিশেষত ম্যানেজমেন্ট-প্রসেসের পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং নামকরণগুলির শেষাংশে 'ক্যাপিটালিজম' শব্দ ব্যবহার না করে 'প্রোডাকশন-প্রসেস' শব্দ ব্যবহৃত হলে তা' হতো আরও অর্থবহ। তবে এই অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের দিকে প্রোডাকশন-প্রসেসের বিবর্তনের রূপটি অনুধাবন করা যায়।

বর্তমানে 'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়নের স্তরটির 'প্রোডাকশন-প্রসেস'কে পূর্বোক্তরা বলেছেন 'কালেক্টিভ ক্যাপিটালিজম'। তবে শেষোক্ত ও বর্তমানে প্রাপ্ত বিশ্বায়নের স্তর সম্পর্কে এই বক্তব্যকে অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকরা স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে অন্যভাবে বিশেষীকৃত করেছেন। যেমন ই. পিয়োরী ও সি. এফ. স্যাবেল (দা সেকেণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিভাইড, ১৯৮৪) মনে করেছেন বর্তমান পুঁজিবাদী স্তরটি সমগ্র শিল্প-পুঁজিবাদী স্তরের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তনধর্মী দ্বিতীয় ঐতিহাসিক অধ্যায়। এম. বেস্ট (দা নিউ কম্পিটিশন : ইনস্টিটিউশন অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিস্ট্রাকচারিং, ১৯৯০) গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন পূর্বতন শিল্প-কাঠামোর সাথে বর্তমান শিল্প-কাঠামোর মৌলিক পার্থক্যের দিক ও উপাদানসমূহ এবং অতীতের সাথে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র ক্ষেত্রে গুণগত পার্থক্যের দিকগুলি। জে. ওম্যাক্, ডি. জোনস এবং ডি. রুশ (দা মেশিন দ্যাট চেঞ্জড দা ওয়ার্ল্ড, ১৯৯০) প্রোডাকশন-প্রসেসে তৃতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রভাবে মৌলিক পরিবর্তন এবং তার দ্বারা বিশ্ব-পুঁজিবাদের সংকট থেকে পরিত্রাণ ও অনিবার্য অগ্রগতির সম্ভবনাকে ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ নিয়েছেন—বর্তমান 'গ্লোবালাইজেশনে'র যথার্থতাকে প্রমাণ করতে। তিনি কেবল 'প্রোডাকশন-প্রসেস' বা উৎপাদন-প্রক্রিয়াই নয়, একই সাথে আমেরিকান 'টাইলারিজম' বা টাইলারবাদী ব্যবস্থাপনা থেকে জাপানী 'টয়োটিজম' বা 'টয়োটোবাদী' ব্যবস্থাপনা কিভাবে সমগ্র 'লেবার-প্রসেস' বা শ্রম-প্রক্রিয়ায় যুগান্তকারী রূপান্তর ঘটাচ্ছে, সেই আলোচনা তুলেছেন বিশ্ব-পুঁজিবাদের নতুন বিশ্বায়নের তৎপরতা প্রসঙ্গে।

'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়নের উপাদান হিসাবে যে দিকগুলি ক্রমশ সর্বত্র সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে সেগুলি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মর্মের দিক থেকে কার্যত অভিন্ন হলেও, বাহ্যিক দিকে স্বীয় বৈশিষ্ট্য গঠন করে নিচ্ছে। সেইসব দিক পরবর্তীকালে কিছুটা বিস্তৃতভাবে উত্থাপন করার চেষ্টা হবে। তবে সেগুলির প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই উপাদানগুলির কয়েকটি হলো 'লিবারালাইজেশন' বা উদারীকরণ, 'মার্কেটাইজেশন' বা 'বাজারীকরণ', 'প্রাইভেটাইজেশন' বা বেসরকারীকরণ, 'ডি-ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন' বা প্রথাগত শিল্পের বি-শিল্পায়ন, 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট' বা কাঠামোগত সংস্কার, 'ওপেন কম্পিটিশন' বা মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, 'ফ্রী ট্রেড' বা মুক্ত বাণিজ্য, 'ডাউন্-সাইজিং অব গভর্নমেন্ট' বা জাতীয় রাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধকরণ, 'ইনফরমালাইজেশন' বা অর্থনৈতিক প্রচলিত ক্ষেত্রগুলির বর্তমান ঘেরাবদ্ধ চরিত্র ভেঙ্গে ফেলে অ-আনুষ্ঠানিক চরিত্র গঠন, 'ক্যাজুয়ালাইজেশন' বা স্থায়ী চরিত্রের শ্রম-ব্যবস্থাকে অনিয়মিত রূপ প্রদান ইত্যাদি।

বিশ্বের অর্থগত ব্যবস্থায় বিস্ফোরণ

বিশ্বায়নের সর্বপ্রধান শক্তি—লগ্নী-পুঁজির বর্তমান ভয়ঙ্কর ভূমিকা ও ক্ষমতা প্রথমে লক্ষ্য করা দরকার। সেক্ষেত্রে প্রথমে লগ্নী-পুঁজির (ফিনান্স ক্যাপিটাল) প্রকৃত আয়তন অনুধাবন করতে দেশের সীমানা অতিক্রম করে মূলধনের প্রবাহ সম্পর্কে এক ঝলক দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে, যদিও এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া কঠিন। তবে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তার দিকে নজর দিলেই বিশ্বায়নের অন্তরালে লগ্নী-পুঁজির ভয়ঙ্কর দাপটকে অনেকটাই বুঝতে পারা যায়। ১৯শে সেপ্টেম্বর '৯২ ও ৭ই অক্টোবর '৯৫ তারিখে 'দা ইকনমিস্ট' পত্রিকা এ'বিষয়ে নিম্নোক্ত কিছু তথ্য পেশ করেছে । তবে তার আগে এই নতুন অর্থনীতির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক প্রথমে উল্লেখ করা দরকার। লক্ষণীয় যে বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক তৎপরতার ভর উৎপাদন ও পণ্যের উপর প্রধানত নয়, তা' অন্যত্র অপসারিত হচ্ছে। এই নতুন সুযোগকে দাবী করা হচ্ছে 'নিউ লিবারাল গ্লোবাল ইকনমিক রেভোলিউশন' তথা নয়া-উদারনীতিক বিশ্বায়িত আর্থনীতিক বিপ্লব নামে। আরও দাবী করা হচ্ছে যে পুঁজিবাদ সম্পূর্ণ নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। প্রথমত, এই নতুন পর্বে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি গ্লোবাল কর্পোরেশনের চরিত্র অর্জন করছে এবং প্রকৃতই অর্থনৈতিক দৈত্য হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। জাতীয় ও বিশ্ব অর্থনীতিতে এই জাতীয় সংগঠনগুলি ক্রমশ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিচ্ছে এবং পরিণত হচ্ছে পুঁজিবাদী সমগ্র ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় কারক শক্তিতে। দ্বিতীয়ত, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে তৃতীয় দুনিয়া ও অন্যত্র পুঁজি-লগ্নী অতি দ্রুত অবিশ্বাস্য মাত্রা অর্জন করে চলেছে। অতীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে

পুঁজি-লগ্নীর যে ধরনের ভূমিকা ছিল, এখন তার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তৃতীয়ত, অধিকাংশ দেশের জি. ডি. পি.-তে (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) শিল্প ও কৃষির চেয়ে পরিষেবার অবদান কেবল দ্রুত বৃদ্ধিই পাচ্ছে না, শেষোক্ত ক্ষেত্রটি প্রথম স্থানে উঠে এসেছে। এই ক্ষেত্রকে বৃহত্তম বাজার হিসাবে চিহ্নিত করে স্বদেশী ও বিদেশী লগ্নী সর্বোচ্চ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আর্থিক ক্ষেত্রগুলি (ফিনান্সিয়াল সেক্টর) সম্পর্কেও নতুন সংজ্ঞা স্থির করা হচ্ছে। তার দ্বারা অর্থ লগ্নী করার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ব্যাঙ্ক ও বীমা শিল্প, যোগাযোগ তথা পরিকাঠামো ক্ষেত্রগুলি, প্রচার মাধ্যম, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

এবারে ফিনান্সিয়াল সেক্টর তথা ফিনান্সিয়াল মার্কেটগুলির বিস্ফোরক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করা যাক ঃ ১৯৮০ সালে ব্যাঙ্কের দ্বারা আন্তর্জাতিক ঋণের পরিমাণ (অর্থাৎ জাতীয় সীমানার বাইরে ঋণ প্রদান + বৈদেশিক মুদ্রার প্রাধান্যসম্পন্ন অভ্যন্তরীণ ঋণ দান) ছিল ৩২৪ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু, যখন মধ্য-আশির দশকে তৃতীয় দুনিয়ার ঋণজাল-বদ্ধ হওয়ার পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী তুমুল সমালোচনা শুরু হয়েছিল ও তার ফলে ঋণদানকারী আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দেওয়া কমিয়ে ফেলেছিল এবং ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাপী ঋণের চাহিদা মেটাতে ব্যাঙ্কগুলি হিমশিম খাচ্ছিল, সেই পরিস্থিতিতেও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দ্বারা আন্তর্জাতিক ঋণের পরিমাণ ১৯৯১ সালে দাঁড়ায় ৭.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এই অতিকায় চরিত্র আরও কিছুটা বোঝার সুবিধার জন্য একটি তুলনীয় দিক উল্লেখ করা যাক। ১৯৮০ সালে ২৪টি ও. ই. সি. ডি.-ভুক্ত দেশগুলির মোট জি. ডি. পি. ছিল ৭.৬ ট্রিলিয়ন ডলার ও ১৯৯১ সালে ১৭.১ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ও. ই. সি. ডি.-ভুক্ত দেশগুলির মোট জি. ডি. পি.-র অনুপাতে ব্যাঙ্কিং আন্তর্জাতিক ঋণ ৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৪ শতাংশে। অন্যদিকে, ব্যাঙ্কিং আন্তর্জাতিক ঋণের প্রত্যাবর্তিত আমানতের পরিমাণ ১৯৭৫ সালে ২৬৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালে দাঁড়িয়েছিল ৪.২ ট্রিলিয়ন ডলার। সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক পুঁজির বাজার (ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপিটাল মার্কেট) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছাড়াও লণ্ডন, সিডনি, টোকিও, প্যারিস, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট প্রভৃতি স্থানে দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের দাবী অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপিটাল মার্কেট নাকি এখনও শৈশব পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তু কার্যকালে এখনই এটির আয়তন ও ভূমিকাকে দানবাকৃতি বলে মনে করা চলে। ১৯৯০ সালের শুরুতে বিশ্বব্যাপী এই ক্ষেত্রটি থেকে প্রাপ্ত সুদের ঘোষিত পরিমাণ ছিল ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারের 'ম্যানুপুলেশন' তথা ফাটকা ব্যবস্থা বিশ্ব-অর্থনীতিতে ক্রমশ দারুণ শক্তিশালী ভূমিকা নিচ্ছে। 'সোয়াপ' নামে এই ব্যবস্থা ১৯৮০ সালের আগে মানুষের কাছে প্রায় অপরিচিত ছিল। ১৯৯১ সালে আন্তর্জাতিক পুঁজির বাজারে মুদ্রা-বাজারের চুক্তিবদ্ধ থাকা বকেয়ার পরিমাণ ছিল ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। ১৯৯১-৯২ সালে পণ্য ও পরিষেবাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল বছরে ২.৫ থেকে ৩ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থ বিনিময়ের বিশ্বের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে ১৯৯১-৯২ সালে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যহ বিনিময় ঘটছিল ১৫০ বিলিয়ন ডলার হিসাবে বছরে ৫৪ ট্রিলিয়ন ডলারের মত। এটা হলো সমকালে পণ্য ও পরিষেবার বছরে মোট বাণিজ্যের ১৮ গুণের মত।

★ আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে ১৯৮৬ সালে যেখানে প্রত্যহ বিনিময় হতো ২৯০ বিলিয়ন ডলার, ১৯৯৪ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ ট্রিলিয়ন ডলার।

★ ১৯৮২ সালে, বকেয়া আন্তর্জাতিক বণ্ডের মোট পরিমাণ ছিল ২৫৯ বিলিয়ন ডলার; ১৯৯১ সালে দাঁড়ায় ১.৬৫ ট্রিলিয়ন ডলারে, ১৯৯৪ সালে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের অধিক হওয়ার সম্ভাবনা।

★ বিশ্বের বণ্ডের বাজার (গ্লোবাল বণ্ড মার্কেট) ক্রমশ তেজী হয়ে উঠছে সরকারগুলি কর্তৃক আন্তর্জাতিক বণ্ড বাজারে ছাড়ার ফলে। ১৯৮০ সালে বিশ্বের আর্থিক সম্পদের (গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস) ১৮ শতাংশ ছিল সরকারগুলি কর্তৃক আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়া বণ্ডের মূল্য; ১৯৯২ সালে এই হার দাঁড়িয়েছিল ২৫ শতাংশে; এটা অনুমান করা হচ্ছে যে ২০০০ সালে এই অংশ দাঁড়াবে ৩৫ শতাংশে।

★ ১৯৮৬ সালে 'প্রিন্সিপাল ডেরিভেটিভস'-এর (অর্থাৎ সুদের হার এবং/অর্থাৎ মুদ্রা ব্যবহার করে অপশনস, ফিউচারস ও সোয়াপস) বিশ্ব-মজুত ছিল ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার। ১৯৯১ সালে তা' লাফিয়ে উন্নত হয়ে দাঁড়ায় ৬.৯ ট্রিলিয়ন ডলারে। আর ১৯৯৪ সালে তা' বিস্ফোরিত হয়ে আকার নিয়েছে ২০ ট্রিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশী।

★ লণ্ডনের ইউরো-ডলারের বাজারের (যেখান থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ধার করে এবং পরস্পরকে ঋণ দেয়) প্রতিটি কর্মব্যস্ত দিনে লেনদেন হয় ৩০০ বিলিয়ন ডলার বা বছরে মোটামুটি ১০০ ট্রিলিয়ন ডলার। এটা বছরে বিশ্ব-বাণিজ্যের মোট পরিমাণের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশী।

আর্থিক বাজারের মাধ্যমে এই বিশ্ব-আর্থনীতিক তৎপরতাকে দাবী করা হচ্ছে 'ফাস্ট ট্র্যাক ইকনমি' বলে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে, প্রচলিত আর্থনীতিক ব্যবস্থা হলো শ্লথগতি অর্থনীতি। প্রচলিত 'রিয়েল ইকনমি'-ব্যবস্থা যা উৎপাদন, বাণিজ্য ও ভোগভিত্তিক, তা' থেকে আর্থনীতিক ক্ষেত্রভিত্তিক এই ফাস্ট ট্র্যাক ইকনমি কেবল স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করছে না, রিয়েল ইকনমিকে বহুদূর পেছনে ফেলে দিয়ে, কার্যত এক সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করছে। একথা সত্য যে আধুনিক পুঁজিবাদের ইতিহাসে রিয়েল ইকনমির বিভিন্ন দিকগুলির তুলনায় ফিনান্স বা মূলধন অনেক বেশী দ্রুততার সাথে বিকশিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ১৯৭০ ও ১৯৮৭ সালের মধ্যে বিশ্ব-উৎপাদনের চেয়ে বাণিজ্য অনেক বেশী দ্রুততায় বেড়ে চলেছিল, অন্যদিকে বাণিজ্যকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছিল ব্যাঙ্কিং; শেষোক্ত আর্থ-শক্তি বাড়ছিল বাণিজ্যের চেয়ে প্রায় দু'গুণ গতিতে—বাণিজ্য যেখানে বাড়ছিল ২৫০০ বিলিয়ন ডলারে, সেখানে ব্যাঙ্কিং বাড়ছিল ৪০০০ বিলিয়ন ডলারে। দেশের সীমানার বাইরে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের চেয়ে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং-এর বৃদ্ধির গতি ছিল ৯ গুণ বেশী। পূর্বে দেখানো হয়েছে যে ব্যাঙ্কিং-ই সর্বাপেক্ষা গতিময় ব্যবস্থা নয়। সিকিউরিটি ট্রানজাকশনের (প্রিন্সিপাল ডেরিভেটিভের বিস্ফোরণ ও দেশীয় সীমানার বাইরে সিকিউরিটি ট্রানজাকশনের ঘাড়ভাঙ্গা গতি লক্ষণীয়) গতি ব্যাঙ্কিং-এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। 'কারেন্সি ট্রেডিং' বা মুদ্রার বাণিজ্যের পরিমাণ আরও সচকিত হওয়ার মতো। এই শতাব্দীর শেষে দৈনিক কারেন্সি ট্রেডিং, বিশ্বের মাসিক মোট বাণিজ্যের সমান হয়ে পড়বে। এই হলো তথাকথিত ফাস্ট ট্র্যাক ইকনমির তথা বিশ্বায়নের গতির অপর এক দিক।

একই সাথে এটাও ঘটনা যে বার্ষিক গড় বিশ্ব স্থির-পুঁজি গঠনকে (অ্যানুয়াল এভারেজ ওয়ার্ল্ড ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন) অতি দূরত্বে রেখে ছাড়িয়ে গেছে বিশ্ব-আর্থিক সম্পদের মজুতের (স্টক অব ওয়ার্ল্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস) বার্ষিক বৃদ্ধি। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বার্ষিক স্থির মূলধন গঠন ছিল ২৩০০ বিলিয়ন ডলার, যেখানে বিশ্ব-আর্থিক সম্পদের বার্ষিক অগ্রগতির পরিমাণ ছিল ৩৮০০ বিলিয়ন ডলার।

উৎপাদনহীন অর্থনীতির এইসব শাখার অধিকাংশ অর্থকেই বলা হচ্ছে 'হট্‌মানি'। এর নেতিবাচক ও বিপজ্জনক প্রকাশতার ব্যাপক দিক সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করেই বলা যায় যে পুঁজিবাদের অতীত বিশ্বায়নের মূল উপাদানগুলি থেকে এই শাখা নতুন বিশ্বায়নকে ইতোমধ্যেই বিচ্ছিন্ন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। লগ্নী-পুঁজি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও, এই অধ্যায়, অতীতের সাথে সক্ষম হয়েছে দূরত্ব গড়ে নিতে। এই পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে কেবল অর্থনৈতিক স্তরে নয়, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্তরেও। আরও লক্ষণীয় যে এই ধরনের আর্থ-বাজারের ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট এবং অংশীদার করা হচ্ছে, যদিও শেষোক্তদের ভূমিকা নিছকই তাৎপর্যহীন।

লগ্নী-পুঁজির মৃগয়া-ক্ষেত্রের এখন লোকায়ত নাম হলো 'ক্যাপিটাল মার্কেট' বা পুঁজির বাজার। এই প্রসঙ্গে আশির দশকটি ছিল 'ফিনান্সিয়াল ইনোভেশনস' বা আর্থগত নতুন প্রথাসমূহ প্রবর্তনের অবিস্মরণীয় যুগ। স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থা প্রথম প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কয়েকটি শতক ধরে, পরবর্তীকালে যাকে ক্যাপিটাল মার্কেট বলা হয়েছে, তার বীজাকার ব্যবসা চলেছিল কম-বেশী অতি সরল নিয়মে। এই অধ্যায়ে বিনিময় ব্যবস্থাগুলিতে অন্তর্গত ছিল শেয়ার, বণ্ড ও সাধারণ চরিত্রের ও সহজে বোধগম্য 'ইনস্ট্রুমেন্টস' বা সাধিত্রগুলি। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আজকের বিশ্বের প্রধান প্রধান

স্টক মার্কেটগুলি প্রতিদিন এমন ধরনের উপাদান নিয়ে পর্বতপ্রমাণ ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময় করে, যেসব ডেরিভেটিভের নাম অতীতে কখনো শোনা যায়নি, যেমন "ফিউচারস" ও "অপশনস", যেগুলির মধ্যে রয়েছে সুদের হার, বিনিময়-হার ইত্যাদি ইত্যাদি। ইক্যুইটি শেয়ারের 'প্রাইমারি মার্কেট' বা প্রধান বাজারের চাইতে শেষোক্ত ধরনের অর্থাৎ যাকে বলা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ডেরিভেটিভস-এর বিনিময়ের 'সেকেণ্ডারি মার্কেট' বা মধ্যম বাজার বহুগুণ ব্যাপক হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র প্রিন্সিপাল ডেরিভেটিভগুলির (সুদের হার ও মুদ্রাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত অপশনস, ফিউচারস ও সোয়াপস) বিশ্ব-মজুত, যা ১৯৯১ সালে ছিল ৬.৯ ট্রিলিয়ন ডলার, তা' ১৯৯৬ সালে দাঁড়িয়েছে ২০ ট্রিলিয়ন ডলারে। 'ডেরিভেটিভস' সহ আন্তর্জাতিক-মুদ্রা বিনিময়ের দৈনিক ব্যবহারের পরিমাণ ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের কম নয়। এই বিষয়ে ওয়াল স্ট্রীটের (আমেরিকার তথা বিশ্বের বৃহত্তম শেয়ার মার্কেট) সমীক্ষা করতে গিয়ে একজন অর্থনীতিবিদ বলেছেন, "গণিতের অধ্যাপক ছাড়া, কোন কোন ডেরিভেটিভ ইনস্ট্রুমেন্টের বা সাধিত্র'র তাৎপর্য অনুধাবন করা অন্যের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এমনকি বহু ধরনের ডেরিভেটিভের ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময়ের মূল ফলাফল কি হতে পারে, তা' পর্যন্ত এগুলির বৃহৎ ব্যবহারকারীর কাছে অগম্য থাকে।" এই জটিলতা সমাধানে দক্ষতার জন্য তাই দেখা যায়, এই বিষয়ে ব্যবসাকারী সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীরা বর্তমানে বিশ্বের সবচাইতে উচ্চ বেতনভোগী।

আর্থিক বিনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার সহগামী ব্যবস্থা হলো আর্থগত এই নতুন প্রথাগুলি । আশির দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'সিকিউরিটি ইণ্ডাস্ট্রি'র ডি-রেগুলেশন বা বি-নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক ব্যবস্থা ও আইন গ্রহণের মধ্য দিয়ে এটি শুরু হয়েছিল। ডি-রেগুলেশন বা বি-নিয়ন্ত্রণের এইসব ব্যবস্থাকে পরবর্তীকালে বলা হয়েছে 'ওয়াল স্ট্রীট রেভোলিউশন'। তারপর অতি দ্রুত 'সিকিউরিটি ইণ্ডাস্ট্রি'র সমর্থনে অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে আর্থব্যবস্থার বি-নিয়ন্ত্রণ (বর্তমানে তৃতীয় দুনিয়াতেও) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি সমাজতান্ত্রিক চীনে পর্যন্ত, সীমাবদ্ধ আকারে হলেও, এইসব ব্যবস্থা চালু হয়েছে ও বাড়ছে।

'সিকিউরিটি ইণ্ডাস্ট্রি'র ডি-রেগুলেশনের পাশাপাশি ব্যাঙ্ক ও বীমাশিল্পে আংশিক ডি-রেগুলেশনও শুরু হয়েছে সমসাময়িক কাল থেকে। এইভাবে, অতীতে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরস্পরের মধ্যে যে প্রাচীর তোলা ছিল তা' ভাঙ্গতে শুরু করেছে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ও সিকিউরিটি ফার্মগুলি এখন ঢুকে পড়তে শুরু করেছে পরস্পরের এলাকায়। তার ফলে অতীতের তুলনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন ব্যাপক মাত্রা পেয়েছে। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 'ফিনান্সিয়াল সেক্টর' তথা আর্থিক ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য পুনর্গঠন সংঘটিত হচ্ছে; বিশ্বের মোট আর্থিক সম্পদে পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির যে ভাগ ছিল, এখন তারও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট আর্থিক সম্পদে ১৯৭০ সালে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ভাগ যেখানে ছিল ৪০ শতাংশ, ১৯৯৩ সালে তা' কমে গিয়ে ২৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে সমকালে ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির ভাগ ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫ শতাংশ।

বিনিময় হারের ওঠা-নামা তথা চরম অনিশ্চয়তা সমগ্র 'ফিনান্সিয়াল ইনোভেশনস' তথা আর্থগত নতুন প্রথা প্রবর্তনের ওপর সব সময়েই সক্রিয় থাকে। বিনিময় হারের ওঠা-নামার ঝুঁকি এড়াবার জন্য 'ফিউচারস' ও 'অপশনস' জাতীয় যেসব সাধিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলি বিশ্বব্যাপী স্টক মার্কেটে ব্যাপক হয়ে উঠেছে। আমেরিকাতে ডলারের সুদের হারের বৃদ্ধি এই ধরনের নতুন প্রথা প্রবর্তনের অন্যতম কারণ ছিল, পরবর্তীকালে তা' অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরিবর্তনশীল সুদের হারের উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে মূলধনকে খেলিয়ে অর্থ বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য বিশ্ব স্টক মার্কেটের খেলোয়াড়রা ব্যবসা শুরু করেছে। 'ফিনান্সিয়াল মার্কেটে'র নিয়মাবলীর মধ্যে দেশে দেশে পার্থক্যকে কারচুপিমূলকভাবে ব্যবহার করেও অতিরিক্ত সুযোগ করে নেওয়া হচ্ছে অর্থ বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। অত্যন্ত নিপুণ রণনীতি নির্ণয় করে নেওয়া হচ্ছে যাতে সুযোগ ও অবস্থা বুঝে বিভিন্ন দেশের বাজারে ক্রমান্বয়ে ও দ্রুত প্রবেশ ও নির্গত হওয়া যায়। এইসবের মধ্য দিয়ে দেশের সীমা অতিক্রম করে পুঁজির গতিময়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লব এই সমগ্র ব্যবস্থা ও তৎপরতাকে ব্যাপকতর মাত্রা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম

প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে। স্টক এক্সচেঞ্জগুলির কমপিউটারিকরণ ও বিশ্বব্যাপী সেগুলিকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে। ফলে পৃথিবীব্যাপী ও সর্বক্ষণ ধরে লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থগত তথ্য যেমন মুহূর্তের মধ্যে জানা যাচ্ছে, অন্যদিকে সম্ভব হচ্ছে বিদ্যুৎগতিতে বিপুল পরিমাণ অর্থকে ভিন্ন দেশে পাঠানো।

এই সমগ্র প্রক্রিয়াতে 'ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট' (এফ. পি. আই.) সারা পৃথিবীর আকাশকে যেন মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তৃতীয় দুনিয়াও তার বাইরে নয়। ১৯৯০ সালে উন্নত দুনিয়াতে এফ. পি. আই.-এর প্রবাহ যেখানে ছিল ৯.৩৪ বিলিয়ন ডলার, ১৯৯২ সালে তা' দাঁড়ায় ৩৬.৮০ বিলিয়ন ডলারে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের হিসাবে ১৯৯৩ এর পরিমাণ ৫৫.৭ বিলিয়ন ডলার, কিন্তু কার্যকালে এটা দাঁড়ায় ৯৩ বিলিয়ন ডলারে। তৃতীয় দুনিয়ায় এফ. পি. আই.-এর প্রবাহও বিস্মিত হওয়ার মত। ১৯৯০ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৬.৩০ বিলিয়ন ডলার, ১৯৯৩ সালে দাঁড়ায় ৬৭ বিলিয়ন ডলারে (দা ইকনমিস্ট পত্রিকার মতে ৮০ বিলিয়ন ডলার)। পাশাপাশি, তৃতীয় দুনিয়ায় 'ইক্যুইটি ইস্যুজ'-এর মূল্য ১৯৯০ সালে মাত্র ১৩৮ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৯৩ সালে ১১ বিলিয়ন ডলার এবং বণ্ডে বিনিয়োগ ১৯৯০ সালে ৪.৬৮ বিলিয়ন থেকে ১৯৯৩ সালে লাফিয়ে ৪২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। 'ফাস্ট ট্রাক ইকনমি'র বিশ্বায়ন চলছে এইভাবে।

বিশ্বায়নের প্রধান এজেন্ট বহুজাতিক সংস্থা

১৯৩২ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদ্বয় ও খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ মিস্টার বার্লে ও মিস্টার মিনস্ তাঁদের রচিত 'দা মডার্ন কর্পোরেশন অ্যাণ্ড প্রাইভেট প্রপার্টি' গ্রন্থে পরবর্তীকালের বহুজাতিক সংস্থাগুলি, (যা তৎকালে কেবলমাত্র জাতীয় কর্পোরেশনের স্তরে ছিল) সম্পর্কে অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন এই মর্মে ঃ "আধুনিক কর্পোরেশনগুলির উত্থানের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক শক্তির অভূতপূর্ব ঘনীভবন শুরু হয়েছে, যা আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে সমকক্ষভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম...(এবং যা) কর্তৃত্বকারী সামাজিক সংগঠন হিসাবে (রাষ্ট্রকেও) ভবিষ্যতে অতিক্রম করে যেতে পারে।" বহুজাতিক সংস্থার অন্যান্য বিভিন্ন দিকের আলোচনা ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র আর্থিক শক্তি হিসাবে এগুলির ভূমিকা সামান্য উল্লেখ করার আগে একটি তথ্যই সম্ভবত পরিস্থিতি উপলব্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। বর্তমান পৃথিবীর ১০০টি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে ৫১টি হলো উন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রশক্তি, বাকী ৪৯টি হলো এক একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে রাষ্ট্র ও বহুজাতিক সংস্থার মিলিত ক্রম-তালিকাতে জাপানের মিৎসুবিশি নামক বহুজাতিক সংস্থার স্থান দ্বাবিংশতিতম, অর্থাৎ ২১টি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রের পরই।

১৯৯৪ সালে প্রকাশিত 'আঙ্কটাডের' (ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট) রিপোর্ট অনুসারে '৯০-এর দশকে বিশ্বের মূল বহুজাতিক সংস্থার সংখ্যা (পেরেন্ট ফার্মস) সংখ্যা ছিল ৩৭,৫৩০টি এবং বিদেশে অনুমোদিত সংস্থার সংখ্যা ২,০৬,৯৬১টি। বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও নির্ভরশীল অগণিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। মূল প্রতিষ্ঠানগুলির দুই-তৃতীয়াংশ বা ২৬,০০০টি হলো ১৪টি উন্নত দেশের। ১৯৬০ সালের তুলনায় এগুলির সংখ্যা বেড়েছে ১৯,০০০টি। মূল বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিদেশে অনুমোদিত সংস্থাগুলির ১৯৯১ সালের বিক্রির পরিমাণ ছিল ৪.৮ ট্রিলিয়ন ডলার যা সমকালে বিশ্বের পণ্য ও নন-ফ্যাক্টর সার্ভিসেস রপ্তানির পরিমাণের চেয়ে সামান্য বেশী এবং ১৯৮০ সালের বিক্রয়ের দ্বিগুণ।

বহুজাতিক সংস্থাগুলি গ্লোবাল কর্পোরেশনে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায়, পুঁজির বৃহত্তম ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের লক্ষ্যে, নিজেদের পরস্পরের মিলন সাধনের (মার্জার) দ্বারা অথবা অন্যটিকে কিনে নিয়ে (অ্যাক্যুইজিশন) একীভবনের তৎপরতাও বর্তমানে তীব্র গতি গ্রহণ করেছে। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ তৎপরতায় যুক্ত পুঁজির পরিমাণ হলো ৩৩৬ বিলিয়ন ডলার, যা ১৯৮৮ সালের রেকর্ড ৩৩৫ বিলিয়ন ডলারকে অতিক্রম করেছে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৪ সাত বছরের মধ্যে এর সর্বন্যূন পরিমাণ ছিল ৩০৫ বিলিয়ন ডলার এবং মোট পরিমাণ ২.৭৬ ট্রিলিয়ন ডলার। সারা বিশ্বে এই কাল-

পর্বে 'মার্জার' ও 'অ্যাক্যুইজিশনে' যুক্ত হয়েছিল ৬ ট্রিলিয়ন ডলার। এই শতাব্দীর শেষে পৌঁছে এর পরিমাণ ১২ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৯৯০-এর দশকের প্রথমার্ধে বহুজাতিক সংস্থাগুলির দেশ ও অঞ্চলভিত্তিক মূল ও বিদেশে অনুমোদিত সংস্থার সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

দেশের নাম	মূল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিদেশে অনুমোদিত সংখ্যা	সাল
উন্নত দেশগুলি	৩৪,২৮০	৮৭,৮৩১	
অস্ট্রেলিয়া	১,০৩৬	৬৯৫	১৯৯২
অস্ট্রিয়া	৭১৬	২,১৭২	১৯৯১
বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ	৯৬	১,১২১	১৯৭৮
কানাডা	১,৩৯৬	৬,৩২৮	১৯৯২
ডেনমার্ক	৮০০	৬৪৭	১৯৯২
ফিনল্যাণ্ড	১,৩০০	১,৩০০	১৯৯৩
ফ্রান্স	২,২১৮	৭,৬১০	১৯৯১
জার্মানি	৭,৫৬০	১২,৫৬৬	১৯৯১
গ্রীস	—	৭৯৮	১৯৮১
আইসল্যাণ্ড	১৪	২৮	১৯৯১
আয়ারল্যাণ্ড	৩৬	১,০০৭	১৯৯৩
ইতালি	২৬৩	১,৪৩৮	১৯৯২
জাপান	৩,৬৫০	৩,১২৫	১৯৯২
নেদারল্যাণ্ডস	১,৬০৮	২,২৫৯	১৯৯৩
নিউজিল্যাণ্ড	২০১	১,০৭৮	১৯৯১
নরওয়ে	১,০০০	২,৭০০	১৯৯২
পর্তুগাল	৬৮৪	৬,৬৮০	১৯৯২
সাউথ আফ্রিকা	—	১,৮৮৪	১৯৭৮
স্পেন	৭৪৪	৬,২৩২	১৯৯২
সুইডেন	৩,৫২৯	২,৪০০	১৯৯১
সুইজারল্যাণ্ড	৩,০০০	৪,০০০	১৯৮৫
তুরস্ক	—	২,৫২৮	১৯৯৩
ইউনাইটেড কিংডম	১,৪৬৭	৩,৮৯৪	১৯৯২
ইউনাইটেড স্টেটস	২,৯৭২	১৫,৩৪১	১৯৯১
উন্নয়নশীল দেশগুলি	২,৮৫০	৯৭,৩৩০	১৯৯১
ব্রাজিল	৫৬৬	৮,৫৭৬	১৯৯২
চীন	৩৭৯	৪৫,০০০	১৯৯৩
কলম্বিয়া	—	১,০৪১	১৯৮৭
হংকং	৫০০	২,৮২৮	১৯৯১
ভারত	১৮৭	৯২৬	১৯৯১
ইন্দোনেশিয়া	—	১,০৬৪	১৯৮৮
মেক্সিকো	—	৮,৪২০	১৯৯৩
ওমান	—	১,৪৮৯	১৯৮৯
পাকিস্তান	৫৭	৫৬০	১৯৮৮

দেশের নাম	মূল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিদেশে অনুমোদিত সংখ্যা	সাল
ফিলিপাইনস	—	১,৯৫২	১৯৮৭
দক্ষিণ কোরিয়া	১,০৪৯	৩,৬৭১	১৯৯১
সৌদি আরব	—	১,৪৬১	১৯৮৯
সিঙ্গাপুর	—	১০,৭০৯	১৯৯৬
তাইওয়ান	—	৫,৭৩৩	১৯৯০
প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়া	১১২	৩,৯০০	১৯৯১
মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি	৪০০	২১,৮০০	
বালগেরিয়া	২৬	১১৪	১৯৯১
সি. আই. এস.	৬৮	৩,৯০০	১৯৯২
প্রাক্তন চেকোশ্লোভাকিয়া	২৬	৮০০	১৯৯২
হাঙ্গেরি	৬৬	২,৪০০	১৯৯২
পোল্যাণ্ড	৫৮	৩,৮০০	১৯৯২
রোমানিয়া	২০	৬,৯০০	১৯৯২
অন্যান্য	৯৩৬	৩,৮৮৬	১৯৯২

মূল বহুজাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ২২০টি ভৌগোলিকভাবে মাত্র কয়েকটি উন্নত দেশের। ১৯৯২ সালের হিসাব অনুসারে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬০টি, জাপানে ৫৪টি, ফ্রান্সে ২৩টি, জার্মানিতে ২১টি, ইউনাইটেড কিংডমে ১৪টি, সুইজারল্যাণ্ডে ৮টি, নেদারল্যাণ্ডসে ৫টি ও ইতালিতে ৫টি। এই ২০০টি বহুজাতিক সংস্থা বছরে ৭৩ বিলিয়ন ডলার লাভ করে, তার মধ্যে প্রথম ১০টি করে ২০ বিলিয়ন ডলার। ১৯৯২ সালের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর সর্বপ্রধান ১০টি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ঃ (১) রয়াল ডাচ/শেল (ইউ. কে./নেদারল্যাণ্ডস)— ১০০.৮ বি. ডলার, (২) এক্সন (ইউ. এস. এ.)—৮৫ বি. ডলার, (৩) আই. বি. এম. (ইউ. এস. এ.)—৮৬.৭ বি. ডলার, (৪) জেনারেল মোটরস (ইউ. এস. এ.)—১৯১ বি. ডলার, (৫) হিতাচি কোম্পানি (জাপান)—৬৬.৬ বি. ডলার, (৬) মিৎসুসিহিতা ইলেকট্রিক (জাপান)—৭৪.৪ বি. ডলার, (৭) নেস্‌লে (সুইজারল্যাণ্ড)—৩১.৩ বি. ডলার, (৮) ফোর্ড (ইউ. এস. এ.)—১৮০.৫ বি. ডলার, (৯) এলকাটেল এলসথ্রম (ফ্রান্স)—৪৪.৪ বি. ডলার, (১০) জেনারেল ইলেকট্রিক (ইউ. এস. এ.)—১৯২.৯ বি. ডলার। এই ১০টি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বাজারের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন সফ্টওয়্যার ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ, এয়ারোস্পেস ও ইলেকট্রনিক ইক্যুইপমেন্টের ক্ষেত্রে ৫টি এম. এন. সি., ফাস্ট ফুড-এ ২টি, সফট ড্রিঙ্কস, টোবাকো ও বিভারেজ-এর ক্ষেত্রে ৫টি। বিশ্বের বৃহত্তম ১০০টি এম. এন. সি.-র (ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্সের বহুজাতিক সংস্থাগুলি বাদে) মোট সম্পদের পরিমাণ ৩.৪ ট্রিলিয়ন ডলার (১৯৯২), যার মধ্যে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ রয়েছে এম. এন. সি.গুলির নিজ দেশের বাইরে। এই ১০০টি এম. এন. সি. বিশ্বের মোট এফ. ডি. আই.-এর (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) এক-তৃতীয়াংশের কর্তৃত্ব করে। আর সমস্ত এম. এন. সি.গুলির ক্ষমতাকে একত্রে বিচার করলে দেখা যায় যে প্রাইমারি ও নির্মিত পণ্যের বাজারীকরণের ৮০-৯০ শতাংশ এবং বিশ্ব-বাণিজ্যের ৬০ শতাংশ তাদের দ্বারা সরাসরি বা আন্তঃফার্ম ব্যবসার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিশ্বব্যাপী পুঁজি ও বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এম. এন. সি.গুলির এই প্রবল ক্ষমতাধর অবস্থান সতত প্রমাণ করে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতি এখন কতটা দুর্বল ও নির্ভরশীল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। তাছাড়াও বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকায় রয়েছে আরও বিভিন্ন দিক যার দ্বারা পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবন সংঘটিত হচ্ছে।

বিশ্বায়ন হলো মূলধনের গতিশীলতার এক ধরনের স্বাভাবিক পরিণতি। নেশন-স্টেট বা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন একদা স্বয়ং ছিল এই ধরনের পরিণতির একটি অধ্যায়। স্বয়ং মূলধনের চরিত্রের অভ্যন্তরেই গতিশীলতা নিহিত থাকে। তবে এই চরিত্র অর্জনের জন্য মূলধনের কোন একটি বা একাধিক এজেন্টের

কার্যকলাপ ও ভূমিকাকে নির্ধারকভাবে বা প্রধানত বলে চিহ্নিত করা যায় না। তথাপি, বর্তমান প্রক্রিয়ারও এজেন্ট রয়েছে, যা সমগ্র প্রক্রিয়ার অংশ হওয়া সত্ত্বেও, গতিশীলতার গতিপথকে মসৃণ করে ও স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছতে সাহায্য করে। পুঁজির আধুনিক বিশ্বায়নের প্রয়াসে, সেক্ষেত্রে যদি এজেন্টগুলিকে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলির মধ্যে প্রধানতম ভূমিকা গ্রহণকারী হলো বহুজাতিক সংস্থা ব্যবস্থা (সিস্টেম)।

বহুজাতিক সংস্থা হলো পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। বলাই বাহুল্য যে মূলধনের ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবন হলো সরাসরি ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্ব-মাত্রিক ব্যাপার এবং সেই মানদণ্ডে বর্তমান একচেটিয়াপনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গকেও বিশ্ব-মাত্রায় বিচার করতে হবে।

এবারে বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকা প্রসঙ্গে লগ্নী-পুঁজির (ফিনান্স ক্যাপিটাল) দিকটিকেও বিচারের অন্তর্গত করা দরকার। পূর্ববর্তীতে এই প্রসঙ্গে ফিনান্স-এর বিস্ফোরণ ও জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে এই ক্ষেত্র জুড়ে মূলধনের অবিশ্বাস্য গতিশীলতার কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিকে প্রধানত এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে কিছুকাল আগে পর্যন্ত বিচার করা হয়েছে। সর্বাধুনিক বিশ্ব-পটভূমিকায় একে খণ্ডিত মূল্যায়ন বলে বলা চলে। আসলে এগুলির ভূমিকা এখন প্রধানত ফিনান্স ক্যাপিটালের গ্লোবাল এজেন্ট হিসাবে। সাধারণভাবে বহু এম. এন. সি.-ই এখন সার্ভিস সেক্টরের 'গ্লোবাল জায়েন্ট', যে সার্ভিস সেক্টরের অন্তর্গত প্রায় সর্বাংশের ফিনান্সিয়াল সেক্টর।

উত্তেজনাময় বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে, তাকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করে বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিপুল মুনাফা অর্জন করে চলেছে। দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদের অসম বিস্তারের ও অবস্থার সদ্ব্যবহার করে, বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে মজুরির যে পার্থক্য রয়েছে তার মধ্য দিয়ে বাড়তি মুনাফা কামাই করে এবং বিশ্বের সার্বভৌম দেশগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বিভাজনকে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে, বিভিন্ন দেশের কর আইন, মাশুলের স্তরগুলি ও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি দিকগুলিকে নিজেদের অনুকূলে কারচুপি করে বহুজাতিক সংস্থাগুলি লগ্নী-পুঁজির গ্লোবাল এজেন্টের ভূমিকা নিচ্ছে। বাজারের অসম্পূর্ণতাকে তারা পরিণত করে আকাশ থেকে ঝরে পড়ার মত বিপুল মুনাফায় এবং দেশসমূহ ও মহাদেশগুলির পরস্পরের মধ্যে ও অভ্যন্তরে পরিকাঠামোর ও উৎপাদনের খরচে যে পার্থক্য ও দুর্বলতা রয়েছে, তা' ব্যবহার করে তুলে নেয় লাভ। এইসব কারণের জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে 'দা ইকনমিস্ট' পত্রিকা অন্যদিক থেকে 'ক্রিয়েচারস অব ইম্‌পারফেক্‌শন' বা অপূর্ণাঙ্গতায় সৃষ্ট জীব বলে চিহ্নিত করেছে। এটাও দাবী করা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে বিশ্বে কোন বহুজাতিক সংস্থা থাকবে না; যে নতুন ধরনের সংস্থা বহুজাতিক সংস্থার অভ্যন্তর থেকে গড়ে উঠবে, তা' হবে একরূপসম্পন্ন, সমপ্রকৃতির ও নিখুঁত।

বিদেশী প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগ

পুঁজির বৃদ্ধি ও বিকাশে, সুদীর্ঘকাল ধরেই পুঁজির রপ্তানি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু সুদূর অতীত থেকে এক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা ও পদ্ধতির গুণগত পরিবর্তন শুরু হয়েছে বর্তমান শতাব্দী থেকে। তার কারণ হলো, এই শতাব্দীতে পুঁজিবাদ নিজেই নিজের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত করা শুরু করেছে। শতাব্দীর প্রথমার্ধে একচেটিয়াপনা ও লগ্নী-পুঁজির দ্বারা সৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদী স্তরের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ঘটে চলেছে; ফলে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা স্থাণু ও একরূপ হওয়ার পরিবর্তে সবসময়েই চঞ্চল ও বহুমাত্রাসম্পন্ন। শতাব্দীর শেষ পাদে পৌঁছে, সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত পরিবর্তনশীল রূপের মত, লগ্নী-পুঁজির ব্যবস্থাও দ্রুত পরিবর্তনশীল চরিত্র নিয়েছে। নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গঠনে নতুন আর একপ্রস্থ তৎপরতার অধ্যায়ে, পুঁজির দুনিয়া জুড়ে প্রসারে, বিশ্ব-পুঁজিবাদ নতুন আর একপ্রস্থ তৎপরতা শুরু করেছে। নানা পদ্ধতি, সংগঠন ও সমন্বয়বাদী ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, গ্যাট বর্তমানে ডব্লু. টি. ও., ও. ই. সি. ডি., জি-৭, রাষ্ট্রসংঘ ইত্যাদি সংগঠনকে তারা এই মর্মে ঐকমত্য করাতে পেরেছে যে বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ,

উদারীকরণ, মুক্ত বাজার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি ব্যবস্থা অপরিহার্য। তার ফলে, এই নতুন উদ্যোগের উপযোগী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো গঠনের প্রয়াসও তীব্রতা পেয়েছে।

এই পটভূমিকা দেশের ভেতর থেকে বহির্মুখী মূলধনের চরিত্র ও গঠনও পরিবর্তিত হচ্ছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সুদূর অতীতের ব্যবস্থাগুলি ব্যতিরেকেই বলা যায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যায় পর্যন্ত মূলধনের বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ঘটতো প্রধানত বণ্ড কেনা, পরোক্ষ শেয়ার হোল্ডিং বা ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে। এই স্তরে এফ. ডি. আই. (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) মূলত নিয়োজিত হতো প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণে (এই উদ্দেশ্যে কলোনিগুলিতে রেললাইন প্রতিষ্ঠার জন্য বহিরাগত বিনিয়োগসহ) এবং সংশ্লিষ্ট উপনিবেশের অধিকারী সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকেই এই এফ. ডি. আই. ঘটতো। এখন পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। উন্নত দেশগুলির অভ্যন্তরে বর্তমানে মোট বিশ্ব এফ. ডি. আই.-এর নিরঙ্কুশ পরিমাণ নিয়োজিত হলেও শিল্পের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চালু হওয়ায়, তৃতীয় দুনিয়াতে এফ. ডি. আই.-এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছে ম্যানুফ্যাকচারিং বা যন্ত্রযোগে উৎপাদনের ব্যবস্থাতে। তার চেয়েও বেশী উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে, আর্থগত স্তরে বিস্ফোরণের বিভিন্ন উপাদান, পুঁজির বাজারের বিশ্বায়ন এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্ষমতার গতিশীলতা ও সংখ্যার বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটার জন্য এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে সামান্য অতীতে বিশিষ্ট ও গুটি কয়েক দেশের বিদেশে প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগকে লগ্নী পুঁজির প্রধান দিক বলে যাকে বলা হতো তার পরিবর্তন সম্পন্ন হয়ে, সামগ্রিক গতিময় এক বিশ্ব-পুঁজির চরিত্র নিয়েছে বর্তমানকালের এফ. ডি. আই.। এই পুঁজি সারা বিশ্বকে এক অখণ্ড ক্রীড়াক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করে এবং জাতীয় সত্তার পরিবর্তে একমাত্র স্বীকার করে বিশ্ব-সত্তাকেই।

১৯৯১ সালে, বিশ্বগত এফ. ডি. আই.-এর অনুমিত তহবিল ছিল ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এই পরিমাণটা হলো—১৯৮৫ সালে প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিদেশের মোট সম্মিলিত সম্পদের আড়াই গুণ। পরবর্তী প্রতি বছরে এফ. ডি. আই.-এর প্রবাহকে যদি যোগ করা যায়, তবে ১৯৯৫ সালে সেটির মোট পরিমাণ ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ সালের মধ্যে বিশ্ব এফ. ডি. আই.-এর তহবিল চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৬০ সালের সাথে তুলনা করলে এটা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০ গুণের বেশী।

১৯৮৮ সালের পর এফ. ডি. আই. বছরে ছিল ২০০ বিলিয়ন ডলারের মত। ১৯৯৪-৯৫ সালের পর এর গতি ও পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় হলো তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে এফ. ডি. আই. বৃদ্ধির বহর—১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে ৩০ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৯৫ সালে ৯০ বিলিয়ন ডলার। ১৯৮৯ সালে বিশ্ব এফ. ডি. আই.-এর ১৫ শতাংশ মাত্র তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে প্রবাহিত হতো, ১৯৯৫ সালে এই ভাগ দাঁড়িয়েছে ৩৮ শতাংশে। অবশ্য এই বর্ধিত প্রবাহের বেশীর ভাগটাই যায় ১০-১২টি নিউলি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজিং দেশগুলিতে এবং ১৯৯৪ সাল থেকে তৃতীয় দুনিয়ায় এফ. ডি. আই.-এর অর্ধেক যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক চীনে।

অপর লক্ষণীয় ঘটনা হলো বিদেশে প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগকারী সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশগুলির ভূমিকাতে বিশ্ব-অবস্থানের পরিবর্তন ঘটছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব কমছে, বাড়ছে জাপানের। জার্মানি ও ফ্রান্সও বিশ্ব এফ. ডি. আই.-তে নিজেদের অংশীদারিত্ব বাড়িয়েছে। ১৯৭৫-৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব এফ. ডি. আই.-তে অংশীদারিত্ব ৪৭ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে ১৯৯০ সালে দাঁড়িয়েছে ১৫ শতাংশে। ঐ সময়ে জাপানের অংশ ৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২২ শতাংশ হয়েছে। জার্মানি ও ফ্রান্সের অংশীদারিত্ব ঐ সময়ে যথাক্রমে ৬ ও ৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯ ও ১১ শতাংশ।

উন্নত দেশগুলির পক্ষ থেকে অর্থনীতির যেসব ক্ষেত্রে এফ. ডি. আই. ঘটছে তাও লক্ষণীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করছে প্রাইমারি প্রোডাকশন, অয়েল রিফাইনিং-সহ ম্যানুফ্যাকচারিং, পেট্রোলিয়ামের পরিবহনসহ পাবলিক ইউটিলিটি ও ট্রান্সপোর্টেশন, পেট্রোলিয়াম-সহ বাণিজ্য, ফিনান্স, অয়েল-ফিল্ড সার্ভিসেসসহ অন্যান্য সার্ভিসে। জাপানের পক্ষ থেকে এই বিনিয়োগ

ম্যানুফ্যাকচারিং, মাইনিং, কমার্স, ফিনান্স ও ইন্সিওরেন্স, রিয়েল এস্টেট ও অন্যান্যতে। ক্ষেত্রগুলির দিকে নজর দিলেই বোঝা যায় যে জাতীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতির শিল্পক্ষেত্রের প্রধান দিকগুলিতে এই লগ্নী-পুঁজি কিভাবে অনুপ্রবেশ করছে।

অতীতের উপনিবেশকালের চরিত্র থেকে প্রধানত ভিন্ন কারণে অনুন্নত দেশগুলিতে বর্তমানের ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ঘটছে। এই ধরনের বিনিয়োগ বাড়ছে সেইসব অঞ্চলে যেখানে মুনাফার সুযোগ বেশী পাওয়া যাচ্ছে। সেই বিচারে তৃতীয় দুনিয়া তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তৃতীয় দুনিয়ায় নতুন ও ব্যাপক বাজারের সুযোগ থাকায় ও বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দেশগুলিতে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করা শুরু করেছে উন্নত দেশগুলি এবং পরিশীলিত পণ্যও এখানে আনছে তারা।

নব্বই-এর দশকে পৌঁছে তৃতীয় দুনিয়ায় এফ. ডি. আই. বাড়ছে এই কারণেও যে এইসব দেশে বিনিয়োগে ঝুঁকি ক্রমাগত কমে চলেছে। কেননা সরকারগুলির হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কেবল কমে যায়নি, প্রায় সব সরকারই নিজ দেশে এফ. ডি. আই.-এর ব্যাপারে এখন উৎসাহী সমর্থক এবং নানা সুযোগ-সুবিধা বিদেশী পুঁজিকে দিচ্ছে। পাশাপাশি উন্নত দুনিয়ার তুলনায় তৃতীয় দুনিয়ায় এফ. ডি. আই. বেশী মুনাফা দিতে শুরু করেছে। এফ. ডি. আই. থেকে বেশী বেশী প্রতিদান পাওয়াতে দেশগুলিতে মূলধন গঠন ত্বরণ পাচ্ছে এবং এটা অনুমান করা হচ্ছে দেশ পিছু গড় এফ. ডি. আই. অচিরেই জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ অতিক্রম করে যাবে। অনুন্নত দেশে এফ. ডি. আই.-এর বার্ষিক পরিমাণ ১৯৯২ সালের মূল্যস্তরে ২০২০ সালে হবে ৪০০ বিলিয়ন ডলার। তবে পাশাপাশি একথাও সত্য যে তৃতীয় দুনিয়া মোট এফ. ডি. আই.-এর অর্ধেক ভাগীদার হয়ে উঠলেও, পৃথিবীর মোট অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠনে তাদের অংশ থাকবে মাত্র ৬ শতাংশ। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অসমান অবস্থা এতে কাটছে না, বরং বাড়ছে। উন্নত দেশগুলির সাথে শক্তি ও সামর্থ্যের ব্যবধানও কমছে না, বরং বাড়ছে। তবে অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজিবাদী বিকাশ, আরোপিত-ভাবে হলেও, অনেকটা গতি পেয়েছে এতে।

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় তথ্য ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

আর্থনীতিক মাপকাঠিতে যাকে বিশ্বায়ন বলা হচ্ছে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মাপকাঠিতে তাকে বলা চলে 'ইনফরমেশন এজ' বা তথ্য-যুগ, কেউ একে বলছেন 'দা ইলেকট্রনিক রিপাব্লিক' তথা বৈদ্যুতিন প্রজাতন্ত্র, অনেকে বলেছেন 'ডিজিটাল এজ', আবার কেউ উল্লেখ করেছেন 'এজ অব ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেপ্ট' বা সম্মতি আদায় করার কাল। 'মাস মিডিয়া অ্যাণ্ড ইনফরমেশন' অর্থাৎ গণ-মাধ্যম ও তথ্য বর্তমান যুগে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন হয়ে উঠছে এবং বিশ্ব শিল্প ও বাণিজ্যের হয়ে উঠছে অন্যতম উপাদান। পাশাপাশি, বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া সংগঠনে এটি অন্যতম এজেন্ট। বর্তমান-কালের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির স্তরে প্রযুক্তিগতভাবে প্রাগ্রসর যোগাযোগ মাধ্যম ও তথ্য ব্যবস্থার প্রাধান্য। তদুপরি, বিশ্ব-মাধ্যম ব্যবস্থা আধুনিককালে এমন এক নাটকীয় বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে যা একই সাথে শিল্পের পুনর্নির্মাণ ও বিধি-ব্যবস্থার পদ্ধতিকে পুনঃশক্তিমান করে তুলছে।

যোগাযোগ মাধ্যমের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলাফলে দু'টি প্রবণতা লক্ষণীয়। প্রথমত, মাধ্যম-শিল্পের প্রবল বিশ্বায়ন ছাড়াও এটিতে দ্রুত কর্পোরেট ঘনীভবন ঘটছে। সমগ্র মাধ্যম জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে মুষ্টিমেয় সংখ্যক শক্তি। বর্তমানে বিশ্বে লম্বভাবে যুক্ত নিরঙ্কুশ শক্তিশালী মিডিয়া কোম্পানি রয়েছে : নিউজ গ্রুপ, ডিজনি, টাইম ওয়ার্নার, ভায়াকম এবং টি. সি. আই.। তাছাড়াও এমন কতকগুলি প্রবল ক্ষমতার মাধ্যম প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের লক্ষ্য রয়েছে বিশ্ব-শক্তি হওয়ার, যেগুলির অন্তর্গত জেনারেল ইলেকট্রিক (এন. বি. সি.-র মালিক), ওয়েস্টিং হাউস (সি. বি. এস.-এর মালিক), সোনি, সিগ্রাম (এম. সি. এ.-র মালিক) এবং ইউরোপীয় কতকগুলি অতিকায় প্রতিষ্ঠান যেগুলির নেতৃত্বে রয়েছে ফিলিপস (পলিগ্রামের মালিক), হাভাস এবং বার্টেলসমান এ. জি.। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি

তৈরি করে সারা বিশ্বের জন্য চলচ্চিত্র, বই, রেকর্ডেড মিউজিক ও টেলিভিশনের কর্মসূচী এবং মালিকানা করে পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িকী, রেডিও স্টেশন, কেবল কোম্পানি ও টেলিভিশন নেটওয়ার্কের। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুবৃহৎ কর্পোরেট ইলেকট্রনিকস্ তথা বৈদ্যুতিন ফার্মের সাথে যুক্ত। পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির দেশে দেশে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, বিনোদনধর্মী পার্ক, অবসর যাপনের আবাস ইত্যাদির ব্যাপক মালিকানা। তাছাড়া, বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্রম-প্রসারমাণ বাজারের পরিকল্পনার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার প্রসার বাণিজ্যিক প্রচার ব্যবস্থাপনার শক্তিকে বাড়িয়ে চলেছে দারুণভাবে। বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপনের বাণিজ্যের কর্তৃত্ব রয়েছে মাত্র ২০০টির মত সুবৃহৎ তথ্য-বহুজাতিক সংস্থার হাতে এবং নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস ও টোকিওতে অবস্থানকারী দারুণ শক্তিশালী গুটিকয়েক সংস্থা বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপনের এজেন্সি হিসাবে কাজ করে। বিগত এক দশকে বিজ্ঞাপনের খরচ ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী ২০০০ সাল ও পরবর্তীতে এই গতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ছাড়িয়ে যাবে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপনের খরচ ১৯৯৫ সালে ৩৩৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২০ সালে ২ ট্রিলিয়ন ডলারে পরিণত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন খরচ বৃদ্ধির গতি জি. ডি. পি.-র বার্ষিক বিকাশের গতির সমান হয়ে উঠেছে; অনুরূপ অগ্রগতি ঘটছে ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার বিজ্ঞাপনের বাণিজ্যে।

বহুজাতিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির অবিশ্বাস্য ধরনের ব্যাপকতা ও গতি সৃষ্টির পেছনে অপর কারণগুলি হলো—প্রচার ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ, বি-নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ টেলিভিশন ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ। ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত অধিকাংশ রাষ্ট্র স্বদেশীয় প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে এসেছে না-লাভ, না-লোকসানের ভিত্তিতে। কিন্তু বর্তমানে 'স্যাটেলাইট ডিজিটাল টেলিভিশন' পদ্ধতি অনেক কম খরচে ও ব্যাপক এলাকা জুড়ে প্রচারের সুযোগ এনে দিয়েছে। ফলে, যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবস্থার বিশ্বায়ন ঘটা ছাড়াও, সামগ্রিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সক্রিয় সহযোগী হয়ে উঠেছে প্রচার ও তথ্য মাধ্যম ব্যবস্থা। তাই সরকারগুলিও মাধ্যমকে ব্যবহার শুরু করেছে লাভের লক্ষ্যে।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হলো ঃ ডিজিটাল কমিউনিকেশনের উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক অগ্রগতি—যেমন ওয়ারলেস মোবাইল কমিউনিকেশন, যা যোগাযোগকে কম ব্যয়সম্পন্ন করেছে এবং করেছে অধিকতর গম্য ও ভোক্তা-অনুকূল। এই নতুন উদ্ভাবনী ও প্রয়োগ প্রচারের বিশ্বায়নকে উৎসাহিত করছে এবং তুলনামূলকভাবে কম খরচে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সমস্ত ধরনের প্রচার মাধ্যম ডিজিটাল ছাঁচে পরিণত হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যমের পরস্পরের মধ্যে অন্তঃসংযোগ ও রূপান্তর সহজসাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে মাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলির পরস্পরের সাথে সমন্বয় ও একের দ্বারা অপরের আত্মীকরণও সহজসাধ্য হচ্ছে। এইসব নতুন উদ্ভাবনী ও ব্যবস্থাগুলির ফলে অতীতের মত প্রচার মাধ্যমকে কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কেননা, বর্তমান পদ্ধতি ও ব্যবস্থায় প্রচার উপাদান উৎপাদন ও বন্টন স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রণালীতে সর্বাপেক্ষা নাটকীয় উদ্ভাবন হলো 'ইন্টারনেট'। আই. বি. এম. সংস্থার একজন এ' কারণে বলেছেন যে ২০০০ সাল নাগাদ 'ইন্টারনেট' হয়ে উঠবে "বিশ্বের বৃহত্তম, গভীরতম, দ্রুততম ও সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত আর্থিক বাজার", যা বাণিজ্যিক স্তরে বছরে লেনদেন করবে ১ ট্রিলিয়ন ডলার। শতাব্দী শেষে চারটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 'ডাটা-ব্রডকাস্টার' সৃষ্টি হবে যেগুলি বিচিত্র ও ব্যাপক ধরনের অগণিত সংখ্যক পার্সোনাল কমপিউটারের জন্য সমস্ত রকমের 'প্যাকেজ' সরবরাহ করবে। এইরকম ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির প্রত্যাশা থেকে দাবী করা হচ্ছে যে পুঁজিবাদের নতুন স্তর তথা বিশ্বায়নের অধ্যায় হবে 'ফ্রিকশন-ফ্রি ক্যাপিটালিজম' বা সংঘাতহীন ধনতন্ত্র, কেননা ত্রুটিহীন তথ্য ব্যবস্থা ও তথ্য ত্রুটিহীন বাজার গঠনের বাস্তবতা সৃষ্টি করে দেবে। এবং এটা কেবলমাত্র কমপিউটারিকরণ বা ডিজিটাল টেকনোলজির উদ্ভাবনের জন্য নয়, 'ইন্টারনেট' ব্যবস্থার জন্য। প্রথম দুই ব্যবস্থার অবিস্মরণীয় অগ্রগতিকে তিন 'ডব্লু' (ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা বিশ্বব্যাপী ঢেউ) বলে পরিচিত করানো হচ্ছিল, কিন্তু এখন তিন ধরনের যোগাযোগ কৌশলের অর্থাৎ পার্সোনাল কমপিউটার, টেলিফোন ও টেলিভিশনের সমন্বয়ে

গঠিত 'ইন্টার-অ্যাকটিভ কমিউনিকেশন' ব্যবস্থা সব কিছুকে অতিক্রম করে এক ধরনের নতুন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই শেষোক্ত পদ্ধতিই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বময় গঠন করে চলেছে "ইনফরমেশন হাইওয়ে।"

অমিত ক্ষমতাধর ও বিশ্বায়িত প্রচার মাধ্যমগুলির প্রধান বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির ক্ষেত্রে '৯০-এর দশক থেকে দুই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে—প্রধানত বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব আরও নিরঙ্কুশ, ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভূত করার জন্য। কেননা প্রচার মাধ্যম এখন স্বয়ং পুঁজিতে পরিণত হয়েছে। এই প্রবণতাদ্বয়ের একদিকে ঘটছে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সম্মিলন (মার্জার) ও সংযুক্তিকরণ (ইনকর্পোরেশন) এবং অন্যদিকে কাজের বহুমুখীনতা (ডাইভারসিফিকেশন) রচনা। ১৯৯৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইনফরমেশন টেকনোলজি ইণ্ডাস্ট্রিতে মার্জার ও অ্যাক্যুইজিশন খাতে লেনদেন লাফিয়ে ৫৭ শতাংশে দাঁড়ায়, যার অর্থমূল্য ১৩৪ বিলিয়ন ডলার।

কিন্তু পূর্বোক্ত পরিস্থিতির প্রভাব সারা বিশ্বে কেবল অসমান মাত্র নয়, সেই অসাম্যের অভ্যন্তরে শোষণের পরোক্ষ চিহ্নও বিদ্যমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় রয়েছে বিশ্বের মোট টি. ভি. ও রেডিও সেটের দুই তৃতীয়াংশ, যদিও এই দুই অঞ্চলে বাস করে যথাক্রমে বিশ্বের জনসংখ্যার ১৪.৯ শতাংশ ও ৫.২ শতাংশ। বিপরীতদিকে সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত হলো আফ্রিকা যেখানে ১২.১ শতাংশ মানুষ বাস করলেও এই অঞ্চলে রেডিও ও টি.ভি. সেটের হার যথাক্রমে ৩.৭ ও ১.৩ শতাংশ। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আরও জ্বলন্ত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ১৯৯৪ সালে ভারতে যেখানে প্রতি ১০০০ মানুষে ০.০০২ শতাংশ ইন্টারনেট-ব্যবহারকারী ছিল, সুইডেনে ছিল ৪৮.৯ শতাংশ। তাই উন্নত-অনুন্নত দুনিয়ার মধ্যে প্রচার ও তথ্য মাধ্যম ব্যবস্থার বিভাজনের বিশ্বায়নকে বলা হচ্ছে 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েজ'—বিশ্ব জুড়ে ভেদ গঠন।

জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা সংকুচিত করার বিশ্বায়ন

পুঁজিবাদের উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাসের সাথে নেশন-স্টেট তথা জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বীয় সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য মূলধনের প্রথমাবধি প্রয়োজন হয়েছে যথোপযুক্ত মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক কাঠামোর। এই কাঠামো সরবরাহ করে এসেছে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান। ধনতন্ত্র নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সর্বজনীনতার ভিত্তিতে জাতীয়-রাষ্ট্র গঠন করে কাঁচামাল, শ্রম, উৎপাদন ও বাজারের প্রাথমিক নিশ্চয়তা ও কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেছিল। মতাদর্শগতভাবে জাতীয়তাবাদ সঞ্জীবিত করে অন্য এলাকা বা দেশ থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের জনগণকে পৃথক রেখে পুঁজির অব্যাহত প্রাথমিক বিকাশ, বিস্তার, ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনকে নিশ্চিত করেছিল। জাতীয় রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিধি-ব্যবস্থা গঠন ও সংহত করে বুর্জোয়ারা নিরুদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল নিজ শ্রেণী ও ব্যবস্থা সম্পর্কে। পুঁজিবাদের কঠিন সংকটের মুহূর্তগুলিতে জাতীয় রাষ্ট্র পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছে—অর্থনীতিকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে রাজনীতি। এমনকি পুঁজিবাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও পরিণাম হিসাবে বাজারের প্রসারও ঘটেনি। এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে 'জনব্রতী রাষ্ট্র' ও 'সামাজিক নিরাপত্তা' ব্যবস্থা চালু করে জাতীয় রাষ্ট্র পুঁজির বাজার বৃদ্ধিতে স্বয়ং দায়িত্ব নিয়েছিল। পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণে অতীতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল জাতীয় রাষ্ট্র। এইভাবে জাতীয় রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল মূলধনের প্রতি প্রধান দায়বদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি। জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীগুলির মধ্যে এবং এক একটি শ্রেণীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশের সাথে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত যোগাযোগের এবং শাসকশ্রেণীর স্বার্থে শ্রেণীগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের সর্ববিস্তৃত জালসম্পন্ন এক প্রণালী হিসাবে।

কিন্তু আধুনিক বিশ্ব অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় পুঁজিবাদের বিকাশের সামনে অনেক বেশী উন্মুক্ত। জাতীয় রাষ্ট্র স্বয়ং কয়েকশত বছরের ব্যাপক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এই অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে মূলধন অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী তরল ও গতিশীল, যা বিশ্বের যে কোন দুর্গম প্রান্তে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম ও কার্যকরী। এমনকি চরম অন্তর্মুখীন দেশগুলিও (অবশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিসহ) এখন নিজেদের দরজা খুলে দিয়েছে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের

সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের জন্য এবং তার ফলেও অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বিশ্বব্যাপী পুঁজির চাহিদা বেড়েছে। সমস্ত দেশগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্যের চাহিদা ও বিনিময় সংঘটিত হওয়া এবং অন্য দেশ থেকে বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতিতে অব্যাহত অনুপ্রবেশ শুরু করাতে, এক দ্রুতগতিসম্পন্ন বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও চালু হতে শুরু করেছে। আধুনিক ধনতন্ত্রের নেতৃত্বে, অতীতের যে কোন কালের তুলনায়, বিশ্ব এখন সংযুক্ত রূপ পরিগ্রহ করছে। মূলধন এখন সক্রিয় হয়েছে এমন এক বিশ্বে যা অতীতের ঔপনিবেশিকবাদ, সার্বভৌম অর্থনীতি বা রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতার মত তথাকথিত "বিকৃতি"র দ্বারা প্রতিরুদ্ধ নয়।

এই রকম পরিস্থিতিতে বিশ্বায়ন ব্যবস্থা, জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা পুনর্নিরূপণের জন্য, সর্বময় চাপ সৃষ্টি করছে। অতিতে জাতীয় রাষ্ট্রকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় শক্তি হিসাবে গণ্য ও প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা করে এসেছে বুর্জোয়ারা। বিশ্ব-পুঁজির নির্দিষ্ট স্বার্থের মাপকাঠিতে এই অলঙ্ঘনীয়তার নীতি সৃষ্টি হয়েছিল। এটি উভয়ত প্রয়োজন হয়েছিল বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জনগণকে পুঁজির অধীনস্থ রাখার স্বার্থে। কিন্তু এখন নীতির আদলগুলিকে সাজানো হচ্ছে ভিন্নভাবে। মূলধন ও পণ্যের বিশ্বময় সংহতি সাধন ও মুক্ত বিকাশের পথে সামান্য বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ালে জাতীয়তাবাদ ও অর্থনৈতিক সংরক্ষণবাদকে এখন আত্মঘাতী ও পশ্চাৎপদতার লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অবশ্য এসবই এখন পর্যন্ত প্রধানত তৃতীয় দুনিয়ার জন্য দাওয়াই।

স্বভাবতই জাতীয় রাষ্ট্র তথা সরকারের, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার, সার্বভৌম ও ব্যাপক ক্ষমতাকে ক্রমান্বয়ে সংকুচিত বা অপহরণের জন্য নানাবিধ তৎপরতা ও ব্যবস্থা, নানানভাবে ও মাধ্যমে একের পর এক গৃহীত ও কার্যকরী হতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রকে দিয়েই প্রধানত স্বীয় আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্যে এই পরিবর্তন শুরু করেছে বিশ্ব-পুঁজিবাদ। এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে 'ডাউনসাইজিং অব গভর্নমেন্ট'। জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানাকে অতিক্রম করার প্রধান এজেন্সি বা মাধ্যম হিসাবে এবং অংশত জাতীয় রাষ্ট্রের কোন কোন ভূমিকার পরিপূরক হিসাবে সূক্ষ্মভাবে সামনে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে নানান ধরনের প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাসহ সংগঠন, যার অন্যতম প্রধান হলো মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি। এগুলিকে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে সুপ্রা-স্টেট বা অতিরাষ্ট্রে এবং চরিত্রায়ণ করা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের পরিপূরক গ্লোবাল কর্পোরেশন হিসাবে। এই কারণে কোন কোন বিশেষজ্ঞ এখন বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকায় সৃষ্ট বাস্তবতাকে বলতে শুরু করেছেন 'টুইলাইট অব সভ্‌রিনিটি' বা সার্বভৌমত্বের উষালগ্ন।

'ডাউনসাইজিং অব গভর্নমেন্ট' প্রক্রিয়াতে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফাণ্ডের ভূমিকাও অন্যতম প্রধান। তৃতীয় দুনিয়ার জাতীয় সরকারগুলিকে দিয়ে, উন্নয়ন সম্পর্কে নীতিগুলির কেন্দ্রীয় মর্ম হিসাবে, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক গ্রহণ করাতে শুরু করেছে 'মার্কেট ফ্রেণ্ডলি অ্যাপ্রোচ টু ডেভেলপমেন্ট' বা উন্নয়নের কাজে বাজার-অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়ণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' বা কাঠামোগত সংস্কারের কর্মসূচীগুলিকে। এক্ষেত্রে প্রধান নীতি ও ব্যবস্থাগুলি হলো : পণ্য উৎপাদনে সরকারের ভূমিকা গ্রহণ বন্ধ এবং বাজারের বিষয়ে হস্তক্ষেপ বাতিল। সরকারকে অর্থনীতির বি-নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে বাজার নিজেই দর নির্ধারণ করতে পারে ও বিনিয়োগ নিজের পথ করে নিতে পারে। সরকারকে কেবলমাত্র পরিকাঠামো ও জনপরিষেবার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সেইসব বিষয়ে যুক্ত থাকতে হবে যাতে বাজারী শক্তির কোন উৎসাহ নেই। সরকারগুলি স্বদেশীয় অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করবে, বাণিজ্যে সমস্ত ধরনের শুল্ক ও বি-শুল্কের বাধা অপসারণ করবে এবং মূলধনের সঞ্চালনের সামনে সমস্ত ধরনের প্রতিবন্ধকতা তুলে নেবে। বৃহত্তর একক সংক্রান্ত অর্থনৈতিক নীতিগুলিতে (ম্যাক্রোইকনমিক পলিসিজ) সরকারকে আর্থিক ঘাটতি কমাতে হবে; মুদ্রাস্ফীতি রোধ এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাজারভিত্তিক উৎসাহ দিতে হবে।

আর্থিক ও বৃহত্তর একক সংক্রান্ত অর্থনৈতিক স্তরের কর্মসূচী ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফাণ্ডের

ভূমিকারও অন্তর্গত। এটা হলো বিশেষজ্ঞমূলক ক্ষেত্র। পরিবর্তিত নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতিতে আই. এম. এফ. স্বীয় শর্তাবলী আরও কঠোর ও কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা শুরু করেছে। 'গ্যাট চুক্তির ব্যবস্থাপনা ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন (পরবর্তীকালে আলোচিত হবে) পূর্বোক্ত সমগ্র লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়ন শুরু করেছে সারা বিশ্বময়। এই ধরনের নীতিগুলির আর এক প্রধান অংশ হলো সরকারকে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণে বাধ্য করা।

তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়াদের বিশ্বায়ন

নতুন পরিস্থিতি তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়াদের অধিকাংশকেই নতুন ও এক সর্বজনীন অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করছে। এইসব দেশের শাসকশ্রেণী শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে সাধারণভাবে যেমন দুর্বল, অন্যদিকে তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্যও ছিল। নানা ঐতিহাসিক ও বাস্তব কারণে তাদের ভূমিকা ছিল এতই জটিল যে এক ধারায় তা' বিশ্লেষণ করা যায় না। বিশ্ব-পুঁজিবাদ যে সংকটের সম্মুখীন হয়ে নতুনের জন্য সন্ধান শুরু করেছিল, তা' তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রেও বহুলাংশে সত্য ছিল, কেননা তৃতীয় দুনিয়ার ব্যবস্থা ছিল সমগ্র বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ। সমগ্র আশির দশক জুড়ে কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে 'ক্রাইসিস-ম্যানেজমেন্ট' বা সংকটের ব্যবস্থাপনার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলিও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। ঋণজালে আবদ্ধ হওয়া, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় 'সাপোর্ট বেস' অবসিত ও সাম্রাজ্যবাদীদের চাপ প্রতিরোধ করার শক্তি লুপ্ত হওয়া, পুঁজি ও বাজারের ক্রমবর্ধমান সংকট, দেশের অভ্যন্তরে জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার ফলে শ্রেণী-অস্তিত্ব ও ক্ষমতা রক্ষা করার প্রশ্নে গভীর সংশয়, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রায় বিলোপের ফলে তৃতীয় দুনিয়ার ঐক্যে ভাঙ্গন, পাশাপাশি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক তীব্র অভিঘাত ইত্যাদির ফলে তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়ারা নিজ নিজ অনুসৃত পথ দ্রুত পরিত্যাগ ও বহুলাংশে আত্মসমর্পণ করা শুরু করেছে। তবে একে কম্প্রাডর বা মুৎসুদ্দি প্রবণতা বলে সরাসরি চিহ্নিত করা যায় না। কেননা, নতুন সুযোগ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও শিল্পোন্নত দেশগুলির সংকট মোচনের স্তরে যথেষ্ট সতর্কতা এবং তাদের নিজেদের মধ্যে তীব্র অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এক বা অনেকের তৃতীয় দুনিয়া বিচ্ছিন্নতার সমস্যা তো রয়েছেই। তাই অতীতের মত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে সরাসরি অধীনস্থ রাখার কর্মকাণ্ড ও কৌশলের পরিবর্তন সাধন করছে উন্নত দেশগুলি। তাছাড়া, নতুন পরিস্থিতিতে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মানচিত্রে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির অবস্থানগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বায়নের নতুন ব্যবস্থায় শেষোক্তদের, মৌখিকভাবে হলেও, সব অধিকারদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'গ্লোবাল পার্টনার' বা বিশ্ব-অংশীদার করার নতুন কৌশলও রয়েছে বিশ্ব-পুঁজিবাদের। সবকিছু মিলিয়ে তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়াদের পরস্পরের মধ্যে এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে যে এই বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়ায় কত দ্রুততার সাথে নিজেদের যুক্ত করা যায়। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্গত হলেও প্রায় চার দশক ধরে জাতীয়তাবাদ ও স্বনির্ভরতার যে নীতির দ্বারা উন্নত দেশগুলির সাথে এক ধরনের প্রতিরোধ ও বিরোধ তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়ারা চালিয়েছিল এবং যা বিশ্ব-পুঁজিবাদের বৃদ্ধির সামনে একধরনের সমস্যা গড়ে তুলেছিল, এখন তা' অবসানের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে। তাই তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়ারা কেবল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে উঠছে না, এইসব দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যে অতীতের ভূমিকার বিভিন্নতার অবসান হয়ে একধরনের সম-দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবস্থাভিত্তিক বিশ্বায়ন ঘটছে।

শোষণ, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বঞ্চনার বিশ্বায়ন

'গ্লোবালাইজেশন'-এর শ্লোগানে মানুষকে সমবেত করার জন্য নানা তত্ত্ব, ঘোষণা ও কর্মসূচী উপস্থিত করা হলেও, কার্যকালে মোট পরিণাম জনগণ, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে, অতি দ্রুত ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এ'বিষয়ে বিস্তৃত দিকগুলি পরবর্তীকালে উল্লেখ করা সাপেক্ষ গ্লোবালাইজেশনের দ্বারা 'গ্রোথ' বা বিকাশের তাৎপর্য, সাধারণত, কিভাবে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে, সেবিষয়ে কিছু উল্লেখ দরকার। 'ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' (ইউ. এন.

ডি. পি.)-এর 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯৬', এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য উপস্থিত করেছে।

বিশ্বায়নের ফলে তথাকথিত অগ্রগতি কার্যকালে দাঁড়িয়েছে 'জবলেস গ্রোথ' বা কর্মহীন বিকাশ, 'রুথলেস গ্রোথ' তথা নিষ্করুণ বিকাশ, 'ভয়েসলেস গ্রোথ' অর্থাৎ কণ্ঠরুদ্ধ বিকাশ, 'রুটলেস গ্রোথ' বা গভীরতাহীন বিকাশ এবং 'ফ্রুটলেস গ্রোথ' তথা ফলহীন বিকাশ। তবে, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে উল্লেখিত এই ধরনের মূল্যায়নের পেছনে যুক্তি ও তথ্যের ব্যাখ্যা, প্রকৃত প্রস্তাবে, সমগ্র বাস্তবতাকে উদঘাটিত করে না। কিন্তু রিপোর্টটির বিশ্লেষণগুলির মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের নেতিবাচক ফলাফলকে অনেকটা অনুমান করা চলে। নব্বই-এর দশকে বিশ্বব্যাপী জনগণের, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার, বৈষম্য, বঞ্চনা, বেদনা, দুর্দশা ও শোষণের কিছুটা স্বরূপ বোঝা যায় নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি থেকে ঃ

১৯৯৩ সালে, সারা বিশ্বের মোট ২৩ ট্রিলিয়ন ডলার জি. ডি. পি.'র ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারই ছিল শিল্পোন্নত দেশগুলিতে; বাকি দুনিয়াতে বিশ্বের ৮০ শতাংশ মানুষ বাস করলেও সেই সমস্ত দেশগুলির জি. ডি. পি. মাত্র ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। বিগত ৩০ বছরে, দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ২০ শতাংশ মানুষের বিশ্ব-উপার্জনে ভাগ ২.৩ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে ১.৪ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনী ২০ শতাংশ মানুষের বিশ্ব-উপার্জনের অংশ ৭০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫ ভাগ হয়েছে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনী ৩৫৮ জন সহস্র কোটিপতির বার্ষিক উপার্জন বিশ্বের ৪৫ শতাংশ জনগণ বাস করে এমন দেশগুলির তুলনায় বেশী। বিশ্বের যে অংশের মানুষের মাথাপিছু বছরে উপার্জনে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়, তাদের সংখ্যাগত হারের বৃদ্ধি ঘটেছে দ্বিগুণ—১২ থেকে ২৭ শতাংশে; অন্যদিকে জনসংখ্যার যে অংশের বার্ষিক মাথাপিছু উপার্জন ক্রমাগত কমে যাচ্ছে তাদের সংখ্যাগত হার বেড়েছে তিনগুণের বেশী—৫ থেকে ১৮ শতাংশ।

১৯৯৪ সালে, লো-ইনকাম ইকনমিক বা সর্বাপেক্ষা নিম্ন-আয়ী অর্থনীতির দেশগুলির, বিশ্বের মোট জি. এন. পি.-র মধ্যে অংশ ছিল ৪.৮ ভাগ, অথচ এখানে বাস করে ৫৭ শতাংশ মানুষ। বৈষম্যের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে জাপানের মাথাপিছু জি. এন. পি. ইথিওপিয়ার চেয়ে ৩৫০ গুণ বেশী, আমেরিকার মাথাপিছু জি. এন. পি. ভারতের চেয়ে ৮০ গুণ বেশী। হাই-ইনকাম ইকনমিক্স তথা উন্নত আয়ের অর্থনীতিসম্পন্ন দেশগুলির জি. এন. পি. নিম্ন-আয়ী অর্থনীতির দেশগুলির চেয়ে গড়ে ৬০ গুণ বেশী। নিম্ন ও মধ্য আয়ী দেশগুলিতে বিশ্বের ৮৫ শতাংশ মানুষ বাস করলেও বিশ্বের মোট জি. এন. পি.-তে তাদের ভাগ মাত্র ২১ শতাংশ। অন্যভাবে বলা যায় যে উন্নত-আয়ী অর্থনীতির দেশগুলিতে ১৫ শতাংশ মানুষ বাস করলেও, বিশ্ব-জি. এন. পি.-তে তাদের অংশীদারিত্ব হলো প্রায় ৮০ শতাংশ।

বিশ্বায়নের অভিঘাতে এই বৈষম্য ও ব্যবধান কেবল পূর্বোক্ত চরিত্রেই সৃষ্টি হচ্ছে না, হাই-ইনকাম ইকনমিক্স-এর অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যেও পার্থক্য ক্রমশ বেড়ে উঠছে। সুইজারল্যাণ্ডের মাথাপিছু জি. এন. পি. ৩৭,৯৩০ ডলার যা পর্তুগালের চেয়ে ৪ গুণ এবং নিউজিল্যাণ্ড ও স্পেনের চেয়ে ৩ গুণ বেশী। জি-৭ ভুক্ত দেশগুলির উদাহরণও যদি গ্রহণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে জাপানের মাথাপিছু জি. এন. পি. ব্রিটেনের চেয়ে ১.৯ গুণ এবং আমেরিকার চেয়ে ৩৩ শতাংশ বেশী। বিশ্বের মোট জি. ডি. পি.-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলো বিশ্বের একক বৃহত্তম শক্তিধর দেশ যাদের অংশীদারিত্ব ২৬.৪ শতাংশ এবং জাপান দ্বিতীয় ও জার্মানী তৃতীয়, যাদের ভাগ হলো যথাক্রমে ১৮.২ শতাংশ ও ৮.১ শতাংশ।

দারিদ্র্যায়ণের অন্য কিছু দিক এবারে পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করা যাক ঃ

তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনীতি : বৈদেশিক ঋন এবং বিদেশাগত বিনিয়োগ (১৯৯৩)

গোষ্ঠী / দেশ	মোট বৈদেশিক ঋণ (বি. ডলারে)	ঋণ পরিশোধ্য রপ্তানি (শতাংশে)	নীট বিদেশী বিনিয়োগ (বি. ডলারে)	* এফ.ডি.আই./ জি.ডি.আই. (শতাংশে)	** নীট ই.পি.ই.আই. (বি. ডলারে)
লো ইনকাম ইকনমিক্স	৪৩৯.৮	১৬.৪	২৮.৮	৯.৭	৪.৭
ইথিওপিয়া	৪.৭	৯.০	০.০	০.০	০.০
ভারত	৯১.৮	২৮.০	০.৩	০.০	১.৮
নাইজিরিয়া	৩২.৫	—	০.৯	১৯.১	০.০
চীন	৮৩.৮	১১.১	২৫.৮	১৪.৮	২.৩
মিশর	৪০.৬	১৪.৯	০.৫	৮.২	০.০
মিডল ইনকাম ইকনমিক্স	১১২৩.৮	১৮.৮	৩৫.৭	৪.০	৪২.২
ইন্দোনেশিয়া	৮৯.৫	৩১.৮	২.০	৪.৯	১.৮
থাইল্যাণ্ড	৪৫.৮	১৮.৭	২.৪	৪.৮	৩.১
ব্রাজিল	১৩২.৭	২৪.৪	০.৮	০.০	৫.৫
মালয়েশিয়া	২৩.৩	৭.৯	৪.৪	২০.৭	৩.৭
মেক্সিকো	১১৮.০	৩১.৫	৪.৯	৬.৫	১৪.৩
আর্জেন্টিনা	৭৪.৫	৪৬.০	৬.৩	১৩.৭	৩.৬
দক্ষিণ কোরিয়া	৪৭.২	৯.২	০.৫	০.০	২.৪
নিম্ন + মধ্য আয়ী অর্থনীতির দেশসমূহ	১৫৬৩.৫	১৮.৩	৬৪.৫	৫.৪	৪৬.৬

* এফ. ডি. আই. (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)/জি. ডি. আই. (গ্রস ডোমেস্টিক ইনভেস্টমেন্ট)

** ই. পি. ই. আই. (ফরেন পোর্টফোলিও ইক্যুইটি ইনভেস্টমেন্ট)

অর্থনৈতিক এই চিত্রের পাশাপাশি জনগণের দুর্দশার অন্য কিছু দিক লক্ষ্য করা যেতে পারে। অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে এই তথ্য হলো : নিরাময়যোগ্য তেমন রোগ যেমন—পেটের অসুখ, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মাতে বছরে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটছে। বিশ্বে যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ এইচ. আই. ভি. জীবাণুতে আক্রান্ত (যা থেকে কালক্রমে এইডস রোগ হয়), তার ৯০ শতাংশ বাস করে অনুন্নত দেশগুলিতে। দুনিয়াতে ১৩ কোটি শিশু ও ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ কিশোর যথাক্রমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ৮০ কোটি মানুষ উপযুক্ত খাদ্য পায় না, যার মধ্যে ৫০ কোটি অপুষ্টির শিকার। বিশ্ব জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ তথা ১৩০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। প্রতি ১লক্ষ গর্ভবতী নারীর ৩৮৪ জন মারা যান প্রসবকালে। এই হার ও. ই. সি. ডি.- ভুক্ত দেশগুলির তুলনায় ১২ গুণ বেশি। বিশ্বের মোট শিশুর এক-তৃতীয়াংশ অপুষ্টিতে ভোগে। পাঁচ বছরের নীচের প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে ৯৭ জন মারা যায়, যা শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় ১২ গুণ বেশি। মরুভূমি বা জমির অনুর্বরতা বৃদ্ধির জন্য আক্রান্ত জনগণের সংখ্যা ২০ কোটি। ১৯৯৪ সালের শেষে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, জাতিগত, অর্থনৈতিক বা প্রাকৃতিক কারণে উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা ২০ কোটি। প্রতি বছর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যের ২ কোটি হেক্টর ধ্বংস করা হচ্ছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে চিত্রটি হলো ঃ বর্তমানে বেকারীর হার ৮ শতাংশ, যুবকদের মধ্যে এই হার ১৫ শতাংশ। ৪০ শতাংশ গৃহস্থালি পরিবারের উপার্জন ১৮ শতাংশ মাত্র। ২০ লক্ষ মানুষ এইচ. আই. ভি.-তে আক্রান্ত। বয়স্কদের এক-তৃতীয়াংশের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা নেই। শ্রমিকাদের মজুরির পরিমাণ শ্রমিকদের দুই-তৃতীয়াংশ। ১০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, ৫০ লক্ষের বেশী মানুষের কোন আবাস নেই। ১৫

থেকে ৫৯ বছর বয়সী ১,৩০,০০০ নারী প্রতি বছর ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতি বছর অরণ্য ধ্বংস করার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ৩৫ বিলিয়ন ডলার, যা হাঙ্গেরির বার্ষিক জি. ডি. পি.'র সমান।

বিশ্বায়ন গঠনের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বিশ্বায়ন স্বয়ং এক প্রক্রিয়াতে পরিণত হচ্ছে। পূর্বোক্ত সমগ্র আলোচনাতে যে প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ইতোমধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা' জ্যামিতিক হারে বিকশিত হতে থাকবে। ফলে ক্রমশ স্পষ্ট হবে এটির অভ্যন্তরে সঞ্চিত আরও অবিশ্বাস্য ও বিস্ফোরক ক্ষতিকারক দিকগুলি।

বিশ্বায়ন এগিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির প্রস্তুতির জন্য পরিবর্তন-প্রক্রিয়া

বিশ্বায়নের সার্বিক ব্যবস্থার জন্য, আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির পুনর্গঠন অথবা নতুন নতুন সংগঠন তৈরির কাজও পাশাপাশি গড়ে উঠছে। এবারে শাসকশ্রেণীর অর্থনৈতিক, আইনি, সামাজিক, শ্রেণীগত ইত্যাদি বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির রূপান্তর প্রক্রিয়া বা নতুন ধরনের সংগঠনের আবির্ভাব অথবা ভবিষ্যতের সংগঠনের জন্য প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। একথা ঠিক যে বিশ্বায়নের প্রচেষ্টার ফলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের স্তরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেগুলির পারস্পরিক প্রভাব ও সম্পর্ক এবং এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট ফলাফল সম্পর্কে সুসংহত আলোচনা এখনও তেমনভাবে শুরু হয়নি। তবে প্রসঙ্গটির গুরুত্ব ক্রমশ বেশি করে অনুভূত হতে শুরু করেছে।

বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করতে হলে সংস্থাগুলির পূর্বতন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া কিছুটা অনুসরণ করা দরকার। কেননা বর্তমান বাস্তবতা যেমন আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়নি, তেমনি সংঘটক শক্তিগুলিতে, যেগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন, পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে থেকে।

ব্রেটন-উডসের রূপান্তর—গ্যাট চুক্তি

গ্যাটের পূর্ব ইতিহাস

আই. এম. এফ. এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-এর সাথে গ্যাটের বাহ্যিক প্রধান পার্থক্য হলো প্রথমোক্ত দু'টি সংস্থা রাষ্ট্রগুলিকে ঋণদানের বিনিময়ে দেশটির পরিস্থিতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রতিরোধের ক্ষমতা এবং সুযোগ অনুযায়ী চাপ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক স্তরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি, বিশেষত, বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্বার্থে কাঠামোগত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করিয়ে নিচ্ছিল। অন্যদিকে শেষোক্ত সংস্থাটি—জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ অ্যাণ্ড ট্রেডস (গ্যাট) সদস্য রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত সভাতে, রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকের তথাকথিত সমান একটি ভোটের অধিকারকে সামনে রেখে, সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক স্বার্থে রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ করিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে উঠতে থাকে প্রধান প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরে বসে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চুক্তিগুলি যাতে প্রতিটি রাষ্ট্র আইনগত বাধ্যতা হিসাবে বলবৎ করার ব্যবস্থা করে তা' কার্যকরী করার সংগঠন। উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে আই. এম. এফ. ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু গ্যাটের ভূমিকা ছিল উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে। এই মূল পার্থক্যের জন্য গ্যাটের রাউণ্ডগুলি (অর্থাৎ নতুন নতুন প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঐকমত্যে পৌঁছনোর তৎপরতার অধ্যায়গুলি) সব সময়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছিল। যেমন বলা যায় যে বহু আলোচিত ডাঙ্কেল-প্রস্তাবটি ছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে গ্যাটে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পূর্বে ঘটেছিল। এই ধরনের রাউণ্ডগুলি ছিল যথাক্রমে ঃ ১৯৪৭ সালে জেনেভা রাউণ্ড, ১৯৬০-৬৯ সালে ফিলোঁ রাউণ্ড, ১৯৬২ সালে কেনেডি রাউণ্ড, ১৯৭৩ সালে টোকিও রাউণ্ড। এর আগে ১৯৪৭ সালে ২৩টি সদস্য রাষ্ট্র ভবিষ্যতে 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অরগানাইজেশন' (আই. টি. ও.) গঠনের জন্য প্রথমে সাধারণ চুক্তি (জেনারেল এগ্রিমেন্ট) করেছিল ও ১৯৪৮ সালে হাভানা রাউণ্ডে (তখনও কিউবার বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়নি) আলোচনাও করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি।

গ্যাটের অষ্টম রাউণ্ড শুরু হবার আগে সমস্ত দেশ, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার উপর আমেরিকা প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল। নভেম্বর '৮২-তে গ্যাট-ভুক্ত দেশগুলির মন্ত্রী-পর্যায়ের সভা ডাকা হয়। অষ্টম রাউণ্ডের আলোচ্যসূচীর বাইরে এবং সম্পূর্ণ নতুন উপাদানসম্পন্ন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমেরিকার চাপে, আলোচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল : ট্রেড রিলেটেড ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটারস (টি. আর. আই. এম. বা ট্রিম) তথা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়, ট্রেড রিলেটেড ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস (টি. আর. আই. পি. এস. বা ট্রিপস) তথা বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাজাত সম্পত্তির অধিকার, ট্রেড ইন সার্ভিসেস বা পরিষেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্য (গ্যাটস)। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এইসব বিষয় অন্তর্ভুক্তির পেছনে ছিল মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি। যেমন, পরিষেবার প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এম. এন. সি.গুলি—সিটি ব্যাঙ্ক, আমেরিকান এক্সপ্রেস, 'ট্রিপস'-এর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের এম. এন. সি.গুলি যথা ফাইজার, মসাঁতো, দ্যুপঁ প্রভৃতি এবং কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়ে কার্গিল কর্পোরেশন ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট সময়ে বহু দেশ এই নতুন সংযোজনের বিরোধিতা করলেও ১৯৮৩ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে এগুলির সংযুক্তির পক্ষে প্রকাশ্য সওয়াল করেন। ১৯৮৫ সাল থেকে অষ্টম রাউণ্ডের জন্য আমেরিকা কঠোর চাপ দিতে থাকে। ১৯৮৬-এর সেপ্টেম্বরে উরুগুয়ের পুন্টা ডেল এস্তে শহরে অষ্টম রাউণ্ডের আলোচনা শুরু হলো তৃতীয় দুনিয়ার তীব্র বিরোধিতার মুখে। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে 'গ্রুপ অব নেগোসিয়েশন' গঠিত হয়েছিল তাতে তৃতীয় দুনিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ব্রাজিলের পাওলো নেগিয়েরা বাতিস্তা এবং ভারতের শ্রীরঙ্গ পি. শুক্লা ছিলেন। কিন্তু এই দুইজনের আত্মসমর্পণধর্মী বক্তব্য গৃহীত হবার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়ে যায়। তৈরি হয়ে গেল তৃতীয় দুনিযার আত্মসমর্পণের ভবিতব্য।

অথচ গ্যাট প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৫৮ সালে গটফ্রেইড হেবারলারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্টে সমগ্র গ্যাট ব্যবস্থায় তৃতীয় দুনিয়ার প্রতি ব্যাপক বৈষম্যের আশঙ্কা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছিল। এরপরও বেশ কয়েকটি নিরপেক্ষ কমিটি অনুরূপ অভিমত দিয়েছিল। বিখ্যাত 'কমিটি- থ্রি' তার রিপোর্টে বলেছিল যে গ্যাটের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলি তৃতীয় দুনিয়ার প্রথাগত রপ্তানির ক্ষেত্রে কেবল প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে না, তৃতীয় দেশগুলির ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি বন্ধ করে দিচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস কমিটি অন ট্রেড অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট তথা আঙ্কটাডের প্রথম সভাপতি রাউল প্রিবিস্চ স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে গ্যাটের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাবলী অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের সমস্যাকে বিবেচনায় রাখছে না।

উরুগুয়ে রাউণ্ডে মোট ১৫টি বিষয় আলোচ্যসূচীতে থাকলেও, সাম্রাজ্যবাদ সুচতুরভাবে নিজেদের শক্তির অবস্থান থেকে দর-কষাকষি করে এবং সংস্থার চেয়ারম্যান আর্থার ডাঙ্কেলকে দিয়ে নানা কলাকৌশলের মাধ্যমে মোট ৭টি বিষয় নিয়ে প্রস্তাব পেশ করে। সেই সাতটি বিষয় হলো : (১) বাজারের অধিকার, (২) কৃষি, (৩) বস্ত্র ও তন্তুজাত দ্রব্য, (৪) বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত বিনিয়োগ, (৫) বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত মেধাজাত সম্পত্তির অধিকার, (৬) পরিষেবামূলক ক্ষেত্রে বাণিজ্য এবং (৭) প্রতিষ্ঠানগত বিষয়।

ডাঙ্কেল-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য

এইভাবে সমগ্র পটভূমিকাই জানিয়ে দিচ্ছিল কোন উদ্দেশ্যে এবং কাদের স্বার্থে গ্যাট-এর বিধিব্যবস্থা কার্যকরী হবে।

১৯৯৪ সালে মারাকাস-এ সদস্য দেশগুলির মধ্যে তুমুল টানাপড়েন সত্ত্বেও শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রবল চাপ ও পরোক্ষ হুমকির ফলে সৃষ্ট পরিবেশে, সর্বসম্মতভাবে 'গ্যাট চুক্তি' স্বাক্ষরিত ও গৃহীত হলো। পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পূর্বে প্রচলিত সাধারণত দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির নীতিগত ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমস্ত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্যের

জন্য সাধারণ ও আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী প্রবর্তিত হলো গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় উন্নত-অনুন্নত সমস্ত ধরনের দেশের জন্য তথাকথিত সমান অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হলেও, 'সার্ভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' বা অর্থনৈতিক 'জোর যার মুলুক তার'-এর নীতিতে বিশ্ব-অর্থনীতিতে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কব্জা আরও শক্ত করা হলো; অতীতে একটি দেশের অন্য দেশের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক পণ্য নির্বাচন করার যে অধিকার ছিল তা' হলো সম্পূর্ণ অপহৃত। দেশের অভ্যন্তরীণ যেসব ক্ষেত্রে কখনো বৈদেশিক অর্থনীতির সাধারণভাবে কোন ভূমিকা ছিল না, যেমন পরিষেবা, কৃষি, মেধা-সত্ত্ব প্রভৃতি, সেগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণহীন করা হলো এবং তাতে বিদেশী পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের অধিকার স্বীকৃত হলো। রাষ্ট্রকে নিজ দেশের অর্থনীতির অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীয় কর্তৃত্ব, অধিকার ও ভূমিকাকে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো মুক্ত বাজার অর্থনীতির নয়া-ব্যবস্থায়। নিও-ইমপিরিয়ালিস্ট থিওরির অন্যতম মূল্যায়ন অনুসারে, এই নতুন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, পৃথিবী নতুন করে (ক) ডমিনেটিং বা কর্তৃত্বকারী দেশ, (খ) ইন্টারমিডিয়েট সেমি-পেরিফেরি বা মধ্যবর্তী আধা-প্রান্তীয় দেশ এবং (গ) ডিপেনডেন্ট বা নির্ভরশীল দেশ হিসাবে তিন নতুন ভাগে বিভক্ত হবার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করবে। ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন অব ওয়েলথ বা আন্তর্জাতিক সম্পদের নতুন বিভাজনের মধ্য দিয়ে পরিণামে ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন অব লেবার বা বিশ্বের শ্রমের ব্যবস্থা ও বাজারের নতুন চরিত্রের বিভাজনের ছক গড়ে উঠবে। থিওরি অব ডিপেনডেন্ট তথা অধীনতার তত্ত্ব-প্রবক্তাদের অনুসারে তৃতীয় দুনিয়ার দেশ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক বাস্তবতা ইত্যাদি স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্ব নতুন করে হারাতে শুরু করবে।

গ্যাট চুক্তির মধ্য দিয়েই কেবল বিশ্ব-বাণিজ্যসহ জাতীয় অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বিষয়ে সর্বজনীন ব্যবস্থা গৃহীত হলো না, আরও পরিবর্তনের জন্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠান ও প্রয়াসের প্রস্তাবও আসতে থাকে। ব্রেটন-উডস চুক্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমেরিকান ফেডারাল রিজার্ভের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মি. পল ভোলক্কারের নেতৃত্বে গঠিত ব্রেটন-উডস কমিশনের রিপোর্ট ২২শে জুলাই '৯৪ তারিখে (১৯৪৪ সালে ঐদিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল) প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টের শিরোনাম—'ব্রেটন উডস ঃ লুকিং টু দ্য ফিউচার!' রিপোর্টের অংশবিশেষ যা জানা গেছে তাতে নতুন চরিত্রের ব্রেটন-উডস চুক্তি করার কথা বলা হয়েছে, ডলারের বিনিময় মুল্যের ওঠা-নামা রোধ করার সুপারিশ যার অন্যতম। কেননা বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও, বিশ্ব কর্তৃত্বকারী মার্কিন মুদ্রা—ডলারের সঙ্কট কোনভাবে সমাধান করা যাচ্ছে না স্থায়ীভাবে। সেজন্য ১৯৮৭ সালে প্যারিসে সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে গৃহীত 'লোউভ্রি অ্যাকর্ড' অনুযায়ী এক্সচেঞ্জ রেট মেকানিজমের (ই. আর. এম.) ব্যর্থতাকে কাটানোর ব্যবস্থা এবং পুঁজির বিশাল বাজারকে সামাল দিতে 'টার্গেট জোন' তৈরি করা প্রভৃতি পূর্বোক্ত সুপারিশের অনুসারী। ১৯৮০-এর দশকে বেশ কয়েকজন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ (যাঁদের মধ্যে জন উইলিয়ামসন ও মার্কাস মিলার অন্যতম) ডলারের ওঠা-নামা রোধ করে ডলারকে পুনরায় আন্তর্জাতিক একমাত্র বিনিময় মাধ্যমে পরিণত করার প্রসঙ্গে 'টার্গেট জোন'-এর প্রস্তাব করেছিলেন। তবে ব্রেটন-উডস পুনরুজ্জীবনের বিরোধী অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হলো যে ব্রেটন-উডস পদ্ধতির সংস্কারের দ্বারা মার্ক ও ইয়েনের অগ্রগতির মুখে ডলার মূল্যের স্থিতিশীলতার এবং বর্তমান পুঁজির বাজারের অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার সুযোগ ও সম্ভাবনা নেই। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চরিত্রের ও ক্ষেত্রের যেহেতু মৌলিক ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, সুতরাং নতুন ধরনের সংগঠন ও ব্যবস্থাই কাম্য। সুতরাং গ্যাটসহ অন্যান্য সংগঠনের প্রয়োজনীয় সংস্কার বা নতুন সংগঠনের পত্তনের প্রয়োজন জরুরি হয়ে পড়েছে।

নতুন বিশ্ব সংগঠন ঃ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন

নতুন সংগঠন ও ব্যবস্থা ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়েছে; যদিও আন্তর্জাতিক বিনিময় মুদ্রা, সেটির মান, বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি দায়িত্ব সেটির অন্তর্গত নয়। গ্যাটের অবসানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন'। এই সংগঠনের করণীয়, পরিচালনা ও পরিদর্শনার

ক্ষেত্র হলো গ্যাট চুক্তির সিদ্ধান্তগুলি ও তার রূপায়ণ। লক্ষ্য হিসাবে এই সংগঠন বিশ্বের অর্থনীতির ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের জন্য এবং উন্নয়নশীল, বিশেষত সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ দেশগুলির উন্নতির জন্য কাজ করবে বলে ঘোষণা করেছে। কাজ করার ক্ষেত্রে এটি প্লুরিল্যাটারাল ট্রেড এগ্রিমেন্টস অর্থাৎ বহুমাত্রিক বাণিজ্যিক চুক্তিসহ (বেসামরিক বিমানের বাণিজ্য, সরকারী সংগ্রহ, দুগ্ধজাত সামগ্রীর বাণিজ্য এবং পশু-মাংসের বাণিজ্য) গ্যাট চুক্তির বিষয়গুলি এবং সেগুলির আইনগত দিক দেখাশোনা করবে এবং সমস্ত ধরনের আপস আলোচনার মঞ্চ হিসাবে কাজ করবে এটি। বিরোধ মীমাংসার এবং ট্রেড পলিসি রিভিউ মেকানিজম (টি. পি. আর. এম.) বা বাণিজ্য-নীতি মূল্যায়নের ব্যবস্থাপনার নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতির পরিচালনা করবে ডব্লু. টি. ও.। একইসাথে এই সংস্থা বিশ্ব-আর্থনীতিক নীতি নির্ধারণে অধিকতর সংহতি অর্জনের জন্য আই. এম. এফ. এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সাথে সহযোগিতা করে যাবে। এইভাবে পূর্ববর্ণিত আই. এম. এফ. এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এই দুই সংস্থার নতুন ভূমিকা পালনের সহযোগী হবে ডব্লু. টি. ও.।

গ্যাটের ন্যায় এই সংস্থাও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। গ্যাটে সমস্ত সিদ্ধান্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতে নেবার নিয়ম থাকলেও, নতুন সংস্থায় প্রয়োজনে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে— এক দেশ এক ভোটের নীতির ভিত্তিতে। কেবলমাত্র চুক্তির ধারার ব্যাখ্যা এবং বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় শর্তাবলী থেকে কোন দেশ বাদ থাকার অনুরোধ জানালে তার অনুমোদন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে হতে হবে। ডব্লু. টি. ও.'র আইনগত কর্তৃত্ব ও অধিকার থাকবে। রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ সহায়ক সংস্থাগুলি যে ধরনের রেহাই সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে পেয়ে থাকে তা' এই সংস্থা ভোগ করবে। অর্থাৎ এটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার সুযোগ কোন রাষ্ট্রের থাকবে না। এটির মর্যাদা হবে আই. এম. এফ. ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মত। সংশোধিত 'গ্যাট, ১৯৯৪', 'গ্যাট, ১৯৪৪' থেকে আইনগতভাবে স্বতন্ত্র হলো। অর্থাৎ গ্যাট প্রতিষ্ঠার সময় থেকে (১৯৪৪) চুক্তি হবার আগে পর্যন্ত (১৯৯৪) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির যে স্বাধীনতা ছিল, তা' চুক্তি হবার পর বাতিল হলো। গ্যাট, ১৯৯৪-এর চুক্তির রূপায়ণ সদস্য দেশগুলির ওপর বাধ্যতামূলক হবে। ডব্লু. টি. ও.'র একটি ডিসপিউট সেটেলমেন্ট বডি (ডি. এস. বি.) বা বিরোধ নিষ্পত্তি স্তর থাকবে। ডি. এস. বি.'র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের ব্যবস্থা- সহ আনুষ্ঠানিক আরও কিছু ব্যবস্থা ও স্তরের সংস্থান এটির সংবিধানে রয়েছে। ১লা জানুয়ারী ১৯৯৫ থেকে ডব্লু. টি. ও. বাস্তবায়িত হয়েছে।

কিন্তু ডব্লু. টি. ও.-র কর্তৃত্ব এখানেই থেমে থাকেনি। মারাকাসে গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে আমেরিকার নেতৃত্বে উন্নত দেশগুলি মানবাধিকার, শ্রম-প্রসঙ্গ, পরিবেশ, প্রচার-মাধ্যম প্রভৃতিকে চুক্তির অন্তর্গত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয় দুনিয়ার তীব্র বিরোধিতায় সেগুলি তখন অন্তর্ভুক্ত না হলেও পরবর্তীকালে সেগুলি নিয়ে ডব্লু. টি. ও.-তে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এখন একে একে সেগুলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুরু হয়েছে।

ডব্লু. টি. ও. প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটির সর্বময়তা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে অতি দ্রুত। তৃতীয় দুনিয়ার যেসব দেশ গ্যাট চুক্তির যেসব ধারা জাতীয় স্তরের আইনি ব্যবস্থার অন্তর্গত করতে পারেনি বা দেশের অভ্যন্তরে ঐসব ধারা সম্পর্কে তীব্র বিরোধিতা রয়েছে, ডব্লু. টি. ও.'র চাপে সব জাতীয় সরকার সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে রূপায়ণ করতে বাধ্য হচ্ছে। গ্যাট চুক্তি ও ডব্লু. টি. ও. বিশ্বায়ন ব্যবস্থার পথ নির্মাণে স্টীম রোলারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ই. সি.-ভুক্ত কতকগুলি দেশ, যেমন ফ্রান্স কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহারের তীব্র বিরোধিতা করলেও পরবর্তীকালে আমেরিকার চাপে অনেকটাই আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। জাপানের সাথে বাণিজ্যে ঘাটতি কমাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হয়ে জাপানের বাণিজ্যের উপর ৫.৯ বিলিয়ন ডলার শাস্তিমূলক আমদানি শুল্ক চাপিয়েছিল; পরবর্তীকালে আমেরিকার প্রদত্ত শর্তেই জাপান কার্যত সম্মতি দিয়েছে। উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে যেখানে এই রকম বাস্তবতা, অনুন্নত দেশগুলির পরিস্থিতি সেখানে সহজেই অনুমেয়।

নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৬, সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত গ্যাটের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে আরও দু'টি

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তার একটি হলো 'মালটিন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট অন ইনভেস্টমেন্ট' (এম. এ. আই.) বা বিনিয়োগ বিষয়ক বহুজাতিক চুক্তি এবং অপরটি হলো 'এগ্রিমেন্ট অন লেবার ক্লজ' (পূর্বে এটিকে 'সোস্যাল ক্লজ' শিরোনামে উল্লেখ করা হচ্ছিল)। প্রথম সিদ্ধান্তটির মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ ও লগ্নী-পুঁজির বিনিয়োগ সম্পর্কে কোন দেশের সরকারের হস্তক্ষেপ করার কার্যত অধিকার থাকবে না। কোন ক্ষেত্রে (শিল্প, পরিষেবা বা কৃষি), কত পরিমাণে, কি শর্তে, কোন ধরনের উৎপাদন প্রণালীতে, কত লাভে এবং লাভ-অর্জিত অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হবে ইত্যাদি সবই নির্ধারণ করবে লগ্নীকারী। মজুরি, শ্রম-সময়, নিয়োগের চরিত্র, কাঁচামাল যোগান, বাজার, পণ্যের দাম প্রভৃতি বিষয়েও হস্তক্ষেপ করা চলবে না সরকারের পক্ষ থেকে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হলো যে শ্রম-ব্যবস্থা ও শ্রমিকদের বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করতে হবে। বিশেষত শিশু শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে উৎপাদন, খারাপ শ্রম-পরিবেশ প্রভৃতি সম্পূর্ণ রহিত করতে হবে। দৃশ্যত এইসব সিদ্ধান্তকে শ্রমিকশ্রেণীর অনুকূল বলে মনে হলেও, এইসব সিদ্ধান্তের দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থেকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৯৭ সালের মধ্যে মানবাধিকার ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়েও জেনেভাতে অনুষ্ঠেয় সম্মেলন থেকে ডব্লু. টি. ও. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই দুইটি প্রসঙ্গ তৃতীয় দুনিয়াকে পুরোপুরি কোণঠাসা করার আরও দুই শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এমনিতেই গ্যাট ও পরবর্তীকালে ডব্লু.টি.ও.'র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রায় বাতিল হবার মুখে রাষ্ট্রসংঘের আঙ্কটাডের অস্তিত্ব। কৃষি প্রসঙ্গ চুক্তিতে যুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘের এফ. এ. ও. বা 'ফাও'-এর ভূমিকাও অকার্যকর হতে থাকবে। শ্রম প্রসঙ্গ যুক্ত হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন হয়ে যাবে আই. এল. ও.-র ভূমিকাও।

আই. এম. এফ. এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক : পরিবর্তনের প্রস্তাব

আই. এম. এফ. ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং ব্রেটন-উডস চুক্তির পতন-সহ নতুন বিশ্ব-বাস্তবতার পটভূমিকায়, সংগঠন দু'টির ভূমিকার পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে নানাবিধ সুপারিশ, আলোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক স্বয়ং প্রকাশ করেছে 'দা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক গ্রুপ : লার্নিং ফ্রম দা পাস্ট, এমব্রেসিং দা ফিউচার';আই. এম. এফ. প্রকাশ করেছে 'ভিশন স্টেটমেন্ট'। পল ভোলক্কার কমিশনের 'ব্রেটন-উডস : লুকিং টু দা ফিউচার', জি-৭-এর জুলাই '৯৪-এ প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভা থেকে গৃহীত প্রস্তাব, চরম দক্ষিণপন্থী ও গোঁড়াপন্থী 'ক্যাটো ইনস্টিটিউট-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাবমূলক বইগুলি—'পারপিচুয়েটিং পভার্টি : দা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, দা আই. এম. এফ. অ্যাণ্ড ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড', 'দা আই. এম. এফ. : রেকর্ড অব অ্যাডিক্টিন অ্যাণ্ড ফেইলিওর', দা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড দা ইমপ্রোভাইসমেন্ট অব নেশনস' প্রভৃতি, বিভিন্ন নন-গভর্নমেন্টাল অরগানইজেশন বা এন.জি.ও.দের দ্বারা গঠিত 'ফিফটি ইয়ারস ইজ এনাফ'-ক্যাম্পেন বা প্রচার, 'ডেভেলপমেন্ট গ্যাপ' কমিটির প্রচার, এপ্রিল '৯৪ মাসে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই. এম. এফ. এবং গ্রুপ-১১ (জি-৭-এর জাপান, আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইতালি ছাড়াও বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ড)-এর মিলিত সভা থেকে গঠিত ইন্টারিম কমিটির রিপোর্ট, ব্রিটেনে সদর দপ্তরসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা অক্সফামের রিপোর্ট প্রভৃতি সংগঠন দু'টির কাঠামো ও ভূমিকার পরিবর্তন সম্পর্কে নানাবিধ প্রস্তাব হাজির করেছে।

তবে আই. এম. এফ. ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের, পরিস্থিতি উপযোগী পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব বা প্রয়াস নতুন নয়। মাত্র আশির দশকেও এ' নিয়ে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চলেছিল।

সংগঠন দু'টির পরিবর্তনের বর্তমান প্রস্তাবগুলির পিছনে বিভিন্ন ধরনের শক্তি, স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের কয়েকটি দিক এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। প্রথমত, ব্রেটন-উডস চুক্তির মূল মর্মগুলি ভেঙ্গে পড়ার পরিণামে সেই লক্ষ্য সাধনের প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব সঙ্গত কারণেই অকার্যকর হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদের ইতিহাসে বর্তমান নতুন অর্থনৈতিক তথা বিশ্ব-ব্যবস্থার চরিত্র বহুলাংশে অভিনব ধরনের;তাই অর্থনৈতিক

প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনও তদনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছিত। তৃতীয়ত, কট্টরপন্থীরা মনে করে এতদিন এই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান দু'টি যেটুকু ঘোমটা দিয়ে চলেছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শিবিরের বিপর্যয়ের পর তার আর কোন প্রয়োজন নেই। চতুর্থত, বিশ্বের প্রধান তিনটি দেশ—আমেরিকা, জাপান ও জার্মানির মধ্যে আর্থিক দ্বন্দ্ব ক্রমশ যেভাবে প্রায় সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করছে, তা' ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক যুদ্ধে রূপান্তরিত হবার আশঙ্কা পরিহার করতে এই সংস্থা দু'টিকে নিয়োজিত করতে হবে। পঞ্চমত, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বিপুল ক্ষতিসাধনের পরিণামে সংশ্লিষ্ট জনগণের মধ্যে সংগঠন দু'টির বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছে তা' নির্বাপিত করা এবং শোষণের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করতে সংগঠনদ্বয়ের নতুন ভাবমূর্তি তৈরি করা প্রয়োজন। ষষ্ঠত, একাংশ উদারনীতিকদের মতে সমাজতান্ত্রিক দেশের তথাকথিত 'কমাণ্ড ইকনমি' এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 'বর্ডারলেস কর্পোরেট ইকনমি'র (উদ্দেশ্য করা হয়েছে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির ভূমিকা) দোষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে এক নতুন ও মহৎ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠন দু'টির পরিবর্তন দরকার। সপ্তমত, বামপন্থী, পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন প্রভৃতি মনে করে সীমাহীন শোষণের এই দুই হাতিয়ারের অস্তিত্বই থাকা উচিত নয়।

তৃতীয় দুনিয়াকে ১,৩০০ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়ে এবং তা' থেকে শত শত বিলিয়ন ডলার সুদ আদায় করে এই সংস্থা দু'টি প্রতিকূল পরিস্থিতি ও গণ-বিরূপতা সৃষ্টি করেছে। তা' থেকে পরিত্রাণ পেতে ১৯৯০ সালে জি-৭-এর সভায় ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাব করেছিল (যা ত্রিনিদাদ টিম রিপোর্ট বলে পরিচিত) ঋণ কমানো ও মকুব করার এবং শর্তাবলী ও সুদ সহজ করার জন্য। তখন তা' গৃহীত হয়নি। কিন্তু এখন ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্পর্কে নতুন আলোচনার প্রস্তাব রেখেছে জি-৭, আই. এম. এফ. ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক স্বয়ং। ১৯৭১ সালের আন্তর্জাতিক বিনিময় মুদ্রা হিসাবে ডলারের 'কনস্ট্যান্ট এক্সচেঞ্জ কারেন্সি'র ভূমিকার অবসানের পর 'ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ কারেন্সি'র ব্যবস্থা কার্যত আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেবল ডলারের নয়, যে কোন মুহূর্তে বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয় আশঙ্কিত হচ্ছে। সেবিষয়ে সমাধানে পৌঁছুতে পল ভোলক্কার কমিশনের রিপোর্ট আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠান দু'টির মৌলিক পরিবর্তন দাবী করেছে। কট্টর দক্ষিণপন্থীরা মনে করে যে এই দুই সংস্থার বিগত ৫০ বছরের ভূমিকা, সাহায্য ও ঋণদান তৃতীয় দুনিয়ায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজি এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থার বিকাশে ব্যবহৃত হয়ে মুক্ত বাজারের বিরোধিতা করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থার সহায়ক হয়েছে; কেননা সংস্থা দু'টি কেবল সরকারকে ঋণ সাহায্য দিয়ে থাকে। অতএব এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। এই ধরনের চাপের মুখে সংস্থা দু'টির অভ্যন্তরে এই প্রস্তাবও উঠেছে যে পরবর্তীকাল থেকে এরা সরকারের পরিবর্তে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেবে।

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের নতুন ধরনের শ্রেণী-সংগঠন

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বহুবিধ নতুন ব্যবস্থাপনার দিক হিসাবে মালিকশ্রেণীর নতুন এক ধরনের সংগঠন শক্তিশালী ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। গত শতাব্দী থেকে ধ্রুপদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মালিকদের সংগঠন হিসাবে চেম্বার্স অব কমার্স ও ইকনমিক ফেডারেশনগুলি গড়ে উঠতে দেখা গেছে। এগুলির ভূমিকা স্বদেশে বাণিজ্যের উন্নতি, কর ব্যবস্থা, পণ্যের মান স্থির করা, পেটেন্ট ব্যবস্থা, ভর্তুকি প্রভৃতি সহ প্রধানত শিল্প ও বাণিজ্য নীতিকে নিজেদের অনুকূলে আনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু (ক) নতুন বিশ্ব-বাস্তবতায় নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থকে আরও সুদৃঢ় করা, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে নিরঙ্কুশ শক্তি হিসাবে যুক্ত হওয়া ও আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা এবং (খ) সামাজিক ও শিল্প সম্পর্ক, শ্রমিকের বৃত্তিগত রোগ ও নিরাপত্তা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, শ্রম আইন ও মজুরি প্রভৃতি প্রসঙ্গ যাতে শ্রমিকশ্রেণী বা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় সেজন্য নিজ শ্রেণীর মধ্যে সংহতি সাধন এবং ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা চালানোর উদ্দেশ্যে বিশ্বের দেশে দেশে গড়ে উঠেছে 'এমপ্লয়ার্স অরগানাইজেশন' বা মালিকদের সংগঠন। অতীতে শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলি মালিকরা

উপেক্ষা করে চলার ফলে প্রায় দেড় শতাধিক বর্ষব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের চাপে কিছুটা কোণঠাসা ও অনেক সময়ে শ্রমিকদের কিছু কিছু দাবী মালিকরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এখন পুঁজিবাদের পক্ষে প্রবল অনুকূল পরিস্থিতিতে প্রথমত শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের সাথে শক্ত অবস্থান থেকে মোকাবিলা করার জন্য এবং শ্রমিক-আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে গৃহীত বিভিন্ন শ্রমিক-অনুকূল শ্রম আইনসহ সামাজিক নিরাপত্তামূলক স্বীকৃত সমস্ত ব্যবস্থা থেকে নিজেদের দায়িত্ব গুটিয়ে নেবার লক্ষ্য থেকে গড়ে উঠেছে দেশে দেশে নতুন ধরনের এমপ্লয়ার্স অরগানাইজেশনগুলি।

বাজার অর্থনীতি ও মুক্ত বাণিজ্যের কাঠামো ও প্রক্রিয়া মালিকদের এই ধরনের সংগঠনের উদ্ভব ও বিস্তারের পটভূমি হিসাবে কাজ করেছে। বেসরকারীকরণ ও কাঠামোগত সংস্কারের দ্রুত তৎপরতার সামনে প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠনগুলি কাজ করে চলেছে—শিল্প প্রতিষ্ঠান ও তার ভাবমূর্তিকে রক্ষা করা, বিশেষত, বাজার অর্থনীতির পরিসরে; শিল্প-সম্পর্ক নির্ধারণে শিল্পের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকে নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করা এবং সংগঠনের সদস্যদের স্বার্থে ভূমিকা পালন করা। মালিকদের প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিকভাবে অথবা দেশভিত্তিক কিংবা আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করে। চেম্বার্স অব কমার্স এবং ইকনমিক ফেডারেশনগুলি বাহ্যত, সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে ভূমিকা নিয়ে এসেছে, কিন্তু মালিকদের বর্তমান ধরনের সংগঠন—'এমপ্লয়ার্স অরগানাইজেশন', কার্যকালে, রাজনৈতিক দল না হয়েও বহুলাংশে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ভূমিকা নিতে শুরু করেছে।

১০৬টি দেশের ১০৮টি ন্যাশনাল এমপ্লয়ার্স অরগানাইজেশন নিয়ে গড়ে উঠেছে ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব এমপ্লয়ার্স (আই. ও. ই.) যেটির সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর, ১৯২০ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এটির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে। মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি ভ্রূণাকারে আবির্ভাবের কাল-পর্বও এটি। কেন্দ্রীয় এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটির ঐতিহাসিক বিকাশ খুঁটিয়ে দেখলে এটা প্রতিভাত হবে যে এম. এন. সি.'র বিকাশের স্বার্থ ও চরিত্র সংস্থাটিতে প্রতিফলিত হয়ে এসেছে। ১৯১৯ সালের অক্টোবরে, লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আই. এল. ও. প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মালিকরা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম মিলিত হয়েছিল। ১৯২০ সালে লণ্ডনে আই. এল. ও.'র তৃতীয় অধিবেশনে মালিক প্রতিনিধিরা ও ইউরোপীয় মালিকরা ক্ল্যারিজেস হোটেলে মিলিত হয়ে গঠন করে ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ার্স। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, ১৯৪৮ সালে আরও ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা গঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব এমপ্লয়ার্স। এটির নাম ও লক্ষ্য পুনর্নির্ধারিত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের পুনর্গঠনের কাজে ব্রেটন-উডস চুক্তি, মার্শাল প্ল্যান, আই. এম. এফ., ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, গ্যাট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের সাথে অর্থাৎ স্তরে স্তরে পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের প্রয়াসের সাথে মিলিয়ে এটির সাংগঠনিক রূপের বিবর্তন ঘটে চলেছে।

এই সংগঠনের সদস্য হতে হলে কতকগুলি শর্ত পূরণ করা বাধ্যতামূলক। সদস্য হতে চায় এখন জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে;সংগঠনকে একান্তভাবেই মালিকদের সংগঠন হতে হবে; সংগঠনকে হতে হবে স্বেচ্ছামূলক ও সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বাইরের কোন ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হতে হবে; সংগঠনকে মুক্ত বাণিজ্যের নীতির প্রতি অনুগত এবং তা' কার্যকর করার জন্য তৎপর থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে দেশসমূহের এমপ্লয়ারদের ফেডারেশন ও কনফেডারেশন, চেম্বার্স অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ, কাউন্সিল ও অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে।

আই. ও. ই.'র নিয়মাবলী অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত সদস্য-সংগঠনগুলির সাথে এটি নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। সামাজিক প্রসঙ্গ সম্পর্কে তাদের অবহিত রাখে বিরামহীনভাবে এবং মালিকদের স্বার্থের প্রসঙ্গে সহায়তা করে থাকে সর্বদা। নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিকভাবে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে আই. ও. ই.। 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ'র কালে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম

ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির মোকাবিলা এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য এই সংগঠনের অর্থ ও সম্পদ প্রধানত ব্যবহৃত হতো। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর বাজার-অর্থনীতির বিকাশ এবং বাজার-ব্যবস্থা উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য এখন এই সংস্থার অর্থ ও ক্ষমতা প্রধানত ব্যয়িত হয়ে থাকে। সম্প্রতিকালে আই. ও. ই.'র সভাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে কাঠামোগত সংস্কার, শ্রম-বাজারের স্থিতিস্থাপকতা, বেসরকারীকরণ এবং অনির্ধারিত ক্ষেত্রের শিল্প। এই সংগঠন মনে করে যে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুক্ত বাণিজ্যের যে বক্তব্যে এটি কাজ করে গেছে, বর্তমানে সেই ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া তাঁদের নীতিগত জয়।

বিশ্ব-পুঁজিপতি শ্রেণীর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় দু'টি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম হলো আই. ও. ই.;অপরটি হলো ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্স—শেষোক্তটির সদর দপ্তর প্যারিসে। কাঠামোগত দিক থেকে দু'টি ভিন্ন হলেও একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। বিশেষত, মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের স্বার্থের পক্ষে এই দু'টি সংস্থা সমবেতভাবে ভূমিকা নেয়।

রাষ্ট্রসংঘ ও সেটির ভূমিকা পরিবর্তনের জন্য তৎপরতা

সৃষ্টির পর থেকে রাষ্ট্রসংঘ পরিণত হয়েছিল বিশ্ব-শ্রেণী-সংগ্রামের অন্যতম মঞ্চে। শক্তির ভারসাম্যের ভিত্তিতে এই সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ে, রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার বিভিন্নতাও প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে এর প্রতিফলন ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এবারে শক্তির ভারসাম্যকে শিল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে নিরঙ্কুশ করে তোলাই কেবল নয়, তাকে স্থায়ী চরিত্র দেবার উদ্যোগও শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক স্তরের উদ্দেশ্য সমাধা করার জন্য পূর্বে আলোচিত সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করার পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘকে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্য হাসিল করার প্রধান মঞ্চ হিসাবে।

১৯৪০-এর দশকে, এক অর্থে, গ্লোবাল গভর্ন্যান্স তথা বিশ্ব-পরিচালনার জন্য দুই ধরনের সংগঠন গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়ী মিত্র শক্তিগুলি (যার মধ্যে আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রধান ছিল) বিশ্ব-রাজনীতি, নিরাপত্তা প্রভৃতির প্রশ্নে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সৃষ্ট লীগ অব নেশনসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'ইউনাইটেড নেশনস' গড়ে তুলেছিল। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী জোট বিশ্ব-পুঁজিবাদের পুনর্গঠন ও বিকাশের স্বার্থে ব্রেটন-উডস সম্মেলন ও চুক্তির দ্বারা গড়ে তুলেছিল আই. এম. এফ., ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও গ্যাট। প্রথমটির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল শেষোক্তগুলির চেয়ে স্পষ্ট ও অনেকটা জনগ্রাহ্য। ইউ. এন.-এর ক্ষেত্রে 'এক দেশ এক ভোট'-এর নীতি বহাল ছিল শেষোক্তগুলিতে ছিল বেশি অর্থ দিলে বেশি ভোটের নীতি। ষাটের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরা একই সাথে ইউ. এন. এবং ব্রেটন-উডস সংগঠনগুলির ওপর কব্জা বজায় রেখেছিল। কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার শতাধিক দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও ইউ. এন.-এর সদস্য পদ লাভ, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রভাব এবং শক্তিশালী জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অভ্যুদয় রাষ্ট্রসংঘে সাম্রাজবাদীদের কর্তৃত্ব কমিয়ে দেয়। ক্রমে আমেরিকা আরও কোণঠাসা হয়ে ইউ. এন.-এর বার্ষিক মঞ্জুরি হ্রাস ও রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সহায়ক সংস্থা থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার, আমেরিকার শত্রুভাবাপন্ন কোন দেশের প্রতিনিধিদের নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে পৌঁছানো আটকে দেওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এটিকে অকার্যকর করে ফেলার চেষ্টা শুরু করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবসান, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভগ্নদশা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অভিপ্রায়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাশিয়াকে সহযোগী হিসাবে পাওয়ায় ১৯৮৯ সাল থেকে আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী জোট রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে আবার হয়ে উঠেছে একচ্ছত্র শক্তিধর। এতদ্‌সত্ত্বেও নতুন বিশ্ব-বাস্তবতায় এই সংগঠনের পরিবর্তন সাম্রাজ্যবাদের কাছে কাম্য।

রাষ্ট্রসংঘের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষও এক ধরনের পরিবর্তন চায়, কেননা বাজার এখন বিশ্বভিত্তিক। তাছাড়া জাতীয় রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব এখন দুর্বল হয়ে পড়ছে। দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রগুলির একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অতীত ক্ষমতা এখন বিশ্বস্তরে অথবা অনেকগুলি দেশের মিলিত অঞ্চল বা রাষ্ট্রগুচ্ছ

তথা ক্লাস্টারভিত্তিক হয়ে পড়েছে। এই পটভূমিকায় সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্ব-শাসনের সংগঠনের চরিত্রের রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা এঁদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘকে পরিবর্তন করার প্রস্তাবগুলি

ইউনাইটেড নেশনস তথা রাষ্ট্রসংঘকে প্রাধান্য দিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও আই. এম. এফ.-এর ভূমিকার পরিবর্তনের সুপারিশের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল 'কমিশন অন গ্লোবাল গভর্নান্স'। ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই কমিশনের শুরুতে এটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন পশ্চিম জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্ট। পরবর্তীকালে এটির কো-চেয়ারম্যান হন সুইডেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গমার কার্লসন এবং গায়নার প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী ও কমনওয়েলথের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল সিদ্ধার্থ রামফল। সম্পাদক ছিলেন প্রাক্তন ব্রিটিশ মন্ত্রী ও অক্সফাম ভলান্টারি এজেন্সির ডাইরেক্টর লর্ড ফ্রান্স জুড। বিশ্বের খ্যাতনামা ২৪ জন ব্যক্তিত্ব নিয়ে গঠিত এই কমিশনে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এর প্রাক্তন ডাইরেক্টর ড. আই. জি. প্যাটেল ছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের অধিকতর গণতান্ত্রিকীকরণ, নিরাপত্তা পরিষদকে আরও সক্রিয় করা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পরিবেশ দূষণ, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি প্রসঙ্গেও কমিশন সুপারিশ করেছে।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার পরিবর্তনের প্রসঙ্গ বিবেচিত হচ্ছে। প্রথমত, নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রশ্ন। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর জার্মানি ও জাপানকে স্থান দেবার চেষ্টা বনাম তৃতীয় দুনিয়ার পক্ষ থেকে জনসংখ্যার ভারসাম্যভিত্তিক দুই বা তিনটি দেশকে স্থায়ী সদস্য করার দাবী। সেক্ষেত্রে ভারতের পক্ষ থেকে দাবীদার হওয়ার উদ্যোগ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে ইতোমধ্যে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘকে সরাসরি আন্তর্জাতিক পুলিশ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে ইচ্ছুক। এরা চায়, রাষ্ট্রসংঘের কাজ হবে তথাকথিত পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ বা পারমাণবিক কেন্দ্র পরীক্ষার পরিদর্শক এবং সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় বা আশ্রয়দানকারী, মানবাধিকার ভঙ্গকারী প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সংগঠন। এইসব ওজরের আড়ালে আসলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে কোন তৎপরতা বন্ধ করতে সামরিক হস্তক্ষেপ করার একান্ত ও একমাত্র অধিকারসম্পন্ন হিসাবে ইউ. এন.-এর রূপান্তর বিবেচনা করেছে এরা। এরকম ঘটলে আমেরিকা ও তার মিত্রদের সেনাবাহিনী কার্যত, স্থায়ী আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী হিসাবে কাজ করবে। রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা যুদ্ধ বা সামরিক ব্যবস্থা গৃহীত হলে তার আর্থিক ব্যয়ভার বহন করবে সমস্ত সদস্য দেশগুলি। ইতিমধ্যে ইরাক, পানামা, লিবিয়া, বসনিয়া, রোয়াণ্ডা, হাইতি ইত্যাদি দেশের সংকটে এই ব্যবস্থার কার্যকরী পরীক্ষাও হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের তথাকথিত মানবতাবাদী পরিবর্তনের জন্য দাবী

"ইউনাইটেড নেশনসকে মানব-সম্পদ বিকাশের ছত্রক হিসাবে নির্মাণে সর্বাগ্রে এটিকে স্বয়ং অব্যাহত মানব-উন্নয়নের নিদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এই বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলিকে সম্মিলিতভাবে সর্বজনীন করণীয়গুলি নির্ধারণ করে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করে যেতে হবে।" এই ধরনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৫' শিরোনামে আন্তর্জাতিক এক বৈঠক আহূত হয়েছিল। দ্বিতীয় করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাব হলো ইউনাইটেড নেশনসের উন্নয়ন তহবিল যে সংস্থাগুলির দ্বারা ব্যয়িত হয়, যেমন ইউ. এন. ডি. পি., ইউনিসেফ, ইউ. এন. এফ. পি. এ., আই. এফ. এ. ডি., ডব্লু. এফ. পি. ইত্যাদি; সেগুলির সমন্বয়ে 'ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল কাউন্সিল' শিরোনামে একটি নতুন সংস্থা গঠন করে সেটির নেতৃত্বে মানব-সম্পদ উন্নয়নের কাজ চলবে। তৃতীয় করণীয় বিষয়ে বক্তব্য হলো যে 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি' নামে একটি নতুন সংস্থা তৈরি করে সেটির দ্বারা মানব-উন্নয়নে অধিক সম্পদ সংগ্রহের কাজ চালাতে হবে।

ইউনাইটেড নেশনসের প্রকাশিত 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯৪, রাষ্ট্রসংঘের চরিত্রের ও ভূমিকার একবিংশ শতাব্দীর লক্ষ্যে পরিবর্তনের প্রস্তাব করতে গিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নতুন

ধরনের সংগঠন তৈরির কথা বলেছে। তার অন্যতম হলো 'ইকনমিক সিকিউরিটি কাউন্সিল'। রাজনৈতিক ও সামরিক জরুরি পরিস্থিতির বিষয়ে কার্যকরী হস্তক্ষেপ বা ব্যবস্থা নেবার জন্য 'সিকিউরিটি কাউন্সিল' বা নিরাপত্তা পরিষদের পাশাপাশি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সংরক্ষণে ব্যবস্থা নেবার জন্য 'ইকনমিক সিকিউরিটি কাউন্সিল' বা 'অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পরিষদ' গঠিত হবে। ভেটোর ব্যবস্থা থাকবে না এবং প্রতি চার বছর অন্তর 'এক দেশ এক ভোট' রীতিতে নির্বাচনের ভিত্তিতে ১১ জন সদস্য নিয়ে ইকনমিক সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠিত হবে। তাছাড়া বিশ্বের অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, বিনিময়, মুদ্রা-মান, ঋণ দান, আন্তর্জাতিক মুদ্রা মজুত, অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ, টাকার বাজারের উচ্চাবচতাকে স্থির রাখা প্রভৃতির জন্য গঠিত হবে 'ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক'। আন্তর্জাতিক ক্যাপিটাল মার্কেট বা পুঁজির বাজারের সামগ্রিক বিষয়ে পরিপূর্ণ দেখ-ভাল করার জন্য প্রস্তাবও করা হয়েছে 'ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট' গঠনের। মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন বা বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রস্তাবিত হয়েছে 'ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি-মনোপলি অথরিটি'।

একবিংশ শতাব্দীর জন্য ইউনাইটেড নেশনসের সাথে যুক্ত করে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও ব্যবস্থার বিষয়ও প্রস্তাবিত হয়েছে। তবে এই প্রস্তাব বিশ্ব-মালিকশ্রেণী এবং নতুন জগৎ-অর্থনীতির স্বার্থকে পরিপুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নয়। নতুন বাস্তবতার ধাক্কাতে বাধ্য হয়ে পরিবর্তনের জন্য যে নতুন ভাবনা রাষ্ট্রসংঘকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ ঃ

১৯৬৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জ্যান টিনবারজেনের প্রস্তাব হলো যে বর্তমানে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে একটি বিশ্ব-সরকারের। প্রাপ্ত সমস্ত সুযোগ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হতে পারে রাষ্ট্রসংঘকে আরও শক্তিশালী ও সংস্কার করে। এক্ষেত্রে ইউ. এন.-এর এজেন্সিগুলির কতকগুলিকে পরামর্শদাতার ভূমিকা থেকে ব্যবহারিক প্রয়োগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। টিনবারজেনের প্রস্তাব হলো ঃ এফ. এ. ও. হবে বিশ্ব-রাষ্ট্রের 'ওয়ার্ল্ড মিনিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার' বা কৃষি-মন্ত্রক, ইউ. এন. আই. ডি. ও. নেবে 'ওয়ার্ল্ড মিনিস্ট্রি অব ইণ্ডাস্ট্রি' বা শিল্প-মন্ত্রকের ভূমিকা, ওয়ার্ল্ড মিনিস্ট্রি অব সোস্যাল অ্যাফেয়ার্স বা সমাজ-বিষয়ক মন্ত্রক হবে আই. এল. ও. প্রভৃতি। এগুলি ছাড়াও তাঁর প্রস্তাব হলো যে আরও কিছু স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থার দরকার হবে—যেমন ওয়ার্ল্ড পুলিশ, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস বা আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয়, ওসেন অথরিটি বা সমুদ্র বিষয়ক কর্তৃপক্ষ, আউটার স্পেস অথরিটি বা মহাকাশ বিষয়ক কর্তৃপক্ষ, অর্থনৈতিক বিষয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেজারি এবং ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশনের (আই. এল. ও.) পরিবর্তন-প্রক্রিয়া

আন্তর্জাতিক শ্রম-বিষয়ক আইন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আই. এল. ও. দীর্ঘ প্রায় আশি বছর ধরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই তৎপরতা ছিল শ্লথ। সত্তরের দশকের শুরু পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি, মালিকশ্রেণী ও পুঁজিবাদ-অনুসারী ট্রেড ইউনিয়নগুলি তথা তাদের প্রতিনিধিদের প্রাধান্য থাকায় গৃহীত 'কনভেনশন' বা প্রস্তাবগুলির চরিত্রও ছিল শ্রমিকশ্রেণীর চাহিদার তুলনায় একান্ত অপ্রতুল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর ন্যূনতম অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আই. এল. ও.'র ভূমিকা। কিন্তু সত্তরের দশক থেকে প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ও চরিত্রে ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করায় আই. এল. ও.'র ভূমিকা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের নিরিখে অনেকটা উন্নত হয়ে উঠছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও 'নন-এলাইন্ড মুভমেন্ট'ভুক্ত দেশগুলির সরকার, মালিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল ও নির্ধারক ভূমিকা আই. এল. ও.-কে বেশ কিছুটা কার্যকরী সংগঠনে পরিণত করেছিল। গৃহীত কনভেনশনগুলি আইনে পরিণত ও কার্যকরী না করা, শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী কার্যকলাপ বা দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির কাছে কৈফিয়ৎ তলব, আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থা গ্রহণ, এসব বিষয়ে নানা ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করে বিশ্ব-জনমত সংগঠিত করা ইত্যাদি তৎপরতা আই. এল. ও.কে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে

অধিক গ্রহণীয় করে তুলছিল। তাছাড়া নানা দেশে শ্রমিকদের দুর্দশার বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করা, সেসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারগুলিকে অবহিত করা, সমস্যা সমাধানে আর্থিক ও বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করে সাহায্য করা, নানান বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র, প্রচলিত বা নতুন সৃষ্ট শ্রম-সমস্যাবলী নিয়ে নতুন নতুন 'কনভেনশন' গ্রহণ প্রভৃতি কাজ আই. এল. ও.-তে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই ধরনের তৎপরতাগুলি স্বভাবতই উন্নত দেশগুলির রাষ্ট্র ও মালিকশ্রেণীর কাছে শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠতে থাকে। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে বিরোধিতা এবং প্রতিরোধ করার চেষ্টা ক্রমাগত ব্যর্থ হতে থাকায়, উন্নত দেশগুলি আই. এল. ও. থেকে ক্রমশ নিজেদের সরিয়ে নেওয়াও শুরু করে দেয়। আশির দশকের প্রথমার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আই. এল. ও.-কে দেয় অর্থ বন্ধ করে দেয়। উন্নত দেশগুলির কোন কোনটি দেয় অর্থ কমিয়ে দিতে থাকে। আই. সি. এফ. টি. ইউ. ও ট্রেড সেক্রেটারিয়েটগুলি পর্যন্ত পরোক্ষে বয়কট করতে থাকে আই. এল. ও.-কে। আই. এল. ও. কমিউনিস্টদের তাঁবেতে পরিচালিত হচ্ছে বলেও অপপ্রচার শুরু হয়।

কিন্তু নব্বই-এর দশক থেকে অবস্থার, কার্যত, আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির মতই আই. এল. ও.'র উপর এখন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, মালিকশ্রেণী এবং আই. সি. এফ. টি. ইউ. এবং ট্রেড সেক্রেটারিয়েটগুলির পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বায়ন সংক্রান্ত সমস্ত দিকগুলিকে আই. এল. ও. এখন নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং সেগুলির পক্ষে সমর্থনসহ শ্রম-ক্ষেত্রে সেগুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কার্যকরী তৎপরতাও শুরু করেছে সংগঠনটি। এখন আই. এল. ও.'র সমস্ত প্রচার, প্রশিক্ষণ, আলোচনা, অর্থ-বরাদ্দ, লেবার স্ট্যাণ্ডার্ড সংক্রান্ত প্রস্তাব, কনভেনশন, কনফারেন্স ইত্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে এই লক্ষ্যে। এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আই.এল.ও.'র কর্মকাণ্ডে আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর প্রস্তাবগুলি গৃহীত ও কার্যকরী কেবল হচ্ছে না, আই. সি. এফ. টি. ইউ. এবং ট্রেড সেক্রেটারিয়েটগুলির বিভিন্ন কর্মসূচীতে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন সক্রিয় সহায়তা, অর্থদান করে কার্যকরী অংশীদার হচ্ছে। আই. এম. এফ., ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও ডব্লু. টি. ও.'র সাথে আই. এল. ও.'র সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘের সাথে এটির সম্পর্ক হচ্ছে ততই দুর্বল। আই. এম. এফ. ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আই. এল. ও.'র সাথে সম্পর্ককে অনেকটা অপ্রকাশ্য রাখলেও, ডব্লু. টি. ও.'র, বিশেষত 'লেবার ক্লজ' নিয়ে তৎপরতার সময়, প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখেছে এবং লেবার ক্লজের সমর্থনে কার্যকরীভাবে ব্যবহারও করছে।

ডব্লু. টি. ও.-তে 'লেবার ক্লজ' গৃহীত হওয়ায় পরোক্ষে আই. এল. ও.'র জন্য স্বীকৃত আন্তর্জাতিক অধিকার যেমন অনেকটা ধূসর হয়েছে, অন্যদিকে আই. এল. ও.'র সাথে রাষ্ট্রসংঘের এযাবৎ কালের সম্পর্ক এবং আই. এল. ও.'র স্বাধিকার ও বহুলাংশে সার্বভৌমত্বও বহুলাংশে ব্যাহত হতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি এমন সৃষ্টি হচ্ছে যে এখন থেকে বিশ্বব্যাপী শ্রম-প্রসঙ্গ যেমন অর্থনীতি ও বাণিজ্যের সম্পূর্ণ অধীন হবে, আই. এল. ও.'র ভূমিকাও অধীন হবে ডব্লু. টি. ও.'র।

স্বভাবতই, আই. এল. ও.'র উপর বিশ্ব-শ্রমিক সংগঠনগুলির দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা আস্থা এখন ক্ষয়ের প্রক্রিয়াতেও প্রবেশ করবে। পূর্বোক্ত নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার ফলে, সরকারগুলির উপর আই. এল. ও.'র যে প্রভাব ছিল তাও ক্ষুণ্ণ হতে থাকবে। এইভাবে, আই. এল. ও.-র দীর্ঘ ৮০ বছরের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি চলছে।

গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলির মধ্যে পরিবর্তনের ছাপ

পূর্বোক্ত বাস্তবতার ফলে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বহু আন্তর্জাতিক সংগঠন পতনোম্মুখ; যেমন, নন-এলাইন্‌ড মুভমেন্ট বা জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন কিংবা কনফারেন্স অব কমনওয়েলথ স্টেটস ইত্যাদি। এমনকি 'কোল্ড ওয়ার' বা ঠাণ্ডা যুদ্ধের কালে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ৭টি দেশ নিয়ে গঠিত 'জি-৭'-কে পতনোম্মুখ যদি নাও বলা যায়, তবে এটিও যে পরিবর্তনের আঘাতের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও প্রসার, ডলারের বিনিময়-মাধ্যম, কর্তৃত্ব ও মান বজায় রাখা, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যসহ অভ্যন্তরীণ অর্থ-ব্যবস্থার মধ্যে

সমন্বয়, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ব্যবস্থার প্রসার রোধ প্রভৃতি লক্ষ্যে 'জি-৭' অতীতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গিয়েছে। তখন আমেরিকার নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা ছিল নিরঙ্কুশ। বলা যায় যে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেবার প্রধান মঞ্চ ছিল এটিই। এটি এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক মঞ্চ যে সেখানে সাধারণভাবে সব সময়ে প্রতিনিধিত্ব করেন ৭টি দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপ্রধানরা; অন্য কোন মঞ্চে বা সংস্থায় এত শীর্ষ প্রতিনিধিত্ব ঘটে না। এখন এগুলির বৈঠক ও আলোচনাগুলির ফলাফল লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর 'জি-৭' বৈঠকে রাশিয়াকে দর্শক হিসাবে উপস্থিত হবার অধিকার যেমন দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কর্মসূচীর অধ্যায়টিও প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির 'কমন-এনিমি' এখন অস্তিত্বহীন হওয়ায় এই মঞ্চ নিজেই এখন হয়ে উঠেছে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের মল্লভূমি। ডলারের ক্রমাগত পতন ও পাশাপাশি ইয়েন ও মার্কের সাফল্যের ঘটনার পাশে আমেরিকার প্রাধান্য এখন ক্ষয়িষ্ণু। ফলে এই মঞ্চে জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ এখন আমেরিকার নির্দেশকে কিছুটা উপেক্ষা করা শুরু করেছে। সভার আলোচ্যসূচীরও পরিবর্তন ঘটছে, যেমন বিশ্ব-বেকারী পরিস্থিতি, তৃতীয় দুনিয়ার ঋণ পরিস্থিতি ইত্যাদি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে—সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সামনে বিপদের আশঙ্কা হিসাবে।

আরও পরিবর্তনের মুখোমুখি

অতীতে কতকগুলি সামরিক জোটের সংগঠন দেখা গেছে; যেমন, ন্যাটো, সিয়াটো, সেন্টো, ওয়ারশ প্যাক্ট ইত্যাদি। পূর্ব ইউরোপের সামজতান্ত্রিক দেশগুলি নিয়ে গঠিত 'ওয়ারশ প্যাক্ট' লুপ্ত হয়েছে। তারও আগে থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক জোট সিয়াটো, সেন্টো ইত্যাদি কার্যত লুপ্ত। ন্যাটোর শত্রু—প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাউকে কাউকে ন্যাটোর অন্তর্গত করা হয়েছে, এমনকি রাশিয়াকে পর্যন্ত ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্তির কথা উঠেছে। এইভাবে সামরিক জোটগুলির বিলোপ বা বিবর্তন শুরু হয়েছে। পাশাপাশি গড়ে উঠছে যে জোটগুলি সেগুলির চরিত্র প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক হলেও, সেগুলিতে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রিক নানা উপাদানও সংযোজিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে ন্যাফটা, ই. সি., সি. আই. এস. (প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত দেশগুলি নিয়ে কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিপেনডেন্ট স্টেটস), এশিয়া-প্যাসিফিক জোট, কিছুটা দুর্বল ধরনের হলেও আশিয়ান, সার্ক ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। এইগুলির মধ্যে একটিতে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট দিয়ে যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল তা' পরবর্তীকালে ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট গঠন এবং মাসট্রিচ ট্রিটির ইউরোপের সর্বজনীন মুদ্রা ব্যবস্থা, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, সীমান্ত দিয়ে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে সর্বজনীন পুলিশি ব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা এক নতুন ধরনের অতি-রাষ্ট্রের আভাসকে স্পষ্ট করে তুলছে।

পুঁজিবাদী নতুন বিকাশ-প্রক্রিয়ার ফলাফল

নতুন বিশ্ব-গঠনের সর্বপ্রধান কারণগুলির কিছু দিক প্রথম খণ্ডে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। এবারে তার ফলাফলের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করা যেতে পারে।

প্রাক্তন চেকোশ্লোভাকিয়া (অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি)-জাত ও পরবর্তীকালে আমেরিকান নাগরিক এবং বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জোসেফ এলোয়িস স্নুম্পেটার ধনতন্ত্রের ভূমিকাকে চিহ্নিত করেছিলেন 'ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশন' বা সৃজনশীলভাবে ধ্বংসসাধন বলে। উদারনীতিবাদী অর্থনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর অনন্য রচনাগুলির মধ্যে, যেমন 'দা থিওরি অব ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট', (১৯১২) 'ক্যাপিটালিজম, সোস্যালিজম অ্যাণ্ড ডেমোক্র্যাসি' (১৯৪২), 'হিস্ট্রি অব ইকনমিক অ্যানালিসিস' (১৯৫৪) প্রভৃতিতে পুঁজিবাদের স্বরূপ চমৎকারভাবে উন্মোচন করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদের বিকাশের বৈপ্লবিক চরিত্রের ডাইলেকটিক বা দ্বন্দ্বাত্মক নীতিটি বা বিপরীতের মধ্যে ঐক্যের অপর ফলাফলটি হলো ধ্বংসসাধন। লেনিন পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর—সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে পুঁজিবাদ যত উন্নততর স্তরে যাবে, সেটির ধ্বংসের গতি ও পরিমাণ তত উন্নততর স্তর অর্জন করবে। জোসেফ এলোয়িস স্নুম্পেটার সাম্যবাদী অর্থনীতিবিদ না হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন

ধারাতে মূল্যায়ন চালিয়ে, লেনিনের মূল্যায়নের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। ধনতন্ত্রের উন্নততর স্তরে আরোহণে তথা বিকাশে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। পুঁজিবাদের উন্নত স্তর অর্জন, সংশ্লিষ্ট কালের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের ফলও বটে। স্কুম্পেটার পুঁজিবাদের ব্যবহারিক অভিনবত্বকে কেবলমাত্র 'ক্রিয়েটিভ' বা সৃজনশীল বলতে চাননি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা' হলো ঃ উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত শ্রমিকশ্রেণী এবং শোষিত জনগণের কাছে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক স্বরূপ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হওয়ার ফলে পুঁজিবাদের সামনে বরাবরই বিপদের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। স্বভাবতই পুঁজিবাদকে নিত্যনতুন এমন সব আঙ্গিকের আশ্রয় নিতে হয় যাতে মানুষ বারেবারে মোহগ্রস্ত হয় ব্যবস্থার প্রতি। কিন্তু নতুন প্রকরণ এমন সৃজনশীলভাবে গৃহীত হয় যার ফলে পুঁজির শোষণ তথা ধ্বংস-প্রক্রিয়া শুধু অব্যাহত থাকে না, উত্তরোত্তর তা' উন্নত হয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিকাশের অন্যতম নিয়ম হলো' প্রতিনিয়ত পুরানো খোলস পরিত্যাগ করা এবং উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সমাজের সর্বাংশের কাছে নতুন নতুন রূপে গ্রহণীয় করে তোলা, তবে, পুঁজিবাদের মূল নীতিসমূহ— শোষণ, ধ্বংস ও অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়ে। পুরানো শোষণমূলক ব্যবস্থাগুলি—দাসভিত্তিক উৎপাদন, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রভৃতির সাথে পুঁজিবাদের শেষোক্ত উপাদানটিতে কেবল পার্থক্য রয়েছে তা' নয়, এই উপাদান প্রায় সর্বাংশে নতুন; পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমাগত উৎকর্ষতা অর্জন করার অন্যতম শর্তও হলো এই 'ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশন'। পুঁজিবাদ পরিকল্পিতভাবে এই কৌশল যেমন ব্যবহার করে, অন্যদিকে গৃহীত নানা ব্যবস্থাও কখনো কখনো স্বয়ং এই ফল দিয়ে থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব এবং নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ব্যবস্থার অবদান থাকে সর্বাধিক। সৃজনশীলভাবে নতুন রূপ অর্জিত হবার পর গ্রীক উপকথার নায়ক নার্সিসাসের মত নিজের রূপে নিজেই মাতোয়ারা হয় পুঁজিবাদ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। তারা মনে করে এটাই চরম, এটাই শেষ; এরপর আর কিছু থাকতে পারে না। এই 'ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশন'-এর সকলের আত্মসন্তুষ্টি হিসাবে তাই বারে বারে উত্থাপিত হয় 'এণ্ড অব ফিলজফি', 'এণ্ড অব ইকনমিক থিওরি', 'এণ্ড অব হিস্ট্রি' ইত্যাদি ঘোষণার বাগাড়ম্বর।

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষুরধার সমালোচক নোয়াম চোমস্কি প্রকাশ করেছেন আর এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ইয়ার ফাইভ হাণ্ড্রেড ওয়ান ঃ দ্য কনকোয়েস্ট কনটিনিউজ' (১৯৯৩)। ১৪৯২ সালে কলম্বাস কর্তৃক ভারতে যাওয়ার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা শুরু করে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছনোর মুহূর্ত থেকে চোমস্কি এক নতুন অব্দ গণনা করেছেন। শকাব্দ, খ্রীস্টাব্দ, হিজরী সন প্রভৃতি বর্ষ গণনার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের চেয়ে তিনি মনে করেছেন এই নতুন অব্দের তাৎপর্য মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অনেক গভীর ও ব্যাপক। কলম্বাসের আমেরিকায় পদার্পণ পুঁজিবাদের জন্ম-চিহ্ন; এই ঘটনা নতুন দেশ জয় ছাড়াও মানবগোষ্ঠী ও প্রকৃতির ধ্বংসসাধন করে পুঁজি বৃদ্ধির দ্বারা ধনতন্ত্রকে শৈশব থেকে যৌবনে দ্রুত এগিয়ে দেবার ঐতিহাসিক মুহূর্ত। নোয়াম চোমস্কি ৫০১ বছর পূর্ব থেকে বিশ্ব-পুঁজিবাদের শোষণ ও ধ্বংসসাধনের ইতিহাস ও তাৎপর্য বিবৃত করে মুক্ত বাজার অর্থনীতি, মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কাঠামোগত সংস্কার ও রাষ্ট্রের ভূমিকার ক্ষয়, অর্থনীতির বিশ্বায়ন ইত্যাদি সর্বাধুনিক স্তর নিয়ে গ্রন্থটিতে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে কলম্বাসের কাল থেকে পুঁজিবাদের "কার্য প্রকরণে পরিবর্তন ঘটলেও, বিজয় অভিযানের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির যে সারবস্তু ও কাঠিন্য তা' অপরিবর্তিত রয়েছে"। কার্ল মার্কস ১৩০ বছর আগে তাঁর 'ডাস ক্যাপিটাল' মহাগ্রন্থে (১ম খণ্ড) পুঁজির এই চরিত্রকে ধারালোভাবে তুলে ধরে বলেছিলেন, "পর্যাপ্ত মুনাফা পেলে পুঁজি সাহসী হয়। শতকরা দশ ভাগ লাভ মিললে যে কোন জায়গায় সে তার বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করে, তার ব্যগ্রতা সৃষ্টি হয় বিশ ভাগ মুনাফার জন্য; শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লাভ হলে সে হয়ে ওঠে উদ্ধত; শতকরা একশ ভাগ মুনাফা তাকে সমাজের সমস্ত নিয়ম-কানুন পদদলিত করতে উদ্বুদ্ধ করে; শতকরা তিনশ' ভাগ লাভ হলে সে যে কোন অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না, এমন কোন ঝুঁকি নেই যা সে নিতে পিছপা হয়।"

এইসব মূল্যায়ন আধুনিক পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে কতখানি সত্য তা' সামান্য কিছু নজির থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

(ক) প্রকৃতির ধ্বংসসাধনে পুঁজিবাদ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডাইলেক্‌টিকস্ অব নেচার' বা 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা'তে প্রকৃতি বিষয়ক দিক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আদি-অনন্ত দ্বন্দ্বে ও সমাজ-বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসে মানুষ তার বাঁচা ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করেছে। ক্রমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বা বিস্তারেও ভূমিকা নিয়েছে মানুষ। কিন্তু শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব এই দ্বন্দ্বকে তীব্র করে চলেছে এই অর্থে যে প্রকৃতির সাথে মানুষের ঐক্যকে এই শোষণ ব্যবস্থা ছিন্ন করে ফেলেছে, বিশেষত ধনতন্ত্র। পুঁজিবাদের তীব্র শোষণমূলক চরিত্র ও ভূমিকা এর কারণ। উৎপাদনের চরিত্র যত প্রশস্ত হচ্ছে, ততই বাড়ছে প্রকৃতির ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ। অথচ মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতির নিয়মে এটাও ঘটে যে মানুষ প্রকৃতিকে যেমন আক্রমণ করে তেমনি কখনো কখনো প্রকৃতিও পাল্টা আঘাত হানে। তা' মানুষের কাছে হয় ভয়ঙ্কর বিপর্যয়কর।

আধুনিক প্রকৃতি ও সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলছেন যে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের নৈতিকতাতে গুরুতর পরিবর্তন ঘটার ফলে প্রকৃতিতে বিপর্যয় ও তার ফলে সমাজ-জীবনে বিপর্যয়ের আশঙ্কা বেড়ে উঠেছে। প্রকৃতি সম্পর্কে প্রকৃত নৈতিকতা হলো 'অ্যানথ্রপ-সেন্ট্রিক' বা মানুষ-কেন্দ্রিক। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সেই নৈতিকতাকে করে তুলেছে 'ইকোসেন্ট্রিক' বা অর্থনীতি-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে মানব সম্পর্ক বিবেচনায় রাখার পরিবর্তে, পুঁজিবাদের অর্থনীতির স্বার্থকে কেন্দ্রে রেখে প্রকৃতিকে বিচার করা হচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বের সমগ্র মানব-সমাজের পরিবর্তে মানব-সমাজের একাংশ যারা শোষক, তাদের মুনাফার স্বার্থকে প্রধান করে তোলা হয়েছে প্রকৃতিকে বিচার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে। পরিণামে আলো, জল, মাটি, বায়ু, গ্যাস, তাপ, শব্দ, ভূ-সম্পদ, মহাকাশ, বন, নদী, হ্রদ, পর্বত, শস্যক্ষেত্র, প্রান্তর, জল-মাটি-আকাশের প্রাণী জীবন, সর্বোপরি মানুষ—সব কিছুই এই ধ্বংসসাধনের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে এই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ভবিষ্যতে থাকবে কিনা।

প্রাকৃতিক সম্পদ নির্দিষ্ট পরিমাণে পৃথিবীতে বিরাজ করে। সমাজের চাহিদা বৃদ্ধি ও তার সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নির্বিচারে ঘটলে এটাই স্বাভাবিক যে, বাড়তি প্রয়োজন মেটানোর জন্য বাড়তি প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া সম্ভব হবে না। বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীর দ্বারা ব্যবহৃত সম্পদকে পুনর্ব্যবহার-(রি-সাইক্লিং) যোগ্য করা এবং প্রথাগত সম্পদ ও শক্তির ব্যবহারের পরিবর্তে অপ্রচলিত সম্পদ ও শক্তির ব্যবহার পদ্ধতি গ্রহণ করে প্রাকৃতিক সম্পদের স্থির পরিমাণকে আরও বেশি সময় পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে হয়তো, কিন্তু পাশাপাশি নানা আধুনিক ব্যবস্থার ফলে প্রকৃতির মজুত সম্পদের ও ভারসাম্যের যে ঘাটতি বেড়ে চলেছে তাতে বৃহত্তর আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবস্থাগ্রহণ ছাড়া তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। আর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত ও মানব-কল্যাণকর শোষণহীন সমাজ ছাড়া অসম্ভব। এমনকি প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিপর্যয় ও পরিবেশ দূষণ-রোধে পরিকল্পনা ব্যবস্থাগ্রহণে যে অর্থ-সামর্থ্য প্রয়োজন, তার কর্তৃত্বও পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলির। অথচ এই কাজ শেষোক্তদের নৈতিক দায়িত্বের অন্তর্গত, কেননা তারাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রকৃতিকে শোষণ করে নিজেদের সম্পদ বাড়িয়েছে। প্রকৃতির কাছে সেই অর্থে তারাই ঋণগ্রহীতা, সেই ঋণ তাদেরই প্রধানত পরিশোধ করার কথা। কিন্তু এ'পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্তরে এসব বিষয়ে যত সম্মেলন, সভা বা আলোচনা বা কমিশন গঠিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং বিপদের ক্ষেত্রে আর একটি মাত্রা যুক্ত হয়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, পরিবেশ প্রসঙ্গ এখন আন্তর্জাতিক প্রধানতম সমস্যাগুলির অন্যতম বলে

সর্বত্র স্বীকৃত। পৃথিবীর সরকারগুলি, রাজনৈতিক দলসমূহ ও সামাজিক সংগঠনগুলি নিজেদের স্থায়ী এজেণ্ডায় পরিবেশ প্রসঙ্গকে স্থায়ী হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রসঙ্গটিতে প্রবেশের পূর্বে পৃথিবীর প্রাকৃতিক আবরণের বাস্তবতাটি লক্ষ্য করা যাক। বায়োমাস-গঠনে বায়োস্ফিয়ারের মৌলিক অবদানের ফল হলো নিম্নরূপ ঃ বিশ্বের সমুদ্রের এলাকা হলো ৩৬০ মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার যা বায়োমাস গঠনে অবদান জোগায় ৪৩ শতাংশ, বিশ্বের ট্রপিকাল বনের এলাকা হলো ১০ মিলিয়ন স্কোয়ার কি. মি. যার বায়োমাস গঠনে অবদান হলো ২৯ শতাংশ, বিশ্বের তৃণভূমির এলাকা হলো ৪২ মিলিয়ন স্কোয়ার কি. মি. যার বায়োমাস গঠনে অবদান হলো ১০ শতাংশ, বিশ্বের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বনের এলাকা হলো ২৫ মিলিয়ন স্কোয়ার কি. মি. যার বায়োমাস গঠনে অবদান হলো ১০ শতাংশ, বিশ্বের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হলো ১৪ মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার যার বায়োমাস গঠনে অবদান হলো ৮ শতাংশ।

পৃথিবীর বহিরাবরণের স্তরগুলি, এটির উপরিভাগ ও মাটি, এর শুকনো ভূ-খণ্ডের অভ্যন্তরে জলাধার ও সমুদ্র এবং এর সমগ্র পরিবেশ, এমনকি নিকট মহাকাশের সাথে যুক্ত অঞ্চলগুলি নিয়ে গঠিত হয় বায়োস্ফিয়ার। একে বায়োস্ফিয়ার বলা হয় কেবল এজন্য নয় যে এই অঞ্চলেই জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে, বরং এই কারণে বলা হয় যে প্রাণ গঠনের প্রক্রিয়াসমূহের অনেকখানি এখানে সৃষ্টি হয়। বায়োস্ফিয়ার তৈরি করে তেমন পরিস্থিতি যা জীবনের পক্ষে উপযুক্ত। বায়োস্ফিয়ার হলো সমগ্র পরিবেশ যা মানুষের দ্যোতনাকে প্রভাবিত করে এবং কার্যকালে নিজেকেও প্রভাবিত করে।

বায়োস্ফিয়ারের প্রাকৃতিক ও মনুষ্যজীবনের প্রয়োজনীয় শক্তির প্রধান সূত্র হলো সৌর-বিকিরণ। পৃথিবীতে এই বিকিরণ পৌঁছয় দৃশ্যত আলো ও ইনফ্রা-রেড বিকিরণের মাধ্যমে। পৃথিবীর ৭০ শতাংশ ভাগকে ঢেকে থাকা মেঘ সৌর বিকিরণের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশকে পুনরায় মহাকাশে ফিরিয়ে দেয়। ভূ-ত্বকও অংশত ফিরিয়ে দেয় বিকিরণ (বরফাচ্ছাদিত এলাকা ৮০ শতাংশ, সমুদ্র ১৫ শতাংশ, মাটি-বন ও অন্য উপাদান ২০ থেকে ৩০ শতাংশ এবং ভূ-উপরিসীমা মোটের উপর প্রায় ৩৫ শতাংশ) এবং বাকী বিকিরণ বায়োস্ফিয়ার শুষে নেওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয় ভূমি, সমুদ্র ও ভূ-পৃষ্ঠের অন্যান্য সামগ্রীর উত্তাপ গঠন। এছাড়াও এর সাথে চলে উদ্ভিদের মধ্যে ফটো-সিনথেসিস বা সালোক-সংশ্লেষ যা আমাদের গ্রহের সমগ্র বায়োমাস গঠনের জন্য পরিণামে দায়ী। তাছাড়া আর্দ্রতাজাত বাষ্পীভবনের ও আরো নানা ধরনের প্রক্রিয়ার দ্বারাও বায়োমাস গঠিত হয়।

পৃথিবীর গ্রীষ্মাঞ্চল ও শীতাঞ্চল এবং সমুদ্র ও ভূমি এলাকার মধ্যে সৌরতাপের পার্থক্যই সৃষ্টি করে পরিবেশের সঞ্চালন। একই সাথে সমগ্র পরিমণ্ডলগত সঞ্চালন রক্ষা করে চলে কিছুটা গতিশীল, কিন্তু নির্ভরযোগ্য পরিবেশ-ভারসাম্য।

সালোক-সংশ্লেষের প্রক্রিয়ায় সৌর-শক্তি ও ভূ-পৃষ্ঠের পদার্থসমূহ সৃষ্টি করে ১৮০ বিলিয়ন টন উদ্ভিজ্জ বায়োমাস এবং ৩০০ বিলিয়ন টন অক্সিজেন। ভূমি থেকে যে বাষ্পীভবন ঘটে তার ৫০ ভাগ গাছপালা আত্মীকরণ বা পরিত্যাগ করে যার পরিমাণ ৩০ হাজার কিউবিক কিলোমিটার।

সৌর-শক্তি যে সামান্য ভাগ পৃথিবীর ভূ-সীমায় পৌঁছয় তাতে থাকে আলট্রা-ভায়োলেট রে, এক্স-রে ও গামা রে বিচ্ছুরণ এবং অ্যাটম ও অ্যাটম-কণার প্রবাহ। আলট্রা-ভায়োলেট বিচ্ছুরণ পরিমণ্ডলে ওজোন গ্যাস তৈরি করে। ওজোন গ্যাস সর্বোচ্চ ঘনীভূত রূপ পায় ৩০ কিলোমিটার উর্ধ্বে। সমস্ত ধরনের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর আলট্রা-ভায়োলেট বিচ্ছুরণকে পৃথিবীতে প্রবেশে বাধা দেয় ওজোন গ্যাস সৃষ্ট ঐ স্তরটি।

এই প্রাথমিক ও একান্ত জরুরি দিকগুলির সামান্যতম ক্ষতিসাধন যে জীবনের পক্ষে বিপর্যয়কর হতে বাধ্য, তা' সহজবোধ্য। যে কোনভাবে এই উপাদানগুলির যে কোন একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, স্বভাবতই, তার প্রভাব পরিবেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়াতে সর্বত্র ক্ষতিসাধন হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের বেপরোয়া ব্যবহারের মধ্য দিয়ে

প্রাকৃতিক ভারসাম্যে হানি শুরু হয়েছে যখন থেকে শ্বেতবর্ণের মানুষ বিভিন্ন দেশ দখল করে উপনিবেশ স্থাপন শুরু করেছিল। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ধ্বংসসাধন শুরু হয়েছিল দখল করা দেশগুলির সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও জনসমষ্টিকে যাথাসম্ভব সম্পূর্ণ নির্মূল করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকার বিশাল বিশাল জাতিগুলির ১০ ভাগের ৯ ভাগকেই নির্মূল করে ফেলা হয়েছিল। বিষুবরেখা বরাবর মধ্য-আফ্রিকার সুবিশাল অরণ্যানী ও আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকা জুড়ে বিপুল বনাঞ্চল, যা সারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তা' উপনিবেশবাদীরা ব্যাপকভাবে ধ্বংস করেছিল, এখনও করে চলেছে। পৃথিবীতে ভূমিজাত সম্পদহানির প্রবণতা প্রচণ্ড বর্ধিষ্ণু। ঐতিহ্যগত কৃষি অঞ্চলগুলির ক্ষয় হচ্ছে। নগরায়ণের জন্য এটা ঘটছে। এ'কারণে বনের অঞ্চলও কমে যাচ্ছে। উন্নত দেশসমূহে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অরণ্য বছরে ০.৬ শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে। কাঠ সংগ্রহ ও কৃষির প্রসারের জন্য আর্দ্র-গ্রীষ্ম অঞ্চলের বনাঞ্চল বছরে ২০০ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার হিসাবে কমছে। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রতি বছরে নি-বনায়ন প্রক্রিয়ার পরিমাণ হলো ৭.৩ মিলিয়ন হেক্টর বা প্রতি মিনিটে ১৪ হেক্টর। অরণ্য-সম্পদ আহরণের নামে পৃথিবী জুড়ে এই ধ্বংসের ফলে সংশ্লিষ্ট ভূ-মৃত্তিকা মুক্ত আকাশের নীচে উন্মুক্ত হয়েছে। অক্সিজেন সৃষ্টির প্রক্রিয়া ভয়াবহভাবে কমে যাওয়া ছাড়াও, বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক মরশুমের অনিশ্চয়তা ও ক্ষতি, ভূগর্ভস্থ জলাধারের সঞ্চয়ে স্বল্পতা, মৃত্তিকার বন্ধন ক্ষমতার হানি ও তার ফলে জলধারণের ক্ষমতা কমায় বন্যার প্রকোপ, বন্যার জন্য ফসল, সম্পত্তি ও প্রাণের ক্ষতি, রোগ-মহামারী, বন থেকে শিল্প ও সামাজিক প্রয়োজনীয় উপকরণের স্থায়ী স্বল্পতা, মরুভূমির প্রসার প্রভৃতি অজস্র ধরনের প্রাকৃতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে চলেছে। এর ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ছে, ধরে রাখছে তাপ অর্থাৎ পৃথিবীতে উত্তাপ ক্ষতিকরভাবে বাড়ছে।

আধুনিককালে শিল্প ব্যবস্থার অবিশ্বাস্য বিভিন্নতা ও ব্যাপকতা এবং বিশ্বের শিল্প ব্যবস্থার উপর উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে। প্রধানত শিল্প-উৎপাদনের কারণে প্রতি বছর প্রায় ১৪৫ মিলিয়ন টন সালফার ডাই-অক্সাইড, ২৫০ মিলিয়ন টন ধূলো, ৭০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস, লক্ষ টন ফ্লোরিন ও ক্লোরিন-যৌগ, প্রায় ১ মিলিয়ন টন লেড-যৌগ পরিবেশে মিশ্রিত হচ্ছে। প্রকৃতি সম্পর্কে উপেক্ষার মনোভাব যদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে তবে একবিংশ শতাব্দীতে বছরে ১৫০ মিলিয়ন টন নাইট্রিক অক্সাইড ও ৫০০ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিমণ্ডলকে দূষিত করবে। পরিবেশে এমন শতাধিক সামগ্রী খুঁজে পাওয়া গেছে যেগুলি প্রকৃতির ক্ষতিসাধন করে। সেগুলির অনেকগুলি হলো বিষ, কতকগুলি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। নির্দিষ্ট সময় ধরে স্বল্প পরিমাণে মানুষের শরীরে এগুলি প্রবেশ করলেও নানা দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ হচ্ছে এগুলি।

জল-দূষণের স্বরূপ ভয়াবহ ধরনের। সেচ ও পানীয় জলের চাহিদা সারা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান হওয়ায় উপযুক্ত জল পাওয়ার সমস্যা বাড়ছে, অথচ পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ব্যবস্থা থেকে জলের সামান্যতম অভাব নেই। কেননা এখন বছরে অপরিশোধিত শিল্প-বর্জ্য নদী-নালা-সাগর প্রভৃতিতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ৩২ কিউবিক কিলোমিটার পরিমাণে। জলে নিক্ষিপ্ত মোট দূষণ সামগ্রীর অর্ধেকই ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তার মধ্যে রয়েছে ৫ বিলিয়ন টন মৌল সামগ্রী। তাছাড়া জল দূষিত হচ্ছে নানাভাবে। দারিদ্র্যের জন্য তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে জলে এসে মিশছে নর্দমা, পায়খানা, কারখানা ইত্যাদির নোংরা। কৃষি বা শিল্পক্ষেত্র থেকে পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম, অ্যালড্রিন, ডি. ডি. টি., অন্যান্য কীটনাশক পদার্থ, সায়ানায়েড, তামা, দস্তা প্রভৃতি নানা ধরনের যৌগ জলে ছড়িয়ে পড়ছে। তৈলখনি থেকে চুঁইয়ে বা তৈলবাহী জাহাজগুলি ধৌত করা, তৈলবাহী জাহাজে অগ্নিসংযোগ বা ডুবে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনায় প্রতি বছর সমুদ্রে পড়ছে ৬ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম-জাত সামগ্রী। নর্থ সী, আইরিশ সী, ইংলিশ চ্যানেল, বে অব বিস্কে, বালটিক সী, ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালির উপকূলবর্তী ভূমধ্যসাগর বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে পেট্রোলিয়াম, ডিটারজেন্ট, পারদ, ডি. ডি. টি. ও বিষাক্ত

সামগ্রীতে। আমেরিকার পার্শ্ববর্তী সমুদ্র—প্রশান্ত মহাসাগর প্রভৃতির অবস্থাও ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠছে। জল দূষিত হওয়ার ফলে মাছ, জলজ প্রাণী, পশু-পাখীসহ মাটি বা জলের আরও অজস্র ধরনের প্রাণ ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব ভয়ঙ্করভাবে বিপন্ন। দূষিত জলের জন্য পৃথিবীতে ৪০ কোটি মানুষ পেটের নানাবিধ রোগে ভোগে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি ব্যবসায়িক স্বার্থে মাছ ধরা, শীল ও তিমি মাছ শিকারের মধ্য দিয়ে যেমন ব্যাপক ধ্বংসসাধন করছে, জল বিষাক্ত হওয়ার জন্যও তিমি ও শীল মাছ বিলুপ্তির পথে চলেছে।

বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লু. এইচ. ও.) হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে বিষাক্ত রাসায়নিক সামগ্রীর মোট সংখ্যা ৬,০০,০০০টি। তার সাথে প্রতি বছর আরও ৩০০টি বিষাক্ত রাসায়নিক সামগ্রী যুক্ত হচ্ছে। একটি দেশের বায়ুর দূষণ সেদেশেই আবদ্ধ থাকছে না। পশ্চিম ইউরোপের দূষিত বাতাস প্রবাহিত হয়ে পূর্ব ইউরোপ ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় বায়ু দূষণের অর্ধেক ঘটছে মোটর যানের ধোঁয়ায় এবং অর্ধেক ঘটছে তাপ বৃদ্ধির ব্যবস্থা ও শিল্পের জন্য। ফ্রিজ বা এয়ার কণ্ডিশনার মেশিন ঠাণ্ডা রাখতে বা ইনস্যুলেটরের কাজে, ফোম বা প্লাসটিক কফি কাপ বা খাবারের বাক্স তৈরি করতে ও কমপিউটারের যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা হয় ক্লোরোফ্লুরো কার্বন গ্যাস। উন্নত দেশগুলিতে এটির ব্যবহার অস্বাভাবিক বেশী। সি. এফ. সি. নির্গত হওয়ার ফলে, ইতোমধ্যেই জানা গেছে, ওজোন দ্বারা সৃষ্ট নিরোধক বায়ুমণ্ডলে বড় বড় গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। এইসব গহ্বর দিয়ে পৃথিবীতে সরাসরি প্রবেশ করা শুরু করেছে অতি বিষাক্ত ও বিপজ্জনক আলট্রা-ভায়োলেট রে। এতে চামড়ার ক্যান্সার রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাসায়নিক গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশে যাবার ফলে রক্তাল্পতা, ফুসফুস, কিডনী, লিভার, মস্তিষ্কের স্নায়ু, হার্ট, রক্তের চাপ, গর্ভস্থ ভ্রূণ, প্রজনন ক্ষমতা প্রভৃতিতে রোগ বা ক্ষতি এখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। তাছাড়া, রাসায়নিক ও ভূগর্ভস্থ তৈল পুড়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাবার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে 'অ্যাসিড রেইন'-এর মত বিপজ্জনক বৃষ্টিপাত। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের ভয়ঙ্কর ধরনের ক্ষতি প্রাকৃতিকভাবে যেমন ঘটে আসছে, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরণের দ্বারা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রতি বছর সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে বা দেশে ছোট-বড় যুদ্ধ ঘটেই চলেছে। যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত বোমায় বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিসাধন বৃদ্ধির পাশাপাশি এখন অধিকতর বিষাক্ত সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে বিস্ফোরক হিসাবে। নাপাম বোমা, রাসায়নিক ও জীবাণু বোমাও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হয়ে ক্ষতিকে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, বায়ুবাহিত হয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের অন্যত্র ও অন্যান্য দেশের জনগণের স্বাস্থ্যের বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে। সর্বোপরি এ্যাটম বোমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মাত্র দু'টি ব্যবহৃত হলেও, পরবর্তীকালে অনেকগুলি দেশ আরও উন্নত ও ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করেছে অজস্রবার ভূমিতে ও বায়ুমণ্ডলে। ভূগর্ভস্থ বিস্ফোরণে আপাত কোন বিপদের চিহ্ন না থাকলেও পূর্বোক্ত পরীক্ষাগুলিতে তেজস্ক্রিয় পরমাণু ভস্ম সারা বিশ্বের জল, বায়ু ও ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বা পরমাণু চালিত সাবমেরিন ও জাহাজ দুর্ঘটনায় তেজস্ক্রিয়তার ফল আরও ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিসাধনের পথকে প্রশস্ত করেছে। তাছাড়া, যানবাহন হিসাবে ব্যাপকভাবে জেট প্লেনের ব্যবহার, বিভিন্ন পাল্লার রকেট ও মহাকাশযান প্রেরণের ব্যবস্থাও বড় ভূমিকা নিচ্ছে বায়ুমণ্ডলকে প্রত্যক্ষভাবে দূষণে।

রাসায়নিক গ্যাস ও আরও বিবিধ কারণে পৃথিবীর তাপও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই কারণগুলির বিস্তৃত উল্লেখ না করেও বলা যায় যে, এই তাপবৃদ্ধিতে রয়েছে ভবিষ্যতে পৃথিবী ও পরিমণ্ডলকে বৃহত্তর বিপদের দিকে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তাপবৃদ্ধির জন্য উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ গলে যাওয়ার ফলে সমুদ্রের জলের উপরিভাগ যদি মাত্র এক মিটার বৃদ্ধি পায় তবে পৃথিবীর বহু দেশের জন-অধ্যুষিত এলাকা সমুদ্রগর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ বর্তমান সময়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে বিপর্যয়কর আশঙ্কা সৃষ্টির কারণ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুমিত ভবিষ্যৎ চিত্রটি দেখা যাক :

মোট জনসংখ্যা (বিলিয়ন বা ১০০ কোটিতে)

দেশের নাম	১৯৮০	২০০০	২০২৫	২০৫০	২০৭৫	২১০০
বিশ্ব	৪.৪৩	৬.১২	৮.২০	৯.৫১	১০.১০	১০.১৮
বেশী উন্নত এলাকা	১.১৩	১.২৭	১.৩৮	১.৪০	১.৪২	১.৪২
কম উন্নত এলাকা	৩.৩০	৪.৮৫	৬.৮২	৮.১১	৮.৬৮	৮.৭৬
আফ্রিকা	০.৪৭	০.৮৫	১.৫৪	২.১৭	২.৫১	২.৫৯
লাতিন আমেরিকা	০.৩৬	০.৫৭	০.৮৭	১.১০	১.২২	১.২৪
উত্তর আমেরিকা	০.২৫	০.৩০	০.৩৪	০.৩৬	০.৩৮	০.৩৮
পূর্ব এশিয়া	১.১৮	১.৪৮	১.৭১	১.৭৭	১.৭৬	১.৭৬
দক্ষিণ এশিয়া	১.৪০	২.০৮	২.৮২	৩.২০	৩.৩১	৩.২৮
ইউরোপ	০.৪৮	০.৫১	০.৫২	০.৫১	০.৫০	০.৫০
ওশেনিয়া	০.০২	০.০৩	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪
সি. আই. এস.	০.২৬	০.৩১	০.৩৬	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮

বিশেষজ্ঞদের মত হলো যে, এই বিপুল জনসংখ্যা সমানভাবে সারা পৃথিবীর বাসযোগ্য জমিতে (৫০ মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার) ছড়িয়ে দিতে পারলেই কেবলমাত্র বাসের সংস্থান ভবিষ্যতে করা সম্ভব। বর্তমান রাষ্ট্র-ভিত্তিক সীমানার অন্তর্গত থেকে কোনওভাবে এই জনসমষ্টির বাসের সংস্থান সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হলো বৃত্তির সংস্থানের সমস্যা। সারা বিশ্বে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়েও দ্রুত হারে বাড়বে ভবিষ্যতে; ন্যূন পক্ষে জনসংখ্যার ২/৩ ভাগ কর্মপ্রার্থী হবে। কিন্তু কৃষি, শিল্প ও পরিষেবার বর্তমান অবস্থার দ্বারা কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটানো কিছুতেই সম্ভব হবে না। বরং নতুন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ব্যবস্থা ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কর্মসংকোচন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই ব্যবস্থা চলতে থাকলে ও সুদৃঢ় হলে কর্মপ্রার্থীর ১/২০ ভাগের বৃত্তির কোন সংস্থান হবে না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামনে অপর ভবিষ্যৎ সমস্যা হলো খাদ্য। বর্তমানে সারা বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির গড় হার ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় ভয়ঙ্কর ধরনের নিম্ন।

বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনের হারকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে ১.৫ গুণ বেশি হারে বৃদ্ধি করে এবং বর্তমান মোট উৎপাদিত খাদ্যের চেয়ে তিন গুণ বেশি উৎপাদন বৃদ্ধি করেই এটা সম্ভব হতে পারে। বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনে উন্নত দেশগুলি বিশেষত আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নিজ জনগণের প্রয়োজনের চেয়ে ৩-৫ গুণ বেশি খাদ্য উৎপাদন করে: খাদ্য বিক্রি করে মুনাফা অর্জন এদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম দিক। এই বাড়তি খাদ্যের বিশ্বব্যাপী সম বন্টনই যথেষ্ট হবে না, বর্তমানে বিশ্বের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি, কৃষিতে আরও উন্নত ব্যবস্থা, এমনকি সমুদ্রের তলদেশের উদ্ভিদকে ব্যবহারযোগ্য করে খাদ্য সমস্যার সমাধান হতে পারে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব কি না তাও পরিপূর্ণভাবে বিবেচনায় রাখার প্রয়োজন দেখা দেবে। পরিবার-নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোচ্চ তৎপরতা চালানোর পরও খাদ্য ছাড়াও শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতির সমস্যা বিস্ফোরণের স্তরে পৌঁছবে। আর এই অবস্থার স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্যমূলক অনুপাত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া, ব্যাপক উত্তোলন ও ব্যবহারের ফলে খনিজ সম্পদও প্রায় নিঃশেষিত হবে;বিশেষত জ্বালানি ও শক্তির সমস্যা হবে বিপজ্জনক।

পুঁজিবাদের 'ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশনে'র এই হলো একটি দিক।

(খ) জনগণের নিরাপত্তার বিপদ সৃষ্টিতে আধুনিক পুঁজিবাদ

ঠাণ্ডা যুদ্ধের তথাকথিত অবসান ও বিশ্বে তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ হ্রাস পাওয়ার কথা প্রচার

করে চলেছে সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু এই বক্তব্যের অন্তরালে বিশ্বের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে জনগণকে নির্মূল করার এক সুপ্ত চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ আধুনিক পুঁজিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে, দুর্বল দেশগুলি ও সেগুলির জনগণ এখন সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক হুমকি ও একেবারে উন্মুক্ত আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন।

এই নতুন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে দুই বিবদমান পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্যে যুদ্ধের ফলে, কোন একটি দেশের অভ্যন্তরে জাতিগত বা ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ বা দাঙ্গাতে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ব্যাপক সামরিক তৎপরতায়। তার ফলে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং জনপদ ও সম্পদের অবর্ণনীয় ধ্বংসসাধন ঘটে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্ধন বা ভূমিকা রয়েছে এগুলির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রসংঘের নিস্পৃহতায় অথবা শিথিল ভূমিকায় পরিস্থিতির উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটছে সর্বত্র।

সংঘর্ষের এই চারিত্রিক পরিবর্তন অতীতে দেশসমূহের মধ্যে যুদ্ধ থেকে এখন দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধের চরিত্র নিচ্ছে। ১৯৮৯-৯২ সালের মধ্যে ঘটেছিল সংঘর্ষের ঘটনা ৮২টি, যখন দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল মাত্র ৩টি। পূর্বোক্ত ঘটনাগুলির কোন কোনটিকে নৃতাত্ত্বিক-জাতিগত সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলির পেছনে কারণ ছিল রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক। অধিকাংশ সংঘর্ষগুলি ঘটেছে অনুন্নত দেশসমূহে। ১৯৯৩ সালে ৪২টি দেশে ৫২টি গুরুতর সংঘর্ষ ঘটেছিল এবং আরও ৩৭টি দেশে প্রবল রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটে। এই ৭৯টি দেশের মধ্যে ৬৫টি দেশ ছিল অনুন্নত অংশের। কিন্তু এই জাতীয় সংঘর্ষগুলি ঘটছে পৃথিবীর সমস্ত এলাকা জুড়ে। ইউরোপে—বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, জর্জিয়া, রাশিয়ার চেচনিয়া, তুরস্ক, ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যে—ইরাক, কুয়েত, ইসরায়েল, আলজিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি; লাতিন আমেরিকাতে—পেরু, কলম্বিয়া, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া প্রভৃতি। এশিয়াতে—বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়নামার, আফগানিস্তান, লাওস, ইরান, ফিলিপাইনস, তাজিকিস্তান প্রভৃতি; আফ্রিকাতে—অ্যাঙ্গোলা, চাঁদ, ইথিওপিয়া, মরক্কো, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, উগাণ্ডা, জায়রে, জিম্বাবোয়ে, রোয়াণ্ডা, মোজাম্বিক প্রভৃতি; ১৯৯৩ সালে সংঘটিত সংঘর্ষগুলির অর্ধেক ছিল পূর্ব এক দশকের ধারাবাহিকতা। এতে নিহত হয়েছিল ৬০ লক্ষ মানুষ। ১৯৮৯-৯২ সালের যেসব দেশে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলেছে তার মধ্যে ৮টি দেশে প্রতি বছর কমপক্ষে সহস্রাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। দেশগুলি হলো ঃ আফগানিস্তান, অ্যাঙ্গোলা, ভারত, পেরু, ফিলিপাইনস, সোমালিয়া, শ্রীলঙ্কা ও সুদান। ১৯৯৫ সালে পাকিস্তানের করাচিতে প্রত্যহ নিহত মানুষের সংখ্যা ইতোমধ্যেই বসনিয়ার রেকর্ডকে অতিক্রম করে গেছে। ১৯৪৫ সালের পর যুদ্ধে এ'পর্যন্ত মানুষ নিহত হয়েছে ২০ মিলিয়ন বা ২ কোটি। কিন্তু তথাকথিত বর্তমান "শান্তির কাল-পর্বে" প্রতি বছর গড়ে যে নিহতের হার, তাতে ১৯৪৫-৮৯-এর মধ্যে নিহত ঐ মানুষের সংখ্যাকে ১৯৮৯-৯৯ সালের অর্থাৎ ১০ বছরের মধ্যে নিহতের সংখ্যা অতিক্রম করে যাবে।

এই সময়কালে সর্বাধিক মানবিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে বসনিয়া, আফগানিস্তান, রোয়াণ্ডা, শ্রীলঙ্কা, সোমলিয়া প্রভৃতি দেশে। এই দেশগুলিতে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন প্রায় ১১ লক্ষ মানুষ, আহত হয়েছেন ১৭ লক্ষ, বীভৎস নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৩-৪ লক্ষ মানুষ বিশেষত নারী ও শিশু, সম্পত্তিহানি অবর্ণনীয়। প্রায় অধিকাংশ দেশের ঘটনাতে দেখা গেছে সাম্রাজ্যবাদ বা আন্তর্জাতিক ধর্মীয় মৌলবাদ এইসব সংঘর্ষে নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে ইন্ধন জুগিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের চক্ষুশূল সংশ্লিষ্ট দেশকে অস্থিরতার মধ্যে রাখতে অন্তর্ঘাত চালানো এবং ঐ দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দেওয়া এবং দেশটিতে তাদের রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক শত্রুদের খতম করার জন্য নানা পরিকল্পনা নিয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া এবং ভয়ঙ্কর ধরনের সন্ত্রাসমূলক কাজের দ্বারা ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত করাও সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে বছরে গড়ে ৫০০টি

করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ঘটেছে। এই সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় ৬০ শতাংশ হলো বোমা বিস্ফোরণ; তার পরে রয়েছে সশস্ত্র আক্রমণ, কোন কোন বিশেষ বছরে অগ্নিসংযোগ বা বিমান ছিনতাই ঘটেছে। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে এইসব ঘটনায় যেখানে বছরে গড়ে ১০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, তারপর এই গড় এখন বছরে ২০০০ অতিক্রম করে গেছে।

পৃথিবীর দেশে দেশে পূর্বোক্ত বিভিন্ন ধরনের গৃহযুদ্ধ ও সংঘর্ষের জন্য মানুষের দেশান্তরী হওয়ার ঘটনাও ভয়ঙ্কর ধরনের। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এই ধরনের দেশান্তরের ঘটনার কিছু নমুনা হলো ঃ আফগানিস্তান থেকে ৬০ লক্ষ মানুষ, মোজাম্বিক থেকে ২১ লক্ষ, ইরাক থেকে ১৪ লক্ষ, সোমালিয়া থেকে ৯ লক্ষ, ইথিওপিয়া থেকে ৯ লক্ষ, লাইবেরিয়া থেকে ৭ লক্ষ, অ্যাঙ্গোলা থেকে ৪ লক্ষ, মায়নামার থেকে ৩.৫ লক্ষ, সুদান থেকে ৩ লক্ষ, শ্রীলঙ্কা থেকে ১.৮০ লক্ষ, রোয়াণ্ডা থেকে ৫০ লক্ষ।

সমাজবদ্ধ মানুষের সামনে সর্বক্ষণের ভীতি ও আশঙ্কার কারণ হিসাবে 'ক্রাইম অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স' তথা দুষ্কর্ম ও হামলাবাজি সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকাসহ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এবং পুঁজিবাদে আশ্রয় নেওয়া প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও তৃতীয় দুনিয়া ও বর্তমানে আরও ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হয়েছে এই সামাজিক ব্যাধির দ্বারা। প্রতি বছর 'ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন' প্রকাশিত রিপোর্টগুলি থেকে এ'বিষয়ে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে কিছুদিন আগে পর্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ-বিদ্বেষের ফলে এবং পশ্চিম ইউরোপে পীত ও অন্যান্য জাতির প্রতি বিদ্বেষের জন্য অথবা সম্পত্তিহরণের লক্ষ্যে কিংবা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক রেষারেষির প্রতিশোধের জন্য, যৌনক্ষুধার তাড়নায়, দুর্বৃত্তির মানসিকতা ব্যাপক আকার ধারণ করায়, চোরা-চালানের ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিরোধের পরিণতিতে, প্রচার-মাধ্যমের বিষক্রিয়ায় মানসিক বিকৃতির ফলে, দারিদ্র্য ও হতাশার পরিণামে, কিশোর কৈবল্যবাদিতায়, সমকামিতার আকর্ষণে, বার বার জেলখাটা দাগীদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত আর্থিক নিরাপত্তা দেবার ব্যর্থতায়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর গুপ্ত সংবাদ বিরোধীশক্তিকে বা পুলিশকে সরবরাহ করার জন্য প্রতিশোধ নিতে, ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠক, বামপন্থী বা প্রতিবাদী গণতন্ত্রীদের কণ্ঠ রোধ করার জন্য, ধর্মঘট বা আন্দোলন ভাঙ্গার উদ্দেশ্য নিয়ে, ব্যবসা বা বৃত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপসারিত করতে দুষ্কার্য ও হামলাবাজি সংঘটিত হয়ে চলেছে। এইসব ঘটনা যেমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সংঘটিত করে, রাষ্ট্রীয় মদতেও বেশ কিছু ধরনের দুষ্কার্য ও হামলা সংঘটিত হয়ে থাকে।

যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে ১ কোটি ৬০ লক্ষটি। প্রতিদিন পৃথিবীতে প্রতি দু'হাজার নারীর মধ্যে একজন ধর্ষণের শিকার হন। ১৯৯৩ সালে আমেরিকাতে ধর্ষণের ঘটনা ছিল ১,৫০,০০০টি এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হন অগণিত নারী।

মানব-সম্পদ ধ্বংসসাধনে পুঁজিবাদ

পৃথিবীর সমস্ত ধরনের সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হলো মানব-সম্পদ। এই ধারণা ঐতিহাসিক ও শাশ্বত। পুঁজিবাদ ব্যবস্থা হিসাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। পুঁজিবাদী ধারণাতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো পুঁজি বা মূলধন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে পুঁজিপতিরা অন্যান্য শ্রেণীগুলির সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে শোষণের লক্ষ্যে এবং এই সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্ক হলো এক পক্ষের শোষণ করার ও অপর পক্ষের শোষিত হওয়ার।

বিশ্ব-জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবের রূপ

এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম দিকটি হলো বিশ্ব-বেকারত্ব। ১৯৯২ সালে ও. ই. সি. ডি.-ভুক্ত দেশগুলিতে বেকারত্বের হার ছিল ৮.২ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছর থেকে ৩১ লক্ষ নতুন বেকার যুক্ত হয়ে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এই বেকারী সর্বাধিক হলো যুব সমাজের মধ্যে।

এই বেকারীর আর একটি উপাদান হলো যে, বেকারত্বের স্থায়িত্বের কালকে আশির দশকে গড়ে

১২ মাস ধরলে এখন তা' বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ মাসের গড়ে পৌঁছেছে। অর্থাৎ বেকারী বৃদ্ধির পাশাপাশি বেকারীর সময়ও এখন বর্ধিষ্ণু। তাছাড়া বেকারত্ব সরাসরি প্রভাব ফেলেছে শ্রমজীবীদের মজুরির উপরও। জার্মানি ও ইতালিকে বাদ দিয়ে ও. ই. সি. ডি.-ভুক্ত দেশগুলির সর্বত্র মজুরি বৃদ্ধির হার গত তিনটি বছরে পূর্ববর্তী বছরের থেকে ক্রমান্বয়ে কমে গেছে।

পূর্ব-ইউরোপীয় প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের অব্যবহিত পর (১৯৯০) বেকার দাঁড়িয়েছিল ১ লক্ষ, মার্চ ১৯৯২ সালে তা' দাঁড়ায় গিয়ে ৪০ লক্ষতে। 'কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস' বা সি. আই. এস. (প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন)-তে ১৯৯২ সালে বেকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০ লক্ষ।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে দুর্দশা বেড়েই চলেছে। ১৯৯০ সালে সেখানকার জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ বা ১৯ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতেন—যা ১৯৮০ সালের চেয়ে ৫ শতাংশ বেশী। ২২ শতাংশ মানুষকে হত-দরিদ্র বলা যায়। সেখানকার গড় বেকারীর সংখ্যা ৮ শতাংশ, তার মধ্যে সর্বাধিক আক্রান্ত হলেন যুবক ও মহিলারা। ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে সেখানে শিল্প-মজুরি কমে গেছে ১৭.৫ শতাংশ, ন্যূনতম মজুরি কমেছে ৩৫ ভাগ। লাতিন আমেরিকার চেয়েও দুরবস্থা হলো ক্যারিবিয়ান দেশসমূহে। আফ্রিকা মহাদেশের শোচনীয় বাস্তবতা অবর্ণনীয়। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ২৫টি দেশের মধ্যে ২০টি হলো আফ্রিকাতে। ২০০০ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৫০ শতাংশে। আফ্রিকাতে বেকারীর পরিমাণ সত্তরের দশকে ১০ শতাংশ ছিল, তা' বৃদ্ধি পেয়ে ২০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আরব দেশগুলির কোন কোনটিতে বর্তমান বেকারীর হার ২৯ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

সারা পৃথিবীতে ষাটোর্ধ্ব বয়সের ৩০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশের বাঁচার মত সামান্য আয় রয়েছে। বাকী ৮০ শতাংশের কোন আর্থিক নিরাপত্তা নেই। তৃতীয় দুনিয়াতে গড় বেকারী ১০% বলে দেখানো হলেও প্রকৃত ও আধা-বেকারী তার চেয়ে তিন গুণ বেশী। উন্নত দেশগুলির মতো বেকারদের জন্য কোন ন্যূনতম আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে না থাকার ফলে বেকারদের দারিদ্র্য প্রচণ্ড। তাছাড়া, যারা কর্মরত তাদের মধ্যে, ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী, ইনফরমাল সেক্টর বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত সংখ্যাই বিপুল; লাতিন আমেরিকাতে ৩০%, আফ্রিকাতে ৬০%। শিল্পে যে দেশ যত অনুন্নত, সেখানে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা বেশী। এর অর্থ হলো বৃত্তিতে অনিশ্চয়তা ও কম মজুরি এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুযোগের অভাব।

ব্যাপক বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ঋণ, বাজেট ঘাটতি, ফাঁপাই মুদ্রার প্রসার প্রভৃতির ফলে অনুন্নত দেশগুলি অতিকায় মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়েছে আশির দশক থেকে। বর্তমানে তার হার নিম্নগামী হলেও, এখনও তার চাপ ভয়ঙ্কর স্তরে রয়েছে। আশির দশকের শেষে মুদ্রাস্ফীতি নিকারাগুয়াতে ছিল ৫৮৪ শতাংশ, আর্জেন্টিনাতে ৪১৭ শতাংশ, ব্রাজিল ৩২৮ শতাংশ, উগাণ্ডা ১০৭ শতাংশ এবং নব্বই-এর দশকের শুরুতে ইউক্রেনে ১,৪৪৫ শতাংশ, রাশিয়াতে ১,৩৫৩ শতাংশ ও লিথুয়ানিয়াতে ১,১৯৪ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতির ফলে উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে শ্রমজীবীদের মজুরি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আশির দশকে প্রকৃত মজুরি-মান অবনমনের হার ছিল ২০ শতাংশ; আফ্রিকার বহু দেশেও অনুরূপ, যেমন টোগোতে ২০ শতাংশ, কেনিয়াতে ৪০ শতাংশ, সিয়েরা লিওনে ৮০ শতাংশ। প্রকৃত মজুরি অবনমনের হার নারীদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় ৩০-৪০ শতাংশ বেশি। এমনকি জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মত উন্নত পুঁজিবাদী দেশে নির্মাণ শিল্পে, নারীরা পুরুষদের থেকে অর্ধেক বেতন পান। উপার্জনের নিরাপত্তা উন্নত দেশগুলিতেও ব্যাপকভাবে কমছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলিতে অন্যান্য অংশের শ্রমজীবীদের গড় মজুরীর তুলনায় অর্ধেক বেতন পান ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ বা কর্মরতদের ২৮ ভাগ। পৃথিবীতে কর্মক্ষম অথবা অন্যভাবে প্রতিবন্ধী শ্রমশক্তির সংখ্যা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ, কিন্তু তার মধ্যে ১ শতাংশ মানুষ মাত্র কর্মরত। এদের দারিদ্র্য সহজেই পরিমেয়। দরিদ্র দেশগুলিতে

এই শ্রমশক্তির সংখ্যা সর্বাধিক। কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পর তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে, অতিসামান্য কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, পেনশন বা সামাজিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে, বিশাল বেকার-অধ্যুষিত দেশগুলিতে কোন কর্মরত ব্যক্তি অবসর গ্রহণের পর এবং সাধারণভাবে পরিবারে কোন উপার্জনক্ষম না থাকলে পরিবারটি নতুন করে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়। উন্নত দেশগুলিতেও অবসরগ্রহণকারীদের আর্থিক সুযোগ ক্রমশ নিম্নগামী। যেমন আমেরিকাতে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে আর্থিক সুযোগের অবনমন ঘটেছে ৪০ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়াতে ৫০ ভাগ। জার্মানীতে 'মেটারনিটি কমপেনসেশন' বা প্রসূতিকালীন ভর্তুকি কমেছে ২৫ ভাগ।

প্রকৃত 'গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট'-এর বিচারে বিগত পাঁচ দশকে বিশ্বের উপার্জন সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথা পিছু প্রকৃত 'গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট'-এর বিচারে, তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মাথাপিছু উপার্জন। কিন্তু উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে এবং প্রত্যেকটি দেশের অভ্যন্তরে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়ের বৈষম্য, কমে যাওয়ার পরিবর্তে, বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনী ২০ শতাংশ অংশের জনগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৭০ থেকে ৮৫ শতাংশ। অন্যদিকে বিশ্বের জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ২০ শতাংশের আয় ২.৩ শতাংশ থেকে কমে ১.৪ শতাংশ হয়েছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বাস করলেও, তারা সারা বিশ্বের চার-পঞ্চমাংশ উপার্জন ও উন্নয়নের সুযোগের অধিকারী। এই পার্থক্য প্রতিফলিত হয় বিভিন্নভাবে—যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বাণিজ্যিক ঋণ প্রদানের ক্ষমতায়। অনুন্নত দেশগুলির এইসব ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রায় শূন্য বললেই চলে।

খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক অধিকার। 'খাদ্য নিরাপত্তার অধিকার' স্বীকৃত হওয়ার অর্থ হলো প্রত্যেকটি মানুষের জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যের উপযোগী সর্বক্ষণের জন্য বস্তুগত ও আর্থিক তথা খাদ্য প্রাপ্তি। বিশ্বে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় তাতে বর্তমানে কোন সমস্যা হবার কথা নয়। এমনকি আশির দশকে অনুন্নত দেশগুলিতেও খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ১৮ শতাংশ। প্রত্যেকটি মানুষ দৈনিক ২৫০০ ক্যালোরির খাদ্য, যা জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট, তা' তাঁরা পেতে পারেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে বিশাল সংখ্যক মানুষ ন্যূনতম খাদ্য থেকেও বঞ্চিত। সারা পৃথিবীতে ৮০০ মিলিয়ন বা ৮০ কোটি মানুষ বুভুক্ষায় দিন কাটায়। সাব-সাহারা বা উপ-সাহারা (আফ্রিকা) এলাকায় জনগণের ৩০ শতাংশ বা ২৪ কোটি মানুষ গভীর অনাহারে দিন কাটায়। খাদ্যের অপ্রতুলতার জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় জন্মগ্রহণকারী ৩০ শতাংশ শিশু স্বাভাবিকের চেয়ে নিম্ন ওজন নিয়ে জন্মায়।

এবারে সর্বাধুনিক পরিস্থিতির দিকে কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন চিল্ড্রেন'-এর এক দশকের মধ্যবর্তী পর্যায়ের পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের ১৯৯৬ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করা করা হয়েছে "শিশু-পুষ্টির ক্ষেত্রে সামান্য অথবা কোন অগ্রগতিই ঘটেনি" বর্তমান বিশ্বে। ১৩-১৭ নভেম্বর ১৯৯৬ রোমে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড ফুড সামিট'-এর মূল্যায়নে উন্নত দেশগুলির দ্বারা অনুন্নত দেশগুলির জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ও খাদ্য-ব্যবসায়ে রক্তশোষক মুনাফার অব্যাহত তৎপরতার চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড ফুড কংগ্রেস'এর সময়ের পর থেকে কৃষিতে উন্নয়নের জন্য সাহায্য ক্রমাগত কমে চলেছে। বর্তমানে ১০০টি দেশের খাদ্য পরিস্থিতি এমন শোচনীয় স্তরে পৌঁছেছে যা ১৫ বছর আগে ভাবাও যেতো না। খাদ্যের ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সাহায্য ৬.২ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে এখন দাঁড়িয়েছে ২.৬ বিলিয়ন ডলারে। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে সারা বিশ্বে খাদ্য মজুত কমেছে বছরে ১৭ শতাংশ হারে। এই সময় সারা বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল ১৭২ কোটি টন। সঙ্গত কারণেই পূর্বোক্ত সম্মেলনে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো প্রশ্ন তুলেছিলেন, "৮০০ মিলিয়ন বুভুক্ষু জনগণ ও প্রত্যহ অনাহারে মৃত ৩৫ হাজার শিশুর জন্য কি করেছে উন্নত দেশগুলি? ২০১৬ সালে অনাহারগ্রস্তের সংখ্যা ৪০০ মিলিয়নে কমিয়ে আনার প্রস্তাবের কোন তাৎপর্য আছে? কেন সারা বিশ্বে ৭০০ বিলিয়ন ডলার সামরিক খাতে ব্যয় করা হচ্ছে, যখন জনগণ খাদ্যের মতো এক ন্যূনতম মৌলিক ও মানবিক

অধিকার থেকে বঞ্চিত?" ১৯৯৭ সালের প্রথমার্ধে প্রকাশিত 'ফাও'-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় আফ্রিকার কতকগুলি দেশ, বিশেষত জাইরে, রোয়াণ্ডা, বুরুন্ডি, কেনিয়া, তানজানিয়া, উগাণ্ডা, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, সুদান, লাইবেরিয়া ইত্যাদিতে বছরের পর বছর ধরে দুর্ভিক্ষ চলছে অব্যাহত ভাবে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য তথা স্বাস্থ্য নিরাপত্তার অধিকার বর্তমান বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভয়াবহভাবে আক্রান্ত। বিশেষত 'গ্যাট চুক্তি' সম্পাদনের মধ্য দিয়ে পেটেন্ট সংক্রান্ত একচেটিয়া ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির করায়ত্ত হওয়ায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রটি নির্মম শোষণের বাজারে পরিণত হয়েছে। সমাজ কল্যাণের এই পরিষেবার ক্ষেত্র সরাসরি পরিণত হয়েছে লাভজনক শিল্পে। এমনকি ধনী দেশগুলির বিভিন্ন 'ফার্মাসিউটিক্যাল' সংস্থা রক্ত, প্লাজমা, কিডনি প্রভৃতি বিভিন্ন মানব-প্রত্যঙ্গ যা শল্য চিকিৎসার দ্বারা মুমূর্ষু রোগীর শরীরে বসিয়ে প্রাণরক্ষা করা যায়, তৃতীয় দুনিয়ার দরিদ্র মানুষদের প্রলোভিত ও প্রতারিত করে সেগুলি প্রকাশ্যে বা গোপনে, আইনি বা বেআইনিভাবে বিদেশে বাণিজ্যিক পাচার করছে। বিশাল লাভের বিনিময়ে উচ্চ মূল্যে মনুষ্য-প্রত্যঙ্গ বিক্রির ব্যবসা চালাচ্ছে তারা। এসব বিষয়ে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য ইতোমধ্যে উদ্ঘাটিতও হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের মধ্যে অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হলো সংক্রামক ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত রোগ, যা বছরে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটায়। তার সাথে ৬৫ লক্ষ মানুষ মারা যান ফুসফুসে কঠিন সংক্রমণে, ৪৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে আন্ত্রিক রোগে, ৩৫ লক্ষ জীবন নির্বাপিত হয় যক্ষ্মাতে। এই রোগগুলি প্রধানত হয় অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য— বিশেষত দূষিত জলপানের ফলে, যাতে বছরে ১০০ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়।

উন্নত দেশগুলিতে খাদ্যাভ্যাস ও ভিন্ন জীবনযাত্রার জন্য ও রক্তচাপজনিত কারণে ৫৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে; দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ক্যান্সার আক্রমণে মৃত্যু।

শিল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশগুলিতে জীবনের আশঙ্কা বিশেষত ঘটে গ্রামাঞ্চলে এবং প্রধানত দরিদ্র ও শিশুদের মধ্যে। ১৯৯০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নিরাপদ পানীয় জল পেতো শহরাঞ্চলে ৮৫ ভাগ ও গ্রামাঞ্চলে ৬২ ভাগ মানুষ। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অ-শ্বেতকায় ও দরিদ্র মানুষরা সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতকায়দেরও এক-তৃতীয়াংশ বাস করে এমন এলাকায় যেখানে কার্বন মনোক্সাইড দ্বারা বায়ু-দূষণ রয়েছে, অ-শ্বেতকায়দের ৫০ ভাগ অনুরূপ পরিবেশে থাকে। এই ধরনের বৈষম্যের পরিবেশের জন্য কানাডাতে আদিবাসীদের আয়ুষ্কাল যেখানে ৭২ বছর, শ্বেতকায়দের ক্ষেত্রে তা' হলো ৭৭ বছর।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যও ভয়াবহ। উন্নত দেশে প্রতি ৪০০ জনে একজন চিকিৎসক রয়েছে, অনুন্নত দেশে প্রতি ৭,০০০ জনে মাত্র একজন। মাথাপিছু স্বাস্থ্য খাতে উন্নত ও অনুন্নত দেশে ব্যয়ও ভয়ঙ্কর ধরনের বৈষম্যমূলক। একটি উদাহরণেই তা' স্পষ্ট হবে। দক্ষিণ কোরিয়া ব্যয় করে বছরে মাথাপিছু ৩৭৭ ডলার, আর বাংলাদেশে ব্যয় হয় ৭ ডলার। উন্নত দেশগুলির দ্বারা অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণের পরিণামের অন্যতম দিক হলো এটি।

অনুন্নত দেশের নারীরা বিশেষত, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসায় সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবহেলার শিকার। গর্ভবতী অবস্থায় উপযুক্ত খাদ্য ও বিশ্রামের অভাব ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার কোন সুযোগ তারা পায় না। অন্যদিকে নিরাপদ প্রসবের সুযোগ ও ব্যবস্থাও অধিকাংশ দরিদ্র জননীদের জন্য নেই। এই সব দেশগুলিতে না আছে প্রসূতিসদন বা হাসপাতাল, না আছে ডাক্তার বা নার্স, এমনকি প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত দাই। তার ফলে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় জন্মকালে শিশুমৃত্যুর হার ১৮ গুণ বেশি তৃতীয় দুনিয়ায়।

জন-স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আধুনিক পুঁজিবাদের সর্বাধুনিক ধ্বংসাত্মক অবদান হল 'এইডস' বা 'অ্যাকয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম' নামে অবিশ্বাস্য ধরনের ভয়াবহ রোগের প্রসার ঘটানো। মানব জাতির ইতিহাসে সম্পূর্ণ অজানিত এই রোগের আবির্ভাব ঘটেছে বিগত ৪০ বছরের মধ্যে। প্রচারিত আছে যে, জীবাণু-যুদ্ধের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে, এই রোগের জীবাণু সৃষ্টি বা আবিষ্কার করা হয়েছিল

আমেরিকার পরীক্ষাগারে। সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন, এটা ঘটনা যে, এই রোগ উন্নত ধনতন্ত্রী সমাজের জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ অবদান। অবাধ নারী-সংসর্গ, সমকামিতা, মাদকাসক্তি প্রভৃতি হলো এই রোগ প্রসারের মাধ্যম। পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়ায় এইচ. আই. ভি. বা 'হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস' সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা ১৯৯৩ সালে ছিল ১৫ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৫০ লক্ষ, যার মধ্যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষ হলো তৃতীয় দুনিয়াতে—উপ-সাহারীয় আফ্রিকাতে ৯০ লক্ষ, ১৫ লক্ষ লাতিন আমেরিকাতে এবং এশিয়াতে ২০ লক্ষ। অন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ঘাঁটিতে সৈন্যদের অবস্থান বা বিনোদন, তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে পশ্চিমী পর্যটকদের যাতায়াত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই রোগ প্রথমে অন্যত্র সংক্রমিত হয়েছিল। এইচ. আই. ভি. সংক্রমিত অধিকাংশ মানুষ বাস করেন নগর বা শহরে, তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ হলো উঠতি বয়সের মানুষ—বয়স যাদের ২৫-৪০ বছরের মধ্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৫-৪৪ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে মৃত্যুর প্রধান রোগ হলো এইডস এবং অনুরূপ বয়সের মধ্যে নারীদের মৃত্যুর কারণগুলির মধ্যে চতুর্থতে। ১৯৮০-এর দশকে এইচ. আই. ভি. ও এইডস-জনিত কারণে বিশ্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যয় সম্পর্কে সর্বন্যূন হিসাব ছিল ২৪০ বিলিয়ন ডলার। ভবিষ্যতে ব্যয় সম্পর্কে হিসাবও চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মতো। ২০০০ সালে এইচ. আই. ভি.-সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩০-৪০ মিলিয়ন বা ৩-৪ কোটি, তার মধ্যে নারীর সংখ্যা হবে ১-৩ কোটি। এইচ. আই. ভি থেকে এইডস-এ পরিণত রোগে আক্রান্ত নারীর সন্তান ঐ রোগসহ জন্মগ্রহণ করে। এইচ. আই. ভি. ও এইডস-এর প্রসারের ভৌগোলিক এলাকার ভরের পরিবর্তনও ঘটবে। মধ্য-আশির দশকে এটির ভর ছিল উত্তর আমেরিকা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি) ও আফ্রিকাতে, কিন্তু ২০০০ সালে নতুন সংক্রমণ অধিকাংশই ঘটবে এশিয়াতে। ১৯৯৩ সালে থাইল্যাণ্ডে এইচ. আই. ভি.-সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ, ভারতে ১০ লক্ষ। ২০০০ সালে এই রোগের জন্য পৃথিবীতে বছরে ব্যয়িত হবে ৫০০ বিলিয়ন ডলার, যা হবে বিশ্ব জি. ডি. পি.-র ২ শতাংশের সমান।

মানবিক সম্পদ ধ্বংসসাধনের স্বরূপকে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্র ও তথ্য দিয়ে আরও কিছুটা স্পষ্ট করা যায়। পৃথিবীতে ৮০ কোটি মানুষ এখনও দৈনন্দিন ন্যূনতম খাদ্যটুকুও পায় না। ১০০ কোটি মানুষ—প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ নিরক্ষর; প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে পড়াশোনা করতে করতে ৩০ শতাংশ শিশু ছাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। বিশ্ব-জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বা ১৩০ কোটি মানুষ (১৯৯২ সালের হিসাবে) নিদারুণ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। বিশ্বে প্রতিদিন ৩৪,০০০ হাজার শিশু ও তরুণ মৃত্যুমুখে পতিত হয় অপুষ্টি ও রোগে। বিশ্বের মোট নিরক্ষরের দুই-তৃতীয়াংশই নারী। ৮৫ কোটি মানুষ নিরুপায় হয়ে চরম অনুর্বর বা মরুভূমি এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয়। বিশ্বের প্রাপ্তবয়স্ক জন-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কোন ধরনের মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা নেই। প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় ১৫টি আত্মহত্যা ও ১০০টি ড্রাগ-দুষ্কৃতি ঘটে। বিশ্বে যত বিবাহ ঘটে তার এক-তৃতীয়াংশ বিবাহ-বিচ্ছেদে শেষ হয়। মোট পরিবারের সংখ্যার ৫ ভাগ হলো এক জন পিতা বা মাতার পরিবার।

শিশু-বিশ্বের চিত্র আরও ভয়ঙ্কর। তৃতীয় দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ শিশু হয় রাস্তায় অথবা বস্তিতে বাস করে। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য বৃদ্ধির আঘাতে এরা শহরমুখো হয় বাঁচার তাগিদে। ৩০ বছর আগে ব্রাজিলের শহরের জনসংখ্যা ছিল ৪৫ শতাংশ, এখন তা' বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ শতাংশ। ব্রাজিলের রাস্তায় বসবাসকারী শিশুদের তিন-চতুর্থাংশ গ্রাম থেকে আগত। শিশুদের অনেকেরই পিতামাতা থাকলেও তারা কদাচিৎ তাঁদের সাথে দেখা করতে পারে, কেননা বাঁচার জন্য শহরে তাঁদের সব সময়েই কাজের সন্ধানে অথবা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফিলিপাইনসের রাজধানী ম্যানিলাতে যে ৩০ লক্ষ মানুষ বস্তিতে বাস করে, তার অর্ধেক শিশু। সেখানে ৭৫ হাজার শিশু রাস্তায় বাস করে। আফ্রিকাতেও রাস্তায় বা ফুটপাতবাসী শিশু এক বড় সমস্যা। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে যে ২ লক্ষ মানুষ বস্তিতে বাস করে, তারও এক বড় অংশ শিশু। এখন এর সংখ্যা ২৫ হাজার।

নারী জীবনের পরিস্থিতিও চরম দুর্দশাপূর্ণ ও বেদনাময়। নারীরা বিশ্ব-জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নের সুযোগের অতি সামান্য ভাগ তারা পায়। প্রায়শই তাদের বাদ রাখা হয় শিক্ষার সুযোগ, চাকুরী, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যের সুযোগ দেওয়া থেকে। প্রায় সর্বত্রই পুরুষদের তুলনায় নারীরা কম সুযোগ পান শিক্ষার। দক্ষিণ এশিয়াতে নারী সাক্ষরতার হার পুরুষদের অর্ধেক। নেপালে পুরুষের তুলনায় ৩৫%, সুদানে ২৭%, আফগানিস্তানে ৩২%। বিশ্বে মোট নিরক্ষরের দুই-তৃতীয়াংশ হলো নারী। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি অনুরূপ, এমনকি উন্নত দেশগুলিতেও। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাতে পুরুষদের তুলনায় নারীদের অংশগ্রহণ আমেরিকাতে ২৮ শতাংশ, অস্ট্রিয়াতে ২৫ শতাংশ, কানাডাতে ২৯ শতাংশ মাত্র। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নারীদের বৃত্তির সুযোগ পুরুষদের তুলনায় গড়ে ৫০ শতাংশ (দক্ষিণ এশিয়ায় ২৯ ভাগ, আরব রাষ্ট্রগুলিতে ১৬ ভাগ)। যদি তাঁরা চাকুরী পানও, তথাপি প্রায় সর্বত্র নারীদের মজুরি পুরুষদের তুলনায় কম। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের পুরুষদের তুলনায় বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয়—বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে। স্বনিযুক্তির সুযোগও অধিকাংশ তৃতীয় দুনিয়ার দেশে পুরুষদের তুলনায় অনেক সীমিত; কেননা সম্পত্তিতে তাঁদের যেমন অধিকার নেই, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁদের ঋণ দেয় না। কিন্তু নারীদের বিষয়ে সব চাইতে বড় সমস্যা হলো অধিকাংশ তৃতীয় দুনিয়ার দেশে নারীদের বিষয়ে কোন পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় না। তার ফলে যেটুকু জানা যায় নারীদের সম্পর্কে তা' সমুদ্রে ভাসমান বরফ শিলার অগ্রভাগের মত যৎসামান্য; আসলে নারী দুর্দশার চিত্র আরও করুণ।

উন্নত দেশগুলিতেও নারীদের চিত্র অনেকটাই যন্ত্রণাময়, বৈষম্য ভোগের প্রতীক। পৃথিবীর তিন সর্বপ্রধান উন্নত দেশ—আমেরিকা, জার্মানি ও জাপানের মধ্যে শেষোক্ত দেশের উদাহরণ কিছুটা দেখা যাক। ১৯৯৩ সালের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স-এ জাপানের অবস্থান সর্বশীর্ষে। কিন্তু যখন পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে এইচ. ডি. আই.-এর পুনর্মূল্যায়ন করা হয়, তখন জাপানের স্থান গিয়ে দাঁড়ায় সপ্তদশ স্থানে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম-ভুক্তির ক্ষেত্রে জাপানের মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের দুই-তৃতীয়াংশ। চাকুরীতে মেয়েরা পুরুষদের ১০০ ভাগের তুলনায় মাত্র ৫১ ভাগের সুযোগ পান এবং সিদ্ধান্তগ্রহণকারী স্তরে নারীদের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে, মাত্র ৭ শতাংশ। রাজনৈতিক স্তরেও তাঁদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত; জাপানে নারীরা ভোটাধিকারী হয়েছেন মাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। উন্নত দেশগুলিতে পার্লামেন্টে নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার যেখানে গড়ে ৯ শতাংশ এবং উন্নতিশীল দেশগুলিতে ১৩ শতাংশ, সেখানে জাপানে মাত্র ২ শতাংশ। জাপানে পুরুষদের বিবাহের বয়স ১৮ বছর, নারীদের জন্য ১৬। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর পুরুষ ইচ্ছে করলে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু নারীদের ছ'মাস অপেক্ষা করতে হয়।

এবারে দৃষ্টি দেওয়া যাক আর একটি দিকে। যেসব দেশে একাধিক নৃতাত্ত্বিক জাতি রয়েছে, বিশেষত উন্নত পুঁজিবাদী দেশে, সেখানে মানবিক উন্নয়নের স্তর অনিবার্যভাবেই জাতীয় উন্নয়নের গড়-স্তর থেকে নিম্নে। আমরা এখানে দুইটি বিপরীত ঐতিহাসিক বাস্তবতাসম্পন্ন দেশের উদাহরণ উল্লেখ করবো—শ্বেতকায়দের কলোনী আমেরিকাতে অতীতে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ে আসা কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের অবস্থা এবং কৃষ্ণকায় আদিবাসী-অধ্যুষিত দক্ষিণ আফ্রিকাতে বহিরাগত শ্বেতকায়দের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে কৃষ্ণকায়দের অবস্থা।

আমেরিকাতে কৃষ্ণকায়দের প্রতি বৈষম্য ও উপেক্ষা শুরু হয় তাঁদের জন্ম-মুহূর্ত থেকে। শ্বেতকায়দের মধ্যে প্রতি ১,০০০টি শিশু-জন্মের মৃত্যুহার যেখানে ৮টি, কৃষ্ণকায়দের ক্ষেত্রে ১৯টি। অধিকাংশ কৃষ্ণ-শিশু বেড়ে ওঠে পিতা-মাতার যুগ্ম-অভিভাবকত্বে নয়, যে কোন একজনের। ১৯৯০ সালে শ্বেতকায়দের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ১৯ শতাংশ, কৃষ্ণকায়দের ক্ষেত্রে ৫৪ শতাংশ। ১৯৯০ সালে সেখানে মাথা পিছু প্রকৃত জি. ডি. পি. শ্বেতকায়দের জন্য ছিল ২২,০০০ ডলার, কৃষ্ণকায়দের জন্য ১৭,০০০ ডলার। স্বভাবতই অধিকাংশ কৃষ্ণকায় শিশু বেড়ে ওঠে দারিদ্র্যের মধ্যে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র্যের কারণে রুজির সন্ধানে প্রতিনিয়ত ছোটাছুটি করা প্রভৃতির ফলে কৃষ্ণকায় মোট জাতকের এক-তৃতীয়াংশ স্বামী-

স্ত্রীর বিবাহ-সম্মিলনের ফল নয়। অর্ধেকের বেশি কৃষ্ণকায় পরিবার নারী অভিভাবকত্বে পরিচালিত। অধিকাংশ কৃষ্ণ-কিশোররা মায়েদের সাথে থাকে এবং অর্ধেকের বেশি মাতারা জীবনে কখনো বিয়ে করেন না। হিসাবে দেখা যায় যে যাদের বয়স ৩০-৪০-এর মধ্যে, তেমন একাকিনী কৃষ্ণকায় নারীর অর্ধেকেরই সন্তান আছে এবং তাদের বিয়ে হয়নি। এই বাস্তবতা শ্বেতকায়দের থেকে প্রায় ৭ গুণ বেশি। এই হলো আমেরিকা; এক দেশ কিন্তু দুই নৃতাত্ত্বিক জাতির। লিবারাল ডেমোক্র্যাসির এই হলো বাস্তব রূপ।

দক্ষিণ আফ্রিকা আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ণ-বিদ্বেষকে বাতিল করে দিয়েছে ঠিক এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানে নেলসন ম্যাণ্ডেলার নেতৃত্বে কৃষ্ণকায়-সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কৃষ্ণকায়দের জগৎ আজও স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছে। দেশের সর্বাপেক্ষা ধনী ৫ শতাংশ মানুষ, যারা প্রায় সবাই শ্বেতকায়, তারা দেশের মোট ব্যক্তিগত সম্পত্তির ৮৮ শতাংশের মালিক। জনগণের অর্ধেক যাঁরা প্রায় সবাই কৃষ্ণকায়, তারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। শহরের কৃষ্ণ-শিশুর ১৫ শতাংশ ও গ্রামের ৪০ শতাংশ অপুষ্টিতে ভোগে। ১৫ বছরের উর্ধ্বে কৃষ্ণকায় জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ বা ৩০ লক্ষ মানুষ নিরক্ষর। শহর ও শিল্পাঞ্চলের বস্তিগুলি সাধারণভাবে কেবলমাত্র কৃষ্ণকায়দের জন্যই কার্যত সংরক্ষিত।

বাসস্থান হলো মানব-জীবনের সংরক্ষণ তথা বাঁচার জন্য ন্যূনতম চাহিদার অন্যতম। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাসস্থানহীনতার প্রক্রিয়া গঠনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিল্পায়ন ও নগরায়ণ এবং সেই কারণে মানুষের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও নিজ বাসস্থান ছেড়ে বৃত্তির সন্ধানে অন্যত্র গমনাগমন।

১৯৭৬ সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে 'দা সিটি সামিট' শিরোনামে বিশ্ব-বাসস্থান সমস্যা নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক অলোচনা ও নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও বিশ্ব-বাসস্থান পরিস্থিতির কোন উন্নতি তো হয়ইনি, বরং ক্রমশ বিপজ্জনক দিকে তা' চলেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, দাঙ্গা, উচ্ছেদ, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রসার, দারিদ্র্যের তীব্রতা বৃদ্ধি, ব্যাপকভাবে প্রথাগত শিল্পের লোপ ও কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, শহর অভিমুখে ও বিদেশে গমন বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে বাসস্থানহীনতার সমস্যা বর্তমান কালের অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ১৯৯৬ সালের প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, বিশ্বে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১০ লক্ষ মানুষ শহর অভিমুখে চলে যায় বৃত্তি ও অন্নের সংস্থানের জন্য। অন্যদিকে শহরগুলিতে দারিদ্র্যের হার ৬০ শতাংশের বেশি। অনুন্নত দেশগুলির ১৬০ কোটি মানুষ বাস করে শহরে এবং তার ৩০-৬০ ভাগ মানুষ ফুটপাথ, মুক্ত আকাশের নীচে, ঝুপড়ি বা বস্তিতে বাস করে। ২০০০ সালের মধ্যে জনসংখ্যার ৫০ ভাগ শহরে বসবাস করবে, অথচ শহরের প্রসার ও বাসস্থানের সংস্থান করার মত জায়গা বা আবাস নির্মাণ করার মত পুঁজির যোগানের ব্যবস্থা নেই। ২০২০ সালের মধ্যে সারা দুনিয়ার ৫০ শতাংশ মানুষ পূর্বোক্ত অনিশ্চয় অবস্থায় বাস করতে বাধ্য হবে অর্থাৎ শহরে আবাসহীন মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২০০ কোটিতে। ২০২৫ সালে শহরে বাসকারী জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৫০০ কোটি। অর্থাৎ যত বেশি নগরায়ণ ঘটবে, ততো বাড়বে বাসস্থান-সংকট এবং ২০২৫ সালে শহরের জনসংখ্যা গ্রামে বাসকারীদের চেয়ে দ্বিগুণ হবে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশই হবে অনুন্নত দেশগুলিতে। উন্নত দেশগুলির তুলনায় দারিদ্র্যের জন্য বৃত্তির সন্ধানে শহরে গমন যেহেতু তৃতীয় দুনিয়ায় বহু গুণ বেশি, স্বভাবতই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাসস্থানের সংকট বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়বে ভবিষ্যতে। জুন ১৯৯৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে 'হ্যাবিটাট্-২' শিরোনামে এ' বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে বাসস্থান-হীনতার করুণ রূপ বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। নতুন উপাদান হিসাবে এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে যেসব দেশে যত বেশি বিশ্বায়নের উদ্যোগ শুরু হয়েছে, সেইসব দেশে সমান্তরালে দ্রুত বাসস্থানের সমস্যা বাড়ছে। পুঁজিবাদী সমাজে পরিবারের ভাঙ্গন এবং মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতার তীব্রতা বৃদ্ধি এই সমস্যায় বাড়তি ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে।

(খ) মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া

বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বাধুনিক রূপ হিসাবে কেবল নয়, ব্যবস্থাটিকে

যোগান ও চাহিদা, বিক্রেতা ও ক্রেতা এবং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দাবী করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে স্বাধীন ব্যবসা ও বাণিজ্যের ব্যবস্থায় মানুষের সৃজনশীলতা ও উদ্যোগ উন্নত রূপ পায়। যদিও অভিজ্ঞতা থেকে বুর্জোয়া-অর্থনীতিবিদরা নিজেরাই নিজেদের প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, মুক্ত বাজার সত্যিই কতটা মুক্ত? জনগণের সমস্ত অংশের পক্ষে বাজারে প্রবেশের অধিকার আছে কি? আয়ের বন্টন এবং অন্যান্য উন্নয়নের সুযোগের উপর মুক্ত বাজারের প্রভাবই বা কতটুকু? বলাই বাহুল্য যে এগুলির উপর নেতিবাচক প্রভাব কেবল নয়, বরং পুঁজিবাদের পূর্বতন ব্যবস্থাগুলির তুলনায় বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতি অধিকতর ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠছে চাহিদা, ক্রেতা ও শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে তথাকথিত 'পিপলস্-ফ্রেণ্ডলি' বা জন-বন্ধুত্বমূলক করার জন্য নতুন নতুন শ্লোগান বা কর্মসূচী যা ঘোষণা করা হচ্ছে, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সেগুলি কোথাও কার্যকরী হয়নি। হয়নি এই কারণেই যে মুক্ত বাজারের নামে প্রথমে যে উদ্দেশ্য হাসিল করা হচ্ছে তা' হলো বাজারকে রাষ্ট্রীয় বাধা-বন্ধনহীন করে কার্যকালে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, বহুজাতিক সংস্থা এবং দেশগুলির অভ্যন্তরের একচেটিয়া পুঁজির পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন করার ব্যবস্থা। সেই অর্থে অতীতে সাধারণ মানুষের বাজারে প্রবেশ ও ভূমিকার বন্ধনকে নতুন মুক্ত বাজার অর্থনীতির বৃহত্তর বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত করে বৃহত্তর মুক্ত শোষণের দ্বারকে উন্মুক্ত করা শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যের জন্য জনগণের চাহিদাকে একদিকে নিয়ন্ত্রণ ও অন্যদিকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের পরিবর্তে অনেকটাই বিলাসী ভোগ্যপণ্যের চাহিদাকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই ধরনের ভোগ্যপণ্যের বাজারে সাধারণ মানুষের প্রবেশকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা হচ্ছে। তার ফলে, সম্পন্ন ক্রেতা ছাড়া আর্থিক দিক থেকে দুর্বল অংশ ক্রমবর্ধমান হারে প্রথাগত বাজার থেকে হটে যেতে বাধ্য হচ্ছে। নতুন ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পণ্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে ও তারা বেকার হয়ে বাজারে প্রবেশের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। নতুন পদ্ধতিতে ও নতুন চরিত্রের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মালিকশ্রেণীর মুনাফা অতিকায় হচ্ছে। এই নতুন প্রণালীতে অভ্যন্তরীণ বাজারে যেমন দুর্বল অংশের জনগণ, আন্তর্জাতিক বাজারের ক্ষেত্রে দুর্বল দেশগুলিও হটে যাচ্ছে। ফলে দুর্দশা আরও বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে একদিকে, অন্যদিকে দেশসমূহের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা স্বরূপ আরও নগ্ন চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার চাপে রাষ্ট্র যেহেতু অর্থনীতি থেকে ক্রমশ হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, তার প্রভাব প্রথমেই পড়ছে সমাজের ওপর। রাষ্ট্রের সীমিত সমাজ-কল্যাণমূলক তৎপরতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। পরিণামে আরও বিপর্যয় নেমে আসছে সাধারণ মানুষের জীবনে।

প্রসঙ্গত, মুক্ত বাজার অর্থনীতির দু'একটি প্রত্যক্ষ উপাদানকে এখানে উত্থাপন করা যেতে পারে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এক নূতন প্রক্রিয়া এখন লক্ষণীয়, যাকে বলা হচ্ছে 'জবলেস গ্রোথ' বা কর্মসংকোচন ঘটিয়ে বিকাশ। সাধারণভাবে বলতে গেলে এর অর্থ হলো অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থার ও প্রক্রিয়ার সাথে তুলনায়, বর্তমানে যে পরিমাণ পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, তাতে যে পরিমাণ উৎপাদনের উপকরণ প্রযুক্ত হচ্ছে, এমনকি যে পরিমাণ উৎপন্নও হচ্ছে, তাতে প্রয়োজন হচ্ছে কম সংখ্যক শ্রমজীবীর। যান্ত্রিক ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গি তথা উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার জন্যই প্রধানত কম শ্রমিকের প্রয়োজন হচ্ছে, কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরাও এই জাতীয় ব্যবস্থার জন্য অপসারিত হচ্ছে। উৎপাদনের তুলনামূলক বিকাশ বাহ্যত যেমন একদিকে ঘটছে এই নতুন লক্ষ্য ও প্রণালীর ফলে, অন্যদিকে তদনুপাতে শ্রমিক সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। ফলে উৎপাদন বিকাশের হার, সেটির পরিমাণ, মুনাফা, অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন প্রভৃতি মাপকাঠিতে এখন আর শ্রমজীবীদের অবস্থান সম্ভব হচ্ছে না। শ্রমিক ছাঁটাই-এর এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে 'স্ট্রাকচারাল আন-এমপ্লয়মেন্ট'।

'জবলেস গ্রোথ' তথা 'স্ট্রাকচারাল আন-এমপ্লয়মেন্ট'—প্রক্রিয়ার চারটি প্রধান কারণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব এমন ধরনের উৎপাদন যন্ত্র ও প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছে,

তার ফলে, স্বাভাবিকভাবে শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীগুলিকে এখন, অতীতের তুলনায়, অধিকতর দ্রুততার সাথে উৎপাদনের প্রয়োগে লাগানো হচ্ছে; তার ফলে, শ্রমিকসংখ্যা হ্রাসের প্রক্রিয়াও দ্রুততর হচ্ছে। '৬০-দশকে উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিশ্চল হয়ে পড়াতে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক দেশের অভ্যন্তর থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার ফলে, উন্নত দেশগুলি মরিয়া হয়ে শ্রম-সংকোচনকারী উৎপাদন-প্রণালীর দিকে ঝুঁকেছিল যার রেশ যুক্ত হয়েছে বর্তমান 'জবলেস গ্রোথ'-এর সাথে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক-আন্দোলনের প্রসার ও তীব্রতা বৃদ্ধি এবং তার ফলে মজুরি বৃদ্ধিতে বাধ্য হওয়ায়, শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়েছিল মালিকরা। তাছাড়া, উৎপাদনের খরচ কমিয়ে বাড়তি লাভের প্রয়োজনেও শ্রমিকসংখ্যা কমানোকে তারা কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাকে ক্রমাগত কমিয়ে তাদের আন্দোলনের শক্তিকে ক্রমাগত নিম্নগামী করা ছিল তাদের অন্যতম পরিকল্পনা। তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী আবিষ্কারগুলিকে সামরিক ও সমর-সামগ্রী উৎপাদনের স্তরে আরও বেশি কার্যকরীভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছিল। শেষোক্ত উদ্যোগে পুঁজির নিবিড়তা অনেক বেশি হলেও কিন্তু শ্রমশক্তির ব্যবহার কমতে থাকে দ্রুত। পুঁজি বিনিয়োগ ও উৎপাদন সত্ত্বেও সামরিক স্তরে এই জাতীয় উৎপাদনে নতুন কোন শ্রমশক্তির দরকার হচ্ছিল না। উন্নত দেশগুলিতে শিল্প-অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও পরিমাণগত দিক থেকে বিরাট অংশ হয়ে উঠেছে সমর-সম্ভার উৎপাদন। সেই কারণেও উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় 'জবলেস গ্রোথ' অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছে। চতুর্থত, নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের কর্তৃত্বের অবস্থার চিত্রটির মধ্যে পৃথিবীতে আয়ের বন্টনের চরিত্রটি ধরা পড়ে। উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা বিশ্ব-জনসংখ্যার ২০ ভাগ হওয়ায় তারা বাকি অনুন্নত দেশগুলির ৮০ ভাগ জনগণের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি ক্রয়-ক্ষমতার অধিকারী। স্বভাবতই বৃহত্তম জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলিতে নিযুক্তির সুযোগ বহু গুণ কম রয়েছে। উন্নত দেশগুলির সাথে কারিগরী ও আর্থিক ক্ষমতার এই পার্থক্য সত্ত্বেও তৃতীয় দুনিয়াতে অতীতের তুলনায় বেশি পুঁজি বিনিয়োগ ও উৎপাদনে অগ্রগতি ঘটছে ঠিকই, কিন্তু বাজারে ক্রয়-ক্ষমতার প্রসার ঘটছে না। সেই কারণে, বিশাল শ্রমশক্তি থাকা সত্ত্বেও, তৃতীয় দুনিয়াতে জবলেস গ্রোথ প্রক্রিয়া গড়ে উঠছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির জি. ডি. পি. (১৯৬০-৭৩) বৃদ্ধির হার ৪-৫ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও, কর্ম-নিয়োগের হার ছিল মাত্র অর্ধেক। ১৯৭৩-৮৪ সালে শিল্পোন্নত দেশগুলির উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটলেও ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনের নিয়োগের হার পড়ে যায়। বর্তমান সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা থেকে বেরিয়ে আসা বা 'রিকভারি'কে বলা হচ্ছে 'জবলেস রিকভারি'।

বেসরকারীকরণের ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া

সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন অর্থনীতির অন্যতম উপাদান হিসাবে বেসরকারীকরণের জন্য বিভিন্ন দেশে চাপ সৃষ্টির কাজটি ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে প্রধানত চালানো হয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও আই. এম. এফ.-এর মাধ্যমে। এই সময়ে সারা বিশ্বে মোট প্রায় ৭,০০০ হাজার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ ঘটেছে; তার মধ্যে প্রাক্তন পূর্ব জার্মানি ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ৫৩০৫টির মতো; ১৪০০টির মতো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে—যার মধ্যে ৫৯ শতাংশ হলো লাতিন আমেরিকা, ২৭ শতাংশ আফ্রিকা, ৯ শতাংশ এশিয়া ও ৪ শতাংশ আরব দেশগুলিতে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থার মোট সংখ্যার অনুপাতে এই বেসরকারীকরণের হার হলো : পূর্ব ইউরোপে ৭৮%, ও. ই. সি. ডি. দেশগুলিতে ২%, লাতিন আমেরিকাতে ১২%, সাব-সাহারীয় আফ্রিকায় ৫%, এশিয়াতে ২%, আরব দেশগুলিতে ১%। সর্বাধুনিক সুনির্দিষ্ট তথ্য না দেওয়া গেলেও, প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় যে লাতিন আমেরিকা ও এশিয়াতে ১৯৯১ সালের পর বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া দ্রুততা ও ব্যাপকতা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও কিছুটা আধুনিক তথ্যের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রে। ক্ষেত্রভিত্তিক এবং বছরভিত্তিক এর অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাক :

১৯৮৮-৯২ সালের মধ্যে অনুন্নত দেশগুলিতে পরিকাঠামো বেসরকারীকরণের চিত্র
(মিলিয়ন ডলারে)

ক্ষেত্র	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৮৮-৯২	মোট দেশের সংখ্যা
টেলিকমিউনিকেশন	৪,০৩৬	৫,৭৪৩	১,৫০৪	১১,৮২১	১৪
পাওয়ার জেনারেশন	২০	২৪৮	১,৬৮৯	৪,১৬৪	৯
পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন	০	৯৮	১,০৩৭	১,১৩৫	২
গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন	০	০	১,৯০৬	১,৯০৬	২
রেল রোড	০	১১০	২১৭	৩২৭	১
রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার	২৫০	০	০	২৫০	১
পোর্ট	০	০	৭	৭	২
ওয়াটার	০	০	১৭৫	১৭৫	২
মোট	৪,৩০৭	৬,২০০	৬,৫৩৫	১৯,৭৮৫	১৫
প্রায় বেসরকারীকরণের পর্যায়ে					
এয়ারলাইনস	৭৭৫	১৬৮	১,৪৬১	২,৮১৩	১৪
শিপিং	০	১৩৫	১	১৩৬	২
রোড ট্রান্সপোর্ট	০	১	১২	১৩	৩
অনুন্নত দেশগুলিতে মোট বেসরকারীকরণ	৮,৬১৮	২২,০৪৯	২৩,১৮৭	৬১,৬২৯	২৫

শিল্পক্ষেত্রে মৌলিক ও ভারী উৎপাদন থেকে শুরু করে মাঝারি ও হাল্কা পণ্য উৎপাদন, পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন সরকারী ও আধা-সরকারী পরিষেবা, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি এবং কৃষি ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের প্রবণতা ও বাস্তবতা পূর্ব-তথ্যের চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। এইসব বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে দেশী ও বিদেশী পুঁজির কাছে। প্রথমদিকে বিদেশীদের কাছে বেসরকারীকরণের হার ছিল অতি শ্লথ। ১৯৯২ সালের পর থেকে তা' ভয়ঙ্কর দ্রুততার সাথে বাড়ছে।

বেসরকারীকরণের জন্য তিনটি 'মিথ্' বা কল্প-কথন চালু করা হয়েছে। প্রথমত, অনুন্নত দেশগুলিতে ক্ষমতার অনুপাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংখ্যা অনেক বেশি। অথচ এগুলির জন্য সরকারকে ব্যাপক পুঁজি নিয়োগ করতে হয়, যা তাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত। দ্বিতীয়ত, বেসরকারীকরণ করা হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী মালিকানার করা হলে উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসবে। উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয় অংশই লাভবান হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার লোকসান এবং সেজন্য ভর্তুকি দেবার চাপ কমে গিয়ে সরকার লাভবান হবে। অন্যদিকে বেসরকারী পুঁজি ব্যাপকভাবে নিয়োজিত হবার ফলে পুঁজির সঙ্গত ব্যবহার যেমন বাড়বে, সরকারকেও বাড়তি পুঁজি জোগাড় করার জন্য সব সময় বিব্রত থাকতে হবে না। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের ভূমিকা কমে আসবে। অর্থনৈতিক পরিসরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কমার ফলে অর্থনীতিতে মুক্ত বাজার সৃষ্টি হবে। 'মার্কেট ফোর্সেস' বা বাজারী শক্তিগুলির স্বাধীন সঞ্চালনের জন্য বিরাষ্ট্রীকরণ ও বেসরকারীকরণ একান্ত জরুরি।

কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করেন যে বেসরকারীকরণের ব্যবস্থাকে অর্থনীতির বিশ্বায়নের এক 'প্যাকেজ' বা বহুদিক-সমন্বিত ব্যবস্থার এক অবিভাজ্য অংশ বলে দাবী করা হলেও, তৃতীয় দুনিয়ার কোন কোন দেশের সরকার কিছু শিল্পপতি অথবা বিদেশী পুঁজিকে তুষ্ট করার বিনিময়ে সামান্য সুযোগ পাওয়ার হাতিয়ার হিসাবে এটিকে ব্যবহার করছে। এই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা

বেসরকারীকরণের 'সেভেন সিনস' বা সপ্ত-পাপ লক্ষ্য করেছেন।

প্রথমত, ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে বেসরকারীকরণ ঃ অধিকাংশ তৃতীয় দুনিয়ার সরকার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজার রচনার কথা মুখে বললেও কার্যকালে স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় 'রেভিনিউ' বা আয় বৃদ্ধির পথ নিয়েছে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দিলে চটপট হাতে অনেক টাকা পাওয়া যায়, এই সাময়িক লাভে ব্যস্ত ও খুশি তারা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে 'টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস' বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে সাময়িক সর্বাধিক লাভের লক্ষ্যে, অথচ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে যে এতে ভোক্তাদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হবে এবং অর্থনীতির দক্ষতা বিনষ্ট হবে।

দ্বিতীয়ত, ভ্রান্ত পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বেসরকারীকরণ ঃ তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে বাজার ও বাজারী শক্তি নিতান্তই দুর্বল এবং তাদের পক্ষে বড় রকমের ভার বহন করার ক্ষমতা এখনো গড়ে ওঠেনি। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণ কার্যকালে বাজার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তিকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে নিছক মালিকানার পরিবর্তন ঘটছে। এর দ্বারা পুঁজিবাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণ তো হচ্ছেই না, বরং অর্থনীতির ক্ষতি ও জনগণের দুর্ভোগ বাড়ছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বর্তমান অবস্থা।

তৃতীয়ত, বেসরকারীকরণ ঘটছে দুর্নীতিমূলকভাবে ঃ এটাও বর্তমানে এক অতি স্বাভাবিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সরকারের অধিকাংশই যথেষ্ট স্থায়িত্বসম্পন্ন নয়। জাতীয় পুঁজিবাদ বিকাশের প্রসঙ্গও তাদের কাছে কোন আন্তরিক আদর্শ নয়। নিজেদের যে কোন প্রকারে সরকারে টিকে থাকা এবং তাতে ব্যর্থ হলে স্বল্পকালীন সরকারের অবস্থানের সুযোগে যত বেশি গুছিয়ে নেওয়া যায় তার জন্য এরা মরিয়া চেষ্টা করে থাকে। স্বভাবতই অধিকাংশ দেশের সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বস্তরে রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি। এই দুর্নীতিমূলক পরিবেশের মধ্যে আরও নতুন ও বৃহত্তর দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করেছে বেসরকারীকরণ; কার্যকালে সেই সুযোগ ব্যবহৃত হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সম্পদের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঘোষণা ও প্রচার করে টেণ্ডার বা 'বিড' করা ছাড়াই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এগুলি বিক্রি করে দেওয়া, এইসব বিক্রয়ের জন্য মোটা অঙ্কের ঘুষ বা সুযোগ গ্রহণ প্রভৃতি এখন ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। ফলে, যথার্থভাবে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কোষাগারে যে অর্থ সংগৃহীত হতে পারতো ও সেই অর্থ বিনিয়োগ করে জনগণের জন্য যে ধরনের কাজ করা সম্ভব হতো, তাও ব্যাহত হচ্ছে। আসলে বৃহত্তর লোকসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ হচ্ছে।

চতুর্থত, বাজেট-ঘাটতি পূরণের জন্য বেসরকারীকরণ ঃ তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি এখন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণে কার্যত আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অন্যদিকে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান বা দেশগুলি এখন ঋণদানের অন্যতম শর্ত হিসাবে সরকারি বাজেট ঘাটতিকে জি. ডি. পি-র এক নির্দিষ্ট হারের মধ্যে বেঁধে রাখার জন্য চাপ দিচ্ছে। জনহিতকর কার্যাবলী ও সামাজিক বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি কমানো প্রভৃতি ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও বাজেট-ঘাটতি নির্দিষ্ট স্তরে কমানোর ধারে-কাছেও দেশগুলি পৌঁছতে পারছে না। তদুপরি দেশে মন্দা ও অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি এবং সময়ে সময়ে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির চাপের ফলে মুদ্রার বিনিময় মূল্যহ্রাসের জন্য তাদের পরিস্থিতি হয়ে পড়ছে অত্যন্ত শোচনীয়। সুতরাং বাজেট-ঘাটতি কমানোর জন্য অন্যতম সহজ পন্থা হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সরাসরি বিক্রি বা সেগুলির শেয়ার বিক্রি করার পথ নেওয়া হচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাজেট-ঘাটতি যত বাড়ছে, বেসরকারীকরণের গতিও ততো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পঞ্চমত, দুর্বল আর্থিক রণনীতি নিয়ে বেসরকারীকরণ ঃ তৃতীয় দুনিয়ার বেসরকারীকরণের পদ্ধতিগুলি উন্নত পুঁজিবাদকে তেমন সন্তুষ্ট করতে পারছে না। তারা চায় যে ক্যাপিটাল মার্কেটে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারীকরণের কাজ সাধিত হোক; এর দ্বারা আন্তর্জাতিক পুঁজি সেই শেয়ার সংগ্রহ করে অতি দ্রুত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কর্তৃত্ব হাতে নেবে। সরাসরি ক্রয় করলে জাতীয়তার স্পর্শকারতা তথা জনরোষের সম্মুখীন হবার যে আশঙ্কা থাকে বা দেশী পুঁজিপতিদের সাথে বিরোধ-সংঘর্ষের আশঙ্কা

দেখা দিতে পারে, শেয়ার ক্রয়ের পরোক্ষ পদ্ধতিতে তা' এড়ানো অনেকটা সম্ভব। কেননা, এই পরোক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে শিল্পের কর্তৃত্বের স্বরূপকে অনেকটা গোপন রাখা যায় প্রথম পর্যায়ে। অথচ অধিকাংশ অনুন্নত তৃতীয় দুনিয়ার দেশে ক্যাপিটাল মার্কেট হয় কার্যত নেই অথবা খুবই অনুন্নত ও দুর্বল। অনুরূপ কোন কোন দেশের সীমিত ক্যাপিটাল মার্কেটের ওপর কর্তৃত্ব রয়েছে সামান্য কিছু গোষ্ঠীর। সর্বোপরি, এইসব দেশে যেহেতু দুর্নীতির ব্যাপকতা রয়েছে, ক্যাপিটাল মার্কেটও তার দ্বারা আক্রান্ত। স্বভাবতই, তৃতীয় দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে বেসরকারীকরণ ঘটলেও, আন্তর্জাতিক পুঁজি যেহেতু এই পরিস্থিতিতে আস্থা রাখতে পারছে না, তাই বেসরকারীকৃত শিল্পসংস্থা ক্রয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশ নিচ্ছে না। তার ফলে, বিদেশী পুঁজির প্রত্যাশিত আগমন এর মাধ্যমে এখনও তেমন ঘটছে না। বেসরকারীকরণের পরিস্থিতিতে উৎসাহিত না হওয়ায় কৃষি, শিল্প বা পরিষেবার ক্ষেত্রেও সরাসরি বিনিয়োগে উৎসাহী হচ্ছে না বিদেশী পুঁজি। ফলে, তৃতীয় দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশে বেসরকারীকরণের সুযোগ নিচ্ছে দেশী পুঁজিপতিরা যাদের ক্ষমতা নেই মালিকানাপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিকে আরও সাফল্যজনক করে তোলার। এই কারণে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত পুঁজিবাদী অর্থসঞ্চালন ও উৎপাদনে উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যায়নি।

ষষ্ঠত, বেসরকারীকরণ ঘটছে শ্রমিকদের ধ্বংসসাধন করেঃ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণের আগেই অথবা ক্রয় করার অন্যতম শর্ত হিসাবে উৎপাদনের খরচ কমানো বা ভবিষ্যতে আধুনিকীকরণের কথা তুলে বেসরকারী মালিকরা দাবী করছে শ্রমিকদের ছাঁটাই-এর। শ্রমিকদের সরাসরি ছাঁটাই করা, বেসরকারীকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রি করা, গোল্ডেন হ্যাণ্ডশেকের নামে কিছু থোক টাকা হাতে দিয়ে অবসর গ্রহণ করানো প্রভৃতি পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। ১৯৯১ সালের পর একমাত্র বেসরকারীকরণ ব্যবস্থার জন্য বিশ্বে বছরে গড়ে ৯ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হচ্ছে। কর্মচ্যুতির জন্য সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা ও সংকট ছাড়াও বিশাল অংশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হানির জন্য বাজারে চাহিদা কমছে, তথা বাজার সংকুচিত হচ্ছে, শিল্প-উৎপাদন বাড়ার পরিবর্তে কমার আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে। মুনাফা বাড়লেও অর্থনীতির বিকাশ বেসরকারীকরণে ঘটছে না।

সপ্তমত, বেসরকারীকরণ সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে ঃ বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়ায় আরও অনেকগুলি উপাদান সক্রিয়। তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনীতি ও আর্থনীতিক কাঠামোতে এই ব্যবস্থা (বেসরকারীকরণ) এক নতুন উপাদান হিসাবে যুক্ত হচ্ছে। অনুন্নত দেশগুলির অধিকাংশই একদা পরাধীন থাকায়, দেশগুলির নিজস্ব পুঁজিবাদী বিকাশ যথার্থভাবে ঘটেনি। শক্তিশালী জাতীয় পুঁজিপতিদের অভাবে, দেশীয় সরকারগুলি অধিকাংশ নিজেরা পুঁজির যোগান ঘটিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পত্তন করেছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থার মাধ্যমেই তা' প্রধানত গঠিত হচ্ছিল। এজন্য রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক যে কাঠামো ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া এখন শুরু হয়েছে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে। কেবল তাই নয়, উন্নত অর্থনীতিতে বেসরকারী মালিকানার যে ভূমিকা, তার ধারে-কাছে না পৌঁছেও উন্নত ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুন্নত দেশে উপর থেকে চাপানো হচ্ছে—যার কোন ধরনের পরিকাঠামো ও সামাজিক বাস্তবতা এখনও সৃষ্টি হয়নি অনুন্নত দেশগুলিতে। সুতরাং এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিচ্ছে সামাজিক দ্বন্দ্বের এক বিশাল ক্ষেত্র। এই বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া প্রথমেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মানসিক বিরোধ ও তা' থেকে প্রতিরোধের ক্ষেত্র রচনা করেছে। জবরদস্তি করে বেসরকারীকরণ করা হলেও, কোনভাবেই শ্রমিকের কাছে তা' গ্রহণীয় হচ্ছে না। এতে শ্রম-বিচ্ছিন্নতা আরও তীব্র হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধিতা, আন্দোলন ও শ্রম-বিচ্ছিন্নতা সমবেতভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। তাছাড়া শাসক রাজনৈতিক দলের সাথে অন্য দলগুলি, বিশেষত গণতান্ত্রিক ও বামপন্থীদের, মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেয়ে সৃষ্টি করে চলেছে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংঘর্ষের আবর্ত। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন সমাজ-জীবনের মূল প্রয়োজনীয়তাগুলির অধিকাংশ উৎপাদন করতো অন্যদিকে উৎপাদিত সামগ্রী না-লাভ, না-লোকসান অথবা সামান্য মুনাফা রেখে সমাজ-স্বার্থে বাজারে বিক্রি করতো সরকার। বেসরকারীকরণের ফলে এই সুযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হচ্ছে।

ফলে ক্রীত সামগ্রীর দাম বেশী পড়ছে অতীতের তুলনায়; মানুষ আর্থিকভাবে প্রবল চাপের মধ্যে পড়ছে। পরিণামে সামাজিক বিক্ষোভ অনিবার্য হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে আধুনিক পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব

এটা প্রমাণিত যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যত উন্নততর হচ্ছে, সেটির শোষণও ততই হচ্ছে তীব্র। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কায়িক শ্রম কমে আসা, শ্রম সময় কমে যাওয়া, উন্নত দুনিয়ার কোথাও কোথাও ও কোন কোন শিল্পে ৪ দিনের সপ্তাহ চালু হওয়া, মজুরির পরিমাণগত বৃদ্ধি, শ্রম পরিবেশে বাহ্যিক উন্নতি প্রভৃতি ঘটনাবলী দিয়ে শোষণ কমে যাচ্ছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু সত্য হলো—বেড়ে চলেছে পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবন। পুঁজি অতীতের তুলনায় বিপুল আকারে ও নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। অতীতের তুলনায় ব্যাপক ও নিবিড় হচ্ছে পুঁজির বিশ্বায়ন। পুঁজি বিনিয়োগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুঁজির উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির গতি বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ। এই দিকগুলি নির্ধারকভাবে প্রমাণ করে যে পুঁজির শোষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ এবং তা' বলবৎ হচ্ছে সম-দ্রুততার সাথে। মূলধনের এই শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমজীবীদের আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাসের উপাদানটিও প্রমাণ দেয় শ্রমিকদের শোষণের তীব্রতার। অর্থনীতি ও উৎপাদনে রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে, যাকে 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট' বা 'ডাউনসাইজিং অব গভর্নমেন্ট' বলা হচ্ছে। সরকারের ভূমিকা ও অবস্থানের পরিবর্তন প্রতিফলিত হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণ ও তার ফলাফলে, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি ক্রমশ প্রত্যাহারে, স্থায়ী কর্মের পরিবর্তে শ্রমিকদের 'পীস রেট' বা দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণভিত্তিক মজুরি প্রদান প্রভৃতিতে। অতীতে একটি ধরন অথবা চরিত্র বা অংশের কাজ পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োজিত শ্রমিককে দিয়ে করানো হতো; এখন সেই কাজের সময় অর্ধেক কমিয়ে অর্থাৎ স্বাভাবিক কাজের সময়কে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ধরনের নতুন শিফ্‌ট প্রথা চালু করা হচ্ছে। একে বলা হচ্ছে 'জব-শেয়ারিং'। এক কাজের জন্য দু'জন শ্রমিককে নিয়োগ করে, শ্রমিকের মজুরি কমিয়ে দেওয়া কেবল নয়, তাদের স্থায়ী ও সর্বক্ষণের কর্মী থেকে অস্থায়ী কর্মীতে পরিণত করা হচ্ছে। এইভাবে মালিক প্রত্যাহার করে নিচ্ছে শ্রমিকের অবসর, ছুটি, পদোন্নতি, ইনক্রিমেন্ট, সামাজিক নিরাপত্তার সব দায়। এই জাতীয় নতুন নতুন পদ্ধতি-প্রকরণগুলি স্বয়ং দেখিয়ে দেয় শোষণের বৃহত্তর রূপকে। তবে এইসব তথাকথিত আধুনিক প্রণালীর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে শ্রমের ব্যবস্থায় আদিম চরিত্রের অনুসৃত পদ্ধতিগুলি ও শোষণগুলি পৃথিবী থেকে অপসৃত হয়েছে। উৎপাদনে তথাকথিত আধুনিকতার পাশাপাশি চরম পশ্চাৎপদতা এখনও অব্যাহত। প্রসঙ্গত নতুন ও পুরাতনের আঙ্গিকের সমন্বয়ে শ্রম-ব্যবস্থার কিছু দিক লক্ষ্য করা যেতে পারে।

'ফোর্সড লেবার' বা বলপ্রয়োগে নিযুক্ত শ্রমিক : মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় হিসাবে দাস-শ্রমের সংবাদ মানুষের কাছে পরিচিত। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের অধ্যায়ে তো বটেই এমনকি ধনতন্ত্র স্বয়ং পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের স্তর বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ, এমনকি শিল্প-পুঁজিবাদের প্রথম অধ্যায়েও ব্যাপকভাবে দাস-শ্রম ব্যবহার করেছে। আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ থেকে বলপ্রয়োগে ব্যাপক মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কলোনিগুলির বাগিচা, উৎপাদন ও গৃহস্থালিকর্মে ব্যবহারের নির্মম ইতিহাস সবারই জানা। ফলে, চরম অমানবিক ও নৃশংস এই ধরনের দাস ব্যবস্থা রহিত করার উদ্যোগ দীর্ঘকাল থেকে চলেছিল আন্তর্জাতিক স্তরে। আধুনিক ইতিহাসে এ বিষয়ে সর্বপ্রাচীন আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৮১৫ সালের কংগ্রেস অব ভিয়েনাতে। ১৯২৬ সালে লীগ অব নেশনস গ্রহণ করে 'শ্লেভারি কনভেনশন'। 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন'-এর (আই. এল. ও.) 'ফোর্সড লেবার কনভেনশন' গৃহীত হয় ১৯৩০ সালে (নং ২৯) ও ১৯৫৭ সালে (নং ১০৫)। তাছাড়াও আই. এল. ও. আদিবাসী ও গিরিজনদের জন্য 'ফোর্সড লেবার কনভেনশন' গ্রহণ করে ১৯৫৭ (নং ১০৭) ও ১৯৮৯ (নং ১৬৯) সালে। কিন্তু এই জাতীয় শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা বিশ্বের সর্বত্র, এখনও পুরোপুরি বাতিল হয়নি। দাস বা সমচরিত্রের শ্রম-ব্যবস্থা এখনও বহাল আছে। এগুলিকে সংশ্লিষ্ট দেশের

সরকারগুলি 'স্বতঃপ্রণোদিত' বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে অথবা নানা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অন্তরালে গোপন করে চালু রেখেছে।

'ট্রাডিশনাল ফর্মস অব শ্লেভারি' বা প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত দাস-শ্রম এখনও দেখা যায় ট্রাইবাল বা গিরিজন গোষ্ঠী অধ্যুষিত অধিকাংশ দেশে। শক্তিশালী ট্রাইবাল গোষ্ঠীগুলি দুর্বল ও দরিদ্র ট্রাইবাল গোষ্ঠীগুলির পুরুষ, নারী ও শিশুদের আক্রমণ করে বন্দী করে নিয়ে এসে নিজেদের সমাজে ও উৎপাদনে বিনা পারিশ্রমিকে আজীবন নিয়োজিত রাখতে বাধ্য করে। ১৯৬১ সালে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ· থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পরও মরিটানিয়াতে এখনও পর্যন্ত এই ধরনের হাজার হাজার দাস রয়েছে। স্বাধীন সরকার দাস-প্রথার অবসান ও ১৯৮০ সালে পুনরায় ঐ নীতি ঘোষণা করার পরও এর অবসান হয়নি। আই. এল. ও. ১৯৯০, ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে এ'বিষয়ে নানা তথ্যসহ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলেও, তেমন পরিবর্তন ঘটেনি পরিস্থিতির। সুদানেও এই ব্যবস্থা অব্যাহত। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন শ্লেভারি কর্তৃক সুদানে দাস ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে পেশ করার পর ১৯৮৯ সালে আই. এল. ও. তে আলোচনাকালে জানা যায় যে সুদান সরকার স্বয়ং বেসরকারী বাহিনী তৈরি করে তাদের মাধ্যমে ট্রাইবদের মধ্য থেকে দাস সংগ্রহ করে থাকে। ৩০ থেকে ৬০ ডলার দামে ঐসব দাসকে সারাজীবনের জন্য বিক্রি করা হয়ে থাকে। সুদান সরকার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে যে, অভিভাবকরা তাদের ৬-১২ বছরের সন্তানদের ভাড়া খাটিয়ে থাকে টাকার বিনিময়ে।

'বন্ডেড লেবার' তথা দাসত্ববদ্ধ শ্রম হলো আর এক ধরনের ট্রাডিশনাল ফর্মস অব শ্লেভারি। পার্থক্য হলো এই যে এক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাপ সৃষ্টি করে শ্রমিককে বিনা মজুরিতে অধীন করে রাখা হয়। প্রথমোক্তদের ন্যায় এই ব্যবস্থা বাহ্যত অতটা বিহ্বলকর না হলেও কার্যকালে একই রকম পরিণামবাহী। এই ধরনের বন্ডেড লেবার প্রথায় পৃথিবীব্যাপী নিষ্পেষিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী। এই ব্যবস্থার সূত্র হলো 'ডেট বন্ড' বা ঋণজালবদ্ধ দাস-শ্রম।

এই ব্যবস্থাতে মালিক দুঃস্থ পুরুষ বা নারীকে অর্থ ঋণ দিয়ে বেঁধে ফেলে, যাতে শর্ত থাকে মালিকের কাছে কাজ করে (শ্রম দিয়ে) প্রাপ্ত মজুরি বা বেতন থেকে সেই ঋণ ক্রমান্বয়ে শোধ করে দেবে ঋণগ্রহীতা। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে মালিকরা মজুরি দেয় যৎসামান্য। তাছাড়া, শ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী ও আবাসের জন্য ভাড়া এবং মালিকের তথাকথিত মনঃপুত না হওয়া কাজের জন্য মজুরি কেটে নেওয়া বা জরিমানা প্রভৃতি ধারাবাহিক অছিলাতে শ্রমিক কোনদিনই আর শোধ করতে পারে না ঋণ, বরং তা' বেড়েই চলে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ঋণগ্রস্ত শ্রমিকের মৃত্যু হলে সেই ঋণের দায় বর্তায় মৃতের সন্তান সন্ততিদের ওপর। একজন শ্রমিক দিয়ে 'বন্ডেড লেবার' শুরু হয়ে তা' বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে। আই. এল. ও.'র পক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে অষ্টম উত্তরাধিকার পর্যন্ত এর নজির রয়েছে।

'বন্ডেড লেবার' ব্যাপকভাবে এখনও প্রচলিত রয়েছে দক্ষিণ এশিয়া ও লাতিন আমেরিকাতে। পাকিস্তান এই প্রথাকে বলছে 'পেশগি', পেরুতে 'এনগানচে' ইত্যাদি। আই. এল. ও.-র কমিটি অব এক্সপার্টস লক্ষ্য করেছে যে পাকিস্তানে বন্ডেড লেবারের সংখ্যা ২০ মিলিয়ন বা ২ কোটি, যার মধ্যে ৭৫ লক্ষ হলো শিশু শ্রমিক। ইট ভাঁটা, বিড়ি তৈরি, জুতো তৈরি, কোয়ারি বা মাটির তলা থেকে খনন করে খনিজ সামগ্রী উত্তোলন, মাছ পরিষ্কার করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এরা নিযুক্ত। তাছাড়া পাথর ভাঙ্গা, সেচের বাঁধ ও সুড়ঙ্গ নির্মাণ, কার্পেট-শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এদের সংখ্যা যথেষ্ট। আই. এল. ও.'র কমিটি অব এক্সপার্টস এবং 'অ্যান্টি-শ্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল' প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ভারতের ক্ষেত্রে বন্ডেড লেবারের সংখ্যা ৫০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ও ১ কোটি শিশু। ভারত সরকার পরবর্তীকালে পার্লামেন্টে কম সংখ্যক বন্ডেড লেবার দেখিয়ে যে তথ্য পেশ করে সেই সংখ্যাকে দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি মানেনি। তারা মনে করে প্রকৃত সংখ্যা প্রদত্ত সংখ্যার চেয়ে ঢের বেশি। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত 'ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি' বিহার ও উত্তর প্রদেশের কার্পেট শিল্পে ব্যাপক বন্ডেড লেবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছে। পেরুর তিন ট্রেড ইউনিয়ন—ন্যাশনাল ফেডারেশন অব মাইনরস, মেটাল ওয়ার্কার্স এবং

আয়রণ এণ্ড স্টিল ওয়ার্কার্স তথ্য দিয়ে দেখিয়েছে যে সেখানকার সোনার খনিতে মাত্র ৯০ দিনের মজুরি অগ্রিম হিসাবে দিয়ে কম মজুরিতে দৈনিক দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করিয়ে শেষ পর্যন্ত সারাজীবনের জন্য শ্রমিকদের বন্ডেড লেবার করে ফেলা হয়।

'ফোর্সড লেবার' বা বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যবস্থা পৃথিবীর বহু দেশের আধুনিক কৃষিতে, বিশেষত বাগিচা শিল্পে, ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। ব্রাজিলে বন কেটে হাজার হাজার একরের চারণভূমি বা চাষের জোতের কাজে এই জাতীয় শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়। আই. এল. ও.-র কাছে প্রদত্ত 'এসক্রাভিডাডে ব্রাঙ্কা' বা শ্বেত দাসত্ব সম্পর্কে অভিযোগ থেকে এই ব্যবস্থার ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'গাতোস' নামে পরিচিত ঠিকাদাররা এদের সংগ্রহ করে চালান দেয়। এই শ্রমিকরা যাতে পালাতে না পারে তার জন্য পাহারা দেয় 'পিস্তেলোরিয়স' নামে এক ধরনের বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনী। ডেমিনিকান রিপাব্লিকে আখ চাষের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে সুদীর্ঘকাল থেকে। পাশের দেশ হাইতির ভয়াবহ বেকারীর সুযোগ নিয়ে ফোর্সড লেবার সংগ্রহ করা হয়। হাইতি থেকে শরণার্থী হিসাবে আগতদের বিশাল বিশাল বসত বা শিবির রয়েছে ডেমিনিকান রিপাব্লিকে। আখ চাষ ও কাটাই-এর সময় সরকারী পুলিশ ও সেনাবাহিনী হাইতির মানুষদের ঐ জাতীয় বসতগুলি ঘেরাও করে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে কাজ করায়। ডেমিনিকান রিপাব্লিকে বন্ডেড লেবারদের ঠিকাদারদের বলা হয় 'বাসকোনিস'। মায়নামারে (প্রাক্তন বার্মা) সামরিক সরকার স্বয়ং বন্ডেড লেবার ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক বলে অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘকালের। কঠোর শ্রমের জন্য ছাড়াও, অত্যাচারে ব্যাপক মৃত্যুর সংবাদও এক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এমন তথ্য রয়েছে যে কোন কোন সামরিক অভিযান চালানোর সময় কোন দেশ ফোর্সড লেবারদের 'মানবিক ঢাল' হিসাবে ব্যবহার করে; তার ফলে এদের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে।

'কমিউনিটি ওয়ার্কস' বা দলবদ্ধ শ্রম দেবার নামেও একধরনের বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যবস্থা কোন কোন দেশে, সরকার ছাড়াও, বেসরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান চালু রেখেছে দীর্ঘকাল আগে থেকে। সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি দেশের প্রয়োজনীয়তা ও দেশপ্রেমিকতার কথা প্রচার করলেও দেখা যাচ্ছে এই ধরনের নিয়োগের উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পূর্ণতই পৃথক। প্রধানত স্বৈরতান্ত্রিক বা সামরিক জুন্টা-শাসিত দেশগুলিতে, বিশেষত আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনুরূপ দেশসমূহে, এ'জাতীয় নজির সর্বাধিক। আরও বিশেষ লক্ষণীয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকারের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করলেও প্রধানত এইসব দেশে আমেরিকান প্রতিষ্ঠানে, বিশেষত কৃষি ও নির্মাণের কাজে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য, বা সেনাবাহিনীর যাতায়াতের সুবিধার্থে সড়ক, বিমানক্ষেত্র প্রভৃতি নির্মাণে এই জাতীয় কমিউনিটি লেবার ব্যবহৃত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার কৃষি বা ছোট-খাটো শিল্পের শ্রমিকদের মধ্য থেকে তালিকাভুক্ত করে এই ধরনের কাজে পাঠায়। এই কাজে যাওয়া বাধ্যতামূলক; কাজে না গেলে জরিমানা, জেল, চাকুরী হারানো ও অন্যান্য ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে কমিউনিটি লেবার দেবার সময় আগে যেখানে নিয়োজিত ছিল তার বেতন বা বিকল্প ছুটি শ্রমিকরা পায় না। বিনামূল্যে খাওয়া ও থাকা ছাড়া কোন মজুরি বা ভাতা পায় না কমিউনিটি লেবারের শ্রমিকরা।

'ভ্যাগরান্সি লেবার' বা ভবঘুরে তথা ভিক্ষুকদের শ্রম আর একটি বিস্ময়কর, অথচ প্রচলিত দাস-শ্রম প্রথা যার অস্তিত্ব রয়েছে বেশ কিছু দেশে। বহু দেশেই কর্মহীনদের রাস্তায় ভিক্ষা করা বেআইনি। এইরকম কিছু দেশে ভিক্ষুকদের কার্যত গ্রেপ্তার করে বিনা মজুরিতে, বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। বুরুণ্ডিতে সরকারী আইন অনুযায়ী ভবঘুরে বা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। ভিক্ষার দায়ে আটক অবস্থায় শাস্তি হিসাবে বিনা মজুরিতে উৎপাদনশীল শ্রমে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করে রাষ্ট্র। কিন্তু এই নিয়োগ কেবল সরকারীভাবে নয়, বেসরকারী মালিক চাইলেও এই সুযোগ বুরুণ্ডিতে দেওয়া হয়ে থাকে। ভেনেজুয়েলাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি রোধের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হলেও, আটক অবস্থায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া বা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বৃত্তি পাওয়ার কোন সংস্থান

এইসব দেশে নেই। আই. এল. ও.-প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে গ্রামাঞ্চলের প্রচণ্ড দারিদ্র্যের জন্য শহরাভিমুখে গমনের ব্যাপকতা এবং তার ফলে সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের ঠেকা দেবার উদ্দেশ্য ভ্যাগরান্সি লেবার নিয়োগের পেছনে কারণ হিসাবে কাজ করে। জাতীয় গড় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিতভাবে ভবঘুরে শ্রমকে ব্যবহার করা হচ্ছে, ব্যবহার করা হচ্ছে মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্যও।

প্রিজন লেবার বা কয়েদী শ্রম, আই. এল. ও.'র কনভেনশনগুলি একে অবৈধ বলেনি ঠিকই কিন্তু এক্ষেত্রে আরোপ করেছে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট শর্ত। প্রথমত, এই শ্রম কেবলমাত্র বিচার বিভাগ কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত দুষ্কৃতকারীদের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। কয়েদী শ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিচারাধীন বন্দীদের জন্য। তাছাড়া, রাজনৈতিক অপরাধ অথবা শ্রম-বিরোধের ফলে সাজাপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে 'প্রিজন লেবার' আই. এল. ও. সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। দ্বিতীয়ত, কয়েদী-শ্রম প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও আই. এল. ও. আরোপ করেছে নানাবিধ বিধি-নিষেধ। সাজাপ্রাপ্ত দুষ্কৃতীকে জেল কর্তৃপক্ষের দ্বারা শ্রমে নিয়োগ করা গেলেও, তাদের কোনভাবেই জেলখানার ভেতরে বা বাইরে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থা বা কারখানাতে নিয়োগ করা যাবে না, এমনকি এই কাজ করানো যাবে না কয়েদীদের সম্মতি নিয়েও। কয়েদীদের কাজের বণ্টন ও পরিদর্শন কেবলমাত্র জেলখানার কর্তৃপক্ষ দ্বারাই সম্পাদিত হতে হবে। এই ধরনের প্রদত্ত নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে যেসব কয়েদীদের শ্রম গ্রহণ করা হবে তাদের দিতে হবে বাইরের মুক্ত শ্রমিকদের মত সমান মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুযোগ-সুবিধা। এইসব বিধি-ব্যবস্থা আরোপ করার কারণ হলো যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে এটি যেন কোনভাবে দেশের শ্রমের চাহিদা পূরণের একটি বাড়তি ব্যবস্থায় পরিণত না হয়।

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে এইসব শর্তাবলী ভঙ্গ করে কয়েদী শ্রমকে উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে কেবল অনুন্নত বা স্বৈরতন্ত্রী দেশগুলিতেই ব্যবহার করার নজির সৃষ্টি হয়নি। অত্যন্ত উন্নত কোন কোন ধনতান্ত্রিক দেশেও এক্ষেত্রে বেনিয়মী কাজ সংঘটিত হচ্ছে। খোদ জার্মানিতে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের যেভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থার শ্রমে নিযুক্ত করা হয়, তাতে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। কয়েদীদের মতামত নেওয়া তো হয়ই না, উপরন্তু মুক্ত শ্রমিকদের মত মজুরি বা সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ দেওয়া হয় না। কয়েদীরা মুক্ত শ্রমিকদের তুলনায় মাত্র ৫-৬ শতাংশ মজুরি পায় জার্মানিতে। জার্মান সরকার এই অভিযোগ স্বীকার করেও বলেছে যে বিষয়টি অর্থনৈতিক কারণে ঘটছে। সেখানে শাস্তির প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্যগুলির (ল্যাণ্ডার) হাতে, যেখানে কয়েদীদের খরচ তুলবার জন্যই এই ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্যগুলি, কেননা সেই খরচ চালানোর ক্ষমতা নাকি তাদের নেই। কিন্তু এগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও জার্মানির মতো আর্থিক উন্নত দেশের বিচারে অগ্রহণীয়। তাছাড়া অস্ট্রিয়াতেও জেলের ভেতরে যেসব বেসরকারী সংস্থার কারখানা বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের কয়েদী শ্রমের সুযোগ দেওয়া হয়। এই সরকারের বক্তব্য হলো বেসরকারী মালিকরা কয়েদী শ্রম ব্যবহার করলেও, তাদের কর্তৃত্ব জেলখানা কর্তৃপক্ষেরই হাতে; সুতরাং এতে কোন অন্যায় নেই।

সামরিক চাকুরীতে একধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম কোন কোন দেশে চালু হয়েছে। ঐসব দেশের নিয়ম অনুযায়ী কোন ব্যক্তি সামরিক বৃত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাকুরী করবে। সাধারণভাবে নির্ধারিত সময়ে নোটিশ দিয়ে চাকুরী থেকে নির্ধারিত সময়ের আগে স্বেচ্ছা-নিষ্ক্রমণ বা অবসর নেওয়াও চলে। এই 'উপযুক্ত সময়ে নোটিশ' দেওয়ার বিষয়টি এক এক দেশে এক এক রকম ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কোন কোন দেশে দেখা যায়, উপযুক্ত সময়ে নোটিশ দেবার পর কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে সেগুলি অগ্রাহ্য করে। তাই নয় কেবল, আবেদন খারিজ করে দেবার পর সামরিক কর্তৃপক্ষ চাকুরীর বকেয়া সময়টুকু বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত করে আবেদনকারীকে। এইসব দেশের অন্যতম হলো বাহারিন, বেনিন, ক্যামেরুন, গ্রীস, টিউনিসিয়া প্রভৃতি। এই পর্যায়ে, সামরিকবাহিনীর এই অংশের মানুষেরা কার্যত এক ধরনের কয়েদীতে পরিণত হয়ে পড়ে। এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে হয় তাদের।

শিশুদের বাধ্যতামূলক শ্রম নিয়ে অতি সম্প্রতি ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে, যদিও এই ব্যবস্থা পৃথিবীতে অব্যাহত ও ব্যাপকভাবে চলছে। শিশুরা যেহেতু কখনোই মুক্তভাবে শ্রমের অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে নিজেদের মতামত দিতে পারে না বয়সজনিত অপরিণত বুদ্ধি ও দারিদ্র্যের কারণে, তাই শিশু শ্রমকে সব সময়েই বাধ্যতামূলক শ্রম বলে আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলি বিবেচনা করে এসেছে। তবে বয়স কম হিসাবে এই শ্রমকে বাধ্যতামূলক বলা ঠিক নয়। শিশু শ্রমিকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে জবরদস্তি, অপহরণ, প্রলোভিত বা প্রতারিত প্রভৃতি করে শ্রমে নিযুক্ত করা হয়। এদের একটা ভাল অংশকে আটকে রাখা হয়। গৃহস্থালির কাজ, দোকান, দূরান্তের অরণ্য সম্পদ বা খনিজ সংগ্রহ, অস্বাস্থ্যকর ছোট শিল্প প্রভৃতিতে এদের নিয়োগ করা হয়। এদের নিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসাও ব্যাপক। শিশু নারীদের অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা হয় দেহ বিক্রির ব্যবসাতে ব্যবহার করার জন্য। শেষোক্ত উদ্যোগটি এখন দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে রপ্তানিমূলক বাণিজ্যের রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে।

শিশু শ্রমিকের সংখ্যা জন-অধ্যুষিত, দারিদ্র্য ক্লিষ্ট এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে প্রায় সর্বব্যাপক হলেও ই. সি.-ভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশে তা' নগণ্য নয়। আন্তর্জাতিক আইনে এই প্রথাকে অসঙ্গত ঘোষণা করা হলেও অধিকাংশ অনুন্নত দেশে শিশু শ্রমিক নিয়োগ-বিরোধী আইন কার্যত নেই, বা নামে থাকলেও তার কোন প্রয়োগ নেই। সর্বত্র শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় দীর্ঘ, কাজের পরিবেশ চরম অস্বাস্থ্যকর, কোন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেই, নেই ন্যূনতম মজুরি, নিয়োগের ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা, সর্বোপরি নেই সরকারী তত্ত্বাবধান বা সতর্কতা। অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য ও বৃত্তিগত রোগে মৃত্যুর ঘটনা শিশু শ্রমিকদের মধ্যে সর্বাধিক। সব দিক বিচারে শিশু শ্রম যেহেতু লাভজনক শ্রম, স্বভাবতই তৃতীয় দুনিয়াতে কৃষি ও শিল্পে এই শ্রমের ব্যবহার সর্বাধিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ছোট ব্যবসাদার বা পুঁজিপতি বা জাতীয় স্তরের পুঁজিপতিরা শিশু শ্রমিক ব্যবহার করে না। একই সাথে উল্লেখযোগ্য হলো যে বহুজাতিক সংস্থাগুলির জাতীয় সাবসিডিয়ারিগুলিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশু শ্রমকে, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহার করে। যন্ত্রাংশ সরবরাহ ক'রে গৃহস্থালি শ্রম দিয়ে বিভিন্ন পণ্য বা সামগ্রীর অংশবিশেষ নির্মাণ বা প্রস্তুত করা, প্যাকিং করা, লেভেলিং করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে পীস-রেটের ভিত্তিতে বাইরের শ্রমিক নিয়োগের একটা অংশ শিশু শ্রমিক এবং তা' মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সত্য।

কিন্তু বর্তমানে শিশু শ্রমিক প্রসঙ্গ নতুন মাত্রা পেয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে। 'গ্যাট' চুক্তি অনুষ্ঠানের কালে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সম্পূর্ণ নতুন ও পূর্বে অনালোচিত 'সোস্যাল ক্লজ' বা সামাজিক শর্তকে যুক্ত করার জন্য যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে তার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল উৎপাদনের সমস্ত কাজে শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির প্রতিরোধে এই 'ক্লজ' গ্যাট চুক্তিতে তখনই যুক্ত করা সম্ভব না হলেও, এটা সিদ্ধান্ত হয় যে নব-গঠিত 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন' বা ডব্লু. টি. ও.-তে এ'বিষয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ১৯৯৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশনের ৭৫ বছর উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমেরিকা, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ সমস্বরে পুনরায় প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে। ১৯৯৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় দুনিয়ার শ্রমমন্ত্রীদের সম্মেলনে উন্নত দুনিয়ার চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য, শিশু শ্রমিকদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার সংশ্লিষ্ট দেশগুলিরই থাকা উচিত বলে প্রস্তাব নেওয়া হয়।

আসলে উন্নত দুনিয়ার পক্ষ থেকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে শিশু শ্রমিক ব্যবস্থা বাতিলের দাবী করা হলেও, এর পিছনে পুরোপুরি রয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থ। স্বল্পমূল্য তথা মজুরিতে শিশু শ্রম ব্যবহার করে উৎপাদনের খরচ কমিয়ে অনুন্নত দেশগুলি যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করে উন্নত দুনিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুবিধা নিতে না পারে, তা' প্রতিরোধ করতেই শিশু শ্রমিক বন্ধের দাবী। তৃতীয় দুনিয়ার পুঁজিপতিরা এটা যথার্থভাবে বুঝতে পেরে তা' প্রতিরোধের চেষ্টা শুরু

করেছে। সুতরাং সেই বিচারে শেষোক্তদের স্বার্থও অর্থনৈতিক ও শোষণের লক্ষ্যে। উভয় অংশের মধ্যে বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে শোষণের প্রশ্নের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, যেখানে শিশু শ্রমিক উপলক্ষ মাত্র। শিশু শ্রমিক ব্যবহার করে কিছু কিছু উৎপাদিত পণ্য আমেরিকা আমদানি বন্ধ বা সেগুলির উপর বাড়তি আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে। কিন্তু দারিদ্র্যজনিত কারণে শিশুদের শ্রমিকে পরিণত হওয়া প্রতিরোধে উন্নত বা অনুন্নত দেশগুলির কোন পক্ষ থেকেই কার্যকরী আর্থিক-সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন কর্মসূচী বা বরাদ্দ ঘোষিত বা গৃহীত হয়নি। স্বভাবতই শিশু শ্রমের চিরন্তন অবসানের কোন সম্ভাবনা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না, কেবলমাত্র আইন রচনা, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি ছাড়া। যদিও আই. এল. ও.'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মজুরি বা অন্য কোন ধরনের বস্তুগত বিনিময়ের দ্বারা ১৫ বছরের কম বয়সীকে শ্রমে নিয়োগ নিষিদ্ধ (কনভেনশন নং ১৩৮), তথাপি সারা বিশ্বে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু শ্রমিক নিযুক্তির সংখ্যা ১৯৯৫ সালে আনুমানিক ৭৩ মিলিয়ন ছিল। অবশ্য 'ইউনাইটেড নেশনস্ 'চিল্ড্রেনস ফাণ্ড' (ইউনিসেফ)-এর মতে ১৯৯১ সালেই এই সংখ্যা ছিল ৮০ মিলিয়ন। কোন বিশেষজ্ঞের মতে এই সংখ্যা ১৫০ মিলিয়নের কম নয়। ১০-১৪ বছর বয়সী বিশ্বের মোট শিশুর মধ্যে শিশু শ্রমিকের হার ন্যূনপক্ষে ১৩.২ শতাংশ। অর্থাৎ সারা বিশ্বের মোট ঐ বয়সী শিশুর পূর্বোক্ত অংশ, দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে, চরম কম মজুরি, দুর্বিষহ শ্রম এবং শ্রম-আইন ও সামাজিক নিরাপত্তার সমস্ত ধরনের সুযোগহীন পরিস্থিতিতে এবং বেআইনি পথে শ্রম বিক্রি করে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এই শিশু শ্রমিক সংখ্যায় ও হারে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে নিম্নোক্তভাবে: এশিয়া—৪৪.৬ মিলিয়ন (১৩ শতাংশ), আফ্রিকা—২৩.৬ মিলিয়ন (২৬.৩ শতাংশ), এবং লাতিন আমেরিকা—৫.১ মিলিয়ন (৯.৮ শতাংশ) অর্থাৎ প্রায় সর্বাংশেই অনুন্নত দেশগুলিতে। মহাদেশভিত্তিক তথ্যের উল্লেখের পাশাপাশি দেশভিত্তিক কিছু নমুনাও এক্ষেত্রে তুলে ধরা যেতে পারে। ১০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজে করে এমন হার হলো: বাংলাদেশ—৩০.১%, চীন—১১.৬%, ভারত—১৪.৪%, পাকিস্তান—১৭.৭%, তুরস্ক—২৪%, কোটে ডি আইভরি—২০.৫%, মিশর—১১.২%, কেনিয়া—৪১.৩%, নাইজিরিয়া—২৫.৮%, সেনেগাল—৩১.৪%, আর্জেন্টিনা—৪.৫%, ব্রাজিল—১৬.১%, মেক্সিকো—৬.৭%, ইতালি—০.৪%, পর্তুগাল—১.৮% ইত্যাদি।

সারা দুনিয়াতে শিশু শ্রমিক ব্যবস্থার ভয়াবহতার স্বরূপ উদঘাটন এবং এই প্রথা রোধ করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নই সর্বকালে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এবং সংগ্রাম করে এসেছে। এঙ্গেলস তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দা কন্ডিশন অব দা ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড ইন এইটিন ফরটিফোর'-এ তুলে ধরেছিলেন সমকালে ইংলণ্ডে শিশু শ্রমিকদের দুর্দশার স্বরূপ। কার্ল মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বেশ কিছু সরকারী তথ্য এ'বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। আই. এল. ও. ১৯৭৩ সালে শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধের জন্য যে কনভেনশন (নং ১৩৮) গ্রহণ করে, ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আই. এল. ও.-র সদস্য ১৭৩টি দেশের মধ্যে মাত্র ৪৯টি দেশ তা' স্বীকৃতি দিয়ে স্বদেশে আইন তৈরি করেছে। এই ৪৯টি দেশের মধ্যে ২১টি মাত্র তৃতীয় দুনিয়ার দেশ, তার মধ্যে এশিয়ার একটি দেশও নেই—যেখানে বিশ্বের মোট শিশু শ্রমিকের অর্ধেক বাস করে। ১৯৯২ সালে আই. এল. ও. 'দা ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম অন দা এলিমিনেশন অব চাইল্ড লেবার' (আই. পি. ই. সি.) গ্রহণ করেছিল। প্রথমে ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, থাইল্যাণ্ড ও তুরস্ক দিয়ে শুরু করার পর ১৯৯৪ সালে তা' প্রসারিত হয় বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস ও তানজানিয়াতে। ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে ক্যামেরুন, কলম্বিয়া ও মিশরে। কিন্তু এতে তেমন বাস্তব অগ্রগতি ঘটেছে বলে রিপোর্ট নেই। মার্চ, ১৯৯৬-তে আই. এল. ও.-র গভর্নিং বডি, পরোক্ষে ডব্লু. টি. ও.-র প্রভাবেই বলা যায়, ১৯৯৮ সালের লেবার কনফারেন্সে শিশু শ্রমিক নিয়োগ সম্পূর্ণ উচ্ছেদের লক্ষ্যে, এক নতুন সাধিত্র পেশ করার পরিকল্পনা তৈরি করেছে। ১৯৯৯ সালে এক নতুন 'কনভেনশন' গ্রহণ করে, তা' রূপায়িত করা হবে বলে তাদের পরিকল্পনা।

শ্রমিকশ্রেণীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অধোগতি

স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা ও বৃত্তি থেকে উদ্ভূত রোগ সম্পর্কে সচেতনতা ও উদ্বেগ প্রায় দুই শ' বছর আগে

থেকে শ্রমজীবীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কাজের সময় কমানোর জন্য দাবী ও সংগ্রাম গড়ে ওঠার সামান্য কিছুকাল পর থেকেই স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা ও বৃত্তি থেকে রোগ নিবারণের দাবী তথা শ্রমের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গ দাবী হিসাবে উত্থাপিত হতে থাকে। ইংলণ্ডকে যদি শ্রমিক আন্দোলনে কাজের সময় কমানো ও শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দাবী উত্থাপন ও প্রথম স্বীকৃতি অর্জনের দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, তবে জার্মানিকে গণ্য করা যায় সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিকের জন্য শ্রমিক আন্দোলন ও স্বীকৃতি অর্জনের প্রথম দেশ হিসাবে। রুশ বিপ্লবের পরই কেবল চাপে পড়ে পুঁজিবাদী দেশগুলি এইসব ব্যবস্থা নিয়েছিল, এই ধরনের কোন কোন মন্তব্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। ১৮৩৯ সালে 'প্রুশিয়ান কোড' (তৎকালে খণ্ড খণ্ড জার্মানির একটি বিশিষ্ট দেশ) এই ব্যাপারে পথিকৃৎ। ১৮৬৯ সালে সমগ্র নর্থ জার্মান কনফেডারেশনে কিছুটা সুসংহত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোড'-এর মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৭১ সালে সমগ্র জার্মান রাইখে এর প্রসার ঘটে। জার্মানিতে সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের বিকাশ রুখতে এবং সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের ইতিবাচক চেহারা তুলে ধরতে ১৮৮১ সালে বিসমার্ক উত্থাপন করেন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে চালু করার জন্য 'অ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স বিল'। কিন্তু তা' প্রত্যাহৃত হয় বিরোধী বুর্জোয়াদের চাপে। কিন্তু বিসমার্ক ১৮৮৩ সালে 'সিকনেস ইন্সিওরেন্স অ্যাক্ট' ও ১৮৮৪ সংশোধিত আকারে 'অ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স অ্যাক্ট', ১৮৮৯ সালে 'ওল্ড এজ অ্যাণ্ড ইনভ্যালিডিটি ইন্সিওরেন্স অ্যাক্ট' পাশ করে চালু করেন। ১৮৯১ সালে সবগুলি মিলিয়ে রচনা করা হয় সুসংহত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোড'। ১৯১৭ সালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য, রুশ সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীসহ জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সূত্রপাত, ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে লীগ অব নেশনস-এর প্রতিষ্ঠা ও আই. এল. ও.'র পত্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির আইনের কাঠামো আবির্ভূত ও প্রস্তাবিত হতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আবির্ভাব ও সমাজতন্ত্রে শ্রমিক ও নাগরিক জীবনের সমস্ত প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তাগুলির বিষয়ে রাষ্ট্রের গ্যারান্টির পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার ব্যাপক স্ফূরণ পুঁজিবাদকে ক্রমান্বয়ে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে বৃহত্তর ও উন্নততর কনসেশন ক্রমশ মঞ্জুর করতে বাধ্য করে। কিন্তু ১৯৭১ সাল থেকে পুঁজিবাদের বিপর্যয়ের সূত্রপাত এবং বাস্তবজীবনে ইংলণ্ডে থ্যাচারিজম ও আমেরিকাতে রেগানোমিকস-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে, পুঁজিবাদের আঙ্গিকে পরিবর্তনের সূত্রপাতে, সর্বাগ্রে আক্রান্ত হতে শুরু করে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি। এখন তা' এসে পৌঁছেছে যথেষ্ট বিপর্যয়কর স্তরে। তার মধ্যে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রসঙ্গটি সর্বাপেক্ষা বেশি বিপদের মুখে পড়েছে।

সর্বাধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক বর্তমান উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট ফলাফল হলো কর্মক্ষেত্রে রোগ ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি নতুন নতুন ধরন ও মাত্রা নিচ্ছে। 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন' বা 'হু'-এর হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর রোগে মোট মৃত্যুর মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিযুক্ত বৃত্তিগত দুর্ঘটনা এবং বিষ-যুক্ত বস্তু, শব্দ ও বিপজ্জনক কাজের চরিত্র থেকে উদ্ভূত দীর্ঘমেয়াদী অসুখের ফলে মৃত্যুর হার তিন শতাংশের অধিক। এটা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি। আই. এল. ও.-র তথ্য অনুসারে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে দুর্ঘটনা ও রোগজনিত মৃত্যুতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট-এর (জি. এন. পি.) ১ থেকে ৪ শতাংশ। নিম্ন ও মধ্য আয়ী দেশগুলির ক্ষেত্রে শিল্পগত দুর্ঘটনা ও রোগ তুলনামূলকভাবে বেশি, স্বভাবতই এইসব দেশে শ্রমজীবী ও জাতীয় ক্ষতির পরিমাণও বেশি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে গুয়াতেমালার নির্মাণ শিল্পে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার সুইজারল্যাণ্ডের চেয়ে ৬ গুণ বেশি কেনিয়াতে পরিবহন শিল্পে অনুরূপ ক্ষেত্রে ডেনমার্কের চেয়ে ৯ গুণ বেশি এবং পাকিস্তানের উৎপাদনমূলক শিল্পে অনুরূপ ক্ষেত্রের হার ফ্রান্সের চেয়ে ৮ গুণ বেশি।

একটা সময় পর্যন্ত 'হেলথ স্ট্যাটাস' বা জনস্বাস্থ্যের অর্জিত স্তরের ভিত্তিতে একটা দেশের অগ্রগতির স্তর বিচার করা হতো, যদিও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমান স্তরের দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক

পার্থক্যও ছিল। তাছাড়া, উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে ছিল সর্বকালীন ও ক্রমবর্ধমান পার্থক্য। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, এমনকি যেসব দেশে অনেক পরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ভয়ঙ্কর দ্রুততার সাথে সেইসব দেশগুলিতে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জনগণের অগ্রগতি ঘটেছিল। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে প্রসঙ্গটা কোন দেশের আর্থিক শক্তি-সামর্থ্যের নয়, প্রধানত দৃষ্টিভঙ্গির। তাই দেখা যায় যে পৃথিবীতে স্বাস্থ্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু সর্বোচ্চ পরিমাণ বরাদ্দ হলেও সেখানে ৪৭ মিলিয়ন মানুষের আদৌ কোন স্বাস্থ্য বীমা নেই।

আর এখন আই. এম. এফ.-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ঋণ দেবার শর্ত হিসাবে এবং ধনতান্ত্রের বিশ্বায়নের নীতির চাপে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর ধারণাই পরিত্যক্ত হতে শুরু করেছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ভর্তুকিমূলক সমস্ত ব্যয় হ্রাস এবং বিপরীতদিকে বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়ায় সামাজিক নিরাপত্তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্র এখন এক একটি নতুন ধরনের শিল্প ও লাভজনক ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া, শ্রীলঙ্কা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, জাম্বিয়া প্রভৃতি ব্যাঙ্ক-ফাণ্ডের ঋণখাতক দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় সর্বাধিক কমে গেছে।

পূর্বে বর্ণিত প্রসঙ্গগুলি হলো স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্বজনীন বাস্তবতার সামান্য কিছু দিক। এর বাইরে পুঁজিবাদী আধুনিক ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের ব্যাপক দিক রয়েছে। বিশেষত কৃষি ও শিল্পে যে ধরনের রাসায়নিক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলির বিষাক্ত উপাদানসমূহের জন্য স্বাস্থ্যে, বিশেষত শ্রমজীবীদের স্বাস্থ্যের উপর, ক্ষতিকারক ও ফলাফল অবিশ্বাস্য ধরনের বিপর্যয়কর।

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা থেকে রাসায়নিক শিল্পে বিপদের স্বরূপ কিছুটা বোঝা গেলেও, শিল্প ও কৃষিতে সারা বিশ্বে যে অজস্র ভূপালের মত পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তা' মানুষের অগোচরে থাকছে। রাসায়নিক সামগ্রীর সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে, বহু রোগ নির্মূল হচ্ছে প্রভৃতি যতখানি সত্য, প্রায় ততখানি সত্য হলো এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে মৃত্যু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

সারা পৃথিবীতে বছরে মোট কতো পরিমাণ রাসায়নিক উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়, তার কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এই তথ্য রাসায়নিক উৎপাদনকারী দেশগুলি সরবরাহ করে না কারণ তাতে তাদের আশঙ্কা যে বিশ্বের মানুষ জেনে যাবে ধনতন্ত্র অর্থের লালসায় কত বিষ মানব-সমাজে ঢালছে প্রত্যহ। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুসারে ১৯৯৩ সালে সারা বিশ্বে রাসায়নিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪০০ মিলিয়ন টনের মতো, যা ১৯৮৫ সালের উৎপাদনের চেয়ে দু'গুণ, ১৯৭০ সালের চেয়ে ৬ গুণ এবং ১৯৩০ সালের তুলনায় ৪০০ গুণ বেশী।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট রাসায়নিকের মোট সংখ্যা ১০ মিলিয়নের কাছাকাছি। প্রতি বছর নতুন রাসায়নিক উদ্ভাবন করা হয় ১,০০০টির মত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো খুব বেশী হলে ১,০০,০০০টির মতো রাসায়নিক সামগ্রী, সাধারণভাবে, বিশ্বে ব্যবহৃত ও বাজারীকৃত হয়। ব্যাপক পরিমাণে উৎপাদিত হয় মাত্র ১০০০টির মতো রাসায়নিক। মোট ৩,৫০০ থেকে ৮,০০০টির মতো বাণিজ্যিক রাসায়নিক বিপজ্জনক অর্থাৎ এগুলির বিষক্রিয়া ঘটাবার আশঙ্কা রয়েছে।

আই. এল. ও. ১৯২১ সালে রঙ-এ সীসা ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক কনভেনশন করে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন রাসায়নিক উৎপাদন ও ব্যবহার প্রচণ্ড ব্যাপক আকার ধারণ করে, কেবল তখন থেকেই ট্রেড ইউনিয়নে এ বিষয়ে সচেতনতা ও আন্দোলন তীব্রতর হয়। 'অকুপেশনাল এক্সপোজার লিমিটস' (ও. ই. এল. এস.) কর্মস্থলে পরিবেশ দূষণের সর্বোচ্চ মাত্রা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ব্যবহৃত রাসায়নিকসমূহের এক সামান্য ভগ্নাংশের জন্য। রাসায়নিকের দ্বারা যাতে কোনভাবে শ্রমিকদের জৈবিক ক্ষতি অথবা কর্মদক্ষতার হানি না হয় সেজন্য ও. ই. এল. এস.-এ রাসায়নিকের 'ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল কনসেনট্রেশন' (এম. এ. সি. এস.) বা সর্বোচ্চ অনুমোদিত ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এই ঘনত্বের স্তর বা মাত্রা দেশগুলি নিজেরা স্থির করে নিয়েছে। কোন কোন দেশে বিচার করা হয় যে রাসায়নিকের ঐ ঘনত্বের মাত্রা এমন থাকা উচিত যার ফলে শারীরিক ক্ষতি কিছু ঘটলেও তা' চিকিৎসার সাহায্যে নিশ্চিতভাবে নিরাময় ও শারীরিক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

আই. এল. ও.'র সাম্প্রতিক (১৯৯৩) সংকলনে দেখা যায় যে ২,১০০টির বেশি রাসায়নিকের জন্য ১৫টি দেশে 'অকুপেশনাল এক্সপোজার লিমিটস', (ও. এ. এম. এস.) নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ পরিবেশে ক্ষতিকারক প্রত্যেকটি রাসায়নিকের জন্য কোন দেশেই মান নির্ধারিত হয়নি। অন্যদিকে শিল্প-পরিবেশে রাসায়নিকের ভেসে বেড়ানো স্তর নিয়েও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে শ্রমিক জীবনের প্রতি তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাবকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে পি. ভি. সি.-র অন্যতম উপাদান ভিনাইল ক্লোরাইড-এর ক্ষতিকারক স্তর আমেরিকাতে বিবেচিত হয় ১৩ মিলিগ্রাম/কিউবিক মিটার, অথচ সুইডেনে তা' ধরা হয় ২.৫ মিলিগ্রাম/কিউবিক মিটার এবং জার্মানীতে শূন্য। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিকটিকে 'কারসিনোজেন' বা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আর সুইডেন মনে করে এটি সম্ভবত 'কারসিনোজেন'। কোন মূল্যায়ন সঠিক, তা' নিশ্চিতভাবে বিশ্ববাসীর কাছে জানা না গেলেও এর থেকে এটা স্পষ্ট যে শ্রমিক জীবনে ক্ষতির প্রশ্নে পুঁজিবাদ কার্যত নিস্পৃহ; স্বভাবতই ফলাফল ভোগ করতে হচ্ছে শ্রমিকদের।

রাসায়নিকের দ্বারা বিষক্রিয়া নানাভাবে শ্রমিকদের জীবনে ঘটতে পারে। সবচাইতে স্বাভাবিক ও সাধারণ সংক্রমণ প্রক্রিয়াটি হলো গ্যাস, বাষ্প বা বাতাসে ভেসে বেড়ানো দূষিত কণা প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুসে যাওয়া। তরল রাসায়নিক সংক্রমিত হয় চামড়ার ভিতর দিয়ে। তবে, কিছুটা অ-প্রথাগত হলেও যেসব দেশে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিম্নমানের অথবা খাদ্যের সাথে রাসায়নিক সামগ্রী একইভাবে মজুতকরণ হয়, সেইসব দেশে শ্রমিকদের খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের মাধ্যমে রাসায়নিক বিষ সংক্রমিত হয়। ক্ষতিকারক রাসায়নিক গর্ভবতী নারীর 'ফোটাস' বা ভ্রূণে যায় 'প্লাসেন্টা' বা ফুলের মাধ্যমে। বহু ক্ষেত্রে রাসায়নিক সংক্রমণের ফল ধীর গতিতে ফলতে থাকে। ফলে, একটি শিল্পে কাজ করার পর কোন শ্রমিক যদি ভিন্ন কোন শিল্প বা ক্ষেত্রে কাজ করতে চলে যায়, তখন তার শরীরে রোগের চিহ্ন দেখা দিলে, রোগের কারণ ও পূর্ব কাজের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রকৃত পক্ষে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকদের বৃত্তির পরিবর্তন বহু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং প্রায় নিয়মিত প্রথা। এটাও মালিকশ্রেণীর সামনে এক পরোক্ষ সুযোগ করে দিচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক সম্পর্কে নিজ শিল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার ক্ষেত্রে। কোন কোন ক্ষেত্রে এটাও ঘটনা যে শিল্পে বিষাক্ত রাসায়নিকের স্তর খুব নিম্ন হওয়ায় তার দ্বারা সরাসরি কোন রোগ সৃষ্টি হচ্ছে না, কিন্তু দেখা যায় শ্রমিকের শরীরের কোন রোগ থাকলে এই নিম্ন স্তরের বিষাক্ত রাসায়নিক সেই রোগকে তীব্র করে তোলে। মালিকরা সব সময়েই ব্যাখ্যা করে থাকে যে রোগ মূলগতভাবে শ্রমিকের শরীরেই ছিল, সুতরাং শ্রমিকের রোগ শিল্পের ত্রুটির জন্য নয়, কেননা তারা তথ্য দিয়ে দেখায় যে শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিকের সংক্রমণযোগ্য মান অনেক নীচে।

কোন প্রামাণ্য পরিসংখ্যান না থাকলেও এটা মনে করা হয় যে রাসায়নিক বিষক্রিয়া সর্বাধিক ঘটে কৃষি ক্ষেত্রে। আই. এল. ও.-র তথ্য অনুযায়ী কৃষিতে কর্মরত শ্রমজীবীদের সংখ্যা ১০০ কোটির বেশি এবং এই সংখ্যা বিশ্বের মোট শ্রম-শক্তির অর্ধেক। কৃষি ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের অধিকাংশই তৃতীয় দুনিয়ার। পুঁজিবাদী প্রসার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে কৃষিতে। তাছাড়া আধুনিক অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের নীতি ও ব্যবস্থাতে কৃষি অন্যতম প্রধান ও আকর্ষণীয় পুঁজি বিনিয়োগ ও লাভের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তার ফলে, কৃষিতে উন্নতমানের বীজ, সার, সেচ প্রভৃতি ছাড়াও চাষের জন্য শিল্প উৎপাদিত আধুনিক যন্ত্রপাতি, কীটনাশক প্রভৃতির ব্যবহার বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক বর্তমানে বিশ্বে উৎপাদিত হচ্ছে তার অধিকাংশটাই কৃষিতে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে কীটনাশক রাসায়নিক। '৪০ ও '৫০-এর দশকে কীটনাশকের ব্যবহার শুরু হবার পর কৃষি উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কীটনাশকের বিষাক্ত উপাদানগুলি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। তবে ডি. ডি. টি.'র ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার তথ্য '৬০-এর দশক পর্যন্ত না জানা থাকায় কীটনাশকের বিপদ সম্পর্কে তেমন সচেতনতা ছিল না।

১৯৩৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৩৯টি কীটনাশক পেটেন্টভুক্ত হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২২,০০০টিতে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রতি দশ বছরে কীটনাশকের ব্যবহার পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ হারে বেড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি পাউণ্ড কীটনাশক ব্যবহৃত হয়। স্বভাবতই সর্বোন্নত পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকেরা সর্বোচ্চ পরিমাণ রাসায়নিক বিষক্রিয়াতে নিমজ্জিত। ১৯৯০ সালে ২৭ বিলিয়ন ডলারের কীটনাশক পৃথিবীতে উৎপাদিত হয়েছিল। ১৯৯১ সালে মোট উৎপাদিত কীটনাশকের বন্টনের বিন্যাস ছিল ঃ পশ্চিম ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকাতে ৫৭ ভাগ, জাপানে ৯ ভাগ, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াতে ১৫ ভাগ, লাতিন আমেরিকাতে ১১ ভাগ, পূর্ব ইউরোপে ৪ ভাগ ও আফ্রিকাতে ৪ ভাগ।

কৃষি-শ্রমজীবীদের জীবনে এর পরিণাম কি? পরিসংখ্যানে জানা যায় যে উন্নত দুনিয়ায় মোট উৎপাদিত কীটনাশকের ৮০ ভাগ ব্যবহার করলেও, কীটনাশক বিষক্রিয়ায় নিহত মানুষের মাত্র ১ শতাংশ সেখানে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা 'হু'-র হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে বছরে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় ৩৫ থেকে ৫০ লক্ষ মানুষ; তার মধ্যে মারা যান ৪০,০০০। মার্কিন সরকারের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে বছরে ৭,৩৫,০০০ মানুষ কীটনাশকের দীর্ঘমেয়াদী বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। কানাডা সরকারের হিসাবে পৃথিবীতে বছরে ৪০ লক্ষ মানুষের মধ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ ধরা পড়ে এবং তৃতীয় দুনিয়ায় এজন্য বছরে মৃত্যু হয় ১০,০০০ মানুষের।

শিল্প ও কৃষির জন্য উৎপাদন ও ব্যবহারের রাসায়নিক বিপদের দিকগুলি ছাড়াও আরও বৃহত্তর বিপদের দিক হলো রাসায়নিক ওয়েস্ট বা বর্জ্য। রাসায়নিকের 'লাইফ সাইক্ল'-এর অন্তিম স্তরে পরিত্যক্ত বর্জ্য স্তূপীকরণ অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণ (প্রসেসিং) হলো ঝুঁকি ও ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থাপনার সম্ভবত সবচাইতে জটিল সমস্যার স্তর।

প্রায় সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি করে বাই-প্রোডাক্ট বা উপ-উৎপন্ন (কোন দ্রব্য প্রস্তুতকালে সেটির উপকরণের দ্বারা বর্জিত অংশের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য,) যা' সাংঘাতিক বিপজ্জনক হতে পারে। এই জাতীয় বিপজ্জনক উপাদানের মধ্যে সাধারণভাবে নাম করা যেতে পারে সায়ানাইড ও রঙের অবশিষ্টাংশ, ধাতু শুদ্ধিকরণের ফলে বর্জ্য, যৌগ সলভেন্টসমূহ, ফসিল তৈল-বর্জ্য এবং সেই সমস্ত পদার্থ যাতে থাকে আর্সেনিক, অ্যাসবেস্টস, মার্কারি বা পারদ ক্যাডমিয়াম। উৎপাদনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে রাসায়নিক বর্জ্যর পরিমাণও বেড়ে চলেছে। রাসায়নিক বর্জ্য নিয়ে কাজ করা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রচণ্ড বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু বর্জ্যকে দোষমুক্ত করার জন্য যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার তা' অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায়, সেগুলির ব্যাপারে সাধারণভাবে কোন উদ্যোগ, এমনকি উন্নত দেশগুলিতেও, দেখা যায় না। তাই দীর্ঘকাল পূর্ব থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে, জনবসতিহীন এলাকায় অথবা সমুদ্রে নির্বিচারে বর্জ্য নিক্ষেপ করে পরিবেশ দূষণের ব্যবস্থা ঘটিয়ে রাখা হয়েছে। তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে এই লোকভীতির বালাইও নেই। কারখানার আশে-পাশেই যেখানে সেখানে বর্জ্য জমিয়ে রাখা হয়।

সারা দুনিয়ায় বছরে কতো পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয় তারও কোন নির্দিষ্ট তথ্য নেই। 'ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি' (ই. ই. সি.) বছরে ৩০ থেকে ৪০ মিলিয়ন টন বর্জ্য তৈরি করে। 'ইউরো-পীয়ান কমিশন স্ট্যাটিস্টিকস' আশির দশকের শেষার্ধে হিসাব দিয়ে বলেছিল যে কৃষিগত জঞ্জালের পরিমাণ হলো এক মিলিয়ন টন ও গৃহস্থালি বর্জ্যের পরিমাণ হলো ১৫০ মিলিয়ন টন। এটাও দেখা গেছে, উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলিকে অর্থ ও নানা সুযোগ দেবার প্রলোভন দেখিয়ে স্বদেশের বর্জ্য শেষোক্ত দেশগুলিতে চালান দিয়েছে, বিপন্ন করেছে তৃতীয় দুনিয়ার জনগণকে। আশির দশকের শুরুতে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে গোপনে বর্জ্য চালান দেবার অভিযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে তুমুল রাজনৈতিক সংঘাত ঘটেছে।

বয়স্ক শ্রমিকের সংকট

পুঁজিবাদের নতুন বিশ্ব গঠনের তৎপরতা সততই শ্রমিক-জীবনে বহু অভিনব ও বিচিত্র ধরনের

সমস্ত সমস্যা, এমনকি সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। এইসব সমস্যা একই সাথে সৃষ্টি করে চলেছে বাস্তব ও তত্ত্বগত প্রবল বিতর্ক; বিষয়গুলি সংগঠন ও আন্দোলনের সমস্যা হিসাবেও দেখা দিচ্ছে। 'বয়স্ক শ্রমিক' প্রসঙ্গ এইরকম এক দিক।

বিশ্ব-জনসংখ্যা দ্রুততার সাথে 'এজিং' বা বৃদ্ধত্ব-প্রাপ্ত হচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্ব-জনসংখ্যাতে প্রবীণদের ভর যুবাদের চেয়ে বেড়ে চলেছে ক্রমান্বয়ে। ১৯৫০ সালে উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সারা বিশ্বে ৬০ বা তদূর্ধ্ব য়সের যে ২০০ মিলিয়ন বা ২০ কোটি মানুষ ছিলেন তাঁরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ। কিন্তু ২০২৫ সাল নাগাদ এই বৃদ্ধ-জনসংখ্যা ১.২ বিলিয়ন বা ১২০ কোটিতে এবং মোট বিশ্ব-জনসংখ্যার ১৪ শতাংশে পরিণত হবে। এই বৃদ্ধ-জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ অনুন্নত দেশগুলিতে হলেও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অদূর ভবিষ্যতে অনেক বেশি কবলিত হবে বৃদ্ধ-জনসংখ্যার দ্বারা। উন্নত দেশগুলিতে এই শতাব্দীর শেষেই বৃদ্ধ-জনসংখ্যা ২৫ শতাংশের বেশি হয়ে পড়বে।

জনসংখ্যাতে বয়সের ভরের এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো 'ফার্টিলিটি রেট' বা মানুষের প্রজননগত ক্ষমতা কমে যাওয়া (বিশেষত উন্নত দুনিয়ার জনগণের মধ্যে), পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপকতা এবং বিবাহ-পারিবারিক-বন্ধন-সন্তান-জন্মদানে, ধীরে হলেও, সংক্রমিত অনাসক্তি প্রভৃতি। বিপরীত দিক থেকে বৃদ্ধ-জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বিশ্ব-জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের উন্নতি, মানুষের জীবনকালের দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতি, শিশু-মৃত্যুর হার নিম্নগামী হওয়া প্রভৃতির জন্য। ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে জন্ম-হার প্রতি হাজারে ৩৮ থেকে কমে ২৭ দাঁড়িয়েছে। এই হার উন্নত দেশগুলিতে ২৫ এবং অনুন্নত দেশগুলিতে ৩১। ইউরোপীয় কিছু কিছু দেশে জন্ম-হার বৃদ্ধির গতি মৃত্যু-হারের গতির চেয়েও নীচে নেমে গেছে। ভবিষ্যৎ আভাস হিসাবে বলা যায় যে আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মানি ও ডেনমার্কের জনসংখ্যা ১৯৮০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ হয়ে পড়বে; ইতালি, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ডের জনসংখ্যা হবে বর্তমানের ১৫-২০ শতাংশ মাত্র। অন্যদিকে বিশ্ব-জনসংখ্যার আয়ু ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সালে ৪৬ বছর থেকে ৬৩ বছর (পুরুষদের ৬১ বছর ও নারীদের ৬৫ বছর) হয়েছে। আয়ুর ক্ষেত্রে উন্নত ও অুন্নত দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য ১৯৫০ সালে ২৫ বছর (উন্নত দেশগুলিতে ছিল ৬৬ বছর ও অনুন্নত দেশেগুলিতে ৪১ বছর) থেকে কমে ১৯৯০ সালে ১৩ বছর (উন্নত দেশে ৭৪ বছর ও অনুন্নত দেশে ৬১ বছর) হয়েছে।

এই উদ্ভুত বাস্তবতা সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক অনুমান ও আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের বিষয়ে আলোচনা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বিপরীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ জন্ম-হার কমছে, কিন্তু তাতে জনসংখ্যা কমছে না। অন্যদিকে জন্ম-হার কমায় এবং মানুষের আয়ু বৃদ্ধির জন্য, যুবকের পরিবর্তে বয়স্ক মানুষ বাড়ছে। সমাজ-বিজ্ঞানীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ মনে করেন যে জনসংখ্যার বৃদ্ধত্ব-প্রাপ্তি সমাজের অর্থনৈতিক অন্তঃশক্তির ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ের লক্ষণকে চিহ্নিত করতে শুরু করেছে। তার প্রধান কারণ হলো, ক্রমবর্ধমানভাবে যুব শ্রমজীবীর অভাবের ফলে বয়স্ক শ্রমজীবীর সংখ্যাধিক্য শ্রম-উৎপাদনশীলতাকে হ্রাস করে যাবে। দ্বিতীয়ত, বয়স্ক শ্রমিকের অসুস্থতা ও শ্রমিকোত্তর বয়স্ক মানুষদের জন্য সমাজে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য, পেনশন, বয়স্ক-ভাতা প্রভৃতিসহ অনুৎপাদক সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলবে। এবং তৃতীয়ত, পূর্বোক্ত কারণ দু'টির জন্য সমাজে আর্থনীতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার উপর আসছে করের চাপ ক্রমশ বেড়ে চলবে।

এই মূল্যায়নের পাশাপাশি অন্যদিকে থেকে যেসব প্রশ্ন উঠে আসছে সেগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, যত বেশি বয়স্ক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে বহাল থাকবে, ততই খরচ বেশি। কেননা দীর্ঘকাল ধরে চাকুরী করার জন্য প্রমোশন ও বার্ষিক বেতন-বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে, নতুন নিয়োজিত শ্রমিকের চেয়ে বয়স্ক শ্রমিক অনেক বেশি মজুরি পায়। অসুস্থতা ও ছুটি নেওয়ার ঘটনা যুব শ্রমিকের চেয়ে বয়স্ক শ্রমিকের বেশি হওয়ায় উৎপাদনে ঘাটতি ও চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচ বেড়ে চলবে। দ্বিতীয়ত, এইসব কারণ দেখিয়ে শিল্পের নতুন বিন্যাসে, বিশেষত বর্তমান 'স্ট্যাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্টে'র

প্রক্রিয়াতে, বয়স্ক শ্রমিককে সর্বাগ্রে বাদ দেওয়া হচ্ছে—যাকে বলা হচ্ছে 'জব-রিলিজ স্কীম' বা 'জব-শেডিং'। সাথে সাথেই প্রশ্ন উঠছে যে বয়স্ক শ্রমিককে বৃত্তিচ্যুত করার ফলে, প্রতিষ্ঠান ও সমাজ সুদক্ষ শ্রম-শক্তিকে হারাচ্ছে কি না? নতুন ও পুরাতন শ্রমিকের মধ্যে সব কিছুর তুল্যমূল্য বিচারে বয়স্ক শ্রমিকের ভূমিকা আর্থিক বিচারেও লাভজনক কিনা? বয়স্ক শ্রমিককে অপসারণ করে পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে সত্যি কি একজন বেকার যুব শ্রমিকের কর্মসংস্থান ঘটে? অর্থাৎ বর্তমান শিল্পের আধুনিকতার চরিত্র বিচার করলে প্রশ্ন থাকে, আদৌ নতুন কোন কর্মসংস্থান কি? তথাকথিত একটি পদ বনাম একটি পদের বিচার কেবল সংখ্যার বিষয় নয়; প্রবীণের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা প্রভৃতি গুণমান নতুন পদে না পাওয়ায় আসলে প্রবীণের পদ বিলোপের সাথে সাথে পদের অন্তর্বস্তুটিও বিলোপ হয় না কি? কর্মক্ষম প্রবীণ শ্রমিককে যত আগে ও বেশি সংখ্যায় বিদায় দেওয়া হবে তার জন্য এককালীন থোক টাকা বা তাদের আয়ু বৃদ্ধির ফলে দীর্ঘ সময় ধরে পেনশন দিয়ে যাওয়া এবং অবসরপ্রাপ্তর শ্রমকে নিষ্ক্রিয় রেখে অবসরকালের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য, বেশি আর্থিক দায়িত্ব সমাজকে নিতে হয় না কি? মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি বা অযোগ্যতার মাপকাঠিই বা কি? নীতি হিসাবে বয়স্ক শ্রমিককে, পূর্বে অবসর দেবার প্রক্রিয়ার পরিণাম (অর্থাৎ সমাজে যুব-সংখ্যা কমে যাওয়া ও বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে) সমাজ বহন করতে সক্ষম কি? যেহেতু যুব-শ্রমশক্তির সংখ্যা ক্রমশ কমে চলেছে, এই নীতি প্রয়োগ বাস্তবসম্মত কি? প্রভৃতি।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত শ্রম-শক্তিতে কোন বয়সী মানুষ কত হারে অংশগ্রহণ করছে তা' দিয়ে দেশটির অর্থনীতির অগ্রগতির স্তরের অন্যতম বিচার করা হতো। শ্রমশক্তিতে বয়স্কদের অংশগ্রহণের হার কমে যাওয়া প্রতিফলিত হতো জাতীয় উচ্চতর মাথা পিছু আয়ে, ক্রমবর্ধমান নগরায়নে এবং উন্নত ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার মধ্যে। সমাজের বর্ধিত আর্থিক অগ্রগতি প্রতিফলিত হতো দীর্ঘমেয়াদী জনগণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে, শ্রমজীবীর কর্মজীবনকে স্বল্প দৈর্ঘ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মধ্যে ও উৎপাদনমূলক শ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে দীর্ঘ সময়ব্যাপী মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে। অতীতে সব সময়ে দেখা গেছে যে বয়স্ক-নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কর্মক্ষম কম বয়সী জনসংখ্যার থেকে অনেক কম। স্বভাবতই কর্মক্ষম কম বয়সী জনসংখ্যা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নির্ভরশীল বয়স্ক জনসংখ্যার সামগ্রিক ভার বহন করতে সক্ষম হতো। নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে বয়স্ক জনসংখ্যাকে শ্রম-শক্তি থেকে অপসারণ করা অব্যাহত আছে নানাভাবে। কিন্তু এতে অদূর ভবিষ্যতে 'নির্ভরশীলতার ভারসাম্য' পরিবর্তিত হয়ে যাবে ভয়াবহভাবে। আই. এল. ও.'র তথ্যের ভিত্তিতে ইউনাইটেড নেশনসের ভবিষ্যৎ আভাস হলো যে ২০২৫ সাল নাগাদ পূর্ব এশিয়াতে প্রতি ২.৪ জন কর্মরত মানুষ পিছু অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ দাঁড়াবে ১ জন করে; আর পশ্চিম ইউরোপে প্রতি ১.৫ জন সক্রিয় মানুষ পিছু ১ জন করে বয়স্ক নিষ্ক্রিয় মানুষ থাকবে।

শিল্পোন্নত দেশগুলির শ্রম-শক্তিতে প্রবীণ বয়সী শ্রমিকদের বর্ধিত অংশগ্রহণের বর্তমান চিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয় শ্রমজীবীদের আঙ্গিক ও বিন্যাসের নতুন দিক। এতে ধরা পড়ে আধুনিক পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে এক ঘনায়মান সংকটের আভাসও। বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রম-বাজার (লেবার-মার্কেট) গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে দুই বিপরীত প্রক্রিয়া। একদিকে শ্রম-জনসংখ্যাতে প্রবীণ বয়সীদের ভিড় বাড়ছে, বিপরীতদিকে শ্রমিকের কর্মজীবনের আয়তনও হ্রাস পাচ্ছে। এটি তীব্রতর হয়েছে মধ্য-ষাটের দশকে উচ্চ বেকারীর কাল থেকে। এই সময়ে দেশগুলিতে যুব বয়সীদের দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা গ্রহণে যুক্ত থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। অন্যদিকে কর্মরত প্রবীণ শ্রমিকদের 'ইনসেনটিভ' বা উৎসাহদায়ী থোক অর্থ দিয়ে বাধ্য করা হচ্ছিল বৃত্তি থেকে অবসর গ্রহণে। এইভাবে চেষ্টা চলেছিল শ্রমের যোগানকে কমানোর। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে বেকারীর সংখ্যাকে গোপন রাখা গেলেও প্রকৃত বেকারী কমে যায়নি, বরং বেড়ে গিয়েছে।

একটা সময় পর্যন্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিক উদ্বৃত্ত ঘোষণা বা ছাঁটাই-এর ক্ষেত্রে 'লাস্ট কাম ফার্স্ট গো' বা শেষে চাকুরীতে এসেছেন যাঁরা, তাঁদের আগে বাতিল করার নীতি নিয়ে চলতো। কেননা তখন এমন কিছুটা অবস্থা ছিল যাতে যুবা শ্রমিক চাকুরী থেকে ছাঁটাই হলে অন্যত্র কাজ খুঁজে নিতে পারতো। কিন্তু এখন মালিকের চাহিদার সাথে ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি এক হয়ে পড়েছে। সর্বত্র ব্যাপক বেকারীর জন্য নতুন চাকুরী খুঁজে পাওয়া যুবা শ্রমিকেরও সম্ভব নয়। অন্যদিকে বয়স্ক শ্রমিক উন্নত মজুরি পেয়ে ও অবসরকালীন সুযোগ থেকে থোক টাকা পেয়ে মোটামুটি অবসর জীবন যাপন করতে পারবে—এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'ফার্স্ট কাম ফার্স্ট গো' বা আগে চাকুরীতে ঢুকেছেন যাঁরা তাঁরা আগে যাবেন—এই নীতি নিয়েছে মালিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি। এই পরিস্থিতিতে এক নতুন উপাদান দেখা দিয়েছে—'এজ-ডিসক্রিমিনেশন' বা বয়সজনিত বৈষম্য। আই. এল. ও.'র পক্ষ থেকে ১৯৮০ সালে 'ওল্ডার ওয়ার্কার্স রেকমেণ্ডেশন' গৃহীত হয়েছে এই পরিপ্রেক্ষিতে। বয়স্ক শ্রমিকদের সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমগ্র অবস্থা নিয়ে নানা দিক থেকে মূল্যায়ন করাও শুরু করেছে। সেগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হলো 'ফিনিশ ইনস্টিটিউট অব অকুপেশনাল হেলথ', 'দা ইউনিভারসিটি অব আমস্টারডাম', 'ইউরোপীয়ান ফাউণ্ডেশনস ফর দা ইমপ্রুভমেন্ট অব লিভিং অ্যাণ্ড ওয়ার্কিং কণ্ডিশনস', 'দা ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন অকুপেশনাল হেলথ', 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন' ইত্যাদি।

আসলে সর্বোচ্চ উৎপাদনের জন্য যেমন এইসব চর্চা, অন্যদিকে বয়সকে অন্যতম উপাদান হিসাবে হাজির করে ছাঁটাই করার জন্যও এই উদ্যোগ। একটি পূর্ব-নির্ধারিত বয়সের ভিত্তিতে অতীতে বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ করানোই ছিল পদ্ধতি। শ্রমিকের স্বাস্থ্য, মানসিক স্থৈর্য ও যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, দক্ষতা ইত্যাদির কোন মূল্যায়ন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বয়সের মানদণ্ড ছিল ভিত্তি। তবে এখন বৈজ্ঞানিকভাবে মূল্যায়নের কোন উপাদান যুক্ত করা হচ্ছে, তা' নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আসল লক্ষ্য হলো শ্রমিকের যোগ্যতা ও ভূমিকার 'ক্রীম লেয়ার' বা শ্রেষ্ঠ সময়টুকু নিংড়ে নেওয়া।

সুতরাং এই জাতীয় নতুন নতুন সৃষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে প্রথমে বয়স্ক শ্রমিক ছাঁটাই বা স্বেচ্ছা-অবসরের ব্যবস্থা এখন উন্নত দুনিয়াতে এবং আই. এম. এফ.-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের শর্তের ও 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্টে'র প্রক্রিয়াতে কোন কোন অনুন্নত দেশেও ঘটতে শুরু করেছে।

বয়স্ক শ্রমিকদের উপর এই নতুন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলনের বাইরে নতুন ধরনের সংগঠন বয়স্ক শ্রমিকদের নিয়ে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। কিছুটা প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনের রূপ এবং কিছুটা মানবিকতাবাদী চরিত্র নিয়ে বৃত্তির মানুষ অথচ নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা শিল্পের পরিবর্তে বয়সের ভিত্তিতে এবং সমবেদনাবাদী বাইরের মানুষদের নিয়ে এই জাতীয় সংগঠনের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'দা ফিন্‌এজ, অ্যাকশন প্রোগ্রাম অন হেলথ', 'ওয়ার্ক এবিলিটি অ্যাণ্ড ওয়েল-বিয়িং অব দা এজিং ওয়ার্কার্স', ফ্রান্সে 'এ. এন. এ. সি. টি. (এজন্সি নাসিওনালে পউর এল এমিলিওরেশন দেস কনডিশনস ডি ট্রাভেইল), আমেরিকাতে 'আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব রিটায়ার্ড পার্সনস' (এ. এ. আর. পি.) প্রভৃতি।

আধুনিক পুঁজিবাদ ও শ্রমজীবী নারী প্রসঙ্গ

পটভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রতিটি পরমাণুর সাথে নারীরা জড়িত। আসলে, পুরুষের ভূমিকার সমান, ক্ষেত্রবিশেষে বৃহত্তর ভূমিকা, পালন করেছে নারীরা। একথা সত্য সামাজিক ও গার্হস্থ্য উৎপাদন—উভয় ক্ষেত্রেও। অথচ তাদের স্বীকৃতি থেকেছে 'কাব্যে উপেক্ষিতা'-র মতোই। তাই ইতিহাসে ও সমাজে নারীর উল্লেখ আংশিক ও বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। মানব-সভ্যতার শুরু থেকেই উৎপাদনের কিছু ক্ষেত্রকে, নারীদের জন্য স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছিল—যাকে আধুনিককালের ভাষাতে বলা হচ্ছে 'ফেমিনাইজেশন অব সেক্টরস'—ক্ষেত্রসমূহের নারী-করণ। তাদের জন্য প্রধানত নির্ধারিত হয়েছিল

গার্হস্থ্য শ্রম। নারীরা গার্হস্থ্য শ্রম করার ফলে গৃহস্থালি শ্রমের অবমূল্যায়ন করা হলো। এই শ্রম যেমন প্রকাশ্য সামাজিক শ্রমের স্বীকৃতি পেল না, অন্যদিকে এই শ্রমকে অনুৎপাদক শ্রম হিসাবেও চিহ্নিত করা হলো সমাজে ও অর্থনীতিতে। আসলে এই 'ডিভিশন অব লেবার' বা শ্রমের বিভাজন সমাজের স্বাভাবিক প্রয়োজনভিত্তিক হলেও নারীদের প্রসঙ্গে সংরক্ষিত করা হলো, তদুপরি একে বিভাজন না বলে 'জিরো লেবার' বা শূন্য শ্রম বলা হলো। আজকের পৃথিবীতে 'জেণ্ডার ডিভিশন অব লেবার' বা শ্রমের লিঙ্গ-ভিত্তিক বিভাজনের যে প্রবণতা, আদিপর্বে তার সূত্রপাত ঘটেছিল প্রকাশ্য শ্রম ও গার্হস্থ্য শ্রমের বিভাজনের মধ্য দিয়ে। ফলে এই আরোপিত ও কৃত্রিম ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সহজাত দ্বন্দ্ব থেকে গিয়েছিল।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্তরে এসে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে পূর্বোক্ত অবস্থার। তবে তা' নারীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন থেকে নয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার স্বার্থে। উৎপাদনের বর্ধিত শ্রম-চাহিদা পূরণ করতে এবং ক্রমবর্ধমান গণ-দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে নারীরা গৃহস্থালির শ্রম দেওয়া ছাড়াও প্রকাশ্য উৎপাদনের মজুরি-শ্রমিক হতে শুরু করে। কিন্তু এই দুই ধরনের এবং পুরুষদের তুলনায় অনেক বর্ধিত শ্রম দেওয়া সত্ত্বেও নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক দুরবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি বরং বেড়েছিল সামগ্রিক দুর্দশা। প্রথমত, উভয়বিধ ও অতিরিক্ত শ্রমের জন্য তাদের কায়িক দুর্গতি; দ্বিতীয়ত, পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম মজুরি পাওয়ার জন্য আর্থিক দুর্গতি তৃতীয়ত, নারী শ্রমিকদের চাকুরি সম্পূর্ণ অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হওয়ার জন্য মানসিক দুর্গতি; চতুর্থত, প্রকাশ্য শ্রমে যুক্ত হওয়ার জন্য পরিবারের কাজে কম সময় দিতে পারায় পারিবারিক দুর্গতি।

বিংশ শতাব্দী দ্বিতীয় দশকে এসে শিল্প-ব্যবস্থাতে 'অ্যাসেম্বলি লাইন প্রোডাকশন' ব্যবস্থা চালু হয়। শ্রমিকদের কাজ বিশ্লিষ্ট রূপ পাওয়া ও উৎপাদন নিপুণতর করার প্রক্রিয়ায় নারী শ্রমজীবীরাও অন্তর্গত হয়ে যাওয়ায় তারা অধিকতর শ্রম-শক্তি শোষণের সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের অংশীদারিত্ব ক্রমশ ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে থাকে সামাজিক, রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনে। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বীকৃত হতে থাকে নারীদের রাজনৈতিক ও ভোটের অধিকার। প্রথম মহাযুদ্ধ ও ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব, নারীদের প্রসঙ্গে ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে আরও পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীদের সমানাধিকার স্বীকৃত হয় এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলি নির্মূল করতে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্র উদ্যোগী হয়। শ্রমিকাদের জন্য সম্প্রসারিত হয় সমস্ত ধরনের শ্রম ও ক্ষেত্র। অর্জিত হয় অভাবনীয় সুযোগ-সুবিধা। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের পুঁজিবাদের সংকট একদিকে, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মনস্তাত্ত্বিক চাপ ও দেশে দেশে ব্যাপক ও তীব্র বামপন্থী ও শ্রমিক আন্দোলন, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে নারীদের জন্য কনসেশন দিতে বাধ্য করতে থাকে। ১৯১৯ সাল প্রতিষ্ঠিত লীগ অব নেশনসের প্রথম ঘোষণাপত্র ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন (আই. এল. ও.) শ্রমজীবী নারীদের জন্য পুরুষদের সম-মানসম্পন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

নারী বিষয়ে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তসমূহ

১৯১৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন থেকে প্রসূতিকালীন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে 'প্রথম কনভেনশন'-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। (মেটারনিটি প্রোটেকশন কনভেনশন, নং ৩)। সংগঠনটির পত্তনের সময় থেকে সম-কাজে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সম-মজুরির সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। ১৯৪৪ 'ডিক্লারেশন অব ফিলাডেলফিয়া'-তে গৃহীত হয় নারী-পুরুষের মধ্যে সম-অধিকার প্রদানের বক্তব্য। ১৯৪৮ সালে 'ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস্'-এ (আর্টিকল ২৫, প্যারাগ্রাফ ২) গৃহীত হয় চাকুরী ও বাসের নিশ্চয়তাসহ সন্তান জন্মদানকালে জননীর স্বাস্থ্য-রক্ষার বক্তব্য। ১৯৫১ সালে 'ইক্যুয়াল রেমুনারেশন কনভেনশন' (নং ১০০) ও 'রেকমেণ্ডেশন' (নং ৯০) গৃহীত হয় নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে। ১৯৫৮ সালে'ডিসক্রিমিনেশন (এমপ্লয়মেন্ট অ্যাণ্ড অকুপেশন) কনভেনশন' (নং ১১১) এবং 'রেকমেণ্ডেশন' (নং ১১১) গৃহীত হয়। শেষোক্ত দু'টি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে (নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা

বিষয়ক) দেশগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় সেগুলি রূপায়ণ করার জন্য। এই কনভেনশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আই. এল. ও.-র 'কমিটি অব এক্সপার্টস্ অন অ্যাপ্লিকেশন অব কনভেনশনস অ্যাণ্ড রেকমেণ্ডেশনস' (কনভেনশন ও সুপারিশগুলি রূপায়ণের বিষয়ে বিশ্ব শ্রম সংস্থার বিশেষজ্ঞ কমিটি) বিভিন্ন দেশে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তায় বৈষম্যগুলি অপসারণের নির্দেশ দেয়।

এসবসত্ত্বেও নারীদের প্রসঙ্গে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি, কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড়া কোন দেশেই ঘটেনি। অন্যদিকে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য অব্যাহত থেকে যায় উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যেও। উন্নত দেশগুলিতে নারীদের বিষয়ে পূর্ব থেকে বেশ কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে এসেছিল। তাছাড়া শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন ও নারীবাদী (ফেমিনিস্ট) আন্দোলনের অব্যাহত চাপের ফলেও নারী বিষয়ক ব্যবস্থায় কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছিল উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে। সে তুলনায় কার্যত কোন অগ্রগতি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঘটেনি।

সমস্যা সমাধানে নারী-সমাজের বিশ্ব-তৎপরতা

১৯৭৫ সালে পৌঁছে নারীদের বিষয়ে সমকালীন ভাবনা-চিন্তগুলি কিছুটা নতুন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়ায়। বিশ্বব্যাপী তখন নতুন পটভূমিকাও সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট বিশ্ব-পুঁজিবাদের তথাকথিত স্বর্ণযুগ এই সময়ে ভেঙ্গে পড়ছে—সৃষ্টি হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট। সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য নানাবিধ ও ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে বিশ্ব-পুঁজিবাদ। কার্যত তারই অংশ হিসাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বব্যাপী নারীদের নিজস্ব উদ্যোগের আহ্বান জানায়। নারীদের আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক স্তরে নারীদের বৃহত্তর অংশগ্রহণের সুযোগ দেবার প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৭৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মেক্সিকো শহরে। ১৯৭৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় ১৯৭৫ সাল থেকে ১০ বছরের জন্য 'বিশ্ব নারী দশক' পালনের। ঐ সম্মেলন নারীদের সমানাধিকার এবং উন্নয়ন ও শান্তির ক্ষেত্রে তাদের অবদান প্রসঙ্গে 'ঘোষণাপত্র' (ডিক্লারেশন) গ্রহণ করে। গৃহীত হয় এক দশক ব্যাপী (১৯৭৬-১৯৮৫) নারীদের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে 'ওয়াল্ড প্ল্যান অব অ্যাকশন'। 'প্ল্যান অব অ্যাকশন' রাষ্ট্রসংঘ ও আই. এল. ও.'র গৃহীত সিদ্ধান্তমত বহুবিধ কর্মসূচী ও গ্রহণ করে। বিশ্বের রাষ্ট্র ও সমাজগুলির উদ্দেশে নারী প্রসঙ্গে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায় এই ঘোষণা। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে সমান অংশীদার করা এবং উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির সুফল যাতে পুরুষদের মতো সমানভাবে সমস্ত নারী ভোগ করতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক, আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত জরুরি; সমতার (ইক্যুয়ালিটি) বিষয়কে আইনের অন্তর্গত করতে হবে, যা নিশ্চিত করবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীদের সমান সুযোগ এবং একই সাথে চাকুরীর সমান শর্তাবলী—যার অন্তর্গত হবে সমান মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তাও।

১৯৭৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্স গ্রহণ করে 'ডিক্লারেশন অন ইক্যুয়ালিটি অব অপরচ্যুনিটি অ্যাণ্ড ট্রিটমেন্ট ফর উইমেন ওয়ার্কার্স'। এর সাথে গৃহীত হয় আরও দু'টি প্রস্তাব 'ওয়ার্ল্ড প্ল্যান অব অ্যাকশন'-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারী করে। একটি প্রস্তাব হলো বৃত্তি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ প্রসঙ্গে, অপর প্রস্তাবটি হলো প্ল্যান অব অ্যাকশন কার্যকরী করার বিষয়ে। এই প্রস্তাব দু'টিতে কর্মসূচী কিভাবে রূপায়িত হবে সেসব বিষয়ের বিভিন্ন দিকের সংজ্ঞা নিরূপণ ও রূপায়ণের কার্যকরী দিকগুলি বলা হয়।

আই. এল. ও.'র মধ্যবর্তীকালীন (১৯৭৬-৮১) পরিকল্পনার (মিড-টার্ম প্ল্যান) অগ্রাধিকার স্থির করা হয় এবং বৈষম্য দূর করার বিষয়ে প্রাথমিক কাজগুলি নির্দেশ করে দেওয়া হয়। মেক্সিকো সম্মেলনের পরবর্তী পাঁচ বছরে 'ইউনাইটেড নেশনস ডিকেড ফর উইমেন'-এর অন্তর্গত ওয়ার্ল্ড প্ল্যান অব অ্যাকশনের অগ্রগতি নিরূপণ ও পরবর্তী স্তরের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে—কোপেনহোগেন শহরে। এই সম্মেলন থেকে নারীদের কাজে নিয়োগ, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের 'প্ল্যান অব অ্যাকশন' গৃহীত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত থেকে এটা বোঝা যায়, অতীতের তুলনায় জাতীয় স্তরের পরিকল্পনা নারীদের বিষয়ে কিছুটা সংবেদনশীল ও অনেকটা সক্রিয় হলেও নারীদের উন্নয়নের প্রশ্নে আরও অনেক দূর অগ্রসর হওয়া বাকি রয়েছে। এই সম্মেলন ঘোষণা করে পরিবারের সংরক্ষণ ও সন্তান-সন্ততিদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান দায়িত্বের কথা। একাজে নারীদের একমাত্র দায়িত্ববদ্ধ করার চিরন্তন ব্যবস্থা ও অভ্যাসের পরিবর্তনও দাবী করা হয়। কর্মসূচীতে সরকারগুলির উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অংশীদার করতে হবে নারীদের। নারীদের নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি পূর্বাবস্থা সৃষ্টি ও প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয় এই প্ল্যান অব অ্যাকশন।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩৪তম অধিবেশনে (১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ থেকে ৭ই জানুয়ারী ১৯৮০) গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কোপেনহোগেন সম্মেলনের 'কনভেনশন অব এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন' রূপায়ণ করার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নেয় পৃথিবীর ৭০টি রাষ্ট্র।

আই. এল. ও.'র দ্বিতীয় মধ্যবর্তী পরিকল্পনা (সেকেন্ড মিড-টার্ম প্ল্যান) (১৯৮২-৮৭), অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় নারীদের সমস্যা সম্পর্কে। তিনটি মূল ধারাতে করণীয় স্থির করা হয়। প্রথমত, নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যের চরিত্র ও মাত্রা সম্পর্কে গভীরতর ধারণা অর্জন করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর ফলাফলগুলির পরিপূর্ণভাবে নিরূপণ করা; দ্বিতীয়ত, সুযোগ সংরক্ষণের প্রশ্নে উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে (নারী ও পুরুষ) সর্বোচ্চ পরিমাণ সমতা অর্জন করা এবং তৃতীয়ত, নারীদের কর্মজীবনে প্রবেশের পথ সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টি করা। নারীদের সুযোগের ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমতা সৃষ্টির জন্য মান (স্ট্যাণ্ডার্ড) রচনা করতে কর্মসূচীতে তিনটি ধারা নির্দেশ করা হয় ঃ প্রথমত, সরকারী গৃহীত আইনসমূহের কঠোরতর প্রয়োগ দ্বিতীয়ত, সর্বজনীন চরিত্রের অন্তর্জাতিক নতুন মান নির্ধারণের জন্য চেষ্টা চালানো এবং তৃতীয়ত, নারীদের বিশেষ বিশেষ সমস্যা বা দিকগুলি নিয়ে আন্তর্জাতিক নতুন মান রচনা অথবা গৃহীত পুরানো মানের সংস্কার সাধন।

১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের নারী-দশক সমাপ্তিতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কেনিয়ার নাইরোবিতে। এই সম্মেলন এক দশকের অগ্রগতির মূল্যায়ন এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত নারী উন্নয়নের ব্যাপারে 'ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্র্যাটেজি' বা সামনে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি-সমন্বিত রণনীতি নির্ধারণ করে। এতে বলা হয় যে আইনগত (ডি জুরি) ও বাস্তবিক (ডি ফ্যাক্টো) সমস্ত বৈষম্যের নিঃশর্ত অবসান ঘটাতে হবে। এ'বছরই আই. এল. ও.-র ৭১তম অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় 'রেজোলিউশন অন ইক্যুয়াল অপরচ্যুনিটিজ অ্যাণ্ড ইক্যুয়াল ট্রিটমেন্ট ফর মেন অ্যাণ্ড উইমেন ইন এমপ্লয়মেন্ট' বা 'চাকুরীতে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও সমান ব্যবহার পাওয়ার বিষয়ে। প্রস্তাবে বলা হয় যে যেসব দেশে ও ক্ষেত্রে নারীরা এখনও সমান সুযোগ ও ব্যবহার পায় না, সেখানে অগ্রাধিকার দিয়ে তার অবসান ঘটাতে হবে। এই পরিবর্তন কার্যকরী করতে গিয়ে দরকার হলে ব্যয় করতে হবে বাড়তি সম্পদ ও অর্থ।

১৯৯১ সালে গৃহীত হয় 'রেজোলিউশন কনসার্নিং আই.এল.ও. অ্যাকশন ফর উইমেন ওয়ার্কার্স'। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের অন্যতম দুই প্রধান মাধ্যম—ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফাণ্ড-নির্দেশিত বিশ্বব্যাপী 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট' বা কাঠামোগত সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ এবং তার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলোপের তৎপরতার কারণে নতুন করে সৃষ্ট বেকারীতে নারীরা সর্বাধিক আক্রান্ত হওয়ার পটভূমিকায় এবং শিল্প ব্যবস্থায় নতুন পরিবর্তন, সংগঠিত শিল্প থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রম-শক্তির ভর অপসারণ, নারীদের মধ্যে ক্যাজুয়াল চরিত্রের নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি

প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। আই. এল. ও. স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামকে মেনে নিয়ে উদ্বৃত্ত নারী শ্রম-শক্তিকে যাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন শিল্প ব্যবস্থায় সংযুক্ত করতে পারা যায় প্রধানত তার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করে।

১৯৯২ সালে রিও-ডি-জেনেরিওতে বিশ্ব-পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সম্পর্কে বিশ্ব সম্মেলন, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কে বিশ্ব সম্মেলন এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজনীন চরিত্রবাহী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বোক্ত সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হলেও, এগুলির প্রত্যেকটিতে নারীদের প্রসঙ্গ বিশেষ স্থান পেয়েছিল। পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে বনাঞ্চলের ও নদী বা সমুদ্রের মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল নারীদের সমস্যা, কায়রোর জনসংখ্যা সম্মেলনে পরিবার নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাতে নারীর অধিকার বা তার আগের মানবাধিকার সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক নারী-নির্যাতনকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত করে প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের কোপেনহেগেন সম্মেলন দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্যের স্তর থেকে উন্নয়ন, উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান ও সামাজিক সংহতি সাধনের কাজকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে ঘোষণা করে নারীকে সেগুলির সীমানার অন্তর্গত করেছিল। এই শীর্ষ সম্মেলন থেকে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিল পরিকাঠামো, নীতি, লক্ষ্য ও অর্জনযোগ্য স্তরকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সমস্ত ক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে যাতে অধিকতর ভারসাম্য ও সমতা অর্জন করা যায় এবং নারীদের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সুযোগ ও স্বাধীনতা প্রসারিত করা সম্ভব হয় এবং প্রতিষ্ঠা করা যায় নারীদের ক্ষমতাশীলা হিসাবে।

১৯৯৫ সালে চীনের বেজিং-এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে। এই সম্মেলনের জন্য খসড়া দলিল প্রায় দেড় বছর ধরে বিভিন্ন কমিটি ও সরকারগুলির স্তরে আলোচিত হয়ে পাঠানো হয়েছিল বিশ্বের নারী সংগঠনগুলির কাছে। আই.এল.ও. স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র বক্তব্য সম্মেলনের জন্য পেশ করে। এই সম্মেলনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শ্রম-ব্যবস্থা, প্রশাসনিক, আইনি, পারিবারিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, প্রচার-মাধ্যম প্রভৃতি সুবিস্তৃত দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল নারী প্রসঙ্গে আলোচনা। সম্মেলনটিতে যে দু'টি দলিল গৃহীত হয় তাতে পূর্বে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির ফলাফল এবং আধুনিক বাস্তবতার নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সিদ্ধান্তের মুল কথা হলো উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশ্ব-তৎপরতায়, সমতার ভিত্তিতে নারীদের সামিল করা।

স্মরণ রাখা দরকার যে নারী সমস্যা সমাজ-সৃষ্ট, পুঁজিবাদ-সৃষ্ট। নানাদিক থেকে সংকটে আক্রান্ত পুঁজিবাদের পক্ষ থেকে নারী সমস্যাকে এক স্বাভাবিক উদ্ভব হিসাবে প্রতিপন্ন করা এবং তার সমাধানের দায়িত্ব জনগণের কাঁধে চাপাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এসব সম্মেলন ও তত্ত্ব-প্রচার করা হচ্ছে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। আসলে সমস্যার কারণ নির্ধারণ ও তা' নিরাময়ের জন্য বুনিয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে প্রলেপ দেবার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাই সম্মেলনগুলিতে প্রস্তাবিত হয়েছে। নারীদের সমস্যার প্রধান কারণ হলো পুঁজিবাদী শোষণ। নারী সমস্যা যাতে শ্রেণী-সংগ্রামের অংশ হয়ে উঠতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে নারী-সমস্যার সমাধানকে 'ডেভেলপমেন্ট' বা 'উন্নয়ন'-এর ধারণায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হলেও, কার্যকালে নারী-সমস্যা এখন সংকটের স্তরে উপনীত হয়েছে। অতীতের বাস্তবতা থেকে আধুনিক বিশ্ব-ধনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়াস এবং শোষণের চরিত্রের বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টার ফলে নারী-সমস্যার আঙ্গিকেরও সাধিত হচ্ছে বিশাল পরিবর্তন। সেগুলি এতো ব্যাপক ও অভিনব চরিত্রের যে পুঁজিবাদের প্রস্তাবিত নতুন দাওয়াইও তার নাগাল পাচ্ছে না। এই অভিনব পরিবর্তন এবং সংকট ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক সমস্ত স্তরে, শিল্প ব্যবস্থা-জাত নারী শ্রমজীবীদের জীবনে। পুঁজিবাদ যখন নারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য তথাকথিত ভূমিকা নিচ্ছে, তখন নারীর জীবনে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে পুঁজিবাদই।

আধুনিককালে শ্রম-বাজারে নারীদের অংশগ্রহণ

শ্রমের বাজারে নারীদের যোগদানের হার বৃদ্ধির পেছনে নানা ধরনের কারণ বর্তমানে রয়েছে। সেসব কারণের কয়েকটি হলো ঃ মেয়েরা সংগঠিত ক্ষেত্রের যেসব শাখাতে বিগত পাঁচ দশক ধরে সাধারণভাবে বেশী সংখ্যায় কাজ করতো সেই পরিষেবা ও কতকগুলি শিল্পগত পণ্য ক্ষেত্রগুলির ব্যাপক প্রসার ঘটছে এখন; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীদের অধিক উৎপাদনকারী সংখ্যায় যোগদান সম্ভব হচ্ছে আন্দোলনের দ্বারা ও সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরে চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে চাকুরীতে যোগদানের আগেই নারীদের বঞ্চিত করার প্রথা কিছুটা কমে গেছে; পরিবারের কাঠামো ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে কিছুটা; সন্তান উৎপন্নতার হার কমে যাওয়ায়; আর্থিক অসঙ্গতি ক্রমবর্ধমান হওয়ায় প্রকাশ্য শ্রমে যোগদান নারীদের পক্ষে কিছুটা বাধ্যতামূলক হয়েছে, চাকুরীর প্রয়োজনও তাদের মধ্যে বেড়েছে পরিবার ও নারীদের মধ্যে অধিকতর স্বাচ্ছল্য অর্জনের আকাঙক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে নারীরা প্রধানত কাজ করেন কৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে; এখন অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারীদের যোগদান ব্যাপক হয়ে উঠেছে। অনুন্নত দেশগুলিতে নারীদের শ্রম-বাজারে অংশগ্রহণের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক দারিদ্র্য হলেও, তাদের উপার্জন ও উপার্জনের প্রকৃত মূল্য হ্রাসপ্রাপ্তই হচ্ছে।

শ্রমবাহিনীতে নারীদের যোগদান-সংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ বলা হলেও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বিভিন্নতা রয়েছে। উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে এই দিকগুলির বড় পার্থক্য তো রয়েছেই। আগেই বলা হয়েছে, অনুন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্যই নারীদের শ্রমবাহিনীতে যোগদানের পেছনে বড় কারণ। উন্নত দুনিয়ার নারীদের মধ্যে যারা অবিবাহিতা, একক ও বিবাহ-বিচ্ছেদী তাদের দুই-তৃতীয়াংশই চাকুরীতে যুক্ত হয়। বিধবাদের এক-চতুর্থাংশ ও যাদের স্বামী বর্তমান তাদের প্রায় অর্ধেক কাজে যায়। স্কুলে যায় না এমন ছয়-এর কম বয়সের সন্তানের মাতাদের এক-তৃতীয়াংশ এবং স্কুলে যাওয়া সন্তানদের অর্ধেকের বেশি মাতা কর্মরতা। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়েছে এমন মায়েদের এক-চতুর্থাংশ, মাধ্যমিক পাশ মায়েদের অর্ধেক, স্নাতক মাতাদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং তদূর্ধ্ব শিক্ষিতা মাতাদের তিন-চতুর্থাংশ, চাকুরী করে। স্বামীদের উপার্জন যে পরিবারে যত বেশী, সেই পরিবারের স্ত্রীরা তত কম কর্মরতা। তাছাড়া পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রমবাহিনীতে বয়স্কদের সংখ্যা বাড়ছে। নারী শ্রমিকদের মধ্যেও এই বাস্তবতা রয়েছে সমান্তরালে। দারিদ্র্য একদিকে, অন্যদিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রের বহুমুখী বিস্তার এবং কম মজুরিতে অভিজ্ঞ শ্রমিক পাওয়া এবং আয়ুষ্কাল ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বয়স্কা নারী শ্রমিকদের সংখ্যা এখন বর্ধিষ্ণু।

সমস্ত ধরনের শ্রমের ক্ষেত্রে আংশিক সময়ের কাজ অতীত থেকেই অব্যাহতভাবে রয়েছে; তদুপরি আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে আংশিক সময়ের কাজকে অন্যতম প্রধান ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হলেও, আংশিক সময়ের কাজ প্রধানত নারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখার প্রথা এখন সুবৃহৎ মাত্রা নিয়েছে। ১৯৯০ সালে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমবাহিনীতে যুক্ত নারীদের মধ্যে আংশিক সময়ের কাজে নিযুক্তাদের হার ছিল এইরূপ ঃ

অরগানাইজেশন অব ইকনমিক কো-অপরাশেন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (ও. ই. সি. ডি.)-ভুক্ত দেশগুলিতে আংশিক সময়ের কাজে নিযুক্ত নারীদের হার—নেদারল্যাণ্ডস ঃ ৬১.৭%; নরওয়ে ঃ ৪৮.২%; ইংল্যাণ্ড ঃ ৪৩.৮%; ডেনমার্ক ঃ ৪১.৫%; সুইডেন ঃ ৪০.৫%; অস্ট্রেলিয়া ঃ ৪০.১% নিউজিল্যাণ্ড ঃ ৩৫.২%; জাপান ঃ ৩১.৯%; জার্মানি ঃ ৩০.৬%; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ ২৫.২%; বেলজিয়াম ঃ ২৫.২%; কানাডা ঃ ২৪.৪%; ফ্রান্স ঃ ২৩.৮%; অস্ট্রিয়া ঃ ২০.০%; আয়ারল্যাণ্ড ঃ ১৭.১%; লুক্সেমবার্গ ঃ ১৬.১%; স্পেন ঃ ১১.৯%; ইতালি ঃ ১০.৯%; গ্রীস ঃ ১০.৩%; ফিনল্যাণ্ড ঃ ১০.২%; পর্তুগাল ঃ ১০.০%।

রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানেও নারীরা কর্মরতা। তবে অনুন্নত দেশগুলিতে নারী শ্রমজীবীদের অধিকাংশই যেহেতু কৃষি-ক্ষেত্রে কাজ করে, সেহেতু তাদের রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কাজের হার

তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার/স্বয়ংশাসিত সংস্থায় নারীদের অংশগ্রহণের মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেট ইকনমিক্স কান্ট্রিগুলিতে (আই. এম. ই. সি.) কেন্দ্রীয় সরকারের মোট চাকুরীর ২৫-৩৫ শতাংশ হলো, রাজ্য সরকার/স্বয়ংশাসিত সংস্থাতে কাজ করে ৪৫ থেকে ৮০ শতাংশ নারী। অন্যদিকে অকৃষি-ক্ষেত্রে নারী-নিযুক্তির হার ৩৫-৫০ ভাগ। রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে নারীরা প্রধানত নিয়োজিত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবার ক্ষেত্রে। আংশিক সময়ের কাজেও কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণ প্রশাসনে ১০-২০ শতাংশ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাতে ৩৫-৪৫ শতাংশ নারী আংশিক সময়ের কর্মী। তবে কেন্দ্রীয় স্তরের চেয়ে রাজ্য স্তরে আংশিক সময়ের কর্মীর সংখ্যা বেশি। অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারে নারীদের চাকুরীর হার ৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হেরফের রয়েছে। অধিকাংশ অনুন্নত দেশগুলিতে, বিশেষত, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে, কেন্দ্রীয় সরকারের নারীদের অংশগ্রহণের হার অকৃষি-ক্ষেত্রে নিয়োজিত নারীর হারের চেয়ে বেশি। কিন্তু এটি ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে কম। উপ-সাহারীয় আফ্রিকা, আরব ও এশিয়া দেশগুলিতে শিক্ষা-ক্ষেত্রের বৃত্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ দ্রুত বাড়ছে।

১৯৯৩ সালে সারা পৃথিবীর শ্রম-শক্তিতে যুক্ত মোট নারীদের অর্ধেক ছিল এশিয়াতে। এই তথ্যের অর্থ এই নয় যে এশীয় দেশগুলিতে নারীদের অগ্রগতি ঘটেছে। বরং বিষয়টির মর্ম বিপরীত। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ এশিয়াতে বাস করে। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক ছিল যে মোট নারী শ্রম-শক্তির কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ আসবে এশিয়া থেকে। তার চেয়ে কমের অর্থ হলো এশিয়াতে নারী-নিয়োগ এখনও কম; স্বভাবতই অর্থনৈতিক দিক থেকে এই মহাদেশে নারীরা দুর্বল। অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও উন্নত দেশগুলির নারীদের শ্রম-শক্তিতে অংশগ্রহণের হার অনেক বেশি। নীচের পরিসংখ্যানে তা' স্পষ্ট হবে।

বিশ্বের মোট নারী শ্রম-শক্তির তুলনামূলক বিন্যাস (শতাংশ হিসাবে)— উন্নত দেশগুলিতে ঃ ৩২.৯%; উত্তর আফ্রিকা ঃ ০.৭%; উপ-সাহারীয় আফ্রিকা ঃ ৭.৮%; লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান ঃ ৪.৬%; পূর্ব এশিয়া ঃ ৩৫.১%; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঃ ৭.৪%; দক্ষিণ এশিয়া ঃ ৯.৯%; পশ্চিম এশিয়া ঃ ১.৩%; ওশেনিয়া ঃ ০.৫%।

১৯৭০ এবং ১৯৯৩ সালে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে শ্রমবাহিনীতে নারীদের অংশীদারিত্ব ছিল নিম্নোক্ত হারে ঃ

দেশের নাম	১৯৭০	১৯৯৩
কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিপেনডেন্ট স্টেটস	৫১.১	৪৮.৮
উত্তর আমেরিকা	৩৬.২	৪১.৩
পূর্ব এশিয়া	৪০.৮	৪২.৪
অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, জাপান ও নিউজিল্যাণ্ড	৩৬.৩	৩৯.৫
উপ-সাহারীয় আফ্রিকা	৪০.৬	৩৮.১
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৩৭.০	৩৭.০
লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিরিয়ান	২১.৬	২৭.০
ওশেনিয়া	৩১.৯	৩৭.১
দক্ষিণ এশিয়া	২৫.০	২১.৯
উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া	১৯.৩	২০.৫

এখানে লক্ষ্য করলে আরও দেখা যাবে যে সমাজতান্ত্রিক প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসানের পর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি নিয়ে গঠিত কমনওয়েলথ অব ইণ্ডপেনডেন্ট স্টেটসের (সি. আই. এস.) নারীদের পরিস্থিতির অবনমন ঘটেছে। মাত্র চার বছরের (১৯৮৯-১৯৯৩) মধ্যে শ্রম-শক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ কমেছে ২.৩ শতাংশ। অনুরূপভাবে উপ-সাহারীয় আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়াতেও নারীদের হার কমেছে; ১৩ বছর ধরে পূর্বাবস্থা রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে। শেষোক্ত দেশ ও অঞ্চলগুলিতেই প্রধানত স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম কার্যকরী হচ্ছে।

কর্মরত থাকার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই কেবল নয় যদি নারীদের অর্থনৈতিক তৎপরতার হারের ভিত্তিতে (যা চিহ্নিত করে প্রকৃত অবস্থা) বিচার করা হয় তা' হলেও অনুরূপ চিত্র ধরা পড়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে চাকুরী না করেও কোন নারী তার শ্রম-শক্তি ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক তৎপরতা সংঘটিত করতে পারে। বর্তমানে এমন বহু ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক তৎপরতা চলে;যদিও সেগুলির সবগুলিকে এখনও সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, ফলে এমনও ঘটছে যে গড় জাতীয় উৎপাদনে (জি. এন. পি.) সেগুলির যথার্থ প্রতিফলন সর্বাংশে ঘটে না। এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে অর্থাৎ জি এন. পি.-র হিসাবে বিচার না করেও, ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় এমন নারী শ্রম-শক্তির স্বরূপ নিম্নোক্ত ধরনের ঃ

দেশের নাম	১৯৭০	১৯৯৩
সি. আই. এস	৬২.৫	৬০.৬
পূর্ব এশিয়া	৬৩.৫	৬৫.৯
উত্তর আমেরিকা	৪১.২	৪৯.৯
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৪৯.৪	৪৭.৪
উপ-সাহারীয় আফ্রিকা	৫৮.৮	৫১.৫
অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ,		
জাপান ও নিউজিল্যাণ্ড	৪১.৯	৪৫.৭
ওশেনিয়া	৩৯.৫	৪৬.০
লাতিন আমেরিকা ও		
ক্যারিবিয়ানস	২২.৯	২৯.০
দক্ষিণ এশিয়া	৩১.৩	২৫.২
পশ্চিম এশিয়া	২০.১	১৮.৫
উত্তর আফ্রিকা	৬.১	৮.৯

এবারে নারীদের নিজস্ব অগ্রগতি বা অধোগতির বাস্তবতা বাইরে, ১৯৯৩ সালে ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে ও অর্থনৈতিক তৎপরতায় সক্ষম পুরুষ ও নারীর আলাদা আলাদা শ্রম-শক্তির কতো ভাগ অর্থনৈতিক তৎপরতায় যুক্ত হতে পেরেছিল তা' লক্ষ্য করা যাক ঃ

দেশ	নারী	পুরুষ
উত্তর আমেরিকা	৪৯.৯	৭৬.৫
অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ,		
জাপান ও নিউজিল্যাণ্ড	৪৫.৭	৭৬.১
সি. আই. এস.	৬০.৬	৭৪.৮
উত্তর আফ্রিকা	৮.৯	৪৮.০
উপ-সাহারীয় আফ্রিকা	৫১.৫	৮৭.১
লাতিন আমেরিকা ও		

দেশ	নারী	পুরুষ
ক্যারিবিয়ান	২৯.০	৮০.১
পূর্ব এশিয়া	৬৫.৯	৮৫.৭
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৪৭.৪	৮৩.২
পশ্চিম এশিয়া	১৮.৫	৫০.২
ওশেনিয়া	৪৬.০	৭৮.৩

পুরুষদের সাথে অনুপাতের বিচারে এটা সততই স্পষ্ট হবে যে অনুন্নত দেশগুলিতে নারী শ্রম-শক্তির কাযর্ত তেমন কোন অগ্রগতিই ঘটেনি। অথচ এইসব অঞ্চলগুলিতে দারিদ্র্য সর্বাধিক।

শ্রম ও নিয়োগের নারীকরণ

বিগত দুই দশকে বিশ্বের শ্রমের বাজারে নারীদের অংশগ্রহণের হার সর্বত্রই কম-বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাহ্যত এই দৃষ্টান্তকে নারীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিক বলে বলা হলেও কার্যকালে পুঁজিবাদী শোষণের বিশ্বময় ব্যাপ্তি তথা শ্রমের বাজারের প্রসার এবং দারিদ্র্যের তীব্রতায় জীবিকার অন্বেষণে শ্রমের বাজারে বৃহত্তর সংখ্যায় যুক্ত হতে বাধ্য করছে নারী-সমাজকে। তদুপরি এই বর্ধিত অংশগ্রহণের নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনে। কিন্তু এই অংশগ্রহণ শ্রমের বাজারে প্রবহমান 'সোস্যাল ডিভিশন অব লেবার' বা শ্রমের সামাজিক বিভাজনের অভ্যন্তরে আর এক নতুন প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে—'জেণ্ডার ডিভিশন অব লেবার' বা শ্রমের লিঙ্গগত বিভাজন। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ধরনের 'ফেমিনাইজেশন অব লেবার ফোর্স এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট' তথা শ্রম-শক্তি ও নিয়োগের নারীকরণ।

পুঁজিবাদী আধুনিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের রূপের নানাবিধ পরিবর্তন, নতুন নতুন ক্ষেত্রের উদ্ভব এবং শ্রম-কাঠামোতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। বৃহত্তর মুনাফার লক্ষ্যে, কম মজুরিতে অধিক উৎপাদন করতে এবং 'ফ্লেক্সিবল' শ্রম-সময়ের ভিত্তিতে, নির্দিষ্ট ধরনের অদক্ষতামূলক চরিত্রের কাজ একান্তভাবে নির্দিষ্ট করে রাখা শুরু হয়েছে নারী শ্রমিকদের জন্য। এই জাতীয় প্রথাকেই বলা হচ্ছে শ্রম ও নিয়োগের নারীকরণ। এই জাতীয় তৎপরতার ফলে, ১৯৯৪ সালে, সারা বিশ্বের ১৫ থেকে ৪৬ বছর বয়সী নারী শ্রমবাহিনীর ৪৫ শতাংশ অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়েছে। অর্থাৎ তারা কোন না কোন ভাবে উপার্জনশীলা হতে পারছে পুঁজিবাদের দ্বারা স্বিরীকৃত ও বাছাই করা ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সক্রিয়তাসম্পন্ন নারী চিরকালই সংশ্লিষ্ট পুরুষ শ্রমবাহিনী থেকে পেছনে পড়ে থেকেছে। নারীদের অংশগ্রহণের হার পুরুষদের বৃদ্ধির হারের তুলনায় সম্প্রতি বৃদ্ধি পেলেও, তা' এখনও অনেক পিছনে পড়ে আছে সামগ্রিক বিচারে। সুতরাং শ্রম-শক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি প্রকৃত অর্থে 'মীথ' ছাড়া কিছু নয়। তবে অতীতে নারীদের প্রকাশ্য শ্রম ছিল সেকেণ্ডারি বা দ্বিতীয় পর্যায়ের, প্রধান ছিল গৃহস্থালি শ্রম। এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পুরুষদের মতো প্রকাশ্য শ্রম প্রদান প্রাইমারি হয়ে উঠছে শ্রমজীবী নারীদের জীবনে। তবে শ্রম ও নিয়োগের নারীকরণের ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র এখনও সমান রূপ পায়নি, নারীদের প্রকাশ্য শ্রমে অংশগ্রহণেও রয়েছে ব্যাপক অসমান বাস্তবতা।

'অরগানাইজেশন অব ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট' (ও. ই. সি. ডি.) ভুক্ত দেশগুলিতে ১৯৮৩-৯২ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় নারীদের নিযুক্তির হার বৃদ্ধি ঘটেছে বছরে গড়ে ২.১ শতাংশ, সেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির এই হার ছিল ০.৮ শতাংশ। নারী শ্রমের ক্ষেত্রে ও. ই. সি. ডি.-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ স্পেন ও নেদারল্যাণ্ডসের ক্ষেত্রে এই হার বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয় দেশগুলির সক্রিয় মোট জনশক্তির অর্ধেকই প্রায় নারী এবং পূর্বোক্ত বয়স-সীমার নারী-শ্রম শক্তির ৭০ ভাগই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়। এইসব দেশগুলিতে শ্রম ও নিয়োগের নারীকরণ সর্বাপেক্ষা অধিক।

পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর সেখানে পুঁজিবাদী

ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে যে ব্যাপক মন্দা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সেখানে শ্রমজীবীদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। কিন্তু পুরুষদের নিযুক্তিতে যে হারে অধোগমন হচ্ছে, নারীদের ক্ষেত্রে ততটা দ্রুত গতিতে নয়। তবে ঐসব দেশে বাজারী অর্থনীতি গ্রহণের কোন ইতিবাচক ফল নয় নারীদের বিষয়ে এই ঘটনা। বরং ভয়ঙ্কর দুর্দশার জন্যই নারীদের আপ্রাণ সংগ্রাম করতে হচ্ছে আর্থিক উপার্জনকে অব্যাহত রাখাতে।

১৯৯৪ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে, বিশেষত 'এশিয়ান টাইগারস' নামে অভিহিত দেশগুলি এবং অজস্র এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন সৃষ্টি হবার ফলে, নারী শ্রম-শক্তির ৮০ শতাংশ অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়। চীনে ১৬ থেকে ৬৪ বছর বয়সীদের ৭০ ভাগ উপার্জনশীলা।

আই. এল. ও.'র সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ১৯৯৪ সালে ছিল ৪৪ শতাংশ। অবশ্য এই হিসাবের মধ্যে তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীদের যে বিপুল অংশ কৃষি ও অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ করে, তার সমস্ত তথ্য যুক্ত নয়। আই. এল. ও. "অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়" শব্দটির সংজ্ঞাগত পরিধিকে অনেকটা প্রসারিত এবং অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র ও অ-বাজারী ক্রিয়াকলাপকে (নন-মার্কেট) যুক্ত করে, বিস্তৃত প্রশ্নাবলীসহ তথ্য সংগ্রহের এক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তৃতীয় দুনিয়ার কতকগুলি দেশের ক্ষেত্রে। তাতে দেখা গেছে নারী শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে এই হার বৃদ্ধির চরিত্র হলো ভারতের ক্ষেত্রে ১৩ থেকে ৮০ শতাংশ, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১১ থেকে ৬৩ শতাংশ। উপ-সাহারীয় দেশগুলির কোন কোনটিতে নারীরা কৃষিতে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত নিযুক্ত। ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী মেয়েদের তুলনামূলক অংশগ্রহণ কম লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে—৩০ শতাংশের মতো। সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যায় নারীদের অংশগ্রহণ হলো আরব দেশগুলিতে।

নিয়োগ ও কাজের ক্ষেত্রে আর একটি দিক রয়েছে। স্থায়ী চরিত্রের কর্ম ও নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেক বেশী বঞ্চিত। ও. ই. সি. ডি.-ভুক্ত দেশগুলির পরিষেবা ক্ষেত্রের অন্তর্গত পার্ট-টাইম কাজগুলিতে নারীরা নিরঙ্কুশ—৬০-৯০%। ১৯৯২-৯৩ সাল নেদারল্যাণ্ডসে সক্ষম নারীদের ৬৩ ভাগ যুক্ত ছিল অনুরূপ বৃত্তিতে; অস্ট্রেলিয়াতে ৪২ ভাগ, নিউজিল্যাণ্ডে ৩৬ ভাগ, নরওয়েতে ৪৮ ভাগ এবং ইংলণ্ডে ছিল ৪৫ ভাগ। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে, কর্মরত নারীদের ১০ শতাংশের বেশি সংগঠিত ও আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কর্মরত নয়। সুতরাং নারীদের কর্ম-সংস্থানের যে বৃদ্ধি উল্লেখিত হয়েছে তা' এই জাতীয় পার্ট-টাইম কর্মক্ষেত্রসমূহে, প্রথাগত ও স্থায়ী চরিত্রের বৃত্তিতে নয়। তার সাথে আরও লক্ষণীয় যে বিশ্ব-পুঁজিবাদী নতুন ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে যে তথাকথিত কাঠামোগত সংস্কার চলছে, তাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংকোচন, কোথাও বা বিলোপ অথবা বেসরকারীকরণের ফলে স্থায়ী চরিত্রের নিয়োগের এক শক্তিশালী ও বৃহৎ এলাকা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। তৃতীয় দুনিয়াতে এক উল্লেখযোগ্য অংশের নারী এইসব ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল, যেমন বলা যায় লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশসমূহে ৩৫ থেকে ৪৫ শতাংশ। সুতরাং স্থায়ী চরিত্রের কর্ম থেকে অপসারিত হয়ে নারী শ্রমজীবীদের একাংশ এখন অ-আনুষ্ঠানিক ও পার্ট-টাইম চাকুরীতে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে অর্থাৎ প্রাপ্ত সুযোগ থেকেও তাদের অপসারণ ঘটছে।

নারীদের অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের কাজের হার উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে পুরুষদের তুলনায় বেশি। এ'বিষয়ে তৃতীয় দুনিয়ার কিছু তথ্য দেখা যাক ঃ

দেশের নাম	বছর	পুরুষ	: নারী
বলিভিয়া	১৯৯১	৪২	৭০
কেপ ভার্দে	১৯৯০	৪২	৫৪
মিশর	১৯৮৯	৪৬	৭৪
এল সালভাদোর	১৯৯১	২৮	৪৮
ঘানা	১৯৮৯	৬৯	৯২

দেশের নাম	বছর	পুরুষ	নারী
ইন্দোনেশিয়া	১৯৮৯	৭০	৭৯
দক্ষিণ কোরিয়া	১৯৯১	৩৮	৪৩
পাকিস্তান	১৯৯২	৬৬	৭৭
পেরু	১৯৯১	৩৯	৫৫
তানজানিয়া	১৯৮৯	৭১	৭৬
তিউনিসিয়া	১৯৮৯	৩৬	৫১
তুরস্ক	১৯৯১	৫৫	৮০

অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র স্বভাবতই নিরাপত্তাহীন; কাজের সময় নির্দিষ্ট নেই ও শ্রম-আইনের সুযোগও কম। কেবল অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র বলে নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত ধরনের অর্থনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রেই অস্থায়ী, পার্ট-টাইম প্রভৃতি চরিত্রের শ্রম এখন ব্যাপকতর হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে নারী শ্রমজীবীরাই সংখ্যাধিক্য অংশ। নারীদের যখন নিয়োগের কিছুটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তখন পুরুষের চাইতে অনিশ্চিত ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশ ঘটছে, পুরুষের সাথে অসামঞ্জস্যমূলক নিম্ন-মজুরির ক্ষেত্র বা বৃত্তিতে তাদের সংস্থান হচ্ছে এবং প্রধানত অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে নারী-শ্রমের সংহতকরণ চলছে। তদুপরি এটা মোটেও বিস্ময়কর নয় যে কাঠামোগত সংস্কারের প্রক্রিয়ার ফলে অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থানেরও তুলনামূলক অবনতি ঘটছে।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার পর, পুরুষদের তুলনায় নারী শ্রমজীবীদের ঘন্টা-প্রতি উপার্জন নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। এটা ঘটছে প্রধানত অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে নারীদের ঘনবদ্ধ রাখা এবং দারুণ কম মজুরির উৎপাদন ক্ষেত্রে, যেমন পোশাক নির্মাণ, কাজ করার জন্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও, দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের নারীদের মধ্যেও অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে যোগদান অব্যাহত ও ব্যাপক। দৃশ্যমান এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে 'অ্যাডেড ওয়ার্কার্স এফেক্ট' বা সংযোজিত শ্রমশক্তির ফল। অর্থাৎ নারী উদ্বৃত্ত-শ্রমের সুযোগ নিয়ে শ্রম-বাজারে তাদের প্রবেশে বাধ্য করে, কম মজুরির বৃত্তিতে পরস্পরকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত করা হচ্ছে। খাদ্য-পণ্য উৎপাদন থেকে ক্রমশ 'ক্যাশ-ক্রপ' বা শিল্পের কাঁচামাল বা উপকরণমূলক ফসল উৎপাদন অর্থাৎ কৃষিতে শিল্প-প্রয়োজনীয় পুঁজিবাদ-প্রথায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেও, নারীরা কৃষিক্ষেত্র থেকে ব্যাপকভাবে উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ছে। এই আঘাত নারীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তীব্র, কেননা কৃষিতেই নারী নিয়োগ, অন্তত তৃতীয় দুনিয়ায়, সর্বাধিক। এই হলো পুঁজিবাদে নতুন 'অ্যাডেড ওয়ার্কার্স এফেক্ট'-এর অন্য এক দিক।

শ্রমিকাদের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্যের অন্যান্য দিক

অতীতে নারীদের প্রতি যে বৈষম্যগুলি ছিল, সেগুলি এখন বহু-বিশ্লিষ্ট হয়েছে। পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকেও সেগুলি নানাভাবে বেড়েছে। সর্বোপরি সেগুলি ক্রমাগত অভিনব ধরনের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

প্রবহমান বৈষম্যের ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে নারীদের জীবনে এই সমস্ত নতুন দিক যুক্ত হওয়ায়, তাদের উপর শোষণ আরও কঠোর হয়ে উঠছে।

প্রায় সমস্ত সমাজেই পুরুষদের তুলনায় নারীদের ক্ষমতা কম। শ্রমের প্রাপ্য তারা কম পেয়ে থাকে, গার্হস্থ্য সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কম। বহু দেশে তারা শিক্ষার সুযোগও কম পায়। আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের (ফর্মাল সেক্টরের) উন্নত মজুরির চাকুরীতে নারীদের স্বল্প প্রবেশাধিকার। পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যায় বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রম (ডোমেস্টিক লেবার) ও অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে (ইনফরমাল সেক্টরে) নারীরা কাজ করে থাকে। এইভাবে শ্রমের বাজারে নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়। পুঁজিবাদী বাজারী-তৎপরতায় কম সময় ধরে নারীরা কাজ করলেও, তা' পুষিয়ে যায় তাদের

গৃহস্থালি শ্রমে দীর্ঘ সময় কাজ করার ফলে। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে (১৯৯৫) এ'বিষয়ে নজির দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশে পুরুষ ও মেয়েরা সপ্তাহে সমান সময়ের শ্রম দিলেও পুরুষ শ্রমের ৯০ ভাগ হলো অর্থ-উপার্জনকারী, অন্যদিকে নারী শ্রমের ৮০ ভাগ হলো গার্হস্থ্য-শ্রম। অর্থাৎ নারীরা যখন পুরুষের সমান্তরাল ও সমান শ্রমও করেন, তখনও শ্রমের এই বিভাজন ও বৈষম্য চলতেই থাকে। সাধারণত এটাই হলো অনুন্নত দেশগুলির নারী-শ্রমের ক্ষেত্রে বাস্তবতা। অন্যদিকে নগদ অর্থ উপার্জনে পুরুষের সাথে এই পার্থক্য, কার্যকালে, নারী-ক্ষমতাকে খর্ব করে রেখেছে। ফলে গৃহস্থালি শ্রমে সর্বাধিক সময় নিয়োজিত করেও গৃহের বিভিন্ন প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়ের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নারীর প্রায় থাকে না বললেই চলে।

পুরুষ ও নারীর প্রকাশ্য শ্রমে (মজুরি বা উপার্জনকারী শ্রম) যোগদানের ক্ষমতা প্রধানত দু'টি উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথমত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। নারীদের প্রতি অব্যাহত বৈষম্যের জন্য বাজারের চাহিদা-মাফিক এ'বিষয়ে যোগ্যতা সাধারণভাবে তারা অর্জন করতে পারে না। কেননা শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্য এশিয়া ও মধ্য-প্রাচ্যে প্রবল, আফ্রিকাতেও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং লাতিন আমেরিকা ও প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ততটা না হলেও একেবারে নগণ্য নয়। দ্বিতীয়ত, প্রকাশ্য শ্রমের অভিজ্ঞতা। নারীরা সবসময়ে সংকীর্ণ গৃহস্থালি শ্রমের সুযোগ পায়। পুরুষদের সমতুল যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকলেও তাই তারা বঞ্চিত হয়ে থাকে। কিন্তু বহু দেশে নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বৈষম্য নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টার পরও দেখা যায় যে পুরুষদের তুলনায় নারীদের মজুরি কম দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বাজারী-অর্থনীতির স্বাভাবিক উপাদানগুলি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দেশ ও সমাজের পরম্পরাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবস্থা হিসাবেও এই বৈষম্য চলতে থাকে।

বাজার-সমর্থক অর্থনীতিবিদরা নারীদের প্রতি মজুরি-বৈষম্যকে প্রকৃতপক্ষে শ্রম-বাজারের বৈষম্য বলে মানতে রাজি নয়। তাদের মতে কোন কোন দেশের মজুরির নিম্ন-মান আসলে প্রতিফলিত করে মজুরি-শ্রমের নিম্ন-উৎপাদনশীলতাকে। তাদের মতে অনুন্নত দেশগুলিতে নারীদের শিক্ষা ও নির্দিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা কম হওয়ায় মজুরি নিম্ন হারে হয়ে থাকে; সুতরাং নারীর মজুরি ঠিক অথবা নিম্ন তা' নির্ধারণ করতে এই বাস্তব শর্ত দিয়েও বিশ্লেষণ করতে হবে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এই তুলনামূলক মূল্যায়নের পদ্ধতিকে 'ডিকম্পোজিশন অ্যানালিসিস' বলে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু এই 'ডিকম্পোজিশন অ্যানালিসিস'এর ধারণাও যে বাস্তবে ঠিক নয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ বিদ্যমান। উদাহরণ হিসাবে ইকুয়েডর, জামাইকা ও ফিলিপিনসকে দেখানো যেতে পারে। এই দেশগুলিতে সাধারণভাবে নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও, পুরুষদের চেয়ে ২০-৩০ শতাংশ কম মজুরি পেয়ে থাকে। ভারতে নারীরা পুরুষদের চেয়ে প্রকৃত মজুরি কম পেয়ে থাকে ৫১ শতাংশ; অথচ তথকথিত 'ডিকম্পোজিশন অ্যানালিসিস'-এর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে নারীর মজুরি বড় জোর ৩৪ শতাংশ কম হতে পারতো; অর্থাৎ ঐ মানদণ্ডের বিচারেও ভারতের নারী-শ্রমিকরা ১৭ শতাংশ মজুরি বৈষ্যমের শিকার হয়। কেনিয়াতেও অনুরূপ ফর্মুলা প্রয়োগের পর দেখা যায় নারীদের মজুরি পুরুষদের চেয়ে ১৮ ভাগ কম। লাতিন আমেরিকাতে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ৭১ শতাংশ মজুরি পান; ডিকম্পোজিশন ফর্মুলা প্রয়োগ করলে তা' বড় জোর ২০ পয়েন্ট কমতে পারে। সুতরাং এটি নারীদের নিম্ন-উৎপাদনশীলতার অভিযোগের নামে স্বাভাবিক বৈষম্যের ব্যবস্থা মাত্র নয়। পুঁজিবাদ সতত শ্রম-শক্তি চুরি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য পেয়ে থাকে। অধিকতর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পুরুষদের সমতুল শ্রম-শক্তি নারীদের ক্ষেত্রে চুরি করেও নারীকে পুরুষের তুলনায় কম মজুরি দিয়ে থাকে পুঁজিবাদ। অর্থাৎ নারী-শ্রম পুঁজিবাদের কাছে অধিক লাভজনক। উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে, মাত্রায় কম হলেও, এই অবস্থায় ব্যত্যয় নেই।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিগত দুই শতাব্দী ধরে নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি ও আয়ের বৈষম্য প্রায় একই থেকে গেছে। বিগত তিন দশকে তার সামান্য ব্যতিক্রম মাত্র ঘটেছে। এমনকি কৃষি থেকে শিল্প এবং বর্তমানে পরিষেবা ক্ষেত্রে ভর সরে আসার পরও নারীদের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতার তেমন ইতর-বিশেষ ঘটেনি। পূর্ব-এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও উপ-সাহারীয় ছয়টি দেশের সাম্প্রতিক

পরিসংখ্যানে নারী-উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈষম্য অতীতের তুলনায় কমে আসার কিছু লক্ষণ দেখা গেছে ঠিকই, কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যের কার্যত কোন অবসান ঘটেনি।

নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অনেকগুলি দিক রয়েছে। অধিকাংশ অনুন্নত দেশে কঠোর পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে পুরুষদের রয়েছে অতি-ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। পরিবারের প্রধান পুরুষরা স্থির করে যে বাড়ির মেয়েরা গৃহস্থালি শ্রমের বাইরে প্রকাশ্য শ্রমে যোগ দেবে অথবা দেবে না। সামাজিক সংস্কৃতির পরম্পরাগত ঘেরাটোপও বহু দেশে নারীদের প্রকাশ্য শ্রমে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হিসাবে কাজ করে। কেননা পর-পুরুষের পাশাপাশি পরিবারের নারীর কাজ করাকে বহু দেশ মানসিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়া বহু দেশে নানা প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনি এমন সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে যে কারণে নারীরা সমস্ত ধরনের কাজে যোগ দিতে পারে না—যেমন তথাকথিত "ভয়ঙ্কর" ধরনের কাজ বা রাত্রিবেলার কাজ ইত্যাদি। তদুপরি নারীর ও পরিবারের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ও গার্হস্থ্য জীবনের চাপও নারীদের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য-শ্রমে যোগদানের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এর বাইরেও কতকগুলি দিক রয়েছে। ব্যক্তিগত বা সাংসারিক প্রয়োজনে কর্মরতা নারী সাময়িকভাবে একবার বৃত্তি ছেড়ে আসতে বাধ্য হলে সাধারণভাবে তা' স্থায়ী চরিত্র পেয়ে যায়। অথচ পুরুষরা অনুরূপ পরিস্থিতিতে পরবর্তীকালে পুনরায় কোন না কোন বৃত্তিতে ফিরে যেতে পারে। নারীরা ফিরতে পারে না—একদিকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বন্ধনে পুনরায় যুক্ত হয়ে পড়ার জন্য, অন্যদিকে শ্রমের বাজরের চরিত্রের জন্য অর্থাৎ নারীদের যথাসাধ্য চাকুরী না দেওয়ার প্রবণতার জন্য। বিশেষত অনুন্নত দুনিয়ায়, নারীরা বৃত্তিতে ফেরার সুযোগ কম পায়। যদিও এটি সর্বকালে ও সর্বদেশে সত্য যে নারী-নিয়োগের দ্বারা পুরুষ-শ্রমের অপসারণ ঘটে না, অথচ নারী শ্রমিক অপসারণ করে পুরুষ শ্রমিক নিয়োগ ঘটে থাকে ব্যাপকভাবে। বাধ্য না হলে মালিকরা সর্বজনীন ক্ষেত্রে নারী-নিয়োগ কখনো করে না এবং নারীরা নিযুক্ত হয় সবচাইতে শেষে; কিন্তু ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন দেখা দিলে নারীরা সর্বাগ্রে চাকুরীচ্যুত হয়—যাকে বলা হচ্ছে, 'উইমেন আর হায়ার্ড লাস্ট, ফায়ার্ড ফার্স্ট'। তাছাড়া পুঁজিবাদী বাজারী অর্থনীতির আরও নানা উপাদান রয়েছে। সব দেশে ও সর্বত্র বাজারের ক্ষমতা আদৌ এক স্তরে নয়। অন্যদিকে পুঁজিবাদের অগ্রগতির স্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের বাজারের ক্ষমতা সমানুপাতিকভাবে নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বহুবিধ বাস্তবতার ওপর বাজারের শক্তি নির্ভর করে। বাজার দুর্বল হলে শ্রমের বাজারও দুর্বল হতে বাধ্য। তৃতীয় দুনিয়ার পুঁজিবাদী বিকাশে দুর্বলতার জন্যই তাদের বাজারও প্রচণ্ড দুর্বল। স্বভাবতই দুর্বল শ্রমের বাজার, দুর্বল সুযোগ দিয়ে থাকে শিক্ষিতা-নারীদেরও। এটা নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, মজুরির প্রশ্নেও অনুরূপ। এই 'ভয়ঙ্কর চক্র' সমাজে ও নারী জীবনে সর্বক্ষণের প্রভাব রেখে চলেছে। বাজারের সুযোগের এই অভাব পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়ায় সমাজ ও নারীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে অনীহা সৃষ্টি করে। ফলে নারীদের কম শিক্ষার বাস্তবতা শ্রমের বাজারে তাদের প্রবেশকে আরও অবরুদ্ধ করে চলে।

এক দেশের শ্রমিকা অপর এক দেশের সংশ্লিষ্টদের তুলনায় কতটা ভাল বা মন্দ মজুরি পায়, তা' এখন প্রায়শই আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনাতে উত্থাপিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর সম্বলিত দেশে, শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয় সেই দেশের প্রচলিত মুদ্রায়। সুতরাং মজুরির তুল্য-মূল্য বিচার করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জটিল। তাছাড়া এই তুলনামূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি সর্বাংশে সঠিক অবস্থাকে চিত্রিত করে না। সাধারণভাবে একাধিক দেশের মজুরির মধ্যে তুলনা করতে হলে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা-মানকে গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বর্তমানেও আমেরিকান মুদ্রা ডলারকে এই মুদ্রা-মান ধরা হয়। ডলারের সাথে অপর একটি দেশের মুদ্রার সরকারী বিনিময় হারকেই তুলনার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব-মুদ্রা বাজারের টলটলায়মান পরিস্থিতি এবং বিশ্ব-বাণিজ্য, ঋণ, অভ্যান্তরীণ বাজার, উৎপাদনে নৈরাজ্য ও অস্থিরতা প্রভৃতির ফলে সরকারী বিনিময় হার অনেক দেশের ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ছে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী বিনিময় হারের তুলনায় বিভিন্ন তৃতীয় দুনিয়ার দেশের মুদ্রার মান আন্তর্জাতিক

বাজারে নীচু। তাই কোন দেশের শ্রমজীবীর প্রাপ্ত মজুরিকে ডলার-মজুরিতে তত্ত্বগতভাবে পরিবর্তন করে নিলেও প্রকৃত পারস্পরিক তুলনা পাওয়া অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের শ্রমিকরা জীবনযাত্রায় যেসব সামগ্রী ক্রয় করেন সেগুলির চরিত্র, পরিমাণ ও মূল্য পরস্পরের মধ্যে সম-স্তর-সম্পন্ন বা সমান্তরাল হয় না। অ-বাণিজ্যিক সামগ্রী যেমন, আবাস অথবা বিশেষত ব্যক্তিগত পরিষেবার দরে দেশে দেশে পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া সেগুলির মূল্য সংশ্লিষ্ট বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। এইসব জটিলতা কিছুটা দূর করে বেতনের তুল্যমূল্য অর্জনের যে পদ্ধতি অর্জিত হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে, 'পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি' (পি. পি. পি.) বা ক্রয়-ক্ষমতার সমতা। এই গাণিতিক পদ্ধতিতে তুল্যমূল্য বিচারের জন্য পারস্পরিক দেশগুলির একই ধরনের পণ্য ও পরিষেবার দরকে সমান স্তরে অর্জন করে নেওয়া হয়। যদিও এই 'পি. পি. পি.' ব্যবস্থাতে একাধিক দেশের শ্রমিকরা একই ধরনের পণ্য ও পরিষেবার কত পরিমাণ ভোগ বা ব্যবহার করে তার যথার্থ তথ্য হিসাবের সময় ব্যবহার করা হয় না। সুতরাং এই পদ্ধতির দুর্বলতা থেকে গেছে। এবারে 'পি. পি. পি.'র দ্বারা অর্জিত ফলাফলকে দেখা যেতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল ও ভারতের মুম্বই শহরের দু'জন বাস-ড্রাইভারের মধ্যে তুলনা দেখা যাক। ডলারের মানের দ্বারা ঐ দুই দেশের শহর দু'টির বাস ড্রাইভারের বছরের (১৯৯৪ সালে) মজুরি হিসাব করলে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২,৮০০ ডলার এবং ১,৭০০ ডলার। কিন্তু পি. পি. পি.'র সাহায্যে হিসাব করলে তা' দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫,৬০০ ডলার ও ৫,৫৯০ ডলার।

এবারে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও পুরুষ-নারীর মধ্যে পার্থক্যের দিক কিছুটা দেখা যাক। কেনিয়ার নাইরোবির একজন অদক্ষ সূতীবস্ত্রের শ্রমিকার তুলনায় জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের একজন ইঞ্জিনীয়ার ৫৬ গুণ বেশি মজুরি পায়। জার্মানির অভ্যন্তরে একজন ইঞ্জিনীয়ার ও সূতীবস্ত্রের শ্রমিকার মধ্যে মজুরির পার্থক্য ৩ : ১। কেনিয়ার অভ্যন্তরে এই পার্থক্য ৯ : ১। জার্মানি ও কেনিয়ার দুই পুরুষ ইঞ্জিনীয়ারের মধ্যে এই পার্থক্য ৭ : ১, অন্যদিকে জার্মানি ও কেনিয়ার দুজন অদক্ষ সূতীবস্ত্রের শ্রমিকার ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো ১৮ : ১। পি. পি. পি.-র এই মূল্যায়ন থেকে লক্ষ্য করা যায়, সাধারণভাবে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য তো আছেই, তাছাড়াও উভয় ধরনের দেশের অভ্যন্তরে পুরুষের সাথে নারী শ্রমজীবীর আয় তথা ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে বৈষম্যও যথেষ্ট।

বৈষম্যের আর দিক রয়েছে। বিশ্বের শ্রম-সক্ষমতাসম্পন্ন বয়সের ৪০ ভাগ মানুষ পারিবারিক জোত ও আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ করে, এদের মধ্যে ৬০ শতাংশ নারী। একটি দেশের অভ্যন্তরের মজুরি ও ক্রয়-ক্ষমতার তুল্য-মূল্য যদি বিচার করা হয় তবে দেখা যাবে যে আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের তুলনায় পারিবারিক জোতের আয়ের পরিস্থিতি হতাশজনক। এক্ষেত্রে নারীরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ, স্বভাবতই তারা বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে অবস্থানকারী দেশগুলির অভ্যন্তরে সংশ্লিষ্ট দেশের নারীদের আয়ের বিকাশের চরিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেক্ষেত্রে তাদের উন্নতি প্রায় হয়নি বললেই চলে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে আশির দশকে এই উন্নতি ছিল কার্যত যৎসামান্য। ১৯৮০, ১৯৮৪ ও ১৯৮৮ সালের কৃষি-বহির্ভূত অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের মজুরি ছিল নিম্নরূপ (পুরুষদের মজুরিকে ১০০ সংখ্যা ধরলে, তদনুপাতে নারীর মজুরি) ঃ

দেশের নাম	১৯৮০	১৯৮৪	১৯৮৮
অস্ট্রেলিয়া	৮৬.০	৮৫.৮	৮৭.৯
বেলজিয়াম	৬৯.৪	৭৪.৪	৭৫.১
সাইপ্রাস	৫৪.৩	৫৭.৯	৫৯.১
চেকোশ্লোভাকিয়া	৬৮.৪	৬৮.৪	৭০.১
ডেনমার্ক	৮৪.৫	৮৪.৪	৮২.১

দেশের নাম	১৯৮০	১৯৮৪	১৯৮৮
ফ্রান্স	৭৯.২	৮০.৭	৮১.৮
পশ্চিম জার্মানি	৭২.৪	৭২.৩	৭৩.৬
আইসল্যাণ্ড	৮৫.৫	৯৪.১	৯০.৬
লুক্সেমবার্গ	৬৪.৭	৬৪.৯	৬৩.১
নেদারল্যাণ্ডস	৭৭.৯	৭৭.০	৭৬.৭
নিউজিল্যাণ্ড	৭৭.২	৭৮.৪	৮০.৪
সুইজারল্যাণ্ড	৬৭.৬	৬৭.২	৬৭.৪
ইংলণ্ড	৬৯.৭	৬৯.৫	—

আরও পরবর্তীকালের তথ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে নারী-পরিস্থিতির তেমন কোন বড় পরিবর্তন, শ্রমজীবীদের জীবনে ঘটেনি। কয়েকটি অনুরূপ দেশের উদাহরণ দেখা যাক। ইংলণ্ডে নারীদের সাপ্তাহিক উপার্জন ১৯৮৭ ও ১৯৯০ সালে ছিল যথাক্রমে ৭৩.৪% ও ৭৬.৬%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৯ ও ১৯৮৮ সালে ছিল যথাক্রমে ৬০% ও ৬৫%। জাপানে ১৯৭৫ সালে ৫৮.৯% থেকে কমে ১৯৮০ সালে ৫৫.৩% এবং ১৯৮৭ সালে ৫৭.৬% দাঁড়িয়েছিল।

পূর্ব ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও অনুরূপ চিহ্ন দেখা গেছে। যেমন চেকোশ্লোভাকিয়াতে ১৯৮৪ সালে ৬৮.৯% এবং ১৯৮৮ সাাল ৭০.৯%। তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ভাল ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও, নারীদের মজুরি সর্বত্র ব্যাপকভাবে কম ছিল।

১৯৯৩-'৯৪ সালে নারী শ্রমজীবীদের বিষয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশনে'র সংগৃহীত তথ্য থেকে নির্ধারকভাবে বোঝা যায় যে পৃথিবীর সর্বত্র নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম মজুরি পেয়ে থাকে। আর্থনীতিক পরিসংখ্যানে নারীদের অবদান প্রায় সর্বত্রই 'আণ্ডার-রিপোর্টেড' বা নিম্ন-তথ্য প্রদানমূলক। নারী শ্রমজীবীদের শ্রমের নিম্ন-তথ্য প্রদানের কারণ হিসাবে আই. এল. ও. চারটি উপাদানকে চিহ্নিত করেছে। আই. এল. ও. যেহেতু ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরিত্রকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে না, স্বভাবতই বাহ্যিক প্রকরণকেই কার্যত কারণ বলা হয়েছে সেটির রিপোর্টে। তার মতে সেগুলি হলো ঃ অলিখিতভাবে পুরুষ ও নারীর মজুরির মধ্যে স্থায়ীভাবে পার্থক্য জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা; স্থায়ী চরিত্রের নিয়োগে নারীদের সুযোগ কম থাকা; নারীদের জন্য কর্মের ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ও ব্যবস্থা; এবং 'ঘোস্ট ওয়ার্ক' বা ভুতুড়ে চরিত্রের কর্মের ব্যাপ্তি (অর্থাৎ দৃশ্যমান নয়, এমন বিনা মজুরির শ্রম অথচ যা অর্থনৈতিক দিক থেকে গৃহস্থালি, কৃষি ও অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে একান্ত জরুরি)। আই. এল. ও. আরও মনে করে যে, বিগত ৪০ বছরে নারীদের মজুরির এই পরিস্থিতি অনুসরণ করে বলা যায় যে নারীদের জন্য বহু আন্তর্জাতিক আলোচনা ও ব্যবস্থা গৃহীত হলেও অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থা পরিবর্তনের তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। সারা বিশ্বে নারীরা পুরুষদের তুলনায় গড়ে ৫০-৮০% মজুরি কম পায়। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উন্নত দেশে নারীদের মজুরি পুরুষের অর্ধেক। পশ্চিমী উন্নত দেশগুলিতে এই পার্থক্য ৩০ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশের সামান্য কম।

আর উল্লেখ্য যেসব ক্ষেত্রগুলিকে 'ফেমিনিন' বা নারীমূলক বলে কার্যত চিহ্নিত করা হচ্ছে সেগুলিতে মজুরির পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে না এবং কম মজুরি সেইসব ক্ষেত্রে অব্যাহত। 'নিউলি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজিং কান্ট্রি'গুলি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে প্রধানত শ্রম-নিবিড়, রপ্তানি-নির্ভর ও প্রধানত নারী শ্রমিক নিয়োজিত উৎপাদনমূলক বা অ্যাসেম্বলি করার পদ্ধতিসম্পন্ন শিল্প-ব্যবস্থার দ্বারা। এরা মুনাফা করছে প্রধানত স্বল্প-মজুরির শ্রম ব্যবহার করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে এইরকম এশীয় দেশগুলির মধ্যে ১৯৯৩ সালে সিঙ্গাপুরের শ্রমিকারা পুরুষদের (মজুরি ১০০ ধরলে) তুলনায় ৫৭.১%

ও দক্ষিণ কোরিয়াতে ৫২.২% মজুরি পেতো। ১৯৯৩ সালে নারীদের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কাতে মজুরি ছিল ৮৯.৯% ও হংকং-এ ৭১.৬%। ইকনমিক কমিশন যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তাতে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানে নারীদের মজুরি ছিল যথাক্রমে পুরুষের মজুরির ৪৪% ও ৭৭%।

এই মজুরি বৈষম্য সৃষ্টির পেছনে আরও নানাবিধ কারণ রয়েছে। যেসব কাজ নারীরা করে সেগুলির নিম্ন-মূল্য স্থির করা হয়। আয়ের বৈষম্য ঘটে যায় নারীদের গৃহস্থালি, প্রেস ওয়ার্ক, কৃষি, মজুরি-ভিত্তিক কাজ ও অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের কাজে। পুরুষরা স্থায়ী কাজে থাকায় চাকুরীর জ্যেষ্ঠতার জন্য মজুরি বৃদ্ধি, প্রমোশন প্রভৃতি হয় এবং তাতে মোট মজুরি ধারাবাহিকভাবে বাড়ে। অন্যদিকে মেয়েরা পার্ট-টাইম ও অস্থায়ী কাজ করার জন্য সারাজীবনে কম মজুরি পায়, পুরুষদের পূর্বোক্ত সুযোগগুলি পায় না। তাছাড়া মেয়েরা গার্হস্থ্য শ্রমে আবশ্যিকভাবে যুক্ত থাকার জন্য এবং সরকারী শ্রম আইনে যেসব কাজে নারী নিয়োগ করা যায় না যেমন—খনি গর্ভের কাজে, রাতের শিফ্টের কাজে, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম ইত্যাদি, তার সুযোগ নিয়ে মেয়েদের নিম্ন-মজুরির কাজে নিয়োগ করা হয়।

ডিসক্রিমিনেশন টু সেগ্রিগেশন ঃ বঞ্চনা থেকে বিচ্ছিন্নকরণ

পুঁজিবাদী শ্রম-প্রক্রিয়াতে ক্রমান্বয়ে লিঙ্গ-ভিত্তিক (জেণ্ডার-বেসড) শ্রমের বিভাজনের (ডিভিশন অব লেবার) ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়া পরিণামে মজুরি-ব্যবস্থায় বিভাজন ঘটিয়ে নারী শ্রমিকদের মজুরি পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় নিম্ন এবং নারীদের জন্য কম মজুরির ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেওয়ার স্থায়ী উপাদানে পরিণত হচ্ছে। এই পদ্ধতি পুঁজিবাদকে দিয়েছে শ্রম-শক্তিকে বৃহত্তর শোষণের সুযোগ, আর নারীর শ্রম-জীবনে সৃষ্টি করেছে ডিসক্রিমিনেশন বা বঞ্চনা। ক্রমে এই 'জেণ্ডার ডিভিশন অব লেবার' বা শ্রমের লিঙ্গ-ভিত্তিক বিভাজন আরও পরিণত রূপ পাচ্ছে। শ্রমের ক্ষেত্রে বিশেষ চরিত্র অনুযায়ী নারীদের নিয়োগ করে ডিসক্রিমিনেশন বা বঞ্চনা এখন নারীদের 'সেগ্রিগেশন' বা বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়ার পথ নিয়েছে। মেয়েদের এখন প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে সেক্রেটারিয়াল ওয়ার্ক, সেলস্, গৃহস্থালি, পরিষেবা ইত্যাদিতে; অন্যদিকে পুরুষদের ট্রান্সপোর্ট ও ইণ্ডাস্ট্রিতে। মেয়েদের নিয়োগ করা হচ্ছে শিক্ষাদান, কেয়ার-সার্ভিস বা যত্ন বা অভ্যর্থনা-পরিষেবা ও কৃষি-উৎপাদনে। অন্যদিকে পুরুষদের নিয়োগ করা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রশাসন এবং পলিসি বা নীতি-নির্ধারণমূলক ক্ষেত্রগুলিতে। আরও গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই সেগ্রিগেশনের তাৎপর্য আরও অনেক গূঢ়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নারীদের নিয়োগ করা হচ্ছে প্রধানত পূর্ব-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাতে, অন্যদিকে পুরুষদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নির্ধারক ক্ষেত্রগুলি পুরুষদের জন্য বেছে রেখে দিয়ে, উপাঙ্গ ক্ষেত্রগুলি রাখা হচ্ছে নারীদের নিয়োগের জন্য।

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানে অর্থনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় নারীদের ৭১ শতাংশ কাজ করে পরিষেবা ক্ষেত্রে। উন্নত দেশগুলিতে এই হার ৬০ ভাগ। এশিয়া ও আফ্রিকাতে নারীদের অধিকাংশই নিয়োজিত কৃষি-ক্ষেত্রে; ৮০ শতাংশ উপ-সাহারীয় অঞ্চলে ও কমপক্ষে ৫০ ভাগ এশিয়াতে।

সারা পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কর্ম-জগতে নারীরা ১০-২০ ভাগ মাত্র নিযুক্ত। পুরুষ-অধ্যুষিত কোন ক্ষেত্রে নারীরা যদি নিযুক্তও হয়, তথাপি দেখা যায় যে, বহু ক্ষেত্রে তাদের মজুরি পুরুষদের তুলনায় কম। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে কানাডায় নারীরা যেখানে পুরুষ-অধ্যুষিত কর্মক্ষেত্র যথা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ম্যানেজমেন্ট, ইঞ্জিনীয়ারিং, ফিজিক্যাল সায়েন্স, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, আইন ও চিকিৎসা ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে চাকুরী করা শুরু করেছে এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের নারীদের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশী উপার্জন করছে তারাও সংশ্লিষ্ট পুরুষ কর্মরতদের তুলনায় ১৫-২০% কম মজুরি পায় (আই. এল. ও. রিপোর্ট)।

বিগত বিশ বছরের বেশী সময় ধরে শ্রম-শক্তির লিঙ্গগত অসাম্য প্রসঙ্গে 'সেগ্রিগেশন' বা বিচ্ছিন্নকরণ ও বিপরীতদিকে 'কনসেনট্রেশন' বা ঘনবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চলছে। বৃত্তিগত কনসেনট্রেশন ও সেগ্রিগেশন-এর স্তর সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন ও কিভাবে এই ধরনের পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেছে,

সেগুলি যথার্থভাবে বুঝতে পারাই হলো নিয়োগের কাঠামো ও গতিতে লিঙ্গের উপস্থিতি অনুধাবনের প্রথম শর্ত।

'সেগ্রিগেশন' ও 'কনসেনট্রেশন' প্রসঙ্গে ব্যাপক তাত্ত্বিক আলোচনা সংঘটিত হয়েছে। 'সেগ্রিগেশন' বলতে বলা হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী শ্রমিকের অনুপাত। যে ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিক বেশী, সেখানে নারী শ্রমিকরা 'সেগ্রিগেটেড' বলে ধরা হয়। আবার বিপরীতটি ঘটলে পুরুষদের 'সেগ্রিগেটেড' ধরা হচ্ছে। অন্যদিকে কনসেনট্রেশন বলতে ধরা হয় কোন ক্ষেত্রে নিয়োজিতদের লিঙ্গ-ভিত্তিক গরিষ্ঠ অংশকে। কিন্তু প্রসঙ্গটি নিছক সংখ্যাগত কম-বেশির ব্যাপার নয়, নয় নিছক তাত্ত্বিক ও পরিসংখ্যানগত তর্ক-বিতর্কের বিষয়। পুঁজিবাদী আধুনিক ব্যবস্থার গভীর প্রতিফলন রয়েছে এটির অভ্যন্তরে। এইসব উপাদান নির্ধারকভাবে নতুন ধরনের শ্রম-প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে উঠেছে। ফলে শ্রমজীবীদের সমাজ, মনস্তত্ত্ব, সংগঠন, আন্দোলন, দাবী-দাওয়া ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের উপর এর প্রভাব ক্রমশ হয়ে উঠছে বর্ধমান।

নারীদের 'আনপেইড ওয়ার্ক' বা মজুরিহীন শ্রম

নারীদের ক্ষেত্রে 'ডিসক্রিমিনেশন' বা বৈষম্য এবং 'সেগ্রিগেশন' বা বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে তাদের 'আনপেইড' বা বিনা-মজুরির কাজ, যেখানে তারা সর্বাধিক সেগ্রিগেটেড, সেটিকে অনুধাবন করতে হবে। সমাজ-বিকাশের সাথে সাথে পুরুষ-শ্রমের সাথে নারী-শ্রমের যে বৈপরীত্য ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়, তা' হলো পুরুষ-শ্রম প্রকাশ্য ও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শাখাতে প্রসারিত ও ব্যাপকতা পায়, অন্যদিকে নারী-শ্রম ধীরে ধীরে প্রধানত পারিবারিক শ্রম ও অংশত পারিবারিক কৃষি-শ্রমের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হতে থাকে। তাছাড়া অপর দিকটি হলো পুরুষ-শ্রম ক্রমশ বেশি বেশি করে উপার্জনমূলক শ্রম হয়েছে, নারী-শ্রম পরিণত হয়েছে বিনা-মজুরি বা অনুপার্জনমূলক শ্রমে। সারা বিশ্বে যখন প্রকাশ্য শ্রমের বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে, তখন মজুরিহীন শ্রম অন্তর্হিত হওয়ার পরিবর্তে বাড়ছে। ক্ষেত্রের রূপান্তর ঘটছে মাত্র।

বর্তমান 'ইনফরমাল ইকনমি' বা অ-আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির অন্তর্গত হয়েছ 'হিডেন' অথবা 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড ইকনমি' বা গুপ্ত অর্থনীতি একদিকে এবং 'হাউসহোল্ড ইকনমি' বা গৃহস্থালি অর্থনীতি আর একদিকে। ইনফরমাল ইকনমির প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের চেয়ে বেশি। এই ধরনের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিনা পারিশ্রমিকে কাজ। অন্যভাবে বলা যায় যে নারীরা কাজ করে বলেই সম্ভবত এগুলি 'হিডেন ওয়ার্ক'। নারীদের প্রতি বঞ্চনা ও বৈষম্যের এবং বিচ্ছিন্নকরণের ব্যাখ্যা স্বয়ং এই ব্যবস্থা। গুপ্ত চরিত্রের ফলে শ্রম-পরিসংখ্যানে ও জাতীয় স্তরের উৎপাদন ও মূল্য প্রসঙ্গের হিসাবে এই চরিত্রের কাজ কখনো অন্তর্গত হয় না। অথচ যদি নিজ পরিবারের জীবনধারণের জন্য কৃষি-কর্ম, পারিবারিক বা গৃহস্থালি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্রশিল্প, হস্তশিল্প বা ছোট-খাটো উৎপাদন ও গৃহস্থালি কাজে নারীদের শ্রমের মূল্য হিসাব করা হতো, তাহলে তাদের অর্থনৈতিক তৎপরতার মূল্য আরও বৃদ্ধি পেতো ১০-২০ গুণ। গৃহস্থালির শ্রমের ফলে উৎপন্ন সম্পদকে যদি 'গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট' (জি. ডি. পি.) বা গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হিসাবে যুক্ত করা হতো, তাহলে বিশ্বের জি. ডি. পি. বৃদ্ধির পরিমাণ প্রদর্শিত হতো, প্রদত্ত পরিমাণের চেয়ে ২৫-৩০ শতাংশ বেশি। নারীদের জন্য প্রধানত নির্ধারিত এই অদৃশ্য শ্রম অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ-শ্রমের পরিপূরক। অথচ এই শ্রম আর্থিক পুরস্কার-হীন। নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য, বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতার বৃহত্তম, অথচ দৃশ্যমান নয়, ক্ষেত্র এটি। পুঁজিবাদী শোষণ এবং মুনাফা গোপন রাখার অন্যতম প্রধান পদ্ধতিও হলো এই ব্যবস্থা।

এই বিনা-মজুরির শ্রমকে হিসাবে ধরলে পুরুষের চেয়ে নারীর শ্রমের পরিমাণ বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই বেশি। ১৯৯৪ সালে, অনুরূপ শ্রমের ফলে জাপানে নারীরা সপ্তাহে পুরুষের চেয়ে দু' ঘন্টা বেশি কাজ করতো, পশ্চিম ইউরোপে তা' ৫-৬ ঘন্টা বেশি। কেবলমাত্র উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে পুরুষ ও নারী শ্রম-সময়ের পরিমাণ সমান সমান। পূর্ব ইউরোপে এই পার্থক্য কমেছে, তথাপি নারী

শ্রমের পরিমাণ এখনও যথেষ্ট বেশি। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত লাতিন আমেরিকাতে নারীরা পুরুষদের চেয়ে সপ্তাহে ৩ ঘন্টা কম কাজ করতো, কিন্তু এখন তারা কাজ করে ৭ ঘন্টা বেশি। সর্বাধিক পার্থক্য এশিয়া ও আফ্রিকাতে। এই দুই মহাদেশে নারীরা পুরুষের চেয়ে সপ্তাহে ১২ থেকে ১৩ ঘন্টা বেশি কাজ করে। বহু অনুন্নত দেশে নারীরা এখন সপ্তাহে ৬০ থেকে ৯০ ঘন্টা পর্যন্ত বিনা-মজুরির শ্রম দেয়। এই শ্রম দিতে তারা বাধ্য হয় নিছক ১০ বছর আগের জীবনযাত্রার মানকে রক্ষা করার জন্য।

নারী শ্রমজীবীদের নিম্ন অবস্থানের জন্য নানা ধরনের যুক্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে। অথচ শারীরিক দিক থেকে পুরুষদের তুলনায় নারীরা দুর্বল বলে চিহ্নিত করার যুক্তিও অসার, কেননা এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের গৃহ নির্মাণ, সড়ক তৈরি, খনির কাজে চিরকালই বিপুল সংখ্যক শ্রমিকারা নিযুক্ত। মানসিক গঠনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রভেদের আর এক অক্ষম যুক্তিও দেওয়া হয়ে থাকে। নারীরা নাকি যে কোন ধরনের ঝুঁকি ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজ গ্রহণে অক্ষম। অথচ অনুন্নত দেশগুলিতেও নারীরা যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ অজস্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাফল্যের সাথে সম্পাদন করছে। খোদ আমেরিকাতে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির উচ্চতম পদগুলিতে বেশি কিছু নারী রয়েছে। নারীদের প্রকৃত সমস্যা অবশ্য তাদের "পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা"। এটি কেবল সন্তানের জন্মদান সংক্রান্ত প্রসঙ্গ মাত্র নয়, যদিও এই কারণের জন্য নারীকে মাত্র কয়েক মাস ব্যয় করতে হয়। তার চেয়েও বড় সমস্যা হলো গার্হস্থ্য পুনরুৎপাদনে নারীর অব্যাহত ও প্রধান ভূমিকা। গৃহস্থালি কাজ, পরিবারের খাদ্য প্রস্তুত করা, সন্তানদের মানুষ করা প্রভৃতি দায়িত্ব ও কাজই প্রকাশ্য শ্রম থেকে নারীদের দূরে থাকতে প্রধানত বাধ্য করে। অথচ কার্যকালে 'দ্বৈত বোঝা' তাদের বহন করতে হয়—গৃহস্থালি শ্রম ও প্রকাশ্য সামাজিক শ্রম।

গৃহস্থালি শ্রম অন্য শ্রমের মতো নয়। অন্য সমস্ত শ্রমে মানুষ শ্রমদায়ীর কাজ করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের জন্য। অন্যদিকে গৃহস্থালি শ্রম পরিষেবামূলক। নারী শ্রম দেয় পরিবারের অন্য সকলের জন্য। গৃহস্থালি শ্রমের এই চরিত্রই লিঙ্গগত বিভাজন ও পুরুষ-নারীর ক্ষমতা-সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু। আর এই গার্হস্থ্য পরিষেবার বঞ্চনার চরিত্রকে গোপন রাখতে সমাজে যুগে যুগে নানা তত্ত্ব ও যুক্তি দিয়ে আদর্শায়িত করা হয়েছে—'শান্তির নীড়', 'নারীর কোমলতা', 'সন্তান জন্মদানের গৌরব', 'নারীর শুচিতা রক্ষা' ইত্যাদি কথায়।

গৃহস্থালি কর্ম কোন ফলদায়ী শ্রম নয়—এই তত্ত্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল। যুক্তি হিসাবে বলা হতো যে প্রকাশ্য শ্রমের মতো গৃহস্থালি শ্রমের নির্দিষ্ট ও ধরা-বাঁধা কোন সময় নেই, শ্রম দেওয়ার ব্যাপারে কোন কর্তৃপক্ষ বা পরিদর্শক নেই, শ্রম থেকে পরিবারের কোন উপার্জন হয় না, কেবল পারিবারিক দায়িত্ব পালিত হয় মাত্র প্রভৃতি। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে নারীকে গৃহস্থালি শ্রম দিতে হয়, বিশেষত দরিদ্র পরিবারের, তার পরিবেশ কারখানার চেয়েও কোন অংশে ভাল নয়। স্যাঁতস্যাঁতে আবাস, সামান্য কিছু গৃহস্থালি সরঞ্জাম, অথচ বাধ্যতামূলকভাবে সময়মত ও সঠিকভাবে পরিবারের খাওয়ার ব্যবস্থা, সন্তানদের শিক্ষা-চিকিৎসা, নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও ভূমিকা নিয়ে পরিবারের ব্যয়-নির্বাহ এবং প্রতিদিনের রুটিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্রম দেওয়া থেকে নারীর কোন রেহাই নেই। এই কাজের জন্য কোন ছুটি নেই, অসুস্থ হলে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব-ভিত্তিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, ভাল কাজ বা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে কোন পদোন্নতি বা পুরস্কার নেই। কেবলমাত্র প্রেম, ভালবাসা, মমত্ব প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত পারিবারিক মানসিক ঐক্য এবং অর্থনৈতিক বন্ধনের জন্য এই কাজ নারীকে করতে হয়। এই অবস্থাকে কখনো ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বলে যে, কারখানা বা অফিসের কর্মজীবীর তুলনায় গৃহস্থালি কর্মে নারীর স্বাধিকার অধিক। অথচ পুঁজিবাদী পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে নারীদের কোন স্বাধিকার নেই। নারীর মজুরিহীন শ্রমকে এইভাবে চিরকালই গৌরবান্বিত করে শোষণ অব্যাহত রাখা হয়েছে। আদিকাল থেকে এখনও পর্যন্ত নারীদের সেগ্রিগেশনের অব্যাহত প্রধান ক্ষেত্র গৃহস্থালি শ্রম।

গৃহস্থালি কর্মের ওপর সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে আশির দশকের মধ্যে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। সেগুলির মধ্যে বিশেষত উল্লেখযোগ্য এ. ওয়াকলে'র 'হাউস ওয়ার্ক' (১৯৭৪) ও 'হাউসওয়াইফ' (১৯৭৬), এস. ইয়েগুলে-র 'উইমেনস ওয়ার্কিং লাইভস' (১৯৮৪), এস. শার্প-এর 'ডাবল আইডেনটিটি' (১৯৮৪), সি. ডেলফি'র 'ক্লোজ টু হোম' (১৯৮৪), এম মেনার্ড-এর 'হাউস ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড দেয়ার ওয়ার্ক' (১৯৮৫), ই. ম্যালোস-এর 'দা পলিটিকস অব হাউস ওয়ার্ক' (১৯৮০) প্রভৃতি। এইসব আলোচনা 'ডোমেস্টিক লেবার-ডিবেট' বা 'গৃহস্থালি শ্রম-বিতর্ক' নামে পরিচিত হয়েছিল। তবে সুদূর অতীত থেকে এই জাতীয় বিতর্কে দু'টি ধারা সক্রিয়। মার্কস তাঁর আলোচনাতে গৃহস্থালি শ্রম, নারীদের দ্বিবিধ শ্রম ও তাদের ওপর দ্বিবিধ শোষণ সম্পর্কে গভীর মন্তব্য করেছিলেন। স্বভাবতই মার্কসবাদীরা প্রসঙ্গটি নিয়ে প্রথমাবধি প্রচার ও আন্দোলন চালিয়ে আসছে। অন্যদিকে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বুর্জোয়া ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট বা নারীবাদী আন্দোলনও বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হয়। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মার্কসবাদীরা গৃহস্থালি শ্রমের চরিত্র ও ফলাফলকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম প্রতিফলন বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে নারীবাদী আন্দোলন একে প্যাট্রিয়ার্কাল সমাজের তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষদের পক্ষ থেকে নারীদের হীন করে রাখার অন্যতম ব্যবস্থা বলেছে।

'কমিউনিটি ওয়ার্ক' বা সামাজিক কাজ নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই বিনা-পারিশ্রমিকের। অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে তা' সাধারণভাবে পারিশ্রমিক-যুক্ত। তবে কমিউনিটি ওয়ার্কের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা-শ্রমের পরিসর ধীরে ধীরে অধিকাংশ দেশে কমে আসছে। এগুলি ইনফরমাল সেক্টর ইকনমির বা অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের অর্থনীতির অন্তর্গত হয়ে স-মজুরি চরিত্র নিচ্ছে। কিন্তু এটা যখন ঘটছে তখন এই ক্ষেত্রে নারীদের প্রাধান্য কমে যাচ্ছে। কমিউনিটি ওয়ার্ক বলতে পরিবারের উৎপাদিত তরিতরকারী দিয়ে অন্যকে সাহায্য করা, অন্য পরিবারের অনুষ্ঠানে রান্না ইত্যাদি করে দেওয়া, এলাকার উন্নয়নে যৌথ শ্রম, গোষ্ঠীর মানুষের অসুস্থতায় সেবা-শুশ্রূষা, অন্য পরিবারের মানুষের অনুপস্থিতিকালে বাড়ীঘর রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের দেখাশোনা করা, অন্যের সন্তানদের মাঝে মাঝে পড়াশোনা দেখিয়ে দেওয়া বা প্রশিক্ষণ দেওয়া, বিনোদনমূলক কাজ—যেমন নাচ, গান, নাটক, বাজনা প্রভৃতি শেখানো, পাড়ার ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া বা বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, অন্যের জামা-কাপড় সেলাই করে দেওয়া প্রভৃতি ধরনের কাজকে বোঝানো হতো। নারীদের ক্ষেত্রে এগুলি আনপেইড বা বিনা-মজুরির শ্রম হলেও, এগুলির সামাজিক ও মানসিক মূল্য ও গুরুত্ব ছিল। একদিকে এই শ্রমের দ্বারা সমাজের সহায়তা হতো, অন্যদিকে নারীদের একঘেয়ে গৃহস্থালি শ্রমের মধ্যে এগুলি ছিল এক ধরনের 'লিজার' বা মানসিক বিশ্রামের ও বিনোদনের উপাদান। এই জাতীয় কাজ অন্তর্হিত হচ্ছে।

সমস্ত গৃহস্থালি ও কমিউনিটি ভলান্টারি তথা স্বেচ্ছা-শ্রমকে আধুনিক পুঁজিবাদ পরিণত করছে প্রকাশ্য, সামাজিক ও স-মজুরি শ্রমে। গৃহস্থালি শ্রম রূপান্তরিত হচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বা সার্ভিস লেবারে। স্বভাবতই সেগুলি পুঁজির অধীন হয়ে পড়ছে। উন্নত-অনুন্নত দুনিয়া নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের আবাস নির্মাণের বা সংস্কারের বা পরিদর্শনের কাজের এক বড় অংশই ছিল গৃহস্থালি শ্রম। অর্থাৎ পরিবারের পুরুষ-নারী নির্বিশেষে নির্মাণ বা সংস্কারে অবৈতনিক শ্রম দিতো। এখন সর্বত্র এক ধরনের শিল্পে পরিণত হয়েছে 'রিয়েল এস্টেট' ব্যবসা। জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, বাড়ির আসবাবপত্র, ঘর সাজানোর সরঞ্জাম ইত্যাদি ধীরে ধীরে তাদের কর্তৃত্বে চলে যাচ্ছে। ফলে বাতিল হচ্ছে এই জাতীয় কাজে গৃহস্থালি শ্রমের উপাদান। গৃহস্থালি শ্রমের অন্যতম প্রধান ছিল রান্নার কাজ। কয়লা, কাঠ, কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালানির ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দিতে এখন ব্যাপক হয়েছে গ্যাসোলিন বা বিদ্যুতের ব্যবহার। নানা ধরনের ওভেন, ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার ব্যবস্থা সম্বলিত কুকিং রেঞ্জ ব্যবস্থা এখন রান্নার নানা পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করে দিচ্ছে। তাছাড়া অধিকাংশ খাদ্যই এখন বাজারে প্রস্তুত অবস্থায় ক্রয় করা যায়। কুকড, হাফ-কুকড খাদ্যসামগ্রী, রেডিমেড মশলা প্রভৃতি ছাড়াও, প্রস্তুত করা খাদ্য বাড়িতে দৈনন্দিন সরবরাহ,

কর্মস্থলে খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতির ফলে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে গৃহস্থালি রান্নার শ্রমের গুরুত্ব ও সময়। পারিবারিক অনুষ্ঠানে ক্যাটারার প্রথা বা হোটেলে ব্যবস্থাপনা লঘু করে ফেলছে পূর্বের অনুরূপ কাজের ভূমিকা। জামা-কাপড় ধোয়ার দৈনন্দিন কাজে উন্নত বিভিন্ন ধরনের ডিটারজেন্ট পাউডার ছাড়াও ওয়াশিং মেসিনের প্রচলন বাড়ছে। সিনথেটিক জামা-কাপড় ব্যবহারের ফলে লুপ্ত হতে চলেছে ইস্ত্রি করার প্রয়োজনীয়তা। বাসন মাজার কাজে ইউজ অ্যাণ্ড থ্রো চরিত্রের থালা, বাটি, গ্লাস ইত্যাদির ব্যবহার ছাড়াও যান্ত্রিক শ্রম-ব্যবস্থার ডিস-ওয়াশার পরিবারে প্রবেশ করছে। বাড়ি-ঘর ঝাড় দেওয়া, মোছা, ঝুল ঝাড়া, জানলা-দরজার রং করা, পশমের বস্ত্র ও লেপ, কম্বল, তোষক, গদি, পাপোষ প্রভৃতি পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ও স্প্রেয়ার। বাড়ির শিশু ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিনের এক উল্লেখযোগ্য সময় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রেস বা শিশু-লালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন স্কুল প্রভৃতির ব্যবস্থা বেড়ে চলেছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে বাড়িতে না রেখে আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠানো অথবা বাড়িতে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অডিও-ভিডিও কোচিং চালু হচ্ছে। শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া ও আসার পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে বিদ্যালয়ের সরবরাহকৃত পরিবহন বা ভাড়া করা দলবদ্ধ পরিবহন। পরিবারের বয়স্কদের দায়ভার কমাতে চালু হয়েছে 'ওল্ড এজ হোম'। বাড়ির অসুস্থ ও বয়স্কদের শুশ্রূষা বা দেখা-শোনার জন্য দিন-মজুরিতে আয়া প্রথা ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। পারিবারিক বিনোদনের জন্য শ্রম দিয়ে টিকিট কাটা ও যাতায়াত করে সিনেমা, থিয়েটার, অপেরা, যাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি দেখার পরিবর্তে গৃহের অভ্যন্তরে টেলিভিশন, ভিডিও প্রভৃতি সেই বিনোদন সরবরাহ করছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শ্রম-ভিত্তিক যোগাযোগের এক বিপুল অংশ কমিয়ে দিয়েছে টেলিফোন ও অনুরূপ আধুনিক যন্ত্র-সামগ্রী। বাড়িতে সেলাই করে পোষাক-পরিচ্ছদ বানানো প্রায় সর্বাংশে বন্ধ হয়ে গেছে—প্রস্তুত পরিচ্ছদ সহজলভ্য ও সুলভ হওয়ার ফলে। জল গরম করার জন্য এসেছে ইলেকট্রিক হীটার বা গীজার। বাড়িতে সন্তান প্রসবের পূর্বতন ব্যবস্থা এখন সর্বাংশেই বিলুপ্ত হওয়ার মুখে। হাসপাতাল, নার্সিং হোম প্রভৃতি এখন সর্বজনীনভাবে ব্যবহৃত প্রসবাগার। ব্যক্তিগত বা সপরিবারে ভ্রমণের জন্য উদ্বেগ ও শ্রম প্রায় সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে ট্যুরিস্ট বা ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবস্থার দ্বারা। এইভাবে বলা যায় যে গৃহস্থালি শ্রমের প্রায় প্রত্যেকটি অংশ ক্রমান্বয়ে পুঁজির অধীনে চলে যাচ্ছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে গৃহস্থালি জীবনযাত্রার বিবর্তন এখন অবিশ্বাস্য মাত্রা পেয়েছে।

এর ফলাফলে ব্যাপক নেতিবাচক দিকও রয়েছে। এগুলির দ্বারা প্রধানত আক্রান্ত হচ্ছে যেহেতু নারী সমাজ স্বভাবতই তারা গৃহস্থালি শ্রমেও ক্রমশ বেকার হয়ে পড়ছে। কেননা গৃহস্থালি শ্রম অপসৃত হলেও, তার বিনিময়ে প্রকাশ্য শ্রমের বাজারে তাদের সংস্থান হচ্ছে খুবই কম। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে 'জবলেস গ্রোথ'-এর প্রতিফলন এইভাবে পড়েছে নারীদের জীবনে। এইভাবে একটি কর্মক্ষম শ্রম-শক্তির ক্ষেত্র থেকে সমাজ ক্রমশ বঞ্চিত হওয়া শুরু করেছে। অন্যদিকে এইসব ব্যবস্থা, অন্যান্য কারণের পাশাপাশি, পারিবারিক বন্ধনকেও শিথিল করে দিচ্ছে;নারী-পুরুষের সম্পর্ক, পরিবার, পারিবারিক মূল্যবোধ প্রভৃতি ক্ষয়ের সূচনা করে সমাজে এক বৃহত্তর ভাঙ্গন ও নৈরাজ্যের আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠেছে।

স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট তথা নতুন পুঁজিবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব প্রভৃতির ফলাফল গৃহস্থালি শ্রমের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক চরিত্র গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে দরিদ্র দুনিয়ার কিছু বাস্তবতা উল্লেখ করা যাক। গার্হস্থ্য শ্রম দিয়ে যা সম্পন্ন করা যেতো, তা' এখন ক্রমশ ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ। ফলে যখন পারিবারিক মালিকানার কৃষিতে ফসলের বিপর্যয় ঘটে বা পরিবারের উপার্জনশীলের আকস্মিক বেকারী সৃষ্টি হয় অথবা পরিবারের কারো রোগ বা ভগ্ন-স্বাস্থ্য হয় কিংবা বয়সের জন্য কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় তখন অর্থনৈতিক ঝুঁকি অতীতের তুলনায় ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্বভাবতই পরিবারের মানুষদের (নারীরা সহ) এখন প্রকাশ্য শ্রমের যুক্ত হওয়ার সময়, হিসাব রাখতে হচ্ছে যে কোন সময় এই ধরনের ঝুঁকি সামলাবার প্রস্তুতি। এই ঝুঁকি সামলানোর জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বিত হচ্ছে সেগুলির অন্যতম হলো শ্রম দেবার অধিকাংশ সময়কে উপার্জনশীল শ্রমে পরিণত করার চেষ্টা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা, বিবাহ করার ব্যাপারে সতর্কতা এবং বিলম্বে বিবাহ বা বিবাহ

না করা, অথবা কর্মরতা নারীকে বিবাহ করা, যথাসাধ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা, আত্মীয়-পরিজন বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিনিময়, ঋণ করা, সম্পত্তি বন্ধক রাখা ইত্যাদি। জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা নতুন মুখের জন্য ভবিষ্যৎ খাদ্য সংস্থানের আশঙ্কায় কেবল নয়; সন্তান জন্ম দেবার পর অপুষ্টি বা রোগের কারণে পরবর্তীকালে সন্তানের যদি মৃত্যু ঘটে, তাহলে সন্তানকে দিয়ে ভবিষ্যতে উপার্জনকারী শ্রম দেওয়ানোর পূর্ব-বিনিয়োগ ব্যর্থ হয়ে যাবে তার মৃত্যু-পূর্ব অহেতুক ভরণ-পোষণের ব্যয়ে, সেই আশঙ্কা থেকেও। এত মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমগ্র পরিস্থিতি। গৃহস্থালি শ্রমের সময় যথাসম্ভব ক্রমাগত কমিয়ে কত বেশী পরিমাণে প্রকাশ্য ও উপার্জনশীল শ্রম পরিবারের সমস্ত মানুষকে দিয়ে দেওয়ানো যায়, তার চেষ্টাতে বয়স-নির্বিশেষে নারী এমনকি বৃদ্ধা এবং শিশুদের শ্রমের বাজারে পাঠানো হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজন হলে দেশান্তরিত হতেও পরিবারগুলি পিছুপা হচ্ছে না। স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম যেসব দেশ গ্রহণ করেছে কেবল সেইসব দেশগুলিই নয়, দেখা যাচ্ছে, উন্নত দেশগুলির দরিদ্র পরিবারেও ভোগের পরিমাণ ও মান ক্রমশ কমে যাচ্ছে এসব কারণে।

ফ্রী ট্রেড জোন বা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের শ্রমিকারা

নতুন অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ব্যবস্থার অন্যতম কাঠামোগত অংশ হলো বিশ্বের ফ্রী ট্রেড জোন (এফ. টি. জেড.) বা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (ই. পি. জেড.) নামে নতুন ধরনের শিল্প-বসতির প্রতিষ্ঠা। এটি প্রধানত অনুন্নত বা নিউলি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজিং কান্ট্রি তথা শিল্পায়নরত নতুন দেশগুলির ব্যবস্থা যদিও অবশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে, বুর্জোয়া-অর্থনীতিবিদরা যাদের বলছেন 'সোস্যালিস্ট ট্রানজিশনাল ইকনমিকস' (এস. টি. ই.), যেমন চীন ও ভিয়েতনাম—তারাও এই ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রহণ করছে। বিশ্ব-অর্থনীতির (পুঁজিবাদী ও বিশেষত উন্নত অর্থনীতির) সাথে স্বীয় দেশের সংযুক্তি সাধন তথা রপ্তানিকে ব্যাপক ও ত্বরান্বিত করে উন্নয়ন ঘটানোর ইচ্ছা থেকে বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে থেকে ই. পি. জেড. ব্যবস্থার। সমুদ্রোপকূলে এইসব এলাকাগুলি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বিদেশের সাথে জলপথে সর্বাপেক্ষা কম খরচে বিপুল পরিমাণে পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য। কিন্তু সমুদ্র-বন্দর বা বন্দর-নগরগুলির সাথে এগুলির বিন্যাসে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সমুদ্র-বন্দরগুলি হলো মালপত্র ওঠানো-নামানো ও পশ্চাৎভূমিতে প্রেরণের, যোগাযোগ ও পরিবহণ, জাহাজ নির্মাণ বা মেরামতি ইত্যাদির ব্যবস্থার এবং এইসব প্রয়োজন-উপযোগী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এজেন্সি, পরিবহন, কমিউনিকেশন, প্রশাসন ও জাহাজের সাথে যুক্ত মানুষদের সংঘক্ষেত্র। অন্যদিকে ফ্রী ট্রেড জোনগুলি হলো স্বয়ং সমুদ্রোপকূলবর্তী রপ্তানি-নির্ভর পণ্য-উৎপাদনের কেন্দ্র প্রধানত। অর্থাৎ এক্সপোর্ট-ওরিয়েন্টেড ইণ্ডাস্ট্রি বা রপ্তানি-ধর্মী উৎপাদনের নগরী এগুলি। পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কোন কোন কাঁচামাল বিদেশ থেকে সরাসরি আমদানি করা হয় ই. পি. জেড. এলাকাতে এবং ই. পি. জেড.-এ উৎপাদিত সমগ্র পণ্য সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এইসব এলাকাগুলির ক্ষেত্রে একান্ত সংলগ্ন সমুদ্র বন্দরের সুযোগ থাকে অথবা অতি নিকটবর্তী কোন বন্দরের মাধ্যমে চলে এই আমদানি-রপ্তানি। এইসব এলাকাগুলিতে গড়ে উঠেছে আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও পরিবহন, শিল্প-এলাকার অভ্যন্তরে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের স্থায়ী আবাসন, নিজস্ব নগরী-প্রশাসন, বাণিজ্যিক প্রশাসনিক দপ্তর এবং নগর-বসতির অন্যান্য নাগরিক ব্যবস্থা।

বিগত ২০ বছর থেকে প্রধানত এইসব অঞ্চলগুলির পত্তন ঘটতে শুরু করেছে। সমগ্র বিচারে বলা চলে যে এই জাতীয় অঞ্চল ও শহরগুলি মানব-বসতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা নবীন এবং অভিনব চরিত্রের। এইসব এলাকার বসবাসকারীরা সাধারণভাবে এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যায় বহিরাগত। এলাকাগুলির ঐতিহ্যগত নিজস্ব কোন সংস্কৃতি নেই বা পূর্বে যা ছিল তা' লুপ্ত। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষদের আগমনে, উৎপাদনের মালিকানা দেশী ও বিদেশী মালিকদের দ্বারা গঠিত হওয়ায় এবং আমদানি-রপ্তানির ব্যবস্থার জন্য বিদেশের সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় এলাকাগুলি মিশ্র-সংস্কৃতির প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে মাত্র। প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত শ্রমিকশ্রেণীর পরিবর্তে এইসব এলাকার শ্রমবাহিনী প্রায় সদ্য-আগতদের নিয়ে গড়ে ওঠায় এখানকার শ্রম-সংস্কৃতির চরিত্রও নতুন। যেসব দেশে এইসব

অঞ্চলগুলি গড়ে উঠেছে সেইসব দেশে গড়ে ওঠা 'শ্রম-প্রক্রিয়া'র তুলনায় শিল্প-ব্যবস্থা, শ্রম-কাঠামো ইত্যাদি ভিন্ন ও নতুন। অন্য উৎপাদন-অঞ্চলগুলির তুলনায় এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের শ্রম-বিন্যাসের অন্যতম প্রধান আর একটি দিক হলো এই যে এখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শ্রমিকরাই হলো নারী এবং এদের বয়স সাধারণভাবে ১৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে এবং তারা অনূঢ়া, বিধবা বা বিবাহ-বিচ্ছিন্না, সর্বোপরি তাদের সামাজিক অস্তিত্ব এখানে নিঃসঙ্গ-প্রায়।

ফ্রী ট্রেড জোনগুলি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের মৃগয়াক্ষেত্র। এগুলিতে কার্যত এক নতুন ধরনের অর্থনীতি ও ব্যবস্থা এমনভাবে চালু করা হয়েছে, যা প্রধানত মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির উপনিবেশবাদী ভূমিকার একান্ত উপযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। বিদেশ থেকে কাঁচা মাল, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস ডিউটিতে সম্পূর্ণ ছাড়, ২০ বছর পর্যন্ত কর ছাড় এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা স্থাপনের খরচে সরকারী ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি হলো ই. পি. জেড. তথা বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার সাধারণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। কোন কোন দেশে নিয়ম করা হয়েছে যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশীদের সাথে যৌথ-উদ্যোগে যুক্ত না হলে দেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ই. পি. জেড.-এ পুঁজি বিনিয়োগ করতে দেওয়া হবে না।

এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলিকে কার্যত ট্রেড ইউনিয়ন বর্জিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ এইসব এলাকায় শ্রমিকরা নির্দয়ভাবে শোষিত এবং তাদের ন্যূনতম অধিকার ও সুযোগ মালিকদের দ্বারা পদদলিত। সারা পৃথিবীতে কয়েক শত ফ্রী ট্রেড জোন রয়েছে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা আনুমানিক আট কোটির বেশী, যার অধিকাংশই নারী। অধিকাংশ ফ্রী ট্রেড জোনই সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষিত। সেগুলির চারদিকে রয়েছে খাড়া প্রাচীর এবং তার উপরিভাগ কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। তাছাড়া আছে বিশেষ পুলিশ বাহিনী। যুদ্ধ-বন্দী শিবিরের সাথে অনেকটা বাহ্যিক সাদৃশ্য রয়েছে অঞ্চলগুলির। শ্রমের বাজারের নতুন ধরনের, শ্রমিকশ্রেণীর উপর নতুন ধরনের শোষণ ও শ্রমের লিঙ্গগত বিভাজনের জাজ্বল্যমান অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো ই. পি. জেড. ব্যবস্থা। ই. পি. জেডে.-এর মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রা অর্জন, বিদেশী মুদ্রা বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিপুলতর লাভের সুযোগ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার, মালিকশ্রেণী, বিশেষত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। অন্যদিকে ই. পি. জেড. এলাকার দরিদ্র শ্রমিক, তার মধ্যে নারীরা বিশেষত, কঠোরতর শ্রম ও শোষণের সম্মুখীন হয়।

এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলির নারীদের অবস্থা আরও কিছুটা বর্ণনা করার পূর্বে, অতীত ইতিহাস থেকে ই. পি. জেড. ব্যবস্থার জন্ম ও বিবর্তনের কিছুটা রসদ সংগ্রহ করা যেতে পারে। চল্লিশের দশকের শেষার্ধে পুয়ের্তোরিকোতে বর্তমান ফ্রী ট্রেড জোনের অনেকটা আদলের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য 'অপারেশন বুট-স্ট্র্যাপ' নামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে পুয়ের্তোরিকোর 'ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছিল যে সেখানে কর্পোরেট পুঁজি বিনিয়োগ করলে দারুণ মুনাফার সুযোগ রয়েছে; কেননা সেখানকার শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা অতি উচ্চ, মজুরি অনেক কম এবং সরকার কর্তৃক কর-ছাড়ভিত্তিক মুনাফার সুযোগ দেওয়া হবে। 'অপারেশন বুট-স্ট্র্যাপ'-এর ফলে রপ্তানিযোগ্য উৎপাদন বাড়লেও, দেশটির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমে গিয়েছিল। ১৯৮২ সালে, পুয়ের্তোরিকোর চমৎকার মরসুমী আবহাওয়া ও উর্বর ভূমি সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, বেকারী দাঁড়িয়ে ছিল ৩০ শতাংশে। অথচ এখন পুয়ের্তোরিকোর দ্বীপ খাদ্যসহ সমস্ত পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করে। সর্বোপরি আমেরিকান ব্যাঙ্কের কাছে দেনাতে দেশটি সর্বস্বান্ত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে কর-ছাড়ের সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং ন্যূনতম মজুরি-ব্যবস্থা প্রয়োগ করার পর, অধিকাংশ মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এখন তারা ঘাঁটি গেড়েছে অধিক শোষণের জন্য হাইতি ও ডোমিনিকান রিপাব্লিকে। আধুনিক ই. পি. জেড.-কে অনুধাবন করতে এই ধরনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা স্মরণে রাখা দরকার।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ই. পি. জেড.গুলিতে পোষাক, ইলেট্রনিকস, জুতা, খেলনা প্রভৃতি শ্রম-নিবিড় চরিত্রের নির্মাণ-শিল্পে নিয়োজিত হয় অবিবাহিতা নারীরা। গ্রামাঞ্চল থেকে এইসব নারীদের সংগ্রহ

করা হয়। শ্রমের বাজারে নারীদের নিয়োগের সুযোগ সর্বত্রই, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায় কম থাকায়, স্বভাবতই তারা বাধ্য হয় পরিবার-পরিজন ছেড়ে দূরবর্তী ই. পি. জেড.-এ কাজে যোগ দিতে। এই বাধ্যতার পরিস্থিতির ফলেই নারীদের কম মজুরিতে নিযুক্ত করার উন্মুক্ত সুযোগ মালিকদের থাকে। ব্যাপক সংখ্যায় যুবতী নারীদের নিয়োগের ব্যাপারে মালিকদের যুক্তি হলো নারীরা সংশ্লিষ্ট নির্মাণ-শিল্পে পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি উপযুক্ত, কেননা তাদের হাতগুলি হলো অধিকতর তৎপর এবং নিপুণ। পিতা-মাতার সম্মতিতে যুবতী নারীদের এইসব নিয়োগ ঘটে বলে দাবী করা হয়। দারিদ্র্যের কারণে মেয়েদের কাজে পাঠিয়ে পরিবারগুলি বাড়তি উপার্জন পায়; সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের লাভ হয় তাদের নীতি রূপায়ণে কম মজুরির শ্রমিকার যোগান পেয়ে; মালিকরা লাভবান হয় সর্বদিক থেকে সর্বাংশে ক্ষতির সম্মুখীন হয় নারী শ্রমিকরা।

কম দক্ষতাসম্পন্ন কাজ, কম মজুরি, ফ্লেক্সি সময় অথবা বাধ্যতামূলক ওভারটাইম এবং অস্থায়ী চরিত্রের কর্মের জন্য নারীরা সংগৃহীত হয় এইসব অঞ্চলে অর্থাৎ "পার্মানেন্ট ক্যাজুয়াল" বা স্থায়ীভাবে অস্থায়ী নিয়োগ সর্বাধিক হলো এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলিতে। হস্টেল ধরনের আবাসের ডরমিটারিতে সার সার বিছানার সংখ্যার চেয়ে বেশি সংখ্যায় মেয়েদের রাখা হয়। এক দল কাজে গেলে আর এক দল বিছানা ব্যবহার করে; কাজ থেকে এক দল ফিরে এলে কাজে রওনা দেয় দ্বিতীয় দল। কাজ ও বাসের পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর। অন্যদিকে পরিবেশে শিল্পগত রাসায়নিক ছড়িয়ে থাকার ফলে জীবন ও স্বাস্থ্য অ-নিরাপদ হয়ে থাকে। এই রকম সামগ্রিক পরিস্থিতির শ্রমিকাদের নিজেদের কোন জীবন বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না বললেই চলে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার সদ্য-শিল্পোন্নয়নমুখী কতকগুলি দেশ এখন শ্রম-নিবিড় উৎপাদনের পরিবর্তে হাই-টেক বা উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পুঁজি-নিবিড় শিল্প ব্যাপকভাবে স্থাপন করা শুরু করেছে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলিতে। শিল্প ছাড়াও পরিষেবা উৎপাদন এইসব এলাকায় প্রসারিত চেহারা নিচ্ছে। শেষোক্ত ধরনের উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে কিছুটা শিক্ষিত ও যন্ত্রসামগ্রী ব্যবহারে অভিজ্ঞ শ্রমিকার প্রয়োজন পড়ছে। ফলে ই. পি. জেড.-এর বিগত ২০ বছরে গড়ে ওঠা ঐতিহ্য ও প্রথাগত শ্রমিকাদের এক ধরনের অবসান প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। তাই ব্যাপক ছাঁটাই এখন সর্বত্রই লক্ষণীয় বাস্তবতা।

ই. পি. জেড.-এ সংশ্লিষ্ট দেশের সমস্ত সরকারী শ্রম আইন ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা কার্যত চালু নেই। ন্যূনতম মজুরি, ছুটি, চাকুরীর নিরাপত্তা, ইন্সিওরেন্স, চিকিৎসা প্রভৃতির কোন স্থায়ী ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেই। মালিকের ইচ্ছার উপর এর প্রায় সব কিছু নির্ভরশীল। ন্যূনতম ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এখানে স্বীকৃত নয় এবং সাধারণভাবে কোথাও ইউনিয়ন বা আন্দোলন করতে দেওয়া হয় না, যে কারণে ফ্রী ট্রেড জোনের শ্রম-ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে 'আন-বার্গেনেবল' বা দর-কষাকষিযোগ্য নয়। তদুপরি অধিকাংশ দেশের নিয়োগের সরকারী পরিসংখ্যানে ই. পি. জেড.-এর শ্রমিকাদের ধরা হয় না; কেননা আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগের স্বীকৃতি দিলে সংশ্লিষ্ট সরকারী আইনের সুযোগ এদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে। এই কারণে ই. পি. জেড.-এর শ্রমিক/শ্রমিকাদের 'ইনভিজিবল এমপ্লয়েড/আন-এমপ্লয়েড' বা অদৃশ্য নিযুক্ত/বেকার বলে গণ্য করা হয়।

এবারে কতকগুলি দেশের ফ্রী ট্রেড জোনের অবস্থান লক্ষ্য করা যেতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ায় ফ্রী ট্রেড জোনগুলি হলো—নুসান্ত্রা বাউণ্ডেন জোন (কে. বি. এন.), পশ্চিম জাভা সুরাবায়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট রিজিয়ন (এস. আই. ই. আর.); পাসুরুনা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট রেমব্যাঙ্গ (পি. আই. ই. আর.), পূর্ব জাভা; বেরেকে ফ্রী ট্রেড জোন, গ্রেসিক ফ্রী ট্রেড জোন; এছাড়াও রয়েছে অনেকগুলি অনুরূপ গ্রোথ এরিয়া।

মালয়েশিয়ায় এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলি হলো—পেনাং-এর ব্যায়ান লেপাস, প্রাই ও ডিমাগাপাই সিলাংগোরের সঙ্গেই ওয়ে, উলু কেলাং ও বাটু বীরেন্দাম; জোহরীর সেনাই ও পাসির; কেলানতান-এর পেনং-কালান চেপা; পাহাং-এর জেবেং। আরও ৫টি নতুন ই. পি. জেড.-এর কাজ চলছে। তাছাড়া

রয়েছে অনুরূপ ধরনের আরও কতকগুলি অঞ্চল, যেগুলিকে বলা হয় গ্রোথ পলিগনস্, গ্রোথ ট্রাঙ্গেল ইত্যাদি।

ফিলিপিনসে বাট্টানা, ম্যাকটান, বাগুইও ও কাভিটি। তাছাড়া রয়েছে সরকার নিয়ন্ত্রিত ১৬টি শিল্পকেন্দ্র, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ৩৬টি পার্ক/এস্টেট এবং ৩টি গ্রোথ এরিয়া।

শ্রীলঙ্কাতে কাভুনায়াকে, বিয়াগামা, কোগ্গালা, মিহিন্তালে ও ক্যান্ডি। ১৯৯২ সালে সারা দেশকে ফ্রী ট্রেড এরিয়া বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

থাইল্যাণ্ডে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলি হলো—১৮টি 'রিজিয়ন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট'। এগুলি দুই ভাগে বিভক্ত ঃ জেনারেল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল জোন/এস্টেট এবং এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন। তাছাড়া ৪টি গ্রোথ এরিয়া রয়েছে।

হংকং-এর সারা দেশই কার্যত ফ্রী ট্রেড এরিয়া। এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন হলো—তাইপো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ও যুয়েন লঙ এস্টেট। তাছাড়া গ্রোথ এরিয়া হলো সাদার্ন চায়না গ্রোথ ট্র্যাঙ্গেল।

তাইওয়ানে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলি হলো কাওসুং, তাই জং ও না-জি। তাছাড়া সাদার্ন চায়না গ্রোথ ট্র্যাঙ্গেল।

দক্ষিণ কোরিয়ায় এই ব্যবস্থা সম্বলিত অঞ্চলগুলিকে বলা হয় ফ্রী এক্সপোর্ট জোন। সেগুলি হলো ২৯টি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট।

সমাজতান্ত্রিক চীনে এই ধরনের ব্যবস্থাকে বলা হয় 'স্পেশাল ইকনমিক জোন'—এগুলি হলো সেনঝেন, জুহাই, সান্ততৌ, জিয়ামেন ও হাইনান। তাছাড়া ১৪টি 'ওপেন সিটি'সহ রয়েছে ৪০০টি স্পেশ্যাল জোন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল জোন, হিন্টারল্যাণ্ড প্রভিন্সিয়াল ক্যাপিটাল, সাংহাই-মুডং ডিস্ট্রিক্ট এবং ফুজিয়ান ইনভেস্টমেন্ট জোন (তাইওয়ানের ব্যবসায়ীদের জন্য)। এ ছাড়াও রয়েছে গ্রোথ এরিয়া—গ্রেটার মেকং সাব-রিজিয়ন, সাদার্ন চায়না গ্রোথ ট্র্যাঙ্গেল এবং টুমেন রিভার এরিয়া।

ভিয়েতনামে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলি হলো—তান থুয়ান, লিঞ্চ ত্রুন, হাই ফঙ্, দানাং, ক্যান খো ও হ্যানয়। তাছাড়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের পরিকল্পনা রয়েছে গাই দঙ ও দঙ আন-এ। গ্রোথ এরিয়াগুলি হলো—গ্রেটার মেকং সাব-রিজিয়ন, আসিয়ান ও আসিয়ান ফ্রী ট্রেড এরিয়া (এ. এফ. টি. এ.)।

মরিশাস পূর্ব-আফ্রিকার তীরবর্তী দ্বীপ-রাষ্ট্র। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম ঘনবসতিসম্পন্ন এই দেশ। এখানে ই. পি. জেড.-এ শিল্পের সংখ্যা ৫৬৮টি।

ডোমিনিকান রিপাব্লিকে ছড়ানো রয়েছে মোট ১৫টি এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন।

জামাইকার সারা দেশই কার্যত ফ্রী ট্রেড জোনের অন্তর্গত, বিশেষত সমুদ্র-উপকুলবর্তী সমস্ত এলাকা।

ফ্রী ট্রেড জোন বা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের শ্রমিকাদের নানা ধরনের সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে। এইসব অঞ্চলে শিল্পোন্নয়ন তথা আর্থিক উন্নয়ন যতটা দ্রুতভাবে ঘটছে, সামাজিক উন্নয়ন তার চেয়ে অনেক পিছনে। পুঁজিবাদী আর্থিক উন্নয়ন এমনিতেই জনগণের সর্বাংশের আর্থিক উন্নয়ন ঘটায় না। তদুপরি তৃতীয় দুনিয়ায় ঐতিহাসিকভাবেই আর্থিক উন্নয়নের গতির চেয়ে সামাজিক উন্নয়নের গতি সর্বত্র শ্লথ। 'ফ্রম কিচেন টু ফ্যাক্টরি' তথা গৃহস্থালি থেকে সরাসরি কারখানায় যোগদান সমাজ ও নারী মানসে পরস্পর-বিরোধী প্রতিক্রিয়া গঠনের এক বিশাল উপাদান। পরিবারে নারীর আকস্মিক উপার্জনের সুযোগ এবং নতুন এক ধরনের তথাকথিত স্বাধীনতা অর্জনের ধারণা পরিবারের স্বাভাবিক বন্ধনগুলির ওপর গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি করছে। ব্যক্তিগত উপার্জনের ও ব্যয়ের সুযোগ ও অধিকার, আধুনিক উৎপাদন ও প্রকাশ্য সমাজ জীবনে মেলামেশা প্রভৃতির ফলে এইসব শ্রমিকাদের মধ্যে বেশ-ভূষা ও আচার-আচরণে ভিন্নতা সৃষ্টি এবং দীর্ঘকাল বাড়ির বাইরে এককভাবে থাকা প্রভৃতি প্রথা ও পরম্পরা-ভঙ্গের অবস্থাকে তৃতীয় দুনিয়ার পশ্চাৎপদ ও গোঁড়ামিপূর্ণ সমাজ মানসিকভাবে মেনে নিতে পারছে না। তাই দেখা যাচ্ছে যে, সমাজে এই অংশের নারীদের অনৈতিকতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ই. পি. জেড. তৃতীয় দুনিয়ার উপাদান হওয়ায় পশ্চাৎপদ সমাজ এভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। ই. পি. জেড.-এর কারখানার নারীদের বিষয়ে সংবাদপত্রে মুখরোচক নানান কল্পিত কাহিনী

প্রকাশিত হয়ে থাকে। ফলে মধ্যবিত্ত বা মধ্য-উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা সাধারণভাবে ই. পি. জেড. কারখানাতে কাজ নেয় না; কাজ নিলেও প্রথম সুযোগে তা' ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। কারখানার কর্মরতা মেয়েদের বিয়ে হলে, এক উল্লেখযোগ্য অংশকে চাকুরী ছেড়ে দিতে কার্যত বাধ্য করে স্বামীরা। বিবাহিত পরিবারের নারীরা দীর্ঘ সময় বাড়ির বাইরে কাটানোর ফলে কেবল গৃহস্থালি কর্মে সমস্যা সৃষ্টি হয় না, সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সমস্ত দিকই অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবহেলিত হয়। ই. পি. জেড. ব্যবস্থা তৃতীয় দুনিয়ায় নারীদের আর্থিক সুযোগ সামান্য কিছুটা এনে দিলেও, এইভাবে সমাজে নতুন ধরনের সমস্যা ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করছে। কেননা পরিসংখ্যানে এটাও দেখা যাচ্ছে যে ই. পি. জেড.-শিল্পে কর্মরতা বিবাহিতা নারীদের প্রায় ৩০ শতাংশই এক অভিভাবক তথা নারী অভিভাবকের পরিবার।

নারী-শ্রমের অন্যান্য আধুনিক রূপ ও শোষণের দিক

শ্রমের বাজারকে বিশ্বময় আরও উন্মুক্ত এবং নতুন নতুন উপাদানে সংহত করছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। পাশাপাশি তারা শ্রমের লিঙ্গগত বিভাজনকে তীক্ষ্ণ এবং নতুন নতুন ধরনের উৎপাদন-ক্ষেত্র সৃষ্টি করে সেগুলিকে সংরক্ষিত করছে কেবলমাত্র নারীদের জন্য, অসংগঠিত ও স্বনিযুক্তির শ্রমকে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করছে। এ'বিষয়ে কিছু দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

সিলিকন ভ্যালি উইমেন ঃ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের স্যান জোসের নিকটবর্তী এলাকায় সিলিকন ভ্যালিতে ইলেকট্রনিক শিল্পের যন্ত্রাংশ ব্যাপক অ্যাসেম্বলি করার কাজে নিযুক্ত নারীদের জন্য নামকরণটি প্রথমে প্রযুক্ত হয়। অনুরূপ কাজের জন্য সমস্ত দেশের নারীদেরই পরবর্তীকালে ঐ নামে অভিহিত করা হতে থাকে। মাইক্রো-চিপ্‌সের কাজ সিলিকন ভ্যালিতে কেবল নয়, একই সাথে বোস্টনের সন্নিকটবর্তী সড়ক—রুট ওয়ান-টুয়েন্টি-এইট এবং শ্রম-বিরোধী ভূমিকার জন্য কুখ্যাত নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। এখন সারা বিশ্বেই ইলেকট্রনিক শিল্পের বিশাল প্রসার ঘটেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শিল্পের মালিকানা বহুজাতিক সংস্থাগুলির। এই জাতীয় কাজে নিযুক্ত মানুষের শতকরা ৯০ ভাগ নারী শ্রমিক। প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, হল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশগুলির বহুজাতিক সংস্থাগুলি মেক্সিকো, ইতালি, স্পেন, পুয়ের্তোরিকো, আয়ারল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশে প্রতিষ্ঠা করছে সাবসিডিয়ারি বা উপাঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলি। অন্যদিকে মূল দেশগুলির শিল্পের জন্য তৃতীয় দুনিয়া থেকে ক্রমবর্ধমান হারে শ্রমিকাদের আনা হচ্ছে। কাজের বিন্যাস এমনভাবে করা হচ্ছে যাতে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকাদের মধ্যে সংমিশ্রণ না ঘটে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি দেশের শ্রমিকারা একাংশ এবং এক ধরনের কাজ করে। এটা করা হয় পরস্পর অংশের মধ্যে কাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিকাদের রকমফের মজুরি দিয়ে, বেশি লাভ করার জন্য। স্বদেশীয় শ্রমিকাদের তুলনায় বহিরাগত শ্রমিকাদের মজুরি অনেক কম।

শিল্পগত রোগ ইলেকট্রনিক শিল্পে সর্বব্যাপক। সর্বক্ষণ 'সলভেন্ট' বা দ্রাবকময় পরিবেশে কাজ করার ফলে নারীদের রজঃস্রাব ও সন্তান উৎপন্ন করার ক্ষমতা ব্যাহত ও নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়; ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের লিভার বা যকৃৎ ও কিডনি বা মূত্রগ্রন্থি; তারা আক্রান্ত হয় ক্যান্সার বা অতিরিক্ত স্নায়বিক সংবেদনশীলতায়। এই ধরনের পরিবেশ দূষণের ফলে জীবনে ব্যবহার্য অধিকাংশ ধরনের সামগ্রীতে নারীদের অ্যালার্জি আক্রমণ ঘটে।

পীস-রেটের ভিত্তিতে এবং ফেক্সিবল চরিত্রের মজুরি ও শ্রম-সময়, টেলি-ব্যবস্থার দ্বারা কাজের উপর সর্বক্ষণ সতর্ক প্রহরা, ইউনিয়ন করতে না দেওয়া, গর্ভবতী হলে ছাঁটাই, কম ছুটি ও বাধ্যতামূলক ওভারটাইম ইত্যাদি হলো সিলিকন ভ্যালি উইমেনদের বৃত্তির পরিবেশের অপর দিক। তদুপরি আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে ইলেকট্রনিক শিল্পে ব্যাপকভাবে রোবট ব্যবহার শুরু হওয়ায়, ব্যাপক লে-অফও শুরু হয়েছে নারী শ্রমিকদের মধ্যে।

যাতে শ্রমিকারা ট্রেড-ইউনিয়নে যুক্ত না হয় অধিকাংশ সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, ইউনিয়ন করলে কি ক্ষতি হয় সে বিষয়ে প্রচার চালায়, সেমিনার করে শ্রমিকাদের নিয়ে।

মালিকদের পক্ষ থেকে বিয়ার ও পিঝা পার্টি দেওয়া হয় শ্রমিকাদের। বিদেশে ভ্রমণের জন্য লটারি বা পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা সংঘটিত করা হয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায়। যেদিন বেতন দেওয়া হয় সেদিন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বিলাস ও মনোহারী সামগ্রীর দোকান খোলা হয় সুলভে সেগুলি শ্রমিকাদের মধ্যে বিক্রয় করার জন্য। এইভাবে আত্মপরায়ণ ও প্রলোভিত করার জন্য জৈবিক ও ভোগবাদী সুযোগসমূহ পসরা আকারে সাজিয়ে রাখা হয় নানাভাবে। কখনও দেখা গেছে যে শ্রমিকাদের মজুরি কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেবার পর তা' কতখানি যৌক্তিক তা' শ্রমিকাদের উপলব্ধিতে আনতে লাঞ্চ-ব্রেকের সময় কারখানাতে এবং নিকটবর্তী রেস্টুরেন্ট ও বারগুলিতে ভিডিও-র সাহায্যে ব্যাখ্যা ও কিভাবে সবার অভিনন্দন সংগ্রহ করছে তা' প্রদর্শন করা হয়। ফ্যাক্টরির সবচেয়ে সুন্দরী কে, তার জন্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়; প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয় শ্রমিকাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য ইত্যাদি।

ম্যাকুইলা উইমেন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে স্বল্প-মজুরিতে শ্রমিক, বিশেষত নারী শ্রমিক সরবরাহের ম্যাকুইলাডোরা নামে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলির শ্রমিকাদের 'ম্যাকুইলা উইমেন' বলে অভিহিত করা হয়।

প্রায় শতাব্দীকাল ধরে আমেরিকার কৃষি ও কৃষি-ব্যবসা মেক্সিকো থেকে বেআইনিভাবে শ্রমিক এনে পরিচালনা করা হতো। এই প্রথাকে বলা হতো 'মাজাদো'। এই কাজের শ্রমিকদের বলা হতো 'ব্র্যাসেরো' বা চুক্তিবদ্ধ বহিরাগত শ্রমিক। ১৯৪২ থকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে 'ব্র্যাসেরো প্রোগ্রাম' অনুযায়ী এই ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে বন্ধ করা হয়। কেননা কৃষিতে ব্যাপক যান্ত্রিকীকরণের ফলে মেক্সিকো থেকে শ্রমিক সংগ্রহের প্রয়োজন আমেরিকার ফুরিয়ে গিয়েছিল। এতে ২ লক্ষ শ্রমিক এবং সীমান্ত এলাকার শ্রম-শক্তির ৫০ শতাংশ বেকার হওয়ায় ১৯৬৪ সালে উভয় দেশ চালু করে 'বর্ডার ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রোগ্রাম' (বি. আই. পি.)। সীমান্তের উভয়দিকে একই প্রতিষ্ঠানের দু'টি করে কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হতে থাকে—যাকে বলা হয় ম্যাকুইলাডোরা প্রথা। শ্রম-নিবিড় কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় মেক্সিকোতে। প্রস্তুত পোষাক, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ নির্মাণ ও অ্যাসেম্বলি, কৃত্রিম ফুল ইত্যাদি সামগ্রী মেক্সিকোতে তৈরি করে আমেরিকা নিজের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনেকটাই এই প্রথায় মিটিয়ে নিতো। মেক্সিকো সরকার এই ব্যবসার জন্য আমেরিকাকে সমস্ত রকমের সুযোগ প্রসারিত করেছিল। এই প্রথায় মেক্সিকোর পুরুষ অংশ বঞ্চিত হতে শুরু করে এবং স্বল্প মজুরিতে নিযুক্ত করা হতে থাকে নারী শ্রমিকদের। ১৯৮৪ সালে মোট ৫০০টি থেকে আশির দশকের শেষে ম্যাকুইলাডোরার সংখ্যা বেড়ে ১০০০ অতিক্রম করে যায়, যেগুলির শ্রমিক সংখ্যার ৮৫ শতাংশ নারী—যাদের বয়স ১৬ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত। এদের কাজের সময় সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা। ১৯৯০ সালে এখানে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৫ লক্ষ অতিক্রম করে গেছে।

দেশের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে নারীদের এনে ডরমিটারিতে স্থায়ীভাবে বাসের ব্যবস্থা করা হয় ম্যাকুইলাডোরাতে। উভয় দেশের শ্রম-আইন ও সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কার্যত এখানে প্রযুক্ত হয় না। সমস্ত নিয়োগ হয় অনিয়মিত ভিত্তিতে এবং চুক্তিপত্রে সিনিয়রিটি ও পদোন্নতির দাবী করা যাবে না বলে লিখিয়ে নেওয়া হয়। শ্রমিকার চাকুরীতে প্রবেশের সময় ডাক্তারী পরীক্ষা করে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়ে নেয় যে সে গর্ভবতী নয়। ম্যাইকুইলাডোরাতে উৎপাদনের কাজে ব্যাপকভাবে বিপজ্জনক রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়। স্বভাবতই শ্রমিকাদের মধ্যে অসুস্থতা সর্বব্যাপক। তাদের মধ্যে সর্বক্ষণের রোগগুলি বিশেষত হলো হাঁপানি, কনজাংটিভাইটিস (চোখ লাল হওয়া রোগ), ব্রঙ্কাইটিস (ফুসফুসের রোগ) ইত্যাদি। তাছাড়াও নারীদের মধ্যে দেখা দেয় গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টিন্যাল ডিসঅর্ডার (পেটের রোগ), ইনসোমনিয়া (নিদ্রাহীনতা), অনিয়মিত রজঃস্রাব, প্রস্রাবের রোগ প্রভৃতি। কেননা বিশুদ্ধ পানীয় জল ও সুষ্ঠু শৌচাগারের ব্যবস্থা প্রায় অধিকাংশ ডরমিটারিতেই থাকে না।

অন্যদিকে মেক্সিকোতে পুরুষদের মধ্যে ব্যাপক বেকারীর জন্য ২০-৩০ শতাংশ পরিবারে নারীরাই একমাত্র উপার্জনকারী। ফলে বর্ধিত পারিবারিক দায়িত্ব থাকে ম্যাকুইলা উইমেনদের। আর এক

সামাজিক দুর্ভোগের দিক হলো—অন্য খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে পুরুষদের মধ্যে সৃষ্ট হীনম্মন্যতা। ম্যাকুইলা নারীদের চরিত্রহীনা বলে চিত্রিত করা সমাজে রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। ফলে অবিবাহিত ম্যাকুইলা নারীর বিবাহ করা কঠিনতর হচ্ছে; বিবাহিতদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ বাড়ছে।

নব্বই-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে 'নর্থ অ্যাটলান্টিক ফ্রী ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন' বা নাফটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া বহুজাতিক সংস্থাগুলির নতুন পদ্ধতিমত স্বীয় দেশ থেকে শিল্পপ্রতিষ্ঠান অন্য দেশে স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়ার ফলে শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে আমেরিকা-মেক্সিকোর সীমান্ত এলাকার শিল্প। তদুপরি রয়েছে শিল্পের আধুনিকীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ। ফলে ম্যাকুইলা শ্রমিকরা এখন ব্যাপকভাবে ছাঁটাই হচ্ছে।

হসপিট্যালিটি গার্লস : কম পুঁজি বিনিয়োগ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুনাফা ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ট্যুরিজম বা ভ্রমণ, হোটেল-মোটেল-রিসোর্ট-স্যানাটোরিয়াম-ক্লাব-বার-রেস্তোরাঁ, ট্যুরিস্ট গাইড, ইন্টারপ্রিটার প্রভৃতির ব্যবসা ও পরিষেবা। জল-আবহাওয়া-নৈসর্গিক পরিবেশ প্রভৃতির চেয়েও ট্যুরিজম ব্যবসাতে বিদেশী আকর্ষণের প্রধান বিষয় হসপিটালিটি গার্লস বা ভ্রমণ-পিপাসুদের সেবাপরায়ণ রমণী। এই ব্যবসাতে তৃতীয় দুনিয়ায় অগ্রগণ্য, বিশেষত দ্বীপময় দেশগুলির মধ্যে, ফিলিপাইনস, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, হাইতি, শ্রীলঙ্কা, মাল্টা, সাইপ্রাস, মালদ্বীপ প্রভৃতির নাম করা হয়। এই ব্যবসায় রয়েছে আরও বহু দেশ যার অন্তর্গত ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি, ইকুয়েডর, গুয়াতেমালা প্রভৃতি ছাড়াও প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ড, রোমানিয়া, স্লোভাক রিপাব্লিক ইত্যাদি। প্রকাশ্যে ঘোষিত নয় কিন্তু অনুন্নত আরও বহু দেশে এই ব্যবসা এখন বাড়বাড়ন্ত। দেশভিত্তিক আংশিক তথ্য যেটুকু পাওয়া যায়, তা' প্রধানত লাইসেন্স-প্রাপ্ত বা বিদেশাগত নারীর সংখ্যা মাত্র। আসল সংখ্যা তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হবে। জাপান, তাইওয়ান, ফিলিপাইনস ও দক্ষিণ কোরিয়ার ট্রাভেল এজেন্সি, প্যাকেজ ট্যুর ও হোটেল ব্যবসায়ে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ও মালটিন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী হসপিটালিটি ব্যবসার সাহায্যে সারা পৃথিবীতে মোট লাভের পরিমাণ ২-৫ বিলিয়ন ডলার (১৯৯২ সালের হিসাবে)। আন্তর্জাতিক প্রচার-মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরাসরি রমণীয় নারীর সর্বক্ষণের সান্নিধ্য দেবার বিজ্ঞাপন দিয়ে ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করে। হোটেলে ছাড়াও ট্যুরিস্ট গাইড বা ইন্টারপ্রিটার হিসাবে রমণী সরবরাহের প্রতিশ্রুতি ও ব্যবস্থা থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ব্যবসায়ে যুক্ত মেয়েদের বলা হয় 'কিয়াসায়েঙ্গ'। তার ভিত্তিতে কিয়াসায়েঙ্গ ট্যুরিজম, কিয়াসায়েঙ্গ পার্টি, কিয়াসায়েঙ্গ রেস্তোরাঁ, কিয়াসায়েঙ্গ হাউস প্রভৃতি ব্যবস্থা রয়েছে। ফিলিপিনসের রাজধানী ম্যানিলাতে অনুরূপ কাজে যুক্ত নারীর সংখ্যা এক লক্ষাধিক। কার্যত দেহদানের এই বৃত্তিতে বিদেশ থেকে নারী সংগ্রহ করা ছাড়াও এই ধরনের শ্রমে যুক্ত আছে ফ্যাক্টরির শ্রমিকা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, গৃহস্থ মহিলারা পর্যন্ত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সর্বক্ষণ বা আংশিক সময়ের জন্য হোটেল, ট্যুরিস্ট এজেন্সি প্রভৃতিকে সরবরাহ করে এইসব নারীদের। তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৩ বছরের কিশোরী থেকে শুরু করে ৫০ বছরের মহিলা পর্যন্ত এই বৃত্তিতে নিযুক্তা হয়। এই জাতীয় বৃত্তিতে দৈনন্দিন মজুরির হার অন্য যে কোন বৃত্তি থেকে যথেষ্ট উন্নত হওয়া সত্ত্বেও নিয়োগকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কমিশন বাদ দেবার পর মজুরির ২০-২৫ শতাংশের বেশি এই নারীদের ভাগ্যে জোটে না। বৃত্তির অনিশ্চয়তা, কাজের অনিয়মিত চরিত্র, মজুরির স্বল্পতা, কোন ধরনের শ্রম-আইনের সুযোগের অভাব, সামাজিকভাবে হীন অবস্থা, কাজে নিযুক্ত হলে দিনের পর দিন বাড়ির বাইরে সর্বক্ষণের কাজ, দেহদানজনিত অস্বাস্থ্য, অন্যের দ্বারা সংক্রমিত রোগ ইত্যাদি হলো এই বৃত্তির সর্বক্ষণের পরিস্থিতি। এই ব্যবস্থা পরম্পরাগত রূপোপজীবিনী বৃত্তির আধুনিক ও সংগঠিত সংস্করণ মাত্র।

সেক্স ওয়ার্কার : এই ধরনের ব্যবস্থার পাশাপাশি ঐতিহ্যগত বেশ্যাবৃত্তি তো আছেই। কিন্তু সেক্ষেত্রেও নানা ধরনের পরিবর্তন এবং তা' সংগঠিত ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অন্তর্গত হয়েছে। দেহদানবৃত্তি পরিচালনার জন্য পরিকল্পিতভাবে বিপুল সংখ্যাতে বিদেশে নারী চালান দেওয়া এক ধরনের বাণিজ্য

হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে দেশে দেশে এইসব ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে ব্যক্তি-মালিকানাধীন এক ধরনের বৃহৎ শিল্প হিসাবে। নতুন এই পদ্ধতিতে দেহদানকারিণী একজন নিছক দৈনিক মজুরির শ্রমিকা অথবা তার দেহভোগের গ্রাহক সংখ্যার ভিত্তিতে কমিশন-প্রাপ্তা মাত্র। অতীতের বেশ্যাবৃত্তির মতো নারী এখানে নিজের সুযোগ-সুবিধামত দেহ বিক্রি করে না; খরিদ্দারের সাথে দর-কষাকষি করে প্রাপ্ত অর্থের সবটা নিজে পায় না। সে নিযুক্তা দৈনিক/মাসিক ভিত্তিতে। যে কারণে এখন এরা 'সেক্স-ওয়ার্কার' বা যৌন-শ্রমিকা নামে পরিচিত হচ্ছে। অর্থাৎ যৌন-সঙ্গদানকে পরিণত করা হচ্ছে এক ধরনের শ্রমে এবং তার বিনিময়ে মজুরিপ্রাপ্তি। অন্যদিকে শ্রম-শক্তি শোষণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির অন্যতম উপাদানের অংশ হয়ে উঠেছে নারীর যৌন-শক্তি শোষণ। কেবল নেপাল থেকে ভারতে বা অন্যত্র প্রেরিত যৌনকর্মীর সংখ্যা ৭ লক্ষ-র বেশি। সারা বিশ্বে লাইসেন্সপ্রাপ্ত যৌনকর্মীর সংখ্যা ১ কোটিরও অধিক। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে সর্বাপেক্ষা দুরবস্থাপূর্ণ ও ঝুঁকিসম্পন্ন এই বৃত্তি, যার দ্বিতীয় কোন নজির নেই। যৌন-গ্রাহকের শোষণের চেয়ে নারীকে যৌন-বৃত্তিতে নিয়োগকারী মালিকের শোষণ এখানে সর্বাপেক্ষা নির্মম এবং এদের উপর কোন ধরনের কঠিন অন্যায়ের প্রতিকারের সুযোগ পর্যন্ত নেই। অন্যদিকে অতীতের যৌন-রোগ—সিফিলিস, গণোরিয়া প্রভৃতির চূড়ান্ত নিরাময়ের ওষুধের আবিষ্কার ঘটা সত্ত্বেও, এখন অতিকায় বিপদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে কালান্তক 'এইডস' রোগ, যা ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাপকভাবে এই সেক্স-ওয়ার্কারদের মধ্যে।

গৃহ পরিচারিকা বৃত্তি নিয়ে সংগঠিত বাণিজ্য ও ব্যবস্থা ঃ পুঁজিবাদ-পূর্ব মানব সভ্যতার কালপর্বে পরিচারিকা বৃত্তি ছিল সংশ্লিষ্ট নারীর অনিচ্ছাপ্রসূত এবং জবরদস্তিমূলক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই পরিচারিকা বৃত্তি মজুরি-দাসের চরিত্র পায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাঁচার প্রয়োজনে গৃহস্থালি শ্রম থেকে প্রকাশ্য শ্রমে যুক্ত হওয়ার বাধ্যতা এবং সেক্ষেত্রে নিজ গৃহস্থালি কর্মের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে ব্যবহার করে পরিচারিকা বৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়ার স্বাভাবিক সুযোগ দরিদ্র নারীদের এই বৃত্তিতে প্রথম থেকে আকর্ষণ করেছে। তাছাড়া অতীত থেকে পরম্পরাগতভাবে এই বৃত্তি থাকার ফলে ফ্যাক্টরি বা অন্য কোন ক্ষেত্রের অপরিচিত কাজের তুলনায়, এই কাজ নারীদের পরিচিত ছিল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুদীর্ঘকাল ধরেই দরিদ্র নারীরা নিজ পরিবারের কাছাকাছি এলাকাতে এই বৃত্তি গ্রহণ করার সুযোগও গ্রহণ করতো।

সমাজ-বিজ্ঞান ও আর্থনীতিক পরিভাষাতে পরিচারিকা বৃত্তিকে বলা হচ্ছে 'ডোমেস্টিক ওয়ার্ক' এবং কর্মীদের 'ডোমেস্টিক ওয়ার্কার'। অসংগঠিত ও অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের বৃত্তিসমূহের মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যায় নিয়োজিতারা হলো ডোমেস্টিক ওয়ার্কার। সর্বক্ষণের বা আংশিক সময়ের—যে কোন চরিত্রের ডোমেস্টিক তথা মজুরিভিত্তিক গৃহস্থালির এই কাজে বৃত্তির অনিশ্চয়তা, নিম্ন মজুরি, অনির্ধারিত কাজের সময়, বিনা ছুটি, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কোন সংস্থান না থাকা ইত্যাদি হলো সর্বজনীন ব্যবস্থা। বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত হিসাবে পরিচারিকা নিয়োগের পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ফলে এই অংশের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে।

সাধারণভাবে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলিতে পরিচারিকা বৃত্তির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছিল গত প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী। উন্নত দেশগুলিতে নারী-শিক্ষার ব্যাপ্তি ও তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনের শাখাতে নারীদের বৃত্তির সুযোগ প্রসার, দরিদ্র পরিবারগুলিতেও ক্রমশ দুইজন (নারী ও পুরুষ) আয়কারী প্রভৃতির ফলে গৃহ পরিচারিকার কাজের সন্ধানে নারীদের মনযোগ কমতে শুরু করছিল। অন্যদিকে সর্বক্ষণের পরিবর্তে আংশিক সময়ের কাজের সুযোগ থাকায় নারীদের পরিচারিকা বৃত্তিতে যোগদান কাম্য হয়ে উঠছিল। তাই পরিচারিকা বৃত্তিতে মজুরির হার উন্নত হয়ে উঠতে থাকে। কেননা চাহিদার তুলনায় যোগান হয়ে ওঠে সংকীর্ণ। তার ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারে পরিচারিকা নিয়োগ কমে যেতে থাকে। আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশে আমেরিকান ব্ল্যাক তথা আফ্রিকা থেকে অতীতে ক্রীতদাস হিসাবে আসা অধিবাসী, আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান, মেক্সিকান, হিস্পানি প্রভৃতি জনগোষ্ঠী থেকে গৃহ পরিচারিকা বৃত্তিতে নিয়োগ করে চাহিদা পূরণ করা শুরু হয়।

তবে, অনুন্নত দেশগুলিতে গৃহ-পরিচারিকা বৃত্তির রূপের পরিবর্তন সামান্যই ঘটেছে। ব্যাপক দুর্দশা ও দৈন্য এবং শ্রমের বাজারে কর্মক্ষম নারীর স্বল্প সুযোগ এই বৃত্তিতে পূর্বাবস্থাসহ যোগাদানের প্রবাহকে কেবল অব্যাহত রাখেনি, বরং বাড়িয়ে চলেছে। উপরন্তু দেখা যাচ্ছে যে, নগরায়নের ব্যাপকতা, নগরী-জীবনে কিছুটা প্রাচুর্য ও আড়ম্বর এবং বিপরীতদিকে গ্রামীণ জীবনে দুর্দশায় যে ব্যাপক রুরাল মাইগ্রেশন বা গ্রামীণ জনগণের শহরে আগমনের প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, তাতে গ্রামের নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ শহরের পরিচারিকা বৃত্তিতে যোগ দিতে শুরু করেছে। শহরাঞ্চলে কিছুটা বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের পরিবারের নারীরা বর্ধিত সংখ্যাতে প্রকাশ্য শ্রমে যুক্ত হচ্ছে। এইসব পরিবারের গৃহস্থালি কাজে পরিবারের মেয়েদের শূন্যতা পরিবারের বাইরের নারী নিয়োগের দ্বারা পূরণ করা হচ্ছে। স্বভাবতই এই ক্ষেত্রটি এখন তৃতীয় দুনিয়ায় কিছুটা প্রশস্ততা পাচ্ছে।

কিন্তু সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ডোমেস্টিক ওয়ার্কের ক্ষেত্রটি পুঁজিবাদের কাছে এক বিশাল ও সংগঠিত লাভের সুযোগ হিসাবে দেখা দিতে থাকে। গৃহ-পরিচারিকা ক্ষেত্র নিয়ে আশির দশক থেকে, এ'কারণে, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশনও এ'বিষয়ে বিভিন্ন দেশের তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার কাজে আগ্রহী হয়।

গৃহস্থালি পরিচারিকার বৃত্তি আর্থিক দিক থেকে মহার্ঘ হওয়ার ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে নিয়োগ কমে যাওয়ার অর্থ এটা ছিল না যে, এই বৃত্তির চাহিদা কমে গেছে। বরং সেইসব দেশে সুপ্তভাবে চাহিদা বৃদ্ধিই পেয়েছে। তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে গৃহ-পরিচারিকার কাজে এখন নিয়োগ ব্যাপক হচ্ছে দেশান্তরিত নারীদের। এইসব উন্নত দেশে দেশান্তরী নারীর উল্লেখযোগ্য অংশ এখন গৃহ-পরিচারিকা বৃত্তিতে যুক্ত হচ্ছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলির নারীরা উত্তর আমেরিকাতে এবং তাইওয়ান, কোরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপিনস প্রভৃতি এশীয় দেশের মেয়েরা পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহে গৃহ-পরিচারিকার বৃত্তি নিচ্ছে। মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বহু দেশে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও উপ-সাহারীয় দেশের নারীরা গৃহ-পরিচারিকার বৃত্তিতে নিযুক্ত। লক্ষণীয় ঘটনা হলো গৃহ-পরিচারিকা বিদেশ থেকে সংগ্রহ ও প্রেরণের জন্য সৃষ্ট এক ধরনের এজেন্সির ভূমিকা। তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশে কর্মসংস্থানের সংবাদপ্রকাশমূলক পত্রিকাগুলিতে অংশ হয়ে উঠেছে বিদেশে পরিচারিকা বৃত্তিতে নিয়োগের সংবাদ। তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশ পরোক্ষে এই ব্যবসাকে মদত দেয় বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রলোভন থেকে। বিদেশে চাকুরী করে মজুরির অংশ স্বদেশে প্রেরণ থেকে এই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বিদেশে কাজ পাওয়া, পাসপোর্ট-ভিসা সংগ্রহ করে দেওয়া ও যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সমুদয় ব্যয় ছাড়াও, চুক্তির কার্যকালের ভিত্তিতে এইসব এজেন্সিগুলিকে দিতে হয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ।

গৃহ-পরিচারিকা বৃত্তির আন্তর্জাতিক পরিসরে লক্ষ্য করা যায় কতকগুলি বিশিষ্ট দিক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দীর্ঘ উপস্থিতি সত্ত্বেও এই বৃত্তিতে নিয়োগকারীর মনোভাব ও আচরণে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদান প্রায় সর্বত্রই বিরাজ করে। সর্বক্ষণের বা আংশিক সময়ের কাজে নিযুক্ত হলেও, পরিচারিকাকে একান্ত আজ্ঞাবহ স্তরে রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, শ্বেতকায় পরিবারে পীত বা কৃষ্ণবর্ণের পরিচারিকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মালিকের বর্ণ-বিদ্বেষবাদী মনোভাব ও বিরূপতার দ্বারা মানসিকভাবে নিগৃহীত হয়। তৃতীয়ত, গৃহ-পরিচারিকা ভিন্ন ধর্মের হলে, মালিকের প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় গোঁড়ামি তাকে সর্বদা শশব্যস্ত রাখে। মধ্য প্রাচ্যে বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইসলাম-ধর্মীয় দেশগুলিতে পরিচারিকাকে ধর্ম পরিত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা এবং তাতে সম্মত না হলে নিগ্রহ করার বেশ কিছু রিপোর্ট রয়েছে। চতুর্থত, সমস্ত ধরনের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে 'সেক্স হ্যারাসমেন্ট' বা যৌন হয়রানি সবচাইতে বেশী পরিচারিকা বৃত্তিতে। উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সমস্ত ধরনের দেশেই যৌন হয়রানির ফলে এবং নিয়োগকারীর দুষ্কর্ম প্রকাশিত হবার আশঙ্কা থেকে পরিচারিকাকে খুনের ঘটনাও ঘটে।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকাদের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বা যৌন হয়রানি

সভ্যতার ঊষাকাল থেকে শ্রমজীবী নারীদের জীবনে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বা যৌন হয়রানি এক অব্যাহত বাস্তবতা। কিন্তু প্রসঙ্গটি নিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনীতিবিদ ও ট্রেড ইউনিয়নের স্তরে আলোচনা ও প্রতিকারের চেষ্টার ইতিহাস মাত্র ৫০ বছর কালব্যাপী। সমাজ-বিজ্ঞানে ও ট্রেড ইউনিয়নের বিবেচ্য হিসাবে 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট' শব্দটিও নতুন করে চয়ন করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ, ইউরোপীয়ান কমিউনিটি, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন, বেশ কিছু উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়টি নিয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা চালিয়েছে বিগত পঁচিশ বছর যাবৎ। প্রসঙ্গত কয়েকটি বিশিষ্ট গবেষণার উল্লেখ করা যায়। যেমন, এন. রুবেনস্টাইনের 'দা ডিগনিটি অব উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক', 'আ রিপোর্ট অন দা প্রবলেম অব সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইন দা মেম্বার স্টেটস অব দা ইউরোপীয়ান কমিউনিটিজ', এন. লিবারের 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইন দা ওয়ার্ক প্লেস : আ কমপারেটিভ স্টাডি অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড দা ইউনাইটেড স্টেটস', বি. লিণ্ডেম্যান ও ডি. কাদুই-এর 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইন এমপ্লয়মেন্ট ল', এন. রুবেনস্টাইনের 'প্রিভেন্টিং অ্যাণ্ড রেমিডিং সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অ্যাট ওয়ার্ক : আ রিসোর্স ম্যানুয়াল' প্রভৃতি।

'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট'কে কখনো কখনো 'সেক্সুয়াল ব্ল্যাকমেইল' বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যৌন হয়রানির কারণ সম্পর্কে প্রচলিত অতিকথা হলো যে নারীরা যেহেতু পুরুষের দৃষ্টিতে সুন্দরী, তাই পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে এ'জাতীয় হয়রানি ঘটে। প্রকৃত সত্য হলো নারীদেহের আকর্ষণের জন্য প্রধানত এটা নয়। আসলে বৃত্তির ক্ষেত্রে শ্রমিকারা পুরুষ-নির্ভরতায় এবং উপার্জনের ও চাকুরীর নিশ্চয়তার প্রশ্নে দুর্বল অবস্থানে থাকে; এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে সাধারণত যৌন হয়রানি করা হয়। কর্মজগতে সিঁড়ি ভাঙ্গা ঊর্ধ্বগামী পদের সারিতে শ্রমিকাদের স্থান সাধারণতই নিম্ন-স্তরে। সুতরাং পুরুষের পদ-মর্যাদাগত উচ্চ অবস্থান শ্রমিকার নির্ভরশীলতার স্বাভাবিক শর্ত। তাছাড়া অতিরিক্ত উপাদান হিসাবে, ভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, যেসব শ্রমিকা বিবাহ-বিচ্ছেদী, বিধবা, অনূঢ়া, পরিবারে এক অভিভাবক প্রধান, 'লেসবিয়ান' বা নারী-সমকামী, ধর্মীয় বা বর্ণগত সংখ্যালঘু, পুরুষ-সংখ্যাধিক্য শ্রমে কর্মরত, বৃত্তিতে নব-নিযুক্তা, ঠিকা বা অস্থায়ী কর্মে যুক্তা ইত্যাদি তারাই সাধারণভাবে যৌন হয়রানির সম্মুখীন হয়। শ্রমজীবী নারীদের এই সমস্যা সমাজের 'পাওয়ার-ইক্যুয়েশন' বা 'পাওয়ার-রিলেশন'-এর তথা ক্ষমতা-সম্পর্কের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষরা যেহেতু ক্ষমতাধর, সেহেতু নারীদের অবস্থান স্বভাবতই ক্ষমতা কাঠামোর নিম্ন-স্তরে। সর্বোপরি সমাজে নারীকে যৌন-উপজীব্য ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়।

নারীরা বৃত্তিগত জীবনে যে সমস্ত প্রতিকূলতা ও আক্রমণের সম্মুখীন হয় তার মধ্যে যৌন হয়রানি হলো সর্বাপেক্ষা তীব্র এবং একই সাথে সর্বাপেক্ষা অবমাননাকর। যৌন হয়রানির শিকার শ্রমিকাদের মানসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে আকস্মিক বিরাট পরিবর্তনে, দুর্বিনীত আচরণে, নিদারুণ বিরক্তি প্রকাশে, ক্রোধোন্মত্ততায় এবং ক্ষমতাহীনতার হতাশায়। এগুলি কার্যকালে আক্রান্ত শ্রমিকার স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। দেখা যায় আবেগপ্রবণতা, মানসিক চাপ ও তজ্জনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তারা। যৌন হয়রানিতে আক্রান্তরা অনুভব করে তীব্র আবেগ-প্রবণ ক্ষত, উদ্বেগ, স্নায়বিক দৌর্বল্য, অবসাদ ও হীনম্মন্যতা। তাছাড়াও দৈহিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে এদের মধ্যে দেখা দেয় নিদ্রাহীনতা, মাথা ধরা, বমন উদ্রেক, উচ্চ রক্ত-চাপ, পাকস্থলীতে ক্ষত প্রভৃতি।

যৌন হয়রানিতে আক্রান্ত শ্রমিকার মধ্যে অনন্য অবস্থাও সৃষ্টি হয়। ক্রমাগত মানসিক বা দৈহিক অসুস্থতার জন্য কাজ থেকে তাকে প্রায়ই ছুটি নিয়ে হয়। তার দক্ষতা কমে যায় এবং কাজে ঘাটতির জন্য সুযোগ-সুবিধাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে শ্রমিকার অসুস্থতাজনিত কারণে উৎপাদনে ক্ষতি এবং তার চিকিৎসার ব্যয়ের একাংশ বহন করতে বাধ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হতে থাকে। যৌন হয়রানির

শিকার নারী শ্রমজীবী তারপরও নিযুক্ত থাকলে কম উৎপাদনশীল ও কম উদ্যোগী হয়। তার ফলে কাজের পরিমাণ ও গুণগত মান নেমে যায়।

যৌন হয়রানিতে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকা কাজের পরিবেশ সম্পর্কে এত বীতস্পৃহ হয়ে ওঠে যে সে সবসময় সচেষ্ট থাকে নিজের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে কোন নতুন কর্মক্ষেত্রে চলে যেতে। এক প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে গেলে শ্রমিকার পূর্বের চাকুরীগত ও আর্থিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পণ্ড হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠানও হারায় অভিজ্ঞ কর্মীকে। আবার নতুন শ্রমিকা সংগ্রহ করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি বাড়তি অসুবিধা ও খরচের দায় বাড়ে প্রতিষ্ঠানের। আসলে যৌন হয়রানির সমস্যা নৈতিকতার চেয়েও, পুঁজিবাদের কাছে, প্রধানত মুনাফার সমস্যা।

যৌন হয়রানির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট' শব্দটি ব্যবহার শুরু হয়। অন্যান্য দেশে, যেমন নেদারল্যাণ্ডস-এ 'আন-ওয়ান্টেড ইন্টিমেসি', ইতালিতে 'সেক্সুয়াল মোলেস্টেশন', ফ্রান্সে 'সেক্সুয়াল ব্ল্যাকমেইল' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হলেও, 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট' শব্দটিই সর্বোপযোগী হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

যৌন হয়রানিকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, একটি সর্বজনীন উপাদান এটির অভ্যন্তরে রয়েছে—যৌন হয়রানি তেমন এক বিশেষ আচরণ যা উদ্দিষ্টার কাছে অগ্রহণীয়। এই প্রসঙ্গে নীতি নির্ধারণে উল্লেখিত উপাদানটির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে।

প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে আতিশয্যপূর্ণ আচরণ এবং যৌন হয়রানিমূলক আচরণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সহকর্মীর কাছ থেকে অনাবিল রসিকতাপূর্ণ আচরণ যা স্বাভাবিক সম্ভ্রম ও সৌজন্যকে অতিক্রম করে না, তাকে যৌন হয়রানি বলা যায় না। তবে এর অর্থ এমন নয় যে এই জাতীয় রসিকতা যদি শ্রমিকার কাছে অনভিপ্রেত হয়, তথাপি এই আচরণ সঙ্গত। এমনও হতে পারে যে অনাবিল কোন রসিকতা কোন এক শ্রমিকা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলেও, পার্শ্ববর্তী কর্মরতা অন্য শ্রমিকা তা' অনুরূপভাবে গ্রহণ নাও করতে পারে। তৃতীয়ত, তথাকথিত অনাবিল কৌতুক যদি কার্যকালে মর্যাদাহানির মর্ম বহন করে বা তার দ্বারা তেমনটি প্রতিভাত হয় তবে সে আচরণও স্বীকৃত হতে পারে না। চতুর্থত, দৈহিক উত্যক্ত করার ঘটনা ও প্রবণতাও অসঙ্গত বলে বিবেচিত হওয়ার কথা, তা' যদি বাহ্যত যৌনতামূলক নাও হয়।

যৌন হয়রানির একেবারে সঠিক সংজ্ঞা ও তালিকা তৈরি করা কঠিন। কেননা কি ধরনের আচরণকে যৌন-হয়রানিমূলক বলা হবে তা' সর্বাগ্রে নির্ভর করছে উক্ত আচরণ যে নারীর উদ্দেশে ঘটছে, সে ঘটনাটিকে কিভাবে গ্রহণ করছে।

যৌন হয়রানি বলতে বোঝায় তেমন কোন আচরণ যার রূপ ও চরিত্র যৌনতামূলক। 'আমেরিকান ইক্যুয়াল অপরচুনিটি কমিশন' কর্তৃক ১৯৮০ সালে গৃহীত এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী 'গাইডলাইনস অন সেক্সুয়াল হ্যারসমেন্ট'-এ বিষয়টিকে উল্লেখ করেছে, "যৌনতা-ধর্মী মৌখিক অথবা দৈহিক আচরণ"কে। ১৯৯১ সালে, 'কমিশন অব ইউরোপীয়ান কমিউনিটিজ' কর্তৃক গৃহীত 'কোড অব প্র্যাকটিস অন মেজারস টু কমব্যাট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট'-এ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমন ধরনের যৌনতা-চরিত্রের আচরণ সম্পর্কে যা "দৈহিক, মৌখিক অথবা অনুচ্চারিত।"

যৌনতা-চরিত্রের শারীরিক আচরণ : এই সংজ্ঞার অন্তর্গত হলো তেমন আচরণসমূহ যা ছড়িয়ে রয়েছে অহেতুক স্পর্শ করা বা চাপড়ানো অথবা খোঁচানো কিংবা শ্রমিকার শরীরের সাথে দেহ ঘষাঘষি করা—যার উদ্দেশ্য হলো নির্যাতন করা অথবা যৌন-সম্পর্ক স্থাপনে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি। কারখানা বা অফিসের বাইরে, রাস্তায় বা অন্যত্র পূর্বোক্ত ধরনের যে কোন তৎপরতাকে দুষ্কৃতীর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

যৌনতা-চরিত্রের মৌখিক আচরণ : এই ধরনের কাজের অন্তর্গত হলো অনভিপ্রেত বা উদ্দিষ্টার ইচ্ছাবহির্ভূত যৌনতামূলক ইঙ্গিত, বক্তব্য, প্রস্তাব, যৌন আচরণে বাধ্য করতে চাপ সৃষ্টি বা ভীতি প্রদর্শন, কর্মক্ষেত্রের বাইরে সামাজিক মেলামেশার জন্য শ্রমিকাকে প্রস্তাব দেওয়া বা চেষ্টা চালানো

যা ইতোপূর্বে শ্রমিকা প্রত্যাখ্যান করেছে, অবমাননাকর ছিনালি বা টুসকি মারা, অর্থবহ (যৌনতামূলক) বক্তব্য বলা, বক্রোক্তি, কামুক মন্তব্য ইত্যাদি। শ্রমিকার প্রতি এই জাতীয় আচরণ প্রমাণ করে যে তাকে সহকর্মী হিসাবে বিবেচনার পরিবর্তে যৌন উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে।

অ-মৌখিক যৌনতা-চরিত্রের আচরণ ঃ এই আচরণের অন্তর্গত হলো রতিক্রিয়ামূলক (পর্নগ্রাফিক) বা যৌনতা-উৎসাহবর্ধক ফটো-চিত্র, বিষয়বস্তু বা লিখিত বিষয় প্রদর্শন; কাম-লালসাপূর্ণ বঙ্কিম কটাক্ষ, শিস্ দেওয়া অথবা যৌনতা-ধর্মী অঙ্গ-ভঙ্গি প্রভৃতি। যে শ্রমিকারা তার সহকর্মীর সাথে পেশাদারী মর্যাদাসহ আচরণ প্রকাশ করে থাকে, পূর্বোক্ত আচরণগুলি সেই শ্রমিকাদের অস্বস্তির সৃষ্টি করে, তাদের মর্যাদাহীন করে অথবা কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক আচরণ করা থেকে বিরত হতে বাধ্য করে।

যৌনতা-ভিত্তিক আচরণ ঃ যৌন হয়রানির অর্থ সবসময় যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টামাত্র নয়, বরং বলা চলে শ্রমিকার বিরুদ্ধে পুরুষের দ্বারা শক্তির এক ধরনের প্রকাশ। এই ধরনের তৎপরতা সাধারণত দেখা যায় অপ্রথাগত চরিত্রের কাজে অথবা যেখানে নারীর বৃত্তি প্রধানত অনিশ্চয়তামূলক। অর্থাৎ কাজের পরিস্থিতি এমন যে, হয় শ্রমিকাকে যৌন আত্মসমর্পণ করতে হবে অন্যথায় চাকুরী হারাতে হবে। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রগুলিতে যৌন হয়রানি সহকর্মী শ্রমিকাদের পক্ষ থকে যতটা না ঘটে তার চেয়ে বেশি ঘটে ব্যবস্থপনার কর্তৃপক্ষ, সুপারভাইজর প্রভৃতিদের কাছ থেকে। ছোট ছোট ফার্ম, অফিস বা কারখানায় যেখানে মালিক, ব্যবস্থাপক বা সুপারভাইজরদের সাথে শ্রমিকা সরাসরি যুক্ত থেকে কাজ করে সেখানে শেষোক্ত প্রবণতা বেশি। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের যেখানে 'ফ্লেক্সি-ওয়ার্ক' পদ্ধতি বা সাব-কন্ট্রাক্টরি প্রথায় কাজ হয়, ফ্রী ট্রেড জোনে ব্যারাকে বাসস্থানভিত্তিক চাকুরী, গারমেন্ট, লেদার, ইলেকট্রনিকস যন্ত্রাংশ নির্মাণ বা অ্যাসেমব্লিং-এর কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা বেশি কাজ করে। সেই সমস্ত কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির প্রাবল্য দেখা যায়। তার অর্থ এই নয় যে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এর প্রকোপ নেই। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাপান, ইতালি, আমেরিকা প্রভৃতির সুবৃহৎ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি নিয়ে সংবাদপত্রে তোলপাড় চলেছে। এমনকি আমেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কর্মরতা ৬৫ ভাগ নারীদের যৌন হয়রানি ঘটেছে বলে ১৯৯৬ সালে রিপোর্ট রয়েছে।

যৌন হয়রানি কেবলমাত্র উন্নত দেশগুলির প্রবণতা—এমন ধারণাও ভ্রান্ত; যদিও এযাবৎকাল প্রধানত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রসঙ্গটি নিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার, আলোচনা, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, নিবারণমূলক আইন প্রণয়ন প্রভৃতি হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলিতে এই বিষয়ে কার্যত তেমন কিছুই হয়নি। কিন্তু যৌন হয়রানির পরিস্থিতি, তৃতীয় দুনিয়ায় সম্ভবত সবচাইতে ভয়ঙ্কর। ইঁট-ভাটা, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথা, গৃহ-নির্মাণ শিল্প, মৎস্য-চাষ ও বিপণন, কৃষি-খামার, তালা-নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশের যে তথ্য সংগ্রহ ও কিছুটা গবেষণা হয়েছে, তাতে ব্যাপক ও সর্বজনীন চরিত্রের যৌন হয়রানির অব্যাহত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বন্ধে উদ্যোগ

'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অ্যাট ওয়ার্ক' যেভাবে পুঁজিবাদের স্বঘোষিত 'লিবারাল ডেমোক্র্যাসি'র ভাবমূর্তিকে আক্রমণ করেছে, তাতে তাদের সমস্ত অংশই সচকিত হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী, বিশেষত উন্নত দেশগুলির সরকার, বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি, মালিকদের সংগঠন, নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন, এমনকি দক্ষিণপন্থী বা বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি এ বিষয়ে এখন তৎপর। প্রসঙ্গটি নিয়ে যৌথ কার্যক্রম পর্যন্ত গৃহীত হতে শুরু করেছে।

(ক) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্তরে যৌথ-চুক্তি এবং নীতিগত ঘোষণার প্রয়াস

কানাডা, ডেনমার্ক, ইতালি, নেদারল্যাণ্ডস, নিউজিল্যাণ্ড, স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক-মালিক যৌথ চুক্তির শর্তাবলীতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের নানা শর্ত যুক্ত করা হচ্ছে। কানাডা ও নেদারল্যাণ্ডস ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষের মধ্যে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া, সমস্যা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে যৌথ দর-কষাকষির ক্ষেত্রে যৌন হয়রানির প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ক্রমশ বেশি করে, যদিও নেদারল্যাণ্ডসে

যৌথ দর-কষাকষির ক্ষেত্রে এগুলি বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে যৌন হয়রানির বিরোধিতা করে নীতিগত ঘোষণা, নির্দেশ বা আচরণবিধি ঘোষিত হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, নেদারল্যাণ্ডস, সুইডেন, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশসমূহে। সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক স্তর থেকে সার্কুলার বা সারণীর মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে এগুলি প্রচার করা হয়।

যৌথ চুক্তি বা নীতিগত ঘোষণা প্রভৃতির অভ্যন্তরে যে ধরনের বক্তব্য গৃহীত বা ঘোষিত হয়, সেগুলির সাধারণ চরিত্র নিম্নরূপ ঃ

প্রসঙ্গটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয় যৌন-নিরপেক্ষভাবে; অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়েই যেন যৌন হয়রানির শিকার। কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় যে নারীরাই প্রধানত আক্রান্ত।

নীতিতে সাধারণভাবে ঘোষণা করা হয় যে যৌন হয়রানি হলো অসমর্থনীয় আচার-আচরণ, যা বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিষ্ঠানগুলি জানিয়ে দেয় যে এই জাতীয় ঘটনা শৃঙ্খলাভঙ্গের আচরণ হিসাবে গণ্য হবে এবং সেজন্য চাকুরী থেকে বরখাস্ত পর্যন্ত শাস্তি হতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রেই কোন ধরনের আচরণকে যৌন-হয়রানিমূলক বিবেচনা করা হবে, তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যাও লিখিত বক্তব্যে বলা হয়।

যৌন হয়রানি এক চরম সংবেদনশীল প্রসঙ্গ যা একই সঙ্গে সংঘটক, আক্রান্ত ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক হতে পারে। এমন বিবেচনা থেকে অনুরূপ অভিযোগের নিষ্পত্তি করার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অ-আনুষ্ঠানিক নানা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের বক্তব্য থাকে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে অনুসন্ধান অনুসৃত হবে গোপনভাবে এবং দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে।

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা কর্মীবৃন্দের স্তরে একজনকে এ'বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হয়। অভিযোগকারিণীকে সাহায্য, পরামর্শ ও সমর্থন দেবার জন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান সাধারণভাবে নিয়োগ করে থাকে কোন দক্ষ মহিলাকেও।

কোন কোন চুক্তিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠান সর্বক্ষণ কি ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং সে'বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সময়ে সময়ে জানাবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

কোন কোন চুক্তিতে বা ঘোষণাতে প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত বা প্রতিষ্ঠানের সীমানার মধ্যে কাজ করে এমন ঠিকাদার, ক্রেতা, প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক সহযোগী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে অনুরূপ ব্যবস্থা নেবার বক্তব্যও সংযুক্ত থাকে।

(খ) মালিকদের সংগঠনের ভূমিকা

কর্মক্ষেত্রকে যৌন হয়রানির পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখার দাবী প্রথম যখন উঠেছিল, মালিকরা বলার চেষ্টা করেছিল যে যৌন হয়রানি ব্যক্তিগত ব্যবহার ও আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিষয়; সুতরাং এ'বিষয়ে তাদের করণীয় কিছু নেই। কিন্তু অবস্থার ক্রমবর্ধমান চাপে তারা বুঝতে শুরু করে যে বিষয়টি প্রকৃতই শিল্প-ব্যবস্থাপনার ও তাদের নিজেদের স্বার্থের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত।

কোন কোন প্রতিষ্ঠান, প্রসঙ্গটি প্রথমদিকে শৃঙ্খলার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করেছিল। 'নিউজিল্যাণ্ড এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন' বিষয়টিকে মানবাধিকারের প্রসঙ্গ এবং কর্মচারী-বিষয়ক নীতির অন্যতম যথার্থ উপাদান হিসাবে বিবেচনার কথা বলে। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ক্রমশ বিষয়টি লঘু করে দেখতে পারছিল না। 'দা ইউনিয়ন অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড এমপ্লয়ার্স কনফেডারেশনস অব ইউরোপ' (ইউ. এন. আই. সি. ই.) স্বীকার করে নেয় যে যৌন হয়রানিকে ধিক্কার জানানো এবং প্রতিহত করা দরকার। কিন্তু তারা বলে যে একদিকে যেমন এই হয়রানি বন্ধ করতে হবে অন্যদিকে এটাও দেখতে হবে যে কেউ যেন মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত না হয়। তারা এও বলে যে যৌন হয়রানি প্রতিকারের দায় একমাত্র মালিকদের নয়, মালিক-শ্রমিক উভয়ের সমান দায়িত্ব রয়েছে এই বিষয়ে। কোন কোন মালিক সংগঠন এটাও মনে করতো যে প্রসঙ্গটি নিয়ে সরকারী আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। তারা আরও

বলেছে যে যৌন হয়রানির দায় মালিকদের ওপর বর্তাতে পারে না, বিশেষত পরিষেবা ক্ষেত্রে, যেখানে শ্রমিকারা ভোক্তাদের দ্বারাও অনুরূপ হয়রানির সম্মুখীন হতে পারে।

মনোভাব ও বক্তব্য যাই থাক না কেন, ধীরে ধীরে মালিকদের বহু সংগঠন বিবৃতি প্রকাশ করে তাদের সদস্যদের যৌন হয়রানির স্বরূপ, করণীয় প্রভৃতি সম্পর্কে নির্দেশিকা দিয়েছে। লাইন-ম্যানেজার ও সুপারভাইজরদের বলা হয়েছে, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সদা-সতর্ক থাকতে। মালিকদের সংগঠনগুলি যৌন হয়রানির ঘটনায় বিস্তৃত অনুসন্ধান ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার কথা বললেও, কোন কোন মালিক সংগঠন মনে করে যে দ্রুত অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রচেষ্টায় ভুল হবার আশঙ্কাও থেকে যায় তাই ধীরে ও সতর্কভাবে এই প্রক্রিয়ার কাজ করতে হবে।

যৌন হয়রানি সম্পর্কে দেশে দেশে মালিকদের যেসব সংগঠন পূর্বোক্ত কোন না কোন ধরনের সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা নিয়েছে সেগুলির অন্যতম হলো অস্ট্রিয়ার 'বুণ্ডেসকাম্মার ডের গেওয়ারব্রিচেন উইরস্চ্যাফট' (ফেডারেল চেম্বার্স অব কমার্স) ও 'ভেরিংগুং অস্টারিচিশেয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়েলের' (ডি. ও. আই.) (ফেডারেশন অব অস্ট্রিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিজ), আয়ারল্যাণ্ডের 'ফেডারেশন অব আইরিশ এমপ্লয়ার্স', নিউজিল্যাণ্ডের 'নিউজিল্যাণ্ড এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন', ব্রিটেনের 'কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইণ্ডাস্ট্রিজ' (সি. বি. আই.), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানুফ্যাকচারার্স' (এন. এ. এম.), 'ইউনিয়ন অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ার্স কনফেডারেশনস অব ইউরোপ' (ইউ. আই. সি. ই.) প্রভৃতি।

(গ) বিভিন্ন দেশের সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও উদ্যোগ

অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ডস সরকার যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করেছে বা করছে। অস্ট্রিয়া সরকার তাদের 'ইক্যুয়ালিটি অব ট্রিটমেন্ট অ্যাক্ট' সংশোধন করে তাতে যৌন হয়রানিকে এক ধরনের বৈষম্য হিসাবে দেখেছে এবং স্বীকার করেছে আক্রান্তার ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকার। ফ্রান্সে 'সেক্রেটারি অব স্টেট ফর উইমেনস অ্যাণ্ড কনজিউমারস রাইটস' শ্রম আইনের সংশোধন ঘটিয়েছে মালিক বা ক্রেতার কাছ থেকে সুযোগ নিতে শ্রমিকাকে যৌন সুযোগ দেবার জন্য চাপ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থান হয়েছে নতুন আইনে। নেদারল্যাণ্ডসের 'ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট অ্যাক্ট'-এর সংশোধন করে বৃত্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের অংশ হিসাবে এবং মালিকদের দায়িত্ববদ্ধ করে শ্রমিকাদের যৌন হয়রানি থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। বেলজিয়ামে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে খসড়া আইন তৈরি হলেও, এই আইনের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা' আরও পরীক্ষা করে দেখার জন্য সময় চেয়ে নিয়েছে 'ন্যাশনাল লেবার কাউন্সিল'।

বহু দেশের সরকারী বিভিন্ন দপ্তর ও পরামর্শদাতা কমিটি স্বীকার করে যে যৌন হয়রানি, যার সাথে ব্যক্তিগত আচার-আচরণ যুক্ত, তা' নিছক আইন প্রণয়নের দ্বারা বন্ধ করা যাবে না। এ'বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার মনে করে যে আইন প্রণয়নের চেয়ে বেশী দৃষ্টি দেওয়া দরকার কিভাবে আটকানো যায় যৌন হয়রানির সম্ভাবনাকে। কানাডার 'হিউম্যান রাইটস কমিশন' যৌন হয়রানির স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করতে মালিকদের পরামর্শ দিয়েছে শ্রমিকদের সুশিক্ষিত করার। জার্মানির 'মিনিস্ট্রি অব উইমেন অ্যাণ্ড ইয়ুথ' শ্রমিকদের চাকুরীদানের চুক্তির এক খসড়া নমুনা পাঠিয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলিকে; তাতে বলা হয়েছে যে চাকুরী পাওয়ার সময় শ্রমিককে মুচলেকা দিতে হবে যে সে অন্যের ক্ষতিকর কোন ধরনের যৌন হয়রানি ঘটাবে না এবং প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি নিষেধ। অনুরূপ উদ্যোগ নিয়েছে অস্ট্রিয়ার 'মিনিস্ট্রি অব উইমেনস অ্যাফেয়ার্স'ও। নেদারল্যাণ্ডের 'মিনিস্ট্রি অব সোস্যাল অ্যাফেয়ার্স অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট' মালিকদের ও 'ওয়ার্কস কাউন্সিল'কে এ'বিষয়ে উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করছে এবং লেবার ইন্সপেক্টরদের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দায়বদ্ধ করেছে।

বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ সরকারী প্রতিষ্ঠান মনে করে যে যৌন হয়রানি হলো লিঙ্গবাদ-ভিত্তিক এক ধরনের বৈষম্য। তারা বলে যে এই জাতীয় হয়রানি হলো এক ধরনের উৎপীড়ন যা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভর করে দাঁড়াতে চায়। এই প্রবণতা নারীদের প্রতি সমাজের পরম্পরাগত মনোভাবের প্রকাশ। কর্মের জগতে নারীদের বিচ্ছিন্ন করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে,

তার প্রতিফলন এই জাতীয় ঘটনা। সে'কারণে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সুপারিশ করে যে শ্রম-শক্তিতে নারীদের ভূমিকা সংহত ও দৃঢ় করার জন্য সম-সুযোগ দানের নীতিকে শক্তিশালী করা দরকার। বিদ্যালয় শিক্ষার স্তর থেকে এ'বিষয়ে সবার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার কথাও তারা বলেছে। বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস ও ব্রিটেনে যৌন হয়রানির বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের প্রচার কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে।

এসব নানা ভূমিকা সত্ত্বেও মাত্রা বেড়েছে যৌন হয়রানির। অন্যদিকে সরকার কতখানি দায়িত্ব গ্রহণ ও ভূমিকা পালন করতে পারে সে'বিষয়ে এখনও যথেষ্ট মতপার্থক্য ও সতর্কতা রয়েছে নিজেদের মধ্যে।

পূর্বোক্ত সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরে ইতর-বিশেষ করে যেসব সরকারের বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেগুলির অন্যতম হলো অস্ট্রিয়ার 'বুনডেস্‌মিনিস্‌টেরিয়াম ফুর আরবেইট অ্যাণ্ড সোজিয়ালেস' (ফেডারেল মিনিস্ট্রি অব লেবার অ্যাণ্ড সোস্যাল অ্যাফেয়ার্স) ও 'বুনডেস্‌মিনিস্‌টেরিয়াম ফুর ফ্রাউয়েনান গেলিগেনহেইথেন' (ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর উইমেন অ্যাফেয়ার্স), বেলজিয়ামের 'মিনিস্টেরি ডি আই' এমপোলি এট্ ডু ট্রাভেইল, কমিশিওন ডু ট্রাভেইল ডেস ফেমিস' (মিনিস্ট্রি অব এমপ্লয়মেন্ট অ্যাণ্ড লেবার কমিশন অন দা এমপ্লয়মেন্ট অব উইমেন), ফ্রান্সের 'মিনিস্টারি ডি. আই' ইকনমি অ্যাট ডেস ফেমিস অ্যাট আ লা কনসোমেশন (মিনিস্ট্রি অব ইকনমি অ্যাণ্ড ফিনান্স, সেক্রেটারিয়েট অব স্টেট ফর উইমেনস্ অ্যাণ্ড কনজিউমারস রাইটস), জার্মানির 'বুনডেস্‌মিনিস্টেরিয়াম ফুর ফ্রাউয়েন অ্যাণ্ড জুগেণ্ড' (ফেডারেল মিনিস্ট্রি অব উইমেন অ্যাণ্ড ইয়ুথ), আয়ারল্যাণ্ডের 'এমপ্লয়মেন্ট অব ইক্যুয়ালিটি এজেন্সি' (মিনিস্ট্রি অব লেবারের অংশ), জাপানের টোকিও মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট, নেদারল্যাণ্ডসের 'মিনিস্টেরেই ভ্যান সোসিয়েল জাকেন এন ওয়েৰ্কজেলেনজেনহেইড' (মিনিস্ট্রি অব সোস্যাল এ্যাফেয়ার্স অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট), ব্রিটেনের ডিপার্টমেন্ট অব এমপ্লয়মেন্ট প্রভৃতি।

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির উদ্যোগ

সারা পৃথিবী জুড়ে এ'বিষয়ে নতুন অবস্থা গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেড ইউনিয়নের সামনেও নতুন অ্যাজেণ্ডা উপস্থিত হয়েছে। দক্ষিণপন্থী বা উদারনীতিবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলিও এই পরিস্থিতির চাপ উপেক্ষা করতে পারছে না। টি. ইউ.গুলির সম্মেলনের রিপোর্ট ও আলোচনাতে, সেমিনারে, মুখপত্রের বিষয়বস্তুতে, সদস্যদের মধ্যে সর্বক্ষণের ক্যাম্পেনের অন্যতম প্রসঙ্গ হিসাবে, দাবী-সনদে, মালিকপক্ষের সাথে দর-কষাকষি ও চুক্তি-স্বাক্ষরে এখন এটি জীবন্ত প্রসঙ্গ।

'ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রী ট্রেড ইউনিয়নস' (আই. সি. এফ. টি. ইউ.)-এর মতে "যৌন হয়রানি ট্রেড ইউনিয়নের কাছে এক অনতিক্রম্য ও যুক্তিসঙ্গত প্রসঙ্গ", কেননা এটি বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ এবং শ্রমিকাদের মর্যাদা ও স্বাস্থ্য-হানি করে। তবে উন্নত দেশগুলির সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত প্রসঙ্গটিকে খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন অথবা সুইজারল্যাণ্ডের ট্রেড ইউনিয়নগুলি মনে করে যে সর্বকালে ট্রেড ইউনিয়ন, নির্দিষ্ট কোন অংশের স্বার্থের পরিবর্তে, শ্রমিকদের সামগ্রিক স্বার্থই তুলে ধরে এসেছে। সেই বিচারে যৌন হয়রানি এক খণ্ড অংশের সমস্যা। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পূর্বোক্ত দেশগুলির শ্রমিক সংগঠনসমূহ যৌন হয়রানিকে বিবেচনা করে দাবী-দাওয়ার পরিমাণগত দিকের এক অংশ বলেই; কোন মৌলিক ও সর্বজনীন প্রসঙ্গ হিসাবে নয়। এদের মতে যৌন হয়রানিতে দৃশ্যত প্রতিফলিত আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ঐ দেশগুলি ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আয়ারল্যাণ্ড, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়নগুলি আশঙ্কা করে যে যৌন হয়রানির ঘটনা আন্তঃব্যক্তিগত আচরণের সীমা অতিক্রম করে আন্তঃইউনিয়ন চরিত্রও কখনো নিতে পারে অর্থাৎ এক ইউনিয়নের সদস্যের দ্বারা অন্য ইউনিয়নের সদস্যার যৌন হয়রানি ঘটতে পারে। তখন বিষয়টি নতুন মাত্রা ও সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে—যা আন্তঃইউনিয়ন জটিলতার চরিত্র নেবে। এই বিশ্লেষণ থেকে পূর্বোক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি অধিক মনোযোগ দেয় যৌন হয়রানির বিষয়ে

(ক) সংগঠনের অভ্যন্তরে নীতিগত ও কার্যকরী পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য, (খ) বিষয়টিকে কেবল নারী প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করার পরিবর্তে এক সর্বজনীন বিষয় হিসেবে বিচার করে সমগ্র প্রচার-কার্যের মূল-ধারায় যুক্ত করতে, এবং (গ) এ'বিষয়ে কথ্য প্রচার ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা নেয় তাদের সচেতন করার জন্য।

অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি যৌন হয়রানির বিষয়ে সরকারী আইন প্রণয়নের জন্য বেশি উদ্যোগী। ট্রেড ইউনিয়নগুলি চাপ সৃষ্টি করে যৌন হয়রানির এক ব্যাপক ও সর্বজনীন সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য। তাদের মতে আইন প্রণয়নের দ্বারা শ্রমিকাদের অধিকার রক্ষা এবং নিয়োগকারীদের দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে স্থির হওয়া দরকার। আইনের বাধ্যতার দ্বারা মালিকপক্ষকে নিরোধমূলক ভূমিকা গ্রহণে উদ্যোগী করা সম্ভব বলে তারা মনে করে। আইনের ব্যবস্থার মধ্যে অভিযোগকারিণী ও সাক্ষীদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত বা অন্যান্য ধরনের হয়রানির আশঙ্কার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ থাকা দরকার বলে দাবী করে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। অভিযোগকারিণীর উপর ঘটনার সত্যতা প্রমাণের দায় থাকা উচিত নয় বলে তাদের স্পষ্ট দাবী।

অবশ্য আইন প্রণয়নের জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি উদ্যোগ নিলেও, তারা এটাও মনে করে যে সংঘবদ্ধভাবে জাতীয় স্তরে বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে প্রচার চালানো দরকার। যৌথ দর-কষাকষির সময় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এ'বিষয়ে প্রাপ্ত আইনের সুযোগগুলি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালায়। উদারনৈতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির ধারণা যে মালিকপক্ষ ও ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগের দ্বারাই কেবলমাত্র যৌন হয়রানি নির্মূল করা সম্ভব, যে কারণে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যাপারে এইসব ট্রেড ইউনিয়ন জোর দেয় উভয় অংশের অংশগ্রহণের প্রতিও।

বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন মালিকপক্ষের সাথে যৌথ চুক্তিতে যৌন হয়রানির বিষয় যুক্ত করার ব্যাপারে বক্তব্যের 'মডেল' বয়ান তৈরি করে শাখা সংগঠনগুলির মধ্যে প্রচার করে। এইসব মডেল বক্তব্যগুলিতে যৌন হয়রানির সংজ্ঞা ও চরিত্র, একে অবশ্য প্রতিহত করার বক্তব্য ও পদ্ধতি, কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব প্রভৃতির উল্লেখ থাকে। কোন কোন বয়ানে ট্রেড ইউনিয়নের নিজস্ব করণীয় সম্পর্কেও বলা হয়। মালিকপক্ষকে লিখিত ঘোষণা প্রচার করতে হবে যে প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বরদাস্ত করা হবে না—এমন শর্তও চুক্তিতে যুক্ত করে দেওয়া হয়। শৃঙ্খলা-বিষয়ক বিভিন্ন ধারাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকে।

বেশ কিছু দেশের ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গটিকে যুক্ত করেছে তাদের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক নীতি ও কর্মধারার মধ্যে। তারা ঘোষণা করেছে যে যৌন হয়রানি ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম অ্যাজেণ্ডা। অনুমোদিত শাখা সংগঠনগুলিকে তারা সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য আইনগত ও চুক্তিগত রণনীতি গড়ে তোলার জন্য সাংগঠনিকভাবে উৎসাহিত করে। কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন তাদের নীতির মধ্যে এই নিশ্চয়তাও দেয় যে অভিযোগকারিণী ট্রেড ইউনিয়নের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবে। বিষয়টি নিয়ে বিচার করার জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার দাবীও ট্রেড ইউনিয়নগুলি জানায়। যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটলে আনুষ্ঠানিক স্তরে নিষ্পত্তির চেষ্টা থাকে। বেশির ভাগ ট্রেড ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে যৌন হয়রানিতে অভিযুক্ত বা যুক্ত কোন সদস্যকে তারা সমর্থন করবে না। কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন অনুরূপ ঘটনায় তাদের সদস্য যুক্ত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কোন সদস্যের দ্বারা যৌন হয়রানির সংবাদ পেলে, কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে। কোন কোন ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় স্তরে অনুরূপ বিষয়ে স্থায়ী বিভাগ ও কমিটি রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে আমেরিকার প্রভাবাধীন 'ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রী ট্রেড ইউনিয়নস (আই. সি. এফ. টি. ইউ.)-এর উইমেনস ব্যুরো ১৯৮৬ সালে এ'বিষয়ে নীতিগত ঘোষণা প্রকাশ করেছে। তাতে যৌন হয়রানি কি, কারা এর শিকার, কারা সাধারণত হয়রানি করে, যৌন হয়রানির ফল ও প্রভাব, কিভাবে হয়রানির মোকাবিলা করতে হবে প্রভৃতির নির্ণয়করণ

হয়েছে। পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় সম্পর্কে তারা প্রকাশ করেছে দীর্ঘ দলিল। ১৯৯২ সালে 'ইউরোপীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনে'র (ই. টি. ইউ. সি.)এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে যৌন হয়রানি সম্পর্কে ৬-দফা বক্তব্য-সম্বলিত এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

যৌন হয়রানি বিষয়ে দেশভিত্তিক যেসব ট্রেড ইউনিয়ন উদ্যোগ নিয়েছে সেগুলির কিছু নাম তথ্য আকারে এখানে দেওয়া হলো। অস্ট্রেলিয়াতে 'অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস' (এ. সি. টি. ইউ), অস্ট্রিয়ার 'বুণ্ডেসারবেইটসকামার' (ফেডারেল চেম্বার অব লেবার), বেলজিয়ামের 'কাউন্সেইল ন্যাশনাল ডু ট্রাভেইল' (সি. এন. টি/ন্যাশনাল লেবার কাউন্সিল), কানাডার 'কানাডিয়ান লেবার কংগ্রেস' (সি. এল. সি.), 'কানাডিয়ান ইউনিয়ন অব পাব্লিক এমপ্লয়িজ' (সি. ইউ. পি. ই.) এবং 'কানাডিয়ান ব্রাদারহুড অব রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট অ্যাণ্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স' (সি. বি. আর. টি. অ্যাণ্ড. জি. ডব্লু.), ফ্রান্সের 'কনফেডারেশন ফ্রান্সাইজ ডু ট্রাভেইল' (সি. এফ. ডি. টি.) (ফ্রেঞ্চ কনফেডারেশন অব ডেমোক্র্যাটিক ট্রেড ইউনিয়নস), 'অ্যাসোসিয়েশন ইউরোপীনি কনট্রি লেস ভায়োলেন্সেস ফেইটিজ অউক্স ফেমিস অউ ট্রাভেইল' (এ. ভি. এফ. টি.) (ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন টু কমব্যাট ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক), জার্মানিতে 'ডুট্সচার গেওয়ের্কসচাফ্টসবাণ্ড' (ডি. জি. বি.) (জার্মান কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস), আয়ারল্যাণ্ডের 'আইরিশ কংগ্রেস অব ট্রেড ইউনিয়নস' (আই. সি. টি. ইউ.), ইতালির 'কনফেডেরোজিওনি জেনেরাসি ডেল লাভেরো' (সি. জি. আই. এল.) (ইতালিয়ান জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার) এবং 'কনফেডেরেজিওনি জেনারালি ইতালিয়ানা ডেল লাভরো/কনফেডেরেজিওনি ইতালিয়ানা ডেই সিণ্ডাকাটি লাভোরেটোরি' (সি. আই. এস. এল.)/ 'ইউনিওনি ইতালিয়ানা ডেললাভারো' (ইউ. আই. এল.) প্রভৃতি এবং ইতালিয়ান জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার/ ইতালিয়ান কনফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন/ ইতালিয়ান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি সম্মিলিতভাবে; নেদারল্যাণ্ডসের 'স্টিচটিঙ্ ভ্যান ডি অরবেইড' (লেবার ফাউণ্ডেশন) ও 'ব্রাউএন বণ্ড, ফেডেরেটেই নেদারল্যাণ্ডস ভ্যাগ্বেউয়েইঙ্' (এফ. এন. ডি.) (উইমেনস্ সেক্রেটারিয়েট কনফেডারেশন অব ডাচ ট্রেড ইউনিয়নস), নিউজিল্যাণ্ডের 'পাব্লিক সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন' (পি. এস. এ.), স্পেনের 'সেক্রেটারিয়া ডি. লা. মুজের, কনফেডেরেসিওন সিণ্ডিকাল ডি. কমিসিওনিস অবরেরোস (সি. সি. ও. ও.) (উইমেন্স সেক্রেটারিয়েট, ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স কমিটিস) এবং 'ইউনিয়ন জেনারাল ডি. ট্রাবাজাডোরেস (ইউ. জি. টি.), ডিপার্টমেন্টো ডি লা মুজের' (জেনারেল ইউনিয়ন অব ওয়ার্কার্স, উইমেন্স ডিপার্টমেন্ট) সুইজারল্যাণ্ডে 'ইউনিয়ন সিণ্ডিকেলে সুইসি' (ইউ. এস. এস.) (সুইস ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস), ব্রিটেনের 'ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস' (টি. ইউ. সি.), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার—কংগ্রেস অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অরগানাইজেশনস (এ. এফ. এল.-সি. আই. ও.) ও 'কোয়ালিশন অব লেবার ইউনিয়ন উইমেন' (সি. এল. ইউ. ডব্লু.) প্রভৃতি।

উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের পক্ষ থেকে দুনিয়াকে এক ছাঁচে ঢেলে সাজাবার প্রচেষ্টার কতকগুলি ফলাফলকে পূর্বে দেখানো হয়েছে। সেগুলি প্রধানত আর্থনীতিক স্তরে বিভিন্ন পরিণাম। দৃশ্যমান এইসব দিক ছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ঘটছে। সেগুলি উল্লেখ করার আগে বিশ্বায়নের প্রচেষ্টায় প্রধান কারক শক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন। নব-প্রযুক্ত 'প্রোডাকশন-প্রসেস' বা উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং 'লেবার-প্রসেস' বা শ্রম-প্রক্রিয়াকেই সম্ভবত প্রধানতম শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। উৎপাদন ব্যবস্থাকে 'সোস্যাল ফর্মেশন' তথা সামাজিক গঠনের সর্বপ্রধান ও প্রায় নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বকারী শক্তি বলে চিহ্নিত করার পশাপাশি 'প্রোডাকশন-প্রসেস' ও 'লেবার-প্রসেস'কে ব্যাখ্যা করা চলে ওয়ার্কিং ক্লাস ফর্মেশন তথা শ্রমজীবীদের শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীগুলির সুনির্দিষ্ট রূপ অর্জনের কারক শক্তি হিসাবে। সুতরাং সামাজিক গঠনে এই দু'টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে বিভিন্ন ধরনের

উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে যত বিশদ আলোচনা হয়েছে, ততো বিশদ আলোচনা হয়নি সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া নিয়ে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনাগুলির ক্ষেত্রেও একথা অনেকাংশে সত্য। তদুপরি সমাজতাত্ত্বিকরা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়াকে আলাদা আলাদা উপাদান হিসাবে যতটা আলোচনা করেছেন, ততটা আলোচনা করেননি দু'টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরস্পরের উপর প্রভাব নিয়ে। কোন কোন সামজতাত্ত্বিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন। ধনতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে শ্রমজীবীদের শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীগুলির পরিবর্তন নিছক আঙ্গিকের রূপান্তর বা নতুন ধরনের শ্রমজীবীদের গঠন, সে সম্পর্কে অতীতে ব্যাখ্যা করেছিলেন অতি নগণ্য সংখ্যক সমাজতাত্ত্বিক। অবশ্য প্রবাহমান বাস্তবতাই স্বয়ং প্রতিবন্ধকতা হিসাবে ছিল। প্রথমত, প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজগুলিতে শত শত বছর ধরে প্রায় একই উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে। তার ফলে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি দৃশ্যত অপরিবর্তিত থেকেছে। উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করা হতো অনঢ় বলে। দ্বিতীয়ত, প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাগুলির কোন কোন স্তরে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার যে সামান্য পরিবর্তন ও তার ফলে সংশ্লিষ্ট শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির রূপের যে পরিবর্তন ঘটতো, তার বিকাশ ও প্রকাশের গতি ছিল অতীব মন্থর। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করা ছিল বহুলাংশে দুঃসাধ্য। বিশ্ব-সমাজ পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থাতে পৌঁছে নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের (বাষ্প-শক্তির আবিষ্কার) ফলে প্রথাগত উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ও তার ফলে শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করার সুযোগ পায়। কিন্তু, পরবর্তী আড়াই শ' বছরে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও শ্রমজীবীদের মূল শ্রেণীটি অর্থাৎ শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর আঙ্গিকের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি (যদিও এইসব অধ্যায়ে আরও অন্যান্য শ্রমজীবী উপ-শ্রেণীর বিবর্তন বা উদ্ভব ঘটেছিল)। প্রধানত এই ধরনের বাস্তবতা উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসাবে কাজ করেছিল।

বর্তমানের তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় আরও বিস্ফোরক ধরনের পরিবর্তনেরও ফলে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া আকস্মিক ও প্রবল ধরনের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতে প্রবেশ করেছে। পরিণামে প্রচলিত শ্রেণী, উপ-শ্রেণীগুলি আকস্মিকভাবে প্রবেশ করেছে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতে। প্রবাহমান কোন কোন শ্রমজীবীদের অংশের রূপান্তর ছাড়াও সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন শ্রমজীবী বর্গের। সবচাইতে বড় দিক হলো পরম্পরাগত শিল্প শ্রমিকশ্রেণী দৃশ্যত লোপ পাওয়ার পথে চলেছে। পাশাপাশি নতুন ধরনের শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর দারুণ পরিবর্তনের প্রবাহ সামাজিক গঠন ও সংহতকরণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে প্রবলভাবে; স্বভাবতই সমগ্র সমাজে সর্বাত্মক সংঘাত শুরু হয়ে গেছে।

তবে এই মুহূর্তে, সমগ্র প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা প্রায় অসম্ভব। কেননা সব কিছু এখনও অস্থির। তবে সেগুলির প্রধান কিছু দিক বিবেচনা করার পূর্বে, আধুনিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার বিবর্তন ও আধুনিক পরিস্থিতির উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য আধুনিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার বেশ কিছু দিক প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক আরও কিছু দিক উত্থাপিত হবে এই অধ্যায়ে। তাতে নতুন শ্রেণীগুলির নির্মাণের ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়াও কিছুটা বর্ণিত হবে।

ধনতন্ত্রের পক্ষ থেকে উৎপাদন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে পরিবর্তন সংঘটনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি ও বিকাশকে বাধা-মুক্ত করা। এই পরিবর্তন প্রথমে কার্যকরী হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে। পরিবর্তন সংঘটিত করার সাথে সাথে, পুঁজিবাদ উৎপাদিকা শক্তির মর্ম বা আঙ্গিকের গুরুতর পরিবর্তন ঘটায়। উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনই শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির পরিবর্তন বা নতুন অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে নানা পরীক্ষা-

নিরীক্ষা ও পরিবর্তন নতুন প্রসঙ্গ নয়, বরং সমগ্র পুঁজিবাদী ইতিহাসের পথ বেয়ে চলেছে; উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে পরিবর্তনও তদনুসারী হয়েছে।

তবে প্রসঙ্গটিতে প্রবেশ করার পূর্বে আরও একটি দিক উল্লেখ করা দরকার। এযাবৎকাল প্রোডাকশন-প্রসেস ও লেবার-প্রসেস প্রসঙ্গে আলোচনা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ থেকেছে শিল্প-উৎপাদনের স্তরে। অতীতে কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষত এবং অংশত হলেও পরিষেবা ক্ষেত্রে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ও ধারাবাহিক আলোচনা হয়নি। তবে সমগ্র বাস্তবতা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে বর্তমানে। উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসাবে শিল্প, কৃষি ও পরিষেবাকে এখন স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যেমন কঠিন হয়ে পড়ছে এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষেত্রগুলির পারস্পরিক অবস্থানেরও বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রতিফলন ঘটেছে এভাবেও। সর্বাধুনিক উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল। তাছাড়া, অতীতে উন্নত দেশগুলির অভ্যন্তরে প্রথমত ও প্রধানত অবস্থানগত ঘেরা বাস্তবতা থেকে এই প্রক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে সর্বজনীন ও বিশ্বজনীনতায়। পরবর্তীকালে আলোচ্য নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার জটিলতার বিভিন্ন দিকগুলি ছাড়াও, ব্যাপকতার এই দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করা দরকার। তবে এই আলোচনাতে, তিনটি ক্ষেত্র বিশেষত কৃষি ক্ষেত্র জুড়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার স্বরূপ উল্লেখিত হয়নি।

আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থায় উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং শ্রম-প্রক্রিয়া দুই সুবৃহৎ প্রসঙ্গ। এই দু'টি প্রসঙ্গের অভ্যন্তরে রয়েছে অনেকগুলি উপাদান। শ্রম, পুঁজি, কাঁচামাল, প্রযুক্তি, উৎপাদন, পণ্যের চরিত্র, শ্রম-বাজার, শ্রম-নিয়ন্ত্রণ, শ্রম-ব্যবস্থাপনা, শ্রম-আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রম-কাঠামো, শ্রম-সংস্কৃতি, শ্রমিকশ্রেণী ও মালিকশ্রেণী, শ্রমিক ও মালিকের ভূমিকা, বাজারের চাহিদা ও যোগান, ভোক্তার ভূমিকা, শ্রেণী-উপশ্রেণীগুলির অবস্থান, শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বহুবিধ দিক নিয়ে পূর্বোক্ত প্রসঙ্গ দু'টি গঠিত। তবে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দু'টি ভিন্ন প্রসঙ্গ নয়; উৎপাদন-প্রক্রিয়াই শ্রম-প্রক্রিয়ার জন্ম নেয়। অন্যদিকে শ্রম-প্রক্রিয়া উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করে চলে। বর্তমানকালে প্রসঙ্গ দু'টি অতীতের পরিচিত বাস্তবতা থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অদৃষ্টপূর্ব ও অভাবনীয় চরিত্র, গুরুত্ব ও মাত্রা অর্জন করেছে বিষয়গুলি। প্রত্যেকটি প্রসঙ্গের বিবর্তন-প্রক্রিয়া ও গতি অতীব গভীর, জটিল এবং জালের মতো পরস্পরের সাথে যুক্ত।

বিশ্ব-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিককাল পর্যন্ত ইতিহাসে তিনটি মহত্তম বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম বিপ্লবটি ঘটেছিল বাষ্প শক্তি ও স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয়টি ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ শক্তি, ইলেকট্রিক মোটর ও ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে এবং তৃতীয় তথা আধুনিকতম বিপ্লবটি সংঘটিত হতে শুরু করেছে এই শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে নিউক্লিয়ার এনার্জি ব পারমাণবিক শক্তি, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি—বিশেষত, মাইক্রো-কমপিউটার ও রোবট, মলিকিউলার বায়োলজি, সোলার এনার্জি বা সৌর শক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং, লেসার অ্যাণ্ড হলোগ্রাফি, প্লাজমা, সলিড ফ্রেম প্রভৃতি এবং এগুলির দ্বারা অজস্র ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য সমস্ত প্রায়োগিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। প্রথম বিপ্লবটি ছিল শিল্প-পুঁজিবাদের অগ্রদূত ও সংবাহক, দ্বিতীয়টি সাম্রাজ্যবাদী স্তরের সূত্রপাত ও বিকাশের এবং তৃতীয়টি সাম্রাজ্যবাদ-পরবর্তী (?) অধ্যায়ের।

মার্কস ও মার্কসবাদীদের মন্তব্য ও অন্যান্য পূর্ব-আলোচনা

কার্ল মার্কস-পূর্ববর্তী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা শিল্প-উৎপাদনে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীর ব্যবহারের তাৎপর্য নিয়ে অর্থাৎ প্রোডাকশন-প্রসেস নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা চালালেও উৎপাদন-ব্যবস্থার নিয়মের সাথে সেটির সম্পর্ক সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিতে পারেননি। কার্ল মার্কসই প্রথম এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উত্থাপন করে বলেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে ম্যানুফ্যাকচারের (ম্যানুয়াল + ফ্যাকচার = মনুষ্যশ্রমের দ্বারা তৈরি বা নির্মাণ) স্থলে 'বিগ ইণ্ডাস্ট্রি'

বা 'মেশিনোফ্যাকচার'-এর (মেশিন + ফ্যাকচার = যন্ত্রের দ্বারা তৈরি বা নির্মাণ) স্তরের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি লিখেছিলেন, "ম্যানুফ্যাকচার (শিল্প বিপ্লব-পূর্ববর্তী অধ্যায়) উৎপাদন ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছিল 'শ্রম-শক্তি' দিয়ে, আধুনিক শিল্পে এর শুরু হয়েছে শ্রমের হাতিয়ার (অর্থাৎ যন্ত্র) দিয়ে"। (ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫১)। মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে অন্যান্য প্রসঙ্গের সাথে উৎপাদনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট পর্বগুলি চিহ্নিত করেছিলেন; যেমন, 'পুটিং আউট সিস্টেম', পরবর্তীকালে আদিম ফ্যাক্টরি ব্যবস্থাতে ঐতিহ্যগত হস্তশিল্প-প্রযুক্তি, ক্রমে বাণিজ্যিক পুঁজিপতিদের সাথে চুক্তি-ব্যবস্থার দ্বারা নিজ আবাসে বসে স্বাধীনভাবে অথবা কারখানাতে উৎপাদন, তারপর শিল্প-পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ নজরদারীতে পণ্য উৎপাদন, ক্রমে বিশ্লিষ্ট শ্রম-ব্যবস্থা চালু করে প্রত্যেক শ্রমিককে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক কাজে নিয়োগ করা প্রভৃতি। প্রযুক্তি ও উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে মার্কসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সূত্রনির্দেশ হলো, "আমরা এখন সেই আদিম (প্রাকৃতিকভাবে) সহজাত শ্রমের রূপ নিয়ে বিবেচনা করছি না যা আমাদের নিছক জন্তুর স্তরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রমের রূপ যা একান্তই মনুষ্য এমন ধারণাকেই আমরা বলছি। একটা মাকড়সা যেভাবে কাজ করে তার সাথে তাঁতীর কাজের মিল রয়েছে, একটি মৌমাছি যেভাবে চাক তৈরি করে তা' হয়তো স্থপতিকে লজ্জা দেয় কিন্তু একজন সর্বাপেক্ষা অযোগ্য স্থপতির সাথে সর্বশ্রেষ্ঠ মৌমাছির পার্থক্য হলো এই যে বাস্তবে এক সৌধ নির্মাণের আগেই স্থপতি তার ভাবনার জগতে সেটিকে নির্মাণ করে নেয়। ...সে (স্থপতি) যার ওপরে কাজ করে তার উপাদানের রূপের পরিবর্তনই কেবল ঘটিয়ে নেয় না, সে তার নিজের উদ্দেশ্যও হাসিল করে নেয়—এমন উদ্দেশ্য যা তার কাজের পদ্ধতির নিয়ম সৃষ্টি করে এবং এই নিয়মের প্রতি তার স্বীয় ইচ্ছাকে অধীনস্থও থাকতে হয়।" (ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪)। এই প্রসঙ্গে মার্কসের তৃতীয় প্রতিপাদ্যটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রুধোঁর জবাব দিতে গিয়ে (১৮৪৬-১৮৪৭) বলেছিলেন, "অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ ভালই অবগত আছেন যে, এক সুনির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ সুতী, লিনেন, রেশম বস্ত্র তৈরি করে। কিন্তু তিনি যা বুঝতে পারেননি তা' হলো যে এই ধরনের সামাজিক সম্পর্ক মানুষের দ্বারাই সৃষ্টি হয়—মানুষের দ্বারা লিনেন প্রভৃতি উৎপন্ন হওয়ার মতো। উৎপাদিকা শক্তিগুলির সাথে সামাজিক সম্পর্কসমূহ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। নতুন উৎপাদিকা শক্তিসমূহ অর্জন করার মধ্য দিয়ে মানুষ তাদের উৎপাদন পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটায় এবং উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে, নিজেদের জীবনের উপার্জনের পদ্ধতি পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা তাদের সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়। হ্যাণ্ড-মিল (হাতে চালানো কায়িক শ্রমের ঘানি) ব্যবস্থার কাল-পর্ব সমাজকে দিয়েছিল সামন্তপ্রভুদের, স্টীম-মিল (বাষ্পচালিত যন্ত্রের কারখানা) ব্যবস্থা দিয়েছে তেমন সমাজ যাতে আছে শিল্প পুঁজিপতিরা।"

উৎপাদন-ব্যবস্থা, উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদনের হাতিয়ারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রয়োগ ও প্রভাবের ফলশ্রুতিকে তিনি লেবার-প্রসেস বা শ্রম-প্রক্রিয়া বলে সর্বপ্রথম চিহ্নিত করেন। এটাও স্পষ্ট যে তিনি প্রোডাকশন-প্রসেসকে গভীরভাবে অনুসরণ করেছিলেন এবং সেটি থেকে নির্গত লেবার-প্রসেসকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রোডাকশন সিস্টেম' বা উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক গঠন ও শ্রেণী-গঠনের যে কারক শক্তি তা' তিনি সামন্তপ্রভু ও শিল্প-পুঁজিপতিদের উদাহরণের মধ্য দিয়ে দিয়েছেন।

প্রযুক্তির ফলে শ্রমের পরিবর্তনের চরিত্রকে মার্কস-পূর্ববর্তীকালে অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন 'লার্নিং বাই ডুইং' বা উৎপাদনের জন্য শ্রমের দ্বারা অভিজ্ঞতা অর্জন। তিনি মনে করেছিলেন যে, শ্রমের সাশ্রয়ের জন্যই শ্রমের চিরায়তভাবে বিভাজন প্রয়োজন হয়। এই সাশ্রয় সর্বোচ্চ হতে পারে যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা এবং যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা শ্রমিককের সর্বোচ্চ অভিজ্ঞ হওয়ার মধ্য দিয়ে। এই প্রস্তাবের পিছনে তাঁর যুক্তি ছিল যে, যদি যন্ত্রের সুযোগ নিয়ে প্রত্যেকটি ভাগের জন্য এক একজন শ্রমিককে দায়বদ্ধ করে সেই কাজে দক্ষ করে তোলা যায় তবে শ্রমের সর্বাপেক্ষা সাশ্রয় সম্ভব। সরাসরি চিহ্নিত করতে না পারলেও, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথই সর্বপ্রথম শ্রম-প্রক্রিয়ার তাৎপর্য

ও উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ককে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিল্প-ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক চার্লস ব্যাবেজ উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় অ্যাডাম স্মিথের বিপরীত ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বললেন, কাজকে এত বেশি সংখ্যাতে বিভক্ত করতে হবে যাতে সেটি সম্পাদন করতে সর্বাপেক্ষা কম শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এটা করা সম্ভব শ্রমিকের ডি-স্কিলিং বা দক্ষতা অপহরণের দ্বারা, আর তার ফলে ঃ (১) দক্ষ শ্রমিকের জন্য ব্যয়িত মজুরির খরচ কমানো যাবে, (২) সর্বস্তরে ব্যবস্থাপকদের (ম্যানেজার—তৎকালের সুপারভাইজার, ফোরম্যান ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে শ্রমিকদের ব্যাপক, নিবিড় ও কঠোরতর শ্রমে নিযুক্ত করা যাবে, (৩) প্রত্যেক শ্রমিকের কাজকে অতি-সরলীকরণ করার মধ্য দিয়ে, শ্রমিককে যখন তখন অন্য যে কোন বিকল্প শ্রমিকের দ্বারা বদল করা যাবে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমিকের অপসারণ করা সম্ভব হবে। যে কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে বিকল্প দিয়ে কাজ চালানোর বাস্তবতা সৃষ্টির ফলে স্থায়ী ও পরম্পরাগত শ্রমিকের ওপর একান্ত নির্ভরশীলতাব অবসান ঘটবে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে বৃত্তির যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে, তাতে কাজ পাওয়ার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে অধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাদের মজুরি কমানো সম্ভব হবে। এইভাবে কাজের সরলীকরণের দ্বারা শ্রমিককে মজুরির দিক থেকে সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করে, ব্যাবেজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন।

কার্ল মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, বিশেষত চতুর্থ অধ্যায় 'দা প্রোডাকশন অব রিলেটিভ সারপ্লাস ভ্যালু' অংশে) যন্ত্র তথা উৎপাদন, শ্রম ও শ্রম-প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক নিয়মের বশবর্তী হিসাবে চিহ্নিত করে দেখান। উৎপাদন-প্রক্রিয়াতে শ্রমের গুরুত্ব বোঝাতে তিনি শ্রম ও শ্রম-শক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে দিলেন। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে তিনি উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা মুনাফা অর্জনের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার অন্যতম হিসাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়াকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থা করার ফলে পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা সৃষ্টির স্বরূপ এবং তার সহগামী হিসাবে শ্রমজীবী জনগণের শ্রম-পরিস্থিতির উপরে প্রভাব কি পড়ে তাও তিনি তুলে ধরেন। উৎপাদনের ব্যবস্থায় কাঁচা সামগ্রীকে নির্মিত সামগ্রীতে রূপান্তর করতে মানুষের শ্রমের কার্যকারী ব্যবহারের ক্ষেত্রে দরকার হয় কাঁচা মাল, হাতিয়ার ও যন্ত্র সামগ্রী; সেগুলির সাথে উৎপাদনের ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটাতে দরকার পড়ে পরিকল্পনা ও তৎপরতার। শ্রমের জটিল সামাজিক ও কারিগরী বিভাজনের অভ্যন্তরে জনগণ আবিষ্কার করে পদ্ধতি, উৎপাদন সামগ্রীর পরিকল্পনা করে, কারখানা ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে, উৎপাদকমূলক তৎপরতার মধ্যে সমন্বয় ঘটায়, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ও যন্ত্র চালায়।

শ্রম, মোটের ওপর, মানুষের সক্রিয় জীবনের বড় অংশ জুড়ে থাকে এবং ব্যক্তির উৎকর্ষতা অর্জনের প্রধান কারক-শক্তি হিসাবে কাজ করে। মার্কস বললেন যে, শ্রম-প্রক্রিয়াতে ধনতন্ত্রী নিয়ন্ত্রণ অধিকাংশ শ্রমিককে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে নিয়ে যায়। শ্রমিকের একমাত্র সান্ত্বনা হলো সব কিছুর বিনিময়ে জৈবিক ও সামাজিকভাবে টিকে থাকার সামান্য মজুরি সে পেয়ে থাকে। স্বভাবতই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংঘাত-প্রবণতা বাড়ে। মর্কিস বললেন যে, শ্রমিকের বিরোধিতা লোপ করার পুঁজিবাদী দাওয়াই হলো শ্রম-প্রক্রিয়াতে যন্ত্রের নিয়োগ। অর্থাৎ উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে এমনভাবে সংঘটিত করা যাতে সৃষ্ট শ্রম-প্রক্রিয়া মালিকদের অনুকূল হয়। তিনি দেখালেন যে, শ্রমিকের বিরুদ্ধে যন্ত্রকে শক্তিশালীভাবে নিয়োগ করে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করে পুঁজিপতিরা। কারিগরীগত পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকের ডি-স্কিলিং বা দক্ষতাহানির উপাদানকেও মার্কস দেখিয়েছিলেন। মার্কস দেখালেন যে ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যামূলক পরিসীমার অভ্যন্তরে প্রযুক্তি নিছক সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করার পরিবর্তে মূলধনের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা গড়ে ওঠে। মার্কস তাঁর লেবার-প্রসেস সম্পর্কিত সমগ্র আলোচনার মধ্যে দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সমগ্র উৎপাদন

ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞান ও কারিগরী নব নব উদ্ভাবনীগুলিকে ব্যবহার করে, শ্রমিককে অধিক থেকে অধিকতর অধীনস্থ ও দমিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

'লেবার-প্রসেস' বা শ্রম-প্রক্রিয়াকে অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ' হলো সেই প্রক্রিয়া যার ফলে শ্রম ও পুঁজির সমন্বয়ে পণ্য ও পরিষেবা উৎপন্ন হয়। লেবার-প্রসেস প্রতিপাদ্যকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা সাধারণভাবে স্বীকার করেনি, যদিও মার্কসের পূর্বে লেবার-প্রসেস ও সেটির তাৎপর্য কার্যত হাতড়ে বেড়িয়েছেন বেশ কিছু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ (পূর্বে উল্লেখিত অ্যাডাম স্মিথ, চার্লস ব্যাবেজ প্রমুখ)। অথচ লেবার-প্রসেসকে নিজ-স্বার্থে পরিকল্পিত রূপ দেবার জন্য পুঁজিবাদ ক্রমাগত প্রচেষ্টা নিয়েছে—প্রোডাকশন-প্রসেসের পরিবর্তন ঘটানোর (পরবর্তীকালে টাইলারিজম বা টাইলার সিস্টেম, ফোর্ডিজম বা ফোর্ড সিস্টেম) মধ্য দিয়ে। মার্কস-উত্তরকালে যৎসামান্য দু'চার জন পশ্চিমী মার্কসবাদী ও বামপন্থী অর্থনীতিবিদ-সমাজতাত্ত্বিক ছাড়া পুঁজিবাদের উৎপাদনের প্রণালীকে লেবার-প্রসেসের আলোয় অতীতে কেউ তেমন চর্চা করেছেন বলে শোনা যায় না। তবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর 'নিউ ইকনমিক পলিসি' বা নেপ-কর্মসূচী রূপায়ণের কালে 'আমেরিকান সিস্টেম' বা 'সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থাকে নিয়ে লেনিনের কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিক আন্তনিও গ্রামসির এ'বিষয়ে চর্চা কিছুটা উল্লেখের দাবী রাখে।

জেলখানায় বসে (১৯২৯-১৯৩৫) গ্রামসির 'আমেরিকানিজম অ্যাণ্ড ফোর্ডিজম' শীর্ষক রচনা নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি তাঁর অন্যতম অবদান। জেলে আটক থাকায়, প্রকাশ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী শ্রম-প্রক্রিয়ার যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, সমকালের অন্য মার্কসবাদী নেতারা তা' পারেননি। ঐ আলোচনাতে তিনি প্রধানত যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তা' হলো, পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে যে পরিবর্তন তৎকালে সংঘটিত হচ্ছিল তা' কি নতুন ঐতিহাসিক যুগের সূচনা অথবা নিছক ঘটনাবলীর এক কাকতালীয়-মুহূর্ত, যার কোন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের সম্ভাবনা নেই—এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর না দিলেও, অর্থনীতির বেদীর উপর উপরিসৌধে এই ধরনের পরিবর্তনকে তিনি উৎপাদন-সম্পর্কের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক অগ্রগতির সূত্রপাত বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে পুঁজিবাদ এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পিছিয়ে যাবে না। তাঁর আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল বিশ্ব-মহামন্দার কাল-পর্বে, যখন আমেরিকান এই পদ্ধতি ইউরোপের অন্যান্য দেশের উৎপাদন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল। তিনি লিখেছিলেন যে, অনুন্নত ইতালিতে ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টাংশকে উচ্ছেদ করবে এবং পুঁজিবাদী উন্নয়নে উচ্চগতি দেবে। বিপরীতদিকে তিনি দেখেছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণী যদিও এই নতুন সৃষ্ট পদ্ধতির বিরোধিতা করছে না ও এখনও বুঝতে পারছে না এই পদ্ধতির সামাজিক ভবিষ্যৎ ফলাফল, কিন্তু দ্রুতই ব্যাপকতর অর্থনৈতিক শোষণ ও স্বৈরতান্ত্রিক শ্রম-সাংস্কৃতিক নির্যাতনের সম্মুখীন হবে তারা। তিনি এও আশঙ্কা করেছিলেন যে ইতালিতে গৃহীত হলে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাকে ফোর্ডবাদ আরও সংহত করবে। গ্রামসির এই আলোচনার পটভূমিকা ছিল সমকালে সারা পুঁজিবাদী বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই ও শ্রমিক আন্দোলনের পরাজয়। তিনি ভেবেছিলেন যে এই পরিস্থিতি ও তৎপরতার মধ্য দিয়ে শত্রুতামূলক দ্বন্দ্বকে পুঁজিবাদ সাময়িকভাবে চাপা দিতে সক্ষম হবে, কিন্তু তাঁর পরিবর্তে নতুন ধরনের দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটবে। এই প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদের নতুন অগ্রগতি লক্ষ্য করেছিলেন গ্রামসি, কিন্তু একই সাথে শ্রমিক আন্দোলনে এজন্য কোন নেতিবাদী মনোভাব নেওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বর্তমান কালের সাথে এই পরিস্থিতির ব্যাপক মিল লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে আঘাত হানতে শুরু করেছিল। স্বভাবতই, কিছুটা ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিমী মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মহলে। ফলে পুঁজিবাদের পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে উল্লেখযোগ্য পর্যালোচনা এই সময় শুরু হয়। ব্রেটন-উডস ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের দুরন্ত বিকাশ ও বৃদ্ধির কালে দুই প্রখ্যাত পশ্চিমী মার্কসবাদী পণ্ডিত পল এ ব্যারান এবং

পল এম সুইজি রচিত অসাধারণ গ্রন্থ 'মনোপলি ক্যাপিটাল—অ্যান এসে অন দা আমেরিকান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল অর্ডার' (১৯৬৬), ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকাতে দুই মার্কসবাদী মহাপণ্ডিত পল এম সুইজি এবং চার্লস বেটেলহেইমের মহা-বিতর্ক ('অন ট্রানজিশন টু সোস্যালিজম' যা 'ট্রানজিশন-ডিবেট' নামে খ্যাত), চতুর্থ আন্তর্জাতিকের ট্রটস্কিবাদী তাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ আর্নেষ্ট ম্যাণ্ডেলের 'মার্কসিস্ট ইকনমিক থিওরি' (১৯৬২) 'লেট ক্যাপিটালিজম' (১৯৭২), 'পাওয়ার অ্যাণ্ড মানি' (১৯৯২) পুস্তকগুলিতে কর্পোরেট পুঁজিবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব প্রভৃতি ও সেগুলির ফলাফল নিয়ে অনেকটা ব্যাপক ও মূল্যবান আলোচনা করা হয়। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়াতে সদ্য যুক্ত হতে থাকা নতুন লেবার-প্রসেসের দিকগুলি চিহ্নিত করার তেমন চেষ্টা করেননি কেউই। ইতিহাসের এইসব নজির উত্থাপনের অন্যতম কারণ হলো, গ্রামসির পর মার্কসবাদী হ্যারি ব্রেভারম্যানের 'লেবার অ্যাণ্ড মনোপলি ক্যাপিটাল : ডিগ্রেডেশন অব ওয়ার্ক ইন দা টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' এবং পুস্তকটির সমালোচক ও সমর্থকদের আলোচনা ছাড়া পুঁজিবাদী লেবার-প্রসেসের বিভিন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি ও তাৎপর্য নিয়ে মার্কসবাদীরা সমকালে ভাবার চেষ্টা করেননি। ব্রেভারম্যানের পুস্তকটির মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে সুইজি স্বয়ং এই দুর্বলতা স্বীকার করেছিলেন। তবে লেবার-প্রসেসের ফলে ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীর যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা' নিয়ে তৎকালে আরো দু'টি অসাধারণ আলোচনা রয়েছে। একটি হলো ই. পি. টমসনের 'দা মেকিং অব দা ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস' (১৯৭২) এবং অপরটি ব্রেভারম্যানেরই এম্পায়ার স্টেট কলেজে ১৯৭৫ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা—'দা মেকিং অব দা ইউ এস ওয়ার্কিং ক্লাস।' আশির দশক থেকে কিছু কিছু লিবারাল অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক বিশিষ্ট শিল্পক্ষেত্র বা খণ্ড খণ্ড অংশ ধরে 'লেবার-প্রসেস' নিয়ে শুরু করেছেন ব্যাপক আলোচনা। পরবর্তীকালে যেসব লেখক শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম ও অবস্থানগত বিন্যাসের বাস্তব পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যাণ্ড্রু জিম্বালিস্ট সম্পাদিত 'কেস স্টাডিজ অন দা লেবার-প্রসেস', ভ্যান ক্লসনের 'ব্যুরোক্র্যাসি অ্যাণ্ড দা লেবার-প্রসেস'। প্রকৃতপক্ষে ব্রেভারম্যানের পুস্তক থেকে একদা পশ্চিমী বামপন্থী মহলে 'লেবার-প্রসেস ডিবেট'-এর জন্ম হয়, বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে তখন একে 'ব্রেভারম্যানিয়া' বলে ব্যঙ্গও করা হয়েছিল।

টাইলারিজম ও ফোর্ডিজম

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, আমেরিকা ও ইউরোপের উৎপাদনমূলক শিল্পের কারখানার প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতো ফোরম্যান ও দক্ষ শ্রমিকরা। নিজেদের কায়িক শ্রম-দান ছাড়াও এরা নির্ধারণ করতো কারখানার কাজ কিভাবে চলবে, কিভাবে শ্রম-শক্তিকে কাজে নিয়োজিত করা হবে, শ্রমিকদের তত্ত্বধান করা হবে এবং কখনো কখনো এরাই স্থির করতো কত সংখ্যক, কি ধরনের ও কখন নতুন শ্রমিক নিয়োগ করা হবে। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে অব্যাহত এই পরিস্থিতির মধ্যে কনভেয়র বেল্ট ও ক্রনোমিটারের উদ্ভাবন ঘটে। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই দুই যন্ত্রের প্রয়োগ সৃষ্টি করে দেয় দ্রুত ও ব্যাপক উৎপাদনের শর্ত। এই সময় থেকেই আমেরিকান পুঁজিপতিরা সন্ধান শুরু করে এমন শ্রম-ব্যবস্থাপনা যাতে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া তারা চাইছিল এমন পরিস্থিতি যাতে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব বা চাপ সৃষ্টি করার দ্বারা উৎপাদন ও মজুরির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের সামান্যতম সুযোগটুকুও বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ শ্রমিকদের উপর প্রতিষ্ঠানের নির্ভরশীলতা লোপ পায় এবং শ্রমিকরা চাপ দিয়ে বা আন্দোলন করে মজুরি বাড়ানোর ক্ষমতা হারায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এলো 'সিস্টেমেটিক ম্যানেজমেন্ট'র ধারণা। বৃহৎ শিল্পে এই সময় থেকে শুরু হয় 'অ্যাসেম্বলি লাইন প্রোডাকশন'।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট' বা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভবের সাথে এফ.ডব্লু.টাইলারের নাম জড়িয়ে আছে, যে কারণে উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতিকে বলা হতো 'টাইলারিজম'। শিল্প ক্ষেত্রে শ্রম-ব্যবস্থা, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে টাইলার প্রধানত তিনটি মূল নীতি গ্রহণ করেনঃ (ক) শ্রমের ব্যাপক বিভাজন—উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করে যেতে হবে এবং প্রত্যেকটি প্রথাগত কাজকে এমনভাবে খণ্ড খণ্ড করতে হবে যাতে প্রত্যেক শ্রমিকের কাজ অতি

সহজ ও সরল হয় এবং সম্ভব হলে একটি মাত্র ধরনের কাজে শ্রমিককে নিযুক্ত রাখতে হবে। কেননা কাজে অতি-অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে অতি-দক্ষতা সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে কাজের সরলীকরণ এবং খণ্ডীকরণ শ্রমিকের দক্ষতা অপহরণ করে। শেষোক্ত অবস্থা সৃষ্টির দ্বারা শ্রম-বাজার থেকে কম মূল্যে ব্যাপক অদক্ষ শ্রমিকের শ্রম-শক্তি সংগ্রহ করা যাবে। শুরু হলো শিফ্‌ট প্রথা, অনিয়মিত প্রথায় নিয়োগ, পীস-রেট প্রভৃতি ব্যবস্থা। কাজের অধিকতর বিভাজনের ফলে শপ-ফ্লোরে পরিকল্পনা, সংগঠন ও নিয়োগের কাজগুলি কমতে শুরু করলো। অধিকতর দক্ষতা সৃষ্টির চেষ্টা কেবলমাত্র ম্যানেজার তথা ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হলো। (খ) কর্মক্ষেত্রের ওপর ব্যবস্থাপকদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হলো সর্বাগ্রে এবং কাজের খণ্ডীকরণের দ্বারা যে কর্ম-ব্যবস্থা তথা শ্রম-প্রক্রিয়া তৈরি হলো তার মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব দেওয়া হলো ম্যানেজারদের উপর। (গ) স্থির হলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক হিসাবে ম্যানেজারদের সবসময় সর্বাধুনিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং উৎপাদনের লাভ ও ক্ষতির, সময় ও গতির সুচারু মূল্যায়ন (সিস্টেমেটিক টাইম অ্যাণ্ড মোশন স্টাডি) করে যেতে হবে।

এফ.ডব্লু.টাইলার, যিনি নিজে একজন শ্রমিক ছিলেন, প্রত্যেকটি কাজকে ধারাবাহিক খণ্ডে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন এবং প্রতিটি অংশ নিষ্পন্ন করতে সময় কত লাগে তা' মাপ করেছিলেন। এইভাবে প্রতি অংশের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল 'স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' এবং নিয়োজিত শ্রমিকদের সেই নির্দিষ্ট সময়টুকুই বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছিল সংশ্লিষ্ট খণ্ডের উৎপাদনের জন্য। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যেই সেই খণ্ডটির উৎপাদন সম্পন্ন করতে হবে। এইভাবে বাতিল করা হয়েছিল 'ইউসলেস টাইম' বা প্রয়োজনহীন সময়কে। ১৮৮০ সাল থেকে ২৬ বছর ধরে টাইলার ৮ লক্ষ পাউণ্ড লৌহকে ১০টি ভিন্ন ভিন্ন মেশিন টুলসের মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার করে উৎপাদনে শ্রম-শক্তিকে সংগঠিত করার পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন।

টাইলার পদ্ধতিকে মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা' সংক্ষেপে এই রকম ঃ শ্রমিকের উদ্যোগ গঠিত হয় অর্থনৈতিক বাস্তবতার ভিত্তিতে। শ্রমিক যদি অনুভব করে যে নতুন ব্যবস্থাপনায় কারখানায় যে লাভ বাড়ছে তার উপযুক্ত অংশ সেও পাচ্ছে, তবে শ্রমিক স্বেচ্ছায় উৎপাদনের কাজে উদ্যোগী হবে এবং সহযোগিতা করবে ব্যবস্থাপনার সাথে। সেজন্য উৎপাদনের ফলাফলের ভিত্তিতে শ্রমিককে মজুরি প্রদানের 'বৈজ্ঞানিক' (!) প্রথা উদ্ভাবন করা হলো; যদিও, কার্যকালে, এই ব্যবস্থা তেমন গৃহীত হয়নি, মালিকশ্রেণীর অধিক মুনাফার স্বার্থে।

শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য টাইলারবাদী ব্যবস্থাপনা একই সাথে দু'টি প্রধান পদ্ধতির প্রস্তাব করে। প্রথমত, সাধ্যমত কায়িক শ্রমের অপসারণ এবং কাজের ক্ষেত্রে নীচুতলার শ্রমিকদের অতীতে প্রাপ্ত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিলোপ; দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থাপনাকে (ম্যানেজমেন্টকে) প্রযুক্তি-দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে মালিকদের পক্ষ থেকে সম্পাদনকারী ভূমিকা থেকে সুনির্দিষ্টভাবে স্বতন্ত্র করা। নতুন ধরনের এই ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে, তৎকালে প্রচলিত শ্রম-প্রক্রিয়ায় এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন শুরু হয়েছিল।

টাইলারের 'টাইম অ্যাণ্ড মোশন স্টাডি'র নীতি 'অ্যাসেম্বলি লাইন প্রোডাকশনে'র পথ সুগম করে দেয়। এই ব্যবস্থায় তিনটি নীতির সংযুক্তিকরণ হয় ঃ যন্ত্রাংশের মানককরণ (স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন), যন্ত্রাংশের পরিবর্তনীয়তা (ইন্টারচেঞ্জেবিলিটি) ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর গমনাগমন (মুভমেন্ট অব মেটিরিয়ালস)। ১৯০৩ সালে ফ্লাই হুইল ম্যাগনেটস উৎপাদনের জন্য ফোর্ড যখন ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ করেন তখন দেখা গেল যে উৎপাদনের সময় ২০মিনিট থেকে কমে গিয়ে মাত্র ৫ মিনিট লাগছে।

শ্রম-প্রক্রিয়া নিয়ে পরবর্তীকালে ফোর্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন মোটর গাড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে। নির্মীয়মাণ মোটর গাড়ীর চারদিকে ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের নির্মাণের কাজ করার প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে শুরু হয়েছিল মোটর গাড়ীর এক একটি দিককে শ্রমিকদের সামনে ক্রেনের সাহায্যে হাজির করে নির্মাণের কাজ। ১৯০৮ সালে নির্মীয়মাণ গাড়ীর চারদিকে ঘুরে কাজ করানো থেকে ১৯১৩ সালে গাড়ীর সমস্ত দিক যান্ত্রিকভাবে ঘুরিয়ে যন্ত্রের সামনে দণ্ডায়মান শ্রমিকদের সামনে উপস্থিত করার

'অ্যাসেম্বলি লাইন' ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হলো। এটা সম্ভব হলো নতুন ধরনের ক্রেন ও কনভেয়ার বেল্ট-এর সাহায্যে। অতীতে একটি মোটর গাড়ী নির্মাণে সারা বছর লেগে যেতো, ১৯২৫ সালে উৎপাদিত হতে শুরু করলো প্রতিদিনে একটি করে গাড়ী।

১৯০৮ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেনরি ফোর্ড উদ্ভাবিত যান্ত্রিক গণ-উৎপাদনমূলক (ম্যাস প্রোডাকশন) পদ্ধতিকে অভিহিত করা হয় 'ফোর্ডবাদ' বলে। 'সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টে'র পদ্ধতিকে ব্যবহার করে তিনি পূর্বের জটিল কাজকে বহু সরল তৎপরতাভিত্তিক ভাগে বিভক্ত করেন এবং উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে ভিন্নতা পরিহার করতে, স্থির করেন পণ্যের মানক (স্ট্যাণ্ডার্ড)। বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক যন্ত্রের সাহায্যে (যে যন্ত্র একটি উৎপন্নের জন্য একটিই ভূমিকা নেয়) এই পরিবর্তনের দ্বারা তিনি মোটর গাড়ী উৎপাদনের যান্ত্রিকীকরণ এবং অ্যাসেম্বলি লাইন প্রণালীকে উন্নততর করেন। শ্রমের খরচ এই ব্যবস্থায় কমে যায়, কাজের সরলীকরণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং উচ্চ মজুরির দক্ষ শ্রমিক দ্বারা স্বল্প-মজুরির অদক্ষ শ্রমিক অপসারিত হতে থাকে। অন্যদিকে যান্ত্রিকীকরণের ফলে বেড়ে যায় উৎপাদনের পরিমাণ, এতে গড়ে ওঠে মাত্রার অর্থনীতি (ইকনমিকস অব স্কেল)। এর নীট ফল হলো, উৎপাদনের প্রত্যেক এককের ব্যয় কমে যাওয়া। পরিকল্পনা করে শ্রমিকদের মধ্যে যন্ত্রের সুষম বন্টন এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক-শৃঙ্খলা। ফোর্ডবাদী ব্যবস্থাতে শিল্প-উৎপাদনের জন্য সমস্ত রকমের তৎপরতাকে একটি বিশালয়তন কারখানার ছাউনির অভ্যন্তরে সংঘবদ্ধ করা হয়।

উদ্দেশ্যসাধক যন্ত্রাদি, গতিশীল অ্যাসেম্বলি লাইনের ব্যবহার, অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিককে খণ্ডীকৃত কাজে নিয়োগ, কঠোর শ্রম-শৃঙ্খলা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃহদায়তন সংঘবদ্ধ কারখানা 'স্কেল ইকনমিকস'এর পত্তন এবং নিম্ন একক ব্যয়ের সাহায্যে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের প্রণালীকে ফোর্ডবাদ বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়। এই প্রণালী মোটর উৎপাদন শিল্প থেকে শুরু করে ভোগ্য-পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অচিরে ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে।

পুঁজিবাদের উৎপাদন প্রণালীতে এই ফোর্ডবাদী ব্যবস্থা পুঁজিবাদের পক্ষে সুনির্দিষ্ট ধরনের ব্যবস্থা হিসাবে ক্রমে গড়ে তোলা হয়। শ্রমিকদের জন্য সামাজিক হিতকারী বিভিন্ন ব্যবস্থাও যুক্ত হতে থাকে। শেষোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুক্তি খাড়া করা হয় যে ফোর্ডবাদী ব্যবস্থার দ্বারা অর্জিত সাফল্য ও মুনাফা টিকিয়ে রাখতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইনগত হস্তক্ষেপ ও সাহায্য দরকার। তাই মালিকদের স্বার্থে অথচ মালিকদের বিনা খরচে শিল্প-পরিপোষণার জন্য রাষ্ট্র শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয়-বরাদ্দে বাধ্য হয়। ফোর্ডবাদী ব্যবস্থায় উদ্দেশ্যসাধক যন্ত্র ও বৃহদায়তন কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ ঘটে। পুঁজি এইভাবে আটকে যাওয়ায় পুঁজির পুনরুৎপাদনের স্বার্থে দরকার পড়ে ভোগ্য-পণ্যের বিশাল ও স্থায়ী বাজার। সেকারণে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অর্থনীতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয় যাতে দেশের জনসংখ্যার পূর্ণ অংশ অব্যাহতভাবে ক্রয়-ক্ষমতাশালী থাকে। অর্থাৎ তারা বৃত্তিতে নিয়োজিত থেকে নিয়মিত আয় করতে পারে এবং যার দ্বারা ক্রেতার ক্রয়-ক্ষমতার ওঠা-নামা না ঘটে। পাশাপাশি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভর্তুকি দিয়ে সামাজিক কল্যাণকারী ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে জনগণের ভোগের উচ্চ স্তরকে অপরিবর্তিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কেইনসিয় অর্থনীতি ও কল্যাণকারী রাষ্ট্রের ব্যবস্থা, কালক্রমে ফোর্ডবাদী প্রথার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে। ফোর্ডবাদ নানাভাবে বিকশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়েছিল 'জাস্ট-ইন-কেস' নীতির উপর।

দৃষ্টান্তমূলক ফোর্ডবাদী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল এটির অতি উচ্চমানের লম্বধর্মী (ভার্টিক্যাল) সংযুক্তি। এই শিল্প-ব্যবস্থায় উৎপাদনের এমন বহু উপায় (মিনস্ অব প্রোডাকশন) উদ্ভাবিত হলো যেগুলির সাহায্যে উৎপাদনের সামগ্রী একবার ব্যবহার করার পর আবার ব্যবহার সম্ভব হতো। কাঁচামাল, যন্ত্রসামগ্রী ও কয়েক ধরনের নির্মিত পণ্য-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গুদামজাত করে রাখতো অর্থাৎ এই ব্যবস্থাতে যখন যখন প্রয়োজন শিল্প-উৎপাদনের জাস্ট-ইন-কেস-এ সরবরাহ করার জন্য, অর্থাৎ উৎপাদন-প্রক্রিয়াতে কোন একটি স্তরে সমস্যা বা চাহিদা দেখা দিলে তা' যাতে তৎক্ষণাৎ পূরণ করা যায়। অনুরূপভাবে, নানা ধরনের শ্রমিকদের মজুত রাখা হতো জাস্ট-ইন-কেস অর্থাৎ

আকস্মিকভাবে নির্দিষ্ট কোন ধরনের শ্রমিক-স্বল্পতা দেখা দিলে সরবরাহের জন্য। নির্মিত নানা ধরনের পণ্য গুদাম জাত করে রাখা হতো জাস্ট-ইন-কেস অর্থাৎ বাজারে কোন বিশিষ্ট ধরনের পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হলে তা' পূরণ করার জন্য।

ফোর্ডবাদী ব্যবস্থাতে শ্রমিকদের যোগ্য, দক্ষ ও পরিশ্রমী ভূমিকার জন্য ধীরে ধীরে উপরের দিকে পদোন্নতির ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিককে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট ও একান্ত অনুগত করা এবং ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হওয়া থেকে তাদের বিরত রাখার জন্য মনস্তাত্ত্বিক স্তরে প্রভাব সৃষ্টি। তাছাড়া, পদোন্নতির প্রলোভন দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ গড়ে তুলে স্থির মজুরিতে নিবিড় ও বর্ধিত শ্রম পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিল শিল্প প্রতিষ্ঠান।

অতীতে যদিও ফোর্ডবাদী উৎপাদন ও বন্টনের কিছু উপাদানের উপস্থিতি ছিল, তথাপি এই ব্যবস্থা টাইলারবাদের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার শুধু নয় বহুলাংশে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল লেবার-প্রসেসের অভ্যন্তরে। ফোর্ডবাদের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করলে এই শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে উন্নত পুঁজিবাদী শিল্প-কাঠামোর সাধারণ অভিমুখ ও শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা, সংগঠন ও আন্দোলন বিকাশের দিকগুলিকে অনেকটাই চেনা যায়। এই কাল-পর্বে রাশিয়াতে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের বিপরীতে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা ও তার ফলে সমান্তরালে এক নতুন শ্রম-প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। তার অভিঘাত পড়েছিল সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর। উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে একচ্ছত্রভাবে পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকার উপর এই সময়ে সর্বপ্রথম, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া প্রভাব ফেলতে থাকে। গত শতাব্দী থেকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও শ্রমিক আন্দোলনের চাপে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কিছু কিছু সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটলেও পরিস্থিতির চাপে তা' অনেকটাই ব্যাপক হয় এই সময়ে। সামাজিক নিরাপত্তার সংযোজন সমগ্র শ্রম-প্রক্রিয়াতে অন্যতম উপাদান হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে।

মধ্যবর্তী সময়ের শ্রম-প্রক্রিয়ার খণ্ড খণ্ড কিছু রূপ আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে ব্রেটন-উডস বিশ্ব-আর্থিক ব্যবস্থার সাফল্যের কাল-পর্বে যে শ্রম-প্রক্রিয়া চলে, তাকে নতুনভাবে আদর্শায়িত করার চেষ্টা করেছেন ক্লার্ক কার, জন ডানলপ ও অন্যান্যরা, তাঁদের রচিত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যান' (১৯৬০) পুস্তকে। নতুন শ্রম-প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট শিল্প-সমাজ সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন ছিল : (১) শিল্পায়ন পুঁজিবাদকে অপসারিত করেছে; কেননা বহুজাতিক সংস্থাগুলি প্রধান ও নির্ধারক আর্থিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যেগুলির উপর অতীত দিনের মতো পুরোপুরি ও একান্ত কোন ব্যক্তিগত মালিকানা নেই(!); জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রি থেকে সৃষ্ট পুঁজিতে এবং প্রফেশনালদের যৌথ নেতৃত্বে এগুলি পরিচালিত হয়, (২) অতীতের পুঁজিবাদ যদিবা শ্রমিকদের ডি-স্কিলিং-এর নীতি নিয়েও থাকে তথাপি তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের পর শ্রমিকের উন্নততর দক্ষতা ও দায়িত্বের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, শ্রম-প্রক্রিয়াতে তা' প্রযুক্তও হয়েছে, (৩) উৎপাদনের কাজে প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবস্থাপক মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা শ্রেণীগুলির এবং শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিচ্ছে, (৪) আধুনিক উৎপাদনের ফলে শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতি ও অবসরের সুযোগ বৃদ্ধির ফলাফল হলো অতীতের মতো মালিকদের শোষণের জন্য ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য নয়, ক্রমবর্ধমান উন্নতি, (৫) এই কারণে শ্রমিকদের মধ্যে স্তিমিত হয়েছে প্রতিবাদের প্রবণতা, (৬) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ও মানবতাবাদী পেশাদারীরা ভবিষ্যতের অগ্র-বাহিনী হয়ে উঠছে, (৭) রাষ্ট্র সর্বত্র বিরাজমান থাকায় আধুনিক শিল্পের আমলাতান্ত্রিকীকরণ জরুরি হয়ে উঠছে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে, (৮) অবশ্য সর্বকালে থাকবে শ্রেণীসমূহ, (৯) এইভাবে ভবিষ্যতে শিল্পায়নের আরও নানাবিধ পন্থা সৃষ্টি হবে, (১০) শিল্পোন্নয়ন ক্রমান্বয়ে বহুবাদিক হবে; ক্রমশ নিষ্প্রভ হবে ক্ষমতার কেন্দ্রিকতামূলক রূপ (পাওয়ার)।

স্মরণ রাখা দরকার যে, এই সময়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে বুর্জোয়া সমাজ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা নতুন ধরনের তত্ত্ব প্রচারিত হতে থাকে : ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্র্যাসি, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল

সোসাইটি, পোস্ট-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি প্রভৃতি (প্রথম খণ্ডে প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ করা হয়েছে)। শিল্প-ব্যবস্থার শ্রম-প্রক্রিয়ায় আলোচনায় সেইসব তত্ত্বের কিছু প্রতিফলনও ঘটে।

ম্যানেজারিয়াল বিপ্লব এবং অটোমেশন

টাইলারবাদী ও ফোর্ডবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সুপ্ত থাকা আরও নতুন নতুন উপাদান পরবর্তীকালে একে একে বিকশিত হতে থাকে। সেগুলির অন্যতম হলো যে প্রথমাবধি কর্ম-কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার (ম্যানেজারিয়াল) উন্নয়ন হাত ধরাধরি করে এগোতে শুরু করেছিল। ১৯৩২ সালে, এ. এ. বার্লে ও জি. সি. মিনস (দা মডার্ন কর্পোরেশন অ্যাণ্ড প্রাইভেট প্রপার্টি) প্রথমে অনেকটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালিকদের পূর্বতন ভূমিকার অপসারণ ঘটিয়ে ম্যানেজারদের দ্বারা কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জরুরি প্রয়োজনীয়তার দিক। বাস্তবে এই প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে শুরুও হয়েছিল। ১৯৪১ সালে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব উপস্থিত করেন জে. বার্নহাম তাঁর 'দা ম্যানেজারিয়াল রেভোলিউশন' পুস্তকে। প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার অতীতে সামান্য কিছু ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকার পরিবর্তে, এই সময়ে, অজস্র ছোট 'শেয়ার-হোল্ডার'দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া শুরু করেছিল। সুতরাং এই নতুন বাস্তবতাও দাবী করেছিল প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট বিভাজন। তাছাড়া উৎপাদনের বিভিন্ন শাখার উচ্চতর পদের কর্মচারীদের (ম্যানেজারদের) বিশেষজ্ঞত্ব ও দক্ষতা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের স্তরে পরম্পরাগত ক্ষমতা ও অধিকারের স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনকে ত্বরান্বিত করতে থাকে। মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে পূর্বতন ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি ম্যানেজাররা অধিক দায়বদ্ধ হয়ে উঠেছিল সামাজিকভাবে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৯ সালে আর. ডারেনডর্ফ (সোসাইটি অ্যাণ্ড ডেমোক্র্যাসি ইন জার্মানি) ম্যানেজারদের আরও উন্নত ভূমিকা গ্রহণের প্রস্তাব করলেন। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সর্বক্ষণের বিরোধের পরিস্থিতিকে এড়াতে এবং শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থের সমদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থাপকদের নতুন ভূমিকা গ্রহণের প্রস্তাব করলেন তিনি। তবে এই ক্ষমতা ও অধিকারের স্বাভাবিক স্বীকৃতি অর্জন করতে হলে প্রযুক্তিগত ওপেশাদারী যোগ্যতায় ম্যানেজারদের সর্বোত্তম হতে হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। কার্যকালে এই লক্ষ্যে পঞ্চাশের দশক থেকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ম্যানেজারদের নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে থাকে।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ক্ষমতা আদৌ বাতিল হয়নি কোথাও। সেই অর্থে 'ম্যানেজারিয়াল রেভোলিউশনে'র তত্ত্ব ছিল কিছুটা অতিরঞ্জিত। মালিক ও শ্রমিকদের প্রতি প্রস্তাবিত সম-দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে দেখা যায় যে ম্যানেজাররা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার বিষয়ে মালিকদের চেয়ে কম স্বার্থান্বেষী ভূমিকা নিচ্ছে না এবং মালিকদের চেয়ে ভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে না তারা। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মুনাফা বা শেয়ারের দর বৃদ্ধির ভিত্তিতে ম্যানেজারদের বোনাস বা নানাভাবে আর্থিক বা অন্য সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় ম্যানেজারদের মধ্যে কোম্পানির জন্য বেশি বেশি মুনাফা অর্জনের প্রবণতা পুরোপুরি টিকে থাকে। ফলে তাদের স্বার্থ সংলগ্নই থেকে যায় মালিকদের সাথে।

এর পাশাপাশি প্রযুক্ত হতে থাকে 'কর্পোরেট নেটওয়ার্ক' ব্যবস্থা। অতীতে মালিকদের প্রতিনিধিত্বমূলক কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর অন্তর্গত হতে থাকে বহিরাগত নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং ম্যানেজারদের সর্বোচ্চ পদের কিছু কিছু ব্যক্তি। তাছাড়া বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিটির উল্লেখযোগ্য শেয়ার-হোল্ডার, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ প্রমুখ অংশও যুক্ত হতে থাকে। এইভাবে মালিক ও ম্যানেজারদের মাঝখানে বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর এক স্তর গড়ে ওঠে, যাদের সাথে গভীর সংযোগ রেখে ম্যানেজাররা ভূমিকা পালনের নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র দ্রুত উৎপাদনের প্রয়োজনে যুদ্ধসামগ্রী নির্মাণের কারখানাগুলিতে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির প্রভূত উন্নতিসাধন হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে সেইসব উন্নয়নকে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে শুরু হয় পণ্য-উৎপাদনকারী কারখানাতে প্রয়োগ। তার ফলে সংশ্লিষ্ট কালের

উন্নত শিল্পে প্রযুক্তিগত যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল মনুষ্য-শক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণকে যথাসম্ভব যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা। পূর্বের সরল ধরনের মেকানাইজেশনের উদ্দেশ্য ছিল কায়িক শ্রমে যান্ত্রিক সহায়তা দান। যেমন, শ্রমিকরা মেশিন বা যন্ত্রের সাহায্যে, অফিসের কর্মচারীরা টাইপরাইটার বা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে, কাজ করতো। আলোচ্য অগ্রগতির স্তরটি ছিল মূলত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন সম্পন্ন করা। মনুষ্য-শ্রমে সম্পাদন করা হচ্ছিল অবশিষ্ট কাজ—যেমন মেশিনের নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্র ঠিকঠাক রাখা ও পরিচালনা করা প্রভৃতি। বকেয়া কাজে মনুষ্য-শ্রমের ভূমিকাকেও অপসারণ করার লক্ষ্যে উদ্ভব হয় অটোমেশন ব্যবস্থার। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে এই তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃত 'অটোমেশন' হলো 'ক্লোজড লুপ' প্রণালী। এই প্রণালীতে কাঁচামাল যন্ত্রে পৌঁছে দেওয়ার পর, পণ্যটি পরিপূর্ণভাবে নির্মিত হয়ে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত মনুষ্য-শ্রমের কোন ভূমিকা থাকে না। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তৃতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব শীর্ষক অধ্যায়ে যেসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং সেগুলি প্রয়োগের তথ্য দেওয়া হয়েছে, এই সময়ে সেগুলিকে প্রধানত ব্যবহার করে শিল্পে শুরু হয় সর্বাত্মক অটোমেশন। এই ধরনের অটোমেশনের ফলে, উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপ্লবাত্মক পরির্বতনের পথে যাত্রা শুরু করে।

অটোমেশন ব্যবস্থার ফলাফল প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে আকর্ষণ বাড়ছিল। তাঁরা বিতর্ক শুরু করেছিলেন এই পদ্ধতির অন্তর্বস্তু নিয়ে। আর. ব্রাউনার (১৯৬৪), জে. এন. ফ্রমকিন (১৯৬৮) প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে অনেকে মনে করেছিলেন যে অটোমেশন ব্যবস্থা শ্রমিকদের অব্যাহতি দেবে নিরানন্দমূলক কাজ থেকে। যে অংশের কাজে নিজস্ব বিচার ও সিদ্ধান্ত দেবার সুযোগ আছে অটোমেশন ব্যবস্থা সেই কাজকে আকর্ষণীয় ও শ্রমিককে দক্ষ করে তুলবে। কিন্তু অটোমেশনের আরও অগ্রগতির ফলে দেখা যায় যে নীচুতলার কায়িক শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের অবশিষ্ট কাজগুলিও অস্তিত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে সমাজতাত্ত্বিকদের একাংশ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে টাইলারবাদ ও ফোর্ডবাদের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের 'ডি-স্কিলিং' বা দক্ষতা অপহরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, অটোমেশনের মধ্যে দিয়ে তা' আরও তীব্র হচ্ছে। বিপরীতপক্ষে, অপর এক অংশ দাবী করেন যে উচ্চ-প্রযুক্তি সমাজে (হাই-টেকনোলজি সোসাইটি) অতীতের চেয়ে ভিন্ন চরিত্রের দক্ষতার প্রয়োজন হবে;এদের বক্তব্য ছিল যে তথাকথিত ডি-স্কিলিং-এর ধারণা পরম্পরাগত উৎপাদন করার দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত, ডি-স্কিলিং সম্পর্কিত তত্ত্ব ঠিক নয়। কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট যুক্তি ও প্রামাণ্য তথ্য-ভিত্তির ওপর এঁদের বক্তব্য দাঁড়ায়নি। তবে একটি প্রক্রিয়া স্পষ্ট হচ্ছিল। স্বয়ংক্রিয় প্রণালীর (অটোমেটেড প্রসেস) পরিকল্পনা ও অব্যাহত প্রয়োগের জন্য একদিকে প্রয়োজন হচ্ছিল উচ্চ-দক্ষতার এবং অন্যদিকে অন্যান্য অংশের দক্ষতার অপহরণ ঘটছিল। অটোমেশন-প্রভাবান্বিত প্রোডাকশন-প্রসেসের ফলে শ্রম-প্রক্রিয়াতে এইভাবে গড়ে উঠছিল শ্রমের নতুন বিভাজনের উপাদান ও শ্রমিকের নতুন রূপ (নতুন আঙ্গিক ও বিন্যাসের শ্রমজীবী)। শ্রমিক নিযুক্তির উপর অটোমেশনের প্রভাবও সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অতীতে এক ধরনের পণ্য উৎপাদনের জন্য যত সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হতো, অটোমেশনের ফলে তার সংখ্যা দ্রুত কমে যেতে থাকে। ফলে বৃদ্ধি পেতে থাকে বেকারবাহিনীও। পরবর্তীকালে যে প্রক্রিয়াকে 'জবলেস গ্রোথ' বা 'স্ট্রাকচারাল আন-এমপ্লয়মেন্ট' বলা হচ্ছে এখন, তার সূত্রপাত এইভাবে অটোমেশনের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঘটছিল। ফলে অর্থনৈতিক ও বেকারীর সমস্যা থেকে অটোমেশন ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন হতে থাকে। এইভাবে, শিল্প-প্রক্রিয়ার গতিকে ছাড়িয়ে অটোমেশন-প্রক্রিয়া হয়ে উঠতে থাকে সামাজিক-প্রক্রিয়ার অন্যতম অংশ।

উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় 'কোয়ালিটি সার্কল' ব্যবস্থার পত্তন

পশ্চিমী জগতে যখন টাইলারবাদ ও ফোর্ডবাদের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন উপাদান সংযোজিত হচ্ছিল, তখন বিশ্ব-দৃষ্টির কিছুটা অলক্ষ্যে নতুন ধাঁচে শ্রম-প্রক্রিয়া গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয় জাপানে। ১৯৬২ সালে জাপানের টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর কাওরু ইশিকাওয়ার-এর নেতৃত্বে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এই নতুন ব্যবস্থা নিয়ে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। একে বলা হলো 'কোয়ালিটি সার্কল', দক্ষতা চক্র বা উৎকর্ষ-বৃত্ত। শিল্প-শ্রমিকদের সর্বজনীন সমস্যাগুলি যেমন, উৎপাদনের কাজের সাথে শ্রমিকদের মানসিক বিচ্ছিন্নতা, অনুপস্থিতি, অতিরিক্ত ছুটি নেওয়া ইত্যাদি প্রবণতা একদিকে, অন্যদিকে শ্রম-বিরোধ, গো-শ্লো, ধর্মঘট প্রভৃতির প্রকোপ এড়াতে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের সমস্যা যেমন, মুনাফার নিশ্চয়তা, পণ্য-মানের উন্নয়ন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির প্রশ্নে শ্রম-শক্তিকে আন্তরিকভাবে কি করে নিযুক্ত করা যায় তা' ছিল উৎকর্ষ-চক্র ব্যবস্থা উদ্ভাবনের অন্যতম লক্ষ্য। সর্বোপরি, উৎপাদন ও বণ্টনে সর্বব্যাপকতা ও উৎকর্ষতা অর্জন ছিল 'কোয়ালিটি সার্কল' পত্তনের মূল কারণ।

উৎপাদনশীলতা (প্রোডাক্টিভিটি) বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমী উৎপাদন-প্রক্রিয়া কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করলেও, অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ব-বাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পণ্যের উৎকর্ষতা (কোয়ালিটি) অর্জনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পন্থা নিতে পারেনি।

উৎপাদনশীলতা ও উৎকর্ষতা দুই স্বতন্ত্র উপাদান—একটি হলো পরিমাণ, অপরটি হলো মান। প্রথমোক্ত উপাদান অর্জনের জন্য পাশ্চাত্যের ব্যবস্থা অতীত থেকে জাপানে চালু থাকলেও, উৎকর্ষতা অর্জনের প্রশ্নে দেশটি গুরুত্ব আরোপ করে পরিমাণ ও মানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে কিছুটা নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে থাকে। পরিমাণ ও মান—উভয় প্রশ্নে বিশেষজ্ঞ, পরিকল্পক, ব্যবস্থাপক, অর্থনীতিবিদ প্রমুখের উপর একমাত্র নির্ভর না করে শ্রমিকের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে উৎপাদনের কাজে সংযুক্ত করার নীতি গ্রহণ করা হয় 'দক্ষতা-চক্র' পদ্ধতির মধ্য দিয়ে।

'দক্ষতা-চক্র'র কাজের পদ্ধতি হলো যে, একজন তত্ত্বাবধায়কের নেতৃত্বে কারখানার একটি সেকশনের তিন থেকে বারো জনের এক একটি গোষ্ঠী, যারা একই ধরনের কাজ করে, সপ্তাহে এক ঘন্টার মতো সময় স্বেচ্ছায় মিলিত হয়। নিজের কাজ ও উৎপাদনের বিভিন্ন সমস্যা তারা শনাক্ত করে ও সেগুলির বিশ্লেষণ করার পর সমাধান-সূত্র কোম্পানিকে জানায়। পরিচালকবর্গ সেগুলির পর্যালোচনা করার পর দরকার হলে সুপারিশের কিছুটা সংশোধন করে শ্রমিকদের কাছে সেই সংস্কার-মূলক প্রস্তাবগুলি ফিরিয়ে দেয়। এবারে সেই সমাধান-সূত্রকে যান্ত্রিক বা সাংগঠনিক বাস্তব রূপ দেয় শ্রমিকরা স্বয়ং। প্রধানত ৭টি কৌশলের সাহায্যে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে 'উৎকর্ষ-চক্র'। এগুলি হলো সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সমস্ত মাত্রা থেকে সমস্যাটির গভীরভাবে বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ, প্যারেটো বিশ্লেষণ, কার্যকারণ বিশ্লেষণ, হিস্টোগ্রাম এবং নিয়ন্ত্রণ কৌশল।

একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখাতে ভিন্ন ভিন্ন 'উৎকর্ষ-চক্র' শুরু করার আগে প্রতিটি চক্রে একজন দক্ষ সাহায্যকারী নিয়োগ করা হয়। সাহায্যকারী ব্যক্তিটি বিভিন্ন চক্রের মধ্যে সংযোগকারী হিসাবেও কাজ করে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য থাকে ঐ সাহায্যকারীরা। এরা সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা করে 'উৎকর্ষ-চক্র'গুলিকে সাহায্য, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার।

জাপানের ক্ষেত্রে আর এক বৈশিষ্ট্য হলো যে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে শ্রমিকের যুক্ত হওয়ার বিষয়টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের বৃত্তি-ভিত্তিক যোগদানের পর শুরু হয় না। পশ্চিমী ব্যবস্থায় শিল্পের বিশেষজ্ঞ স্তরের জন্য উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল প্রথম থেকে। কিন্তু সেই শিক্ষা বৃত্তিকারী হলেও সুনির্দিষ্ট শিল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট শ্রম-প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসাবে তা' গড়ে ওঠেনি। কিন্তু জাপানের বিদ্যালয়ের স্তর থেকে সুনির্দিষ্ট শিল্পের সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রেখে ও পরিকল্পনা মাফিক প্রত্যেক ছাত্রকে প্রস্তুত করার কাজ ১৯৫৭ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। জাপানের পরাক্রান্ত 'মিনিস্ট্রি ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি'—এম. আই. টি. আই. নামে যা জগৎবিখ্যাত হয়েছে, দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যকে পরিকল্পিতভাবে কার্যকরী করে থাকে।

পশ্চিমী দুনিয়ার উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় উৎপাদন তথা শ্রম থেকে শ্রমিককে যখন মানসিক ও কায়িকভাবে বিচ্ছিন্ন ও অদক্ষ করা হচ্ছিল, জাপান তখন উৎকর্ষ-চক্রের মাধ্যমে কিছুটা বিপরীত ভূমিকা নেয়। অর্থাৎ উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় 'অ্যালিয়েনেশন অব লেবার' বা শ্রম-বিচ্ছিন্নতা

থেকে শ্রমিকদের বিপরীতমুখীন করার চেষ্টা হয়েছে 'কোয়ালিটি সার্কল' ব্যবস্থার মধ্যে। তাছাড়া, পশ্চিমী ম্যানেজারিয়াল রেভোলিউশনের ম্যানেজারিয়াল কর্তৃত্বকে 'দক্ষতা-চক্র' ব্যবস্থায় ভিন্ন মোড় দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে মালিক, ম্যানেজার ও শ্রমিকদের মধ্যে সমন্বয়বাদিতা কোয়ালিটি সার্কলের গৃহীত নীতি—যদিও তা' পুঁজিবাদের বৃহত্তর বিকাশ তথা বৃহৎ মুনাফার স্বার্থে। অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি শ্রম-প্রক্রিয়াতে এই ধরনের নতুন উপাদান সংযোজন করে, পশ্চিমী পুঁজিবাদের তুলনায় জাপানী পুঁজিবাদ সক্ষম হয় এগিয়ে যেতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মধ্য-সত্তরের দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলি 'উৎকর্ষ-বৃত্ত' ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু করেছিল, কিন্তু তা' অনেকটাই যান্ত্রিকভাবে। ফলে স্বীয় পদ্ধতির সাথে, স্বভাবতই, এটির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছিল, যে কারণে পাশ্চাত্যে তখন এটি সাফল্য পায়নি।

শ্রম-প্রক্রিয়ার প্রভাবে ষাটের দশকে শ্রেণী-সম্পর্কিত নতুন তত্ত্বের আবির্ভাব

নতুন শ্রম-প্রক্রিয়ার ফলে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সৃষ্ট পরিস্থিতি শ্রমিকশ্রেণীর পরিচিত অবস্থান সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে নানা সংশয় ও বিভ্রান্তি উৎপন্ন করে ষাটের দশকে। তথাকথিত 'ম্যানেজারিয়াল রেভোলিউশন' ও অটোমেশনের ফলে উদীয়মান নতুন আঙ্গিকের শ্রমিকশ্রেণীকে 'নিউ ওয়ার্কিং ক্লাস' এবং 'অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কার' নাম দিয়ে দু'টি উল্লেখযোগ্য বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক এস.ম্যালেট (দা নিউ ওয়ার্কিং ক্লাস,১৯৬৩), এ.গরজ (স্ট্র্যাটেজি ফর লেবার, ১৯৬৪), ও.এর.তৌরাইনে (দা পোস্ট-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি,১৯৬৯) প্রমুখ বলেন যে উৎপাদন-প্রযুক্তির বিবর্তন শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে নতুন অংশ সৃষ্টি করেছে। উন্নত ও উচ্চ প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিল্প উৎপাদন গঠিত হচ্ছে এই নতুন শ্রমিকশ্রেণীকে দিয়ে। বলা হলো যে উচ্চ প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজন অতীতের শ্রমিকদের তুলনায় উচ্চতর শিক্ষিত শ্রমিক এবং যাদের কাজ করতে হয় গোষ্ঠীগতভাবে। তার ফলে, বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে এই শ্রমিকরা কারখানার সাথে। তবে আলোচ্য সমাজতাত্ত্বিকরা একথাও বলেছেন যে, যদিও এই নতুন ধরনের শ্রমজীবীরা দারুণ উৎকৃষ্ট, নিপুণ, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থায় এবং নিজেদের মেধা দিয়ে কাজ করার ফলে উন্নত বেতনের এবং ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট আনুকূল্য পায়, তথাপি তীব্রতর শোষণের জন্য শিল্পগত ও সামাজিক জঙ্গীপনা শ্রমিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ বৃদ্ধি পায় তাদের শ্রেণী-চেতনা। এইভাবে নতুন শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের মধ্য দিয়েও পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পরিস্ফুটন ঘটে।

এঁরা মনে করেছিলেন যে একদিকে পণ্য-উৎপাদন ও অন্যদিকে মুনাফার ব্যক্তিগত আত্মসাৎকরণের ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের ফল গোষ্ঠীগতভাবে ভোগ করে এই নতুন শ্রমিকশ্রেণী। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য নতুন শ্রমিকশ্রেণী দ্রুত বুঝতে পারে যে কিভাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়া চলে এবং এই প্রক্রিয়াতে তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তারা প্রদত্ত শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না। গোষ্ঠীগত-ভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে 'নিউ ওয়ার্কিং ক্লাস' উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রে একীভূত হয়। এইভাবে, পরম্পরাগত শ্রমিকদের কাছে অতীতে যে দ্বন্দ্ব অস্পষ্ট থাকতো, তা' নতুন উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় 'নতুন শ্রমিকশ্রেণী' প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে পারে। দ্বিতীয়টি হলো, তাদের মধ্যে সঞ্চিত দক্ষতা, দায়িত্ব ও প্রশিক্ষণ বনাম কোম্পানির নীতিকে অংশের শ্রমিকদের দ্বারা প্রভাবিত করতে না পারার ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব। ম্যালেট ও গরজ মনে করেছিলেন যে নতুন যন্ত্র-ব্যবস্থায় দক্ষ কায়িক শ্রমিক ও নতুন প্রযুক্তি পরিচালনাকারী টেকনিসিয়ান ও প্রফেশনালরা উত্থিয়মান এই নতুন শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্গত।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে আরও যেসব গবেষণা হয়েছিল সেগুলির ফলাফল পূর্বোক্ত বক্তব্যের অনুরূপ। পরবর্তীকালে বক্তব্যগুলির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি ছিল : (১) উচ্চ প্রযুক্তি-জ্ঞাত এই শ্রমিকদের নতুন উৎপাদন-প্রণালীর উপর নিয়ন্ত্রণ কমই থাকে । ফ্রান্স ও ব্রিটেনের তৈল শোধনাগারগুলির নতুন অংশের শ্রমিকদের কাজকর্মের তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে ডি.গ্যালিই বলেছিলেন যে সেখানকার শ্রমিকরা ট্র্যাডিশনাল আধা-দক্ষ শ্রমিকের চেয়ে সামান্য উন্নত মাত্র। সুতরাং উচ্চ প্রযুক্তিতেও 'ডি-স্কিলিং' তথা দক্ষতাহানি ঘটেই থাকে। (২) যদিও নতুন গঠিত শ্রমিকশ্রেণী অনেকটা

সম-চরিত্রের তথাপি সেটি অভ্যন্তরে দক্ষতা ও দায়িত্বের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে; যেমন, টেকনিসিয়ানদের মধ্যে। (৩) সত্তরের দশকে ফ্রান্সের নতুন শ্রমিকশ্রেণী, পরম্পরাগত শ্রমিকদের তুলনায়, কম সচেতন ও জঙ্গী ছিল এবং পুঁজিবাদের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করেছিল। আর. ব্লাউনার (১৯৬৪) লক্ষ্য করেছিলেন যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবস্থার উৎপাদনে কর্মরত আমেরিকার নতুন শ্রমিকশ্রেণী পরম্পরাগত শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় শ্রম থেকে কম বিচ্ছিন্ন (অ্যালিয়েনেটেড)।

নতুন লেবার-প্রসেসের ফলে সৃষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর বিবর্তন-প্রক্রিয়া নিয়ে সত্তর ও আশির দশকের শ্রেণী-বিষয়ক বিতর্কের কিছু দিক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর দৃশ্যমান পরিবর্তনসমূহ কার্যকালে সমাজ-বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী সম্পর্কেই সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে এক ধরনের অনাস্থা সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল। আলোচ্যকালের অব্যবহিত পর, শ্রেণী-বিষয়ক বিতর্কটি উৎপাদনের বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক স্কেলের দ্বারা নির্ণয় প্রণালীর দিকে ঢলে পড়ে। এই বিতর্ক 'অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কার ডিবেট' নামে পরিচিত হয়েছিল। জে. এইচ. গোল্ডথ্রপ, ডি. লকউড, এফ. বেছোফার, জে. প্ল্যাট প্রমুখ এই বিতর্কের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। (দা অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কার ঃ ১৯৬৮এ, ১৯৬৮ বি, ১৯৬৯)।

এঁদের তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা ও মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত দিকগুলি ছিল নিম্নোক্ত ধরনের ঃ

প্রচলিত শিল্প-শ্রমিকশ্রেণী ও নব-উত্থিত অ্যাফ্ল্যুয়েন্ট ওয়ার্কার তথা সমৃদ্ধ শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে এঁরা পার্থক্য দেখিয়েছিলেন কতকগুলি দিক থেকে। পরম্পরাগত শিল্প-শ্রমিকরা বসবাস করে থাকে অন্যান্য সামাজিক বসত এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন ও নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য ঘেরাবদ্ধ একান্ত এলাকাতে এবং গোষ্ঠীগতভাবে। এইভাবে তারা নিজেরা গঠন করে নিয়েছে এক ধরনের যূথচর গোষ্ঠী-সমাজ, যা সহকর্মী শ্রমিক, আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীদের দ্বারা ঘনবদ্ধ। এদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা গঠিত হয় পরস্পরের ক্ষমতার স্তর ও বিরোধ-ঐক্যের ভিত্তিতে। শ্রম ও বৃত্তি এদের ভাবগত জীবনের প্রধানতম অংশ এবং এই সার্বিক প্রক্রিয়া জীবনধারণের জন্য নিছক আর্থিক উপার্জন করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। পরম্পরাসম্পন্ন শিল্প-শ্রমিকদের দেখা পাওয়া যায় তুলনামূলকভাবে প্রাচীন শিল্পগুলিতে এবং দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত শিল্প-এলাকাগুলিতে।

অন্যদিকে অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কার বা নতুন এই সমৃদ্ধ শ্রমিকরা আসছে অন্য এলাকা থেকে নতুন প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক শিল্পে। অতি-উচ্চ মজুরি ও উন্নত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজের প্রতি এদের আকর্ষণ। এরা যেন এক ধরনের প্রাইভেটাইজড ওয়ার্কার অর্থাৎ ব্যক্তি-অধিকৃত শ্রমজীবী, যারা গোষ্ঠীগত সামাজিক জীবনে একাত্ম হওয়ার পরিবর্তে পরিবার ও গৃহ-কেন্দ্রিক আত্মমগ্ন থাকতে ভালবাসে। এরা কর্ম ও নিযুক্তিকে জীবনের কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ মনে করে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, বৃত্তিকে তারা জীবনযাত্রার জৈবিক ও যান্ত্রিক প্রয়োজন মেটানোর আর্থিক ও নিরাপত্তার চাহিদা পূরণের বেশি মনে করে না। তার ফলে 'মানবিক সম্পর্কে'র সাথে যুক্ত 'সামাজিক চাহিদা'গুলিকে পূরণ করার কোন তোয়াক্কা করে না এই অংশ। এদের মধ্যে গড়ে উঠছে উন্নত আর্থিকসম্পন্নতা-ভিত্তিক এক ধরনের নির্বিরোধী শ্রেণীর রূপ।

অবশ্য অ্যাফ্লুয়েন্ট-তাত্ত্বিকরা এটাও মনে করেছিলেন যে পরম্পরাগত শ্রমিকদের সাথে এই ধরনের পার্থক্যের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কাররা ক্রমশ মিডল ক্লাশ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে, কেননা তাদের শ্রেণীগতরূপের মধ্যে উন্নত আর্থিক অবস্থান থাকলেও তা' মধ্যবিত্ত-মর্যাদা-আদলের (মিডল ক্লাস প্রেস্টিজ মডেল) নয়। অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কাররা ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হয়, আন্দোলন করে এবং রাজনৈতিক নির্বাচনে প্রগতিশীলদের ভোট দেয়।

পরবর্তীকালের সমালোচনাগুলি দাবী করেছে যে গোল্ডথ্রপ প্রমুখের পক্ষ থেকে দুই অংশের— প্রচলিত ও নতুন শ্রমিকের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য-নির্দেশ ছিল বহুলাংশে অতিরঞ্জিত। কেননা অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপাদান পরম্পরাগত শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও দেখা যায়। তাছাড়া অন্য আর একটি দিক থেকে সমালোচনাও ছিল যথেষ্ট তীব্র। তা' হলো যে শ্রেণী-

কাঠামোর আর্থিক প্রতিচ্ছবিকে (মানি ইমেজ অব ক্লাস-স্ট্রাকচার) ক্ষমতার আদল (পাওয়ার মডেল) থেকে সরলীকৃত ও স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা চলে না। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টে অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কাররা নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়াতে অতীতে শ্রমিকদের প্রাপ্ত ক্ষমতার চাইতে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু একইসাথে একথাও সত্য যে নতুনরা পুরাতনদের মতই ক্ষমতাহীন। মূলধনের দাপটের সামনে আলোচনা, বিতর্ক ও সমালোচনা থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কাররা শ্রমিকশ্রেণীর উপরের কোন একটি স্তর নয়। তাছাড়া অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে লেনিন-আলোচিত 'অ্যারিস্টোক্র্যাট লেবার' ও 'অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কার' ধারণার মধ্যেও পার্থক্য ছিল। প্রথমোক্ত অংশ চিহ্নিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী দেশের সেই অংশের শ্রমিকরা, যাদের মধ্যে অন্য দেশ শোষণ করে মুনাফার একাংশ উচ্ছিষ্ট হিসাবে বিতরণ করে উন্নত মজুরি দেওয়া হতো। তার ফলে পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সেই অংশের শ্রমিকের সাধারণত অনীহা ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পদানত জাতিগুলির আন্দোলনে সহানুভূতি ছিল না। অন্যদিকে অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কার বলা হয়েছে সেই অংশের শ্রমিকদের যারা উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নতুন ধরনের কাজে যুক্ত হচ্ছে এবং দেশের অভ্যন্তরের প্রচলিত শিল্প-শ্রমিকদের তুলনায় উন্নত মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

শ্রম-প্রক্রিয়া ও ব্রেভারম্যান তত্ত্ব

১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় হ্যারি ব্রেভারম্যানের 'লেবার অ্যাণ্ড মনোপলি ক্যাপিটাল'। লেবার-প্রসেস সম্পর্কে আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছিল এটি।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে ষাটের দশক থেকে শিল্প-উৎপাদন তৃতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের কার্যকরী প্রয়োগের ফলে শ্রমের হাতিয়ারে নতুন উৎকর্ষতা সৃষ্টি ও তার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর আঙ্গিকের পরিবর্তন সংঘটিত হতে শুরু করেছিল। সমাজ-বিজ্ঞানীরা নতুন অংশের শ্রমজীবীদের বিশেষীকৃতভাবে চিহ্নিত করার জন্য 'নিউ ওয়ার্কিং ক্লাস' বা নতুন শ্রমিকশ্রেণী বলে উল্লেখ করা শুরু করেন। এই "নিউ" বা নতুন শব্দে বোঝানো হচ্ছিল সেই সমস্ত বৃত্তি যেগুলিতে সাধারণভাবে সঞ্চিত হচ্ছিল উৎপাদন ও প্রশাসনের নতুন জ্ঞান ঃ ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিসিয়ান, বিজ্ঞানী, অধঃস্তন ব্যবস্থাপক ও প্রশাসক, প্রশিক্ষক প্রভৃতি। এই 'নতুন'কে বোঝানো হচ্ছিল দু'ভাবে ঃ প্রথমত, সেই ধরনের বৃত্তি যা নতুন সৃষ্টি হয়েছে বা অতীতে স্বল্প পরিমাণে ছিল, কিন্তু বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে; দ্বিতীয়ত, 'নতুন'দের তথাকথিত গুরুগম্ভীর, অগ্রগতিমূলক ও 'পুরানো'দের চেয়ে উন্নত ভূমিকা। এ'কারণে এদের 'এডুকেটেড লেবার' বা শিক্ষিত শ্রমিকও বলা হচ্ছিল। হ্যারি ব্রেভারম্যান এইসব বক্তব্যকে সমূলে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি নতুন ধরনের উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াকে মনে করছিলেন টাইলারিজমের সম্প্রসার। কেননা সমগ্র টাইলার-পদ্ধতি সীমাবদ্ধ ছিল শ্রমিক-ব্যবস্থাপক সম্পর্কের মধ্যে। নতুন শ্রম-প্রক্রিয়া এর বাইরে যায়নি, মাত্রার দিক থেকে উন্নত হয়েছে মাত্র।

ব্রেভারম্যান সমগ্র প্রসঙ্গকে বিচার করেছিলেন মার্কসের মতোই, শ্রম-প্রক্রিয়ার মানদণ্ড দিয়ে। ব্রেভারম্যান লিখেছেন যে, ধনবাদে উদ্দেশ্যসাধন অর্থাৎ মুনাফা বৃদ্ধির জন্য নানা পন্থার অন্যতম হিসাবে ম্যানেজমেন্টের অর্থাৎ ব্যবস্থাপকদের দ্বারা শ্রমিকদের সর্বার্থসাধক যন্ত্রে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। এর লক্ষ্য হলো ঃ শ্রম-প্রক্রিয়ার বিষয় (সাবজেক্ট) বা উদ্দেশ্য যে শ্রম, তাকেই অপসারিত করা এবং তার পরিবর্তে শ্রমকে বিষয়ী (অবজেক্ট) স্তরে বা উপলক্ষে রূপান্তরিত করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সমগ্র কর্ম-প্রণালীর সর্বশেষের ক্ষুদ্রতম দিকটি পর্যন্ত ম্যানেজমেন্ট এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কর্তৃপক্ষের দ্বারা পূর্বাহ্নে সুনির্দিষ্টভাবে কল্পনা করে নিয়ে কাগজে ছক এবং মাপ-জোক ঠিক করা হয়। তারপর শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্ম-সম্পাদনের মান পূর্বেই নিশ্চিত করা হয় তা' রূপায়ণ করার জন্য। এবারে মনুষ্য-যন্ত্রকে যুক্ত করা হয় যন্ত্রের ক্ষমতা ও কাজ করার চরিত্রকে বাস্তবায়নের জন্য। ব্রেভারম্যান আধুনিককালের শ্রম-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে ধনতন্ত্রের এই নতুন শিল্প-উৎপাদন প্রণালী শ্রমিক ও যন্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র ফারাক বাড়িয়ে চলে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে নির্ধারকভাবে যন্ত্রের অধীনস্থ করে। মার্কস একেই চিহ্নিত করে শ্রম-প্রক্রিয়ার পরিণাম হিসাবে বলেছিলেন যে

সামরিক যুদ্ধে সেনাপতিরা সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে জয়ী হয় আর অর্থনৈতিক যুদ্ধে শিল্পের সেনাপতিরা জয়ী হয় শ্রমিকদের অপসারিত করে। এইভাবে পুঁজিবাদের ধারাবাহিক ভূমিকা থেকে বলা যায় যে বর্তমানে আলোচিত 'জবলেস গ্রোথ' বা 'স্ট্রাকচারাল আন-এমপ্লয়মেন্ট' কোন নতুন ঘটনা নয়। ক্রমান্বয়ে নতুন ও উন্নত শ্রম-প্রক্রিয়া সেটিকে তীব্র করেছে মাত্র।

ব্রেভারম্যান মনে করেছিলেন যে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রম-প্রক্রিয়াকে পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের মানদণ্ড হিসাবে বিচার করতে হবে। নিছক প্রযুক্তিগত বা সাংগঠনিক উপাদানের দ্বারা সৃষ্ট নয় শ্রম-প্রক্রিয়া। কেননা উৎপাদনের অর্থনৈতিক মালিকানার চরিত্র নির্বিশেষে প্রযুক্তি ও সংগঠনের নিজস্ব চাহিদা গড়ে ওঠে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করলেন যে যেভাবে শ্রম-প্রক্রিয়া তৈরি করা এবং এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তাতেও প্রতিফলিত হচ্ছে পুঁজিবাদের অভ্যান্তরের দ্বন্দ্ব—যা সৃষ্টি হচ্ছে পুঁজির দ্বারা শ্রম-শক্তি শোষণের জন্য। এই শত্রুতামূলক দ্বন্দ্বের অন্যতম প্রমাণ হলো যে আধুনিক কর্পোরেশন-গুলির প্রতিনিধিত্বকারী ম্যানেজাররা আর আস্থা রাখতে পারছে না শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন করার প্রচলিত ব্যবস্থার উপর। সুতরাং ম্যানেজাররা উদ্যোগী হয়েছে শ্রম-প্রক্রিয়ার উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ-আরোপে এবং উৎপাদনে স্তরে শ্রমিকদের এযাবৎকাল প্রাপ্ত যে কোন সুযোগ, যোগ্যতা, দক্ষতা ও ক্ষমতাকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করতে। প্রযুক্তির বিবর্তনকে ব্যবহার ও কাজকে সংগঠিত করার দিকটি পুঁজির পক্ষ থেকে স্থির করা হচ্ছে শ্রম-প্রক্রিয়ায় নিজেদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অর্জনের এবং প্রতিরোধ করার শ্রমিকের ক্ষমতাকে দুর্বল করার লক্ষ্যে।

শ্রম-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ব্রেভারম্যান। সেগুলির প্রত্যেকটিই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে অন্যতম দু'একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার, কেননা এ নিয়ে প্রথমাবধি বিতর্ক রয়েছে। নতুন উত্থিত শ্রমিক অংশের চরিত্রকে 'ইন্টেলেকচুয়াল লেবার' বলেননি তিনি, সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন 'মেন্টাল লেবার' শব্দটি। 'ইন্টেলেকচুয়াল লেবার' বা বোধিগত শ্রম 'ক্রিয়েটিভনেস' বা সৃজনশীলতা ও 'স্কিল' বা দক্ষতার সমন্বিত মর্ম বহন করে; 'মেন্টাল লেবার' বা মানসিক শ্রম তা' করে না। এই 'মানসিক শ্রম' নিছক 'ডি-স্কিলড' বা বি-দক্ষতামূলক শুধু নয়, একইসাথে গতানুগতিক। শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ও কর্তৃত্বকে খর্ব করার জন্য সর্বকালে ও ঐতিহাসিকভাবে ম্যানেজারিয়াল ব্যবস্থা চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। এই লক্ষ্যে, অন্যান্য তৎপরতার সাথে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি, কাজের সংগঠন ও নতুন প্রযুক্তির এমন ধরনের ব্যবহার করা শুরু হয় যা শ্রমিকের দক্ষতার উপর কম নির্ভরশীল। এই তিন পদ্ধতি একযোগে শ্রমিকের দক্ষতা হরণ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য শ্রমিকদের উপর ম্যানেজারের নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে অপসারণ করে তার পরিবর্তে যথাসম্ভব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যায়। ঐ তিন পদ্ধতিতে শ্রম-ব্যয় কমিয়ে মুনাফা যেহেতু বাড়ানো যায়, তাই দক্ষতা-হরণের প্রক্রিয়াকে তীব্র করা ও প্রযুক্তিগত বিকল্পকে শক্তিশালী করা হয়ে থাকে। ডি-স্কিলিং-এর বিষয়ে ব্রেভারম্যানের গভীর মননের প্রতিফলন ঘটেছে পুস্তকটির "এ ফাইনাল নোট অন স্কিল" অধ্যায়ে। কেননা ষাট ও সত্তরের দশকের লেখকরা, যেমন ড্যানিয়েল বেল (দ্যা কামিং অব পোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি, ১৯৭৪) বিপরীতভাবে বলেছিলেন যে নতুন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থায় শিল্প-শ্রমিকদের গড় দক্ষতার স্তর ক্রমশ উন্নত হচ্ছে, পাশাপাশি ঘটছে বৃত্তিগত কাঠামোর পরিবর্তন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিস্তার। তাছাড়া একাংশ সমাজ-বিজ্ঞানী দাবী করেছিলেন যে উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে শ্রমিকের ইন্টেলেকচুয়াল স্তর অর্জিত হচ্ছে, যা 'আপগ্রেডিং থিসিস' বলে পরিচিত হয়েছিল। এইসব ধারণার বিরোধিতায় দীর্ঘ যুক্তি উত্থাপনের পর ব্রেভারম্যান বললেন, "...বরং বিপরীতপক্ষে, তাদের (শ্রমিকদের) দক্ষতা কেবল অসীম চরিত্রে নেমে যায় না, (শ্রমিকরা হাতের ও মাথার কর্ম-নিপুণতা এবং পরম্পরাগত দক্ষতা হারিয়ে ফেলে এবং তার পরিবর্তে সেই ক্ষতিগ্রস্ততা নিছক নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করার দ্বারা পূরণ হয় না) তুলনামূলক ধারণার বিচারেও তা' হয়। বিজ্ঞানকে যত বেশি করে শ্রম-প্রক্রিয়াতে যুক্ত করা হচ্ছে, শ্রমিক তত কম অনুধাবন করতে পারছে সেই প্রক্রিয়া যন্ত্র যত বেশি জটিলতাসম্পন্ন হচ্ছে ও বোধিগত স্তর পাচ্ছে, সেবিষয়ে শ্রমিকের কর্তৃত্ব ও উপলব্ধি

তত কমছে। অন্যভাবে বলা যায় যে আধুনিক যুগ-ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কর্মকালে মনুষ্য-সত্তা বজায় রাখার জন্য শ্রমিকের পক্ষ থেকে যত বেশি জানার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই সে কম জানছে।...” ব্রেভারম্যান দেখালেন, যে নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট প্রবণতা “...ক্রমবর্ধমানভাবে বিশেষজ্ঞমূলক কারিগরী কৃৎকর্মের উপর ভর করছে, কিন্তু বিবেচেনাতে আনছে না যে কারিগরী বিশেষজ্ঞত্বের স্তরেও ব্যাপকভাবে স্ব-বিশ্লিষ্ট ভাগাভাগি সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে বিদায় দিচ্ছে বিজ্ঞান, জ্ঞান ও দক্ষতার জগৎ থেকে।”

ব্রেভারম্যানের এই ‘ডি-স্কিলিং থিসিস’ বা দক্ষতাহানির তত্ত্ব ‘লেবার-প্রসেস ডিবেট’-এ সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কেউ কেউ একে অতীতের ক্র্যাফ্‌ট স্কিল সম্পর্কে রোমান্টিক ধারণার বশবর্তী বলে সমালোচনাও করেছেন। তবে পরিপূর্ণভাবে মার্কসীয় মূল্যায়নের অনুসারী বলেই কেবল নয়, সর্বাধুনিক বাস্তবতা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনায়ও এটা প্রতিপন্ন হবে যে আধুনিক শ্রম-প্রক্রিয়ার মর্মে অন্যতম উপাদান হলো ‘ডি-স্কিলিং অব লেবার’।

পরবর্তী আরও তত্ত্বসমূহ

সত্তরের দশক থেকে শিল্প ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৃহত্তর ব্যবহারের ফলে শিল্প-ব্যবস্থার কাঠামো ও শ্রম-প্রক্রিয়ার পরিবর্তন সম্পর্কে আরও নতুন নতুন আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। শিল্পে কমপিউটারের প্রয়োগের ফলে শ্রমিকদের আরও ডি-স্কিলিং-এর স্বরূপ উদঘাটন করেন অ্যাণ্ড্রু জিম্বালিস্ট (এ. জিম্বালিস্ট সম্পাদিত ‘কেস স্টাডিজ অন দা লেবার-প্রসেস’ ১৯৭৭)। অ্যাণ্ড্রু ফ্রিডম্যান অন্যদিক থেকে দেখান যে আধুনিক কর্মক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকদের উপর পুঁজিবাদী কর্তৃত্বের দু’ধরনের রণনীতি গৃহীত হচ্ছে। একটি রণনীতি হলো ‘ডাইরেক্ট কন্ট্রোল’ বা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ, এটা করা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার কৃৎকৌশলের দ্বারা;দ্বিতীয়টি হলো ‘রেসপন্সিবল অটোনমি’ বা দায়িত্ববদ্ধ স্বয়ং-অধিকার। অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিককে কিছুটা স্বাধিকার দেওয়া এবং নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে উৎপাদন করা। কিন্তু ফ্রিডম্যান, তৎকালের বিচারে, ব্যর্থ হয়েছিলেন সমগ্র প্রক্রিয়ার প্রকৃত অভিমুখ নির্ধারণ করতে। কেননা ‘ডাইরেক্ট কন্ট্রোল’ ব্যবস্থার দ্বারা আসলে ‘রেসপন্সিবল অটোনমি’ ক্রমান্বয়ে অপসারিত হতে থাকে। তার ফলে পূর্ব প্রাপ্ত শ্রমিকদের স্বাধিকারটুকুও বাতিল হয়ে যায়। নিছক যন্ত্র ও ব্যবস্থাপনার তথা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার উপাঙ্গে পরিণত হয় শ্রমিকরা। এই ব্যবস্থায় ডি-স্কিলিং বাড়তেই থাকে। সুতরাং ফ্রিডম্যান ‘রি-স্কিলিং’-এর তথা পুনর্দক্ষতার যে উপাদান নতুন শ্রম-প্রক্রিয়ায় দেখাতে চেয়েছিলেন, তা’ কার্যকালে সত্য ছিল না। রিচার্ড এডোয়ার্ডস, বহুলাংশে, আধুনিক শ্রম-প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইতিহাসগত বিকাশের ব্যাখ্যা করেন (কনটেস্টেড টেরেইন, ১৯৭৯)। তিনি দেখান যে নতুন সৃষ্ট শিল্প-প্রক্রিয়া তথা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পিষ্ট হয়ে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে নতুন ধরনের প্রতিরোধের মুখে এবং নতুন ধরনের উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট নতুন ধরনের চাহিদা মেটাতে পুঁজিবাদ নতুন নতুন অনুক্রম উদ্ভাবন করে চলেছে। অতীতে উৎপাদনের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল ছোট কারখানার ব্যবস্থাপনা। পরবর্তীকলে এটা স্থান করে দিয়েছিল কারিগরী প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে (অ্যাসেম্বলি লাইন)। তার পর এসেছিল আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (সংশ্লিষ্ট কালের কর্পোরেশনগুলির অভ্যান্তরীণ সুবিস্তৃত শ্রমের বাজারকে কেন্দ্র করে—যাকে ‘সায়েন্টিফিক কন্ট্রোল’ বলা হচ্ছিল। এটাও ছিল এক অতিক্রান্তিকালীন ব্যবস্থা। কেননা এটা আসলে ছিল অ্যাসেম্বলি লাইন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত ও অবশিষ্ট সমস্ত সমস্যা সমাধানের এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাত্র। নতুন নতুন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা সত্ত্বেও তা’ যথার্থভাবে কেন ফলবতী হতে পারে না, তার কার্যকারণ অনুসন্ধান করে পিটার বরো, ব্ল্যাকবার্ণ ও মান (দা ওয়ার্কিং ক্লাস ইন দা লেবার মার্কেট, ১৯৭৯) দেখান যে নিয়োগের শর্ত হিসাব শ্রমিকের দক্ষতার মান নানাভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া হলেও নিয়োগের পর তার প্রয়োগের সুযোগ থাকে না। ক্রম্পটন, জোন্স ও রিডের (১৯৮২) আলোচনাতে বলা হয়েছিল যে সেক্রেটারিয়াল ও ক্ল্যারিকাল কাজেও, কমপিউটারাইজেশন প্রভৃতির প্রয়োগ স্বাধীনতা হরণ করছে। ককবার্ণ (১৯৮৩) আধুনিক ছাপাখানার সমগ্র কারিগরী পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন যে অতীতের

ছাপাখানা শ্রমিকদের অসাধারণ দক্ষতা ও সৃজনশীলতা লেশমাত্র প্রয়োগের সুযোগ আধুনিক (ডি.টি.পি., ফটো ওয়েভ অফসেট প্রভৃতি) ব্যবস্থার মধ্যে নেই। বরং যে কোন ব্যক্তি যিনি টাইপরাইটার বা কমপিউটার কী-বোর্ড চালনা করতে জানেন তিনি সমান্য অভিজ্ঞতায় সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি-সম্পন্ন সংবাদপত্রের ছাপাখানাতে কাজ করতে পারেন। এইভাবে ব্রেভারম্যানের ডি-স্কিলিং-এর তত্ত্ব নতুন প্রোডাকশন ও লেবার-প্রসেসের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছিল।

নতুন ধরনের সংগঠনের উদ্ভব ও বর্তমান সংগঠনগুলির পরিবর্তনের প্রক্রিয়া

নব্বই-এর দশকে পৌঁছে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়তে থাকে সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনের উপর। এইসময়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সংগঠনেরও আবির্ভাব ঘটেছে, সেগুলির মধ্যে এমন কিছু সংগঠন রয়েছে যেগুলির অনুগামীরা সমাজে স্পষ্টভাবে পরিচিত বা স্বীকৃত ছিল না বা তাদের স্বার্থের কোন সংগঠন ছিল না। অন্যদিকে, অতীতের পরম্পরাগত অপসারণ ঘটিয়ে সংগঠনের আমূল সংস্কার বা বিকল্প সংগঠনের প্রস্তাবও করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে সমাজতত্ত্বে। মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে এক এক ধরনের সংগঠনের উদ্ভব ঘটেছিল, সাধারণভাবে, সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থার স্বার্থে। একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্ভূত সংগঠন সংশ্লিষ্ট সমাজের বিকাশের প্রক্রিয়ার সমান্তরালে বিকশিত ও উন্নত হয়েছিল। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজে এসে যাওয়ায় পূর্বতন সংগঠনগুলির কোন কোনটির ভূমিকার পরিবর্তন ঘটলেও সেগুলির কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সর্বক্ষেত্রে ঘটেনি। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বহমান কোন কোন ধরনের সংগঠনের পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে গিয়েছিল। সমাজের ভিত্তি—অর্থনীতির অনুসারী হিসাবে উপরিসৌধের ব্যবস্থাবলী ও সংগঠন গড়ে ওঠে। অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন ঘটে তদনুযায়ী সংস্কার সাধিত হয় উপরিসৌধে। কিন্তু সমাজের বুনিয়াদে মৌলিক পরিবর্তন ব্যতিরেকেই বর্তমানকালে উপরিসৌধের এত চাঞ্চল্যকে ব্যাখ্যা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। সাধারণভাবে অনুমিত হচ্ছে যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত সংকটে উপরিসৌধের আঙ্গিকে গুরুতর পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, গুরুতর আরও প্রশ্ন ও সমস্যা থেকে যাচ্ছে। তা' হলো স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং আঙ্গিক তথা উপরিসৌধেই কি এমন গভীর সংকট সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য উপরিসৌধ আত্মসংস্কারের প্রক্রিয়াতে প্রবেশ করেছে কিংবা অর্থনীতি তথা বুনিয়াদের সংকটে জর্জরিত হতে হতে উপরিসৌধ বাধ্য হয়ে বেদীকে পরিবর্তন করার জন্য সক্রিয় হয়েছে। প্রায় সমস্ত ধরনের সংগঠনে নতুন পরিবর্তন-প্রক্রিয়া নিয়ে সার্বিক ও সমন্বিত আলোচনা ও মুল্যায়ন এখনও লক্ষ্য করা যায় না। তবে বিশিষ্ট ধরনের নতুন সংগঠন নিয়ে আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তবে দেশে ও ভৌগোলিক এলাকা প্রভেদে, সংগঠনের স্তরে পূর্বে বর্ণিত প্রক্রিয়া-প্রভেদ রয়েছে এখনও। কিন্তু পরিস্থিতির চাপ এত তীব্র এবং এমন বাস্তবতা সৃষ্টি হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে ও স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনের নতুন প্রক্রিয়ায় লীন হয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের সাম্প্রতিক রূপান্তর বা নতুন উদ্ভবের পিছনে প্রধানত দুই দিকের অবদান রয়েছে। সামাজিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া একদিক থেকে সংগঠনের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী স্বয়ং সক্রিয়ভাবে পরিবর্তনকে সংগঠিত ও কার্যকরী রূপ দেবার জন্য তৎপর। আবার এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাবের ফলেও কোন কোন ধরনের সংগঠনের উদ্ভব ঘটছে। এগুলিকে এখনও পর্যন্ত বাহ্যত যতটা পুঁজিবাদ-বিরোধী বলে মনে হয়, তার চেয়ে বেশি মনে হয় 'সামাজিক স্থিতাবস্থা-বিরোধী' হিসাবে।

পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিসহ নতুন সংগঠন বা পূর্বতন সংগঠনগুলির পরিবর্তনের কিছু কিছু দিক এবারে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

শিল্প-উৎপাদনে রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্টের নতুন বিন্যাস

শিল্প-উৎপাদন নিয়ে রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (আর. অ্যাণ্ড. ডি.) তথা গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থা আদিপর্বে পুরোপুরি ব্যক্তিগত ও ব্যক্তি-মালিকানার প্রসঙ্গ ছিল। ক্রমে তা' গৃহীত হয়েছিল

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষার অংশ ও ধাপ হিসাবে। শিল্প-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর ধনতান্ত্রিক ধ্রুপদী দেশগুলিতে সামরিক সামগ্রীর উৎপাদনের বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে রাষ্ট্র স্বয়ং দৃষ্টি দিতে থাকে। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও অনুরূপ কাজে নিয়োজিত করতে অর্থ বরাদ্দ শুরু হয়। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে অতীতে অভ্যস্ত ছিলেন অর্থনীতিবিদরা। তাঁরা মনে করতেন যে আর্থবিষয়ক নীতি উদ্ভাবন প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু ক্রমে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর. অ্যাণ্ড. ডি.'র ব্যাপারে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম নজর দেয় গত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আর. অ্যাণ্ড. ডি.'র কাজের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে শিল্প-পুঁজিবাদের কাছে। ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য শুধু নয়, নতুন পণ্য সৃষ্টি ও উৎপাদন প্রণালীসহ ফলিত অর্থনীতির বহু দিক এই গবেষণা ও উন্নয়নের কাজের অন্তর্গত হতে থাকে।

পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত আর. অ্যাণ্ড. ডি. প্রধানত নতুন ধরনের পণ্য সৃষ্টি ও উৎপাদনের প্রণালী অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। পরবর্তীকালে এর সাথে যুক্ত হয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য। পাশাপাশি, সমসাময়িক কাল থেকে আর. এণ্ড. ডি.-এর ভর রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ততা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দিকে দ্রুত বেড়েছে। এই দুই অংশের (রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত মালিকানা) মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য এই ভরের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। রাষ্ট্র বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও উন্নয়নকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বীয় স্বার্থের পক্ষে পুরোপুরি ফলপ্রসূ মনে করছিল না, কারণ (১) পূর্বোক্ত ব্যবস্থায় (রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে) গবেষণা হতো মৌলিক বিষয়ে এবং তা' প্রধানত জ্ঞানের অগ্রগতিব জন্য। (২) এই প্রণালীতে অর্জিত গবেষণা ও উন্নয়নের তথ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল; ফলে সেই ফলাফলকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নিজ প্রয়োজনে এবং একান্ত ব্যবহারের জন্য 'পেটেন্ট' করতে পারতো না। (৩) মৌলিক বিষয়ে গবেষণার কাজ দীর্ঘস্থায়ী এবং যথেষ্ট অনিশ্চয়তাপূর্ণ ছিল। কেননা বিপুল অর্থ ও সময় ব্যয় করার পরও, তা' থেকে কার্যকরী ফল অনেক সময় পাওয়া যেতো না। (৪) তাছাড়া গবেষণা-অর্জিত ফলাফলকে ব্যবহার করতে সুদীর্ঘ সময়ও লেগে যেতো অনেক সময়। এই পরিস্থিতি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অধিকাংশ সময়ই উপযোগী হতো না;তারা চাইতো আর. অ্যাণ্ড. ডি. তে বিনিয়োগের কার্যকরী দ্রুত ফলাফল। তার ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি চাপ দিতে থাকে যাতে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার পক্ষে দ্রুত সহায়ক হয় এবং আর. অ্যাণ্ড. ডি.'র উপর সরকার ও বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি বেশি গুরুত্ব দেয়। পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ প্রয়োজনের উপযোগী সুনির্দিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দায়িত্ব ও অর্থ প্রদান করা ছাড়াও নিজেরা আর. অ্যাণ্ড ডি. শুরু করে।

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষত বহুজাতিক সংস্থাগুলি, ক্রমে রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট-এ শুরু করে সুবিশাল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ। এই ব্যয়-বরাদ্দের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গির বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কারখানা ও যন্ত্রপাতির জন্য স্বাভাবিক বিনিয়োগের খরচ বাদে, উদ্ভাবনের জন্য ব্যয় বরাদ্দের হার দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ গবেষণা (আর) ১০ – ২০ শতাংশ, উন্নয়ন (ডি) ৩০ - ৪০ শতাংশ, উৎপাদন কারিগরী (পি ই বা প্রোডাকশন ইঞ্জিনীয়ারিং) ৩০ – ৪০ শতাংশ এবং বাজারে প্রয়োগ (এম বা মার্কেট লাঞ্চ) ১০ – ২০ শতাংশ। অধিকাংশ বহুজাতিক সংস্থা আর. অ্যাণ্ড ডি.'র ৬০ ভাগ বা তার বেশী ব্যয় করছিল সুনির্দিষ্ট ধরনের পণ্য ও উৎপাদন প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য।

আশির দশক থেকে প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য উৎপাদনের প্রণালীগত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি যেমন 'রিভার্স ইঞ্জিনীয়ারিং', 'কমপিউটার এইডেড ডিজাইন/ ম্যানুফ্যাকচার' (ক্যাড/ক্যাম), 'কমপিউটার নিউমারিকাল কন্ট্রোল সিস্টেম', 'প্রোগ্রাসেবল লজিক কন্ট্রোলারস', 'অটোমেটেড মেটেরিয়ালস হ্যাণ্ডলিং সিস্টেম', 'প্রসেস কন্ট্রোলারস', 'সেন্ট্রালাইজড ডাটা প্রসেসিং' ও 'অফিস টেকনোলজি'-এর জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আর. অ্যাণ্ড ডি.-তে জোর

দিতে থাকে। পাশাপাশি ডিজাইন, ইঞ্জিনীয়ারিং, অ্যাডভার্টাইজিং, মার্কেটিং ও ম্যানেজমেন্টের বিষয়েও আর. অ্যাণ্ড ডি.'র কাজ চলতে থাকে। উৎপাদনের তিনটি সর্বজনীন উপাদান—মূলধন, ভূমি ও শ্রমের সাথে আরও দুই মৌলিক উপাদান যুক্ত হয় এইকালে—ইনফরমেশন এবং আর. অ্যাণ্ড ডি.। ফলে আর. অ্যাণ্ড ডি.'র প্রসঙ্গ নতুন গুরুত্ব ও মাত্রা পেতে শুরু করে।

আর. অ্যাণ্ড ডি.'র দ্বারা অর্জিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নত ও ব্যাপক ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় ঘটতে থাকে নতুন নতুন রূপের আবির্ভাব। সেগুলির অন্যতম হলো ফ্লেক্সিবল প্রোডাকশন সিস্টেম, উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে উৎপাদন, উৎপাদনে 'সাপ্লাই সাইড'এর প্রাধান্য, সর্বোপরি লীন প্রোডাকশন এবং শেষোক্ত ব্যবস্থায় মালিক, ভোক্তা ও শ্রমিকের মধ্যে নতুন ধরনের সম্পর্ক গঠন ইত্যাদি। নতুন দিকগুলি যত বিকশিত বা সেগুলির সামনে সমস্যা বা জটিলতা দেখা দিতে থাকে ততই অনুভূত হতে থাকে রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্টের গতিকে তীব্র করার প্রয়োজনীয়তা। নানা দেশ বা আঞ্চলিক সংস্কৃতির আত্মীকরণ ও ব্যবহার করে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপক উদ্যোগ আর. অ্যাণ্ড ডি.'র পরিসরে নতুন মাত্রা যুক্ত করে দেয়। অতীতে প্রকৃতি বিজ্ঞানের মূল শাখাগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে সংশ্লিষ্ট গবেষক ও বিজ্ঞানী এবং উদ্ভাবনকে প্রয়োগে রূপান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন শাখার প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে আর. এণ্ড ডি.'র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গঠিত হতো। আর. অ্যাণ্ড ডি.'র কাজে অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, ব্যবস্থাপক, বাজার-বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি অংশকেও যুক্ত করা হচ্ছিল। কিন্তু ক্রমে সমাজ ও জীবনের প্রায় সমস্ত প্রসঙ্গের গবেষক ও পারদর্শীদের যুক্ত করা হতে থাকে। এইভাবে সমাজতত্ত্বের সমস্ত শাখা—সামাজিক পরিস্থিতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, পারিবারিক ব্যবস্থা, আইন, মতবাদ, ধর্ম, ভাষা, ভোগ, রুচি, আচার-ব্যবহার, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গ ক্রমান্বয়ে উৎপাদন ও পরিষেবার আর. অ্যাণ্ড ডি.'র অন্তর্গত হয়ে পড়েছে।

আর. অ্যাণ্ড ডি.'র কাজে অতীতের অন্তর্মুখীনতার পরম্পরাগত প্রকাশতাভিত্তিক কেন্দ্রীভূত কাজ কর্ম, এখন বাইরের জ্ঞান সংগ্রহ, আত্মীকরণ ও ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা গঠিত হওয়ার ফলে বিকেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ধ্রুপদী জ্ঞান ও লোকায়ত জ্ঞানকে সমন্বিত করে আর. অ্যাণ্ড ডি.'র কাজ এখন পরিচালিত হয়। এইভাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া গঠনের পরিকল্পিত উদ্যোগে গবেষণা ও উন্নয়ন নতুন ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।

স্থানগত ব্যবধান ও শ্রমের পার্থক্য গঠনের দ্বারা গতিময় উৎপাদন-প্রণালী

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে নতুন বিশ্বায়ন ব্যবস্থা গঠনের প্রথম পর্বে শ্রমের ও শ্রমের বাজারের বিভাজন ও পুনর্বিন্যাস-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট কালের উদ্ভিন্ন কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে। সেই স্তরটি থেকে শুরু করে বর্তমান কালের উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার ফলে শ্রম ও শ্রম-বাজারে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার তাত্ত্বিক গঠনটি এবারে লক্ষ্য করা যেতে পারে। তবে এই তত্ত্বের বাস্তব ও ফলিত দিকগুলি পরে ধাপে ধাপে কিছুটা আলোচনা করা হবে।

ভৌগোলিক ব্যবধানগত (স্পেটিয়াল) ও ক্ষেত্র-ভিত্তিক (সেক্টোরাল) ব্যাপক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করার প্রবল ক্ষমতা অর্জনের ফলে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন তথা বহুলাংশে গ্লোবাল কর্পোরেশনগুলি এখন বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি, সামাজিক গঠন (স্যোসাল ফর্মেশন) শুধু নয়, বহু দিককে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করার সুযোগ নিচ্ছে ক্রমশ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পদ্ধতির সাহায্যে এই প্রয়াস চালানোর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, উৎপাদনগত ও সাংস্কৃতিক স্তরে বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। যদিও এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্তর অসমান। নতুন তৎপরতা স্বয়ং এই অসমানতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলেও অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অন্তর্গত ইউনিট বা এককগুলির (দেশ বা অঞ্চলগুলির) রয়েছে বিভিন্ন বাস্তবতা, কর্মসূচী ও গতি (ডিনামিকস)। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সমান অবস্থা সৃষ্টির জন্য বিশ্ব-পুঁজিবাদ সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করছে দেশ বা অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যবধান (স্পেটিয়ালিটি)

ও গতিময়তাকে (ডিনামিকস) এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের পরিবেশকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াকে গঠন করা হচ্ছে ব্যবধান (স্পেস) ও সময়ের (টাইম) মধ্যে সংযুক্তি সাধনের দ্বারা। বহুজাতিক সংস্থার ব্যবধানীয় গতিশীলতার (স্পেটিয়াল ডিনামিকস) অর্থ হলো নানা দেশে ছড়িয়ে কারখানা বা উপ-ঠিকাদারী প্রথায় উৎপাদন করা এবং উৎপাদনকে ইচ্ছামত স্থানান্তর করার গতিশীলতা। এই কাজে ব্যবধানীয় সুনির্দিষ্টতা ব্যবহারের (স্পেটিয়াল স্পেসিফিসিটি) তাৎপর্য হলো নানা দেশে ছড়িয়ে উৎপাদন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশ, অঞ্চল, সমাজ, প্রবহমান শ্রেণীগঠন, পরম্পরাগত শ্রম-প্রক্রিয়া, সংস্কৃতি ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট বাস্তবতাকে ব্যবহার। সময়-সুনির্দিষ্ট সংগঠনের (টাইম স্পেসিফিক অরগানাইজেশন) অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও কার্যকরী উৎপাদন-সংগঠন নির্মাণ। নতুন উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়া গঠিত হচ্ছে এই তিনের মধ্যে সর্বোত্তম সংযুক্তি-সাধনের দ্বারা। এই সংযুক্তির ফলে যখন যে আদল পাওয়া যাচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রে ও মুহূর্তে তার চেক্-আপ এবং ত্রুটি-মুক্ত করে পুনঃ সংস্থাপনের কাজও চালানো হচ্ছে অবিরত। এইভাবে উৎপাদনে ব্যবধান গঠনের সাথে সময়ের সংযুক্তি সাধনের কাজটি আধুনিককালে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এর সাথেই বহুজাতিক সংস্থার উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে ব্যবধা-ক্ষেত্র সম্পর্ক বিধানের (স্পেস-সেক্টর ইন্টারফেস) দিকটি নির্ভর করে শ্রম ও উৎপাদনের গতিময়তার (ডিনামিকস) উপর।

সত্তরের দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত এম. এন. সি.গুলির ব্যবধানমূলক (অর্থাৎ নানা দেশে ছড়িয়ে উৎপাদন করা) ব্যবস্থা ছিল নীচু থেকে উর্ধ্বমুখীন স্তর-ভিত্তিক কাঠামোর (হায়ারাক্যাল স্ট্রাকচার) দ্বারা গঠিত। ভৌগোলিক ব্যবধানে ছড়ানো উৎপাদনের জন্য গড়ে তোলা হয় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও যোগাযোগের সুসংবদ্ধতা। ছড়িয়ে উৎপাদন কাঠামো তথা কারখানা চালানো এবং প্রয়োজনে যে কোন সময় ও স্থানে সেগুলি সরিয়ে নেওয়ার মতো ব্যবস্থা ও কাঠামোর ফ্লেক্সিবিলিটি স্বয়ং ছিল ব্যবধানমূলক এই নতুন চরিত্রের পিছনে একই সাথে কারণ ও ফলাফল। হায়ারার্কির দ্বারা ক্ষেত্র-ভিত্তিক (সেক্টোরাল) পরিচালিত ও ব্যবধান-ভিত্তিক (স্পেটিয়াল) সুগঠিত বর্ডার-লেস কর্পোরেশনগুলির সমগ্র ব্যবস্থাপনা তিনটি স্তরের দ্বারা প্রতিপালিত হতে থাকে। স্তর তিনটি হলো ঃ ব্যবসায়িক প্রশাসনিক স্তর, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী স্তর এবং উন্নত মিডিয়া-প্রযুক্তির দ্বারা যোগাযোগ ও তথ্য সরবরাহের স্তর। ব্যবসায়িক প্রশাসনের অবস্থান হলো সংশ্লিষ্ট এম. এন. সি.-টির মূল দেশের কেন্দ্রীয় দপ্তরে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী স্তরটির অবস্থান হলো অন্য দেশে প্রতিষ্ঠানটির শাখা/সাবসিডিয়ারির কেন্দ্রীয় দপ্তরে। তৃতীয় স্তরটি অন্য দেশে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে চাপ সৃষ্টির দ্বারা উৎপাদনের ব্যয়কে সর্বনিম্ন রেখে এক সামগ্রিক ভূমিকা পালন করে। কাঁচামাল, শ্রম-শক্তি, সম্পদ, পরিকাঠামো ও বাজার খোঁজা ও প্রসারে এবং সেগুলিকে যথাযোগ্য ব্যবহারে তৃতীয় স্তরের কার্যকলাপ ছড়ানো থাকে এবং কর্পোরেট মূল প্রশাসন ও অন্য দেশে সেটির উৎপাদন ও বন্টনের প্রশাসন হাত ধরাধরি করে চলে। এইভাবে কর্পোরেট অর্থনীতির অভ্যন্তরে সমন্বয় ঘটে। এই ধরনের তৎপরতার ফলে এম. এন. সি.'র বিচরণের অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে অসাম্য সৃষ্টি হয়। দেশে দেশে উৎপাদন কেন্দ্রগুলির অভিমুখে দক্ষ ও উন্নত শ্রমিকদের আগমনের প্রবাহ শুরু হয়। কর্পোরেশনের শ্রম ও উৎপাদনের গতিময়তাকে আরও পুষ্ট করে চলে পরম্পরাগত শ্রমিকদের অপসারণ।

ভৌগোলিক ব্যবধান-ভিত্তিক বহুজাতিক সংস্থার উৎপাদন-প্রণালীতে ভূমি-লম্ব (ভার্টিক্যাল) ও ভূমি-সমান্তরাল (হরাইজন্টাল) ব্যবস্থার মধ্যে এক ধরনের দ্রবন ঘটিয়ে চলতে থাকে সাযুজ্য অর্জনের কাজও। এই প্রয়াসে সৃষ্টি হতে শুরু করে নতুন ব্যবহারিক আদল। এই আদল অর্জনের প্রয়োজন হচ্ছিল অন্য কারণেও। উৎপাদন দেশে দেশে বিভিন্ন স্তরে সম্পন্ন হওয়ায় নির্মিত পণ্যের বাজার ও প্রযুক্তিগত স্তরে গড়ে উঠছিল পার্থক্য। তাছাড়া ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছিল শ্রমিকদের মধ্যে এবং উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার কাঠামোর মধ্যে। অর্থাৎ ব্যবধানীয় উপাদান (স্পেটিয়াল এলিমেন্ট) ছড়াতেই থাকে। সুতরাং উৎপাদন,

বাজার, শ্রম, প্রযুক্তি ইত্যাদির উপর এম. এন. সি.গুলির কার্যকরী কর্তৃত্ব অর্জনের স্বার্থে সার্বিক সাযুজ্য অর্জনের রণনীতির প্রয়োজন সবসময় দেখা দেয়।

আশির দশকে পৌঁছে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি পূর্বোক্ত কার্যকলাপ চালিয়ে সংস্কারের প্রক্রিয়া চালু করে; পুঁজি-নিবিড় ও শ্রম-নিবিড় উভয়বিধ পদ্ধতিতে আরও খণ্ডিকৃত ও পরিশীলিত উৎপাদনের রূপ অর্জনের অধ্যায়ে প্রবেশ করে তারা। এটা রচনা করা হয় পণ্যের প্রতিটি দফাওয়ারী খণ্ডিকরণের ব্যবস্থার সাথে ব্যবধান ও ক্ষেত্র-ভিত্তিক শ্রমের বিভাজনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। অর্থাৎ এক একটি দেশের কারখানায়, একটি খণ্ডের একটি মাত্র অধ্যায়ের উৎপাদনকে নির্দিষ্ট করে সেটিকে আরও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা এবং সেই কাজে আলাদা আলাদা ধরনের শ্রমিক (অতি-দক্ষ, দক্ষ, আধা-দক্ষ, অদক্ষ ইত্যাদি) নিয়োগ করা। তাছাড়াও কোন কোন খণ্ড পুঁজি-নিবিড় তথা উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং কোন কোন খণ্ড কম মজুরির অদক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে বা সাব-কন্ট্রাক্টিং-এ শ্রম-নিবিড় পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হতে থাকে। এই সংমিশ্রণের কাজ আসলে ঘটতে থাকে আরও ব্যাপক পরিসর জুড়ে। একদিকে বহুজাতিক সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক রণনীতিকে আরও পরিপুষ্ট করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উৎপাদন ও ভোগের কাঠামোকে শক্তিশালী করতে নিজেদের প্রশাসনিক কাঠামো উন্নততর করে চলে, অন্যদিকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে উৎপাদনের কাজে আত্মীকরণ ও ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনাকে বণ্টন করে দিতে থাকে অ-স্তরমূলক প্রশাসনিক কাঠামোতে, আবার উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধনও করে যেতে থাকে। উৎপাদনের দেশগত ব্যবধান, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের মধ্যে ব্যবধান, পুঁজি-নিবিড় ও শ্রম-নিবিড়ের মধ্যে ব্যবধান ইত্যাদিতে এইসব প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকেনি। এগুলি যুক্ত হতে থাকে ও প্রভাব ফেলতে থাকে আন্তর্জাতিক দর ব্যবস্থা (প্রাইস মেকানিজম), মজুরি-প্রভেদক (ওয়েজ ডিফারেন্সিয়াল) ও শ্রমের তুলনামূলক গতিশীলতার (কম্পারেটিভ মবিলিটি অব লেবার) উপরও। এইসব প্রতিক্রিয়া প্রধানত ও সাধারণভাবে সৃষ্টি হয় তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে প্রথমে এম.এন.সি.গুলির উৎপাদনের স্তরে। ক্রমে এগুলি প্রভাব ফেলতে শুরু করে তৃতীয় দুনিয়ার সমগ্র উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে।

এর পরিণাম বা বাস্তব ফলাফল কিছুটা লক্ষ্য করা যেতে পারে। পুঁজি-নিবিড়, দক্ষ ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে উৎপাদনের ফলে উচ্চ মজুরির কাজগুলি পৃথিবীর কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকাতে সংহত হচ্ছে। তৃতীয় দুনিয়ায় এম.এন.সি. প্রতিষ্ঠানের এই উৎপাদন এলাকাগুলিতে এসে জড়ো হচ্ছে সংগঠিত, দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকরা। তার ফলে এইসব এলাকাতে সর্বাংশের শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে প্রভেদ—শ্রম,মূল্য ও মজুরি-প্রভেদক, জীবনমান, মানসিকতা ইত্যাদিতে। এম.এন.সি.গুলির দেশে এজাতীয় তৎপরতার ফলে, তাদের স্বদেশে নিয়োগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে অনুরূপ দক্ষ শ্রমিকদের। অথচ কম মজুরিতে সমতুল শ্রমিকের সংখ্যা এম.এন.সি.'র প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোটের উপর বাড়ছে। তৃতীয় দুনিয়ার এই অংশের শ্রমিকের মজুরি উন্নত দুনিয়ার সমতুল শ্রমিকের তুলনায় কয়েক গুণ কম হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের তুলনায় তা' অনেক বেশি;স্বভাবতই তারা কিছুটা স্বতন্ত্র অবস্থান নিচ্ছে ও অভিজাত রূপ পাচ্ছে।

কিন্তু শ্রমের ব্যবধান ও বিভাজনের ক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন প্রণালী, সম্পূর্ণ ভিন্ন রণনীতির দ্বারা পরিচালিত। অন্যদিকে পরম্পরাগত দেশীয় শ্রম-নিবিড় উৎপাদনের থেকে বহুজাতিক সংস্থা অনুসৃত শ্রম-নিবিড় ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে স্বতন্ত্র। কোন কোন ধরনের পণ্য উৎপাদনে এম.এন.সি.গুলি পুঁজি-নিবিড় ব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রম-নিবিড় উৎপাদনে শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে নিয়োগ করছে। ফলে দেশীয় প্রথাগত উৎপাদন-প্রণালী উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক গঠন প্রবেশ করেছে এক ধরনের ভাঙ্গনের প্রক্রিয়ায়। অন্যদিক থেকে এতে এম.এন.সি.গুলির লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে। কেননা ভৌগোলিক ব্যবধানজনিত সমস্যাকে সর্বাধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহন প্রযুক্তির সাহায্যে এবং উৎপাদনকে খণ্ড খণ্ড করার ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করার সুযোগ শ্রম-নিবিড় ব্যবস্থার দ্বারা তৈরি হয়েছে। এই ধরনের ব্যবস্থার সাহায্যে (অর্থাৎ দেশীয় প্রথাগত উৎপাদন প্রণালী ও সামাজিক

গঠনে ভাঙ্গন এবং উৎপাদনকে উন্নত ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির সাহায্যে খণ্ড খণ্ড অধ্যায়ে বিভক্ত করা) উৎপাদনকে পৃথিবীব্যাপী সমচরিত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভব হচ্ছে প্রক্রিয়াগুলিকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া। মূল উৎপাদনের অনুষঙ্গ প্রক্রিয়াতে গ্রাম-শহরের আধা-সংগঠিত ও অদক্ষ বা আধা-দক্ষ শ্রমিকদের অনিয়মিত বা সাময়িকভাবে নিয়োগ করে উৎপাদনে শ্রমের যোগানকে কেবল নিখুঁত করা হচ্ছে না, বিপুলভাবে ঘটানো হচ্ছে শ্রম-ব্যয় তথা উৎপাদনের ব্যয়ের সংকোচ। উৎপাদনের স্তরে তিনটি উপাদানকে শ্রমের উপর সক্রিয় করে এটা সম্ভব হচ্ছে—(১) তীব্রকরণ (ইন্টেনসিফিকেশন), (২) যুক্তিসম্মতকরণ (র‍্যাশনালাইজেশন) এবং (৩) কারিগরী পরিবর্তন (টেকনিক্যাল চেঞ্জ)। এই তিনটি দিককেই এখন প্রবল ও সমন্বিতভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে। এই তিনটি উপাদানকে তীব্র করার অন্যতম লক্ষ্য হলো উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই ব্যবস্থাকে, অতীতের ফোর্ডবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নতুন পথ গৃহীত হচ্ছে বলে অনেক সমাজতাত্ত্বিক দাবী করেছেন।

ফোর্ডবাদের বেশ কিছু দিক বজায় রাখা হলেও, এও ঘটনা যে উৎপাদন ও শ্রমের ব্যবধান ও বিভাজন এক নতুন দিক। এই ব্যবধান ও বিভাজনের আর এক পরিণাম হলো বৃহদাকার এবং পাশাপাশি থোক থোক উৎপাদন। এই পদ্ধতিতে মাত্রার অর্থনীতির (ইকনমিকস অব স্কেল) বৃহত্তর দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে। এই প্রণালীকে কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন 'পোস্ট-ফোর্ডিস্ট' বা ফোর্ডোত্তরবাদী (এটলিংগার, ১৯৯০)। এই প্রথাতে সংগঠিতদের পাশাপাশি অসংগঠিত শ্রমিকদের আধা-ঠিকাদারী প্রথায় এবং খণ্ড খণ্ড কাজের শ্রম-পদ্ধতির দ্বারা গঠন করা হচ্ছে তথাকথিত "অ-ধনতান্ত্রিক" উৎপাদন কেন্দ্র। এইভাবে উন্নত ও সংহত উৎপাদনের পাশাপাশি শ্রম-নিবিড়, খণ্ড খণ্ড চরিত্রের পশ্চাৎপদ পদ্ধতির উৎপাদন সহাবস্থান করছে।

ফোর্ডবাদের পতন (!)

উৎপাদন-প্রণালী ও শিল্পে অর্থনৈতিক শাসন বা নিয়ন্ত্রণের সুসংহত ব্যবস্থা হিসাবে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ফোর্ডবাদের কার্যকারিতার সংকটকে ঘিরে নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছিল সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে। প্রশ্ন এসেছিল কোন পদ্ধতি গৃহীত হবে পরবর্তীকালে। উদ্ভাবনের পর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে ফোর্ডবাদী ব্যবস্থা। স্বভাবতই এটিও আধুনিকতাকে আশ্রয় করে এগিয়েছে। তাই আকস্মিকভাবে কি এই ব্যবস্থার সাথে বিচ্ছেদ সম্ভব? এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিল্প ও সমাজে যে ব্যাপক ও গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা' কি আকস্মিকভাবে পরিবর্তন করা যাবে? কিন্তু উৎপাদন-প্রক্রিয়া এত দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল এবং তার সাথে পরম্পরাগত শিল্প-ব্যবস্থাপনার এমন সংঘাত ঘটছিল যে নতুনের ভাবনা না ভেবে পুঁজিবাদের উপায় ছিল না।

আশির দশকের মাঝামাঝি, পুঁজিবাদী শিল্প-ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনগুলির মূল্যায়ন করতে গিয়ে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'মার্কসিজম টু-ডে' পোস্ট-ফোর্ডিজম বা ফোর্ডোত্তরবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে। ধনতন্ত্রের আঙ্গিকের পরিবর্তন ও সেটির তত্ত্বগত দিকটিকে ফোর্ডোত্তরবাদ বলে উল্লেখ শুরু হয়েছিল। কিন্তু, সন্দেহ নেই যে এখনও পর্যন্ত পোস্ট-ফোর্ডিজম এক অসংহত ও প্রশ্নযোগ্য ধারণার স্তরেই রয়েছে। কেননা পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালী ও শিল্প-নিয়ন্ত্রণের কোন সুসংহত সর্বজনীন ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। সবই পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে এবং মুখোমুখি হচ্ছে সমস্যারও। একাংশ মতবাদী নতুন ব্যবস্থাকে বলেছেন, এই ধারা ফোর্ডবাদের সাথে কোনভাবে সম্পর্কিত নয়—এ' হলো 'ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন' বা ফ্লেক্সিবল বিশেষজ্ঞত্বমূলক। আরেক অংশ (এস. ল্যাসে ও জে. উরি : দা এণ্ড অব অরগানাইজড ক্যাপিটালিজম, ১৯৮৭) নতুন প্রক্রিয়াকে বলেছিলেন 'নন-ফোর্ডিজম' বা অ-ফোর্ডবাদ। এঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে সংগঠিত ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়াপনার ব্যবস্থা থেকে অধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণমূলক বি-সংগঠিত (ডিসঅরগানাইজড) স্তরে প্রবেশ করেছে বিশ্ব-একচেটিয়া পুঁজিবাদ। এই অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে আধুনিক সমাজের অধিকতর খণ্ডিকরণের প্রক্রিয়ার সাথে—যাকে বলা হচ্ছে পোস্ট-মডার্নিজম' বা আধুনিকোত্তরবাদ। তৃতীয় মতবাদীরা

নতুন ব্যবস্থাকে বলছেন 'নিও-ফোর্ডিজম' বা নয়া-ফোর্ডবাদ। এঁদের বক্তব্য হলো যে ফোর্ডবাদ বিলুপ্ত হওয়ার পরিবর্তে পরিশীলিত রূপ নিচ্ছে এখন। এই ব্যবস্থা ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে বাজার ও উৎপাদনকে ঘিরে। কোন ধরনের নিয়ম ও শাসনকে অস্বীকার করে মুক্ত ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার স্তর এটি, যে কারণে সমাজ-সংস্কৃতির সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক-সাধনের ভাবনা এখন পরিত্যক্ত হচ্ছে।

'নিও-ফোর্ডিস্ট' প্রবক্তাদের ধারণা যে অদূর ভবিষ্যতে উদ্দেশ্যসাধক যন্ত্রের দ্বারা অটোমেশনকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হবে অধিকতর ফ্লেক্সিবিলিটি অর্জন করার জন্য। এক গুচ্ছ যন্ত্রের সাহায্যে একের পর এক অথবা / এমনকি একইসাথে, একাধিক পণ্য ও প্রত্যেকটি পণ্যের একাধিক বৈচিত্র্য যথাক্রমে নির্মাণ বা সৃষ্টি করা যাবে। তবে এই প্রথায় পাশাপাশি থাকবে চলমান অ্যাসেম্বলী লাইন ব্যবস্থাও। যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে স্থির কনভেয়রের পরিবর্তে যুক্ত করা হবে কমপিউটার-নিয়ন্ত্রিত পূর্বে নির্ধারণ করে দেওয়া কর্মসূচীর ক্যারিয়ারগুলি (প্রোগ্রামেবল ক্যারিয়ারস)। শ্রম-প্রক্রিয়াতে ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকদের ওপর কঠোর অনুশাসন অব্যাহত থাকবে। কর্মের নিয়মিত খণ্ডিকরণের ব্যবস্থায় পণ্যের নিপুণতার যে হানি ঘটছে, তার প্রতিকারে উৎসাহ দেওয়া হবে যূথবদ্ধভাবে কাজ করাকে। আধা-দক্ষ শ্রমিক-নিয়োগ হবে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সামাজিক মনস্তত্ত্বে বৈচিত্র্যের যে চাহিদা বাড়ছে তা' ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ও গভীর হবে। এই পরিস্থিতিতে পণ্য-বাজারের চাহিদা মেটানো হবে পণ্যের আদল ক্রমাগত পরিবর্তনের পরিকল্পনা এবং প্রত্যেকটি আদলের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। তবে এই বৈচিত্র্যময় পণ্য-উৎপাদনের উৎপাদনের চরিত্রের মধ্যেও ব্যাপক সর্বজনীনতা গড়ে তোলা হবে। উৎপাদনে সর্বজনীনতা ও যন্ত্রপাতির অধিকতর ফ্লেক্সিবল ব্যবহারের দ্বারা নিও-ফোর্ডিস্ট পদ্ধতির উৎপাদকরা প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে ফোর্ডবাদী ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট ও বহমান অর্থনৈতিক চাহিদার অর্থাৎ মুনাফার যোগানও দিয়ে যাবে।

ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন

'ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন' (এফ. এস.) বা ফ্লেক্সিবল বিশেষজ্ঞত্ব তত্ত্বের উদ্যোক্তা এম. পাইওরি ও সি. সাবেল (দা সেকেণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিভাইড, ১৯৮৪)। এঁরা দেখিয়ে দেন ও ব্যাখ্যা করেন যে ফোর্ডবাদের অবসানের মধ্য দিয়ে কিভাবে নতুন ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং অরগানাইজেশনের সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ পুরানো ধরনের কারখানা ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন ধরনের উদ্ভব ঘটছে।

'ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন' তত্ত্ব প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনার দু'টি আদলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছিল ঃ ফোর্ডবাদের 'ম্যাস-প্রোডাকশন' বা গণ-উৎপাদন ও ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন (এফ. এস.)। 'ম্যাস-প্রোডাকশন' ব্যবস্থা ছিল বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্যসাধক যন্ত্রের ব্যবহার এবং অর্ধ-দক্ষ শ্রমিককে একটি ধরনের কাজে দক্ষ করে গণ-ভোগ্য বাজারের জন্য মানসম্মত পণ্যের বিপুল উৎপাদন। অন্যদিকে ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন হলো, বিশেষীকৃত বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য, সর্বজনীন লক্ষ্যসাধক যন্ত্র এবং বিশেষজ্ঞ শ্রমিক ব্যবহার করে ব্যাপক ও নিয়ত পরিবর্তনশীল পণ্যের স্বল্প উৎপাদন। শেষোক্তকে এক ধরনের আধুনিক ক্র্যাফট-প্রোডাকশনও বলা চলে। 'ফ্লেক্সিবিলিটি' বলতে বোঝানো হচ্ছিল উৎপাদনের রূপকে। নতুন প্রযুক্তি দ্বারা, বিশেষত কমপিউটারাইজেশনের মাধ্যমে, সাধারণ উদ্দেশ্যসাধক যন্ত্র দিয়ে প্রোগ্রাম করে, বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করা যায়। অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষিত শ্রমিক, যার কমপিউটার ব্যবহারের যোগ্যতা রয়েছে, তার সাহায্যে ফ্লেক্সিবল যন্ত্রের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্য উৎপাদন পাওয়া যায়। স্পেশালাইজেশন বা বিশেষজ্ঞত্ব বলতে বোঝানো হচ্ছিল উৎপন্ন পণ্যের বাজারের চরিত্রকে। গণ-বাজার পরিণত হয়েছে খণ্ড খণ্ড বিশেষ চরিত্রের বাজারে, কেননা ক্রেতারা এখন চান অধিকতর বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভাবন।

বিশ্বায়নের অন্যতম লক্ষ্য জনগণের রুচি, চাহিদা ও ভোগের মধ্যে একধরনের সমতা অর্জন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ স্বীয় প্রয়োজনের জন্য একই ধরনের পণ্য ব্যবহার করবে। স্বভাবতই, ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশনের উদ্দেশ্য হবে অপরিচিত বিভিন্ন ধরনের পণ্য যাতে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে গণভোগের চরিত্র নেয়, তা' গড়ে তোলা। নিত্য ও অবশ্য-প্রয়োজনীয়

পণ্যের পরিবর্তে ভোগমূলক পণ্য-উৎপাদনে পুঁজিবাদ বর্তমানে অধিক মনোযোগী হওয়ায়, শেষোক্ত চরিত্রের পণ্যকে বিশ্বজনীন চাহিদায় পরিণত করা হলো। এই তথাকথিত রুচি ও ভোগের সমতা অর্জনের পদ্ধতিকে বলা হল 'এফ. এস.'। তাই 'ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন' এই স্তরে তৎপর, তার মধ্যে অব্যাহত ফ্লেক্সিবিলিটি রেখে।

নিত্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্য সাধারণভাবে সর্বজনীন চরিত্রের। তার পরিবর্তে ভোগমূলক পণ্যের প্রসঙ্গ এলে তা' স্বভাবতই খণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞমূলক হবে। খণ্ডিত হবে এই কারণে যে জনগণের সর্বাংশের পরিবর্তে খণ্ডিত অংশ এতে যুক্ত হতে থাকবে এবং বিশেষজ্ঞত্বমূলক হবে এজন্য যে নব-সৃষ্ট ভোক্তাদের রুচির মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে। এই 'ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইলজেশনে' আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য পুঁজিবাদ এখনো পায়নি; অন্যদিকে এই কাজে শ্রমিকের বিশেষ ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন হবে সম্পর্কিত দাবীও সঠিক নয়। কেননা কাজকে যখনই বিশ্লিষ্ট করা হচ্ছে তখনই তা' গতানুগতিক হতে বাধ্য। ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন সম্পর্কিত পরবর্তীকালের সমাজ-বিজ্ঞানীদের আলোচনাতে তা' স্বীকৃতও হয়েছে।

এফ. এস. ব্যবস্থার অভ্যন্তরে প্রযুক্ত প্রতিটি নীতির নির্দিষ্ট ধরনের প্রয়োজনীয়তা থাকে। নিম্ন বা ক্ষুদ্রাতি স্তর (মাইক্রো-লেভেল) ও উর্ধ্বতন বা প্রশস্ত স্তরে (ম্যাক্রো-লেভেল) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার দ্বারা এই প্রয়োজন পূরণ করা হয়। এফ. এস.-এর জন্য প্রয়োজন হয় উৎপাদনের ইউনিটগুলির মধ্যে একদিকেপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্যদিকে সহযোগিতার স্তরে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে উদ্ভাবনীকে উৎসাহিত করা। মাইক্রো-লেভেল তৎপরতার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অন্যতম হলো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্টস বা শিল্প জেলা/অঞ্চলসমূহ এবং বিকেন্দ্রীভূত বৃহৎ কোম্পানিগুলি। ফোর্ডবাদী ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারী নিয়ন্ত্রণমূলক জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে, এফ. এস.-এর ম্যাক্রো-লেভেল ব্যাবস্থাপনা সেগুলির অবসান ও মুক্ত ব্যবস্থা চায় ও চালু করে। এফ. এস.-এ শিল্প অঞ্চল গঠনের উদাহরণমূলক বিশ্ব-নজির হলো ইঞ্জিনীয়ারিং, ফার্নিচার, জুতো ও পোশাক নির্মাণের বিশেষজ্ঞতা-সম্পন্ন শিল্প জেলাসমূহের দ্বারা গঠিত 'থার্ড ইতালি', ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার 'সিলিকন ভ্যালি' প্রভৃতি।

ম্যানেজারদের ভূমিকা, দক্ষতা-হরণ, ফ্লেক্সিবল বিশেষজ্ঞত্ব ইত্যাদি নিয়ে পরবর্তী পরিস্থিতি

শিল্প-সমাজতত্ত্বের ধারায় বোধিগত স্তরে ব্রেভারম্যানের বক্তব্য এক নতুন বাঁক সৃষ্টি করেছিল, যার দ্বারা লেবার-প্রসেসের প্রকৃতি সম্পর্কে আকর্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রথম স্পষ্ট হয়েছিল পুঁজিবাদী শিল্প-ব্যবস্থাপনা ও নতুন উৎপাদন-প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভুত সামাজিক সম্পর্কের বিবর্তনের দিকগুলি। পরবর্তীকালের গবেষণাগুলি আরও গভীরভাবে নিবদ্ধ হয় দু'টি প্রসঙ্গে, বিশেষত, ডি-স্কিলিং এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনাগত রণনীতি নিয়ে।

ব্রেভারম্যান-আলোচিত লেবার-প্রসেসের বিপরীতে 'ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন 'তত্ত্ব কর্ম-পরিসরে নিম্নোক্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার ফলে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার পরিবর্তনে (ক) ডি-স্কিলড বা দক্ষতা-অপহৃত হওয়ার পরিবর্তে কর্মচারীরা 'রি-স্কিলড' বা পুনর্দক্ষ হচ্ছে। (খ) শ্রম হয়ে উঠছে অধিক সন্তুষ্টিমূলক এবং শ্রমিকদের অধিকার সৃষ্টি হচ্ছে অধিক স্বাধীনতার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার। (গ) এই নতুন প্রণালীতে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেননা শ্রমিকরা অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করছে এবং দক্ষ শ্রমিকদের আকৃষ্ট করার জন্য কোম্পানি অধিক মজুরি দিচ্ছে। (ঘ) এইরকম পরিস্থিতির ফলে শ্রম-সম্পর্ক হচ্ছে অধিকতর শান্তিপূর্ণ এবং অধিকতর টীম-ওয়ার্কের মানসিকতার ভিত্তিতে সাংগঠনিক সংস্কৃতি (অরগানাইজেশনাল কালচার) বিকশিত হচ্ছে। এটা ঘটছে অংশত এই কারণে যে, শ্রমিকদের কর্ম ও মজুরিতে উন্নতি এবং তাদের মানসিকতায় প্রতিষ্ঠান ও মালিক সম্পর্কে বিশ্বাস উৎপাদন করা ম্যানেজারদের সর্বক্ষণের কাজ হয়েছে। এই কাজের দ্বারা ম্যানেজার ও শ্রমিকদের মধ্যে নৈকট্য বাড়ছে। পাশাপাশি উৎপাদনের কাজের দ্রুত রূপের পরিবর্তন ও কর্মীদের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ও সুযোগ ম্যানেজারদের শক্ত নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করছে।

'ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন' তত্ত্বটি উল্লেখযোগ্য কতকগুলি বিশেষ কারণে। কারণ এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিল ঃ (ক) ফ্যাক্টরি অথবা উৎপাদনের ইউনিটের স্তরে উৎপাদনের পদ্ধতিকে (খ) কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রাতি (মাইক্রো-লেভেল) স্তরগুলি এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে (গ) জাতীয় স্তরের অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণকারী প্রশস্ত স্তরকে (মাইক্রো-লেভেল)। এই তত্ত্ব যথার্থভাবে পরিবর্তনশীল পণ্য-বাজার ও প্রযুক্তির গুরুত্বকে তুলে ধরেছিল এবং একই সাথে চিহ্নিত করেছিল কিভাবে পরিবর্তন ঘটছে বৃহদায়তন কোম্পানিগুলির কাঠামোর।

কিন্তু 'ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন' তত্ত্ব বিভিন্ন দিক থেকে নিম্নোক্তভাবে সমালোচিত হয়। (ক) দুই বিপরীত প্রযুক্তিগত তত্ত্ব তুলে ধরে, এই তত্ত্ব উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ইতিহাস ও বাস্তবের অতি সরলীকরণ ঘটিয়েছে। কেননা উভয় মডেলই (আধুনিক ও ক্র্যাফট শিল্প) একটি দেশীয় অর্থনীতিতে পাশাপাশি সহাবস্থান করছে। এমনকি একটি ফার্মের অভ্যন্তরেও ম্যাস প্রোডাকশন ও ক্র্যাফট প্রোডাকশন হয়। (খ) আধুনিক বাজারের চাহিদা যেহেতু অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ ও উদ্ভাবনীমূলক পণ্যের, তাই গণ-উৎপাদকরা বেশি বেশি করে 'ফ্লেক্সিবল প্রোডাকশন'-এর পদ্ধতি নিচ্ছে। অতীতের চেয়ে অধিকতর ফ্লেক্সিবল বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক যন্ত্র সরবরাহ করছে কমপিউটারীকৃত কারিগরী। সুতরাং উচ্চ পরিমাণে গণ-ভোগের উৎপাদন করেও, বিভিন্ন ধরনের বিশেষীকৃত পণ্য (সম পরিমাণে) অনায়াসে উৎপাদন করতে পারে গণ-উৎপাদকরা। তদুপরি, বিশিষ্ট বাজারের জন্য বিশিষ্ট ধরনের পণ্য উৎপন্নের পাশাপাশি গণ-ভোগের জন্য পণ্য উৎপাদনের সমন্বয়ও প্রায়শই হয়ে থাকে। মোটর গাড়ির যে উৎপাদকরা কম সংখ্যায় বিশেষ মডেল তৈরি করে, তারা এইসব গাড়িতে প্রায়শই সর্বজনীন ধরনের ইঞ্জিন, ড্রাইভ চেসিসের অংশ ইত্যাদি ব্যবহার করে। (গ) নতুন প্রযুক্তির দ্বারা দক্ষতার উন্নয়নের ফলে শ্রমিকের স্বাধিকার ভোগ ও কর্মসন্তুষ্টি তৈরি নাও হতে পারে, কেননা ম্যানেজারা এটা নাও চাইতে পারে। (ঘ) এফ. এস. তত্ত্বে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্ট-এর যে উদাহরণ দেওয়া হয়ে থাকে (থার্ড ইতালি, সিলিকন ভ্যালি ইত্যাদি) সেইসব অঞ্চলে অতি আদিম ধরনের শ্রম, শিল্প ও উৎপাদন চালু আছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ও ব্যবহারের নজির এইসব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্ট-এর কারখানায় নেই বললেই চলে। সুতরাং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্টকে প্রগতিশীল শিল্প-ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা ভ্রান্ত। (ঙ) তত্ত্বটিতে বৃহদায়তন কারখানাকে যতটা বিকেন্দ্রীকৃত বলে দেখানো হয়েছে, বাস্তবে তা' নয়। বরং বৃহদায়তন শিল্পগুলি এখনও শিল্প-উৎপাদনে কর্তৃত্ব করছে এবং শিল্প ও যন্ত্র উদ্ভাবনের এবং প্রয়োগের কেন্দ্র প্রধানত এগুলিই।

এবারে 'ডি-স্কিলিং' ও 'ম্যানেজারিয়েল স্ট্র্যাটেজি' বা ব্যবস্থাপনাগত রণনীতি সম্পর্কিত সমস্যা ও যুক্তি-তর্কের অন্যান্য দিকগুলি কিছুটা উত্থাপন করা যেতে পারে। এটা দেখা যাচ্ছে যে শিল্পে উন্নত পুঁজিবাদী সমাজগুলিতে বৃত্তিগত পরিবর্তনের অন্যতম লক্ষণ হলো নিম্ন-যোগ্যতার বৃত্তিগুলি ক্রমশ কমে আসছে এবং বাড়ছে উচ্চস্তরের শিক্ষা-নির্ভর বৃত্তির সংখ্যা। তার ফলে পরম্পরাগত রূপের শিল্প-শ্রমিকের রূপের পরিবর্তন ঘটছে এবং নতুন ধরনের শ্রমজীবীরা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে সংখ্যায়। একারণে শ্রমজীবী জনসংখ্যার গড়পড়তা শিক্ষারে স্তর উন্নত হচ্ছে। যাই হোক, এই সাধারণ উন্নয়নের অভ্যন্তরে এইটাই স্বাভাবিক ও সম্ভব যে কোন কোন শ্রমের ক্যাটাগরি দক্ষতা হারাচ্ছে (যেমন উৎপাদন শিল্পের কায়িক শ্রমিকরা)।

দক্ষতা হলো এক সামাজিক-নির্মাণ (সোস্যাল কনস্ট্রাক্ট) এবং একই সাথে প্রকৃত জ্ঞান এবং/ অথবা কায়িক পারদর্শিতার সমন্বিত প্রতিফলন। অবশ্য, দক্ষতা এক আপেক্ষিক ধারণা। কতকগুলি পরম্পরাগত ব্যবস্থা ও যান্ত্রিক মাপকাঠিতে সরকারী ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্তের দ্বারা দক্ষতার স্তর নির্দেশ ও ক্রমিক তৈরি করা হয়। পূর্বের স্বীকৃত কোন উচ্চ দক্ষতাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নীচে নামিয়ে স্থান নির্দেশ হয়; আবার পূর্বের স্থিরীকৃত কোন নিম্ন দক্ষতাকে পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে উপরে তুলে আনা হয়। উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হলে তার সাথে প্রথমদিকে যুক্ত হওয়া শ্রমিকদের সাধারণভাবে উচ্চ ক্রমিকে অবস্থান নির্দেশ করা হয়। এইসব প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি সব সময়ে দক্ষতার সার্বিক তুল্যমূল্য বিচার ও স্থান নির্দেশ করতে পারে না। সুতরাং কোন ধরনের দক্ষতার নির্ধারিত তালিকায় উপরের

দিকে আনুষ্ঠানিক অবস্থান থেকে এটা সতত প্রমাণ হয় না যে সেই অংশের প্রকৃত দক্ষতা বাড়ছে, অথবা বিপরীতটি ঘটছে।

তাছাড়া, কাজ ও শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কর্মকে অদক্ষ করা যায়, কিন্তু কর্মীর অর্জিত দক্ষতাকে সহসা হরণ করা যায় না নানা কারণের জন্য। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অগ্রগতির কালে যখন দক্ষতার অপহরণ ঘটে (নতুন প্রযুক্তি ইত্যাদির জন্য) সেই সময়ে দক্ষ শ্রমিকদের জন্য প্রাপ্য পদের সংখ্যা বাড়তে পারে ঠিকই, কিন্তু শ্রমিক সংখ্যা কমে যাওয়া সত্ত্বেও মোট কর্ম-নিযুক্তির তুলনায় দক্ষ নতুন শ্রমিকের বৃদ্ধির সংখ্যা যথেষ্ট কম থাকে। অতীতে নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়া পত্তনের সাথে নতুন কর্ম-দক্ষতার চাহিদা বাড়লেও পুরানো দক্ষতা পাশাপাশি বহাল থাকতো। তাছাড়া নতুন ধরনের ও উন্নত যন্ত্র এবং নতুন ধরনের পণ্য উৎপাদন করাই বাড়তি দক্ষতার পরিচায়ক নয়। অতীতের পরিসংখ্যান ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মের দক্ষতার হরণ ঘটতো না নতুন শিল্প-কাঠামোতে, পুরানো দক্ষ বা অদক্ষরা সরাসরি কাজ হারাতো।

উৎপাদন এবং প্রথাগত অফিসের কাজে অটোমেশন প্রয়োগের ফলে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতায় নিয়োগের সুযোগ ক্রমশ কমছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে দক্ষতার উপর সব সময়ে তার প্রতিফলন পড়ছে। নতুন প্রযুক্তি নতুন দক্ষতার চাহিদা সৃষ্টি করে, পরিকল্পনা ও মৌলিক প্রয়োগের স্তরে। অন্যদিকে সর্বাঙ্গীণ উৎপাদন ও প্রথাগত অফিসের কাজে দেখা যায় নতুন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দক্ষতা অপহরণ যেমন হচ্ছে আবার পুরোনো কর্মীদের নতুন যন্ত্র চালানোর উপযোগী করে নেওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি এটা বোঝা যাচ্ছিল যে মুনাফা-সচেতন ম্যানেজাররা শ্রম-প্রক্রিয়ার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যয়কে অযৌক্তিক বলে মনে করছে। কেননা অটোমেশন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যেখানে উৎপাদনের উপর শ্রমিকদের কর্তৃত্বকে পুরোপুরি অবসান করতে পারেনি, সেখানে কঠোর শ্রম-নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যয় যথেষ্ট উচ্চ। সুতরাং ম্যানেজারিয়াল তত্ত্বে এমন মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে যে পরিদর্শক অংশের সংখ্যা কমানো সত্ত্বেও শ্রমিকদের কাছ থেকে যথোপযুক্ত উৎপাদন প্রতিষ্ঠান পায়, তবে সুপারভাইজর পদের সংখ্যা কমানোও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লাভজনক। তাই দেখা যায় যে বহু প্রতিষ্ঠান, বিশেষত জাপানী, শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে দিচ্ছে। তারা শ্রমিকদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে পরিদর্শন ও উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণের ভার। 'ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন' তত্ত্ব দাবী করেছিল যে কোম্পানির এখন প্রয়োজন বহুধা দক্ষতা-সম্পন্ন মানুষদের নিয়োগ করা (যাকে বলা হয়েছে 'পলিভ্যালান্সি'), কেননা নতুন প্রযুক্তিতে কাজ করতে হলে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল পণ্যের জন্য এটা প্রয়োজন হবে।

এবারে আধুনিক ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনার কতকগুলি দিক উল্লেখ করা দরকার।

ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক আকর্ষণ প্রধানত তিনটি বিষয়ে নিবদ্ধ ঃ (১) অভিজাত গোষ্ঠী হিসাবে ম্যানেজারদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে, (২) প্রতিষ্ঠানের নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বমুখীন স্তরে স্তরে ম্যানেজারদের অভ্যন্তরীণ অবস্থানে পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের চরিত্র, (৩) প্রযুক্তিগত ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ম্যানেজমেন্টকে এক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা।

(১) বৃত্তি গত স্তর হিসাবে ব্যবস্থাপক ও প্রশাসকদের সংখ্যা এক শতাব্দীর মধ্যে জনসংখ্যার এক নগণ্য ভগ্নাংশ থেকে উন্নত দুনিয়াতে প্রায় ১০ শতাংশে পৌঁছেছে; তৃতীয় দুনিয়াতেও এই হার দ্রুত বর্ধিষ্ণু। সমস্ত ধরনের কর্মজীবীদের কর্ম-সন্তুষ্টির (জব স্যাটিসফ্যাকশন) সুযোগ প্রাপ্তির বিচারে, ম্যানেজাররা সব চাইতে উপরে বা কাছাকাছি অবস্থান করছে। তবে ম্যানেজারদের আভিজাত্যমূলক অবস্থান ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ হলো আধুনিক শ্রমের বাজার ও শিল্পে কাজের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল পদ্ধতি ও পরিস্থিতি। শ্রমের বাজারে ম্যানেজাররা সব চাইতে মূল্যবান। বৃত্তিগত সমগ্র জীবনে তাদের আয়, নিয়োগের শর্তাবলী, চাকুরীতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ও অবসর গ্রহণের পর সুযোগ ইত্যাদি সবচাইতে বেশি। ম্যানেজারদের কাজের চরিত্র তুলনামূলকভাবে আকর্ষণীয় এবং অন্য সম-স্তরের বৃত্তির চাইতে এদের স্বাধিকার অনেকটা বেশি। বাজার ও কাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতরে সুযোগ

যত বেশি ম্যানেজাররা অর্জন করে নিতে পারে, ততই তাদের গতি বেড়ে যায় উপরে ওঠার। এই কারণে ম্যানেজারদের নিয়োগ উত্তরোত্তর অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও কঠোর নির্বাচন-ভিত্তিক হয়ে উঠেছে। এই পরিমণ্ডল সুযোগ তৈরি করে মালিকানার সাথে ম্যানেজারদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের। ব্যাপক জটিলতা ও দ্রুত প্রবাহিত নানা ঘটনার মধ্যে কাজ করতে হয় ম্যানেজারদের এবং কাজের জন্য রীতি-নীতি, পরিসর ও তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকদের তুলনায় অনেক দুরূহ, তাই মালিকপক্ষ নিজ স্বার্থে ম্যানেজারদের পরিপূর্ণ স্বাধিকার দেয় ও তাদের উপর নির্ভর করে। এটা ঠিক যে আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠানে 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস'-এর ব্যবস্থা অনুসৃত হওয়ায় ম্যানেজারদের প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক বলা যায় না। তথাপি নীতি প্রণয়নে বিপুল ভূমিকা থাকে ম্যানেজারদের এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের অধিকাংশ দিক নিয়ন্ত্রণ প্রধানত ও প্রত্যক্ষভাবে করে এরাই।

(২) ম্যানেজারদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি, ম্যানেজারদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর লম্বধর্মী ও সমান্তরাল বিস্তৃতিও বাপকতর হয়েছে এখন। তাছাড়া কাজ ও বিশেষজ্ঞত্ব-ভিত্তিক ম্যানেজারদের বিভাজন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যাবস্থাপক হলো সর্বোচ্চ ম্যানেজারদের অংশসহ বোর্ড অব ডিরেক্টরস। এরা কর্পোরেশনের রণনীতি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বণ্টনের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপক তারা, যারা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়ন, বাজারীকরণ, শ্রম-প্রসঙ্গ, হিসাব-নিকাশ এবং আর্থিক বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপক অংশ অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে গঠিত যাদের মধ্যে থাকে ফোরম্যান, সুপারভাইজর প্রমুখ। লম্ব ও সমান্তরাল-ধর্মী অবস্থান ও বিশেষজ্ঞত্ব-ভিত্তিক ম্যানেজারীয় ব্যবস্থার বিভাজন নির্মাণ করে এক জটিল সাংগঠনিক জাল। তাই এই দিকটি শিল্প-সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে 'অরগানাইজেশন থিওরি'। সম্প্রতিকালে লক্ষ্য করা যায় যে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বিতীয় ও নিম্নতম ম্যানেজারীয় স্তরকে সংখ্যায় ক্রমশ সংকুচিত করে চলেছে। একে বলা হচ্ছে 'ডি-লেয়ারিং' বা বি-স্তরীকরণ। নতুন উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে শ্রমিকদের কাজে পরিবর্তন ও সংকোচন যেমন ঘটছে, ম্যানেজারীয় ব্যবস্থাতেও সমান্তরাল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

(৩) ম্যানেজমেন্ট প্রণালীর দু'টি প্রধান উপাদান রয়েছে। পুঁজিবাদী নীতিতে এক অর্থে ম্যানেজমেন্ট স্বয়ং হলো এক ধরনের অর্থনৈতিক সম্পদ, যা অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও প্রসারের স্বার্থে বাস্তবিক কাজকর্ম করে। তাদের এই কাজের অন্তর্গত পরিকল্পনা তৈরি, শ্রমের জটিল বিভাজনকে সংগঠিত ও সংহত করা এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে তৎপরতার অভিমুখ নির্দেশ করা। দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থাপনা হলো নিয়ন্ত্রণের এক কাঠামো যা উপর থেকে নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অধঃস্তনদের গ্রহণ ও তদনুযায়ী কার্যকরী করানোর ব্যবস্থা করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বে। অধঃস্তনরা অর্থাৎ শ্রমিকরা ও ম্যানেজাররা নয় সম-স্বার্থভোগী। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ, শ্রমিকদের মতো, ম্যানেজারদের একাংশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা অধঃস্তন ম্যানেজাররা উর্ধ্বতন ম্যানেজারদের স্বার্থ ও লক্ষ্যের সমান অংশীদার নয়, যে কারণে এখন এটা স্বীকৃত হচ্ছে যে 'ব্যবস্থাপনা' সমপ্রকৃতিসম্পন্ন বা ঐক্যবদ্ধ কোন সত্তা নয়। 'অরগানাইজেশন থিওরি'তে ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরে সংঘাত তাই অন্যতম আলোচ্য প্রসঙ্গ।

নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনার রণনীতির দিকগুলি এখন চিহ্নিত করা হচ্ছে। কেননা, যদি ধরে নেওয়া যায় যে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা করার জন্য ম্যানেজারদের দরকার অনুগত শ্রমিক, তৎসত্ত্বেও শ্রম-প্রক্রিয়ার উপর ম্যানেজারদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার কেবলমাত্র একটি দিককে তুলে ধরে সেই উপাদানটি, কারণ কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। যেমন, (ক) শ্রমের বাজার নিয়ন্ত্রণ; (খ) শ্রম ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ; (গ) কর্মক্ষেত্র এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ও পদ্ধতির বাস্তবায়নের দ্বারা আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ; (ঘ) প্রতিষ্ঠানের সাথে একাত্ম ও উৎপাদনে অংশীদার হওয়ার বিষয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ। এর যে কোন একটির

জন্য চারটি ধরনের নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিই কম বেশি দরকার হয়। আবার সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সেগুলির পরস্পরের মধ্যে তুলনামূলক ভরের পরিবর্তন ঘটে থাকে। শ্রমের বাজার নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় শ্রমিকদের আনুগত্য আদায় করার জন্য নিয়োগ ও ছাঁটাই, মজুরির পরিমাণ হ্রাস, পদোন্নতি বন্ধ ও কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার হুমকি প্রভৃতি পদ্ধতিকে। প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় কিভাবে উৎপাদনকে সংগঠিত করা হবে এবং সেই কাঠামোর অভ্যন্তরে কিভাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যবহার করা হবে। ম্যানেজার-কর্মচারী নির্বিশেষে সবার জন্য বাধ্যতামূলক, আইনসম্মত ও নির্ধারিত ব্যবস্থাগুলি প্রতিষ্ঠা এবং ম্যানেজারদের দ্বারা শ্রমিক-কর্মচারীদের ইচ্ছামত ব্যবহারের ব্যবস্থাই হলো আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। এই ব্যবস্থাকে অ-পক্ষপাতহীন নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায়সম্মত হিসাবে প্রচার করা হয় সর্বাংশের আস্থা অর্জনের জন্য, সাংস্কৃতিক দিকে প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক স্তরে। ম্যানেজাররা শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে ইতিবাচক ও স্বতঃস্ফূর্ত এমন মনোভাব গড়ে তোলে যাতে শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানকে আপন ভেবে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মেনে চলে এবং উৎপাদনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে।

প্রফেশনাল ও ম্যানেজারদের শ্রেণী-অবস্থান নিয়ে বিতর্ক

তথাকথিত 'ম্যানেজারিয়াল রেভোলিউশন' এবং পরবর্তীকালে প্রফেশনাল ও ম্যানেজার অংশের ব্যাপ্তি ও ক্রমান্বয়ে প্রবল তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের পর থেকে 'প্রফেশনাল-ম্যানেজারিয়াল ক্লাস' শীর্ষক বামপন্থী বিতর্কের আবির্ভাব ঘটেছিল। পাশ্চাত্যের মার্কসবাদীদের একাংশ যুক্তি দেন যে উচ্চস্তরের এই অংশের 'হোয়াইট কলার এমপ্লয়ী' গ্রহণ করছে শ্রমিকশ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট একটি শ্রেণী-অবস্থান। বারবারা এরেনেরিখ ও জন এরেনেরিখের 'প্রফেশনাল-ম্যানেজারিয়াল ক্লাস' শীর্ষক রচনা নিয়ে সত্তর দশকের শেষার্ধে 'র‍্যাডিক্যাল আমেরিকা' পত্রিকাতে সূত্রপাত এই বিতর্কের। তৎকালের গ্রীসের কমিউনিস্ট নেতা পৌলান্তাজাস-এর শ্রেণীবিষয়ক রচনা ও আলোচনার সমালোচনায় এরিক ওলন রাইটের (ক্লাস, ক্রাইসিস অ্যাণ্ড স্টেট, ১৯৭৮) বক্তব্য এই বিতর্কে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছিল। এই বক্তব্য গড়িয়ে গড়িয়ে আশির দশকের শেষার্ধে আলেক্স ক্যালিনিকস-এর আলোচনাতে আরও সংঘবদ্ধ রূপ পায়। এই সমগ্র আলোচনা থেকে উদ্ভূত হয় 'কন্ট্রাডিক্টরি ক্লাস লোকেশনস থিওরি' বা পরস্পরবিরোধী শ্রেণী-অবস্থানগুলির তত্ত্ব।

শ্রীমতী ও শ্রীযুক্ত এরেনেরিখ প্রফেশনাল-ম্যানেজারিয়াল ক্লাস (পি. এম. সি.) তথা পেশাদার-ব্যবস্থাপক অংশকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন "যারা বেতনভোগী, মানসিক শ্রমদায়ী ও যাদের উৎপাদনের উপায়ে মালিকানা নেই এবং শ্রমের সামাজিক বিভাজনে সাধারণভাবে যাদের প্রধান ভূমিকা হলো পুঁজিবাদের সংস্কৃতি ও পুঁজিবাদী শ্রেণী-সম্পর্কের পুনরুৎপাদনে অংশীদার হওয়া।" উভয় তাত্ত্বিক বলেছিলেন যে হ্যারি ব্রেভারম্যান আলোচিত নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কায়িক শ্রমের দক্ষতাহরণ, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ও একচেটিয়া পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জনের ফলে এই নতুন ধরনের পেশাদার-ব্যবস্থাপকদের প্রফেশনাল-ম্যানেজারিয়াল ক্লাসের (পি. এম. সি.) আবির্ভাব ঘটেছে। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে তেমন এক শ্রেণী, "যারা পুঁজিবাদী শ্রেণী-সম্পর্কের পুনরুৎপাদনে বিশেষজ্ঞ...পুঁজিপতি শ্রেণীর যা প্রয়োজনীয়।" "...এই পি. এম. সি. ... মূলধনের দ্বারা নিয়োজিত, শ্রেণীটি স্বয়ং ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং শ্রমিকদের উপর কর্তৃত্ব করে (যদিও শ্রমিকদের নিয়োগ করে না)।" কিছুটা যথার্থ পথে এই তত্ত্ব অগ্রসর হলেও, কার্যকালে পি. এম. সি.দের কার্যাবলীর (ফাংশানস) ভিত্তিতে এই তত্ত্ব গঠিত হয়েছিল। এই বক্তব্য সম্পর্কে আল সাঝিমানস্কি (আ ক্রিটিক অ্যাণ্ড এক্সটেনশন অফ দা প্রফেশনাল ম্যানেজারিয়াল ক্লাস) তাঁর সমালোচনায় বলেন যে, অনুৎপাদক শ্রম (আনপ্রোডাকটিভ লেবার) ও শ্রেণী-সম্পর্কের পুনরুৎপাদনের মানদণ্ডে শ্রেণীর বিষয়ে কোন সংজ্ঞা স্থির করলে ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতির প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরও শ্রমিকশ্রেণী থেকে বাইরে রাখতে হবে, কেননা তাদের কাজের চরিত্র দৃশ্যত ঐ দুই উপাদান বহন করে। কিন্তু শেষোক্ত কর্মচারীরা কোন দিক থেকেই পি. এম. সি.'র মত নয়। তিনি বললেন, এই প্রসঙ্গকে আরও

প্রসারিত করলে শ্রমিকশ্রেণীর এক সুবৃহৎ অংশেরই শ্রমিকশ্রেণীর বাইরে থেকে যাওয়ার কথা।

তবে এরেনরিখ-দ্বয়ের মূল্যায়ন পি. এম. সি.-র শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণে নতুন ভাবনা যুক্ত করেছিল সন্দেহ নেই। তাঁরা দেখান যে পুঁজির দ্বারা এই অংশ প্রধানত নিয়োজিত হয় 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' (সোস্যাল কন্ট্রোল)-এর জন্য। তাঁরা বললেন যে পি. এম. সি. কেবল ব্যবস্থাপক হিসাবে কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণ করে না, প্রকাশ্য সমাজজীবনে শ্রমিকের ভোক্তার ভূমিকাকেও নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন সামাজিক পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে। তাই তাঁরা বললেন, "পেশাদার-ক্রেতা যোগাযোগ (প্রফেশনাল-ক্লায়েন্ট কন্ট্যাক্টস) ... শ্রমিকশ্রেণী ও পি. এম. সি. সম্পর্ক গঠনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" তবে এই বিশ্লেষণ সত্ত্বেও, শ্রমজীবী কোন অংশের শ্রেণীর চরিত্র নির্ণয়ে যুক্তিগুলি পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞান-গ্রাহ্য নয়। কেননা পরিষেবার শ্রমজীবীদের সাথে ক্রেতার যে মুখোমুখি যোগাযোগ থাকে, বস্তুগত পণ্য-উৎপাদনকারী কারখানার শ্রমিকদের সে যোগাযোগ ভোক্তার সাথে সরাসরি থাকে না, অতএব এরেনরিখের বক্তব্য মানলে পরিষেবার শ্রমজীবীরা পি. এম. সি.'র চরিত্র অর্জন করে। স্বভাবতই পূর্বোক্ত বক্তব্যের সমালোচকরা বললেন যে উপার্জন এবং ভোক্তার সাথে সম্পর্কসমূহ বা ভূমিকার (ফাংশানস) বিষয়ক মাত্রা কোন অংশের শ্রেণী অবস্থান নির্ণয়ের পরিপূর্ণ মাপকাঠি নয়।

রাইট তাঁর পি. এম. সি.-প্রাসঙ্গিক আলোচনাতে 'কন্ট্রাডিক্টরি ক্লাস লোকেশনস'-এর তত্ত্ব হাজির করেন। 'কন্ট্রাডিক্টরি ক্লাস লোকেশনস'-এর বাস্তবতা নির্ণয়ে তিনি দু'টি বিশেষ উপাদানকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন—"(১) ম্যানেজার ও সুপারভাইজররা বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মাঝামাঝি এক পরস্পর বিরোধী অবস্থান নেয়। "(২) কতকগুলি স্তরের আধা-স্বশাসিত কর্মচারী (সেমি-অটোনমাস এমপ্লয়ী), যাদের নিজ নিজ নিকটবর্তী শ্রম-প্রক্রিয়াতে তুলনামূলকভাবে উচ্চস্তরের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তারা শ্রমিকশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়াদের মাঝে কন্ট্রাডিক্টরি ক্লাস লোকেশনস বহন করে।" এই আলোচনাতেও প্রবল দুর্বলতা ছিল। কেননা রাইট প্রসঙ্গটি প্রধানত বিচার করেছিলেন ব্যক্তিগত মূলধন ও শ্রমিকের মধ্যে অবস্থানের পটভূমিকায়। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের পটভূমিকায় এই দুই মাত্রা প্রয়োগ করলে পরিস্থিতি অনুরূপ থাকে না—অর্থাৎ সরকার ও কর্মচারীদের মাঝামাঝি আমলাদের অবস্থানের বিচার করলে। তাছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়াও পরিবর্তনশীল। কেননা কার্টার গুডরিক যাকে বলেছিলেন 'দা ফ্রন্টিয়ার অব কন্ট্রোল' বা নিয়ন্ত্রণের সীমান্ত বা সম্মুখভাগ, তাতে কেবল ম্যানেজার ও প্রফেশনালরা নয়, এটাও লক্ষ্য করা যায় যে শ্রমিকরা কখনো কখনো তাদের ঠিক নিকটবর্তী শ্রম-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাছাড়া, রাইটের বক্তব্যের বিরোধিতায় কোন কোন তাত্ত্বিক ইতিহাস থেকে উদাহরণ তুলে দেখিয়েছিলেন যে কন্ট্রাডিক্টরি ক্লাস লোকেশনস-এ অবস্থান গ্রহণকারী বলে আধুনিককালে যাদের বলা হচ্ছে, তেমন ধরনের অংশ, যেমন দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার, অভিজাত শ্রমিক প্রভৃতি ঊনবিংশ শতক থেকে এই শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং বিপ্লবী শ্রেণী (শ্রমিকশ্রেণী) থেকে তাদের বাইরে ধরা হবে কেন? রাইটের বক্তব্যের সংশোধন ও তার সমালোচকদের জবাবে জি. কার্চেদি বলেছিলেন যে এই কন্ট্রাডিক্টরি ক্লাস লোকেশনসের বিচার করতে হলে প্রফেশনালদের ভূমিকায় "নিয়ন্ত্রণের কাজ ও কড়া নজর রাখার" (ওয়ার্ক অব কন্ট্রোল অ্যাণ্ড সার্ভিল্যান্স) উপাদানটি যুক্ত করতে হবে, কেননা মধ্য-স্তরের ম্যানেজাররা এই কাজটি করে থাকে। কোন কোন আলোচক কন্ট্রাডিক্টরি ক্লাস লোকেশনসের উপাদান হিসাবে যুক্ত করেন এই অংশের উপর মূলধন ও মালিকানার বিশেষ বিশ্বাস (ট্রাস্ট) স্থাপনের দিকটিকে। পরবর্তীকালে রাইট তাঁর পূর্বের বক্তব্যের সমর্থনের তথ্য দিয়ে বলেছিলেন যে কোম্পানিগুলি ম্যানেজারদের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের (মুনাফার) ২০ শতাংশ বন্টন করে থাকে। অর্থাৎ মালিকশ্রেণী একা উদ্বৃত্ত-মূল্যের সবটা আত্মসাৎ করছে না, তাতে অংশীদার করছে পি. এম. সি.দের। স্বভাবতই মুনাফা-প্রবণতাও পি. এম. সি.দের উপাদান, অথচ তারাও শ্রম বিক্রি করে। এইভাবে তারা মালিক ও শ্রমিকের মাঝখানে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয়। এস. আরোনোউইজ (দা প্রফেশনাল-ম্যানেজারিয়াল ক্লাস অব মিডল স্ট্রাটা) বললেন—এরা হলো একটি স্তর (স্ট্রাটা)।

আলেক্স ক্যালিনিকস এই বক্তব্যের সম্প্রসার করে তাঁর আলোচনায় দেখান যে ম্যানেজার, সুপারভাইজর ও সেমি-অটোনমাস এমপ্লয়ীরা শ্রমিকশ্রেণী থেকে এক স্বতন্ত্র স্তর (স্ট্রাটা) গঠন করে এবং তিনি (যদিও তাঁর নিজের মনঃপুত নয়) এদের বললেন 'নিউ মিডল ক্লাস' (এন. এম. সি.) বা নতুন মধ্য-শ্রেণী। 'মুফিল্ড গ্রুপ' বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের আলোচনায় এদের বলেছিলেন 'সার্ভিস ক্লাস'। জে. ওয়েস্টারগ্যারড ও হেনরিয়েটা বেসলার এদের বলেছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক মধ্য-দেওয়াল গোষ্ঠী (সোস্যাল অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল বাফার গ্রুপ)।

এইভাবে আলোচনা এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কার্যকালে প্রফেশনাল ও সাধারণ মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মধ্যে অবস্থানগত পার্থক্যের ভেদাভেদকে অনেকটাই মুছে ফেলেছিলেন পূর্বোক্ত তাত্ত্বিকদের অধিকাংশ। একাংশের তত্ত্ব ও যুক্তি ম্যানেজার ও প্রফেশনাল সম্পর্কিত চরিত্রায়ণ যেমন নিম্ন-মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের সমান দেখিয়ে উভয় অংশই সমানভাবে শ্রমিকশ্রেণী থেকে স্বতন্ত্র, এমনকি বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছিল, অপরাংশের বক্তব্যে বিপরীত দিক থেকে প্রফেশনাল ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের একাকার করে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। পূর্বের বা পরবর্তীকালের শ্রেণীবিষয়ক বিতর্কের মত, এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে মার্কসবাদ ও শ্রেণীবিষয়ক মার্কসবাদী সংজ্ঞাও কার্যত সংশোধন করার প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে সত্তরের দশক থেকে শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কিত আলোচনার মত ম্যানেজার ও প্রফেশনালদের বিষয়ে আলোচনার অভ্যন্তরে নতুন ধরনের শ্রমিকশ্রেণী ও পরিষেবার কর্মচারীদের শ্রেণী-চরিত্র নিয়ে বিচারের চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হয়নি। ভুল বা শুদ্ধ যাই হোক না কেন, লেনিনোত্তরকালে শ্রেণীবিষয়ক বিচারের প্রয়োজনীয়তাকে এইসব বক্তব্য জাগিয়ে রেখেছিল।

উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক যন্ত্র ও তথ্য মাধ্যমের প্রয়োগ

উৎপাদনে কমপিউটারের প্রয়োগ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যম বর্তমানকালের কর্মস্থানের বিশেষত ব্যবধানের বিবর্তন ও বিশাল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অফিসে কর্মরত প্রায় সর্বাংশের কর্মীর ডেস্ক-এর সামনে এখন কমপিউটার এসে গেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে মত, তথ্য, বক্তব্য, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে 'লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কস' (এল. এ. এন. এস. বা ল্যানস), ইলেকট্রনিক মেইল এবং অন্যান্য জটিল যোগাযোগ প্রণালীর দ্বারা। যেসব কর্মীদের কাজের অন্যতম উপাদান হলো ভ্রমণ তাদের সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে ডিজিটাল ডাইরি, ল্যাপটপ, হ্যাণ্ডহোল্ড কমপিউটার, পেজার, সেলুলার ফোন প্রভৃতি ইলেকট্রনিক হাতিয়ারের সাহায্যে। 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস' বা শিল্পগত প্রক্রিয়া (উৎপাদন প্রক্রিয়ার এক অংশ) গঠিত হচ্ছে প্রোগ্রামেবল মেশিনারি, কমপিউটার এইডেড ডিজাইন (সি. এ. ডি. বা ক্যাড), কমপিউটার-বেসড ইনভেন্টরি সিস্টেমস্ এবং অন্যান্য নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্যে। এই পরিণামে, অতীতে আধুনিক ব্যবস্থার শিল্প-সমাজে কর্ম ও বাসস্থানের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তা' অন্তর্হিত হচ্ছে। 'হোম-ওয়ার্ক' বা বাড়িতে বসে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ এখন ব্যাপক।

বর্তমানের উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শিল্প-প্রক্রিয়াকে গঠন করা হচ্ছে ভোক্তাদের কাছে পণ্যসামগ্রী কার্যকরীভাবে পৌঁছে দেওয়া ও উৎপাদকদের খণ্ড খণ্ড ও ছড়ানো তৎপরতার মধ্যে যথার্থ সমন্বয় সাধন করার জন্য। ভোক্তাদের রুচি, চাহিদা ও ভোগের সমস্ত দিক নিয়ে নিবিড় চর্চা করা হলো বর্তমান কালের 'ইকনমিক অরগানাইজেশন' তথা আর্থনীতিক সংগঠনের অনতিক্রম্য কাজ। তবে অর্থনীতি, উৎপাদন ও পরিষেবার কাজের আয়তন ও জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই কাজ স্বভাবতই কঠিন হয়ে পড়েছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সমাজে এই কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক একক তথা কর্পোরেশনের দ্বারা। এই কর্পোরেট ব্যবস্থার বর্তমানে বিশেষ ভূমিকা হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপসারণ বা নিয়ন্ত্রণ, কাঁচামালের সমস্ত সূত্রকে কব্জা করা, বাজারে অংশীদারিত্ব বাড়ানো, একধরনের পণ্য উৎপাদনের কারখানার উপর নির্ভরশীলতা কমানো, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের গতি আয়ত্তে রাখা এবং নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রী বা পরিষেবার বাণিজ্যিক প্রসারকে নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এই ধরনের

প্রতিষ্ঠানগুলি বাজারের 'অদৃশ্য হাত'কে (ইনভিজিবল হ্যাণ্ড) পরিণত করছে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ভূমিকাতে, উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অতিকায় কেন্দ্রগুলির সাহায্যে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে জনগণের জীবন ও কর্মের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যক্তিস্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, সৃজনশীলতা ও পছন্দের স্বাধীনতাকে অপসারণ করে এইসব কর্পোরেশন নামক অর্থনৈতিক দৈত্যগুলি গ্লোবালাইজেশন প্রক্রিয়ায় প্রধান অনুঘটকের ভূমিকা নিচ্ছে। এই সমস্ত কাজে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে।

অতীতে দৈত্যাকৃতি কর্পোরেশনগুলি লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে উপর থেকে প্রদত্ত নির্দেশগুলি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশে একদেশদর্শী এবং নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করে সমগ্র অর্থনৈতিক তৎপরতায় কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতো। কিন্তু নতুন বিশ্ব-বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে এই ব্যবস্থা সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বোচ্চ স্তরের ম্যানেজার তথা ব্যবস্থাপকরা এটা অনুভব করছিল যে প্রথাগত আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থা চালিয়ে নতুন ও জটিল ব্যবস্থাপনার কাঠামোর অভ্যন্তরে সমন্বয় সাধন প্রায় অসম্ভব। সুতরাং তারা বাধ্য হচ্ছিল কর্পোরেট কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে অবস্থানকারী ম্যানেজারদের ক্রমশ স্বাধিকার প্রদান করতে। এই ব্যবস্থাকে একজন বাণিজ্য বিষয়ক ঐতিহাসিক বলেছেন 'ডি-সেন্ট্রালাইজড সেন্ট্রালাইজেশন' বা বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রিকতা। এই বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রিকতা কখনোই বাস্তবায়িত হতে পারতো না ইলেকট্রনিক মাধ্যমের প্রাপ্ত নতুন সুযোগ ছাড়া।

নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিকল্প পথে অর্থনৈতিক তৎপরতা চালানোর জন্য প্রযুক্তিগত ভিত্তি রচনা করা, যাতে কিন্তু পূর্বে বর্ণিত বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক তৎপরতার সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করা চলে। এই প্রযুক্তি যেহেতু বহু দূরের সাথে দ্রুততম যোগাযোগ সাধন করতে পারে, তার ফলে এখন বহু দূরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে গভীর ও তৎক্ষণাৎ সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। তদুপরি, এই ব্যবস্থার দ্বারা বাজার সম্পর্কে নিপুণ ও সর্বাধুনিক তথ্য, প্রযুক্তিগত জালের অন্তর্গত ভূমিকা গ্রহণকাবী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ও চরিত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কর্পোরেশন বা প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করতে পারছে। তাই পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা ও কর্মসূচীভিত্তিক কাজ করার পদ্ধতি বজায় রাখার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে না। অনুমানের পরিবর্তে, এখন প্রকৃতই কি ঘটতে চলেছে তা' যথার্থভাবে নিরূপণ করে, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ও প্রযুক্তিগত যোগাযোগের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানগুলি স্থির করা শুরু করেছে স্বয়ংক্রিয় ও সৃজনশীলভাবে কর্মপদ্ধতি।

একই ধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় 'ফ্রাঞ্চাইজিং' প্রথা বা প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে স্বাধিকার ও কর্তৃত্ব অর্পণ করার নতুন ব্যবস্থায়। প্রচলিত কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা বনাম প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের প্রাপ্ত স্বাধিকার ও ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা রয়েছে এই 'ফ্রাঞ্চাইজিং' প্রচেষ্টার মধ্যে। কেন্দ্রীয় ফ্রাঞ্চাইজিং এজেন্সির ভূমিকা হলো সঞ্চালকের, যা ইউনিট ফ্রাঞ্চাইজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও বক্তব্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ ও বিকিরণ করে দ্রুততমভাবে পুনঃপ্রেরণ ও ব্যবহার করছে। এই ব্যবস্থায় ইউনিট ফ্রাঞ্চাইজগুলি (সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলি) বহুলাংশে স্বাধীন থাকছে। কেননা সেগুলি ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাহায্যে কেন্দ্রীয় ফ্রাঞ্চাইজ (কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান/কর্তৃত্ব) ও অন্যান্য ইউনিট ফ্রাঞ্চাইজগুলির সাথে সরাসরি চালিয়ে যেতে পারছে কথোপকথন। একদিকে এরা পরস্পর উভয় দিক থেকে তথ্য পাচ্ছে, অন্যদিকে উভয় দিকে তথ্য প্রেরণ করে চলেছে। ফলে, অতীতের আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে এক ধরনের সমন্বয়কারী, অ-দমনমূলক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতে শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানে।

নতুন নিপুণ তথ্য-সঞ্চালনের প্রযুক্তির বেশ কিছু ব্যবস্থা সমগ্র প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেও নিয়োজিত ব্যক্তিদের অধিকতর কার্যকরী করে তুলেছে। উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ইলেকট্রনিক তথ্য-সঞ্চালন ব্যবস্থা। ফলে প্রতিষ্ঠানে নতুন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে যতটা না 'অটোমেট' বা স্ব-সাধক করার জন্য, তার চাইতে বেশি 'ইনফরমেট' তথা তথ্য-সমৃদ্ধ করতে। এইসব ব্যবস্থার প্রাপ্ত সাফল্যের ভিত্তিতে দাবী করা হচ্ছে যে, আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে

মানুষ ইচ্ছাশক্তি যা অপসারণ করছে বাজারের 'অদৃশ্য হাত'কে। আসলে কর্পোরেশনগুলি তথ্য-প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছে কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণে।

উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত মেশিনিস্টদের কাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে কমপিউটার-ভিত্তিক পরিশীলিত প্রযুক্তি। কমপিউটারাইজড নিউম্যারিকাল কন্ট্রোল (সি. এন. সি.) যন্ত্রপাতি কমপিউটারের সাথে মেশিন টুলসকে কার্যকরীভাবে সংযুক্ত করছে এবং পরিশীলিত ফিডব্যাক লুপস তৈরি করছে এমনভাবে যাতে উৎপাদন চলাকালে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হলে কমপিউটার তদনুযায়ী ঠিকঠাক করে নিতে পারে উৎপাদনকে। এই জাতীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মেশিনিস্টের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে প্রযুক্তি নিজেই প্রোগ্রাম করে ফেলতে পারছে। এতে কেবল দক্ষতাহানি নয়, মেশিনিস্ট পদটিই ভবিষ্যতে অবলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য পাশাপাশি একথাও সত্য যে পূর্বোক্ত সমগ্র ব্যবস্থাটির ফলাফল একমাত্র নেতিবাচক নয়। কেননা কমপিউটারের সব সময় প্রোগ্রাম প্রয়োজন হয় এবং মেশিনিস্ট কার্যকালে রূপান্তরিত হচ্ছে প্রোগ্রামারে। এর ফলে এমনও ভবিষ্যতে ঘটতে পারে যে অতীতে মেশিনিস্টরা উৎপাদনের যে স্তরে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারতো না, নতুন ব্যবস্থায় সেই স্তরে হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

ভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাতে, নতুন তথ্য-ব্যবস্থা একই চিত্র তুলে ধরে। ভোক্তা, আর্থিক বাজার ও অন্যান্য প্রসঙ্গে তথ্য সঞ্চয়, প্রক্রিয়াকরণ ও বিকিরণের কাজে পরিশীলিত তথ্য-প্রযুক্তি ভূমিকা নিতে চলেছে মুহূর্তের মধ্যে। কেননা, যেহেতু তথ্য ও পরিসংখ্যান 'অন-লাইনে' রয়েছে, সেহেতু কমপিউটার টার্মিনালের জালের সাহায্যে যে কোন ব্যাঙ্ক কর্মীর পক্ষে তা' তৎক্ষণাৎ পাওয়া ও মূল্যায়ন করা সম্ভব। তার ফলে যে অংশের পরিদর্শকরা অতীতে নীচুতলার কাজের পরিদর্শন করতো, তাদের ভূমিকা পরিণত হচ্ছে শূন্যে। পরিদর্শকদের অতীতের কর্মধারা এখন উন্নতভাবে ফরমাটেড হয়ে কমপিউটার টার্মিনালের সাথে যুক্ত নীচুতলার কর্মচারীদের কাজের অন্তর্গত হয়ে পড়ছে। তাই ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের কাজ ও টেলারের মধ্যে অতীতের ব্যবধান মুছে যাচ্ছে এখন। টেলার এখন অপসারিত হচ্ছে এ. টি. এম. ব্যবস্থার মতো অন-লাইন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দ্বারা। পাশাপাশি অবশিষ্ট টেলার ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেম। সমকালে ক্ল্যারিকাল ও সেক্রেটারিয়াল কাজে অটোমেশন ব্যবস্থার অভিজ্ঞতাও একই রকম এবং মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপক ও পেশাদাররা একই রকমভাবে অপসারিত হচ্ছে।

শিল্প-ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সংস্কৃতির আত্মীকরণ

আধুনিক উৎপাদন, বিশেষত, বহুজাতিক সংস্থাগুলির উৎপাদন কারখানার ভৌগোলিক বা এলাকাগত সাধারণ মানুষের, বিশেষত শ্রমজীবীদের 'কালচার' বা সংস্কৃতিকে গুরুত্ব প্রদান ও আত্মীকরণ ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতিতে। ধনতন্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রম-সংস্কৃতি (ওয়ার্ক-কালচার) এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি (প্রলেতারিয়ান কালচার) গড়ে উঠেছে। বর্তমান প্রয়াস সেই উপাদানগুলিতে নিছক গতি দেওয়ার জন্য নয়। অতীতে অনুন্নত দেশগুলিতে আধুনিক শিল্প উৎপাদন ও উন্নয়নের স্বার্থে ধনতান্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ন্যূনতম উপাদান থাকাকে আবশ্যিক শর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হতো, আলোচ্য তৎপরতা সেটি অর্জন বা উন্নয়নের জন্যও নয়। বরং বর্তমান তৎপরতা ভিন্নতর ও নতুন এবং সেটির তাৎপর্য আরও গভীর। উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট দেশ, অঞ্চল ও শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্যকে বর্তমানে প্রথমত ব্যবহার করতে চায় বাজারের প্রসারের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদের, বিশেষত বিদেশী, বিরুদ্ধে সহজাত শত্রুতাকে নিষ্প্রভ করার অন্যতম উদ্দেশ্যে শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক স্পর্শকাতরতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে এইভাবে। তৃতীয়ত, পুঁজিবাদী উৎপাদনে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সহজাত শ্রম-বিচ্ছিন্নতাকে (অ্যালিয়েনেশন অব লেবার) সাধ্যমত বন্ধ করাও উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সংস্কৃতি আত্মীকরণের অন্যতম লক্ষ্য। উন্নত পুঁজিবাদ অভিজ্ঞতা থেকে এও উপলব্ধি করেছে যে স্থানীয় সংস্কৃতির আত্মীকরণ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা উৎপাদনের মান উন্নয়ন ও পরিমাণ বৃদ্ধির

সহায়ক। বিদেশ থেকে আমদানি করা নতুন উৎপাদন-আঙ্গিকের ব্যবহারের ফলে যে অবিশ্বাস ও অনাস্থা স্থানীয় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রথমদিকে থাকে, স্থানীয় সংস্কৃতির সংযুক্তির দ্বারা সেটিকে পরিহার করে, মানসিক দিক থেকে তাদের অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা অনেকটাই দূর করা যায়; এই প্রণালীর মধ্য দিয়ে ক্রমশ গড়ে ওঠা নতুন-শ্রম-প্রক্রিয়ার বিকাশও সহজতর হয়; পুঁজিবাদ, বিশেষত বিশ্ব-কর্পোরেশনগুলির দেশের শ্রমের বাজারে ভূমিকা গ্রহণ স্বাভাবিক পথ পায়। শেষ পরিণামে স্থানীয় সংস্কৃতির আত্মীকরণ সৃষ্টি করে আকাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ও মুনাফার অন্যতম শর্ত।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সংস্কৃতির সংযুক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনার ইতিহাসের শুরু পাঁচ দশক পূর্বে। কেননা তার আগে অন্য দেশে পুঁজি রপ্তানি ও বিদেশের মাটিতে উৎপাদন এত ব্যাপক ছিল না। তাই শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায় বিবিধ সংস্কৃতির আত্মীকরণের প্রসঙ্গ সামনে ছিল না। তাছাড়া, পুঁজিবাদের ধ্রুপদী উদ্ভব, বিকাশ ও উন্নতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে হওয়ায়, পাশ্চাত্য-সংস্কৃতি সহজাতভাবেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে গিয়েছিল। পুঁজির সাথে এই সংস্কৃতিই রপ্তানি করা হতো। অন্য দেশে উন্নত পুঁজিবাদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশ এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদের বিকাশ ও উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য অনুন্নত দেশগুলির প্রয়াসের পটভূমিকা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল পঞ্চাশের দশক থেকে। জাতীয় সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় তখন থেকে। এ বিষয়ে ম্যাক্স ওয়েবারের মননসম্পন্ন আলোচনাগুলি তখন এই প্রসঙ্গের উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর মত ছিল যে পাশ্চাত্যে ধনতন্ত্রের বিকাশ পাশ্চাত্য মূল্যবোধ-ভিত্তিক। আর এই সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় শলাকা হলো 'প্রটেস্ট্যান্ট এথিক বা খ্রীষ্টধর্মের প্রটেস্ট্যান্ট শাখার নীতিবোধ সৃষ্ট। ওয়েবারের মত ছিল যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ কেবল পশ্চিমী সংস্কৃতির দ্বারাই সম্ভব। অন্য দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে হলে, সেখানকার সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরও পশ্চিমী ধারায় হওয়া আবশ্যিক। এই মতবাদ ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যায়। ডব্লু. ডব্লু. রোস্টও (১৯৫৬) এই ধারাকে অনুসরণ করে বললেন যে অনুন্নত দেশের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদে পৌঁছুতে হলে তাদের একই সাথে অর্জন করে যেতে হবে পশ্চিমী চরিত্র। এই চরিত্র অর্জনে অন্যতম প্রয়োজন হলো কর্ম-সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেরণা সৃষ্টি, ধর্ম সম্পর্কে মানসিক যুক্তিবাদিতা এবং ছোট পরিবারের গঠন ইত্যাদি।

উন্নত দুনিয়া থেকে এই তত্ত্বভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপাদান উত্তরপঞ্চাশের কালে অনুন্নত দেশগুলির উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় রপ্তানিও করা হতে থাকে। এই প্রেসক্রিপশন উন্নয়নশীল দেশগুলি অন্ধভাবে অনুকরণ করাও শুরু করেছিল। টাইলারবাদ বা ফোর্ডবাদ এই সময়ে তৃতীয় দুনিয়ায় প্রবেশ করতে থাকে ব্যাপকভাবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পাল্টা ধাক্কা আসে জাপানের শিল্পায়ন ও অগ্রগতি থেকে। জাপানের পুঁজিবাদকে প্রথমদিকে বিক্ষিপ্ত, অ-পশ্চিমীয় ইত্যাদিতে ভূষিত করা হলেও, অনতিকালের মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা সেখানে এক সাফল্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র ও স্বকীয় ধারাতে গড়ে উঠছে। ব্যবস্থাপনার প্রণালীতে সংস্কৃতির প্রসঙ্গ প্রথম থেকেই জাপানে গুরুত্ব পেয়েছিল। জাপানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও ব্যবস্থাসমূহ যা কঠোরভাবে পিতৃতান্ত্রিক, পরিবারকেন্দ্রিক, পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের কঠোর আনুগত্য ও নীতি মেনে চলার মনোভাবসম্পন্ন, ধৈর্যবাদী ইত্যাদি সেই উপাদানগুলিকে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়ে। এই অভিজ্ঞতা ও সাফল্য থেকে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব পেতে থাকে। হফস্টেডি (১৯৮০) উৎপাদনে সংস্কৃতির ভূমিকাকে বললেন, "জনগণের মানসিক কর্মসূচী"। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্টে পেট্রি (১৯৯৩) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করলেন দেশগুলিতে কনফুসিয় পরম্পরার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সংস্কৃতির অবদানের। ১৯৭৯ সালের ইরানের বিপ্লবও ভিন্ন দিক থেকে স্থানীয় সংস্কৃতির গুরুত্বকে তুলে ধরেছিল। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদকে বিদেশী ও শয়তান দ্বারা প্ররোচিত এবং কর্তৃত্বকামী আখ্যা দিয়ে জনগণকে সমবেত করেছিল এই বিপ্লব। স্মিথ একে বলেছেন 'ভার্নাকুলার মবিলাইজেশন' বা

'স্বদেশী সংঘবদ্ধতা'। এই ধরনের ঘটনা থেকে বিশ্ব-পুঁজিবাদ, প্রধানত বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিদেশে পুঁজি-বিনিয়োগ, শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণের মধ্যে নিহিত বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যায়। বিশেষত আশির দশক থেকে ধর্ম, আঞ্চলিকতা, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক উপাদান নিয়ে দেশে দেশে তীব্র উন্মাদনার প্রসার বিশ্ব-পুঁজিবাদের সামনে স্থানীয় সংস্কৃতির গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরে।

উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার কাজে আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে ব্যবহারের বিশিষ্ট কয়েকটি উদাহরণ প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। জাপানীরা উৎপাদন প্রণালীতে 'ডোচাকুকা' ব্যবস্থার উপর জোর দেয়। 'ডোচাকুকা' ধারণার অর্থ হলো স্থানীয় পরিবেশ ও সংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিল্প-ব্যবস্থাপকদের সেগুলিকে ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত করা। কেবল তাই নয়, কেন্দ্রীয় নীতি হিসাবে উৎপাদন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় 'ডোচাকুকা' যুক্ত করে সেই ব্যবস্থাকে স্থানীয় উৎপাদনের স্তরে প্রসারিত করা এবং উপাদান সামগ্রীকে যথাসম্ভব স্থানীয় সংস্কৃতি-ভিত্তিক রূপ দেওয়া হচ্ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার 'জোখা' ও জুলু ভাষায় 'উবুন্টু' বা মানবতাকে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। ভারতে চেষ্টা হচ্ছে "কর্ম"কে "শ্রেষ্ঠ ধর্ম" হিসাবে ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কনফুসিয়, তাওবাদী ও জেনপন্থী ধর্মের সামাজিক নীতিগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার কাজে। ধর্মীয়, সামাজিক ও আঞ্চলিক গ্রন্থগুলি থেকে নানা নির্দেশাবলীর মধ্যে অংশবিশেষ ছাপিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর প্রচার করা হচ্ছে উৎপাদনের কাজে তাদের আন্তরিক ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। ম্যানেজারদেরও সুশিক্ষিত করা হচ্ছে সেসব বিষয়ে।

এইভাবে 'ক্যাপিটালিজম' স্বীয় স্বার্থে 'লিবারাল' হতে শুরু করে। বিদেশে ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনার রণনীতি নির্ধারণ ও সাফল্যের প্রশ্নে উদ্বেগ ও সংশয় নিরসন এবং উৎপাদনের আঙ্গিকের পরিবর্তন এবং তৃণমূলের বাস্তবতাকে যথার্থভাবে উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা থেকেই তাদের কাছে জরুরি হয়ে পড়ে স্থানীয় সংস্কৃতির আত্মীকরণ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অতীতের শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবস্থাপনা গভীরভাবে পশ্চিমী ফোর্ডবাদী ধারার ওপর প্রধানত দাঁড়িয়েছিল। দ্রুত শিল্পায়নের যুগে শিল্প-ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলার প্রসঙ্গটি প্রধানত বিবেচিত হয়েছিল নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতি, কর্মকাণ্ডের গবেষণা, পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ও সাংগঠনিক আচরণ প্রভৃতি উপাদানের উপর ভিত্তি করে। ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্যগুলি, যেমন উৎপাদনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নীতিগুলি, উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ ও বাজার সম্পর্কে অনুমানের প্রচেষ্টা ইত্যাদি দিকগুলি সংস্কৃতিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। প্রণালীকরণ, বিশেষজ্ঞত্বকরণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিমাণগত বিশ্লেষণ এবং জটিল সংগঠনের ভবিষ্যৎ সুনির্দিষ্ট করার উপরই প্রধানত গুরুত্ব দিয়েছিল টাইলারবাদ ও ফোর্ডবাদ (জেলেসিক, ১৯৮০)। এগুলি অর্জনের জন্য ম্যানেজারদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল সময়, ব্যবধান, সম্পদ ও শ্রমের ব্যবহারের সর্বোচ্চকরণ ঘটিয়ে উৎপাদন ও পুঁজি-সঞ্চয় বৃদ্ধি করা। এই কঠোর কাঠামোগত যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বভাবতই সাধারণভাবে সংস্কৃতির ভূমিকাকে, বিশেষত অ-পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে কোন গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি।

কিন্তু ধনতন্ত্রের পুনর্গঠনের বর্তমান বিশ্ব-প্রেক্ষাপটের অন্তর্গত হয়েছে উৎপাদন-কর্মপদ্ধতির পুনর্গঠন, শিল্প-পুঁজি থেকে ফিনান্সের স্বতন্ত্রীকরণ, শ্রমের নতুন আন্তর্জাতিক বিভাজন এবং সুবিশাল আন্তর্জাতিক বাজারের সংহতিসাধন। এই ধারাগুলিতে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করছে (ড্রাকার, ১৯৯৩)। এই ব্যাপক উদ্যোগের অভ্যন্তরে স্থানীয় সংস্কৃতিকে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় নতুন ও কার্যকরী উপাদান হিসারে আত্মীকরণ শুরু হয়েছে, যাকে বলা যায় "বস্তুগত অবস্থার সংস্কৃতায়ন এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার বস্তুকরণ" (রবার্টসন, ১৯৯২)। "বর্তমানের পুঁজিবাদ বহুধা সংস্কৃতিকে আত্মীকরণ করে"— এই প্রত্যয় থেকে পুঁজিবাদের রূপের বিভিন্নতাও এখন স্পষ্টতর হচ্ছে।

'বিজনেস উইক' পত্রিকা (১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯৪) বর্তমান পুঁজিবাদের আঙ্গিক-ভিত্তিক চরিত্রকল্প করেছে এইভাবে ঃ আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় 'কনজিউমার-ক্যাপিটালিজম'; জার্মানি,

ফ্রান্স, জাপান ও মেক্সিকোতে 'প্রোডিউসার-ক্যাপিটালিজম'; তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়াতে 'ফ্যামিলি-ক্যাপিটালিজম' এবং চীন ও রাশিয়াতে 'ফ্রন্টিয়ার -ক্যাপিটালিজম'। পুঁজিবাদের মৌলিক নীতির কোন পরিবর্তনের চিহ্ন বহন না করলেও, ক্যাপিটালিজমের আঙ্গিকের এই তথাকথিত ভাগাভাগি, উৎপাদনের প্রণালীর বিভিন্নতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা যে প্রকাশ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটা ঘটনা যে, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের এইসব পুঁজিবাদী প্রণালীগুলির কার্যকরী ও সাফল্যগুলি থেকেও ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে পরস্পর। একে বলা যায় কৃৎকৌশলে স্থানীয় সংস্কৃতির এক ধরনের সংমিশ্রণ।

সংস্কৃতির প্রসঙ্গ কেবলমাত্র উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার স্তরে নয়, সর্বোপরি ব্যবহৃত হচ্ছে 'কনজিউমার' বা ভোক্তাদের আকৃষ্ট করার জন্যও। পণ্যের চরিত্র ও রূপ নির্ধারণে অর্থাৎ বাজারের চাহিদা সৃষ্টি করা ও ভোক্তার রুচি গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে স্থানীয় সংস্কৃতি। নতুন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ফলাফলের অন্যতম সামাজিক ভোগবাদের কেন্দ্রীয় দিক হয়ে দাঁড়িয়েছে সংস্কৃতি। উৎপাদনের চেয়ে বাজারীকরণের উপর বর্তমান পুঁজিবাদের ঝোঁক বৃদ্ধি পাওয়ায়, সংস্কৃতির প্রাধান্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, সংস্কৃতি স্বয়ং এক ধরনের পুঁজিতে পরিণত হচ্ছে। সংস্কৃতিকে পরিণত করা হচ্ছে পুঁজিবাদী তৎপরতার অন্যতম 'সোর্স' বা সূত্রে। সংস্কৃতিকে বিভিন্নভাবে ও কাজে ব্যবহার করে, সেগুলির মধ্যে গড়ে তোলা হচ্ছে সমন্বয়ও। কোন কোন ধরনের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বা নারীদের দিয়ে বিশেষ ধরনের কাজ করানো, বাজারীকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সাংস্কৃতিক চাহিদার প্রতি গুরুত্ব প্রদান, নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে নিয়োগ ইত্যাদিতে এ'বিষয়ক উদাহরণ পাওয়া যায়। আধুনিক পুঁজিবাদ সংস্কৃতিকে মূলধন হিসাবে বিবেচনা করার ফলে, এটাই স্বাভাবিক যে ব্যবস্থাপনাবাদ, যা উদ্ভাবনী, আত্মবিশ্বাস ও আত্মীকরণের ক্ষমতা নিয়ে গঠিত, তা' সংস্কৃতির প্রতি ক্রমাগত আকৃষ্ট হবে, সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করবে, সংস্কৃতিকে সংযুক্ত করবে এবং তার দ্বারা নানা মাত্রার শিল্পগত সংস্কৃতি (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কালচার) ও সংস্কৃতিময় শিল্প (কালচারালাইড ইণ্ডাস্ট্রি) গঠনের চেষ্টা চালাবে।

ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপকদের সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি দান প্রাধান্য পাচ্ছে নিম্নোক্ত দিকগুলিতেঃ (ক) আঞ্চলিক সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টসমূহ চিহ্নিত করা যাতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি উৎপাদন ও বাজারী আদল এবং লক্ষ্যসাধনের কাজে ব্যবহার করা যায়, (খ) সংস্কৃতিকে চিরে চিরে অনুপুঙ্খ বিচার করা এমনভাবে, যাতে কেবলমাত্র একাংশের সাংস্কৃতিক গঠন অথবা একটি বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির একটি মাত্র মাত্রাকে ব্যবহার করা যায়; (গ) জনগণের সাংস্কৃতিক চেতনার সাথে সমগ্র উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনাকে সংযুক্ত করে নেওয়া এবং উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনাকে জাতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক তৎপরতায় আপন হিসাবে প্রতিপন্ন করা যায়।

সাংস্কৃতিক বস্তুর প্রতি ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনার মনোযোগ দান যুক্ত রয়েছে বিশ্ব-ভোগবাদিতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চারটি সূত্রের সাথে। ভোক্তা-সংসর্গিত সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকারগুলি নিবদ্ধ রয়েছে 'ড্যুরেবল' ও 'নন-ড্যুরেবল' তথা স্থাবর ও অস্থাবর ভোগ্য-পণ্য থেকে নির্বাচনে, খাদ্যাভ্যাসগুলির প্রসঙ্গে, ভ্রমণ এবং অন্যান্য জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রেখে। এই লক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানগুলির বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাও অন্তরঙ্গভাবে দেশ বা এলাকার জনগণের সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে পণ্যের বৈচিত্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণকে বাড়িয়ে চলেছে।

সংস্কৃতির এই আত্মীকরণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে টার্গেট গ্রুপগুলি স্থির করা হচ্ছে, তাতে অধিকাংশ দেশেই অগ্রাধিকার পাচ্ছে মধ্যবিত্ত অংশ। মধ্যবিত্ত, বিশেষত শহুরে মধ্যবিত্ত এবং তাদের চাহিদাগুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হচ্ছে এবং বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য বাজারী প্রচার-কৌশলের মধ্য দিয়ে রুচি পুনর্নির্মাণ সাধন করার কাজ চালানো হচ্ছে। এক একটি দেশের বিশিষ্ট শ্রেণী বা উপ-শ্রেণীর ভোগের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকার বা স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে, ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপকরা, বিপ্রতীপে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির বিশিষ্ট ধারণা, মূল্যবোধ ও পরিচিতিকে অন্যান্য শ্রেণী-উপ-শ্রেণীগুলির

মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই কাজে, ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপকরা সংস্কৃতির চিহ্নিতকরণ ও জনগণের ভোগকে নিজেদের অভিপ্রায়মত পরিবর্তিত করার তৎপরতায় একই সাথে ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট শ্রেণী-উপ-শ্রেণীর সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বকে। সংস্কৃতিকে তারা বিশ্লেষণ করে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। এই বিশ্লেষণের সাহায্যে জনগণের নির্বাচন, অগ্রাধিকার, প্রথা ও মূল্যবোধের মনোভাবগুলিকে তারা খুঁজে বের করে। তাছাড়া জনগণের সংস্কৃতিগত সংবেদনশীল কর্ম-তৎপরতাকে উৎপাদন-প্রণালীতে ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে সংযুক্তি সাধন করতে সংস্কৃতি-বিষয়ক সমালোচনাকে আহ্বান ও উৎসাহিত করে ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা; জনগণের কাছে সংস্কৃতির বিষয়ে তারা আন্তরিকতা প্রদর্শন করে আস্থা অর্জনের জন্য। দেশীয় জনগণের নানাধরনের সংস্কৃতিক তৎপরতা, উৎসব বা প্রতিযোগিতায় আর্থিকসহ নানা আনুকূল্যও দিয়ে থাকে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'স্পনসরশিপ' ব্যবস্থা এখন তাই বাড়ছে।

প্রসঙ্গত ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে ব্যবসায়িক স্বার্থে সংস্কৃতির স্বীকৃতিদান ও ব্যবহারের প্রসঙ্গটির সমালোচনামূলক বিচার করা জরুরি। আধুনিক পুঁজিবাদের এই ধরনের সাংস্কৃতিক তৎপরতার লক্ষ্য হলো সংস্কৃতির সম-প্রকৃতিকরণ (হোমোজেনাইজেশন) ও প্রভুত্বকরণ (হেজিমনাইজেশন)। যদিও বহুধা চরিত্রের সংস্কৃতিকে ধনতন্ত্র সম-প্রকৃতিকরণ করতে চায়, কিন্তু বহুধা সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও দিকগুলিকে আপাতত তাদের স্বীকার ও ব্যবহার না করে উপায় নেই। তাই প্রভুত্বকরণের দ্বারা বিভিন্ন সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার পরিবর্তে, আপাতত নিজেদের অভিপ্রায়মত পুনর্গঠিত সংস্কৃতিই তাদের লক্ষ্য।

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম ও সূত্র হলো সংস্কৃতি। কিন্তু শতাব্দীর এই অন্তিম অধ্যায়ে, বহুধারূপী ধনতন্ত্র এবং সেক্ষেত্রে ভোগতন্ত্রী পুঁজিবাদের প্রাবল্য, এখন সমাজের বিভিন্ন অংশের সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর ও কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে (সংস্কৃতির জগতে) আগ্রাসন চালাচ্ছে ও নিজেদের অভিপ্রায়ের প্রতি স্বীকৃতি আদায় করে নিতে সক্ষম হচ্ছে।

তৃতীয় দুনিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রধানত আহৃত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত উপনিবেশবাদী ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে, বিংশ শতাব্দী সংস্কৃতির সংজ্ঞা গঠিত হচ্ছে ধনতন্ত্রের সংস্কৃতির বহুধা-রূপ থেকে। আগামী একবিংশ শতকে, বহুজাতিক বহুসাংস্কৃতিক-ধনতন্ত্রের যুগে, সংস্কৃতির সংজ্ঞা গঠনের চেষ্টা চলছে ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপকদের দ্বারা। সর্বাধুনিক 'ম্যানেজারিয়াল রেভোলিউশন' বা ব্যবস্থাপনাগত বিপ্লব, যার কেন্দ্রে ঘনীভূত হচ্ছে সংস্কৃতির প্রভূত্বের সংকল্প, তা' হলো সমগ্র সমাজ, বিশেষত শ্রমজীবীদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বের জন্য সর্বাপেক্ষা আধুনিক ও সর্বাপেক্ষা বিধ্বংসী প্রয়াস।

সর্বাধুনিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া

পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সদা-উদ্ভিন্ন শিল্প-প্রক্রিয়ার রূপটিকে বলা হচ্ছে 'লীন প্রোডাকশন'। শব্দটির মর্মার্থ মোটামুটি ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে যে এ' হলো মেদহীন অর্থাৎ সমস্ত ধরনের বাড়তি ও অপ্রয়োজনীয় উপসর্গহীন কৃশতনু উৎপাদন-রীতি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, লীন প্রোডাকশনে ব্যবহার করা হয় সর্বাধুনিক 'প্রোগ্রামেবল মালটিফাংশনাল মেশিন' তথা পূর্ব-স্থিরীকৃত বহু কর্মসাধক যন্ত্রের। এক ধরনের 'প্রোডাকশন অ্যাপ্লিকেশন' চালু থাকা অবস্থাতেই, কম খরচে, অন্য ধরনের পণ্য উৎপাদনে এই পদ্ধতির সাহায্যে ইচ্ছামত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতায়াতের সুযোগ আছে। এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিত মূল কারখানাকে ঘিরে বহু ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক বা জাল থাকে। আশা করা হচ্ছে, এই ব্যবস্থা আরও ব্যাপক ও উন্নত হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে। অতীতের (ম্যাকডোনাল্ডের) অ্যাসেম্বলি লাইন প্রোডাকশন, ম্যাস প্রোডাকশন এবং অটোমেটেড ম্যাস প্রোডাকশন—যা 'জাস্ট-ইন-কেস' নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল তার পরিবর্তে লীন প্রোডাকশনের প্রিন্সিপল বা নীতি হলো 'জাস্ট-ইন-টাইম' (জি. আই. টি. বা জিট) এবং 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট' (টি. কিউ. এম.)। এই নীতিতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে স্বাভাবিকভাবে সাপ্লায়ার্স, অ্যাসেম্বলার্স ও ডিস্টিবিউটরদের মধ্যে অনেক বেশি সহযোগিতা ঘটে। এই ব্যবস্থা পুরোপুরি নির্ভর করে ফ্লেক্সিবিলিটির উপর—ফ্লেক্সিবল প্রেডাকশন, ফ্লেক্সিবল মার্কেট, ফ্লেক্সিবল লেবার মার্কেট, ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক টাইম,

ফ্লেক্সিবল প্লেস, ফ্লেক্সিবল লেবার ওয়েজ, ফ্লেক্সিবল স্পেশালাইজেশন প্রভৃতি (পরে প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করা হবে)। লীন প্রোডাকশনে এই ধরনের নমনীয়তা ব্যবহারের অন্যতম কারণ হলো (কোন কোন অভিমত অনুযায়ী) ঃ ম্যাস প্রোডাকশন মার্কেট বা গণ-উৎপাদনের বাজার ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে তার পরিবর্তে, ঢেউ-এর অভিঘাতের চরিত্র নিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে 'কনজিউমার ডিমাণ্ড' বা ভোক্তা-চাহিদার। ডিমাণ্ড-পুল ইকনমিকস বা চাহিদা-ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে সত্তরের দশকের শেষার্ধে উদ্ভূত হয় সাপ্লাই-পুল-ইকনমিকস বা সরবরাহভিত্তিক অর্থনীতি। ক্রমে তা' 'ইকনমিকস অব স্কেল' বা মাত্রার অর্থনীতিতে এবং এখন তা' রূপান্তরিত হচ্ছে 'ইকনমিকস অব স্কোপ' বা সুযোগের অর্থনীতিতে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিমণ্ডলে ভোক্তার রুচিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্যের বাজার গঠনের 'সুযোগ' তৈরি ও গ্রহণের প্রশ্নেই শিল্প-ব্যবস্থায় জরুরি হয়ে উঠেছে ফ্লেক্সিবিলিটি। আরও বিশেষত গণ-উৎপাদনের পরিবর্তে, ঠিক যে ধরনের এবং যতটুকু বাজারে চাহিদা তদনুযায়ী উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভোক্তার চাহিদার মুহুর্মুহু পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি ধরনের পণ্য উৎপাদন চলতে চলতেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে অন্য ও নতুন আকর্ষণীয় পণ্য উৎপাদনের। এজন্য গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে 'জাস্ট-ইন-টাইম'-এ—ঠিক উপযুক্ত মুহূর্তটিতে ঠিক উপযুক্ত উৎপাদন। তাই এই সমগ্র কাজে ফ্লেক্সি-পদ্ধতি তথা ফ্লেক্সিবিলিটিকে কেন্দ্রীয় পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য অতীতের মতো 'কোয়ালিটি কন্ট্রোল' বা মান নিয়ন্ত্রণ মাত্র নয়, ব্যবস্থা হচ্ছে "টোটাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল" বা পুরোপুরি মান নিয়ন্ত্রণ করার।

'লীন প্রোডাকশন' প্রথার উদ্ভব প্রধানত জাপানে। উৎপাদনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মালয়েশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে জাপানের সহযোগী শিল্পগুলিকে 'ফ্লেক্সিবিলিটি'তে সাজানো হয়েছে। জাপানী উৎপাদনে দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক, পরিদর্শক, ব্যবস্থাপক, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মালিক পর্যন্ত একসাথে উৎপাদনে প্রায় সমভাবে কাজ করে, বিশেষত ছোট কারখানাগুলিতে। লাঞ্চ-ব্রেকের সময় সবাই সমবেতভাবে একই খাবার, এক টেবিলে বসে খায়। উৎপাদন চালু থাকার সময় একজন ব্যক্তি-শ্রমিকের শ্রম-সময় যাতে সামান্যতম অপচয় না ঘটে, তার জন্য সুসংহত ও সর্বব্যাপী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

লীন প্রেডাকশনের নমনীয়তা অর্জনে সহায়ক হয়ে উঠেছে মাইক্রো-ইলেকট্রনিকস টেকনোলজি। টনি স্মিথ তাঁর আলোচনাতে (লীন প্রোডাকশন ঃ এ ক্যাপিটালিস্ট ইউটোপিয়া?, ১৯৯৪) দেখিয়েছেন যে মাইক্রো-ইলেকট্রনিকস ব্যবস্থা সহজেই নতুন উৎপাদন-প্রণালী যুক্ত করতে পারে। শ্রমিক-পরিচালিত বিকেন্দ্রীকৃত ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রযুক্তির অন্তঃশক্তি ব্যবহারে যথেষ্ট সক্ষম। ফ্লেক্সিবল টেকনোলজির খরচ ক্রমাগত কম হওয়ায় বিকেন্দ্রীভূত হোম-ওয়ার্ক ফার্মগুলির কাছে তা' সহজেই গ্রহণীয় হয়ে উঠছে। পোস্ট-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমি (এটি পোস্ট-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল তাত্ত্বিকদের মত অনুসারে বলা হচ্ছে না; শিল্প থেকে পরিষেবাতে অর্থনীতির ভর পরিবর্তনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে) পরিপূর্ণভাবে যুক্ত ও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ইনফরমেশন-ইনটেনসিভ অ্যাক্টিভিটি বা তথ্য-নিবিড় তৎপরতায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব ইনফরমেশন টেকনোলজিতে যে বিস্ফোরণমূলক ও ঘাড়-ভাঙ্গা গতি এনেছে তা' লীন-প্রোডাকশন ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন ও বাজারে সৃষ্টির সর্বপ্রধান হাতিয়ার। এই উৎপাদন-চরিত্র পরিপূর্ণভাবে শিল্পগত পরিসরের ম্যাস প্রোডাকশন ও ক্র্যাফট প্রোডাকশনের অবশিষ্টাংশকে সমূলে অপসারিত করে বিশ্ব-উৎপাদনের স্ট্যাণ্ডার্ড বা মানক-ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে দাবী করা হচ্ছে। এই উৎপাদনের রূপ সম্পর্কে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের দাবী হলো যে এটি সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্তরে কোম্পানিগুলির পরস্পরের মধ্যে, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে, উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে ঐক্য গঠন করবে—সর্বাংশের ভবিষ্যৎ-শুভর জন্য (!) ইত্যাদি। কিন্তু অতীতের পুঁজিবাদী ধারার উৎপাদনের মতো লীন প্রোডাকশনেও পুঁজি ও মজুরি শ্রমিক , উৎপাদক ও ভোক্তা এবং উৎপাদনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক উপাদান থেকেই যাচ্ছে।

বর্তমানকালের শ্রম-প্রক্রিয়া উপলব্ধি করতে হ্যারি ব্রেভারম্যানের আর একটি বক্তব্য উল্লেখ করা

দরকার। তিনি লিখেছিলেন, "ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা একচেটিয়াপনার স্তরে সামগ্রিকভাবে অধিগ্রহণ করেছে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক চাহিদাসমূহকে এবং অধীনস্থ করেছে বাজারের; একই সাথে মূলধনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সেগুলিকে ছাঁচে ঢেলে নিচ্ছে। এই উপাদানগুলি যথার্থভাবে অনুধাবন না করে নতুন বৃত্তিগত কাঠামো এবং সেই কারণে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। কিভাবে পুঁজিবাদ সমাজের সব কিছুকে এক অতিকায় বাজারী ক্ষেত্রে পরিণত করছে সেই প্রক্রিয়া নিয়ে খুব সামান্যই অনুসন্ধান করা হয়েছে, যদিও এ' হলো সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম চাবিকাঠি।"

লীন প্রোডাকশনের, শ্রম-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে অপর একটি কারক-শক্তির কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করা দরকার। একে বলা যেতে পারে 'ডাউনসাইজিং' বা ছেঁটে ছোট করে দেবার উপাদান। নতুনের পত্তন করতে হলে পুরানোর ধ্বংসসাধন করার আগে শেষোক্তকে গুরুত্বহীন ও অর্থহীন করে তোলার প্রক্রিয়া এটি। 'ফ্লেক্সিবিলিটি' হলো 'ডাউনসাইজিং' করার অন্যতম হাতিয়ার। সুতরাং ফ্লেক্সিবিলিটি পদ্ধতি পুঁজিবাদী উৎপাদনের কেবল বহিরঙ্গ মাত্র নয়, অন্তর্বস্তুরও অংশ।

এবারে আধুনিক শ্রম-প্রক্রিয়ার ফলাফলের বাস্তব কিছু উল্লেখযোগ্য দিক লক্ষ্য করা যাক। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারা (১) শ্রম-শক্তি অতিরিক্ত নিংড়ে নেওয়া হলেও শ্রমের অবিশ্বাস্য ও ব্যাপক অপসারণ ঘটছে, (২) কায়িক শ্রমের এই প্রক্রিয়াগত অপসারণ ছাড়াও, রোবোটাইজেশন দ্বারা বাকি কায়িক শ্রমকে যন্ত্র-শ্রমে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, (৩) শিল্প ক্ষেত্র থেকে অর্থনীতির ভর পরিষেবা ক্ষেত্রে ধাবিত হচ্ছে, (৪) জটিল, সূক্ষ্ম, নিপুণ ও পূর্ব-নির্ধারিত, ঘড়ি ধরে স্বয়ংক্রিয় ও পরম্পরা-যুক্ত যন্ত্র ব্যবস্থা ও কৃৎকৌশলের ফলে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে স্থান করে নিচ্ছে মানসিক শ্রম। অতীতে মানসিক শ্রমকে সাধারণভাবে সার্ভিস সেক্টর বা পরিষেবা ক্ষেত্রের এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমজীবীদের 'হোয়াইট কলার এমপ্লয়ী' বলে চিহ্নিত করা হলেও, এখন তার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। পূর্বতন কারখানা শ্রমিকের মতই, অন্যান্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি, শিল্প-ক্ষেত্রেও এই মানসিক শ্রমদায়ীরা এখন ক্রমবর্ধমান সংখ্যাতে কাজ করছে। এই নতুন ধরনের মানসিক শ্রমদায়ীরা হলো টেকনিসিয়ান, কমপিউটার অপারেটর, ইঞ্জিনীয়ার, প্রোগ্রামার, প্ল্যানার, ডিজাইনার, অ্যাডভারটাইজার, মিডল-লেয়ার ম্যানেজার, স্ট্যাটিস্টিসিয়ান, ইকনমেট্রিস্ট, জিওলজিস্ট, মার্কেট সার্ভেয়ার, সেলস অফিসার, কার্টোগ্রাফার, ড্রাফটসম্যান প্রভৃতি।

উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার বাস্তব কিছু ফলাফল

উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার সাধারণ চরিত্র ও বর্তমান গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এবারে এগুলির বাস্তব ফলাফলের কিছু দিক লক্ষ্য করা যাক। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার পূর্বোক্ত দিকগুলি সারা বিশ্বে সর্বজনীন এবং হুবহু এক তো নয়ই বরং ব্যাপক মাত্রায় পৃথক, এমনকি একই রূপের মধ্যেও অসমান ধরনের। অন্যদিকে অনুন্নত দেশগুলিতে দেশজ ও পরম্পরাগত উৎপাদন ও শ্রম-ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং নিম্নে বর্ণিত ফলাফলগুলিও তদনুযায়ী গঠিত। তবে, একথা সত্য যে, সর্বত্র পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যেমন সৃষ্টি হয়েছে, কোথাও তা' তীব্রতরও হচ্ছে।

(ক) শ্রম-সময় ও কর্ম-কাঠামোর রূপান্তর

পুঁজিবাদের উদ্ভবের প্রায় শুরুর অধ্যায় থেকে শ্রমিকশ্রেণী অন্যতম যে প্রধান বিষয় নিয়ে মালিকশ্রেণীর সাথে বিরোধ শুরু করেছিল তা' ছিল শ্রম-সময় কমানোর। কিন্তু এখন, নতুন ধরনের শিল্প ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে এক সম্পূর্ণ নতুন অবস্থা গড়ে উঠছে। তবে এ' বিষয়ে একটি নিশ্চিত ও নির্ধারক রূপ এখনও সৃষ্টি হয়নি। প্রলম্বিত শ্রম-সময়ের ঐতিহ্য যেমন বহাল আছে, নতুন উপাদানও যুক্ত হচ্ছে। শুরুতে একথাও উল্লেখ করা দরকার যে, শ্রম-সময়ের প্রসঙ্গ এখন শ্রমিকের চাকুরীর নিরাপত্তার প্রসঙ্গের সাথে জড়িয়ে গেছে সরাসরি।

শ্রম-সময় : ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর প্রায় দুই দশকব্যাপী অন্তত একটি ক্ষেত্রে পূর্ব-ব্যবস্থা অব্যাহত থাকতে দেখা গিয়েছিল। তা' হলো কাজের সময়ের ক্ষেত্রে। ১৯৬২ সালের আই. এল. ও.'র

'রিডাকশন অব আওয়ারস অব ওয়ার্ক (রেকমেণ্ডেশন নং ১১৬) সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে কর্মজীবীদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল সপ্তাহে ৪০ ঘন্টার শ্রম। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সংগঠিত শিল্প ও পরিষেবাতে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। যদিও তৃতীয় দুনিয়ায়, বিশেষত কৃষি ও অসংগঠিত শিল্পে এই শ্রমের সময় কার্যত বাস্তবায়িত হয়নি। উন্নত দেশগুলিতে, এই দুই দশকে, কাজের সময় দিবস-ভিত্তিক, সপ্তাহ-ভিত্তিক, বছর-ভিত্তিক, এমনকি একজন কর্মজীবীর সমগ্র কর্মজীবন-ভিত্তিক হিসাবে গড়ে উঠেছিল, তবে কিছুটা বিভিন্নতাপূর্ণ ও ফ্লেক্সিবল হিসাবে। এর পিছনে নানা কারণ ছিল। যেমন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের স্তর, জনসংখ্যার বয়সগত বর্গের অবস্থা, সক্রিয় (কর্মক্ষম) জনসাধারণের আকাঙক্ষার মাত্রা, দেশটির অর্থনীতির দক্ষতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বাস্তবতা প্রভৃতি। সমগ্র অর্থনৈতিক তৎপরতাকে প্রতিফলিত করে এমন সব উপাদানগুলির প্রভাব ছিল শ্রমজীবীদের কর্ম-সময়ের পরিমাণের উপর। যদিও এগুলি বাহ্যিক উপাদান; আসলে শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে শ্রমশক্তি শোষণের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ ও মাত্রা ছিল নির্ধারক। তবে পুঁজিবাদের কোণঠাসা তৎকালীন বাস্তবতা, আর্থিক ও সামাজিক সংকট, শ্রমিক আন্দোলনের চাপ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব প্রভৃতির জন্য শ্রমশক্তির শোষণকে পুঁজিবাদ উন্নীত করতে পারেনি মাত্রাতিরিক্ত স্তরে।

কিন্তু আশির দশকের শেষার্ধ থেকে শ্রম-সময়ের চাপ বৃদ্ধি ও তার প্রভাব শ্রমিকশ্রেণী ও একই সাথে শিল্পের উপর প্রবলভাবে পড়তে শুরু করে।

স্ট্রেস অ্যাট ওয়ার্ক বা কর্মক্ষেত্রে কর্ম-সময়ের চাপের প্রভাব প্রতিফলিত হয় শ্রমিকের কাজে অনুপস্থিতি (অ্যাবসেন্টিজম্), উৎপাদনশীলতায় ঘাটতি, শারীরিক অবস্থায় অবনতি, অসুস্থতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। শ্রমশক্তি শোষণের তীব্রতায় পূর্বোক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, স্বাস্থ্য-বীমা, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য উৎপাদনের মোট খরচ বাড়তে থাকে। ১৯৯২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইসব কারণে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২০০ বিলিয়ন ডলার, ইংলণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ বার্ষিক গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্টের ১০ শতাংশের সমান ছিল।

শ্রম-সময়ের চাপ বৃদ্ধিজনিত পরিণামের ফলাফলকে বলা হয় 'জব বার্নট আউট' বা কর্মক্ষমতা-বিনষ্টি। যে ব্যক্তি 'বার্নট আউট' বা কাজের শক্তির শূন্যত্ব অর্জন করেছে, জরাজীর্ণ হয়েছে তার এনার্জি বা তেজশক্তি (কর্মক্ষমতা) স্বভাবতই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার কমেছে; বৃদ্ধি পেয়েছে তার শ্রম-বিচ্ছিন্নতা (অ্যালিয়েনেশন) অর্থাৎ সে কর্ম সম্পাদন করে অদক্ষভাবে; কাজে তার অনীহা প্রকাশিত হয়; ক্রমে নৈরাশ্যবাদী হয়ে ওঠে সেই শ্রমিক। শ্রমিকের শ্রমশক্তি বার্নট আউট হওয়া পর্যন্ত পাঁচটি স্তর দেখানো হয়েছে—(ক) হনিমুন স্টেজ : কর্মজীবনের প্রারম্ভে যুবশক্তির প্রাবল্যের অধ্যায়, (খ) ফুয়েল শর্টেজ : বার্নট আউট প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ, (গ) ক্রনিক স্টেজ : যখন থেকে অবসাদ, ক্রোধ, রোগ ও মানসিক নিম্ন চাপ পরিলক্ষিত হতে থাকে, (ঘ) ক্রাইসিস স্টেজ : এই সময়ে উপসর্গ এমন প্রবল হতে থাকে যে, শ্রমিক অনুভব করতে থাকে তার জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে, ও (ঙ) হিটিং দা ওয়াল : যখন শ্রমিক আর কার্যত শ্রম দিতে পারে না এবং তার কাজে গভীর অবনতির চিহ্ন দেখা যায়।

প্রসঙ্গটি সম্প্রতি জাপানে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। অতিরিক্ত কাজের চাপের জন্য মৃত্যুকে জাপানে বলা হচ্ছে 'কারোসি'। উন্নত দেশগুলির মধ্যে জাপানের শ্রমিকদের দীর্ঘতম সময় কাজ করতে হয়—১৯৯০ সালে সরকারী হিসাব অনুযায়ী বছরে ২,০৪৪ ঘন্টা। জাপানের কর্ম-বর্ষ দীর্ঘ, কারণ সেখানে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে বিনা পারিশ্রমিকে 'সার্ভিস ওভারটাইম' ব্যবস্থা। জাপানে বহু ব্যাঙ্কের কর্মীদের বছরে (২৫০ দিন কর্মদিবস ধরে) ৩,০০০ ঘন্টা বা দৈনিক ১২ ঘন্টা কাজ করতে হয়। ইন্সিওরেন্স শাখায় দৈনিক গড় কাজের সময় ১১ ঘন্টা ২০ মিনিট। 'কারোসি' শব্দের উদ্যোক্তা ডঃ টেটসুনোজো উয়েহাতা বলেছেন যে, জাপানে সত্তরের দশক থেকেই শ্রম-সময়ের চাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আমেরিকাতে ২০ ধরনের কাজের শ্রমিকদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে,

তাদের মধ্যে শ্রম-সময় বৃদ্ধি ও কাজের চাপের জন্য নানা ধরনের কঠিন ক্ষতিকর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ইংলণ্ডের সমীক্ষাতেও ফলাফল অনুরূপ।

কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা' পুঁজিবাদী বিগত শ্রম-প্রক্রিয়ার ঐতিহ্যগত ও ধারাবাহিক ব্যবস্থার পরিণত রূপটি। এই রূপও দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু এবং এক সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়ার (এবং নিঃসন্দেহে তা' বর্ধিষ্ণু) সূত্রপাত ঘটে গিয়েছে। শ্রমের সময় কমানোর দাবী ও ব্যবস্থা এখন শ্রমিকদের পক্ষ থেকে নয়, উত্থাপিত হচ্ছে মালিকদের পক্ষ থেকে। শ্রমিকদের জন্য কম কাজের সময় শুধু নয় সেই সময়ও চালু করা হচ্ছে ধরাবাঁধা দৈনন্দিন ভিত্তিতে নয় বরং নমনীয় ও সুবিধাজনক ফ্লেক্সিবল চরিত্রে। পূর্বেই 'জবলেস গ্রোথ' প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে শিল্প-গঠনের ভারসাম্য এখন শ্রম-নিবিড়তা থেকে পুঁজি-নিবিড়তায় পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে। এ'কারণে এখন শ্রমিকের সংখ্যাগত প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে অতি দ্রুত; এটা প্রবেশ করেছে ক্রমাগত কমে যাওয়ার প্রক্রিয়ার স্তরে। স্বভাবতই প্রয়োজনমতো ছাঁটাই বা 'জব-শেডিং' করার পরিবর্তে (কেননা তাতে শ্রম-বিরোধ তৈরি এবং উৎপাদনের সামনে অহেতুক সমস্যা সৃষ্টি হয়) সমগ্র উৎপাদন-প্রক্রিয়াতে নতুন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গড়ে তোলা দরকার হয়ে পড়েছে মালিকশ্রেণীর কাছে। সমগ্র উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে এটা 'ইন-বিল্টসিস্টেম' হিসাবে বলবৎ হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির বিশ্বায়নের ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপাদানকে সার্থকভাবে ব্যবহার এবং ক্রমাগত জয়ী হতে শিল্পের ও উৎপাদিত পণ্যের উন্নততর বিন্যাস ঘটিয়ে যেতে হচ্ছে। এজন্য উৎপাদনের খরচ কমানো এবং তার মধ্যে শ্রম-খরচ কমানো ছাড়াও শ্রমিকের সর্বশ্রেষ্ঠ দক্ষতা ও অনবসিত প্রাত্যহিক শ্রমশক্তিটুকু সর্বাধিক কম সময়ের মধ্যে ক্রয় করাও জরুরী। তৃতীয়ত, নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অব্যবহৃত শ্রমশক্তি তথা বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলবে। অথচ এখন সমগ্র পুঁজিবাদের সামনে বৃহত্তম বিপদ হলো স্ব স্ব দেশে তথা বিশ্বব্যাপী বেকারী; সামাজিক উত্তেজনা ও সংঘাতের প্রধান বীজও এটি। স্বভাবতই বেকারী কমানোর জন্যও পুঁজিবাদকে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হচ্ছে। সেকারণে, সমগ্র উৎপাদন-প্রক্রিয়াতে এমন উপাদান প্রবেশ করানো এবং প্রক্রিয়া হিসাবেই এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাদের সামনে প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে যাতে বেকার সমস্যার মুখে দাঁড়ানো যায়। একজন মানুষের কাজ ও শ্রম-সময়কে, কোন বাড়তি আর্থিক ব্যয় ব্যতিরেকেই, যদি দুই বা ততোধিক মানুষকে দিয়ে করানো সম্ভব হয় তবে, এতে একই কাজে দু'জনের বা ততোধিকের নিয়োগ ঘটিয়ে বেকারীর বিষয়ে, বাহ্যত হলেও, এক সাফল্য সমাজের সামনে দেখানো যায়। চতুর্থত, নির্ধারিত শ্রম-সময়ভিত্তিক স্থায়ীভাবে শ্রমিক নিয়োগ করার পরিবর্তে, শ্রমিককে তার নিজ ইচ্ছামত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করতে দিয়ে এবং তার বিনিময়ে নিয়োগকে যদি অস্থায়ী চরিত্র দেওয়া যায় তবে ছুটি ও ছুটির সমপরিমাণ মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন সুযোগ—চিকিৎসার ব্যয়, দুর্ঘটনাজনিত বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ, মাতৃত্বকালীন বা পিতৃত্বকালীন ছুটি ও সুযোগ-সুবিধা, পেনশন, বীমা প্রভৃতির জন্য ব্যয়কে বহুলাংশে কমিয়ে উৎপাদন খরচ কমানো তথা মুনাফাকে বৃদ্ধি করা চলে। পঞ্চমত, বর্ধিত উৎপাদনের জন্য উৎপাদন কেন্দ্রের (কারখানা) সংখ্যা বৃদ্ধি ও তদনুযায়ী বাড়তি শিল্প-সরঞ্জাম ব্যবহার করার পরিবর্তে, একটি কারখানায় একই সরঞ্জামে ভাগে ভাগে লোক নিয়োগ করে উৎপাদনের জন্য কাজের সময়কে দীর্ঘ করে নেওয়া সম্ভব। ষষ্ঠত, বাজারের চাহিদার ওঠা-নামার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে উৎপাদনের পরিমাণের হেরফের করতেও শ্রমিক সংখ্যা ও তাদের শ্রমের সময়ের মধ্যে স্থির-ব্যবস্থার পরিবর্তে নমনীয় ও ফ্লেক্সিবল ব্যবস্থা এখন মুনাফার স্বার্থে অনেক জরুরী। সপ্তমত, আধুনিক উৎপাদন প্রণালীতে যে ধরনের জটিলতা ও বিশিষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে বহু ক্ষেত্রে একটি নিপুণতাসম্পন্ন শ্রমিকের পরিবর্তে বিভিন্ন নিপুণতা ও দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক দরকার হচ্ছে। স্বল্প শ্রম-সময়ে বেশি সংখ্যক সংশ্লিষ্ট ধরনের দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করে সমাধান করা যায় সেই সমস্যার। অষ্টমত, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রেতাকে বেশি সময় ধরে সাহায্য করতে পারলে শিল্পের পক্ষে লাভজনক হয়, যেমন ব্যাঙ্ক, বীমা, দোকান ইত্যাদি। কম সময়ে কাজের বিনিময়ে বেশি সংখ্যক কর্মজীবী নিয়োগ করে এইসব প্রতিষ্ঠানে ভোক্তার

পরিষেবার সময়কে বাড়িয়ে দিয়ে তা' সম্ভব হয়। নবমত, স্বল্প-সময়ের জন্য ও অস্থায়ী চরিত্রের শ্রমিককে শিল্পে রাখতে পারলে শ্রমিকের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের সংস্পর্শ ও প্রতিবাদী মনোভাব কমিয়ে দেওয়া সম্ভব।

নতুন ব্যবস্থা শ্রমিকদের পক্ষে—এই প্রচারের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ : বর্তমানে সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের জটিলতা ও ব্যস্ততা হয়ে উঠেছে বহুমুখী ও ব্যাপক। এইরকম পরিস্থিতিতে, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের ও দীর্ঘক্ষণের কাজ, শ্রমিক জীবনে সমস্যা কাটানোর পরিবর্তে, স্বয়ং প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে। সুতরাং শ্রমিককে কম শ্রম-সময় ও শ্রমশক্তি খরচের কিছুটা স্বাধীনতা দিতে পারলে সুবিধা অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য শ্রমিকের আইনগত ও বাধ্যতামূলক আনুগত্য শিথিল হলে একাধিক প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনভাবে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে বাড়তি উপার্জন করা তার পক্ষে সম্ভব। লক্ষণীয় যে, সমাজে বিলাসী ভোগবাদিতা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হবার পরিপ্রেক্ষিতে বেশি উপার্জনের দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য চেষ্টা এখন উন্নত দেশগুলির শ্রমজীবীদের মধ্যে বাড়ছে। তৃতীয়ত, কতকগুলি অংশের শ্রমিক, যাদের বাড়তি পারিবারিক দায়িত্ব বহন করতে হয় অথবা যারা বয়স্ক কিংবা যারা দৈহিকভাবে কিছুটা অক্ষম তারা নমনীয় শ্রম-ব্যবস্থাকে নিজেদের পক্ষে অনুকূল বলে বিবেচনা করে থাকে। চতুর্থত, বৃত্তির নমনীয় শ্রম-সময় হলে ব্যক্তিগত দৈনন্দিন কাজের রুটিনে শ্রমিক অধিকতর স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব ভোগ করতে পারে।

ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং টাইম : সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিল্পোন্নত দেশসমূহের শ্রমজীবীদের কর্মজীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটছে অধিকতর ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং টাইম চালু হবার মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দীর্ঘ সাড়ে চারশ' বছরের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এই ব্যবস্থা উন্নত দেশগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মজীবনকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে শুরু করেছে। এই ব্যবস্থার বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্পে এর রূপ বিভিন্ন এবং বহু ক্ষেত্রে হতবুদ্ধিকর ধরনের জটিলও। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সংস্থা নমনীয়তা বিষয়ক কৌশলগুলি প্রয়োগ করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। সময়ের ফ্লেক্সিবিলিটির উদাহরণ হলো—পার্ট-টাইম ওয়ার্ক বা আংশিক সময়ের কাজ, ফোর ডেজ ওয়ার্ক-উইক বা চার দিনের কর্ম-সপ্তাহ, ১০ ঘন্টার শিফ্‌ট ব্যবস্থা, রোটেটিং ডেজ অফ বা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুটির দিনের ব্যবস্থা, জব-শেয়ারিং বা কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া, আওয়ারস অ্যাভারেজিং বা গড়পড়তা সময়ের কাজ, ফ্লেক্সি-টাইম বা কাজের সময়ের মধ্যে পরিবর্তনযোগ্যতা, কমপ্রেসড ওয়ার্ক-উইক বা সংকুচিত কর্ম-সপ্তাহ, শিফ্‌ট পীস-রেটিং, কল ডিউটি ওয়ার্ক বা দরকার পড়লে শ্রমিককে ডেকে পাঠিয়ে কাজ করানো প্রভৃতি প্রথা এই নতুন কর্ম ও কর্ম-সময় কাঠামোর কতকগুলি রূপ। যদিও এগুলির মধ্যে কোন কোনটি সুদীর্ঘকাল ধরে চালু ছিল কিন্তু বর্তমানের সাথে পার্থক্য হলো এই যে, অতীতে সেগুলি ছিল মূল শ্রম-প্রক্রিয়ার উপাঙ্গ ও পরিপূরক মাত্র। কিন্তু এখন এগুলি ক্রমশ প্রধান হয়ে উঠছে। অতীতের শ্রম-প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট কর্ম-কাঠামোর সহায়কমূলক ব্যবস্থা অন্যান্য নতুন ধরনের সহায়কমূলক ব্যবস্থার সাথে বর্তমানে যুক্ত হয়ে কর্ম-সময় কাঠামোর রূপান্তর সংঘটিত করে চলেছে।

ইউরোপে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কম সময়ের কাজের দাবীকে মালিকরা নতুন প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে চুক্তিবদ্ধ করে নিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের শ্রমিকদের কাজের সময় ১৯৬০ সাল থেকে ধীরে ধীরে কমছে। জার্মানিতে ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে বার্ষিক গড় কাজের ঘন্টা ২,০৮০ থেকে ১,৫৮৯ ঘন্টায় অর্থাৎ ২৪ শতাংশ কমেছে। ১৯৭৫ সালে মালিকদের সমস্ত সংগঠনের সাথে ট্রেড ইউনিয়নগুলি আলোচনা ও চুক্তি করে ৪০ ঘন্টার সপ্তাহ চালু করেছিল। ১৯৯০ সালের চুক্তিবলে ১৯৯৩ সালের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে ৪০ লক্ষ শ্রমিকের জন্য সপ্তাহে ৩৬ ঘন্টার কাজ ও ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৩৫ ঘন্টার সপ্তাহ চালু হয়েছে।

কাজের সময় কমানোর ব্যাপারে মালিকশ্রেণীই বর্তমানে সক্রিয় উদ্যোগ নিচ্ছে। কঠোর কর্ম-কাঠামো থেকে ধীরে ধীরে সরে আসা এবং কাজের সময়-ব্যবস্থা থেকে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করে,

কারখানা চালু রাখার সময় বাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা প্রসারিত হচ্ছে ইউরোপে। এ' যেন এক ধরনের শিফ্‌ট প্রথা থেকেও না থাকা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশে এই প্রথা এখন চালু হতে শুরু করেছে।

আমেরিকাতে ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং টাইম চালু হওয়ার পিছনে শিল্পগত প্রয়োজন ছাড়াও বড় কারণ হলো আরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান ঘটানো। আমেরিকাতে দীর্ঘ ৩০ বছরের অধিক সময় ধরে কাজের সময়ের কোন হেরফের ঘটেনি। সাধারণভাবে ইউরোপের গড় শ্রম-সময়ের চেয়ে আমেরিকার কাজের সময় বেশি। ১৯৭৫ সাল থেকে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি স্তরও প্রায় স্থির রয়েছে। অথচ জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের জন্য আমেরিকার শ্রমিকদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা প্রবল। তাই শ্রম-সময়ের জন্য তাদের তেমন মাথাব্যথা দেখা যায়নি, যতটা তৎপরতা তাদের দেখা গেছে মজুরি বৃদ্ধির জন্য। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাবের জন্য পরিবারের মেয়েদের মধ্যেও উপার্জনের উদ্যোগ বেড়েছে। মালিকরা এক্ষেত্রে সুযোগ গ্রহণ করা শুরু করেছিল মেয়েদের পার্ট-টাইম কাজে নিয়োগ করে। কিন্তু নতুন বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার ধাক্কা তীব্র হওয়ার সাথে সাথে আমেরিকার শ্রম-প্রক্রিয়াতে ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং টাইমের সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা দ্রুত চালু হচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জাপানে কাজের সময় উন্নত দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। এখন সরকারের নীতি হলো কাজের সময় কমানো। সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সাপ্তাহিক কাজের ঘন্টা ১৯৮৮ সালে ৪৮ থেকে ৪৬ এবং এপ্রিল ১৯৯১ থেকে ৪৪ ঘন্টা করেছে। ১৯৯৩ সাল থেকে বার্ষিক কাজের ঘন্টা ১৮০০ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনও তা' সবটা হয়নি। জাপানে পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলির প্রসারের বিস্তৃত রিপোর্ট জানা না থাকলেও, পার্ট-টাইম কাজের ব্যবস্থা উত্তরোত্তর অপসারণ করতে শুরু করেছে সর্বক্ষণের কাজের ব্যবস্থাকে।

ইউরোপের মধ্যে জার্মানি, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, উত্তর আমেরিকার কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু শিল্পে ৪ দিনের সপ্তাহ চালু হয়ে গেছে।

পার্ট-টাইম কাজ-এর ব্যবস্থা সুদীর্ঘকালের। এই ব্যবস্থায় অর্ধ-দিবস পর্যন্ত কাজ চালু ছিল। কিন্তু এখন পরিবর্তন ঘটছে এই রীতির। প্রধানত জাপানেই এই ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বক্ষণের কর্মীর পাশাপাশি আংশিক সময়ের কর্মী, যাদের বলা হচ্ছে 'ফ্রী টাইম এমপ্লয়ী', তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এই ফ্রী টাইম কর্মীরা নিজেরাই নির্বাচন করতে পারে সপ্তাহে কোন কোন দিন ও মোট কত ঘন্টা কাজ তারা করবে, যদিও তাদের বাধ্যতামূলকভাবে সপ্তাহে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা এবং যে দিন কাজে তারা হাজিরা দেবে সেদিন ন্যূনপক্ষে ২ ঘন্টা কাজ করতে হয়। কর্মী কি ধরণের কাজ করতে চায় তা' পূর্বাহ্নে নিজেকে স্থির করে দিতে হচ্ছে এবং সপ্তাহে সপ্তাহে তার পরিবর্তন করা চলে না। এই কাজে যুক্ত হবার উৎসাহ বেশি দেখা যাচ্ছে বিশেষত নারীদের মধ্যে, যারা কাজের পাশাপাশি সন্তান পালনও গুরুত্ব দিয়ে করতে চায়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও এই ধরনের কাজে যোগদানের ঘটনা বর্ধিষ্ণু।

জব-শেয়ারিং বা কাজের ভাগাভাগি হলো এক ধরনের পার্ট-টাইম কাজ, কিন্তু এতে রয়েছে ভিন্ন ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটি। এই ব্যবস্থায় একটি 'জব' বা ঠিকা কাজের জন্য দু'জন কর্মী সম্মত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট কাজের মজুরি বা উপার্জন উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। এই ব্যবস্থাতে মালিকের নানা সুবিধা রয়েছে। একজন কর্মীর মধ্যে যে পর্যায় পর্যন্ত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা পাওয়া সম্ভব, সেক্ষেত্রে দু'জনকে পাওয়া গেলে সেই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ব্যবহারের স্তরকে বাড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া দু'জনের মধ্যে একজন অসুস্থ হলে, কাজে ঘাটতি না রেখে, সাথে সাথে আর একজনকে দিয়ে তা' পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। তাছাড়া কোন সময়ে কাজের পরিমাণ ও চাপ যদি বেড়ে যায় তবে দু'জনকেই একসাথে কাজে লাগানো যাচ্ছে। আমেরিকার একটি কোম্পানি কর্তৃক উদ্ভাবিত এই জব-শেয়ারিং প্রথার দ্বারা কমানো যাচ্ছে 'অ্যাবসেন্টিজম' বা শ্রমিক অনুপস্থিতি-জনিত সমস্যা। জব-শেয়ারিং-এর দ্বারা অ্যাবসেন্টিজম ৫.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১.২ শতাংশ করা সম্ভব হয়েছে। জব-

শেয়ারিং ব্যবস্থা চালু হবার পূর্বে শিল্পের ব্যবস্থাপকদের বাড়তি কর্মী রাখতে হতো শ্রমিকের সংখ্যাগত ঘাটতির যে কোন আকস্মিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য। এতে উৎপাদনের খরচ বেশি হতো এবং শিল্পের মোট শ্রমশক্তি কিছুটা অলস পড়ে থাকতো। জব-শেয়ারিং ব্যবস্থা চালু হবার পর তার আর দরকার হচ্ছে না।

এই ব্যবস্থাতে জব-শেয়ারার বা কাজ ভাগাভাগি-করিয়েদের নিজেদের পার্টনার বা সঙ্গী সংগ্রহ করতে হয়। একের অনুপস্থিতি পূরণ করে দিতে হয় অপরকে। তাদের উভয়কে কাজ করতে হয় বছরের আধা-আধি। প্রয়োজন দেখা দিলে বাড়তি ঘন্টার কাজও তাদের কাছে বাধ্যতামূলক। প্রথম দিকে ফুল টাইম প্রোডাকশন লাইনের বা নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্তদের মধ্য থেকে কাজের ভাগাভাগি প্রথা চালু হয়েছিল। এখন শিল্প ছাড়াও ক্ল্যারিকাল বা করণিকের কাজ, নার্সিং সার্ভিস প্রভৃতিতেও জব-শেয়ারিং চালু হয়েছে।

'ফ্লেক্সি-টাইম' (ফ্লেক্সিবল টাইম) বা নমনীয় সময় ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্মীর অধিকার থাকে তার নিজের সুবিধামত প্রত্যহ কাজের শুরু ও শেষ ঠিক করার। পূর্বে 'ফ্লেক্সি-টাইম' কর্মীকে দিনের মধ্য-ভাগে 'কোর টাইম'-এ উপস্থিত হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক, কেননা সেই সময়ে ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কর্মীদের সাথে যথোপযুক্ত যোগাযোগ করা ছাড়াও কাজ বুঝে নেবার বাধ্যতা ছিল। কিন্তু এখন সেক্ষেত্রেও নমনীয়তা আনা হয়েছে। কতকগুলি ধরনের কর্মীদের ক্ষেত্রে 'কোর টাইম'-এ কাজে আসা এখন আর বাধ্যতামূলক নয়। কোন কোন শিল্পে শ্রমিককে নিজের কাজের সময়ও নিজেকে নির্ধারণ করে নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, যদিও এইসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ফ্লেক্সি-টাইম ওয়ার্কারকে সপ্তাহে ৩০ থেকে ৪০ ঘন্টার কাজের পরিকল্পনা তৈরি করে নিতে বলে। কোর টাইম ব্যবস্থা না থাকলেও সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করা আবশ্যিক রয়েছে। এই শ্রমিকরা তাদের কাজের সময় কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিয়ে কাজ করতে পারে। বাড়তি কাজের সময়টুকু 'টাইম অ্যাকাউন্টে' জমা থাকে। তবে কাজে ঘাটতি বা নির্ধারিত চেয়ে কম সময় অ্যাকাউন্টে বকেয়া হিসাবে দেখানো যায় না, কিন্তু বাড়তি কাজ করে টাইম অ্যাকাউন্টে সময় জমিয়ে একজন শ্রমিক সপ্তাহ এমনকি মাসাধিক কাল পর্যন্ত ছুটি ভোগ করতে পারে।

কমপ্রেসড ওয়ার্ক-উইক বা সংকুচিত কর্ম-সপ্তাহ ব্যবস্থার সাধারণ রূপগুলি হলো :

(ক) দৈনন্দিন ৯ বা ১০ ঘন্টার চার দিনের সপ্তাহ,

(খ) দৈনন্দিন ১২ ঘন্টার তিন দিনের সপ্তাহ,

(গ) একটি চার দিনের সপ্তাহের পর একটি তিন দিনের সপ্তাহ। এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বা পালা করে ব্যবস্থা।

সংকুচিত কর্ম-সপ্তাহ ব্যবস্থাতে কর্ম-দিবসের কাজের সময় দীর্ঘতম হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের সমস্যা এড়ানো এবং সপ্তাহে বেশি পূর্ণ ছুটির দিন পাওয়াতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুবিধা ঘটে। এই প্রথায় প্রতিষ্ঠানের কর্মীর সংখ্যা অনেক কম হওয়া এবং ভোক্তাকে দীর্ঘ সময়ের সুযোগ দেবার ফলে ব্যবসাতে সাফল্য প্রভৃতি ঘটলেও, পূর্বোক্ত ফ্লেক্সিবল বিকল্প ব্যবস্থাগুলির মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা ব্যর্থ। এর অন্তর্নিহিত সমস্যা হলো দীর্ঘ সময় কাজের ফলে কর্মীরা হাঁপিয়ে পড়ে এবং কাজের শেষের দিকে কর্মীর উৎপাদনশীলতার অধোগতি ঘটে।

আওয়ারস অ্যাভারেজিং বা সময়ের গড়পরতা কাজ করার ব্যবস্থার তাৎপর্য হলো সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের দৈনিক, সপ্তাহে, মাসে, এমনকি বছরে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বাধ্যতামূলক শ্রম-ঘন্টার কাজ। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্যের দৈনিক বা মরসুম-ভিত্তিক ওঠা-নামার চাহিদার যোগানকে অব্যাহত রাখার জন্য কর্মীর দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক কর্ম-সময়ের হেরফের করা এই ব্যবস্থার আর এক দিক। এই ধরনের কাজে গড়ে সপ্তাহে ৪০ ঘন্টার কাজ ধরে সর্বনিম্ন ৩৫ ও সর্বোচ্চ ৪৫ ঘন্টার কাজ করতে হয়। শ্রমিকের কাজের সময়ে ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত ঘাটতি ও ২০ ঘন্টা পর্যন্ত বাড়তির হিসাব রাখা হয়। সঞ্চিত সময়ের বিনিময়ে ছুটি অথবা বেতন এবং ঘাটতি সময়ের জন্য বেতন কাটার ব্যবস্থা চালু

আছে। তাছাড়া আওয়ারস অ্যাভারেজিং ব্যবস্থায় ওভারটাইমও হয়। চাহিদা বৃদ্ধি বা অ্যাবসেন্টিজমের জন্য প্রতিষ্ঠানের বাড়তি কর্মী বা সাময়িক কর্মী রাখার প্রয়োজন দেখা দেয় না। কিন্তু এই ব্যবস্থাতে মালিকদের কর্তৃত্ব অবাধ এ'কারণে যে, ফ্লেক্সিবল টাইমের সুযোগ দেবার নাম করে কার্যত মালিকের প্রয়োজনে কম বা বেশি কাজ করতে হয় শ্রমিককে। ফলে বিকল্প কোন কাজের জন্য সময় বের করা অনিশ্চিত থাকে শ্রমিকের কাছে;অনেক সময় চাহিদা কমের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ কম করার জন্য মজুরিও কমে যায় শ্রমিকের।

বহুকাল পূর্ব থেকে, কারখানার এক প্রস্থ যন্ত্রপাতি দিয়ে, শ্রমিকদের দৈনিক ৮ ঘন্টা বা ১২ ঘন্টার কাজের ব্যবস্থা করে, দু'টি বা তিনটি শিফ্‌টে বা পালায় উৎপন্নের যোগান অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা ছিল। তবে এই ব্যবস্থাতে উৎপাদনের জন্য শ্রমের ব্যয়ের অংশ পুঁজিবাদ কমাতে পারেনি সাধারণভাবে। কেননা প্রতি শিফ্‌টের জন্যই স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করতে হতো। কিন্তু এখন শিফ্‌ট ও ফ্লেক্সি-টাইম ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। বাহ্যত শ্রমিকদের সুবিধা দেবার নামে নাইট শিফ্‌ট বা রাত্রিকালীন কাজের পালার সময় কমানো, পালার কাজে শ্রমিকের গ্রুপ বা দলকে পর্যায়ক্রমে বদল করা, শুক্রবার দিন তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দেওয়া যাতে শ্রমিক শনি ও রবিবারের ছুটির দিন কাজ করার জন্য মানসিক ও দৈহিক পূর্ব-প্রস্তুতি নিতে পারে প্রভৃতি নতুন উপাদান যুক্ত করা হয়েছে। সুইডেনে আধুনিক শিফ্‌ট প্রথা নিয়ে সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত পরীক্ষা ঘটেছে। শিফ্‌ট ব্যবস্থার মধ্যে সেখানে ১০ ধরনের ফ্লেক্সি-টাইমের বিভিন্ন রূপ যুক্ত হয়েছে। শিফ্‌ট ব্যবস্থার মধ্যে একই সাথে রয়েছে ফুল টাইম বা সর্বক্ষণের কর্মী এবং পার্ট-টাইম বা আংশিক সময়ের কর্মী। কিন্তু কেবলমাত্র রাত্রিবেলার পালার জন্য পার্ট-টাইম, ফ্লেক্সি-টাইম, উইক-এণ্ড বা সপ্তাহ শেষের কর্মী প্রভৃতি প্রথার নিয়োগ হয়।

পার্ট-টাইম ওয়ার্ক বা আংশিক সময়ের কাজের ব্যবস্থা সুদীর্ঘকাল আগে থেকে প্রচলিত থাকলেও, এখন ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ফ্লেক্সি-টাইম ব্যবস্থার অন্যতম অংশ হিসাবে। এই ধরনের ব্যবস্থার শ্রমিকের নিয়োগের চরিত্র, চাকুরীর নিরাপত্তা, মালিকের দায়িত্ব ও শ্রম-শোষণের উপাদানগুলির পরিবর্তন, নতুন বিশ্বায়নের ও কাঠামোগত সংস্কারের অভিন্ন অংশ হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি অভিন্ন অংশ হয়ে উঠেছে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার। স্বভাবতই এই ব্যবস্থা শ্রমিকের কাছে দুঃসহ। এই ব্যবস্থায় শ্রমিক তার গৃহস্থালি ও অন্য কাজে অনেক বেশি মনোনিবেশ ও সময় দিতে পারে বলে প্রচার সর্বৈব মিথ্যা। আসলে শ্রমিকের পক্ষে এই ব্যবস্থা যে দারুণ অনিশ্চিত ক্লেশকর তা' বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যাপক বেকারীর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম-বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ নিয়ে মালিকশ্রেণী এই ধরনের ব্যবস্থা বেশি বেশি প্রয়োগ করতে পারছে। ফলে শ্রমিকরা বাধ্য হচ্ছে দুর্বল অবস্থান থেকে দর-কষাকষি করতে। তাই দেখা যায় বেসরকারীকরণের পর খরচ কমানোর প্রচেষ্টা হয় পার্ট-টাইমে নিয়োগ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তীব্রতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেও এই ব্যবস্থা বর্ধিত মাত্রা পাচ্ছে। তাছাড়া শিল্পের চরিত্রেও গুরুতর পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটছে। বড় বড় ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার পরিবর্তে ছোট ছোট অত্যাধুনিক কারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলি বেশি বেশি করে পার্ট-টাইম কর্মী নিয়োগ করছে। বিশেষত এই ধরনের নিয়োগ বাড়ছে সার্ভিস সেক্টর বা পরিষেবা ক্ষেত্রে। নিয়োগ কাঠামোর এই চরিত্র-ভিত্তিক কিছু কিছু কারখানাকে বলা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল ফার্ম বা ফ্লেক্সি-ফার্ম। এই সব কারখানার কেন্দ্রে বা মুল শক্তি হিসাবে নিয়োজিত থাকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য স্থায়ী কিছু শ্রমিক। তাদের ঘিরে নিয়োগ করা হয় অস্থায়ী শ্রমিকদের—পার্ট-টাইম ওয়ার্কার্স, আউট ওয়ার্কার্স, সাব কন্ট্রাক্টিং ওয়ার্কার্স প্রভৃতি। উৎপাদনের পরিমাণের হেরফেরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিসীমাতে নিযুক্ত অস্থায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা, কাজের সময় ও চরিত্র নির্ণয় করে নেওয়া হয়। কাজের চরিত্র যেখানে পরিদর্শক স্তরের নয়, সেখানে পার্ট-টাইম কাজে শ্রমিক নিয়োগ সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। অবশ্য এখন ম্যানেজমেন্ট স্তরেও পার্ট-টাইম নিয়োগ আমেরিকাতে শুরু হয়েছে।

আশির দশকে অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশে পার্ট-টাইম ওয়ার্কার্সের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত ১০টি দেশে সর্বক্ষণের কর্মী নিয়োগের

সংখ্যা যেখানে ২.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেখানে পার্ট-টাইম কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ শতাংশ হারে। ১৯৮৯ সালে ইউরোপীয়ান কমিউনিটিভুক্ত দেশগুলির শিল্পসংস্থাতে পার্ট-টাইম কর্মীর সংখ্যা ছিল ৫.৭ শতাংশ, আর পরিষেবা ক্ষেত্রে ছিল ১৭.৫ শতাংশ। পার্ট-টাইম ওয়ার্কারদের বেতন সর্বত্রই কম। যে সময় ধরে তারা কাজ করে সেই ঘন্টা-অনুপাতে বা সর্বক্ষণের কর্মীদের তুলনায় তাদের কম মজুরি দেওয়া হয়। পার্ট-টাইম ওয়ার্কারদের মজুরি কম হওয়ার অন্যতম কারণ হলো যে তাদের প্রধানত সেইসব সেক্টর বা ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়, যেখানে সর্বক্ষণের কর্মীদের মজুরিও জাতীয় গড় মজুরির চেয়ে কম। তাছাড়া তাদের মজুরির পরিমাণ কম হয় আরও এই কারণে যে, তারা ওভারটাইম অ্যালাউন্স, ছুটির দিন ও অন্যান্য ভাতা পায় না। এই সমস্ত পার্ট-টাইম ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে টেম্পোরারি বা ফিক্সড-টার্ম কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থা। আশির দশকে ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যাণ্ডস, লুক্সেমবার্গ, স্পেন প্রভৃতি দেশে যে পরিমাণ নতুন নিয়োগ হয়েছে, তার অর্ধেকই এই ব্যবস্থায়। তাছাড়া রয়েছে এজেন্সির মাধ্যমে কাজ।

উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া এবং বিশ্বায়নের তৎপরতার অভ্যন্তরে ফ্লেক্সি-প্লেস বা ওয়ার্ক অ্যাট হোম এক নতুন ধরনের ব্যবস্থা। এ' হলো হোম-ওয়ার্কিং বা বাড়িতে বসে উৎপাদনের কাজ অর্থাৎ নিজের বাড়িতে বসে নিয়োগকারীর জন্য উৎপাদন করে শ্রমিক। 'কমিউনিকেশন অ্যাণ্ড ইনফরমেশন প্রসেসিং টেকনোলজি'-এর সাহায্যে 'ইলেকট্রনিকালি মিডিয়েটেড হোম ওয়ার্ক' তথা বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাড়িতে বসে উৎপাদন করে শ্রমিক। গৃহ-ভিত্তিক উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রনিক কটেজ। বর্তমানকালে এই বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিশেষত, ইলেকট্রনিকালি মিডিয়েটেড নতুন প্রযুক্তির দ্বারা বাড়ীতে বসে একক শ্রম করার মধ্যে দিয়ে সমবেত শ্রম (কারখানার শ্রম) বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কি না তথা প্রথাগত ফ্যাক্টরি ওয়ার্কের অবসান ঘটাতে চলেছে কি না, সেবিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ জিজ্ঞাসা ইতোমধ্যেই উত্থাপিত হয়েছে।

নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কেন্দ্রীভূত কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে করে তুলছে বিকেন্দ্রীকৃত। অতীতে দূরবর্তী স্থানে উৎপাদনের বা নির্মাণের কাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, নির্দেশ দেওয়া, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদিতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ঘটতো, বর্তমানে কমপিউটারাইজড ইনফরমেশন সিস্টেমের সাহায্যে তার অবসান হয়েছে অনেকটাই। এইভাবে ব্যবধানগত সমস্যার সমাধান হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

তবে হোম-ওয়ার্কের ধারণা শিল্প উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সাথে কেবলমাত্র জড়িত নয়, অনেক বিস্তৃত পরিসর জুড়ে এটির দ্রুত প্রসার ঘটছে। কেননা, ক্ল্যারিকাল ধরনের কাজ, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং দূরবর্তী স্থানে বা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ ইত্যাদি এখন হোম-ওয়ার্কের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে শুরু করেছে। তাছাড়া, শিল্পগত উৎপাদনের একাংশ হোম-ওয়ার্কাররা নিম্ন মজুরির, আংশিক সময়ের এবং সামাজিক ও শ্রম-নিরাপত্তাহীন কর্মী;আবার অপর এক অংশ রয়েছে যারা উচ্চ মজুরির ও অতি-দক্ষ শ্রমিক। পাশাপাশি এই পদ্ধতিতে সাংস্কৃতিক কর্মী, প্রযুক্তিগত পেশাদার (যেমন ইঞ্জিনীয়ার বা কমপিউটার পেশাদার), ব্যবসা-বিষয়ক পরামর্শদাতা ও অন্যান্য আরও কিছু অংশ তাদের নিজেদের কর্ম-ব্যবস্থার দিকগুলি বজায় রেখেও বাড়িতে বসে সমগ্র কর্মের বহু দিক, পেশাদারীভাবেই করতে পারছে। হোম-ওয়ার্ক সংক্রান্ত গবেষণাতে ফিজাকলিয়া ও ওলকোউইজ দেখিয়েছেন যে শেষোক্ত ধরনের পেশাদাররা কাজ ও 'ক্যারিয়ারে'র মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার পরিবর্তে, স্থান-স্থানান্তরে ভ্রমণ ও সেকারণে সময়ের ব্যয়কে সংক্ষেপ করে পরিবারে সন্তান-সন্ততিদের সাথে অতীতের তুলনায় বেশি সময় কাটাবার সুযোগ নিচ্ছে বাড়িতে বসে কাজের মাধ্যমে এবং তা' তারা করছে কাজের সন্তুষ্টি, উচ্চ উপার্জ্জন ও উন্নত স্তরের স্বাধিকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এইভাবে হোম-ওয়ার্কের মধ্যে এক ধরনের 'ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক'-এর উপাদান গড়ে উঠছে। এটাও দাবী করা হচ্ছে যে প্রযুক্তির সাহায্যে সৃষ্ট হোম-ওয়ার্ক ব্যবস্থা কায়িক বা মস্তিষ্ক শ্রমের সামনে এক ধরনের আকাঙ্ক্ষিত বিকল্প

কর্ম-ব্যবস্থা। তবে পূর্বোক্ত অংশের বাইরে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ যে অংশ এই ধরনের কাজে যুক্ত, তারা সাধারণ অংশের শ্রমজীবী। তাদের সুযোগের অবস্থা প্রথমোক্তদের ধারে-কাছেও নয়।

এই ধরনের কাজ ক্রমাগতই বাড়ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, কেননা মালিকরা শ্রমের খরচ কমানোর জন্য ফ্লেক্সিবিলিটির পথ বেশি করে নিচ্ছে। তবে এই ধরনের কাজে যুক্ত মানুষের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন, যেহেতু এইসব কাজ অনেক সময় হয় অঘোষিতভাবে। সরকারী শ্রম-আইনের বাধ্যবাধকতা এড়ানো ও শ্রমশক্তির তীব্র শোষণের জন্যই এই পথ নেওয়া হয়। আই. এল. ও. ১৫০টি দেশে সমীক্ষা করে দেখেছে যে মাত্র ১৮টি দেশে সুনির্দিষ্ট হোম-ওয়ার্ক আইন রয়েছে, আর হোম-ওয়ার্কের বিষয়ে সামান্য সংস্থান আছে মাত্র ১৭টি দেশের শ্রম-আইনে। তাছাড়া মালিক-শ্রমিকের কালেকটিভ বার্গেনিং বা যৌথ দর-কষাকষি ব্যবস্থা এবং চুক্তিতে কদাচিৎ হোম-ওয়ার্ক শ্রমিকদের প্রসঙ্গের সংযুক্তি ঘটে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি অতীতে সঙ্গতকারণে ওয়ার্ক অ্যাট হোম ব্যবস্থার বিরোধিতা ও বিলোপ চাইতো। কিন্তু সত্য হলো যে টি.ইউ.গুলি অধিকাংশ দেশেই এই জাতীয় শ্রমিকদের তেমনভাবে অতীতে সংগঠিত করেনি। বর্তমানে পরিস্থিতির বাধ্যতার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি দাবী করছে যে হোম-ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রেও সমস্ত ধরনের শ্রম-আইন প্রযুক্ত করতে হবে। তবে কোন সুনির্দিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল লেবার স্ট্যাণ্ডার্ড বা আন্তর্জাতিক শ্রম-মানক হোম-ওয়ার্কারদের জন্য এখনও পর্যন্ত নেই। এতেই বোঝা যায় যে এই ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দুরবস্থার বিষয়ে দৃষ্টিদানে মনোযোগিতা কোন স্তরে রয়েছে।

অধিকাংশ হোম-ওয়ার্ক শ্রমিকরা প্রধানত কাজ করেন বস্ত্র, সুতি ও অন্যান্য শ্রম-নিবিড় প্রতিষ্ঠানে, কেননা এইসব শিল্পের কাজগুলিকে ফ্র্যাগমেন্ট বা খণ্ড খণ্ড বা ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। অতি সাধারণ দক্ষতার দরকার হয় এইসব কাজে। তবে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে হোম-ওয়ার্ক বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হচ্ছে পরিষেবা ক্ষেত্রে—যেমন করণিকের কাজ, লন্ড্রি বা ধোলাইখানা, ক্যাটারিং বা প্রস্তুত-খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতিতে।

কাউন্সিল অব ইউরোপের সমীক্ষা অনুযায়ী সেটির অন্তর্ভুক্ত ১৫টি সদস্য দেশে হোম-ওয়ার্কারের সংখ্যা ২০ লক্ষাধিক, জাপানে ১০ লক্ষ, ফিলিপাইনে ৫ লক্ষ, ভারতে (বিড়ি শিল্পে) ২০ লক্ষ, জাভাতে (ইন্দোনেশিয়া) ২০ লক্ষ প্রভৃতি।

হোম-ওয়ার্কারদের প্রধান সমস্যা হলো কম মজুরি। দিল্লী-উপকণ্ঠের পোষাক শিল্পে অনুরূপ শ্রমিকরা পীস-রেট হিসাবে যে মজুরি অর্জন করে তা' ন্যূনতম মজুরির অর্ধেক। নেদারল্যাণ্ডস ও ব্রাজিলে পোষাক শিল্পের অনুরূপ শ্রমিকরা শিল্প শ্রমিকদের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ মজুরি পায়। বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থান করার জন্য ইউনিয়নে তেমন সংগঠিত নয় এরা; স্বভাবতই শোষণের তীব্রতা এখানে বেশি। তাছাড়া এর কাজ পায় দালাল, কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর প্রভৃতির মাধ্যমে—যারা মালিক ও শ্রমিকদের মাঝখানে থেকে টাকা কামিয়ে নেয় দালালির দ্বারা। হোম-ওয়ার্কারদের কাজের সময়ের কোন স্থিরতা নেই এবং তাদের কাজ করতে হয় দীর্ঘ সময়। তারা এবং তাদের পরিবারের মানুষেরা দাহ্য ও অন্যান্য ঝুঁকি-সম্বলিত সামগ্রী নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কাজ হারাবার ভয়ে তারা কখনো প্রতিবাদ করতে পারে না।

সময় ও কাজের কাঠামো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা মালিকশ্রেণীর স্বার্থে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। শ্রমিকরা এগুলি মানতে বা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে চাকুরী হারাবার ভয়ে। পরিবারের ও শ্রমিকের ব্যক্তিগত সুবিধার নামে ও শ্রমিকের চয়েজ বা নির্বাচন বলে এই ধরনের সময় ও কর্মের কাঠামোকে প্রচার করা হলেও এগুলির ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে প্রতিষ্ঠানই কাজের সময় কার্যত ঠিক করে দেয়। তাছাড়া অবিন্যস্ত সময়ে কাজের জন্য শ্রমিক একদিকে যেমন সামাজিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অন্যদিকে পরিবার, সন্তান-সন্ততিদের সময়ের প্রয়োজনের সাথেও সঙ্গতি রাখতে পারে না। শ্রমিকের দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়ার সময় ও সুযোগ অগোছালো হয়ে পড়ে। যে পরিবারে একাধিক মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ফ্লেক্সি-টাইম ও শিফ্‌টে কাজ করে, সেই পরিবারে সমস্যা আরও

বেশি। ফ্লেক্সি-শিফ্‌টে কাজ করা মানুষরা আত্মীয়-পরিজনদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। ফলে অবসর সময় তাদের সাধারণত একাই কাটাতে হয়। যাতায়াতে যানবাহনের সমস্যা, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারীদের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে। ফ্লেক্সি-টাইমকে শ্রমিকের স্বার্থের উপযুক্ত করার জন্য আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়নে এখন ধীরে ধীরে পাল্লা ভারী করছে। তবে ব্যাপক বেকারী ও ছাঁটাই-এর আশঙ্কার ফলে ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থান স্বভাবতই রয়েছে রক্ষণাত্মক স্তরে।

কাঠামোগতভাবে শ্রম-ব্যবস্থাপনার এই পরিবর্তন প্রয়াস সংশ্লিষ্ট দেশ ও এলাকার সাংস্কৃতিক চরিত্র ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর প্রভাব ফেলছে। কেননা কাজের সুযোগ ক্রমাগত সঙ্কুচিত হতে থাকার ফলে পরিবারের একজন মাত্র থাকছে কর্ম-নিযুক্তিতে। তাছাড়া পরিবারের গঠন ও চরিত্রেও নানা ধরনের প্রভাব ফেলছে। একদিকে বাধ্যতামূলক ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে শ্রমিকরা সন্তানের সংখ্যা কমাতে বাধ্য হচ্ছে, অন্যদিকে সিঙ্গল-পেরেন্ট ফ্যামিলি বা একজন অভিভাবকের পরিবারও বর্ধিষ্ণু। পরিবারগুলিতে ভাঙ্গন তথা বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্যতম কারণে ঘটছে সন্তানদের নিয়ে একক পিতা অথবা মাতার পরিবার। তাছাড়া বাড়ছে বিবাহহীন সন্তান নিয়ে মাতার পরিবারের প্রবণতা। এইভাবে ফ্লেক্সি-টাইম ব্যবস্থার সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সংঘাত ক্রমশ বেড়ে উঠছে। ট্রেড ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার এইসব পরোক্ষ পরিকল্পনা সংগোপনে জন্ম দিচ্ছে ভবিষ্যৎ সামাজিক সংঘাতের।

(খ) 'ডি-লোকেশনাইজেশন' বা উৎপাদন-কারখানার ভৌগোলিক অবস্থানের ফ্লেক্সিবিলিটি

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা পরিণত প্রতিষ্ঠান—মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন বা বহুজাতিক সংস্থার অন্যতম ও ক্রমবর্ধমান উপাদান হলো 'ডি-লোকেশনাইজেশন'। ডি-লোকেশনাইজেশন ব্যবস্থার তাৎপর্য হলো যন্ত্রযোগে উৎপাদনকে (ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাকশন) সমূলে অন্য এলাকায় বা দেশে ইচ্ছা ও প্রয়োজনমতো স্থানান্তরকরণ, বিশেষত সেইসব দেশে যেখানে শ্রমিক-মজুরি কম, কাঁচামাল ও বাজার ব্যাপক ও সুলভ এবং শ্রম-বিষয়ক আইন ও নিয়মকানুন নিম্ন-মানের। শিল্প ব্যবস্থাতে 'ডি-লোকেশনাইজেশন' পদ্ধতি বর্তমান স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের যেমন এক নতুন উপাদান, অন্যদিকে শ্রমিকদের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টির অন্যতম কারণ। নতুন কিন্তু মর্মের দিক থেকে এই ব্যবস্থা হলো প্রোডাকশন-প্রসেসে এক অভিনব সংযোজন। এম. এন. সি.-র অধীন একটি চালু কারখানাকে সরাসরি বন্ধ করে দিয়ে অন্য দেশে সেই কারখানা নতুন করে পত্তন করায়, পূর্বতন দেশের ঐ কারখানার সমস্ত শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। কারখানা বন্ধের এই জাতীয় ঘটনা শিল্পের লোকসানের জন্য সাধারণত ঘটছে না, ঘটছে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি বৃদ্ধি করে বৃহত্তর লাভ অর্জনের জন্য। কোন কোন ক্ষেত্রে কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এই অজুহাতে যে, সেগুলির যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন প্রণালী প্রাচীন ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তবে এটি ঠিক নয়। কেননা, এটা কারণ হলে নিজ দেশেই সেইসব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণের প্রশ্নটাই প্রধান হতো, অন্য দেশে কারখানা সরিয়ে নেবার প্রশ্ন আসতো না।

এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে ডি-লোকেশনাইজেশন ডিবেট—শ্রমিকশ্রেণী, ট্রেড ইউনিয়ন, জনসাধারণ, জাতীয়তাবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। এ বিষয়ে তত্ত্বগত বিতর্ক ফ্রান্সে সর্বাধিক, কেননা সেখানে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তরকালের সর্বাপেক্ষা কঠিন মন্দা চলছে। আমেরিকাতে ডি-লোকেশনাইজেশন নিয়ে প্রধান বিরোধ তুলেছে সেখানকার বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন 'এ. এফ. এল.-সি. আই. ও.'।

ডি-লোকেশনাইজেশন সমস্যা নিয়ে ফ্রান্সের পার্লামেন্টের বেশ কয়েকটি স্পেশাল কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে। সেনেটার জাঁ অর্থুইজ তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন 'রি-লোকেশনাইজেশন' (ডি-লোকেশনাইজেশনকে বিপরীত দিকে থেকে বোঝানো হয়েছে) ও বেকারীর মধ্যে গভীর সম্পর্ককে। তিনি উৎপাদনের ডি-লোকেশনাইজেশনের ফলে ক্রমবর্ধমান হারে ও পরিমাণে কাজ হারানোর "উদ্বেগজনক পরিস্থিতি"র ব্যাখ্যা করে কেবলমাত্র ফ্রান্সেই ১০ লক্ষাধিক মানুষের কাজ হারানোর হিসাব দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন ফ্রান্সে কর্মহানির পেছনে তিনটি উপাদান কার্যকরী রয়েছে এবং যা চেন-রিয়্যাকশন তথা শিকল-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে : (ক) কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের শিল্পের (যথা বস্ত্র, ইলেকট্রনিকস ও

যেলনা) প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা কোম্পানিগুলিকে তাদের 'ডাউনস্ট্রীম' ও 'আপস্ট্রীম' স্তরের কাজগুলিকে নিম্ন-ব্যয়ের দেশে অপসারণে উদ্যোগী করছে। (খ) চীন, মাদাগাস্কার, মরিশাস, তাইওয়ান এবং মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপের দেশসমূহ, যারা আন্তর্জাতিক ব্যবসাকে স্বদেশে অবাধ করেছে বা করছে, সেইসব দেশ হয়ে উঠছে রি-লোকেশনের অতিরিক্ত ও শক্তিশালী এলাকা। (গ) দেশের মন্দা ও উৎপাদনের ব্যয় কমাতে কোম্পানিগুলিকে বাধ্য করছে উৎপাদনের বিভিন্ন অংশকে নিম্ন-ব্যয়ের দেশে প্রেরণ করতে। রিপোর্টটি চিহ্নিত করেছে তিনটি ধারার উৎপাদনকে—চিরাচরিত ভোগ্যপণ্য, পরিষেবা ও ইনট্যানজিবল বা প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক প্রয়োজনভুক্ত নয় (যেমন মাইক্রোচিপস, কালার টিউব ইত্যাদি) এমন সমস্ত সামগ্রী। এর মধ্যে শেষোক্ত ধরনের সামগ্রীর উৎপাদন দিয়ে ডি-লোকেশনাইজেশনের সূত্রপাত ঘটলেও, অন্যগুলিতেও তা' চালু হচ্ছে।

তবে এটা ঘটনা যে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের (এফ. ডি. আই.) মধ্যে রি-লোকেশনাই-জেশনের জন্য ইনভেস্টমেন্ট এখনও যৎসামান্য। এর অর্থ হলো রি-লোকেশনের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল কাজে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিবর্তে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগই এখনও সাধারণত বেশি। রি-লোকেশনাইজেশনের ফলে যেখানে নতুন কারখানা ও উৎপাদন হচ্ছে, সেইসব দেশ কিছুটা লাভবান হচ্ছে বলে যে দাবী করা হচ্ছে তাও বা কতটা ঠিক? যে দেশগুলি থেকে কারখানা উঠে যাচ্ছে সেখানে যত সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, রি-লোকেশনাইজড নতুন কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কখনোই তার এক-চতুর্থাংশের বেশী নয়। সুতরাং এই রি-লোকেশনাইজেশনের ব্যবস্থাও সর্বদা সর্বমোট শ্রমিক-সংখ্যা কমাচ্ছে; দ্বিতীয়ত, উঠে যাওয়া কারখানার দেশে শ্রমিকদের দুর্গতি ও দুর্দশা চরম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু নতুন দেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিকল্প কারখানার শ্রমিকরা পূর্বতন দেশের শ্রমিকদের তুলনায় যৎসামান্য মজুরি পাচ্ছেন; তৃতীয় দুনিয়ায় ডি-লোকেশনাইজড কারখানার শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় মজুরির চাইতে কম মজুরি পান অথবা তাদের বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয়; তৃতীয়ত, বহুজাতিক সংস্থাগুলি তৃতীয় দুনিয়ার সরকার বা আইন-কানুনের কোন তোয়াক্কা করে না। ফলে শ্রমিকদের উপর শ্রম-শক্তি শোষণ তীব্র; তাছাড়া শ্রমিকদের কোন ট্রেড ইউনিয়নে সাধারণভাবে যোগ দিতে দেওয়া হয় না, অন্যদিকে কারখানার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। শ্রমিকরা আন্দোলন বা চাপ সৃষ্টি করলে এম. এন. সি.গুলি পুঁজি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার হুমকি দিয়ে সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের বাধ্য করে নিজেদের সিদ্ধান্তই বহাল রাখতে। চতুর্থত, ডি-লোকেশনাইজেশন ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর এক দেশের অংশকে অন্য দেশের শ্রমিক অংশের প্রতি বিরূপ করে তোলে। যদিও বাস্তব দিক থেকে কারখানা-স্থানান্তরের সিদ্ধান্তে রি-লোকেশনাইজড দেশের শ্রমিকদের কোন ভূমিকাই নেই, তথাপি প্রাক্তন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব বাস্তব।

(গ) কারখানা ছাড়া উৎপাদন

মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির মধ্যে যেগুলি ম্যানুফ্যাকচারিং বা যন্ত্র দ্বারা উৎপাদন করে থাকে তাদের একাংশ পণ্যসমূহের বাস্তব উৎপাদনকে গবেষণা ও উন্নয়ন (রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট) থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে স্বতন্ত্র করে নিচ্ছে। আর. অ্যাণ্ড ডি. প্রসঙ্গে পূর্বের আলোচনার সাথে এই বক্তব্যকে বিরোধী বলে মনে হলেও, এটা এক ধরনের বাস্তব। সমগ্র উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে একই সাথে আধুনিকতা ও পশ্চাৎপদতার সংমিশ্রণ বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। কারখানা ছাড়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে দু'টি বিপরীত পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদন হচ্ছে। প্রথম ক্ষেত্র অর্থাৎ পণ্যসমূহের বাস্তব উৎপাদনের জন্য এক নিবিড় জালের দ্বারা বিস্তৃত ও গঠিত (একই সাথে তাদের কাজকর্মে নজরদারির ব্যবস্থা-সম্পন্ন) স্বাধীন সরবরাহকারীদের উপর নির্ভর করা হচ্ছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি অর্থাৎ গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ নিজ উদ্যোগে করা হচ্ছে। সাব-কন্ট্রাক্টরদের দ্বারা এই ধরনের উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রথমে পোশাক ও জুতা তৈরির শিল্পে শুরু হলেও, এই ব্যবস্থা এখন প্রসারিত হচ্ছে যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদনের অন্যান্য শিল্পে ও পরিষেবাতেও। সাব-কন্ট্রাক্টরদের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করা হয় 'ওয়ার্কিং ফর ম্যানুফ্যাকচারার্স উইদাউট ফ্যাক্টরি' অর্থাৎ যন্ত্র দ্বারা উৎপাদনকারীদের স্বার্থে বিনা-কারখানাতে উৎপাদন।

এই নতুন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান দিকগুলি হলো উন্নত দেশে প্রধান প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান হলেও, তাদের উৎপাদনের সাব-কন্ট্রাক্টররা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে থাকে। এই সাব-কন্ট্রাক্টরদের মধ্যে যারা প্রধান কাজ করে এবং যেগুলি 'এশিয়ান টাইগার' গ্রুপের অন্তর্গত (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপিনস, হংকং প্রভৃতি) তারা আবার বাড়তি সুযোগ ও মুনাফার জন্য নিজেদের কাজকে ডি-লোকেশনাইজেশন করে অন্য অনুন্নত দেশে উৎপাদন করছে। উৎপাদনের সমগ্র কাজের বিভাজনের ক্ষেত্রে (ডিভিশন অব লেবার) মূল প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত করে থাকে ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, মেটেরিয়াল টেস্টিং, প্রোডাকশন অ্যাণ্ড কনস্ট্রাকশন ডিজাইন, সার্ভিস পার্ট অব দা প্রোডাকশন-প্রসেস, মার্কেট অ্যানালিসিস, ডাটা প্রসেসিং, মার্কেটিং, স্টক ম্যানেজমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশন, ট্রান্সপোর্ট অ্যাণ্ড সেলস টু কনজিউমারস, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রভৃতি। কমপিউটার নেটওয়ার্ক সার্ভিসের দ্বারা সমস্ত সাব-কন্ট্রাক্টরদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে মূল প্রতিষ্ঠানটি।

মূল প্রতিষ্ঠানটিতে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের সংখ্যা যৎসামান্য—যারা প্রধানত প্রফেশনাল বা পেশাদার যেমন, ম্যানেজার, ইকনমিস্ট, ফ্যাকাল্টি এক্সপার্ট, ইঞ্জিনীয়ার, প্ল্যানার অ্যাণ্ড ডিজাইনার, স্ট্যাটিস্টিসিয়ান, কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজার প্রভৃতি। স্বভাবতই এই অংশ প্রায় সর্বাংশেই শিক্ষিত, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ অংশ এবং উচ্চ বেতন ও সুবিধাভোগী এবং সাধারণভাবে স্থায়ী চাকুরিয়া। কিন্তু সাব-কন্ট্রাক্টরের অধীনে কর্মরতরা সবাই পেশাদার শ্রমিক, নিম্ন-বেতনভোগী এবং প্রায় সর্বাংশে অস্থায়ী। ক্ষেত্র বিশেষে শ্রমিকরা পীস-রেটে কাজ করে মজুরি পায়। আরও লক্ষণীয় হলো মূল প্রতিষ্ঠানে যত মানুষ কাজ করে, সাব-কন্ট্রাক্টরের অধীনে কাজ করে তার থেকে দশ গুণ থেকে পঞ্চাশ গুণ সংখ্যক শ্রমিক। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদনের ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত সাব-কন্ট্রাক্টরের দ্বারা সংঘটিত হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সাব-কন্ট্রাক্টররা ছড়িয়ে আছে ৭০টি সংখ্যক পর্যন্ত দেশে, সেগুলির মধ্যে নিরঙ্কুশ হলো তৃতীয় দুনিয়ার দেশ। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের বছরে ৮ বিলিয়ন ডলার টার্ন-ওভার হলেও এটির সংগঠিত ও স্থায়ী অংশের কর্মজীবীরা সংখ্যায় অবিশ্বাস্য ধরনের কম, অথচ এটির সাব-কন্ট্রাক্টিং ব্যবস্থা কার্যত এক ধরনের আন-অরগানাইজড বা অসংগঠিত স্তরের উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং শ্রম-নিবিড়। কোন কোন ক্ষেত্রে মূল সংগঠনের কর্মজীবীর তুলনায় সাব-কন্ট্রাক্টরদের অধীন মজুরদের মজুরি ২০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। অথচ সাব-কন্ট্রাক্টরের শ্রমিকরাই কার্যকরী উৎপাদন করে থাকে। মার্কেটিং বা বাজারীকরণের স্তরে মিডলম্যান বা মধ্যস্তর প্রথা পুঁজিবাদে সুদীর্ঘকাল প্রচলিত থাকলেও শিল্পগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে মধ্য-প্রথা সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা চালু ছিল না। অতীতে বাজারীকরণে মধ্য-প্রথার বিভিন্ন স্তরে কিছু কিছু লাভ রাখার ফলে উৎপাদকের অভিপ্রেত লাভ থেকে ফারাক হয়ে যেতো; ভোক্তার কাছে পণ্যের দাম বেশীও পড়তো। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাতে পুরানো প্রথা সবটা উল্টে দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের স্তরে চালু হয়েছে মধ্য-প্রথা আর বাজারীকরণের স্তরে সরাসরি ব্যবস্থা। ফলে সব দিক থেকেই বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মূল উৎপাদকের লাভ। ফলে, বাজারীকরণের স্তরের মধ্য-ব্যবস্থায় অতীতে নিয়োজিত অংশ এই নতুন ধরনের শিল্প ব্যবস্থায় বাতিল হয়ে বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে উৎপাদনে মধ্য-প্রথা অবলম্বন করার পরও মূল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে শিল্প-কাঠামোর স্থায়ী চরিত্রের সংগঠিত শ্রমিক বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কারখানা ছাড়া উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় এসেছে তুলনামূলকভাবে কম মজুরির বিশাল অস্থায়ী চরিত্রের শ্রমিক—যাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ও চাকুরীগত সুযোগ-সুবিধার কোন সংস্থান নেই। তাছাড়া অজস্র দেশে ছড়িয়ে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য ও সংগঠন করার বাস্তবতা গড়ে না ওঠায় সাব-কন্ট্রাক্টর বা মালিকের সাথে দর-কষাকষি করাও শ্রমিকদের কাছে অবাস্তব পর্যায়ে রয়েছে।

(ঘ) নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ফলে লেবার মাইগ্রেশন বা শ্রমের দেশান্তর

বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের (মার্কেন্টাইল ক্যাপিটালিজম) কাল থেকেই অর্থাৎ তিনশ' বছর ধরে পুঁজি ও বাণিজ্যের বিশ্বায়নের চেষ্টা চলে আসছে। অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ইতিহাসে উপযুক্ত গুরুত্ব না পেলেও

একথা সত্য যে, অপরিকল্পিতভাবে শ্রমের বাজারের বিশ্বায়নের চেষ্টাও পাশাপাশি চলেছিল। এটা প্রতিফলিত হতো শ্লেভ লেবার, ইনডেঞ্চার্ড লেবার, এক্সপোর্টেড লেবার, লেবার মাইগ্রেশন প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে। বিগত সাড়ে চারশ' বছর ধরে পুঁজিবাদের কলোনি বা উপনিবেশ গঠনের পেছনে শ্রমের দেশান্তর অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আফ্রিকার দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক বাস্তবতা তার প্রমাণ।

আধুনিককালে পুঁজি ও বাণিজ্যের আরও ব্যাপক ও নিবিড় এবং নতুন ধরনের বিশ্বায়নের তৎপরতার ফলে শ্রমের বিশ্বায়নের প্রয়াসও আনুপাতিক মাত্রা নেবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে মূলধন ও বাণিজ্যের তুলনায় শ্রমের বিশ্বায়ন তথা বাস্তবক্ষেত্রে শ্রমের দেশান্তরের প্রসঙ্গ অনেক বেশি সংবেদনশীল এবং সেক্ষেত্রে সামাজিক উত্তাপ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতও অনেক বেশি তীব্র। এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন রয়েছে রাজনৈতিক স্তরে। আধুনিক প্রোডাকশন-প্রসেস ও লেবার-প্রসেস-এ লেবার মাইগ্রেশন বা শ্রমের দেশান্তর এক অবিভাজ্য উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

লেবার মাইগ্রেশনের সাথে জড়িত নৃতাত্ত্বিক, ফার্টিলিটি বা গর্ভগত উর্বরতা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক অনেককাল ধরেই আছে। তবে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা সাধারণভাবে বিষয়টির অর্থনৈতিক ও বাহ্যিক ফলাফলের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত। লেবার মাইগ্রেশনের ফলে আর্থিক লাভ কার বেশি, এই তাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রমিকরা বিদেশে গিয়ে উপার্জন করে স্বদেশে অর্থ পাঠালে দেশের আর্থিক সম্পদ ও বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বাড়বে। বাণিজ্য ঘাটতির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কুলান এর থেকে অনেকটা করা যাবে। গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট-এর বৃদ্ধি ঘটবে বিদেশাগত এই অর্থ সংযোগে। বিদেশে গমনকারীদের পরিবারের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও, উন্নয়ন ঘটবে তাদের জীবন-মানের। বাজারে বাড়তি মুদ্রা সঞ্চালনের ফলে কিছুটা চাহিদা বৃদ্ধি হবে শিল্প, কৃষি ও পরিষেবার। দেশের বেকারীর চাপও এতে অনেকটা লঘু হবে। মোটের উপর শ্রমের দেশান্তর ঘটলে স্বদেশের উন্নতি হবে। এগুলি হলো অর্থনীতিবিদদের বক্তব্যের কিছু দিক। তথ্য হিসাবে তাঁরা দেখান যে, জর্ডন, লেসেথো, ইয়েমেন, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজার দেশান্তরিত শ্রমিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থ দেশগুলির জি. এন. পি.-র ১০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত; জি. এন. পি.-র ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ হলো বাংলাদেশ, বুরাকিনা ফাঁসো, মিশর, গ্রীস, জামাইকা, মালাউই, মরক্কো, পাকিস্তান, পর্তুগাল, শ্রীলঙ্কা, সুদান ও তুরস্কে। উন্নত দেশগুলির সাথে অনুন্নত দেশগুলির মজুরির পার্থক্য ব্যাপক হলেও দেশান্তরিত শ্রমিক নিজের খরচের পরও যে টাকা স্বদেশে পাঠায় তা', দেশে থাকলে সে যা মজুরি পেতো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার থেকে অনেকটাই বেশি।

সাধারণত অনুন্নত দেশ থেকে শ্রমিকরা দেশান্তরিত হয় উন্নত দেশগুলিতে। অপরাংশ অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হলো যে, লেবার মাইগ্রেশনের অর্থনীতির বাহ্যিক বিচারে আগত দেশগুলিই হচ্ছে লাভবান। কেননা উন্নত দেশগুলিতে আধুনিক উৎপাদনের জন্য শ্রমিক চাহিদা মেটাতে দেশগুলির অভ্যন্তরীণ শ্রমের বাজারে বিদেশাগতরা যোগান সম্পন্ন করছে। তার ফলে, মালিকশ্রেণীর পক্ষে সহজ হচ্ছে মুক্ত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এই ধরনের শ্রমের বাজার থেকে স্বল্প পারিশ্রমিকে শ্রমিক পাওয়া। ফলে উৎপাদনের ব্যয় কম হচ্ছে শ্রমের খাতে। পরিণামে উৎপাদিত পণ্য নিয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের পক্ষে হচ্ছে সহজতর। কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে এটাও দেখা যায় যে আগন্তুক শ্রমিকরা যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বহন করে আনে তা' আশ্রয়দাত্রী দেশটির সমাজ-সংস্কৃতির পরিপূরক। কেননা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ বিদেশাগত বিভিন্ন জাতিসমূহের সংস্কৃতির মিশ্রণেই ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে। আবার কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিদেশাগতদের বংশধরেরা সংশ্লিষ্ট দেশের সমাজ ও অর্থনীতির গতিশীলতা সৃষ্টিতে ধারাবাহিক ও কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে—উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে চীনা শিল্পপতিরা, কানাডাতে হংকং-এর ব্যবসায়ীরা, আফ্রিকাতে ভারতীয় ও লেবাননীয় ব্যবসায়ীরা, মধ্য-প্রাচ্যের তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলির সিভিল সার্ভিসে জর্ডনীয় ও প্যালেস্টিনীয়রা, প্রভৃতি। বেশ কিছু

দেশে দেখা যায় যে স্বদেশীয় শ্রমিকদের অদক্ষ কাজে যোগদানে অনীহা পূরণ করে বিদেশাগত শ্রমিকরা। বর্তমান সময়ে দেশান্তরিত শ্রমিকদের ৭০ ভাগই এই ধরনের শ্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে। উত্তর আফ্রিকা ও তুরস্ক থেকে ফ্রান্স ও জার্মানিতে আগত শ্রমিকদের যথাক্রমে ৬০ ও ৮০ ভাগ এই ধরনের কাজে নিযুক্ত। তাছাড়া ইজরায়েলে প্যালেস্টিনীয়রা, মধ্য-প্রাচ্যে পাকিস্তানী, মালয়েশিয়াতে ইন্দোনেশীয়রা ও আর্জেন্টিনাতে বলিভিয়রা গ্রহণ করছে এই ভূমিকা। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশাগত শ্রমিকরা এমন কাজ করে যা তাদের অনুপস্থিতি ঘটলে হতো লুপ্ত। কোথাও কোথাও বিদেশাগতদের উপস্থিতি ও ভূমিকার জন্য দেশীয়দের জন্য নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে মালয়েশিয়াতে তাল-তেল ও রবার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতো যদি না ইন্দোনেশীয় শ্রমিকরা সেখানে যেতো। দক্ষিণ আফ্রিকার খনি এবং ডোমিনিকান রিপাব্লিক, মালয়েশিয়া ও স্পেনের বাগিচা রক্ষা পেয়েছে বিদেশাগত শ্রমিকদের জন্য।

এই ধরনের যুক্তি স্বীকার করেও বলা যায় যে লেবার মাইগ্রেশনের তাৎপর্যের ভর অন্যত্র। দেশত্যাগে বাধ্য হবার মানসিক যাতনা ও পারিবারিক সমস্যা ছাড়াও, লেবার মাইগ্রেশন স্বয়ং সামগ্রিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার এক নতুন ধারা। এই ব্যবস্থার দ্বারা একই সাথে বহিরাগত ও বিদেশী শ্রমিকরা সর্বাংশেই শোষিত হয়, এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা।

শ্রমজীবীদের বিভিন্ন অংশের নিজ আবাস ছেড়ে অন্যত্র গমনাগমন বা বিদেশে দেশান্তরী হওয়ার পেছনে বাধ্যতামূলক কারণ হলো নিজ এলাকায় বৃত্তির অনিশ্চয়তা এবং অন্য কোন এলাকায় বৃত্তির নিশ্চয়তা। ইন্টারনাল মাইগ্রেশন বা দেশের অভ্যন্তরে অন্যত্র যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকের যাওয়া সাধারণভাবে মরসুমী ধর্মী; নির্দিষ্ট মরসুমের কাজ সম্পাদন করে দেশে ফিরে আসে শ্রমিক। অবশ্য বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নগরায়ণ ও সেখানে বৃত্তির বেশি সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় রুরাল মাইগ্রেশন বা গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে আসার প্রবণতা এক উত্তাল চরিত্র নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক দেশান্তরের ক্ষেত্রেও এই চরিত্রের ছাপ আছে। উন্নত দেশগুলি কার্যত বিশ্বের শহরাঞ্চলের চরিত্র অর্জন করায়, তৃতীয় দুনিয়া থেকে দেশান্তর ঘটছে শিল্পোন্নত দেশে। শ্রম-দেশান্তরের প্রক্রিয়া থেকে দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্যের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। যদিও নতুন বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় এমন কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে যাতে দেখা যায় যে বিশ্বের মোট দেশান্তরের অর্ধেক সম্পন্ন হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির অভ্যন্তরেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে দক্ষিণ এশিয়া থেকে দেশান্তর ঘটছে তৈলসমৃদ্ধ মধ্য-প্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়ার 'নিউলি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজিং ইকনমিক' বা নতুন শিল্পায়নকারী অর্থনীতির দেশগুলিতে এবং দরিদ্র আফ্রিকার দেশগুলি থেকে উপ-সাহারীয় এলাকার তুলনামূলক উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে ঘটছে দেশান্তর।

উন্নত দেশগুলিতে দেশান্তরে এখন কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। যেমন প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলি, পোল্যাণ্ড, রোমানিয়া, বালগেরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে বুদাপেস্ট-এর মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপে, মেক্সিকো থেকে এল পামো, টেক্সাসের ভিতর দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে কাজ পাওয়ার জন্য ম্যাঘারেবের আরব শ্রমিকরা মার্সেলিসের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছে, জাপানে থাই ও ফিলিপিনোরা প্রবেশ করছে টোকিও-র মধ্য দিয়ে।

আবার উন্নত দেশ থেকে অধুনা শিল্পোন্নয়নরত দেশে দেশান্তরও ঘটছে। যেমন ৩০,০০০ জাপানী শ্রমিক রয়েছে থাইল্যাণ্ডে এবং ৫,০০০ মালয়েশিয়ায়। বিপরীত দিকও রয়েছে। অস্থায়ী বা আধা-স্থায়ীভাবেও বিদেশাগত শ্রমিকদের নিয়োগ জাপান আইনানুগভাবে বন্ধ করছে, কিন্তু সেখানে শ্রমের চাহিদার তুলনায় যোগান কমছে। তাছাড়া, কতকগুলি নির্দিষ্ট ধরনের কাজে সেখানকার শিক্ষিত যুবসমাজ যোগ দিতে অস্বীকার করছে। জাপানী ভাষাতে তিনটি অচ্ছুৎ ক্ষেত্রকে আদ্যক্ষর "ক" (ইংরেজী অক্ষর "কে") দিয়ে চিহ্নিত হচ্ছে—কিটানাই, কিকেন্স ও কিটসুই (ইংরেজীতে তিনটি "ডি"—ডার্টি, ডেনজারাস ও ডিফিকাল্ট)। ফলে শ্রমের চাহিদা সেখানে আরও বর্ধিষ্ণু। এর সুযোগ নিয়ে আইন ফাঁকি দিয়ে ভ্রমণের বা ভাষা শিক্ষার নামে অথবা টেনিং নেবার অজুহাতে সেখানে ১৯৯০ সালে ৫ লক্ষ বহিরাগত শ্রমিক

কাজ করতো। এদের বেশির ভাগই বাংলাদেশ, দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার মানুষ। ঐ সময়, শ্রম-শক্তির স্বল্পতার জন্য বিদেশাগত শ্রমিকের সংখ্যা তাইওয়ানে ১,২০,০০০, দক্ষিণ কোরিয়াতে ১,৯০,০০০, হংকং-এ ৪৫,০০০ ও সিঙ্গাপুরে ১,৫০,০০০ দাঁড়ায়।

১৯৯১ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ইউরোপীয়ান কমিউনিটিভুক্ত দেশগুলিতে আইনি বহিরাগতের সংখ্যা ৮২ লক্ষ ও বেআইনি আরও ২০ লক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল মেক্সিকো থেকে আগত মানুষের সংখ্যাই ১ কোটি ২০ লক্ষ, যার সাথে বছরে আরও ১,৩৫,০০০ জন যোগ দিচ্ছে। মধ্য-প্রাচ্যে প্রতি বছর এশিয়া থেকে যায় ৭,৫০,০০০ শ্রমিক। ১৯৯৩ সালে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহিরাগতের সংখ্যা অথবা সেখানে গিয়ে বসবাসকারীর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ।

এই সমগ্র পরিসংখ্যান ও চরিত্র থেকে লেবার মাইগ্রেশন ও শ্রম-দেশান্তরের বিশ্বজনীন চরিত্র ও গুরুত্ব বোঝা যাবে। এখানে উল্লেখ করা না হলেও বলা যায় যে পৃথিবীর ১৭০টি দেশ এই দেশান্তর প্রক্রিয়ার অন্তর্গত রয়েছে কোন না কোনভাবে।

আইনি দেশান্তরী শ্রমিকদের ভাগ্যেও সাধারণত জোটে অদক্ষ শ্রমিকের কাজ। তাদের মজুরি দেশীয় শ্রমিকদের তুলনায় যেমন অনেক কম, চাকুরীও সাধারণভাবে সম্পূর্ণ অস্থায়ী। শ্রম-বিষয়ক আইন ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুযোগগুলিও অধিকাংশ দেশেই এদের জন্য প্রযুক্ত হয় না। পুঁজিপতিদের সুবিধামতো ফ্লেক্সি-টাইম ও ফ্লেক্সি-ওয়ার্ক ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা কার্যকরীভাবে চাপানো হয় বহিরাগত শ্রমিকদের উপর। খনি, বাগিচা, কৃষি, নির্মাণ ও শিল্পের সর্বাপেক্ষা কায়িক শ্রমসাধ্য, বিপজ্জনক ও দীর্ঘ সময়ের কাজ নির্ধারিত থাকে দেশান্তরিতদের জন্য। দেশান্তরী শ্রমিকদের অনেক দেশেই সামাজিক ভাবে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়। বাড়ী ভাড়া পেতে সমস্যা ও অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও আবাসের সুযোগ প্রসারিত না করায় এদের বহু স্থানেই দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে হয় বিচ্ছিন্ন এলাকায়। বিদেশীদের সম্পর্কে সহজাত অনীহা ছাড়াও, উগ্রবাদী ও বর্ণ-বিদ্বেষী বিভিন্ন সংগঠন এবং দুষ্কৃতীদের হাতে নিগ্রহ নির্বিবাদে ভোগ করতে হয় এদের; এমনকি স্বাভাবিক ও স্বীকৃত মানবাধিকারও বহু দেশে ও ক্ষেত্রে এদের জন্য স্বীকৃত ও রক্ষিত হয় না।

দেশান্তরিত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ স্বদেশে জনগণের উপার্জনের মধ্যে অসাম্য বাড়িয়ে তোলে। যদিও সেই প্রক্রিয়াটি জটিল, কিন্তু বাস্তব। কেননা অত্যন্ত দরিদ্র অংশের শ্রমিক বা আর্থিক কারণের জন্য কর্মক্ষমদের এক বড় অংশ দেশান্তরী হতে পারে না। দেশান্তরী হয় কিছুটা সচ্ছল শ্রমিক। ফলে এই অংশের শ্রমিকরা যখন দেশে অর্থ প্রেরণ করে, তখন সেইসব পরিবারে স্বভাবতই যে আর্থিক অগ্রগতি ঘটে, তাতে দরিদ্র অন্য অংশের সাথে উপার্জনের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেশের অভ্যন্তরেও দরিদ্র অংশের মধ্যে শ্রেণী-ঐক্য এর দ্বারা বিঘ্নিত হয়।

যেসব সমাজের আর্থিক-সামাজিক বাস্তবতা দেশের যোগ্য ও দক্ষ অংশকে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে না, সেখানে মাইগ্রেশন ঘটে 'ব্রেন-ড্রেন'এর বা মস্তিষ্ক পাচারের চরিত্রে। এইসব ক্ষেত্রে বিদেশে গিয়ে দক্ষ মানুষরা যত বেশি রোজগারই করুক এবং স্বদেশে সেই অর্থে পাঠাক না কেন, এই দেশান্তর দেশের পক্ষে সম্পদগত দিক থেকে বিশাল ক্ষতি। দেশের অর্থে ও চেষ্টায় সৃষ্ট এই মানব-সম্পদকে বিদেশ ব্যবহার করে আরও বেশি লাভ করে। মাতৃভূমি সমানুপাতে অগ্রগতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সমগ্র উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শ্রম-প্রক্রিয়ায় দেশান্তর এক জটিল প্রসঙ্গ। শোষণের পরোক্ষ ও সূক্ষ্ম কৌশলগুলির অভিব্যক্তি রয়েছে দেশান্তরের সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে। পুঁজি, কাঁচামাল, পণ্য, বাণিজ্য প্রভৃতির মুক্ত বাজার ও আন্তর্জাতিকীকরণের ব্যাপক প্রক্রিয়া চললেও শ্রমের বাজার এখনও দেশের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ। শ্রমের বাজারের বিশ্বায়নের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও তৎপরতা এখনও নিউ ইকনমিক ওয়ার্ল্ড অর্ডারে স্পষ্ট হয়নি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে শ্রম হলো অন্যতম প্রধান মৌলিক উপাদান এবং অন্যান্য মৌলিক উপাদানগুলির সাথে অবিভাজ্যভাবে জড়িত। সুতরাং দৃশ্যত শ্রমের

বাজারের বিশ্বায়নের অনুপস্থিতি সমগ্র বিশ্বায়ন ব্যবস্থার বিকাশের পথে স্বয়ং এক প্রতিবন্ধক এবং একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব। সুতরাং পুঁজিবাদের দৃশ্যত নিস্পৃহতা সত্ত্বেও বিশ্বায়নের নিজস্ব প্রক্রিয়ার চাপে শ্রমের বাজারের এক ধরনের বিশ্বায়নের প্রবণতা হিসাবে লেবার মাইগ্রেশন কাজ করেছে। এই স্ব-বিরোধিতার এক তাৎপর্যপূর্ণ দিক রয়েছে। পুঁজি, কাঁচামাল, উৎপাদন যন্ত্র, কারিগরী দক্ষতা, নিপুণ পণ্য, বাণিজ্য, প্রচার, ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও মালিকানা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির হাতে থাকলেও, শ্রমের মালিকানা ও কর্তৃত্বের সিংহভাগ অনুন্নত তৃতীয় দুনিয়ার। শ্রম এমন এক উপাদান যা পুঁজিবাদের পক্ষে কখনো সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। যত দিন যাচ্ছে উন্নত উৎপাদনে শ্রমশক্তির ব্যবহার কমে গেলেও, অব্যবহৃত শ্রম-শক্তির চাপও পুঁজিবাদের উপর বাড়ছে। সুতরাং শ্রমের চাহিদা পূরণে ও স্বল্পমূল্যে তা' ব্যবহারের জন্য তারা যেমন তৃতীয় দুনিয়ায় উৎপাদন করে বা কিছুটা মাইগ্রেশন ঘটিয়ে তা' পুষিয়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে বিশাল বেকারীর চাপকে তারা তৃতীয় দুনিয়ার অভ্যন্তরেই আটকে রাখতে চায়, যে কারণে লেবার গ্লোবালাইজেশন আন্তরিকভাবে কখনো তাদের কাম্য নয়।

(ঙ) শিল্প থেকে সার্ভিস সেক্টরে ভর পরিবর্তন

প্রসঙ্গটিতে প্রবেশের পূর্বে শ্রমের একটি ধরন সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানসিক শ্রম ঃ এটি এমন এক শ্রমের ক্ষেত্র যে শ্রমের সংজ্ঞাকরণ নিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্ক কয়েক শতাব্দীর। কেননা শ্রমিক, কৃষক, কারিগর, নির্মাতা, হস্ত-শিল্পী প্রভৃতি অভিধায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের কর্মজীবীদের বাহ্যত চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু মানসিক শ্রমের ক্ষেত্র এত অপ্রকাশ্য, বিশাল ও বহুধা বিস্তৃত যে সবগুলিকে একটি ধরাবাঁধা গণ্ডির মধ্যে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন কাজ। ফলে এই ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহাকবি মিল্টন এদের বলেছিলেন 'সার্ভেন্ট', অর্থনীতির বুর্জোয়া শাখার অন্যতম জনক অ্যাডাম স্মিথ এদের নামকরণ করেন 'আর্টিফিসিয়ার', শিল্প-বিপ্লবের কালে এদের কাজকে বলা হয়েছিল 'ক্ল্যারিকাল' প্রভৃতি। কার্ল মার্কস উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক ও ভূমিকাকে চিহ্নিত করে শ্রেণীগুলির সংজ্ঞা স্পষ্ট করেছিলেন। ১৮৫০-এর দশকে তাঁর আলোচনাতে 'মিডল ক্লাস' বলতে মূলত উদীয়মান বুর্জোয়া অংশই চিহ্নিত ছিল। সমস্যা ছিল এই যে তৎকালে পুঁজিবাদী উৎপাদনের শ্রম-প্রক্রিয়াতে (লেবার-প্রসেসে) প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলির অনেকটা সুস্পষ্ট রূপান্তর ঘটেছিল। সে তুলনায় মানসিক শ্রমদায়ী যেমন ইংলণ্ডে ক্লার্ক, কমার্শিয়াল ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, রিটেইনার, কনফিডান্ট, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি বা আমেরিকাতে গেইনফুল ওয়ার্কার্স প্রভৃতি নামের শ্রমদায়ী অংশের ততটা অগ্রগতি ঘটেনি। বরং বলা যায় প্রাক্-পুঁজিবাদী কাল থেকে চলে আসা এইসব অংশের রূপ ও ভূমিকা প্রায় একই ধরনের ছিল। এই শতাব্দীর প্রথমের দিকে, মার্কস পরবর্তীকালের মার্কসবাদীরা এই অংশের শ্রেণীগত চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে খানিকটা সমঝোতা ও গোঁজামিল দিয়ে এদের বলেছিলেন 'মিডল ক্লাস' (এমিল লেডার : ডাই প্রাইভেট্যাংগেস্টেলটেন ইন ডার মডারনেন ওয়ার্টস্টাফটেন্টুইফলুঙ, হ্যারী ব্রেভারম্যানের 'লেবার অ্যাণ্ড মনোপলি ক্যাপিটাল ঃ দ্য ডিগ্রেডেশন অব ওয়ার্ক ইন দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)। যদিও মার্কস-বর্ণিত 'পেটি-বুর্জোয়া' নামেই এই সমস্ত অংশকে মার্কসবাদীদের কোন কোন অংশ ব্যাখ্যা ও উল্লেখ করে গিয়েছেন সুদীর্ঘকাল ধরে। প্রায় সমসাময়িক কাল থেকে বুর্জোয়া-সমাজতাত্ত্বিকরা এই অংশটিকে 'হোয়াইট কলার ওয়ার্কার্স', 'স্যালারিড এমপ্লয়িজ', দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তরকালে 'লোয়ার মিডল ক্লাস' প্রভৃতি নামে অভিহিত করতে শুরু করেন। পঞ্চাশের দশক থেকে অর্থনীতি ও উৎপাদনে মানসিক শ্রমের উচ্চতর দক্ষতা, কর্তৃত্ব ও ভূমিকা সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনালদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বর্গটিকে 'মিডল লেয়ার' বলেও চিহ্নিত করা হচ্ছিল।

অতীতে অর্থনীতির তিনটি ক্ষেত্রেই—শিল্প, কৃষি ও পরিষেবাতে, বিশেষত প্রথমদিকে শিল্পের অর্থনীতি ও উৎপাদনের অংশ ছিল 'মেন্টাল লেবার' বা মানসিক শ্রমদানকারীরা; যদিও সেকালে এদের ভূমিকা ছিল নিছক সহযোগীর। শিল্প-পুঁজিবাদের কালে মানসিক শ্রমদায়ীরা কারখানাতে বসেই হিসাব-নিকাশ, চিঠিপত্র লেখার কাজ করতো। শিল্প-পুঁজিবাদের উন্নত স্তরে অগ্রগতির ফলে কারখানা থেকে অফিস আলাদা হয়ে যায়। তার ফলে কারখানার অভ্যন্তরে কায়িক ও মানসিক শ্রমদায়ীদের মিলে

মিশে একাকার থাকার বাস্তবতাও ভেঙ্গে যায়। ব্যাঙ্কিং পুঁজিবাদের উদ্ভবের পর মানসিক শ্রমের গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছিল। এই শতাব্দীর প্রথমদিকে, কারখানার কায়িক শ্রম থেকে পরিকল্পক, ব্যবস্থাপক প্রভৃতিকে আলাদা করে নিয়ে মানসিক শ্রমের কাজ এদের উপরই অর্পিত হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদনের আরও বিকাশের প্রক্রিয়াতে কৃষি, শিল্প ও পরিষেবার যে বিবর্তন, পরিবর্তন এবং যে নতুন শ্রম-প্রক্রিয়া গড়ে উঠতে থাকে তাতে মানসিক শ্রমদায়ী অংশের ভর ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় সার্ভিস সেক্টর বা পরিষেবা ক্ষেত্রে। ক্রমান্বয়ে একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভবের সাথে এই ধরনের আরও বিভিন্ন অংশের উদ্ভব এবং একচেটিয়া বিকাশের বিকাশের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এগুলির বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তবে প্রাক্-একচেটিয়া পর্যায়ের পেটি-বুর্জোয়ার (খামার, ব্যবসা ও পরিষেবার ছোট মালিক, পেশাদার ও হস্তশিল্পে কর্মরত প্রভৃতি অংশকে তখন বোঝানো হতো) মতো এই মানসিক শ্রমদায়ী অংশকে আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডে মেরু-ভিত্তিক শ্রেণী সংজ্ঞাতে খাপ খাওয়ানো যায়নি। কিন্তু অতীতের মধ্যবিত্ত মানুষদের থেকে বর্তমান অংশকে অনেকটাই স্বতন্ত্র করে নেওয়া যায়। এরা ক্রমশ শ্রমিকশ্রেণীর কাছাকাছি যেতে শুরু করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর মতোই এই মানসিক শ্রমদায়ী অংশ প্রবলভাবে শোষিত হচ্ছে, এদেরও শ্রম বিক্রি করে জীবন ধারণ করতে হয়; এদের নেই অর্থনৈতিক ও বৃত্তিগত স্বাধীনতা, এরা নিয়োজিত হয় মূলধন বা সেটির কোন উপাঙ্গের দ্বারা; এদের প্রবেশাধিকার নেই নিজস্ব বৃত্তির বৃত্তের বাইরে উৎপাদনের অন্য উপায়ে এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এদের নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রমকে পুনর্নবীকরণ করে যেতে হয় মূলধনের স্বার্থে। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে, বিশেষত মানসিক শ্রমদায়ীদের বিভিন্ন অংশ শ্রমিকশ্রেণীর অনুকরণে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনে অংশীদার হচ্ছে ব্যাপকভাবে। ধনী-দরিদ্র দেশ নির্বিশেষে এটা অনেকাংশেই সত্য। কোন কোন দেশে ও অংশে এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের দ্বারাও। আন্দোলনগুলি ক্রমশ পুঁজি-বিরোধী ও প্রত্যক্ষ শ্রেণী সংগ্রামের চরিত্রও অর্জন করছে। আধুনিক অর্থনীতি ও উৎপাদনের বাহ্যিক চরিত্রের পরিবর্তনের ফলে এইসব অংশগুলির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং সংগঠন ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামাজিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে এদের পূর্বতন শ্রেণীগত অবস্থানের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াও সূচিত হয়েছে। তারা হয়ে উঠছে শ্রমিকশ্রেণীর অনেকটাই কাছাকাছি।

সার্ভিস সেক্টর বা পরিষেবার ক্ষেত্রকে অর্থনীতিতে টার্সিয়ারি বা তৃতীয় ক্ষেত্র বলা হয়। অতীতে এই ক্ষেত্রকে 'ক্লোজড ইকনমি মডেল' বা বদ্ধ অর্থনীতির আদল বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। মার্কসের কালে অর্থনীতি বা সমাজে কোন গুরুত্ব ও স্বীকৃতি না থাকলেও এটির চরিত্র তিনি যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "একটি পরিষেবা ব্যবহারিক মূল্যের (ইউজ ভ্যালু) প্রয়োজনীয় ফল ছাড়া আর কিছুই নয়, তা' পণ্যের ফল হিসাবেই হোক বা শ্রমের জন্যই হোক।" (ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৭)। আধুনিক বাস্তবতার আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে শিল্প থেকে পরিষেবার ভর বৃদ্ধির প্রবণতার তত্ত্বকে তিনি বলেছিলেন, "যন্ত্রের দ্বারা কর্মজীবীদের অপসারিত হওয়ার ক্ষতিপূরণের তত্ত্ব (থিওরি অব কমপেনসেশন)" (ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২০-২১)। তিনি তাঁর 'থিওরি অব সারপ্লাস ভ্যালু' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গকে আরও বাস্তবভাবে বিশ্লেষণ করেছেন : "ফ্যাক্টরি সংক্রান্ত সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে (১৮৬১ অথবা ১৮৬২) ইউনাইটেড কিংডমে শিল্পে তথাকথিত মোট নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা (ম্যানেজারদের সহ) ৭,৭৫,৫৩৪ জন, যখন ইংলণ্ডে নারী গৃহ-পরিচারিকার সংখ্যা ১০ লক্ষ। কি চমৎকার সুবিধাজনক এই ব্যবস্থা, যা দিয়ে ফ্যাক্টরির মালিক নারী শ্রমিককে ১২ ঘন্টা কারখানায় ঘাম ঝরায়, তার বোনকে বিনা পারিশ্রমিকে ব্যক্তিগত কাজে ঝি-গিরি, ভাইকে দিয়ে ঝাড়ুদার এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে পুলিশ বা সৈনিক বৃত্তি করায়।" (থিওরি অব সারপ্লাস ভ্যালু, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০১)।

বর্তমানকালের পরিষেবা ক্ষেত্রে মানসিক শ্রমদায়ী অংশের মধ্যে মুখ্যত রয়েছে সরকারী-বেসরকারী সংস্থার করণিক অংশের কর্মচারী, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারী, সর্বস্তরের শিক্ষক, স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসক, পৌর প্রতিষ্ঠানের পানীয় জল সরবরাহ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার সাথে যুক্ত কর্মী, ডাক-তার-টেলিফোন কর্মী, পরিবহন কর্মী, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টনের কর্মী, খাদ্য পরিষেবার কর্মী,

ভ্রমণ ও বিনোদনের কর্মী, কারিগরী কর্মী ও ইঞ্জিনীয়ার, এয়ারলাইনসের কর্মী, শিশু-লালনকারী কর্মী, সামাজিক সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রহরার কর্মী, অগ্নি-নির্বাপক সংস্থার কর্মী, বন উন্নয়ন ও রক্ষণের কর্মী, প্রশাসক, ম্যানেজার, পরিকল্পক, অন্যান্য প্রফেশনাল, গবেষক, বিভিন্ন অংশের বুদ্ধিজীবী প্রমুখ।

অ্যাডাম স্মিথের পূর্ববর্তীকাল থেকে এমন ধারণা প্রচারিত ছিল যে, পরিষেবা ক্ষেত্র হলো অনুৎপাদক বা উৎপাদনশীলতার বিকাশে পরিষেবা ক্ষেত্র কোন সহায়তা দিতে অক্ষম। তৎকালীন সময়ে এই ধারণার ভিত্তি ছিল 'ট্রেড থিওরি'। মনে করা হতো যে সার্ভিস হলো নন-ট্রেডেবল বা পরিষেবার চরিত্র অ-বাণিজ্যিক; সুতরাং এর থেকে মুনাফা সাধারণভাবে আসে না। ১৯৪০ সালেও কলিন ক্লার্ক লিখেছেন, "তৃতীয় শিল্পের (পরিষেবা) অর্থনীতি নিয়ে লেখা এখনও বাকি রয়েছে।" সত্তরের দশকেও অর্থনীতিবিদরা আক্ষেপ করেছেন যে পরিষেবা নিয়ে অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় সমগ্র অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ইতোমধ্যে আশির দশকের শুরু থেকে বিশ্ব-পুঁজিবাদ যে নতুন ধরনের উদ্যোগ নেয় তাতে পরিষেবার ক্ষেত্র দ্রুত নতুন গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ১৯৮৪ সালের আঙ্কটাডের (ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট) রিপোর্টে বলা হলো : "গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট-এ অর্থাৎ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে প্রত্যক্ষ অবদান যোগানের দিকটি বোঝা না গেলেও, উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে স্বাস্থ্য পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাথে অন্তঃসম্পর্ক থাকার কারণে বহু ধরনের পরিষেবা এমন সব বাহ্যিক উপাদানসমূহ সৃষ্টি করে যা দেশের মোট উন্নয়ন তৎপরতাকে নাটকীয়ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই পটভূমিকায়, উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে পরিষেবা সম্পর্কে পরিব্যাপ্ত ও উন্নত ধারণা গঠন অত্যন্ত জরুরী। অথচ পরম্পরাগতভাবে উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে, বিশেষত কৃষি ও যন্ত্রযোগে উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে; অন্যদিকে তৃতীয় ক্ষেত্রে (পরিষেবা) তেমন নজর দেওয়া হয়নি।"

পরিষেবা ক্ষেত্রকে সাধারণভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম অভিব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে কেবলমাত্র মাথাপিছু আয়-বৃদ্ধির ফলাফলকে প্রভাবিত করার অন্যতম উপাদান ও ক্ষেত্র হিসাবে। মাথাপিছু আয়-বৃদ্ধির ফলে মানুষের গৃহস্থালি চাহিদা নানাভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; নিজের ইচ্ছামত বাজার থেকে বেশি পরিমাণে ও উন্নত মানের পণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা বেড়েছে। অথচ অতীতে, বুর্জোয়া অর্থনীতিতেও, বাঁচার জন্য গৃহস্থালি ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার চেয়ে অতিরিক্ত ক্রয়ের প্রবণতাকে বিলাসিতা বলে বিবেচনা করা হতো। এটি ছিল 'ডিমাণ্ড পুল' বা চাহিদাভিত্তিক আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। কিন্তু বর্তমান অর্থনীতিতে সর্বজনীন ব্যবস্থা হিসাব 'সাপ্লাই পুল' বা যোগানভিত্তিক তৎপরতা গৃহীত হবার ফলে পরিষেবার ক্ষেত্রে সেই নীতির প্রভাব পড়েছে। সুতরাং ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে পরিষেবা বিক্রয়। তাছাড়া ওয়েলফেয়ার স্টেট ব্যবস্থার ক্রম-অবলুপ্তি এবং মিনিমাম গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টার ফলে পরিষেবার অধিকাংশ ক্ষেত্র, যা প্রধানত ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, তার বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। ফলে না-লাভ না-ক্ষতি ব্যবস্থা সমন্বিত পরিষেবার চরিত্র পাল্টে ব্যবসায়িক মুনাফাভিত্তিক ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। পরিষেবার জন্য সামগ্রীসমূহ, সেগুলির উৎপাদন, পরিষেবার কাঠামো, পরিষেবার বিষয়ে কারিগরী দক্ষতাসহ সমগ্র দিকগুলি নিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এখন বিশাল বাজার উন্মুক্ত করেছে। মুক্ত বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতিতে অন্য দু'টি ক্ষেত্রের—কৃষি ও শিল্পের তুলনায়, পরিষেবা উৎসাহব্যঞ্জক ক্ষেত্রে পরিণত হওয়া এবং সর্বাংশের মানুষের জীবনের অনিবার্য অংশ হয়ে উঠায় ক্ষেত্রটিতে দারুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বিপুল বিনিয়োগ ও লাভের সম্ভাবনা। ফিনান্সিয়াল মার্কেট বাদ দিলে আর সমস্ত দিকগুলির চেয়ে সার্ভিস বা পরিষেবা হয়ে উঠেছে সর্বাধিক লাভজনক।

সার্ভিস সেক্টরের প্রতি পুঁজিবাদের মনোভাবকে, ব্রেভারম্যানের ভাষাতে বলা যায়, 'পরিষেবা অর্থনীতি'র দানশীলতার জন্য বিশ্ব-বাজার বিপুলভাবে এটির উজ্জীবন করছে এবং প্রশস্তি করছে এটির 'সুবিধা', 'সাংস্কৃতিক সুযোগ', 'প্রতিবন্ধীদের তত্ত্বাবধানের জন্য আধুনিক ব্যবস্থাপনা' ইত্যাদির।' পুঁজিবাদী নতুন অর্থনৈতিক তৎপরতা, বিশ্ব-বাজার ও বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব তথা সর্বাধুনিক উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়া

সার্ভিস সেক্টর বৃদ্ধির পিছনে প্রধান কারক শক্তি; অর্থাৎ পণ্য-উৎপাদনকারী ক্ষেত্র পরিপূর্ণভাবে জয় করার পর এ' হলো নূতন অভিযান—শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক অপসারিত করার পর সমান্তরালে ও বিকল্প হিসাবে পরিষেবা ক্ষেত্রে পুঁজির নতুন ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের উদ্যোগ। সার্ভিস সেক্টরের এই গঠন একইসাথে পুরানো ধরনের কাঠামোসমূহ, যেমন সামাজিক, গোষ্ঠীগত, পারিবারিক, সমন্বয় ও আত্ম-সহায়তার ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুনভাবে কাঠামো সৃষ্টি করছে। আধুনিক পুঁজিবাদ অতীতের তুলনায় অনেক দ্রুত ও ভয়ঙ্কর গতিতে সার্ভিস সেক্টরকে ব্যাপক ব্যবহার করছে শ্রমের সামাজিক বিভাজনে। অধিকাংশ উন্নত দেশে জাতীয় মোট আয়ে অবদানের ক্ষেত্রে সার্ভিস সেক্টর কেবল প্রথম স্থানেই উঠে আসেনি, দেশে নিয়োজিত মোট শ্রম-শক্তির অর্ধেকের বেশি হয়ে পড়েছে এতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি। অনুন্নত দেশগুলিতেও এই প্রবণতা তীব্রভাবে বর্ধিত হচ্ছে।

'গ্যাট' (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যাণ্ড টারিফস)-এর উরুগুয়ে রাউণ্ডের প্রস্তাবে অন্যান্য বিষয়ের সাথে পরিষেবার প্রসঙ্গ যুক্ত করার জন্য আমেরিকার নেতৃত্বে উন্নত দেশগুলির ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তৎপরতার মধ্যে ক্ষেত্রটির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বিশেষভাবে স্পষ্ট হচ্ছিল। গ্যাটের অভ্যন্তরে গ্যাট্‌স (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস) যুক্ত করা হয়। এই বিষয়ে গ্যাটের বক্তব্য, যা পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসাবে গৃহীতও হয়েছে তা' হলো ঃ পরিষেবা বাণিজ্যে ব্যাঙ্ক, বীমাসহ আর্থিক ক্ষেত্রগুলি, টেলি-কমিউনিকেশন, শিক্ষা, পরিবহন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে বৈদেশিক পুঁজির অবাধ সুযোগ দিতে হবে। কোন দেশ ক্ষেত্রগুলির কোনটিতেই, সামাজিক স্বার্থ বিবেচনার নামে, সংরক্ষণ ব্যবস্থা বা অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে পারবে না। এইসব ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি নিয়োগে কোন দেশে যদি বাধা-নিষেধ থাকে সেগুলি অবিলম্বে শিথিল করতে হবে। বিদেশী পুঁজি পরিষেবার কোন ক্ষেত্রে লগ্নী করা হবে তা' স্থির করার অধিকারী হবে লগ্নীকারী। কতগুলি ক্ষেত্রে তারা পুঁজি বিনিয়োগ করবে তার কোন পরিধি বা সীমানা নিয়ন্ত্রিত করা যাবে না। কোন পরিষেবা কতো পরিমাণ উৎপাদন করবে বা ফল দেবে তা' স্থির করার পূর্ণ অধিকার পাবে সংশ্লিষ্ট বিদেশী বিনিয়োগকারীরা। কতো লোক সংশ্লিষ্ট পরিষেবাতে নিয়োগ করা হবে তা' স্থির করবে সংশ্লিষ্ট মালিক। দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতির মধ্যে কোন পার্থক্য করা চলবে না। কোন পরিষেবা প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের ক্ষেত্রে বিদেশীদের একশত ভাগ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দিতে হবে। ব্যাঙ্ক বা বীমা প্রতিষ্ঠানে বিদেশী লগ্নীকারীর লগ্নী, আমানত, ব্যয়, মুনাফা প্রভৃতি সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছাধীন হবে। তারাই স্থির করবে লগ্নীকৃত দেশ বা অন্য কোন দেশে লগ্নী-পুঁজি থেকে উদ্বৃত্তের ব্যবহার বা স্থানান্তর। পরিষেবা প্রতিষ্ঠানগুলির সংগৃহীত পুঁজি সংশ্লিষ্ট দেশে বিনিযোগে কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা, অগ্রাধিকার প্রভৃতি নির্দেশ করা যাবে না। পূর্বোক্ত পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী নিজের বা সেটির সহায়তাপ্রাপ্ত লগ্নীকারীর দ্বারা ভূমিকা সম্প্রসারিত করার অধিকারও পাবে। কোন লগ্নীকারী তার নিজ প্রয়োজনে চলতি আর্থিক আদান-প্রদানের জন্য বিদেশে পুঁজি স্থানান্তর করতে বা খরচ মিটিয়ে দিতে পারবে। নির্দিষ্ট পরিষেবার জন্য শ্রম-সম্পদ নিয়োগের পরিমাণ তারা নিজেরাই স্থির করবে।

যদিও গ্যাট চুক্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের শর্ত দেওয়া আছে, কিন্তু পরিষেবার ক্ষেত্রে তা' ব্যাপক ও অনেক ঋজু। এ' থেকে ক্ষেত্রটির বর্ধিত অন্তঃশক্তি অর্থাৎ বাণিজ্যিক শক্তি যেমন প্রমাণিত হয়, অন্যদিকে প্রমাণিত হয় আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে এটির বাড়তি গুরুত্ব।

তিনটি ক্ষেত্রে—কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা—শ্রম-শক্তির বিন্যাস ও গতি কি ছিল, তাও প্রসঙ্গত লক্ষণীয় (শতাংশ হিসাবে) ঃ

দেশের নাম	কৃষি			শিল্প			পরিষেবা		
	১৯৭৯	১৯৮৩	১৯৮৭	১৯৭৯	১৯৮৩	১৯৮৭	১৯৭৯	১৯৮৩	১৯৮৭
কানাডা	৫.৭	৫.৫	৪.৭	২৮.৯	২৫.৫	২৫.৫	৬৫.৪	৬৯.০	৬৯.৮
ফ্রান্স	৮.৮	৭.৮	৭.০	৩৫.৭	৩৩.৩	৩০.৪	৫৫.৪	৫৮.৯	৬২.৬
পঃ জার্মানি	৫.৮	৫.৬	৫.২	৪৪.২	৪১.৮	৪০.৫	৫০.০	৫২.৬	৫৪.২

দেশের নাম	কৃষি			শিল্প			পরিষেবা		
	১৯৭৯	১৯৮৩	১৯৮৭	১৯৭৯	১৯৮৩	১৯৮৭	১৯৭৯	১৯৮৩	১৯৮৭
ইতালি	১৪.৬	১২.২	১০.৩	৩৭.২	৩৫.৫	৩২.০	৪৮.২	৫২.৩	৫৭.৭
জাপান	১১.২	৯.৩	৮.৩	৩৫.০	৩৪.৯	৩৩.৯	৫৩.৮	৫৫.৯	৫৭.৮
ইংল্যাণ্ড	২.৭	২.৭	২.৪	৩৮.৬	৩৩.৪	৩০.২	৫৮.৭	৬৪.০	৬৭.০
আমেরিকা	৩.৬	৩.৫	৩.০	৩১.৫	২৮.২	২৭.৩	৬৪.৯	৬৮.২	৬৯.৬
অস্ট্রেলিয়া	৬.৬	৬.৬	৫.৭	৩১.২	২৮.০	২৬.২	৬২.২	৬৫.৪	৬৮.০
বেলজিয়াম	৩.১	২.৯	২.৭	৩৪.৪	৩০.৪	২৮.০	৬২.৫	৬৬.৬	৬৯.৩
ফিনল্যাণ্ড	১৩.৬	১২.৫	১০.২	৩৪২	৩২.৭	৩০.৭	৫২.৩	৫৪.৮	৫৯.০
গ্রীস	—	৩০.০	২৭.০	—	২৮.৬	২৮.০	—	৪১.৪	৪৫.৫
আয়ারল্যাণ্ড	১৯.৭	১৬.৯	১৫.১	৩২.৭	২৯.৫	২৭.৬	৭.৭	৫৩.৬	৫৭.২
নেদারল্যাণ্ডস	৫.৮	৫.৪	৫.০	৩৩.৬	২৮.৫	২৬.৫	৬০.৬	৬৬.০	৬৮.৫
স্পেন	১৯.৮	১৮.৬	১৫.১	৩৬.৬	৩৩.৫	৩২.৫	৪৩.৬	৪৭.৯	৫২.৫
সুইজারল্যাণ্ড	৭.২	৬.৭	৬.৫	৩৯.৬	৩৭.৮	—	৫৬.৯	৬২.৫	—
বাহারিন	৩.১	২.৭	—	৪০.০	৩৪.৮	—	৫৬.৯	৬২.৫	—
মিশর	৪২.৫	৩৯.৭	—	২২.০	২২.২	—	৩৫.৫	৩৮.১	—
ইসরায়েল	৫.৯	৫.৫	৫.২	৩১.৯	৩০.৩	২৯.৪	৬২.২	৬৪.২	৬৫.৫
সিরিয়া	৩২.৮	৩০.৬	—	৩১.২	২৯.২	—	৩৫.৯	৪০.১	—
তিউনিসিয়া	৩৫.৫	৩২.৯	—	৩৪.৩	৩৫.৯	—	৩০.২	৩১.২	—
হংকং	১.২	১.২	১.৫	৫০.৬	৪৫.০	৪২.৯	৪৮.২	৫৩.৮	৫৫.৫
উত্তর কোরিয়া	৩৫.৮	২৯.৮	২১.৯	৩০.১	২৯.১	৩৪.০	৩৪.১	৪১.১	৪৪.১
মালয়েশিয়া	৩৭.২	৩০.৬	৩১.৮	২৪.১	২৫.৯	২৩.২	২৮.৭	৪৩.৫	৪৫.০
পাকিস্তান	৫৫.০	৫২.৯	৫০.৯	১৮.৫	১৯.৫	২০.৩	২৬.:৫	২৭.৬	২৮.৯
ফিলিপাইনস	৫২.৯	৫২.০	৪৭.৮	১৫.৪	১৩.৮	১৪.৬	৩২.৮	৩৪.২	৩৭.৬
সিঙ্গাপুর	১.৫	১.০	০.৯	৩৫.৩	৩৬.০	৩৫.১	৬৩.২	৬৩.০	৬৪.০
থাইল্যাণ্ড	—	৬৩.১	৬৩.৮	—	১৩.০	১২.৫	—	২৩.৮	২৩.৭

পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হবে যে (ক) কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমজীবীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে (খ) পরিষেবা ক্ষেত্রে শ্রমজীবীর সংখ্যা ক্রমবর্ধিষ্ণু;(গ) উন্নত দেশগুলিতে পরিষেবাতে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা মোট শ্রমজীবীর অর্ধাংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের পর শিল্প বিকাশের যে গতি ছিল এবং কৃষিতে শ্রমজীবীর সংখ্যাকে অতিক্রম করতে শিল্প-ক্ষেত্রের যে সময় লেগেছিল বর্তমানে পরিষেবার ক্ষেত্রে সেই গতি বহুগুণ দ্রুত। মাত্র তিন দশকের মধ্যে পরিষেবায় শ্রমজীবীর মোট সংখ্যা কৃষি ক্ষেত্রের মোট শ্রমজীবীর সংখ্যাকে এবং দুই দশকের মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রের মোট শ্রমিকের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, নানা চরিত্রের পরিষেবা উৎপাদনের সাথে তাদের সম্পর্ক, সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রভৃতিতে তাদের নানা পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের ফলে তারা আদৌ হোমাজিনিয়াস বা সমরূপ-সম্পন্ন নয়। স্বভাবতই শিল্প-শ্রমিকদের মতো কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীরূপ এই অংশের শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য অর্জিত এখনও হয়নি। কিন্তু আধুনিক শ্রম-প্রক্রিয়াতে নিঃসন্দেহে এরা ধীরে ধীরে পরিণত শ্রমজীবী হয়ে উঠছে। সুতরাং অর্থনৈতিক স্তরেই নয়, শ্রমজীবীদের স্তরেও পরিষেবার শ্রমিক-কর্মচারীরা হয়ে উঠছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের প্রথম ও সর্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রের উপর। এখানে কর্মরত মানুষদের মজুরি অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে উন্নত মনে হলেও, এখন নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের উপর আক্রমণ

সর্বাপেক্ষা তীব্র হয়েছে। প্রথমত, পরিষেবা ক্ষেত্রের অধিকাংশই ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিসাবে। তৃতীয় দুনিয়ার প্রায় সব দেশে সেগুলিকে বেসরকারী মালিকদের কাছে বিক্রি অথবা পরিণত করা হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চারে। এখনও যেগুলি পূর্ব অবস্থাতেই রয়েছে সেখানে সেগুলির জন্য সরকারী বাজেট বরাদ্দ, ভর্তুকি প্রভৃতি হয় সম্পূর্ণ বন্ধ বা প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্ব-নির্ভর ও লাভজনক করার। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথমাবধি সাধারণভাবে ছিল শ্রম-নিবিড়। এখন এগুলিকে ধীরে ধীরে পুঁজি-নিবিড়ে পরিণতকরা হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থার ফলে খরচ কমানোর পদ্ধতি হিসাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি সংকোচন, অন্যান্য ভাতা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বন্ধ বা কমিয়ে দেওয়াই কেবল নয়, ব্যাপকভাবে ছাঁটাইও শুরু হয়েছে। তাছাড়া থোক টাকার বিনিময়ে স্বেচ্ছা-অবসর, বয়স্কদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো তো আছেই। প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানোর নামে শ্রমিক-কর্মচারীদের বাধ্য করা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনতে। দ্বিতীয়ত, যেসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ ঘটছে সেগুলি জাতীয় একচেটিয়া পুঁজি বা বহুজাতিক সংস্থা ক্রয় করছে। ক্রয় করার প্রথম শর্তই হলো শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কমানো, নিম্ন মজুরিতে নিয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানের কাছে কর্মীদের পুরানো আর্থিক দায় গ্রহণ না করা। এতেও বিশাল সংখ্যায় কর্মজীবীরা ছাঁটাই হচ্ছে। তৃতীয়ত, পরিষেবাতে নতুন প্রযুক্তির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। পরিষেবাতে মানসিক শ্রমের ভর সাধারণভাবে বেশি হওয়ার ফলে আধুনিক কারিগরীর সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ও ব্যাপক প্রয়োগের সুযোগ ও সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি। পরিষেবার যত দ্রুত আধুনিকীকরণ হচ্ছে ততো দ্রুত শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কমছে; নতুন যে ধরনের শ্রমের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তা' প্রথাগত শ্রম নয় স্বভাবতই পরম্পরাগত শ্রমিকের কর্মসংস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটছে না। চতুর্থত, পরিষেবার ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির, বিশেষত মালটিন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলি এবং মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে দেশীয় পুঁজি (তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে) কোনভাবেই দাঁড়াতে পারছে না। এইভাবে, রাষ্ট্রীয় পরিষেবার প্রতিষ্ঠানগুলি শুকিয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দুর্দশাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। পঞ্চমত, প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমিকদের চেতনা, ঐক্য, সংগঠন ও আন্দোলনের স্তর, উন্নত-অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে সদ্য গঠিত হচ্ছে, অথচ এই ক্ষেত্রে কর্মজীবীর সংখ্যা আকস্মিকভাবে যেমন বিপুল হয়েছে, শোষণের তীব্রতাও হয়ে উঠছে প্রখরতর।

(চ) আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি-বহির্ভূত অর্থনীতিতে শ্রমিক

শিল্প-বিপ্লবের কাল থেকেই আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির বাইরে উপাঙ্গ-অর্থনীতির অবস্থান রয়েছে। তবে ফর্মাল বা আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের বাইরে ইনফর্মাল বা অ-আনুষ্ঠানিক তথা অসংগঠিত ক্ষেত্র নিয়ে গভীরভাবে বিচার শুরু হয়েছে সত্তরের দশকের শুরু থেকে। আশির দশকের প্রারম্ভ থেকে আধুনিক প্রযুক্তি-ভিত্তিক উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়া, আই এম এফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নির্দেশিত স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এর সূত্রপাত ও ১৯৮৯ সাল থেকে "নতুন ধরনের" বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের প্রক্রিয়াতে 'ইনফর্মাল সেক্টর' নতুন চরিত্র ও তাৎপর্য অর্জন করেছে। এই কাল-পর্বে ইনফর্মাল সেক্টর পরোক্ষে নতুন অর্থনীতির অন্যতম সংবাহক কেবল নয়, এক প্রয়োজনীয় উপাদানও হয়ে উঠেছে। যদিও একথাও সত্য যে ইনফর্মাল সেক্টরের অর্থনীতির অভ্যন্তরে যেমন অজস্র দ্বন্দ্ব রয়েছে, অন্যদিকে ফর্মাল সেক্টরের অর্থনীতির সাথেও রয়েছে এটির দ্বন্দ্ব। একইসাথে, পরস্পরের মধ্যে এই বৈপরীত্য ধনতন্ত্রের নতুন বিকাশ ঘটাতে দ্বান্দ্বিক ঐক্যও সৃষ্টি করে চলেছে।

গ্রেসুনি এবং পহান (সি. লিটলার সম্পাদিত 'দ্য এক্সপিরিয়েন্স অব ওয়ার্ক' পুস্তকের 'ব্রিটেন ইন দ্য ডিকেড অব দ্য থ্রি ইকনমিজ' শীর্ষক নিবন্ধ, ১৯৮৫) দেখালেন অর্থনীতিতে সেক্টর বা ক্ষেত্র হিসাবে কৃষি, শিল্প ও পরিষেবার পাশাপাশি ঐ তিন সেক্টরের প্রত্যেকটির অভ্যন্তরকে তিনটি ধরনের কাঠামোগত রূপের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, ফর্মাল ইকনমি বা আনুষ্ঠানিক তথা সংগঠিত অর্থনীতির অংশ। এই অর্থনীতির ভিত্তিতেই সরকারীভাবে 'গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট' (জি.এন.পি.) বা মোট জাতীয়

উৎপাদন স্থির করা হয়। দ্বিতীয়ত, হিডেন বা অণ্ডারগ্রাউণ্ড ইকনমি তথা গুপ্ত বা অপ্রকাশ্য চরিত্রের অর্থনীতি। এতে আনুষ্ঠানিক অংশের মতো পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন ঘটলেও, আনুষ্ঠানিক মূল অংশ থেকে ব্যতিক্রম হিসাবে এখানে কাজ হয় নগদে অথবা পণ্য বিনিময়ের দ্বারা বাণিজ্যে (বার্টার)। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কর আরোপের সরকারী ব্যবস্থার কাছে কিংবা অন্যান্য বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কাজগুলি গোপন রাখা হয়। তৃতীয়ত, হাউসহোল্ড বা কমিউনাল ইকনমি তথা গৃহস্থালি বা গোষ্ঠীমূলক অর্থনীতি। এখানে পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন নগদ টাকা বা পণ্য বিনিময়ের দ্বারা বাণিজ্যের মাধ্যমে ঘটে না। পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় করার পরিবর্তে এটি সম্পন্ন হয় গৃহস্থালি অথবা পারিপার্শ্বিক বিকল্প সামগ্রীর বিনিময়ের দ্বারা।

সত্তরের দশকে সমাজ-বিজ্ঞানীরা সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র নিয়ে যখন কাজ শুরু করেন তখন আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি মুমূর্ষু হয়ে পড়ছিল। ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার পতনের অব্যবহিত পর এই নতুন স্তরের আর্থিক তৎপরতার ব্যাপক সূত্রপাত ঘটে। তখন কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছিল, অথবা অল্প সময়ের জন্য শ্রমিক নিয়োগ ঘটছিল কিংবা চলছিল মজুরি সংকোচন; বাড়ছিল বেকারী, শিল্পে মন্দা, অর্থনীতিতে স্ট্যাগফ্লেশন বা মন্দাস্ফীতি। তখনই অনুমান করা হচ্ছিল যে এই পরিস্থিতির জন্য নতুন ধরনের সুপ্ত অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত হবে। কিন্তু আশির দশকের শুরু থেকে ভিন্ন প্রবণতা দেখা গেল। 'হিডেন ইকনমি'তে সক্রিয় সেলফ-এমপ্লয়েড বা স্ব-নিয়োজিতরা, যারা নিজেদের উপার্জন বা লাভে ইনকাম ট্যাক্সের চৌহদ্দি এড়িয়ে চলতো, তাদের সংখ্যা ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে কমছে। কারখানা বন্ধ বা বেকারী বাড়তে থাকায় অন্যের অলক্ষ্যে ও বেআইনিভাবে কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিনা খরচে ব্যবহার করার সুযোগ স্ব-নিযুক্তদের কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কেননা এইসব শ্রমজীবীরা হিডেন ইকনমিক তৎপরতায় নিজেদের কর্মক্ষেত্র—কারখানাকেই বেআইনিভাবে ব্যবহার করতো, ব্যবহার করতো কারখানার যন্ত্রপাতিও। সরকার ও কর দপ্তরের তৎপরতাও এই অর্থনীতির বিরুদ্ধে এই সময় বৃদ্ধি পায়। এগুলি ছিল সাময়িকভাবে 'হিডেন ইকনমি'র শ্লথ হওয়ার বাহ্য কারণ। নতুন বিশ্বায়নের ব্যবস্থায় মুক্ত বাজার অর্থনীতি, মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বেসরকারীকরণ, অর্থনীতিতে সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা হ্রাস, উৎপাদনমূলক বাজার থেকে ফিনান্সিয়াল মার্কেটে ভর বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে যেসব সুপ্ত প্রবণতা ও উপাদান সৃষ্টি হচ্ছিল তা' সমাজ-বিজ্ঞানী বা প্রথাগত অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টির মধ্যে সর্বাংশে আসেনি প্রথমে। কিন্তু এরপর দেখা গেল যে নতুন ধরনের ইনফর্মাল সেক্টর অতীব প্রকাশ্য রূপ নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। তখনও অ-আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ধারাকে কেবলমাত্র পশ্চাৎপদ দেশসমূহের অর্থনীতির উপাদান বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। অথচ এশিয়ার প্রবল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিউলি ডেভেলপিং ইকনমিকস-এর দেশগুলির (দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি) আত্মপ্রকাশ করার পিছনে দেখা যাচ্ছিল এই অ-আনুষ্ঠানিক ও সুপ্ত অর্থনীতির ভূমিকা ছিল দারুণ গুরুত্বপূর্ণ।

এইরকম পরিস্থিতিতে ইনফর্মাল সেক্টরকে সংজ্ঞায়িত করার কাজ যথেষ্ট গোলমেলে সমস্যা হিসাবে দেখা দেয় অর্থনীতির গবেষকদের কাছে। কেনিয়াতে ইনফর্মাল সেক্টরে নিয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে, এটির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে প্রথমের দিকে ক্ষেত্রটি সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছিল। সেগুলি হলো : ক্ষেত্রটি শ্রমজীবীদের কাছে সহজলভ্য, স্থানীয় সম্পদের উপর ক্ষেত্রটির নির্ভরশীলতা, পারিবারিক মালিকানা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ, শ্রম-নিবিড় চরিত্রের উৎপাদন, উৎপাদনের প্রয়োজনের উপযোগী করে নেওয়া প্রযুক্তির ব্যবহার, ধ্রুপদী পদ্ধতি-বহির্ভূতভাবে শ্রমিকদের দক্ষতা অর্জন করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং অনিয়ন্ত্রিত ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার। মোটামুটি এই ছিল ইনফর্মাল সেক্টর সম্পর্কে সাধারণ চরিত্রায়ণ। পরবর্তীকালে চেষ্টা হয়েছিল ফর্মাল সেক্টরের সাথে তুলনা-ভিত্তিক এক সংজ্ঞা স্থির করার। এইসব গবেষকদের বক্তব্যে সংক্ষিপ্তসার ছিল : ইনফর্মাল সেক্টরের সবিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো স্ব-নিযুক্তি আরোপের সরকারী ব্যবস্থা, পাশাপাশি ফর্মাল সেক্টরের বৈশিষ্ট্য হলো মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগ; সরকার আরোপিত আইনি ও প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন প্রথমোক্তরা মেনে চলে না

আদৌ, অন্যদিকে ফর্মাল সেক্টর তা' করে। রাশি-বিজ্ঞানের সাহায্যে ইনফর্মাল সেক্টরের সমস্ত ধরনের পরিসংখ্যান নির্ধারণ করা যায় না, ফর্মাল সেক্টরে তা' করা যায়।

ইনফর্মাল সেক্টরের অন্যতম অংশ—হিডেন ইকনমির গুরুত্ব কোথায়, তা' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফিনেগ্যান (ডীম ও সালাঘান সম্পাদিত 'ওয়ার্ক, কালচার অ্যাণ্ড সোসাইটি' ১৯৮৫ পুস্তকের নিবন্ধ 'ওয়ার্কিং আউটসাইড ফর্মাল এমপ্লয়মেন্ট') বলেছেন যে এই অর্থনীতির তিনটি চরিত্র রয়েছে। প্রথমত, বেআইনি বা আইন এড়িয়ে এক ধরনের সিঁধেল চুরি। অর্থাৎ এক জায়গাতে কর্মরত থেকেও কর্তৃপক্ষের অগোচরে মাঝে মাঝে অন্য কাজ করে অর্থ উপার্জন। দ্বিতীয়ত, এক প্রতিষ্ঠানের চাকুরী করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে বাড়িতে বসে কাজ করা। তৃতীয়ত, আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কর্ম ও কর্ম-সময় থেকে একাংশ চুরি করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিষ্ঠানের যন্ত্র সামগ্রী বা কাঁচামাল প্রভৃতি হাতিয়ে নিয়ে অল্প মূল্যে বা কম মজুরিতে অন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করে দেওয়া বা নিজে সেগুলি দিয়ে সামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করা। আইন অনুসারে এগুলিকে চুরি বা দুর্নীতি বলে চিহ্নিত করা চলে বটে, কিন্তু বিশ্ব-উৎপাদন ও অর্থনীতিতে তথাকথিত আইনি ব্যবস্থার সমান্তরালে এই জাতীয় তৎপরতা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এমনকি কোন কোন ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প বা ব্যবসা অতীতেও এই ধরনের হিডেন বা গুপ্ত উৎপাদনের দ্বারা ছিল পুষ্ট। তবে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকাশ্য ও আইনি রূপ থাকার ফলে গুপ্ত উৎপাদন পর্যবসিত হতো স্বাভাবিক উৎপাদনে। পুঁজিবাদী উৎপাদনকে আইনি বলা হলেও এটির সমগ্র কাঠামো, পুঁজি, মুনাফা প্রভৃতির মধ্যে ব্যাপক বেআইনি ও গুপ্ত দিক রয়েছে; সামাজিক নীতির নিরিখে সেগুলি নিঃসন্দেহে বেআইনি, দুর্নীতিমূলক ও সর্বস্তরের মানুষকে শোষণকারী। হিডেন বা গুপ্ত উৎপাদন ও অর্থনীতি সেই ব্যবস্থারই অঙ্গ। এগুলিকে বেআইনি ও গুপ্ত বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল মনোপলি তথা একচেটিয়ার পুঁজির পক্ষ থেকে। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদন-মূল্য, বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে, হিডেন ইকনমির উৎপাদন-মূল্যের তুলনায় বেশি হওয়ায় পিছিয়ে পড়ছিল বৃহৎ উৎপাদকরা। স্বভাবতই গুপ্ত উৎপাদনকে দুর্নীতি বলে প্রচার করা হতো। গুপ্ত উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের দায়ী করা হলেও, আসলে কাজগুলি হয় একাংশ মালিক ও শিল্পের জন্য এবং তাদের প্রশ্রয়ে ও সাহায্যে। অন্যদিকে এই গুপ্ত উৎপাদনেও শ্রমিকদের শোষণ করা হয় তীব্রভাবে; উৎপাদনের অন্য ক্ষেত্রের তুলনায় কম মজুরি পায় তারা।

বর্তমান অর্থনীতি ও উৎপাদন বাণিজ্যে অভূতপূর্ব আধুনিকতা ও অগ্রগতি সত্ত্বেও, এই গুপ্ত উৎপাদন ও অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে। আসলে আধুনিকতার অঙ্গ হয়ে উঠেছে এই গুপ্ত ব্যবস্তা। নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র শ্রম-কাঠামো ও তাদের বাহ্যিক রূপ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে এবং শ্রমের বাজারের স্তরে গুপ্ত ব্যবস্থা এখন এক অন্যতম উপাদান। কর্মক্ষম বা বেকার শ্রমিককে এই জাতীয় অর্থনীতি ও উৎপাদনে যুক্ত হতে বাধ্য করছে ক্রমবর্ধমান দুর্দশা।

আন-অরগানাইজড সেক্টরে সেলফ-এমপ্লয়মেন্ট বা স্ব-নিযুক্তি একটি শ্রম-ব্যবস্থা। অনুন্নত দেশগুলিতে অতীত থেকে এবং উন্নত দেশগুলিতে ১৯৮৯ সালের পর থেকে, কৃষি-ভিত্তিকও নয় আবার মজুরি ব্যবস্থাযুক্ত নয় এমন কিছু ক্ষেত্রে স্ব-নিযুক্তি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

উন্নত দেশগুলিতে স্ব-নিযুক্তির হার বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট কালের মন্দাজনিত সমস্যার সাময়িক সমাধান বলে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে তা' সবটা সত্য নয়। পরবর্তীকালে লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তন ঘটছে স্ব-নিযুক্তির চরিত্রে। এখন স্ব-নিযুক্তদের ৭০ শতাংশ কাজ করছে সার্ভিস বা পরিষেবাতে, বিশেষত রেস্টুরেন্ট ও হোটেলে, জমি ও বাড়ির লেনদেনের কারবারে, ব্যবসায়িক পরিষেবায়, ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি কাজ প্রভৃতিতে। সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় স্ব-নিযুক্তি বিশেষত করে বেড়েছে পরিষেবার নতুন ক্ষেত্রগুলিতে যেমন—জমি ও বাড়ির ব্যবসা, ব্যবসায়িক পরিষেবা এবং বিনোদন ও সাংস্কৃতিক পরিষেবাতে। আরও লক্ষণীয় যে স্ব-নিযুক্তি বেড়েছে পেশাদার (প্রফেশনাল), প্রযুক্তিবিদ ও পরম্পরাগত পরিষেবা কর্মীদের মধ্যেও। অধিকাংশ দেশের স্ব-নিযুক্ত শ্রমজীবীদের ব্যাপক অংশ হলো পুরুষ এবং সম-ধরনের মজুরিভোগী ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিতদের তুলনায় বয়সে প্রবীণ, যদিও বর্তমানে মহিলা ও যুবকদের

মধ্যেও এই সংখ্যা বর্ধিষ্ণু।

নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বয়ং যেমন স্ব-নিযুক্তি ব্যবস্থা বৃদ্ধির কারণ অন্যদিকে অন্যতম কারণ হলো সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেকারী বৃদ্ধি। কর্মক্ষমদের শ্রম-বাজারে প্রবেশ করার পর বৃত্তির সংস্থান না হওয়া ছাড়াও, শিল্পের বেসরকারীকরণ বা কারখানা-দপ্তর বন্ধ হয়ে যাওয়া, ছাঁটাই, লে-অফ প্রভৃতি কারণে স্ব-নিযুক্তি ব্যবস্থাতে যুক্ত হচ্ছে বিপুল সংখ্যক মানুষ। বর্তমানে নতুন ধরনের শ্রম-সময় ব্যবস্থা ও কাঠামোতে শিল্পে সামান্য কিছু দক্ষ ও কর্মস্থলের উপযোগী (কোর) শ্রমিক দরকার হচ্ছে। বাকি কাজ করানো হচ্ছে 'পেরিফেরি' বা পরিসীমার শ্রম দিয়ে। এই প্রান্তিক প্রয়োজনের জন্যও স্ব-নিযুক্তির সুযোগ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে স্ব-নিযুক্তির অর্থ স্বয়ং ব্যবসা করা নয়। কেননা ব্যবসাতে প্রয়োজন হয় পুঁজির। সেই পুঁজির সংস্থানের সুযোগ এইসব অংশের মানুষের নেই। তাই স্ব-নিযুক্তি হলো শ্রম ও দক্ষতার বিনিময়ে অনিয়মিতভাবে উপার্জন। স্বভাবতই স্ব-নিযুক্তিতে কর্মজীবীদের মজুরি তুলনামূলকভাবে কম ও অনিয়মিত। তাছাড়া শ্রম আইন, সামাজিক নিরাপত্তা, অবসরের সুযোগ প্রভৃতি এই ব্যবস্থায় কার্যত নেই।

আশির দশক থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ইনফর্মাল সেক্টরের ব্যাপক প্রসার ঘটার ফলে, অতীতের তিনটি দশকের তুলনায় নিয়োগ-কাঠামোতে ভরের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। নিয়মিত মজুরী-ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিযুক্তির কাঠামো থেকে ভর সরে আসতে থাকে অনিয়মিত, ইনফর্মাল চরিত্রের কাজে। ১৯৮০-৮৭ সালের মধ্যে, লাতিন আমেরিকাতে ইনফর্মাল সেক্টরে বছরে ৬.৬ শতাংশ হারে মোট ৫৬ শতাংশ নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটেছে। ইনফর্মাল সেক্টরের এই অগ্রগতি বেকারীর ব্যাপকতার পরিস্থিতিতে সৃষ্টি করে কিছুটা ভারসাম্যও। ইনফর্মাল সেক্টর কতো গুরুত্ব ও ভূমিকা অর্জন করেছে তার অন্যতম প্রমাণ হলো, ঐ সময়কালে মজুরিভোগী নিয়োগ ঘটেছিল বৃহৎ শিল্পে ৩.৩ শতাংশ ও ছোট শিল্পে ৫৫.৪ শতাংশ।

ইনফর্মাল সেক্টরে নিয়োগের সমগ্র চরিত্রকে বলা হচ্ছে 'টার্সিয়ারাইজেশন অব এমপ্লয়মেন্ট' বা নিয়োগের তৃতীয় পর্যায়ীকরণ। মন্দা-কবলিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বাঁচাতে পরিকল্পিতভাবে নিম্ন-উৎপাদনশীলতামূলক পরিষেবা-তৎপরতাভিত্তিক ইনফর্মাল সেক্টর গঠন এবং শ্রম-নিয়োগের চরিত্রের অবমূল্যায়ন করে নিয়োগকে চারিত্রিক দিক থেকে তৃতীয় নিম্নস্তরে টেনে আনার ব্যবস্থা হলো। অবশ্য এই সেক্টরকে কার্যত তিন দশক থেকে "আবিষ্কার" করা হয়েছিল উপ-সাহারীয় দেশগুলিতে। সেখানে ১৯৮০ থেকে ৮৫ সালের মধ্যে ইনফর্মাল সেক্টরে নিয়োগ ঘটেছিল বছরে ৬.৭ হারে যা শহুরে বেকার বৃদ্ধির হারের চেয়ে এবং ফর্মাল সেক্টরে নিয়োগের অনুপাতে বেশি ছিল। এখন সারা বিশ্বেই ইনফর্মাল সেক্টরকে বলা হচ্ছে 'আর্বান লেবার সোক্' বা স্পঞ্জ বা শহুরে বাড়তি শ্রম শুষে নেবার ব্যবস্থা। অর্থাৎ এই ক্ষেত্র হলো দৃশ্যমান বেকারীকে নিয়োগের মুখোশ পরানোর প্রথা। তবে এতটুকু বললে সমগ্র বিষয়টির গুরুত্বের অবমূল্যায়ন ও অতি সরলীকরণ করা হয়। আসলে পুঁজিবাদের বর্তমান কার্যকলাপের অবিভাজ্য অংশ যেমন এই ক্ষেত্রটি, একই সাথে সমগ্র শ্রম-প্রক্রিয়ার অন্যতম উপাদানও।

তৃতীয় দুনিয়ার নগর ও শহরাঞ্চলে শহুরে দরিদ্র মানুষ উপযুক্ত আবাসের অভাবে নিজেরাই ফাঁকা জমি, রেল লাইনের ধারে বা পরিত্যক্ত এলাকায় স্বীয় শ্রম এবং যা কিছু যোগাড় করতে পারে তা' দিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই বানিয়ে নিচ্ছে। কর্মে নিয়োগের সুযোগের অভাবে এরা বাধ্য হচ্ছে নানা ধরনের পরিবার-ভিত্তিক শ্রম-প্রধান বা নিবিড় ব্যবসা বা শ্রম বিক্রি করে অন্নের সংস্থানটুকু করতে। রাস্তা-ঘাটে ফল-মূল, শাক-সব্জী, মনোহারী সামগ্রী, ফাস্ট ফুড প্রভৃতির ভেণ্ডার বা হকার ব্যবসাবৃত্তি কর্ম-সংস্থানের বিকল্প হয়ে উঠেছে। এইভাবেও প্রসারিত হচ্ছে ইনফর্মাল সেক্টর।

অতীতে ইনফর্মাল সেক্টরকে সরকারগুলি অবজ্ঞা এবং পরিকল্পকরা অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রান্তীয় বলে উপেক্ষা করতো। এঁদের মত ছিল যে ইনফর্মাল সেক্টর শহরের পরিষেবা ও পরিবেশকে বিনষ্ট করে, সরকারী বা পৌর কর না দিয়ে ক্ষতিসাধন করে, এই সেক্টরের কাজকর্ম এলোমেলো এবং এদের কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক ভূমিকা নেই প্রভৃতি। মধ্য-সত্তর ও আশির দশক থেকে

দ্বিতীয় ভাবনা দেখা দিতে থাকে সরকার ও পরিকল্পকদের মধ্যে। তাঁরা উপলব্ধি করা শুরু করে এই সেক্টরের ব্যাপকতা ও তীব্রতা। তারা মনে করতে শুরু করে যে, পরবর্তী কয়েক দশক ধরে শহুরে কর্মসংস্থানের এবং শহুরে পরিষেবার নতুন ভিত্তি হবে ইনফর্মাল সেক্টর।

বর্তমানে এই ভাবনা আরও স্পষ্ট রূপ নিয়েছে তাদের প্রয়োজনেই। স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের দরুন শ্রম-বাজারের যে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাতে ফর্মাল থেকে ইনফর্মাল সেক্টরে ভরের প্রসার আরও নতুন নতুন দিকে ঘটছে; বিশেষত আরও এই কারণে যে, স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের ফলে বেকারী বাড়ছে। বেকারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ বাড়ছে বিশেষত সেইসব দেশে যেখানে বেকারীর কোন রক্ষাকবচ, যেমন আন-এমপ্লয়মেন্ট ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি ব্যবস্থা কার্যত নেই। তাছাড়া কাঠামোগত সংস্কারের ফলে ফর্মাল সেক্টরে ব্যাপক লে-অফ হওয়ায় শ্রমিকরা কাজের সন্ধানে নামছে; নারী ও পরিবারের মানুষেরাও আর্থিক অনটন কমাতে শ্রমের বাজার অভিমুখী হচ্ছে। তাছাড়া ইনফর্মালাইজেশন অব এমপ্লয়মেন্ট বা বৃত্তির অ-প্রথাগতকরণ স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হচ্ছে। এই ইনফর্মালাইজেশন-এর প্রক্রিয়া তীব্র হয়ে উঠেছে প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবং এশিয়া, উপ-সাহারীয় আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকাতে। শেষোক্ত দেশগুলিতে অতীত থেকে ইনফর্মাল সেক্টরের সবল অস্তিত্ব থাকলেও, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। শেষোক্ত দেশগুলিতে ফর্মাল সেক্টরের প্রবল অধোগতি ঘটছে।

বিশ্ব-সামাজিক স্তরে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত

বর্তমান বিশ্ব-সমাজ যে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে তা' সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। প্রথমদিকে পরিবর্তনের লক্ষণগুলিকে মনে করা হয়েছিল একান্ত পশ্চিমী বলে। কিন্তু এখন অনুভূত হচ্ছে যে এই প্রক্রিয়া আঞ্চলিক এবং উন্নত দুনিয়ার একান্ত নয়, সর্বজনীন চরিত্রের। বর্তমানে সৃষ্ট সামাজিক পরিবর্তনের অজস্র দিক ও মাত্রাসমূহ আলোচনা করার সামর্থ্য ও সুযোগ এখানে নেই। তবে প্রাসঙ্গিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ও লক্ষণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

ষাট ও সত্তরের দশকে বিশ্ব-সমাজের সদ্য-উদ্ভিন্ন পরিবর্তনের লক্ষণগুলি নিয়ে প্রধানত অর্থনীতির ভিত্তিতে নানা তত্ত্ব ও বিতর্ক ব্যাপকভাবে হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে উৎপাদন, শ্রম, বাজার, শ্রেণী ইত্যাদি প্রসঙ্গে বাস্তবতা ও আলোচনা কিছুটা বর্ণিত হয়েছে প্রথম খণ্ডে। বুর্জোয়া উদারনীতিক অর্থনীতিবিদ বা সমাজতাত্ত্বিকদের সেকালের অধিকাংশ বক্তব্য ও প্রস্তাব পরবর্তীকালে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। তবে একথা সত্য যে ব্যাপক পরিবর্তনের একটা ঢেউ যে আসন্ন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। সেই সব তত্ত্ব ও বিতর্কগুলি আসন্ন পরিবর্তনের প্রসঙ্গে প্রাথমিক সাড়া দেবার চেষ্টা করেছিল। আশির দশকের শেষার্ধ থেকে পরিস্থিতি যখন কিছুটা স্পষ্টতর হয়েছে, তখন গবেষণাগুলি আরও অনেকটা ঘনীভূত রূপ পেতে শুরু করে।

উদারনীতিক ও স্বঘোষিত বামপন্থী সমাজতাত্ত্বিকদের একাংশ বর্তমান বিশ্বকে 'পোস্ট-মডার্নিটি' বা আধুনিকোত্তর বলে চিহ্নিত করেছেন অর্থাৎ আধুনিকতা অতিক্রমকারী এক অধ্যায় হিসাবে। পাশ্চাত্য সমাজকেই প্রথমদিকে এইভাবে উল্লেখ করা হচ্ছিল। এঁরা বলেন যে এই পোস্ট-মডার্নিটি প্রভূত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং সেগুলিকে প্রধানত চারটি দিক থেকে বিচার করা যায়—সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।

(ক) সামাজিক : ধনতন্ত্রের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বহন করে এনেছিল সামাজিক শ্রেণীগুলিকে (সোস্যাল ক্লাসেস)। এটা ছিল সামাজিক কাঠামো (সোস্যাল স্ট্রাকচার) ও সামাজিক পৃথকীকরণের (সোস্যাল ডিফারেন্সিয়েশন) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এই আধুনিকোত্তর সমাজে সামাজিক শ্রেণী প্রসঙ্গ আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন সামাজিক কাঠামো অনেক বেশি খণ্ড খণ্ড এবং জটিল। এখন পৃথকীকরণের উৎস অজস্র। সেগুলির প্রতিফলন কেবল শ্রেণীর উপর পড়ছে না, বিভক্তিকরণ এখন ঘটছে লিঙ্গ, জাতি, বয়স ইত্যাদির ভিত্তিতেও।

(খ) সাংস্কৃতিক : পোস্ট-মডার্নিটির তাত্ত্বিকদের অনেকে সাংস্কৃতিক উপাদানকে কেন্দ্রীয় স্থান দিয়েছেন। একে নিয়ন্ত্রণ করছে কালচারাল ইণ্ডাস্ট্রি (সংস্কৃতি শিল্প-ব্যবস্থা অর্থাৎ টেলিভিশন, রেডিও, সিনেমা, ভিডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদি)। প্রাত্যহিক জীবনের নন্দনায়ন (ইসেথেটাইজেশন) ঘটছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ক্রমাগত নান্দনিক হয়ে উঠছে। একে বলা চলে সাংস্কৃতিক প্রকল্প (কালচারাল প্রোজেক্ট) অর্থাৎ পরম্পরাগত ঐতিহ্য বা আরোপিত প্রথার পরিবর্তে, প্রত্যেক মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা গঠনে ব্যবহার করছে নিজের রুচি ও ইচ্ছাকে। এইভাবে, সমগ্র জীবন-প্রবাহ ও বিভিন্ন সামজিক স্তরগুলির অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও পরিচিতি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে; তার ফলে, ব্যবধান (স্পেস) ও সময়ের (টাইম) বিষয়ে মানুষ অভিজ্ঞ হচ্ছেন বিভিন্নভাবে।

(গ) অর্থনৈতিক : আধুনিক সমাজে প্রাধান্য ছিল ফোর্ডবাদী প্রথার উৎপাদন ও বাজারের। ফোর্ডবাদী প্রথাতে, গণ-বাজারের জন্য, আধা-দক্ষ শ্রমিকদের ব্যবহার করে বৃহদায়তন শিল্পগুলি পণ্য উৎপাদন করতো গণ-উৎপাদনের পদ্ধতিতে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যবহৃত হতো এবং জাতীয় স্তরের ট্রেড ইউনিয়নকে দেওয়া হতো মজুরির বিষয়ে দর-কষাকষির সুযোগ। কিন্তু পোষ্ট-মডার্ন সমাজে, এর বিপরীতে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা হলো ফোর্ডোত্তর। বহুধা-দক্ষ শ্রমিককে ব্যবহার করে বিশিষ্টতামূলক উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা থেকে গৃহীত হচ্ছে থোকে থোকে উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা এখন। বাজার এখন খণ্ড খণ্ড ও খোপ খোপ ধরনের—কেননা সমস্ত মানুষ একই ধরনের পণ্যে উৎসাহী নয়। প্রতিষ্ঠানগুলি আয়তনে ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং উৎপাদনের ভর বাড়ছে উপ-ঠিকাদারী প্রথায়। ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে শ্রমজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গঠনের জন্য। উৎপাদকদের চাহিদামত শ্রমজীবীদের সামাজিক সম্পর্ক গঠনের চেষ্টা হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশে হয় বিরত থাকছে বা যুক্ত হচ্ছে না, কেবলমাত্র কারখানা-স্তরে সামান্য কিছু ভূমিকা নিচ্ছে। তাছাড়া, ফোর্ডোত্তর অর্থনৈতিক সংগঠনের একটি দিক হলো বাজারভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক গঠনের দ্বারা আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের অপসারণ ঘটানো।

(ঘ) রাজনৈতিক : আধুনিক সমাজের অন্যতম চরিত্র ছিল শক্তিশালী ও সংহত সরকার, কল্যাণকারী রাষ্ট্র, গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, জনগণকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পরিষেবা দান এবং অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের কার্যকরী হস্তক্ষেপ। আধুনিকোত্তর সমাজ স্বানির্ভরতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাজার ও ব্যক্তিগত মালিকানার মনোভাবকে সক্রিয় করে পূর্বতন এইসব রাষ্ট্রীয় তৎপরতার অপসারণ ঘটচ্ছে। ফলাফল হলো যে কল্যাণকারী রাষ্ট্রের বহু কর্তৃত্ব ও ভূমিকা বাতিল হচ্ছে। সামান্য কিছু সুযোগ ও পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে নিতান্ত অক্ষম অংশকে; বাকি জনগণকে সব কিছুই ক্রয় করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে এবং সরকার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে অর্থনীতির সমস্ত দিকের ব্যবস্থাপনা থেকে।

নতুন যুগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও সেবিষয়ে বিশেষণ প্রয়োগে অন্য বক্তব্যও রয়েছে। যাঁরা মনে করেন যুগের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তা' প্রধানত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য, তাঁরাই প্রধানত 'পোস্ট-মডার্নিজম'-এর প্রবর্তক। অন্যদের মধ্যে কেউ গুরুত্ব দেন অর্থনৈতিক কারণের উপর, কোন অংশ উৎপাদন ও বাজারীকরণের উপর। কর্পোরেট এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যুগের এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে একাংশ দাবী করেন। ফলে নতুন যুগকে 'লেট ক্যাপিটালিজম', 'মালটিন্যাশনাল ক্যাপিটালিজম', 'পোস্ট-ফোর্ডিজম', 'ফ্লেক্সিবল অ্যাকুমুলেশন এজ' প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হচ্ছে। তবে আশির দশক থেকে যুগ সম্পর্কে বিচার এই ধরনের মূল্যায়ন ও নামকরণে থেমে থাকেনি। কোন বিশেষ উপাদানের ভিত্তিতে পূর্বোক্ত নামকরণগুলি ছাড়াও যুগ সম্পর্কে ধারণাতে যুক্ত হয় 'ইনফরমেশন এজ', 'ডিজিটাল এজ', 'ফ্রিকশন-ফ্রী ক্যাপিটালিস্ট এজ', 'ডিস-অরগানাইজ ক্যাপিটালিস্ট এজ' প্রভৃতি। 'পোস্ট-মডার্ন' অভিধার মতো অনেকটা সর্বজনীন চরিত্রের নামকরণ হিসাবে অপর যে নামকরণটি প্রথমে পরিচিত হয়েছিল তা' ছিল 'পোস্ট-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি'; তবে পোস্ট-মডার্ন ধারণার মতো শেষোক্ত তত্ত্বটি ততটা পূর্ণাঙ্গ ছিল না।

দু'জন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক—ফ্রেডরিক জেমেশন এবং ডেভিড হার্ভে মন্তব্য করেছেন যে 'মডার্নিটি'

ও 'পোস্ট-মডার্নিটি' ধনতন্ত্রের দুই স্বতন্ত্র স্তরকে চিহ্নিত করে (জেমেশন ঃ ফাইভ থেসিস অন অ্যাকচ্যুয়ালি এক্সিস্টিং মার্কসিজম, মান্থলি রিভিউ ৪৭, মে, ১৯৯৬; হার্ভে ঃ দা কনডিশন অব পোস্ট মডার্নিটি, ম্যাস, ১৯৯০)। এঁদের মতে, একটি থেকে অপরটিতে এই পরিবর্তনের অর্থ পুঁজিবাদ থেকে পুঁজিবাদোত্তর কোন যুগে প্রবেশ নয়, কেননা পুঁজির সমন্বয় ও পুনরুৎপাদনের মূল নীতি নতুন স্তরেও অপরিবর্তিত থাকছে। তবে, একই সাথে এঁরা মনে করেছেন যে ধনতন্ত্রের চরিত্রে সুবিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। এটা প্রতিফলিত হচ্ছে একটি বস্তুগত বাহ্যিক গঠন (মেটেরিয়াল কনফিগারেশন) থেকে অপর একটিতে যাওয়া এবং একটি সাংস্কৃতিক গঠন (কালচারাল ফর্মেশন) থেকে ভিন্ন একটিতে রূপান্তরে। জেমেশন লক্ষ্য করেছেন যে পোস্ট-মডার্নিটি সংলগ্ন হয়েছে 'লেট ক্যাপিটালিজম' তথা পুঁজিবাদের বহুজাতিক, 'ইনফরমেশনাল' বা তথ্যায়িত এবং 'কনজুমারিস্ট' বা ভোগবাদী নতুন ধরনের স্তরের সাথে। অন্যদিকে ফরাসী 'রেগুলেশন স্কুল'-এর অনুসরণে ডেভিড হার্ভে এই পরিবর্তনকে বলেছেন ফোর্ডবাদ থেকে 'ফ্লেক্সিবল অ্যাকুমুলেশন' তথা নমনীয় সঞ্চয়ের স্তরের আবির্ভাব। শেষোক্ত ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায় (যদিও ততটা উচ্চকণ্ঠে নয়) এস. ল্যাস ও জে. উরি-র 'ডিস-অরগানাইজড ক্যাপিটালিজম' বা অসংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্বে (দা এণ্ড অব অরগানাইজড ক্যাপিটালিজম, ইউনিভার্সিটি অব উইন-কনসিন প্রেস, ১৯৮৭)। শেষোক্তের মতে আধুনিকোত্তর যুগ সংলগ্ন হয়ে পড়েছে ধনতন্ত্রের সেই নতুন ধারার সাথে যেখানে মানক (স্ট্যাণ্ডার্ড) পণ্যের গণ-উৎপাদন ও সেটির সাথে যুক্ত সমস্ত ধরনের শ্রম অপসারিত হয়েছে 'ফ্লেক্সিবিলিটি'র দ্বারা। তার পরিবর্তে তথ্যায়িত প্রযুক্তির (ইনফরমেশনাল টেকনোলজি) সাহায্যে নতুন ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া যেমন 'লীন প্রোডাকশন', 'টীম কনসেপ্ট' ও 'জাস্ট-ইন-টাইম' প্রযুক্ত হয়েছে, পণ্যের বিশ্লিষ্টকরণ করা হচ্ছে ব্যক্তি-ভোক্তার রুচি ও চাহিদা-ভিত্তিক বাজারের জন্য, গঠন করা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল শ্রমশক্তি, গতিময় মূলধন ইত্যাদি।

পোস্ট-মডার্নবাদী মূল তাত্ত্বিকদের বাইরের অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে এবং মূলতত্ত্বের ভিত্তিকে কার্যত অস্বীকার করে, এলেন মেইকসিনস উড এই প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন ভিন্ন দিক থেকে। তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিকোত্তরবাদী অনেক তাত্ত্বিক-বর্ণিত পূর্বোক্ত পরিবর্তনগুলির চাইতে সমাজে অনেক বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটছে এবং তা' ব্যাপকভাবে; ডেভিড হার্ভে মনে করেছেন যে আধুনিকোত্তরতার ব্যাখ্যা করতে 'টাইম-স্পেস কমপ্রেশন' তথা সময় ও ব্যবধানের দু'দিক থেকে চাপ দিয়ে সংকোচনের পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন। কেননা, নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে এবং নতুন ধরনের বেতার যোগাযোগের অভ্যন্তরে, দ্রুতগতিসম্পন্ন নতুন পদ্ধতির উৎপাদন ও বাজারীকরণের ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে। তার ফলে সমাজে নতুন চরিত্রের ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন পদ্ধতির আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা সম্ভবপর হচ্ছে সময়ের ত্বরণ ও ব্যবধানের সংকোচন। এই দিকগুলির সম্মিলিত ফলাফল হলো—এক নতুন সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক আদল নির্মাণ, যাকে বলা চলে 'পোস্ট-মডার্নিজম'। 'মডার্নিজম' বা আধুনিকতার সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধিক কাঠামোকে এই আধুনিকোত্তরতা অপসারণ করছে, একইসাথে অতীতে সৃষ্ট আধুনিকতা বিষয়ক প্রকল্পকেও (প্রোজেক্ট অব মডার্নিটি)।

প্রসঙ্গত ধ্রুপদী আধুনিকোত্তরবাদীদের দ্বারা 'প্রোজেক্ট অব মডার্নিটি'ও বিবেচিত হয়েছে, মডার্নিটি থেকে পোস্ট-মডার্নিটির বিচ্ছিন্নতাকে স্পষ্টীকরণের জন্য। এই আধুনিকতা বিষয়ক প্রকল্পের বীজ ছিল ইউরোপের 'এনলাইটমেন্ট' অধ্যায়ে, যদিও তা' ফলবতী হয়ে উঠেছিল উনবিংশ শতকে। তথাকথিত এই 'এনলাইটমেন্ট প্রোজেক্ট'-এর উপাদান ছিল র‍্যাশনালিজম বা যুক্তিবাদিতা, টেকনোসেন্ট্রিজম বা প্রযুক্তি-কেন্দ্রিকতা (অন্যভাবে বলা যায় বিজ্ঞান-মনস্কতা), জ্ঞান ও উৎপাদনের মানকত্বকরণতা, অগ্রগতির ব্যবস্থায় সরল প্রগতিময়তা এবং বিশ্বজনীন, চিরন্তন সত্যে বিশ্বাস। 'প্রোজেক্ট অব মডার্নিটি'র প্রতিক্রিয়া হলো পোস্ট-মডার্নিজম—যদিও শেষোক্তের শিকড় রয়েছে মডার্নিজমে এবং একইসাথে এনলাইটমেন্টে। আধুনিকোত্তরবাদ মনে করে, বর্তমান বিশ্ব নির্ধারকভাবেই খণ্ডে খণ্ডে গঠিত ও অস্থিরীকৃত। এঁরা সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করেন পূর্ণাঙ্গতাসম্পন্ন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকে, তথাকথিত অধিবিদ্যক বর্ণনা এবং বিশ্ব ও ইতিহাস বিষয়ক সুসংহত ও বিশ্বমাত্রার তত্ত্বকে। এঁরা প্রত্যাখান করেন বিশ্বজনীন রাজনৈতিক প্রকল্প,

এমনকি মুক্তির জন্য প্রকল্পকেও (যেমন মার্কসবাদ)। কোন বিশেষ ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে, এঁরা সর্বজনীন মানবতার মুক্তির জন্য প্রকল্পে বিশ্বাস করেন। কেননা, এঁরা মনে করেন যে পোস্ট-মডার্নিটিতে শ্রেণীর বিলোপ ঘটেছে।

পোস্ট-মডার্নিজমের ধ্রুপদী তাত্ত্বিকদের বাইরে আধুনিক মার্কসবাদীর একাংশ মনে করেছেন যে সমগ্র পুঁজিবাদের ইতিহাসের অভ্যন্তরে পুঁজির আদিম সঞ্চয়, বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ, শিল্প পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি অধ্যায়ের ধ্রুপদী ভাগ ছাড়াও, ধনতন্ত্রের ইতিহাসে দু'টি প্রধান অধ্যায় এবং একটি সম্বন্ধচ্যুতি (রাপচার) ঘটেছে। এঁরা অষ্টাদশ শতক থেকে এই শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্ত মডার্নিটির কাল-পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (হার্ভে সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন ১৯৭২ সাল ব্রেটন-উডসের পতনকে)। জেমেশন ও হার্ভে মডার্নিটিকে অনেকগুলি অধ্যায়ে ভাগ করলেও, পোস্ট-মডার্নিটিকে এক পরিপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট 'রাপচার' বলতে চেয়েছেন। 'রাপচার' সম্পর্কে প্রস্তাবিত সময় নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সম্বন্ধচ্যুতি নিয়ে কোন বিতর্ক থাকতে পারে না বলে পূর্বোক্ত বামপন্থীরা মনে করেন। এঁরা এটাও মনে করেন যে পুঁজির আদিম সঞ্চয়, বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ, শিল্প পুঁজিবাদ ইত্যাদি তাৎপযপূর্ণ প্রত্যেকটি অতীত বিভাজন থেকে বর্তমান 'রাপচার' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্রের; অতীতের বিভাজনগুলির চরিত্রের পরিবর্তে বর্তমান বিচ্ছেদ হলো ধনতন্ত্রের সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্নতা। বামপন্থীরা এই তথাকথিত বিদারক বিচ্ছেদের পক্ষে এক বিস্ফোরক যুক্তি দিয়েছেন। তাঁরা দাবী করেছেন যে সমগ্র পুঁজিবাদের ইতিহাসে নানা ভাগে ও রূপে কৃষক সমাজের যে অস্তিত্ব ছিল, পোস্ট-মডার্ন স্তরে সেই কৃষক সমাজের চিরন্তন মৃত্যু ঘটেছে। এই সম্পূর্ণ নতুনত্বের বিশিষ্ট উপাদানগুলি হলো স্বয়ং পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন, এটির সামাজিক সম্পর্কসমূহ, এটির গতির নিয়ম, এটির দ্বন্দ্বসমূহ—জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে পণ্যায়নের (কমোডিফিকেশন) যুক্তি, সঞ্চয় (অ্যাকুমুলেশন) এবং লাভের সর্বোচ্চকরণ। তবে, এটা পুঁজিবাদ থেকে স্বতন্ত্র নয়, পোস্ট-মর্ডানিটি স্বয়ং পুঁজিবাদই। মডার্নিটি জন্ম দিয়েছিল পুঁজিবাদের যে নতুন অধ্যায়কে বা অন্যভাবে বলা যায় যে মর্ডানিটি পুঁজিবাদকে সঞ্জীবিত করেছিল, সেই মডার্নিটিকে এখন ধ্বংস করেছে স্বয়ং পুঁজিবাদই—পোস্ট-মডার্নিটি।

আধুনিক থেকে আধুনিকোত্তর সমাজ সম্পর্কে এই অংশের বামপন্থীদের বিতর্ক এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। দুরদর্শী আলোচনা ও মুল্যায়নের ঘাটতিও রয়েছে, যেমন—প্রথমে বর্ণিত চারটি দিক কতখানি পরস্পরের সাথে যুক্ত, পূর্বোক্ত চারটি উপাদান সারা বিশ্বে কতখানি পরিব্যাপ্ত হয়েছে অথবা এগুলি কেবলমাত্র সমাজে বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা, পোস্ট-ফোর্ডবাদী সমাজ এবং আত্মপরিচিতির জন্য মানুষের রুচি ও ইচ্ছা কতখানি ঠিক, ইত্যাদি। এঁদের আলোচনাতে অস্পষ্টতা ছাড়াও, স্ব-বিরোধিতার উপাদানও যথেষ্ট। তবে মডার্নিটি থেকে পোস্ট-মডার্নিটির মধ্যে পার্থক্য টানলেও এঁরা শেষোক্তকে পুঁজিবাদই বলেছেন। ফলে তাঁরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন শ্রমিকশ্রেণীর বিলোপের ধারণাকে।

আধুনিকোত্তর সমাজ নিয়ে বিচারে আরও বিভিন্ন দিক ও মাত্রা সংযোজিত হয়ে চলেছে। এবারে সেগুলির দিকে কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া যাক।

সময় ও ব্যবধান (টাইম অ্যাণ্ড স্পেস) সম্পর্কে তত্ত্ব

আধুনিক উৎপাদন-প্রণালীতে ব্যবধানকে ব্যবহারের তাৎপর্য শ্রম-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে স্পেস বা ব্যবধান বিষয় আলোচনা এখন ব্যাপক মাত্রা নিয়েছে সমাজতত্ত্বে। বিশেষত, আঞ্চলিক ও শহুরে জীবনে ও সমাজের মনস্তত্ত্ব বিচারের প্রশ্নে ব্যবধানের উপাদানটি এখন ব্যপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। ভৌগোলিক স্তর ছাড়াও, ব্যবধানের প্রসঙ্গ বিবেচিত হচ্ছে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং এগুলির সমন্বয়ে শ্রেণী, যোগ্যতা, শ্রম—কায়িক ও মানসিক, রুচি ও চাহিদা, ভোগ, নারী, পুরুষ ও হিজড়া, শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীত বর্ণ, ভাষা, জাতি, উপজাতি, অধিজাতি প্রভৃতির পরস্পরের বা সেগুলির প্রত্যেকটির অভ্যন্তরের নানাদিকের বিষয়ে। কিন্তু সমাজতত্ত্বে 'টাইম' বা সময়-এর উপাদানটির প্রয়োগ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী ও গভীর আলোচনা এখনও ততটা ব্যাপক নয়, যদিও বর্তমান সমাজ বাস্তবতা

ব্যাখ্যা করতে টাইম ও স্পেস যে অন্যতম সর্বপ্রধান মানক ও মাপকারী তা' নির্দ্বিধায় গৃহীত হয়েছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'টাইম' বা সময় এবং 'স্পেস' বা ব্যবধানের তাৎপর্য নিয়ে গবেষণার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কারে উপাদান দু'টির ব্যাপক ও অনতিক্রম্য গুরুত্ব স্পষ্টতর হয়।

সমাজে 'টাইম' বা সময় সম্পর্কে অতীত ধারণার আলোচনার ব্যতিরেকেই বলা যায় যে ম্যাক্স ওয়েবার (১৯৩০) দেখিয়েছিলেন যে ধনতন্ত্রে শ্রমের সংগঠনে সময়ের সুনির্দিষ্ট হিসাব রাখার ব্যবস্থা উৎপাদনে ও সমাজে সময়ের দারুণ গুরুত্বকে প্রথম তুলে ধরে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জনসাধারণের জন্য বাজারে স্বল্প মূল্যের ঘড়ি বিক্রি শুরু হওয়ার পর শিল্প-সমাজের ব্যক্তি মানুষের জীবন-প্রণালী নিয়ন্ত্রণে সময় ক্রমশ নির্ধারক ভূমিকা নিচ্ছিল। ১৯৮৪ সালে এ. গিডেনস তার সময় ও ব্যবধানের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিতকরণের বক্তব্যে (দা কনস্টিটিউশন অব সোসাইটি ঃ আউটলাইন অব থিওরি অব স্ট্রাকচারেশন) বলেন যে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্জিত বিভিন্ন দিকগুলির বিচারে সময়কে উপেক্ষা করা অবাঞ্ছিত। কেননা সামাজিক তৎপরতা ছড়িয়ে থাকে সময় ও ব্যবধানের মাত্রার ব্যাপ্তির মধ্যে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে সামাজিক বাস্তবতাকে পাওয়া যায় তার অনেক আগে থেকে তা' গঠিত হতে থাকে। সুতরাং সামাজিক সংগঠনের প্রক্রিয়া বিচারকালে সংশ্লিষ্ট সময় সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ঃ সময়মত ফ্যাক্টরিতে হাজিরা দিতে হলে তার আগে বাড়ীর কাজ, খাওয়া, কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই ঠিক ঠিক সময়মতো করে নিতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে সময়ের এই ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে সময়ের সর্বজনীন চরিত্রের ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়। কেননা একটি কারখানার প্রত্যেক শ্রমিককে কারখানার ও ব্যক্তিজীবনের দৈনন্দিন প্রতিটি অধ্যায়কে মোটামুটি একই ধরনের সময়ের বিভাজনের দ্বারা পরিচালনা করতে হয়। ১৯৮৪ সালে এন. ইলিয়ান তাঁর 'টাইম—অ্যান এসে' শীর্ষক পুস্তকে দেখিয়েছেন যে সময়ের ভাগাভাগির বিষয়ে সর্বজনীনতা, যার মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রতি ইউনিট অর্থাৎ ব্যক্তি, প্রাপ্ত সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে শেখে, তা' হলো সমাজ-সভ্যতা গঠন-প্রক্রিয়ার অন্যতম দিক। এইভাবে প্রত্যেক মানুষের 'টাইম-বাজেট' গড়ে ওঠে (দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ইত্যাদি)। আর এই 'টাইম-বাজেট' স্বয়ং হলো এক ব্যক্তি প্রতিটি নির্দিষ্ট সময়ে যে যে কাজ করছে তার ফলাফলের সময়-পঞ্জী। 'টাইম বাজেট' থেকে অনুধাবন করা যায় একজন ব্যক্তির ভূমিকা। একটি সমাজের সমস্ত মানুষের মিলিত 'টাইম বাজেট' হলো সংশ্লিষ্ট সমাজের ঘটনাবলীর যোগফল।

বর্তমান সমাজে ব্যবধান ও সময়ের দুই উপাদানই নিজ নিজ স্তরে একই সাথে বিশ্লিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ, নিয়মমাফিক একাধারে সরল ও অন্যদিকে জটিল অথচ পরস্পরের সাথে হয়ে উঠছে গভীর সম্পর্কযুক্ত। সমাজের প্রত্যেকটি প্রসঙ্গে ব্যবধান যেমন বাড়াচ্ছে আবার সময়ের মানদণ্ডে দারুণ দ্রুততর হয়েছে সমাজের প্রত্যেকটি দিকের গতি। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজের ফলাফলের পেছনে মুল কার্যকারণগুলির পাশাপাশি, সময়ের গতি একদিকে সেগুলির ব্যবধানকে বাড়াছে, অন্যদিকে সেগুলির মধ্যে ব্যবধানের বৃদ্ধি সমাজের পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার সময়ের গতিকে বাড়িয়ে চলেছে। এখনকার সমাজের পরিবর্তনগুলি (অর্থাৎ অতীতের সমাজের সাথে ব্যবধান গড়ে ওঠা) অতীতের মতো দীর্ঘ সময় ধরে সম্পন্ন হওয়ার পরিবর্তে সংঘটিত হচ্ছে স্বল্প সময়ে। এইভাবে ব্যবধান ও সময় পরস্পরের সাথে যুক্ত ও সহায়ক হয়ে কার্যকালে, উপাদান দু'টির স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখেও, ভূমিকা নিচ্ছে সম্মিলিত এক 'ইউনিট' বা এককের। তার ফলে উভয় উপাদানের এক ঐক্য-সাধক ভূমিকাও সৃষ্টি হচ্ছে—সমাজের সর্বাংশের ভাঙ্গনের (ব্যবধানের) অভ্যন্তরে সময় ঐক্য-সাধক ভূমিকা নিচ্ছে। অন্যদিকে সমাজের অভ্যন্তরে সময়ের গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সমাজের সর্বাংশে ব্যবধান ঘটিয়ে। এইভাবে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের 'অ্যাটমিক থিওরি' এবং সমাজ-বিজ্ঞানের 'থিওরি অব ডাইলেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম'-এর চমৎকার প্রতিফলন দেখা যায় সামাজিক 'টাইম অ্যাণ্ড স্পেস' তত্ত্বে।

'পোস্ট-মডার্নিজম'কে স্বীকার করা হোক বা না হোক, 'টাইম অ্যাণ্ড স্পেস' তত্ত্বের গুরুত্ব রয়েছে

নিঃসন্দেহে। এই বিমূর্ত তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনার পরিবর্তে আধুনিক সামাজিক বাস্তবতার আলোকে তত্ত্বটির যথার্থতা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

ইনফরমেশনাল সোসাইটি বা তথ্যায়িত সমাজ

সমাজ (সোসাইটি) ও ব্যবধানের (স্পেস) মধ্যে সম্পর্ককে প্রথমে তুলে ধরেছিলেন মানব-জাতির আদি বিজ্ঞানীরা। কিন্তু ব্যবধান, সমাজ ও ইতিহাসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব খুব দীর্ঘ আলোচিত বিষয় নয়। অথচ 'নতুন বিশ্বে'র এ' এক নতুন বাস্তবতা যে ব্যবধান (স্পেস), সমাজ (সোসাইটি), সময় (টাইম) ও ইতিহাস (হিস্ট্রি)-এর মধ্যে এক অভিনব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

নতুন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উপাদান তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের অভ্যন্তরে সক্রিয় 'ইনফরমেশন টেকনোলজি' বা তথ্য-প্রযুক্তি এবং তার ফলে নির্মীয়মাণ 'ইনফরমেশনাল সোসাইটি' বা তথ্যায়িত সমাজ। বলাই বাহুল্য যে এই 'ইনফরমেশনাল সোসাইটি'র উপাদানসমূহ অতীতের সমাজের চাইতে অনেক বেশি নিবিড় ও প্রসারিতভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। পুঁজিবাদী সমাজের তথাকথিত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি'র খোলস ছেড়ে নবরূপে এই সমাজ আবির্ভূত হচ্ছে। নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার ও ক্রমাগত সেগুলির উন্নয়ন সাধন করার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ উৎপাদন ও ভোগ, ব্যবস্থাপনা ও শ্রম, জীবন ও মৃত্যু, সংস্কৃতি ও সমরবিদ্যা, যোগাযোগ ও শিক্ষা, ব্যবধান ও সময়কে বেশ কিছুটা স্বপক্ষে বিন্যাসসাধন করা শুরু করেছে। সমাজ প্রবেশ করেছে এক নতুন প্রযুক্তিগত যুগে। অতীতের প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ভিত্তি ছিল 'এনার্জি' বা শক্তি, বর্তমান প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মেরুদণ্ড হলো 'ইনফরমেশন টেকনোলজি' বা তথ্য-প্রযুক্তি।

এই তথ্যায়িত প্রযুক্তিময় বিপ্লব (ইনফরমেশনাল টেকনোলজিক্যাল রেভোলিউশন) সমাজের সমস্ত ধরনের কাঠামোগত প্রধান প্রধান পরিবর্তনের কারক-শক্তি হিসাবে ভূমিকা নিচ্ছে। পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত নতুন বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কার্যকরীভাবে গঠনের বুনিয়াদী পরিকাঠামো সৃষ্টি করে দিচ্ছে এই 'ইনফরমেশনাল টেকনোলজিক্যাল রেভোলিউশন', একই সঙ্গে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটির সাথে টেনে দিচ্ছে ছেদকে।

নতুন তথ্যায়িত প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটিয়ে, প্রক্রিয়া হিসাবে চলেছে জ্ঞান, সংবাদ, আবিষ্কার, তথ্য ইত্যাদির সংগ্রহের প্রবল কেন্দ্রীভবন এবং সেগুলির বণ্টনের ও বিকিরণের বিকেন্দ্রীভবন। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন যোগাযোগ-চরিত্র—যাতে উদ্ভূত হচ্ছে 'গ্লোবাল-ভিলেজ' বা বিশ্ব-পল্লীর বাস্তবতা। কিন্তু এই জ্ঞান-তথ্য-যোগাযোগ থেকে পরিকল্পিতভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হচ্ছে ব্যাপক অংশের মানবগোষ্ঠীকে—বিশ্ব-তথ্য জাল থেকে বাদ রাখার মধ্য দিয়ে। অন্যভাবে বলা যায় যে এই ভয়ানক গতি (টাইম) সম্পন্ন তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লবের দ্বারা সৃষ্ট বিশ্ব-আদানপ্রদান ব্যবস্থার সম্ভাব্য ভোক্তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে প্রবল পার্থক্য ও বৈষম্য (ব্যবধান)। এটা আধুনিক পুঁজিবাদের শোষণের একটা নতুন দিক। উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার ফলাফলও এই দিকগুলি।

এই নতুন তথ্যগত প্রযুক্তি অর্থনীতির উৎপাদিকা-শক্তি ও সমাজের সাংস্কৃতিক ক্ষমতার মধ্যে এক নতুন ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে চলেছে। জ্ঞানের সঞ্চয় এবং তথ্য-বিশ্লেষণ হলো নতুন পুঁজিবাদী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম মূল হাতিয়ার। অতীত ইতিহাসেও প্রত্যেকটি দেশীয় সমাজ নিজেদের সম্পদের সূত্র ও আয়ত্তাধীন তথ্যগত শক্তিকে নোঙ্গর করে অর্থনীতির মধ্যে সমন্বয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং তা' ব্যবহার করে আর্থনীতিক উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং রাজনৈতিক-সামরিক শক্তির বাড়তি ভিত্তি গড়ে নিয়েছিল। এখন সেক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে সেটির ব্যবহার স্বভাবতই ব্যাপক ও তীব্রতর হয়েছে।

গঠনাত্মক স্তরের এই 'ইনফরমেশনাল সোসাইটি'র প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি গঠনের পেছনে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব সরাসরি উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে ভূমিকা নিচ্ছে। ভূমি, পুঁজি ও শ্রমের অনতিক্রম্য উপাদানকে বাদ দিলে বর্তমান যুগে উৎপাদন তথা অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠছে ইনফরমেশন। অতীতেও ইনফরমেশন ছিল উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশের

সহায়ক, কিন্তু আধুনিককালে তথ্য সেই ভূমিকা পালন ছাড়াও হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় নির্ধারক কাঁচামাল। শ্রেণী-গঠন (ক্লাস-ফর্মেশন) এবং সামাজিক গঠনে (সোস্যাল-ফর্মেশন) 'ইনফরমেশন' দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে বস্তুগত উৎপাদন, পরিষেবা দান এবং উৎপাদনের ব্যবস্থা ও সমাজের কাঠামোর সমস্ত বিষয় তথ্য-ব্যবহারের অধীনস্থ হয়ে পড়ছে।

মিচেল ডসন ও জন বেলামি ফস্টার আধুনিক যুগকে বলেছেন 'ভারচ্যুয়াল ক্যাপিটালিজম' বা গুণসম্পন্ন পুঁজিবাদের কাল-পর্ব। এঁরা বলতে চেয়েছেন যে শিল্প-বিপ্লবের কাল থেকে শুরু করে সংগঠিত পুঁজিবাদের ব্যবস্থা এখন অপসারিত হচ্ছে তথ্য-বিপ্লবের প্রযুক্তি-সৃষ্ট 'ইলেকট্রনিক রিপাব্লিক' বা বৈদ্যুতিন প্রজাতন্ত্রের যুগের দ্বারা। শিল্প বিপ্লব অতিকায় সামাজিক সংগঠনগুলির জন্ম দিয়েছিল—বিশাল কর্পোরেশন, শক্তিশালী ইউনিয়ন এবং প্রবল ক্ষমতাধর সরকারগুলিকে। 'ইনফরমেশন রেভোলিউশন' তথা তথ্য-বিপ্লব এইসব দৈত্যদের খতম করছে এবং নতুন যুগে ও ব্যবস্থায় নিয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে, ধনতন্ত্রের স্বার্থের যথার্থ দিকটি উল্লেখ করে, পুঁজিবাদের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, মাইক্রোসফট-এর চেয়ারম্যান, বিল গ্যাটেস তাঁর 'দা রোড অ্যাহেড' পুস্তকে আধুনিক পুঁজিবাদকে বলেছেন "ফ্রিকশন-ফ্রী ক্যাপিটালিজম' বা ঘর্ষণহীন ধনতন্ত্র, যে ধনতন্ত্রে যথার্থ তথ্য সৃষ্টি করে নিরুপদ্রব বাজারের ভিত্তি। এই বাজার গঠনের পিছনে 'ইন্টারনেট' ও তথ্য-সড়কের (ইনফরমেশন হাইওয়ে) অবাধ ক্ষমতা প্রধান উপাদান হিসাবে কাজ করছে।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ধরনের তথ্য ও যোগাযোগের মধ্যে বাধাগুলি এখন ভেঙ্গে পড়ছে এবং সমস্ত দেশের যোগাযোগ-মাধ্যম বিষয়ক আইনগুলি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। 'লিবারালাইজড কমিউনিকেশন' তথা উদারীকৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্ভর করতে শুরু করেছে পুঁজিবাদী অভ্রান্ত(!) বাজারভিত্তিক মতবাদের উপর—যে মতবাদ পরিণত হয়েছে কার্যত এক 'সিভিক রিলিজিয়ন' তথা নাগরিক ধর্মে। তথ্যের কার্যসাধনের বন্দোবস্তের (রেগুলেটরি মেকানিজম) দ্বারা বাজারের নিয়ন্ত্রণের শক্তি সংগ্রহ করা হচ্ছে 'বাজারী ধারণা' (মার্কেট-প্লেস আইডিয়াজ) থেকে। এর দ্বারা আবার প্রচার মাধ্যমের অতীতের নিজস্ব বাজারের সাথে বর্তমানের প্রচার মাধ্যমের বাজারের সম্পূর্ণ ছেদ ঘটে যাচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচার-বাজারের ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করা হতো মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষমতাকে ব্যবহার করার জন্য, আর বর্তমানে মুক্ত মতামতের ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে বাজারের ক্ষমতা ও শক্তিকে প্রসারিত করার জন্য। এই কারণে ও উদ্দেশ্যে দেশে দেশে প্রচার-মাধ্যম সংক্রান্ত নতুন আইনগুলিতে সর্বাপেক্ষা রক্ষাকবচ দেওয়া হচ্ছে 'কমার্শিয়াল স্পীচ'-এর তথা অ্যাডভারটাইজমেন্ট বা বিজ্ঞাপনের সুযোগ ও ক্ষমতাকে।

এই নির্মীয়মাণ বাস্তবতার ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মহানগরীগুলিতে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের সংখ্যাগত ভর বৃদ্ধি ঘটছে 'ইনফরমেশন প্রসেসিং জব' বা তথ্য-বিশ্লেষণ/বিশ্লিষ্টকরণের কাজে। এটা তৃতীয় দুনিয়ার নগরগুলিতেও ক্রমশ অনেকটা চোখে পড়ার মতো স্তরে আসতে শুরু করেছে। তার ফলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত শিল্প থেকে পরিষেবাতে ভর-বৃদ্ধির যে নির্ধারক তথ্য দেওয়া হচ্ছিল, তাও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছে। তাছাড়া পরিষেবা সম্পর্কিত অতীত সংজ্ঞা এখন হয়ে পড়ছে অনেকটাই ঝাপসা। পরিষেবার অন্তর্গত হয়ে পড়ছে একদিকে অতীতে কথিত শিল্প-ক্ষেত্রের বহু অংশ, বিপরীত দিকে পরিষেবার বহু শাখাকেও এখন শিল্পের অন্তর্গত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পরিষেবা, কৃষি এবং শিল্প-ক্ষেত্রের বিশাল ভাগ জুড়ে অবস্থান নিচ্ছে 'ইনফরমেশন প্রসেসিং' শাখা। পণ্য ও কৃষি উৎপাদন ও পরিষেবা প্রদানে পরিমাণগত ব্যাপ্তি ও গুণগত মান অর্জনের জন্য 'ইনফরমেশন প্রসেসিং' তৎপরতা মৌলিক ব্যবহার্য উপাদান হিসাবে প্রাধাণ্য ও প্রভুত্ব অর্জন করছে।

মহানগরীগুলির রূপান্তর-প্রক্রিয়া

নতুন যুগ গঠনের প্রক্রিয়ায় এক ধরনের রূপান্তর প্রথমে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মেট্রোপলিটন সিটিজ বা মহানগরীগুলিতে। ক্রমে তা' সম্প্রসারিত হচ্ছে অন্যান্য দেশের মহানগরীগুলিতেও। প্রকৃতপক্ষে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এবং ইতিহাসগত প্রক্রিয়ায় প্রধান নগরীগুলি সমকালের উৎপাদন-ব্যবস্থা তথা সমাজ-ব্যবস্থার ঘনীভূত রূপকে বহন করেছিল। নগরীগুলি সংশ্লিষ্ট

পর্বের রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও অবস্থারই কেবল কেন্দ্র ছিল না, শাসকশ্রেণীগুলির অগ্রণী অংশের অবস্থানের এবং সামাজিক উৎপাদনেরও প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইতিহাসে এমনও দেখা গেছে যে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে ও ক্ষেত্রবিশেষে বেশ কিছুটা স্বকীয়তা বহন করে এইসব নগরীর ছিল অবস্থান। সমাজের প্রচলিত উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের যখন পরিবর্তন ঘটতো, তখন উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিকা শক্তিরও পুনর্বিন্যাস সাধিত হতো। ফলে পুনর্বিন্যাস ঘটতো নগরীগুলির সমস্ত দিকের অর্থাৎ এইসব নগরীর রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ—বিশেষত উৎপাদনের মালিক ও শ্রমজীবী অংশ এবং স্বভাবতই শ্রেণীগুলির সংস্কৃতি প্রভৃতির। এই নতুন অভিঘাতের ফলে প্রতিষ্ঠিত নগরীগুলির রূপান্তর ঘটতো তদনুযায়ী অথবা সেগুলি অপাংক্তেয় হয়ে যেতো, পরিবর্তে পত্তন হতো নতুন নগরীর। নতুন নগরীগুলি নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিতো। প্রথমোক্ত নগরীগুলি কালক্রমে পরিণত হতো 'ওল্ড সিটি' বা পুরানো নগরে। পুরোনো নগরগুলি থেকে অধিবাসীরা ধীরে ধীরে চলে যাওয়ায় সেগুলি অংশত পরিত্যক্ত বা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যেতো। পুঁজিবাদের উত্থানকালে পুঁজিপতিরা সমন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে অন্যান্য কাজ ও বিষয়ের সাথে 'ফিউডাল ফোর্ট-সিটি' বা সামন্ততান্ত্রিক দুর্গ-নগরীর পাল্টা 'বার্গ' বা 'মিউনিসিপ্যালিটি' নামে নতুন ধরনের নগরীর পত্তন করেছিল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের বিপ্লবে এইসব নগরী সংগঠনগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকার উল্লেখ করেছিলেন কার্ল মার্কস। পুঁজিবাদের পূর্ণবিজয়ের পর শেষোক্ত নগরগুলিই কর্তৃত্বশালী ও প্রধান হয়ে যায়। ধনতন্ত্রের বিভিন্ন পর্বেও—পুঁজির আদিম সঞ্চয়, বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ, শিল্প-পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ, নয়া-উপনিবেশিক পুঁজিবাদ প্রভৃতি, পুঁজিবাদী শহরের রূপান্তর বা স্থানান্তর ঘটেছে। কখনো বা একই শহরের ব্যাপক প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস সাধিত হয়েছে। সুদূর অতীতে সমস্ত শহরের জনবসতির অবস্থানে কোন পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদের অগ্রগতির সাথে সাথে এলাকাগত ভাগাভাগি শুরু হয়। তার ফলে, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত এবং মালিক ও অভিজাতদের মধ্যে বসবাসের এলাকার পৃথকীকরণ, প্রশাসন-অফিস-যোগাযোগ-বাণিজ্য-বিনিয়োগ প্রভৃতির অঞ্চল, শিক্ষা-চিকিৎসা-বিনোদন-ভ্রমণ প্রভৃতির স্বতন্ত্র এলাকার বিন্যাস সাধিত হয়েছিল। মহানগরীগুলি যত বেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের শক্তিশালী কেন্দ্র হতে থেকেছে, শহর থেকে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, মজুরিভোগী প্রভৃতি অংশগুলির ততো স্থানান্তর হয়েছে শহরতলীতে। শহরের উপকণ্ঠে উপনগরীর পরিকল্পনা করে ক্রমান্বয়ে বসত নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন নিম্ন-আয়কারী মানুষদের জন্য। প্রশাসন ও উৎপাদন এবং তুলনামূলকভাবে ধনীদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়েছিল শহরগুলি। সমাজ-বিজ্ঞানীরা পুঁজিবাদী সমাজের এই মহানগরীগুলিকে সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-সিটি' বা শিল্প-নগরী হিসেবে। কেবলমাত্র শিল্পের জন্য গড়ে ওঠা নগরীকে সাধারণভাবে শিল্প-নগরী বলা হলেও, এই শিল্প-নগরীর সংজ্ঞা পুঁজিবাদের শিল্প-পুঁজিবাদের স্তরের প্রতীকী চরিত্রের প্রকাশ এবং এগুলির আঙ্গিক ছিল 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি'র—শিল্পগত সমাজের। ৬০-৭০-এর দশক থেকে শহরগুলিতে শিল্প-শ্রমিকদের তুলনায় পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছিল। সব প্রধান নগরীর মূল অংশ থেকে শিল্প-শ্রমিকরা এখন প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে। মহানগরীর বিন্যাস 'কোর' বা কেন্দ্র, শিল্পাঞ্চল ও শহরতলী—এই তিন অংশ নিয়ে সংহত রূপ পেয়েছিল।

'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড'-এর বাস্তবতা থেকে 'ইনফরমেশনাল ওয়ার্ল্ড'-এ রূপান্তরের প্রক্রিয়ার প্রথম ও প্রধান অভিঘাত এসে পড়ে মহানগরীগুলিতে। 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি' থেকে 'ইনফরমেশনাল সোসাইটিতে' রূপান্তরের প্রক্রিয়া তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। শহরগুলি 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিটি' থেকে পরিণত হতে থাকে 'ইনফরমেশনাল সিটি'তে। কার্ল মার্কসের বক্তব্যের অনুসরণেই অনেকটা যেন এই নতুন শহর পুঁজিবাদের নতুন অভিযানের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠছে। 'ইনফরমেশনাল সিটি'র কাঠামো (স্ট্রাকচার) ও গতিময়তার (ডায়নামিকস) দ্বারা যে ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবণতা গড়ে উঠছে সেদিকে কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

'ইনফরমেশনাল সিটি'তে মানুষের তৎপরতার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠছে কমপিউটার ও কমপিউটার

নেটওয়ার্ক। সারা পৃথিবীর ঘটনাবলী ও বাস্তবতার মর্মকে আবৃত করে এই উদীয়মান শহর আবর্তিত হচ্ছে। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান, কারিগরী, বাণিজ্য, ব্যবসা, স্টক ও ফিনান্সিয়াল মার্কেট এবং শিল্প, পরিষেবা, কৃষি, গৃহস্থালি কর্ম প্রভৃতির উৎপাদন, বন্টন, বিনিময়, সংগ্রহ, সমন্বয়, মূল্যমান, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, শিক্ষা, ট্রেনিং ইত্যাদির ইনফরমেশন বা তথ্য সংগ্রহ ও কেন্দ্রীকরণ এবং সেগুলির বিকেন্দ্রীকরণ, বন্টন, ব্যবহার, প্রত্যাহার প্রভৃতির মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে এইসব শহর। শিল্প, বাণিজ্য, প্রশাসন এবং সেগুলি কেন্দ্রিক তৎপরতা এখন অনেকটাই 'ইনফরমেশন টেকনোলজি'র দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ইনফরমেশন টেকনোলজি বেশি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে সমস্ত ধরনের, সর্বাপেক্ষা প্রধান, প্রসারিত ও সর্বাধিক নিয়োজিত শ্রমশক্তির কাজের হাতিয়ার হিসাবে। ইনফরমেশন টেকনোলজি কেবল মানুষের চাহিদা, রুচি ও ভোগ গঠন নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ করছে না, সমগ্র গৃহস্থালি প্রয়োজন ও শ্রমকেও ধীরে ধীরে এর অন্তর্গত করে নিচ্ছে।

একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজারীকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বত্র বিরাজমান শক্তি। ১৯৯২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসাতে আনুমানিক ১ ট্রিলিয়ান ডলার (দেশে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট-এর প্রতি ৬ ডলারের ১ ডলার) ব্যয়িত হয়েছিল বাজারীকরণ ব্যবস্থায় জনগণকে পণ্য ক্রয়ে আরও বেশি আসক্ত করার জন্য। এর মধ্যে ১৬০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়িত হয় বিজ্ঞাপনে, বাকী অর্থ ঢালা হয়েছিল সেল্‌স প্রমোশনে। '৯০-এর দশকে পণ্যের বাজারীকরণ ব্যবস্থা তেমন ধরনের ব্যবস্থাপনায় পরিণত হচ্ছে যা উৎপাদনের অভ্যন্তরে শ্রমশক্তির ব্যবস্থাপনাকে ক্রেতাদের স্বার্থাভিমুখী করে। পণ্যের বাজারীকরণের ব্যবস্থাপনায় চারটি উপাদান থাকছে ঃ টারগেটিং বা নিশানা করা, মোটিভেশন রিসার্চ বা প্রেরণাধর্মী গবেষণা, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বা পণ্যের উৎকর্ষতা সৃষ্টি এবং সেল্‌স কমিউনিকেশন বা বিক্রয়ের স্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

জনসংখ্যাগত তথ্য-পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে টার্গেটিং বা নিশানা করা হলো সম্ভাব্য ক্রেতার অংশকে জড়ো করার জন্য প্রচার। বর্তমানকালে এই 'টার্গেটিং' পরিণত হচ্ছে 'হাইপার টার্গেটিং' বা অতি-নিশানার চরিত্রে, যে কাজে লক্ষ্য হলো প্রতি একটি পরিবার, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে প্রতি একজন ক্রেতা। পদ্ধতি হলো প্রযুক্তি ও বাজারীকরণের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে ক্রেতাকে কোম্পানির ঘরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা। 'ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে'র এই মিথস্ক্রিয়ামূলক চরিত্র প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতার তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। কোম্পানিগুলি নিজস্ব বিভিন্ন ধরনের পণ্যের লক্ষ লক্ষ ক্রেতার তথ্য এইভাবে সংগ্রহ করে রাখছে। এর পাশাপাশি চলে 'মোটিভেশন রিসার্চ'-এর কাজ, যার অর্থ হলো সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ক্রেতাকে ক্রয়ে উদ্যোগী করার জন্য উদ্ভাবনীসমূহ। কোম্পানির ক্রেতাকে বিশেষ ধরনের পণ্য ক্রয়ে উদ্যোগী করাকে বলা হচ্ছে 'কোয়ান্টিটি প্রোডাকশন অব কাস্টমারস' বা ক্রেতার পরিমাণগত উৎপাদন।

এই সমস্ত তৎপরতা এখন অনেকটা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এমন ধরনের তৎপরতায় যাকে বলা হচ্ছে 'ওয়ান-টু-ওয়ান-মার্কেটিং' অর্থাৎ ক্রেতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বাজারীকরণ। 'মার্কেটিং ইনফরমেশন রেভোলিউশনে'র ফলে ব্যক্তিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের দ্বারা ক্রেতাকে চিহ্নিত এবং অনুসরণ করার অর্জিত ক্ষমতা এখন নির্দিষ্ট পরিবার ও ব্যক্তির কাছে সরাসরি পৌঁছুবার শর্ত সৃষ্টি করছে। একে কখনো কখনো বলা হচ্ছে 'ন্যারো কাস্টিং' বা সমস্ত ক্রেতাকে আয়ত্তাধীন ছাঁচে গড়ে নেওয়া। বাজারীকরণের নতুন দর্শন হলো (ক) নিছক বাজারে ভাগ বসানোর পরিবর্তে ক্রেতার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ভাগ বসানো এবং (খ) উভয় পক্ষের (বিক্রেতা ও ক্রেতা) মধ্যে আলোচনা করে সমঝোতা করা। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল প্রকাশিত 'দা মার্কেটিং ইনফরমেশন রেভোলিউশন'-এ বলা হয়েছে যে 'বিকেন্দ্রীভূত বাজারের অভ্যন্তরে বিশ্লিষ্টকৃত পণ্যসামগ্রী'-সজ্জিত এই নতুন বিশ্বে প্রত্যেক ক্রেতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাজারের ছিন্নাংশ। সুতরাং বর্তমানের লক্ষ্য হলো বিক্রেতা-ক্রেতার মত বিনিময়ের সুযোগকে গ্রহণ করে কার্যকালে 'ক্রেতাকে নিয়ন্ত্রণে আনা'। এটা করা সম্ভব হচ্ছে 'মডুলার প্রোডাক্ট ডিজাইন' তথা সামঞ্জস্য বিধায়ক উৎপন্ন পরিকল্পনার দ্বারা—যা ক্রেতাকে নিজের ইচ্ছামত বেছে নেওয়ার সুযোগ দেবে এবং একই সাথে ক্রেতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণালীকে সহজতর করবে।

ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য বাজারীকরণের রণনীতির অংশ হিসাবে, কোম্পানিগুলি নিজেদের পণ্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে মাঝেমাঝেই অপাংক্তেয় করে ফেলে। এটা করা হয় পরিকল্পিতভাবে নেপথ্যে প্রচার চালিয়ে। তারপর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মোড়কের ও নামের পরিবর্তন করে একই পণ্য নতুন করে বাজারীকরণ করে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা হয়। বর্তমান পণ্য-বাজারে পণ্যের দৃশ্যমান রূপটাই এক ধরনের পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিক্রয়ের জন্য ক্রেতার সাথে যোগাযোগে সাম্প্রতিক অতীতে বিজ্ঞাপনকেই প্রধান মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করে আসা হয়েছে। কিন্তু এর স্থান ক্রমে দখল করে নিচ্ছে সেল্‌স প্রমোশন ও প্রত্যক্ষ বাজারীকরণ। সেল্‌স প্রমোশন হলো সেই পদ্ধতি যার সাহায্যে ক্রেতাকে তৎক্ষণাৎ ক্রয়ের জন্য প্ররোচিত করা হয়। এইক্ষেত্রে কৌশল ও পদ্ধতি হিসাবে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে খেলাধূলো বা অন্য ধরনের অনুষ্ঠানের 'স্পনসরশিপ', রিবেট বা ছাড় দেওয়া, উৎপাদনের সময় খুঁত হওয়া পণ্য কম দামে বিক্রি, কম দামের লটারির টিকিটে বেশী দামের পণ্য পাওয়ার সুযোগ প্রদান, কোন সামগ্রী বেশী কিনলে সেজন্য কুপন প্রদান ও তা' দিয়ে অন্য সামগ্রী কেনার সুযোগ দেওয়া, কোন পণ্যের সাথে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাড়তি কিছু উপহার দেওয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা হচ্ছে। হ্যারি ব্রেভারম্যানের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : 'একচেটিয়াপনার যুগেই কেবলমাত্র লক্ষ্য করা যায় যে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক চাহিদাসমূহকে অধিগ্রহণ করে নিচ্ছে এবং তাদের বাজারের অধীনস্থ করার জন্য তাদেরও (জনগণকেও) পুনর্গঠিত করে নিচ্ছে মূলধনের প্রয়োজন উপযোগী করে।' এই প্রচেষ্টায় এখন পর্যন্ত যেটুকু অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা' পূরণ করতে উদ্যত হয়েছে ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে।

বিশ্ব-বাজারের আত্মপ্রকাশের প্রভাব এখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্পষ্টতর হচ্ছে, এখনকি মানুষের বিনোদনের জগৎও—যা ছুটির সময়ের বড় অংশ জুড়ে থাকে, তাতেও বাজার প্রবেশ করেছে। প্রসঙ্গত ব্রেভারম্যান বলেছিলেন, "(পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তীব্র শোষণে) জন-জীবনের ক্ষত ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সরাসরি বিচ্ছিন্নতা মানুষের মুক্ত সময়গুলিতে শূন্যতা সৃষ্টি করে।" তার ফলে, "কর্মের বাইরের সময় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বাজারের উপর। এই বাজার গঠন করছে তেমন সমস্ত ধরনের বিনোদন ও চিত্তাকর্ষক উন্মাদনা যা কেবল জীবন-বিরোধী নয়, একই সাথে শহরের ঘেরাবদ্ধ জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যেন স্বয়ং জীবনের বিকল্প। এগুলিকে প্রবাহিত করা হচ্ছে মানুষের সমগ্র সময়ের অভ্যন্তরে। মূলধনের বিকাশের জন্য, বিনোদন ও খেলাধূলোর সমস্ত মাধ্যমকে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত করে, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে।

এইভাবে, গণ-বিনোদনকে বিক্রয় করা হচ্ছে বাজারের পক্ষে কার্যকরী হিসাবে এবং সমগ্র সমাজব্যাপী বাজার সৃষ্টির অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসাবে গণ-বিনোদনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। রেমণ্ড উইলিয়ামস তাই বলেছেন, পুঁজিবাদ "প্রত্যেকটি নতুন প্রযুক্তিকে নতুন নির্বাচনের মুহূর্ত" হিসাবে মানুষের সামনে ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন হয়ে উঠছে বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সমঝোতার মাধ্যম।

পুঁজিবাদের পক্ষ থেকে পূর্বোক্ত প্রয়াসগুলির পাশাপাশি, সাধারণ মানুষও নিজের ও পরিবারের আহার, বিহার, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, ভ্রমণ, অবসর, বিনোদন ইত্যাদির জন্য ইনফরমেশন টেকনোলজির উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। স্যাটেলাইট ও অন্য মাধ্যমের টেলিকমিউনিকেশন, টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, পি.সি. (পার্সোনাল কমপিউটার), ই-মেইল (ইলেক্ট্রনিক মেইল), ই-ফ্যাক্স (ইলেক্ট্রনিক ফ্যাক্স), ইলেক্ট্রনিক টাইপরাইটার, পেজার, সেলুলার টেলিফোন, ডি. টি. পি., হাইস্পিড ট্রান্সপোর্ট, এভিয়েশন কমিউনিকেশন প্রভৃতি হয়ে উঠছে ইনফরমেশনাল সিটির মানুষের তথ্য সংগ্রহ ও বিকীরণের রুচি, চাহিদা, যোগান ও ভোগের অন্যতম আধুনিক হাতিয়ার। অতীব ধীরে হলেও তৃতীয় দুনিয়ার বৃহৎ নগরীগুলির নানা অংশের শ্রমজীবীরা ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে টেলি-ব্যবস্থার সংবাহক, টেলি-ব্যবস্থা ব্যবহারকারী অথবা কর্মক্ষেত্রে টেলি-নিয়ন্ত্রিত কর্মী। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সমস্ত ধরনের সরকারী বা বেসরকারী তথ্য বেশি বেশি করে সংগৃহীত, নিয়ন্ত্রিত ও বণ্টিত হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজির দ্বারা। শিক্ষা ও জ্ঞানের সমস্ত ধরনের তথ্য সংরক্ষণ ও

কর্টন বিশেষত পুস্তক, পত্রিকা, শিক্ষালয়, পাঠাগার প্রভৃতি ব্যবস্থার পাশাপাশি মাইক্রো-ফিল্ম, টেলি-ক্যাসেটিং, ভি.ডি.ও, ইন্টারনেট প্রভৃতির দ্বারা সেগুলি সম্পন্ন হতে শুরু করেছে।

এই গঠনাত্মক চরিত্রের শহরগুলিতে অবস্থিত দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠান ও সেগুলির কর্মকর্তা ও কর্মীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। শহরগুলি হয়ে উঠছে বিদেশীদের নিত্য গমনাগমন ও ভ্রমণের কেন্দ্র। এইভাবে ইনফরমেশনাল সিটি অন্য অর্থে হয়ে উঠেছে 'ট্যুরিজম সিটি'ও। এইসব শহরে কাজের ধরনের অজস্রতা, নিপুণতা ও বহুদেশীয়তার চরিত্র গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ বিদেশাগত শ্রমজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি। অতীতে স্বদেশের অভ্যন্তরেই অন্যান্য অঞ্চল থেকে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে আগত মানুষদের ব্যাপকতা ও মিশ্রণের জন্য মহানগরীগুলিকে 'কসমোপলিটান সিটি' বলা হতো, এখন তার পরিবর্তে বিদেশাগত মানুষদের সমন্বয়ে এগুলি হয়ে উঠছে 'গ্লোবাল সিটি'। গ্লোবাল ইকনমির অন্যতম আধার ও উপকরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই ক্রমগঠিত 'গ্লোবাল সিটি'গুলি।

পূর্বোক্ত শহরগুলি ছাড়াও এই গ্লোবাল ইকনমি ও ইনফরমেশন টেকনোলজির ভিত্তিতে গড়ে উঠছে আর এক সম্পূর্ণ নতুন চরিত্রের শহর। সেগুলি হলো পূর্বে উল্লেখিত 'ফ্রী ট্রেড জোন' এবং সেগুলির ভিত্তিতে সৃষ্ট শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র ও শহর। ফ্রী ট্রেড জোন ও সিটি প্রায় সর্বাংশেই তৃতীয় দুনিয়ায়। এগুলির বুনিয়াদ ও পরিকাঠামো প্রথম থেকেই 'ইনফরমেশনাল সিটি' ও 'গ্লোবাল সিটি'র চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠছে। এগুলির জনবসতি, শ্রমিকশ্রেণী, ভাষা, সংস্কৃতি, শ্রমের কাঠামো ইত্যাদি সবই সদ্য-সৃষ্ট, মিশ্রণমূলক ও বহুজাতিক।

তবে পুঁজিবাদের গ্লোবাল সিটি গঠন সহজসাধ্য ও নিরুপদ্রব হবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। কেননা এগুলির অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শহরগুলিতে দ্রুতই 'ডুয়্যালিটি' বা দ্বৈত অন্তর্বস্তু সৃষ্টি করছে। সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লব স্বয়ং উৎপাদিকা শক্তিতে ক্রমশ রূপান্তরিত হওয়ায়, বিশেষত 'ইনফরমেশন টেকনোলজি'-এর ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যে, পরিকাঠামোতে এক ধরনের বিশৃঙ্খলার উপাদান সৃষ্টি হচ্ছে। কেননা প্রথাগত শিল্প, পরিষেবা ও গৃহস্থালি মনুষ্য-শ্রম যন্ত্র-শ্রমের দ্বারা বহুলাংশে অপসারণ ঘটানোর ফলে শহরে সৃষ্টি হচ্ছে বিপুল বেকারবাহিনী। 'আরবান সোক্' বা শহরের উদ্বৃত্ত শ্রম শুষে নেবার ইনফর্মাল সেক্টরের যতই বাড়-বাড়ন্ত হোক না কেন এবং তাতে একাংশ বেকারের নিযুক্তি ঘটলেও, ইনফরমেশনাল সিটি গঠনের প্রক্রিয়া এই ইনফর্মাল সেক্টরের শ্রমজীবীদেরও অর্থনৈতিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে মূল শহর থেকে ক্রমশ উপকণ্ঠে ঠেলতে শুরু করছে। স্বভাবতই সামাজিক সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়ছে। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত শহরের অভ্যন্তরতা ও ব্যবস্থার সাথে নতুন শহরের চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতও সম্ভবত অনিবার্য হবে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটির ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এলিটদের ইনফরমেশনাল সোসাইটির এলিটে রূপান্তর পুঁজিবাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে হয়তো ঘটবে। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রলেতারিয়েতের ইনফরমেশনাল প্রলেতারিয়েতে স্বাভাবিক রূপান্তর ঘটবে না। কেননা নতুন রূপান্তরের প্রধান দায় বহন করতে হবে প্রথাগত শ্রমিকশ্রেণীকে এবং তাঁর চরিত্র হবে নির্মম। কেননা শিল্প শ্রমিককে এখন রুটি ও রুজি ছেড়ে দিতে হচ্ছে সদ্য-উত্থিত ইনফরমেশনাল শ্রমিককে। 'পুরানো' শিল্প শ্রমিককে ট্রেনিং নিয়ে 'নতুন' শিল্পে নিয়োগের যে পরিকল্পনা পুঁজিবাদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছে তা' 'মিথ্' বা কল্পকথা। এর তেমন কোন কার্যকরী ভিত্তি নেই। কেননা আধুনিক উৎপাদনের যন্ত্রসামগ্রীর চরিত্র ও ক্রমাগত পরিবর্তনমুখীন চরিত্র প্রথাগত শিল্প-শ্রমিকের যোগ্যতায়, সাধারণভাবে, অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং পুরানো প্রজন্ম বনাম নতুন প্রজন্মের সংঘাতের আশংকা হবে তীব্রতর। তৃতীয়ত, শতাধিক বছরের বেশী প্রাচীন শিল্প-শহরের প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সংস্কৃতির সাথে সদ্য-উদ্ভূত তথ্য-সমাজ সংস্কৃতির সংঘাতও আশংকিত। এক্ষেত্রে বৃহত্তম উপাদান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে বহিরাগতদের বিষয়টি। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ইনফরমেশনাল সিটিগুলিতে এই সংঘাত কিছু কিছু ঘটতে শুরু করেছে। বেকারীর প্রাবল্যের মুখে বিদেশী শ্রমিকদের আগমন শ্রমজীবীদের ঐক্যে গুরুতর সংকট সৃষ্টি করতে বাধ্য। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামনেও এ' এক গুরুতর সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে বিদেশাগতদের বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, বর্ণ ও ধর্মের সামনে স্বদেশীয় সংস্কৃতির অস্তিত্বের তথাকথিত

বিপন্নতাবোধ এই জাতীয় শহরগুলিতে উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবিদ্বেষবাদ ও ধর্মান্ধতার প্রবণতা ও তৎপরতা বাড়িয়ে চলেছে। চতুর্থত, শহরগুলির দ্রুত আধুনিকতা আরো পিছনে ফেলে দিচ্ছে গ্রামকে। তাই গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধির প্রবণতা এক বড় সমস্যার কারণ হওয়ার সম্ভাবনা। বাহ্যিকভাবে ইনফরমেশনাল টেকনোলজির কল্যাণে পৃথিবীকে 'গ্লোবাল ভিলেজ' বলে বলা হলেও এবং আধুনিক প্রচার ও তথ্য-মাধ্যমের সাহায্যে মুহূর্তে আধুনিকতম তথ্য প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌঁছবার ব্যবস্থা হলেও, তা' সার্বিকভাবে সংগ্রহ করার সুযোগ সমস্ত গ্রামীণ মানুষের নেই, তুলনামূলকভাবে উন্নত দেশগুলিতে কিছুটা বেশি আছে মাত্র। কিন্তু মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছানো এক প্রাথমিক শর্ত মাত্র। উপলব্ধির জন্য তথ্য বিশ্লেষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা এবং সেগুলি প্রয়োগের সুযোগ গ্রামাঞ্চলে নেই। তাই আধুনিক তথ্য গ্রামের ক্ষেত্রে কার্যত এক ইলিউশন বা মরীচিকায় পরিণত হচ্ছে। স্বভাবতই শহরে তথ্যের কেন্দ্রীভবন, রুরাল মাইগ্রেশন বা গ্রাম থেকে শহরে মানুষের আগমনের প্রবণতাকে ব্যাপকভাবে বাড়াচ্ছে এবং বাড়াবে। শহরের ক্রমবর্ধমান বেকারীর সাথে গ্রাম থেকে আগত বেকারের ভীড় তথ্য-নগরীর সমস্যাকেও অতিকায় করে তুলতে বাধ্য। এটা যতটা না সিভিক প্রবলেম বা নাগরিক সমস্যা তার চেয়ে অনেক বেশি সৃষ্টি করতে পারে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা।

সোস্যাল মবিলিটি ও স্পনসর্ড মবিলিটি

সমাজে মানুষের মধ্যে অসাম্য সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করতে ব্যর্থ হলেও, ভিন্নভাবে অসাম্যের কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা শুরু হয়েছিল দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই। মানুষে মানুষে অসাম্যের কারণ খুঁজতে বুর্জোয়া উদারনীতিক সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান আশ্রয় করেছিল 'সোস্যাল মবিলিটি' বা সামাজিক গতিশীলতার অন্যতম ধারণাকে। সামাজিক গতিশীলতা বলতে একজন ব্যক্তির সমাজের বিভিন্ন ক্রমোচ্চ স্তরে ওঠা-নামাকে বোঝায়, যা সাধারণভাবে মোটা দাগে নির্ণয় করা হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বৃত্তিগত বা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে। এক একটি সমাজের প্রকাশ্যতা ও অ-ঘনীভূত অবস্থার স্তর নির্ধারণেও সামাজিক গতিশীলতার অবস্থাকে মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সামাজিক গতিশীলতা নির্ধারণ করতে ঐ গতিশীলতার হার, গতিশীলতার আদল, সমাজে ব্যক্তির বিভিন্ন পদে নিয়োগ এবং এইসব নিয়োগের মাপকাঠিকে বিচার করা হয়। গতিশীলতার আদল বলতে বোঝায়, সমাজে ব্যাপক ও সুনির্দিষ্টভাবে পৃথকীকৃত ক্রমোচ্চ স্তরের বিভিন্ন ব্যক্তির পদের সাথে ব্যক্তি-বিশেষের ভিন্ন অবস্থানের এবং শেষোক্ত ব্যক্তির ক্রমোচ্চ স্তরে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী গমানগমনের সম্ভাবনার আদলকে। 'ইন্টার-জেনারেশনাল মবিলিটি' বা অন্তর্বংশগত গতিশীলতা নির্দেশ করে পিতা-মাতার অবস্থানের সাথে স্বীয় অধস্তন পুরুষদের অবস্থানের পার্থক্যকে। অন্যদিকে 'ইন্ট্রা-জেনারেশনাল মবিলিটি' বা আন্তর্বংশগত গতিশীলতা থেকে বোঝা যায় একজন মানুষের সারা কর্মজীবনের বিভিন্ন সময়ের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

তবে সামাজিক গতিশীলতার তত্ত্ব নিয়ে বুর্জোয়া উদারনীতিক সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্কও রয়েছে। একাংশ মনে করেছিলেন যে আধুনিক শিল্প-সমাজের স্থায়িত্বের জন্য ক্রমোচ্চ স্তরে মানুষের অব্যাহতভাবে উঠে আসার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু নিম্নস্তরের অবস্থানকারী দক্ষ ও আকাঙ্ক্ষী মানুষের অভিজাত স্তরে ওঠার সুযোগ সোস্যাল মবিলিটির মধ্য দিয়ে তৈরি হয়, তাই তেমন সুযোগ মানুষকে দিতে পারলে শোষণজনিত বিক্ষোভ থেকে সংঘবদ্ধ হওয়া ও আন্দোলন করা থেকে নীচুতলার মানুষদের নিবৃত্ত করা সম্ভব হবে (এস. লিপসেট ও আর বেনেডিক্ট—সোস্যাল মবিলিটি ইন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি, ১৯৫৯)। সোস্যাল মবিলিটির প্রয়োজনীয়তা ও যথার্থতাকে অপর একাংশ বিচার করেছিলেন মানুষের দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান ও সামাজিক ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠিতে। এঁরা মনে করেছেন যে আধুনিক সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সবচাইতে দক্ষ মানুষদের দিয়ে উৎপাদন ও সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো। সামাজিক গতিশীলতার সুযোগ সৃষ্টি করে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব। (পি. এম. ব্লাউ—এক্সচেঞ্জ অ্যাণ্ড পাওয়ার ইন সোস্যাল লাইফ, ১৯৬৪ পি. এম. ব্লাউ এবং ও. ডি. ডানকান—দা আমেরিকান অকুপেশনাল স্ট্রাকচার, ১৯৬৭)। একই ধারার

অপরাংশ তাত্ত্বিকরা মনে করেছিলেন যে গণতান্ত্রিক সমাজে ন্যায়বিচার পাওয়া নির্ভর করে সামাজিক কাঠামোতে প্রত্যেক মানুষের সমতা অর্জন করার জন্য সুযোগ পাওয়া ও ব্যবহার করার মধ্যে এবং সেকারণে সোস্যাল মবিলিটি জরুরি শর্ত।

'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি' বা শিল্পগত সমাজ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কালের বিভিন্ন তত্ত্ব সামাজিক গতিশীলতার প্রসঙ্গকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিল। সেগুলির মধ্যে 'কনভারজেন্স থিসিস' মনে করতো যে যেহেতু আর্থনীতিক দিক থেকে অগ্রগতির ফলে সমস্ত শিল্পোন্নত দেশ একটি সর্বজনীন আদল ভবিষ্যতে পাবে, সেহেতু শিল্পোন্নত দেশগুলির জন্য একই চরিত্রের সামাজিক গতিশীলতা থাকা দরকার। গতিশীলতার বিষয়ে প্রস্তাবগুলির অন্যতম ছিল ঃ উচ্চ হারে সামাজিক গতিশীলতা; নিম্নগামিতার পরিবর্তে ঊর্ধ্বগামী গতিশীলতা, কেননা নিয়োগের কাঠামোর ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হবে; যেহেতু সমাজ ক্রমশ বেশি বেশি সমতামুখী হতে থাকবে সেহেতু বিভিন্ন সামাজিক অবস্থাসম্পন্ন মানুষ ঊর্ধ্বমুখী গতি অর্জনে সমান সুযোগ পাবে; এই রকম সমাজে, একই সাথে, সামাজিক গতিশীলতার সুযোগের বৃদ্ধির ধারাবাহিক ব্যবস্থাও থাকতে হবে। অসম অবস্থার যে প্রতিফলন থাকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সামাজিক গতিশীলতায়, তা' সময়ের অগ্রগতির সাথে অন্তর্হিত হবে।

বিপরীতদিকে লেবার-প্রসেস দৃষ্টিভঙ্গি (আধুনিককালে, প্রধানত হ্যারি ব্রেভারম্যানের তত্ত্ব) দেখিয়েছিল যে যেহেতু শিল্প-পুঁজিবাদের বিকাশ শ্রমজীবীদের দক্ষতা অপহরণ এবং জনগণের ক্রমাগত সর্বহারাকরণ ঘটায়, সেহেতু পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক গতিশীলতা সবসময়ই নিম্নাভিমুখী, বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে আন্তর্দেশীয় অসাম্য (ক্রস-ন্যাশনাল ভ্যারিয়েশন) বিষয়ক বামপন্থী সমাজতাত্ত্বিকরা দাবী করেছিলেন যে শিল্পায়ন সত্ত্বেও দেশ-ভেদে সামাজিক গতিশীলতার মধ্যে পার্থক্য থাকবে অব্যাহত-ভাবে; কেবল থাকবে না, এই পার্থক্য বাড়বে। উন্নত দেশগুলির দ্বারা শোষণের ফলে অনুন্নত দেশগুলিতে সামাজিক গতিশীলতা সাধারণভাবে আরও নিম্নগামী হতে থাকবে।

বামপন্থীদের দ্বারা ও বাস্তব জীবনের নিয়মিত অভিজ্ঞতায় 'সোস্যাল মবিলিটি'-র তত্ত্ব খণ্ডিত হতে থাকায়, নতুন আবরণ দিয়ে বাস্তব সত্যকে কিছুটা ঢাকবার উদ্যোগ নেওয়া হতে থাকে সংশোধিত তত্ত্বে। এটা হয়েছিল এক ধরনের 'কমপ্রোমাইজ' বা সমঝোতার চেষ্টা। শেষোক্ত প্রচেষ্টায় সামাজিক গতিশীলতার সমাজতাত্ত্বিকরা মৌলিক পার্থক্য টানলেন 'অ্যাবসলিউট' বা চরম ও 'রিলেটিভ' বা তুলনামূলক সামাজিক গতিশীলতার হারের মধ্যে। অ্যাবসলিউট রেট বলতে বোঝানো হয়েছিল সামাজিক প্রধান প্রধান বর্গের সামাজিক গতির হারকে, যাদের চিরাচরিত সামাজিক গতিশীলতা রয়েছে। অন্যদিকে, 'রিলেটিভ রেট' অর্থে বলা হয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণী-উৎপত্তির অংশের, বিশেষত নিম্ন-স্তরের মানুষদের ঊর্ধ্বতন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে যাওয়ার গতির হারকে।

অর্থনীতি ও সমাজের স্বাভাবিক প্রবাহের পরিণামে সামাজিক গতিশীলতাকে ব্যাখ্যা এবং সেটিকে সংগঠিত ও উদ্দেশ্যধর্মী করার প্রস্তাব করা হতে থাকে পরবর্তীকালের নানা সংশোধিত তত্ত্বে। কিন্তু তাতেও এই তত্ত্ব দানা বাঁধতে পারছিল না। ফলে পঞ্চাশের দশকে যাকে 'স্পনসর্ড মবিলিটি' বা প্রবর্তিত গতিশীলতা বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, বর্তমানে সেই তত্ত্বকে আবার সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। উৎপাদন ও মুনাফার স্বার্থে সমাজে শিক্ষা-ব্যবস্থার ছক থেকে শুরু করে একাংশকে সুযোগ দিয়ে যোগ্য ও দক্ষ হিসাবে গড়ে তোলা ও তারপর বৃত্তিগত ও অন্যান্য সুযোগ দিয়ে ঊর্ধ্বতন স্তরে উন্নীত করার এক ধরনের 'স্পনসর্ড মবিলিটি'র ব্যবস্থা অতীত থেকেই পুঁজিবাদ অনুসরণ করে এসেছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রতিফলন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের ক্ষেত্রে ঘটলেও, সর্বজনীন চরিত্রে হওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। স্বভাবতই শ্রেণীর বিন্যাস ও অবস্থানকে এবং শ্রেণী-মনোভাব ও সামাজিক উত্তেজনাকে এ' দিয়ে রোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই নতুন শিল্প-ব্যবস্থায় নতুন ধরনের স্পনসর্ড মবিলিটির প্রয়াস শুরু হয়েছে। এখন আর কমপ্রোমাইজ নয়, ঊর্ধ্বমুখীন ও নিম্নগামী সমান্তরাল ধারায় সামাজিক গতিশীলতা গঠনের এই উদ্যোগ। নতুন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া, মুক্ত বাজার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উপাদান ও শ্রম-প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ উপাদান ও ফল হিসাবে স্পনসর্ড মবিলিটিকে গঠন করা হচ্ছে। স্পনসর্ড মবিলিটি এখন কেবলমাত্র

শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রক্রিয়া নয়, প্রায় সারা বিশ্ব-সমাজেরই উপাদান হয়ে উঠছে, যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা অগ্রগতি ও মাত্রার মধ্যে।

নতুন এই স্পনসর্ড মবিলিটির আধার হিসাবে সৃষ্টি করা হচ্ছে 'কনজিউমার সোসাইটি' বা ভোগবাদী সমাজের ব্যবস্থা এবং আরও কিছু দিক যার অন্যতম প্রতিফলন রয়েছে উদ্ভিন্ন 'ইনফরমেশনাল সোসাইটি'তে। নতুন স্পনসর্ড মবিলিটিতে পরম্পরাগত নীচুতলার শ্রমজীবীদের উপরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার পরিবর্তে এখন সরাসরি উপরের দিকে শ্রমজীবীদের স্বতন্ত্র স্তর গঠন করা হচ্ছে। শ্রমজীবীদের মধ্যে কার্যকালে নতুন ও স্থায়ী শ্রেণী-ভাগাভাগি করার চেষ্টা ছাড়াও, শাসকশ্রেণী স্পনসর্ড মবিলিটির দ্বারা নিজেদের শ্রেণীর সাপোর্ট বেসকে প্রসারিত ও সংহত করতে প্রয়াসী। প্রথমদিকে, এ বিষয়ে তাদের পক্ষে কিন্তু সুফলও ফলছে। যেমন বলা যায় নব্বই-এর দশকে, দেশে দেশে রাজনৈতিক সাধারণ নির্বাচনে এই নতুন শিল্পের নতুন ও উন্নত মজুরীভোগী শ্রমিকরা শাসকশ্রেণীর প্রধান পক্ষকে সমর্থন করছে বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

কনজিউমার সোসাইটি বা ভোক্তা-সমাজ

'কনজিউমার সোসাইটি'বাদী সমাজতাত্ত্বিকরা দাবী করেছেন যে আধুনিক সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে চাহিদার (কনজাম্পশন) ভিত্তিতে বর্তমান সমাজ গঠিত হচ্ছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতে যখন এই প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তখন একে বলা হয়েছিল 'ম্যাক্‌ডোনাল্ডাইজেশন অব সোসাইটি' বা সমাজের 'ম্যাক্‌ডোনাল্ডায়ন'। এই সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা, ভোগ ও রূপকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল, "যখন ফাস্ট-ফুড রেস্টুরেন্টের নীতি ও ব্যবস্থা সমাজে বেশি বেশি করে প্রাধান্য অর্জন করছে" (জি. রিটজার : দা ম্যাক্‌ডোনাল্ডাইজেশন অব সোসাইটি, ১৯৯৩) বলে। ম্যাক্‌ডোনাল্ড রেস্টুরেন্ট-এর সৃষ্টি হয় 'সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট' ও ফোর্ডবাদী পদ্ধতিতে মানুষের নিত্য-ভোজ্য খাদ্যসামগ্রী শিল্পগতভাবে উৎপাদন করে নির্মিত পণ্য হিসাবে বাজারে সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে। উন্নত দেশগুলির এবং তুলনামূলকভাবে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল মানুষদের জীবনযাত্রার প্রণালী হিসাবে গড়ে উঠলেও, আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে ধীরে ধীরে অনুন্নত দেশে এবং শ্রমিকশ্রেণীসহ সমাজের কিছুটা নিম্ন-বর্গগুলির মধ্যেও এই ব্যবহার প্রবেশ করতে শুরু করে। খাদ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের নতুন ব্যবস্থা ক্রমে জনগণের সমস্ত ধরনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিষেবাতে প্রসারিত হতে থাকে দ্রুত (পূর্বে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে)। এই ধরনের ব্যবস্থা অন্যান্য নানান পরিষেবায় ছড়িয়ে পড়ে—যেমন ম্যাক্‌ডেন্টিস্ট, ম্যাক্‌ডক্টরস, জাঙ্ক ফুড জার্নালিজম (অর্থাৎ তথ্য ও সংবাদের এমনভাবে মানক গঠন যা পাঠকের কাছে সহজে গ্রহণীয় হয়) ইত্যাদি।

'কনজিউমার সোসাইটি' সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও, সমাজতাত্ত্বিকরা এটির সামাজিক প্রকৃতির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। (১) বাহুল্যের প্রসার। মানুষের হাতে বাড়তি পয়সা আসা অথবা জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনকে কাট-ছাট করে ভোগ্যপণ্য, অবসর ও বিনোদনের জন্য ক্রমবর্ধমান ব্যয় করছে মানুষ। (২) কর্মক্ষেত্রে শ্রমের সময় প্রায় সর্বত্র কমে যাচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি, ফ্লেক্সি-ওয়ার্ক এবং উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার অন্যান্য ফলাফলের দ্বারা। সুতরাং অবসর যাপন ও বিনোদনের জন্য মানুষ এখন অনেক বেশি সময় দিতে পারছে। (৩) মানুষ আত্ম-পরিচিতি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব শুরু করেছে। একজন মানুষ কতখানি উন্নত ভোক্তার ভূমিকা পালন করছে এবং বিনোদনের জন্য অধিক সময় দিতে পারছে—সেই মানদণ্ডে আত্ম-পরিচিতিকে বিচার করছে। (৪) জীবনের সর্বক্ষেত্রে নন্দনায়নের প্রবণতা বাড়ছে। মানুষ জীবনযাত্রার দৃশ্যমান রূপকে উন্নততর করে গঠন এবং তাকে প্রদর্শন করে নিজের প্রতিবিম্ব সমাজে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। এই তৎপরতা প্রদর্শিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বিলাসবহুল পণ্য ক্রয় ও ব্যবহারের দ্বারা। কিন্তু এই ভোগ প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে নয়, স্বভাবতই কৃত্রিম, আরোপিত এবং বাহুল্য-মণ্ডিত। (৫) ভোগের জন্য তৎপরতা, দৃশ্যত জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন বিলাস পণ্যের সংগ্রহ ও ব্যবহারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নিজের সামাজিক মর্যাদা অর্জন ও প্রতিষ্ঠা। মানুষ 'নিজের সামগ্রী' ব্যবহার করছে সমাজে বিশেষ ধরনের ও উন্নত বর্গের অন্যতম সদস্য হিসাবে

নিজেকে জাহির করার এবং বাস্তবে অবস্থানকারী বর্গটি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র হিসাবে দেখানোর জন্য। (৬) উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সামাজিক বিভাজনের প্রধান সূত্র ছিল আর্থ-সামাজিক শ্রেণী, জাতি, বর্ণ অথবা লিঙ্গ;বিংশ শতকে শেষ পর্যায়ে এসে পুঁজিবাদ সেগুলি অপসারিত করার চেষ্টা করছে ভোগের চরিত্রের দ্বারা। মানুষে মানুষে এই বিভাজনকে চিহ্নিত করা হচ্ছে 'কনজাম্পশন ক্লিভেজ' বা ভোগের বিভাজন বলে। (৭) কনজিউমার সোসাইটিতে একজন ভোক্তা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করে উৎপাদকদের ব্যবহার করার দ্বারা—পণ্য বা পরিষেবা যে ক্ষেত্রেরই উৎপাদক হোক না কেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সেই ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে উচ্চস্তরের ভোক্তা বলে পরিচিত হয় যে যত বেশি উঁচু দরের ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল ইত্যাদি সামাজিক অংশকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। (৮) ভোক্তার অর্থনৈতিক অবস্থা যত উন্নত, নাগরিক হিসাবে তার উপর আরোপিত রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য ততই অপসারিত হচ্ছে, অন্যদিকে ভোক্তা যেন অপসারণ করছে নাগরিক সমাজের (সিভিল সোসাইটির) নাগরিক সত্তাকে। বর্ধিত ও উন্নত সংখ্যায় পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় করা শুধু নয়, মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি দিককে পণ্যায়িত করা হচ্ছে, অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য করা হচ্ছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হচ্ছে বাজার। মানুষের জীবনে কেনাকাটা ক্রমশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিনোদনমূলক অন্যতম তৎপরতা।

ভোক্তা-সমাজের পূর্বোক্ত উপাদানগুলি উন্নত দেশগুলিতে বেশি ও অনুন্নত দেশগুলিতে সামান্য চোখে পড়লেও, এখনও সর্বজনীন চরিত্র গ্রহণ করেনি। আবার যেখানে এগুলি ঘটছে, সেখানেও পূর্বোক্ত সব উপাদানগুলিকে একত্রে পাওয়া যায় না। এটাও এখন স্পষ্ট নয় যে এই প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে বাড়বে। কেননা শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সামাজিক বাস্তবতা এখনও বাস্তব শুধু নয়, সেগুলির তীব্রতাও বাড়ছে। সামাজিক বিভাজনের প্রধান উপাদান হিসাবে এখনও এগুলি সর্বাংশে সক্রিয়। সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ এগুলির দ্বারা আক্রান্ত। তবে এটাও ঘটনা যে মানুষের বাঁচার ও জীবনধারণের মৌলিক ও প্রাথমিক চাহিদাগুলির তুলনায় বিলাস-পণ্য উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনতন্ত্র সর্বত্র পরিকল্পিতভাবে সমাজে একটা নির্দিষ্ট অংশকে গড়ে তুলতে চাইছে পুঁজি বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট বিলাস-পণ্যের ক্রেতার স্থায়ী বাজার হিসাবে। নানাভাবে সেই বাজার প্রসারের চেষ্টাও তীব্র। কিন্তু এর ফলে জনগণের বেশি বেশি অংশের দারিদ্র্যায়ণ ঘটে চলেছে; বিলাস-পণ্যের ভোক্তার চাইতে বিপরীতের সংখ্যাই সমাজে ক্রমবর্ধমান। এই বাস্তব পরিস্থিতির ফলে সমাজতাত্ত্বিকদের এক বড় অংশ কনজিউমার সোসাইটিতে ভোক্তার ক্ষমতা অর্জনের তত্ত্বে বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। পুঁজিবাদী চাকচিক্যময় মেকী মূল্যবোধের এক রূপ হিসাবে ভোক্তা-সমাজ প্রতিফলিত হচ্ছে মাত্র। প্রসঙ্গত পুঁজিবাদী মূল্যবোধসঞ্জাত কনজিউমার সোসাইটির অন্যদিকের কিছু প্রতিফলন লক্ষ্য করা যেতে পারে।

পরিবার, বিবাহ ও যৌন সম্পর্কের স্তরে নতুন অভিঘাত

বর্তমান পৃথিবীতে বহু সামাজিক, সমাজ-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ধারণা ও শব্দ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। যেমন, নেশন স্টেট, বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত, সোস্যালিজম, ক্যাপিটালিজম, মনোপলি, ইম্পিরিয়ালিজম, হেজিমনি, ফ্যামিলি, ম্যারেজ, সেক্স, ক্লাস, রেভোলিউশন, ক্লাস-স্ট্রাগল, উইমেন ইত্যাদি বিষয়ক প্রচলিত অবস্থান, সংজ্ঞা ও ধারণা। তবে এই চ্যালেঞ্জ কতখানি যথার্থ ও কার্যকরী অথবা মেকি বা একাডেমিক তা' বিশদ বিচারের দাবী রাখে।

পুঁজিবাদের প্রত্যেকটি স্তরে, মৌলিকভাবে না হলেও, নারী, বিবাহ, যৌন সম্পর্ক প্রভৃতি সংজ্ঞার কিছু কিছু বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছিল—নারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও আনুষ্ঠানিক কিছু অধিকারের স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে। তার ফলে মানুষীদের বর্ধিত সামাজিক ভূমিকা, সমাজের সাথে তাদের নতুন সম্পর্ক, তাদের মানসিক পরিবর্তন, পুরুষ-নারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন কিছু উপাদানের সংযুক্তি প্রভৃতি ঘটেছিল।

নারীর মানসিক ও সামাজিক অবস্থানের বিবর্তনের পিছনে পরিবার-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন অন্যতম কেন্দ্রীয় কারণ। সুতরাং পরিবার তথা বিবাহ ও যৌন সম্পর্ককে যতটা স্থাণু ও অপরিবর্তিত

বলে মনে করা হয়েছে, আসলে ঘটনা তা' নয়। তবে সভ্যতার প্রথমদিকে এই পরিবর্তন এত ধীরে সমাজে আত্মীকৃত হয়েছে যে মানব সমাজের এক শত বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক প্রজন্ম, তা' চিহ্নিত করতে বা বুঝে উঠতে পারেনি।

ধ্রুপদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উত্থানের কালে ইউরোপের দেশগুলিতে 'ফ্যামিলি' বা পরিবার শব্দের ও ধারণার উদ্ভব ঘটেছিল। ইংলণ্ডে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজে 'ফ্যামিলি' শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। শব্দটি এসেছিল ল্যাটিন 'ফ্যামিলিয়া' তথা গৃহস্থালি এবং ল্যাটিন 'ফ্যামুলুস' তথা গৃহভৃত্য শব্দ দু'টি থেকে। এই শব্দটি, অসচেতন কিন্তু অত্যন্ত সঠিকভাবে, পরিবারের অভ্যন্তরে নারীজাতির অবদমিত অবস্থাকে তুলে ধরেছিল, তুলে ধরেছিল পুঁজিবাদী পরিবারের আদিম রূপটিকেও। এই যুগে, একটি বাসস্থানে বসবাসকারী আত্মীয়-পরিজন, বাড়ীর চাকর-চাকরাণী, মালিকানাধীন খেত-খামারের দাস, কৃষি-শ্রমিক প্রভৃতি সব মিলে পরিবার গঠিত ছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের পরিবার ছিল একই পূর্বপুরুষের অধস্তন ও নিকটস্থ পিতৃতান্ত্রিক শাখা-প্রশাখার সমস্ত মানুষদের একটি আবাসে বসবাসকারীদের নিয়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বীজ রূপে উদ্ভব ঘটেছিল আধুনিক বুর্জোয়া পরিবারের। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানরা ছাড়াও, স্বামীর পিতা-মাতা ও তার অবিবাহিত ভাই-বোনদের নিয়ে গঠিত হতো পরিবার। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জেমস স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন 'সেই গোষ্ঠী যা পিতা-মাতা ও সন্তান নিয়ে গঠিত, তাকে বলে পরিবার।' তবে এই পরিবার ব্যবস্থা ছিল প্রধানত মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবীদের। এই স্তরে, পরিবারের ভরণ-পোষণ করে মজুরিভোগী শ্রমে নিয়োজিত মানুষ। ক্লাস-ফিলিং বা শ্রেণী-মর্মিতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন যেমন পরিবারের অভ্যন্তরে ছিল, প্রকাশ্যেও তার অভিব্যক্তি ঘটতো। কারখানার শ্রমিক ও শ্রমিকারা শ্রেণী-সম্বন্ধকে যেমন রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিল। ফ্যাক্টরির শ্রমিক ও শ্রমিকা পরস্পরকে সম্বোধন করতো 'ব্রাদার' ও 'সিস্টার' বলে। ক্রমে, পরিবারে নারীর 'কালেক্টিভ লেবার' বা যৌথ শ্রম ও 'কালেক্টিভ আইডেন্টিটি' বা যৌথ পরিচিতি যখন 'অ্যাটমিক ফ্যামিলি' বা কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের দ্বারা অণু-পরিবারে রূপান্তরিত হয়েছে, তখন তা' 'সিলেক্টিভ' বা নির্বাচিত শ্রম ও পরিচয়ে নির্বাসিত হয়েছে। বস্তুত্র থেকে নারীর একাকী শ্রম তাকে ক্রমাগত ও অধিকতর আত্ম-মনোনিবেশী করে বিচ্ছিন্নতার সামাজিক অবস্থান ও মানসিকতায় অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করেছিল। তাছাড়া বিগত পাঁচ শতাধিক বছরে বিশ্ব জুড়ে পরিবার প্রথার বিবর্তনের প্রক্রিয়াতে (ট্রাইব সমাজগুলির ব্যতিক্রম বাদ দিলে) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রতিফলনও রয়েছে।

'ম্যারেজ' তথা বিবাহ ও 'ফ্যামিলি' বা পরিবারের ধারণা ও অস্তিত্ব মানবসভ্যতার ইতিহাস যতখানি পুরাতন, ঠিক ততখানিই পুরাতন সেক্স-কোশ্চেন বা লিঙ্গ-প্রসঙ্গ এবং তা' নিয়ে প্রকাশ্য বা নেপথ্য বিরোধ-বিতর্ক। অতীতের 'মাদারহুড সুপ্রিম রাইট' তথা মাতৃতান্ত্রিক চরম অধিকার পুনরুদ্ধারে নারীদের পক্ষ থেকে চেষ্টা এবং 'প্যাট্রিয়ার্কাল' বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে লিঙ্গগত বৈষম্য তথা রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় বৈষম্যকে কেন্দ্র করে নারীদের সেক্স-আইডেন্টিটির সমস্যা, সুপ্তভাবে বা প্রকাশ্যে মানসিক বিরোধ জিইয়ে রেখেছিল।

যৌন প্রসঙ্গ, কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত, জনজীবনে অপ্রাসঙ্গিক এবং একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হতো, যদিও সব সময়ে একথা স্বীকৃত যে প্রাণী জগতের অব্যাহত অস্তিত্ব ও পুনরুৎপাদনের জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনতিক্রম্য। কিন্তু পুরুষ-নারীর যৌন সম্পর্কের এই ঐতিহাসিক ব্যবস্থাকে বর্তমানে গভীর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে। কোন কোন অংশের সমাজতাত্ত্বিক এবং একাংশ নারীবাদীদের কাছে যৌন প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে 'বিপ্লবের ভাষা'(!)। কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে বিগত কয়েক দশকব্যাপী যৌন বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে; কোন কোন অংশ সামাজিক বিপ্লবের আশা ও সম্ভাবনাকে অনেকটাই স্থাপন করেছেন যৌন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের উপর। শেষোক্তরা মনে করেন যে, আধুনিক সভ্যতার অভ্যন্তরে যেসব বন্ধন, সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে সেগুলি ভেঙ্গে ফেলা এবং পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে যৌন বিপ্লব এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তিন শতাব্দী পূর্ব থেকে দমিত নারী সমাজ সম্পর্কে আলোচনা, দুই শতাব্দী পূর্ব থেকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতার দাবী এবং এক শতাব্দী পূর্ব থেকে নারী-মুক্তির বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে। এসব বক্তব্য ও তৎপরতা সংঘটিত হয়েছিল পুরুষদের পক্ষ থেকে প্রধানত। বর্তমান শতাব্দীতেই সর্বপ্রথম নারীরা স্বয়ং লিঙ্গগত সমতার দাবী তুলেছে এবং নিজেরা সক্রিয় হয়েছে। একটা সময় পর্যন্ত সেই দাবী প্রসারিত ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরে; ক্রমে সেই দাবী প্রসারিত হয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্তরে। কিন্তু সত্তরের দশক থেকে এই ধারাতেও অবিশ্বাস্য ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এই নতুন ধারার উদ্ভাবনীতে প্রধানতম হয়ে ওঠে 'পিওর রিলেশনশিপ' তথা পুরুষ-নারীর মধ্যে অনাবিল সম্পর্ক নির্ধারণ ও প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ। সেই উদ্দেশ্যে ঘোষিত হয়, যৌনতা (সেক্সুয়ালিটি) ও আবেগের (ইমোশন) দ্বারা সুসজ্জিত পরম্পরাগত লিঙ্গগত জেণ্ডার পাওয়ারের বিরুদ্ধে যৌন বিপ্লবের পথে পুরুষের সাথে সাম্য অর্জনের তত্ত্ব।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড তাঁর 'থ্রি এসেস' আলোচনাতে খানিকটা অস্ফুটভাবে যাকে 'প্লাস্টিক সেক্সুয়ালিটি' বলেছিলেন, বর্তমানে সেই উপাদানের উপর অনেকটা নির্ভর করেই যেন পূর্বোক্ত সাম্য-আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব। এই 'প্লাস্টিক সেক্সুয়ালিটি'কে এখন প্রস্তাব করা হচ্ছে 'ডি-সেন্টার্ড সেক্সুয়ালিটি' বা বি-কেন্দ্রীভূত যৌনতার জন্য দাবী হিসাবে। দাবী করা হচ্ছে যে, প্রচলিত এক পুরুষ-এক নারীর মধ্যে, এমনকি যে কোন একজন পুরুষ ও যে কোন একজন নারীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত পরম্পরাগত যৌন ব্যবস্থা স্বভাবতই পিওর রিলেশনশিপ নয়; পিওর রিলেশনশিপের উপর প্রতিষ্ঠিত প্লাস্টিক সেক্সুয়ালিটি তথা ডি-সেন্টার্ড সেক্সুয়ালিটি হবে পুনরুৎপাদনের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রচলিত যৌন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা এবং যৌন উপভোগ নারীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অধিকার অর্জনের জন্য প্রয়োজন 'প্লাস্টিক সেক্সুয়ালিটি'র। পরিবারকে ছোট করা এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা যে ঢেউ সৃষ্টি করেছিল, সেটি সংহতকরণের পর এখন ক্রমে সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে এই নতুন মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। 'প্লাস্টিক সেক্সুয়ালিটি'কে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে পার্সোনালিটি তথা ব্যক্তিত্ব গঠনের এক উপাদান হিসাবে এবং স্বভাবতই প্রসঙ্গটির সাথে জড়িয়ে গেছে নতুন আত্ম-পরিচিতি (সেলফ-আইডেন্টিটি) গঠনের আকাঙ্ক্ষা।

সভ্যতার ইতিহাসে যৌন আবেগগত ধারা নেপথ্যে প্রবাহিত থেকেছে। কেননা পুরুষের যৌন অভীষ্ট অনুসরণ অপ্রকাশ্য থেকেছে তার প্রকাশ্য সামাজিক জীবনে। পুরুষের দ্বারা নারীর যৌন নিয়ন্ত্রণের ইতিহাসও অনুরূপ। সাধারণভাবে সমস্ত সমাজে নারীর যৌন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল পুরুষের জন্য স্বীকৃত অধিকার। এই উভয়বিধ নিয়ন্ত্রণ (পুরুষের স্বেচ্ছাচারী যৌন অভীষ্ট অনুসরণ এবং নারীর যৌন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ) যখন ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে অপ্রকাশ্য থেকে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে পুরুষের যৌন অভীষ্ট অনুসরণ; নারীর যৌন ব্যবস্থার উপর পুরুষের এযাবৎকালের নিয়ন্ত্রণের অধিকার যত শিথিল হচ্ছে ততই নারীদের উপর পুরুষের যৌন হিংসাত্মক আক্রমণ উত্তাল ঢেউয়ের মতো হয়ে উঠছে।

এইভাবে মানব-সমাজের 'ট্রান্সফরমেশন অব ইন্টিমেসি'র বা সংলগ্নতার রূপান্তরে ঐতিহাসিক গতি এখন এক নতুন অভিঘাতের মুখোমুখি হয়েছে। তবে নারীর দিক থেকে একমাত্র নয়, পুরুষ ও নারী উভয়ের যৌনতার দর্শন (ফিলজফি অব সেক্স) এখন নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। অতীতে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের একাংশ নারী বা পুরুষের নিয়ন্ত্রণহীন যে যৌনতাকে দেহ ও মন জগতের অসুস্থতা বলে চিকিৎসাশাস্ত্র ঘোষণা করেছিল এবং পরবর্তীকালে সামাজিক মানদণ্ডের বিচারে যাকে মানসিক বিকৃতি বলা হয়েছিল, বর্তমানে এই উভয় ধারণা ও বক্তব্য সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়েছে। একদা পাশ্চাত্য-উত্থিত এই বাস্তবতার ছায়া তৃতীয় দুনিয়ার সমাজেও ক্রমশ প্রলম্বিত হচ্ছে; তবে পার্থক্য হলো, এসব নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা বা তত্ত্ব এখনও ততটা সোচ্চার নয় শেষোক্ত দেশগুলিতে।

'প্লাস্টিক সেক্সুয়ালিটি' সম্পর্কে আধুনিককালের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য মিচেল ফোকাল্ট (দ্য হিস্ট্রি অব সেক্সুয়ালিটি, তিন খণ্ডে, পেলিকান, ১৯৮১) বা পূর্ববর্তীকালে উইলহেম রিখ (লিস্ন—

লিট্‌লম্যান, সুভেজির, ১৯৭২; ক্যারেক্টার এনালিসিস—ভিহ্‌ন, ১৯৫০; দা সেক্সুয়াল রেভোলিউশন—স্ট্রাস অ্যাণ্ড গিরক্স, ১৯৬২ প্রভৃতি) এবং হার্বার্ট মারক্যুইজ (ইরোজ অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন—এলেন লেন, ১৯৭০; নেগেশনস—এলেন লেন, ১৯৬৮ প্রভৃতি) প্রমুখরা হেটারো সেক্সুয়ালিটি তথা ইতররতি অর্থাৎ ইচ্ছা ও সুযোগমতো পুরুষ ও নারী উভয়ের যে কোন বিপরীতের সাথে যৌন সম্পর্ককে এক স্বাভাবিক জৈব প্রবণতা বলে প্রমাণ করার প্রসঙ্গও এই নতুন দর্শনে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ছে। একদা যাকে বিকৃতি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাকে এখন বলা হচ্ছে যৌনতা প্রকাশের এক ন্যায়সঙ্গত পথ এবং আত্ম-পরিচিতি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। দাবী করা হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের যৌন তৎপরতা কার্যকালে বহুত্বমূলক (প্লুরাল) জীবন-চর্চার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বহুত্ব মানে গণতন্ত্র, এই দাবী উপর গঠিত 'র‍্যাডিকাল সেক্সুয়াল প্লুরালিজম' বা বিপ্লবাত্মক বহুত্বমূলক যৌনতার দর্শন স্থির করতে চায় স্বাধীন যৌন নির্বাচনের এবং ব্যবহারের অধিকারের দ্বারা মুক্তি অর্জনের জন্য নির্দেশিকা, কিন্তু নির্দেশিকার ক্ষেত্রে কোন প্রচলিত ও সুসংহত নৈতিক মানদণ্ড চায় না এই দর্শন। এঁদের মতে যৌনতা হলো রাজনৈতিক বুনিয়াদী সংগ্রামের এক ভূখণ্ড এবং মুক্তির এক মাধ্যম। রিচ্‌ ও মারকিউজ উভয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে এক অ-নিষ্পেষণমূলক সমাজ অর্জিত হলে যৌন জীবন ও ব্যবস্থার বাধ্যতার বর্তমান বাস্তবতাও অপসারিত হবে। এইসব 'যৌন বিপ্লবী'রা মনে করেন এজন্য দ্বিমুখী বিপ্লব প্রয়োজন হবে— সমাজকে প্রবাহিত হতে হবে এক চূড়ান্ত সংঘাতী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং সমাজের আমূল মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং এটা সম্পন্ন করতে হবে নীচু থেকে উপরে (ফ্রম দা বটম আপ)। আরেক অংশ পূর্বোক্ত বক্তব্য ও লক্ষ্যকে কিছুটা ভিন্নভাবে প্রস্তাব করে বলেছেন যে এই 'সমাজ-বিপ্লব'-এর কাজ হবে ব্যক্তির বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিকীকরণ (র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটাইজেশন অব পারসন)।

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় শিল্প-সাম্রাজ্যবাদ যে শ্রম-প্রক্রিয়ার নিয়োগ শুরু করেছে তার অন্তর্গত করে নিয়েছে পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনকে; ব্যক্তিজীবনের রুচি, ভোগ, আচার-ব্যবহার (পূর্বে কিছুটা বর্ণিত হয়েছে) ইত্যাদির সাথে যৌন সম্পর্ক, বিবাহ, পরিবার প্রভৃতিকেও এর অন্তর্গত করছে। পরিবার, ব্যক্তি, যৌনতা, বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত ব্যবস্থার ভাঙ্গনের তৎপরতাকে তারা নাম দিয়েছে 'প্রোজেক্ট অব সেক্সুয়াল ডেমোক্র্যাসি'।

ব্যক্তিগত জীবনের গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়াটি সব সময়ই কম দৃশ্যমান। নারীরা এর সুফল না পেলেও, এ'বিষয়ে নেপথ্যে প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন নারীরাই। এই পটভূমিকায় অতীত গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যৌনতা-গণতন্ত্রের প্রবক্তারা বলেছেন—ব্যক্তিগত জীবনে গণতন্ত্রের বিকাশের বিষয়টি অতীতে ছিল 'পুরুষ প্রকল্প' (মেল প্রোজেক্ট), কিন্তু বিকল্প হিসাবে এরা 'ফিমেল প্রোজেক্ট'-এর দাবী তোলেনি। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মতবাদের কাছে যৌন গণতন্ত্রের অর্থ হলো যৌন অধিকার ও ক্ষমতার সমবন্টন। এযাবৎ পুরুষের জন্য সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত যৌন সম্পর্কিত সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা, প্রস্তাবিত নতুন 'বৈপ্লবিক যৌন গণতন্ত্রে' সমভাবে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বণ্টিত হবে। এই গণতন্ত্রে সর্বাগ্রে অর্জিত হবে নারী ও পুরুষ—উভয়ের 'অটোনমি' তথা স্বশাসন এবং তা' থেকে উভয় অংশই সুযোগ পাবে 'সেলফ আইডেন্টিটি' তথা আত্ম-পরিচিতি গঠনের।

এই জাতীয় সমগ্র আলোচনা থেকে যা ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হচ্ছে, তা' হলো মানব-সভ্যতার ইতিহাসে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্কের ও বন্ধনের দুই প্রধান ভিত্তি—ভালবাসা ও বংশবৃদ্ধি বাতিলের ব্যবস্থা। তার পরিবর্তে যৌন সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে প্রস্তাবিত হচ্ছে উভয়ের স্বতন্ত্রতাভিত্তিক (স্থায়ী বিযুক্তি ভিত্তিক) যৌন বিষয়ে গণতন্ত্র, স্বাধিকার ও আত্ম-পরিচিতি। এইভাবে মানব-সভ্যতার ঐক্য, বন্ধন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা, আত্মীয় সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তব্য, গার্হস্থ্য জীবন এবং সংগঠনের প্রথম বীজ—পরিবার ব্যবস্থাকে বাতিল এবং সমাজ-নিরপেক্ষভাবে মানুষকে 'আমি'তে রূপান্তরিত করার দর্শন ও ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয়েছে।

১৯৯৫ সালে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব-নারী সম্মেলনে বিতর্কের অন্যতম বিষয় ছিল একবচনে (সিঙ্গুলার নাম্বার) 'ফ্যামিলি' তথা পরিবার অথবা বহুবচনে (প্লুরাল নাম্বার) 'ফ্যামিলিজ' তথা পরিবারসমূহ

শব্দ ব্যবহৃত হবে। এই বিতর্কের কারণ হলো, এখন এক স্বামী-স্ত্রীর পরিবার, পরিবার-ব্যবস্থার একমাত্র রূপ নয়। পাশ্চাত্যে ছেলে-মেয়েদের সপ্তাহ-শেষে (সাধারণভাবে) 'ডেটিং' এখন প্রায় তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে। যুক্তি হিসাবে বলা হচ্ছে যে সপ্তাহে ও নির্দিষ্ট একটি দিনের সেক্স হলো মেকানিক্যাল তথা যান্ত্রিক। এতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই। পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধ থেকে সাময়িক সহবাস, কমিউনাল সেক্স, লিভিং টুগেদার প্রভৃতি ব্যবস্থা প্রথাগত পরিবারের চরিত্রের পরিবর্তন সংঘটিত করা শুরু করেছিল। এই ধরনের যৌন ব্যবস্থা পরম্পরাগত পরিবারকে যেমন ভাঙ্গছিল, অন্যদিকে গণতন্ত্র, স্ব-শাসন ও আত্ম-পরিচিতির তথাকথিত তাড়নায় পরিবারের ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব ছেলে-মেয়েদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র আবাসে বসবাসও পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন ঘটাতে শুরু করেছিল। শেষোক্ত অন্যতম মর্ম হলো মুক্ত যৌনতার ব্যবহার। বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থা বহু পূর্ব থেকে শুরু হলেও 'ওয়ান পেরেন্ট ফ্যামিলি'—ছেড়ে যাওয়া পিতা বা মাতার সন্তান-সন্ততি নিয়ে পরিবার এখন ব্যাপক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার প্রধান হলেন নারী এবং দরিদ্র নারীদের মধ্যেই প্রধানত এই 'ওয়ান পেরেন্ট ফ্যামিলি'। এখন অন্যভাবেও সৃষ্টি হচ্ছে 'ওয়ান পেরেন্ট ফ্যামিলি'। তাছাড়া 'ইনফ্যান্ট মাদার', 'চাইল্ড মাদার' অথবা 'ইয়ং মাদার' নামে এক ধরনের পরিবার গঠিত হচ্ছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরী ও সাধারণভাবে স্কুলে পাঠারতা অবিবাহিতা নারীর সন্তানের জন্মদান, অনেকক্ষেত্রে এদের একক পরিবার গঠনে বাধ্য করছে। অনুমিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৯৪ সালে কেবল আমেরিকাতে এই কিশোরী-মাতার সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ লক্ষাধিক। তাছাড়া আছে 'গ্রুপ লিভিং টুগেদার'-এর পরিবার। একদল স্বামী ও একদল স্ত্রী এবং যারা প্রত্যেকেই পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী। আরও আছে। অবিবাহিত পুরুষ বা নারীর অ্যাডপটেড বা পোষ্য সন্তান নিয়ে পরিবার। গড়ে উঠছে পুরুষদের হোমো-সেক্সুয়াল বা নারীদের লেসবিয়ান পরিবার—যেখানে যথাক্রমে দুইজন পুরুষ বা দুইজন নারী একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করে। গঠিত হচ্ছে ইউনাক বা হিজড়াদের (উভয়-লিঙ্গদের) পরিবার। পরিবার গঠনের অধ্যায়ে আরও অভিনব দিক সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। গত ২-৩ বছর ধরে এক স্বামী-স্ত্রীর পরিবারে স্ত্রীর গর্ভে স্বামীর সন্তান ধারণের পরিবর্তে, অর্থের বিনিময়ে, অন্য নারীর গর্ভে জিন- প্রোথিত করে (স্মর্তব্য যে এটি প্রচলিত পুরুষের সংগৃহীত বীর্য ব্যবহার করে নয়) সন্তান উৎপাদনের ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। এক্ষেত্রে একজন অবিবাহিত পুরুষ যেমন এইভাবে তার সন্তান পেতে পারে, অন্যদিকে একজন অবিবাহিতা নারী নিজের কাঙ্ক্ষিত পুরুষের সাথে সংশ্রব না রেখেও নিজের সন্তান পেতে পারে। পরিবার ব্যবস্থার পূর্বোক্ত রূপান্তর আসলে প্রচলিত যৌন ব্যবস্থার রূপান্তর; গণতন্ত্র, স্বাধিকার ও আত্ম-পরিচিতি অর্জনের প্রক্রিয়াও বটে!

নারীবাদের ধারা

'ফেমিনিজম' (ফে = চির দুর্বল + মিনাস = বিশ্বাসে আস্থাশীল + ইজম = মতবাদ) বা নারীবাদ ভিত্তিক এবং সোস্যালিজম-ভিত্তিক নারীমুক্তির ধারণার উদ্ভব মহাসমুদ্রের দুই প্রান্তে হলেও, কাকতালীয়-ভাবে ঠিক একই সময়ে ঘটেছিল। ১৯-২০শে জুলাই, ১৮৪৮-এ নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস-এ অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলন থেকে 'ডিক্লারেশন অব সেন্টিমেন্টস' এবং একই বছরে ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মানিতে মার্কস-এঙ্গেলস রচিত 'ম্যানিফেস্টো অব দা কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রকাশ। এইভাবে নারী আন্দোলনে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারার পত্তন হয়েছিল। পৃথিবীতে বুর্জোয়া তথা ফেমিনিস্ট নারীবাদী ধারাতে বিশ্ব-নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় দেড়শ' বছর আগে, সমাজতান্ত্রিক ধারাতে বিশ্ব-নারী সম্মেলনের উদ্ভবের কালও শতবর্ষ স্পর্শ করেছে। ঐ দুই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের প্রথম পর্ব অনেকটাই ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক। এই এক্সপেরিমেন্ট ছিল মতবাদ, সংগঠন ও আন্দোলনের স্তরে। ধারা দু'টি প্রথম থেকে, কম-বেশি, 'আইডিওলজিক্যাল কনস্ট্রাক্ট' বা মতাদর্শগত নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ঐ দুই উইমেন মুভমেন্ট জন্মলগ্নে দু'টি স্বতন্ত্র ভিত্তি নিয়েছিল—সমাজতান্ত্রিক অংশ বেছে নিয়েছিল আর্থনীতিক ভিত্তি, বুর্জোয়া নারীবাদী অংশ গ্রহণ করেছিল সামাজিক ভিত্তি। বিভিন্ন দেশের নারী আন্দোলন ঐ দু'টি ধারাতে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যও পেয়েছিল। ফেমিনিস্ট ধারার জন্ম শিল্প-পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের কালে, সোস্যালিস্ট উইমেন মুভমেন্টের পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে। তৃতীয় তথা বর্তমান নতুন ধারার উদ্ভব

পুঁজিবাদের এক সম্পূর্ণ নতুন অবস্থাগত স্তরে। বর্তমানের নারীবাদী নতুন ধারাকে মার্কসবাদীদের বড় অংশই অতীতের বুর্জোয়া নারীবাদী আন্দোলনের সম্প্রসার বলে চিহ্নিত করেছেন। এই বক্তব্য অতি সরলীকরণ বলে মনে করার সঙ্গত যুক্তি রয়েছে। অতীতের বুর্জোয়া নারীবাদী আন্দোলনে এর জন্ম-সূত্র পাওয়া গেলেও, নতুন যুগ ব্যবস্থার পটভূমিকায়, অতীতের সাথে নতুন ধারার বিচ্ছেদ নিতান্ত সামান্য নয়।

সমাজতাত্ত্বিকরা ঐতিহাসিক কাল-পর্ব ধরে মোটা দাগে আধুনিক ফেমিনিজমকে ভাগ করেছেন ক্লাসিক্যাল ফেমিনিজম, প্রোটো-ফেমিনিজম, নিও-ফেমিনিজম, পোস্ট-ফেমিনিজম প্রভৃতিতে। কেউ ভাগগুলিকে ফাস্ট ওয়েভ ফেমিনিজম, সেকেণ্ড ওয়েভ ফেমিনিজম ও থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজম বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ওল্ড ফেমিনিজম ও নিউ ফেমিনিজম নামেও ভাগ করা হয়েছে। কেউ বা বলেছেন কনজারভেটিভ ফেমিনিজম, মেইনস্ট্রীম ফেমিনিজম, র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিজম ও সেক্সিস্ট ফেমিনিজম। মূল ভাগগুলির বাইরে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত গোষ্ঠীগুলির আবির্ভাব ঘটেছে (যেগুলির কিছু কিছু লুপ্তও হয়েছে) সেগুলি পরিচিত হয়েছে পরিবারবাদী ফেমিনিস্ট, ইন্টিগ্রাল ফেমিনিস্ট, ইগালিটারিয়ান ফেমিনিস্ট, এভানজেলিক্যাল ফেমিনিস্ট, ক্রিশ্চিয়ান ফেমিনিস্ট, র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্ট, মেল ফেমিনিস্ট, মডার্ন ফেমিনিস্ট, ইক্যুয়াল রাইটস ফেমিনিস্ট, ফিমেল সুপিরিয়রিটি ফেমিনিস্ট, কনগ্রুয়েন্ট ফেমিনিস্ট, কমপ্লিমেন্টারি ফেমিনিস্ট, হিউম্যানিস্ট ফেমিনিস্ট, গাইনো-সেন্ট্রিক ফেমিনিস্ট, রিলেশনাল ফেমিনিস্ট, ইনডিভিজ্যুয়ালিস্ট ফেমিনিস্ট, কালচারাল ফেমিনিস্ট প্রভৃতি নামে। ষাটের দশকের পর থেকে আরও নতুন ধারার উদ্ভব ঘটতে থাকে। আমেরিকাতে বিশেষত কৃষ্ণবর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে উইমেন অব কালার ফেমিনিজম, তাছাড়া তৃতীয় দুনিয়ায় থার্ড ওয়ার্ল্ড ফেমিনিস্ট। ক্রমে আধুনিককালে গড়ে উঠেছে পোস্ট-মডার্নিটি ফেমিনিস্ট, অ্যান্টি-পর্ণো ফেমিনিস্ট, অ্যান্টি-অ্যান্টি-পর্ণো ফেমিনিস্ট, অ্যাকাডেমিক ফেমিনিস্ট, ইকো-ফেমিনিস্ট, অ্যান্টি-অ্যাবোরশন ফেমিনিস্ট বা প্রো-লাইফ ফেমিনিস্ট প্রভৃতি। এইসব নাম থেকে সংশ্লিষ্ট নারীবাদের বক্তব্য ও দাবীকে বোঝা যায়। বলাই বাহুল্য, নারীবাদী আন্দোলন এখন সারা বিশ্বে ব্যাপক।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তরকালে ফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ বাঁক সৃষ্টি হয়েছিল সিমন ডি বুভেয়ারের 'দা সেকেণ্ড সেক্স' (১৯৫২) পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন দেশে ফেমিনিস্ট আন্দোলনে নতুন নতুন উপাদান ও ধারা যুক্ত হতে থাকে। এক দশকের মধ্যে বেটি ফ্রিডম্যানের 'দা ফেমিনিন মিস্টিক' (১৯৬৩) পুস্তক নতুন করে অভিঘাত হানে সমগ্র আন্দোলনে।

সিমন ডি বুভেয়ার তাঁর 'দা সেকেণ্ড সেক্স' পুস্তকের একটি স্থানে লিখেছিলেন, '...দা বডি ইজ আ সিচ্যুয়েশন...' অর্থাৎ নারীর জৈবিক অবয়বটাই হলো পরিস্থিতি। একথা সর্বাংশে সত্য কেননা পুরুষ-প্রধান সমাজে নারীর জাগতিক দেহের ধারণার সাথে তার মানসিক দেহকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নারীদের মানসিকতায় শোষণ-নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান প্রতিফলন ও তার ফলে সংঘাতের চাপে, শেষ পর্যন্ত 'জেন্ডার স্টাডিজ' বা লিঙ্গ-প্রসঙ্গ মূল্যায়নের এক শাখা গঠন করে নিয়েছে উদারনীতিবাদী সমাজতত্ত্ব। 'উইম্যান অ্যাজ আ ফিল্ড অব অ্যানালিসিস' বা নারীকে বিশ্লেষণের এক ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করতে 'স্টাটাস অব উইমেন', 'সোসিওলজি অব উইমেন', 'উইমেন অ্যাজ বায়োলজিক্যাল ক্যাটেগরি', 'উইমেন অ্যাজ সোস্যাল ক্যাটেগরি', 'সেক্স-ক্লাস' (ই. পি. টমসন), 'নিউ পুওর', 'আণ্ডার ক্লাস' প্রভৃতি সোসিওলজিক্যাল স্টাডিজ বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ধারা গড়ে উঠেছে ক্রমে। এই ক্ষেত্রে আধুনিক আলোচনাগুলির অন্যতম প্রসঙ্গ হলো 'ডিফারেন্স' বা পার্থক্য—দৈহিক, যৌনগত, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি। পার্থক্য পুরুষ ও পুরুষের সাথে জড়িত সমস্ত ধরনের বিষয়ের সাথে নারীর। এই 'ডিফারেন্স' বা পার্থক্যকে 'ইনইক্যুয়ালিটি', বা অসমতার সমার্থক বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই 'ডিফারেন্স' তথা 'ইনইক্যুয়ালিটি'-র দুই মেরুর একদিকে স্থান দেওয়া হয়েছে 'ডমিন্যান্স' বা প্রাধান্যকে ও অন্যদিকে 'সাবর্ডিনেশন' বা অধীনতাকে। পুরুষের অবস্থান 'ডমিন্যান্ট ক্যাটাগরি'তে, নারীর বাস 'সাবর্ডিনেট ক্যাটাগরি'তে। এই ধারা থেকে নির্মিত হয়েছে—'জেণ্ডার অ্যাজ

সোস্যাল কনস্ট্রাক্ট'—লিঙ্গত্বের সামাজিক নির্মাণ 'সোস্যাল ক্যাটাগরি ইম্‌পোজড অন সেক্সড বডি'—লিঙ্গত্বসম্পন্ন জৈবিক দেহের উপর প্রস্থিত সামাজিক অংশ প্রভৃতি ধরনের বিচার।

ফেমিনিজমের বিভিন্ন ধারার আলাদা আলাদা আলোচনার পরিবর্তে এগুলির কিছুটা সাধারণ দিক লক্ষ্য করা যেতে পারে। আধুনিক ফেমিনিজমের অধিকাংশ শাখা নারীকে সামাজিক অংশ হিসাবে অতীতের ব্যাখ্যার পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট 'পলিটিক্যাল ক্যাটেগরি' বা রাজনৈতিক বর্গ হিসাবে চিহ্নিত করছে। এই তত্ত্বে প্যাট্রিয়ার্কিকে বা পুরুষতান্ত্রিকতাকে ধনতন্ত্রের সমার্থক বলে বলা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় (প্যাট্রিয়ার্কি) নারীরা সর্বজনীনভাবে নির্যাতিত হওয়ায়, ব্যবস্থাব বিরোধিতায় তারা দাঁড়াতে চায়। স্বভাবতই, শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সমার্থক হিসাবে এই তত্ত্ব স্থাপন করেছে নারী সমাজকে। কিন্তু নারীবাদের কোন কোন ধারা মনে করে যে এ' ব্যাপারে সর্বত্র নারী স্বার্থ একরকম নয়। যেমন আফ্রিকান-আমেরিকান (আমেরিকান নিগ্রো) ফেমিনিস্টরা মনে করে বর্ণ-বিদ্বেষ ও তার ফলে শোষণ ও বঞ্চনার ক্ষেত্রে শ্বেত নারীরা প্যাট্রিয়ার্কির পক্ষভুক্ত, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নারীদের সম্পর্কে যেমন মনে করে থার্ড ওয়ার্ল্ড ফেমিনিজম।

ফেমিনিস্ট আন্দোলনের কোন কোন ধারার কেন্দ্রীয় শ্লোগান দাঁড়িয়েছে 'উইমেন পাওয়ার' বা নারী-শক্তির জাগরণ, প্রদর্শন, প্রতিষ্ঠা ও সংহতকরণ। প্রাচীন সভ্যতায় মাতৃ-শক্তি কোন না কোন ধরনের অতিপ্রাকৃতবাদী সামাজিক তৎপরতা ও ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত ছিল। ক্রমে এই ধারার আরও বিবর্তন ঘটে। সুপার-ন্যাচারাল পাওয়ার-এর পরিবর্তে এলো 'ভেনাস পাওয়ার' বা যৌন-প্রেম শক্তি। সৃষ্টি হলো বহু চমকপ্রদ মনমোহিনী নারী চরিত্র। পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্য দিয়ে এই সেক্সিস্ট ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল। এইভাবে উইম্যান পাওয়ার কার্যকালে পুরুষতান্ত্রিকতার অধীনে গ্রহণ করলো নমনীয় যৌন চরিত্র। আধুনিক 'উইম্যান পাওয়ার'-এর শ্লোগানও কার্যত পুরুষের সাথে 'পাওয়ার-শেয়ারিং' হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উইম্যান পাওয়ারকে 'ফেমিনিন পাওয়ার'ই মনে করা হচ্ছে; তা' ম্যাসকুলিন পাওয়ার নয়। বরং ম্যাসকুলিন পাওয়ার থেকে এই পাওয়ার ডিসট্যান্সড্—ব্যবধানীয় সত্তা-সম্বলিত।

তবে, নারীদের সহজাত ও স্বাভাবিক ক্ষমতা (পাওয়ার) মাতৃতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরাজয়ের সাথে সর্বাংশে শেষ হয়ে যায়নি, তবে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা' ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চলেছে। এ'কারণেই বুর্জোয়া সমাজের শালপ্রাংশু প্রতিনিধি ফ্রান্সিস বেকন একদা বলেছিলেন যে মানব সমাজের পক্ষ থেকে প্রকৃতিকে অধীনস্থ করার চেষ্টার হাত ধরাধরি করে চলেছে নারীদের অধীনস্থ করার কাজ। নারীরা যখন থেকে গার্হস্থ্য-শ্রম ছাড়াও সামাজিক প্রকাশ্য-শ্রমে নিরত হয়ে অর্থ উপার্জন (মজুরি) শুরু করেছে এবং পাওয়ার বা শক্তি অর্জন ও ব্যবহারের প্রাথমিক শর্ত সৃষ্টি করেছে সেই কাল-পর্ব থেকেই নারীর উপার্জনকে 'সাপ্লিমেন্টারি টু দা ব্রেড-উইনার' বা পুরুষ-উপার্জনের সহায়ক বলে পরিচিত করানো হয়েছে। এমনকি একটি পরিবারের অভ্যন্তরে নারী কখনো যদি পুরুষের চেয়ে বেশি, এমনকি একক উপার্জনকারী হিসাবেও ভূমিকা নিয়েছে, তখনও সেই উপার্জন সাপ্লিমেন্টারি বা সহায়ক ছাড়া পরিবার বা সমাজে মর্যাদা পায়নি। শ্রমের ক্ষেত্রেও, এমনকি সংগঠিত শিল্পের শ্রমে, নারীর শ্রমকে খড়ির চিহ্নে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে অভিহিত করা হচ্ছে 'ফিমেল অক্যুপেশন' বলে। এইভাবে আধুনিককালেও নারীদের ক্ষেত্রে 'পাওয়ার সাবর্ডিনেশনে'র ফলে নারীবাদে পুরুষের সাথে পাওয়ার ইক্যুয়েশন-এর প্রসঙ্গ তীব্র হচ্ছে।

নারী সমস্যার কার্যকারণ নির্ধারণে সমাজ-বিজ্ঞানের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি-বর্জিত এই বক্তব্য কার্যকালে অবলম্বন করেছে 'ইনক্লুশনিজম' বা অন্তর্ভুক্তিবাদকে। পুরুষদের কর্তৃত্বের অন্তর্গত থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারে অংশীদারিত্ব দাবী করে নারীবাদী 'ইনক্লুশনিজম'। বৈষম্যের বন্ধন থেকে মুক্তির এই হলো উপায়। স্বাধীনতা ও সম্পদে অংশীদারিত্ব করতে 'পাওয়ার ডমেইন' বা 'স্ট্রাকচারে' তথা ক্ষমতার কাঠামোতেও ইনক্লুশন জরুরি হেতুই এই ধারার নারীবাদ নারীদের 'পলিটিক্যাল ক্যাটেগরি' হিসাবে উপস্থিত করে। ভাবা হচ্ছে যে নারী-দাবী অর্জনের স্বার্থে এই 'ইনক্লুশনিজম' যুক্তিযুক্ত এবং এর 'লেজিটিমেসি' বা বৈধ্যতাও অখণ্ডনীয়। পুরুষদের সমান্তরালে অবস্থান নিতে চেয়েছে এই ধারার

নারীবাদ। কেননা পুরুষকে সার্বিকভাবে অধিকারচ্যুত করার দাবী না তুললে পুরুষদের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা আসবে না, সুতরাং স্বাধীনতা ও অধিকার হাসিল করা যাবে—এই ট্যাক্টিক্যাল মনোভাবও 'ইনক্লুশনিজম' তত্ত্বের পিছনে কাজ করে। এরা আরও মনে করে যে পুরুষ-সংস্কৃতিকে আত্মীকরণ করার মধ্য দিয়ে পুরুষের সমান ও সমান্তরাল হবার আকাঙক্ষা পূরণ হবে।

স্যোস্যাল-বায়োলজিস্ট তথা সামাজিক জীব-বিদ্যাবিদদের একাংশের নারী-ভরভিত্তিক মূল্যায়ন নারীবাদে 'অ্যান্ড্রগ্নি থিসিস'-এর সংযোগ ঘটিয়েছে। 'অ্যান্ড্রগ্নি' শব্দের অর্থ হলো 'অ্যান্ড্রো' অর্থাৎ পুরুষ এবং 'গ্নি' শব্দের অর্থ নারী। অনেকটা ভারতীয় শাস্ত্রের অর্ধনারীশ্বর ধরনের। এই তত্ত্ব 'ফিউশন অ্যাপ্রোচ' বা একত্রীভবন পদ্ধতি বলেও উল্লেখিত হয়েছে। এদের প্রতিপাদ্য হলো যে শরীর-ভিত্তিক বিভাজনে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যকে যত বড় করে তুলে ধরা হয়েছে, তার চেয়ে উভয়ের মধ্যে মিলের দিকগুলিই বেশি। এক্ষেত্রে নানা উদাহরণ দিয়েছেন তাঁরা। যেমন একজন পুরুষ সবল ও একজন নারী দুর্বল হতে পারে, আবার এর বিপরীতটিও রয়েছে। একজন পুরুষের বশ্যতা যেমন নারী স্বীকার করতে পারে আবার নারীর বশীভূতও হয় একজন পুরুষ। একজন নারী একজন পুরুষের তুলনায় দুর্বল, আবার সেই নারী অপর একজন পুরুষ বা নারীর তুলনায় সবল হতে পারে। সুতরাং শক্তি ও ক্ষমতা পুরুষের একান্ত প্রসঙ্গ নয়। তবে এই 'অ্যান্ড্রগ্নি তত্ত্ববিদ'রা প্রসঙ্গটিকে শরীরগত 'হেরোমাফ্রোডিটিজম' বা উভয়-লিঙ্গত্ববাদ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেছেন। এই 'অ্যান্ড্রগ্নি'-কে বিবেচনা করা হয়েছে সামাজিক ও মানসিক জগতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে একত্রীভবনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। পুরুষ-বিদ্বেষ ও পুরুষ থেকে নারীকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, একান্ত ও স্বতন্ত্রভাবে গড়ে তোলার নারীবাদী ধারণাকে অস্বীকার করেছে এই নারীবাদী তত্ত্ব। এইভাবে 'অ্যান্ড্রগ্নি তত্ত্ব' আবির্ভূত হয়েছে আধুনিক নারীবাদের একটি নতুন ধারা হিসাবে। এই সমঝোতার তত্ত্ব সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো পুরুষ-বিদ্বেষ ও পুরুষ-বিচ্ছিন্নতার ফলে নারীবাদের ব্যর্থতা। এই তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও হচ্ছে। এ' বিষয়ে আলোচনাগুলির অন্যতম সর্বজনীন মর্ম হলো, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের সমস্ত উপাদান ও গুণাবলী রয়েছে নারীর মধ্যে। নারীকে পুরুষের সমতুল করে তুলতে হলে তা' কেবলমাত্র দাবী, অধিকার অর্জন, সংগঠন ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সম্ভব হবে না। পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে, যা নারীর মধ্যেও সুপ্ত থাকে, শৈশব থেকেই প্রতিটি নারীর মধ্যে জাগরিত ও পুষ্ট করে যেতে হবে। শৈশব থেকে প্রতিটি নারীকে এইভাবে গঠন করতে পারলে এক সময় নারীরা সমবেতভাবে অর্জন করবে সমবেত পুরুষের সমান শক্তি, দক্ষতা ও চরিত্র। এই প্রস্তুতির পর্বকে যথার্থভাবে সম্পাদন করার মধ্য দিয়ে নারীবাদী আন্দোলন নিশ্চিত সাফল্য অর্জনের শর্ত সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। কিন্তু অ্যান্ড্রগ্নি তাত্ত্বিকরা একই সাথে একথাও বলেছেন যে পুরুষের গুণাবলী অর্জনের প্রয়াস চালানোর অর্থ এই নয় যে নারীরা তাদের সহজাত গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে উৎকর্ষতর করার জন্য চেষ্টা চালাবে না। বরং নারীগত দিকগুলির উৎকর্ষতা অর্জনের পাশাপাশি পুরুষগত দিকগুলি অর্জন করতে পারলে নারীর বিকাশের ভারসাম্যই কেবল রক্ষিত হবে না, উপরন্তু উভয় গুণাবলীর সমন্বয়ে নারীরা এক অর্থে পুরুষের গুণাবলীর তুলনায় উচ্চ স্থান নেবে। তাছাড়া নারীর স্বীয় গুণাবলীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন এজন্য যে পুরুষের একান্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলি নারীরা কখনই পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতে পারবে না। তাই, এই সমন্বিত দ্বৈত গুণাবলীতেই নারীরা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। এইরকম অর্জিত পরিস্থিতিতে পুরুষ-শাসিত সমাজের পক্ষে নারীকে উপেক্ষা করা কোনভাবে সম্ভব হবে না।

এই অ্যান্ড্রগ্নি তত্ত্ব গঠনের পূর্বে নারীবাদী গবেষণাতে নারীর মূল্যায়নে গণিত-ভিত্তিক নানা চর্চা চলেছিল। ষাটের দশক থেকে সমাজ এবং ইতিহাস, সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বসহ বিদ্যাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখার সমালোচনা করা শুরু করেছিল নারীবাদের নতুন প্রবাহ। পূর্বকালের লিঙ্গগত গবেষণাসমূহের তিনটি মৌলিক ত্রুটির উল্লেখ করেছিল এরা, (ক) ম্যাসকুলিনিটি-ফেমিনিটি তথা পুরুষত্ব-নারীত্বের ধারণাকে গঠন করা হয়েছে অ-মাত্রা-নির্দেশিত পদ্ধতিতে, (খ) পুরুষত্ব-নারীত্বকে বিচার করা হয়েছে দুই মেরুতে অবস্থানকারী হিসাবে, তদনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে ম্যাসকুলিনিটি-ফেমিনিটি স্কেল (এম. এফ.

স্কেল)। সত্তর দশক পর্যন্ত এই মানকের ভিত্তিতেই এম. এফ. জরিপের কাজ চলেছিল। সান্ড্রা বেস সর্বপ্রথম এম. এফ. বিচারের বিভিন্ন মাপকের ধারণার তত্ত্ব হাজির করেন যা লিঙ্গগত দুই মেরুত্বের দিকটি অপসারণের উদ্যোগ নেয়। একজন মানুষ একই সাথে কম-বেশি পুরুষত্ব ও নারীত্বের ভূমিকাগত উপাদান বহনকারী হতে পারে। নারীত্ব ও পুরুষত্বের উচ্চস্তরের গুণাবলীই অ্যান্ড্রগ্নি অবস্থার নির্ধারক। বলা হলো যে অ্যান্ড্রগ্নি উপাদানসম্পন্ন মানুষ মনস্তাত্ত্বিকভাবে সর্বাপেক্ষা ভারসাম্যসম্পন্ন এবং পরিস্থিতি উপযোগী ভূমিকা পালনে সক্ষম, স্বাস্থ্যবান, অধিক নমনীয় এবং কেবলমাত্র পুরুষত্ব বা নারীত্বের একক গুণাবলীর অধিকারী মানুষের চেয়ে অধিকতর স্ব-নির্ভর। সান্ড্রা বেস উদ্ভাবন করেন এমন এক সূচক যার দ্বারা পুরুষত্ব, নারীত্ব ও অ্যান্ড্রগ্নির স্তর নির্ধারণ করা যায়। একে বলা হলো 'বেন সেক্স রোল ইনভেন্টরি' (বি. এস. আর. আই.)। ১৯৭৪ সালে হেইলবার্ন, ১৯৭৫ সালে স্পেন্স, হেলম্রিচ ও স্ট্যাম্প, ১৯৭৮ সালে বার্জিনস্, ওয়েলিং ও ওয়েটার বি. এস. আর. আই.কে আরও উন্নত ও প্রসারিত করেন। কিন্তু অনতিকালের মধ্যে সাইকো-মেট্রিক্স (মনস্তত্ত্বীয় ক্রিয়াসমূহের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ) রীতির দ্বারা আর. এস. বি. আই.-এর সমালোচনা উত্থাপিত হওয়ায়, পদ্ধতিটির জৌলুস দ্রত নিষ্প্রভ হয়ে যায়। পরবর্তীকালের গবেষণা ও বিতর্ক এত ব্যাপক হয়ে পড়ে যে পুরুষত্ব বা নারীত্ব মাপার প্রয়াস, কার্যত, অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু অ্যান্ড্রগ্নির তত্ত্ব থেমে যায়নি। নারী-সমস্যার সমাধানে অ্যান্ড্রগ্নিকে উচ্চ মূল্য দেওয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বতন্ত্র নারীবাদ বা অন্তর্ভুক্তিবাদ অ্যান্ড্রগ্নির তত্ত্বের বাইরেও, বর্তমানে নারীবাদে 'ট্রান্সফর্মেশনালিস্ট' বা বিবর্তনীয়তা-পন্থী মতবাদের প্রবাহ আছে। এই মতবাদ, নারীদের সামাজিক বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করা, নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক শক্তি অর্জন প্রভৃতি তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র। পুরুষ-মূল প্রবাহে সংযুক্তি বা আত্মীকরণের বা তা' থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পরিবর্তে এই মতবাদ পুরুষ ও নারীর মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্ক ও কর্তৃত্বের কাঠামোর এমন পরিবর্তন চায় যাতে নারী প্রসঙ্গটি সমস্যা হিসাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এরা মনে করে যে প্রধানত সাংস্কৃতিক স্তরে বিবর্তনের সংঘটিত করার মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থা সম্পন্ন হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় 'ট্রান্সফর্মেশনালিস্ট ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট' সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারী পৃথকীকৃত সত্তার বিলোপ দাবী করে। 'পোস্ট-মডার্নিজম' তত্ত্ব অনেকটা যেন এই নারীবাদে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ধরনের নারীবাদী ধারাগুলি, বর্তমানে, অনেকটা আশ্রয় নিয়েছে ডেভেলপমেন্ট থিওরি বা উন্নয়নের তত্ত্বে।

নারীসহ মানব সমাজের শোষণ থেকে মুক্তির পরিবর্তে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে সংস্কারবাদ একদা চালু করেছিল 'প্রোগ্রেস' বা প্রগতির তত্ত্ব। ধনতন্ত্র মানতে চায়নি। এখন 'প্রোগ্রেস' বা অগ্রগতির ধারণা অপসারিত হয়েছে 'ডেভেলপমেন্ট' বা উন্নয়নের ধারণা ও লক্ষ্যের দ্বারা। আধুনিক ফেমিনিস্ট মুভমেন্টের কোন কোন ধারা, এমনকি সোস্যালিস্ট উইমেন মুভমেন্টের কোন কোন অংশও, বুর্জোয়াদের 'ডেভেলপমেন্ট'-এর তত্ত্বকে গ্রহণ করেছে। এই মতবাদকে অনেকে বলেছেন 'সোস্যালিস্ট মুভমেন্ট' থেকে 'সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট'-এ রূপান্তর।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'ডেভেলপমেন্ট'-এর অর্থ বাস্তবিকপক্ষে কি সত্য বহন করে? আমেরিকান ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে বিপ্লবের পূর্ববর্তী কলোনিয়াল আমেরিকান সমাজে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার বেশী ছিল, অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল। আমেরিকান বিপ্লব ও ১৮৬১-তে গৃহযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের আমেরিকান নারীদের সামাজিক অবস্থা পরবর্তীকালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের কাল-পর্বের চেয়ে ভাল ছিল। পরবর্তীকালে—আধুনিক সময় পর্যন্ত তাদের অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিবাদের উন্নত ও ব্যাপ্ত বিকাশের ফলে নারীদের উন্নয়নের এই হলো অবস্থা। সারা পৃথিবীতে তথাকথিত উন্নয়নের জয়যাত্রায় নারীদের পরিস্থিতি কি দাঁড়িয়েছে? পুরুষ ও নারীর মধ্যে এবং সমস্ত সামাজিক অংশর মানুষের মধ্যে অর্থ, ক্ষমতা ও ছুটি ভোগের সুযোগ নারীদের সবচাইতে কম। বিশ্বে যে ১৩০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, তার সত্তর ভাগ হলো নারী। বিগত বিশ বছরে নারীদের মধ্যে দারিদ্র্য বেড়েছে পঞ্চাশ শতাংশ। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার-এ নারীদের

জন্য তথাকথিত 'সাস্‌টেনেবল গ্রোথ' বা ধরে রাখার মত উন্নয়ন, 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট উইথ হিউম্যান ফেস' বা মানবিকতাসম্পন্ন কাঠামোগত সংস্কার, 'ইক্যুয়াল পার্টনারশিপ' বা সমান অংশীদারত্ব প্রভৃতি বাগাড়ম্বরের পরিণাম দাঁড়িয়েছে 'ফেমিনাইজেশন অব পভার্টি'। প্রকৃতই দারিদ্র্যের এখন নারীকরণ ঘটেছে। আর এর মধ্য দিয়ে ঘটছে নারীদের 'মার্জিনালাইজেশন' বা প্রান্তীয়করণ। তবে নারীদের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটি কেবল 'ইকনমিক মার্জিনালাইজেশন' মাত্র নয়। বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় মার্জিনালাইজেশনের প্রক্রিয়াতে যেহেতু রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বহু বিষয়ের মধ্যে মূল্যবোধ ও মানবিক সুকুমার বৃত্তিগুলিও অন্তর্গত, স্বভাবতই নারী সমাজের মার্জিনালাইজেশনের প্রক্রিয়াতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সমান্তরালে সামাজিক, মানবিক ও মানসিক অস্তিত্বও অন্তর্গত হয়েছে। মার্জিনালাইজ করা হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, যৌন সম্পর্ক, বিবাহ, পরিবার, সন্তান-সন্ততিদের প্রতিপালনের দায়িত্ব ও গার্হস্থ্যে মূল্যবান শ্রমকে। এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, নারীবাদের অধিকাংশ শাখা বর্তমানে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ভাবে ঝুঁকেছে পুঁজিবাদের 'ডেভেলপমেন্ট' তত্ত্বে।

বিশ্ব-নারী সমাজের সমস্যাকে নারীদের আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি তিনটি সাধারণ চরিত্রে বিচার করে নিজেরা স্বতন্ত্র ধারা গড়ে নিয়েছে। তার প্রথম দু'টিতে ফেমিনিস্ট ও সোস্যালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় রয়েছে, তৃতীয়টিতে রয়েছে আধুনিক উগ্র নারীবাদের দর্শন।

প্রথম অংশের বক্তব্য ও দাবীগুলি সাধারণভাবে সেইগুলি, যেগুলির মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে পরোক্ষ বিরোধিতা রয়েছে। নারীদের অধিকার হলো মানবাধিকার; নারীদের জন্য সমান সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার; যুদ্ধের ব্যয় সংকোচ করে সেই অংশ নারী-উন্নয়নে ব্যয়; বর্ণ-বিদ্বেষ ও সমস্ত ধরনের নারী-নির্যাতন বন্ধ এবং নারী-নির্যাতন বিরোধী কঠোর আইন চালু; নারীদের যৌনতা ও উৎপন্নতার ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়কে জবরদস্তি, বৈষম্য ও হিংসা থেকে রক্ষা; জন্মগ্রহণের পূর্বেই শিশু-নারীত্ব চিহ্নিতকরণ বন্ধ; গৃহস্থালি, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরিহীন নারী-শ্রমের পরিমাপ ও মূল্য নির্ধারণ; সমস্ত প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার; পুরুষ ও নারীর সম-মজুরি উচ্চশিক্ষা, বৃত্তি এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান, গণসংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদিতে নারীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা; সরকারের নীতি-নির্ধারণকারী সমস্ত স্তরে নারীদের স্থান, নারী-দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশ্ব জুড়ে রণনীতি (স্ট্র্যাটেজি) নির্ধারণ; বহুজাতিক সংস্থাগুলি যাতে জাতীয় আইন, বিশেষত শ্রম-আইন মেনে চলে তার জন্য ব্যবস্থা; নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ ও সর্বক্ষণ তার উপর নজরদারী করতে আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন, রাষ্ট্রসংঘের সনদ (চার্টার), ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস, কনভেনশন অন দা এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন দলিল ও সিদ্ধান্তগুলি অবিলম্বে রূপায়ণ বিদেশে কাজের জন্য নারীদের রপ্তানি করা বন্ধ, বিদেশে কর্মরত নারীদের ওপর অত্যাচার, বিশেষত যৌন অত্যাচার বন্ধ ইত্যাদি হলো প্রথম ধারার নারীবাদীদের দাবীর চরিত্র।

নারীবাদী দ্বিতীয় অংশের দাবী ও বক্তব্যগুলি হলো ঃ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, ড্রাগের চোরাচালান, গৃহযুদ্ধ, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক ও বর্ণগত দাঙ্গা ইত্যাদিতে সর্বাধিক আক্রান্ত নারী সমাজকে সমস্ত উপায়ে রক্ষা; ধর্মীয় ও সামাজিক নিপীড়ন বন্ধ; জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও খোরপোষের অধিকারের পূর্ণ আইনগত স্বীকৃতি; পুরুষদের নির্ধারিত রূপের মানদণ্ডভিত্তিক নারী-রূপসী নির্বাচনের প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা বন্ধ; যৌন কর্মীদের জন্য বিনামূল্যে কনডোম সরবরাহ; স্কুল স্তর থেকে শিক্ষা পাঠক্রমে বৈজ্ঞানিক যৌন শিক্ষা চালু; নারীদেহ পণ্য হিসাবে প্রদর্শন ও প্রচার বন্ধ; নারীদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি গড়ে ওঠে এমন প্রচারের ব্যবস্থা।

তৃতীয় ধারার বক্তব্য হলো সর্বাপেক্ষা উগ্র। তাদের বক্তব্য ও দাবীগুলি সাধারণভাবে সর্বৈবভাবে পুরুষ-বিরোধী, পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিবাহ ও প্রথাগত পরিবার বিরোধী। এরা নারীর অবাধ যৌনাচারের পক্ষে, নারী সমকামিতা ও সমকামিতাভিত্তিক পরিবারের পক্ষে এরা সমকামিতাকে আইনানুগ এবং সমকামীদের সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি ও সমস্ত অধিকার প্রদানের দাবী করে। পুরুষদের উর্ধ্বাঙ্গ

নগ্ন রেখে প্রকাশ্য বিচরণের মতো নারীদের অধিকার, নারী সমকামিতার বিষয়ে পত্র-পত্রিকা, ভি.ডি.ও, সিনেমা প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের আইনি সুযোগ, শিক্ষা ব্যবস্থায় সমকামিতা সম্পর্কে পাঠ্যসূচী, নারী-পুরুষের শৃঙ্গার ও রতিকলাগুলি প্রদর্শন করার স্বীকৃতির মতো নারী-সমকামিতার কলাকৌশল প্রদর্শন ও শিক্ষা দেবার অধিকার, নারী-সমকামীদের একঘরে করে রাখা এবং চাকুরী ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বৈষম্য ও অবিচার এবং তাদের উপর প্রশাসনিক, পুলিশী ও ক্ষেত্রবিশেষে গোঁড়াপন্থী মানুষদের আক্রমণ ও অত্যাচার বন্ধ ইত্যাদি হলো তাদের আন্দোলনের দাবী।

এই ধারার তীব্রতম ও বিশিষ্ট অংশকে বলা হচ্ছে 'র‍্যাডিকাল ফেমিনিজম', কোন কোন অংশকে 'লেসবিয়ান (নারী সমকামী) ফেমিনিজম'। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যে শেষোক্ত ধারা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে নিয়েছে র‍্যাডিকাল ফেমিনিজম । এরা অধিকাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিবর্তন বা পূর্ণ অপসারণ চায়, নিছক সংস্কার নয়। এরা চায় প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংস্কৃতিক সেক্সিজম বা যৌনতাবাদ। এরা পুরুষের অনুরূপ হতে চায় না; তারা অস্বীকার করে আরোপিত নারীত্বকে। তারা মনে করে যে নারী নির্যাতনের প্রধান নিদর্শন হলো বাধ্যতামূলক মাতৃত্ব। তাই যৌন দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি আবশ্যিক। স্বভাবতই নারীকে সর্বাগ্রে তার নিজ দেহের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে হবে। র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টরা দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য হিসাবে গড়ে তুলতে চায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী-সংস্কৃতি। তারা আশা করে যে ভবিষ্যতে এমন এক সমাজ তারা গঠন করবে যা র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্ট মূল্যবোধের পূর্ণাঙ্গতা, আস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা এবং এক ইন্দ্রিয়গত ভোগ-বাসনার সাহায্যে আনন্দে ও আতিশয্যে পরিপুষ্ট হবে। সেকারণে, তারা মনে করে যে, নারীদের জন্য এমন স্বতন্ত্র এলাকা থাকতে হবে যা পুরুষদের অনুপ্রবেশের দ্বারা কলুষিত হবে না। এইভাবে তারা আরও পরিণত হয়ে উঠবে, পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যেসব শক্তি অর্জন থেকে বঞ্চিত থেকেছে নারীরা সেগুলিও আয়ত্ত করতে পারবে। ষাটের দশকের শেষার্ধ থেকে র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টরা বিবাহ ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদের অবসান এবং নারীদের সমকামী হওয়া ও টেস্ট টিউব গর্ভধান করার অধিকারের দাবী তুলতে শুরু করেছে।

অবশ্য র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিজম কোন আকস্মিক ধারা নয়। পুঁজিবাদের উৎপাদন ব্যবস্থাতে জন্মগতভাবে সর্বকালে নৈরাজ্য যেমন অব্যাহত থাকে, এটির উপরিসৌধের সমস্ত প্রকোষ্ঠেও কাজ করে যায় সেই নৈরাজ্যের প্রভাব। এই শতাব্দীর বিশের দশকের মধ্যে অধিকাংশ উন্নত দেশে নারীদের জন্য ভোটাধিকার অর্জিত হতেই, সমকালে নারী আন্দোলনের শক্তিশালী ও সর্বপ্রধান ধারা—সাফ্রাজিস্ট মুভমেন্ট বা ভোটের দাবীতে নারী আন্দোলন বিবর্ণ হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। প্রধান দাবী অর্জিত হওয়ায় সাফ্রাজিরা খানিকটা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে ও নানা দল-উপদলে বিভক্ত হতে শুরু করে। এই সময়েই নারী আন্দোলনে উগ্র নৈরাজ্যবাদী ধারার উদ্ভব—যাকে বলা হয়েছিল 'ফ্ল্যাপার্স মুভমেন্ট'। এই নারীরা পুরুষদের মত ছোট করে চুল ছাঁটা, প্রকাশ্যে ধূমপান, নারীদের পক্ষে অভব্য ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান শুরু করেছিল। বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কাল থেকে ফ্ল্যাপারদের উত্তরাধিকারী এক ধারা হিসাবে লেসবিয়ান ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট শুরু হয়। এই সেক্সুয়াল রেভোলিউশন বা যৌন বিপ্লবের (!) তত্ত্ব দাবী করতে শুরু করে যে প্রত্যেক নারীর সীমাহীন যৌন অভিজ্ঞতা অর্জনের অধিকার রয়েছে, যা অলিখিতভাবে পুরুষ একা ভোগ করে এসেছে। তারা মনে করেছিল বিবাহ ব্যবস্থা হলো নারীদের স্বাধিকার হরণের অন্তিম ফাঁদ। 'হিউম্যান পোটেনশিয়্যাল এ্যাডভোকেটস' ফেমিনিস্ট অংশ বিবাহকে বৈষম্যমূলক বিধি ও অনমূলক আরোপিত ব্যবস্থা হিসাবে আক্রমণ শুরু করেছিল।

এইসব বক্তব্য ও দাবী উত্থাপনের পেছনে গড়ে ওঠা বাস্তবতা লক্ষণীয়। পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধ থেকে পুঁজিবাদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হওয়ায় সমাজের একাংশে অ্যাফ্লুয়েন্সি বা বৈভব বাড়ছিল। নতুন মিডিয়া হিসাবে টেলিভিশন সমাজের উপর প্রথম অভিঘাত হানতে শুরু করেছে তখন। টেলিভিশন ও সিনেমাতে নারী-স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা এবং বাস্তব শিল্পকর্মের নামে যৌন-কর্ম প্রদর্শিত হতে শুরু করেছিল। এই সমগ্র বাস্তবতার কারণে সমাজে দেখা দিতে শুরু করে যৌন স্বাধীনতার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা বিষয় ও দিক। প্রি-মেরিটাল ও এক্সট্রা-ম্যারিটাল সেক্স বা প্রাক-বিবাহ ও বিবাহিত

জীবনে অন্যের সাথে যৌন-সম্পর্কে ঘটনা রেনেসাঁ-কালপর্ব থেকে ইউরোপে প্রচলিত থাকলেও, এই সময়ে নন-ম্যারিটাল সেক্স অর্থাৎ বিবাহিত-অবিবাহিত নিরপেক্ষ অবাধ যৌন-সম্পর্ক বাড়তে থাকে ব্যাপক আকার ধারণ করে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনাও।

'যৌন ক্ষেত্রে এই নতুন অবস্থাকে 'নিউ হেডোনিজম' বা নতুন যৌন ভোগ-সর্বস্বতাবাদ হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। এই প্রগলভতার ধারাকেও অতিক্রম করে যা ঘটে যায় তাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে সেক্স রেভোলিউশন বলে—যার অন্যতম ফসল হলো 'লেসবিয়ান ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট'। এই তথাকথিত বিপ্লবের প্রথম ধাক্কাতেই প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি, সামাজিক ইত্যাদি রীতিরও ঘটে গেল কিছু পরিবর্তন। পর্ণগ্রাফি বা উন্মুক্ত যৌনাচারমূলক পত্রিকা প্রকাশ কোন কোন দেশে আইনিভাবে স্বীকৃত হলো; কোন কোন দেশে ধর্ষণ-বিষয়ক আইনের সংস্কার করা হলো কিছুটা তথাকথিত উদার করে; গর্ভপাত ও বেশ্যাবৃত্তির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিল কোন কোন দেশ; বিনা কারণেও বিবাহ-বিচ্ছেদ করার অধিকার কোথাও বা স্বীকৃত হলো; কোথাও বা স্কুলে যৌন শিক্ষাক্রম চালু করা হলো। আমেরিকার ১৬ বছরের বয়সের কম মেয়েদের মধ্যে কন্ট্রাসেপ্টিভ বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণমূলক সামগ্রী বিক্রয় / বণ্টন করার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট যে আইন চালু রেখেছিল, তা' কোন কোন প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক ১৯৭৭ সালে প্রত্যাহৃত হলো। আমেরিকার সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন নিউরোসিস বা স্নায়বিক রোগের তালিকা থেকে বাতিল করে দিলো হোমোসেক্সুয়ালিটি বা সমকামিতাকে।

সুতরাং র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট বা লেসবিয়ান ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট আর মামুলি প্রসঙ্গ থাকলো না, উন্নত পশ্চিমী দুনিয়ার নারীদের একাংশের মনস্তাত্ত্বিক জগতে আন্দোলন ও আলোড়ন হিসাবে আবির্ভূত হলো। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, নারীদের ওপর সুদীর্ঘকাল জবরদস্তি করে যেসব চরম অসঙ্গত ব্যবস্থা 'নর্মালসি' বা স্বাভাবিকতা বলে চাপিয়ে রাখা ও চালিয়ে আসা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহকে র‍্যাডিক্যালরা "স্বাভাবিক" (!) বলে দাবী করেছে।

এই প্রগলভ যৌন ভোগবাদিতাকে 'গেই মুভমেন্ট' বলা হয়েছে। (অবশ্য পরবর্তীকালে পুরুষ সমকামীদের আন্দোলনকেই কেবলমাত্র গেই মুভমেন্ট বলা হচ্ছে।) এর ভেতর দিয়ে সামাজিক প্রকাশ্যতায় উঠে এসেছে সমকামিতা—পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রেমের পরিবর্তে দুই নারীর মধ্যে প্রেমবাদকে লেসবিয়ানবাদ উত্থাপন করেছে। চরম নিপীড়নমূলক পুরুষতান্ত্রিকতার সামাজিকীকরণের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্করতম বিদ্রোহ হিসাবে লেসবিয়ানবাদকে বিবেচনা করা হচ্ছে, যে বিদ্রোহীরা পুরুষদের কাছে সামান্যতম নতি স্বীকারে অনিচ্ছুক এবং প্রেমের বিষয়ে কেবল নারীদের মধ্য থেকে নির্বাচন হলো যৌন বিপ্লবের অগ্রদূত। এই ধারাতে সৃষ্টি হয়েছে 'ব্রাদারহুডে'র তথাকথিত বিকল্প হিসাবে 'সিস্টারহুড'—সমস্ত নারী জাতির মধ্যে একান্ত মমত্বমূলক ভগ্নিত্ববোধ। এই সামগ্রিক মানসিক বিবর্তনের পরিণামে যা ঘটলো তা' হলো মানবিক স্বাভাবিক সুকৃতি ও স্বাভাবিক মূল্যবোধগুলির বিপর্যয় এবং নতুন ধরনের মূল্যবোধের (!) আবির্ভাব। পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংবেদনমূলক পারস্পরিক আদান-প্রদানের পরিবর্তে প্রস্তাবিত হলো আত্মপদী স্বাতন্ত্র্য; আপনজনের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতার স্বাধীনতা; দায়বদ্ধতা অপসারিত হলো যৌন-কেন্দ্রিক যত্রতত্র ও যা খুশি মনোভাবের দ্বারা; প্রগলভ বিনোদনমূলক যৌনাচারকে মহিমান্বিত করে প্রদর্শন করা শুরু হলো; প্রমাণ করার চেষ্টা শুরু হলো যে যৌনতার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, শরীরের আর পাঁচটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতই বা অন্য যে কোন সাধারণ আনন্দ ভোগের মতই এই এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রাণীজগতের প্রাকৃতিকতা এবং সভ্যতা-পূর্ব মানবজাতির বন্যতার স্তরকে, এইভাবে আহ্বান করা হলো বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে।

বিশ্বায়নের সমগ্র প্রক্রিয়ার সাথে নারীবাদী তৎপরতা এখন গভীরভাবে একাত্ম হয়ে পড়ছে। প্রথমত, পূর্বে বর্ণিত নারীবাদের প্রায় প্রত্যেকটি ধারাই এখন তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে অল্প-বিস্তর প্রসারিত হয়ে, কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের অতীত উপসর্গের চরিত্র হারিয়ে, সারা বিশ্বময় হয়ে উঠছে। দ্বিতীয়ত, নারীবাদকে অতীতে অভিজাত সমাজের নারীদের 'ফ্যান্টাসি' বা কল্প-বিলাস বলে যেভাবে বলা হতো, এখন দেখা যাচ্ছে এই ধারা নিম্ন, বিশেষত, মধ্যবর্গের নারীদের আকৃষ্ট করছে। বিশ্বায়নের তত্ত্বের

উদারীকরণ, মুক্ত বাজার অর্থনীতি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উন্নয়ন, গণতন্ত্র, স্বাধিকার ইত্যাদি উপাদানকে নারীদের কোন না কোন শাখা তাদের দর্শন ও কার্যকলাপের অংশ করে নিয়েছে। বাস্তব উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটির ব্যবস্থা নারীবাদী যৌনতাকে ফ্লেক্সিবল ও পুনরুৎপাদক হওয়ারও সুযোগ করে দিয়েছে।

সমকামীদের দাবী, সংগঠন ও আন্দোলন

সমকামিতার মতবাদকে আদর্শায়িত করা হচ্ছে 'নার্সিসিজম' (গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর এক নায়ক নার্সিসাস, যে ঝর্ণার প্রবাহিত জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আজীবন নিজের প্রেমে মুগ্ধ ছিল) বলে। পুরুষ সমকামিবাদীরা তাদের ভূমিকার গৌরবজনক পূর্বসূরি হিসাবে অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সাথে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক অস্কার ওয়াইল্ড থেকে শুরু করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখের নাম উল্লেখ ও ব্যবহার করে থাকে। এরা প্রকাশ করেছে 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব হোমো-সেক্সুয়ালিটি', 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব গেই মুভমেন্ট অ্যাণ্ড লিবারেশন' প্রভৃতি। নারী সমকামিতার শক্তিগুলির পক্ষ থেকে অনুরূপ কোন চরিত্রকে আদর্শায়িত করা না হলেও, সারা বিশ্বে এদের সংগঠনের সংখ্যা এবং প্রকাশ্য আন্দোলন পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক।

'লেসবিয়ান মুভমেন্ট' বা নারী সমকামীদের আন্দোলনের দর্শনে যৌন বিপ্লবের তত্ত্বের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু 'গেই মুভমেন্ট' বা পুরুষ সমকামীদের আন্দোলনের তেমন কোন স্পষ্ট মতবাদ পাওয়া যায় না। পুরুষ ও নারী সমকামীদের সংগঠন ও আন্দোলন স্বতন্ত্র ধারা হলেও একই চরিত্রবিশিষ্ট। একই ধরনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিকূলতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে উভয় ধারা মাঝে মাঝে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়, কখনও বা যৌথভাবে দাবী উত্থাপন ও আন্দোলনও করে।

গত শতাব্দীর শেষার্ধে অভিযুক্ত সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড বিচার মঞ্চে বলেছিলেন যে, একই লিঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ দৈহিকের চাইতে অনেক বেশি বৌদ্ধিক। অস্কার ওয়াইল্ড ব্যক্তি জীবনে 'হোমো-সেক্স' বা সমকামিতা সম্পর্কে বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা করলেও ছাপা হরফে গত শতাব্দীতে ঐ শব্দ তখনও ব্যবহৃত হয়নি। আর গেই মুভমেন্ট শব্দটি প্রকাশ্যে এসেছে তার অনেক পরে। বোধিগত স্তরে সমকামিতার বিষয়ে দর্শন, এক অর্থে, অস্কার ওয়াইল্ড-এর দ্বারাই অতি ক্ষীণভাবে প্রথমে প্রস্তাবিত হয়েছিল। তাঁর 'দা পিক্‌চার অব ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাস একই লিঙ্গের চরিত্রগুলিকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে পরস্পরের মধ্যে অভিনব আকর্ষণের চরিত্রকে অনুভব করা যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী এবং শোষিতদের সমর্থকের তীব্র স্পৃহা থেকে অস্কার ওয়াইল্ডের মধ্যে 'গেই-কনসাসনেস' বা সমকামী-চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল বলে বলা হয়। একই মনোভাব আরও সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় সমকালের ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের 'লাভস কামিং অব এজ' এবং 'দা ইন্টারমিডিয়েট সেক্স' উপন্যাস দু'টিতে। কার্পেন্টারই, সেইকালে, লেসবিয়ান ও গেই রাইটস বা নারী ও পুরুষ সমকামীদের অধিকারের আধুনিক দাবী ও বক্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে ছিলেন।

ধর্মীয় ও সামাজিক বক্তব্য ও ব্যবস্থাপনার বিপরীতে, গত শতাব্দীতে সমকামিতার বিষয়ে ফ্রয়েডের আলোচনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেতে শুরু করেছিল। পরিস্থিতির চাপে কোন কোন দেশের রাষ্ট্রীয় আইনে এ'বিষয়ে সামান্য কিছু সংস্কার ঘটলেও, সমকামিতা অনৈতিক ও বেআইনি হিসাবেই ঘোষিত থেকেছে। কিন্তু তিন দশক আগে থেকে সামাজিক ধারণার এই মডেল তিনটি ধারায় ভাঙ্গতে শুরু করেছে। প্রথমত, কোন কোন দেশের ক্রাইম বা দুষ্কর্মের তালিকা থেকে সমকামিতা বাদ পড়তে থাকে। দ্বিতীয়ত, সমকামিতাকে লজ্জাকর হিসাবে চিহ্নিত করা বন্ধ এবং পরিবর্তে একে আনন্দ, আরও বিশেষত একাংশ সংখ্যালঘু মানুষের আত্ম-সচেতন সাংস্কৃতিক পরিচিতির মাধ্যম বলে উল্লেখ করা হতে থাকে। তৃতীয়ত, সর্বাধুনিককালে, সমকামিতাকে একটি নতুন 'ওরিয়েন্টেশন' বা উদয় তথা নির্মাণ হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকাতে সমকামীদের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটছিল। কিন্তু তাদের প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্যোগ, পুলিশী আক্রমণের

মুখে, কিছুকালের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যায়। এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে, দেশে দেশে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনি ব্যবস্থার যথাসম্ভব অনুকূলে সংস্কার এবং সর্বজনীন সমাজে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি ও স্বীকৃতিকে নিশ্চিত করার জন্য আবেদন-নিবেদনের পথে প্রচেষ্টা শুরু করেছিল সমকামী রাজনীতি। কিন্তু তাতে কোন সাফল্য আসেনি। ষাটের দশকে সারা বিশ্বে, এমনকি উন্নত দুনিয়তে, বিপ্লবী শ্রমিক ও গণ-আন্দোলন তীব্র ব্যাপক হয়ে উঠে। এই পরিস্থিতি ও প্রভাবে সমকামী ধারাতে দাবী অর্জনের মাধ্যম হিসাবে আন্দোলনের পদ্ধতি গৃহীত হয়। পূর্বের সামাজিক আন্দোলনের স্তর থেকে সমকামী ধারা রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্রাভিমুখী হতে থাকে। পুরুষ ও নারী সমকামী সমাজ ঘোষণা করতে থাকে যে তারাও প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শোষণের অন্যতম শিকার। ১৯৬৯ সালে স্টোন ওয়াল-এ ৪০০০ পুরুষ ও নারী সমকামীদের মিছিল ও জমায়েতের সাথে পুলিশের তুমুল সংঘর্ষ হয়। পুলিশী নির্যাতন ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে দাবী নিয়ে সংঘটিত এই আন্দোলন 'স্টোন ওয়াল রায়ট' বলে পরিচিত হয়েছে। বিশ্বের সমকামী ধারার এই ঘটনা এক তাৎপর্যপূর্ণ বাঁকের মুহূর্তে পরিণত হয়। আমেরিকা ও ইউরোপে গড়ে ওঠে 'গেই লিবারেশন ফ্রন্ট' (জি. এল. এফ.), প্রকাশিত হয় 'ম্যানিফেস্টো ফর গেই লিবারেশন'। এই ম্যানিফেস্টোতে বলা হয় সমাজে প্রচলিত শ্রেণী-ব্যবস্থা কিভাবে সমকামীদের আবাস, শিক্ষা, নিয়োগ ইত্যাদিতে বৈষম্য ও বঞ্চনা করছে। বিপ্লবী ও শ্রমিক আন্দোলনের সাথে একাত্ম হতে শুরু করে এই আন্দোলন। ইউরোপ, আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকার কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক দলের বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে সমকামীদের প্রসঙ্গ যুক্ত হতে থাকে, বিশেষত ব্রিটেনের লেবার পার্টিতে।

তবে এই আন্দোলনের সামনে অস্পষ্ট ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের যথার্থ লক্ষ্য ও রূপ। এই কারণে, এদের মতবাদে প্রধান ভর দাঁড়ায় ব্যক্তিগত জীবন-চর্চার রাজনীতির উপর। যুক্তি দেওয়া হতে থাকে যে গণ-আন্দোলনের সাথে যৌথ তৎপরতার চাইতে জীবন-চর্চার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শেষোক্ত পদ্ধতির দ্বারা সাফল্য স্বয়ং নির্যাতনের অবসান ঘটাবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন থেকে সমকামী-ধারার বিচ্ছিন্ন হওয়ার আর এক প্রবণতাও এই সময় গড়ে ওঠে। এরা দাবী করতে থাকে যে যৌন ব্যবস্থার ত্রুটি অনুধাবন এবং তা' থেকে উত্তরণ কেবল সমকামীদের দ্বারাই সম্ভব। এইসব বিভ্রান্তির পরিণামে অল্পকালের মধ্যেই পুরুষ, স্ত্রী, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে এই আন্দোলন নানা ভাগে বিভক্ত হতে শুরু করে।

আশির দশকে, ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচারের প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে সাধারণ শ্রমজীবীদের পাশাপাশি সমকামী সংগঠন ও আন্দোলন ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়। নতুন রাষ্ট্রীয় আইনের ক্লজ ২৮-এর নির্দেশে আদর্শ পরিবার (এক স্বামী-স্ত্রীর জোড়বাঁধা পরিবার) ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক সহায়তা দান করার নামে সমকামীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রশাসনিক ও পুলিসী তৎপরতা শুরু করা হয়। এর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয় ৪০,০০০ সমকামীদের বিশাল সমাবেশ। আক্রান্ত হয়ে সমকামী ধারা শেষোক্তদের দিকে অবস্থান গ্রহণ শুরু করে। ১৯৮৫ সাল দীর্ঘ ১০ মাস ব্যাপী ব্রিটিশ খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে পুরুষ ও নারী সমকামীদের সংগঠনগুলি সমস্ত শহরে নিয়মিতভাবে কেবল মিছিল-সমাবেশ করাই নয়, ব্যাপক অর্থ সংগ্রহ করে ধর্মঘটীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা করে। সমকামী আন্দোলন এইভাবে, অংশীদার হওয়া শুরু করে শ্রেণী-আন্দোলনের।

আশির দশকের শেষার্ধ থেকে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের বড় বড় শহরগুলিতে প্রায় প্রতি বছর সমকামীদের বিশাল বিশাল, এমনকি ৬০,০০০ মানুষের সমাবেশ ও মিছিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। ১৯৯৫ সালে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব-নারী সম্মেলনে সমবেত ৩০টি দেশের ১,৫০০ নারী সমকামীদের মিছিলে ফরাসী বিপ্লবের অনুকরণে শ্লোগান উঠেছিল 'লিবার্টি, ইগলাইটি অ্যাণ্ড সেক্সুয়ালিটি'। 'দা ইন্টারন্যাশনাল গেই অ্যাণ্ড লেসবিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনে'র নেতৃত্বে তাদের মিছিলের ফেস্টুনে অপর দুই প্রধান শ্লোগান ছিল 'লেসবিয়ান রাইটস আর হিউম্যান রাইটস্' এবং 'লেসবিয়ানস

অব অল কান্ট্রিজ ইউনাইট'। 'লেসবিয়ান-ডে' পালন করা ছাড়াও, প্রতিদিন লেসবিয়ান মতবাদ ও জীবনধারা নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠান করেছে তারা।

উন্নত দুনিয়ার বাইরে সমকামীদের সংগঠন প্রাপ্ত কিছু তথ্য থেকে ধারাটির বিশ্বজনীন অবস্থান বোঝা যায়। নব্বই-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে তুরস্ক, ব্রাজিল, চেক রিপাব্লিক, নিউজিল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিকারাগুয়া, জিম্বাবোয়ে, মালয়েশিয়া, শ্লোভেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যাণ্ড, বলিভিয়া, কেনিয়া, মালদোভা, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস প্রভৃতি দেশে প্রাকশ্যে গেই ও লেসবিয়ান সংগঠন কাজ করছে। প্রত্যেকেটি দেশে তারা দৈনিক পত্রিকাসহ নানা ধরনের সাময়িকী প্রকাশ করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পতনের পর রাশিয়ার সাইবেরিয়ার টোমস্ক শহরে এবং পূর্ব ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশে অনুরূপ বহু সংগঠন গড়ে উঠেছে। ইসলাম অধ্যুষিত ইরানে ৭০ জন সমকামীকে হত্যা করার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে (সুইডিশ রিপোর্ট, ১৯৯১)। নিষেধ সত্ত্বেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি সমকামী সংগঠনের অস্তিত্ব ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের তথ্য। ভারতে রয়েছে সমকামীদের প্রায় ৩২টি সংগঠন এবং ২৮টির মতো পত্রিকা। এমনকি সমাজতান্ত্রিক চীনে ৪টি সমকামীদের সংগঠনের নজির সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের সমাজে সমকামিতা এখনও প্রকাশ্য রূপ পায়নি ঠিকই, কিন্তু অনুসন্ধান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ঐসব দেশেও এই ধারার ব্যাপকতা সৃষ্টি হচ্ছে। 'ইন্টারন্যাশনাল লেসবিয়ান অ্যাণ্ড গেই অরগানাইজেশন' ১৯৭৮ সালে ১৭টি দেশের সংগঠন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের শেষে এটির সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০০-র বেশী, যারা ৭০টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। স্বভাবতই সমকামী ধারা এখন আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে।

তবে, দেশে দেশে পুরুষ ও নারী সমকামীদের সংগঠন, দাবী-দাওয়া, প্রচার ও আন্দোলনের চরিত্র ও স্তরের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। প্রচলিত আইনের সংশোধন করে সমকামীদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ও সমাজের একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতিদানের দাবীতে পাশ্চাত্যের উন্নত দুনিয়ার দেশগুলিতে আন্দোলন চলছে। অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চেক রিপাব্লিক ও নিউজিল্যাণ্ডের সমকামীরা নিজেদের মধ্যে বিবাহের এবং উত্তরাধিকারের জন্য আইন রচনার দাবী তুলেছে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সমকামীরা, সাধারণভাবে, নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও নিজের অবস্থার বিষয়ে প্রচারের কাজে ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন সরকার সমকামী যুগলকে সরকারী রেজিস্ট্রেশনের অধিকার দিয়েছে এবং বিবাহ-জনিত সুযোগ ও ব্যবস্থা তাদের জন্য কিছুটা সম্প্রসারিত করেছে। হল্যাণ্ডও এই পথে অগ্রসর হচ্ছে। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের বিভিন্ন শহরের কাউন্সিল ও স্ব-শাসিত সংস্থাগুলি সমকামী যুগলদের স্বীকৃতিদান শুরু করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই রাজ্য, একটি মামালার প্রাথমিক রায়ের ফলে, সমকামী বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

পুঁজিবাদী নতুন বিশ্বে ম্যাক্‌ডোনাল্ড যা ঘটিয়েছে খাদ্য-ব্যবস্থায় এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে ডিজনি, যৌন-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা' ঘটিয়ে চলেছে সমকামী ধারার উত্থান। যৌনতার এই বিশ্বায়নকে তাই অনেকে বলেছেন 'ম্যাক্‌-গাই'। পরিস্থিতিকে মূল্যায়ন করে সমাজতাত্ত্বিকদের অভিমত হলো যে সমকামিতার বর্তমান মতবাদ ও তৎপরতা এক ধরনের 'সোস্যাল কনস্ট্রাকশন' বা সামাজিক নির্মাণ, কিন্তু সমকামিতা স্বয়ং তা' নয়। প্রায় এক দশক ধরে 'জেনেটিক সায়েন্স' বা জিন-বিজ্ঞান সমকামিতার কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছে। জিন-বিজ্ঞানীদের একাংশ বলতে চান যে, মানুষের মধ্যে ক্রোধ, অনুদ্যোগ, মিথ্যা-ভাষণ, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ইত্যাদির মতো, নির্দিষ্ট জিনের জন্য মানুষের মধ্যে সমকামিতার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটা এখনো প্রমাণিত হয়নি। বরং বিজ্ঞানের এখনও পর্যন্ত অভিমত হলো যে অন্যসব কিছুর মতো এটিও মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা, কিন্তু সর্বজনীন নয়। গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সম-লিঙ্গ বা সম-যোনির আকর্ষণ কখনো কখনো ঘটে। কিন্তু আবেগ ও সংবেদনশীলতার ক্ষণিক মুহূর্তকে, কৃত্রিমভাবে, স্থায়ী নির্মাণ করার বর্তমান চেষ্টা হলো ব্যতিক্রম। বর্তমান সামাজিক বাস্তবতা ও পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের চাহিদার জন্য এটির ব্যপকতা

সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রবণতা যত বাড়ছে, সমাজে গোপনীয়তা ও লজ্জার ধারণা ততই ভেঙ্গে পড়ছে।

প্রকাশ্যে বিরোধিতার ছদ্মাবরণ এখনও রাখলেও, সমকামিতার বিষয়ে উন্নত দেশগুলির সরকারগুলির উদার মনোভাব বিশ্ব-পুঁজিবাদের মনোভাবেই প্রতিফলন। গত কয়েক বছর ধরে বিশেষীকৃত ও এক গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসাবে সমকামী মানুষদের বিবেচনা করতে শুরু করেছে পুঁজিবাদ; গঠন করা শুরু করেছে গেই-ফ্রেন্ডলি বা সমকামীদের বন্ধুত্বমূলক এক ধরনের 'পিঙ্ক ইকনমি'—সমকামীদের বিশেষ ধরনের জীবনচর্চার উপযোগী পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করার জন্য। বড় বড় কোম্পানিগুলি সমকামীদের জন্য 'প্রাইড ফেস্টিভাল'-এ অর্থ যোগাচ্ছে। বেশ কিছু সমকামী বিষয়ক ব্যবসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটেনের বিভিন্ন সমকামী গোষ্ঠী যেমন 'আউটরেজ অ্যাডভোকেট', 'ক্যুয়ার স্পেডিং পাওয়ার' থেকে শুরু করে 'প্রেসার বিজিনেস' প্রভৃতি এই ধরনের ব্যবসা করতে চাপ দিচ্ছে মালিকদের। লেসবিয়ান ও গেই ব্যক্তিরা জীবনচর্চার নামে পূর্বে উল্লেখিত যে তত্ত্ব খাড়া করেছে, তাকে ব্যবহার করে রাজনীতি থেকে এদের মুখ ঘুরিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে পুঁজিবাদ। এই পথকে প্রশস্ত করার জন্য সমকামীদের মালিকানায় ছোটখাটো কারখানা বা ব্যবসা স্থাপন এবং তাতে সমকামীদেরই শ্রমিক হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা কয়েকটি দেশে হয়েছে।

সমকামী ও তাদের ধারার বিষয় পশ্চিমী কিছু কিছু কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব কি তা' কিছুটা বোঝা যায় 'সোস্যালিজম টু-ডে' (জুলাই-আগস্ট, ১৯৯৬) পত্রিকার আলোচনা থেকে। "পুঁজিবাদ যে পিঙ্ক অর্থনীতি শুরু করেছে তা' পুরুষ সমকামীদের জন্য, নারী সমকামীদের জন্য নয়। তদুপরি অধিকাংশ সমকামী বিচার করে দেখে না যে তারাও শ্রমিকশ্রেণী এবং গণ-বেকারী ও কম মজুরির দ্বারা নিপীড়িত। সমকামীদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের দিকটি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কখনো বিবেচ্য নয়, কেবলমাত্র শোষণের জন্য তাদের মধ্যে বাজার খোঁজা ছাড়া। ...বর্তমানে বহু সমকামী-ব্যবহার্য পণ্যের ব্যবসার মালিক সমকামীরাই এবং একে তারা মনে করছে সমতায় পৌঁছুনোর এক ধাপ। ...কিন্তু এই সুযোগ-প্রাপ্তির দ্বারা তাদের উপর অপমান ও অত্যাচার কমেনি। ...দ্বিতীয়ত শ্রেণী-স্বার্থই সমকামী ব্যবসাদার ও সেগুলির সমকামী শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এখানেও কম মজুরিতে সমকামী শ্রমিককে বেশীক্ষণ কাজ করতে হয়। ...তাদের (সমকামী মালিকদের) ব্যবসাও লাভের জন্য পরিচালিত হয়।..." তারপর 'সোস্যালিজম টু-ডে' পুঁজিবাদের দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব উদাহরণ তুলেছে। "ব্যবসায়ীদের যে অংশ দেখছে যে সমকামী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবসা করতে পারলে নতুন ক্ষেত্রে লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সমকামীদের বিষয়ে সমাজে অধিক সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারলে কার্যকরীভাবে এই মুনাফা করা যাবে, সেকারণে তারা রাষ্ট্র ও সমাজের উপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি করছে। সর্বোপরি এইসব তৎপরতার পেছনে পুঁজিবাদের গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে, যেকারণে বহু আলোচিত 'ভারচ্যুয়ালি নরমাল' পুস্তকের প্রণেতা অ্যান্ড্রু স্যুলিভ্যান বলেছেন যে আমাদের সমাজে ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-মেরুকরণের প্রক্রিয়ায় সমকামীদের স্বতন্ত্র করে রাখার প্রশ্ন আসে না; নি-খরচায় যুগল থাকার সমকামীদের অধিকার বা সমকামী বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি আইনি স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে পারলে, তারা ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক মিত্র হয়ে উঠবে।..."

লক্ষণীয় ঘটনা হলো ইউরোপের সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি বেশ কিছুকাল আগে থেকে এবং ১৯৯৭ সালে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি সমকামীদের দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। লেবার পার্টি ক্লজ-২৮ (পূর্বে উল্লেখিত) তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রথমদিকে এই দলগুলি সমকামীদের প্রসঙ্গ শোষণ-নির্যাতনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলেও এখন ভোটের রাজনীতিতে এদের সংখ্যার গুরুত্ব ও বিশ্বায়নের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছে। এই সত্য পূর্বোক্ত বক্তব্যে প্রমাণিত হচ্ছে।

বামপন্থীদের দৃষ্টিতে 'সোস্যালিজম টু-ডে' পত্রিকাটির মন্তব্য হলো, "সমকামীদের দাবী-দাওয়া ও আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে শ্রেণী-প্রসঙ্গ গভীরভাবে প্রবেশ করতে বাধ্য। কৃষ্ণকায় মানুষ ও নারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মতই এটা ঘটবে। ...শেষোক্তদের সমস্যার মতো সমকামী সংখ্যাগরিষ্ঠ

অংশের সমস্যাও গ্রথিত রয়েছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকের জন্য চমৎকার মানের জীবনযাত্রা প্রসারিত করতে ব্যর্থতার মধ্যে।" তারপর 'সোস্যালিজম টু-ডে' মন্তব্য করেছে, "ধনতন্ত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে বিভাজন ও অসাম্যের উপর। আর আধুনিক পুঁজিবাদের মতবাদ হলো সেই প্রধান হাতিয়ার যা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা হচ্ছে। সমাজের উপরমহল কুসংস্কারকে সব সময় কারচুপিমূলকভাবে ব্যবহার করে অসাম্যকে সমর্থন ও বিভাজনকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য। সমাজতান্ত্রিক পথে সমাজের আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যথার্থ সাম্যের বাস্তবতা সৃষ্টি করে কুসংস্কার ও বৈষম্যকে সম্পূর্ণ অপসারণ করা যাবে এবং সমকামীদের মুক্তি বাস্তবায়িত হবে।"

সমকামীদের প্রসঙ্গ, এইভাবে, নতুন মোড় নিতে শুরু করেছে এবং শ্রেণী-আন্দোলনের অন্যতম প্রসঙ্গ হিসাবে প্রাথমিকভাবে বিবেচিতও হচ্ছে।

গণিকাবৃত্তি ও নতুন বাস্তবতা এবং তাদের সংগঠন-আন্দোলন

ইতিহাসে মানব-সভ্যতা ও বারাঙ্গনাবৃত্তি সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বলা যায় এখনও পর্যন্ত সভ্যতার অবিভাজ্য অঙ্গ এই বৃত্তি। গণিকাদের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকায় ব্যাপক স্ব-বিরোধিতা ও দ্বন্দ্ব সমাজ ও ধর্মে প্রথমাবধি প্রবাহিত থেকেছে। কোন কোন সভ্যতার কালে দেহ-উপজীবিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অতি উচ্চ স্থান দিলেও কার্যকালে তাদের সম্পূর্ণ অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছিল সমাজ-মানস ও ব্যবহারে। অনৈতিকতা ও পাপের মূর্ত রূপ বলে অভিযুক্ত বেশ্যাবৃত্তি অপাংক্তেয় থাকলেও, প্রথাটির অব্যাহত উপস্থিতি স্বয়ং সমাজের গোপন ও চাপা যৌন অনৈতিকতাকে সামাল দিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে। অর্থাৎ বারবণিতা বৃত্তিকে সমাজ-প্রধানরা অচ্ছুৎ করে রাখা বা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালালেও, সমাজ এই বৃত্তিকে ত্যাগ করেনি। আরও লক্ষণীয় দিক হলো, প্রাপ্ত ইতিহাসের বহু প্রধান প্রধান ঘটনাবলীতে এই বৃত্তির নারীদের ইতিবাচক উপস্থিতি পাওয়া যায়। বৃত্তি হিসাবে এটির সবল অস্তিত্ব সমাজে সব সময় যেমন থেকেছে, অন্যদিকে ধর্ম ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমরাঙ্গন, কূটনীতি, গুপ্তচর বৃত্তি ইত্যাদিতে গণিকারা কোন কোন সময় ঐতিহাসিক ভূমিকাও পালন করেছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমাজ বাধ্য হয়েছে তাদের ভূমিকার অন্তত তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি দিতে।

গণিকা-প্রথার এক অতুলনীয় ও সর্বকালের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৃত্তি প্রায় নিরঙ্কুশভাবে নারীদের জন্য সংরক্ষিত থেকেছে। বিশ্ব-মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পতনের পর, সমগ্র নারী-জাতির উপর আরোপিত নিপীড়ন ও অবমাননার অন্যতম প্রতিফলন, মাত্রা ও দিক হলো একাংশ নারীকে গণিকাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা। পরিণামে এই ব্যবস্থা হলো পুরুষ-প্রধান সমাজের অন্যতম প্রতীক। প্রকাশ্যে যে ধরনের বিরোধিতাই করা হোক না কেন, গণিকাবৃত্তিকে সর্বকালে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে টিকিয়ে রাখা শুধু নয়, বাড়বাড়ন্ত করিয়েছে প্রত্যেকটি শোষণ-ভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজ স্বয়ং। পুরুষের কাম-উগ্রতাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য কেবল নয়, পরিবারের অভ্যন্তরে যে কোন যৌন দুর্ঘটনায় পতিত নারী সমাজ-বহির্ভূত বিকল্প সংস্থান ও গৃহস্থালি শ্রমে বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ নারীদের একাংশকে নিম্নস্তরের প্রকাশ্য শ্রমের নিযুক্তির ব্যবস্থা হিসাবে এই প্রথার প্রচলন থেকেছে। নারীর গৃহস্থালি শ্রমকে স্বীকৃতি না দেওয়ার যে নীতি অতীত থেকে বহাল ছিল, তার সাথে সঙ্গতি রেখে, এই দেহশ্রম বিক্রয়কে সামাজিক উৎপাদনমূলক শ্রমের স্বীকৃতি কখনো দেওয়া হয়নি।

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে এঁদের প্রতি ঘৃণা ও ব্যবহারিক জীবনে এঁদের অপাংক্তেয়তা পরিকল্পিত-ভাবে এবং প্রধানত তৈরি করা হয়েছিল গৃহস্থালি নারীদের মধ্যে। অন্যদিকে এঁদের সামাজিক, দৈহিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও নিষ্পেষণ করা এবং অমর্যাদা করার দায়িত্ব বহন করতো পুরুষেরা। এইভাবে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি কালের উৎপাদন ও সমাজ-ব্যবস্থায় শোষণের অন্যতম ভুক্তভোগী হিসাবে এঁরা ছিলেন শোষিত জনগণের অন্যতম অংশ।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পৌঁছে শোষণের তীব্রতা যেমন প্রভূত বৃদ্ধি পায় তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে

এই অংশের নারীদের উপরও। পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শ্রমের রূপান্তর ও বিভাজনের প্রভাব পড়েছে গণিকাবৃত্তির চরিত্রে ও রূপে। পরিণামে লক্ষ্য করা যায় যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের বিভিন্ন অংশের আন্দোলনে প্রায় প্রথম থেকে গণিকাসমাজের ইতঃবিক্ষিপ্ত এমনকি কখনও বা সবল উপস্থিতি ঘটেছে। গণিকাদের জন্য যেমন স্বতন্ত্র বসবাসের ব্যবস্থা প্রথমাবধি কারখানার শ্রমিকদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তীব্র শোষণে ও পরিবেশে শ্রমিক-বস্তি এলাকায় ও শ্রমিকদের পরিবারের মধ্যে গণিকাবৃত্তি প্রসারিত হওয়ার উপাদানটিকে গ্রাহ্যের মধ্যে নিয়ে এলে, শ্রমিক আন্দোলনে এঁদের ভূমিকা গ্রহণের অন্যতম স্বাভাবিক কারণ অনুধাবন করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর বিবাহ, পরিবার, বাসস্থান ও সমাজের পরিবর্তন ও বাস্তবতা থেকে বারাঙ্গনাবৃত্তির প্রসার ও চরিত্রের পরিবর্তনগুলি অনুধাবন করা যায়। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনে রূপোপজীবিনীদের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। অষ্টাদশ শতকে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শ্রমিকদের প্রথমদিকের সংগ্রামগুলিতে—হাঙ্গার রায়ট, মেশিন ব্রেকিং প্রভৃতি—দেহোপজীবিনীরা প্রায়শই প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতেন। ১৭৮৯ সাল থেকে ফরাসী বিপ্লবের সমগ্র কাল-পর্ব জুড়ে, ১৮৪৯-৫০-এর 'কনটিনেন্টাল রেভোলিউশনে', বিশেষত প্যারিস ও লিয়ঁ শহরে ব্যারিকেড লড়াইতে, ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনে, ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবে, '৩০ ও '৪০-এর দশকের চীনের বিপ্লবে এঁদের অসামান্য বিপ্লবী ভূমিকা ছিল। ভারতের ক্ষেত্রেও জনৈকা গণিকার সন্তানকে হিন্দু স্কুলে ভর্তি করতে অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে কলকাতায় ১৮৪৮ সালে ১২০০ বারাঙ্গনার মিছিলের ঘটনা দেশের শ্রমজীবীদের, সম্ভবত, প্রথম প্রকাশ্য মিছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী মহাবিদ্রোহে কানপুরসহ বেশ কয়েকটি শহরে ছাউনির সেনানীদের বিদ্রোহে যোগ দিতে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করেছিলেন বারবণিতারাই। বিদ্রোহের শেষ-পর্বে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ দিল্লী শহর রক্ষায় হাতাহাতি লড়াইতে অকাতরে প্রাণ দিয়েছিলেন কয়েকশত বারাঙ্গনা। সাম্রাজ্যবাদ-পদানত দেশগুলির স্বাধীনতা বিপ্লবে এঁদের অনুরূপ ভূমিকার অজস্র ও উল্লেখযোগ্য নজির রয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী, সন্ত্রাসবাদী ধারার সংগঠক, কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট প্রমুখ অংশের মানুষদের পুলিশী অনুসরণ বা হামলা থেকে নিরাপদ আশ্রয় দান, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাসহ আত্মগোপন করে থাকার সময় রক্ষণাবেক্ষণ, বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজ প্রভৃতি অজস্র ধরনের ভূমিকা নিয়েছেন এই নারীরা। এই মনোভাব ও ভূমিকা কোন খণ্ড উদাহরণ নয়, অব্যাহত প্রবাহ। ১৯৯৬ সালে প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থানেও স্মরণীয় ভূমিকা ছিল সেখানকার গণিকাদের।

বিশ্ব-পুঁজিবাদের নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমিকায় গণিকাবৃত্তিতে কেবল অজস্র ধরন সৃষ্টি হয়নি, এটির ব্যাপকতা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হয়েছে। যৌনতার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গকে প্রকাশ্য ও পণ্যে পরিণত করে, বাজারীকরণের জন্য এটিকে সংগঠিত বৃহৎ শিল্পে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম উপাদানে পরিণত করছে আধুনিক পুঁজিবাদ। বিশ্বের জনগণের রুচি, চাহিদা ও ভোগের রূপান্তরে অন্যতম ক্যাটালিটিক এজেন্টে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে এটিকে। এই প্রক্রিয়াতে পুঁজিবাদ সমগ্র প্রথাটিকে ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও সেটির রূপ ও ব্যবস্থার মধ্যে বিশ্বময় সর্বজনীনতা গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতিতে গণিকারা পরিণত ও পরিচিত হয়েছেন 'সেক্স-ওয়ার্কার' বা যৌন শ্রমিকা হিসাবে এবং বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ও ব্যাপ্তিতে হয়ে উঠছেন উল্লেখযোগ্য অংশ।

বারবণিতা-জীবনের যন্ত্রণা

বারবণিতাদের দেশভিত্তিক সামাজিক গঠন ও সংস্কৃতি এখনও পর্যন্ত বেশ কিছুটা ভিন্ন। প্রায় অধিকাংশ দেশে বেশ্যাবৃত্তি কলঙ্কজনক বলে চিহ্নিত। বৃত্তির চরিত্র হলো গোপনীয়তামূলক, নিজেদের মধ্যে গভীর সংযুক্তিময় এবং পেশা থেকে কারো নিবৃত্ত হওয়া বা পরিত্রাণ পাওয়া সর্বত্রই প্রায়

দুষ্কর। আইন প্রয়োগকারীদের বৈষম্যমূলক আচরণের মুখোমুখি হন বেশ্যারা। আরও বিশেষত এই কারণে যে, অধিকাংশ দেশে বারবণিতা-নিরোধক আইন অসমান এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকগুলি পরিবর্তনশীল। স্বভাবতই বারবণিতাকে কয়েদের হুমকি দিয়ে ইচ্ছামত ও নিয়মিত অর্থ নিংড়ে নেয় পুলিশ। তাছাড়া 'আণ্ডারওয়ার্ল্ড' বা সমাজ অন্তরালের দুষ্কর্মের জগতের প্রান্তে এঁদের যেহেতু অবস্থান, পুলিশ এঁদের বাধ্য করে দুষ্কৃতকারীদের তথ্য নিয়মিত সরবরাহ করতে ও চিহ্নিতকরণের কাজে। এসবের ফলে তাঁরা সমাজ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হন। সমাজ এঁদের দুষ্কৃতকারী বলে মনে করে; এঁদের মানসিকতায় ও কাজেও দুষ্কৃতিও গড়ে ওঠে। রাষ্ট্র ও সমাজের এই ধরনের কার্যকলাপ বেশ্যাবৃত্তির অবসানের পরিবর্তে, কার্যকালে এটিকে স্থায়ী করতেই সাহায্য করে।

বেশ্যালয়ে ও পট্টিতে একজন দেহোপজীবিনী দিন কাটায় দৈহিক নির্যাতন ও আক্রমণের মধ্যে। এসব আক্রমণ ও অত্যাচার প্রধানত ঘটে সেই সমস্ত অংশের দ্বারা যারা নারীটিকে ব্যবসার জন্য সংগ্রহ করে এনেছে (প্রকিওরার), বেশ্যালয়ের দালাল (পিম্প), মাসি (বেশ্যালয়ের মালিক, প্রাক্তন একজন নারী বেশ্যা, ম্যাডাম), অন্ধকার জগতের গুণ্ডারা (মিসক্রিয়েন্ট) এবং ভোক্তারা (কমিউটার)। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দেহ-ক্রেতা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও ঐ একই অবস্থা তাঁদের ভাগ্যে জোটে।

শিল্প ক্ষেত্রে 'অক্যুপেশনাল হ্যাজার্ড অ্যাণ্ড ডিজিজ'-এর মতো, বারাঙ্গনাদের যৌন শ্রমেও রয়েছে বৃত্তিগত ঝুঁকি ও রোগের ভয়ঙ্কর প্রাবল্য। বারবার গর্ভসঞ্চার ও গর্ভপাত ছাড়াও, যৌন সম্পর্কের দ্বারা সংক্রমিত রোগসমূহ যেমন সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি যৌন রোগ ছাড়াও টি.বি. ইত্যাদির সাথে বর্তমানে মারাত্মক 'এইডস' রোগ এঁদের জীবনের ঝুঁকি তীব্রভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। নিরোধক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বারবণিতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যবহারের চেষ্টা সত্ত্বেও, তথ্য থেকে জানা যায় যে, ভোক্তারা সেইসব নিরোধক ব্যবস্থা ব্যবহারে বেশ্যাদের জবরদস্তি বাধা দেয়। ফলে রোগ প্রতিরোধ করার সুযোগটুকুও এঁরা অধিকাংশ সময় নিতে পারেন না। বেশির ভাগ দেশে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায়, সরকার নিয়ন্ত্রিত বেশ্যালয় এবং রেজিস্টার্ড বেশ্যাদের জন্য ছাড়া, নিয়মিত ও উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ বাকিদের কার্যত নেই।

ক্রমাগত গর্ভপাত ঘটানো, মৃত সন্তান প্রসব, ব্যবসার স্বার্থে নিজ সন্তানকে গোপন রাখার বাধ্যতা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকায় সন্তান হত্যা, অবৈধ সন্তানের জন্মদান ও সেই সন্তান প্রতিপালনে প্রবল সমস্যা প্রভৃতি এঁদের শারীরিক ছাড়াও সর্বক্ষণ তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও উদ্বেগের মধ্যে রাখে। এঁদের সন্তানদের জীবন হয় দুর্বিষহ এবং ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও অন্ধকারময়। শেষোক্ত দিকটিও বাড়িয়ে চলে তাঁদের যন্ত্রণার মাত্রাকে। বৃত্তি পরিত্যাগ করা বা বৃত্তি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা যেমন সর্বক্ষণ এঁদের তাড়িয়ে বেড়ায়, একই সাথে বৃত্তি ছাড়লে বিপদ ও অনিশ্চয়তাও সমানভাবে গণিকাদের মন ছেয়ে থাকে।

বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্তির কারণগুলি

উন্নত-অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক বঞ্চনা প্রধানত নারী ও শিশু-কন্যাদের এই বৃত্তিতে যুক্ত হতে বাধ্য করে। কোন কোন দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা বেশ্যা পরিবারের মেয়েদের এই বৃত্তিতে আবশ্যিকভাবে নিযুক্ত করে। অনুন্নত বহু দেশে নারী সন্তানকে মনে করা হয় অপ্রয়োজনীয় বা বোঝা হিসাবে। তাছাড়া দারিদ্র্যের জন্য কন্যাসন্তানকে বিক্রি করা হলে, ক্রয়কারী বহুক্ষেত্রেই গণিকাবৃত্তিতে ব্যবহার করে ঐ নারীকে। দরিদ্র নারীদের চাকুরী বা বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে এনে 'চরিত্র নষ্ট' করার পর লোকলজ্জার ভয় দেখিয়ে তাঁদের বাধ্য করা হয় বারবণিতা বৃত্তিতে। এই পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিভাবকহীন, আধা-অভিভাবকহীন ও বাড়ি থেকে পালানো শিশু-কন্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে ভগ্নদশা পরিবারের সন্তান, অবৈধ সন্তান, পরিত্যক্ত সন্তান প্রভৃতির রাস্তায় রাস্তায় ভবঘুরে জীবন এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও ছোটোখাটো দুষ্কর্মে এদের যুক্ত থাকার সুযোগ নিয়ে এই বৃত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা। সারা বিশ্বে ১২ বছরের

কম বয়সী রাস্তায় বাস করা শিশুর সংখ্যা ১৯৯২ সালে ছিল ১৪৫ মিলিয়ন। এই বিশাল সংখ্যক ফুটপাতবাসী শিশুর বিপুল অংশের পরিণাম কি তা' কিছুটা অনুধাবনের জন্য একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে। ১২৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত ব্রাজিলে যে ২৫ মিলিয়ন শিশু রাস্তায় বা ফুটপাতে বাস করে তার ৩-৫ মিলিয়ন বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত।

চরম দারিদ্র্য ছাড়াও সমাজতাত্ত্বিক ও বিশেষজ্ঞরা আরও বিশেষ কারণ লক্ষ্য করেছেন এই বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হওয়ার পিছনে। কেননা হতদরিদ্র হলেও ব্যাপকতম অংশের নারী এই বৃত্তিতে যায় না। তবে আর্থিক দারিদ্র্যজনিত বা সামাজিক কারণের বাইরে, ক্রেতার চাহিদাও যৌন বাজারে নিযুক্তির পিছনে অন্যতম কারণ। কিন্তু নারীদের দারিদ্র্যের জন্য, চাহিদার তুলনায় যৌন বাজারে সরবরাহ কিছুটা বেশি হলেও তা' সীমাহীন ও অতি-উদ্বৃত্তধর্মী হতে পারে না। তাছাড়া প্রচলিত যৌন বাজারের আকর্ষণও বর্তমানে ক্রমশ কমছে। কিন্তু তা' এজন্য নয় যে মানুষের মধ্যে পরিবার-বহির্ভূত যৌনতার প্রবণতা নিম্নগামী। আসলে পরিবার-বহির্ভূত যৌন চাহিদা ভিন্নভাবে অনেকটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে যৌন বাজার ও ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে মুক্ত হওয়ায়।

বহু সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে আর্থনীতিক কারণের মতই পরিবেশগত ও মনস্তাত্ত্বিক কারণও এই বৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়ার পিছনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্ষিতা হওয়া, প্রাক-বিবাহ গর্ভবতী হওয়ার পর বিবাহ না হওয়া, বিবাহিতা বা বিধবা-নারীর অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্কের ফলে গর্ভবতী হওয়া এবং তার ফলে পরিবার থেকে বহিষ্কার, যে পরিবারের পিতা বা মাতা বা উভয়েই অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ও সেগুলি জানার সুযোগ ঘটেছে বাড়ীর যে কন্যার, কারখানা বা অফিসে কাজ করতে গিয়ে সহকর্মী বা মালিক প্রভৃতির কাছে বারবার যৌন লাঞ্ছিত হওয়া, গৃহস্থালি পরিচারিকার উপর যৌন নিপীড়ন ও তার ফলে এক বা একাধিকবার গর্ভবতী হওয়া এবং গর্ভপাত ঘটানো, পিতা-মাতা বা বাড়ীর অভিভাবকদের ক্রমাগত দুর্ব্যবহার প্রভৃতি ঘটনাবলী থেকে বারবণিতা বৃত্তি গ্রহণের পরিবেশগত কারণগুলি পাওয়া যায়। এমনকি পিতা কর্তৃক কন্যা, ভ্রাতা কর্তৃক ভগ্নী বা পরিবারের নিকট পুরুষ আত্মীয় কর্তৃক নারীকে ক্রমাগত যৌন সম্পর্কে বাধ্য করার ফলে সমাজ, পরিবার ও নৈতিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়ে এই বৃত্তিতে যোগদানের নজির রয়েছে। স্বামীর নৃশংস অত্যাচার, বিশেষত যৌন উৎপীড়ন, শ্বাশুড়ী, ননদ প্রভৃতির অত্যাচার, অল্প বয়সে বৈধব্য ঘটলে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার বা অন্য উদ্দেশ্যে সেই নারীর চরিত্র সম্পর্কে অপবাদ রটনা অথবা বিধবা নারীকে অন্য পুরুষের ভোগে বাধ্য করে পরিবারের অর্থ উপার্জন ইত্যাদিও কারণ হিসাবে কখনো কখনো কাজ করে।

এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ স্বয়ং বেশ্যাবৃত্তিকে দারুণভাবে ছড়িয়ে দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রধানত কেবল ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তা' ছড়িয়ে পড়ে উত্তর আফ্রিকা ও সমগ্র এশীয় ভূখণ্ডে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ যেসব দেশে সামরিক অভিযান বা দখলদারী করেছে সেইসব দেশে ব্যাপকভাবে বেশ্যাবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছাড়াও আমেরিকান সৈন্যদের প্রয়োজনে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপিইনস, মালয়েশিয়া, হংকং প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে গণিকাবৃত্তির প্রসার হয়।

বারবণিতাবৃত্তি গ্রহণে পূর্বোক্ত সাধারণ কারণগুলি সত্তরের দশকের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল। ঐসব কারণ এখনও বহাল থাকলেও নতুন ধরনের কারণের উদ্ভবের ফলে নতুন ধরনের বারবণিতা-বৃত্তির উদ্ভব ঘটতে শুরু করেছে। পৃথিবীব্যাপী দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ন, শহর ও শিল্পাঞ্চলে ও সেগুলির উপকণ্ঠে বিশাল বিশাল নতুন বস্তি অঞ্চল গড়ে ওঠা, মানুষের ভিড় ও গায়ে গায়ে লাগানো ফ্ল্যাট বাড়ী, বাণিজ্যের নানা প্রয়োজনে বিদেশীদের, বিশেষত বিজনেস এক্সিকিউটিভ, প্রফেশনাল, ফিনানসার, প্ল্যানার, টেকনিশিয়ান, এডভারটাইজার, ভ্রমণকারী প্রভৃতি অংশের বৃত্তিগত গমনাগমন, পরিবারের ব্যবস্থায় মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিতে ভাঙ্গন, এক অভিভাবক পরিবারের ব্যাপক প্রসার,

বিলম্বে বিবাহ, নারী ও পুরুষের মধ্যে মুক্ত মেলামেশা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুযোগের ফলে গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে আশঙ্কা দূরীভূত হওয়া, গর্ভপাতের সপক্ষে অধিকাংশ দেশে আইন, নারীদের মধ্যে নেশাগ্রস্ততার প্রসার, সমাজে লজ্জা ও গোপনীয়তার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ক্রমাগত ক্ষয়, প্রকাশ্য যৌনতা সম্পর্কে নতুন নতুন মতবাদ, সংগঠন ও আন্দোলনের আবির্ভাব ইত্যাদি দিকগুলি প্রচলিত বেশ্যাবৃত্তির চরিত্রকে ব্যাপকভাবে বদলে দিচ্ছে এবং নতুন নতুন কারণ সৃষ্টি করছে।

বর্তমানকালে চোরাচালান, মাদকদ্রব্য চালান ও মাদকাসক্তি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, গুণ্ডামি, খুন, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও সমাজের উচ্চমহলে দুর্নীতি, সিনেমা, টি. ভি., ভি. ডি. ও.তে প্রকাশ্য যৌনতা প্রদর্শন, যৌন বিষয়ক পত্র-পত্রিকার ব্যাপক প্রসার ও বিষাদগ্রস্ততা থেকে নানা মরিয়া মানসিকতা ও তৎপরতা ইত্যাদি সমাজে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলি একক বা ক্রমান্বিত-ভাবে বেশ্যাবৃত্তি বিকাশের যেমন অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে, পতিতাবৃত্তি স্বয়ং হয়ে উঠেছে এগুলির অনুষঙ্গ।

শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা ক্ষেত্রের চাইতে 'আন-অরগানাইজড সেক্টর' বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের বর্তমানে ব্যাপক বিস্তার এই বৃত্তি প্রসারিত হওয়ার অন্যতম কারণ। অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্যতম অংশ হয়ে উঠেছে যৌন ব্যবসায়ে স্ব-নিযুক্তি; অন্যদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নারীদের অংশগ্রহণ বা ব্যবসা, নিযুক্তি প্রভৃতির ফলে অল্পবয়সী মেয়ে থেকে মধ্যবয়সী নারীদের মধ্যে মুক্ত যৌনতা ও ক্ষেত্রবিশেষে বারবণিতাবৃত্তি গ্রহণে প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে।

আধুনিক শিল্প ও শ্রম-ব্যবস্থায় সাব-কন্ট্রাক্টিং, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, ম্যাকুইলাডোরা প্রভৃতিতে কার্যত ব্যারাকের বিচ্ছিন্ন জীবনে ও দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে স্বয়ং যৌন তৃষ্ণা নিবারণে ও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনে মুক্ত যৌনতাকে ব্যাপকভাবে আশ্রয় করতে শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকারা।

যৌন ব্যবসার নতুন নতুন প্রকরণ

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে শেষোক্ত কারণগুলি বিশেষত উদ্ভূত হচ্ছিল। আগামী দিনে সারা বিশ্বে পরিপূর্ণ প্রকাশ্য ব্যবস্থা হয়ে ওঠার অন্তর্বর্তী স্তর হিসাবে, বর্তমানে, বারাঙ্গনাবৃত্তি গোপন স্তর ভেঙ্গে আধা-প্রকাশ্য হয়ে উঠছে। শহর, শিল্পাঞ্চল, সমুদ্র-বন্দর ইত্যাদি এলাকায় এই বৃত্তির কেন্দ্রীভূত উপস্থিতি এখন অন্যত্রও প্রসারিত হচ্ছে। তাছাড়া বাণিজ্যিক যৌন ব্যবস্থার বাজার সর্বময় করার জন্য এটির আঙ্গিককেও পরিবর্তন করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সরকারী আইনের বাধা-নিষেধের জালকে এড়াতে এখন ব্যাপকভাবে ও নতুন রূপে গড়ে উঠছে মাসাজ পার্লার, বিউটি পার্লার, কল-গার্লস, ইরোজ সেণ্টার, মক্ ম্যারেজ ও ম্যারেজ ব্যুরো, এসকর্ট সার্ভিস, ট্যুরিস্ট গাইড, সেক্স বার ও রেস্টুরেন্ট, হোটেল অ্যাটেনডেন্ট, ট্রানস্লেটার সার্ভিস, ওয়েসাইড রিসর্ট ও মোটেল, সেক্স-সুইমিং পুল, দক্ষিণ কোরিয়াতে 'কিসায়েং-গার্ল হোটেল', সেক্স ট্যুরিজম, চাইল্ড সেক্স ট্যুরিজম, মেল প্রস্টিটিউশন, পর্ণ গার্ল, সেক্স এপার্টপোর্ট ইত্যাদি নামের অজস্র ব্যবস্থা। এই সমস্ত প্রথায় জড়িত মানুষের সংখ্যার কোন সঠিক ও সুনির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়া গেলেও পৃথিবীতে মোটামুটি ২ কোটি নারী ও শিশু-কন্যা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এগুলিতে জড়িত বলে অনুমান করা হয় এবং এই ব্যবসায়ে বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বে যৌন বাণিজ্যে লাভের পরিমাণ স্বভাবতই বিপুল।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মজুরি দাসত্বের অভ্যন্তরে এখন যুক্ত হয়েছে 'ফিমেল সেক্স শ্লেভারি' বা নারীর যৌন দাসত্ব। গণিকাবৃত্তি এখন মজুরি দাসত্বে পরিণত হয়েছে। অতীতে গণিকাবৃত্তির ক্ষেত্রে একজন বারবণিতা নিজের দেহ বিক্রির অর্থ মোটামুটি নিজেই পেতো। তাকে এই বৃত্তিতে নামিয়েছে যে ব্যক্তি তাকে, মাসি, দালাল ও পুলিশকে মাসোহারা বা কমিশন দিতে হতো। এই প্রথা অনেকটা স্বাধীন ব্যবসায় ধরনের ছিল। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত নতুন নতুন প্রথাগুলিতে ছাড়াও বিশাল বিশাল বেশ্যালয়ের ব্যবস্থাকে এখন এক প্রকারের কারখানা বলা চলে এবং এই বৃত্তি শিল্পে পরিণত হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকের ভাগাভাগির মত এখানে ভাগাভাগি সৃষ্টি হচ্ছে—পণ্য-রূপী যৌনতা

উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা বনাম যৌন শ্রম। পণ্য-রূপী যৌনতাকে উৎপাদন করার ক্ষেত্রে শ্রমদায়ী হলো যৌন শ্রমিকা।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যৌন বাণিজ্যের ব্যাপকতা

যৌন বাজারে যৌন শ্রমিকাদের প্রবেশ ব্যাপক হয়ে উঠছে সত্তরের দশকের পর থেকে। তৃতীয় দুনিয়ার এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশ কার্যত এক ধরনের বিনা-পুঁজি বা নিম্ন-পুঁজি বিনিয়োগে ব্যাপক লাভজনক অন্যতম বাণিজ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে যৌন আমদানি ও রপ্তানির বাণিজ্যকে।

উন্নত দুনিয়াতে পুঁজির অভ্যন্তরীণ পুনরুৎপাদনের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে যৌন ব্যবসা। সত্তরের দশক থেকে পশ্চিম জার্মানিতে নারীদেহ ব্যবসার পাশাপাশি অনুরূপ মেয়েদের দিয়ে পর্ণগ্রাফিক (যৌনকর্মের উন্মুক্ততা-ভিত্তিক) পত্রিকা, ছবি, ফিল্ম, ভিডিও ক্যাসেট, সেক্স-শপ প্রভৃতির ব্যবসা দেশের ভিতরে ছাড়াও রপ্তানি বাণিজ্যের বিশিষ্ট উপাদান হয়ে ওঠে। দুই জার্মানির মিলনের পর প্রাক্তন পূর্ব জার্মানিতে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার ছাঁটাই নারীরা, এমনকি প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অনুরূপ নারীরা এবং ঐসব দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা জার্মানিতে এসে এই ব্যবসায়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে যুক্ত হচ্ছে। জার্মানিতে এই ব্যবসার মালিক প্রধানত অন্ধকার জগতের মাফিয়া ডন, যারা ভুয়া কোম্পানির নামে এগুলি চালায়। এদের অকাতরে ঋণ দিয়ে থাকে জার্মানির ব্যাঙ্কগুলি। ফরাসী দেশে এই ব্যবসা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বেশ কয়েকটি সুবৃহৎ কোম্পানি, ট্রাস্ট বা হোল্ডিংস। হল্যাণ্ডসহ স্ক্যাণ্ডিনেভিয় দেশগুলিতে গণিকাবৃত্তি কার্যত আইনি বলে স্বীকৃত এবং এদের মধ্যে রোগ বিষয়ক ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেই। স্ক্যাণ্ডিনেভিয় দেশগুলি, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিটি শহরে দৈনিক গড়ে ৪০ থেকে ৫০ হাজার ভোক্তা গণিকালয়ে যায়। ফরাসী সংবাদপত্র 'লা মঁদে'র রিপোর্টে জানা যায় যে আমেরিকাতে ১৯৭০ সালে পর্ণগ্রাফিক ইণ্ডাস্ট্রির বাজেট ২.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৮০ সালে ৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল, যদিও আমেরিকার ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৪৯টিতে (নেভাদা রাজ্য বাদে) গণিকাবৃত্তি আইনত নিষিদ্ধ। অন্যান্য উন্নত দেশগুলির পরিস্থিতি কম-বেশি একই রকম।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির, বিশেষত থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস, ব্রাজিল, পেরু, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং (এখন সমাজতান্ত্রিক চীনের অন্তর্ভুক্ত) প্রভৃতির অর্থনীতিতে যৌন ব্যবসা গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। এইসব দেশে সরকারী বা আধা-সরকারী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে দেহোপজীবিনীদের নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত করার এবং তাদের এ'বিষয়ে আইডেন্টিটি কার্ড ও সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেমন, দক্ষিণ কোরিয়াতে 'সাউথ কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন' (কে. আই. টি. এ. বা 'কিটা') 'সার্টিফিকেট অব এমপ্লয়মেন্ট ইন দা এন্টারটেইনমেন্ট সার্ভিস' সরকারীভাবে বণ্টন করে। তাছাড়া যৌন ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য 'কনসালটেন্সি সার্ভিস' বা 'প্রমোশনাল সার্ভিস'ও চালু হয়েছে কোন কোন দেশে।

ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম' বা আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো জাতি, লিঙ্গ ও ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সমঝোতা, শান্তি-সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা। রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অরগানাইজেশন'-এর চার্টারে স্বাক্ষরদানের মধ্য দিয়ে এই লক্ষ্য, অঙ্গীকার হিসাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই ব্যবস্থা, সাধারণভাবে, নারী সমাজের কাছে বিপদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার নারীদের ক্ষেত্রে। কেননা বর্তমানে 'ট্যুরিজম' ও 'সেক্স' অবিভাজ্য সত্তা। টুরিজম বর্তমানে যেহেতু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম পাথেয়, তার সাথে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক যৌন ব্যবসায়ে সৃষ্টি হয়েছে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একটি দিক হলো তৃতীয় দুনিয়ার এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশের সরকার ও ট্যুরিজম-এর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উন্নত দুনিয়ার ট্যুরিস্টদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করার জন্য তৎপরতা এবং অপর দিকটি হলো উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে যেসব দেশে যৌন ব্যবসার চাহিদা

ব্যাপক সেইসব দেশে ব্যাপকভাবে যৌন শ্রম রপ্তানি করা। উভয় ক্ষেত্রেরই প্রধান লক্ষ্য হলো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। এর নীট ফল হলো ব্যাপক যৌন শোষণ ও সংশ্লিষ্ট মেয়েদের দুর্দশা, নিপীড়ন, অপব্যবহার এবং অমানবিক আচরণ প্রভৃতি চূড়ান্ত স্তরে উন্নীত হওয়া।

উন্নত দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে জার্মানি, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি এবং অনুন্নত দেশগুলি যেমন ফিলিপিনস, থাইল্যাণ্ড, হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, শ্রীলঙ্কা, ব্রাজিল, পেরু, আর্জেন্টিনা প্রভৃতিতে স্বদেশীয় ছাড়াও বিদেশাগত যৌন কর্মীদের দিয়ে ব্যাপক ব্যবসা চালানো হচ্ছে। উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে বিদেশী যৌন শ্রমিকাদের ব্যবহারের প্রধান কারণ হলো অভ্যন্তরীণ ক্রেতা-চাহিদা মেটানো শুধু নয়, ক্রেতার বিভিন্ন রুচি পূরণের ব্যবস্থা করে যৌন ব্যবসাকে সর্বক্ষণের জন্য করা। অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য অনুন্নত দেশগুলিতে সাধারণভাবে উন্নত দেশ থেকে যৌন কর্মী আমদানি করা হয় না। কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার যেসব দেশে যৌন কর্মী আমদানি করা হয় তার কারণ হলো স্বল্প-মূল্যের বিদেশী যৌন কর্মীদের দিয়ে দেশীয় যৌন বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি এবং এর মধ্য দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে দেশীয় যৌন কর্মীদের কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা। তাছাড়া বিদেশী যৌন কর্মীদের ব্যবহার করে বিদেশী ভ্রমণকারীদের দেশে আকৃষ্ট করে কম ব্যয়ে বেশি উপার্জনের উদ্দেশ্যও থাকে। তাছাড়া স্বল্প-মূল্যের বিদেশী নারী দিয়ে বেশি মুনাফা করার অপর উদ্দেশ্যও এতে রয়েছে। সরাসরি যৌন ব্যবসার জন্য না হলেও, গৃহের পরিচারিকা বা অন্য গৃহস্থালি কাজের জন্য তৃতীয় দুনিয়া থেকে নারী এনে ব্যাপক যৌন শোষণের ঘটনা ঘটছে তৈল-সমৃদ্ধ মধ্য-প্রাচ্যের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে। কয়েক লক্ষ বিদেশী নারী কার্যত ব্যক্তিগত যৌন শ্রমিকা হিসাবে কাজ করে এইসব দেশে।

যেসব দেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যায় যৌন শ্রমিকা বিদেশে প্রেরণ করে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেগুলির অন্যতম হলো নেপাল, মেক্সিকো, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, উপ-সাহারীয় দেশগুলি, ফিলিপিনস, থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, চিলি, ঘানা, পানামা, ডোমিনিকান রিপাব্লিক প্রভৃতি এবং অংশত ভারত। তৃতীয় দুনিয়ার এই কতকগুলি দেশ যৌন কর্মীদের উভয়ত আমদানি ও রপ্তানি করে থাকে। এইভাবে দুই দিক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করছে এরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৯৬ সালে ফিলিপিইনস সর্বোচ্চ লাভ করেছে এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করে।

যৌন ব্যবসাকে কেন্দ্র করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পর্ণ-সংবাদপত্র, সাময়িকী, ফটো, ভিডিও ক্যাসেট প্রভৃতির ব্যবসাও এখন ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য ও লাভের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে যৌন শ্রমিকাদের নগ্ন দেহ প্রদর্শনের বাণিজ্য ছাড়াও, যৌন ব্যবসার জন্য বিজ্ঞাপনও এখন ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। শেষোক্ত দিকগুলি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রণালীতে সম্পূর্ণ নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে।

আন্তর্জাতিক যৌন ব্যবসার অপর এক দিক হলো যৌন শ্রমিকা সংগ্রহ, তাঁদের দরদাম নির্ধারণ ও চুক্তিবদ্ধ করা এবং বিদেশে প্রেরণের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রভৃতির জন্য বড় বড় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 'এজেন্সি' প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী যৌন কর্মী সরবরাহ করা ছাড়াও, নিজেরা যৌন কর্মীদের মজুত রাখে যাতে প্রয়োজনমতো সরবরাহ করা যায়। এইসব প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখার ব্যাপ্তিও অবিশ্বাস্য ধরনের বিশাল ও নিপুণ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চোরাচালান ও ড্রাগের ব্যবসার সাথে স্বভাবতই এই ব্যবসা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংগৃহীত নারীদের কাছ থেকে এরা যেমন কমিশন নেয়, অন্যদিকে প্রেরিত দেশের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও বিশাল অঙ্কের অর্থ নিয়ে থাকে। 'হিডেন ইকনমি'র এখন অন্যতম বড় উপাদান হলো 'আণ্ডারওয়ার্ল্ড'। অতীতের প্রধান সূত্র গ্যাম্বলিং বা জুয়ার পরিবর্তে স্মাগলিং, ড্রাগ ট্র্যাফিকিং ও সেক্স ট্রেড এখন মূল বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে আধুনিক আণ্ডারওয়ার্ল্ড ইকনমির।

যৌন নিপীড়ন ও বাণিজ্যের বিরুদ্ধে গণিকাদের আন্দোলন

গত শতাব্দী থেকে উন্নত দেশগুলিতে বারাঙ্গনাবৃত্তির অবলুপ্তির দাবীতে নানা ধরনের বুর্জোয়া-উদারনীতিবাদী সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক নন্-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনগুলির মধ্যে 'স্যালভেশন আর্মি'র ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় দুনিয়ায় জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে বারবণিতারা যেমন অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সামাজিক, আর্থিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা নিয়ে মানবতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলনের ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে 'লীগ অব নেশনস' ও পরবর্তীকালে 'ইউনাইটেড নেশনস', আই. এল. ও., হু, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা এদের বিষয়ে এবং এই ব্যবস্থা বিলোপের জন্য নানা ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 'ইউনাইটেড নেশনস এগ্রিমেন্টস, কনভেনশনস অ্যাণ্ড রেজোলিউশনস'-এর ১০টি ধারা অধিকাংশ দেশ স্বীকার করে নিয়ে নিজ নিজ দেশে বারবণিতা-বৃত্তি নিরোধকমূলক বহু আইন রচনা ও গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা তৎপর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাবলিশনিস্ট ফেডারেশন' (আই. এ. এফ.) যারা নিয়মিতভাবে দেশে দেশে ও সারা বিশ্বে গণিকাবৃত্তির অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাটির বিলোপ এবং সংশ্লিষ্ট মেয়েদের পুর্নবাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এইসব তৎপরতার ফলে কোন কোন বিশেষ ধরনের দেহোপজীবিনী ব্যবস্থা (যেমন ভারতে দেবদাসী প্রথা) বন্ধ হয়েছে বটে, তথাপি এই প্রথা লুপ্ত হওয়া দূরের কথা, (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাদে) বরং বেড়ে চলেছে।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশে দেহোপজীবিনীদের বিশিষ্ট সর্বজনীন সমস্যার বিষয়ে অজস্র এন. জি. ও. সংগঠন গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক এবং সমাজতাত্ত্বিকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ যেমন এদের মধ্যে কাজ করছে, অন্যদিকে শেষোক্তরা এন. জি. ও.গুলির পরামর্শদাতার ভূমিকাও নিচ্ছেন। শতাধিক আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে যেগুলি দেশে দেশে এই ধরনের সংগঠনগুলির সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা করা ছাড়াও বারবণিতাদের জন্য সামাজিক প্রকল্প যেমন পুনর্বাসন, হস্তশিল্পের ট্রেনিং, দেহোপজীবী নারী ও তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, কনডোম সরবরাহ, এইডস সচেতনা সৃষ্টি ইত্যাদির জন্য অর্থ সাহায্য করে। রাষ্ট্রসংঘের পরামর্শদাতা সংগঠনের স্বীকৃতি আছে এমন ধরনের সংগঠনগুলি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মঞ্চেও ভূমিকা নিচ্ছে।

গণিকাদের গণ্য করা হয় এক ভিন্ন শ্রেণী হিসাবে। এঁদের ওপর পুলিশি নজরদারি থাকে, কেননা মনে করা হয় যে বেশ্যাদের এলাকা হলো দুষ্কৃতীদের ঘাঁটি। পুলিশ ও রাজনীতিবিদদের একাংশ বেশ্যাদের মাধ্যমে আর্থনীতিক লাভও পেয়ে থাকে এবং নি-খরচায় উপভোগ করে যৌন প্রমোদও। অন্যদিকে গণিকাদের সমর্থনে ও সাহায্যে দুষ্কৃতকারীরা বেশ্যালয়গুলিকে নিজেদের শক্তিশালী ডেরাতেও পরিণত করে। এইরকম তাড়া-খাওয়া ও নিষ্পেষিত, দুষ্কৃতিময় ও বিচ্ছিন্ন জীবন পরিস্থিতির জন্য সারা বিশ্বে বারবণিতাদের দাবী-দাওয়া, সংগঠন ও আন্দোলনের উদ্ভব ঘটছে, বিশ্ব-মঞ্চেও তাঁরা তাঁদের দাবী তুলছেন। প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে, সর্বশেষ বেজিং সম্মেলনেও সহস্রাধিক বারাঙ্গনা উপস্থিত হয়ে দাবী তুলেছেন, মিছিল-সমাবেশ করেছেন।

গণিকাদের আন্দোলনে কেন্দ্রীয় উপাদানগুলি হলো ঃ তাঁদের মর্যাদা ও শ্রদ্ধা পাওয়ার, তাঁদের বক্তব্য অন্যদের শোনার এবং তাঁদের দেখভাল পাওয়ার অধিকারের আকাঙ্ক্ষা। সমাজ তাঁদের ব্যবহার করে, কিন্তু তাঁদের যন্ত্রণাদায়ক জীবনের দিকে আদৌ মুখ ফিরিয়ে দেখে না। বেশ্যালয়ে বা রাস্তায় তাঁদের দৈহিক নিরাপত্তাটুকু পর্যন্ত নেই; অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদাহীন এক মানবেতর পরিস্থিতিতে তাঁদের জীবন কাটে। সমস্ত ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে এঁরাই সম্ভবত সবচাইতে বেশি সংখ্যায় নিয়মিত খুন হন, কিন্তু সেইসব ঘটনার অধিকাংশ প্রকাশ্যে আসে না এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দোষীরা শাস্তি পায় না। দুষ্কৃতি, দালাল ও পুলিশ বিনা পারিশ্রমিকে এঁদের ভোগ করে নিজেদের স্বেচ্ছাচারী যৌনতার নিবৃত্তি করে না কেবল, এঁদের উপার্জনের বড় অংশও তারা কার্যত জবরদস্তি

আত্মসাৎ করে। যৌন ক্রেতাদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার জন্য সমস্ত ধরনের যৌন প্রতিষ্ঠানে নগ্ন দেহে এঁদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, শিশু ও কুমারী বারাঙ্গনাদের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের নির্বাচনের পদ্ধতি সবচাইতে জঘন্য। ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়সী গণিকাদের অধিকাংশই দেহ ব্যবসায়ে অক্ষম ও তার ফলে তাঁরা প্রবল দারিদ্র্যে পড়েন, শুধু তাই নয়, দৈহিক ও মানসিক রোগ তাঁদের জরাজীর্ণ ও অর্ধমৃত করে ফেলে; আত্মহত্যার প্রবণতা ও ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে এই বয়সী বারবণিতাদের মধ্যে।

পূর্বোক্ত পটভূমিকায় গণিকাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বর্তমানে যেসব দাবী উত্থাপিত হচ্ছে, তা' মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

(১) বেশ্যালয়ে, রাস্তায় ও বাড়ীতে তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে, তাদের ওপর আক্রমণ বন্ধ ও হামলাকারীদের প্রতিহত করার আইনি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) বেশ্যা ও বেশ্যালয়গুলিকে, অন্যান্য ব্যবসার মতো, সরকারী লাইসেন্স দিতে হবে; এজন্য রাষ্ট্রীয় বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু অন্যান্য বাণিজ্যের মতো এই প্রথাকে ব্যবসায় হিসাবে স্বীকৃতি এবং অনুমোদিত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

(৩) সরকারীভাবে এবং ভর্তুকিমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যের রোগের চিকিৎসা, বিনামূল্যে কনডোম সরবরাহ, সন্তান-সন্ততিদের জন্য শিক্ষা, ব্যবসা ছেড়ে যাঁরা চলে যেতে চান তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসন এবং স্বাভাবিক সমাজ জীবনের প্রবাহে যুক্ত হতে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) বিদেশে নারী ও শিশু যৌন কর্মীদের রপ্তানির বিষয়ে দালালদের ভূমিকা বন্ধ, বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির সময় সরকারী কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি ও গ্যারান্টি, বিনা হয়রানিতে পাসপোর্ট ও ভিসা পাওয়ার ব্যবস্থা, বিদেশে বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার সময় মজুরি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং নির্বিঘ্নে ও ইচ্ছামতো দেশে প্রত্যাবর্তনে স্বদেশীয় রাষ্ট্রদূত অফিসের সর্বক্ষণের ও উপযুক্ত নজরদারী ও সহায়তা দান।

(৫) বারাঙ্গনাবৃত্তির সমস্যাকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের এবং অনুরূপ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজের স্থায়ী বিবেচনার বিষয় হিসাবে গ্রহণ, এই বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট প্রকাশ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে, বিশেষত রাষ্ট্রসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, হু, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ প্রভৃতি, এদের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতি।

এদের র‍্যাডিকাল দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ যৌন কর্মীদের দেশীয় সমস্ত ধরনের শ্রম আইনের পরিসরের অন্তর্গত করা, উপযুক্ত মজুরি, কাজের সময় ও সপ্তাহে ছুটির দিনের ব্যবস্থা, উন্নত কর্ম-পরিবেশ, মালিকের সাথে বিরোধে সরকারের হস্তক্ষেপ এবং মালিক-যৌন শ্রমিকার বিরোধ লেবার কোর্টের আওতাভুক্ত করা, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিনামূল্যে বীমা, পেনশন বা এককালীন থোক টাকা দান, যৌন শ্রমিকাদের সংগঠনের স্বীকৃতি প্রদান, মিউনিসিপ্যাল বা প্রাদেশিক নির্বাচনে এঁদের জন্য আসন সংরক্ষণ, গণিকাবৃত্তির বিষয়ে জাতীয় সমস্ত আইনের পুনর্মূল্যায়ন ও নতুন করে রচনা প্রভৃতি।

উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত দেশে গণিকাদের সংগঠনগুলি এখন প্রকাশ্যে মিছিল-সমাবেশ, বিশেষ বিশেষ ঘটনায় বা মুহূর্তে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, থানা ঘেরাও, পথ অবরোধ, টর্চলাইট মার্চ প্রভৃতি নানা ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করে চলেছে।

গণিকা-প্রথার অবসানের জন্য সামাজিক সংস্কার এবং গণিকাদের সংগঠিত করে তাঁদের নিজস্ব দাবী উত্থাপনের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮৬০-এর দশকে ইংলণ্ডের লিভারপুলের শ্রীমতি জোসেফাইন বাটলারের দ্বারা। বর্তমানে সংস্কার আন্দোলনের ধারা প্রধানত বহন করছে এন. জি. ও.গুলি। অন্যদিকে নিজেদের সমস্যার সমাধানের ভার তুলে নিয়েছেন নিজেরাই নিজেদের আন্দোলনের ও সংগঠনের মাধ্যমে। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর দেশে দেশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে যে সংগঠনগুলি সেগুলির কয়েকটি হলো আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোর 'কল অফ ইওর টাইরেড এথিকস' বা 'কয়টে'—

যার চাঁদা সংগ্রহের পদ্ধতির নাম 'হুকার্স বলস' ও মুখপত্রের নাম 'কয়টে হাউলস', নিউইয়র্কের 'পনি', ম্যাসাচ্যুসেটস-এর 'পুসা', কানসাতে 'কিট্টি', ফ্লোরিডাতে 'কয়টি', লস এঞ্জেলসে 'কাট', নিউ অর্লিয়েন্সে 'প্যাশন', ক্যালিফোর্নিয়াতে 'কয়োটি', মিনিয়াপোলিসে 'হুইস্পার' ও 'প্রাইড' প্রভৃতি। বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে তাদের জাতীয় সংগঠনটি হলো ইউ. এস. পি. আর. ও. এস. বা 'আসপ্রোস'। ব্রিটেনে অনুরূপ সংগঠন হলো 'পি. এল. এ. এন.', 'পি. আর. ও. এস., 'ই. সি. পি.' ইত্যাদি, ইতালিতে 'সি. সি. আর. পি.', 'লুসিওলা' ইত্যাদি, স্পেনে 'ক্যারিটাস এসপানোল', নেদারল্যাণ্ডস-এ 'রেড থ্রেড' ও 'পিঙ্ক থ্রেড', কানাডাতে 'পাওয়ার' ও 'কয়োটি', সুইজারল্যাণ্ডে 'এস. এস. পি. এ. এস. আই. ই', 'এস. ও. এস. ফেম্মিস', জার্মানিতে রয়েছে ৩৭টির মতো বড় সংগঠন, ফিলিপিনসে ৭১টি সংগঠনের মধ্যে প্রধান দু'টি হলো 'স্টপ' এবং 'টি. ডব্লু—এম. এ. ই. ডব্লু', লাতিন আমেরিকার সহস্রাধিক সংগঠনের মধ্যে বৃহত্তম হলো ব্রাজিলের 'বারুয়েল ডি লাগেনসেট', থাইল্যাণ্ডে রয়েছে ৪৪টি সংগঠন প্রভৃতি। তাছাড়া ফ্রান্স, নরওয়ে, মেক্সিকো, চিলি, পানামা,অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এবং ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে, পর্তুগাল এবং সম্প্রতিকালে পোল্যাণ্ড, চেক রিপাব্লিক ও রোমানিয়াতে কিছু কিছু সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছে।

পশ্চিমি কমিউনিস্ট, সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক, অ্যানার্কিস্ট ও ট্রটস্কাইট পার্টিগুলি এবং ব্রিটেনে লেবার পার্টি এবং বামপন্থী বা লিবারাল নির্বিশেষে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বারবণিতাদের সংগঠিত করা, তাঁদের দাবী উত্থাপন এবং সাধ্যমত তাঁদের আন্দোলনে যুক্ত করার কাজ দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে শুরু করেছিল। আসলে এ'বিষয়ে স্বীয় উদ্যোগের চেয়ে পরিস্থিতির বাধ্যতাই ছিল এই প্রচেষ্টা গ্রহণের পিছনে প্রধান কারণ। মহাযুদ্ধে অন্য দেশের অধিকৃত এলাকাগুলিতে বিদেশী সৈন্যদের এবং রণাঙ্গনের কাছাকাছি এলাকাগুলিতে স্বদেশীয় সৈন্যবাহিনীর ধর্ষণের ঘটনা ও তার ফলে অবৈধ মাতৃত্ব এবং যুদ্ধ-শেষে ব্যাপক দুর্দশার জন্য পতিতাবৃত্তির ব্যাপক প্রসার প্রভৃতি বাস্তবতা রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে বারাঙ্গনাদের সমস্যা তুলে ধরতে বাধ্য করেছিল। আরও বিশেষত এই কারণে যে প্রধানত মেহনতি অংশগুলি এই পরিস্থিতিতে সর্বাধিক আক্রান্ত হয়েছিল। বর্তমানেও বামপন্থীদের মধ্যে এঁদের বিষয়ে যে নতুন ভাবনার উদয় দেখা যাচ্ছে তাও অনেকটা পরিস্থিতির চাপেই। সেক্ষেত্রেও অন্যতম সমস্যা হলো যে উন্নত-অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে, অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গটিকে নিছক যৌন বিষয়ক ও সামাজিক সমস্যা বলে মনে করে;এটিকে শ্রেণী-সমস্যা তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল সমস্যার অন্যতম অংশ হিসাবে বিবেচনা ও তদনুযায়ী তেমন ভূমিকা গ্রহণ এখনও শুরু করেনি তারা।

হিজড়া সম্প্রদায় ঃ নতুন চেতনার উন্মেষ

জনজীবন থেকে সাধারণভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, অবহেলিত, দারুণভাবে ঘৃণিত এবং প্রবলভাবে শোষিত ও দরিদ্র হিজড়া (ইউনাখ) বা নপুংসক সম্প্রদায় এখন শুরু করেছেন সংগঠিত ও নিজেদের সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হতে। এশীয় ও আফ্রিকীয় দেশগুলির চরিত্রের হিজড়া সম্প্রদায় ইউরোপ ও আমেরিকাতে দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু শেষোক্ত দেশ ও অঞ্চলগুলিতেও রয়েছে এই সমাজ।

জন্মলগ্ন থেকে যৌনাঙ্গের প্রায় অনুপস্থিতি বা অসম্পূর্ণতা অথবা বিকৃতি কিংবা কৃত্রিমভাবে লিঙ্গ অপসারণ করে নপুংসকতা গঠন বা ছদ্মবেশী হিজড়া মানব-সভ্যতার প্রায় শুরু থেকেই ছিল; ঐতিহাসিক কোন কোন সমাজ ও সভ্যতায় এঁদের ছিল সামাজিক স্বীকৃতি ও কার্যকরী ভূমিকাও। তবে পরবর্তীকালে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানমূলক ধর্মগুলি, যেমন হিন্দু, খ্রীস্টান, ইসলাম, ইহুদী, শিখ প্রভৃতি, হিজড়াদের সামাজিক স্বীকৃতি দেয়নি এবং ধর্ম আচরণ করার অধিকার থেকে বাইরে রেখেছে। সুতরাং সমাজ তথা অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি হিজড়ারা বাইরের অংশ বলে চিহ্নিত। এঁদের সাথে সমাজের মানুষের সমস্ত ধরনের সম্পর্কও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনেক দেশে সাংবিধানিক, নাগরিক ও মানবিক অধিকারের

বহু দিক থেকে এঁরা বঞ্চিত।

জন্মগত যৌন-প্রতিবন্ধী তথা নপুংসক তথা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পাঁচ ধরনের হিজড়া রয়েছে। সেগুলিকে বলা হয় : (ক) দৈহিক চরিত্রে প্রধানত পুরুষের ভর বিশিষ্ট 'ক্লাইনেফেল্টার সিনড্রোম', (খ) দৈহিক চরিত্রে অধিকাংশটাই পুরুষের ভরবিশিষ্ট 'এক্স এক্স. ওয়াই—মেল', (গ) দৈহিক চরিত্রে বেশি পুরুষ ও কম নারী ভর বিশিষ্ট 'এক্স. এক্স.—মেল সিনড্রোম', (ঘ) 'টার্নার সিনড্রোম' এবং (ঙ) 'মিক্সড গোণ্ডাল ডিস্‌জেনেসিস'। তাছাড়া প্রকৃত হিজড়াত্ব (ট্রু হারমাফ্রেডিটিজম) রয়েছে তিন ধরনের। হিজড়া হিসাবে ধরা হয় আরেক অংশকে যাঁরা পরিপূর্ণভাবে যৌন সক্ষম, কিন্তু যাঁদের লিঙ্গ ছেদন করে খোজা করা হয়। আর এক অংশ রয়েছে ছদ্মবেশী হিজড়া—যাঁদের মধ্যে পুরুষরা নারী সেজে থাকেন এবং নারীরা নারী-হিজড়ার অভিনয়মূলক জীবনযাপন করেন।

সারা বিশ্বে জন্মগত যৌন-প্রতিবন্ধীর হার প্রতি এক লক্ষে এক জন। এই ধরনের সন্তানের ক্ষেত্রে শৈশবের শুরুতে পরিবারে কোন সমস্যা না হলেও, বয়ঃসন্ধির কাল থেকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা তৈরি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, জন্মগত যৌন-প্রতিবন্ধীরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং স্থায়ীভাবে স্থান করে নেন সমগোত্রীয়দের পরিবারে বা সমাজে।

প্রায় সমস্ত দেশেই, বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকাতে, হিজড়ারা শহর বা গ্রামে বাস করেন স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে এবং নির্দিষ্ট এলাকায় এবং ভদ্র লোকালয় থেকে দূরে। সাধারণভাবে শ্রমজীবীদের এলাকা বা তার কাছাকাছি এঁদের বাস। তাদের সাথে এঁদের সম্পর্কও স্বাভাবিক ও অনেকটা হার্দ্য। কোন কোন দেশে এঁদের মধ্যে বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থাও রয়েছে। এঁদের সাজ-সজ্জায় যতই চাকচিক্য থাক না কেন, এঁরা সাধারণভাবে দারুণ দরিদ্র।

পৃথিবীর সর্বত্রই এঁরা নারী বেশধারী (ফিমেল ইউনাখ) এবং জীবনধারণে এঁদের প্রধান পন্থাই হলো গণিকাবৃত্তি করা। হিজড়াদের গণিকাবৃত্তির এই ব্যবস্থাকে অনেকে একধরনের সমকামিতা বলে ব্যাখ্যা করলেও, প্রকৃত সমকামিতা থেকে এই ব্যবস্থা স্বতন্ত্র এবং নিঃসন্দেহে এক ধরনের গণিকাবৃত্তিই। কেবলমাত্র ছদ্মবেশী হিজড়াদের প্রসঙ্গে অর্থাৎ যাঁদের যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক তাঁদের ক্ষেত্রে, বৃত্তটি সমকামিতা-মূলক। তবে, পাশ্চাত্যে পুরুষের বিপরীত সজ্জাকামী (ট্রান্সভেস্টাইট) ও যৌন-পরিবর্তনকামী (ট্রান্সসেক্সুয়াল) অংশের হিজড়ারা গণিকা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছেন। এঁদের উপার্জন তুলনামূলক ভাবে অন্য সমগোত্রীয় গণিকাবৃত্তির দ্বারা উপার্জনের চেয়ে বেশি। পারকিনস্‌ ও বেনেট-এর সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে পাশ্চাত্যের হিজড়াদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লিঙ্গ পরিবর্তন করানোর উদ্দেশ্যে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের ব্যয় সংগ্রহে জীবনের কোন না কোন সময় বেশ্যাবৃত্তিতে যুক্ত হন। প্রবল ব্যয়সাধ্য এই ব্যবস্থার সুযোগ অনুন্নত দেশগুলির ছদ্মবেশী হিজড়াদের গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। ভারত সহ এশীয় ও আফ্রিকীয় দেশগুলির কোন কোন সমাজ ও ধর্মীয় কিছু অনুষ্ঠানে এঁদের অংশত যোগ দেবার যে সুযোগ রয়েছে, তা' থেকে কিছু অর্থ ও জীবন ধারণের সামগ্রী পেলেও, তাতে নিয়মিত ভরণপোষণ হয় না। ফলে দেহোপজীবিকা এঁদের বেঁচে থাকার প্রধান সংস্থান। কোন কোন দেশে এঁদের বাড়ী-বাড়ী বা হাটে-বাজারে নিয়মিত তোলা তুলতেও দেখা যায়। তবে পাশ্চাত্যে এই প্রথা নেই। ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় শহরে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে ঘুরে এঁরা খরিদ্দার সংগ্রহ করে থাকেন। বেশিরভাগ দেশে প্রথাগত বেশ্যা-পট্টিতে বা স্বতন্ত্রভাবে এঁদের নিজেদের গণিকালয় আছে।

অর্থনীতির তিন প্রধান ক্ষেত্র—কৃষি, শিল্প ও পরিষেবাতে এঁদের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। তবে কোন কোন দেশে এঁরা কিছু ধরনের হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্প চালান ও তা' থেকে অংশত জীবনধারণ করেন। প্রধানত দেহ-বিক্রয়ে লিপ্ত থাকার জন্য এবং সর্বত্রই এই ব্যবসা বেআইনি থাকায়, আণ্ডারওয়ার্ল্ডের সাথে বেশি বেশি যুক্ত হয়ে পড়ছেন এঁরা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চোরাচালান, নেশা ও মাদকদ্রব্যের ব্যবসা, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, অপহরণ, খুন ইত্যাদি এঁদের উল্লেখযোগ্য অংশের জীবিকার প্রধান দিক। এমনকি কোন কোন দেশে এঁদের মধ্যে উদ্ভব ঘটেছে মাফিয়া ডন-এর, যারা যথেষ্ট ধনী এবং নিজেরা দল গঠন করে কাজ চালায়। সংখ্যায় কম হলেও ইথিওপিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান,

মায়নামার, সিঙ্গাপুর, মাদাগাস্কার প্রভৃতি দেশে একধরনের গোপন নিলাম-বাজার চালু আছে, যেখানে হিজড়াদের মালিকানার হাত বদল হয়—ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা দ্বারা। কার্যত এ' হলো এক ধরনের ক্রীতদাস প্রথা। এই ক্রয়-বিক্রয় প্রধানত হয় গণিকাবৃত্তি চালানোর প্রয়োজনে। অপুষ্ট লিঙ্গের শিশু পালন করে যুবক হওয়ার পর, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গৃহস্থ বাড়ী বা হাসপাতাল থেকে শিশু চুরি করে এনে অথবা ছদ্মবেশী হিজড়াদের পরিবারের পুরুষ সন্তানদের বীভৎসভাবে খোজা করে, তারপর তাদের বিক্রিও করা হয়। এই আদিম ও নির্দয় খোজাকরণে মৃত্যুর হারও ব্যাপক।

একদিকে দারুণ দারিদ্র্য এবং অন্যদিকে অস্বাভাবিক ও নির্বিচার যৌনাচারের ফলে এঁদের মধ্যে সমস্ত ধরনের যৌন রোগ ছাড়াও অন্যান্য মারাত্মক রোগ দেখা যায়—যেমন সিফিলিস, গনোরিয়া, ডোনোভানোসিস, ভেনারাল ওয়ার্টস, নন্-স্পেসিফিক টি. ইউ. আই., নন্-স্পেসিফিক প্রোকটাইটিস, হেপাটাইটিস বি-পজেটিভ, টিউবারক্যুলেসিস, এইডস, ক্যান্সার প্রভৃতি। বৃদ্ধ বয়সে এঁদের জীবন হয়ে ওঠে মর্মান্তিক। রোগ ও দারিদ্র্যের চাপে ভিক্ষাবৃত্তিই শেষ সম্বল হয়ে দাঁড়ায়।

হিজড়াদের সংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান পৃথিবীর কোন দেশেই পাওয়া যায় না। কেননা আদম সুমারির সময়ে এঁরা নিজেদের লিঙ্গত্ব গোপন রাখেন। অন্যদিকে ভোটের তালিকাতে সাধারণভাবে এঁরা নিজেদের নারী হিসাবে নথিভুক্ত করেন। আরও বিশেষত এই কারণে যে বহু দেশেই এঁদের ভোটাধিকার নেই। তবে এশীয় ও আফ্রিকীয় দেশগুলিতে এঁদের সংখ্যা নগণ্য নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, হিজড়া কল্যাণ সভা ভারতে ১৯৮৪-৮৬ সালে এঁদের সংখ্যা দেখিয়েছে মোট ৩,১৪,৮১৮ জন। এই সংখ্যা থেকে এঁদের আন্তর্জাতিক জনসংখ্যার কিছুটা অনুমান করা চলে। অর্থাৎ সংখ্যায় এঁরা খুব একটা নগণ্য নন।

সমাজ-বিজ্ঞানীরা যাঁদের বলেছেন 'ফ্রোজেন সেক্স', সেই হিজড়াদের সংগঠিত করার তথ্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পাওয়া গেলেও, এই শতাব্দীর সত্তরের দশকের পূর্বে নিজেদের দ্বারা নিজেদের সংগঠিত করার তেমন কোন সংবাদ জানা যায় না। এশীয় ও আফ্রিকীয় দেশগুলিতে খোজাকরণের নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে গত শতাব্দী থেকে উপনিবেশবাদী শাসকরা নানা ব্যবস্থা ও আইন রচনা শুরু করেছিল। পদানত দেশগুলির হিজড়াদের মধ্যে খ্রীস্টান পাদ্রীদের মানবতাবাদী কাজ করার তথ্য রয়েছে গত শতাব্দী থেকেই। এই শতকের সত্তরের দশক থেকে কিছু কিছু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান (এন.জি.ও.) এঁদের মধ্যে কাজ করছে। আশির দশক থেকে এশীয় দেশগুলিতে হিজড়াদের নিজস্ব নানা আঞ্চলিক সংগঠন ছাড়াও জাতীয় স্তরে সংগঠন তৈরি এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের রিপোর্টও রয়েছে। এখন প্রায় ২/১ বছর অন্তর নানা দেশে হিজড়াদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া অঞ্চল বা মহল্লা- ভিত্তিক সম্মেলনও হয় প্রায়শই। ১৯৮৭ সালে মধ্যপ্রদেশের বাদনগরে একটি বড় আকারের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের জাতীয় স্তরের সম্মেলনের দু'টি রিপোর্ট রয়েছে—২৪শে মে থেকে ৬ই জুন, ১৯৯২ পশ্চিমবাংলার হলদিয়ার দুর্গাচকে এবং ৩রা নভেম্বর '৯৫ থেকে সপ্তাহব্যাপী পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে। আশির দশক থেকে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক স্তরে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচনে হিজড়াদের প্রার্থী হওয়া। জাতীয় স্তরে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য না ঘটলেও স্বয়ংশাসিত বিভিন্ন সংস্থা বা মিউনিসিপ্যালিটির আসনে জয়ী হওয়ার বেশ কয়েকটি নজির সৃষ্টি হয়েছে। এইসব ঘটনাতে ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় দীর্ঘকাল বঞ্চিত হিজড়াদের মধ্যে।

হিজড়ারা সারা বিশ্বেই শ্রমজীবীদের অংশ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বিবিধ শোষণের শিকার। ভাষার বিশিষ্টতাকে শ্রমিকশ্রেণী ও সেটির বিভিন্ন অংশের পরিচিতির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করার যে তত্ত্ব আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের একাংশ উত্থাপন করছেন, সেই নিরিখে বলা যায় যে এঁদের কথ্য ভাষা সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকে সর্বত্রই স্বতন্ত্র। শ্রমজীবীদের সংগঠন ও আন্দোলনে এঁদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলে এঁরা অনেক সময়েই শাসকশ্রেণীর সঙ্গীতে পরিণত হচ্ছেন। যৌন অঙ্গের অসম্পূর্ণতাটুকু ছাড়া হিজড়ারা সবদিক থেকে স্বাভাবিক মানুষ ছাড়া আর কিছু নন। স্বভাবতই মানুষের অধিকারবোধ ক্রমশ সঞ্চারিত হচ্ছে এঁদের মধ্যেও। এঁদের সমস্যা নিয়ে এন. জি. ও.গুলি

যেমন তৎপর, সংবাদপত্রেও এঁরা এখন স্থান করে নিচ্ছেন। উপন্যাস, সিনেমা ইত্যাদিতেও এঁদের প্রসঙ্গ আসছে, চরিত্র হিসাবে এঁরা স্থান পাচ্ছেন। পাশাপাশি সমস্যা নিয়ে নিজেদের আলোচনা, দাবী উত্থাপন এবং সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের প্রচেষ্টাও কিছুটা শুরু করেছেন এঁরা। গণিকাদের সাথে নানা দিক থেকে মিল থাকার জন্য, এঁদের বেশ কিছু দাবী-দাওয়া গণিকাদের অনুরূপ। এটাও লক্ষণীয় যে বঞ্চিতের সমবেদনায় নিম্নবর্গের শ্রমজীবীরা, বিশেষত গণিকারা, সাধারণত অচ্ছুৎ হিসাবে দেখে না এঁদের; এঁদের সাথে সম্পর্ক ও মেলামেশাও তাদের বেশি। যে সামান্য তথ্য জানা যায় তাতে, দেশ-ভেদে এঁদের দাবীর মধ্যে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকলেও, অধিকার সম্পর্কিত দাবীগুলি মোটামুটি একইরকম। দাবীগুলি নিম্নোক্ত ধরনের : (১) হিজড়াদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি, (২) চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদির সুযোগ এবং সেজন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষণা ও অনুদান, (৩) বয়স্ক ও অসুস্থ হিজড়াদের সরকারী মাসোহারা প্রদান, (৪) বিনামূল্যে কন্ডোম সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, (৫) হিজড়া হিসাবে আদমসুমারিতে অন্তর্ভুক্তি, আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা, বিনা ভাড়াতে ট্রেনে-বাসে যাতায়াতের সুযোগ প্রভৃতি, (৬) সংগঠনের স্বীকৃতি।

বিশ্ব-সমাজে ক্রিয়াশীল অন্য কিছু প্রবণতা প্রসঙ্গে

তথাকথিত আধুনিকতার আগ্রাসনে সমাজিক বিভিন্ন শ্রেণীর প্রচলিত অবস্থান, ভূমিকা ও রূপও নানাভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। দৃশ্যত নেতিবাচক এইসব সামাজিক প্রবণতাগুলি হয়তো বর্তমানকালের শ্রেণী-দ্বন্দ্বের এক ধরনের রূপ। কিন্তু তা' এত জটিল ও সঙ্কুল যে সেগুলির অভ্যন্তরের প্রকৃতি চেনা প্রায় দুষ্কর। যাইহোক, কিছু অনুরূপ চরিত্রের সামাজিক প্রবণতা প্রথমে লক্ষ্য করা যাক।

ধর্ম, জাতি ও নৃতাত্ত্বিক জাতির ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজন ও সংঘর্ষের বিশ্ব-প্রক্রিয়া

ধর্ম (রিলিজিয়ন) ও জাতি (ন্যাশনালিটি) সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনা কয়েকশত বছর অতিক্রম করেছে। তুলনামূলকভাবে নৃতাত্ত্বিক জাতি (রেস) বিষয়ক বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা চলছে কার্যত দুই শত বছরের কম সময় ধরে। যদিও সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনার যে পটভূমি সংশ্লিষ্ট কালে ছিল এবং যে সমস্ত কাঠামোগত তত্ত্ব পূর্বে সৃষ্টি হয়েছিল, এই শতাব্দীর আশির দশক থেকে সেগুলির অনেক ওলট-পালট হয়ে গেছে।

বুর্জোয়া বিপ্লব ও বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্র (নেশন স্টেট) গঠনের মধ্য দিয়ে জাতি সমস্যার (ন্যাশনালিটি কোয়েশ্চেন) কিছুটা সমাধান ঘটেছিল। জাতি সমস্যা সমাধানের প্রধান সূত্রগুলি ছিল, সাধারণভাবে, মোটামুটি এক ধরনের ভাষা, সংস্কৃতি ও বাজারের ভিত্তিতে জাতীয় ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ ও সেটির অভ্যন্তরে বুর্জোয়া রাষ্ট্র-আরোপিত জনগণের ঐক্য গঠন। কিন্তু এই দেশ (নেশন) নির্ধারণের ব্যবস্থায় পুঁজির বা দেশের অভ্যন্তরে অন্য শক্তিশালী জাতির শোষণ থেকে অবশিষ্ট জাতিগুলি মুক্তি পায়নি। তার ফলে অবদমিত জাতিগুলির মধ্যে বহির্মুখীন বা বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা প্রথমাবধি সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপের কতকগুলি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, সংশ্লিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারগুলি পরিকল্পিতভাবে প্রতিটি জাতি-সত্তা বিকাশের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর জাতিগত বিরোধ ও সংঘর্ষ ঐসব দেশে ফেটে পড়েছে। তবে জাতি-সমস্যার প্রকোপ এখন তীব্র ও নতুন মাত্রা পেয়েছে সারা বিশ্বেই। ধর্ম, জাতি ও উপজাতি-অধিজাতি (নৃতাত্ত্বিক জাতি) প্রসঙ্গ একাকার হয়ে অভূতপূর্ব এক সংকট হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

মানব-সমাজের মূল্যায়নের প্রসঙ্গে নৃতাত্ত্বিক জীবন-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব-ভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক ধারণার মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। তাই নৃতাত্ত্বিক জাতি বিষয়ক বিজ্ঞানীরা (অ্যানথ্রোপলজিস্ট) সামাজিক-অর্থনৈতিক জাতি-ধারণার (ন্যাশনালিটির) কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকার সম্ভাবনাকে কার্যত অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে সমাজতাত্ত্বিকরা জাতিগত (রেসিয়্যাল) বিষয়টিকে নিছক বাস্তব অনুসন্ধানের একটি ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তার ফলে সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জাতির ন্যাশনালিটি বিষয়ে আলোচনার অন্তর্গত হয়েছে : (১) নৃতাত্ত্বিক জাতি (রেসিয়ালিস্ট সোসিওলজি)

যেহেতু মনে করে যে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সামাজিক অসাম্য জন্মগত সূত্রের ভিত্তিতে ঘটে আসছে, তাই সামাজিক অর্থনৈতিক মানদণ্ডে এই প্রসঙ্গের সত্যাসত্য নিয়ে বিচার; (২) উপজাতি বিদ্বেষ ও উপজাতি সমাজতত্ত্বকে যে সমাজ-কাঠামো ও মানসিকতা প্রশ্রয় দেয় সেই সমাজের মূল্যায়ন; (৩) যেসব কারণ সমাজের স্তরীকরণের প্রক্রিয়ায় সামাজিক কাঠামোকে লম্বভাবে ও সমান্তরালে খণ্ডকরণ করে থাকে, সামাজিক শ্রেণী ও জাতীয়তার উপর সেগুলির প্রভাব; (৪) জাতি ও জাতি বিদ্বেষের ঐতিহাসিক উদ্ভব ও বিকাশে উপনিবেশবাদ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী প্রক্রিয়ার ভূমিকা (৫) শ্রম-বাজারের অভ্যন্তরে জাতিগুলির অবস্থান; (৬) বর্তমানে বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে জাতিগুলির মধ্যে অসাম্যের কার্যকারণ। তবে সাম্প্রতিককালের এসব বিষয়ে প্রধান বিতর্ক হলো, সমাজিক স্তরীকরণের প্রক্রিয়ায় নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব কি একটি স্বতন্ত্র উপাদান ও মাত্রা অথবা প্রসঙ্গটিকে মর্যাদা (স্ট্যাটাস), প্রতিপত্তি (প্রেস্টিজ) ও সামাজিক শ্রেণী বিষয়ক উপাদানের নিরিখে বিবেচনা করা উচিত। কেননা অতীতে প্রাধান্যকারী সংস্কৃতির মানদণ্ডে ও কর্তৃত্বকারী জাতিগুলির দৃষ্টিতে নৃতাত্ত্বিক জাতির প্রসঙ্গটি বিচার করার ফলে সমাজতাত্ত্বিকদের উল্লেখযোগ্য অংশ কার্যকালে সংখ্যালঘু শ্বেতকায় জাতির মনোভাবের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তার ফলে জাতি-সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্ণীত হয়নি।

অন্যদিকে ধর্মের বিষয়ে আলোচনায় দু'টি প্রধান দিক লক্ষ্য করা গেছে ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে— (১) সামাজিক ব্যবস্থার সংরক্ষণে ধর্ম কিভাবে অবদান যোগায়? (২) ধর্ম ও ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে সম্পর্ক কি? দিক দু'টির বিশ্লেষণ করে অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে শিল্পগত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে ধর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও অনুগামিতা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে; ফলে সমাজের বাঁধুনি আক্রান্ত হবে। সমাজের বাঁধন আক্রান্ত হওয়ার ফলে যে নৈরাজ্য সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেবে, সেই সুযোগে ধর্ম বিকৃত তাৎপর্য নিয়ে আবির্ভূত হতে চাইবে। কিন্তু নব্বই-এর দশকে পৌঁছে সমাজতাত্ত্বিকদের পূর্ববর্তীকালের ভাবনা সমূলে দারুণভাবে নাড়া খেয়েছে নতুন বাস্তবতার তীব্র ও ব্যাপক আঘাতে। ধর্ম নিছক ধর্মের ভূমিকা পালনের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক আন্দোলন ও ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার এবং রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে আন্তঃ ও অন্তঃ-সামাজিক সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে ধর্ম। তাছাড়া রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে ধর্মের অভ্যুদয়, ধর্ম ও জাতি এবং ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক জাতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, ধর্মের আন্তর্জাতিকতাবাদ ও ঐক্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু ধর্মের দুই মেরুর ভূমিকা এবং ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তার (ন্যাশনালিটি) পরিচিতি ইত্যাদি নতুন দিকগুলি ধর্ম-বিষয়ে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া, একদিকে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে হাতিয়ার ও অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার অন্যতম উপাদান হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার, শ্রেণী-ভিত্তির পরিবর্তে ধর্মকে সামাজিক বিভাজনের অন্যতম প্রধান মানদণ্ড হিসাবে প্রচার এবং ধর্মগত দ্বন্দ্বের ছদ্মাবরণ শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ধর্মের দ্বারা জাতীয়তা (ন্যাশনালিটি) ও নৃতাত্ত্বিক জাতির (রেস) পরিচয় প্রসার, প্রদান ইত্যাদি অবিশ্বাস্য সব প্রক্রিয়াও চলছে।

এইভাবে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান আকর্ষণকারী, ব্যাপক, বিতর্কিত, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ও ভয়ানক আদর্শগত গঠন হিসাব ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি দিকগুলি উপস্থিত হয়েছে। কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে বর্তমান দশকের বিশ্ব-রাজনীতির কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হলো ধর্ম—যাকে বলা হচ্ছে 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন' বা সভ্যতার সংঘর্ষ। আবার কেউবা একে বলেছেন 'মডার্ন হেট' বা ঘৃণার আধুনিক রূপ, যা মাত্রা ও ব্যাপকতার দিক থেক ঠাণ্ডাযুদ্ধের যুগের গতি, অবাধ্যতা ও ব্যাপকতাকে ছাড়িয়ে গেছে। এখন ধর্ম-ভিত্তিক পরিস্থিতি, প্রসঙ্গ ও ক্ষেত্রের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে; ধর্মের স্তরে নতুন নতুন বিস্ফোরণ ও ঘটনাবলী সৃষ্টি করছে বিশ্ব-প্রতিক্রিয়া, শত্রুতা ও অন্যদিকে সমঝোতাও। পরম্পরাগত ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত মতবাদ, তৎপরতা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শত্রুতায় অবতীর্ণ হয়েছে পূর্বোক্ত প্রবণতাগুলি। শ্রেণী-ভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা তথা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শ্রেণী-সংগ্রাম, স্বাধীনতা, মানবাধিকার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার

সংঘর্ষের ব্যাপ্তি বিশ্বময় হয়েছে। অতীতের নানা ধরনের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ (কালচারাল ন্যাশনালিজম) তা' নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, জাতি, অতীত ঐতিহ্য-ভিত্তিক বা অন্য যাই হোক না কেন, তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত শ্রেণী-সংগ্রামের জানিত রূপগুলির সাথে বর্তমানের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ও সাংস্কৃতিক প্রবণতার ও সংঘর্ষের রূপের প্রভূত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেসব দেশে বা এলাকায় নৃতাত্ত্বিক জাতি ও ধর্ম প্রসঙ্গ একাকার হয়ে বিরোধ বা সংঘর্ষ চলছে সেগুলির 'অ্যানগ্রো-রিলিজিয়াস' বা নর-ধর্মীয় চরিত্র গড়ে উঠেছে। ধর্মের সংকীর্ণতাকে কিছুকাল পূর্বে যেভাবে 'ফাণ্ডামেন্টালিস্ট' বা মৌলবাদী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হতো, এখন সেই খণ্ডিত ধারণার মধ্যে আবদ্ধ থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে, যে কারণে সমাজতাত্ত্বিকদের কোন কোন অংশ প্রবণতাটিকে সাধারণভাবে 'অ্যান্টি-মডার্নিজম' বা প্রতি-আধুনিকতাবাদ বলে অভিহিত করেছেন। তবে এটা লক্ষণীয় যে এই প্রবণতাগুলি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করলেও আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের (নেশন স্টেট) রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে—এটা সব সময় সত্য নয়। তথাকথিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বাহক এই 'নিউ রিলিজিয়াস রেভোলিউশনারি' বা 'নতুন ধর্মীয় বিপ্লবীরা' জাতীয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোর খুব বেশি সমালোচক বা বিরোধী নয়, যতটা উগ্র বিরোধী সেটির অভ্যন্তরের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পিছনে যুক্তিযুক্ততা, রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি ও রাষ্ট্র কেন সমাজের আনুগত্য অর্জন করবে ইত্যাদি বিষয়ে এদেরও এক ধরনের উদ্বেগ আছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ (ন্যাশনালিজম) কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতার (সেকুলারিজম) ভিত্তিতে যথার্থভাবে গঠিত হতে পারে—এই মতবাদকে পাশ্চাত্য থেকে ধার করা, কৃত্রিম ও আরোপিত বলে ঘোষণা করে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এঁরা। আবার একই সাথে, এরা জাতীয় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে কোন অসঙ্গতি খুঁজে পায় না, অবশ্য তা' যদি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সামাজিক চুক্তির (সোস্যাল কন্ট্রাক্ট) দ্বারা গঠিত না হয়। এদের দাবী সমগ্র সমাজের জনগণের মধ্যে রাষ্ট্র সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি গঠিত হতে হবে সংশ্লিষ্ট দেশের ধর্মের পরম্পরাগত নীতিসমূহের দ্বারা। ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ, এদের মতে, এক ধরনের ধর্ম এবং তা' ধর্মই কেবল নয়, তা' একান্তভাবে পশ্চিমি। এই 'পশ্চিমি' উপাদানকে এরা ব্যাখ্যা করে যে ঐ দেশগুলি হলো খ্রীস্টধর্মাবলম্বী এবং রাষ্ট্রগুলি হলো খ্রীস্টান রাষ্ট্র, সুতরাং প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রগুলি ধর্মনিরপেক্ষ নয় এবং পৃথিবীতে প্রচারিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা হলো 'ওয়েস্ট টক্সিফিকেশন' বা পশ্চিমি মাদকাসক্তি কিংবা 'ওয়েস্টোম্যানিয়া' বা পশ্চিমি বায়ুগ্রস্ততা। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ইসলামবাদীরা পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষ প্রবণতাসমূহকে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতন্ত্রীদের এরা শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে, কেননা এরা মনে করে বিশ্ব-শত্রু 'পশ্চিম'-এর সাথে যোগসাজগে তারা কাজ করে। সর্বোপরি সমাজতন্ত্রীদের এরা মনে করে ধর্ম-বিদ্বেষী।

এই ধরনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় এরা যুক্তি হিসাবে তোলার চেষ্টা করে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও দৃশ্যমান বাস্তবতাকে। উপনিবেশবাদ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশ পশ্চিমী গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছিল। জনগণ আশা করেছিল সমাজের সার্বিক উন্নতির। কিন্তু কার্যকালে সম্পূর্ণ বিপরীতটি ঘটেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ ও শাসকশ্রেণী-সৃষ্ট সংকটের বোঝা জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার তৎপরতা মানুষের মোহভঙ্গ ঘটাতে শুরু করে—যাকে বলা হচ্ছে 'ফলেন এঞ্জেল সিন্ড্রোম' বা পরীর মর্তে পতনের লক্ষণ (চৈতালি রাতের স্বপ্নভঙ্গের লক্ষণ)। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীরা জনজীবনে এই বিপর্যয় ও সংকটের কারণ হিসাবে পুঁজিবাদকে চিহ্নিত না করে দোষারোপ করে পশ্চিমী গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে। এরা পাশ্চাত্য সমাজে প্রবাহিত অবিবাহিত মাতৃত্ব, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বর্ণবৈষম্য, মাদকাসক্তি ইত্যাদি সামাজিক ক্ষতিকর উপসর্গগুলিকে উত্থাপন করে নিজেদের ধর্মীয় নীতিকে উন্নত হিসাবে প্রমাণ করার জন্য; বোঝানোর চেষ্টা করে যে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরিণামে এইসব ঘটে চলেছে; সুতরাং ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এইসব অপকারী সামাজিক ব্যাধিগুলিকে নির্মূল করা যাবে। অথচ উৎপাদনের ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদকে

তারা আন্তরিকভাবে সমর্থন করে এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে এই ধর্মীয় শক্তির মূল উদ্গাতা ও নেপথ্য নেতারা হলো পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর একাংশ। এই দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত নিজেদের অভিপ্রেত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মতবাদকে রাজনৈতিক পরিভাষাতে তারা বলতে চায়—'আইডিওলজি অব অর্ডার'—নৈরাজ্য থেকে সমাজকে শৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠার মতবাদ।

ইসলাম, হিন্দু, শিখ, ইহুদী ইত্যাদি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একাধিক সম-ধর্মীয় জাতীয় রাষ্ট্রকে জড়িত করে এক অতিরাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সেকারণে নিজেদের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে আশু লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে তারা সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হিসাবে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানাকে অতিক্রম করার ঘোষণা রাখে। তাদের কাছে জাতির অর্থ একটাই—ধর্ম। সুতরাং এক ধর্মাবলম্বী মানুষ যদি সংলগ্ন একাধিক দেশ জুড়ে বসবাস করে তবে সেই সমগ্র এলাকা জুড়ে একই রাষ্ট্র গঠিত হওয়া উচিত যে কারণে 'প্যান-ইসলাম'-এর ধারণা প্রস্তাবিত হয়েছে দীর্ঘকাল পূর্ব থেকে।

ইসলাম-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একটি দেশে অভ্যুদয় অন্য ইসলাম অধ্যুষিত দেশে দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে। ১৯৭৯ সালে ইরানের শা'র বিরুদ্ধে আয়াতুল্লা খোমেইনির নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মীয় বিপ্লব ও সাফল্য, যেসব দেশে শিয়াপন্থী মুসলমানরা রয়েছে (যেহেতু ইরান শিয়াপন্থী দেশ) সেখানে তৎক্ষণাৎ তীব্র উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, যেমন লেবানন, ইরাক, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে। ১৯৮৯ সালে সুদানে লেফটেনান্ট জেনারেল ওমর হাসন আমেদ বসিরের নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর (নেপথ্যে আসল ধর্মীয় নেতা ছিলেন হাসান আবদুল্লা তুবারি) আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, নাইজিরিয়া, চাদ ও জর্ডনেও অনুরূপ ইসলামী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সৌদি আরব, কুয়েত ও উপসাগরীয় অন্যান্য আমিরশাহী দেশগুলিতে ইসলামী রাষ্ট্র আগে থেকেই রয়েছে।

আশির দশক থেকে, ইসলামী উগ্র ধর্মবাদী সংগঠন সন্ত্রাস বিস্তার শুরু করেছে আলজিরিয়াতে। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তারাই জয়ী হয়। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি, ধর্মনিরপেক্ষ জনগণ ও সামরিকবাহিনী ধর্মীয় মৌলবাদের এই অভিযানকে মেনে নেয়নি। 'ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট'ও নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা ক'রে পূর্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা নিবৃত্ত হয়নি। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে আলজিরিয়ার বিভিন্ন অংশে ঐ সন্ত্রাসবাদীরা নতুন করে ও পূর্ণোদ্যমে সশস্ত্র আক্রমণ ও বেপরোয়া গণহত্যা সংঘটিত করেছে। অবৈধ ঘোষিত 'ইসলামী রেনেসাঁ পার্টি' ও 'নাদা মুভমেন্ট' তিউনিসিয়া এবং জর্ডনে যথেষ্ট সক্রিয় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জর্ডনে 'মুসলিম ব্রাদারহুড' বৃহত্তম দল হিসাবে জয়ী হয়। লেবাননে শিয়াপন্থী মুসলমান ও খ্রীস্টানরা—উভয়েই নিজেদের লেবাননের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী বলে দাবী করে পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত ও সশস্ত্র সংঘর্ষ করে চলেছে অব্যাহতভাবে। তুরস্ক ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও সেখানে ঐতিহাসিক কারণেই সুদীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমি সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিদ্যমান। নব্বই-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে সেখানেও ইসলাম ধর্মীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটতে থাকে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরোধিতা এবং ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার শ্লোগান ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তুলে শেষোক্ত শক্তি জয়ী হয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। মিশরে ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতের হত্যাকাণ্ড উগ্র ধর্মান্ধদের দ্বারা সংঘটিত হয়। এরা অনেকগুলি গণ-হত্যাকাণ্ডও ঘটায় ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সেখানে সরকারের প্রয়াস থাকলেও প্রবল চাপের মুখে ইসলাম ধর্মীয় ব্যবস্থার কিছু কিছু দিক শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা শুরু হয়েছে।

ইজরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টিই হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে—ইহুদী ধর্ম। ইজরায়লের রাষ্ট্রীয়, আইনি, সামাজিক ইত্যাদি ব্যবস্থার ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে ইহুদী-ধর্মীয় নির্দেশাবলী বা প্রথা। প্রথমাবধি সেখানকার সরকারের উপর জিওনবাদী সাম্প্রদায়িক দল ও অজস্র গোষ্ঠীগুলির কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তারা ইসলামী আরব দুনিয়ার সাথে যে কোন ধরনের সমঝোতার তীব্র বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছে। সুদীর্ঘকাল জুড়ে আরব জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিশ্ব-জনমতের চাপে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে আমেরিকার সহায়তায় ইজরায়েল সরকার ইয়াসের আরাফাতের নেতৃত্বাধীন 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন

অরগানাইজেশন'-এর (পি. এল. ও.) সাথে প্যালেস্টিনীয়দের জন্য স্বশাসিত ভূখণ্ড মেনে নিয়ে চুক্তি করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু জিওনবাদী ধর্মান্ধ শক্তি তা' মেনে নেয়নি। এখন মুসলমান ও ইহুদীদের ধর্মস্থান নিয়ে, বিশেষত জেরুজালেম নিয়ে, পুনরায় বিরোধ ও সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ইজরায়েলে ধর্মীয় কট্টরপন্থী শক্তি জয়ী হওয়ায় এই বিরোধিতা তীব্র হয়েছে এবং চুক্তি অমান্য করতে শুরু করেছে ইজরায়েল সরকার। অন্যদিকে স্বশাসিত প্যালেস্টাইনে পি. এল. ও.-বিরোধী কট্টর ইসলামী ধর্মান্ধ শক্তির দাপটও ক্রমে বেড়ে উঠেছে। পি. এল. ও.-ইজরায়েলের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথে সমগ্র এলাকা জুড়ে এরা দাঙ্গা সংঘটিত করে। দাঙ্গাকারীরা কেবল ইহুদীদের ও ইজরায়েল সরকারের বিরোধিতা করেনি, পি. এল. ও.-র ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরোধিতা এবং নতুন স্বশাসিত এলাকায় ইসলামীয় ব্যবস্থা পত্তনের দাবীও তুলেছে। ইজরায়েল রাষ্ট্রের সীমানার ভিতরে এই ভূমিকা গ্রহণ করেছে প্রধানত ইসলামবাদী 'কাছ পার্টি ও 'গাস এমুনিম' এবং নতুন গঠিত রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনে 'হামাস'। তাছাড়া ইসলামবাদী অন্যান্য সক্রিয় সংগঠনগুলির হলো আল-জুজাম্মা আল-ইসলামী, হারাকাৎ আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া প্রভৃতি।

পাকিস্তান রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল এবং অনতিকালের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সেখানে প্রধান সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি হলো জামিয়াত-আল উলামা-ই-ইসলাম, জামিয়াত আল উলামা-ই-পাকিস্তান, ইসলামী জামহুরি ইত্তেহাদ প্রভৃতি। শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষে বিগত কয়েক বছরে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে সেখানে।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ রাষ্ট্রীয় স্তরে গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীকালে সামরিক শাসনে সেখানে কট্টর মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী সংগঠনগুলির বিস্তার ঘটতে শুরু করে। নির্বাচনে খালেদা জিয়া জয়ী হওয়ার পর বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সাম্প্রাদয়িক শক্তিগুলি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাস্ত এবং আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও সাম্প্রদায়িক শক্তির তীব্র প্রচার আন্দোলন ও হামলা অব্যাহত রয়েছে। দেশে সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীও মাঝে মাঝে ইসলাম ধর্মান্ধদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মান্ধ উগ্র শক্তির আক্রমণের অপর লক্ষ্য হলো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাক্‌মা উপজাতি সম্প্রদায়। ইসলাম মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রায় ১ লক্ষ চাক্‌মা শরণার্থী ভারতের পূর্বাঞ্চল—ত্রিপুরা প্রদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন ক'রে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভারত রাষ্ট্র। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেই হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান প্রভৃতি অংশের উগ্র ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠনের অভ্যুদয় ঘটেছিল। স্বাধীনতার আগে ও পরে ভারতে অজস্র ছোট-বড় বা অঞ্চল-ভিত্তিক হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-শিখ ইত্যাদি দাঙ্গা ঘটেছে। আশির দশক থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি—রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর. এস. এস.), বিশ্ব-হিন্দু পরিষদ (ভি. এইচ. পি.), রাজনৈতিক দল—ভারতীয় জনতা পার্টি (বি. জে. পি.) ও শিবসেনা, গণসংগঠন—বজরঙ দল ইত্যাদির ভূমিকা ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে। এরা ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করতে এবং প্রধানত ইসলাম-বিদ্বেষ প্রচার করে জঙ্গী অভিযান শুরু করে। পাশাপাশি পাঞ্জাবে শিখ উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির সক্রিয় আর্বিভাবও ঘটে এই সময়ে। আশি ও নব্বই-এর দশকের প্রথমার্ধ জুড়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অজস্র ঘটনাবলী, বিধ্বংসী সন্ত্রাস ও দাঙ্গার ফলে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে ভারতে। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসংখ্যা অধ্যুষিত কাশ্মীরের অবস্থান নিয়ে সমস্যা ভারতে স্বাধীনতার প্রায় জন্ম-লগ্ন থেকে সঙ্গী হয়েছে। প্রধানত কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তিনবার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার জন্য একাংশ এবং স্বাধীন

কাশ্মীর রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে অপরাংশ ইসলাম মৌলবাদীরা প্রচণ্ড সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু করেছে। এতেও কয়েক সহস্র মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নৃ-গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতাবাদী যে তৎপরতা পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু হয় তাতে নেপথ্যে সক্রিয় খ্রীস্টান সাম্প্রদায়িকতা। অবস্থার চাপে উত্তর-পূর্বাঞ্চল অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত হওয়ার পরও নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মণিপুর এবং ক্রমে আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহত। এছাড়াও নৃ-জনগোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতার তৎপরতা ছড়িয়ে পড়েছে ঝাড়খণ্ড, গোর্খাল্যাণ্ড, উত্তরাখণ্ড, ছত্রিশগড়ী ইত্যাদি নামের নানা শাখা-প্রশাখাতে। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাবরি মসজিদ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে হিন্দু মৌলবাদীরা। তারপর সারা দেশে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে, যাতে নিহত হয় শত শত মানুষ। এই ঘটনার প্রবল প্রভাব বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষত মুসলমানদের বসবাস আছে যেসব দেশে। পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ নানা দেশে হিন্দু মন্দির আক্রান্ত হয়। এর পর থেকে দেশে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে বি. জে. পি.-র রাজনৈতিক প্রভাব। ১৯৯৬ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে এরা একক সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে আবির্ভূত হয়ে কেন্দ্রে জোট সরকার গঠন করেছে। সংখ্যাগুরু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়ায় এবং প্যান-ইসলামিক মতবাদের প্রভাবে ও শেষোক্ত ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলির নেপথ্য মদতে, ভারতের অভ্যন্তরে ইসলাম মৌলবাদও মাথা চাড়া দিচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় বা প্রদেশে নানা নামে ও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে।

শ্রীলঙ্কাতে সাম্প্রদায়িকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে দু'দিক থেকে—ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দু ও খ্রীস্টান সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের দ্বারা। শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী পূর্বোক্ত সংখ্যালঘুরা নিজেদের একদিকে চরম অবহেলিত ও অন্যদিকে স্বতন্ত্র জাতি বলে নিজেদের মনে করে থাকে। অন্যদিকে দেশের অবশিষ্টাংশের সংখ্যাগুরু সিংহলী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা রাষ্ট্রের দ্বারা উপেক্ষিত বলে দাবী করে। শেষোক্তদের এই মনোভাবের পিছনে কারণ হিসাবে দেখানো হয় যে দেশের সরকার ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার নামে সিংহলীদের তথা বৌদ্ধদের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে। এমনকি তারা মনে করে যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ফলে দেশীয় মূল ধর্ম—বৌদ্ধধর্ম প্রবলভাবে আক্রান্ত। সুতরাং তাদের দাবী হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেশ থেকে সমূলে উচ্ছেদ ও বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের আন্দোলন সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় চরিত্রের নয় ঠিকই, কিন্তু তামিল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র—'তামিল ইলম'-এর দাবী তুলেছে;এতে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে হিন্দু ও খ্রীস্টান ধর্মীয় আত্ম ও জাতীয় পরিচিতির আকাঙ্ক্ষা।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নেতৃত্বে সেখানে সাম্প্রদায়িক সংগঠন—'জনথা বিমুক্তি পরামুনা'র (জে.ভি.পি.) আবির্ভাব ঘটে। ব্যাপক যুবসমাজকে তারা সমাবেত করতে সক্ষম হয়। মধ্য-আশির দশক থেকে এরা শ্রীলঙ্কার প্রধান রাজনৈতিক দল—শ্রীলঙ্কার ফ্রিডম পার্টি ছাড়াও কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি এবং হিন্দুদের উপর বিক্ষিপ্তভাবে চোরাগোপ্তা আক্রমণ শুরু করে দেয় এবং বহু মানুষকে হতাহত করে। শ্রীলঙ্কা সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে ঐ দশকের মধ্যেই জে. ভি. পি. কে দমন করলেও উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তিশালী সামরিক অভ্যুত্থান শুরু করে। ১৯৯৩ সালের মে দিবসে এরা রাষ্ট্রপতি প্রেমদাসাকে হত্যা করে। ভারতের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকেও এরা খুন করে ভারতের মাটিতে। তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জাফনাকে রাজধানী করে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার স্বাধীন সরকার হিসাবে ঘোষণা করার পর শ্রীলঙ্কার সরকার এদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আক্রমণে এবং গৃহযুদ্ধে ইতোমধ্যে নিহত হয়েছে প্রায় এক লক্ষ নাগরিক, এল. টি. টি. ও সেনা।

আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কালে দেশ থেকে পলাতক প্রতিবিপ্লবীদের নিয়ে একদিকে আমেরিকা ও পাকিস্তান ও অন্যদিকে ইরান আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করেছিল। দেশের গণতান্ত্রিক সরকারকে ধর্ম-বিদ্বেষী বলে প্রচার করে এই পলাতকদের নিয়ে ধর্ম-উদ্ধারের বাহিনী গঠন ও সরকারের

বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়। ১৯৯২ সালে ইরান ও পাকিস্তানের দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত আফগানিস্তানকে দখল করে এরা। দখলদারদের অন্যতম ছিল জামিয়াত-ই-ইসলামী, হেজেব-ই-ইসলামী, মুজাহিদিন, তালিবান প্রভৃতি গোষ্ঠী। দখলদারী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে ইসলামী ব্যবস্থার পত্তন করা হয়। দখলদারী সামরিক শক্তি ও ইসলামী ধর্মান্ধরা প্রাক্তন সরকার-সমর্থক ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রায় ৩০ হাজার মানুষকে খুন করে। কিন্তু গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ চলতে থাকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলে হত্যাকাণ্ডও থামেনি। ১৯৯৬ সালে তালিবান গোষ্ঠী রাজধানী কাবুলসহ দেশের তিন-চতুর্থাংশ দখল করে। রাষ্ট্রসংঘের আবাসে আশ্রয়ে থাকা সত্ত্বেও, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ নাজিবুল্লাহকে ধর্মান্ধরা জোর করে বের করে এনে প্রকাশ্য রাস্তায় ফাঁসিতে ঝোলায়। দেশের উত্তর প্রান্তে হটে যাওয়া সরকারী বাহিনীর সাথে তালিবানদের যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

মায়নামারে (প্রাক্তন বার্মা) বার্মা সোস্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টির বিরুদ্ধে মধ্য-আশির দশক থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আন্দোলন শুরু করেছিল। এই আন্দোলন আসলে পরিচালিত হতে থাকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে। বার্মা-থাইল্যাণ্ড সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি তৈরি করে, ১৯৮৮ সালে, সরকার-সমর্থক মানুষদের বিরুদ্ধে তারা সংঘটিত করে ব্যাপক আক্রমণ ও দাঙ্গা। শেষ পর্যন্ত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মায়নামারকে বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার দাবী ওঠে। পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে শ্রীমতি আউঙ্ সান সু কি-র সমর্থনে দাঁড়ায় কট্টরপন্থী বৌদ্ধরা। শ্রীমতি সু কি নির্বাচনে জয়ী হলেও,সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলে আমেরিকার প্রচ্ছন্ন মদতে ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে সেখানে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে প্রধান ভূমিকা নিতে থাকে এই ধর্মান্ধ শক্তি।

১৯৯১ সালে কম্বোডিয়াতে অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির মধ্যে শান্তির চুক্তি সম্পাদন কার্যকালে যেখানে উগ্র বৌদ্ধবাদের জন্ম দিয়েছে। একথা ঠিক যে প্রধানমন্ত্রী হুন সেন ও প্রিন্স নরোদম সিহানুকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অতীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, কিন্তু একদা সমাজতান্ত্রিক পথের অনুসারী ও ধর্মনিরপেক্ষ কম্বোডিয়াতে এখন বৌদ্ধ উগ্রবাদী আন্দোলন গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে।

থাইল্যাণ্ডে আশির দশকের শেষার্ধ থেকে সামরিক শাসনের অবসান, ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য বর্জন ও বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে দেশকে ঘোষণার দাবীতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল। ছামলঙ্ শ্রিমভাং-এর নেতৃত্ব ১৯৯২ সালে বৌদ্ধদের দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামার অন্যতম পরিণতিতে দেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। তারপর থেকে বৌদ্ধ ধর্ম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এরা শুরু করেছে। অন্যদিকে থাইল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশে 'পাট্টানি ইউনাইটেড লিবারেশন অর্গানাইজেশন' ও 'বারিসান ন্যাশনাল রেভোলিউসি' নামে দু'টি কট্টর ইসলামিক সাম্প্রদায়িক সংগঠনের নেতৃত্বে পাট্টানি, যালা, নারথিওয়াত ও সুতন প্রদেশগুলির স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে শুরু করেছে চোরাগোপ্তা আক্রমণ ও সন্ত্রাস।

মালয়েশিয়াতে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন 'পার্টি ইসলাম সে মালয়েশিয়া' ও অন্যান্য ইসলামিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি রাষ্ট্রে ধর্মের প্রতিষ্ঠার দাবী তুলে আন্দোলন চালাচ্ছে। এরা প্রধানত সেখানকার সংখ্যালঘু চীনা বৌদ্ধ জনসাধারণের বিরুদ্ধেই পরিচালিত করছে এই আন্দোলনকে।

১৯৪৯ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম জাতীয়তাবাদ 'দারুল ইসলামে'র দাবীতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এসিচ অঞ্চলে ইসলাম হলো বিচ্ছিন্নতার মতবাদ। নব্বই-এর দশকে সুহার্তো সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির বিরুদ্ধে এদের আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে এবং ১৯৯২-এর নির্বাচনে এদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট পার্টি প্রভৃত জনসমর্থন পায়।

ফিলিপাইনস-এর দক্ষিণ দ্বীপ মিনডানাও-কে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র 'বাংসা মোরো হোমল্যাণ্ড' হিসাবে ঘোষণার দাবীতে উগ্র ইসলামবাদী সংগঠন—'মোরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট'-এর নেতৃত্বে

আন্দোলন চলছে। অন্যদিকে উত্তর দ্বীপে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান উগ্রবাদীদের নেতৃত্বে দেশকে খ্রীস্টান দেশ হিসাবে ঘোষণার দাবীতে গড়ে উঠেছে আন্দোলন। উভয় আন্দোলনই বিশ্বের সংশ্লিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায় ও সংগঠনের পক্ষ থেকে নেপথ্যে নৈতিক, আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য পাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ড খণ্ড হয়ে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমান-অধ্যুষিত নতুন রাষ্ট্রগুলিতে ইসলাম ধর্মান্ধতা প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৮৮ সাল থেকে এইসব অঞ্চলে প্রবল ধর্মীয় উন্মাদনার সূত্রপাত ঘটেছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ১৯৮৮ সালে সমগ্র উজবেকিস্তানে যেখানে মোট ৮০টি মসজিদ ছিল, ১৯৯১ দেশটির মোট ১২টি অঞ্চলের এক একটিতে ১০০০-এর বেশি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়; সমগ্র মধ্য এশিয়াতে ১৯৯১ সালে গড়ে প্রতিদিন ১৫টি করে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। ১৯৯০ সালে তাজিকিস্তানের সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে নিজস্ব টেলিভিশন নেটওয়ার্ক তৈরি করে ধর্মপ্রচার শুরু হয় এবং সৌদি আরব সরকার ১০ লক্ষ কোরান এই দেশে বিতরণ করে। এই রকম পরিস্থিতিতে তথাকথিত তাজিকিস্তানের প্রাক্তন কমিউনিস্ট নেতৃত্বের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের ডাক দেন। বিপরীতদিকে মৌলবাদী 'ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টি' ডাক দেয় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তোলার। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে ধর্মবাদীদের তীব্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট নেতা রাখামান নাবিয়েভ ক্ষমতাচ্যুত হন। নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পুনরায় কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ফেরে। কিন্তু ১৯৯২-এর মে মাসে সশস্ত্র ধর্মীয় বাহিনী পুনরায় ক্ষমতা দখল করে। ডিসেম্বর '৯২তে পুনরায় সংগ্রাম চালিয়ে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে। এরপর থেকে পরস্পরের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলছে।

কাজাখাস্তানে নৃ-গোষ্ঠী হিসাবে রাশিয়ান ও কাজাখরা সংখ্যায় প্রায় সমান। ফলে মুসলিম ধর্মান্ধতা ততটা কার্যকরী ভূমিকা এখনও নিতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম মোল্লাদের নেতৃত্বে 'আলাস পার্টি' ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন চালাচ্ছে। কিরঘিজস্তানের ধর্মান্ধ শক্তি ও সংস্কারপন্থী কমিউনিস্টরা মিলিতভাবে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত করেছে। ফারগানা উপত্যকায় উগ্রবাদী ধর্মান্ধরা অত্যন্ত শক্তিশালী সশস্ত্র। তুর্কেমেনিস্তানে উগ্র ধর্মান্ধ আন্দোলন ও প্রভাব সমগ্র গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সেখানে তারা সরকারকে উপেক্ষা করে ধর্মীয় ব্যবস্থা চালু করেছে। এই সমস্ত দেশের ইসলামপন্থীরা সমবেতভাবে অতীতের তুর্কীস্তান তথা মধ্য-এশীয় সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী তুলেছে এবং মধ্য-প্রাচ্যের আরব মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত সংগঠনের চরিত্রে ফেব্রুয়ারী ১৯৯২-তে ইরান, তুরস্ক, পাকিস্তান, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান মিলিত-ভাবে গঠন করেছে 'দা ইসলামিক কমন মার্কেট'।

সমাজতান্ত্রিক মঙ্গোলিয়াতে অতি দ্রুত শুরু হয়ে যায় এই ধরনের প্রক্রিয়া। মঙ্গোলিয়া জনগণের ধর্ম তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্ম। এই সময় থেকে মহাযান শাখার বৌদ্ধ উগ্রবাদ তীব্রতা লাভ করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে শুরু করে ব্যাপক আন্দোলন। ডিসেম্বর, ১৯৮৯তে রাজধানী উলান বাটোরের মূল সরকারী দপ্তরের সামনে এদের সুবিশাল জমায়েতের পর সরকার দ্রুত নতি স্বীকার করা শুরু করে। উগ্র বৌদ্ধবাদীদের সংগঠন 'মঙ্গোলিয়ান পিপলস্ রেভোলিউশনারি পার্টি' (এম. পি. আর. পি.) গঠিত হয়। ১৯৯০ সালের মার্চের নির্বাচনে এরা বিপুলভাবে জয়ী হয় এবং ১৯৯২ সালে গৃহীত নতুন সংবিধানে মঙ্গোল জাতীয়তাবাদ ও বৌদ্ধ ধর্মকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করিয়ে নেয়। গানদান বৌদ্ধ মঠ দেশের রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং যেখান থেকে কেবল স্বদেশে নয় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংঘ গড়ে তোলার নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। তিব্বত থেকে পলাতক ধর্মগুরু দলাই লামা এই কাজে নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছেন।

সমাজতান্ত্রিক চীনের অভ্যন্তরে স্ব-শাসনের দাবী যেসব অঞ্চলে উঠেছে, সেখানে তার পিছনে অংশত ধর্মীয় উপাদান রয়েছে। চীনের সীমান্তের সাথে সংলগ্ন কাজাখাস্তান ও কিরঘিজ এবং চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের কাসগর অঞ্চলের উইগুর জনগোষ্ঠী (যারা ১৯৯০ সালে চীন সরকারের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করেছিল) মিলিতভাবে দাবী তুলেছে স্বাধীন 'ইসলামিক রিপাবলিক অব ইস্ট তুর্কিস্তান'র।

১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালের প্রথমার্ধে শেষোক্ত অঞ্চলে ইসলাম মৌলবাদীদের দ্বারা সংঘটিত দাঙ্গাতে ২০০-র বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সামরিকবাহিনী দিয়ে হস্তক্ষেপ করে এই দাঙ্গা বন্ধ করতে হয়েছে এবং ১৫ জন নেতাকে ঝোলাতে হয়েছে ফাঁসিতে। অন্যদিকে বিদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী দলাই লামার প্ররোচনায় আশির দশক থেকে লামাদের নেতৃত্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তিব্বতে ক্রমাগত সংঘর্ষ ও দাঙ্গা ঘটিয়েছে—চীন থেকে তিব্বতের বিচ্ছিন্নতার দাবীতে। এতে নিহত হয়েছে কয়েক হাজার মানুষ।

পোল্যাণ্ডের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটানোর পিছনে সেখানকার রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রবল ভূমিকার কথা পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তি হিসাবে ১৯৯০ সালের নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল চার্চ। কমিউনিস্ট পার্টি-বিরোধী নতুন শাসকদের পক্ষে চার্চের সমর্থন সুদৃঢ় হতে থাকে। সারা দেশে ধর্মীয় ব্যবস্থাই কেবল প্রবর্তিত হয় না, পোলিশ জাতীয়তাবাদের প্রমাণ রাখতে সাধারণ মানুষের চার্চে যাওয়া অনেকটা বাধ্যতামূলক করা হয়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও ১৯৯৬-এর নির্বাচনে ওয়ালেসার পরাজয় ও প্রাক্তন কমিউনিস্টদের বিজয় ঘটেছে।

ডিসেম্বর ১৯৮৯-তে রোমানিয়ায় নিকোলি চসেস্কুর সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটাতে অর্থডক্স চার্চের অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে অভিযোগ উঠতে থাকে যে সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু রোমানিয়ান উনিয়েট চার্চ ও সদস্যদের উপর অর্থডক্স চার্চ ব্যাপক নির্যাতন শুরু করছে।

নৃ-গোষ্ঠীগত ও জাতীয়তা-ভিত্তিক বিরোধ থেকে প্রাক্তন চেকোশ্লোভাকিয়া ভেঙে চেক ও শ্লোভাক আলাদা দু'টি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে খণ্ড খণ্ড দেশে পরিণত হওয়ার পর মুসলিম ধর্মাবলম্বী অংশের সাথে খ্রীস্টানদের রক্তাক্ত সংঘর্ষ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ কেবল খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সংঘর্ষ চলছে খ্রীস্টানদের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও। কেননা সার্বরা প্রধানত অর্থডক্স খ্রীস্টান, অন্যদিকে ক্রোট ও শ্লোভেনরা প্রধানত রোমান ক্যাথলিক। ক্রোয়েশিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রধান নেতা ক্যাথলিক চার্চ। অন্যদিকে বসনিয়া-হারজেগোভিনা প্রদেশ সার্ব, ক্রোট ও মুসলমানদের নিয়ে গঠিত। ১৯৯২ সাল থেকে জাতি ও ধর্মীয় সশস্ত্র দাঙ্গা ও যুদ্ধে এখানে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। আলবেনিয়াতে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মীয় সংগঠনগুলি; এখন তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে রক্তাক্ত সংঘর্ষ শুরু করেছে, যদিও ১৯৯৭-এর নির্বাচনে প্রাক্তন কমিউনিস্টরা ভালভাবেই জয়ী হয়েছে। লাটভিয়াতে ধর্মীয় আন্দোলন আগস্ট, ১৯৯১ থেকে প্রবল তীব্রতা পায়। ইস্টার্ন অর্থডক্স চার্চ, জর্জিয়ান অর্থডক্স চার্চ, আর্মেনিয়ান এপস্টলিক চার্চ ও অন্যান্য চার্চগুলি লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি এলাকায় প্রধানত ভূমিকা নিতে থাকে। ইউক্রেনের ক্ষেত্রেও জনজীবনে অর্থডক্স চার্চ এখন সর্বময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলাম, হিন্দু, জিওনবাদ প্রভৃতি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের যে স্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান বিশ্বে দেখা যাচ্ছে, অনুরূপ দিকগুলি খ্রীস্টান সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এটির অস্তিত্ব রয়েছে অত্যন্ত সবলভাবেই। দেশে দেশে এগুলির রূপ ভিন্নতর। খ্রীস্টান ধর্মান্ধতার বিচরণ এমন সন্তর্পণে, যে সব সময় এটিকে ঠিকমত অনুধাবনও করা যায় না। কেননা ইসলাম যেমন ধর্মীয় ব্যবস্থা ছাড়াও স্বয়ং এক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা সম্বলিত দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রিশ্চানিটি তা' নয়। তার ফলে ইসলামের মত জাতীয়তাবাদ-ভিত্তিক মনোলিথিক বা ঘনবদ্ধ রূপ ক্রিশ্চানিটিতে পাওয়া যায় না। এর প্রতিফলনে, খ্রীস্টান সাম্প্রদায়িকতাকে ইসলাম ধর্মান্ধতার মত সর্বজনীন বা প্রায় একই রূপে চিহ্নিত করা কঠিন।

এইসব সত্ত্বেও এবং খ্রীস্টান ধর্মান্ধতার ব্যাপক ও দীর্ঘ অতীতে ইতিহাসের উল্লেখ না করেও বলা যায় যে চার্চের পক্ষ থেকেই আধুনিক খ্রীস্টান সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি এসেছে। ১৯৬৩ সালে ভাটিকানে পল-সিক্সথ আসীন হওয়ার পর ১৯৬৮ সালে তাঁর রচিত 'হিউম্যানেই ভিটেয়ি' পুস্তকে

তিনি সরাসরি গোঁড়া ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ালেন। এটির ভিত্তিতে ১৯৭১ সালে চার্চ-অনুশাসনের পরিবর্তন ঘটানো হলো। তাতে ঘোষণা করা হলো যে গর্ভপাত হলো হিংসাত্মক অপরাধ, কেননা ভ্রূণ-হত্যা মানে নর-হত্যা। সুতরাং এই কাজ কেউ করলে তার শাস্তি খ্রীস্টান ধর্ম থেকে বহিষ্কার। এই সমস্ত ঘটনা সমগ্র ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের খ্রীস্টান মৌলবাদীদের উৎসাহিত করে তোলে। সত্তরের দশক থেকে খ্রীস্টান মৌলবাদী আন্দোলন শুরু হয়ে যায় ইউরোপে।

১৯৭২ সাল থেকে আমেরিকার চার্চগুলির গোঁড়া বিশপরা গর্ভপাতের বিরুদ্ধে কমিটি গঠন করে শুরু করে প্রচার। কিন্তু ২২শে জানুয়ারী '৭৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট 'রো বনাম ওয়েড' মামলার রায়ে গর্ভপাত প্রসঙ্গকে ব্যক্তির নিজস্ব ও গোপন বিষয় এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনুচিত বলে ঘোষণা করলো। এই ঘটনা ঘৃতাহুতি ঘটালো পরিস্থিতিতে। মৌলবাদী খ্রীস্টানরা আন্দোলনকে ব্যাপক করে তুললো এবং প্রবল চাপ সৃষ্টি করলো রাজনৈতিক দলগুলির উপর—সংবিধান সংশোধনের জন্য। রাষ্ট্রীয় স্তরে এ'বিষয়ে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর, রাজ্যগুলিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভপাতের বিরুদ্ধে নানা আইন রচনার জন্য বা প্রচলিত আইনগুলি যাতে অকার্যকর হয়ে পড়ে সেজন্য নানা প্রয়াস শুরু করে মৌলবাদীরা। মধ্য-সত্তরের দশকে পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে শিশু-পাঠ্য কিছু বই-এর অংশ খ্রীস্টানবিরোধী ঘোষণা করে বইগুলি ও স্কুল বয়কট আন্দোলন শুরু করে তারা। 'নিউ ক্রিশ্চিয়ান রাইট' নামে সারা দেশে সংগঠন গড়ে ওঠে এবং ১৯৭৫ সালে এরা প্রকাশ করে 'প্যাস্টোরাল প্ল্যান ফর প্রো-লাইফ'। ১৯৮০ ও ১৯৮৪ সালে রিপাব্লিকান পার্টির কনভেনশনে এরা গর্ভপাতের পক্ষের বিচারকদের নিয়োগ বন্ধ করার দাবী মঞ্জুর করাতে সক্ষম হয়। প্রেসিডেন্ট রেগন 'রো বনাম ওয়েড' মামলার গর্ভপাতের পক্ষে রায়দানকারী তিনজন বিচারককে অপসারণ করেন। জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মনোভাবাপন্ন বেশ কয়েকজন প্রার্থীর বিচারক পদে নিয়োগ বাতিল করা হয়। রেগন প্রশাসন ১৯৮০ সালে গর্ভসঞ্চারের বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেবার অধিকার বন্ধ করেন ('গ্যাগ্ ল' বলে পরিচিত)। অল্পবয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা তাদের যে কোন একজনের অনুমতি ছাড়া গর্ভপাত বন্ধ, গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেবার পর এক মাস বাধ্যতামূলকভাবে অপেক্ষা করা, রাষ্ট্রসঙ্ঘের পপুলেশন ফাণ্ডের (জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যবস্থার জন্য তহবিল) সদস্যপদ থেকে ১৯৮৫ সালে আমেরিকার নাম প্রত্যাহার এবং ঐ সংস্থাকে প্রতিশ্রুত বছরে ৪৬ মিলিয়ন ডলার সাহায্য বন্ধ, প্রভৃতি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এইভাবে আমেরিকার সরকার খ্রীস্টান মৌলবাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে (বিল ক্লিন্টন ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমত এগুলি প্রত্যাহার করেন)। পাশাপাশি আমেরিকাতে শ্বেত জাতিগুলি খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়ায় এবং সেখানে আফ্রিকান-আমেরিকান তথা কৃষ্ণবর্ণের বিরুদ্ধে অঘোষিত বর্ণ-বিদ্বেষ জারি থাকায় সেখানে নৃ-গোষ্ঠীজাত বিরোধ একইসাথে ধর্মীয় বিরোধে পরিণত হয়েছে। খ্রীস্টান শ্বেত জাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে আফ্রিকান-আমেরিকানরা মধ্য-ষাটের দশক থেকে ব্যাপকভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের মানুষদের মধ্যে মাঝে মাঝেই দাঙ্গা সেখানে অব্যাহত। কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলন কখনো কখনো বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়ছে। শ্বেত জাতি তথা খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে কার্যত অনুসৃত এই আন্দোলনকে কখনো 'সিভিল লিবার্টিজ মুভমেন্ট', কখনো বা 'হিউম্যান রাইটস মুভমেন্ট' বলা হচ্ছে। এই আন্দোলনের পিছনে মতাদর্শকে চিহ্নিত হচ্ছে 'ব্ল্যাক-কনসাসনেস' বা কৃষ্ণ-চেতনা হিসাবে। ১৯৯৬ সালে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ আফ্রিকান-আমেরিকানদের বিক্ষোভ-সমাবেশ।

'প্রো-লাইফ মুভমেন্ট' তথা উগ্র খ্রীস্টানবাদীদের পক্ষ থেকে গর্ভ-নিরোধ ও গর্ভপাত-বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর রূপ নিয়েছে নব্বই-এর দশকে। আমেরিকাতে বিগত দু'টি সাধারণ নির্বাচনে খ্রীস্টান ধর্মবাদীরা প্রসঙ্গটিকে রাজনৈতিক স্তরে প্রবলভাবে উত্থাপনও করেছে। খ্রীস্টান ধর্মবাদীরা দাবী তুলেছে সমস্ত স্তরের পাঠ্যসূচীতে বাইবেল শিক্ষা চালু করার।

কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, ইউরোপের ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, ব্রিটেন, জার্মানি প্রভৃতি দেশেও 'প্রো-লাইফ' ধর্মান্ধ আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। খ্রীস্টধর্মের ক্যাথলিক শাখাতে পুরুষদের

বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকলেও নারীদের সেই অধিকার নেই। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন দেশে ক্যাথলিক শাখার মধ্যে, বিগত দেড়শ বছরে, নারীদের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। এখন তা' প্রত্যাহার করার দাবী তুলেছে ক্যাথলিক শাখার চার্চ ও ধর্মান্ধরা। গর্ভপাত-বিরোধী আন্দোলন তো ইংলণ্ডে যথেষ্ট শক্তিশালী।

১৯৯৫ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড পপুলেশন সামিট'-এ মুসলিম ও খ্রীস্টান ধর্মান্ধরা একযোগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জন্মনিরোধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

আমেরিকা, মেক্সিকো ও লাতিন আমেরিকার কিছু দেশে আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের (রেড ইণ্ডিয়ান) জাতি-সত্তা প্রতিষ্ঠা, হৃত জমি ফিরিয়ে দেওয়া প্রভৃতির দাবী বাড়ছে ও আন্দোলনগুলি জনসমর্থন পাচ্ছে। সংখ্যায় অতি নগণ্যতে পরিণত হওয়া ছাড়াও, বর্তমানে এদের নৃ-গোষ্ঠীগত অস্তিত্বই বিপন্ন। এদের সমর্থনে আন্দোলন করছে কিছু কিছু 'নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন' (এন. জি. ও.)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নব্বই-এর দশকে কয়েকটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্প্রতি কয়েক বছর যাবৎ কুইবেক প্রদেশ কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবী তুলেছে। সাধারণভাবে কানাডা ইংরাজী-ভাষী দেশ হলেও, কুইবেক প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ফরাসী-ভাষী। শেষোক্তরা মনে করে যে তাদের জাতি-সত্তা আক্রান্ত। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সেখানে গণভোটে রায় দিয়েছে। কানাডার সংবিধান পরিবর্তন করে কুইবেক প্রদেশের জন্য কিছু বিশিষ্ট অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হলেও, বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা আদৌ নির্বাপিত হয়নি সেখানে।

আয়ারল্যাণ্ডের জাতি-সত্তার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশদের রোপিত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ এখন ধীরে ধীরে মহীরুহের রূপ ধারণ করেছে। অন্যদিকে ভ্রান্ত পথে এর মোকাবিলা করতে 'আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি' (আই. আর. এ.) ১৯৭৩ সাল থেকে ব্রিটেনের মূল ভূখণ্ডে পাল্টা আক্রমণ, সন্ত্রাস ও অন্তর্ঘাত শুরু করে। ফলে এতে প্রায় তিন হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর আয়ারল্যাণ্ড তথা আলস্টারের সংখ্যালঘু রোমান ক্যাথলিকদের উপর শুরু হয়েছে সংখ্যাগুরু প্রোটেস্টান্টদের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। দীর্ঘ অতীতে অবলুপ্ত প্রোটেস্টান্ট সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদী 'আলস্টার ভলান্টারি ফোর্স (ইউ. ভি. এফ.) কয়েক বছর আগে পুনর্গঠিত হয়েছে এবং পাশাপাশি আর একটি অনুরূপ সংগঠন—'আলস্টার ফ্রীডম ফাইটার্স' গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু রোমান ক্যাথলিক চার্চের মদতে ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টি খোদ ব্রিটেন থেকে সেনাবাহিনী আনিয়ে শুরু করেছে একধরনের রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস। এইভাবে আয়ারল্যাণ্ডে জাতীয়তার জন্য সুদীর্ঘকালের সংগ্রামের পাশাপাশি নতুন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সংঘাত সেখানে হয়েছে শুরু।

লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশে, বিশেষত এল সালভাডোর, গুয়াতেমালা ও নিকারাগুয়াতে বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে খ্রীস্টীয় চার্চ ও খ্রীস্টান গোঁড়াপন্থীরা রাজনৈতিক স্তরে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। "বিপ্লব ও ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা" এদের প্রধান শ্লোগান। লক্ষণীয় হলো যে, এই দেশগুলিতে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ-পৃষ্ঠপোষিত একনায়কত্বমূলক সরকারের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল ছিল এবং সেইসব সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামও ছিল অব্যাহত। জাতীয়তাবাদীদের সংগ্রামে চার্চ এক এক দেশে এক এক রকম ভূমিকা নিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বলা যায় যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত পরিণতি পাওয়ার পর, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রাজনীতি ও রাষ্ট্রে এখন চার্চের প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর দিকে নজর দিলে এটা স্পষ্ট হবে যে সারা দুনিয়ায় জাতীয়তা ও উপজাতি সমস্যার সাথে ধর্মীয় উগ্রতা মিলে মিশে কেবল একাকার হয়নি, যেখানেই উগ্র ধর্মান্ধতার আবির্ভাব ঘটেছে সেখানেই শ্রমজীবীদের সংগঠন ও আন্দোলন এবং সামাজিক অংশের মধ্যে বিশেষত নারীরা সাধারণভাবে আক্রান্ত হয়েছে। সমস্ত প্রবণতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার যে উপাদান, তাতে রয়েছে শ্রেণী-চেতনাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রবল দিক। মুসলিম, খ্রীস্টান, হিন্দু, ইহুদী ইত্যাদি প্রত্যেকটি ধর্মান্ধ আন্দোলনের মধ্যে এই প্রবণতা একইরকমভাবে তীব্র।

নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন (এন. জি. ও.)

নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন (এন. জি. ও.) বর্তমানে আবির্ভূত হয়েছে এক বিশ্বজনীন ব্যবস্থা হিসাবে। বর্তমানে একে 'অরগানাইজেশন' বা সংগঠন হিসাবে বিচার করা ছাড়াও এক ধরনের 'সিস্টেম' বা প্রণালী বলা যায়। সমাজ-বিজ্ঞানীদের একাংশ এন.জি.ও. কে অভিহিত করেছেন 'থার্ড সেক্টর' বা তৃতীয় ক্ষেত্র বলে। 'স্টেট সেক্টর' বা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের এবং 'প্রাইভেট সেক্টর' তথা বেসরকারী ক্ষেত্রের পাশাপাশি আবির্ভূত হয়েছে এন. জি. ও.সেক্টর তথা থার্ড সেক্টর। সরকারী ক্ষেত্রের সমান্তরালে অথচ একই সাথে সরকারী ও বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রের সমন্বিত ব্যবস্থার নাম এন. জি. ও.। কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, সাংবিধানিক ব্যবস্থা, মুদ্রা প্রচলন, বৈদেশিক নীতি ও সামরিক দিকটি বাদে অন্য প্রত্যেকটি দিকে যেমন অর্থনীতি, পরিকল্পনা, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য, বাণিজ্য, উন্নয়ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি, এমনকি রাজনৈতিক স্তরেও এন. জি. ও.দের ভূমিকা এখন ক্রমবর্ধমান। বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার দুর্বল দেশগুলিতে পুঁজির বেসরকারী ভূমিকা দুর্বল হওয়ায়, সেই শূন্যতা পূরণে এন.জি.ও.দের ভূমিকা বাড়ছে। অন্যদিকে জাতীয় বেসরকারী পুঁজির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উন্নত দেশগুলির বেসরকারী পুঁজির অনুপ্রবেশের অন্যতম বাহন হয়ে উঠেছে এন. জি. ও.। অতীতে কেবলমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূতএন. জি. ও.-র ভূমিকা এখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে এন. জি. ও. প্রসঙ্গ এখন সুবিস্তৃত। স্বভাবতই এন.জি.ও. সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিজ্ঞ, পরিকল্পক, বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি অংশের আকর্ষণ বেড়েছে এবং এন. জি. ও.-র বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ও মূল্যায়ন চলছে। অতি সংক্ষেপে কিছু দিক উল্লেখ করা যেতে পারে।

ষাটের দশকের শেষার্ধের এন.জি.ও. কে আর্থিক লাভে অনিচ্ছুক সংগঠনের এক মডেল হিসাবে তুলে ধরেছিলেন 'সাবসিডি-থিওরি' বা 'ভর্তুকি-তত্ত্বে'র প্রবক্তরা। তাঁরা মনে করেছিলেন যে বিভিন্ন সংস্থা ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক কল্যাণের কাজে, এন.জি.ও.গুলিকে ক্রমবর্ধমান অর্থদানের পেছনে দাতাদের ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক স্বার্থ থাকে। কেননা সাবসিডি তথা ভর্তুকি দেওয়ার পদ্ধতিতে এই দান করার জন্য দাতা-প্রতিষ্ঠানের ট্যাক্স-হিসাব থেকে ঐ পরিমাণ অর্থ বাদ যায় এবং প্রতিষ্ঠানের 'আফটার-ট্যাক্স কস্ট' কম হয়। ডোনেশনের মাধ্যমে প্রদত্ত এই আর্থিক বিনিয়োগ বাড়তি পুঁজির যোগান সৃষ্টি করে। তাছাড়া দানকারী সংস্থা ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত অর্থে এন.জি.ও.রা যে কাজ সম্পাদন করে, তা' রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পন্ন হলে সমপরিমাণ ভর্তুকি দিতে হত সরকারকে, পরিণামে প্রদত্ত সমপরিমাণ সংগ্রহ করতে হতো জনগণের কাছ থেকেই। সুতরাং এন.জি.ও.-র মাধ্যমে উন্নয়নে বিনিয়োগ লাভজনক, লাভজনক জনগণের পক্ষেও। এন.জি.ও. সম্পর্কে এই সময়ে গড়ে ওঠা আর একটি তত্ত্ব ছিল 'পাবলিক গুডস থিওরি' বা জন-প্রয়োজন সাধন তত্ত্ব। এঁদের মতে, জনগণের অপূর্ণ থাকা চাহিদার অংশ পরিপূরণ করতে পারে এন.জি.ও.। সরকার ভোটারদের সর্বজনীন কতকগুলি চাহিদা পূরণ করে। কিন্তু জনগণের চাহিদা থেকে যায় এর বাইরেও। এগুলি পূরণ করতে পারে এন.জি.ও.। অপর একটি তত্ত্ব দাঁড়িয়েছিল যাকে বলা হতো 'কন্ট্রাক্ট ফেইলিওর থিওরি' তথা চুক্তি ব্যর্থতার তত্ত্ব। প্রয়োজনীয় সাধারণ পণ্যসামগ্রী ও পরিষেবা সরবরাহ বা হিতকর কাজ সম্পাদনের জন্য কন্ট্রাক্ট পায় সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা। এই কন্ট্রাক্টরি প্রথায় অনেক ক্ষেত্রে ফাঁকি বা বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার নাও ঘটতে পারে। জনগণের পক্ষেও সব সময় বিষয়গুলিতে নজরদারি সম্ভব হয় না, তাছাড়া ঐসব কাজে খুঁটিনাটি বা জটিলতা অথবা সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বা দক্ষতা-বিষয়ক জ্ঞান সাধারণ মানুষের থাকে না। এন.জি.ও.-র যেহেতু লাভ করার চেষ্টা থাকে না এবং কাজের বিষয়ে তাদের উপযুক্ত জ্ঞান ও পারদর্শিতা থাকে, সেহেতু তারা একদিকে বিকল্প এজেন্সি হিসাবে ভাল কাজ করতে পারে অন্যদিকে একই সাথে জনগণের পক্ষে তারা করতে পারে কাজের তদারকি; কেননা, তারা জনগণের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনকে জনগণ পছন্দ করবে বেশি। এই

সময় অপর আর একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছিল—'কনজিউমার কন্ট্রোল থিওরি' বা ভোক্তা নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব। এঁদের মতে, সমাজের এমন বিভিন্ন উন্নত অংশ থাকে যাদের ভোগের চরিত্র ও ধরন অন্যান্যদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বহুলাংশে ভিন্ন। এই অংশের চাহিদা ও ভোগ সব সময়, এমনকি কখনই পূরণ করতে পারে না বাজার বা সরকার। এন.জি.ও. এই অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পারে দু'ভাবে—প্রথমত, পূর্বোক্ত অংশের চাহিদা পূরণে ভূমিকা নিয়ে, দ্বিতীয়ত সাংগঠনিকভাবে ও প্রচারের সাহায্যে ঐ অংশের ভোক্তার চরিত্র ও চাহিদার অনেকটা পরিবর্তন সাধন করে অন্যান্য ভোক্তাদের চাহিদার সাথে সমতা সৃষ্টি করে। সত্তরের দশকের শুরু থেকে উন্নত দেশগুলির কিছু কিছু এন. জি. ও.-র সাথে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক দেশে দেশে প্রধানত দারিদ্র্য দূরীকরণের যৌথ প্রকল্প গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। ১৯৮১ সালে 'এন.জি.ও.-র সাথে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় 'এন.জি.ও.-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক কমিটি' গঠনের মাধ্যমে। ১৯৮৭ সালের জুলাইতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এন.জি.ও.-র সাথে সহযোগিতার নীতিগত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। ১৯৮৮ সালে এন.জি.ও.দের ভূমিকা পালন সম্পর্কে ও.ই.সি.ডি. প্রকাশ করে 'ভলান্টরি এইড ফর ডেভেলপমেন্ট'। এন.জি.ও.-র বিষয়ে এই আনুষ্ঠানিক এবং পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের দীর্ঘ ১৫ বছর আগে থেকে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক সারা বিশ্বে পরীক্ষামূলক নানা ধরনের কর্মসূচী ও প্রকল্প নির্মাণ শুরু করেছিল। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের তৎপরতায় আরও কিভাবে এন.জি.ও.দের ব্যবহার করে প্রসারিত করা যায় সে বিষয়ে সমীক্ষা করা ছাড়াও, এই ধরনের ব্যবস্থাবলীর ফলে দেশে দেশে জনগণের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে তা' যাচাই করাও ছিল এই ধরনের প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্য। কাজগুলির 'টার্গেট' ছিল জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ। এইভাবে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে এন.জি.ও.দের দিয়ে এই পরীক্ষার স্তর রূপায়িত হয়েছিল। তিন ধরনের এন.জি.ও. কে এইসব কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল: (ক) ইন্টার-ন্যাশনাল এন.জি.ও., (খ) ইণ্ডিজেনাস ইন্টারমিডিয়ারি এন.জি.ও. এবং (গ) গ্রাস-রুটস এন.জি.ও.। এই তিন ধরনের মধ্যে (ক) অংশকেই, সর্বাধিক ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির এন.জি.ও.-গুলিকে। সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে তৃতীয় দুনিয়ার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য ঘোষণা করে উন্নত দুনিয়ার ইন্টারন্যাশনাল এন.জি.ও.গুলি নিজস্ব উদ্যোগ নিচ্ছিল। শর্ত এবং নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে বাধ্য করে এই এন.জি.ও.গুলি তৃতীয় দুনিয়ায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কাজ শুরু করে। নিজেরা সরাসরি কাজ করার পাশাপাশি নর্থ বা উন্নত দুনিয়ার এন.জি.ও.গুলি 'সাউথ' বা অনুন্নত দুনিয়ার দেশীয় এন.জি.ও.-র মাধ্যমেও কাজ করেছিল। উন্নত দুনিয়ার এন.জি.ও.গুলির তহবিল প্রধানত সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত হলেও স্বীয় রাষ্ট্রেরও দান সেখানে থাকতো। সাহায্য কম দিলেও রাষ্ট্র অন্যদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অনুন্নত দেশের সরকারকে এন.জি.ও.দের নিজেদের শর্ত মেনে নেওয়ার জন্যও নানা পদ্ধতিতে চাপ দেওয়ার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে উন্নত দেশের সরকারগুলি। উন্নত দেশগুলির কতকগুলি এন.জি.ও. যেগুলি ইন্টারন্যাশনাল, বর্তমানে ট্রান্স ন্যাশনাল এন.জি.ও. হিসাবে পরিচিত এবং তৃতীয় দুনিয়ায় কাজ করছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—সি.এ.আর.ই. (কেয়ার), প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড ভিশন, অ্যাকশন এইড, সেভ দা চিলড্রেন, অক্সফাম, ক্রিশ্চিয়ান এইড, সি.এ.এফ.ও.ডি. (কাফোড), এন.ও.ভি.আই.বি. (নোভিব), জার্মানি ও স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলির চার্চ এজেন্সিগুলি (চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিস, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইত্যাদি), কনসার্ন, রেড ক্রস, মেডিসিনস সানস্, ফ্রান্টিয়ারিস, নিডা, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, কেয়ার (কো-অপারেটিভ ফর আমেরিকান রিলিফ এভরিহয়ার), সিডা (কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি), প্যাক্ (পার্টনারশিপ আফ্রিকা-কানাডা), স্যাপ (সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ), জাপানের 'সাসাকওয়া পীস ফাউণ্ডেশন' ইত্যাদি।

বিশ্বব্যাপী নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনের সংখ্যার সরকারী ও প্রামাণ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কেননা এন.জি.ও. সম্পর্কে স্বীকৃত কোন আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা কার্যত নেই। তাছাড়া সমাজ

জীবনের সমস্ত মূল ও সহ-ক্ষেত্র জুড়ে অজস্র ধারাতে বিচিত্র ও অভিনব ধরনের সংগঠন এখন নিত্য গড়ে উঠছে। ১৯৮০ সালে ইউনাইটেড নেশনস-এর 'ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনফরমেশন' এন. জি. ও.-কে সংজ্ঞায়িত করেছিল : "সরকারের অংশ এবং সরকারের সাথে চুক্তির দ্বারা গঠিত নয় এমন বহু সংগঠনই হলো নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পেশাদারদের সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, চেম্বার অব কমার্স, যুব সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রবীণ নাগরিকদের সমিতি, ভ্রমণকারীদের সংঘ, ব্যক্তিগত অছি পর্যদ, রাজনৈতিক দল, জায়নবাদী সংস্থা, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক লগ্নিকারী সংস্থা এবং অন্যান্য বেসরকারী চরিত্রের সংগঠন।" মোটামুটি এই মাপকাঠিতে বিশ্বব্যাপী উন্নত দেশগুলির এন. জি. ও.দের ব্যাপ্তির কিছু তথ্য দেখা যেতে পারে।

১৯৮৪-৮৫ সালের 'ইয়ারবুক অব ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন' প্রদত্ত হিসাবে উন্নত দেশগুলির ইন্টারন্যাশনাল এন. জি. ও.-র সংখ্যা ছিল ৭,১০৯টি এবং আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করে এমন এন. জি. ও.-র সংখ্যা ৫,৫৭৭টি। ও. ই. সি. ডি.-র ১৯৮৮ সালের ডাইরেক্টরি অনুযায়ী 'ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি-র (ডি. এ. সি.) সদস্য দেশগুলির ৪,০০০ বেশি এন. জি. ও. আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কর্মসূচীতে যুক্ত ছিল, যেগুলির সংখ্যা ১৯৮১ সালে ছিল ১,৭০২টি। ঐ বছর জাপানের অনুরূপ কাজে যুক্ত এন. জি. ও.-র সংখ্যা ছিল ১৭৪টি। আমেরিকাতে অভ্যন্তরীণ কাজে যুক্ত এন. জি. ও.-র সংখ্যা ১৯৮৮ সালে ছিল ৮,৭৩,০০০টি। সুইডেনের হিসাবে দেখা যায় যে অতীব সংকীর্ণ জনবসতি (৫ হাজার থেকে ১০ হাজারের মধ্যে) পিছু ১০০টি করে এন. জি. ও. ছিল। ১৯৮১ সালে ফ্রান্সে এন. জি. ও.-র সংখ্যা ছিল ৩,০০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০ মধ্যে এবং সেখানে প্রত্যহ গড়ে ১০০টি করে নতুন এন. জি. ও.র উদ্ভব ঘটে চলেছিল।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনগুলির ব্যাপক প্রভাব বৃদ্ধির পাশাপাশি ঘটে চলেছিল সেগুলির সাংগঠনিক জালের এবং তথ্য-সঞ্চালন ব্যবস্থার ব্যাপক বৃদ্ধি। উন্নত দেশগুলির আন্তর্জাতিক এন. জি. ও.গুলি নিউইয়র্ক, জেনিভা, ব্রাসেলস, প্যারিস, বন, লণ্ডন, মিলান ইত্যাদি শীর্ষ নগরীগুলিতে সুবিশাল ও সর্বাধুনিক ব্যবস্থাসম্বলিত দপ্তর পরিচালনা করে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং হার্ড ও সফ্‌ট ওয়ারের সুলভ মূল্যের ফলে এগুলি গঠন করতে থাকে নিজস্ব আন্তর্জাতিক ইলেকট্রনিক যোগাযোগ-মাধ্যম ও তথ্য-জাল। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে, পরিবেশ বিষয়ক এন. জি. ও.গুলি যেসব ইলেকট্রনিক বিশ্ব-প্রচার-যোগাযোগ জাল তৈরি করেছে সেগুলির কয়েকটি হলো আই. জি. সি. (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), গ্রীননেট (ইংলণ্ড), পেগাসুস্ (অস্ট্রেলিয়া), ওয়েব (কানাডা), নিকারাও (নিরাকাগুয়া), নর্ডনেট (সুইডেন) ও অলটারনেক্স (ব্রাজিল)। তাছাড়া, মে, ১৯৯০-তে ৭টি নেটওয়ার্ক নিজেদের মধ্যে এক সমবায় গঠন করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য দেশে নতুন ও বিপুলায়তন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এইভাবে সাংগঠনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে ব্যাপক সংখ্যক দেশের মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করছে তারা;গড়ে উঠেছে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোগ্রেসিভ কমিউনিকেশন' (এ. পি. সি.)। ১৬টি দেশের পরিবেশ বিষয়ক এন. জি. ও.-র দ্বারা গঠিত ঐ কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের অন্তর্গত নেটওয়ার্কগুলি হলো : ওয়ামানি (আর্জেন্টিনা), পেগাসুস্ (অস্ট্রেলিয়া), অলটারনেক্স (ব্রাজিল), ওয়েব (কানাডা), ইক্যুয়ানেক্স (ইকুয়েডর), কমলিঙ্ক (জার্মানি), লানেতা (মেক্সিকো), নিকারাও (নিকারাগুয়া), গ্রাসনেট (রাশিয়া), হিস্টিয়া (শ্লোভানিয়া), সানগোনেট (দক্ষিণ আফ্রিকা), নর্ডনেট (সুইডেন), গ্রীননেট (ইংলণ্ড), গ্লাক (ইউক্রেন), চাস্‌কিউ (উরুগুয়ে) এবং আই. জি. সি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। এই নেটওয়ার্কগুলি যোগাযোগ রাখে পীস্‌নেট, ইকোনেট, কন্‌ফ্লিক্টনেট, লেবারনেট, হোমোনেট ইত্যাদি নামের (অর্থাৎ পীস মুভমেন্ট, ইকনমিক মুভমেন্ট, বিরোধী-মুভমেন্ট, লেবার মুভমেন্ট, হোম মুভমেন্ট ইত্যাদি) অন্যান্য চরিত্রের এন. জি. ও.গুলির নেটওয়ার্কগুলির সাথে।

এ. পি. সি. নেটওয়ার্কের প্রভাবের অন্তর্গত রয়েছে প্রায় একশ'টি দেশের ২০,০০০ এন. জি. ও.। বিশ্বের মধ্যে এন. জি. ও.দের তথ্য বিনিময়ের এটি সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা জীবন্ত মঞ্চ। এ. পি. সি নেটওয়ার্কের অন্তর্গত রয়েছে মানব-উন্নয়ন বিষয়ক প্রায় সমস্ত ধরনের কর্মী ও আলোচক গোষ্ঠী,

যেমন কর্ম-নিয়োগ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ, পরিবেশ, মানবাধিকার, নগর প্রসঙ্গ, শিশু-বিকাশ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এই এন. জি. ও.গুলির নিজেদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য বিভিন্ন তথ্য এ. পি. সি.-র কমপিউটারে 'অন-লাইন' বক্তব্য থেকে সংগ্রহ করে নেয়। এই ধরনের এন. জি. ও.গুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা বা বিতর্কের জন্য ব্যবহার করে ২০,০০০টি নিজস্ব কমপিউটার ও ইন্টারনেট।

উন্নত দেশগুলির এন. জি. ও. ইন্টারনেট সিস্টেমে এক পৃষ্ঠা সংবাদ পাঠাতে যে খরচ লাগে, অনুন্নত দেশের এন. জি. ও.গুলির খরচ তার চেয়ে ৪ গুণেরও বেশি। ইন্টারন্যাশনাল 'ইনফরমেশন পাইপলাইন'-এর এই বৈষম্য ও ঘাটতি দূর করার জন্য অনুন্নত অঞ্চলগুলি, আদিবাসী সমাজ, নারী ও দরিদ্র গোষ্ঠীর জন্য ১৯৯১ সালে গঠিত হয়েছে 'এনজিও-নেট'। 'এনজিও-নেট'-এর সাহায্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশীয় ও তৃণমূল এন. জি. ও.গুলির সুযোগ গ্যারান্টি করার পর এখন 'স্মল লিঙ্ক' ব্যবস্থা রূপায়ণ করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

কেবলমাত্র অর্থের বিষয়ে পরনির্ভরশীলতা ব্যতিরেকে বাকি সমস্ত দিক থেকে আন্তর্জাতিক এন. জি. ও.সিস্টেম হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণভাবে স্ব-নির্ভর। নিজস্ব মতবাদ, আর্থিক ও পরিকল্পনার নীতি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ, নিজস্ব আন্তর্জাতিক মঞ্চ, আন্তর্জাতিক স্তরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব ও অধিকার প্রভৃতি দিকগুলি ছাড়াও এগুলির রয়েছে বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নিজস্ব বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী, প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞ, পরিকল্পক, ব্যবস্থাপক, কর্মী-গোষ্ঠী প্রভৃতি। শেষোক্ত সম্পদ রয়েছে উল্লেখযোগ্য মানের ও সংখ্যাতে। এইভাবে ধীরে ধীরে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠায় এবং বিশ্ব-বাস্তবতার পরিবর্তন ও কাজের ক্ষেত্র আকস্মিক ও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, এন. জি. ও.গুলির মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রভাবমুক্ত হওয়ার প্রবণতাও। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে আন্তর্জাতিক এন. জি. ও.গুলির চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্বীয় দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা এদের প্রায় সর্বক্ষণের। ১৯৯৩ সালে আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থার প্রধান ঘোষণা করেছিলেন যে, সি. আই. এ. রাজনৈতিক ও সামরিক স্তরে প্রধান ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি এখন থেকে বৃহত্তর ভূমিকা নেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরে। তাই সি. আই. এ. ঘোষিত ঐ দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নত দেশগুলির আন্তর্জাতিক এন. জি. ও.গুলির ভূমিকার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই গভীর সম্পর্ক থাকা সম্ভব। তাছাড়া এই সম্পর্ক অতীতেও অব্যাহত ছিল।

এখন লগ্নিকারী ও ঋণদানকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তৃতীয় দুনিয়ার সরকারগুলিকে প্রকল্পের জন্য ঋণ বা অনুদান দেওয়ার সময় শর্ত আরোপ করছে যে প্রকল্প নির্মাণের এক নির্দিষ্ট অংশ এন. জি. ও.দের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এইভাবে ঋণদানকারী সংস্থার বিপুল অর্থ পরোক্ষে চলে আসতে শুরু করেছে এন. জি.ও.গুলির হাতে। এতে সংগঠনগুলির সামনে সৃষ্টি হচ্ছে পুঁজির সরবরাহ ও কাজের বিশাল সুযোগ। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে সরাসরি আলোচনা ও তাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করার নতুন সুযোগ পাচ্ছে এন. জি. ও.গুলি। তৃতীয় দুনিয়ার সরকারগুলির পুঁজির স্বল্পতার সুযোগজনিত পরিস্থিতি এবং ঋণদাতাদের শর্তাবলীকে ব্যবহার করে এন. জি. ও.গুলি রাষ্ট্রীয় ও সামজিক স্তরে প্রভাব বৃদ্ধি করে চলেছে। যেসব দেশের সরকার অতীতে এন. জি. ও.দের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দিহান ছিল এবং সেজন্য এন. জি. ও.দের কাজের সুযোগ দিতো না বা বাধা সৃষ্টি করতো, এখন তারাও বাধ্য হয়ে এন. জি. ও.দের স্মরণাপন্ন হচ্ছে। কেবল ঋণদানকারী সংস্থার শর্ত মাত্র নয়, এন. জি. ও.গুলির মতবাদসহ সমগ্র সিস্টেমকেও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে সরকারগুলি।

আধুনিককালে তৃতীয় দুনিয়াতে এন. জি. ও. ব্যবস্থার বিকাশের পিছনে কিছু আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বা প্রথারও পরোক্ষ অবদান রয়েছে। ১৯৮৫ সালে, রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলির ৪০তম সভা থেকে প্রতি বছরের ৫ই ডিসেম্বরকে 'ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারি অ্যাকশন ডে' হিসাবে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এন. জি. ও.দের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও স্বীকৃতি দানের। লক্ষ্য করা যায় যে সত্তরের দশক থেকে 'আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস', 'বিশ্ব অন্ধ নিবারণী দিবস',

'বিশ্ব কুষ্ঠ নিবারণী দিবস', 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস', 'বিশ্ব সংখ্যালঘু জন-জাতি দিবস', 'বিশ্ব মাদক-বিরোধী দিবস', 'বিশ্ব ধূমপান-বিরোধী দিবস', 'বিশ্ব নারী দিবস', 'বিশ্ব শিশু দিবস', 'বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস', 'বিশ্ব বাসস্থান দিবস' ইত্যাদি পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এন. জি. ও.দের কর্মক্ষেত্রের পরিচিতি এবং দিবসগুলি রূপায়ণের জন্য দেশে দেশে সরকারগুলিকে উদ্যোগী ও উৎসাহিত করে এন. জি. ও.দের কাজের সুযোগকে পরোক্ষে প্রসারিত করার ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি এইসব দিবসে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে দায়িত্ব নেবার জন্য আহ্বান জানিয়ে থাকে রাষ্ট্রসংঘ। তাছাড়া নারী, উন্নয়ন, পরিবেশ, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলাদা আলাদা আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা এবং সেগুলিতে এন. জি. ও.গুলির প্রবেশাধিকার ও ভূমিকা স্বীকৃত হওয়ায়, প্রভাব সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক প্রচারের সুযোগ পেয়ে যায় এরা। এক একটি প্রসঙ্গে এই সম্মেলনগুলির মাধ্যমে এন. জি. ও.গুলি সুযোগ পেয়ে যায় নিজেরদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও মতামত বিনিময়ের।

বাজারী ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে পণ্য ও পরিষেবা নগদ মূল্যে ক্রয় করার বাধ্যতা তৃতীয় দুনিয়ার মানুষকে বেশি বেশি করে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করে তুলছে—যাতে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা পণ্য ও পরিষেবার চাহিদার ঘাটতি কিছুটা মেটানো যায়। এই প্রয়োজন থেকে এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যতিরেকে এই ধরনের সংগঠন (যেগুলিকে নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনের পরিবর্তে 'পিপলস অরগানাইজেশন' বলা হচ্ছিল) বিগত তিন দশক থেকে গড়ে উঠছিল। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কৃষকদের মধ্যে প্রথমদিকে এই ধরনের স্ব-সাহায্যকারী হাজার হাজার সংস্থার উপস্থিতি দেখা দিতে থাকে। যেমন জিম্বাবোয়েতে 'নিম্বে' ও 'জান্‌গানো', নাইজিরিয়াতে 'ওয়ে' ও 'আরে', ঘানাতে 'নওরোয়া' ও 'সুসু';নাইজিরিয়াতে 'এসুসু', রোয়াণ্ডাতে 'ইবিমিনা', ক্যামেরুনে 'টনটিনিজ' ও 'নাজাঙ্গিস', শ্রীলঙ্কায় 'চেতু', বাংলাদেশে 'সমবায়' ইত্যাদি। গুয়েতেমালার সীমান্তের সাথে যুক্ত মার্কুইসি ডি কমিলার রেইন-ফরেস্ট এলাকার মেক্সিকোর কৃষকদের অনুরূপ সংগঠনগুলি 'ইউনিয়ন ডি এজিদোস জুলিও সাবিনিজ' নামে পরিচিত। জায়েরেতে রয়েছে 'অ্যাকশন সোজিয়ালি এট্ ডি অরগানাইজেশন পায়াসানে'। কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও শহর ও আধা-শহরের বস্তি বা দরিদ্র বসত এলাকার মানুষদের সমস্যা নিয়ে তৃতীয় দুনিয়ার দেশে দেশে গড়ে উঠেছে সহস্র সহস্র 'পিপলস অরগানাইজেশন'। সেগুলি প্রধানত কাজ করে (ক) এলাকার পয়ঃপ্রণালী ও আবর্জনা অপসারণ, (খ) নিম্ন-ব্যয়ে আবাস নির্মাণ, (গ) নারীদের স্ব-নিযুক্তি কেন্দ্র গঠন, (ঘ) নারী-মঙ্গলের কাজ, (ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে।

এক এক ধরনের দাতা আন্তর্জাতিক সংস্থা নিজেদের প্রয়োজন ও লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করানোর জন্য এন. জি. ও.দের সংজ্ঞা স্থির করে নিয়েছে। স্বভাবতই সেইসব সংজ্ঞা খণ্ডিত। এগুলির বাইরে অজস্র ধরনের সংগঠন রয়েছে, যেগুলি নিজেদের এন. জি. ও. বা ঐ ধরনের কোন ভূমিকা পালনের দাবী করে। এগুলির কাজের ক্ষেত্র, সাংগঠনিক চরিত্র, অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি, দাতাদের চরিত্র, সংগঠনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি ব্যাপকভাবে আলাদা। এই ধরনের সংগঠনের নামগুলির মধ্যে রয়েছে 'ভলান্টারি এজেন্সি (ভি. এ.), অ্যাকশন গ্রুপস (এ.জিস), 'গ্রাস-রুট অরগানাইজেশন' (জি. আর. ও.), নন-গভর্নমেন্টাল ডেভলপমেন্টাল অরগানাইজেশনস (এন. জি. ডি. ওস), ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন ইনস্টিটিউশনস্ (আই. ডি. সি. আইস), প্রাইভেট ফিলানথ্রপিক ফাউণ্ডেশনস (পি. পি. এফস), নন-পার্টি পলিটিক্যাল ফর্মেশনস (এন. পি. পি. এফস), মাস মুভমেন্ট ইত্যাদি। এন.জি.ও.দের প্রথাগত ভূমিকার বাইরে ভিন্নতাও সৃষ্টি হচ্ছিল। এর কিছু কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। চিলিতে পিনোচেত স্বৈর-সরকারের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক চার্চের দ্বারা গঠিত হয়েছিল 'ভিকারিয়া ডি লা সলিডরিডাড', অথবা প্রাক্তন রোডেশিয়াতে (বর্তমানে জিম্বাবোয়ে) কর্ণবিদ্বেষী স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে জাসটিস অ্যাণ্ড পীস কমিশন। এরা জনমত সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের প্রধান শক্তি হিসাবে ভূমিকা নিয়েছিল। ডোমিনিকান রিপাব্লিকে নারীদের মর্যাদা উন্নয়নের জন্য কাজ করে 'সেন্ট্রো ডি ইনভেস্টিগেশিয়ন পারা লা অ্যাশিয়ন ফেমিনিনা'। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে ইউরোপসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে

গড়ে উঠেছে 'গ্রীন পীস মুভমেন্ট গ্রুপ', ফিলিপিনসে যেমন 'গ্রীন ফোরাম' বা কেনিয়াতে 'গ্রীন বেল্ট মুভমেন্ট'। ইকুয়ডরে মানবাধিকার রক্ষার জন্য যথাক্রমে 'ফোরো ন্যাশিওনাল পোর কলম্বিয়া' ও 'সুয়ার ফেডারেশন'। ব্রাজিলে ভূমিহীন কৃষকদের সাহায্য করার জন্য 'কমিশাও প্যাস্টোরাল জা টৈর্রা', বুরকিনা ফাঁসোতে দরিদ্র মানুষদের রোজগারের ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র শিল্প গঠনে উৎসাহদানকারী 'গ্রুপেমন্টেজ নাম', 'ফাণ্ডেসিওন কোস্টারিসেনি ডি ডেসা রালো' এবং শ্রীলঙ্কাতে 'সর্বোদয় শারামাদানা মুভমেন্ট'। তাছাড়া জিম্বাবোয়েতে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য 'অরগানাইজেশন অব রুর‍্যাল অ্যাসোশিয়েশন ফর প্রোগ্রামস', বাংলাদেশে গ্রামীণ গরীবদের জন্য 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' ইত্যাদি হলো এন. জি. ও.দের বিভিন্নতার প্রতীক। এসব ছাড়াও নারী, জনসংখ্যা, শিক্ষা, স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম ইত্যাদি নিয়ে বিশ্বের বহু দেশে কাজ করছে এই ধরনের সংগঠনগুলি। এস্টাব্লিশমেন্ট-বিরোধী এই ধরনের এন. জি. ও.গুলি নিয়ে আলাদা আলাদা আন্তর্জাতিক মঞ্চ গড়ে উঠেছে। এইসব মঞ্চ পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে প্রতিবাদ ও জনমত সংগঠিত করছে। পরিবেশ, উন্নয়ন, নারী, জনসংখ্যা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সত্তরের দশক থেকে বিশ্বে যতগুলি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বা কংগ্রেস হয়েছে, তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ও প্রতিবার সংশ্লিষ্ট এন. জি. ও.গুলি সরকারী সম্মেলনের পাশেই করেছে বিশাল বিশাল পাল্টা সম্মেলন;প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা ছাড়াও হাজির করছে বিকল্প কর্মসূচী। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী সম্মেলনের সিদ্ধান্তের কিছু কিছু সংশোধন করতেও সক্ষম হয়েছে তারা। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফাণ্ডের যখনই বার্ষিক যৌথ সম্মেলন হয়, তখনও এদের একটা অংশ সম্মেলন-স্থলে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ করে। এই ধরনের কর্মসূচীর জন্য গড়ে ওঠা সংগঠনগুলির অন্যতম হলো ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম এগেইনস্ট স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। প্রথমদিকে ৪০টি দেশের অনুরূপ সংগঠন নিয়ে গড়ে এটি উঠলেও ক্রমে আরও দেশ এবং বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, আইন-বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি অংশ যুক্ত হয়েছে। ১৯৯২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে মিলিত হয়ে এরা গঠন করেছে 'এন. জি. ও. ফোরাম অন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড আই. এম. এফ. অ্যাডজাস্টমেন্ট লেণ্ডিং'। এই সংগঠনটি পরবর্তীকালে প্রায় প্রত্যেকটি 'জি-৭' সম্মেলনের সময় প্রতিবাদ সভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠান করেছে। এরা নতুন বিশ্বায়নের নীতি, আন্তর্জাতিক ঋণদান ব্যবস্থা এবং উন্নত দেশগুলির দ্বারা তৃতীয় দুনিয়াকে নানাভাবে শোষণের বিরুদ্ধে এবং উন্নত দেশগুলির বার্ষিক বাজেট ব্যয়ের ন্যূনতম ১০% তৃতীয় দুনিয়াকে, ঋণের পরিবর্তে দেবার দাবী তুলেছে। এন. জি. ও.গুলির এই ধরনের ভূমিকা সরকারী ব্যবস্থাপকদের যেমন সচকিত করে তুলছিল, জনগণের দৃষ্টিও ক্রমবর্ধমানভাবে এদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল।

কাজের চরিত্রের ভিত্তিতে জাতীয় স্তরের এন. জি. ও.দের বিষয়ে বিস্তৃত মূল্যায়ন পাওয়া যায় না। তবে এগুলি যে ধরনের কাজ করে সেই ক্ষেত্রগুলি প্রধানত হলো (ক) দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজ, (খ) দরিদ্রদের ঋণ-দান, (গ) দরিদ্রতমদের সাহায্য, (ঘ) প্রান্তিক সামাজিক গোষ্ঠীগুলির উন্নতিসাধন, (ঙ) লিঙ্গগত বৈষম্যের বিরোধিতা, (চ) জরুরি প্রয়োজনে ত্রাণ-সাহায্য দান ইত্যাদি।

তৃতীয় দুনিয়ার এন. জি. ও.গুলির ভূমিকা পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধ থেকে অনেকগুলি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। আশির দশকে পৌঁছে, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক এন. জি. ও.গুলি ও স্ব স্ব দেশের সরকারগুলির সাথে দেশীয় এন. জি. ও.গুলির সম্পর্ক ও সহযোগিতা এক নতুন মাত্রা অর্জন করে। এন. জি. ও.গুলির 'লেজিটিমেসি' বা স্বীকৃতি অর্জনের অনেকটা সংহত হওয়ার অধ্যায় এটি। অর্থবল বৃদ্ধি, উন্নয়নে বৃহত্তর ভূমিকা, প্রচার মাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের আনুকূল্য, জনগণের ক্রমবর্ধমান সমর্থন এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এন. জি. ও.-রা স্বঘোষিত 'এজেন্ট অব সোস্যাল ট্রান্সফরমেশন' বা সামাজিক পরিবর্তনের শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকে। উন্নয়নমূলক কাজে সাফল্য দেখিয়ে নিজেদের পরিচিত করতে থাকে জনগণের গভীর আত্মীয় হিসাবে। তৃতীয় দুনিয়ায় জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য এদের প্রধান শ্লোগান দাঁড়ায় 'এমপাওয়ারমেন্ট অব পিপল' বা জনগণকে ক্ষমতাধর করা। জনগণের চরম

দুর্দশা ও আর্থিক দৈন্য, বেকারী, গণতন্ত্রের ব্যভিচার, প্রশাসন ও উন্নয়নে জনগণের ভূমিকার অস্বীকৃতি, উন্নয়নের কাজে ঠিকাদারী ব্যবস্থা, প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি ও হয়রানি ইত্যাদির পরিস্থিতিতে 'এমপাওয়ারমেন্ট অব পিপল' শ্লোগান জনগণকে সহজেই আকৃষ্ট করতে শুরু করে।

সমাজে আরও কয়েকটি বিষয় পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে—যেমন শিশু শ্রমিক, এইডস্, যৌন শ্রমিকা, শিশু যৌন ব্যবসা, দেশান্তরী শ্রমিক, ড্রাগের নেশা, পিতা-মাতা পরিত্যক্ত শিশুর সমস্যা প্রভৃতি। এইসব ক্ষেত্রে এন. জি. ও.দের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে নব্বই-এর দশকে।

'এন. জি. ও. এগেনস্ট এন. জি. ও.'এর ধারণা এবং সংগঠনের উদ্ভব এই সময়কালেই ঘটেছে। কেউ কেউ একে 'সাদার্ন এন. জি. ও. বা 'এন্টি-নর্থ এন. জি. ও. অথবা 'থার্ড ওয়ার্ল্ড এন. জি. ও. বলেছেন। উন্নত দুনিয়ার এন. জি. ও.গুলির স্বদেশীয় স্বার্থ-রক্ষী ভূমিকা অথবা তৃতীয় দুনিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, অন্তর্ঘাত, শোষণ, ইত্যাদির চরিত্র উন্মোচন এবং জনগণকে সেসব বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে এই সংগঠনগুলি। দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের বিচারে এগুলিকে নতুন আদর্শবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এরা মতাদর্শভিত্তিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি দলীয় রাজনীতিমূলক নয় বা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যেও নয়। দৃশ্যত এইসব কাজকে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা-বিরোধী মনে হলেও কার্যকালে তা' নয় পুরোপুরি। তৃতীয় দুনিয়ার যন্ত্রণা ও পাশ্চাত্য-বিরোধিতার ঐতিহ্যগত সংস্কারের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এইসব সংগঠনগুলির দৃষ্টিভঙ্গি। এগুলি যতটা সংগঠন, তার চেয়ে বেশি আন্দোলন বা আন্দোলন-ভিত্তিক সংগঠন।

এই সময়ে তৃতীয় দুনিয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তা' হলো জনগণের পরম্পরাগত সংগঠনগুলির বিকল্প হয়ে ওঠার জন্য এন. জি. ও.গুলির প্রয়াস। সাধারণ মানুষ নিজেদের আকাঙক্ষা প্রকাশ করে নিজের গণসংগঠনের দ্বারা; তাদের নিজ ক্ষমতা প্রকাশের ও বৃহত্তর ক্ষমতা অর্জনের চিরাচরিত মাধ্যমও ছিল এগুলি। কিন্তু জনগণের এই ধরনের সংগঠন, বিশেষত ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন, বনবাসী/আদিবাসী সংগঠন, নারী সংগঠন, বস্তিবাসী সংগঠন ইত্যাদির সামনে এন. জি. ও.গুলি নতুন চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করতে শুরু করে। বিভিন্ন সামাজিক পশ্চাৎপদ অংশের অধিকার, আইনি ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি দাবী-ভিত্তিক তৃতীয় দুনিয়ার এন. জি. ও.-র আবির্ভাব ঘটতে থাকে মধ্য-আশির দশক থেকে। নতুন ভূমিকা পালনের জন্য, এন. জি. ও.গুলি গঠন করে নিতে থাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত গণসংগঠনগুলির কাজ অথবা আন্দোলনের মুহূর্তে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বা কোথাও কোথাও সেগুলির সাথে যৌথ মঞ্চ গঠন করে বিকল্প হয়ে ওঠার জন্য পরিকল্পিত তৎপরতা শুরু করে তারা। প্রথাগত গণসংগঠনগুলির শ্রেণী-মর্মকে চ্যালেঞ্জ করে তৃতীয় দুনিয়ার দেশে দেশে এই ধরনের এন. জি. ও.গুলি নিজ মতাদর্শকেও উত্থাপন করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে স্বদেশ বা আন্তর্জাতিক স্তরের উদারনীতিক মনীষীদের দর্শনকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী, লিও টলস্টয়, এরা ফ্রেয়ার প্রমুখের দর্শনকে যেমন ব্যবহার করা হচ্ছে, অন্যদিকে নিজেদের সংগ্রামী ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য এরা ব্যবহার করছে ব্রাজিলের পাউলো ফ্রেয়ারের 'বঞ্চিতের দর্শন', ফিলিপিনসের সাউল আলিনিস্কির 'জনগণের ক্ষমতা লাভের তত্ত্ব', শ্যুমেকারের 'ক্ষুদ্রই সুন্দর', গুইতিয়ারেজের 'লিবারেশন থিওলজি', আফ্রিকার ব্ল্যাক কনসাসনেস', দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'নিও-বুদ্ধিস্ট ফিলজফি' প্রভৃতি। কোথাও কোথাও গ্রামসি, চে গুয়েভারা, রেজি দ্যব্রে প্রমুখের নামও ব্যবহৃত হচ্ছে। একদিকে প্রচলিত গণসংগঠনগুলির কোণঠাসা ও ক্ষয়িষ্ণু বাস্তবতা এবং অন্যদিকে নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতির জন্য জনগণের মধ্যে সৃষ্টি নতুন নতুন ধরনের চাহিদা পূরণে তাদের এই ধরনের প্রকরণগুলি বিকল্প সংগঠন হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। বামপন্থী মতাদর্শের স্তরে বর্তমানে যে বিভ্রান্তি ও আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে, সেই শূন্যতা ও অস্থিরতার জগতে এই ধরনের এন. জি. ও.গুলির মতবাদ ও ভূমিকা এইভাবে কিছুটা স্থান করে নিচ্ছে। বিভিন্ন অংশের শ্রমজীবীদের প্রত্যক্ষ ও জঙ্গী আন্দোলনের অনুপস্থিতি আন্দোলনের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণীর সর্বাত্মক আক্রমণ ও আন্দোলনগুলির ব্যর্থ পরিণতির ফলেও এন. জি. ও.গুলির প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

তৃতীয় দুনিয়ার কোন কোন দেশে ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে এন. জি. ও.রা। জাতীয় স্তরের ট্রেড ইউনিয়নে শিল্প শ্রমিক ছাড়াও পরিষেবার কর্মজীবী ও কৃষি মজুর, অসংগঠিত অংশের মেহনতকারীদের সদস্যভুক্ত করা হচ্ছে, কোন কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সাংগঠনিক স্তরে বা শাখা সংগঠন হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এই ধরনের ট্রেড ইউনিয়নের কাঠামোতে কোথাও কোথাও এদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থা রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার শক্তিশালী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 'কোসাটু'তে। অনুরূপ সংস্থান করা হয়েছে জিম্বাবোয়ে, জাম্বিয়া, ঘানা প্রভৃতি দেশের ট্রেড ইউনিয়নেও। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশে এন. জি. ও.দের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তারা অধিকাংশ সময় যৌথভাবে আন্দোলন করে। অনুরূপ প্রয়াস এখন বাড়ছে লাতিন আমেরিকার আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রাজিল, বলিভিয়া ইত্যাদি দেশেও। শ্রমজীবীদের সামাজিক সমস্যাবলী নিরসনের চেষ্টা ও সংগঠন সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব যথাসম্ভব প্রতিহত করার লক্ষ্য থেকে এন. জি. ও.দের বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নে এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে।

সত্তরের দশক থেকেই, উন্নত দুনিয়ার, বিশেষত ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এন. জি. ও.দের কিছু কিছু ভূমিকাকে সমর্থন শুরু করেছিল। আশির দশক থেকে লাতিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এবং নব্বই-এর দশক থেকে পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উপ-সাহারীয় আফ্রিকা ও দক্ষিণ অংশের আফ্রিকার বেশ কিছু দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেরাই শুরু করেছে এন. জি. ও. চরিত্রের গণসংগঠন গঠন ও পরিচালনা করা। ভারতে সত্তরের দশক থেকে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া এবং মধ্য-আশির দশক থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গড়ে তুলছে অনুরূপ কিছু চরিত্রের গণসংগঠন। 'ফাউণ্ডেশন'-ধর্মী সংগঠন ছাড়াও, জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতা সৃষ্টি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পরিচালিত এন. জি. ও.দের উপস্থিতির শুরু ঘটছে।

পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে নানা তত্ত্ব উপস্থিত করা হচ্ছিল। পূর্বে তাঁর কিছু উল্লেখ করা হয়েছে 'নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন' সম্পর্কে। সত্তরের দশক থেকে উদারনীতিক, এমনকি একাংশ বামপন্থী সমাজতাত্ত্বিক কিন্তু কিছুটা সংহত তত্ত্ব উত্থাপন শুরু করেন এন. জি. ও. সম্পর্কে। এইসব তত্ত্বগুলির অন্যতম হলো 'পার্টি-লেস নিউ পলিটিক্যাল অরগানাইজেশন' বা দল-হীন রাজনৈতিক সংগঠন, কেউ একে বললেন 'নিউ মাস মুভমেন্ট' তথা নয়া গণ-আন্দোলন, কারো মতে এ' হলো 'অল্টারনেটিভ মাস অরগানাইজেশন' বা বিকল্প গণসংগঠন, কেউ বা বলেছেন 'নিও-প্লুরালিজম' বা 'নয়া-বহুত্ববাদ', কারো কারো মতে 'ক্লাস-লেস পিপলস অরগানাইজেশন' বা শ্রেণী-নিরপেক্ষ জনগণের সংগঠন, অনেকের মতে 'নিউ-র‍্যাডিক্যাল অল্টারনেটিভ' বা নতুন বিপ্লবাত্মক বিকল্প, কারো মতে 'নিউ অ্যাডভান্সমেন্ট' তথা নয়া অগ্রগতি, কারো কারো মতে 'ভ্যানগার্ড অব নিউ সোস্যাল রেভোলিউশন' তথা নয়া-সমাজ বিপ্লবের অগ্রদূত প্রভৃতি। মার্কসবাদকে সংস্কার করার তথাকথিত উদ্যোগের প্রতিফলন হিসাবে নয়া-বামপন্থীদের আলোচনাতে এন. জি. ও. সম্পর্কিত নতুন নতুন তত্ত্বও এখন প্রচারিত হচ্ছে। আর্নেস্টো ল্যাকলাউ, চ্যান্টাল মৌফি, স্টুয়ার্ট হলো প্রমুখ (আর্নেস্টো ল্যাকলাউ এবং চ্যান্টাল মৌফি : 'হেজিমনি অ্যাণ্ড সোস্যালিস্ট স্ট্রাটেজি', ১৯৮৫; স্টুয়ার্ট হলো : 'সিগনিফিকেশন, রিপ্রেজেন্টেশন, আইডিওলজি : আলথুসার অ্যাণ্ড পোস্ট-স্ট্রাক্‌চারালিস্ট ডিবেটস'; জেমস কুরান, ডেভিড মোরলে ও জ্যানেরি ওয়ালকারডাইন সম্পাদিত 'কালচারাল স্টাডিজ অ্যাণ্ড কমিউনিকেশন'; চ্যান্টাল মৌফি : 'দা রিটার্ন অব দা পলিটিক্যাল', ১৯৯৬, প্রভৃতি) ম্যাক্স ওয়েবার ও আলথুসারের তত্ত্বের সম্প্রসারণ করে এন. জি. ও. বিষয়ক নতুন তত্ত্বগুলি আমদানি করেছেন। এইসব আলোচনাতে বলা হয়েছে যে সমাজে শক্তি-সম্পর্ক (পাওয়ার রিলেশনস) এমনভাবে গঠিত যে একজন ব্যক্তি-বিশেষ বহুবিধতার বাহক। সেই বহুবিধতার মধ্যে একটিতে সে কর্তৃত্বকারী ও অন্যগুলিতে তার ভূমিকা অধীনতামূলক। বিভিন্ন নেতিবাচক উপাদানসমূহের অস্তিত্বের জন্য একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরে অধীনস্ত চরিত্রের সম্পর্কগুলি নির্মিত হয়। সুতরাং সেগুলি অতিক্রম করার জন্য দরকার হলো 'সোস্যাল এজেন্ট'। অধীনস্ততার

দিকগুলিকে ব্যবহার করে, প্রভুত্বকারী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে হাতে নেওয়া যেতে পারে জনগণকে সমবেত করার কাজ। অধীনস্ততার বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ব্যাপক ধরনের দিকগুলির ভিত্তিতে সংগ্রাম গড়ে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের (র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাসির) জন্য অগ্রসর হওয়া চলে। এই কাজে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ সোস্যাল এজেন্টের ভূমিকা নিতে পারে এন. জি. ও.। জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করার জন্য বুর্জোয়া তত্ত্ববিদদের সচেতন প্রচেষ্টা যেমন রয়েছে, নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট বিমূঢ়তা থেকে পরিত্রাণ পেতে বিকল্পের সন্ধানে একইভাবে উদ্যোগী হয়েছে 'পোস্ট-মার্ক্সিস্ট' ধারাও।

এন. জি. ও. সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্বটি 'ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ' বা প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নামে পরিচিত হয়েছে। ইংরেজী আদ্যক্ষরে গঠিত ডব্লু. আই. এস. ই. বা 'ওয়াইজ' শব্দের পূর্ণবিন্যাস হলো 'ওয়েল বিয়িং অব ইণ্ডিভিজুয়ালস্ অ্যাণ্ড সোসাইটিজ এভরিহোয়ার' (বর্ট্রাণ্ড শেচনেইডার, ১৯৯৫)। এই তত্ত্বে অনুন্নত দেশগুলির সামগ্রিক দুরবস্থার, বিশেষত দরিদ্র জনগণের জন্য উন্নত দেশগুলির ভূমিকাকে একমাত্র দায়ী করে সমালোচনা করা হয়েছে কঠোর ভাষায়। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির ভূমিকাকে কলঙ্কজনক ও লজ্জাকর বলে অভিহিত করেছেন এঁরা। ষাটের দশক থেকে উন্নত দেশগুলির দ্বারা তৃতীয় দুনিয়ার 'ডেভেলপমেন্ট' বা উন্নয়ন সংক্রান্ত ভাবনা ও কার্যকলাপকে এই মতবাদে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। 'আণ্ডার-ডেভেলপমেন্ট' বা নিম্ন-উন্নয়নকে ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়নের বিপরীত শব্দ বলেছে 'ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ'। তাই তৃতীয় দুনিয়ার তথাকথিত উন্নয়নের সমস্ত মডেল, অ্যাপ্রোচ ও এজেন্টকে এঁরা নিম্ন-উন্নয়নের শর্ত বলে চিহ্নিত করে সেগুলিকে খারিজ করেছেন। প্রচলিত 'ইনস্টিটিউশন' বা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে উন্নয়নের জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান হিসাবে এঁরা প্রস্তাব করেছেন নতুন ভূমিকাসম্পন্ন এন. জি. ও.কে। 'ওয়াইজ অ্যাপ্রোচের' প্রস্তাবের ভিত্তি হলো যে বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকার ও বাস্তবতার মধ্যে বর্ধমান ভারসাম্যহীনতা এবং পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির সাথে কাজের ও ফলাফলের পার্থক্যই প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে উন্নয়নের নতুন ধারণা উদ্ভাবনের। এই উন্নয়ন হবে 'ওপেন এণ্ডেড' বা উন্মুক্ত;অর্থাৎ প্রচলিত পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যভিত্তিক হবে না। আধুনিক বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তন, জটিলতা ও অনিশ্চয়তাকে মোকাবিলা করে এগোবে এই উন্নয়ন তৎপরতা। সমাজের বহুধা-বিস্তৃত সংস্কৃতি ও পরিস্থিতিকে আত্মীকরণ করবে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এই প্রণালীতে উন্নয়ন ব্যবস্থা হবে এমন সুস্থিত ও ধারাবাহিক যা জনগণের চাহিদার স্তরে স্তরে ভূমিকা পালন করে স্তরগুলিকে সমানভাবে উন্নত করে এগিয়ে চলবে। উন্নয়নের কাজ শুরু করতে হবে মানব-কোণ (হিউম্যান-অ্যাঙ্গেল) থেকে এবং শেষে ফিরে আসতে হবে মানুষেই। উন্নয়নের অন্তিম লক্ষ্য হবে সুখ অর্জন। মানুষ ও সমাজের সমৃদ্ধির মাত্রাতে এই সুখ প্রতিফলিত হবে। সমৃদ্ধি বলতে কেবলমাত্র মানুষের জৈবিক প্রয়োজন পূরণ বোঝাবে না, তা' হতে হবে মনস্তাত্ত্বিক সমৃদ্ধিও।

এই 'হ্যাপিনেস' তথা সুখ এবং 'ওয়েল-বিয়িং' বা সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য 'ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ' নয়-সূত্রী দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছে। প্রথম সূত্রের বক্তব্য হলো জনগণই প্রথম। জনগণের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নে, বিশ্ব-রণনীতি হিসাবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনগণকে অংশগ্রহণ করাতে হবে। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে যে অনুন্নত দেশগুলিকে নিজেদের উন্নয়নের বিষয়ে উন্নত দেশের আদলের নির্বিচার অনুকরণ ছাড়তে হবে। নিজ নিজ দেশের বাস্তবতার ভিত্তিতে তৃতীয় দুনিয়াকে গড়ে তুলতে হবে উন্নয়নের স্বীয় মডেল। তৃতীয় সূত্র হলো, উন্নয়নের পদ্ধতি ও লক্ষ্য হিসাবে "সহায়তা দেবার" পরিবর্তে জনগণকে 'ইকনমিক পার্টনার' বা অর্থনৈতিক অংশীদার করে নিতে হবে;মানুষকে সম-মর্যাদার আসন দিয়ে, দিতে হবে সম-অংশীদারিত্বের অধিকার। চতুর্থ সূত্রে, সমস্ত ধরনের উন্নয়নের কাজে পরিবেশের উন্নয়নকেও গুরুত্ব দিতে হবে। পঞ্চম সূত্র হলো যে, ইকনমিক মার্কেট বা অর্থনৈতিক বাজার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন হতে হবে এবং উন্নয়নের কাজে বাজারের সুযোগকে ব্যবহার করতে হবে সর্বতোভাবে। ষষ্ঠ সূত্রে প্রস্তাবিত হয়েছে যে উন্নয়নের প্রয়োজনে সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তৎপরতায় (যেমন সদ্য গঠিত 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন') ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে প্রবেশাধিকার অর্জন ও সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। সপ্তম সূত্রে বলা হয়েছে যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে জ্ঞাত

হওয়া ও সেগুলির ব্যবহার একান্ত জরুরি। কিন্তু অনুকরণ বা যান্ত্রিকভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিবর্তে দেশ, কাল ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে উপযুক্ত 'টেকনোলজি' ব্যবহার করতে হবে। অষ্টম সূত্র অনুসারে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সমাজ বা এলাকা-ভিত্তিক খণ্ড খণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না, বিচার করতে হবে সারা দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়ের মনোভাবের ভিত্তিতে। সরকার ও জনগোষ্ঠীসমূহের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা রচনা করতে হবে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা। নবম সূত্রে প্রস্তাবিত হয়েছে যে দেশে বা আন্তর্জাতিক স্তরে যারাই উন্নয়নের বিষয়ে যুক্ত, তাদের সবার সাথে যোগযোগ ও মত-বিনিময়ের ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। 'ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ' সুনির্দিষ্টভাবে মনে করে যে, বর্তমানে প্রচলিত কোন ধরনের সংগঠন, এমনকি রাষ্ট্র-সংগঠনের পক্ষেও পূর্বোক্ত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর করা সম্ভব নয়, কেননা সমস্ত প্রচলিত সংগঠন এখন বাস্তবতা থেকে পিছিয়ে পড়েছে এবং ক্ষয়িষ্ণু। তার পরিবর্তে, এন. জি. ও.-র মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পূর্ণাঙ্গ সম্ভাবনা।

শিক্ষার প্রসারকে এন.জি.ও.গুলির ভূমিকার কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ করতে প্রস্তাব করেছে 'ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ'। 'লার্নিং প্রসেস' বা জ্ঞান-অর্জনের প্রক্রিয়া হিসাবে তথা সর্বক্ষণের কাজ হিসাবে 'এডুকেশন' বা শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে এন.জি.ও.দের কাজে দ্বিতীয় প্রধান হিসাবে গুরুত্ব পাওয়া উচিত বলে 'ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ' মনে করে। তৃতীয় প্রধান প্রসঙ্গ হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে যে এন. জি. ও.দের ভূমিকা হবে দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতাধর করা এবং সেক্ষেত্রে প্রধান কাজ হবে সম্পত্তির অধিকারকে সমস্ত মানুষের মৌলিক অধিকারে পরিণত করা। চতুর্থ প্রধান কাজ হবে উন্নয়নের প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদের সংস্থানে আমূল পরিবর্তন ঘটানো। ব্যক্তিগত (মালিকাধীন) বা সরকারী অর্থ-সূত্রের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে যাওয়া এবং তার পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে 'সিভিল সোসাইটি ফাণ্ডিং' বা নাগরিক সমাজ থেকে সম্পদ ও অর্থ সংগ্রহের। একক ও সমবেত স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে নিজেদের চেষ্টায় সম্পদ সৃষ্টি এবং সৃষ্ট সম্পদ পুঁজি হিসাবে পুনর্বিনিয়োগ করে। পঞ্চম প্রতিপাদ্য হলো সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ক্ষমতা ও ভূমিকার পাশাপাশি 'সিভিল সোসাইটি' বা নাগরিক সমাজ এবং নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনের ক্ষমতা ও ভূমিকাকে সুদৃঢ় করে যেতে হবে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে যাতে কালক্রমে শেষোক্ত এই দুই অংশ পূর্বোক্ত দু'টির সমান্তরালে অর্জন করতে পারে সম-শক্তি।

লক্ষণীয় যে এন. জি. ও. ব্যবস্থাকে এক সুসংহত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে এই 'ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ'। এদের প্রধান দাবী হলো সমস্যাকীর্ণ বিশ্ব-সমাজে এটি হলো প্রকৃত ও কার্যকরী পথ এবং সমস্ত ধরনের প্রচলিত সংগঠন ও ব্যবস্থার বিকল্প এই সংগঠন।

শ্রমিকাদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন

শ্রমিকশ্রেণীর আদিম সংগঠনের অভ্যন্তরে মৌলিক উপাদানের অন্যতম ছিল পুরুষ-নারী-শিশু শ্রমিক নির্বিশেষে অবস্থান ও ঐক্য। কিন্তু শোষণের স্বার্থে এদের মধ্যে কৃত্রিম বৈষম্য পুঁজিবাদ সবসময়েই জিইয়ে রেখেছে। এই শতাব্দীর সত্তরের দশকে পৌঁছে, ধনতন্ত্র সমগ্র শ্রমের বাজারকে আরও পরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্টভাবে পুরুষ ও নারী, যুবক ও বয়স্ক, শ্বেত ও কৃষ্ণ/পীতবর্ণ, স্বদেশী ও বিদেশাগত, এমনকি ধর্মের ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা নিয়েছে। মজুরি, চাকুরীর নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, কাজের সময়, পদোন্নতি, ছুটি ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে পূর্বোক্ত দুই অংশের মধ্যে দৃশ্যত পার্থক্য ও বঞ্চনা এই সত্যকে স্পষ্ট করতে শুরু করে। এই ভেদাভেদের ব্যবস্থাগুলির তাৎপর্য পুঁজিবাদী দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলি, সাধারণভাবে, সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেনি প্রথম থেকে।

এই সাধারণ পটভূমিকা ছাড়াও, আরও কতকগুলি উপাদান নারীদের দ্বারা একমাত্র নারীদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বাস্তবতা সৃষ্টি করেছিল। সেগুলির অন্যতম হলো ষাটের দশক থেকে 'ফেমিনিজম'

বা নারীবাদের 'সেকেন্ড ওয়েভ' বা দ্বিতীয় প্রবাহের আবির্ভাব। বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী নারী আন্দোলনের এই ধারা তথাকথিত উইমেন-লিব্ বা নারীমুক্তির (!) প্রশ্নে পুরুষ ও পুরুষ-শাসিত সমাজকেই কার্যত দায়ী করে। এই মতবাদ পুরুষদের সাথে মিলিতভাবে এবং তথাকথিত পুরুষ-প্রধান প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের বিরুদ্ধে ধ্বজা তুলতে শুরু করেছিল। নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থায় প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গণসংগঠনের অবসান ঘটানোর পরিকল্পিত তৎপরতা বাড়ছে। পাশাপাশি নতুন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে নতুন ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বর্তমানে সর্বস্তরে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনের (এন.জি.ও.) নব-উত্থান এক উল্লেখযোগ্য দিক। এই উদ্ভিন্ন প্রক্রিয়া ও পরিমণ্ডল শ্রমিকাদের স্বীয় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরোক্ষ প্রণোদনা জুগিয়ে চলেছে।

বিভিন্ন দেশে ও ক্ষেত্রে প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়নগুলির নারী সমস্যাগুলির বিষয়ে অনীহা বা উপেক্ষা এক দীর্ঘকালীন দুর্বলতা। এমনকি বহু ক্ষেত্রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রমিকাদের ওপর বঞ্চনা অব্যাহত রাখার চুক্তিও করা হয়েছে। এই উপাদান নারীদের স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার পেছনে তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে একটি ঘটনার কথা তোলা যেতে পারে।

মেক্সিকোর ম্যাকুইলাডোরাগুলিতে নারীদের চাকুরী পাওয়ার সময় ডাক্তারের সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়—যাতে নিশ্চয়তা দেওয়া থাকে যে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা নয়। ভাল অংশের ম্যাকুইলাডোরাতেই কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে গর্ভনিরোধক বড়ি মেয়েদের সরবরাহ করে অথবা শ্রমিকাদের প্রত্যহ বড়ি খেতে বা ইনজেকশন নিতে বাধ্য করে। কোন কোন ম্যাকুইলাডোরা প্রতি তিনমাস অন্তর শ্রমিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে কিনা তার ডাক্তারী পরীক্ষা করায়। দালাল ইউনিয়নগুলি মালিকের সাথে চুক্তি করার সময় মালিকদের এই চরম অসঙ্গত কাজকে স্বীকার করে নেয়। এইরকম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে 'গ্রেন ডি মেক্সিকো প্ল্যান্টে'। 'রেভোলিউশনারি কনফেডারেশন অব মেক্সিকান ওয়ার্কার্স' (সি.আর.ও.এম.) এই ধরনের চুক্তি করেছিল। এই চুক্তির ফলে অন্তঃস্বত্ত্বা শ্রমিকাদের ক্রমে ব্যাপক হারে চাকুরী যেতে শুরু করে। শ্রমিকারা এ'বিষয়ে ইউনিয়নের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে মালিকদের কাছে নিজেরা সরাসরি ডেপুটেশন দেয়। মালিকপক্ষ জানিয়ে দেয় যে ইউনিয়নের সাথে চুক্তিমত তারা এই কাজ করছে। প্ল্যান্টের শ্রমিকারা সংঘবদ্ধভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আশেপাশের প্ল্যান্টগুলি থেকেও শ্রমিকারা এতে যোগ দেয়। নারীরা দলবদ্ধভাবে ইউনিয়নের সদস্যপদ ত্যাগ করে। গড়ে ওঠে 'গ্রেন ডি মেক্সিকো ফিমেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'।

যেসব দেশে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ছিল, ষাটের দশক থেকে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে মতাদর্শগত বিতর্ক ও বিরোধের প্রভাব সেগুলির উপর পড়তে শুরু করেছিল। দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এক বড় অংশই তখন থেকে ধীরে ধীরে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পথ নিচ্ছিল। নারী-শাখা গঠন করে শ্রমিকাদের বিশেষ ধরনের সমস্যা সমাধানের প্রয়াস এই ধরনের ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে বহাল ছিল উন্নত দেশগুলিতে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক চরিত্রে নব-রূপান্তরিত টি.ইউ.গুলিতে শ্রমিকাদের দাবী-দাওয়া ও সমস্যা এবং নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত নারীদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। অন্যদিকে অধিকাংশ তৃতীয় দুনিয়ার দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সরকার-পৃষ্ঠপোষিত অথবা নিছক অর্থনীতিবাদী সংগঠন। বিশেষত, 'নিউলি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজিং কান্ট্রি'গুলিতে গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়নগুলির চরিত্র ও ভূমিকা প্রায় সর্বাংশেই অন্যান্য দেশে অতীত থেকে গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে স্বতন্ত্র। আন্দোলনের পথ কার্যত প্রায় বর্জন এবং মালিকপক্ষের সাথে আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদনের সংগঠন এইগুলি। তাই এইগুলির দাবী-দাওয়ার চরিত্র ও সাফল্য বহুলাংশে মালিক-মনোভাব-নির্ভরশীল। স্বভাবতই এইসব দেশে ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে শ্রমিকাদের সমস্যা সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত। ফলে শ্রমিকাদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে প্রথমে মানসিক বিচ্ছিন্নতা এবং ক্রমে নিজেদের দ্বারা সংগঠন গড়ে তোলার পথে তাঁদের ঠেলে দিয়েছে।

বর্তমান সময়ে নারীদের স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ট্রটস্কিপন্থী চতুর্থ আন্তর্জাতিক বা সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অনুরূপ গোষ্ঠীগুলির কিছুটা রাজনৈতিক তৎপরতা রয়েছে।

এরা ছাড়াও 'স্ট্রাকচারালিস্ট', 'পোস্ট-মডার্নিস্ট', 'নিউ লেফট' প্রভৃতি অতি বুদ্ধি-উপজীব্য ধারাগুলির দ্বারা পুষ্ট নানা ধরনের নারীবাদী সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু কিছু দেশে। এই সংগঠনগুলি ট্রেড ইউনিয়নসহ সমস্ত ধরনের গণসংগঠনের বিকল্প হিসাবে নিজেদের দাবী করে।

স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পূর্বপটে শ্রমিকাদের নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এবং তার ফলে সাফল্য অর্জনের ইতিহাস রয়েছে। এই ধরনের আন্দোলন ও সাফল্য উৎসাহ যুগিয়েছে অন্যত্র শ্রমিকাদের স্বীয় সংগঠন গড়ে তুলতে।

লিঙ্গগত (জেন্ডার) বিভাজন-বৈষম্য-বিচ্ছিন্নতা, দারিদ্র্যের নারীকরণ, শিল্প-শ্রমিকাদের অব্যাহত অস্থায়ীকরণ, বাড়ীতে বসে শিল্পের জন্য কাজ (হোম-ওয়ার্কার), গ্রামীণ কাজ, স্ব-নিযুক্তি, পরিচারিকা বৃত্তি, অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ বা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে নিয়োগ ইত্যাদি ধরনের বিশিষ্টতা নারীদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে উৎসাহিত করেছে। যেসব সমাজে নারীরা কম স্বাধীনতা ভোগ করে সেখানে নারী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভব ঘটেছে কিছুটা বিদ্রোহের উপাদান হিসাবে; অন্যদিকে যে সমাজে নারীরা কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে, অর্থাৎ উন্নত দুনিয়ায়, সেখানে নারী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভব অধিকতর স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জনের জন্য। শেষোক্ত দেশগুলিতে নারী ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ কম, কিন্তু সাফল্য বেশি। তৃতীয় দুনিয়াতে নারী ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বেশি, কিন্তু সাফল্য কম। উন্নত দুনিয়ায় নারী ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা কম হলেও শ্রমিকাদের বিশেষ দাবীগুলি তারা এগিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে। সার্বিক প্রতিকূলতার জন্য তৃতীয় দুনিয়ার নারী টি. ইউ.গুলি চেষ্টা করছে সংগঠনের চরিত্রে কিছু কিছু উদ্ভাবন-ভিত্তিক পরিবর্তন আনতে। এগুলির মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে কর্মক্ষেত্রের সমস্যা ও দাবী-দাওয়া সমাধানের চেষ্টা হয়। শ্রমিকাদের সর্বক্ষণের জন্য কাজ ও আর্থিক সমস্যা সমাধানের বিকল্প ব্যবস্থা করতে কো-অপারেটিভ বা সমবায় গঠনের চেষ্টা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নারী ট্রেড ইউনিয়নগুলি এক ধরনের নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনের (এন. জি. ও.) ভূমিকাও পালন করছে—যার মধ্যে যুক্ত থাকছে নারীসমাজ ও পরিবারের উন্নয়নের কর্মোদ্যোগও।

নারী টি. ইউ.গুলির সাফল্যের বিভিন্নতা রয়েছে। এই সাফল্য প্রধানত নির্ভরশীল কি পদ্ধতিতে শ্রমিকাদের সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির সাংগঠনিক কাঠামো ও চরিত্র কি ধরনের।

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাতে কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে যেখানে সাব-কন্ট্রাক্টরি প্রথায় কাজ হয়, সেখানে ইউনিয়ন তৈরির কাজ বেশ কঠিন হয়ে পড়ে শ্রমিকাদের ক্ষেত্রে। বড় বড় কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত যে পদ্ধতিতে সংগঠন করার কাজ করা যায়, তা' অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ, স্ব-নিযুক্তিমূলক কাজ, হিডেন ইকনমিতে, বাড়িতে বসে উৎপাদন বা গৃহস্থালি কর্মে নিযুক্তদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এই ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকাদের নিয়ে তৎপরতা চালানো হয়—তাদের অবসরের সময়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া অথবা অন্য প্রকল্পে কাজ যোগাড় করে দেওয়া হয় উপার্জন বৃদ্ধির জন্য।

শ্রমিকা ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিজেদের নারী-বন্ধুত্বমূলক (উইমেন-ফ্রেণ্ডলি) ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করে নানাভাবে। বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে সমিতির পক্ষ থেকে নারীদের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বর্ধিত ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতি দান শ্রমিকাদের এই ধরনের ট্রেড ইউনিয়নে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে নিছক নারী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার জন্যই শ্রমিকা ইউনিয়ন গড়া হচ্ছে। যেসব কর্মক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিক সংখ্যা বেশি, সেখানে এই ধরনের প্রচেষ্টায় সাফল্যের তেমন নজির নেই।

ডোমেস্টিক ওয়ার্কার বা গৃহস্থালি কাজে নিযুক্ত শ্রমিকাদের সংগঠিত করার বিষয়ে

গৃহস্থালি শ্রমিকারা নিঃসন্দেহে ক্যাজুয়াল কর্মী। এটাও সত্য যে, ক্যাজুয়াল চরিত্র সমস্ত ধরনের ক্যাজুয়ালদের মধ্যে এক রকম নয়। এমনকি গৃহস্থালি কাজের ক্যাজুয়াল চরিত্রও একরকম নয় সর্বত্র।

গৃহস্থালি শ্রমিকারা যদিও বেতনভোগী, তথাপি তাদের সংগঠিত করা সহজসাধ্য নয়। তাদের কাজের ধরন-ধারণ স্বয়ং পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে।

এবার কতকগুলি দেশে এই ধরনের শ্রমিকাদের সংগঠনের পরিস্থিতি দেখা যাক।

ব্রাজিলে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ নারী শ্রমিকের মধ্যে ৩০ লক্ষ হলো গৃহস্থালি শ্রমিকা (১৯৮৫)। এদের সংগঠিত করে নারী ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে—দা ইউনিয়ন অব ডোমেস্টিক এমপ্লয়িজ (ইউ. ডব্লু. ডি. ই.)। ১৯৯১ সালে 'সিণ্ডিকেটো, ডোস্ এমপ্রেডাগোস্ ডোমেস্টিকোস্ না এরিয়া মেট্রোপলিটানা ডা সিডাডে ডি রেসিফি'-র সমীক্ষা অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে কর্মরতাদের মধ্যে সম-সংখ্যক দেশীয় ও বিদেশী নারীরা রয়েছে। ১৯৬০ সালে 'ইয়ং ক্যাথলিক ওয়ার্কার্স মুভমেন্ট' (ওয়াই. সি. ডব্লু.) এদের প্রথম সংগঠিত করা শুরু করেছিল। সমিতি গঠনের জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছিল, কেননা ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিকার স্বাক্ষর পাওয়া যাচ্ছিল না। ১৯৮৮ সালে এরা 'লাতিন আমেরিকান অ্যাণ্ড ক্যারিবিয়ান ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স কনফারেন্স-এ (বোগোটাতে অনুষ্ঠিত) প্রথম প্রতিনিধি পাঠায়। ১৯৯১ সালে, 'এস. ও. এস. সি. ও. আর. সি. ও.'—একটি নারী নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন (এন. জি. ও.)-এর সাথে ঐ সংগঠন যুক্তভাবে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তারা সংগঠন করার অধিকার, ন্যূনতম মজুরি, বছরে ১৩ মাসের বেতন, সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি, বার্ষিক ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, বরখাস্ত করতে হলে পূর্বাহ্নেই নোটিশ প্রদান, কিছু পেনশন প্রভৃতি দাবী অর্জন করেছে।

মেক্সিকো শহরে বিশের দশক থেকে গৃহস্থালি কর্মীদের সংগঠিত করার জন্য উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। চল্লিশের দশকে অস্তিত্ব ছিল কমপক্ষে চারটি অনুরূপ সংগঠনের। ১৯৪৮ সালে সেখানে জাতীয় স্তরে গড়ে ওঠে 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স'। সত্তরের দশক থেকে সেখানে গৃহস্থালি কর্মীদের অনেকগুলি ট্রেড ইউনিয়নের পত্তন হয়—'ফিমেল ইউনিয়ন অব ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স অব পোর্ট ভেরাক্রুজ', 'রেড ফিমেল ইউনিয়ন অব ডোমেস্টিক সার্ভেন্টস অ্যাণ্ড রিলেটেড ওয়ার্কার্স অব আম্বয়ে ডি এঙ্গোসটুরা', 'হোগার ডি সার্ভিডোরেস ডেমেস্টিকোর্স', 'স্যালারিজ ওয়ার্কার্স সাপোর্ট সেন্টার' (সি. এ. টি. ডি. এ.), 'সিঙ্গল ইণ্ডিপেনডেন্ট ইউনিয়ন অব ওয়ার্কার্স ইন প্রাইভেট হোমস' (এস. ইউ. আর. এ. সি. এ. পি.), 'কালেক্টিভ ফর সলিডারিটি অ্যাকশন উইথ ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স' (সি. এ. এস. ই. ডি.), 'ইউনিয়ন জুভেনাইল ডি এমপ্লিয়েডোস ডি হোগার ক্রিস্টিয়ানো' (ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন অব ইয়ং ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স) প্রভৃতি। ১৯৮৭ সালে মেক্সিকো শহরে গৃহস্থালি শ্রমিকাদের সমর্থন ও উন্নতিসাধনের জন্য গঠিত হয় 'আটাবল' (এ. টি. এ. বি. এ. এল.) সমবায়। গড়ে উঠেছে অনুরূপ আর একটি সংগঠন—'লা এস্‌সেরানঝা' (অর্থাৎ 'হোপ' বা আশা)। ১৯৮৮ সালে, মেক্সিকোর এই সমিতিগুলি—লাতিন আমেরিকার ও ক্যারিবিয়ান দেশের ১১টি জাতীয় স্তরের সংগঠনের সাথে এক 'কনফেডারেশন' গঠন করেছে। নানা আন্দোলন করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত যেটুকু জাতীয় আইন এদের জন্য প্রণীত হয়েছে তা' অস্পষ্ট ও প্রত্যাশার কাছাকাছি নয়।

নামিবিয়াতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য অর্জিত হয় মার্চ, ১৯৯০ সালে। দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন—ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব নামিবিয়ান ওয়ার্কার্স (এন. ইউ. এন. ডব্লু.) ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শক্তি। এই সংগঠনের ৭০ শতাংশ সদস্য শ্রমিকা—যাদের অধিকাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামীকে হারিয়েছে; এঁরা অনেকেই ৪-৫টি সন্তানের জননী। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গৃহস্থালি শ্রমিকারা এই সংগঠনের অভ্যন্তরেই সংগঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনের অভ্যন্তরে শেষোক্ত নারীদের জন্য গঠিত হয়েছে 'দা নামিবিয়ান ডোমেস্টিক অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। আর্থিক সীমাবদ্ধতা কাটাতে এই সমিতিকে প্রশিক্ষণ প্রভৃতি দিতে 'ট্রেড ইউনিয়ন সলিডারিটি অব ফিনল্যাণ্ড' (সাস্ক বা এস. এ. এস. কে.) এবং একটি এন. জি. ও.—'অক্সফাম' নিয়মিত সাহায্য করে।

বিদেশাগত শ্রমিকাদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা

গ্রাম থেকে শহরে এসে নারীদের কাজ খোঁজার প্রবণতা, বর্তমান শতাব্দীর শেষার্ধে পৌঁছে, এক

দেশ থেকে অন্য দেশে বৃত্তির অন্বেষণমুখী করেছে। বাড়ী ছেড়ে বিদেশে যাওয়া স্বভাবতই নারী-জীবনে নানা ধরনের বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। এছাড়া অপরিচিত ও প্রতিকূল পরিবেশের সমস্যা তো আছেই। বিদেশাগত শ্রমিকাদের অনেকে পেশাদারী যোগ্যতাসম্পন্না হওয়া সত্ত্বেও, শেষপর্যন্ত তাদের উল্লেখযোগ্য অংশকে গৃহ-পরিচারিকা বৃত্তির রোজগারে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আগত দেশে গৃহস্থালি কাজে তাদের কাজের সময়, চাকুরীর নিরাপত্তা, আর্থিক উন্নতি ইত্যাদির কোন নির্দিষ্ট সুযোগ কার্যত থাকে না।

ইতালিতে ফিলিপিনস থেকে আগত গৃহ-পরিচারিকাদের এক সংগঠন গড়ে উঠেছে—'লাইফ' (এল. আই. এফ. ই.)। সিঙ্গাপুরের সরকার প্রায় ৬৫,০০০ বিদেশাগত পরিচারিকার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এর বিরুদ্ধে এবং সেখানে কাজ করার সুযোগ অব্যাহত রাখার দাবীতে শ্রমিকারা সংগঠন গড়ে তুলেছে। হংকং-এ থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিনস, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ও শ্রীলঙ্কার গৃহ-পরিচারিকারা ১৯৮৮ সালে তৈরি করেছে 'দা এশিয়ান ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (এ. ডি. ডব্লু. ইউ.)। কানাডাতে বিদেশাগত গৃহস্থালি শ্রমিকাদের তিন বছর থাকার পর দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে টরেন্টোতে ১৯৭৯ সালে গড়ে উঠেছে, 'ইন্টারসেড' (আই. এন. টি. ই. আর. সি. ই. ডি. ই.—ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন টু এণ্ড ডোমেস্টিক এক্সপ্লয়টেশন)। কিছুটা অধিকার তারা সরকারের কাছ থেকে অর্জনও করেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফিলিপিনসের গৃহ-পরিচারিকারা গড়ে তুলছে 'এমপাওয়ারিং ফিলিপিনাস ইন ইউরোপে'। তাছাড়া ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর অনুরূপ শ্রমিকারা গড়েছে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ডোমেস্টিক এমপ্লয়িজ' (ন্যুড—এন. ইউ. ডি. ই.)।

ইউরোপের ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ফুড অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স অ্যাসোশিয়েশন (ই. ইউ. এফ.)-এর অনুমোদিত কিছু ইউনিয়নে গৃহস্থালি শ্রমিকারা সদস্যভুক্ত আছে—যেমন 'অস্ট্রিয়ান এগ্রিকালচারাল, ফুড প্রসেসিং অ্যাণ্ড ক্যাটারিং ইউনিয়ন' (এ. এন. ডি.), দা জার্মান ইউনিয়ন অব ফুড প্রসেসিং অ্যাণ্ড ক্যাটারিং ওয়ার্কার্স (এন. জি. সি.) 'দা ইটালিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স ইন কমার্স, ট্যুরিজম অ্যাণ্ড সার্ভিসেস/ইটালিয়ান জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার' (এফ. আই. এল. সি. এ. এম. এস./সি. জি. আই. এল.) প্রভৃতি।

অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে স্ব-গৃহে বসে উৎপাদনকারী শ্রমিকাদের সংগঠিত করার বিষয়ে

'হোম ওয়ার্ক' বা 'আউট ওয়ার্ক' অর্থাৎ গৃহে বসে উৎপাদনকারী শ্রমিক/শ্রমিকা বা কারখানার বাইরে উৎপাদনকারী শ্রমিক/শ্রমিকাদের সংগঠিত করার বিষয়টি আশির দশক থেকে শুরু হয়েছে। প্রথমত, হোম-ওয়ার্কের ক্ষেত্রে নতুন ধাঁচের উৎপাদন প্রণালী ক্রমবর্ধমান, দ্বিতীয়ত, হোম-ওয়ার্কার/আউট-ওয়ার্কাররা কাজ করে বিচ্ছিন্নভাবে। হোম-ওয়ার্কার বা গৃহ-কর্মীরা সাধারণভাবে নারী হওয়ায় 'ক্যাপটিভ ওয়ার্কফোর্স' বা ঘেরাবদ্ধ চরিত্র-সম্পন্ন শ্রমশক্তি; তাছাড়া তারা অধিকাংশ সময়ে উপার্জনশীল শ্রমের পাশাপাশি চিরন্তন পারিবারিক শ্রমেও নিযুক্ত। এরা অনেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু অথবা দেশান্তরিত শ্রমিকা। উপার্জনমূলক বৃত্তি যোগাড় করতে না পেরে, তারা এই ধরনের বৃত্তিতে যোগ দেয়। নারী হোম-ওয়ার্কাররা স্বল্প মজুরিভোগী হওয়ায় শ্রমিকরা সাধারণত মনে করে যে শ্রমিকারা তাদের মজুরিকে ক্ষয় করে দিচ্ছে। ফলে নারী হোম-ওয়ার্কারের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্বেষের পরিবেশ কাজ করে।

হোম-ওয়ার্কারদের সমস্যার চ্যালেঞ্জের মুখে ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়াস হলো এদের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের মতো যাতে শ্রম-আইনের ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করানো যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ধরনের কাজকে 'স্যোয়েটেড ট্রেড' বা ঘর্মাক্ত একঘেয়ে বৃত্তি বলা হতো। এই ধরনের শ্রমের ক্ষেত্রে অতীতে রাষ্ট্র নানাভাবে হস্তক্ষেপও করতো। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যাণ্ডের সরকার অতীতে এদের জন্য প্রণয়ন করেছিল ন্যূনতম মজুরির আইন, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রমিকাদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পরিদর্শকদের দিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা প্রভৃতি। অথচ এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দাবী ছিল হোম-ওয়ার্ক প্রথা আইনানুগভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়নগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল সরকারকে

দিয়ে হোম-ওয়ার্ক সম্পূর্ণ অবৈধ করাতে, ১৯৬৪-তে আই. এল.ও.-র পৃষ্ঠপোষণাতে পোষাক শিল্পের ত্রিপাক্ষিক টেকনিক্যাল কমিটির যে সভা হয় সেখান থেকেও এই শিল্পে হোম-ওয়ার্ক প্রথা শেষ পর্যন্ত তুলে দেবার 'নীতিগত' প্রস্তাব করা হয়েছিল। কেবলমাত্র প্রতিবন্ধী ও কয়েকটি বিশেষ ধরনের মানুষের জন্য ছাড়ের কথা বলা হয়েছিল, যাদের কারখানাতে গিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়; যদিও ঐ সম্মেলন একই সাথে বলেছিল যে অবিলম্বে এই প্রথার বিলোপ সম্ভব নয়, তবে এদের জন্য সরকারী শ্রম-আইন দ্রুত সর্বত্র চালু হওয়া দরকার।

পূর্বোক্ত কাল-পর্বে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির ইউনিয়নগুলি হোম-ওয়ার্কারদের সংগঠিত করতে না পারলেও বিকল্প খুঁজেছিল পূর্বোক্ত ধরনের আইনি তৎপরতা ও ব্যবস্থার মধ্যে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি তখন মনে করতো যে এই প্রথা ঊনবিংশ শতকের প্রাচীন উৎপাদনের অনুসারী। সুতরাং উৎপাদনের রূপের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে এই প্রথা আপনা-আপনি বিলুপ্ত হবে, এই অংশের দারিদ্র্যের অবসানও ঘটবে। কিন্তু পরবর্তীকালে শিল্প-বিকাশের প্রক্রিয়া ও চরিত্র সেই আশা পূরণ করেনি।

প্রকৃত ঘটনা হলো যে এই ব্যবস্থা কখনো বিলুপ্ত হয়নি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের নারীরা যুদ্ধ-বিমানের যন্ত্রাংশ যুক্ত করার কাজ বাড়ীতে বা গ্যারেজে বসে করতেন।

সত্তর ও আশির দশকে উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে দেশসমূহে হোম-ওয়ার্ক প্রথা অবিশ্বাস্য ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। নতুন শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ও অবিভাজ্য অংশ হয়ে ওঠে এই প্রথা। অক্টোবর, ১৯৯০-তে আই. এল. ও.-র 'এক্সপার্ট কমিটির মিটিং'-এ প্রতিভাত হয় যে একই কারখানার উৎপাদন দুই দেশে করানো অথবা কোন কোন দেশে 'সাব-কন্ট্রাক্টিং' বা উপ-ঠিকাদারী ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের ফলে এই প্রথা বাড়ছে। ১৯৮৯ সালে কাউন্সিল অব ইউরোপের রিপোর্টেও ইউরোপীয় দেশগুলিতে ব্যবস্থাটির প্রসারের পিছনে অনুরূপ কারণ নির্দেশ করা হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে গৃহ-শ্রমিকাদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে শুরু করেছে। কানাডাতে ১৯৯১ সালে গড়ে ওঠে 'ইন্টারন্যাশনাল লেডিজ গারমেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (আই. এল. জি. ডব্লু. ইউ.)। তার আগে থেকেই ইহুদী, ইতালীয়, চৈনিক, ভিয়েতনামী ও হংকংয়ীয় শ্রমিকাদের আলাদা আলাদা অনুরূপ সংগঠন গড়ে উঠছিল, যেগুলির নাম সাধারণভাবে ছিল 'হোম-ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন' (এইচ. ডব্লু. এ.)। এছাড়া পরবর্তীকালে গঠিত হয়েছে 'কোয়ালিশন ফর ফেয়ার ওয়েজেস অ্যাণ্ড ওয়ার্কিং কণ্ডিশন ফর হোম-ওয়ার্কার্স', 'সেন্টার ফর রিসার্চ অন ওয়ার্ক অ্যাণ্ড সোসাইটি' 'চাইনিজ ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন', 'কোয়ালিশন ফর ভিজিবল মাইনরিটি উইমেন', 'ইক্যুমেনিকাল কাউন্সিল ফর ইকনমিক জাস্টিস', 'লেবার কাউন্সিল অব মেট্রো টরেন্টো অ্যাণ্ড ওর্ক রিজিয়ন', 'মুজের এ্যা মুজের', 'ন্যাশনাল অ্যাকশন কমিটি অন স্ট্যাটাস অব উইমেন', 'এন. ডি. পি. স্প্যাডিনা ট্রিনিটি রাইডিং অ্যাসোসিয়েশন', 'অন্টারিও কোয়ালিশন ফর বেটার চাইল্ডকেয়ার', 'পার্কডেলে কমিউনিটি লিগাল সার্ভিসেস ক্লিনিক', 'ওয়ার্কার্স ইনফরমেশন অ্যাণ্ড অ্যাকশন সেন্টার অব টরেন্টো' ইত্যাদি।

নেদারল্যাণ্ডসে 'ন্যাশনাল হোম-ওয়ার্ক সাপোর্ট সেন্টার' (এইচ. এস. সি.) ও 'উইমেন্স ইউনিয়ন', অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে অনুরূপ ইউনিয়ন, ইংলণ্ডে বিভিন্ন 'হোম-ওয়ার্কিং গ্রুপ', মেক্সিকোতে 'গারমেন্ট ইউনিয়ন' এবং সম্প্রতি হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশেও হোম-ওয়ার্কারদের বহু সংগঠন গড়ে উঠেছে। বুরকিনা ফাঁসেতে 'দা কিসিন-ন্যাটেনগা উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন', কোটে ডি আইভরিতে 'দা ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ইনফর্মাল সেক্টর উইমেন' (এস. ওয়াই. এস. এ. এফ. এম. আই.), ইতালিতে 'ফিলটিয়া' শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে।

গ্রামীণ ক্ষেত্রের শ্রমিকাদের সংগঠন

গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারীরা তৃতীয় দুনিয়ার সমস্ত দেশে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও রুরাল ওয়ার্কার্স অরগাইজেশনগুলি (আর. ডব্লু. ও.) তথা গ্রামীণ শ্রমিক সংগঠনগুলি অথবা ট্রেড ইউনিয়ন নারীদের সংগঠিত করার ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেয়নি অতীতে। দেশে দেশে গ্রামীণ

শ্রমিকদের সংগ্রামের ফলে তাদের জন্য নানাবিধ রাষ্ট্রীয় আইন গৃহীত হয়েছে ঠিকই কিন্তু শহুরে ও সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকাদের জন্য প্রযুক্ত আইন সমূহের সুযোগ অধিকাংশ দেশে বিশেষত অনুন্নত দেশগুলিতে, গ্রামীণ শ্রমিকাদের নেই বললেই চলে। তদুপরি সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ ক্ষেত্রের শ্রমিকাদের জন্য যেসব আইন রয়েছে, তা' প্রায়শই অকার্যকর; উপযুক্তভাবে আইন প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, তা' পরিদর্শনে সুষ্ঠ ব্যবস্থাও তেমন নেই। স্বভাবতই গ্রামীণ শ্রমিকাদের মধ্যে এই ধরনের উপেক্ষার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হওয়ার কিছুটা সর্বজনীন প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব প্ল্যান্টেশন, এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স-এর (আই. এফ. পি. এ. এ. ডব্লু.) পঞ্চম কংগ্রেসে এই প্রবণতার উল্লেখ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে নরওয়ে সরকারের অর্থানুকূল্যে আই. এল. ও. এই প্রবণতা রোধ করে, ট্রেড ইউনিয়নে গ্রামীণ ক্ষেত্রের নারীদের সংযুক্ত করার জন্য, বেশ কয়েকটি দেশে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে। এসব নিছক আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল। গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীদের সমস্যাবলীর উপযুক্ত সমাধান-সূত্র এইসব প্রশিক্ষণে না থাকায় তেমন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়নি। তবে আফ্রিকার কতকগুলি দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি বাধ্য হয়েছে গ্রামীণ ক্ষেত্রের নারীদের জন্য স্বতন্ত্র এবং প্রায় স্বয়ংশাসিত সংগঠন গড়ে তুলতে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে জেনারেল এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স অব জিম্বাবোয়ে' (জি. এ. পি. ডব্লু. ইউ. জেড.), উগাণ্ডার 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব প্ল্যান্টেশন অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স' (এন. ইউ. পি. এ. ডব্লু.), 'কেনিয়া প্ল্যানেটেশন অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (কে. পি. এ. ডব্লু. ইউ.), 'উইমেন্স কাউন্সিল অব জিম্বাবোয়ে কংগ্রেস অব ট্রেড ইউনিয়নস্ (জেড. সি. টি. ইউ.) প্রভৃতি। ভারতেও কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠন অনুরূপ উদ্যোগ নিয়েছে। ফিলিপিনসে 'অ্যাসোসিয়েটেড লেবার ইউনিয়নস' (এ. এল. ইউ.), 'ফার্মস গ্রোয়ার্স অরগানাইজেশন' (এফ. জি. ও.), 'ফেডারেশন অব অ্যাগ্রেরিয়ান অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল টয়লিং হ্যাণ্ডস' (ফেইথ—এফ. এ. আই. টি. এইচ.), 'লাকাস নাঙ্ ম্যাগসাসাকাঙ্ ফিলিপিনো' (এল. এস. পি.), 'পামব্যাসাঙ্ কিলুসান নাঙ্ পাগ্গাওয়া' (কিলুসান), শ্রীলঙ্কাতে 'লঙ্কা জাথিকা এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (এল. জে. ই. ডব্লু. ইউ.) প্রভৃতি হলো এই ধরনের সংগঠন।

মধ্য-আমেরিকা ও ডোমিনিকান রিপাব্লিকে কেবলমাত্র গ্রামীণ ক্ষেত্রের নারীদের নিয়ে অজস্র ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। এই ধরনের রুরাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নগুলিতে সরাসরি সদস্য হওয়া যায়। আর কতকগুলি সংগঠন রয়েছে যেগুলি ফেডারাল চরিত্রের—সমিতিসমূহ এগুলির সদস্য। শেষোক্তগুলির মধ্যে রয়েছে কোস্টারিকার এফ. ই. সি. সি. সি. (ক্রিশ্চিয়ান এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অব কোস্টারিকা) ও এফ. ই. এস. আই. এ. এন. (ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন), ডোমেনিকান রিপাব্লিকের 'কোনামুকা' (ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব উইমেন এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স), 'ফেডেলাক' (ডোমিনিকান ফেডারেশন অব ক্রিশ্চিয়ান ওয়ার্কার্স লীগ), 'ফেনাজুকার' (ন্যাশনাল ফেডারেশন অব সুগার অ্যাণ্ড প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স) ও 'আনাক' (ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন), হণ্ডুরাসে 'অ্যামাচ্' (ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব হণ্ডুরান এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স) 'কোডিমকা' (কাউন্সিল ফর দা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব উইমেন এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স) এবং 'সিট্রাটেরাকো' (টেলা রেলরোড কোম্পানি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন), নিকারাগুয়াতে এ. টি. সি. (ফার্ম ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন), পানামাতে 'সিট্রাচিল্‌কো' (চিকিকুয়ি ল্যাণ্ড কোম্পানি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) প্রভৃতি।

এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে নারীদের সংগঠন

'আনবার্গেনেবল' এবং 'ইউনিয়ন-ফ্রী জোন' বলে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলিকে পরিচিত করানো এবং সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে এই শ্রমিকদের সদস্যভুক্তির হার যৎসামান্য হলেও, এরা এখন আর পিছিয়ে থাকছে না। তুলনামূলকভাবে ই.পি. জেড.-এর নারী সংগঠনগুলির চরিত্র পুরোপুরি ট্রেড ইউনিয়ন ধাঁচের পরিবর্তে অনেকটাই সমবায়মূলক। বৃত্তির জন্য ট্রেনিং, ঋণ দেওয়া,

আমানত করা, দুরবস্থায় পড়লে সাহায্য করা, সমস্যা দেখা দিলে কর্তৃপক্ষকে চিঠিপত্র লেখার খসড়া তৈরি, আইনের সাহায্য দান প্রভৃতি এইগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়। আবার কোথাও কোথাও যৌথভাবে দাবী পেশ, প্রচার, আন্দোলন প্রভৃতিও সমিতিগুলি করে থাকে। মরিশাসের ই.পি.জেড.-এ গড়ে উঠেছে 'দা মরিশাস টেক্সটাইল অ্যাণ্ড গারমেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (এম.টি. অ্যাণ্ড. জি. ডব্লু. ইউ.) এবং 'মরিশাস ফ্রী জোন অ্যাণ্ড সেকেণ্ডারি ইণ্ডাস্ট্রিজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন', ফিলিপাইনসের বাটানা, বাগুইও, কাইটি ও ম্যাকটান ই. পি. জেড.-এ বিভিন্ন সমিতি, মালয়েশিয়ার পেনাং-এ, ডোমিনিকান রিপাব্লিকে ফ্রী ট্রেড জোন ইণ্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন—'এডোজোনা' এবং 'সান পেড্রো ডি ম্যাকারিস ফ্রী জোন ট্রেড ইউনিয়ন' (এস. পি. এম. এফ্. জেড. ইউ.), জামাইকাতে 'দা সেন্ট পিটার ক্ল্যাভার ফ্রী জোন উইমেন্স গ্রুপ', শ্রীলঙ্কাতে 'লীগাল অ্যাডভাইস সেক্টর' (এল. এ. সি.), ডোমিনিকান রিপাব্লিকে 'সেন্ট্রো ডি ইনভেস্টিগেশিয়ান পরো লা ড্যামিওন ফেমিনো' (সি. আই. পি. এ. এফ.), মেক্সিকোতে 'কমিউনিকেশন, ইন্টারচেঞ্জ অ্যাণ্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন ল্যাটিন আমেরিকা' (সি. আই. ডি. এইচ. এ. এল.) প্রভৃতি হলো ফ্রী ট্রেড জোনের শ্রমিকাদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন।

ফ্যাসিবাদী চরিত্রের সংগঠন ও আন্দোলনের উত্থান

সমাজ-মানসে ও সংস্কৃতিতে পরম্পরাগত ভাল ও মন্দ উপাদানগুলির কোনটির চিরকালের জন্য অবসান ঘটেছে এমন ইতিহাস সাধারণভাবে পাওয়া যায় না। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নতুন ভাল ও মন্দ উপাদানের আবির্ভাব ঘটে এবং সেগুলি প্রভূত্বও করে, কিন্তু পুরাতনগুলির অবসান ঘটে না পুরোপুরি। এমনকি একটি পর্যায়ে পৌঁছে পুরাতন শ্রেণীগুলির এবং সেগুলির কোন কোনটির কর্তৃত্বের অবসান ঘটা সত্ত্বেও সেগুলির বহু প্রবণতা ও উপাদান নতুন উদ্ভূত শ্রেণীগুলির মধ্যে সুপ্তভাবে থেকে যায়, কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে পুরাতনগুলি নতুন সমাজ-মানসে ফিরে আসে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ও কিছুকালের জন্য সমাজের ব্যাপক মানুষকে প্রভাবিত ও আন্দোলিত করতে থাকে। সুতরাং সমাজ-বিকাশের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলির অবসানের সাথে সাথে সেইসব শ্রেণী-মূল্যবোধের অবসানের ধারণা অনৈতিহাসিক। 'সিজারিজম' বা সিজারবাদ, 'ক্রমওয়েলিজম' বা ক্রমওয়েলবাদ, 'রোবস্পিয়ারিজম' বা রোবস্পিয়ারবাদ, 'বোনাপার্টিজম' বা বোনাপার্টবাদ, 'বিসমার্কিজম' বা বিসমার্কবাদ অথবা 'হিটলারিজম' বা হিটলারবাদ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট যুগ-ব্যবস্থায়, রকম-ফেরে, একই মতবাদ ও কার্যকরী শক্তি ছিল। এমনকি, হিটলারের পতনের পর লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশে সর্বময় কর্তৃত্ববাদী শক্তি, ধারণা ও ব্যবস্থার অব্যাহত উপস্থিতি ঘটেছে, আজও রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে শ্রেণী-একনায়কত্বের অভ্যন্তরে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা সব সময়ে সক্রিয় থাকায় পরবর্তী ইতিহাসে সেই ধরনের উপাদানের অব্যাহত উপস্থিতির মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই।

ইউরোপের বহু দেশে এবং অতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতেও ফ্যাসিবাদ বা অনুরূপ ধরনের প্রবণতা, সংগঠন ও আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছে। এইসব ঘটনায় সমাজতাত্ত্বিকদের কোন কোন অংশের মধ্যে কিছুটা বিস্ময় লক্ষ্য করা যায়। এই বিস্ময়ের কারণ সম্ভবত এই যে নাজিবাদের পতনের মর্মকে কিছুটা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদ বা নাজিবাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরাজিত ও উৎখাত হয়েছিল—এই সরলীকরণের মধ্যে সেই ভ্রান্তি ছিল। রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সমরাঙ্গনে ঐ শক্তিকে পরাস্ত করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু মতাদর্শ, শ্রেণী, সংস্কৃতি ও সমাজের বাস্তবতার স্তরে নয়। তার প্রধান কারণ হলো, উভয় মতবাদ ও ব্যবস্থার মূল সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার—আদৌ উচ্ছেদ ঘটেনি। এই ঐতিহাসিক সত্যের অবিলম্ব প্রমাণও ছিল। রোজার এটওয়েট তাঁর 'ফ্যাসিজম' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে ১৯৪৫ সালে নাজিবাদের পতনের মাত্র এক বছর পর জার্মানিতে ৪৮ শতাংশ মানুষ ও ১৯৪৯ সালে ৫৯ ভাগ মানুষ নাজিবাদের নীতিকে সমর্থন করতো। ১৯৪৬ সালে, ইতালির রোম ও নেপলস-এর নির্বাচনে এরা ২০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম জার্মানির নির্বাচনে এরা পেয়েছিল ১০.৫ ভাগ ভোট। ফ্যাসিবাদের উত্থানের পর তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের যে

সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা' কার্যত কোথাও ফলবতী হয়নি, কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি। ইউরোপ, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার যে সামান্য কয়েকটি দেশে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির প্রত্যেকটির নেতৃত্বে ছিল বুর্জোয়ারা। ফ্যাসিবাদ-দখলীকৃত দেশগুলির বাইরে স্ব স্ব দেশে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করেছিল সংশ্লিষ্ট সেইসব দেশের বুর্জোয়ারা ও রাষ্ট্রশক্তি। এই ঘটনার সবচাইতে বড় নজির হলো গ্রেট ব্রিটেন। অন্যদিকে মিত্রপক্ষের সামরিক বাহিনী পরাস্ত করেছিল নাজি-পদানত দেশগুলির ফ্যাসিবাদী শক্তিকে। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের নাজি-অধিকৃত কতকগুলি দেশে কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্যদের গেরিলা ও পার্টিজান বিপ্লবী যুদ্ধ চলেছিল ঠিকই। কিন্তু রুশ রেড আর্মিই, অন্তিম বিচারে, এই দেশগুলিতে নাজি-শক্তিকে পরাস্ত করেছিল। পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্টদের অব্যাহত প্রয়াস ও বিপুল আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, সর্বাংশের জনগণকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমবেত করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে জনগণকে সমবেত করে আন্দোলনের মাধ্যমে নাজিবাদকে পরাস্ত করার পরিবর্তে জাতীয় বুর্জোয়ারা প্রশাসনিক ও আইনি দমন ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক নির্বাচনের মাধ্যমে সফল হয়েছিল। জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ কার্যত কোন অধ্যায়ে ছিল না। ফলে মতবাদগত ও সামাজিক স্তরে ঐতিহাসিকভাবেই, ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদ পরাস্ত হয়নি।

প্রাক-সত্তরের দশকের ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদের মতবাদ, সংগঠন ও প্রচারের দিনগুলি সম্পর্কে রোজার গ্রিফিন ও রোজার এটওয়েট তাঁদের রচিত দুই পুস্তকে নানা তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু সর্বাধুনিক ঘটনাবলীকে পুরোপুরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরম্পরা হিসাবে মনে করার বাস্তব কোন কারণ নেই। কেননা, ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত পালমো সম্মেলন থেকে 'পালমো আন্তর্জাতিক' গঠন ও গৃহীত ঘোষণাপত্রের সাথে আধুনিক ফ্যাসিবাদের বক্তব্য ও ভূমিকার খুব সুস্পষ্ট মিল নেই। তাছাড়া আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন—দুই মহাশক্তির বিরুদ্ধে ও তৃতীয় শক্তি হিসাবে এদের আবির্ভাবের সেই সময়ের আকাঙ্ক্ষা ও ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতও পরিবর্তিত হয়েছে। পালমো-ফ্যাসিবাদের ইউরোপীয় সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন, পরোক্ষে, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট এবং অতি সম্প্রতি (১৯৯৭) 'ন্যাটো'র সম্প্রসারের মধ্য দিয়ে পূরণ হয়েছে। তবে এইসব সম্পন্ন হয়েছে ফ্যাসিবাদের দ্বারা নয়, ইউরোপের দেশগুলির বুর্জোয়া শাসক দলগুলির দ্বারা। এমনকি কর্পোরেট রাষ্ট্রের মাধ্যমে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণের অভিলাষ বর্তমান বিশ্ব-পুঁজিবাদের ব্যাপক তৎপরতার মধ্য দিয়ে অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। সুতরাং আধুনিক ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বা তার পূর্ববর্তী প্রবাহের সরাসরি উত্তরসূরি নয়। বরং বলা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনোন্মুখ মুহূর্ত ও বিশ্ব-পুঁজিবাদের নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাতের সংযোগ মুহূর্ত থেকে এই নয়া-ফ্যাসিবাদের উদ্ভব। যদিও একথা সত্য যে সত্তরের দশকে ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার পতন তথা বিশ্ব-পুঁজিবাদের প্রবল সংকটই এই ধরনের শক্তির আবির্ভাবের বাস্তব সামাজিক ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী এক দশকের মধ্যে পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। কমিউনিজমের প্রতি বিদ্বেষ ও জিঘাংসার প্রত্যক্ষ প্রয়োগের সুযোগ সাময়িকভাবে সামনে না থাকায় এদের দাবীর চরিত্র ও ভূমিকাতেও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং নতুন পটভূমিকার ভিত্তিতে বলা যায় যে বর্তমান ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ও শক্তিগুলি কার্যকালে নতুন বিশ্ব-পুঁজিবাদের দ্বারা সৃষ্ট।

১৯২০ থেকে ৪০-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় ৪৩টি দেশে নানা প্রকরণে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। ইউরোপের সর্বোন্নতগুলি ছাড়াও কম উন্নত দেশগুলি, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কলোনিগুলিতে সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ফ্যাসিবাদের কম-বেশি প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু এবারে এটি প্রধানত সীমাবদ্ধ ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে এবং গতবারের প্রভাবের বাইরে এখনো পর্যন্ত একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতে, অতি সম্প্রতি নিউজিল্যাণ্ডে। ইউরোপের জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এদের ভূমিকা এক ধরনের ও উগ্র। কিছুটা ভিন্ন চরিত্রের ও কম উগ্র হলেও নয়া-ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান ঘটেছে প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির

মধ্যে রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, বসনিয়াসহ প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ার দেশগুলিতে এবং ইন্দোনেশিয়া, চিলি, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভারত প্রভৃতি দেশে। শেষোক্তদের তৎপরতা নব্বই-এর দশক থেকে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয়তাবাদী সামাজিক আন্দোলনের নামে আবির্ভূত হলেও, এদের রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উত্থানের চেষ্টাও কোন কোন দেশে রয়েছে। নিজস্ব নানা নাম ছাড়াও এদের প্রধানত অভিহিত করা হচ্ছে নিও-ফ্যাসিস্ট, নিও-নাজি, পোস্ট-ফ্যাসিস্ট, নিউ-রাইটস, ইউনিভার্সাল ফ্যাসিস্ট, ইউরো-ফ্যাসিস্ট বলে। দেশে দেশে এদের একাধিক সংগঠন রয়েছে এবং সেগুলির রয়েছে স্বতন্ত্র নাম। এই শক্তিগুলির সামাজিক ভিত্তি প্রধানত বেকার, কলকারখানা থেকে ছাঁটাই শ্রমিক, শহরে নিম্ন-বিত্ত পরিবারের মানুষ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিপ্রাপ্ত দুষ্কৃতকারীরা। এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অতি সামান্য ক্ষেত্রেই শ্রেণী হিসাবে বৃহৎ বুর্জোয়াদের সমর্থন রয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশের এইসব সংগঠন ও আন্দোলনের প্রতি। তবে এগুলির সাথে 'আণ্ডারওয়ার্ল্ডে'র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কোন কোন দেশে আশির দশক থেকে এইসব সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং এদের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা নেওয়া হতে থাকে। অনুন্নত দেশগুলির কোথাও কোথাও এরা দেশীয় শাসকশ্রেণীর এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগী হিসাবে ভূমিকা পালন করে আসছে। মধ্য-আশির দশক থেকে ইউরোপের কোন কোন দেশের পার্লামেন্ট বা লোকাল কাউন্সিলের নির্বাচনে এইসব দল ৫ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ভোট ও সামান্য কিছু আসনও পেতে থাকে।

ইউরোপের দেশগুলিতে এইসব সংগঠনগুলি প্রধানত যে বক্তব্য, লক্ষ্য ও দাবী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে তা' হলো বিদেশী-বিতাড়ন, বৃত্তিতে বহিরাগত নিয়োগ বন্ধ ও বিদেশী কর্মরতদের ছাঁটাই, শহরাঞ্চলে বিদেশীদের বসবাস নিষিদ্ধ এবং কৃষ্ণ ও পীত বর্ণ-বিদ্বেষবাদ। অতীতের নাজিবাদ আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার বিষয়ে তাত্ত্বিক বক্তব্য গঠন করেছিল। বর্তমানের ফ্যাসিস্তরা রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার বিষয়টিকে আড়াল করতে বর্ণ-বিদ্বেষের আবরণকে বেছে নিয়েছে। ব্যাপক বেকারী থেকে পরিত্রাণে শ্রমের জগৎ থেকে বিদেশীদের বিতাড়ন করে দেশীয়দের নিয়োগের স্লোগান তুলে বর্ণ-বিদ্বেষকে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এই বক্তব্য পরোক্ষে জনগণকে আকৃষ্ট করছে। মধ্য-আশির দশক থেকে পূর্বে উল্লেখিত ইউরোপের দেশগুলির অনেকগুলি শহরে বড় বড় মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা কিসিমের ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলির দ্বারা। জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশে এরা স্বস্তিকা চিহ্ন-খচিত পতাকা, প্রাক্তন নাজি আধা-সামরিক সংগঠনগুলির অনুকরণে প্যারেড ও অভিবাদন, স্লোগান ইত্যাদি দিয়ে থাকে। পুরুষ ও নারী-নির্বিশেষে এরা একই ধরনের পোষাক ব্যবহার করে এবং প্রকাশ্যে ও জনজীবনে রূঢ়তা ও জঙ্গীপনা প্রদর্শন করে। মিছিল, সমাবেশ বা প্যারেডের সময়ে রাস্তাঘাট, যানবাহন প্রভৃতি জোর করে বন্ধ করে দেওয়া, পথচারী, গাড়ী, সরকারী অফিস ও দোকানের উপর হামলা চালানো প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে পুলিশের সাথে এদের তুমুল সংঘর্ষ এবং তারপর শহরে দাঙ্গা বাঁধানোর বহু ঘটনাও পর পর ঘটেছে। প্রকাশিত তথ্য থেকে এটাও জানা যাচ্ছে যে প্রকাশ্যে কঠোর নীতিবাদিতা প্রচার করলেও এইসব গোষ্ঠীর মানুষেরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত জীবনে চরম অমিতাচারী।

ইউরোপের বহু শহরে পীতকায় বিশেষত ভিয়েতনামী, ফিলিপিনীয়, দক্ষিণ কোরীয়, ইন্দোনেশীয়, মালয়েশীয়, হিস্পানি, লাতিন আমেরিকান মানুষ, বিশেষত শ্রমজীবী, তাদের পরিবার, বাড়ী ও বসত এলাকার উপর এদের সশস্ত্র ও হিংসাশ্রয়ী আক্রমণ বারে বারে সংঘটিত হচ্ছে। গৃহদাহ, লুঠ, মারধোর এবং অনেকগুলি ক্ষেত্রে খুনের ঘটনাও ঘটেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষদের কর্মক্ষেত্র বা প্রকাশ্যে টিটকারি দেওয়া ও হুমকি প্রদর্শনের ঘটনা প্রতি বছর, সরকারী হিসাবে, কয়েক সহস্রাধিক করে ঘটে এবং তা' ক্রমবর্ধমান। এদের পক্ষ থেকে কিছুটা অনুরূপ মনোভাব ও আচরণ লক্ষ্য করা যায় কৃষ্ণবর্ণের আফ্রিকান-ইউরোপীয়, ইউরোপীয়দের বর্ণ-সংকর এবং লাতিন আমেরিকান এবং কৃষ্ণবর্ণের নারীকে বিবাহকারী শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে। সমস্ত আক্রমণ প্রধানত সংঘটিত হচ্ছে পূর্বোক্ত ধরনের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে।

জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে এই নয়া-ফ্যাসিস্তরা উগ্র জাতীয়তাবাদী কিছু কিছু স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়নও গঠন করেছে। এরা শ্রমিকদের সর্বজনীন সমস্যা ও দাবী-দাওয়ার পরিবর্তে দেশীয় শ্বেতকায়দের জন্য শেষ সুযোগ-সুবিধা দাবী করে ও বিদেশী শ্রমিকদের স্বার্থের বিরোধিতা করে। এদের দ্বারা আন্দোলন ও ধর্মঘটের বিরোধিতা বা ভাঙ্গার নজিরও রয়েছে। ধ্রুপদী নাজিবাদের কালে নাজি ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্যের মধ্যে মার্কসবাদ এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধিতার প্রধান দিকটি বর্তমান ফ্যাসিস্তদের সামনে ততটা প্রখর না থাকলেও অন্য কিছু দিকের মিল রয়েছে। জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ার নামে ধর্মঘটের বিরোধিতা, শ্রমিক-মালিক সমঝোতা করে উৎপাদন এবং পরোক্ষে শ্রেণী-সমন্বয়বাদিতার আদর্শে শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস বর্তমান ফ্যাসিস্তদের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হচ্ছে। তবে এই প্রবণতা ইউরোপীয় দেশগুলির বর্তমান ফ্যাসিস্তদের ক্ষেত্রে যতটা বাস্তব, তার চেয়ে বেশি বাস্তব তৃতীয় দুনিয়ার পূর্বে উল্লেখিত দেশগুলির ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির ক্ষেত্রে। সেকারণে তৃতীয় দুনিয়ার ফ্যাসিস্তদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি জাতীয় বুর্জোয়াদের অনুগামী ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রায় সহযোগী ভূমিকা পালন করে থাকে।

নতুন বিশ্ব-বাস্তবতায় ট্রেড ইউনিয়ন

নব্বই-এর দশক শ্রমজীবীদের সামনে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে। এই চ্যালেঞ্জের অজস্র দিক থাকলেও কেন্দ্রীয় চ্যালেঞ্জটি হলো "আধুনিক প্রযুক্তি শেষ পর্যন্ত এমন স্তরে উন্নীত হয়েছে যার দ্বারা মনুষ্য-শ্রমিককে অপ্রয়োজনীয় ক'রে তুলেছে।" দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্য, সংগঠন, দেশ, অঞ্চল, ক্ষেত্র ইত্যাদি নির্বিশেষে কর্মজীবীদের সামনে এসেছে এই চ্যালেঞ্জ। ঐতিহাসিক পরম্পরা, ধনতন্ত্রের খোলস পরিবর্তন এবং আধুনিক বিশ্বের নানা ঘটনাবলী ও সৃষ্ট পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এবং একই সাথে বিশ্ব-শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে শ্রমিকশ্রেণী, সংগঠন, আন্দোলন, চেতনা, ঐক্য ইত্যাদিকে পর্যুদস্ত করার জন্য এক ধরনের আগ্রাসন শুরু হয়েছে। সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার নামে এখন আক্রমণ শুরু হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বকেই বাতিল করার। উৎপাদনের অখণ্ডনীয় তিন মূল উপাদান—প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম ও মূলধন থেকে মনুষ্য-শ্রমকে উচ্ছেদ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। মনুষ্য-শ্রমকে অপাংক্তেয় করতে পারলে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বকেই কার্যকালে বাতিল করা সম্ভব, সম্ভব ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে নির্মূল করা। দেখা যাচ্ছে যে তথাকথিত বাম-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এই ধরনের মনোভাব যথেষ্ট সক্রিয়। আঁদ্রে গরজ-এর 'ফেয়ারওয়েল টু ওয়ার্কিং ক্লাস', জর্জ গিলডার্স-এর 'মাইক্রোকসম', জেরেমি রিফকিনস-এর 'এণ্ড অব ওয়ার্ক', স্ট্যানলি আরনউইজ ও উইলিয়াম ডি' ফাজিও-এর 'জবলেস ফিউচার' প্রভৃতি পুস্তক প্রস্তাব করেছে শ্রমের জগৎকে এমন হতবিহ্বলকর ভবিষ্যতে পৌঁছে দেবার।

এই ধরনের সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে পুঁজিবাদের 'হিডেন এজেণ্ডা' তথা গোপন ষড়যন্ত্র যাই থাক না কেন অথবা মূলধনের নতুন বিশ্বায়নের তৎপরতার ভাল বা মন্দ, কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত দিকগুলি বা সেটির চুলচেরা বিচার যে ভাবেই করা হোক না কেন কিংবা তার ফলাফল সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তই হোক না কেন, একটি বিষয় সাময়িকভাবে হলেও বর্তমানে হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয়, মূলধন বিশ্ব-নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই এই কঠিন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারছে না ট্রেড ইউনিয়ন। কেননা এই উপাদানটির সাথে গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভব, বিকাশ ও ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ। মূলধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভব সত্ত্বেও, কার্যকালে পুঁজিবাদকে স্বীকার করে নিয়ে, জন্মলগ্ন থেকে সেটির অভ্যন্তরেই নিজের স্থান করে নিয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর এই অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংগঠন। পুঁজির কর্তৃত্বকে ধ্বংস করে নিজেকে মুক্ত করার যে সুযোগ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কিছুকালের জন্য কিছু দেশে শ্রমিকশ্রেণী পেয়েছিল, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সেইসব দেশে ট্রেড ইউনিয়নকে আবার ফিরতে হয়েছে পুঁজিতন্ত্রের জঠরে। প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের ঘটনাবলীকে দেখিয়ে, আধুনিক বিশ্বকে পুঁজিবাদী সমাজতাত্ত্বিকরা

খানিকটা ব্যঙ্গাত্মকভাবে পরিস্থিতিকে চিত্রিত করতে চাইছেন "ফ্রম ক্যাপিটালিজম টু ক্যাপিটালিজম, ভায়া সোস্যালিজম"। যাই হোক, উত্থান-পতন, অগ্রগতি-পশ্চাৎগতি, বিবর্তন-পরিবর্তনের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে দ্বন্দ্ব-ঐক্যের ডাইলেকটিকসে পুঁজিবাদের পাশাপাশি স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নিজেও সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি কালের অংশ হয়ে উঠেছিল। ট্রেড ইউনিয়নের এই ঐতিহাসিক পরম্পরার দিকটি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই প্রক্রিয়ায় মূলধনের শোষণ ও পুঁজিবাদের বিকাশের প্রত্যেকটি অধ্যায় সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ ও সংহতিসাধন ঘটেছে, অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া পুঁজিবাদ চলতেও পারেনি। কিন্তু এখন এই অবস্থার থেকে ব্যতিক্রম ঘটানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে; মনুষ্য-শ্রম তথা শ্রমিকশ্রেণী তথা ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া এক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পত্তন করতে চায় বিশ্ব-মূলধন।

পুঁজি থেকে শ্রমকে তথা পুঁজিবাদ থেকে ট্রেড ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন ও তাৎপর্যহীন করার দাবীর পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা তার কোন সম্ভাবনা না থাকলেও, ঐ শ্লোগান উত্থাপন ও সেটির অনেকটা বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির জন্য চেষ্টার প্রবল চাপের ফলে ট্রেড ইউনিয়নকে স্বয়ং নিজ দুর্বলতাগুলি ও সেগুলির কারণ খুঁজতে হচ্ছে। এবং এই অনুসন্ধান কেবল বর্তমানের মধ্যে নয়, পূর্ব ইতিহাস ও পরম্পরার মধ্যেও খোঁজার প্রয়োজন হচ্ছে। কেননা দেশ, এলাকা বা ক্ষেত্র-ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন, সবল বা দুর্বল যাই হোক না কেন, শ্রেণী-সংগ্রামের অন্তঃশক্তি হিসাবে কোথাও ও কখনো দুর্বল নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়নের বর্তমানে কোণঠাসা-অবস্থা, নিছক পুঁজি ও পুঁজিবাদের আক্রমণের ফল মাত্র নয়, অভ্যন্তরীণ কারণও এজন্য দায়ী অনেকটাই। কতকগুলি প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশের বিপর্যয়ের সাথে বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়নের বিপর্যয়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়নের বর্তমান বিপর্যয়ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের মত দারুণ গুরুত্বসম্পন্ন। সেকারণেই আত্ম অনুসন্ধান এত জরুরি।

প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পেছনে পূর্বাপর যেসব কারণ কাজ করেছে, বিশ্ব-শ্রমিক আন্দোলনের বর্তমান সংকটের পিছনে সেইসব কারণসমূহ অন্যতম। কেবল সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ-ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্ষেত্রেই সত্য নয়, সমস্ত দেশের, সমস্ত ধরনের ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও সত্য। উভয় ক্ষেত্রের বিপর্যয়ের পিছনে প্রধানত বিভ্রান্তি, ত্রুটি ও বিচ্যুতি ঘটছে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রেণীটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দিকে। বিপর্যয়ের জন্য পিছনের কারণগুলি—মতবাদ, সংগঠন, আন্দোলন, দাবী, রণনীতি ও কৌশল ইত্যাদির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সুদূর অতীত থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট কালের প্রত্যেকটি বিতর্ক, বিরোধ, সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যে দেখা গেছে তার প্রতিফলন।

দীর্ঘ অতীত থেকে, ব্যাপক পরিসরে, কারণসমূহ অনুসন্ধানের চেষ্টার পরিবর্তে, খণ্ড খণ্ডভাবে হলেও, কয়েকটি দিক উত্থাপন করা জরুরি। দেশ-ভিত্তিক সোস্যাল ফর্মেশন বা সামাজিক গঠন এবং ক্লাস-ফর্মেশন তথা শ্রেণী-গঠনের ঐতিহাসিক ও বাস্তব পরিস্থিতি এবং ট্রেড ইউনিয়নের পত্তনের মধ্যে ঐতিহাসিক নানা গরমিল ছিল। একদা সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত বিশাল ভৌগোলিক এলাকার দেশগুলির ক্ষেত্রে একথা সর্বাগ্রে সত্য। ধ্রুপদী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজিবাদের সামাজিক গঠন তথা শ্রেণীগঠন ও সংহত করণ অনেকটাই ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনা, সংগঠন, শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভৃতি স্তরে স্তরে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়েছিল। অন্যান্য শ্রেণীগুলির মত শ্রমিকশ্রেণীও এগিয়েছে বিপুল রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রাক-পুঁজিবাদী কাল থেকে বিকশিত হতে হতে সামাজিক ও শ্রমের সংগঠনগুলি কালক্রমে ট্রেড ইউনিয়নের জন্ম দিয়েছিল ধ্রুপদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিতে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশগুলিতে ধনতন্ত্র পৌঁছেছিল সর্বোচ্চ মাত্র দেড়শ'/দুশ' বছর আগে। এইসব দেশে ধনতন্ত্র ছিল বিদেশাগত এবং উপর থেকে স্থাপিত। তদুপরি সমাজ বিকাশের ধ্রুপদী নিয়ম ও পদ্ধতিতে এই দেশগুলিতে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি; ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকৃতি ছিল জন্ম-লগ্ন থেকে। সেকারণে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক গঠন তথা শ্রমিকশ্রেণীসহ শ্রেণীগুলির

গঠন দেশগুলিতে ছিল কেবলমাত্র আরোপিত নয়, অসম্পূর্ণ এবং বিকৃতও বটে। এইভাবে ট্রেড ইউনিয়নও দেশীয় জনগণের সামাজিক ও শ্রমের পরম্পরাগত সংগঠনগুলি থেকে উদ্ভূত বা রূপান্তরিত না হয়ে, আরোপিত রূপ নিয়েছিল। এই সমগ্র পরিস্থিতির জন্য শ্রেণী, চেতনা, সংগঠন, আন্দোলন প্রভৃতি প্রত্যেকটি উপাদান অনেকটাই থেকেছে অসম্পূর্ণ। জাতীয় ঐতিহাসিক পরম্পরার সাথে প্রকৃত একাত্ম হতে পারেনি ট্রেড ইউনিয়ন। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে, অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান কাল-পর্ব পর্যন্ত, সমগ্র সমাজের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন অবস্থানের পিছনে এই গূঢ় দিকটিকে উপেক্ষা করা চলে না।

এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ধ্রুপদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের সাথে অনুন্নত দেশগুলির সমান্তরাল অংশগুলির গভীর বিচ্ছিন্নতা গড়ে রেখেছে। পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণী অসচেতনভাবে হলেও প্রথমাবধি পুঁজির বিরুদ্ধে একধরনের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল। অন্যদিকে অনুন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন দৃশ্যত পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেও মর্মের দিক থেকে এইসব আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন তথা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। জাতীয় বুর্জোয়ারাই সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নকে সংগঠিত করেছে ও নেতৃত্ব দিয়েছে। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মতবাদের পরিবর্তে জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থ ও মতাদর্শের দ্বারা শ্রেণী, সংগঠন ও আন্দোলন গঠিত ও বিকশিত হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও এই পরম্পরা থেকে মুক্ত হতে পারেনি অনুন্নত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী, ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলন।

পূর্বোক্ত অবস্থার বিপরীতে, বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়নে ও আন্দোলনে আর একটি মাত্রা গড়ে উঠেছিল। ধ্রুপদী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ব্যাপকতম অংশের শ্রমিকশ্রেণী জাতীয়তাবাদী ও জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণ ও তাদের দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেনি বা সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। বরং সাম্রাজ্যবাদের লুঠ অংশত ভোগ করায় তারা সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। অন্যদিকে এই পরিস্থিতির জন্য অনুন্নত দেশের শ্রমিকশ্রেণীও উন্নত দুনিয়ার শ্রমিকদের সহগামী ও সমব্যথী বিবেচনার পরিবর্তে, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সাথে ঐসব দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে একাকার করে ফেলেছে। পুঁজির বিশ্বময় আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রথমাবধি বিঘ্নিত হয়েছে এইভাবে। এই ভেদ ও বিচ্ছিন্নতার দেয়াল আধুনিক কাল পর্যন্ত লুপ্ত হয়নি উন্নত ও অনুন্নত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুগত অবস্থার মধ্যে থেকে যাওয়া বিশাল বৈষম্য ও পার্থক্যের জন্য। বিশ্ব-পুঁজিবাদ এই ব্যবধানকে প্রথমাবধি ব্যবহার করে চলেছে।

এই শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রণনীতিগত যে পরিবর্তন কার্যত শুরু হয়, বর্তমান ট্রেড ইউনিয়নের সামনে প্রতিকূল পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সেটির অবদান নিতান্ত কম নয়। বিশ্ব-পুঁজিবাদ কর্তৃক কেইনসিয় অর্থনীতি গ্রহণ হলো সেটির পশ্চাৎপট। চাহিদা-ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার অন্যতম লক্ষ্যে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' তথা হিতকর রাষ্ট্রের ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত শ্রম-আইন, মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি সুযোগ বৃদ্ধির প্রতি শ্রমিক আন্দোলন ঝুঁকতে থাকে। তার ফলে, রাষ্ট্র শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি হলেও, মালিকশ্রেণীর পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণীর দাবী ও আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে সরকার। যথার্থ সমাজ তথা শ্রেণী-চেতনার অভাবে, এইভাবে, শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরে সরকার এবং মালিকশ্রেণীর মধ্যে এক পার্থক্যের ধারণা গড়ে উঠেছে। সরকারকে টার্গেট করার মধ্য দিয়ে মালিকশ্রেণীকে অংশত অব্যাহতি দিয়েছে শ্রমিকশ্রেণী এবং এইভাবে নিজেদের শ্রেণী-বিদ্বেষ ও বিরোধের ধারাকে দুর্বল করে ফেলেছে নিজেরা।

এর প্রতিফলন ঘটেছে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পার্লামেন্টবাদী মোহ সৃষ্টিতে। যে সরকার দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা যায় না বা শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী, নির্বাচনের পথে তাদের হঠিয়ে 'ভাল সরকার' পাওয়ার তাড়নায় তারা ছুটেছে। কার্যকালে বুর্জোয়াদেরই কোন না কোন পার্টির মধ্যে নিজেদের

পছন্দ-অপছন্দকে সীমাবদ্ধ রেখে মূল সংগ্রামী লক্ষ্যকে তারা হারাতে শুরু করেছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশগুলিতে সাধারণভাবে সরকারগুলির নেতৃত্ব করেছে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী বুর্জোয়া অংশই। প্রাক-স্বাধীনতাকালের বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকার জন্য, স্বাধীনতার পরও শ্রমিকশ্রেণী এই নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী থেকেছে। এই নেতৃত্বের উপর দীর্ঘকালের বিশ্বাস ও আস্থা, শ্রমিকশ্রেণীকে মালিকদের কাছ থেকে দাবী অর্জনের ধারণা থেকে অনেকটাই সরিয়ে রেখেছিল। জাতীয় আন্দোলনের নেতারা, যাঁরা স্বাধীনতার পর সরকারের নেতা হয়েছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলেই মালিককে দিয়ে দাবী মিটিয়ে দিতে পারেন—শ্রমিকশ্রেণীর ধারণার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল এমনভাবে। দাবী-দাওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, মালিকদের অনিচ্ছার ফল হিসাবে ভাবার পরিবর্তে জাতীয় নেতা তথা সরকারের অনিচ্ছার ফল হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে। ফলে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বিরোধের প্রকৃত ধারণা ও ভূমিকার পরিবর্তে ট্রেড ইউনিয়নের সমস্ত কার্যকলাপ ভিন্ন দিকে বাঁক নিয়েছে।

এবারে, বর্তমানকালে, শ্রমিকশ্রেণীর সামনে সৃষ্ট প্রতিকূলতার কতকগুলি প্রধান দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

আদর্শগত স্তরে প্রতিকূলতা : ১৯৮৯-৯১ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মডেলগুলির বিপর্যয় ঘটলো। দেশগুলি গ্রহণ করলো পুঁজিবাদী পথ। তার কিছুদিন আগেই সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিশ্ব-কেন্দ্র 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন' শ্রেণী-সংগ্রামের পথ বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলে বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণী প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সুসংগঠিত বিশাল শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ সমস্ত ধরনের সমর্থন, সহযোগিতা ও নেতৃত্ব থেকে এক ধাক্কায় বঞ্চিত হলো। মূল 'সাপোর্ট বেস' তথা সমর্থনকারী শক্তির অনুপস্থিতিতে সাংগঠনিক দিক থেকে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন একদিকে যেমন বিপর্যস্ত হলো, অন্যদিকে নিমজ্জিত হলো হতোদ্যম পরিস্থিতিতে—আদর্শের হাতিয়ার অপহৃত হওয়ায়।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই ভয়ানক বিপর্যয়ের সুযোগে, বিশ্ব-পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়নের মতাদর্শ, সংগঠন, আন্দোলনের বিরুদ্ধে আক্রমণকে করেছে তীব্রতর। আদর্শগত স্তরে বিশ্ব-পুঁজিবাদের আক্রমণের কার্যত সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বহু দেশের অতীতের সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিও। কমিউনিস্ট পার্টির বিলোপ সাধন করে সেগুলির গণতান্ত্রিক সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে পরিণত হওয়া, শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী-সমন্বয়বাদী পথ গ্রহণ, আন্তর্জাতিকতাবাদকে পরিত্যাগ করে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় ট্রেড ইউনিয়নকে যুক্ত করা ইত্যাদি উদ্যোগ ট্রেড ইউনিয়নের মূল মর্মকে বিনষ্ট করে চলেছে। এর ফলে, আদর্শের হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্বীয় অনুগামী শ্রমিকশ্রেণী থেকেও বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে।

তৃতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবের প্রভাব : অতীতের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিপ্লবগুলি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাতে পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল;কায়িক শ্রমের ভার অনেকটা লাঘব করা সত্ত্বেও বহুগুণ ও ক্রমাগত বৃদ্ধি করে গিয়েছিল শ্রমিকের সংখ্যাকেও। তৃতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ক্রমাগত ব্যবহারিক অগ্রগতি উৎপাদনের সমস্ত ধরনের যন্ত্র-ব্যবস্থায় প্রায় আকস্মিক ও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অতি জটিল, নিপুণ, সূক্ষ্ম ও দ্রুতগামী এইসব ব্যবস্থা পরম্পরাগত শিল্প শ্রমিককে দ্রুততায় অপসারিত করছে; পুরাতন ব্যবস্থার শ্রমিকের পক্ষে এই নতুন যন্ত্র-ব্যবস্থাকে আয়ত্ত করে, পুনরায় বৃত্তিতে প্রবেশের সুযোগ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কেননা অতীতের যন্ত্র-চরিত্রের সাথে নতুনগুলির কার্যত কোন মিল নেই; ফলে পরম্পরাগত শ্রমিকের পক্ষে প্রচলিত শিক্ষা ও কর্ম-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই জাতীয় যন্ত্রপরিচালনা করে উৎপাদন করা অসম্ভব। নতুন ধরনের শ্রমিকের সংখ্যা অতীতের তুলনায় অনেক কমে যাওয়া শুধু নয়, তাদের শ্রমের চরিত্র, শ্রমের কাঠামো, মানসিকতা ইত্যাদিও পুরাতনদের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নতুন। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সর্বক্ষেত্রে স্বয়ং-পরিচালিত তথা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-শ্রমে পরিণত করা শুরু

করেছে। তার ফলে উৎপাদনে কায়িক শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রবণতা ও প্রক্রিয়া এখন ধেয়ে চলেছে প্রায় শূন্যের কোঠার দিকে। শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা কমে যাওয়া ট্রেড ইউনিয়নের গণ-ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলেছে। অন্যদিকে নতুন ধাঁচের শ্রমজীবীদের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও সংগঠন-আন্দোলন সম্পর্কে মানসিক অনীহার পরিস্থিতি ট্রেড ইউনিয়নের হৃত সদস্য সংখ্যা পুনরুদ্ধারের সুযোগের সামনে সৃষ্টি করছে সমস্যা।

পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের অর্থনীতি ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রভাব : পুঁজিবাদকে বিশ্বব্যাপী তথাকথিত একই রূপ দেবার নামে প্রায় প্রত্যেক দেশের অর্থনীতির বাজারীকরণ, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, বিশ্বায়ন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই সমস্ত পদ্ধতি সম্পাদনের জন্য প্রচলিত অর্থনীতি, উৎপাদন, বন্টন, আইন, কর-ব্যবস্থা, সরকারের ভূমিকা, শ্রম-ব্যবস্থা, বাণিজ্য, বাজার, আমানত, মজুরি, ইত্যাদি সব কিছুর কাঠামোগত সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে (এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে)। 'অনুৎপাদক' বা 'লোকসানি' নাম করে প্রথাগত যন্ত্র-উৎপাদন-ভিত্তিক শিল্প বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সারা বিশ্বে এজন্য রুগ্ণ বা বন্ধ হয়েছে লক্ষ লক্ষ কারখানা। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণ এবং বেসরকারীকরণের পর শ্রমিক সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিদেশী বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে পুরানো শিল্পের পুনরুজ্জীবন বা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, বিদেশী পুঁজি লগ্নি করে যৌথ সংস্থা নির্মাণ, কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা বেসরকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা কম রাখার শর্তকে করা হচ্ছে বাধ্যতামূলক। এই ধরনের সমস্ত তৎপরতার অন্যতম প্রধান ফলাফল হলো শ্রমিক সংখ্যার সংকোচন। কারখানা রুগ্ণ ও বন্ধ হওয়া বা সচল কারখানাতে শ্রমিক ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পারছে না ফলপ্রসূ তেমন ভূমিকা নিতে। ফলে শ্রমিকরা ইউনিয়ন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে।

শিল্প থেকে পরিষেবা ক্ষেত্রে অর্থনীতির ভর পরিবর্তনের প্রভাব : উৎপাদনমূলক বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্র থেকে এখন পরিষেবা শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান। সর্বোপরি পুঁজি এখন প্রধানত বিনিয়োজিত হচ্ছে টাকার বাজার, স্টক প্রভৃতিতে। পরিষেবা ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের সংখ্যা-তথ্য পূর্বে দেওয়া হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে। অতীতে পরিষেবা ক্ষেত্রের আয়তন অত্যন্ত ছোট ছিল তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমজীবীরা ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত ছিল না; ট্রেড ইউনিয়নগুলিও এই ক্ষেত্রের প্রতি অতীতে কার্যত তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি। শ্রমজীবীদের সংখ্যাগত অবস্থানের ভর নতুন চরিত্রে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি নতুন শ্রমিকদেরও পাচ্ছে না। এই বাস্তবতা কেবল প্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা নতুন সদস্য সংগ্রহের সামনে সমস্যা নয়, এই সমস্যা হলো অনুগামীদের চরিত্র পরিবর্তনের গুরুতর সমস্যা। এ হলো ট্রেড ইউনিয়নের প্রচলিত গণভিত্তির সামনে সমস্যা। তার ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রচলিত কাঠামোসহ সমগ্র কর্মধারার প্রশ্নেই সমস্যার মুখে পড়েছে।

উৎপাদনের কাঠামোগত ও বিন্যাসের পরিবর্তনের প্রভাব : সুদূর অতীতের বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন কাঠামো পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রবেশ করে এক ছাউনির নীচে (কারখানাতে) ঘনীভূত হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পিছনে এই বাস্তবতা ছিল অন্যতম প্রাথমিক ও প্রধান শর্ত। কিন্তু সর্বাধুনিক কারখানা-ভিত্তিক উৎপাদনে অধিকাংশ শ্রমিক অস্থায়ী ও অনিয়মিত হিসাবে কাজ করে। ফ্লেক্সিবল অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ফ্লেক্সিবল টাইম, ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক উইক, ফ্লেক্সিবল ওয়েজ, ফ্লেক্সিবল সোস্যাল সিকিউরিটি ইত্যাদি ব্যবস্থার ফলে কারখানার সাথে শ্রমিকদের সম্পর্ক ও কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তাপূর্ণ, অনিয়মিত এবং কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী থোক (অ্যাড-হক) ভিত্তিতে। নতুন ব্যবস্থার জন্য এবং মজুরির ঘাটতি পুষিয়ে নিতে আধুনিক শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য অংশকে কারখানার বাইরে অন্য নানা কাজে যুক্ত হতে হচ্ছে। ফলে কারখানাকে তারা জীবনধারণের জন্য একমাত্র উপার্জনের ক্ষেত্র মনে করে না। আর একারণে তারা আকর্ষণ বা দায়িত্ব বোধ করে না কারখানা-সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের প্রতি। অথচ অতীত দিনে কারখানার শ্রমিক নিয়েই ট্রেড ইউনিয়ন কাজ করে এসেছে।

উন্নত দেশের কারখানার মালিকরা 'নন-ইউনিয়ন জোন/এরিয়া'-তে অর্থাৎ যে এলাকাতে ইউনিয়নের 'উপদ্রব' কম বা যেখানে আইনগতভাবে ইউনিয়ন গড়া বা শ্রমিকদের সংগঠিত চাপ সৃষ্টির সুযোগ সীমিত, সেখানে নির্মাণ করছে বা সরিয়ে নিচ্ছে। অতিরিক্ত হিসাবে 'এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন', 'স্পেশাল এরিয়া' প্রভৃতি এলাকাগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—যেখানে শ্রমিকদের দাবীদাওয়া 'আন-বার্গেনেবল' বলা হয়। তাছাড়া কারখানা স্থানান্তরের ফলে শ্রমিকদের দূরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে নতুন ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হওয়া অথবা নতুন এলাকার কারখানাতে নতুন শ্রমিক নিযুক্তি প্রভৃতির ফলে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে সংগঠন করা বেশি বেশি করে কঠিন হয়ে পড়ছে।

দেশের অভ্যন্তরে অন্যত্র কারখানার স্থানান্তর মাত্র নয়, বহুজাতিক সংস্থাগুলি ক্রমবর্ধমান হারে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করছে উৎপাদনের বড় অংশ—মূল কারখানার উৎপাদনের অংশ বিশেষ উৎপাদনের জন্য। এমনকি একটি কারখানার একই ধরনের পণ্যের উৎপাদন বহু দেশে ছড়িয়ে করা হচ্ছে। কখনো সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান খাড়া করে, কখনো বা মূল মালিকানা এক থাকা সত্ত্বেও, ভিন্ন রেজিস্ট্রেশনে আলাদা কারখানার নামে উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রথমত, দেশের অভ্যন্তরে কারখানা বন্ধ বা সংকোচন অথবা আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন ছাঁটাই করার ফলে যে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে তা' ট্রেড ইউনিয়নগুলি রোধ করতে পারছে না, সর্বোপরি পারছে না কারখানা স্থানান্তর রোধ করতে। ফলে দেশের মূল কারখানাতে শ্রমিক সংখ্যা কমে যাওয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তি দুর্বল হচ্ছে; ছাঁটাই ও স্থানান্তর প্রতিরোধ করতে না পারায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে একদিকে ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় ভীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা বাড়ছে। অন্যদিকে নানা দেশে কারখানা ছড়িয়ে থাকায়, কোন একটি ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে বা সংশ্লিষ্ট দেশের কারখানাগুলির ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সম্মিলিতভাবে এক মালিকানাধীন সমস্ত কারখানাগুলির সমগ্র শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া ও সমস্যা নিয়ে কোন চাপ কর্তৃপক্ষের ওপর সৃষ্টি করা ও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।

তাছাড়া, বড় বড় প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র কারখানা স্থানান্তর করে উৎপাদনের ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ করছে না; সাব-কন্ট্রাক্টরি এবং হোমওয়ার্ক প্রথায় উৎপাদনের কাজ চালাচ্ছে। সাব-কন্ট্রাক্টরি প্রথার মালিকানার ধরন-ধারণ ও চরিত্র কেবল ভিন্ন নয়, শ্রমিকদের চাকুরীর শর্তাবলী, মজুরি, সুযোগ-সুবিধাও স্বতন্ত্র এবং মূল কারখানার শ্রমিকদের তুলনায় সাধারণভাবেই নিম্ন। সুতরাং মূল কারখানার সাথে মিলিতভাবে সাব-কন্ট্রাক্টরি প্রথার শ্রমিকদের সংগঠিত করা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে দুরূহ হচ্ছে। সাধারণভাবে মূল কারখানার শ্রমিকরাও সাব-কন্ট্রাক্টরি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সাথে যুক্ত হতে চায় না। কেননা তাদের আশঙ্কা থাকে যে, কম মজুরির শ্রমিকরা তাদের সাথে যুক্ত হলে তাদের মজুরির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। অন্যদিকে সাব-কন্ট্রাক্টরি ব্যবস্থায় মালিকের কর্তৃত্ব প্রবল হওয়ায় সেখানকার শ্রমজীবীরা ইউনিয়ন সম্পর্কে ভীত। হোমওয়ার্কাররা মূল কারখানার পরোক্ষ চরিত্রের শ্রমিক। তাদের অবস্থান ও কার্যকলাপ মূল কারখানা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং চতুর্দিকে ছড়ানো। তাদের কাজের পরিস্থিতি ও পরিবেশ, মজুরির চরিত্রও মূল কারখানার শ্রমিকদের থেকে স্বতন্ত্র। বিছিন্ন থাকার জন্য এদের ইউনিয়নে সংগঠিত করা যেমন কঠিন, তেমনই সমস্যার চরিত্র ভিন্ন হওয়ায় এরা মূল ইউনিয়নে সাধারণত আসে না।

সরকার ও মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধ ভূমিকার প্রভাব : পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশের সরকার ও মালিকশ্রেণী ট্রেড ইউনিয়নকে চূড়ান্তভাবে কোণঠাসা করার জন্য আইনি, প্রশাসনিক প্রভৃতি সহ নানা ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিভিন্ন দেশের শ্রম-আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারের সাথে সাথে সংকুচিত করা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারও। বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকায়, তারা কার্যত কোন দেশের শ্রম-আইনই মানে না, নিজেদের শর্ত সরকারও ট্রেড ইউনিয়নের উপরে চাপায়। কোন কোন সময়ে বিদেশে শিল্প স্থাপনের শর্ত হিসাবে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে দিয়ে শ্রম বিষয়ক ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে স্বীয় স্বার্থানুকুল বিধি-নিষেধ তারা স্বীকার করিয়ে নেয়। তাছাড়া নতুন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মালিকরাও ট্রেড ইউনিয়ন ভাঙা বা দুর্বল করার

জন্য তাদের তৎপরতা বাড়িয়েছে। ধর্মঘট করলে বরখাস্ত, আন্দোলনের ওপর পুলিশ দিয়ে আক্রমণ ও অত্যাচার, নিজেদের নিরাপত্তা বাহিনী গঠন বা গুণ্ডাদের দিয়ে হামলা, ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে আক্রমণ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া, গ্রেপ্তার, এমনকি গুম বা খুন করার অজস্র ঘটনা লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে ঘটেছে ও ঘটছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পূর্বোক্ত এলাকার বহু দেশে ট্রেড ইউনিয়ন বেআইনি ছিল। কোন কোন দেশে এখনও সরকার ও মালিক-পৃষ্ঠপোষিত ট্রেড ইউনিয়নকেই স্বীকার করা হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের বিপরীতে, প্রধানত শ্রম-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করার জন্য 'এমপ্লয়ার্স অরগানাইজেশন' বা নিয়োগকারীদের সমিতি এখন সর্বময় কর্তৃত্বকারী ও সংগঠিত ভূমিকা নিচ্ছে। এরা কেবলমাত্র দেশীয় স্তরে নয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাকে সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করার জন্য সরকারগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

বিদেশাগত শ্রমিক ও বিভিন্ন বর্ণ-ধর্ম-জাতিত্ব (ন্যাশনালিটি) সম্পন্ন শ্রমিকদের প্রভাব : ট্রেড ইউনিয়নের সামনে জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার অন্যতম কারণ হিসাবে বর্তমানে উপস্থিত হয়েছে দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভিত্তিক বিন্যাস স্বয়ং। এখন কেবল উন্নত দেশে নয়, অনুন্নত বহু দেশে বিদেশাগত শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। অধিকাংশ বিদেশাগত শ্রমিকদের চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা স্বদেশী শ্রমিকদের তুলনায় অত্যন্ত নিম্ন। দেশীয় শ্রমিকরা বিদেশাগতদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মনে করে। স্বভাবতই উভয় অংশের মধ্যে একদিকে উচ্চমন্যতা ও অন্যদিকে হীনমন্যতা কাজ করে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি দেশীয় শ্রমিকদের সমর্থন হারানোর আশঙ্কায় বিদেশাগতদের সমস্যা ও দাবী-দাওয়া উত্থাপন করে না, তাদের সংগঠনে সদস্যভুক্তও করে না সাধারণভাবে। বিদেশাগতরাও মালিকদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হয় না। ফলে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা এইসব অংশে কম;এজন্য শ্রমিক ঐক্য ও আন্দোলনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এছাড়াও উন্নত দেশগুলিতে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম-ভিত্তিক বিরোধ সমানে বাড়তে থাকায়, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে ট্রেড ইউনিয়নের উপরেও। অধিকাংশ দেশের ট্রেড ইউনিয়ন বিভেদের বিরুদ্ধে ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও, শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্বেষ-সংক্রমিত মানসিকতা ট্রেড ইউনিয়ন-ভুক্তির পথে বাধা হিসাবে কাজ করছে। ফলে কোথাও বা ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে। গড়ে উঠছে নতুন নতুন ইউনিয়ন।

নারী শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রভাব : সারা বিশ্বে বর্তমানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী নিয়োগের সংখ্যা সাধারণভাবে বর্ধিষ্ণু। বর্তমানে বার্ষিক নারী নিয়োগের হার পুরুষের হারের তুলনায় বেশি। উন্নত দেশগুলিতে নারীদের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়ার হার অতীত থেকে বেশি হলেও অনুন্নত দেশসমূহে এই হার যথেষ্ট কম প্রথম থেকেই। তদুপরি শেষোক্ত দেশগুলিতে পুরুষ-প্রধান সামাজিক মনোভাব ও ব্যবস্থা এবং নারীদের বিশিষ্ট দাবী-দাওয়া ও সমস্যার প্রতি ট্রেড ইউনিয়নগুলির দীর্ঘ উপেক্ষা, শ্রমিকাদের মানসিক জগতে একধরনের বিচ্ছিন্নতাকে সুপ্তভাবে বহন করে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সম্প্রতিকালে নারীবাদীরা, সামাজিক স্তরে ছাড়াও, স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করায় এর প্রভাব ছড়াতে শুরু করেছে অন্য ট্রেড ইউনিয়নে। তথাকথিত পুরুষ-প্রধান ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অনীহা সৃষ্টি করা হচ্ছে শ্রমিকদের মধ্যে। সুলভ শ্রম ব্যবহারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, পুরুষদের তুলনায় শ্রমিকাদের উপর শোষণের চরিত্র তীব্রতর। ফলে নারী শ্রমিকদের সমস্যার ব্যাপকতা ও জটিলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে অতীতের তুলনায়। তাছাড়া এখন বেশ কিছু ক্ষেত্র কার্যত সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যেখানে একান্তভাবে নিযুক্ত হচ্ছে শ্রমিকারা। এই ধরনের উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকাদের সমস্যা সম্পর্কে সমাধানের পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব তাদের ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত রেখেছে। অন্যদিকে উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে বহু দেশে নারীবাদ-ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা এখন প্রবণতার চরিত্র নিচ্ছে; প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থে সমবায় গঠন বা মানবতাবাদী সংগঠন অথবা এন.জি.ও. তে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে তাদের মধ্যে। দেশ ও ক্ষেত্র

বিশেষে শেষোক্ত প্রবণতা এক ধরনের সুপরিকল্পিত প্রয়াসের ফল বলেও উল্লেখ করা চলে। কেননা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে এই জাতীয় সংগঠনকে অধিকতর শ্রেয় বলে বিবেচনা করছে এবং সেজন্য নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে ঐসব ধরনের সংগঠনকে।

নবীন শ্রমিকদের মনোভাবের প্রভাব : পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে উৎপাদনশীল ও উপার্জনকারী শ্রমবাহিনীতে সারা বিশ্বে ধীরে ধীরে বয়স্কদের সংখ্যা বাড়ছে, নবীন শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। অথচ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যভুক্তি ও সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপের এবং সামগ্রিক বিকাশের ধারাকে উন্নত ও অব্যাহত রাখার মূল শক্তি নবীনরাই। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বিপরীতমুখী হচ্ছে। দীর্ঘ বেকারী ভোগের পর সমাজ সম্পর্কে মানসিক জগতে কিছুটা বীতস্পৃহা নিয়ে বৃত্তিতে প্রবেশ, অনিশ্চয়তাপূর্ণ, অস্থায়ী ও খণ্ড-সময়ের চাকুরী এবং কম মজুরি প্রাপ্তির কারণে অন্য কোন কাজ করে আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাণান্তকর খাটুনি, সমাজ-মানসে ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতার প্রভাব এবং তার ফলে আত্মকেন্দ্রিকতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির ফলে সারা বিশ্বেই নবীন শ্রমজীবীদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে চরম অনীহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সংগঠন ও আন্দোলনের কাজ ইত্যাদি বিষয়েও একই রকম মনোভাব দেখা যায় নবীন অংশের মধ্যে। এটা উল্লেখ্য এই কারণেও যে, বহু দেশেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিজস্ব রাজনীতি বিদ্যমান বা বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে।

ব্যাপক বেকারীর প্রভাব : উন্নত দেশগুলিতে শিল্প, পরিষেবা, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে 'জব-লেস্ গ্রোথ' বা নিয়োগহীন উৎপাদনের বিকাশ অথবা যাকে কখনো কখনো 'স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট' বা কাঠামোগত বেকারী বলা হচ্ছে, তা বর্তমানে এক প্রবণতা। তার ফলে নতুন নিয়োগ দূরের কথা, কর্মরতরাও বেকার হচ্ছে। অনুন্নত দেশগুলিতে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির বৃদ্ধির তুলনায় নিযুক্তির সুযোগ ও সম্ভাবনা সাংঘাতিক কম। ফলে বেকারীর হার ও সংখ্যা সারা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান। এজন্য চাকুরী বা বৃত্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বেকারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার গতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং চাকুরীর জন্য ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সর্বৈব মানসিকতা বাড়ছে। কর্মরতরাই বেকারদের নিযুক্তির সামনে প্রধান প্রতিবন্ধক, এই ভ্রান্ত মনোভাব পরিব্যাপ্ত হচ্ছে তাদের মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত বেকারের কাছে ট্রেড ইউনিয়ন কোন মিত্র প্রতিষ্ঠান নয়, কেননা তারা মনে করে যে, ট্রেড ইউনিয়ন হল কর্মরতদের সংগঠন।

অন্যদিকে, পুঁজিবাদের প্রায় সমগ্র ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বেকারদের মজুতবাহিনী হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে মালিকশ্রেণী। দাবী-দাওয়া, আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শক্তি, গুণ্ডাবাহিনী, দালাল প্রভৃতি নিয়োগের পাশাপাশি বেকারদের ব্যবহার করা হতো চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে। এখন সেই সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মালিকদের পক্ষে। অতীতে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলি বেকারদের চাকুরী ও কাজের সর্বজনীন মৌলিক অধিকার প্রভৃতি দাবী তুলতো এবং শ্রমিকশ্রেণীকে আন্দোলনে সামিল করতো এই ধরনের দাবীতে এবং বেকারদের সংগ্রামে সহমর্মিতা প্রকাশ করতো। ফলে বেকার-সমাজের দাবীর প্রধান উদগাতা হিসাবে তাদের মিত্রতা অর্জন করতো ট্রেড ইউনিয়ন। কিন্তু এখন ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামনে কর্মরতদের চাকুরী রক্ষা করাই কঠিন সমস্যা। তদুপরি অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে সংস্কারবাদী ও সুবিধাবাদী মনোভাব ও ভূমিকা গ্রহণ করায় বেকারদের সাথে তাদের বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার 'পুনর্গঠনের' ফলে ট্রেড ইউনিয়নের সামনে চ্যালেঞ্জ : ১৯৭৯ সাল থেকে ব্রিটেনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির পুনর্গঠনের নামে বেসরকারীকরণের প্রথম উদ্যোগ বিশ্বে শুরু হয়েছিল। ক্রমে মডেল হিসাবে এই ব্যবস্থা আই. এম. এফ. ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সুপারিশ, শর্ত ও ব্যবস্থাবলীর দ্বারা সারা বিশ্বে, বিশেষত অনুন্নত দেশগুলিতে, আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ব্যাপক রূপ পেতে থাকে। 'গ্যাট' চুক্তি ও 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন'-এর প্রস্তাবিত 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' (স্যাপ)-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করাও হয়।

তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের উন্নতিসাধন ও প্রসারের জন্য এবং বিপরীত পক্ষে, দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অথবা শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী বা লোকসানি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবী তুলেছে ও আন্দোলন করেছে অতীতে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অত্যন্ত সংগঠিত ক্ষেত্র হওয়ায় এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের ত্রিপাক্ষিক (মালিক, সরকার ও ট্রেড ইউনিয়ন) শ্রম-সম্পর্কের পরিবর্তে দ্বিপাক্ষিক (সরকার ও ট্রেড ইউনিয়ন) ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় থাকায়, সদস্য বৃদ্ধি করা, কেন্দ্রীয় স্তরে দর-কষাকষি এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ব করা ইত্যাদির কিছুটা বাড়তি সুযোগ পেতো ট্রেড ইউনিয়ন। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়ন ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে যেতে থাকে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর। বি-রাষ্ট্রীয়করণ প্রতিরোধ করা ট্রেড ইউনিয়ন ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর কাছে প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ট্রেড ইউনিয়নকে এই আন্দোলনে এখন পর্যন্ত কার্যত বিঘ্ন-পরাজয় মানতে হচ্ছে। সাধারণভাবে যেসব দেশে বেসরকারীকরণ বা যৌথ-মালিকানাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা' প্রতিহত করা যায়নি তো বটেই, বরং দ্রুতগামী হয়েছে।

উৎপাদন/পরিষেবা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় কমানোর জন্য প্রবল চাপ, শ্রমিকদের বৃত্তির সর্বক্ষণ নিরাপত্তাহীনতা ও অন্যদিকে নিবিড় শ্রম এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ প্রভৃতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নকে। মালিকানার সমস্ত ধরনের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের "হৃদয় ও মন জয় করার" চেষ্টা হচ্ছে; লুপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে অতীতের 'আমরা' (শ্রমিকশ্রেণী) ও 'ওরা' (মালিক শ্রেণী, কর্তৃপক্ষ ও ব্যবস্থাপক)-মূলক মনোভাব ও ভূমিকাকে। (কোলি ও কোলি ১৯৯১ গেস্ট ও ডিউই ১৯৯১)। সর্বত্র 'শপ-ফ্লোর' কমিটিকে বাড়তি প্রাধান্য দিয়ে শ্রমিকদের পূর্বোক্ত মানসিকতায় টেনে আনার চেষ্টা ছাড়াও, ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব খর্ব করার জন্য শপ-ফ্লোর কমিটিগুলির সাথে শ্রমিকদের সমস্যার বিষয়ে আলোচনা ও ব্যবস্থাদি নেওয়া হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। মালিকদের এই প্রয়াসে নীচুতলার কমিটিগুলিও বাধ্যতার সম্মুখীন হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নকে এড়িয়ে এই কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকদের সূক্ষ্ম-সুতোর উপর দিয়েই কেবল হাঁটতে হচ্ছে না, তারা ক্রমাগত বিপদের জালেও জড়িয়ে পড়ছে (পোলার্ট, ১৯৯১)।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বি-রাষ্ট্রীয়করণের ফলে সৃষ্ট সর্বক্ষণের কর্মী ও আংশিক সময়ের কর্মী তথা যথাক্রমে 'স্ট্রংগার' ও 'উইকার বার্গেনিং গ্রুপ' অর্থাৎ শক্তিশালী ও দুর্বল দর-কষাকষির গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগাভাগি সৃষ্টি করে মালিকপক্ষ ট্রেড ইউনিয়নকে আরও কোণঠাসা বা খণ্ড খণ্ড করে ফেলছে। ভাগ হয়ে যাচ্ছে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক, আংশিক সময়ের কর্মীর ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের মধ্যে (কলিং, ১৯৯৫ কলিং ও ফেরনার, ১৯৯৫)। এর প্রভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে এখন নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে—মালিকানার সাথে অংশীদারিত্ব অথবা স্বকীয়তা বজায় রাখতে সংঘর্ষের পথ গ্রহণ—কোন পথে সদস্যভুক্তি রক্ষা ও আস্থা অর্জন করা যাবে শ্রমিকশ্রেণীর। (কোলি-১৯৯৫)। "শপ-ফ্লোর" ব্যবস্থাকে ব্যবহারের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি ও দর-কষাকষির ক্ষমতার পরিস্থিতি প্রসঙ্গেও বিতর্ক জোরদার হয়েছে। একাংশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব মনে করেন যে, ব্যবস্থাপকদের ঐ প্রচেষ্টা প্রতিহত করে ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ও অধিকার পুনরুদ্ধার করা দরকার; অপরাংশ মনে করেন যে, শিল্প-সম্পর্কের কর্মস্থলে অর্থাৎ শপ-ফ্লোরে ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকালে তৃণমূল সংগঠনের শক্তি এবং গণতন্ত্রের প্রসার ও সংহতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করছে (ফেয়ারব্রাদার, ১৯৯৫)। শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও বিশ্লেষণাত্মক করে বলা হচ্ছে যে অতীতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত, আমলাতান্ত্রিক ও প্রত্যক্ষ শ্রমে অসংযুক্ত নেতৃত্বের দ্বারা গঠিত এবং তার ফলে শ্রমিকদের থেকে মানসিক ও বাস্তবভাবে দূরবর্তী। মালিকানার পক্ষ থেকে নতুন ব্যবস্থার ফলে সেগুলি ভাঙছে এবং ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা কেন্দ্রীভূত থেকে বিকেন্দ্রীকৃত হচ্ছে; তার ফলে ট্রেড ইউনিয়নে প্রতিফলিত হচ্ছে শ্রমিকদের প্রকৃত ইচ্ছার, তাদের ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ উন্নততর হচ্ছে (ফস, ১৯৯৩)।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে পাবলিক সেক্টরের জন্য চালু হতে শুরু করেছে নতুন ধরনের আইনি ব্যবস্থা।

ব্রিটেনে একে বলা হচ্ছে 'কম্পালসরি কম্পিটিভ টেন্ডারিং'। এই আইনের দ্বারা শ্রম-বাজারে তথাকথিত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি ও প্রভাব সীমিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। (কলিং, ১৯৯৫)। এই ব্যবস্থায় রয়েছে উভয়বিধ লক্ষ্য। প্রথমত, শ্রমিকের কার্যকরী শ্রমের অর্থকরী মূল্যের হিসাব পেশ করে, বৃত্তিতে নিয়োগের সময় শ্রমিকদের বাধ্য করা হচ্ছে মালিকদের কাছে নিজের তরফ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক টেণ্ডার বা দরপত্র দিতে। প্রাপ্ত টেণ্ডারগুলিকে যাচাই করে সর্বাপেক্ষা কম মজুরিতে উৎকৃষ্ট শ্রমিক নিয়োগ করছে প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্নে প্রতিষ্ঠান ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরির মান নির্ধারণে অতীতের প্রচলিত ব্যবস্থা বাতিল করা হচ্ছে। তার ফলে প্রথম থেকেই নবাগত শ্রমিকরা ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যবস্থাপকদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব : প্রায় প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন প্রতি শিল্পে একটি সংগঠনের অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয় বলে নীতিগতভাবে মনে করে। কিন্তু, বাস্তবে পরিস্থিতি সারা বিশ্বেই বিপরীত। ঐতিহাসিকভাবে সর্বপ্রথম কারখানা-ভিত্তিক সংগঠন গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে ক্রাফ্‌ট, ট্রেড বা বৃত্তিমূলক সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। ক্রমে সেগুলির দ্বারা জাতীয় স্তরে 'অ্যামালগ্যামেশন', 'কো-অর্ডিনেশন', 'ফেডারেশন' 'কনসোলিডেশন' ইত্যাদি ধরনের সম্মিলিত সংগঠনের উদ্ভব ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মালিকদের দ্বারা, বিশেষত ধর্মঘটের সময়ে, পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলা হলেও সেগুলি স্থায়ী হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগ থেকে মতাদর্শভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভব ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে দেখা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক টি. ইউ. মুভমেন্ট থেকে 'সিণ্ডিক্যালিস্ট অ্যানার্কিস্ট' ধারা আলাদা হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নের যেমন বিকাশ ঘটে; সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নও ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভবও এই কালপর্বে। তবে বহু আগে থেকেই বুর্জোয়াবাদী শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। এই শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরোধের ফলে দ্বিধা-ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যায়। তার আগে পঞ্চাশের দশক থেকে মূল ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেক্টর বা ক্ষেত্র-ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ব্যাপকভাবে শুরু হয়—প্রথমে সার্ভিস বা পরিষেবা ক্ষেত্রে, তারপর আন-অরগানাইজড বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ক্রমে আশির দশক থেকে শিল্প-ভিত্তিক, বর্ণ-ভিত্তিক, জাতি-ভিত্তিক, লিঙ্গ-ভিত্তিক ইত্যাদি নানা ধারার ট্রেড ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। শ্রম-ক্ষেত্রে নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনের (এন.জি.ও.) অনুপ্রবেশ ট্রেড ইউনিয়ন-বিভক্তির আর একটি শক্তিশালী উপাদানে পরিণত হয়।

ইতিহাসগত বিকাশের চরিত্র থেকে, সম্ভবত, একথা বলা যায় যে উৎপাদনের ও সমাজের শ্রেণীগুলির বিকাশের প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন বিভঙ্গ সৃষ্টির প্রতিফলন হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশের ধারাতে বহুবিধ নতুন উপাদানের আবির্ভাব ঘটেছিল। এর অন্যতম ফল হলো এটির ক্রমান্বয় আত্ম-বিভাজন। অতীতের এই ধরনের আত্ম-বিভাজন প্রক্রিয়া, ভেতর বা বাইরে থেকে সংঘটিত হয়ে এখন আত্ম-খণ্ডনের অন্যতম উপাদানে পরিণত হচ্ছে। মতাদর্শের স্তরে বিগত তিন দশকে ঘাড়ভাঙ্গা গতির ভাঙ্গনের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি একদিকে বুনিয়াদি শ্রেণী, উপ-শ্রেণী বা পর্বে পর্বে উদ্ভূত নতুন নতুন বর্গগুলির স্বীয় শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গির আত্মপ্রকাশ এবং অন্যদিকে বাইরে থেকে শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের ও স্বার্থের তাগিদ এই ভাঙ্গনের চরিত্রকে বহুমুখীন করেছে। পাশাপাশি বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি ইত্যাদি সামাজিক উপাদানগুলিও নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ভাঙ্গন প্রক্রিয়ায়। আর এই সমস্ত ধরনের ভাঙ্গনের পেছনে কারণগুলি নতুন ইউনিয়ন সৃষ্টি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা গঠনের কারণ হয়েছে। তাছাড়া, ট্রেড ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, বিশেষত কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন কেন্দ্রের দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ার পাশাপাশি উৎপাদনের বহুজাতিকতা ও বিশ্বময় ছড়ানো ব্যবস্থা অতীতের একদেশ-ভিত্তিক

ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাকে বিভক্ত করে ফেলেছে। কেননা, বহু দেশে একই মালিকানাধীন একই চরিত্রের শিল্পে সৃষ্টি হয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশের নতুন ট্রেড ইউনিয়ন।

ট্রেড ইউনিয়নের এই সমস্যা স্বয়ং ঐতিহাসিক পরম্পরা এবং সমাজ ও উৎপাদনের বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার এক বিশিষ্ট দিক। আর এখন এইসব নেতিবাচক দিক সম্মিলিতভাবে ট্রেড ইউনিয়নের সামনে প্রবল সংকট তৈরি করেছে।

এই সমস্যার মুখে পড়ে এবং পরিস্থিতির চাপে দেশে দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঐক্য গঠনে, অন্ততপক্ষে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের জন্য, অব্যাহত চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সমস্যা কম নয়। কেননা অর্থনৈতিক, সামাজিক, উৎপাদনগত, অধিকারগত ইত্যাদি দাবী-দাওয়ার নিয়েও এখন ট্রেড ইউনিয়নে সর্বজনীন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন। কেননা শ্রেণী-দাবীর সমান্তরালে এখন সুবিধাভোগী বনাম বৈষম্যভোগী, সংগঠিত বনাম অসংগঠিত, পুরুষ বনাম নারী, শ্বেত বনাম কৃষ্ণ/পীত বর্ণ, স্বদেশীয় বনাম বহিরাগত ইত্যাদি বহুবিধ ধারার প্রবাহ গড়ে উঠেছে। তাছাড়া মতাদর্শগত স্তরে রয়েছে প্রবল বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য দূরের কথা দাবীর ঐক্যবদ্ধ চরিত্র গঠনে এ'জাতীয় অনৈক্যের বাস্তবতা ট্রেড ইউনিয়নের সামনে অতীতে সাধারণভাবে আসেনি। দাবীর প্রশ্নে ঐক্যই ছিল ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের প্রাথমিক ভিত্তি। এখন আক্রমণ এসেছে সেই ভিত্তির উপরেই।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের 'সোস্যাল ক্লজ', ট্রেড ইউনিয়নের সামনে সমস্যার নতুন দিক : বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শ্রম-প্রসঙ্গ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে থেকেও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন। এখন ধনতন্ত্রের অন্যতম পরিকল্পনা হলো শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সক্রিয় সহায়ক অংশে পরিণত করা, অন্যদিকে ধনতন্ত্রের ব্যবস্থার তলানিতে শ্রমিকশ্রেণীকে স্থায়ীভাবে রেখে নীচে চুঁইয়ে নামা 'উন্নয়নের ফল' বিতরণ করা। কিন্তু বাহ্যত তাদের শ্লোগানটি হলো শ্রমিকশ্রেণীকে 'গ্লোবাল-পার্টনার' তথা উন্নয়নের বিশ্ব-অংশীদার করা। এজন্য পুঁজি, বাজার, পণ্য-পরিষেবা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির বিশ্বজনীনকরণের মত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে শ্রম, শ্রম-ব্যবস্থা ও শ্রমের বাজারের বিশ্বায়ন। আর এই প্রচেষ্টার অন্যতম একটি দিক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এবং অত্যন্ত জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে ট্রেড ইউনিয়নের সামনে।

'জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যাণ্ড ট্রেডস'(গ্যাট)-এর উরুগুয়ে রাউণ্ডের চূড়ান্ত পরিণামে যে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন' (ডব্লু.টি.ও.) গঠিত হয়েছে, সেটির কর্মপরিসরের মধ্যে যুক্ত করার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে 'সোস্যাল ক্লজ'। এই সোস্যাল ক্লজের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন' (আই. এল. ও.)-এর ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ 'কনভেনশন'কে, যেগুলিকে 'কোর কনভেনশন' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কনভেনশনগুলি হলো— 'ফ্রীডম অব অ্যাসোসিয়েশন' (কনভেনশন নং ৮৭), 'ফ্রীডম ফ্রম ফোর্সড্ লেবার' (কনভেনশন নং ২৯ ও ১০৫), 'রাইট টু অরগানাইজ অ্যাণ্ড বার্গেন কালেক্টিভলি' (কনভেনশন নং ৯৮), 'মিনিমাম এজ ফর এমপ্লয়মেন্ট অব চিলড্রেন' (কনভেনশন নং ১৩৮), 'ফ্রীডম ফ্রম ডিসক্রিমিনেশন ইন এমপ্লয়মেন্ট অ্যাণ্ড অকুপেশন অন দ্য গ্রাউণ্ড অব রেস, সেক্স, রিলিজিয়ন, পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন, এটসেট্রা' (কনভেনশন নং ১১১) এবং 'রাইট টু ইক্যুয়াল রেমুনারেশন' (কনভেনশন নং ১০০)।

কনভেনশনগুলির সবগুলি অথবা অধিকাংশই তৃতীয় দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশ গ্রহণ ও কার্যকরী করেনি। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও চাপের অভাবে একদিকে, অন্যদিকে শোষণের স্বার্থে কনভেনশনগুলির বিরোধী ব্যবস্থা অনুন্নত অধিকাংশ দেশে বজায় রয়েছে। দেশগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতাও এ' জাতীয় শ্রম-বিরোধী পরিস্থিতি বজায় থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। বিপুল অলস শ্রম-শক্তি এবং ব্যাপক গণ-দারিদ্র্য এই পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূর্বোক্ত কনভেনশনগুলি সর্বাত্মকভাবে প্রয়োগ করতে হলে অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে যে উন্নতি,

অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যে সহযোগ ও সমান্তরাল বিকাশ প্রয়োজন, সেই সঙ্গতি ও বাস্তবতা অধিকাংশ তৃতীয় দুনিয়ার দেশে নেই এখনও।

ফলে মারাকাসে অনুষ্ঠিত গ্যাট সম্মেলনের 'সোস্যাল ক্লজ' অন্তর্ভুক্ত করার যখন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল, তখন তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল এটিকে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ সামিল বলে অভিযোগ করে। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলি যুক্তি দিয়েছিল যে অসঙ্গত শ্রম-পরিস্থিতি এবং ন্যায়-নীতিহীন ও নিম্ন মজুরির শিশুশ্রমিক ব্যবস্থা চালু রেখে উন্নয়নশীল দেশগুলি পণ্য উৎপাদনের খরচ চূড়ান্ত কম করছে এবং তার দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় তারা গ্রহণ করছে বাড়তি সুযোগ।

উরুগুয়ে রাউণ্ডের অন্তিম চুক্তিতে তৃতীয় বিশ্ব ও জনগণকে নিরন্তর শোষণের ব্যাপক ব্যবস্থা কার্যত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানীরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের বিচারে যথার্থভাবেই একে 'ব্লু রাউণ্ড' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'ব্লু কলার ওয়ার্কিংমেন' বা কায়িক শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধেই সমগ্র আক্রমণ ঐ চুক্তি ও ব্যবস্থাতে সর্বাগ্রে গৃহীত হয়েছে বলে এই নামকরণ।

'সোস্যাল ক্লজ'-এ শর্ত দেওয়া হয়েছে যে পণ্য-রপ্তানিকারী প্রত্যেকটি দেশ বা প্রতিষ্ঠানকে ঐ তথাকথিত 'সামাজিক ধারা'র ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করতে হবে। তা' না হলে অন্য যে দেশ বা প্রতিষ্ঠান ঐসব পণ্য আমদানির জন্য বাণিজ্যিক চুক্তিবদ্ধ, সেই দেশ বা প্রতিষ্ঠানের একতরফাভাবে সেই চুক্তি খারিজ করার, এমনকি পণ্য নিষিদ্ধ করার অধিকার থাকবে। অর্থাৎ পণ্যের গুণগত মান, দাম, পরিমাণ, সরবরাহের সময়সীমা ইত্যাদি সম্পূর্ণ যথার্থ হলেও, পণ্য উৎপাদনের নেপথ্য ব্যবস্থার গাফিলতির জন্য চুক্তি খারিজ করা যাবে। লক্ষণীয় দিক হলো শ্রম প্রসঙ্গ হলেও এটিকে 'লেবার ক্লজ' না বলে 'সোস্যাল ক্লজ' বলা হয়েছে। দৃশ্যত এই 'সোস্যাল ক্লজ' দেশ (রাষ্ট্র) ও প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ববদ্ধ করলেও, আসল লক্ষ্য হলো শ্রমিকশ্রেণী। অথচ বাণিজ্যের প্রসঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং প্রসঙ্গটিকে তথাকথিত শ্রেণী-নিরপেক্ষ এক সামাজিক আবরণ দিতে নামকরণে এই আবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই 'সোস্যাল ক্লজ'-এর দ্বারা বিশ্ব-ধনতন্ত্র উন্নত ও অনুন্নত দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে খাড়াখাড়ি বিভাজনের ব্যবস্থাও করেছে। তবে শেষোক্ত প্রসঙ্গ আলোচনার আগে, বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের অন্যান্য কিছু দিক লক্ষ্য করা যেতে পারে।

'ডব্লু.টি.ও.'-তে সোস্যাল ক্লজ যুক্ত হওয়ার পূর্বেও বাণিজ্য চুক্তিতে এই জাতীয় ধারা নিয়ে উন্নত পুঁজিবাদ অতীত থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছে। 'দা নর্থ আমেরিকান ফ্রী ট্রেড এগ্রিমেন্ট' (নাফটা) নামে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে যে 'মালটিল্যাটারাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট' তথা বহুদেশীয় বাণিজ্য চুক্তি ঘটেছে, সেটিতে 'সাইড এগ্রিমেন্ট অন লেবার' বা শ্রম-প্রসঙ্গে সহ-চুক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল।

তবে এই 'সাইড এগ্রিমেন্ট'-এ পূর্বোক্ত ধরনের শ্রম-ব্যবস্থার হুবহু শর্ত না থাকলেও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের পণ্য আমদানিকারক দেশ বাতিল করতে পারবে বলে সংস্থান করা হয়েছে। নাফটা চুক্তির প্রস্তুতিপর্বে আমেরিকান ট্রেড ইউনিয়নগুলি আন্দোলন শুরু করেছিল এই বক্তব্য তুলে যে, আমেরিকার শ্রম-শক্তির সুযোগ কানাডা ও মেক্সিকোতে পাচার হয়ে যাবে। শ্রমিকশ্রেণীসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে এই বিক্ষোভের মনোভাব লক্ষ্য করে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, চুক্তিতে আমেরিকান শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ও পরিবেশ-মান সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ও সুরক্ষা না থাকলে তিনি চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবেন না। তারপর ঐ চুক্তিতে 'সাইড এগ্রিমেন্ট' শিরোনামে তিনটি অংশ যুক্ত হয়; এগ্রিমেন্ট অন লেবার কো-অপারেশন, এগ্রিমেন্ট অন এনভায়রণমেন্ট, ও এগ্রিমেন্ট অন ইমারজিং ইস্যুজ। লক্ষণীয় যে দেশীয় শ্রমিকশ্রেণীর দাবীকে মেটাতে যেসব শর্ত যুক্ত করা হলো সেগুলি স্পষ্টতই 'প্রোটেকশনিস্ট' বা 'সংরক্ষণবাদী'। অর্থাৎ আমেরিকান শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের নামে কানাডা ও মেক্সিকোর উৎপাদনে শ্রমের জন্য বাড়তি খরচ চাপিয়ে দেশ দু'টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার

ডানা ছাঁটা হল। অন্যান্য উন্নত দেশগুলির সরকার নাফ্‌টার এই ব্যবস্থা-পত্র থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নিয়েছিল। তাই দেখা যায়, গ্যাটের আগে বহু ধরনের 'বাই-ল্যাটারাল', 'ট্রাই-ল্যাটারাল' ও 'মালটিল্যাটারাল' চুক্তিতে শ্রম-প্রসঙ্গ যুক্ত হতে শুরু করেছিল; যেগুলির অন্যতম ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রযুক্ত 'জেনারেল সিস্টেম অব প্রেফারেন্স' (জি.এস.পি.),'সোস্যাল চার্টার অব দা ইউরোপীয়ান কমিউনিটি', 'সোস্যাল চার্টার অব ক্যারিবিয়ান বেসিন ইনিসিয়েটিভ' প্রভৃতি। ইউরোপের বহু ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থির করেছে যে শিশু শ্রমিকদের দিয়ে তৈরি করা হয়নি, এই সার্টিফিকেট দেবার পরই আমদানিকৃত কার্পেট বিক্রি করা হবে। আমেরিকাতে এবিষয়ে 'হারকিন বিল' আইনের অপেক্ষায় রয়েছে। উল্লেখিত চুক্তিগুলিতে প্রধানত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার যথার্থতার উপর। কিছু কিছু বহুজাতিক সংস্থা, অন্যদেশে পুঁজি বিনিয়োগ ও উৎপাদন করার শর্ত হিসাবে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কাছে 'কোড অব কণ্ডাক্ট'-এর চুক্তিও করিয়ে নিচ্ছে। কোডের নামে এগুলি কার্যকালে শ্রম-বিরোধ চাপা দেবার ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু শ্রম-পরিবেশ ইত্যাদির যে শর্ত দেয় তারা, নিজেদের সাব-কন্ট্রাক্টরদের ক্ষেত্রে তা' সাধারণভাবে নিজেরাই পালন করে না, এম. এন. সি.-গুলি সরকারের উপর কখনো চাপ দেয় না।

'সোস্যাল ক্লজ'-বিষয়ে পক্ষ ও বিপক্ষ শিবিরের চরিত্র অভিনব ধরনের। এটির পক্ষে দাঁড়িয়েছে উন্নত দেশগুলির সরকার, মালিকশ্রেণী, দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়ন ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। এর বিরুদ্ধে রয়েছে তৃতীয় দুনিয়ার সরকারগুলি এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির একাংশ। উভয় পক্ষের যুক্তির মূল দিকগুলি নিম্নরূপ :

'সোস্যাল ক্লজ'-এর পক্ষের প্রবক্তারা মনে করেন যে এই ক্লজের প্রবল চাপে আই.এল.ও.-র কনভেনশনগুলি, যা অতীতে কার্যকরী হয়নি, এখন থেকে সেগুলি দেশে দেশে, বিশেষত, তৃতীয় দুনিয়ায়, আইনি ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠা পাবে। তার ফলে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের উদারীকরণ ঘটবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার রক্ষার জন্য নতুন আন্তর্জাতিক মঞ্চ গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। ক্লজের সমর্থকদের দাবী হলো যে, এই 'ক্লজ'-এর দ্বিবিধ ইতিবাচক উপাদান রয়েছে; এই ব্যবস্থা রপ্তানিকারক দেশগুলির কর্ম-মানের উন্নতি ঘটাবে, অন্যদিকে আমদানিকারী দেশের শিল্প বন্ধ হওয়া ও কর্মহানির আশঙ্কা কমাবে। এইভাবে দুই দেশের রপ্তানিকারী ও আমদানিকারী শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমের পরিসরে বাজারী শক্তির সঞ্চালনের সামনে সৃষ্টি হবে 'লেভেল প্লেয়িং গ্রাউণ্ড' বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমান পরিবেশ। সমর্থকরা আরও মনে করে যে, বহুদেশে নিম্ন-মজুরির ব্যবস্থা এবং পীড়নমূলক শ্রম-পরিবেশের অবসান ঘটতে শুরু করবে 'সোস্যাল ক্লজ'-এর প্রয়োগের ফলে। ক্লজ-বাদীদের আর একটি যুক্তি হলো, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমান্তরালে সামাজিক উন্নতি সর্বাংশে জরুরি; 'সোস্যাল ক্লজ' শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক উন্নতি ঘটিয়ে দেশের সর্বাংশের সামগ্রিক সামাজিক উন্নতির অন্যতম ক্ষেত্র তৈরি করবে। এঁরা মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে দারিদ্র্য-বিমোচন ও সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম দিক হলো শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শেষোক্ত বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল কেবল দেশীয় সরকারগুলির শুভবুদ্ধি ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল থেকেছে, ফলে এ'ব্যাপারে তেমন কোন উন্নতি তৃতীয় দুনিয়ায় ঘটেনি। শ্রমিকশ্রেণী ও দেশের অভ্যন্তরীণ গণ-আন্দোলনের শক্তির চাপে সামান্য মাত্র অগ্রগতি ঘটেছে মাত্র, তাও অধিকাংশ দেশে আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল; কোন কোন দেশে ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ-আন্দোলনের অস্তিত্ব এখনো পর্যন্ত নেই। সুতরাং এখন সময় উপস্থিত হয়েছে যখন দেশের বাইরে থেকে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রভাব ও চাপ সৃষ্টি করে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি করা দরকার। শ্রমিকশ্রেণীর উন্নয়নের দায়ভার এখন আর কেবলমাত্র দেশের সরকার ও সংশ্লিষ্ট দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের উপর ছেড়ে রাখা যায় না। পাশাপাশি ক্লজ-সমর্থকরা মনে করেন যেসব দেশে বিভিন্ন ধরনের শ্রম-মানক (লেবার স্ট্যাণ্ডার্ড) আইনগতভাবে গৃহীত হয়েছে, সেসব দেশেও এগুলির রূপায়ণের বা পরিদর্শনের ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। ৭৫ বছরের আই.এল.ও.-র অস্তিত্বের ইতিহাসে সংস্থাটি বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেও

সেগুলি বাধ্যতামুলকভাবে দেশগুলির দ্বারা রূপায়ণ করানোর অধিকার পায়নি, ভবিষ্যতে তেমন সম্ভবনাও নেই। সুতরাং আই.এল.ও.-র সিদ্ধান্ত দেশগুলির দ্বারা মান্য ও রূপায়ণ করার জন্য বাধ্যতার নতুন আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা করা দরকার। সমর্থকরা মনে করেন যে ডব্লু.টি.ও. তে প্রস্তাবিত 'সোস্যাল ক্লজ' সেক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

'সোস্যাল ক্লজ'-এর বিরুদ্ধে যাঁরা, তাঁর সর্বাগ্রে মনে করেন যে এই ব্যবস্থা ডব্লু.টি.ও. তে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অন্যতম প্রধান নীতি অর্থাৎ বাণিজ্যে সকলের জন্য সমান অধিকার ও মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই 'সোস্যাল ক্লজ'-এর মধ্য দিয়ে বৈষম্যকে পিছনের দরজা দিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে। মুক্ত বাজার ও বিশ্বায়নের দাবী তুলে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বাজারে উন্নত দেশগুলির পণ্য-প্রবেশের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি 'সোস্যাল ক্লজ' প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তারা ছদ্মাবরণে নিজ দেশের বাজারে অন্য দেশের পণ্য-প্রবেশ বিরোধী তথা অতীতের 'প্রোটেকশনিস্ট' তথা সংরক্ষশমূলক ব্যবস্থা বহাল রাখতে চাইছে। 'সোস্যাল ক্লজ' হলো বিদেশী পণ্য প্রবেশের বিরুদ্ধে পরোক্ষ কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী এক ধরনের 'ট্যারিফ ব্যারিয়ার'—উচ্চহারে কর বা শাস্তির মাসুল গুণতে বাধ্য করার মাধ্যমে প্রতিরোধী প্রচেষ্টা। এই 'সোস্যাল ক্লজ' মৌলিক শ্রম-মানক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয়, আসলে এটি হলো উন্নত দেশগুলির দ্বারা অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নকে সীমাবদ্ধ রাখার এক ধরনের চক্রান্ত এবং তাদের অভ্যন্তরীণ আইন ও সামাজিক বিষয়ে পরোক্ষ হস্তক্ষেপের হাতিয়ার। এই ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার অর্থ অনুন্নত দেশে যে শ্রমজীবীরা কাজ করে তাদের এক ব্যাপক অংশকে ছাঁটাই করতে হবে (যেমন শিশু শ্রমিক), ফলে বেকারী আরও বাড়বে। এঁদের মতে এটা 'সোস্যাল ক্লজ' নয় এটা 'কনস্‌পিরেসি ক্লজ' বা 'চক্রান্তমূলক ধারা'।

নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে যে, এক ব্যাপক সংখ্যক দেশ আই. এল. ও.-র শ্রম-বিষয়ক সংশ্লিষ্ট কনভেনশনগুলি এখনো 'র‍্যাটিফাই' করেনি অথচ ডব্লু. টি. ও.-র বর্তমান সদস্য ১১২টি দেশ। তাছাড়া সদস্য হওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ আবেদনকারী দেশের সংখ্যা হলো ২৬টি (১৯৯৭)। সেগুলি হলো, আলবেনিয়া, আলজিরিয়া, আর্মেনিয়া, বেলারুশ, কলম্বিয়া, চীন, ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, জর্ডন, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, ম্যাসিডোনিয়া, মল্ডোভা, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, পানামা, রাশিয়া, সৌদি আরব, সেচেলেস, সুদান, তাইওয়ান, টোঙ্গো, ইউক্রেন, উজবেকিস্তান, ভানুয়াটু ও ভিয়েতনাম।

আই. এল. ও. কনভেনশন নম্বর	কনভেনশনের চরিত্র	কতগুলি দেশ র‍্যাটিফাই করেছে
৮৭	ফ্রীডম অব অ্যাসোসিয়েশন	৯৪
৯৮	রাইট টু অরগানাইজ অ্যাণ্ড কালেক্টিভ বার্গেনিং	১০৫
১৩৮	এনলিস্টমেন্ট অব চাইল্ড লেবার	৪১
১১১	ফ্রীডম ফ্রম ডিস্‌ক্রিমিনেশন ইন এমপ্লয়মেন্ট অ্যাণ্ড অক্যুপেশন	১০৬
১০০	ইক্যুয়াল রেমুনারেশন	১০৬
২৯	ফোর্সড লেবার	১১৪
১০৫	অ্যাবলিশন অব ফোর্সড লেবার	৯৪

আই. এল. ও. কনভেনশনগুলির 'র‍্যাটিফিকেশন'-এর পরিস্থিতি যেখানে এরকম, সোস্যাল ক্লজ-বিরোধীরা মনে করেন যে, সেখানে বাণিজ্যিক চুক্তিতে ঐ 'ক্লজ' মেনে নেওয়া অধিকাংশ তৃতীয় দুনিয়ার দেশের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা ঐ ধরনের উপযোগী বাস্তবতাই সংশ্লিষ্ট দেশে নেই।

তৃতীয় দুনিয়ার মালিকশ্রেণী, সরকার ও তাদের পক্ষ ভুক্ত একাংশ বুদ্ধিজীবীর 'সোস্যাল ক্লজ' বিরোধিতা হলো 'স্ট্যাণ্ডার্ড' তথা মানক এবং 'কালচার' তথা সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। এঁরা বলেন যে

'ইউনিভার্সাল লেবার স্ট্যাণ্ডার্ড' বা বিশ্বজনীন শ্রম-মানকের কোন অস্তিত্ব নেই। পশ্চিমি দেশগুলির তুলনায় ভিন্ন ধরনের শ্রম-অধিকার, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রয়েছে তৃতীয় দুনিযার শ্রমিকশ্রেণীর। ফলে যে সোস্যাল ক্লজ তথা লেবার ক্লজ-এর কথা বলা হচ্ছে তা' বিদেশী, কৃত্রিম ও আরোপিত হতে বাধ্য। তাছাড়া যে শিল্পোন্নত দেশগুলি লেবার ক্লজ নিয়ে এত উৎসাহী সেইসব দেশেও ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার অত্যন্ত আংশিক। বিরোধীদের অপর যুক্তি হলো 'সোস্যাল ক্লজ'কে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষী বলে যদি ধরেও নেওয়া যায়, তথাপি বলা যায় যে ঐসব শ্রম-মানক যাদের জন্য সর্বাপেক্ষা জরুরি এবং একান্ত প্রয়োজনীয়, তারা সাধারণভাবে সোস্যাল ক্লজের দ্বারা উপকৃত হবে না। কেননা 'সোস্যাল ক্লজ' প্রযুক্ত হবে রপ্তানি-মূলক উৎপাদনকারী সংগঠিত শিল্পে। অথচ তৃতীয় দুনিয়ার শ্রমজীবীদের ৮০ শতাংশের বেশী কাজ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। তাছাড়া সংগঠিত শিল্পের বড় অংশও রপ্তানিধর্মী নয়। এমনকি রপ্তানি-ভিত্তিক পণ্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপাদিত হয় তৃতীয় দুনিয়ায় ব্যবসাকারী বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে, সাব-কন্ট্রাক্টরি বা হোম-ওয়ার্ক প্রথায়। রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে শেষোক্ত দুই ব্যবস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের সরাসরি সামনে দেখা যায় না এবং মূল কারখানার দ্বারা নিযুক্তও তারা নয়। সুতরাং রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান আমদানিকারী দেশের সাথে পণ্য-বিষয়ে চুক্তি করার সময় সাব-কন্ট্রাক্টরি বা হোম-ওয়ার্ক প্রথার শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নেবে না। ফলে 'সোস্যাল ক্লজ' রূপায়িত হলেও, পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য তৃতীয় দুনিয়ার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক শ্রমজীবী এর আওতাতে আদৌ আসবে না। তাছাড়া এমনও কিছু দেশ আছে, যেমন তাইওয়ান, যারা রাষ্ট্রসংঘের ও অর্ন্তভুক্ত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার (আই. এল. ও. সহ) সদস্য নয়। সুতরাং তাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই 'সোস্যাল ক্লজ'-এর বিষয়ে, অথচ এরাও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করে থাকে। সোস্যাল ক্লজের বিরোধীদের অনেকে ঘোষিত উদ্দেশ্য সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন, শর্ত ভঙ্গ করলে যদি কোন প্রতিষ্ঠান বা দেশের পণ্য-বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাতে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির আর্থিক উন্নতির তথাকথিত আন্তর্জাতিক লক্ষ্য পূরণ হবে কি? শ্রমিকদেরও কিভাবে উন্নতি ঘটবে যদি রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করার ফলে কারখানার উৎপাদন কমে যায় বা কারখানা বন্ধ হয়ে যায়? সোস্যাল ক্লজগুলি কেবলমাত্র আইনানুগ এবং ইনস্ট্রুমেন্ট বা সাধিত্র, কিন্তু কার্যকরী ফলাফলের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেগুলির রূপায়ণের ব্যবস্থা। অথচ সে ব্যবস্থা দেশগুলিতে বা ক্লজেও নেই। গ্যাট-চুক্তির অন্তর্গত সোস্যাল ক্লজ কেবল বিষয়বস্তু বা ব্যাখ্যা ও শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তির হুমকি দিয়েই দায় শেষ করেছে, শাস্তি প্রয়োগের কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেনি।

সোস্যাল ক্লজ সম্পর্কিত বিতর্কে আরও বিভিন্ন ধরনের মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এই বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন মহলে, জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমুহের অভ্যন্তরে—যেমন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই. এল. ও., ডব্লু. টি. ও. ইত্যাদি এবং সাহায্যদানকারী সংস্থাগুলি ও নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন প্রভৃতিতে।

বিশ্বের 'ফেমিনিস্ট' তথা নারীবাদী এন. জি. ও.গুলির এক ধরনের বক্তব্য রয়েছে এ'বিষয়ে। ইংলণ্ডে সদর দপ্তর, প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার্কিং উইমেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড' (ডব্লু. ডব্লু. ডব্লু.) সংগঠনটি 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড ইস্যু ইজ আ উইমেনস ইস্যু' শীর্ষক আলোচনায় চ্যালেঞ্জ করেছে যে সোস্যাল ক্লজে নারী-প্রসঙ্গ যেমন যুক্ত হয় নি, ক্লজটি সম্পর্কিত বিভিন্ন স্তরের আলোচনা-বিতর্কেও তাদের যুক্ত করা হচ্ছে না। এই ক্লজের উদ্দেশ্য যদি শ্রমজীবীদের শ্রম-সমস্যা হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সর্বত্রও সর্বাপেক্ষা অবহেলিত হল নারী শ্রমজীবীরাই। তদুপরি রপ্তানিযোগ্য উৎপাদনের আধুনিক শিল্পে নারী শ্রমজীবীরা সর্বাধিক সংখ্যায় কাজ করে। তদুপরি এই ধরনের শিল্পে নারীরা সর্বত্র সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত ও নিষ্পেষিত। মজুরী ও শ্রমের পরিস্থিতি তাদের পক্ষে সবচাইতে খারাপ ও বৈষম্যপূর্ণ। নারীদের পারিবারিক শ্রমের প্রসঙ্গ কোথাও উল্লেখিত হয় না; স্বভাবতই তাদের শ্রম-অধিকারের পরিসর পুরুষদের তুলনায় বৃহত্তর। এগুলিসহ যৌন হয়রানি, মাতৃত্ব ও শিশু পালনের অধিকার প্রভৃতি 'সোস্যাল ক্লজ'-এ যুক্ত না থাকলে, শ্রমিকাদের জীবনে এই ক্লজ অর্থহীন হতে বাধ্য।

মানবাধিকার বিষয়ক এন. জি. ও.গুলি 'সোস্যাল ক্লজ'কে শ্রম-সংক্রান্ত বিষয়ের চাইতে অধিকতর মানবাধিকার (হিউম্যান রাইটস)-মূলক বলে অভিহিত করেছে এবং দাবী করেছে এগুলির মধ্যে পূর্ণ মানবাধিকার বিষয়ক শর্ত যুক্ত করার। সোস্যাল ক্লজকে তারা শাঁখের করাত মনে করে, কেননা এতে নিহিত আছে সৎ ও অসৎ উভয় উদ্দেশ্যই। তবে তারা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পক্ষপাতী। এদের মতে শর্তাবলী পূরণ না করলে রপ্তানিকারক সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যবস্থাও মানবাধিকার-বিরোধী। কেননা তাতে কারখানা বন্ধ হবে অথবা শ্রমিক ছাঁটাই হবে; ফলে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং এদের দাবী ক্লজে এ' জাতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংস্থান থাকা উচিত নয়। বরং তারা মনে করে যে মানবাধিকার-ভিত্তিক 'সোস্যাল ক্লজ'কে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে দেশে রূপায়িত করতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নের স্তরে এই বিরোধ-বিতর্কের তিনটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে। (ক) 'সোস্যাল ক্লজ'-এর পক্ষে, (খ) এটির বিপক্ষে, ও (গ) একটি মধ্যবর্তী ধারা। প্রথম দু'টি ধারা এক অর্থে জাতীয়তাবাদী, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সরকার ও মালিকশ্রেণীর মনোভাবের প্রতিনিধিত্বকারী এবং তৃতীয়টি নিজ অংশের প্রতিনিধিত্বকারী, শ্রমিকদের স্বার্থ-ভিত্তিক।

'সোস্যাল ক্লজ'-এর পক্ষে কেবল নয় সেটিকে আরও ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট করার দাবী তুলেছে আই. সি. এফ. টি. ইউ.। তারা আই. এল. ও.-র অন্যান্য ধারাগুলি ছাড়াও, বিশ্বব্যাপী একই ন্যূনতম মজুরি-ব্যবস্থার চালুর সপক্ষে। তবে 'ইন্টারন্যাশনাল টেক্সটাইল, গারমেন্ট এবং লেদার ওয়ার্কার্স ফেডারেশন' (আই. টি. জি. এল. ডব্লু. এফ্) মনে করে যে সোস্যাল ক্লজ'-এর মিনিমাম ওয়েজ সিস্টেম সুদৃঢ় রেখেও শ্রমিকের পরিবারের ভরণপোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সংস্থান সম্ভব হয় এমন প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হওয়া উচিত। উন্নত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলি 'সোস্যাল ক্লজ'-এর ধারাগুলির সাথে 'মিনিমাম ওয়েজ' ছাড়াও, অক্যুপেশনাল হেলথ এণ্ড সেফ্‌টি; উইকলি রেস্ট, নারীদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা, শ্রমব্যবস্থা পালিত হচ্ছে কি না তা' শ্রমিকদের দ্বারা পরিদর্শন করার অধিকার, নিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইত্যাদি যুক্ত করার দাবী তুলেছে। উন্নত দেশগুলির একাংশ ট্রেড ইউনিয়নের বক্তব্য হলো শ্রম-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে 'কোর স্ট্যাণ্ডার্ড' বলে ঘোষণা করা এবং সেগুলিকে সোস্যাল ক্লজে যুক্ত করা এবং অন্যদিকে 'নন-কোর স্ট্যাণ্ডার্ড'গুলিকে স্বেচ্ছামূলকভাবে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা দরকার। 'কোর স্ট্যাণ্ডার্ড'কে এরা মৌলিক মানবাধিকারের অংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করে। 'নন্-কোর স্ট্যাণ্ডার্ড'গুলি বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তরের ভিত্তিতে প্রয়োগ করাই সঙ্গত বলে এদের অভিমত।

শেষোক্ত সব বক্তব্য অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের শ্রম-ব্যবস্থাকে উন্নত দেশগুলির মানে উপনীত করবে—এটা দৃশ্যত প্রমাণ করার এবং এক আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ বলে মনে হলেও, কার্যকালে এটি পরিস্থিতি-বিচারহীন যান্ত্রিকতা মাত্র। এদের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো 'সোস্যাল ক্লজ'-এর অস্ত্র দিয়ে তৃতীয় দুনিয়ার বাণিজ্যকে দুর্বল করা এবং তার বিনিময়ে স্বদেশী বাণিজ্যকে পুষ্ট করে শিল্পের বিকাশ ও স্বদেশী শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বের ও উন্নতির চেষ্টা মাত্র।

অন্যদিকে তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলির অধিকাংশই সমগ্রভাবে বিরোধিতা করেছে 'সোস্যাল ক্লজ'-এর। তারা মনে করে, এই ব্যবস্থা হলো সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষী ও প্রয়াস এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী। এই অংশের ট্রেড ইউনিয়ন স্বীয় শ্রমিকশ্রেণীর সার্বিক উন্নতি কামনা করলেও, তারা মনে করে যে উন্নত শ্রম-ব্যবস্থা স্বদেশীয় বাস্তবতার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে এবং দেশের সর্বাংশের শ্রমিকশ্রেণীর জন্যই করাতে হবে, কেবলমাত্র রপ্তানিমূলক ক্ষেত্রে জন্য নয়। 'ক্লজে' বর্ণিত শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধের প্রশ্নই অনুন্নত দেশের ট্রেড ইউনিয়নের সামনে প্রধান সমস্যা। কেননা প্রবল দারিদ্র্যের জন্য তৃতীয় দুনিয়ায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২০ কোটির বেশি; এরা ট্রেড ইউনিয়নে সাধারণভাবে সংগঠিতও নয়; সর্বোপরি এদের ছাঁটাই করার পর এদের বাঁচার সংস্থানের জন্য বিকল্পের ব্যবস্থা করা ট্রেড ইউনিয়ন বা রাষ্ট্রের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। অর্থাৎ শ্রম-মানক রূপায়ণ করতে গিয়ে উদ্বৃত্ত শ্রমের সামাজিক

ও আর্থিক সংস্থান না করা পর্যন্ত, এই ধরনের ব্যবস্থা বিপর্যয় ছাড়া কিছুই বহন করবে না—এটা ট্রেড ইউনিয়নগুলি দৃঢ়ভাবে মনে করে। অনুন্নত দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি দুর্বল-শক্তির হওয়া ছাড়াও বৃহদংশের সংগঠনই মালিক-ঘেঁষা বা সরকার-পৃষ্ঠপোষিত। তাই অনুরূপ বহু ট্রেড ইউনিয়ন মালিক ও সরকার পক্ষের যুক্তি দিয়ে 'সোস্যাল ক্লজ'-এর বিরোধিতা করে।

ট্রেড ইউনিয়নের স্তরে তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত-অনুন্নত দেশ-নিরপেক্ষ; এই মনোভাব প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির। এদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রমিকশ্রেণীর ও সার্বিক জনগণের স্বার্থরক্ষা, আন্তর্জাতিকতাবাদী ঐক্য প্রয়াস এবং সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধিতার নীতিগত অবস্থানের সুদৃঢ় দিকসমূহ রয়েছে। 'সোস্যাল ক্লজ' নিয়ে বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত খাড়াখাড়ি দ্বিধাবিভক্তিকে বিপজ্জনক এবং তার ফলে বিশ্ব-পুঁজিবাদ বাড়তি সুযোগ পাচ্ছে বলে এরা মনে করে। এই তৃতীয় ধারা মনে করে যে, পূর্বোক্ত পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পেছনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনের চরিত্র ও লক্ষ্য সম্পর্কে উভয় অংশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির যথার্থ উপলব্ধির অভাব এবং তার ফলে তথাকথিত শ্রম-মানক বাস্তবায়িত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপলব্ধিতে ভ্রান্তি ঘটছে। এই তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ডব্লু. টি. ও.-এর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সামাজিক মানকের বিরোধিতা করলেও বিশ্বজনীন শ্রম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সুদৃঢ়। তাদের এই অবস্থান গ্রহণের পিছনে প্রকৃত বিশ্ব-বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কেননা সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতি কেবল প্রবল বৈষম্যমূলক নয়, সেই বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। বিশ্বের সমগ্র 'গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট'-এর (জি.এন.পি.) বা মোট জাতীয় আয়ের যোগফলের ৮০ ভাগ ঘনীভূত রয়েছে মুষ্টিমেয় উন্নত দেশগুলিতে। বিশ্বের সর্বনিম্ন দরিদ্র অংশ ভোগ করে মাত্র ১.৪ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও আই. এম. এফ.-নির্দেশিত 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' (স্যাপ) তথা কাঠামোগত সংস্কারের কর্মসূচী কেবল গণ-দারিদ্র্য বাড়াচ্ছে না, অধিকন্তু ঋণ-সংকট বাড়িয়ে তৃতীয় দুনিয়ার সম্পদ উত্তরোত্তর উন্নত দুনিয়ায় পাচার করছে। একই সঙ্গে লক্ষণীয়— বহুজাতিক সংস্থাগুলির (যেগুলিকে এখন মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন বলার চেয়ে 'গ্লোবাল কর্পোরেশন' বলাই বাঞ্ছনীয়) বিশ্ব-বাণিজ্যের ওপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব অর্জন। পৃথিবীর সর্বপ্রধান ১৫টি গ্লোবাল কর্পোরেশনের বার্ষিক আয় ১২০টি অনুন্নত দেশের 'গ্রস ডোমোস্টিক প্রোডাক্ট' (জি.ডি.পি) বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের যোগফলের চেয়ে বেশি (১৯৯৫)। ৫০০টি সর্ববৃহৎ কর্পোরেশন বিশ্ব-বাণিজ্যের ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে বিশ্ব-জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ গভীর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত এবং দুনিয়ার ৮০০ মিলিয়ন মানুষ বেকার।

'গ্যাট' চুক্তি ও ডব্লু. টি. ও.-র প্রতিষ্ঠা বিশ্ব-আর্থনীতিক কাঠামোর এই বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য হয়নি;এখনও পর্যন্ত তারা এ বিষয়ে সামান্য কোন পরিবর্তন ঘটায়নি;বরং এটির সহায়তায়, গ্লোবাল কর্পোরেশন ও শিল্পোন্নত দেশগুলি, বিশ্বের কোটি কোটি জনগণের ওপর কর্তৃত্ব ও শোষণ আরও বৃদ্ধি করে চলেছে। ডব্লু. টি. ও. অধিকতর স্বাধীন বাণিজ্যের নিশ্চয়তা দিয়েছে, কিন্তু পক্ষপাতহীন বাণিজ্যের নিশ্চয়তা দেয়নি। যে প্রতিষ্ঠান স্বয়ং ধারাবাহিকভাবে অধিকার ভঙ্গ করে চলেছে এইভাবে, কি করে আশা করা যায় যে তাদের হাতে শ্রমিকদের অধিকার অর্জিত ও সুরক্ষিত হবে?

ট্রেড ইউনিয়নের তৃতীয় ধারার বক্তব্য হলো যে ডব্লু. টি. ও.-বর্ণিত রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে শোষিত জনগণের স্বার্থের পার্থক্যও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। যে পটভূমিকায় ডব্লু. টি. ও. 'আনফেয়ার ট্রেড' বা অবাঞ্ছিত বাণিজ্যের বিষয়ে বিরোধ-নিষ্পত্তি করবে বলে প্রতিশ্রুত, আদৌ যদি তা ঘটে তবে তা' ঘটবে রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূলে, জনগণের স্বার্থের অনুকূলে নয়;বরং তাতে জনগণের স্বার্থের ক্ষতি হবে।

পূর্বোক্ত পটভূমিকায় তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়গুলি মনে করে যে গ্যাটের উরুগুয়ে রাউণ্ড ও ডব্লু. টি. ও. ব্যবস্থার দ্বারা অসম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি ও জনগণের স্বার্থের বিরোধিতা সুস্পষ্ট, তাতে 'সোস্যাল ক্লজ' আর একটি বাড়তি উপাদান। 'সোস্যাল ক্লজ'-এর সপক্ষে উন্নত দেশগুলির বক্তব্য যেমন উদ্দেশ্য প্রণোদিত, অন্যদিকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ক্লজের বিরোধিতাও প্রকৃত প্রস্তাবে

শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের স্বার্থরক্ষার সহায়ক নয়। শেষোক্ত দেশগুলি 'সোস্যাল ক্লজে'র বিরোধিতা করে, অথচ ডব্লু. টি. ও.-র শর্তাবলী মেনে নিতেও শুরু করেছে।

'নিও-লিবারাল ইকনমিক পলিসি'র বিশ্বায়নের সাথে শ্রমিক, নারী ও শিশুর অধিকার, মানবাধিকার ও পরিবেশের অধিকাবের উপর আক্রমণও বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘ সংগ্রাম অর্জিত অধিকারগুলিরও ক্ষয় হচ্ছে। সংগঠিত ক্ষেত্র থেকে শ্রমিকরা বেশি বেশি করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে দ্রুত দারিদ্র্য বাড়ছে ও শ্রমজীবীরা দ্রুত প্রান্তিক চরিত্র পাচ্ছে। এর প্রভাব সবচাইতে বেশি পড়ছে নারী ও শিশুদের ওপর। সুতরাং এই ব্যাপ্ত ও জটিল পটভূমিকায় ডব্লু. টি. ও.-র 'সোস্যাল ক্লজ' কখনো, কোন দেশের সমগ্র জনগণের জাতীয় সামাজিক সাম্য ও উন্নতির বিকল্প দিতে পারে না।

'মালটিল্যাটারাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট'-এ শ্রম, পরিবেশ ও মানবাধিকার প্রসঙ্গ যুক্ত করার তাৎপর্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে, ভারতে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির আলোচনাতে (২০-২৩শে মার্চ, ১৯৯৫, দিল্লী) দু'টি মত এসেছে। এক পক্ষ মনে করে যে, যেহেতু এই সংযুক্তি বৃহত্তর শোষণমূলক ব্যবস্থার স্বার্থে, সুতরাং 'ক্লজ'কে সরাসরি খারিজ করতে হবে। অপর অংশের বক্তব্য হলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জন-বিরোধী ভূমিকার ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক স্বার্থরক্ষার জন্য স্বয়ং 'সোস্যাল ক্লজ' দর-কষাকষি ও লড়াই-এর বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। তবে উভয় অংশই মনে করে যে শ্রমিক স্বার্থরক্ষার সর্বোত্তম পথ হল সংগ্রাম গড়ে তোলা।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন অংশ মনে করে, ডব্লু. টি. ও.-র দ্বারা বিশ্বব্যাপী 'সোস্যাল ক্লজ' চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার পটভূমিতে, ট্রেড ইউনিয়নকেও দেশ, অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক স্তরে দৃষ্টিভঙ্গির সমতা গড়ে তুলে লড়াই চালাতে হবে।

ওয়ার্ক-কালচার তথা কর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের সমস্যা : চিরায়ত ধনতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা একদা উন্নত শিল্প ব্যবস্থার পত্তন ও বিকাশের শর্ত হিসাবে অনুন্নত দেশগুলিকে পশ্চিমি ওয়ার্ক-কালচার বা কর্ম-সংস্কৃতি অনুসরণের কথা বলতেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী-কালে উপনিবেশগুলিতে শিল্পব্যবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে (ব্যবস্থাপক স্তর ছাড়া) পাশ্চাত্য কর্ম-সংস্কৃতি চালু করার চেষ্টা তাঁরা করেননি। প্রাক-পুঁজিবাদী দাস বা সামন্ত ব্যবস্থায় তীব্র শোষণের অব্যাহত ধারায় সর্বোচ্চ পরিমাণ শ্রম-শক্তি নিংড়ে নেওয়া ও দাসত্বের শৃঙ্খলা ছিল তাদের শ্রম-সংস্কৃতির স্বরূপ। পদানত দেশগুলি ছিল সাধারণভাবে পশ্চাৎপদ সমাজব্যবস্থার স্তরে, বিশেষত, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। বাইরে থেকে প্রবিষ্ট ও আরোপিত পুঁজিবাদ সেই সমাজ-সংস্কৃতির কোন পরিবর্তন ঘটায়নি। বরং পশ্চাৎপদ সমাজব্যবস্থার উপর শিল্পব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে শ্রমিকদের জন্য কার্যত এক ধরনের দাস-শ্রমভিত্তিক কর্ম-সংস্কৃতি বহমান ছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শ্রমিকের তথাকথিত শ্রম-শক্তি বিক্রির স্বাধীনতার স্তরটুকুও অর্জিত হয় নি। সুতরাং উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় পদানত দেশগুলির সদ্য গঠিত পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থায় স্বতন্ত্র কর্মসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পদানত দেশগুলি একে একে স্বাধীনতা অর্জন এবং কিছুটা স্বীয় শিল্প-বিকাশ শুরু হওয়ার পর উন্নত পুঁজিবাদী কর্ম-সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ হয়ে উঠতে থাকে—দ্রুত শিল্পোন্নয়নের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু দীর্ঘ পরাধীনতার পর মুক্তি, কার্যত দাস-শ্রম থেকে কিছুটা আধুনিক মজুরি শ্রমের ব্যবস্থা, নতুন শিল্প-সম্পর্ক, ট্রেড ইউনিয়নের বিস্তার, কিছু কিছু বুনিয়াদি শিল্পের পত্তন, আধুনিক যন্ত্র-ব্যবস্থার সংযুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক, পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ, অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার, ছাপা প্রচার মাধ্যমের ব্যাপ্তি ইত্যাদি উপাদানের আবির্ভাব ও ব্যাপ্তি অনেকটাই অপ্রস্তুত ও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই জটিলতা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয় প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তথা সমাজব্যবস্থার যথোপযুক্ত পরিবর্তন না হওয়ায় ফলে, বিশেষত সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের

অবসান না ঘটায়। আফ্রিকার কোন কোন দেশে তো একই সাথে ক্রীতদাস ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সহাবস্থান পর্যন্ত বহাল থাকে। বিপুল পশ্চাৎপদতা ও সাম্রাজ্যবাদ-নিভরশীলতা সত্ত্বেও লাতিন আমেরিকা দেশগুলির কর্ম-সংস্কৃতি কিছুটা পশ্চিমি কর্ম-সংস্কৃতি বহন করে এসেছে। তাসত্ত্বেও, সেই কর্ম-সংস্কৃতি হুবহু পশ্চিমি চরিত্রের ছিল না। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশগুলির মত 'ডিপেণ্ডেন্সি' বা নির্ভরশীলতার কর্ম-সংস্কৃতি লাতিন আমেরিকাতেও যথেষ্ট ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড়া অন্য সর্বত্র 'ডিপেণ্ডেন্ট ওয়ার্ক-কালচার' বা নির্ভরশীলতার কর্ম-সংস্কৃতির সর্বজনীন একটা রূপ পাওয়া গেলেও, দেশ-ভেদে সেগুলির মধ্যে ছিল ব্যতিক্রম ও বৈশিষ্ট্য। ব্রেটন-উডসের পরবর্তী বিশ্ব-পুঁজিবাদের তিরিশ বছরের 'স্বর্ণ-যুগে' যান্ত্রিক ও অনুকরণকারী পদ্ধতিতে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে পশ্চিমি চরিত্রের লেবার-প্রসেস বা শ্রম-প্রক্রিয়ার সাথে কর্ম-সংস্কৃতিও আরোপ করার চেষ্টা হয়েছিল। পূর্বোক্ত বাস্তবতার সাথে সেই আরোপিত কর্ম-সংস্কৃতির মানসিক সংঘাত ছিল অনিবার্য এবং কার্যকালে তা' ঘটেও। ফলে দেশজ পরিস্থিতিভিত্তিক প্রয়োজনীয় কর্ম-সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়নি। বরং আরোপিত ব্যবহার অভিঘাতে প্রথা ও পরম্পরাগত কর্ম-সংস্কৃতিও ভেঙ্গে পড়তে থাকে। কার্যকালে কর্ম-সংস্কৃতির স্তরে, সবার অলক্ষ্যে, সৃষ্টি হতে থাকে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি।

কর্ম-সংস্কৃতির ভাঙা-গড়ার এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বড় আঘাত আসে মধ্য-সত্তরের দশকে ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার পতন এবং বিশ্ব-পুঁজিবাদের ভয়ঙ্কর সংকটের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটের প্রবল ঢেউয়ে যে প্রবল অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা বেড়ে ওঠে, তাতে বহমান কর্ম-সংস্কৃতির ন্যূনতম পরিবেশ বিনষ্ট হতে শুরু করে উন্নত-অনুন্নত সমস্ত দেশেই। উৎপাদনে মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, কল-কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে-অফ ইত্যাদির প্রাবল্যের পাশাপাশি শ্রমিক-আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী উত্তাল বিস্তারের ফলে প্রচলিত কর্ম-সংস্কৃতি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে অনেকটাই।

মধ্য-আশির দশক থেকে বিশ্ব-পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের কাল-পর্ব থেকে কর্ম-সংস্কৃতি নতুন করে অ্যাজেণ্ডাভুক্ত হতে শুরু করে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে স্বীয় কর্ম-সংস্কৃতির উদ্ভাবন তাদের শিল্প-সাফল্যের অন্যতম সোপান হয়ে ওঠে। লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটায়, সেখানে কিছুটা নতুন ধারায় কর্ম-সংস্কৃতি গড়ে ওঠার লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার বাকি দেশগুলিতে কর্ম-সংস্কৃতি স্থিতাবস্থাই বহন করতে থাকে।

অধিকাংশ তৃতীয় দুনিয়ার মালিকশ্রেণী, সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার কারণে, স্বদেশীয় কর্ম-সংস্কৃতির উন্নয়ন ও তা' নিয়ে কার্যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তেমন করেনি। 'রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলমেন্ট' (আর. অ্যাণ্ড ডি.) তথা গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয়কে এরা অনুৎপাদক বলে বিবেচনা করে এসেছে। এই খাতে যেটুকু ব্যয় করা হয় তাতে ওয়ার্ক-কালচারের প্রসঙ্গ সুদীর্ঘকাল একেবারেই যুক্ত ছিল না। বরং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান হিসাবে কর্ম-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ বিবেচনা করার পরিবর্তে, তৃতীয় দুনিয়ার মালিকশ্রেণী ও সরকারগুলি, শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নকে আক্রমণ ও কোণঠাসা করার হাতিয়ার হিসাবে এই প্রসঙ্গকে ব্যবহার করা শুরু করে। সংগঠিত শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনের চাপকে প্রতিহত করতে, জনগণ থেকে শ্রমজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য, কর্ম-সংস্কৃতিকে তারা আক্রমণ করার অন্যতম বিষয় হিসাবে বেছে নেয়। শ্রমিকদের তথাকথিত অলসতা, কাজে ফাঁকি, দুর্নীতি, অদক্ষতা, কর্ম-বিমুখতা, শৃঙ্খলাহীনতা ও আর্থিক সুবিধাবাদ, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে রেষারেষি, দায়িত্বজ্ঞানহীন আন্দোলন, আন্দোলনে রাজনীতি, বহিরাগত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের রাজনৈতিক অভিপ্রায় সাধনে শ্রমিকশ্রেণীকে ব্যবহার, উৎপাদনের পরিমাণ ও মানে ঘাটতি ইত্যাদি অভিযোগ তুলে এবং এগুলিকে শ্রমিকদের মধ্যে কর্ম-সংস্কৃতির অভাবজনিত ফল বলে প্রচার চালাতে থাকে মালিক ও সরকার পক্ষ। নিম্নমানের শ্রম-আইন ও সামাজিক নিরাপত্তার পরিস্থিতি, বৃত্তির অনিশ্চয়তা, নিম্ন মজুরি, জঘন্য কাজের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনার অযোগ্যতা, মালিক ও কর্তৃপক্ষের

দুর্নীতি, সমাজের প্রতি মালিকপক্ষের দায়বদ্ধতার অনুপস্থিতি, অতি মুনাফার তাড়নায় জাতীয় স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা, শিল্প প্রসারে অনীহা, শ্রমিকদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকা, ইত্যাদি প্রধান যে কারণগুলি কর্ম-সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সামনে প্রধান সমস্যা তা' সম্পূর্ণ গোপন রাখা হতে থাকে। নব্বই-এর দশকের শুরু থেকে কর্ম-সংস্কৃতির তথাকথিত অভাবকে ব্যবহার করা হতে থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ, শিল্প বন্ধ করে দেওয়া, শিল্পের আধুনিকীকরণের জন্য শ্রমিক ছাঁটাই করার অছিলা হিসাবে।

অথচ বিশ্বায়নের নতুন অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প-ব্যবস্থা, কাঠামোগত সংস্কার ইত্যাদির পটভূমিকায় পুঁজিবাদের নিজ স্বার্থের অনুকূল প্রয়োজনীয় কর্ম-সংস্কৃতি প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। সেকারণেও সেগুলি যথার্থভাবে করে উঠতে না পারায় শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন-নির্ধারিত কর্ম-সংস্কৃতিকে প্রচার-আক্রমণ করা শুরু হয়।।

কর্ম-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেণী অংশত বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে জনগণের দিক থেকেও। একদিকে জনগণের গড় উপার্জনের তুলনায় সংগঠিত শিল্প ও পরিষেবার শ্রমিকদের বেশি আয় এবং অন্যদিকে জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা ও উচ্চমূল্য—এই ধরনের কঠোর বৈপরীত্যের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নকে দায়ী করে জনগণকে প্ররোচিত করার ফলে জনগণের মধ্যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের চেয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প ও পরিষেবাতে কর্ম-সংস্কৃতি উন্নত বলে প্রচার করে, চেষ্টা হচ্ছে জনগণের মধ্যে বেসরকারীকরণের সপক্ষে মতামত গড়ার। শাসকশ্রেণীর এটাও বক্তব্য যে তথাকথিত অতিরিক্ত গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার শ্রমিকদের কর্ম-বিমুখতার জন্য দায়ী। তাদের দাবী, উপযুক্ত কর্ম-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে হলে, ঐসব অধিকার সীমাবদ্ধ করা দরকার। কর্তৃপক্ষের অধিকার থাকা দরকার অযোগ্য শ্রমিককে তৎক্ষণাৎ অপসারণের, প্রয়োজনে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলি অতীতে শ্রমিকদের কর্ম-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ কখনো বিবেচনা করেনি বা করতে পারেনি। প্রথমত, পরাধীনতার কালে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল বলে বিবেচিত হয়নি ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেণীর কাছে। বরং দাস-চরিত্রের শ্রম-ব্যবস্থা শ্রম থেকে সর্বদাই শ্রমিককে 'এলিয়েনেট' বা বিচ্ছিন্ন করেছে। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা-উত্তরকালে মালিকানার পরিবর্তন ঘটলেও, মালিক-চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, সুরাহা হয়নি ন্যূনতম প্রত্যাশাগুলির এবং শ্রমিকশ্রেণীর জীবন-সমস্যার কোন পরিবর্তন ঘটেনি; বরং দেশী-বিদেশী শোষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বভাবতই উৎপাদনের প্রশ্নে অব্যাহত থেকেছে শ্রমিকশ্রেণীর মানসিক বা কায়িক বিরোধিতা। তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি, দু'শ বছর ধরে আন্দোলন চালালেও, মালিকশ্রেণীর সাথে তাদের সহযোগিতার প্রধান ক্ষেত্র ছিল শ্রমিকদের উৎপাদনে একাগ্র করা ও আন্দোলন থেকে বিরত রাখার বিষয়ে। তাছাড়া পাশ্চাত্যে উদ্ভূত শিল্প-পুঁজিবাদ জন্মলগ্ন থেকেই দেশীয় বা এলাকাগত সংস্কৃতি এবং পূর্ববর্তী স্তরের উৎপাদনের কর্ম-সংস্কৃতির উপযুক্ত পরিবর্তন ঘটিয়েও প্রক্রিয়াগতভাবে আত্মীকরণ করে, নতুন কর্ম-সংস্কৃতি গড়ে নিতে সাহায্য করেছিল শ্রমিকদের। তাছাড়া উৎপাদনের রূপের পরিবর্তনের সাথে সাথে যে 'লেবার-প্রসেস'বা শ্রম-প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছিল, তাতে কর্ম-সংস্কৃতিও প্রক্রিয়াগতভাবে ক্রমাগত আত্মীকৃত হয়েছে শ্রমিকদের। তদুপরি ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ট্রেড ইউনিয়নের দাবীর কার্যকরী স্বীকৃতি মালিকশ্রেণী না দিলেও যেটুকু আনুষ্ঠানিক সুযোগ উন্নত বহু পুঁজিবাদী দেশে প্রসারিত হয়েছিল, সেটিকেও শ্রমিকের কর্ম-সংস্কৃতি গঠনে ব্যবহার করেছে পুঁজিবাদ। কিন্তু উন্নত দেশগুলির এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়ার কোন লক্ষণ ছিল না অনুন্নত দেশগুলিতে। চতুর্থত, উন্নত-অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলি তত্ত্বগতভাবেই কর্ম-সংস্কৃতির প্রসঙ্গকে সুদীর্ঘকাল গ্রহণ করেনি। কার্ল মার্কসের 'থিওরি অব এলিয়েনেশন'-এর তত্ত্বের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের শ্রম-বিচ্ছিন্নতা স্বাভাবিক এবং বিপ্লব-পূর্ব কালে ট্রেড

ইউনিয়নের ভূমিকা ধ্বংসাত্মক, কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের স্তরেই শ্রমিকশ্রেণীর গঠনাত্মক ভূমিকা প্রয়োজন, এবম্বিধ মনোভাব সম্ভবত কাজ করেছে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকাতে। পঞ্চমত, শ্রম-সংস্কৃতি এবং কর্ম-সংস্কৃতি দুই স্বতন্ত্র উপাদান। সমস্ত ধরনের সুসংস্কৃতির সৃষ্টি ও সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশের প্রধান শর্ত শ্রম এবং ওই শ্রম-সংস্কৃতি শ্রমিকের সামাজিক শ্রমের দ্বারা গড়ে ওঠে। এই সংস্কৃতি শ্রেণী-মর্ম, মতাদর্শ, শ্রমের সামাজিক চরিত্র ও সমাজের সাংস্কৃতিক পরম্পরার ফসল। কিন্তু কর্ম-সংস্কৃতি সেই অর্থে কোন সংস্কৃতি নয়। মালিকশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিককে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সর্বোত্তমভাবে যুক্ত করার যান্ত্রিক ব্যবস্থা এটি। সুতরাং কর্ম-সংস্কৃতি কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়, অনেকটাই আরোপিত এবং কৃত্রিম।

কর্ম-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে শাসকশ্রেণীর নতুন ধরনের আক্রমণ এবং পূর্বোক্ত বাস্তবতা ও পরম্পরার ফলে, ট্রেড ইউনিয়ন স্বভাবতই কঠিন সমস্যার মুখে পড়েছে। দেশে দেশে, সংশ্লিষ্ট বাস্তবতা অনুযায়ী যথার্থ কর্ম-সংস্কৃতি কি, কিভাবে তা' গড়ে উঠবে এবং সেক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা কি, তা' নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন এখনও পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। অথচ অনেকটাই অবস্থার চাপে পড়ে উৎপাদন বাড়ানো, কাজের ও পণ্যের মান উন্নত করা, কাজের সময়ে কাজ, সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা ইত্যাদি কয়েকটি যান্ত্রিক শ্লোগান ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের উদ্দেশে ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

বর্তমানে যে প্রসঙ্গকে 'ওয়ার্ক-কালচার' বা কর্ম-সংস্কৃতি বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, ষাট ও সত্তরের দশকে সেই প্রসঙ্গকে 'অরিয়েন্টেশন টু ওয়ার্ক' বা কর্মের উপযোগী করে শ্রমিকের গঠন করা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল; বিষয়টি বিতর্কও সৃষ্টি করেছিল। শিল্প-প্রসঙ্গের সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করতেন যে, কর্ম-প্রসঙ্গে শ্রমদানকারী মানুষের ভূমিকা একই রকম ও সর্বজনীন চরিত্রের এবং তা অনড়; এটা গঠিত হয় সমাজের প্রয়োজন-ভিত্তিতে এবং কর্ম-চাহিদা পূরণের বিষয়টি শ্রমিকের কাছে নির্ধারকভাবে আত্মসন্তুষ্টি পূরণের বিষয়। এই মূল্যায়ন থেকে যা বলতে চাওয়া হয়েছিল তা' হলো পটভূমিকাগত উপাদান, যেমন কাজ বা প্রযুক্তির ধরন অথবা প্রতিষ্ঠানের আয়তন, যা নাকি সামাজিক ফলাফলের সাথে যথাযথভাবে সঙ্গতিপূর্ণ তা' শ্রমিকের কর্ম-সন্তুষ্টির উপাদান। কিন্তু এই ধারনা আদৌ সত্য ও সঠিক নয়। যেকারণে জে. এইচ. গোল্ডথ্রপ, ডি. লকউড, এফ বিচোফার ও জে. প্ল্যাট (১৯৬৮, ১৯৬৮, ১৯৬৯) তাঁদের 'অ্যাফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কার' গবেষণাতে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে কর্মে প্রবেশের পূর্বে একজন মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা স্থির করে দেয় যে কি প্রত্যাশা নিয়ে ব্যক্তিটি নিযুক্ত হচ্ছে। এই পূর্বসৃষ্ট আকাঙ্ক্ষার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় প্রাপ্ত কাজের পরিসরে। আসলে কর্মক্ষেত্রে কাঠামোর এবং শ্রমজীবীর ধারণা ও ব্যবহারের মধ্যে মধ্যস্থতা গঠনের চলরাশি (মিডিয়েটিং ভ্যরিয়েবল) হলো 'অরিয়েন্টেশন'। তাঁরা 'অরিয়েন্টেশনে'র তৎপরতার দু'টি ভাগ করেছিলেন। প্রথমটি হলো 'সলিডারিজিম' বা ঘনীকরণবাদ। অর্থাৎ যে শ্রমজীবীরা সমাজের ও কর্মের সন্তুষ্টি আকাঙ্ক্ষা করে সেইসব শ্রমিকদের অরিয়েন্টশন বা শিল্প-ব্যবহার কর্ম-উপযোগী করা। (খ) দ্বিতীয়টি হলো 'ইনস্ট্রুমেন্টালিজম' বা উপায়ভূতবাদ অর্থাৎ যেসব শ্রমিক কর্মের জগতে নিছক উচ্চ মজুরি, পদোন্নতি ও বৃত্তির নিরাপত্তা; আকাঙ্ক্ষা করে যাঁরা এই চাহিদাগুলি পূরণ হলে যে কোন ধরনের কাজ, যে কোন ঝুঁকি ও সময় ব্যয় করতে প্রস্তুত তাদের কর্মের উপযোগী করে গঠন করা।

এই দৃষ্টিভঙ্গিও পরবর্তীকালের গবেষণাগুলির দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কোন কোন গবেষক শ্রমিকদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন সর্বজনীন চরিত্রের 'অরিয়েন্টেশন' ঘটানোর উপাদান খুঁজে পাননি। আবার কোন কোন গবেষক শ্রমিকদের মধ্যে চিহ্নিতকরণ-যোগ্য বিষয় ধরে সব 'অরিয়েন্টেশন'-এর যে উপাদান খুঁজে পেয়েছেন তাকে 'সলিডারিজিম' ও 'ইনস্ট্রুমেন্টালিজম'-এর সমন্বয় বলেছেন। কোন কোন গবেষক 'সলিডারিজিম'কে দুই ভিন্ন মনোভাবের এক সম্মিলিত উপাদান বলেছেন—যা সরাসরি কর্ম-সত্তা ও সমাজায়িত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ কর্ম-সন্তুষ্টির জন্য নিজ চাহিদাগুলি পূরণের আকাঙ্ক্ষা একদিকে এবং অন্যদিকে যে সমাজ থেকে শ্রমিক আগত সেই সমাজের দ্বারা তার

মধ্যে সৃষ্ট চাহিদাগুলি পূরণের আকাঙ্ক্ষা—এই উভয় দিকের সমন্বিত চাহিদা ভিত্তিক অরিয়েন্টাল।

তবে এ'জাতীয় অধিকাংশ গবেষণাই ছিল কায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের নিয়ে। মানসিক শ্রমিক, নারী শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমজীবীদের বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। আর. ব্রাউন (১৯৭৬) মনে করেছেন যে 'অরিয়েন্টেশন টু ওয়ার্ক' প্রসঙ্গে শ্রমিকারা শ্রমিকদের থেকে ভিন্নতা প্রদর্শন করে। কেননা (ক) নারীদের মধ্যে সৃষ্ট সমাজায়িত ধারণার মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে বৃত্তিগত কর্ম হবে বিবাহের ও পরিবারের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ; (খ) নারীরা ধ্রুবভাবে বিশ্বাস করে যে কাজের সুযোগ নারীদের কাছে পুরুষদের তুলনায় সীমাবদ্ধ; (গ) গৃহস্থালি জীবন-বৃত্তের কর্মের মধ্য দিয়ে নারীরা এমন ধরনের দায়িত্ববোধ অর্জন করে, যা বৃত্তি-কর্মের (কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের) কেন্দ্রীয় ধারণাকে নিম্ন গুরুত্ব দেয়; (ঘ) যে কাজ নারীরা চেয়ে থাকে, তা' সাধারণভাবে পুরুষদের তুলনায় কম আকর্ষণীয় হয়।

১৯৮৪ সালে ব্রিটেনে জাতীয় স্তরের এক সমীক্ষা থেকে (জে. মার্টিন ও সি. রবার্টস) দেখা যায় যে নারীদের বৃত্তি-কর্মের 'অরিয়েন্টেশন'-এর প্রয়োজনীয়তা বহু-মাত্রিক, তাতে কর্ম-সন্তুষ্টির প্রশ্নে অর্থনৈতিক চাহিদার উপাদান সর্ব-অগ্রগণ্য; তাছাড়া অবিবাহিতা নারীদের তুলনায় বিবাহিতা শ্রমিকারা নিজেদের বৃত্তি-কর্মের দ্বারা অর্থনৈতিক-স্বনির্ভর হতে চায় না, বরং পরিবার ও নিজ জীবনধারণের চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করতে চায় না। তাদের মধ্যে এই মনোভাবই থাকে যে স্বামীর আয়ে নির্ভরশীল থেকে গৃহস্থালি কাজ করাই ভাল, স্বাধিকার সম্পন্ন বৃত্তি-কর্মের চেয়ে শেষোক্তটি শ্রেয়। যেসব নারীরা আংশিক সময়ের কাজ করে, অথবা যারা বিবাহিতা কিংবা যাদের সন্তান রয়েছে, বৃত্তিতে নিযুক্ত সর্বক্ষণের পুরুষ কর্মীদের তুলনায় তাদের ভিন্ন অগ্রাধিকার রয়েছে। তারা নিজেদের সুবিধামত কাজের সময়কে পছন্দ করে। গবেষণা থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে কর্ম-সন্তুষ্টির অন্বেষণে শ্রমিকের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে উচ্চতর স্তরের কাজে পদোন্নতি পাওয়ার পর, অ-কায়িক শ্রমমূলক বৃত্তিতে এবং বয়ঃবৃদ্ধির ফলে। এ থেকে বোঝা যায় যে, 'অরিয়েন্টেশন'-র প্রসঙ্গে একজন শ্রমজীবীর অবস্থান পরিবর্তনশীল। অতএব 'অরিয়েন্টশন' করার কোন সর্বজনীন ফর্মূলা নেই।

'অরিয়েন্টেশন টু ওয়ার্ক' বিষয়ক আলোচনা অনেকটাই ছিল উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকদের নিয়ে। সেইসব আলোচনাতে উৎপাদন ও ব্যবসার ব্যবস্থাপকদের তৎপরতাকে যুক্ত করে এবং তার প্রভাব ও ফলাফল নিয়ে আলোচনাও ব্যাপকভাবে হয়নি। আলোচনা হয়নি শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের তৎপরতার প্রতিক্রিয়া অথবা ট্রেড ইউনিয়নগুলির দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রসঙ্গে কি ছিল অথবা কি ভূমিকা নিয়েছিল তা' নিয়েও। কিন্তু ঐসব গবেষণা কর্ম-সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রশ্নে অনেকগুলি মৌলিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিককে উত্থাপন করেছিল। সেগুলির অনেক প্রসঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ এবং উন্নত-অনুন্নত দেশ নিরপেক্ষ এবং সেগুলির তাৎপর্য আজও সমানভাবে বিদ্যমান। বর্তমানে সেগুলির সাথে আরও বহুবিধ উপাদান ও মাত্রা যুক্ত হয়ে জটিলতা বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

এখনও পর্যন্ত কর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক কেবল সংগঠিত শিল্প ও পরিষেবার শ্রম-ক্ষেত্র নিয়ে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ায় অসংগঠিত শ্রম-ক্ষেত্র সংগঠিত ক্ষেত্রের চেয়ে বহুগুণ বেশি এবং প্রায় আশি শতাংশ শ্রমজীবী তাতে যুক্ত। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্কৃতির একমাত্র অর্থ হলো নিয়োগকারীর ইচ্ছা ও নির্দেশের অনুবর্তী হওয়া।

কর্ম-সংস্কৃতির বিষয়টি মালিকশ্রেণীর কাছে উৎপাদনের পরিমাণ ও মান বাড়ানো, কাজ করা এবং সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার বাহ্যিক উপাদান, মর্ম নয়; যদিও প্রকৃত কর্ম-সংস্কৃতির কাঠামোকে ঘিরে এগুলি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বয়ংক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ততার বাতাবরণ ছাড়া, নিছক আইনি ব্যবস্থা বা প্রশাসনিক তৎপরতা কিংবা দমনের শক্তি বা ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশে কর্ম-সংস্কৃতি পুরোপুরি গড়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া কর্ম-সংস্কৃতি এক যৌথ ধারণা ও প্রক্রিয়া। কোন একক শ্রমিকের আয়ত্ত করার প্রসঙ্গ কর্ম-সংস্কৃতি নয়, এমনকি একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে এটা গড়ে উঠতে পারে না পুরোপুরি। প্রসঙ্গটি সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার সমস্ত ধরনের ক্ষেত্র জড়িয়ে গড়ে ওঠার প্রসঙ্গ।

তবে ব্যক্তি ও একক প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগ নিতে ও শুরু করতে হয় নিশ্চিতভাবেই। এই যৌথ ধারণা ও প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হতে হয় শ্রমিকশ্রেণী, মালিকপক্ষ ও সরকার, ব্যবস্থাপনা, জনগণ, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদিকে। আবার কর্ম-সংস্কৃতি অজস্র 'একক'-এর সমন্বয়ও বটে। উৎপাদনের অন্য ক্ষেত্রগুলিতে ভিন্ন পরিস্থিতি থাকলে, কেবলমাত্র শিল্প-শ্রম-ব্যবস্থায় এবং তাও কেবল সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এই আশা করাও সর্বাংশে বাস্তবোচিত নয়। বিপরীত দিকে, সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্কৃতির বিকাশ ছাড়া এবং এই ক্ষেত্র নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালন করতে না পারলে এটি যথার্থভাবে বিকশিত হবে না। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির অবস্থানের গুরুত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারাই এটা সপ্রমাণিত।

তৃতীয় দুনিয়ার শ্রমজীবীদের মধ্যে কোন ধবনের কর্ম-সংস্কৃতি নেই বা থাকলেও দুর্বল—এই ধারণাও এক অর্থে ভ্রান্ত। অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজিবাদের বিকাশের বিভিন্ন কাল-পর্বে উৎপাদনের ও পণ্যের যে অগ্রগতি ঘটেছে, তা' শ্রমজীবীদের কর্ম-সংস্কৃতির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ভিত্তি ছাড়া কখনো সম্ভব হয়নি। এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যগুলি রাষ্ট্রশক্তি, আইনি ব্যবস্থা, মূলধনের ক্ষমতা, কাঁচামাল, যন্ত্র, বাজার, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির একমাত্র অবদান নয়। বরং নিম্ন-মান সত্ত্বেও, শ্রমজীবীদের কর্ম-সংস্কৃতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির বড় উপাদান হিসাবে কাজ করে এসেছে। উন্নত দেশগুলিতেও কর্ম-সংস্কৃতি রাতারাতি তৈরি হয়নি, হতে পারেও না। উৎপাদনের রূপের পরিবর্তনের সথে কর্ম-সংস্কৃতির নবায়ন জরুরি হয়ে পড়ে উৎপাদনের আরও বিকাশের প্রয়োজনে। অন্যভাবে বলা যায় যে উৎপাদিকা শক্তির সামনে সৃষ্ট বাধা অতিক্রম করার ক্ষেত্রেও অন্যতম সহায়ক উপাদান কর্ম-সংস্কৃতি। সেই অর্থে কর্ম-সংস্কৃতি প্রধানত এক সামাজিক প্রক্রিয়া ও উপাদান। সুতরাং এটা নিছক উৎপাদনের প্রসঙ্গ নয়, কর্ম-সংস্কৃতি নিজেই এক ধরনের মূলধন এবং সেই অর্থে সামাজিক সম্পর্ক।

শ্রমিকশ্রেণী যেহেতু সমাজের সর্বাপেক্ষা অগ্রণী শ্রেণী, স্বভাবতই কর্ম-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব বিবেচ্য বিষয়। মালিকশ্রেণী শ্রমিকের শ্রম-শক্তি চুরি করে, তাই শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদনের কাজে ফাঁকি দিয়ে মালিকের মুনাফা ঠেকাবে, এটা প্রগতিপন্থী শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়ন তেমন প্রবণতায় উৎসাহিত করতে পারে না।

তবে প্রসঙ্গটির সমস্যাতে এখন আরও নতুন নতুন উপাদান প্রবেশ করেছে। শ্রমের রূপের বিপুল পরিবর্তন এবং তার সাথে প্রথাগত শ্রমজীবীদের শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীগুলির রূপান্তর ঘটছে। এগুলি ঘটছে উৎপাদনের রূপের এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রের ভরের পরিবর্তন ও রূপান্তরের অন্যতম কারণে। তাছাড়া শিল্পের স্থানান্তর এবং বিদেশাগত শ্রমিকদের সংখ্যা-বৃদ্ধিও একটি উপাদান। কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সংখ্যাও বর্ধিষ্ণু। বহুজাতিক সংস্থাগুলি দেশ, অঞ্চল বা স্থানীয় সংস্কৃতিকে উৎপাদন-ব্যবস্থাপনার এক উপাদানে পরিণতও করছে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যদেশের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে, স্বদেশী কর্ম-সংস্কৃতিতে বিদেশী উপাদান আমদানি করছে। শিল্পে সর্বাধুনিক যান্ত্রিকীকরণ ছাড়াও পরিষেবাতে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারে অতীতের বিভিন্ন ক্যাটাগরির (যেমন, ক্ল্যারিকাল) শ্রমজীবীদের অবসান ঘটছে। নতুন ধরনের অজস্র ক্যাটাগরির সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে কর্ম-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ জটিলতর হয়ে পড়ছে, সমস্যা বাড়ছে ট্রেড ইউনিয়নের সামনে।

সরকার ও মালিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে কর্ম-সংস্কৃতিকে যত ব্যাপকভাবে উত্থাপন ও প্রচারে ব্যবহার করা হচ্ছে, তদনুপাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির পাল্টা-উত্থাপন জোরদার নয় এখনো। ট্রেড ইউনিয়ন স্বয়ং যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিকদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির সূত্র হিসাবে কর্ম-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করছে, তা' শ্রমজীবীদের মানসে গ্রহণীয় হচ্ছে না অনেক সময় প্রসঙ্গটির আকস্মিকতার জন্য এবং উপযুক্ত যুক্তি ও পরিবেশের অভাবে। বরং কোথাও কোথাও বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে এ' বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে প্রসঙ্গটির উপেক্ষাকে জনগণ বিচার করছে আশু বিতর্ক-বিরোধ থেকে ট্রেড ইউনিয়নের দূরে থাকার কৌশল হিসাবে। অথচ বর্তমানের বাস্তবতায় শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব-বোধ সৃষ্টি ও কর্ম-সংস্কৃতি গঠন থেকে শ্রমজীবীদের দূরে

রেখে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত মঙ্গল সাধনের কাজ কোন ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে না।

কর্ম-সংস্কৃতির প্রসঙ্গে বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিতে নানা পার্থক্য ও বিরোধ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভ্রান্তি গঠনের অন্যতম উপাদানে পরিণত হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঐক্যের ভিত্তিকেও দুর্বল করে দিচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি যখন প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই রক্ষণাত্মক অবস্থানে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে, তখন জমি রক্ষা করা এবং এগিয়ে যাওয়ার শর্ত হলো যুক্তিগ্রাহ্য ও বাস্তবোচিত বিকল্প উত্থাপন;এই বিকল্প রক্ষণাত্মক স্তর থেকে আক্রমণাত্মক উদ্যোগের সৃষ্টি করতে অন্যতম সহায়ক। কর্ম-সংস্কৃতি তেমন এক প্রসঙ্গ যে উপাদানকে শ্রম-সংস্কৃতি ও শ্রেণী-প্রসঙ্গের সাথে সমন্বিত করে উত্থাপন করতে পারলে স্বীয় শ্রেণী ও জনগণের সমর্থন পাওয়া সম্ভব। এর দ্বারা মালিকপক্ষ, ব্যবস্থাপনা ও সরকারকে কর্ম-সংস্কৃতির পরিবেশ গড়তেও বাধ্য করা যায়। কর্ম-সংস্কৃতির পরিবেশ অর্জনের সাথে শ্রম-সম্পর্ক, বৃত্তি-সন্তুষ্টি ও উৎপাদনকে অধিকতর সামাজিক করার শর্তও জড়িয়ে থাকে। তাছাড়া কর্ম-সংস্কৃতি যেমন উৎপাদন ও মুনাফার শর্ত, তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর হোমোজিনিটি গঠনের এক উপাদান হতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যম : আধুনিক প্রচার মাধ্যম—প্রিন্ট তথা ছাপা এবং ইলেকট্রনিক তথা টেলিভিশন প্রচার মাধ্যম ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠন, মতবাদ, দাবী-দাওয়া, সমস্যা, জমায়েত, প্রচার ইত্যাদি প্রতিটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক ও ভূমিকার সামনে বৃহত্তম প্রতিবন্ধক হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। উন্নত দেশগুলির যৎসামান্য কয়েকটি কিছু ট্রেড ইউনিয়ন 'কমিউনিকেশন' বা যোগাযোগ ও 'মিডিয়া' বা প্রচার মাধ্যম হিসাবে নিজস্ব পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টি.ভি. চ্যানেল, 'ইন্টারনেট', 'স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন'-এর ব্যবস্থা গড়ে তুললেও, সেগুলির প্রভাব এখনও অত্যন্ত সীমিত। বাকি উন্নত এবং সমগ্র অনুন্নত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলির রেডিও, টি.ভি. ও স্যাটেলাইট চ্যানেলের সুযোগ গ্রহণ করার মত সামান্যতম আর্থিক সামর্থ নেই।

বর্তমান বিশ্বে সমগ্র 'মিডিয়া'-ব্যবস্থা পুঁজিবাদী বাণিজ্যের অন্যতম বৃহত্তম শিল্প এবং ফিনান্সিয়াল মার্কেটের পরই পুঁজির দ্বিতীয় বৃহত্তম বিচরণের ক্ষেত্র। সর্বোপরি সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজি, শ্রম ও ভূমির মত অন্যতম কেন্দ্রীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে 'ইনফরমেশন টেকনোলজি'। 'মিডিয়া' এখন নিজেই একটি স্বয়ম্ভর শক্তি, অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতম সংগঠক। কিন্তু 'মিডিয়া' হলো 'পাওয়ার উইদাউট রেস্‌পন্সিবিলিটি অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টিবিলিটি' অর্থাৎ প্রচার মাধ্যম হলো সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতাহীন শক্তি। অবশ্য কথাটি সামগ্রিক অর্থে সত্য নয়। প্রচার মাধ্যমের পক্ষ থেকে জনগণ, সমাজ বা জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি কোন কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা না থাকলেও বিশ্ব-পুঁজিবাদের প্রতি কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা আছে।

বহুজাতিক সংস্থাগুলি যেমন বিশ্বব্যাপী প্রচার-মাধ্যমগুলির মালিক, অন্যদিকে বহুজাতিক সংস্থাগুলির চেয়ে প্রচার মাধ্যম রাষ্ট্র, আইন, এলাকা ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে স্বেচ্ছায় কাজ করার ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতাধর। আর এই অমিত শক্তির ফলে পুঁজিবাদী এস্টাব্লিসমেন্ট বা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী যে কোন উদ্যোগ বা শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার প্রবণতা স্বয়ং রাষ্ট্র বা পুঁজিবাদের চেয়েও প্রচার মাধ্যমের চরিত্রে বর্ধিষ্ণু। শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন সেই ক্ষেত্রে 'মিডিয়া'র অন্যতম টার্গেট। ফলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতই এখন প্রচার মাধ্যমের বিশাল শক্তির মোকাবিলা করতে হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নকে। এই মোকাবিলার অনেকগুলি দিক রয়েছে। প্রথমত, প্রচার মাধ্যমের দ্বারা ধনতান্ত্রিক শক্তির শোষণকে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টার মোকাবিলা করা;দ্বিতীয়ত, প্রচার মাধ্যমের দ্বারা শ্রমজীবীমানসে সৃষ্ট সমস্ত ধরনের বিভ্রান্তির মোকাবিলা করা;তৃতীয়ত, বিশ্বময়, বিপুলয়াতন ও প্রসারিত প্রচার মাধ্যম প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের ওপর শোষণের মোকাবিলা করা;চতুর্থত, পুঁজিবাদী প্রচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাল্টা নিজস্ব প্রচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম চালানো; পঞ্চমত, বুর্জোয়া প্রচার টেকনিকের বিপরীতে কার্যকরী নিজস্ব টেকনিক গড়ে তোলার জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রয়াসে নিরত থাকা; ষষ্ঠত, রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমের উপর মালিকশ্রেণীর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এবং যথাসাধ্য

গণস্বার্থ-প্রসঙ্গকে উত্থাপনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা এবং সেজন্য আন্দোলন করা ইত্যাদি।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বুর্জোয়া সংবাদপত্রে শ্রমিক-বিষয়ক 'কলামে'র ব্যবস্থা ও 'ইলেকট্রনিক মিডিয়া'তে 'লেবার চ্যানেল' পরিচালিত হচ্ছে। সংবাদপত্র ও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ শ্রম-বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করে থাকে এই কাজ পরিচালনার জন্য। এই ধরনের প্রচারের ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়বস্তুগুলি হলো শ্রমিকদের উন্নত জীবন-মানের ছবি তুলে ধরা, শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলির প্রচার, শ্রমিকদের সেলফ্ হেল্প, সমবায়, সহযোগিতামূলক কর্মসূচীগুলির তথ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা, শ্রমিক-মালিক উন্নত শ্রম-সম্পর্কের গুরুত্ব এবং তার সাফল্যের তথ্য বিশ্লেষণ, শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের উজ্জ্বল চিত্র প্রচার, ক্ষেত্র-ভিত্তিক শ্রমজীবীদের অবস্থার সমীক্ষা, নারী শ্রমিকদের সমস্যা ও সেগুলির সমাধানে এন. জি. ও.গুলির ভূমিকা, উন্নত কর্ম-সংস্কৃতির জন্য দৃষ্টান্ত উত্থাপন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব প্রচার, ট্রেনিং-এর কর্মসূচী, সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলির মালিক-ঘেঁষা কর্মসূচীগুলি ফলাও করে উত্থাপন, শ্রমিকদের আবাস, অবসর ও বিনোদনের তথ্য ইত্যাদি। কেবল 'লেবার চ্যানেল' বা সংবাদপত্রের শ্রম-বিষয়ক কলামেই একমাত্র নয়, যে কোন সুযোগে পূর্বোক্ত বিষয়গুলিকে প্রচারের প্রসঙ্গ করা হয়। আপাত নিরীহ ও গঠনমূলক চরিত্রের মনে হলেও, সবসময়েই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা হয় মালিক ও ব্যবস্থাপকদের অসঙ্গত ভূমিকাকে, শ্রমিকদের শোষণ ও দুরবস্থার দিক, ছাঁটাই-লে অফ-লক-আউটের তথ্য, আন্দোলন ও আন্দোলনের ওপর আক্রমণের ঘটনা, শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিবাদী ভূমিকা, ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভা-সমাবেশগুলি, দাবী-দাওয়ার চরিত্র, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মঞ্চে উত্থাপিত তাদের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তাব প্রভৃতি। রাজনৈতিকভাবে তৃতীয় দুনিয়ার যেসব দেশের বিরোধিতা করে উন্নত দেশগুলি, শেষোক্ত দেশগুলির প্রচার মাধ্যম প্রথমোক্ত দেশগুলির সরকার, মালিকশ্রেণী, ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনের বিরুদ্ধেও অপপ্রচার করে নিয়মিত। দেশীয় স্তরের ট্রেড ইউনিয়নের এস্টাব্লিসমেন্ট-বিরোধী সমস্ত ধরনের ভূমিকা প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয় প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সরকার, শ্রম-ব্যবস্থা ও ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রচার মাধ্যম ধারাবাহিক প্রচার চালাতো, বিশেষত কমিউনিজম-বিরোধিতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য। বিপরীত তৎপরতাও রয়েছে। বিদেশের যে সরকারের বিরোধিতা করে থাকে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি, প্রথমোক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি সংশ্লিষ্ট দেশের ট্রেড ইউনিয়ন অসঙ্গত বিরোধিতাও করে, তবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমর্থনে দাঁড়ায় পুঁজিবাদী বিশ্ব-প্রচার মাধ্যম। কয়েক বছর আগে পোলাণ্ডের সলিডারিটি মুভমেন্টের পক্ষে বা আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কোন কোন দেশে অনুরূপ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ধরনের উল্লেখযোগ্য নজির রয়েছে। ডব্লু. টি. ও.-র 'লেবার ক্লজ' নিয়েও উন্নত দেশগুলির সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলির দৃষ্টিভঙ্গিও গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমগুলিতে।

বিশ্ব-পুঁজিবাদের প্রচারের কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিশ্বের অধিকাংশ সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নই এখন কার্যত সহমতে পৌঁছাচ্ছে। অতীতে শ্রেণী-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা থেকে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেণীকে বিরত করার জন্য শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে ব্যাপক, সর্ববিধ ও সর্বক্ষণ প্রচেষ্টা চলেছে। আধুনিক প্রচার মাধ্যম সেই সাফল্য অর্জনের গতিকে দারুণভাবে ত্বরান্বিত করেছে। শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নকে 'কনফ্রন্টেশন' বা সংঘাতের মনোভাব থেকে প্রথমে 'প্যাসিভ' বা নিরাসক্ত করে তোলা এবং তারপর শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্ট নিরাসক্তি থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে তাদের 'কনসেনসাস' বা সহমতে টেনে আনা এবং পরিশেষে এই অর্জিত 'কনসেনসাস'কে 'কনসেন্ট'-এ বা সম্মতিতে রূপান্তরের প্রত্যেকটি মনস্তাত্ত্বিক স্তরকে দ্রুততার সাথে সংঘটিত করছে আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলি। এই চেষ্টার ক্ষেত্রে বাড়তি গুরুত্বপূর্ণ দিকও রয়েছে। শ্রম-প্রসঙ্গে মালিকশ্রেণীর মনোভাবকে শ্রমিকশ্রেণী-

মধ্যে গ্রহণীয় করার চেষ্টা ছাড়াও শ্রমিকদের পরিবার ও জনগণের মধ্যেও গ্রহণীয় করার চেষ্টা হচ্ছে। শাসকশ্রেণীর ইচ্ছার সাথে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের ঐকমত্য ও সম্মতিকে আদায় করে দেবার ব্যবস্থা করছে প্রচার মাধ্যম।

পুঁজিবাদী শোষণের নির্মম অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে হতে, তা' থেকে ক্রমে শ্রেণী-ঘৃণা সৃষ্টি হতো শ্রমিক-মননে; সংগঠন, আন্দোলন, চেতনা ও ঐক্যের মধ্য দিয়ে তা' অনেকটাই সংহত রূপ পেতো। ধনতন্ত্রের কিছু কিছু প্রদত্ত কনসেশন সেই মনোভাবকে মুছে ফেলতে পারতো না। কিন্তু এখন শোষণ-সঞ্জাত শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে প্রতিদিন মুছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে প্রচার মাধ্যম। ট্রেড ইউনিয়নের সাথে শ্রমিকের সঙ্গ ও কথোপকথনের চেয়ে শ্রমিকের সাথে মালিকপক্ষের আন্তরিকতা ও সঙ্গকে অনেক বেশি বাড়িয়ে নিয়েছে প্রচার-মাধ্যম। তাছাড়া দৃশ্য ও শব্দের সমন্বয়ে গঠিত ও ব্যবহৃত আধুনিক ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমের অন্তর্ভেদী শক্তি ট্রেড ইউনিয়নের কথ্য বা লেখ্য প্রচার মাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। সর্বোপরি ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমের পরিমণ্ডলের মধ্যে এসে গেছে পৃথিবীর নব্বই শতাংশ মানুষ; টেলিভিশন সেট পৌঁছে গেছে বিপুল সংখ্যক নিম্ন-বিত্ত শ্রমিকের ঘরেও। শিল্প-ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থানে টেলিভিশন সেট বসানো ছাড়াও, দরিদ্র শ্রমিক এলাকাতে কর্তৃপক্ষই কমিউনিটি টেলিভিশন সেট বসাবার ব্যবস্থা করছে। টেলিভিশন ক্রয় করার জন্য ঋণ দেবার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে অনুন্নত দেশগুলির বহু প্রতিষ্ঠানে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া এইভাবে সর্বাংশের শ্রমিকদের কাছে বেশি বেশি পৌঁছে যাচ্ছে। তাছাড়াও মিডিয়া ও শ্রমজীবীদের মধ্যে 'টু-ওয়ে ট্র্যাক' আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। একদিক হলো, প্রচার ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক মিডিয়া শ্রমিকের ঘরে পৌঁছাচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিক তার স্বীয় ও পারিবারিক মানসিক প্রয়োজনে টেলিভিশনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

টেলিভিশন ক্রয়ের বিরোধিতা বা শ্রম-বিরোধী প্রচার কর্মসূচী না দেখার জন্য শ্রমিকদের প্রতি ট্রেড ইউনিয়নের একদা প্রচারের কর্মসূচী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই প্রচার গোঁড়ামি ও বিজ্ঞান-বিরোধিতার নামান্তর বলে সমালোচিত হয়েছিল। অন্যদিকে প্রতিটি প্রসঙ্গ ও অপপ্রচার সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মিত প্রচারের শক্তিও নেই। ফলে প্রচার মাধ্যমের বিরোধিতার মুখে ট্রেড ইউনিয়ন বহুলাংশে অসহায় ও অক্ষম। এই অসহায়তা ও অক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে মতাদর্শের হাতিয়ারের দুর্বলতা বা অনুপস্থিতিতে, কেননা মতাদর্শ গড়ে দেয় বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি। আর সেই মানদণ্ডে শ্রমিকশ্রেণী অনুধাবন করতে পারে প্রত্যেকটি প্রচার ও ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য, নিজের মানসিকতাকে কলুষিত হওয়া থেকে মুক্ত রাখতে পারে। এখন, তাই, তথ্যের নামে 'ইনফরমেশন-জাঙ্গল' বা বি-তথ্যের জঙ্গলে অনেকটা পথ হারাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী। অন্যভাবে বলা যায় যে বিশ্ব-পুঁজিবাদের 'ব্রেন-ম্যানেজমেন্ট ইণ্ডাস্ট্রি' এখন সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সমাজের সবচাইতে অগ্রণী ও প্রতিবাদী শ্রেণীর মধ্যে।

ট্রেড ইউনিয়নে নারী সংগঠকদের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট-এর সমস্যা : সংগঠনে নারী শ্রমিকদের আরো বেশি করে যুক্ত করা, শ্রেণীগত দাবীর পাশাপাশি নারীদের সামাজিক ও বৃত্তিগত বিশেষ ধরনের দাবীগুলি উত্থাপন, নারীদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ উন্নত করা ইত্যাদি প্রসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন এখন গভীরভাবে চিন্তান্বিত এবং সক্রিয়। অথচ এক নতুন ধরনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তবে প্রসঙ্গটি প্রকৃত অর্থে নতুন নয়;এটি অন্তর্লীনভাবে আগে থেকেই ছিল বলে মনে করার কারণ রয়েছে, অতীতে আক্রান্তারা বিষয়টি সামনে আনতে সাহস পায়নি এবং ট্রেড ইউনিয়নও সাহস পায়নি প্রকাশ্যে ও সাহসের সাথে তা' নিয়ে সক্রিয় হতে প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায়। পূর্ব অধ্যায়ে 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অব উইমেন ইন ওয়ার্কপ্লেস' বা কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হয়রানির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গটির নামকরণ করা যেতে পারে 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অব উইমেন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট ইন ট্রেড ইউনিয়ন ওয়ার্ক' বা 'ট্রেড ইউনিয়ন কর্মক্ষেত্রে নারী সংগঠকদের যৌন হয়রানি'। শেষোক্ত হয়রানি মালিক, সুপারভাইজার, সহকর্মী বা প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদার, ভোক্তা ইত্যাদি দ্বারা নয়; এই হয়রানি ঘটে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, সংগঠক ও কর্মীদের দ্বারা। বিশ্বের

যে সামান্য কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন এ' বিষয় নিয়ে চর্চা ও ব্যবস্থা নিচ্ছে, তারা এখনো পর্যন্ত 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট' শব্দটি ব্যবহার করার সাহস পায়নি। তথাপি তাদের ভূমিকা অভিনন্দনযোগ্য এই কারণে যে অন্যদের তুলনায় এরা আত্ম-অনুসন্ধানের কঠোর চেষ্টার প্রমাণ রেখেছে। এরা সাহসের সাথে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করেছে নারী সংগঠকদের মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষায়। এইভাবে কার্যকালে ট্রেড ইউনিয়নের সামগ্রিক স্বার্থকেই রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছে এরা। সংগঠনের জাতীয় সম্মেলন থেকে কিছুটা নমনীয়ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে 'সেক্সুয়াল কণ্ডাক্ট' বা যৌন আচরণ বিধি সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে এখন পর্যন্ত; এক্ষেত্রে অন্যথা ঘটলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হচ্ছে।

এই ধরনের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন 'কোসাটু'-র নাম সর্ব-অগ্রগণ্য। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, আমেরিকার এ. এফ. এল.—সি. আই. ও.-র নারী শাখা, ফ্রান্সের সি.জি.টি. প্রভৃতি সংগঠনের নামও উল্লেখ করা যায়। জাপান, মেক্সিকো, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশের ট্রেড ইউনিয়নেও এ'বিষয়ে বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন, আলোচনা, বিতর্ক এবং ক্ষেত্রবিশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের নজির সৃষ্টি হয়েছে। এ'বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নের বর্তমান পর্যায়ের অবস্থান নিয়ে একটি উদাহরণ প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত 'কোসাটু'র তৃতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসে টি. জি. ডব্লু. ইউ. (নারী শাখা)-র গৃহীত প্রস্তাবের বয়ান ছিল নিম্নরূপ :

"এই কংগ্রেস লিপিবদ্ধ করছে যে :

"১. অন্যান্য বিষয়ের সাথে একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি হলো তাঁর (পুরুষ/নারী) ব্যক্তিগত আচরণ ও কার্যকলাপ।

"২. আমাদের অনুমোদিত সংগঠনে আগত নতুন নারী সদস্যদের সাথে আমাদের সংগঠনের পুরুষ কমরেডরা প্রায়শই সম্পর্কে যুক্ত হন এবং এই ধরনের সম্পর্কের দ্বারা ক্ষমতার অসাম্যই (পুরুষ ও নারীর মধ্যে) প্রতিপন্ন হয়ে থাকে, কেননা পুরুষ কমরেডদের তুলনামূলক বেশি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং সাংগঠনিক জ্যেষ্ঠতা থাকে।

"৩. যখন এই অসম সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ে, সংশ্লিষ্ট নারীকে সংগঠন থেকে প্রায়শই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য দিকে এই সম্পর্ক-ভঙ্গ জনিত কারণে সংগঠনের অভ্যন্তরে বিরোধ সৃষ্টি হতে থাকে।

"৪. পূর্বে বর্ণিত এই সমস্যা আমাদের সাংগঠনিক কাঠামোতে নারীদের ধারাবাহিকভাবে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতির একটি কারণ।

"আরও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যে : "সংগঠনে-পুরুষ কমরেডদের দ্বারা নারী কমরেডদের যৌন হয়রানির বহু ঘটনা সংগঠনে ঘটেছে।

"সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যে :

"১. আমাদের সংগঠনে কঠোরতর যৌন শৃঙ্খলা বলবৎ হওয়ার দাবী রাখে।

"২. আমাদের ফেডারেশনের আচরণ-বিধি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যৌন শৃঙ্খলার প্রসঙ্গটির প্রতি আমরা গুরুত্ব দিতে চাই।

"সংবিধানের সংশোধন :

"প্রস্তাব করা হচ্ছে যে আমাদের সংবিধানে লিঙ্গগতভাবে উল্লেখের ব্যবস্থা, যেমন "হিজ ডিউটি" বা "চেয়ারম্যান" এবং অন্যত্র ব্যবহৃত অনুরূপ শব্দ বাতিল করতে হবে এবং সেগুলির স্থলে অযৌনতামূলক (নন-সেক্সিস্ট) শব্দ ব্যবহার করতে হবে।"

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী সম্মেলনগুলিতেও এই জাতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তবে এই জাতীয় প্রস্তাব পুরুষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সচেতনভাবে ও প্রকাশ্যে প্রথম তোলা হয়েছিল কি না, তা' জানা নেই। কেননা কোন কোন সংগঠনের সম্মেলনে ট্রেড ইউনিয়নের নারী শাখার পক্ষ থেকে প্রস্তাব পেশ করার তথ্যই মাত্র পাওয়া গেছে।

এই ধরনের প্রস্তাবকে বা প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে বা স্বতন্ত্রভাবে ‘এম্পিরিক্যাল’ বা অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যসহ বিশ্লেষণাত্মক কিছু কিছু আলোচনা বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে। অতি সংক্ষেপে সেগুলির কিছু দিক উল্লেখ করা যেতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হয়রানির যে বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়, তেমনটি লক্ষ্য করা যায় না ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে। প্রত্যক্ষ যৌন সম্পর্কের অভিযোগও যৎসামান্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অন্যান্য আঙ্গিকে, এগুলি ঘটে থাকে। সাংগঠনিক পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির জন্য এসব প্রকাশ করতে সাহসী হন না নারী সংগঠকরা। পরিস্থিতির বাধ্যতার জন্য নারী-সংগঠকদের কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তেমন তথ্য যথেষ্ট রয়েছে।

যৌন হয়রানি-ভুক্তভোগী নারী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের যে ‘টার্গেট’ অংশকে চিহ্নিত করা হয়েছে, ‘এম্পিরিকাল’ গবেষণা বা আলোচনাগুলিতে সেবিষয়ে তেমন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। অবিবাহিতা, অল্পবয়সী, মধ্যবয়সী, বয়স্কা, বিধবা, বিবাহিতা, বিবাহ-বিচ্ছেদী, নারী ওয়ান-পেরেন্ট, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি প্রায় সব অংশের ক্ষেত্রেই এই ধরনের ঘটনার তথ্য ট্রেড ইউনিয়নে পাওয়া যায়। যদিও আক্রান্তাদের সহ সর্বজনীন নারী সংগঠকদের অভিমত হলো, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির তুলনায় ট্রেড ইউনিয়নে এই জাতীয় ঘটনা অতীব সামান্য। এসব ঘটনা অদৌ সর্বজনীন নয়; নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রমী। সাংগঠনিক অবস্থানের বিচারে নারীদের অবস্থান উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে হলে এই হার কম হতে থাকে। অর্থাৎ উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে সাংগঠনিক অবস্থান হলে, নারী-সংগঠকদের হয়রানি কম হয়।

যৌন মনস্তত্ত্বের গভীর প্রতিফলন রয়েছে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে। ইউনিয়নের নারী সদস্যকে সংগঠনের বিষয়ে সচেতন করা, কাজে যুক্ত করা ইত্যাদির পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে শুরু করে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে সহায়তা, আর্থিকসহ নানাবিধ সাহায্য দানের মধ্য দিয়ে প্রথমে গড়ে ওঠা সাধারণ সম্পর্ক পরবর্তীকালে দুই জনের পারস্পরিক একান্ত সম্পর্কে পরিণত হওয়ার তথ্য রয়েছে।

নানাবিধ কারণ দেখানো হয়েছে এই ধরনের সম্পর্ক পরবর্তীকালে ভেঙ্গে যাওয়ার পিছনে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া শুরু হয় পুরুষের পক্ষ থেকে। এই ভাঙ্গনের পর সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট কোন পুরুষ ট্রেড ইউনিয়ন ছেড়ে চলে যান না, কিন্তু নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বসে যান।

এসব ক্ষেত্রে ভাঙ্গন ঘটার পরও যেসব নারীরা সংগঠনে থেকে যান, তাঁরা সাধারণভাবে, অন্য ধরনের হয়রানির শিকার হতে থাকেন। কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সামান্য ত্রুটির জন্য সমালোচনা, দায়িত্ব থেকে অপসারণ, অপমান এবং চরিত্রের ওপর কলঙ্ক আরোপ (সবচাইতে বেশি ঘটে থাকে) ইত্যাদি ঘটতে দেখা যায়। এই ধরনের তৎপরতায় কেবলমাত্র সম্পর্ক ছিন্নকারী পুরুষ-হয়রানিকারীর একক ভূমিকা থাকে না, ট্রেড ইউনিয়নের অন্য কোন কোন কর্মী-সংগঠকও জড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের হয়রানির বিভিন্ন নজিরও উল্লেখ করা হয়েছে নানা আলোচনাতে যেমন, কর্মক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ বা সংগঠনের নেতৃত্ব অথবা পরিবারের মানুষদের কাছে বেনামী চিঠি পাঠানো, নারী সংগঠককে টেলিফোনে ভীতি প্রদর্শন, ব্ল্যাকমেল করার নানা কূট-কৌশল ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ যৌন সম্পর্কযুক্ত নয়, অথচ এক ধরনের যৌন হয়রানির বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে কোন কোন আলোচনায়। এই ধরনের তৎপরতাকে কেউ কেউ বলেছেন ‘ইনডাইরেক্ট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট’। এসব ঘটনা ঘটে কোন কোন ক্ষেত্রে দক্ষ নারী সংগঠকদের ক্ষেত্রে। ট্রেড ইউনিয়নে যোগ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন নারী কর্মী আবির্ভূত হলে বা সংশ্লিষ্ট স্তরের নেতৃত্বের যোগ্যতার চেয়েও অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হলে অথবা যেসব নারী কর্মীরা কঠোর সমালোচক, তাঁদের কাউকে কাউকে শেষোক্ত ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হতে দেখা যায়। অন্যান্যভাবে তাঁদের হয়রানির চেষ্টা ছাড়াও, সেই নারীদের চরিত্রহীনা বলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচারের উল্লেখ আছে। একে ‘ইনডাইরেক্ট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট’ বলা হয়েছে। আলোচকরা বলেছেন এ’ হলো ‘মেল-ডমিনান্স’-

এর বা পুরুষ কর্তৃত্ববাদের এক ধরনের বিকৃত প্রতিফলন। যৌন মনস্তত্ত্বের আলোয়, কেউ বা বলেছেন একে 'সেক্সুয়াল রাইভালরি' বা যৌন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা-র প্রতীক। নারীর বাড়তি যোগ্যতা যোগ্যতায় পশ্চাৎপদ পুরুষ-মানসিকতায় কখনো কখনো ঈর্ষার কারণ হয়। কোন নারী সংগঠক সম্পর্কে প্রচারিত কুৎসায় সংগঠন-নেতৃত্বের প্রভাবিত হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। এঁরা আলোচনাতে দেখিয়েছেন যৌন হয়রানিকারী পুরুষ কখনো সমস্যায় পড়ে না, পড়ে হয়রানিভোগী। নারীদের পক্ষ থেকে অভিযোগের অপর প্রধান দিক হলো যে পুরুষের দ্বারা যৌন হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে অথবা চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিকার বা যথার্থ বিচার, সাধারণভাবে ট্রেড ইউনিয়নে পাওয়া যায় না। ফলে ভুক্তভোগী নারী তার ট্রেড ইউনিয়নকে একান্ত পুরুষ-শাসিত বলে বিশ্বাস করে। কোন নারী, ট্রেড ইউনিয়নের কাছে অভিযোগ করে বিচার না পেলে, সেই ঘটনা অন্যান্য নারীর মধ্যে প্রচারিত হওয়ার পর তাদের মধ্যেও বিচার না পাওয়ার ক্ষোভ সংক্রমিত হয়।

এম. এন. সি., শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন

মূলধনের নক্ষত্র-সংখ্যক মাত্রায় বিশ্বায়ন বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে (এম. এন. সি.) বিশ্বায়িত সংস্থায় (গ্লোবাল কর্পোরেশন) পরিণত করেছে। একইসাথে এই জাতীয় সংস্থার অধীনে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যাও বিপুলায়তনে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে গ্লোবাল কর্পোরেশনগুলিতে সরাসরি কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা 'আংটাড'-এর ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, স্বীয় দেশ ও বিদেশের প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট ৭৩ মিলিয়নের মতো। নিয়োগের চরিত্র, শ্রমিক-সংখ্যা, শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া, শ্রম-প্ররিস্থিতি, সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রম-পরিবেশ, অধিকার, দর-কষাকষি ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্বভাবতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে। পুঁজি ও মালিকানার (এম. এন. সি.) বিপুল বিশ্বায়ন যেহেতু এক ধরনের নতুন বাস্তবতা, তার ফলে বিভিন্ন অংশের বুদ্ধিজীবী ও ট্রেড ইউনিয়নের সামনে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে, সৃষ্টি হয়েছে তাত্ত্বিক বিতর্কও। চাকুরী, মজুরি ও কর্ম-পরিবেশ প্রসঙ্গে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে এম. এন. সি.গুলি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা বিদেশী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং শ্রমিকশ্রেণীর দর-কষাকষির ক্ষমতা ও রণনীতির বিষয়—এই ধরনের আলোচনাতে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

তৃতীয় দুনিয়ার শ্রমের ক্ষেত্রে এম. এন. সি.-র তাৎপর্য

'নিও-ক্ল্যাসিকাল'বাদীরা মনে করে যে এম. এন. সি.গুলি তৃতীয় দুনিয়ায় অবস্থানের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের কর্ম-নিয়োগের স্তর বাড়িয়ে চলে (হুড ও ইয়ং)। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কম উন্নত দেশের তথ্য তুলে ধরে এই প্রতিপাদ্যকে ব্যাখ্যা করেছেন (মেইয়ার, রিউবার)। এঁদের আরও বক্তব্য হলো যে এম. এন. সি.গুলি দেশীয় কর্মসংস্থান বিকাশের সহযোগী হিসাবে ভূমিকা নেয় এম. এন. সি.গুলির সাবসিডিয়ারিতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ যোগ করলে, সেগুলির মোট অবদান উল্লেখযোগ্য।

'গ্লোবাল-রিচ্'বাদীরা মনে করেন যে তৃতীয় দুনিয়ার বেকার সমস্যার অনুপাতে এম. এন. সি.গুলির অবদান কোন ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। এঁদের মতে এম. এন. সি.গুলির দ্বারা কর্ম-সংস্থানকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়। কেননা; প্রথমত, দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে অধিগ্রহণ করে এম. এন. সি.গুলি যখন পুঁজি বিনিয়োগ করে, তাতে নতুন কোন কর্মসংস্থান হয় না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিগৃহীত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক ছাঁটাই হয়। দ্বিতীয়ত, এম. এন. সি.গুলি পুঁজি-নিবিড় আধুনিক শিল্প তৈরি করে, যাতে তুলনামূলকভাবে কম শ্রমিক দরকার হয়। তৃতীয়ত, এম. এন. সি.গুলি উৎপাদনের মধ্যবর্তী পর্যায়ের সামগ্রীগুলি দেশীয় ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করার পরিবর্তে বিদেশ থেকে আমদানি করার ফলে সেকেণ্ডারি এমপ্লয়মেন্টের সুযোগও সীমাবদ্ধ থাকে। চতুর্থত, এম. এন. সি.গুলি যেহেতু মুনাফার উল্লেখযোগ্য অংশ স্বীয় দেশে পাচার করে, ফলে পুঁজির পুনর্বিনিয়োগ কম বা না হওয়ায় ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগও কমে যায় (ভেইটসস)। প্রসঙ্গত এঁরা আরও বলেছেন যে এম. এন. সি.গুলি শ্রমিকদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করে বটে, কিন্তু এই ট্রেনিং নির্দিষ্ট শিল্প-ভিত্তিক ও চরিত্রের; ফলে

প্রদত্ত ট্রেনিং সংশ্লিষ্ট দেশের বাইরে বা অন্য শিল্পে ব্যবহারের জন্য কাজে লাগে না। তাছাড়া এই ধরনের নতুন ট্রেনিং সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রমিকের পরম্পরাগত দক্ষতাকে অপসারণ করে।

'নিও-ইমপিরিয়ালিস্ট'বাদীরাও মনে করেন যে এম. এন. সি.গুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ কর্মসংস্থান ঘটে। এঁদের অতিরিক্ত বক্তব্য হলো, এম. এন. সি. প্রতিষ্ঠানে নতুন নিয়োগের দ্বারা সংশ্লিষ্ট দেশটির শ্রমিকবাহিনীর কাঠামোতে প্রভাব পড়ে। কেননা ক্যাপিটাল-ইনটেনসিভ বা পুঁজি-নিবিড় ব্যবস্থার দরুন নিয়োজিত শ্রমিকরা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে, এম. এন. সি.গুলির কাছ থেকে তারা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বাড়তি মজুরি বা সুযোগ পায়। এই শ্রমিকরা এম. এন. সি.গুলির উৎপাদনের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্যের (মুনাফা) খানিকটা ভাগ পেয়ে থাকে—মজুরি, ভাতা ইত্যাদির মাধ্যমে। ফলে এদের আয়, অন্যান্য অংশের শ্রমিকদের তুলনায় বেশি। আর একারণে শ্রমিকশ্রেণীর কাঠামোর অভ্যন্তরে এক নতুন ধরনের 'লেবার অ্যারিস্টোক্র্যাসি' বা শ্রম-আভিজাত্য গড়ে ওঠে (আরিঘি)। এই তত্ত্বকে বলা হচ্ছে 'নিও-লেবার অ্যারিস্টোক্র্যাসি থিসিস'। যদিও লক্ষণীয় যে, শ্রম-আভিজাত্যের সুযোগ সমস্ত ধরনের এম. এন. সি. প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঘটে না। বরং বিপরীত পরিস্থিতিই ব্যাপক। এম. এন. সি.গুলি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে, সংশ্লিষ্ট দেশে (বিশেষত আফ্রিকায়) প্রচলিত মজুরি-মানের চেয়েও কম মজুরি শ্রমিকদের দিয়ে থাকে। তাছাড়া ব্যাপক বেকারীর জন্য এম. এন. সি.গুলি কম মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ পেয়ে যায়।

যেখানে উচ্চ-মজুরির ও তুলনামূলকভাবে সুবিধাভোগী এম. এন. সি.-শ্রমিক রয়েছে সেখানে 'লেবার-অ্যারিস্টোক্র্যাসি'র তাৎপর্য প্রতিফলিত হয় শ্রমিকদের মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক স্তরে আচরণের মধ্যে, যদিও এই মূল্যায়ন সর্বাংশে সঠিক নয়। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত ভূমিকার ক্ষেত্রে, বিশেষত তাদের আন্দোলনের কালে, বাড়তি সুবিধা ভোগের জন্য আন্দোলন ও সংগঠন-বিমুখতার তেমন সর্বজনীন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং তিরিশের দশকে ভেনেজুয়েলার তৈল-শিল্পে (এম. এন. সি মালিকানাধীন) ধর্মঘট থেকে শুরু করে পরবর্তী ছয় দশকে তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশে উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী ভূমিকা পালনের ইতিহাস এম. এন. সি.-শ্রমিকদেরও রয়েছে। তবে, তত্ত্বগতভাবে, যেসব কারণের জন্য লেনিন এই শতাব্দীর প্রথমদিকে আমেরিকান শ্রমিকদের 'অ্যারিস্টোক্র্যাট লেবার' বলে চিহ্নিত করেছিলেন, নতুন আর এক পটভূমিতে তেমন সুপ্ত উপাদান কোন কোন দেশে, কোন কোন শিল্পে, এম. এন. সি.-র শ্রমিকদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান।

বহুজাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা তৃতীয় দুনিয়ায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে এলাকা নির্বাচন এবং 'এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন'কে ব্যবহারের মধ্যে অতি-মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে। বিস্তৃত সমীক্ষায় দেখা গেছে, এম. এন. সি.-নির্বাচিত এলাকাগুলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারী আইনকানুন ও শ্রম-আইনের শিথিলতা এবং কর-ব্যবস্থায় ব্যাপক সুবিধা নেওয়ার দিকটি ছাড়াও, এইসব এলাকার শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়া, দীর্ঘসময় কাজ করানো, কম ছুটির সময় ও দিবস, শ্রমিকদের অত্যধিক নিবিড়-শ্রমে বাধ্য করা ও তৎপর-শ্রম আদায় করা, কর্ম-পরিবেশের প্রতি অবহেলা এবং শ্রমিকদের কাছ থেকে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা আদায় করে নেওয়া ইত্যাদি করে থাকে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী এই ব্যবস্থাকে বলেছেন 'ওয়ার্ল্ড মার্কেট ফ্যাক্টরিজ' বা বিশ্ব-বাজার কারখানা (ফ্রবেল, এ. জি. ফ্র্যাঙ্ক প্রমুখ)।

এম. এন. সি. ও ট্রেড ইউনিয়ন

যেসব দেশে ট্রেড ইউনিয়ন দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে দীর্ঘ আন্দোলন ও নানাবিধ প্রক্রিয়ায় নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে পরিহার করে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংহতি সাধনের কাজে অগ্রগতি সাধারণভাবে ঘটেছিল;কিন্তু গ্লোবাল কর্পোরেশনগুলির অপ্রতিহত ভূমিকা এবং পুঁজির ব্যাপক বিশ্বায়ন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভাজনের (জাতীয় পুঁজির প্রতিষ্ঠান বনাম আন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক পুঁজির প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে) নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, বাড়িয়ে তুলছে শ্রমিকশ্রেণীর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপাদানকে। তাছাড়া 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' বর্তমান বিশ্বায়নের অর্থনীতির এক

অপরিহার্য অঙ্গ। সেই 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'-র পরিসরে সমগ্র শ্রম-বাজার ও ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে টেনে আনতে পারলে উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি—উভয়ত জাতীয় ও বহুজাতিক মূলধনের পক্ষে সহায়ক হয়। সুতরাং সেই কাঙ্ক্ষিত পটভূমিকায় নানাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাস্তবতা সৃষ্টি করা বর্তমান বিশ্ব-পুঁজির পক্ষে জরুরি। আর শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারলে, তার ফল হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমিক-ঐক্য, শ্রমিক-আন্দোলন এবং শ্রমিক-সংগঠন দুর্বল করার উপাদানও সৃষ্টি করা যায়। সর্বোপরি 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র অর্থ যেহেতু 'একক'-এর প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত মতাদর্শও এর প্রভাবে বিপন্ন হতে বাধ্য। কেননা প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিমণ্ডলে, ব্যক্তি-শ্রমিক নিজ সাফল্য অর্জনের জন্য পুঁজির কাছে মানসিকভাবে আত্মসমর্পণে ক্রমশ বাধ্য হতে থাকে।

এই লক্ষ্য ও প্রক্রিয়াকে সফল করার জন্য বহুজাতিক সংস্থা গ্রহণ করে থাকে নানা পদ্ধতি। প্রথমত, বহুজাতিক মূলধনের বিশ্বময় চলাচলের অধিকার ও ক্ষমতার ফলে তারা সমগ্র উৎপাদন বা কারখানা/প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণকে বিদেশে স্থানান্তরের হুমকি দিয়ে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নকে 'ব্ল্যাকমেল' করে থাকে। দ্বিতীয়ত, এম. এন. সি.গুলি একই ধরনের পণ্য বা সেটির বিভিন্ন অংশ নানা দেশে উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে। কোন একটি দেশে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন যদি ধর্মঘটের পথে যায়, তখন সেখানকার উৎপাদন বন্ধ রেখে সেই পণ্য অন্য দেশ বা কারখানাতে উৎপাদন করে তারা বাজারের চাহিদা পূরণসহ মুনাফা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। সুতরাং কোন দেশের একটি প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট করেও ট্রেড ইউনিয়ন এম. এন. সি.-কে সাধারণত বিচলিত বা দুর্বল করতে পারে না। বরং দীর্ঘ সংগ্রামের পর কোন সাফল্য না এলে, ক্লান্ত ও মজুরি না পাওয়া শ্রমিক এক সময়ে বাধ্য হয় আত্মসমর্পণে। তৃতীয়ত, এম. এন. সি.গুলির উৎপাদন, ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের লাভ-লোকসান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সুনির্দিষ্ট তথ্য ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে সংগ্রহ করাই দুরূহ। তাছাড়া কোন দেশে, কোন সাবসিডিয়ারির শ্রমিকদের সাথে দর-কষাকষি করে এম. এন. সি. দাবীর নিষ্পত্তি করছে, সেগুলির শর্তাবলী কি, মূল কোম্পানি সেই সব চুক্তি কিভাবে নিজেদের হিসাব-নিকাশে প্রতিফলিত করছে, কোম্পানিগুলি কিভাবে ও কত পরিমাণে 'ট্রান্সফার প্রাইজিং' বা দর স্থানান্তর এবং তার দ্বারা প্রকৃত মুনাফার কারচুপি করছে ইত্যাদি জ্ঞাত হওয়া কোন একটি দেশের একটি ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। স্বভাবতই কোন ধরনের দাবী উত্থাপন থেকে শুরু করে, তা' নিয়ে দর-কষাকষি বা আন্দোলন গড়ে তোলাও ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে কঠিন হয় পড়ে।

দুই দশক আগের বাস্তবতায় এম. এন. সি.-র সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়নগুলির যে তৎপরতা ছিল, তার ছক নিম্নোক্তরূপ :

কৌশলগত লাইন	এম. এন. সি.-র ক্ষমতা খর্বকরণ	ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
জাতীয় স্তরে উদ্যোগ	জাতীয় রাষ্ট্রিক আইন প্রণয়ন	এম. এন. সি.-র সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে ট্রেড ইউনিয়নের কর্তৃত্ব
আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্যোগ	আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবস্থা	আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমিকশ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আইনি ব্যবস্থার দ্বারা বহুজাতিক সংস্থাগুলির কর্তৃত্ব খর্ব করার কিছু প্রয়াস সত্তর ও আশির দশকে ঘটলেও এবং কোন কোন দেশে কিছু কিছু বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ঘটনা ঘটলেও তা' বর্তমানে ব্যর্থ হয়ে গেছে। জাতীয় স্তরে এম. এন. সি.গুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে ট্রেড ইউনিয়নের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সামান্যতম ফলবতী হয়নি কোথাও। আন্তর্জাতিক স্তরে এম. এন. সি.-র বিরুদ্ধে যৌথ প্রচেষ্টা চালানোর জন্য 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন

অব ট্রেড ইউনিয়নস' (ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর) আবেদন আশির দশকের শুরুতেই স্বীকৃত ও গৃহীত হয়নি কোন আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা। কেননা শেষোক্তদের অধিকাংশই এম. এন. সি.-র পরিবর্তে কমিউনিজমকে বৃহত্তর বিপদ বিবেচনা করে এসেছে। এক্ষেত্রে বুর্জোয়াবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিজ মতবাদের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য দেখিয়েছিল। তবে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাঠামোর বাইরে এম. এন. সি.গুলির বিরুদ্ধে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে ঘটেছিল। কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময় এবং এক ধরনের 'ইন্টারন্যাশনাল কম্বাইন কমিটিজ'ও গঠিত হয়েছিল। মাঝখানে কিছুটা অনিশ্চিয়তা থাকার পর নব্বই-এর দশক থেকে সব অংশের ট্রেড ইউনিয়নেরই অনেকটা হুঁশ ফিরতে শুরু করেছে। ডব্লু. এফ. টি. ইউ. ও অন্তর্গত টি. ইউ. আই.গুলির পুনর্গঠনের কিছুটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। এরাও আই. সি. এফ. টি. ইউ. ও ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েটগুলি এম.এন.সি.-র বিরুদ্ধে নানা ধরনের উদ্যোগ এখন চালাচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়নের উপর আক্রমণ বৃদ্ধির সাম্প্রতিক কিছু দিক

বর্তমানে দেশে দেশে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের উপর ব্যাপক ও অব্যাহত আক্রমণ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখন সহসা পাওয়া যায় না, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সরকার বা প্রচার মাধ্যমগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করে না। আক্রমণের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সংগঠন করার অধিকারের উপর আক্রমণ, নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা, ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরের উপর আক্রমণ, ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি হরণ, ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তর ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সীল বা বাজেয়াপ্ত করা, নেতা-কর্মী-সংগঠকদের গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করা, আন্দোলন-ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের বরখাস্ত, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের এমনকি পরিবারের মানুষদের অপহরণ, খুন করা প্রভৃতি। প্রতি বছর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বা জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে কিছু কিছু ঘটনা লোকচক্ষুর সামনে আসে। কোন কোন সময় প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে, আই. এল. ও. সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির কাছ থেকে সেসব বিষয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। যদিও অধিকাংশ সরকার সেসব বিষয়ে উত্তর দেয় না বা দীর্ঘ বিলম্ব করে অথবা সাজানো রিপোর্ট পাঠায় নিজ দোষক্ষালন করে। সুতরাং সর্বাত্মক রিপোর্ট না জানা গেলেও, যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায় তার পরিমাণও বিপুল।

আই. এল. ও.-র 'কমিটি অন ফ্রীডম অব অ্যাসোসিয়েশন' ১৯৯০-৯১ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে যে অভিযোগ পায় তাতে দেখা গেছে শত শত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠককে খুন করা হয়েছে, কয়েক হাজার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন কাজের জন্য চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়েছে কয়েক হাজার। অতি সংক্ষেপে এই হলো আক্রমণের চরিত্র। এর মধ্যে কলাম্বিয়াতে ১৯৮৬ সাল থেকে খুন হয়েছিল ৩০০ জনের বেশি। তাছাড়া বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তর ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করার ঘটনা ঘটেছিল ১০টি। এল. সালভাডোরের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন 'ফেনোস্ট্রাস' (এফ. ই. এন. ও. এস. টি. আর. এ. এস.)-এর দপ্তর দু'বার ডিনামাইট দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল, যাতে নিহত হয়েছিল ৯ জন ও আহত ৭। অনুরূপ আক্রমণ ঘটেছিল গুয়াতেমালার ট্রেড ইউনিয়নের উপরও। ফিলিপিনস-এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন হওয়া সত্ত্বেও, সংগঠিত সশস্ত্র গুণ্ডাদের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের উপর আক্রমণ ও খুন অব্যাহত আছে। জুন, ১৯৮৯-তে সুদানে অভ্যুত্থান ঘটানোর পর সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, নেতা-সংগঠকদের জেলে আটক অব্যাহত আছে; ধর্মঘট করলে বরখাস্ত ও জেল ছাড়াও, মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি প্যালেস্টাইনে স্বয়ংশাসিত অঞ্চল গঠনের আগে পর্যন্ত, ইজরায়েল-অধিকৃত প্যালেস্টাইনে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। মিশর, ইরাক, মরিটানিয়া, সিরিয়ান আরব রিপাবলিক ও ইথিওপিয়াতে সরকারী নীতির অনুগামী এবং সরকার-পৃষ্ঠপোষিত একটি করে দেশভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোন ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বের অধিকার নেই। প্যারাগুয়েতে রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীদের

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের এবং দাবী-দাওয়া বা সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার অধিকার নেই। পরিবহন, মৌলিক উৎপাদন ও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের ধর্মঘট করার অধিকার নিষিদ্ধ। থাইল্যাণ্ডে এপ্রিল, ১৯৯১-তে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটার পর রাষ্ট্রীয় সংস্থার সব ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ হয়েছে, সেগুলির সদস্য সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। মধ্য-আশির দশকে খোদ ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের উপর ব্যাপক আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল মার্গারেট থ্যাচারের প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে। সেখানে শ্রম-আইনের মধ্যে নিষেধাজ্ঞামূলক যেসব সংশোধন করা হয়েছে, সেগুলির অনেকগুলি ধারাকে আই. এল. ও.-র 'কমিটি অব এক্সপার্টস' সংগঠন করার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলে ঘোষণা করেছে। যেসব দেশে 'এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন' ব্যবস্থা রয়েছে সেইসব অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যত কোন অধিকার নেই। কোস্টারিকাতে ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি খর্ব করার জন্য মালিক ও শ্রমিকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক 'দান' নিয়ে 'সলিডারিস্ট' নামে এক নতুন ধরনের সংগঠন তৈরি করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। এদের কাজের ধারা অনেকটা 'মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটি' বা পরস্পর সহায়তা করার সংস্থার মতো। এরা আমানত, ঋণ, গৃহনির্মাণ, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে এবং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির কাজ চালায়। কিন্তু দাবী-দাওয়া উত্থাপন, বা আন্দোলন করার কোন অধিকার এগুলির নেই। এই ব্যবস্থার ফলে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা দ্রুত কমছে। আই. এল. ও.-র বিভিন্ন কমিটি এইসব প্রয়াসকে অসংগত বলে মত প্রকাশ করেছে। সমসাময়িককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ শ্রমিক ধর্মঘটের সময় হাজার হাজার ধর্মঘটী শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। দেশে সরকার-পৃষ্ঠপোষিত একটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের বাধ্যতামূলকভাবে সেটির সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বুরকিনা ফাসে, চাদ, গাম্বিয়া, লেসেথো, ঘানা, নাইজিরিয়া, জাম্বিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ট্রেড ইউনিয়নের উপর অব্যাহত আক্রমণ রয়েছে। এখানে সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার স্বীকৃত নয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাতে ধর্মঘটের জন্য ছাঁটাই ছাড়াও পুলিশ ও গুণ্ডাদের দ্বারা হামলা চালানো, খুন ইত্যাদি বিচ্ছিন্নভাবে হলেও নানা স্থানেই ঘটে। বেশ কিছু এলাকাতে, যেমন কয়লাখনি এলাকায়, মাফিয়াদের সশস্ত্র হুমকির মুখে ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হয়। অনুন্নত দেশগুলিতে সাব-কন্ট্রাক্টরি ও হোম-ওয়ার্ক প্রথায় কাজ ও অসংগঠিত/অ-আনুষ্ঠানিক শিল্পে মালিকদের একচ্ছত্র দাপটে ও আক্রমণের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করাই কার্যত দুঃসাধ্য হচ্ছে।

শিল্প এলাকায় নানা ধরনের মাফিয়াদের উপস্থিতি ও মালিকদের হয়ে আন্দোলন ভাঙ্গার জন্য ভাড়াটে গুণ্ডাদের হামলা দীর্ঘ অতীত থেকেই ছিল। এখন শ্রমিকদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করা এবং মালিকপক্ষের বাইরে এক স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে মাফিয়াদের ভূমিকা তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে এক স্থায়ী চিত্র। শ্রমিকদের বাড়ী-ঘর লুঠ, গৃহদাহ, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি ঘটানোর অজস্র নজির এক্ষেত্রে রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনের ওপর হামলা করার অন্যতম নতুন শক্তিগুলি হলো দেশে দেশে উগ্র মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ। শ্রমিক আন্দোলন, বিশেষত বামপন্থীরা, এই শক্তিগুলির আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর ১৯৮৯ সালে এক ধরনের প্রতিবিপ্লবী অভিযান শুরু হয়েছিল সেখানকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধেও। নতুন সরকারগুলি কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়নের সম্পত্তির দখল নেওয়া, পত্র-পত্রিকা ও প্রেস সিল করে দেওয়া, সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা, নেতৃত্ব সংগঠকদের গ্রেপ্তার এবং কোন কোন অনুরূপ দেশে সাজানো মামলায় বিচারের প্রহসন পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল। নতুন সব সরকারের পক্ষ থেকে এইসব দেশে পাল্টা ট্রেড ইউনিয়নও গড়ে তোলা হয়েছে। মধ্য-প্রাচ্য ও সংলগ্ন যেসব দেশে নতুন করে ইসলামিক মৌলবাদীরা ক্ষমতা দখল করেছে সেইসব দেশেও ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনকে প্রায় বেআইনির স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দেশে দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি, উন্নয়নের স্তর, সামাজিক অবস্থা, শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার পরম্পরা, ট্রেড

ইউনিয়নগুলির দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্র, সরকার ও মালিকশ্রেণীর ভূমিকা, উৎপাদন ও শ্রমের প্রক্রিয়া ও বিন্যাস, শ্রমজীবীদের কর্ম-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক শক্তিগুলির ভূমিকা ও তাদের প্রতি ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি বা সম্পর্ক, গণ-আন্দোলনের অবস্থা ও সেক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা প্রভৃতি উপাদান প্রধানত স্থির করে দেয় সংশ্লিষ্ট দেশে ট্রেড ইউনিয়নের প্রকৃত অবস্থা ও ভূমিকা কি। এর সাথে বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের সামনে ব্যাপক ও নতুন নতুন যে ধরনের প্রতিকূলতার উপাদান যুক্ত হয়েছে তার উল্লেখ পূর্ব অধ্যায়ে করা হয়েছে। তাছাড়া নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়া স্বয়ং কেবল শ্রমিকশ্রেণীর রূপান্তর ঘটাচ্ছে না, উভয় প্রক্রিয়া ট্রেড ইউনিয়নের সামনে বিপুল সমস্যাও সৃষ্টি করেছে।

ট্রেড ইউনিয়নেরও বৈদেশিক নীতি তথা আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সেটির বিকাশের এক আবশ্যিক শর্ত। যেহেতু পুঁজির বিশ্বময় ভূমিকা রয়েছে এবং যা বর্তমান যুগে অতীতের তুলনায় বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে রয়েছে আত্মিক আন্তর্জাতিক ঐক্য, সেহেতু পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমের আন্তর্জাতিক ঐক্য এক আবশ্যিক শর্ত। এইভাবে একবিংশ শতকে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি, সম্ভবত, প্রয়োজনীয় বৃহত্তর পরিবর্তনের জন্য এক অন্তর্বর্তী স্তরে প্রবেশ করেছে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর প্রভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাঠামো, ভূমিকা ও ক্ষমতার পরিবর্তনের লক্ষণসমূহ ছাড়াও, মর্মগত তথা আদর্শগত অবস্থানের ক্ষেত্রেও এক সংঘাতী পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। এইরকম পরিস্থিতিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির বর্তমান অবস্থার কিছু কিছু দিক এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলির অবস্থা

'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেট ইকনমিকস' তথা যে দেশগুলিকে শিল্পায়িত বাজারী অর্থনীতিভিত্তিক বলা হচ্ছে, প্রধানত সেইসব দেশে ট্রেড ইউনিয়নের আদি পত্তন ঘটেছিল। এই দেশগুলির অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নগুলি সাধারণভাবে শক্তিশালী ছিল এবং সমাজ ও রাজনীতিতে অনেকটা প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এইসব দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখন নানা ধরনের ও ব্যাপক চরিত্রের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে—কাঠামোগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক। চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়ার যে শিল্পগত পরিবেশে এইসব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর আদি ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, এখনকার শ্রমক্ষেত্র তা' থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে পড়ছে। আজকের শ্রমজীবীরা উৎপাদনের কাজে ক্রমান্বয়ে জটিল, সূক্ষ্ম ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও রোবটের সাহায্যে শ্রম-শক্তি ব্যয় করছে। অতীতের শিল্পগত কায়িক দক্ষতার পরিবর্তে আসছে বিশেষীকৃত মস্তিষ্কজাত যান্ত্রিক ভূমিকা। অতীতের 'ব্লু কলার' বা কালিঝুলি মাখা শ্রমিকের সাথে 'হোয়াইট কলার' বা অফিস কর্মজীবীর মধ্যে সুপরিচিত যে ভাগাভাগি ছিল, তা' ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। আংশিক সময়ের কাজ এবং নানা নতুন ধরনের কাজের প্রসার ঘটছে। শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় পরিষেবা ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে নারী-শ্রমিকের সংখ্যাও।

প্রথমেই লক্ষ্য করা যাক ট্রেড ইউনিয়নগুলির 'ডেনসিটি-লেভেল' বা ঘনত্বের স্তর তথা ইউনিয়নে সদস্যভুক্তির পরিস্থিতি। যৎসামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সমস্ত উন্নত দেশে সদস্যভুক্তির হার ক্রমাগত নিম্নগামী এবং কোথাও কোথাও প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। এ' বিষয়ে তথ্য দেখা যেতে পারে।

১৯৮৯ সালে ও. ই. সি. ডি. (অরগানাইজেশন অব ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট)-ভুক্ত দেশগুলিতে সদস্যভুক্তির হার (মোট শ্রমিকের শতাংশ)

দেশ	সমস্ত ক্ষেত্র মিলে	ব্যক্তি-মালিকানাধীন	রাষ্ট্রায়ত্ত	উৎপাদন মূলক	আর্থিক	অনান্য
সুইডেন	৮১	৮১	৮১	৯৯	৭২	৮৭
আইসল্যাণ্ড	৭৮	☆	☆	☆	☆	☆
ডেনমার্ক	৭৬	☆	☆	☆	☆	☆
ফিনল্যাণ্ড	৭২	৬৫	৮৬	৮০	☆	৮৬

দেশ	সমস্ত ক্ষেত্র মিলে	ব্যক্তি-মালিকানাধীন	রাষ্ট্রায়ত্ত	উৎপাদন মূলক	আর্থিক	অন্যান্য
নরওয়ে	৫৪	৪১	৭৫	৮৭	৩৩	৬৮
বেলজিয়াম	৫৩	☆	☆	৯৫	২৩	২৭
নিউজিল্যাণ্ড	৪৬	৫১	৯৪	৫৮	৪২	৫৭
লুক্সেমবার্গ	৪৯	৪৩	৭৪	☆	☆	☆
অস্ট্রেলিয়া	৪৫	৩২	৬৮	৪৮	২৮	৪৬
অস্ট্রিয়া	৪৪	৪১	৫৭	৫৩	২৮	৪৪
আয়ারল্যাণ্ড	৪২	☆	☆	☆	☆	☆
ইউ.কে. (ব্রিটেন)	৩৯	২৮	৫৫	৪১	২৫	৫২
ইতালি	৩৪	৩২	৫৪	৪৭	২২	৩১
জার্মানি	৩২	৩০	৪৫	৪৮	১৭	২৮
কানাডা	৩০	☆	☆	৩৮	৬	৫৩
পর্তুগাল	২৯	☆	☆	☆	☆	☆
সুইজারল্যাণ্ড	২৮	২২	৭১	৩৪	১৪	২৪
জাপান	২৬	২৩	৫৬	৩২	৫০	৩১
গ্রীস	২৬	☆	☆	☆	☆	☆
নেদারল্যাণ্ডস	২৪	২০	৫১	২৫	৯	৩২
তুরস্ক	১৬	☆	☆	৪৮	১২	৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৫	১৩	৩৭	২২	২	১৯
স্পেন	১১	☆	☆	☆	☆	☆
ফ্রান্স	১০	৮	২৬	৫	☆	☆

☆-এর অর্থ ঃ তথ্য পাওয়া যায়নি।

তবে সমগ্র পরিস্থিতির মূল্যায়ন থেকে এটা জানা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যার হার যাই হোক না কেন, সমাজজীবনে তাদের প্রভাব এখনও অনেকটা রয়েছে। ঘনত্বের হারের তারতম্যের কারণ নিয়ে রয়েছে নানা ধরনের মত। ছোট দেশগুলিতে টি. ইউ. ঘনত্বের হার বৃদ্ধি সম্পর্কে এক ধরনের মূল্যায়ন হলো যে, দেশ ছোট হওয়ার ফলে সংগঠনের নেতৃত্ব, মালিকপক্ষ ও সরকার সহজে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। নর্ডিক-দেশগুলির প্রসঙ্গে এই বক্তব্য সত্য হলেও, সুইজারল্যাণ্ডসহ ইউরোপের আরও অনেক নর্ডিক দেশের ক্ষেত্রে এই প্রতিপাদ্য খাটে না। আবার একথাও বলা হয় যে ঘনত্বের হার সেইসব দেশে বেশি, যেখানে সরকার দীর্ঘকাল ধরে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। এটাও মনে করা হয় যে সংগঠনের সদস্য হার বেশি সেইসব দেশে যেখানে শ্রম-সম্পর্কের ক্ষেত্রে দর-কষাকষির কাঠামো ও ব্যবস্থা সবিশেষ কেন্দ্রীভূত। নর্ডিক দেশসমূহে কিছুদিন আগে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্তরের একটি মালিকদের সংগঠন ও একটি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন জাতীয় স্তরে শ্রমিকদের স্বার্থের বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করতো। এছাড়া, ও.ই.সি.ডি. ভুক্ত দেশগুলিতে তিন ধরনে ও স্তরে দর-কষাকষি ও চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। (ক) সেন্ট্রাল বা দেশভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্তরে, (খ) সেক্টোরাল বা ক্ষেত্র-ভিত্তিতে, এবং (গ) এন্টারপ্রাইজ বা কোম্পানিভিত্তিক।

সুইডেনে প্রধান ট্রেড ইউনিয়নগুলি হলো 'সুইডিশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন', 'সুইডিশ কনফেডারেশন অব প্রফেশনাল এমপ্লয়িজ' এবং 'সুইডিশ কনফেডারেশন অব একাডেমিকস'। তিরিশ-এর দশক থেকে মধ্য-আশির দশক পর্যন্ত দেশে ইউনিয়নভুক্তি ধারাবাহিকভাবে বেড়েছিল, তারপর বছরে ১% হারে কমেছে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। তারপর বেড়ে ১৯৯২ সালে ৮৩% দাঁড়ায়। টি.ইউ.-তে নারীদের বেশি যোগদান এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার আগে

সুদীর্ঘকাল সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির শাসনে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষণা পাওয়ায়, সদস্যভুক্তি এই মাত্রা অর্জন করেছিল। কিন্তু এখন আবার কমতে শুরু করেছে।

জার্মানিতে "জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন"-এর সদস্যসংখ্যা পূর্ব জার্মানির সাথে মিলনের পর ১২ মিলিয়নে উত্তীর্ণ হয়। ট্রেড ইউনিয়ন,মালিকপক্ষ ও সরকারের মধ্যে ধারাবাহিক আলোচনার ব্যবস্থা থাকায় ও.ই.সি.ডি. দেশগুলির মধ্যে জার্মানির শ্রমিকদের মজুরি সর্বোচ্চ ও দৈনিক কাজের সময় সবচাইতে কম। আপাতদৃষ্টিতে এইসব সুযোগ শ্রমিকদের কাছে চরম সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নটি পৌঁছে দিলেও, শ্রমিকদের সমস্যা এখানে কমে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়ছে। প্রাক্তন পূর্ব জার্মানির শ্রমিকদের মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম জার্মানির শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম। ১৯৯২-৯৩ সালের চুক্তির পর প্রথমোক্তদের মজুরির মান বৃদ্ধি পাওয়ার পরও পশ্চিমের তুলনায় মাত্র তিন-চতুর্থাংশ হয়েছে। পূর্ব জার্মানিতে কাঠামোগত সংস্কারের ফলে কল-কারখানা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকারী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমগ্র পরিস্থিতির জন্য ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিকদের ১১ দিনের ধর্মঘট দিয়ে যে সংঘর্ষের কাল-পর্ব শুরু হয়, তা' পরবর্তীকালে আরও ব্যাপক চেহারা নিয়েছিল। ১৯৯৫-৯৬ সালে শিল্প শ্রমিকসহ, পরিষেবার ক্ষেত্রে রেল ও সড়ক, সরকারী দপ্তর ইত্যাদিতে অনেকগুলি বড় ধর্মঘট ঘটেছে।

ইউনাইটেড কিংডম তথা ব্রিটেনে আশির দশকে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের আন্দোলনের উপর ব্যাপক আক্রমণ এবং আন্দোলনগুলির পরাজয় ট্রেড ইউনিয়নের উপর ব্যাপক প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে। ব্রিটেনের সর্ববৃহৎ সংগঠন 'ব্রিটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস' দীর্ঘকাল আগেই কমিউনিস্টদের বাদ দেবার ব্যবস্থা নিয়ে ও লেবার পার্টির প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করে আসছিল। সংস্কারবাদ এখন এমন তীব্র চেহারা নিয়েছে যে, সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার চাপ সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রবল আকার ধারণ করেছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে, পুঁজিবাদের পক্ষে লেবার পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরের তীব্র প্রভাব পড়েছে এখানকার শ্রমিক আন্দোলনে। দেশে 'এন্টারপ্রাইজ'-ভিত্তিতে দর-কষাকষির ব্যবস্থা চালু রয়েছে। 'ব্রিটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস' এখন প্রস্তাব করেছে সমন্বয়মূলক, কেন্দ্রীয়ভাবে এবং দ্রুততার সাথে দরকষাকষির ব্যবস্থার।

স্পেনে ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো সরকারের পতনের পেছনে গুপ্ত সংগঠন, শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৭৭ সালে ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রকাশ্যে কাজ করার অধিকার পায়। তারপর থেকে সদস্যভুক্তি বেড়ে ১৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। এই কাল-পর্বেই 'ইউরো-কমিউনিজম'-এর অন্যতম প্রধান প্রবক্তা স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কারিল্লোর তত্ত্ব জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলনকে সংস্কারবাদী পথে নিয়ে যেতে শুরু করে। জাতীয় জীবনের উন্নয়নে যুক্ত হওয়ার নামে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত অচিরেই সদস্যভুক্তির হার ১৯৮৯ সালের মধ্যে ১১ শতাংশে নামিয়ে আনে। বেকারী, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে১৯৮৮ সালে সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্ত সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল। এর পর ১৯৯২ সালে স্বাস্থ্য, অসামরিক প্রতিরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বড় বড় আন্দোলন চলে, যাতে ঘটেছিল ৪৩ শতাংশ শ্রমিকের অংশগ্রহণ। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যভুক্তির চেয়ে চার গুণ বেশি শ্রমিক এইসব ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত যৌথ চুক্তিতে অন্তর্গত হয় ৮২ শতাংশেরও বেশি শ্রমিক। ১৯৯৪ সালে প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হার দাঁড়িয়েছে ১০%।

পর্তুগালে ফ্যাসিস্ত সালাজার সরকারের পতন হয় ১৯৭৪ সালে। তারপর ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ১৯৮০ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫২ শতাংশে, ১৯৯২ সালে তা' কমে দাঁড়ায় ৩০ শতাংশে। ট্রেড ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব দুর্বল। সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি সামাজিক ও আর্থনীতিক বিষয়ে জাতীয় স্তরে ১৯৯২ সালে সরকার ও মালিকপক্ষের সাথে যৌথ চুক্তি করেছে। এই চুক্তির মর্মার্থ যতটা শ্রমিক স্বার্থে, তার চেয়ে অনেক বেশি মালিকের পক্ষে। কেননা ধর্মঘট, আন্দোলন না

করা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এই চুক্তির প্রধানতম শর্ত। ১৯৯৫ সালে স্পেনে বেশ কয়েকটি বড় ধর্মঘট হয়েছিল। তাসত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা নিম্নগামী।

নেদারল্যাণ্ডসের ট্রেড ইউনিয়নভুক্তির হার ১৯৭৮ সালে ৩৯ শতাংশ থেকে ১৯৮৯-তে ২৪ শতাংশে পৌঁছোনোর পর ১৯৯২ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ শতাংশ হয়েছিল, যদিও সদস্য হারের তুলনায় জাতীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব এখনও যথেষ্ট। সদস্যপদ কমে যাওয়ার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণগুলি হলো বেকারী বৃদ্ধির পাশাপাশি কাঠামোগত সংস্কার ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। জাতীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব এখনও কিছুটা থেকে যাওয়ার পেছনে কারণ হলো মালিকশ্রেণীর স্বার্থানুকূল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জাতীয় উন্নয়নের কাজে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা গ্রহণ। অথচ এই প্রভাব বেড়েছে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও সমর্থনের বিনিময়ে। নেদারল্যান্ডস-এ ১৯৯৬ সালের পূর্ববর্তী ৫ বছরে কোন বড় ধর্মঘট ট্রেড ইউনিয়ন করেনি।

ইতালিতে সদস্যভুক্তির হার ১৯৮০ সালে ৪৪ শতাংশ থেকে ১৯৮৯-তে ৩৪ শতাংশ এবং ১৯৯২ সালে তা' ৩০ শতাংশে নেমে যায়। একদা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ঐতিহ্যপূর্ণ ও শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন এখন অন্যতম দুর্বল সংগঠন। তার পরিবর্তে সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব বাড়ছে। তদুপরি নয়া-ফ্যাসিবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ, বিদেশাগত বিশাল সংখ্যক শ্রমবাহিনীর প্রতি বিদ্বেষ ও বিরোধ প্রভৃতি ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসাবে এক ধরনের সংগঠনের—'কমিটাটি ডি বেস'— আবির্ভাব ঘটাতে প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়নের দুর্বলতা বাড়ছে ও শক্তি কমছে। 'কমিটাটি ডি বেস' কার্যত এক ধরনের ক্র্যাফট ট্রেড ইউনিয়ন যা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দক্ষ বা পেশাদারি কর্মীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। ইউরোপের মধ্যে ইতালিতে হোম-ওয়ার্কার ও সাব-কন্ট্রাক্টরি প্রথায় উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং এইসব ক্ষেত্রের শ্রমিকরা অসংগঠিত থাকার ফলে ট্রেড ইউনিয়নের দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ইতালিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক দলের আনুগত্যের ভিত্তিতে খাড়াখাড়ি বিভক্ত। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উচ্চস্তরে ব্যাপক দুর্নীতির প্রভাব পড়েছে ট্রেড ইউনিয়নেও। বেশ কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। সবকিছু মিলিয়ে রাজনীতির প্রতি অনীহায় ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছে ইতালির শ্রমিকশ্রেণী।

ফ্রান্সে সদস্যভুক্তির হার ও.ই.সি.ডি. দেশগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন। অথচ সেখানে কাঠামোগত সংস্কারের বিরুদ্ধে ইউরোপের মধ্যে সর্বব্যাপক ও সর্বাধিক সংখ্যক ধর্মঘট ঘটছে। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে লাগাতার ধর্মঘট প্রায় অভ্যুত্থানের চরিত্র গ্রহণ করেছিল। ফ্রান্সে কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন 'ফ্রেঞ্চ কনফেডারেশন অব জেনারেল ট্রেড ইউনিয়নস' (সি.জি.টি.), প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাইরে, 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস'-এর সবচেয়ে শক্তিশালী ও বৃহত্তম ইউনিয়ন ছিল। ইউরোপীয়ান কমিউনিটির সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরে জার্মানির ট্রেড ইউনিয়নের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার তৎপরতায় এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার মনোভাব থেকে ডব্লু.এফ.টি.ইউ. থেকে তারা বেরিয়ে গেছে। ফ্রান্সে সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব যেমন বাড়ছে, পাশাপাশি 'ইউরোপীয়ান লেফট'-দের নানা গোষ্ঠী শ্রমিকদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

নিউজিল্যাণ্ডে মুক্ত বাজার অর্থনীতি নতুন মোড় নিয়েছে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও হস্তক্ষেপ প্রায় পুরোপুরি প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে। কেন্দ্রীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষের মধ্যে দীর্ঘ-প্রচলিত 'আরবিট্রেশন' প্রথার কাঠামোতে দর-কষাকষি ও চুক্তির পুরানো ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে ১৯৯১ সালের 'এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টস অ্যাক্ট'-এর মধ্য দিয়ে। এখন দর-কষাকষি ব্যবস্থা নেমে এসেছে কোম্পানি বা কারখানা স্তরে। নতুন ব্যবস্থায় ব্যক্তি শ্রমিককে অধিকার দেওয়া হয়েছে নিজ দাবী নিয়ে দর-কষাকষি করার। ফলে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব প্রচণ্ড পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য-হার বিশ শতাংশ কমে গেছে।

জাপানের শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রথাগত ইউরোপীয় ধাঁচে বিকশিত হয়নি। সর্বাধুনিক

যে উৎপাদনের চরিত্র—'জাস্ট-ইন-টাইম' ও 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট'—তা' প্রধানত জাপানী প্রথা। স্বভাবতই জাপানের শ্রম-প্রক্রিয়া সর্বাধুনিক ও বহন করছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই শ্রম-প্রক্রিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীকে স্বেচ্ছায় যুক্ত করতে জাপানী ট্রেড ইউনিয়নগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এখানে বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন 'রেনগো' সংস্কারবাদী কেবল নয়, মালিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী। ১৯৭৪ সালে বিশ্বব্যাপী তৈল সংকটের পটভূমিকাতে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি সরকার ও মালিকশ্রেণীর সাথে সহযোগিতা শুরু করে উৎপাদনের খরচ কমানোর জন্য। তার ফলে শ্রমিকদের মজুরি দাঁড়ায় ইউরোপের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরে। এখনও জাপানে সারা বছরে একজন শ্রমিককে উন্নত দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ শ্রম-ঘন্টা কাজ করতে হয়। ট্রেড ইউনিয়নের এই ভূমিকার ফলে জমায়েতের ক্ষমতা ও প্রভাব কমতে থাকে। ১৯৫০ সালে ইউনিয়নভুক্তির হার যেখানে ছিল ৫০ শতাংশ, ১৯৯১ সালে তা' কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশে। জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগঠন—'জেনরোরেন' বামপন্থী মনোভাবাপন্ন এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কিছুটা সংঘর্ষের মধ্যে রয়েছে। এরা দেশে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগেও রয়েছে। এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য গড়ার যে প্রচেষ্টা চলছে, তাতেও সংগঠনটি অন্যতম ভাগীদার। কিন্তু 'রেনগো'র সদস্যসংখ্যা এককভাবে ৭.৬ মিলিয়ন এবং তা' মোট ট্রেড ইউনিয়নভুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ। ফলে শ্রমিক আন্দোলন প্রধানত সংস্কারবাদী ধারায় পরিচালিত। জাপানে কোম্পানি স্তরে মোট ইউনিয়নের সংখ্যা ৭৫,০০০, যেগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে পূর্বোক্ত ফেডারেশনগুলির অন্তর্ভুক্ত। এগুলিকে বলা হয় 'তানসস্'। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান স্তরে শ্রমিকদের বার্ষিক দাবী কি হবে তা' নিয়ে তিনটি ফেডারেশন একমত হয়ে কর্মসূচী নেয়, যাকে বলা হয় 'স্প্রিং অফেনসিভ' বা 'সুনতো'। বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্বাধুনিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও জাপানী সমাজ কঠোরভাবে পিতৃতান্ত্রিক ও বহুলাংশে গোঁড়া। ফলে তার প্রভাব রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নেও; যে কারণে দেখা যায় যে, জাপানের নারী শ্রমিকরা, ইউরোপের তুলনায়, ট্রেড ইউনিয়নে কম নাম লেখায়।

অস্ট্রেলিয়াতে কাঠামোগত সংস্কার ব্যাপক রূপ পেয়েছে। এখানেও ইউনিয়ন সদস্য-হার ক্রমাগত কমছে। সদস্য-হার কমে যাওয়ার কারণ, ইউনিয়নগুলির মতে, কাঠামোগত সংস্কার। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ইউনিয়নগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, শ্রমিকদের স্বেচ্ছা-সমর্থন ছাড়াই সেগুলি কাজ করে যেতে পারে। কেননা শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন করার বিষয়টি সেখানে কার্যত অপরিচিত প্রসঙ্গ। ব্যাপক সংখ্যায় ইউনিয়ন সেখানে থাকার জন্য সম্প্রতি সেগুলিকে ২০টি বৃহৎ শিল্প ইউনিয়নের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রায় সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্কারবাদী হওয়া সত্ত্বেও, সম্প্রতিকালে একটি দিক লক্ষণীয়। বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে দেশীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়াও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যোগযোগ স্থাপন ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ার কিছু ট্রেড ইউনিয়ন উৎসাহী ও তৎপর। এখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীরাও সক্রিয় সহযোগিতা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিগত তিন দশক ধরে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যের হার ক্রমাগত কমছে। ১৯৮৯ সালে ৩০ শতাংশ থেকে এই হার ১৫ শতাংশের নীচে নেমে গেছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির অন্যতম সমর্থনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী বিল ক্লিন্টন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও, এটা ঘটনা যে আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী কোন বাড়তি সুবিধাতো পায়ই নি, বরং ছাঁটাই ইত্যাদি বাড়ছে। তার ফলে, সদস্য-হার কমে যাচ্ছে এবং সমানুপাতে টি.ইউ.গুলির রাজনৈতিক প্রভাবও কমছে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সীমাবদ্ধ করে নতুন কিছু আইন, মালিকশ্রেণীর নানাবিধ তৎপরতা বিশেষত ধর্মঘট করলে ছাঁটাই ও নতুন নিয়োগ, ইউনিয়ন ভাঙ্গার জন্য সমস্ত-রকম চেষ্টা, শিল্পসংস্থা অ-ইউনিয়ন এলাকায় বা অন্য দেশে স্থানান্তর, সর্বাধুনিক ও নব নব চরিত্রের শিল্প উৎপাদন প্রণালীর প্রয়োগ, বিশাল বিশাল পুরানো কারখানা (বিশেষত অটোমোবাইল শিল্প) পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া, অজস্র ধরনের শ্রম-কাঠামো, সমাজ-মানসের বিচিত্র ও অংশত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, আন্দোলনহীন আনুষ্ঠানিকতা-সর্বস্ব ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ ইত্যাদির প্রভাব ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি ক্ষয়ের পেছনে কারণ হিসাবে তো

রয়েছেই, সর্বোপরি আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে অনুষ্ঠিত 'নর্থ আটলান্টিক ফ্রী ট্রেড এগ্রিমেন্ট' বা 'নাফটা' চুক্তি ও ব্যবস্থা সাংঘাতিক আঘাত করেছে আমেরিকান শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে। বহুজাতিক সংস্থাগুলির এতে প্রভূত লাভ হলেও, আমেরিকার উৎপাদন বেশি বেশি করে পার্শ্ববর্তী দেশ দু'টিতে চালান হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাই প্রচণ্ডভাবে সংকুচিত হতে শুরু করেছে।

কানাডাতে ট্রেড ইউনিয়নে সদস্যভুক্তির গতি আমেরিকা তো বটেই, ও.ই.সি.ডি.ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বিপরীত। সদস্য-হার কমে যাওয়ার পরিবর্তে এখানে ধীরে ধীরে তা' বেড়ে চলেছে। মধ্য-ষাটের দশক পর্যন্ত কানাডার ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত সদস্যদের ৬০ শতাংশ, আমেরিকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ছিল। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রের মত, ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়েও আমেরিকার উপর নির্ভরশীলতার বিষয়ে সুপ্ত বিরুদ্ধ মনোভাব ক্রমে নতুন পথ নিতে থাকে। শ্রমিকরা ছাড়তে শুরু করে পূর্বোক্ত আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্যপদ। এই প্রক্রিয়ায় বেড়ে উঠতে থাকে স্বদেশীয় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যভুক্তি। তবে ৯০-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে ফরাসী-ভাষী কুইবেক প্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়নের সামনেও এখন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কুইবেকে গড়ে উঠছে স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন যেগুলি কানাডার মূল ট্রেড ইউনিয়নগুলির থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে।

প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থা

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ও পুঁজিবাদী পথ গ্রহণের পর রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে আকস্মিক পরিবর্তন ও সংঘাত স্বভাবতই ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও প্রবল প্রভাব ফেলেছে এবং নতুন প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কালে ঐ দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নের সর্বব্যাপক ও সুবিশাল ভূমিকা ছিল। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে উৎপাদনের ও বন্টনের ক্ষেত্রে সরকার, মালিকশ্রেণী, পরিকল্পক, ব্যবস্থাপক প্রভৃতি অংশের ভূমিকার এক ধরনের সমন্বয়ের অন্যতম রূপ ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি। তখন মজুরি, নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে ভূমিকা পালন ছাড়াও, কারখানার স্তরে উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় ট্রেড ইউনিয়নের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের জন্য আবাস, ভ্রমণ-নিবাস ইত্যাদি নির্মাণ ও বন্টন করতো, বন্টন করতো ভোগ্যপণ্য ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, এমনকি খাদ্যসামগ্রীও। বর্তমান পরিবর্তনের ফলে সেই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 'প্লুরালিজম' বা বহুত্ববাদিতা এখন ব্যাপক আকারে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থায় এক্ষেত্রে প্রবণতাটিকে দু'টি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত 'রিফর্মড ট্রেড ইউনিয়ন' বা সংস্কার-কৃত ট্রেড ইউনিয়ন। অতীতের পরম্পরাগত ট্রেড ইউনিয়নগুলি নতুন পরিস্থিতি এবং অতীতের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভূত পরিবর্তন করে, নব-কলেবরে আবির্ভূত হয়েছে। দ্বিতীয় ধারা হলো 'অল্টারনেটিভ ট্রেড ইউনিয়ন' বা বিকল্প ট্রেড ইউনিয়ন। এগুলি হলো 'বিকল্প'-র নামে পুঁজিবাদী দেশের সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নের নকলনবিশি। এই অল্টারনেটিভ ট্রেড ইউনিয়নের ধারণা প্রধানত শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, পুরানো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশেষটুকুর বিলোপসাধন ও সোস্যালিস্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে। প্রকৃতপক্ষে, অতীত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, তথাকথিত 'রিফর্মড ট্রেড ইউনিয়ন'গুলি অথবা বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের পতাকাবাহী 'অল্টারনেটিভ ট্রেড ইউনিয়ন'গুলির কেউই এখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। যদিও অতীতের ধারা বজায় রেখে প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এখনও (১৯৯২) ট্রেড ইউনিয়ন-ঘনত্ব গড়ে ৯০ শতাংশের বেশি। পুঁজিবাদী দেশের 'উদার গণতন্ত্রে' ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেখানে ৫০ শতাংশ শ্রমজীবীকে আকৃষ্ট করতে পারছে না, বিপর্যয়ের মধ্যেও মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী তাদের নিজেদের সংগঠনকে এখনও পরিত্যাগ করেনি। তবে ব্যাপক বেকারী বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিশেষত নারীদের মধ্যে, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যভুক্তি কমছে। অতীতে সমাজতান্ত্রিক দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে নারীরা সংখ্যায় বিপুল,

সর্বোচ্চ ও ব্যাপকভাবে থাকলেও এখন সেই সংখ্যা যৎসামান্য বললেই চলে। এখন একটি নতুন প্রবণতাও এইসব দেশের শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যায়, যা অতীতে ছিল না। তা' হলো শ্রমিকদের দ্বৈত-সদস্যপদ অর্থাৎ একাধিক ইউনিয়নের সদস্য হওয়া।

এইসব দেশের উৎপাদনে পুঁজিবাদী দেশের মত ব্যবস্থাপকদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ শুরু হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের অতীত অধিকার ব্যাপকভাবে খর্ব হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে রাষ্ট্র, ব্যবস্থাপক ও ট্রেড ইউনিয়ন—এদের ত্রিপাক্ষিক সম্পর্ক এখনও সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়নি। ফলে বিভ্রান্তি যেমন আছে, নানা সমস্যাও তৈরি হচ্ছে। অতীতের পদ্ধতির পরিবর্তে দর-কষাকষি ও চুক্তির স্তরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে 'এন্টারপ্রাইজ' বা কারখানার স্তরে। ফলে মজুরিসহ শিল্পভিত্তিক সমস্ত ব্যবস্থার সমতা ভেঙ্গে পড়ছে, খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ছে শিল্প-ভিত্তিক শ্রমিকদের ঐক্যও। শ্রমিকদের পক্ষে কোন ইউনিয়ন দর-কষাকষি ও চুক্তি করবে, তা' নিয়েও গড়ে উঠছে বিরোধ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে রেষারেষি। অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন দাবী তুলেছে যে শ্রম-সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড লেবার অরগানাইজেশনের (আই. এল. ও.) ৮৭নং কনভেনশনের ব্যাখ্যা স্পষ্টীকরণ করতে হবে।

পরিস্থিতির এই পটভূমিকাতে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলির বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করা যাক।

পোল্যাণ্ডে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটানোর পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল লেচ ওয়ালেসার 'সলিডারিটি' ট্রেড ইউনিয়ন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর এটির সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ মিলিয়নে। কিন্তু দ্রুতই এটির শক্তি ক্ষয় হতে থাকে এবং ১৯৯২-তে দাঁড়ায় ১.৮ মিলিয়নে। অন্যদিকে দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কালের ট্রেড ইউনিয়ন 'সি. আর. জেড. জেড.' নাম পরিবর্তন করে 'ও. সি. জেড. জেড.' ('কনসেনসাস' বা সহমত) নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে। এটির সদস্য সংখ্যা ৫ মিলিয়ন। ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালের প্রথমার্ধে দেশে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন 'এম. জেড. ও. টি.' মধ্য-আশির দশক থেকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তথাকথিত স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিল। মার্চ '৯০-তে এটির নাম হয় 'এম. এস. জেড. ও. এম. জেড.'। কিন্তু এত সব করা সত্ত্বেও এটি শ্রমিকদের সংগঠনের মধ্যে ধরে রাখতে পারেনি। এটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় 'রিফর্মড' ইউনিয়ন 'কনফেডারেশন অব অটোনমাস ট্রেড ইউনিয়নস' (এ. এস. জেড. ও. কে.) গঠিত হয়েছে। তাছাড়া 'বিকল্প' ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে 'ডেমোক্র্যাটিক লীগ অব ট্রেড ইউনিয়নস', যার সদস্য-সংখ্যা ৩ লক্ষ; অপর 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স কাউন্সিলস'—সদস্য-সংখ্যা ১.০৫ লক্ষ, প্রভৃতি (১৯৯২)।

চেকোশ্লোভাকিয়াতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে প্রাক্তন ট্রেড ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'চেকোশ্লোভাক কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস' (সি. ও. এস. বা 'কস')। ১৯৯১ সালে এটির সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬ মিলিয়ন। তারপর চেক (বোহেমিয়া-মোরাভিয়া) এবং শ্লোভাক নামে দুটি স্বতন্ত্র দেশ গঠিত হওয়ার পর সংগঠনটি খাড়াখাড়ি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় স্তরে উভয় দেশের সংগঠন দু'টি শিথিল একটি ফেডারেশন হিসাবে কাজ করে। অঞ্চল, ক্ষেত্র, কারখানা-ভিত্তিক এখন অজস্র সংগঠন গড়ে উঠেছে। দর-কষাকষি ও চুক্তির কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও কাঠামো গড়ে না উঠলেও, এইসব কাজ কেন্দ্রীভূত হয়েছে 'এন্টারপ্রাইজ' স্তরে।

রোমানিয়ায় পূর্বতন পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর মূল ট্রেড ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয় এবং 'রিফর্মড' সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে 'ন্যাশনাল ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন অব রোমানিয়া' (সি. এন. এম. এল. আর.)। কিন্তু এই পুনর্গঠনের ফলে সংগঠনের পূর্বের ৫ মিলিয়ন সদস্য-সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩ মিলিয়নে। 'বিকল্প' সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে 'ফ্রাতিয়া' ('ফ্রাটারনিটি' বা সৌভ্রাতৃত্ব), যেটির সদস্য-সংখ্যা ৬ লক্ষ। নভেম্বর '৯১-তে গড়ে ওঠে আর একটি সংগঠন—আলফা কার্টেল। এই তিনটি সংগঠন মিলে প্রাক্তন ট্রেড ইউনিয়নের সমস্ত সম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে, অন্যদিকে তৈরি

করেছে 'কনভেনশন অব সলিডারিটি অব ট্রেড ইউনিয়নস'। এরা দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে প্রদর্শনমূলক (ডেমনস্ট্রেটিভ) যৌথ আন্দোলনও সংগঠিত করে। এর বাইরেও আরও দু'টি শক্তিশালী সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে 'এলিয়াঙ্গা' ('অ্যালায়েন্স' বা মৈত্রী) যার সদস্য-সংখ্যা ১.৮ মিলিয়ন এবং 'ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ব্লক' (বি. এন. এম.)।

বালগেরিয়াতে প্রাক্তন ট্রেড ইউনিয়নের অবসান ঘটিয়ে 'রিফর্মড' সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে 'কনফেডারেশন অব ইণ্ডিপেনডেন্ট ট্রেড ইউনিয়নস' (সি. আই. টি. ইউ. বি.) এবং 'অল্টারনেটিভ' দৃষ্টিভঙ্গির টি. ইউ. হিসাবে 'পড্‌ক্রেপা' (সাপোর্ট বা সমর্থন)। প্রাক্তন ট্রেড ইউনিয়নের সম্পত্তি নতুন সরকারের কাছ থেকে দখল নেবার জন্য এরা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং আই. এল. ও.-র কাছে অভিযোগ জানায়। এই সুযোগ গ্রহণে অংশীদার হতে না পারার জন্য আর একটি সংগঠন তৈরি হয়—'এন. টি. ইউ.—পসক্রেপা'। কিন্তু ২ লক্ষর কম সদস্য থাকায় তারা এখনও স্বীকৃতি পায়নি সরকারের।

আলবেনিয়াতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের বিলোপের পর গড়ে উঠেছে 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়ন অব আলবেনিয়া'। শ্রমিকদের মধ্যে এই সংগঠনের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব আদৌ তৈরি হয়নি। পরবর্তীকালে, নির্বাচনে ক্ষমতা দখলকারী রাজনৈতিক দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থনপুষ্ট হয়ে পাশাপাশি গড়ে উঠেছে 'ইউনিয়ন অব ইন্ডিপেনডেন্ট ট্রেড ইউনিয়নস অব আলবানিয়া' (বি. এম. পি. এম. এইচ.) নামে আর একটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন।

এস্তোনিয়াতে অতীতের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর গড়ে উঠেছে 'কনফেডারেশন অব এস্তোনিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস' (ই. এ. কে. এল.)। দল-নিরপেক্ষ হিসাবে এরা নিজেদের দাবী করে। তাছাড়াও দেশে ৩৪টি ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন রয়েছে। কিন্তু এগুলির সম্মিলিত সদস্য-সংখ্যা সমাজতন্ত্রের কালের চেয়ে ৮ লক্ষ কম।

লাটভিয়ার অতীতের 'রিপাবলিকান ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল' পুনর্গঠিত হয়েছে 'ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন অব লাটভিয়া' (এল. বি. এ. এস.) নামে। তাছাড়াও রয়েছে ২ লক্ষ সদস্য-বিশিষ্ট 'লাটভিয়ান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। শ্রমিকদের স্বার্থ দেখার পরিবর্তে ট্রেড ইউনিয়ন দু'টির প্রধান কাজ হলো নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করা।

লিথুয়ানিয়াতে গড়ে উঠছে 'কনফেডারেশন অব ফ্রি লিথুয়ানিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস' যেটির সদস্য সংখ্যা ৫ লক্ষ ও 'লিথুয়ানিয়ান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'—যেটিতে রয়েছে ১.৫ লক্ষ সদস্য। তাছাড়া এখন বহু স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠছে। কিন্তু সদস্যভুক্তি সমাজতান্ত্রিক কালের তুলনায় এখনও অনেকটাই কম।

কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস অব রাশিয়াতে, যা অতীতে পরিচিত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন হিসাবে, অজস্র ট্রেড ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কালে, পৃথিবীর দেশ-ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ছিল 'এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ.'। ১৯৯০ সালে এটি রূপান্তরিত হয় 'জেনারেল কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস' (জি. সি. টি. ইউ.)-এ। কিন্তু তাতেও ভাঙ্গন ঠেকানো যায়নি। কেননা শেষোক্তটির জন্মের আগেই ১৯৮৯ সালে গড়ে উঠেছিল 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইনার্স ট্রেড ইউনিয়ন'। খণ্ড খণ্ড স্বাধীন দেশ গঠিত হবার পর সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে থাকে। ফলে জে.সি.টি. ইউ-এরও অবসান ঘটে যায়, গড়ে ওঠে 'ফেডারেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন অব রাশিয়া' (ফিটুর বা এফ. আই. টি. ইউ. আর.)। এপ্রিল, ১৯৯২ সালে ৭টি স্বাধীন দেশের (রাশিয়া সহ কিন্তু ইউক্রেন বাদে) জতীয় স্তরের কেন্দ্রীয় সংগঠন এবং ৩৮টি শিল্পভিত্তিক ইউনিয়ন নিয়ে গড়ে ওঠে এক নতুন আন্তর্জাতিক জে. সি. টি. ইউ.। ফিটুর-এর ৩৬টি অনুমোদিত সংগঠন রয়েছে। 'বিকল্প' ট্রেড ইউনিয়নগুলি ৭টি স্বাধীন রাষ্ট্রে একই ধরনের সংগঠন গড়ে তুলেছে। আন্তঃ ক্ষেত্র-ভিত্তিক শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এক ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি হয়েছে—অ্যাসোসিয়েশন অব সোস্যালিস্ট ট্রেড ইউনিয়নস (এস. ও. টি. এস. পি. আর. ও. এফ. বা সটসপ্রফ)। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠিত

হওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স ফ্রন্ট'। কয়লাখনির শ্রমিকদের 'কনফেডারেশন অব লেবার', রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির 'কালেক্টিভ'গুলি নিয়ে 'ইউনিয়ন অব লেবার কালেক্টিভস' প্রভৃতি। সারা দেশে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার জন্য এখনও পর্যন্ত কোন অংশের ট্রেড ইউনিয়নই শ্রমিকদের ব্যাপক অংশের আস্থা অর্জন করতে পারেনি।

ইউক্রেনে 'রিফর্মড' ট্রেড ইউনিয়ন 'এফ. এন. টি. ইউ.' এখনও পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং 'কমনওলেথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস'-এর কেন্দ্রীয় সংগঠন জে. সি. টি. ইউ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'অল্টারনেটিভ' সংগঠন 'জি. ও. এস. টি.' বা 'জোস্ট' জাতীয়তাবাদী উদীয়মান আন্দোলনের সাথে রয়েছে। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন অংশের শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট চালিয়ে অনেকগুলি স্বাধীন ইউনিয়ন তার প্রভাবকে বিস্তার ও সংহত করতে পেরেছে। 'সটস্‌প্রফ'-এর একটি 'ইউক্রেনিয়ান ফেডারেশন'ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান ট্রেড ইউনিয়নগুলির পরিস্থিতি

লাতিন আমেরিকার এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ-পৃষ্ঠপোষিত স্বৈরতান্ত্রিক অথবা সামরিক একনায়কত্বের সরকারের বিরুদ্ধে তিন দশকের বেশি সময় ধরে প্রবল সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই কঠিন লড়াইয়ে আত্মদান করেছিল ট্রেড ইউনিয়নের শত শত নেতা, সংগঠন কর্মী ও শ্রমিক। কিন্তু এত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ট্রেড ইউনিয়ন প্রকাশ্য বা বেআইনিভাবে কেবল টিকে থাকেনি, বেড়েছিল। লাতিন আমেরিকার উল্লেখযোগ্য অংশের ট্রেড ইউনিয়ন ছিল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং বামপন্থী বিভিন্ন ধারার অনুগামী। ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে অব্যাহত মতাদর্শগত বিতর্ক এই অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়নগুলির ছিল এক উল্লেখযোগ্য উপাদান। এইসব দেশের শ্রম-সম্পর্ক ছিল দারুণ রাজনীতি-সম্পৃক্ত। সরকারগুলি, শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক না কেন, শ্রম-সম্পর্কের বিষয়ে প্রায়শ প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নও মৈত্রী বা সমঝোতা তৈরি করেছে রাজনৈতিক দলের সাথে। যেসব দেশে জোটবদ্ধ রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করেছে, তার কোথাও কোথাও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা সরকারে যোগ দিয়েছে বা সরকারের উপর প্রভাব ফেলেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে আর্জেন্টিনাতে পেরনবাদী দলে ট্রেড ইউনিয়নের দীর্ঘকাল প্রভাব ছিল। কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনের আন্দোলনগত প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করেছে ট্রেড ইউনিয়ন। একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, পেরু ও উরুগুয়েতে ট্রেড-ইউনিয়নের ভূমিকা স্মরণীয়।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও ব্যাপক পরিবর্তনগুলি লাতিন আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরে গভীর আবর্তের মধ্যে ফেলেছে। এর প্রধান দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমত, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্বায়ন, তার অভ্যন্তরে বিশেষত অর্থনীতির উদারীকরণ ও মুক্ত-বাজার অর্থনীতি, কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেওয়ার ফলে, শ্রম-সম্পর্কের ব্যাপারে সরকারগুলি অতীতের সক্রিয় ভূমিকা থেকে এখন হাত গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে। আক্রান্ত হতে শুরু করেছে শ্রমিকশ্রেণী-অর্জিত অধিকারগুলি। তাছাড়া কল-কারখানা বন্ধ হওয়া, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণ, বহুজাতিক সংস্থার ব্যাপক অনুপ্রবেশ এবং শিল্প-ব্যবস্থা ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে নব নব উপাদান দ্রুত প্রযুক্ত হওয়া প্রভৃতির ফলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব, ক্ষমতা ও অধিকার দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর এবং চীন কর্তৃক বাজারী সমাজতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করার দরুন ট্রেড ইউনিয়নের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারা পড়েছে নিদারুণ বিভ্রান্তির মধ্যে। তাছাড়া সম্প্রতিকালে মালিকদের পৃষ্ঠপোষিত ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা একদিকে ও জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অন্যদিকে—উভয়ের বিরুদ্ধে তথাকথিত মধ্যপন্থী সংগঠন ও আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছে—'সলিডারিস্‌মো'। লাতিন আমেরিকার সরকারগুলি নতুন শ্রম-আইন প্রণয়ন ও ত্রি-পাক্ষিক চুক্তির উপর জোর দিয়েছে এবং শিল্পে শান্তি বজায় রাখার জন্য

ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে 'কনসার্টেসিওন সোসিয়াল' বা সামাজিক চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। তবে এই অঞ্চলের দেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের উপর মালিকশ্রেণী ও সরকার আক্রমণ করা থেকে খুব একটা পিছিয়ে যায়নি। ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাকে কেবলমাত্র মজুরি ও বিরোধ-সমাধানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা— 'রেগলামেন্টারিশমো'— এখন শুরু হয়েছে নতুনভাবে। অধিকাংশ লাতিন আমেরিকান দেশে ধর্মঘট বেআইনি করা হয়েছে। কোন সংগঠন শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিত্ব করলেও সেটিকে স্বীকৃতি দেওয়া বা প্রত্যাহার করার অধিকার মালিকপক্ষের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতাও রয়েছে অনেকগুলি সরকারের।

আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ব্যতিরেকে অধিকাংশ দেশে শ্রমিকদের নিয়ে সমগ্র কারখানা-ভিত্তিক, এমনকি একই কারখানার খণ্ড খণ্ড অংশের ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ফলে কোন কোন দেশে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সহস্র সহস্র। ট্রেড ইউনিয়নের এই খণ্ড খণ্ড দশা তৈরি হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত। তার ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে অনৈক্য ও রেষারেষির পরিবেশ ছাড়াও, বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে এখন তৈরি হচ্ছে গভীর সমস্যা। কেবলমাত্র কিউবা, বলিভিয়া ও উরুগুয়ে এর ব্যতিক্রম। এইসব দেশে একটি করে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রয়েছে। কিউবাতে এই সংগঠনের নাম 'ওয়ার্কার্স সেন্ট্রাল ইউনিয়ন অব কিউবা' (সি. টি. সি.), বলিভিয়াতে 'বলিভিয়ান ওয়ার্কার্স সেন্ট্রাল ইউনিয়ন' (সি. ও. বি.) এবং উরুগুয়েতে 'ইন্টার-ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাসেম্বলি ওয়ার্কার্স' ন্যাশনাল কনভেনশন' (পি. আই. টি.— সি. এন. টি.)। আর্জেন্টিনাতেও একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন রয়েছে— 'জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার' (সি. জি. টি.), কিন্তু এটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ এবং এখন প্রায় অকার্যকর।

লাতিন আমেরিকাতে শ্রম-শক্তির সংখ্যার মোট ২০ শতাংশ ইউনিয়নভুক্ত—৪০ মিলিয়ন (১৯৯২)। তবে সদস্যভুক্তির বাইরেও সংগঠনের অনেকটা প্রভাব রয়েছে। শ্রমশক্তির ৫০ শতাংশ আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ করে। সমাজতান্ত্রিক কিউবাতে ইউনিয়নভুক্তির হার ৯৫ শতাংশের বেশি। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলিতে এই হার কেবল কম নয়—ব্যাপকভাবে পার্থক্যমূলকও। নিম্ন সারণী থেকে এটি বোঝা যাবে ঃ

সদস্য-ঘনত্বের হার (শতাংশে)	দেশের নাম
২০-৪০	আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ও ভেনেজুয়েলা
১০-২০	কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, চিলি, পানামা ও পেরু
১০-এর কম	বাকি সমস্ত দেশগুলি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সীমান্তে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে ম্যাকুইলাডোরা প্রথায় কর্মরত ৪০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ১০% ইউনিয়নভুক্ত। লাতিন আমেরিকাতে নারী শ্রমিকদের ইউনিয়ন-ভুক্তির হার ৩২ ভাগ, কিন্তু ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের মধ্যে তাদের প্রতিনিধিত্ব ৩ শতাংশ মাত্র;আর জাতীয় স্তরের নেতৃত্বে নারী প্রতিনিধিত্ব ১ শতাংশের মত। নারীদের প্রসঙ্গ ক্রমশ দাবী-দাওয়াতে যুক্ত হওয়ার ফলে, শ্রমিকা-সদস্যভুক্তি বাড়ছে। এই প্রবণতা বিশেষত লক্ষণীয় ব্রাজিল, কলম্বিয়া, এল সালভাডোর, গুয়াতেমালা, নিকারাগুয়া ও প্যারাগুয়েতে।

দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড চরিত্রের ট্রেড ইউনিয়নগুলির অবসান ঘটিয়ে সুবৃহৎ সংগঠন গড়ার প্রবণতা কোন কোন দেশে সম্প্রতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন কোস্টারিকাতে 'ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (সি. এ. ডি. টি.) এবং 'কোস্টারিকান কনফেডারেশন অব ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স' (সি. সি. ডি. টি.)

মিলিত হয়ে গঠন করেছে (১৯৯০) 'রেরাম নভারাম ওয়ার্কার্স কনফেডারেশন' (সি. টি. আর. এস.)। কলম্বিয়াতে 'জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার' (জি. সি. টি.) ও 'কনফেডারেশন অব ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স অব কলম্বিয়া' (সি. টি. ডি. সি.) মিলিত হয়ে (১৯৯২) গড়ে তুলেছে 'ডেমোক্র্যাটিক জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার' (সি. জি. টি. ডি)। ডোমিনিকান রিপাব্লিকে চারটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন মিলিত হয়ে গঠন করেছে (১৯৯২) 'ইউনিটারি কনফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স'।

নিকারাগুয়াতে অতীতের ১৩৩টি ইউনিয়ন ও ৫ শতাংশ সদস্যভুক্তির হার (সান্দিনিস্তা বিপ্লবের সময়ে, ১৯৮৪) বেড়ে ১১০০টি সংখ্যক ইউনিয়নে এবং সদস্যভুক্তি ৫৫ শতাংশে পৌঁছেছিল।পরবর্তীকালে ৯০ শতাংশ ইউনিয়ন মিলিত হয়ে গঠন করেছিল ছয়টি এফ. এস. এল. এন. কনফেডারেশন। নির্বাচনে সান্দিনিস্তা সরকারের পরাজয়ের পর আন্তর্জাতিক পুঁজির সমর্থনপুষ্ট নতুন সরকারের অনুগামী তিনটি সংগঠন গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো 'পার্মানেন্ট ওয়ার্কার্স কংগ্রেস' (সি. ও. পি. টি.)।

সমগ্র লাতিন আমেরিকায় অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। এর অন্যতম কারণ হলো সদস্য চাঁদার হার অত্যন্ত নিম্ন। যেসব দেশের সংগঠন তুলনামূলক উচ্চহারে চাঁদা গ্রহণ করে সেখানকার সংগঠনগুলি অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেগুলির অন্যতম হলো আর্জেন্টিনার 'সি. জি. টি.', চিলির 'ইউনিফায়েড ওয়ার্কার্স সেন্টার' (সি. ইউ. টি.), ইকুয়েডরের 'ইকুয়েডরিয়ান কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন অরগানাইজেশনস' (সি. ই. ও. এস. এল.), মেক্সিকোর 'কনফেডারেশন অব মেক্সিকান ওয়ার্কার্স' (সি. টি. এস.), ভেনেজুয়েলার 'কনফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স অব ভেনেজুয়েলা' (সি. টি. ডি.)। ব্রাজিলে ট্রেড ইউনিয়নগুলির অর্থের যোগান আসে প্রত্যেক শ্রমিকের বেতন থেকে—একদিনের মজুরি বাধ্যতামূলকভাবে কেটে নেওয়ার মাধ্যমে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'ইম্‌পোস্টো সিন্ডিক্যাল' বা ট্রেড ইউনিয়ন ট্যাক্স। তবে সম্প্রতি প্রধান প্রধান সংগঠনগুলি এই ব্যবস্থার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

লাতিন আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নসমূহ প্রচলিত সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালানোর পাশাপাশি, নতুন পরিস্থিতিতে, ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নিয়ে ব্যাপক অভ্যন্তরীণ বিতর্ক ও তৎপরতা শুরু করেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে বিতর্ক তো আছেই। তাছাড়া লাতিন আমেরিকার নিজস্ব বাস্তবতায় বিপ্লবী শ্রমিক সংগ্রাম গড়ে তোলার বিষয়ে অতীত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়েও নতুন বিতর্ক চলছে। ইউরোপের এবং পাশ্চাত্যের অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পথ গ্রহণ করায়, শ্রেণী-আন্দোলন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভ্রান্তি বাড়ছে লাতিন আমেরিকাতেও। পাশাপাশি তথাকথিত নানা ধরনের নয়া বাম প্রবণতা, পোস্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম, পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম পোস্ট-মডার্নিজম ইত্যাদি তত্ত্বের প্রভাবও বাড়ছে। প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে সরকার-পৃষ্ঠপোষিত বুর্জোয়া মতাদর্শভিত্তিক অর্থনীতিবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলিও। কিন্তু এত সব স্রোত-প্রতিস্রোতের মধ্যে লাতিন আমেরিকার শ্রমজীবী জনগণের এবং ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সুদীর্ঘকালীন শোষণের তিক্ত রেশ এখনও তীব্র। তা' প্রতিফলিত হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থার, (বিশেষত আমেরিকান) বিরুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এইরকম নতুন পরিস্থিতিতে সরকারের সাথে সম্পর্ক, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বাধীন ও স্বকীয় সত্তা প্রতিষ্ঠার নতুন পথই বা কি হবে, তা' নিয়ে চলছে ব্যাপক বিতর্ক।

শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে প্রথাগত ধারণারও মূল্যায়ন শুরু করেছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। অতীতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কেবল মজুরিভোগী কায়িক শ্রমিকদের বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে এসেছে। কিন্তু শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমক্ষীয়মাণ, নানা ধরনের শ্রমজীবীদের আবির্ভাব ঘটছে। সুতরাং অর্থনীতির নতুন সমস্ত ক্ষেত্র, অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র, পেশাদার, এমনকি অবসরপ্রাপ্তদেরও সংগঠিত করা এবং তার মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এখন অনুভূত হচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি মনে করছে যে নতুন অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রক্রিয়াতে নিজেদের

উপযুক্ত অবস্থান স্থির করে নিতে হবে। নয়া-প্রযুক্তির দ্রুত ও ব্যাপক প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে রক্ষণাত্মক ভূমিকা থেকে শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষাকারী ভূমিকা সজোরে প্রতিপালন করা দরকার। লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সম্মিলিত দুই প্রতিষ্ঠান—'ইন্টার-আমেরিকান রিজিওনাল অরগানাইজেশনস' (ও. আর. আই. বি.) এবং 'ল্যাটিন আমেরিকান সেন্টার অব ওয়ার্কার্স' (সি. এস. এ. টি.)-এর 'ল্যাটিন আমেরিকান ওয়ার্কার্স কাউন্সিল'-এর ২২তম ও ২৩তম কংগ্রেসে এইসব বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে (১৯৯৩)।

ট্রেড ইউনিয়ন এখন সক্রিয় হচ্ছে বিভিন্ন নতুন প্রসঙ্গ নিয়েও, বিশেষত পরিবেশ। ইকুয়েডরের সি. ই. ও. এস. এল. 'আমাজনিয়ান এনভারনমেন্টাল অবজারভেটরি'তে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। ব্রাজিলের তিনটি বৃহত্তম ফেডারেশন পরিবেশ প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চালানো ছাড়াও, স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে প্রসঙ্গটি নিয়ে নিজেদের কার্যকলাপ নিয়মিত পর্যালোচনার ব্যবস্থা করেছে।

লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ও সংহতিকরণের তৎপরতার দিকটিও ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। আঞ্চলিক এই ধরনের অর্থনৈতিক চুক্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ অ্যাকর্ড অন কার্টাজেনা, দা সেন্ট্রাল আমেরিকান কমন মার্কেট, দা নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন। চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন নিজেদের মধ্যে সমন্বয়কারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যেমন 'অ্যানড্রিয়েন লেবার কাউন্সিল', 'ট্রেড ইউনিয়নস' কো-অর্ডিনেটিং বডি ফর দা সাউথ', 'লাতিন আমেরিকান ইনটিগ্রেশন অ্যাসোসিয়েশন' ইত্যাদি।

আফ্রিকা মহাদেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলির বর্তমান অবস্থা

আফ্রিকার সামান্য দু'চারটি দেশ বাদ দিলে, জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামবাসী, তারা ছোট ছোট জোতের কাজে নিযুক্ত। শহরে শ্রমজীবীরাই কেবল সংগঠিত অংশ। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শ্রম-শক্তির মাত্র ১০ ভাগ নিয়োজিত এবং তাদের সামান্য সংখ্যকই ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত। সংগঠিত অংশের ৬০-৭০ শতাংশ শ্রমজীবী সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কাজ করে। ফলে আফ্রিকাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের প্রধান ভর রয়েছে সরকার ও তার নিয়োজিত অংশের সম্পর্কের উপর। তবে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব নিজস্ব সদস্য-সংখ্যার বাইরেও প্রসারিত। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র মহাদেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলনের প্রক্রিয়া চলেছিল, তাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে বহু দেশে ট্রেড ইউনিয়ন।

সামাজিক পরম্পরা রীতিনীতি ও সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যমূলক রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার জন্য আফ্রিকার শ্রম-অবস্থা প্রবলভাবে কেন্দ্রীভূত। ষাট-এর দশক থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির জাতীয় সরকার ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনগুলিকে একটি বা দু'টি সংগঠনে সংহত করেছিল। বিশাল অংশের শ্রমজীবী, সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও নার্সিং স্টাফদের জাতীয় ফেডারেশনে যোগদান প্রায় সর্বত্রই ছিল নিষিদ্ধ। পরাধীন-কালে গঠিত খণ্ড খণ্ড ইউনিয়নগুলিকে সংহত রূপ দেবার চেষ্টা ছাড়াও, দেশের রাজনৈতিক চরিত্রের প্রয়োজন থেকে প্রধানত এই কাজ করা হয়েছিল। কেননা কিছুকাল আগে পর্যন্ত আফ্রিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রের সরকার ছিল একদলীয়। সুতরাং এইসব সরকার ট্রেড ইউনিয়নের কাছে 'রেসপন্সিবল পার্টিসিপেশন' বা দায়িত্ববদ্ধ অংশগ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করতো ও ব্যবস্থা নিতো। তথাকথিত 'দেশ গঠনে'র উপযোগী লক্ষ্যের ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকার পরিচালনা করা হচ্ছিল ক্যামেরুন, কঙ্গো, গ্যাবন, ঘানা, গিনি, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, মালি, টোগো, তানজানিয়া, জায়রে ও জাম্বিয়াতে। তখন থেকে দেশে দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সরকার বা সরকারী পার্টির সাথে একাকার হয়ে আছে। মিশর, গিনি ও তানজানিয়াতে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল সেদেশের শ্রমমন্ত্রীর পদ পেয়ে থাকেন। একদলীয় সরকার সম্পন্ন ক্যামেরুন, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, গ্যাবন, ঘানা, সিয়েরা লিওন, তানজানিয়া, টোগো, জায়রে ও জাম্বিয়ার পার্লামেন্ট ও জাতীয় স্তরের কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষণের সংস্থান আছে। সত্তর-এর দশকের মধ্যে, কেবলমাত্র বুরকিনা ফাঁসো, গাম্বিয়া, লেসোথো, মাদাগাস্কার, মরিশাস, মরক্কো, সেনেগাল ও দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া

সমস্ত একদলীয় সরকারের দেশে একটি করে জাতীয় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সরকারের সাথে একাত্মতা হয়ে ভূমিকা পালনের চরিত্রের ফলে এই ধরনের ট্রেড ইউনিয়নগুলি কোন আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সাধারণত যুক্ত হয় না।

কিছুটা বিস্ময়কর মনে হলেও সত্য যে অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির উল্লেখযোগ্য অংশ আই. এল. ও.-র কনভেনশনসমূহকে মেনে নিয়েছে এবং তদনুযায়ী বেশ কিছু সরকারী শ্রম-আইন প্রণয়ন করেছে। অথচ কার্যকালে ঐ সমস্ত দেশে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ব্যাপকভাবে খর্ব করা হচ্ছে। ঐক্য ও শিল্পে জাতীয় শান্তির নাম করে ধর্মঘট ও আন্দোলনের উপর চালানো হচ্ছে ব্যাপক দমন-পীড়ন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন রদ ও ইউনিয়ন বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন ঘটেছে ৯০-এর দশকে বেনিন, নাইজেরিয়া, সেচেলেস ও উগাণ্ডাতে। এমনকি স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পরিস্থিতিতেও কোন কোন দেশে সর্বক্ষণের বাধা-নিষেধ রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে সোয়াজিল্যান্ডে পুলিশের অনুমতি দরকার হয় ট্রেড ইউনিয়নের সভা করতে। আলজিরিয়া, বেনিন, ইথিওপিয়া ও ইউনাইটেড রিপাব্লিক অব তানজানিয়াতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নকে 'ম্যাস অরগানাইজেশন' বা গণ-সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পালটা সংগঠন গড়ে তুলে শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে বেশ কিছু দেশে, যেমন বেনিন, লিবিয়ান আরব জামাহিরিয়া, সোয়াজিল্যান্ড, ইউনাইটেড রিপাব্লিক অব তানজানিয়া ও জাম্বিয়া। শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে দেশের আদিম ধরনের এবং দীর্ঘ অতীতে বিলুপ্ত সংগঠনের পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে সেগুলির দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে। যেমন সোয়াজিল্যাণ্ডে 'নাডবাজাবান্টু' নামে আদিম চরিত্রের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী-সংগঠনের পত্তন হয়েছে।

অন্যদিকে একদলীয় সরকারের দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নের অতিকেন্দ্রিকতা-মূলক ব্যবস্থা ও ভূমিকা সংগঠনকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তৃণমূল থেকে; সদস্যদের সাথে সংগঠনের সম্পর্ক নিছক যান্ত্রিক। তার ফলে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ ও মর্যাদা অনুগামীদের মধ্যে বিপুলভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কেননা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নীচুতলার সংগঠন বা সদস্যদের কোন ভূমিকা থাকে না; ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকালে সরকারের স্বার্থের পরিপূরক হয়ে পড়ে। আনুষ্ঠানিক সম্মেলন বা সভা ছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের কাজে সাধারণ সদস্যদের ভূমিকা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই।

১৯৬০ ও '৭০-এর দশকে আফ্রিকার দেশে দেশে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যভুক্তি বেড়েছিল। এটা ঘটেছিল অংশত সরকারের কিছুটা সদিচ্ছা ও জাতীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনে নানাবিধ অনুকূল আইন-কানুন প্রণয়নের ফলে। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সংগঠন-ভুক্তির হার এখনও যথেষ্ট উঁচু। কোটে ডি আইভরি, ঘানা, কেনিয়া, নামিবিয়া, সেনেগাল, সোয়াজিল্যান্ড, তানজানিয়া, টোগো ও জাম্বিয়াতে শিক্ষকদের সংগঠনের সদস্য-হার ৫০ শতাংশের বেশি। যেসব দেশের সরকারী আইনে সরকারী কর্মচারীরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে না, সেসব দেশেও কর্মচারীদের বিভিন্ন অংশ সমবায়মূলক নিজস্ব ইউনিয়ন গঠন করেছে।

আফ্রিকার দেশসমূহে শ্রমিকাদের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যভুক্তির হার গড়ে ৩০ শতাংশের বেশি হলেও, সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বে তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। তবে সিয়েরা লিওন, বৎসওয়ানার 'ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস', গিনি প্রভৃতি দেশে নারী প্রতিনিধিত্বের হার কিছুটা ভাল। বৎসওয়ানা, ঘানা, নামিবিয়া, উগাণ্ডা, জিম্বাবোয়ে ও জাম্বিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলি নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা ও শ্রমে দক্ষ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছে।

বৎসওয়ানা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে বিগত ৭ বছরে (১৯৮৫-১৯৯২) ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যভুক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও অন্যত্র তা' ক্রমশ কমছে। আলজেরিয়াতে শাসকদল এফ. এল. এন.-এর পতনের পর সেখানকার একমাত্র জাতীয় সংগঠন ইউ. জি. টি. এ. নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে।

বেনিনে শাসক দলের অন্যতম শাখা—জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ইউ. এন. এস. বি. টি.—উন্নত শ্রম-সময়ের দাবীতে আন্দোলন শুরু করায় সরকারের বিরাগভাজন হয় এবং সদস্যপদও কমতে থাকে। নতুন দু'টি ইউনিয়নের অভ্যুদয় ঘটেছে সেখানে—"অটোনমাস ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার' (সি. এস. এ.) ও 'পাব্লিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেড ইউনিয়ন কালেক্টিভ (সি. এস. এ. পি)। ক্যামেরুনে শাসকদল থেকে 'অরগানাইজেশন অব ওয়ার্কার্স অব ক্যামেরুন' বিচ্ছিন্ন হয়ে গঠন করেছে 'কনফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স অব ক্যামেরুন' (সি. এস. বি. সি.)। সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাব্লিকে আন্দোলন করার জন্য সেখানকার জাতীয় স্তরের সংগঠন—'ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব সেন্ট্রাল আফ্রিকান ওয়ার্কার্স'কে (ডি.এস.টি.সি.) অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। কঙ্গোর 'কঙ্গোলীজ কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস' বজায় রেখে চলেছে স্বাধীন সত্তা। ১৯৯০ সালে অভ্যুত্থানের পর চাদ-এর পূর্বতন ট্রেড ইউনিয়নকেও অবৈধ ঘোষণা করা হলে, সংগঠনটি 'ইউনিয়ন অব চাদিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন' (ইউ. এস. টি.) নামে আবির্ভূত হয়েছে। যদিও সেখানে আর একটি সংগঠন তৈরি হয়েছে—'ফ্রি ফেডারেশন অব চাদিয়ান ওয়ার্কার্স (সি. এল. টি. টি.)। ইথিওপিয়াতে ১৯৯১ সালে নতুন সরকার ক্ষমতা দখল করে, পূর্বতন সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সহ অবৈধ ঘোষণা করে। তানজানিয়ার 'অরগানাইজেশন তানজানিগান ট্রেড ইউনিয়ন' দীর্ঘ ২৭ বছর সরকারের সাথে সহযোগিতা চালানোর পর ১৯৯১ সালে নিজেদের স্বাধীন হিসাবে ঘোষণা করেছে। টোগোতে প্রাক্তন শাসকদলের অবসানের সাথে সাথে 'ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব টোগোলীজ ওয়ার্কার্স'-এর ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি গড়ে উঠেছে আরও তিনটি সংগঠন—'ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন অব টোগোলীজ ওয়ার্কার্স', 'অটোনমাস ট্রেড ইউনিয়ন গ্রুপ' ও 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রেড ইউনিয়নস অব টোগো'। জায়েরেতে দীর্ঘকাল ধরে শাসকপার্টির সাথে 'ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার'-এর (ইউ. এন. পি. জেড.) গভীর সম্পর্ক থাকলেও, এখন সেখানে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরও প্রায় ৩০টি নতুন সংগঠন গড়ে উঠেছে। জাম্বিয়াতে একদলীয় সরকারের পতন ঘটাতে 'জাম্বিয়ান কংগ্রেস অব ট্রেড ইউনিয়নস' (জেড. সি. টি. ইউ.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। মরিশাস-এ 'ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার' (ইউ. টি. এম.) এপ্রিল ১৯৯১-তে একদলীয় ব্যবস্থা অবসানের দাবীতে সরকারকে চরমপত্র দেবার পর সেখানে গণভোট গ্রহণ করা হয় এবং তারপর বহুদলীয় ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। নাইজার-এর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (ইউ. এস. টি. এন) আশির দশকের শেষার্ধ থেকে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সমগ্র নেতৃত্ব গ্রেপ্তার হয়েছিল এই লড়াই-এর জন্য এবং কঠোর দমন-পীড়নও চলেছিল ধর্মঘটগুলির ওপর। ১৯৯১ সালে, সরকার বহুদলীয় নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। মালি-এর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, এপ্রিল '৯১-তে শাসকদল থেকে নিজেদের বিযুক্ত করে নেয়। তারপর সেখানে ঐতিহাসিক লাগাতার ধর্মঘট চলে সমস্ত শিল্পে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছিল। পরিণামে সরকারের পতন ঘটে। ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অব মালি (ইউ. এন. টি. এম.) অব্যাহত চাপ রাখার ফলে সেখানে বহুদলীয় নির্বাচন স্বীকৃত হয়।

আরব দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়নগুলির অবস্থা

মধ্য-প্রাচ্য তথা আরব দেশসমূহের একটি/ দু'টি দেশ বাদে অধিকাংশ দেশ ধর্মীয় মৌলবাদে গভীর ভাবে নিমজ্জিত। দেশগুলি খনিজ তেলে বিপুলভাবে-সমৃদ্ধ ও আর্থিক দিক থেকে ধনী হওয়া সত্ত্বেও, মুষ্টিমেয় অংশ ছাড়া জনগণের বিপুলতম অংশ দরিদ্র এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ধনবৈষম্য অবিশ্বাস্য ধরনের গভীর। কোন কোন দেশে রয়েছে রাজতন্ত্র বা শেখতন্ত্র-ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। দেশগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে পুঁজিবাদী পথ নেওয়া সত্ত্বেও, সেখানে আদিম পুঁজিবাদের চিহ্নসমূহ পর্যন্ত অনুপস্থিত। এইসব দেশে কৃষি ব্যবস্থা ও শিল্প উৎপাদনও নগণ্য। অন্যদিকে দেশগুলি পশ্চিমি দুনিয়া-নির্ভর, এবং অর্থনীতি ও বহির্বাণিজ্য প্রধানত আমদানি-সর্বস্ব। দেশে যেসব উন্নত শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তার সাথে স্বদেশী শ্রমিকের আত্মগত হওয়ার পরিস্থিতিও অতি নিম্নমানের। অধিকাংশ আরব দেশের শিল্প ও নির্মাণ-মূলক শ্রমে বিদেশাগত শ্রমিকদের, বিশেষত দক্ষতামূলক কর্মে, উপস্থিতি বেশি। রাষ্ট্রের দ্বারা

রাজনৈতিক ও সামাজিক ন্যূনতম প্রগতিরও বিরোধিতার ফলে, সাধারণভাবে চিন্তাভাবনার সামান্যতম উপস্থিতিও শ্রমিক আন্দোলনে ঘটেনি। তদুপরি, রাজতন্ত্র কঠোরভাবে সামরিক ব্যবস্থার দ্বারা সর্বক্ষণ পরিচালিত হওয়ায় এবং রাষ্ট্রশক্তির পক্ষ থেকে পশ্চিমি, বিশেষত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের, অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ এই অঞ্চলে সর্বক্ষণ বজায় রাখার তৎপরতায়, শান্তিপূর্ণ কোন প্রতিবাদ করার অধিকারও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি ও ভূমিকার পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়।

স্বভাবতই ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ এই এলাকার দেশসমূহে প্রচণ্ডভাবে নিয়ন্ত্রিত। বাহারিন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও ইউনাইটেড আরব এমিরিটাসে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেসব দেশে ট্রেড ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি রয়েছে, সেখানেও সাংঘাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত অধিকারসমূহ। যেমন কুয়েত ও সিরিয়াতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সম্পূর্ণ সরকার-নিয়ন্ত্রিত। জিবুতি, ইরাক ও ইয়েমেনে ট্রেড ইউনিয়নের দর-কষাকষি করার অধিকারও নেই।

জর্ডন ও লেবাননে ট্রেড ইউনিয়ন সরকার নিরপেক্ষভাবে কিছুটা কাজ করলেও সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার অধিকার নেই। এর সমস্ত দেশ অবস্থানকারী বিদেশী শ্রমিকদের নেই কোন সামান্য ধরনের অধিকার।

তবে সাম্প্রতিককালে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে এতসব নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কিছু কিছু দেশে প্রাথমিক ধরনের শ্রমিক-প্রতিবাদ সংঘটিত হচ্ছে। জাতীয় অথবা প্রতিষ্ঠানগত স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে ট্রেড ইউনিয়ন কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে। বিশেষত সামাজিক পরিষেবা, সামাজিক বীমা, বৃত্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সক্ষম হচ্ছে মতামত প্রকাশ করতে।

এলাকার কয়েকটি দেশের সাথে আমেরিকার বিরোধ অব্যাহত থাকায়, ট্রেড ইউনিয়নে তার প্রতিফলন পড়েছে। এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সরকার আমেরিকা-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণে ট্রেড ইউনিয়নকে কিছুটা সুযোগ দিচ্ছে। যেমন সিরিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস'-এর সাথে যুক্ত এবং ডব্লু. এফ. টি. ইউ-এর পুনরুজ্জীবনে তাদের কিছুটা আন্তরিকতা ও তৎপরতাও দেখা যায়। রাজধানী দামাস্কাসে ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর পুনরুজ্জীবনের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এশিয়া ভূখণ্ডে ট্রেড ইউনিয়নের পরিস্থিতি

এশিয়া ভূখণ্ডে ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থা অনেকটাই সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির স্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এই মহাদেশের উল্লেখযোগ্য এলাকা জুড়ে সামন্ততন্ত্রের ও আধা-সামন্ততন্ত্রের উপস্থিতি রয়েছে। কতকগুলি দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে দারুণ অনুন্নত কতকগুলি উন্নয়নশীল। কয়েকটিতে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। অবশ্য শেষোক্তগুলি অতীতের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। বুর্জোয়া অর্থনীতির পরিভাষাতে শেষোক্তদের অর্থনীতিকে বলা হচ্ছে 'ইকনমি ইন ট্রানজিশন' বা অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের অর্থনীতি। এশিয়ার উন্নত দেশগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হলো জাপান। চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া ও লাওসের পরিস্থিতি বাদ দিলে, বাকি প্রায় প্রত্যেকটি দেশে ট্রেড ইউনিয়ন অসংখ্য ভাগে বিভক্ত ও খণ্ড-খণ্ড। দেশীয় পরিস্থিতির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার মধ্যে বিপুল বৈচিত্র্য ও পার্থক্য রয়েছে। ফলে, ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকার মধ্যে গড়ে উঠেছে নানা অভিনবত্ব ও ব্যবধান। বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের উপাদানগুলিকে প্রধানত চিহ্নিত করা যায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অগ্রগতির বিশিষ্ট চরিত্রের ভিত্তিতে : সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ, জাপান ও জাপান প্রভাবিত দেশগুলি, পশ্চিম-প্রভাবিত দেশগুলি এবং কৃষি-প্রধান ও সামন্ত বা প্রাক সামন্ততান্ত্রিক পরম্পরাবাহী দেশগুলি ইত্যাদি। দেশে দেশে শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা-ব্যবস্থা ও শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বিভিন্নতা রয়েছে, তাই প্রধানত ট্রেড ইউনিয়নের রূপ ও ভূমিকাকে প্রভাবিত করে চলেছে। এই মহাদেশের কিছু এলাকায় সুদীর্ঘকাল পূর্ব থেকে শিল্পব্যবস্থা রয়েছে। তার ফলে অনেক দেশে শতবর্ষ আগে ট্রেড ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটলেও

সেগুলির কোন কোন দেশে পরবর্তীকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য, ধারাবাহিকতা প্রায় ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে এইরকম দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন পুনর্গঠনের নূতন বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এশিয়ার অধিকাংশ দেশে অদ্যবধি ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যভুক্তির হার অতি নিম্ন এবং অত্যন্ত দুর্বল। কোনো কোনো দেশের ট্রেড ইউনিয়নের জন্মলগ্নের ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কও ছিল গভীর। কিন্তু অধিকাংশ দেশে হয় তা' সম্পূর্ণ ছিন্ন অথবা অতীব ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। ষাটের দশকের মধ্যভাগে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিরোধ ও বিভেদের ফলে বেশ কিছু দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের বিভাজন ঘটে। তবে সংস্কারবাদী ও জাতীয়তাবাদী ট্রেড ইউনিয়নের প্রাধান্যই রয়েছে এশিয়ার দেশগুলিতে। সত্তরের দশক থেকে দেশে দেশে রাজনৈতিক দলগুলির অনুগামী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকায় ট্রেড ইউনিয়ন আরও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়তে থাকে। আশির দশক থেকে ধর্ম বা স্বদেশী-বিদেশী শ্রমজীবীভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছে কোন কোন দেশে।

সামান্য কয়েকটি দেশ বাদে, অন্যত্র সংগঠিত ও মজুরিভোগী শ্রমজীবীদের মধ্যেই ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যপদ, ভূমিকা ও প্রভাব সীমাবদ্ধ। এশীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখন প্রবলতম ও নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। কাঠামোগত সংস্কার ও বেসরকারীকরণের ফলাফল, ছাঁটাই ও বেকারী, সুবিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মজীবী, বহুজাতিক সংস্থার শোষণ ও আক্রমণ, শিশু শ্রমিক ও নারী শ্রমজীবী, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ক্রমশ সংকীর্ণ হওয়া ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যা ও সেগুলির বহুমাত্রিক অভিঘাতের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন। তার ফলে ক্রমশই কোণঠাসা হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন।

অগ্রগতির স্তরের পার্থক্য ও পূর্বোক্ত পরিস্থিতির প্রভাবে এশিয়ার দেশে দেশে ইউনিয়ন-ঘনত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কৃষি ও অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীরা অধিকাংশ দেশেই যেহেতু সংগঠিত নয়, তাই সংগঠনে সদস্যভুক্তির হার ১০ শতাংশের নীচে থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত রয়েছে। একটি লক্ষণীয় সাধারণ উপাদান হলো—দরিদ্রতর দেশগুলিতে সদস্যভুক্তির হার যেমন সামান্য বর্ধিষ্ণু, অন্যদিকে তুলনামূলক উন্নত দেশগুলিতে অর্জিত হার এখন ক্ষয়িষ্ণু।

এশিয়ার বহু দেশে ট্রেড ইউনিয়নের প্রকৃতি ও বিকাশে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব রয়েছে এইসব দেশের সরকারের। সরকারগুলি মনে করে যে শিল্পে অশান্তি ঘটলে বিদেশী পুঁজি-বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ঘটবে; স্বভাবতই তারা ট্রেড ইউনিয়নের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সরকারের এই হস্তক্ষেপকারী ভূমিকার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে স্বকীয় ও স্বাধীন ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। কোন কোন দেশে ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষমতাসীন দলের অনুগামী। যেখানে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়নগুলি থাকে সেখানে ট্রেড ইউনিয়নকে যথাসম্ভব রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

যেসব দেশে 'ফ্রি ট্রেড জোন' বা 'এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন' রয়েছে যেমন চীন, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিনস ইত্যাদি, সেখানে উক্ত অঞ্চলগুলিতে দেশের সমস্ত শ্রম আইন কার্যকরী হয় না; এইরকম কোন কোন দেশের অনুরূপ অঞ্চলভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন করা নিষিদ্ধ। ফলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দেশের ই. পি. জেড.গুলিতে সদস্যভুক্তির হার সংশ্লিষ্ট দেশের গড় সদস্যভুক্তির হারের অর্ধেকেরও অনেক নীচে।

· এশিয়ার শ্রমশক্তির অর্ধেকেই মহিলা। এরা প্রধানত নিয়োজিত কৃষি, বাগিচা, চা, কফি, রাবার, কোকো, নারকেল, আঙ্গুর, বন, মৎস্য ইত্যাদি অসংগঠিত ক্ষেত্রে। যদিও জাতীয় উৎপাদনের শ্রমিকারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তথাপি সদস্যভুক্তি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে তাদের প্রতিনিধিত্ব যৎসামান্য। কোন কোন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন বিগত এক দশক ধরে গুরুত্ব দিয়ে নারীদের সংগঠিত করা শুরু করেছে, কিন্তু অগ্রগতি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

এবারে দেশভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থা কিছুটা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক চীন হলো বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তি—অধ্যুষিত দেশ। নিয়োজিত শ্রমশক্তির

৯০ শতাংশের বেশি ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত। সেই বিচারে বিশ্বের দেশভিত্তিক বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন হলো 'অল চায়না ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস' (এ. সি. এফ. টি. ইউ.)। সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির ভিত্তিতে দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের জন্য যে বিশাল ও ব্যাপক কর্মকাণ্ড চীনে শুরু হয়েছে এবং উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জিত হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি হলো এ. সি. এফ. টি. ইউ.। ১৯৯২ সালে, নতুন পরিস্থিতির উপযোগী করে এক নতুন 'লেবার কোড'-এর খসড়া সরকার রচনা করে এবং আই. এল. ও. কে দেশের লেবার ল'গুলির মূল্যায়ন করার অনুরোধ জানায়। শিল্প ব্যবস্থা ও সম্পর্কের বিষয়ে চীনের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বের একটি অধ্যায়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে যে একপ্রস্থ 'লেবার কোড' গৃহীত হয়েছে তাতে ইউনিয়ন গঠনের জন্য ন্যূনতম ২০০ সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ২৫ জন করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে শহরে সমবায়, পরিষেবা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক সংস্থা ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এখন সেগুলিতে ইউনিয়ন গড়া সহজসাধ্য হবে। তবে নব-গঠিত ইউনিয়নের অনুমোদন দেবার অধিকারী হল এ. সি. এফ. টি. ইউ.।

ভারতে যদিও ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব শতাব্দী কাল অতিক্রম করেছে, তথাপি মোট সক্রিয় শ্রম-শক্তির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব সাধারণভাবে খুবই দুর্বল। মোট শ্রম-শক্তির ১০ শতাংশের কম ট্রেড ইউনিয়নে সদস্যভুক্ত। কৃষি-মজুররা সাধারণভাবে ট্রেড ইউনিয়নে নেই। সীমাবদ্ধ এলাকাতে কৃষি-মজুরদের স্বতন্ত্র কিছু কিছু সংগঠন রয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে অতীতে কোন ইউনিয়ন ছিল না বললেই চলে। তবে সম্প্রতি এই অংশকে সংগঠিত করার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। নারী ও শিশু শ্রমিক সংখ্যা ভারতে বিশাল, তবে তারা অধিকাংশই ইউনিয়নভুক্ত নয়। সংগঠিত ক্ষেত্রের ইউনিয়নেও নারী সদস্য-সংখ্যা প্রচণ্ড কম; ইউনিয়ন নেতৃত্বে তাদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। জাতীয় স্তরের ট্রেড ইউনিয়ন, মতাদর্শগতভাবে বারে বারে ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে এখন অনেকগুলিতে পরিণত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রধান হলো আই. এন. টি. ইউ. সি., এইচ. এম. এস., সি. আই. টি. ইউ., এ. আই. টি. ইউ. সি., ইউ. টি. ইউ সি., এইচ. এম. পি., বি. এম. এস., টি. ইউ. সি. সি., সি. সি. আই. টি. ইউ. ইত্যাদি। কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত নয় এমন সুবৃহৎ জাতীয় স্তরের বহু ইউনিয়নও রয়েছে। ক্ষেত্রগুলি হলো রেল, কেন্দ্রীয় সরকারী ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী,- ব্যাঙ্ক, বীমা, শিক্ষক, অধ্যাপক, জাহাজী, পরিবহন, ফার্মাসিউটিক্যাল, রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলি। আবার প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও শিল্পে একই ধরনের শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্য-ভিত্তিক নানা ইউনিয়ন রয়েছে। আশির দশক থেকে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনে অনৈক্যের নতুন উপাদান গড়ে উঠেছে। ধর্ম, জাতি, জাত-পাত নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও আঞ্চলিকতা-ভিত্তিক প্রবণতায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্ভব ঘটেছে। ধর্ম, জাত বা অঞ্চলের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের পত্তন এবং রাজ্যে রাজ্যে তাদের প্রাধান্য বাড়ায় ট্রেড ইউনিয়ন ঐসব ধারাতে বিভক্ত হতে শুরু করেছে। নব্বই-এর দশকের শুরু থেকে নতুন যে অর্থনৈতিক নীতি দেশে গ্রহণ করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরের ও ক্ষেত্র-ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন ব্যাপক আন্দোলন ও প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে, ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের এই ভূমিকা অতুলনীয়। শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে ভারতে শ্রম-আইনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল। ভারত সরকার, আই. এল. ও.-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, এখনও বহু কনভেনশন আইনে পরিণত করেনি। বিগত কয়েক বছর ধরে, দেশে প্রচলিত শ্রম-আইনে শ্রমিক-বিরোধী সংশোধনের চেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে; কিন্তু আন্দোলনের চাপ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য তা' এখনও আইনে পরিণত হতে পারেনি। সদস্যসীমার বাইরে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখন কিছুটা প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এটা সম্পন্ন হচ্ছে প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির মোর্চার দ্বারা জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সক্রিয় হস্তক্ষেপ ও সঠিক নীতিগত অবস্থান গ্রহণের জন্য।

বর্তমান বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাস ও বিকাশ একদা ভারতবর্ষের অখণ্ড অংশ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে তা' ভারতের থেকে সর্বাংশেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাংলাদেশে মূল ও ভারী শিল্পের অস্তিত্বহীনতা এবং প্রধানত কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতিতে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব রয়েছে কেবলমাত্র সংগঠিত ক্ষেত্রে। তথাপি ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নে সদস্যভুক্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ শতাংশে দাঁড়ায়। কিন্তু মতাদর্শগত বিরোধ থেকে সেখানেও ট্রেড ইউনিয়ন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়েছে। জাতীয় স্তরে গড়ে উঠেছে 'জাতীয় শ্রমিক লীগ' (বি. জে. এস. এস.), বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (বি. টি. ইউ. কে.), বাংলা লেবার ফেডারেশন (বি. এস. এফ.), বাংলা দেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (বি. এফ. টি. ইউ. সি.), বাংলাদেশ ইউনাইটেড লেবার ফেডারেশন ইত্যাদি। তাছাড়াও পাবলিক সার্ভিসের জাতীয় স্তরে সংগঠন এদেশে রয়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে জাতীয় স্তরের সংগঠনগুলি নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য একটি 'ন্যাশনাল কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন' গঠিত হয়েছে। কিন্তু দেশে প্রবল রাজনৈতিক সংঘাতের পটভূমিতে এই চেষ্টা এখনও তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। তবে বাংলাদেশের এই খণ্ড খণ্ড ট্রেড ইউনিয়নগুলির বেশ কয়েকটি নানা কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে পরিচালিত। জাতীয় জীবনে এই ট্রেড ইউনিয়নগুলির ইতিবাচক ভূমিকা ও কিছুটা প্রভাব রয়েছে। এখানে আন্দোলনও হয় অব্যাহতভাবে।

নেপালে রাজতন্ত্রের কালে জাতীয় স্তরে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল। কিন্তু সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সংগ্রামে। এখন২৫-৩০টি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সেখানে সবচাইতে শক্তিশালী। সরকারী কর্মচারীদের নিজস্ব সংগঠন নেপালে রয়েছে।

শ্রীলঙ্কাতে সুদীর্ঘকাল ধরেই প্রথমে ট্রটস্কি-পন্থী চতুর্থ আন্তর্জাতিকের ও পরবর্তীকালে তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গোষ্ঠীর নেতৃত্বে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল। বিগত ২০ বছরে সেখানে উদ্ভব ঘটেছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের। কিন্তু এই উপমহাদেশের দেশগুলির মতো শ্রীলঙ্কার ট্রেড ইউনিয়নও রাজনৈতিক মতবাদ অনুযায়ী খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। এখানে একই ক্ষেত্রে একাধিক ইউনিয়নের অস্তিত্ব রয়েছে। শ্রীলঙ্কার প্রধান প্রধান সংগঠনগুলির অন্যতম হলো 'সিলোন ওয়ার্কার্স কংগ্রেস', 'লঙ্কা জাথিকা এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন', 'ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স কংগ্রেস' ইত্যাদি। উত্তর ও পূর্ব শ্রীলঙ্কাতে বিগত প্রায় দেড় দশক ধরে জাতিগত বিরোধ ও গৃহযুদ্ধের ফলে সেখানকার সমাজ-জীবনের মতো ট্রেড ইউনিয়নও যথেষ্ট কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। দেশের ইউনিয়ন সদস্যভুক্তির হার ২৫-৩০ শতাংশের মধ্যে।

ইন্দোনেশিয়াতে প্রায় তিন দশক আগে, সামরিক শাসন চালু হওয়ার পর, পূর্বতন সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন বাতিল করে সরকার ও মালিকশ্রেণীর স্বার্থে ও পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে(!) জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন—'অল ইন্দোনেশিয়ান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (এম. পি. এস. আই.) তৈরি করা হয়েছিল। শ্রমিকদের ন্যূনতম দাবীগুলি নিয়ে সংগঠনটি কখনো তেমন কোন উদ্যোগ দেখায়নি। ফলে কয়েক বছর আগে জেলায় জেলায় সংগঠনের অভ্যন্তরে কার্যত বিদ্রোহ ঘটতে শুরু করে। এই পরিস্থিতি থেকে গড়ে উঠেছে নতুন ট্রেড ইউনিয়ন—'সেরিকাত বুরু সেঝাতেরু ইন্দোনেশিয়া' (এস. বি. এস. আই.)। এটিই বর্তমানে বৃহত্তম সংগঠন। কিছুটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্মুক্ত হওয়ায় বর্তমানে ক্ষেত্র-ভিত্তিক সংগঠনের উদ্ভব ঘটছে। ১৯৯৮ সালে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো বিরোধী যে ছাত্র ও গণসংগ্রাম হয়েছে তাতে শ্রমিকশ্রেণীও অংশ নিয়েছে।

সিঙ্গাপুরের জাতীয় স্তরে একটি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রয়েছে —'সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। সংগঠনটি সরকারে আসীন দলের সাথে সহযোগিতা করে চলে। এটির অনুমোদিত ইউনিয়নের সংখ্যা ৭৬টি। এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে সিঙ্গাপুরের ট্রেড ইউনিয়নভুক্তির ঘনত্ব সর্বোচ্চ—২৫ শতাংশ। এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় এখানকার ট্রেড ইউনিয়ন পরিস্থিতি বেশ

কিছুটা স্বতন্ত্র। 'এশিয়ান টাইগার' দেশগুলির অন্যতম সিঙ্গাপুর এবং এখানকার শিল্প কাঠামো অতীব আধুনিক এবং রপ্তানি-ভিত্তিক। এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক সবলতা অনেকটাই বেশি বলে প্রতিপন্ন হত (অবশ্য ১৯৯৭ সালের শেষের দিক থেকে সমস্ত মীথ ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে)। শ্রমিকরা সাধারণভাবে সুশিক্ষিত ও দক্ষ। এ পরিস্থিতির ফলে তাদের দাবী-দাওয়ার চরিত্র 'অ্যাফ্লুয়েন্ট' বা সমৃদ্ধধর্মী। স্বভাবতই ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনের প্রতি শ্রমিকদের মনোভাব শীতল, যেকারণে ১৯৮৬ সালের পর সিঙ্গাপুরে শ্রমিক ধর্মঘটের নজির নেই।

ফিলিপিনস সরকার দেশে বিদেশী পুঁজি ও শিল্প আকর্ষিত করার লক্ষ্য থেকে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যাতে শক্তিশালী হতে না পারে সেজন্য ব্যাপক চেষ্টা বজায় রেখেছে। তবে চরম সংস্কারবাদী ও মালিক-ঘেঁষা চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও, সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের বাড়বাড়ন্ত কমানো যায়নি। ফিলিপিনসে সদস্যবৃদ্ধির হার এশিয়ার মধ্যে সর্বাধিক—৩৮ শতাংশ। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্য-সংখ্যা ২.৯ মিলিয়ন যা মোট শ্রম-শক্তির ১২ শতাংশের মতো। ১৯৯০ সালে ফিলিপিনসে শিল্প কারখানা-ভিত্তিক মোট ৪৯,৯৬২টি ইউনিয়ন ছিল। এগুলি নিয়ে গঠিত ফেডারেশনের সংখ্যা ২,২৯৮টি। দেশে কিছুটা গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়া সূচিত হওয়ার ফলে এই বৃদ্ধি ঘটছে বলে দাবী করা হয়। অপর কারণ হলো, মালিকদের পক্ষ থেকে অসঙ্গত শ্রম-ব্যবস্থা চালু রাখার ফলে শ্রমিকরা ক্ষোভ থেকে সংগঠনে যুক্ত হচ্ছে। ক্ষোভের প্রধান কারণগুলি হলো—মজুরি না দেওয়া অথবা উপযুক্ত মজুরি ও সরকারী ন্যূনতম ব্যবস্থা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কার্যকর না করা। ১৯৮৯ সালে যত শ্রম-বিরোধ সেখানে ঘটেছিল সেগুলির ৭৬ শতাংশই ছিল এগুলি নিয়ে। ১৯৯০ সালে 'ফিলিপিনস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট' যে সমীক্ষা চালায় তাতে দেখা গেছে ৬০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান লেবার কোডে বর্ণিত লেবার স্ট্যান্ডার্ডগুলি মেনে চলে না। অত্যাধুনিক শিল্প ব্যবস্থার অন্তরালে বহুজাতিক সংস্থা ও মালিকশ্রেণীর ভূমিকা কি, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ ফিলিপিনস।

হংকং-এর মতো অতি ক্ষুদ্র দেশেও ট্রেড ইউনিয়ন শতধা-বিভক্ত। সেখানে মোট রেজিস্ট্রিকৃত ৪৩৯টি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য-সংখ্যা ৪.১৬ লক্ষ। প্রায় প্রত্যেক শিল্পেই একাধিক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন রয়েছে। অধিকাংশ ইউনিয়নই মালিক-ঘেঁষা। শ্রমিকদের সমস্যার ব্যাপকতা থাকা সত্ত্বেও সেসব নিয়ে দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি তেমন কোন ভূমিকা নেয় না। ১৯৯৭ সালে, চুক্তি শেষ হওয়ার ফলে ব্রিটেন চীনের কাছে হংকংকে প্রত্যর্পণ করেছে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক চীন সরকার "এক দেশ দুই অর্থনীতি"-র ভিত্তিতে হংকং-এর পূর্বাবস্থা বহাল রেখেছে; তবে তাতে ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থার কোন পরিবর্তন এখনও ঘটেনি।

মালয়েশিয়াতে ইউনিয়নভুক্তির ঘনত্ব ১০ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে। 'ফ্লেক্সি-ওয়েজ' প্রথা মালয়েশিয়াতে চালু করার প্রচেষ্টাকে সরকার-পৃষ্ঠপোষিত সংগঠন 'মালয়েশিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' 'ওয়েজ রিফর্ম' বা মজুরি সংস্কার নামকরণের আড়ালে শ্রমিকদের মেনে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। সেখানে বছরে ৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির স্বাভাবিক ব্যবস্থা রয়েছে। এখন সরকার ও মালিকশ্রেণী তাও বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন সংগঠন-কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে 'মালয়েশিয়ান লেবার অরগানাইজেশন'। কিন্তু এটিও পরোক্ষে সরকার মদতপুষ্ট। মিনিস্ট্রি অব হিউম্যান রিসোর্সেস ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্য দেশগুলিতে যখন গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া বাড়ছে তখন মালয়েশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণী আরও অধিকার হরণের আশঙ্কায় সময় কাটাচ্ছে।

রিপাব্লিক অব কোরিয়া বা দক্ষিণ কোরিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যভুক্তি ১৯৮৭ সাল থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিপরীত দিকে, ১৯৮৭ সালে শ্রম-বিরোধ শীর্ষে পৌঁছালেও, তারপর থেকে তা' দ্রুত কমতে শুরু করেছে। ট্রেড ইউনিয়নের পরিচিত অবস্থার সাথে এই বৈপরীত্যকে অনুধাবন করা যথেষ্ট কঠিন। ১৯৮০ সালে যখন দেশে তুমুল শ্রম-সংঘর্ষ চলছিল, তখনই পাশাপাশি উদারীকরণের নীতি গৃহীত হয়। এই সংস্কারের কালে ধর্মঘটকে প্রথম আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যদিও সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ধর্মঘট যথারীতি নিষিদ্ধ থাকে। এর পর

থেকে কমতে থাকে শ্রম-বিরোধ। দাবী করা হচ্ছিল যে গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়ার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উচ্চ মজুরির দাবীর বিপরীতদিকে সরকারের পক্ষ থেকে মজুরির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টার ফলে উত্তেজনা সব সময়েই বহাল আছে। এই উত্তেজনা থেকে নব্বই-এর দশকের কয়েকটি বড় বড় শিল্প ধর্মঘটও হয়। ১৯৯২ সালে প্রবল সংঘর্ষ চালিয়ে শ্রমিকরা দেশের সর্ববৃহৎ মোটর নির্মাণ কারখানাকে বেশ কয়েকদিনের জন্য দখল পর্যন্ত করে নিয়েছিল। সর্বাপেক্ষা তীব্র, ব্যাপক ও জঙ্গী আন্দোলন সংঘটিত হয় ১৯৯৬ সালে, সরকার কর্তৃক শ্রম-আইন ব্যাপকভাবে সংশোধন করার উদ্যোগ নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেকটি শিল্পে ও শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক ধর্মঘট ও অবরোধ চলে। সরকারী দমন-পীড়ন উপেক্ষা করে এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। সরকার আইন-সংশোধনকে বাতিল করে।

১৯৯২ সালের পর এশীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে নতুন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ঐক্য গঠনের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'অ্যাপেক' ও 'সার্ক' দেশভুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে কয়েকটি যৌথ আলোচনা সভা। এই প্রচেষ্টায় ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কিছু কিছু দেশও প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। যেসব দেশের ট্রেড ইউনিয়ন এই সমস্ত যৌথ প্রচেষ্টায় অংশীদার হচ্ছে, সেগুলির বেশ কিছু আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর সদস্য। তৃতীয় দুনিয়ার মার্কসবাদী ও বামপন্থী কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন এই প্রচেষ্টার সক্রিয় অংশীদার। তবে চীনের ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এখনও কার্যকরী সাড়া পাওয়া যায়নি। বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকা ও কাঠামোগত সংস্কারের ফলে উদ্ভূত শ্রমিক-সমস্যা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোর ব্যাপারে এদের মধ্যে অনেকটা সহমত লক্ষ্য করা গেছে, যদিও এই সমস্ত উদ্যোগ এখনও রয়েছে প্রাথমিক স্তরে।

ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক আধুনিক কিছু তত্ত্ব

উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার বিপুল পরিবর্তন, সেগুলির অভ্যন্তরে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও জটিলতার ফলে উৎপাদিকা শক্তি—যার কেন্দ্রে রয়েছে শ্রমজীবীরা, তাদের পরিবর্তনের ধারা কত অদৃষ্টপূর্ব ও অভাবনীয় হতে পারে সেগুলির বিভিন্ন দিক পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৮ সালের প্রথমার্ধ জুড়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথাকথিত 'এশিয়ান টাইগার' বলে অভিহিত দেশগুলির আকস্মিক আর্থনীতিক বিপর্যয় নিয়ে বহু মত, গবেষণা-আলোচনা এবং 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট'-এর নানা প্রসঙ্গ। কিন্তু দৃষ্টির অলক্ষ্যে এক্ষেত্রেও থেকে গেছে দেশগুলিতে গৃহীত নতুন 'প্রোডাকশন-প্রসেস' এবং 'লেবার-প্রসেস'-এর অবদান এই সংকটের পেছনে কতখানি। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা ভ্রুকুঞ্চন করতে পারেন এই কথা বলে যে অর্থনীতির 'মাইক্রো' এবং 'ম্যাক্রো' বিধি-ব্যবস্থার নিছক এক অংশ মাত্র 'প্রোডাকশন-প্রসেস' এবং 'লেবার-প্রসেস'; সুতরাং আর্থনীতিক সংকটের মূল কারণগুলি জানা ও বোঝা গেলে, শেষোক্ত দু'টির ক্ষেত্রে যদি কোন সমস্যা থেকেও থাকে, তা' আর থাকবে না। এমন ধরনের মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল কিছুদিন আগের 'মেক্সিকান-ক্রাইসিসের' সময়ে। সেই সংকটকে সামাল দেওয়া গেছে বলে দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু সংকট থেকে সত্যি পরিত্রাণ পেয়েছে কি সেখানকার অর্থনীতি এবং প্রোডাকশন ও লেবার-প্রসেস? সুতরাং, অতীতের মতো এত সরল নয়-এখনকার নতুন বাস্তবতা ও ব্যবস্থা। সমাজের প্রত্যেকটি শাখায় ও স্তরে উন্নতিসাধনে যে ধরনের কৃত্রিম 'ক্লোনিং'-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার ফলে কোন অংশ কার ঘাড়ে চেপে বসছে, বেস-সুপারস্ট্রাকচার সম্পর্কে কি ধরনের পরিবর্তন বা জগাখিচুড়ি ঘটছে তা' এখনও অনির্ণীত। যাইহোক, অনেক তাত্ত্বিক বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও গ্লোবালাইজেশনের ফলাফল এখন বিস্ময়করভাবে পশ্চাৎমুখী এবং প্রভেদাত্মক হতে শুরু করেছে। ব্যারোমিটারের পারদের ওঠা-নামার মতো শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা সেই অনিশ্চয়তাকে নতুন করে প্রমাণ করছে। ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকার উপরও ক্রমাগত ঘটে চলেছে তার প্রতিফলন।

সমগ্র পরিস্থিতির, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর অস্থির অস্তিত্বের রূপ ও মনোভাবের বিপুল প্রভাব

রয়েছে আধুনিককালের ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর। ট্রেড ইউনিয়ন নির্বিশেষে এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নেই। মার্কসবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যেও যেমন এখন নানা নতুন প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছে, অনুরূপভাবে বুর্জোয়াপন্থী, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক বা লিবারাল ধরনের ট্রেড ইউনিয়নগুলিতেও রয়েছে প্রবল অস্থিরতা এবং নতুন পথ নির্ণয়ের জন্য তৎপরতা। অবশ্য এই প্রসঙ্গে যে কোন আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য শ্রেণী সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন ছাড়া। কেননা 'শ্রেণী'-প্রসঙ্গের সাথে জড়িয়ে রয়েছে ব্যাপক দিকসমূহ—মার্কস থেকে ফ্রয়েড, জীবন থেকে মৃত্যু, জন্ম থেকে জরা পর্যন্ত।

বলাই বাহুল্য যে ট্রেড ইউনিয়নের আধুনিককালের মতবাদগুলি ব্যাপক বিভিন্নতাসম্পন্ন, কোন কোন ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ধরনের পরস্পর-বিরোধী, কোন কোনটি অতি বামমার্গী, কোন কোনটি অরাজনৈতিক, কোনটি আবার নয়া উদারনীতিবাদী। এগুলির কোন কোনটি উন্নত দুনিয়ার বাস্তবতাভিত্তিক, কোন কোনটি তৃতীয় দুনিয়ার, আবার কোন কোন মতবাদ দেশ বা আঞ্চলিকতাবাদী, কোন কোন মতবাদ দেশভিত্তিক হলেও, সেগুলির উদ্গাতারা বিশ্বজনীন বলে দাবী করেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিলে এই সব প্রবণতা কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিজম

আশির দশকের প্রথমার্ধে ট্রেড ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম রূপ হিসাবে 'ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিজম স্কুল' বা ট্রেড ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদ মতবাদ ধারার উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্যের বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কিছুটা ব্যাপকভাবে প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। অথচ উন্নত দেশের ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা প্রভাবিত ও ক্ষেত্রবিশেষে পরিচালিত এবং অর্থ সাহায্যের দ্বারা পরিপুষ্ট তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলি কিন্তু এসব নিয়ে অর্থাৎ 'ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিজম'-এর প্রভাব নিয়ে কার্যত তেমন কোন বিচার-বিশ্লেষণ করেনি কখনো। প্রসঙ্গটি নিয়ে প্রথম তাত্ত্বিক আলোচনা উত্থাপন করেন লাতিন আমেরিকার বামপন্থীরা। ট্রেড ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদ বলতে প্রধানত চিহ্নিত করা হয়েছিল আমেরিকার সর্ববৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন—এ.এফ.এল.-সি.আই.ও., মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক শ্রম-নীতি, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির কিছু ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গৃহীত তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি মনোভাব ও ভূমিকাকে—যে দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা তৃতীয় দুনিয়াকে শোষণের পরোক্ষ সহায়ক ভূমিকা পালন করা ছাড়াও নিজেরই একধরনের ট্রেড ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা নেয় বলে দাবী করা হয়। এই ধারার ধারণাকে অতি বাম মার্গী হিসাবে চিহ্নিত করা এবং তত্ত্বটির সারবত্তা থাকলে তা বামপন্থী আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র—ডব্লু. এফ. টি. ইউ.-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে বুর্জোয়া ট্রেড ইউনিয়ন বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে তখন প্রচার করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু নব্বই-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে একাংশ বাম বুদ্ধিজীবী দাবী করছেন যে আধুনিককালের অভিজ্ঞতাই 'ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিজম'-র উপাদানকে বেশী করে প্রমাণ করে চলেছে। পূর্বে আলোচিত ডব্লু.টি.ও.-র সোস্যাল-ক্লজের প্রস্তাব এবং সেবিষয়ে উন্নত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলির সক্রিয় সমর্থন এই প্রবণতার বর্তমান কালের প্রমাণ বলে তাঁদের দাবী।

১৯৬২ সাল থেকে এ. এফ. এল-সি. আই. ও. এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৈদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন নীতি ও ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করার প্রধান হাতিয়ার হলো লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর ফ্রী লেবার ডেভেলপমেন্ট' (এ. আই. এফ. এল. ডি), এশীয় এলাকায় 'এশিয়া-আমেরিকান ফ্রী লেবার ইনস্টিটিউট', এবং আফ্রিকার ক্ষেত্রে 'আফ্রিকান-আমেরিকান লেবার সেন্টার' প্রভৃতি সংস্থা। আন্তর্জাতিক স্তরে আমেরিকান ট্রেড ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমলাতন্ত্র, সি. আই. এ. এবং এ. এফ. এল-সি. আই. ও.-এর প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে থাকে। এ. এফ. এল-সি. আই. ও. তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ট্রেড ইউনিয়নের সুদীর্ঘকালের প্রধান নেতা জর্জ মিয়ানি নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, "আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিশ্বাস

করি এবং আমরা পুঁজিবাদী সমাজের সদস্য। ...এই ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য আমরা নিবেদিত, যা শ্রমিকদের পুরস্কৃত করে। ...আমরা এই ব্যবস্থার বিনিময়ে অন্য কোন বাণিজ্য করতে চাই না।"

বিদেশে ধনতন্ত্র-বিরোধী মতবাদ ও সংগঠনগুলির মোকাবিলা এবং ধনতন্ত্র-পন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির পরিপোষণা চালায় এ. এফ. এল-সি. আই. ও। এরা একদিকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য সর্বতোভাবে ভূমিকা নেয়, অন্যদিকে নিজ দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গড়তে সাহায্য করে। যেসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পুরোপুরি অনুকূল নয় সেইসব দেশে বহুজাতিক সংস্থা ও আমেরিকান সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে এ. এফ. এল-সি. আই. ও.-র বৈদেশিক শাখা কাজ করে যৌথভাবে। এদের মধ্যে কদাচিৎ মতপার্থক্য ঘটে কৌশলগত প্রশ্নে, নীতিগত ক্ষেত্রে নয়। স্বীয় দেশের রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে ট্রেড ইউনিয়নকে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করতে দিতে আমেরিকান রাজনীতির সর্বস্তরে বিরোধিতা থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম-প্রসঙ্গে বৈদেশিক নীতি অতি রাজনৈতিক মাত্রা-যুক্ত। তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের প্রভাবিত করার জন্য আমেরিকান বৈদেশিক শ্রমনীতি নগ্নভাবে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে। বিগত তিরিশ বছর ধরে, লাতিন আমেরিকাতে এ. আই. এফ. এল. ডি., একনায়কত্বমূলক প্রায় প্রত্যেকটি সরকারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন দান ও সহায়তামূলক কাজ যেমন করে গেছে, পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতিবিরোধী সরকারগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন করার নামে অন্তর্ঘাত চালিয়ে এসেছে।

'আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর ফ্রী লেবার ডেভেলপমেন্ট' (এ. আই. এফ. এল. ডি), 'এশিয়া-আমেরিকান ফ্রী লেবার ইনস্টিটিউট' ও 'আফ্রিকান-আমেরিকান লেবার সেন্টার'-এর মাধ্যমে এ. এফ. এল.-সি. আই. ও. নানা ধরনের প্রকল্পে বিপুল অর্থ যোগায়। গোষ্ঠী বা বৃত্তি-ভিত্তিক বিভিন্ন দেশের জাতীয় (ন্যাশনাল) ইউনিয়নগুলির দ্বারা গঠিত, আমেরিকার প্রভাবাধীন 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেক্রেটারিয়েট'গুলির (আই. টি. এস.) মাধ্যমেও এ. এফ. এল-সি. আই. ও. কাজ করে। আরও বিশেষত একারণে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বরাদ্দকৃত অর্থের ওপর অধিকাংশ আই. টি. এস. নির্ভরশীল; তাছাড়া এরা ইউরোপীয়ান কমিউনিটির সদস্যভুক্ত দেশগুলি বা বিভিন্ন ফাউণ্ডেশন থেকেও বিপুল অর্থ পেয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক শ্রম-নীতি রচনা ও প্রয়োগের প্রধান শক্তি হলো এ. এফ. এল.-সি. আই. ও. এবং সংগঠনটি নিজস্ব 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট' ও 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট অব এফিলিয়েট ইউনিয়নস'-এর মাধ্যমে বছরে ব্যয় করে কোটি কোটি ডলার। নিজস্ব বাজেটের ২৩-২৫ শতাংশ এইসূত্রে এ. এফ. এল-সি. আই. ও. ব্যয় করে। কিভাবে এই অর্থ ব্যয়িত হয়, তার হদিস সংগঠনের উচ্চতম আমলারাই একমাত্র জানে।

এ. এফ. এল,-সি. আই. ও. অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী করে গড়ে তোলার জন্য ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মিয়ামির ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল, পিটস্‌বার্গ ইউনিভার্সিটি, উইস্‌কনসিন ইউনিভার্সিটির স্কুল ফর ওয়ার্কার্স, জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটনের মাউন্ট ভেরনন কলেজের ইন্টার-আমেরিকান লেবার ইকনমিকস কোর্স প্রভৃতি। বিভিন্ন দেশ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের বাছাই করে আমেরিকাতে এনে, তাদের উচ্চবৃত্তি দিয়ে, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রম ও ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর আবার নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়। সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ৪০টি দেশের দেড় সহস্রাধিক কর্মীকে প্রতি বছর এইসব কোর্সে পড়ানো হয়। এদের অনেকেই যেমন বিভিন্ন দেশের এ.এফ.এল.-সি.আই.ও.-র পৃষ্ঠপোষিত বা আই.সি.এফ.টি.ইউ.-অনুমোদিত সংগঠনের নেতা, সংগঠক বা কর্মী, আবার ট্রেড ইউনিয়নে ভবিষ্যতে কাজ করবে এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকেও ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিজম ও বামপন্থার বিরোধিতা করা হলো এই সমস্ত কার্যকলাপের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। 'কমিউনিস্ট স্বৈরতন্ত্র'-এর বিরুদ্ধে এবং তথাকথিত উদার আমেরিকান

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে শ্রমিকদের মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়াসের নামে এ.এফ.এল-সি. আই.ও.-র পূর্বোক্ত তিন মহাদেশীয় সংগঠনগুলি তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির গণতন্ত্র-বিরোধী, স্বৈরতান্ত্রিক ও সামরিক একনায়কত্বের সরকারগুলিকে সমর্থন করে এসেছে; কমিউনিস্টদের প্রভাবিত বা বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য বিপুল অর্থ-ব্যয় ও পাল্টা সংগঠন তৈরির অজস্র নজির রয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। কোন কোন দেশে ঐ মহাদেশীয় সংগঠনগুলির প্রকাশ্য দপ্তর রয়েছে, আবার বহুদেশে আমেরিকান দূতাবাসের শ্রম-শাখার মাধ্যমেও এরা কাজ করে। সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রম-বিষয়ক ক্ষেত্রে ঐ তিন মহাদেশীয় সংগঠন ভূমিকা নেয় দেশীয় ট্রেড ইউনিয়ন বা নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনের মাধ্যমে। এই ধরনের কাজের অপর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অন্য দেশের শ্রমিকদের স্বার্থের বিনিময়ে আমেরিকান শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা। এই তিনটি বহুদেশীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে নানা শহরে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের সভা বা সম্মেলন আসলে পরিণত হয় সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে আমেরিকার বৈদেশিক শ্রম-নীতিতে বা গুপ্তচর-বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষদের সমাবেশে।

গ্যাট-চুক্তিতে সোস্যাল ক্লজ যুক্ত করার দাবী প্রথমে যেমন উন্নত দেশগুলির সরকার তুলেছিল, পাশাপাশি তুলেছিল সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলিও। সত্তরের দশকেই সুইডিশ ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস, ইন্টারন্যাশনাল মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, এ.এফ.এল-সি.আই.ও., ই.ই.সি.-ভুক্ত কয়েকটি দেশের ট্রেড ইউনিয়ন প্রথমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সোস্যাল ক্লজ যুক্ত করার দাবী তোলে। ১৯৭২-৭৪ সালে আই.এল.ও.-তে সোস্যাল ক্লজ প্রসঙ্গে প্রথম যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে উন্নত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলি অনুন্নত দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং সোস্যাল ক্লজের সংযুক্তির দাবী উচ্চকণ্ঠে তুলেছিল—তৃতীয় দুনিয়ার শ্রমিকদের স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের দেশের শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। ১৯৭৮ সালে ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটির (ই.ই.সি.) রিপোর্ট রচনায়, ১৯৭৯ সালে লোমে সম্মেলনে, ১৯৮০ সালে ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল কাউন্সিল প্রস্তাবিত সোস্যাল ক্লজ সম্পর্কিত দলিল রচনা ইত্যাদি থেকে শুরু করে অদ্যবধি প্রসঙ্গটি নিয়ে উন্নত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলি কার্যত ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিস্টদের ভূমিকাই গ্রহণ করে আসছে।

১৯১৭ সালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ১৯১৮-১৯১৯ সালে জার্মানিতে বিপ্লবের প্রয়াস ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন ছিল 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন' পত্তনের প্রধান পটভূমি। মাঝে মাত্র এক দশকের মতো সময় বাদ দিলে, বিগত ৭৫ বছর ধরেই আই.এল.ও.তে উন্নত পুঁজিবাদী সরকারগুলি, তাদের শিল্প প্রতিনিধি ও ঐসব দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির আধিপত্য রয়েছে। জন্মলগ্ন থেকে আই.এল.ও.-র ভূমিকা বিশ্লেষণ করে ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিজম পন্থী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সংস্থাটিকে চিত্রিত করেছেন "পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা ও কায়েম রাখার" অন্যতম আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান হিসাবে। এঁদের মতে "পুঁজিবাদ-অনুমোদিত কাঠামোর অভ্যন্তরে সামাজিক ও শিল্পগত পুনর্গঠনে শ্রমিকদের সংগঠিত অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে" এই সংস্থা এবং অন্যদিকে "কর্তৃত্বকারী গোঁড়াপন্থী ধনতান্ত্রিক শক্তির ভূমিকাকে গোপন করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার সীমানাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত রেখে" এই সংস্থা কাজ করে। এই সংস্থার তৎপরতায় কিছুটা সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসির বাতাবরণ রয়েছে। পূর্ব ইউরোপ এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ে এবং ডব্লু.এফ.টি.ইউ. ও সেটির অন্তর্ভুক্ত টি.ইউ.আই.গুলি কার্যত হীনবল হয়ে পড়ার পর, আই.এল.ও. তে এখন যেহেতু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রায় একচ্ছত্র প্রাধান্য নিয়েছে, সেহেতু সংস্থাটি এখন অনেকটাই ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিজমের ধারার পরোক্ষ অনুকূলে।

আমেরিকান ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আই.সি.এফ.টি.ইউ.-এর আন্তর্জাতিক ভূমিকা বর্তমানে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু 'ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিজম' বলে যে

ভূমিকাকে চিহ্নিত করা হয়, তার অস্তিত্ব রয়েছে পুরো মাত্রায়। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্বয়ং সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা গ্রহণ। তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলির জন্য উন্নত দেশগুলির আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির পূর্বোক্ত ধরনের সমস্ত পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও রূপায়ণের প্রধান কাজটাই এম.এন.সি.গুলির আর. অ্যাণ্ড ডি.-র দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিজমকে এজন্য স্পনসর করা হয় সার্বিকভাবে।

আলোচ্য বিষয়ক তাত্ত্বিকদের মতে বর্তমান বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি, এইভাবে, সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা ও আন্দোলন, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নতুন ফ্রন্ট খুলেছে—ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিজমের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদের নয়া ভূমিকার অন্যতম অংশ হয়ে উঠছে এই ধরনের ট্রেড ইউনিয়নগুলি।

গ্লোবাল বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নজম

উন্নত দেশগুলি বিশেষত এম. এন. সি.গুলির দ্বারা অন্য দেশে সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বব্যাপী উৎপাদন ও ব্যবসা করার সাথে অনেকটা তুলনীয় ভাবে উন্নত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলির দ্বারা অনুন্নত দেশে এক ধরনের 'গ্লোবাল বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম' তথা আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনার ব্যবসার এক প্রবণতার উল্লেখ করছেন কিছু সমাজতাত্ত্বিক। এই তত্ত্বটিকে 'ট্রেড ইউনিয়ন ইম্পিরিয়ালিজম-এর কাছাকাছি বলে অনেকটা মনে হলেও, এটির স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। 'গ্লোবাল বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম' ব্যবস্থা কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক ভূমিকার অন্তর্গত নয়, এই ধরনের তৎপরতায় যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে 'নিউলি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজিং ইকনমিক'-ভুক্ত দেশগুলির কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়নকেও। বর্তমান বিশ্বের তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ও সেগুলির প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে একটি প্রধান দেশ-কেন্দ্রিক তৎপরতা চালানোর মত, 'গ্লোবাল বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম' ব্যবস্থা হল একটি প্রধান দেশের প্রধান ট্রেড ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীভুক্ত অন্য দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সহযোগীদের নিয়ে গড়ে ওঠা ব্যবস্থা।

প্রথমদিকে কানাডা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাঠামো ও মর্মে 'আমেরিকানাইজেশন' ঘটানো ছিল 'আমেরিকান বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম'-এর তৎপরতার অন্যতম দিক। পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়নগুলির 'জাপানাইজেশন'-এর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল জাপানের আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালনকারী ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে, 'বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম' পদ্ধতির মাধ্যমে। আমেরিকান এ. এফ. এল.-সি. আই. ও.-র মতো তেমন কোন ব্যাপক প্রয়াস জাপানি ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে না ঘটলেও, জাপানি এম. এন. সি.গুলির সাথে জাপানি গ্লোবাল বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নজমের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। বিদেশে, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে, জাপানি এম. এন. সি.গুলির স্বার্থে কাজ করতে এবং ঐ সব দেশের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে এম. এন. সি-বিরোধিতাকে প্রতিহত করার জন্য উক্ত জাপানি ট্রেড ইউনিয়নগুলি ক্রমশ কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছিল। প্রধানত এই দুই ভূমিকা পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক গভীরতর করা, আর্থিক সাহায্য দান ইত্যাদি ছাড়াও সেগুলিকে জাপানি পদ্ধতির ট্রেড ইউনিয়নের কাঠামো ও চরিত্রে রূপান্তরের প্রচেষ্টা ছিল জাপানি বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজমের কাজের অন্যতম দিক।

তাছাড়া এ' হল এক নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নজম ব্যবস্থা, যা একটি অতি উন্নত দেশের সরকারের পৃষ্ঠপোষণা ও বাণিজ্য-অনুকূল রণনীতির জন্য গৃহীত। এই ব্যবস্থাতে, শিল্পোন্নত মূল দেশটির ট্রেড ইউনিয়ন অনুন্নত দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে উৎসাহ দেয় বা পরোক্ষে নানাভাবে বাধ্য করে রাজনৈতিক অন্তর্বস্তু-সম্পন্ন সংগ্রামের পথ ত্যাগ ও সংঘর্ষের পরিবর্তে মালিক পক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও ত্রি-পাক্ষিক চুক্তিতে মিলিত হতে। বিজিনেসকারী বিদেশী ট্রেড ইউনিয়নটি চেষ্টা করে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবী, যেমন মজুরি ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি নিয়ে তৎপরতা চালানো,

কাঠামোগত সংস্কার ও উদারীকরণ ইত্যাদির মতো সরকারী নীতিকে সমর্থন এবং 'সামাজিক চুক্তি'র পরিমণ্ডলে দেশীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আবদ্ধ রাখতে। সর্বোপরি, ধর্মঘট না করার পক্ষে শ্রমিকদের দাঁড় করানো হলো তাদের প্রধান কাজ। মূল দেশটির ট্রেড ইউনিয়ন অনুন্নত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে প্রশিক্ষণ দেয় পূর্বোক্ত লক্ষ্য থেকে এবং ট্রেড ইউনিয়নে সুবিধাভোগী নেতৃত্ব তৈরি করে, অন্যদিকে তৃণমূলে শ্রমিকদের মধ্যে জঙ্গীপনা যাতে সৃষ্টি হতে না পারে সেইমতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ব্যবহার করে। এই 'গ্লোবাল বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম'-এর বিনিয়োগ ও উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির কাজ বস্তুগত নয় বরং সামাজিক ও মানসিক, কিন্তু পরিণামে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। অনুন্নত দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষেত্রে নিজোপযোগী সংগঠকদের নির্বাচন এবং দুই দেশের মধ্যে টি. ইউ. কর্মী বিনিময়, থাকা-খাওয়া ও প্রশিক্ষণের ব্যয় বহন করে বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়ন। এই কাজ নানাভাবে সম্পন্ন হয়। বিজিনেসবাদী ট্রেড ইউনিয়ন অন্য দেশের ট্রেড ইউনিয়নকে আর্থিক মঞ্জুরি ও শিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। কখনো বা গ্রুপ-এক্সচেঞ্জ বা উভয়দেশের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য পরস্পরের দেশে যাতায়াত ও আলোচনার ব্যবস্থা হয়। কখনো তারা অন্য দেশের নির্বাচিতদের এনে প্রশিক্ষণ দেয়। এইভাবেই বিজিনেসপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের মতবাদগত পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা স্বদেশে ফিরে গিয়ে বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্য পূরণ করে ও আরও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে তদনুযায়ী গড়ে তোলে। এইভাবে বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থে বিনিয়োজিত মনুষ্য-পুঁজি থেকে উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হতে থাকে, মনুষ্য-পুঁজির পুনরুৎপাদন চলে এই প্রক্রিয়াতে।

একদিকে যখন তৃতীয় দুনিয়ার আক্রান্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি সংগঠন, দাবী-দাওয়া ও আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সর্বজনীন অ্যাজেণ্ডা রচনা ও রি-গ্রুপিং-এর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে তখন অন্যদিকে বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে সেইসব প্রয়াসের বিরুদ্ধে নিচ্ছে অন্তর্ঘাতী ভূমিকা। বর্তমানে গ্লোবাল বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজমের তৎপরতায় অন্যতম শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে আমেরিকা ও জাপান ছাড়াও জার্মানি, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু ট্রেড ইউনিয়ন। 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন'ও এক ধরনের পরোক্ষ সহায়তা দিচ্ছে গ্লোবাল বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজমে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে আই. এল. ও. এমন সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগত বিষয়ে চর্চা ও শ্রমিকদের মধ্যে নতুন উৎপাদন প্রণালী সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির নামে এমন সমস্ত গোষ্ঠী সভা, আলোচনা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে চলেছে, যা কার্যত সাহায্য করছে এম. এন. সি.গুলির সাথে অনুন্নত দেশের ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে এবং বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নগুলির পথকে সুগম করতে।

এই প্রসঙ্গে সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে।

এই 'বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম'এর কাজের নানা পদ্ধতি রয়েছে। ইন্দোনেশিয়াতে সরকার-পৃষ্ঠপোষিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এস. পি. এস. আই. কে শ্রমিকদের কাছে গ্রহণীয় করার জন্য আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর পক্ষ থেকে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর প্রতিদানে ইন্দোনেশিয়ার সংগঠনটি সেটির অন্তর্গত বহু সংগঠনের উপর আই. সি. এফ. টি. ইউ. প্রভাব সৃষ্টি করার কাজে নানা সহায়তা দেয় ;এস. পি. এস. আই. নিজেও আই. সি. এফ. টি. ইউ.-র অনুমোদন নিতে বাধ্য হয়। এছাড়া দেশীয় সরকারের পক্ষে এস. পি. এস. আই. কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ছাড়াও, আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর প্রদত্ত আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করা শুরু করেছে। ইন্দোনেশিয়ার একনায়কত্বমূলক সুহার্তো সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সমস্ত রোষ নিম্নগামী করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছিল এস. পি. এস. আই.। তবে ১৯৯৮ সালের প্রথমার্ধ থেকে আই. সি. এফ. টি. ইউ.-এর বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজমে যে মন্দা শুরু হয় তার প্রভাব পড়ে ইন্দোনেশিয়াতেও। সেখানে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেওয়া ছাড়াও আমেরিকান মডেলের পরিবর্তে জাতীয় মডেলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম প্রধানত চালাচ্ছে জাপানের দক্ষিণপন্থী

ও বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন—জাপানিজ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন—'রেনগো'। রেনগো কেবল জাপানি বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্বার্থের আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্ব করে না, এই সংগঠন মালয়েশিয়া ও থাইল্যাণ্ডে জাপানি মডেলের 'এন্টারপ্রাইজ ট্রেড ইউনিয়নিজম' ব্যবস্থাকে উৎসাহিত, প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করছে।

জাতীয় স্তরে গঠিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থাকে অপসারণ করে তার পরিবর্তে কারখানাভিত্তিক খণ্ড খণ্ড ইউনিয়ন গঠন-প্রথাকে বলা হয় 'এন্টারপ্রাইজ ট্রেড ইউনিয়নিজম'। এই ব্যবস্থার নানা উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণীর দেশভিত্তিক ঐক্য যাতে গড়ে না ওঠে; দ্বিতীয়ত, জাতীয় অর্থনীতি বা কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রম-বিরোধী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন যাতে শ্রমিকরা গড়ে তোলার সুযোগ না পায়; তৃতীয়ত, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ও কেবল অর্থনৈতিক দাবীতে সংগঠনকে আটকে রেখে শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার বিকাশের সম্ভবনারোধ; চতুর্থত, ইউনিয়নকে খণ্ড খণ্ড কাঠামোয় রাখতে পারলে একদিকে যেমন জাপানি বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে যে কোন যৌথ শ্রমিক-প্রতিরোধকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, অন্যদিকে 'রেনগো'র প্রভাব ও উদ্দেশ্যকে বিনা বাধায় ইউনিয়নকে দিয়ে গ্রহণ করানো ও অধীনস্থ রাখা সম্ভব হয়।

এন্টারপ্রাইজ ট্রেড ইউনিয়নিজম প্রথার উদ্ভব জাপানে। জাপানি পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যে সক্রিয়তা ও কার্যকারিতা প্রথমাবধি গড়ে উঠেছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এই এন্টারপ্রাইজ ট্রেড ইউনিয়নজম আরও বিশেষত এটা সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে নব-উদ্ভূত জাপানী প্রথা লীন-প্রোডাকশনে। তাই, পাশ্চাত্যের 'শপ ফ্লোর ট্রেড ইউনিয়নিজম' থেকে 'এন্টারপ্রাইজ ট্রেড ইউনিয়নিজম' স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। শপ-ফ্লোর ইউনিয়ন সমগ্র শিল্প বা জাতীয় কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত, কিন্তু 'এন্টারপ্রাইজ ট্রেড ইউনিয়নিজম' ছোট ছোট এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিয়ন। 'এন্টারপ্রাইজ ইউনিয়নিজম' এক ধরনের ব্যবস্থাপনা-নিয়ন্ত্রিত (ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলড) ইউনিয়ন ব্যবস্থা যা শ্রমিকদের যৌথ দর-কষাকষির শক্তিকে স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল করে দেয়। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই প্রথা ব্যবস্থাপনা-সমর্থক, সংরক্ষিত চরিত্রের এবং এক ধরনের অভিজাত শ্রমিক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তার ফলে ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত হওয়ার প্রবণতাই কমতে থাকে শ্রমিকদের মধ্যে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে জাপানি উৎপাদন পদ্ধতির এক প্রধান শ্লোগানের ভিত্তিতে, তথাকথিত 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' (এইচ. আর. এম.) বা মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনার চেষ্টাও শুরু করেছে 'রেনগো'। (এই হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের চরিত্র পরবর্তীকালে কিছুটা ব্যাখ্যা করা হবে।) সংক্ষেপে এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমানভাবে প্রতিষ্ঠানের সাথে একাত্ম করে তোলা। এই প্রয়াসে শ্রমিকদের বোঝানো হয় যে শ্রমিক ও মালিক এক সর্বজনীন স্বার্থেই কাজ করে চলেছে। ব্যাবস্থাপনার রণনীতি হিসাবে এইচ. আর. এম. কেবলমাত্র শ্রমিকদের জঙ্গী প্রবণতা লোপ করার জন্যই ব্যবহৃত হয় না, এই ব্যবস্থাকে কোন কোন ইউনিয়নে ব্যবহার করা হয় 'বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়ন'-এর অধিকতর যোগ্য সহযোগী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। এই সমগ্র পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে 'জাপানাইজেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস' বা ট্রেড ইউনিয়নগুলির জাপানিকরণ। সিঙ্গাপুরের 'ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (এন. টি. ইউ. সি.) দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সমাজতান্ত্রিক চীন ও ভিয়েতনামে প্রসারিত ও সংহত করার জন্য শেষোক্ত দেশ দুটির ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজমের অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা শুরু করছে। সিঙ্গাপুরের এন. টি. ইউ. সি. সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক মডেল সমর্থক ও কাঠামো হিসাবে। চীন ও ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজমের প্রয়োগ কিছুটা বিচিত্র ধরনের। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—দু'ধরনের আর্থনীতিক ব্যবস্থা হলেও উভয় ধরনের রাষ্ট্রের অন্তর্গত ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সমন্বয় করার এক অভিনব পরিকল্পনা নিয়েছে বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম। সমাজতান্ত্রিক চীনের এ. সি. এফ. টি. ইউ-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে এরা হাতে নিয়েছে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের প্রকল্প। এই প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণের অন্যতম প্রধান 'কারিকুলাম' হলো পুঁজিবাদী উৎপাদনের চরিত্র এবং এম. এন. সি.গুলির ব্যবসায়িক

স্বার্থের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশের ট্রেড ইউনিয়নের যে কোন বিরোধ নেই তা শেখানো।

মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম

'মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম' তত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে, "এই প্রথা এমন এক ইউনিয়নবাদিতা যা কেবলমাত্র বিশিষ্ট ধারার আন্দোলন গড়ে তোলে না যাকে বলা যায় 'মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম', বরং অনুরূপ আন্দোলনে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালন করে—অর্থাৎ এ' হল এমন এক ট্রেড ইউনিয়নবাদিতা যা কর্মক্ষেত্রভিত্তিক গঠিত এবং যার শিকড় রয়েছে সমাজে; গণতান্ত্রিক, মতবাদ গত এবং এমন ধরনের আন্দোলনে মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম আনুগত্যসম্পন্ন যা যে কোন ধরনের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করবে এবং মৌলিক পরিবর্তন আনবে।"

"মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম বাইরের দিকে দৃষ্টি উন্মীলিত করে যাত্রা শুরু করে না, বরং এর কাজ শুরু হয় অভ্যন্তরের প্রতি নজর রেখে। এই আন্দোলন-তত্ত্বে কর্মক্ষেত্র হলো বুনিয়াদি দিক। শেষোক্ত এই উপাদানটিই শ্রমিককে যৌথ তৎপরতার প্রাসঙ্গিকতা বা অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলে। কর্মক্ষেত্রই হলো সেই বেদীভূমি যেখান থেকে শ্রমিকরা তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষমতা সঞ্চয় করে।"

বুর্জোয়া-লিবারাল এবং এক ধরনের নয়া-ট্রেড ইউনিয়ন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা গঠিত মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজমের সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা গঠনের প্রস্তাবিত পরিপ্রেক্ষিতটি যেমন অভিনব, অন্যদিকে মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম-এর প্রস্তাবিত কর্মধারাও অনেকটাই নতুন ধরনের। এরা ক্যাপিটালিজমকে ক্ষতিকর মনে করলেও, বিকল্প হিসাবে সোস্যালিজমকে অস্বীকার করে, অথচ পুঁজিবাদের থেকে ভিন্ন এক ধরনের বিকল্পের জন্য প্রস্তাব করে। এই তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কানাডাতে শুরু করা হলেও দাবী করা হচ্ছে যে এই তত্ত্ব সর্বজনীন চরিত্রের এবং আগামী একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার পক্ষে এই প্রথা নাকি কার্যকরী হবে। কানাডিয়ান অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (সি. এ. ডব্লু.) সভাপতির সহকারী এবং শ্রম বিষয়ক অর্থনীতিবিদ সাম গিনডিন এই তত্ত্বের উদ্‌গাতা। তিনি ভ্রূণাকারে এই প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপন করেছেন তার রচিত 'কানাডিয়ান অটো ওয়ার্কার্স ঃ দা বার্থ অ্যাণ্ড ট্রান্সফরমেশন অব আ ইউনিয়ন' (১৯৯৫) শীর্ষক পুস্তকে।

এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে পৌঁছে এখন এটি স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে যে শ্রমিকশ্রেণীর বিস্তারের উপর সমাজতন্ত্রের যে অগ্রগতি ও সাফল্য নির্ভরশীল ছিল, শ্রমিকশ্রেণীর বিস্তার থেমে যাওয়া শুধু নয়, সংখ্যাগতভাবে ক্রমাগত হ্রাস প্রাপ্তির ফলে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার এখন সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। স্বভাবতই ধনতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্রের ধারণাও এখন অবাস্তব। সুতরাং প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সমাজতন্ত্রের প্রকল্পের পরিবর্তে পুঁজিবাদের বিকল্প নতুন কোন প্রকল্প কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেটির লক্ষ্য কি হবে? তাছাড়া, শ্রমজীবীদের পক্ষে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের এমন কোন্ সংস্কৃতি, তথা নয়া চরিত্রের আন্দোলন গড়ে তোলা কিভাবে সম্ভব হবে? অথবা ক্যাপিটালিজমের বিকল্পের ভাবনা ও প্রয়াসকে কিভাবে উজ্জীবিত রাখবে শ্রমিকশ্রেণী?

'ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর সর্বোচ্চ এক নেতৃত্ব তাঁর সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "...এই নতুন প্রজন্ম (শ্রমিক নেতৃত্বের) স্বীকার করেন যে নতুন বিশ্বায়িত অর্থনীতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকায় চিরকালের জন্য পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ...শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগগুলির সংকোচন মেনে নিতে হবে, অন্যদিকে ইউনিয়নগুলিকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নতুন পথ খুঁজতে হবে। ইউনিয়নের অ্যাজেণ্ডা হওয়া উচিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতাবাদিতা; তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের সব কিছুকেই সাবলীল ও দক্ষ করে তুলতে হবে।" (বিজিনেস উইক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৬)। এই উদ্ধৃতি প্রয়োজন এজন্যই যে বি. টি. ইউ. সি.-র পক্ষ থেকেও এক নতুন ট্রেড ইউনিয়ন তত্ত্ব হিসাবে কার্যত 'মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম'কেই প্রস্তাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। অন্তত 'মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম'-পন্থীদের দাবী তাই। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের আংশিক অনুকরণে, কিন্তু কার্যকালে সেই তত্ত্বের বিরোধিতাকে মর্মে রেখে, 'মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম' মনে করে যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্বীয় সৃষ্টির কালে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপসারণ এবং শ্রমিক-ঐক্য গঠনের প্রয়াস নিয়েছিল।

কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেসব প্রশ্ন, প্রসঙ্গ ও সমস্যাকে সামনে রেখে মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম তাদের তাত্ত্বিক নির্মাণটিকে উত্থাপনের চেষ্টা করে, সেগুলির অন্যতম হলো ঃ আজকের যুগে বৃত্তির প্রশ্নে শ্রমিকদের মধ্যে আরও তীব্র ও ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনের মানসিকতা ও ভূমিকাকে আবার নতুন করে শ্রমিকদের মধ্যে পুনর্জাগরিত করা জরুরি। তবে এজন্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। প্রসঙ্গত প্রশ্ন তোলা হয়েছে অন্যের কাজের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে তার বিনিময়ে নিজের কাজকে সুরক্ষিত করার কোন নৈতিক ভিত্তি শ্রমিকশ্রেণীর থাকা উচিৎ কি? এই তত্ত্ব অন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সমালোচনা করেছে, কিভাবে শ্রেণী-ঐক্য গড়ার বর্তমানের ট্রেড ইউনিয়ন রণনীতি কার্যকালে কোম্পানির স্বার্থে, মালিক বা জাতীয় মূলধনের সাথে ঐক্য গড়াকে সমর্থন করে। এবং এইভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবহৃত হয় শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপসারণের নামে বৃহত্তম সংখ্যক শ্রমিককে ছাঁটাই বা বেকার করতে ও রাখতে। একেই দাবী করা হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান বলে। কিন্তু এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একাংশের শ্রমিকের জয়ের অর্থই হলো অপরাংশ শ্রমিকের পরাজয়। যদি উচ্চ প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন একাংশ শ্রমিকের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা, জয় অর্জিত হয়, তবে তার পরিণামে জাতীয় অর্থনীতিতে অন্যান্য অংশের অদক্ষ, আধা-দক্ষ, অনিয়মিত প্রভৃতি ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে? ধনতন্ত্রে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র প্রকৃত অর্থ হলো উৎপাদনশীলতা, অর্থাৎ মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে পুঁজিবাদ নিজের স্বার্থে বিশেষ কিছু ধরনের "দক্ষতা" এবং "উৎপাদনশীলতা"কেই কেবল স্বীকার করে। মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজমের প্রবক্তারা একথা বলেও আধুনিক পুঁজিবাদকে আক্রমণ করেছেন যে কাঠামো-পুনর্গঠনের (স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট) গতিশীলতার মতোই ধনতন্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক শক্তিশালী মতবাদ হিসাবে কাজ করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতবাদ সবসময়েই প্রশ্নাতীতভাবে পুঁজিবাদের অগ্রগতির মৌলিক মাধ্যম; পুঁজিবাদ এও মনে করে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যা সামান্য ত্রুটি ঘটে তা' ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এই ধরনের অন্যতম বক্তব্যের দ্বারা, পুঁজিবাদের বর্তমান ধারা, ভবিষ্যতে যে কোন বিকল্পের বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম মনে করে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতবাদ কারো শুভ ঘটাতে পারে না। কেননা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সব সময়েই নতুন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে হাজির করতে থাকবে, এমনকি পুঁজিবাদের নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকেও। তাছাড়া শুরুর অধ্যায় থেকেই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ক্রমান্বয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে সংক্রমিত করা, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির স্বীয় সদস্যদের রক্ষা করার ক্ষমতা অপহরণ করা।

তাই মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নবাদীরা মনে করেছেন যে মূলধনের মোকাবিলা করতে হবে। এবং সেকারণে শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যসাধন সবচাইতে জরুরি কাজ। এঁদের দাবী যে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ'র পরবর্তীকালে এবং শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থীদের পরাজয়ের ফলে শ্রমিক আন্দোলন নাকি অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে! কিন্তু অগ্রগতির সামনে রয়েছে অন্তর্নিহিত বহু সমস্যাও। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই এঁরা যে প্রসঙ্গের সমাধান করতে চান তা হলো "কিসের জন্য ঐক্য—এই প্রশ্নের সমাধানে সংগ্রাম না করে ঐক্য অর্জন করা যাবে না।" এক্ষেত্রেও প্রধান ও প্রথম সমস্যা হিসাবে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে সুদীর্ঘকাল ধরে ক্রমান্বয়ে আমলাতান্ত্রিকীকরণ ঘটেছে। দ্বিতীয়ত তাঁরা বলেছেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সম্পর্কিত আবহমানকালের বিশ্বময় কতকগুলি ধারণা, ব্যবস্থা ও সংগঠনের কাঠামো ও চরিত্র সম্পূর্ণ অকার্যকরী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, সেগুলি এখনও বয়ে বেড়ানো হয়। এই পরম্পরাগুলিই স্বয়ং সদস্যদের সমবেতকরণের সামনে বর্তমানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয় সমস্যা হিসাবে এঁরা দায়ী করেছেন আধুনিকতাবাদীদের (মডার্নিস্ট) একাংশকে, যাঁরা বাস্তববাদিতার (রিয়ালিজম) নামে শ্রমিকদের খোদ আশা-আকঙ্ক্ষারই পুনর্গঠন করতে চান এবং সমাজের প্রতি শ্রমিকদের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করার নামে কার্যকালে শ্রমিকদের ব্যবহার করতে চান পুঁজিবাদের সামনে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলি দূরীকরণে। শেষোক্তদের তথাকথিত আধুনিকতার প্রয়াস কার্যকালে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে শ্রমিকদের দূরে সরিয়ে দিতে থাকে এবং এইভাবে বিনষ্ট করে শ্রমিকদের জঙ্গীপনা, প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

এবং ক্যাপিটালিজমকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা। তদুপরি, এই প্রক্রিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে দর-কষাকষির সমগ্র প্রথাকে সংগঠনের সদস্যদের মনোভাব, চাহিদা ও ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং পরিণত করে নিছক নেতৃত্ব ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে দাবী-দাওয়ার বিষয়ে প্রাণহীন চুক্তিবদ্ধতায়। এই পন্থাই শেষ পর্যন্ত নিয়োগকারীর সাথে ট্রেড ইউনিয়নের এক ধরনের 'পার্টনারশিপ'-গড়ে তোলে। শ্রমিক-রাজনীতিকে এই ধারা ক্রমান্বয়ে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক মতবাদ অনুসারী করে শ্রমিক আন্দোলনকে শেষপর্যন্ত অর্থাৎ অন্তিম লক্ষ্য হিসাবে সরকারে অংশীদার হওয়ার জন্য নির্বাচন-নির্ভরতায় পরিণত করে। এসবের মধ্য দিয়ে শ্রমিক জমায়েতের উপাদানটি নিছক পিছনেই পড়ে যায় না কেবল, এক বিপজ্জনক আত্মমুখীন পাল্টা আঘাতেও পরিণত হয়।

এ সব ত্রুটিপূর্ণ ঐতিহ্যের পরিবর্তে, ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে না তুলে এবং তা' ফলবতী করতে হলে সমবেতকরণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ছাড়া কোন পথ নেই। মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নপন্থীদের বিশ্বাস যে এর অন্যথা ঘটলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অগ্রগতির পরিবর্তে পিছিয়ে পড়বে। কানাডায় শ্রমিক আন্দোলনের সাম্প্রতিক অনেকগুলি আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম নিজেদের এই নতুন লাইনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সম্পদের বড় অংশ ব্যয় করছে শ্রমিকদের সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করার এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনের কাজে। এরা প্রতিষ্ঠা করেছে 'ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার্ক অরগানাইজেশন'— যে শাখা শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলিকে চিহ্নিত করে, শ্রমিক-মালিক দর-কষাকষিতে এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য গড়তে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা নেয়। এঁরা দাবী করেন যে পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিসম্মত ও কার্যকরী প্রয়াসের ফলে পূর্বের বহু আলাদা আলাদা সংগঠনের একত্রীকরণ ঘটছে, এবং তা' নিছক ক্ষেত্র (শিল্প, বৃত্তি, কারখানা)-ভিত্তিক নয়, মতাদর্শগতও।

এঁরা ধর্মঘটের পরিবর্তে কাজ বন্ধ করার এক অভিনব পদ্ধতি চালু করেছে যাকে বলা হচ্ছে 'ওয়ার্ক-প্লেস শাট ডাউন'। মালিকশ্রেণী, সরকারী আইন বা সরকারের বিরুদ্ধে বা দাবী-দাওয়া অর্জনের জন্য কেবল এই ধরনের আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন হলো জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। একদিনের 'ওয়ার্কপ্লেস শাট ডাউন'-এর ফলে উৎপাদনের যতোটা ক্ষতি হয়, তার চেয়ে যে কারণগুলির জন্য হাজার হাজার শ্রমিকের সর্বক্ষণের ও বিপুল ক্ষতি হচ্ছে, তার প্রতি জনগণ দৃষ্টি দেবে না কেন, জনগণ কেন সৃষ্টি করবে না সরকার ও মালিকদের উপর চাপ? অতীতে আন্দোলন বা ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে মালিক/সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতো শ্রমিকশ্রেণী। মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের উপর চাপ সৃষ্টি করে, জনগণের দ্বারা মালিক/সরকারের উপর চাপ সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। এই ধরনের 'অ্যাকশন'এর মধ্য দিয়ে প্রথমে একটি কারখানার অভ্যন্তরের শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে, ক্রমে অন্য কারখানার শ্রমিকদের সাথে, সর্বোপরি জনগণের সাথে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের ঐক্য গড়ে ওঠে বলে এঁদের দাবী। এর দ্বারা বাড়তে থাকে ট্রেড ইউনিয়নের 'মবিলাইজেশন' বা জমায়েতের শক্তি।

মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজমের সামনে 'রিয়াল ইস্যু' অর্থাৎ প্রকৃত প্রসঙ্গ হলো "যে বিকল্পের প্রত্যাশা হচ্ছে তা' বিকল্প নীতি (অল্টারনেটিভ পলিসি) বা বিকল্প সরকার (অল্টারনেটিভ গভর্নমেন্ট) নয়, বিকল্প রাজনীতি (অল্টারনেটিভ পলিটিকস)। কেননা শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে দেশে গৃহীত কোন তাৎপর্যপূর্ণ নীতি বা শ্রমিকদের প্রতি রাষ্ট্রে অধিষ্ঠিত সহানুভূতিসম্পন্ন কোন সরকার শ্রমিকের জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না, যদি না সেই সমস্ত নীতি ও ব্যবস্থা মূলধনের বিরুদ্ধে বুনিয়াদি চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হয়। স্বভাবতই বিকল্পকে সম্ভবপর করতে দরকার শ্রমিকদের নেতৃত্বে তেমন ধরনের আন্দোলন, যা বদলে দেবে প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে (পলিটিক্যাল কালচার), প্রাত্যহিক সংগ্রামে ক্রমবর্ধমানভাবে মানুষকে সামিল করবে (নিজেদের জীবনকে গঠন করতে যৌথভাবে যুক্ত হওয়া), এবং সংগঠকদের ধারণা ও সাংগঠনিক দক্ষতাকে গভীরতর করার সাথে সাথে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতি গভীর আনুগত্য সৃষ্টি করবে (সমাজবাদীদের চেতনাকে

উন্নততর করা)।" নীতি ও পদ্ধতি মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম হিসাবে রাজনৈতিক নির্বাচনে ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে না, তবে এঁদের বক্তব্য হলো যে অংশগ্রহণের ফল দিয়েই কাজকে বিচার করতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচনে অংশগ্রহণ দ্বারা জমায়েত করার ক্ষমতা ও দক্ষতা, আন্দোলনের গঠন এবং জনগণের অধিকার ও অন্তঃশক্তি সম্পর্কে বোধ কতোটা জাগরিত হল তা'ই প্রধানত বিবেচ্য।

ট্রেড ইউনিয়ন যেহেতু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নের স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের উপর নির্ভর করতে হয়, সুতরাং পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকদের সমবেত করার পূর্বশর্ত হলো শ্রমিকদের মধ্যে তাদের আপন সংগঠন হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নকে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে। আর এই কাজে ইউনিয়নকে সর্বাগ্রে ও সবসময়ে সাংগঠনিক ও মতাদর্শগতভাবে মূলধনের প্রভাব থেকে স্বাধীন থাকতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়নের গণতন্ত্রকে আনুষ্ঠানিক হওয়ার পরিবর্তে হতে হবে প্রকৃত। প্রতিটি স্তর, পদক্ষেপ, সংগঠন ও আন্দোলন গঠিত হবে সর্বাংশের অনুগামীদের তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য পরিবর্তনের সংগ্রামে প্রত্যেক সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটবে। অন্যদিকে এই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্র হয়ে উঠবে কার্যকরী (এফেক্টিভ ডেমোক্র্যাসি)।

ট্রেড ইউনিয়নের ছোট-বড় প্রত্যেকটি আলোচিত, অনালোচিত প্রসঙ্গ নিয়ে ক্রমাগত পর্যালোচনা চালানোর মধ্য দিয়ে সংগঠনের কাঠামোর প্রসার ঘটিয়ে মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম শ্রমিকদের জীবনের কেন্দ্রে ইউনিয়নকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর দ্বারা সংগঠনের গণতান্ত্রিক চরিত্রের শ্রীবৃদ্ধি হবে এবং সংগঠন ক্রমান্বয়ে গভীর আত্মীয় হয়ে উঠবে শ্রমিকদের কাছে। শ্রমিকের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী প্রভৃতি ছাড়াও নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে শ্রমিকদের যোগাযোগ বা সম্পর্ক রাখতে হয় তাদের সবার সাথে ক্রমান্বয়ে সম্পর্ক স্থাপন করে যেতে হবে ইউনিয়নকে। অর্থাৎ এক কথায় সমাজের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের যে কোন সামান্য বাধা বা পার্থক্যকে দূর করে গড়ে তুলতে হবে এক সমগ্রতা।

শ্রমিকদের কাছে সব সময়েই অবিলম্ব সমস্যা হলো বৃত্তি বা বৃত্তির নিরাপত্তা, ক্রমে সামাজিক নিরাপত্তা, জীবনের উন্নতি ইত্যাদি। এগুলির সমাধানে ট্রেড ইউনিয়ন সরাসরি কর্তৃত্ব করতে পারে না। এজন্য মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম ক্রমান্বয়ে বিকল্প প্রকল্প বা ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী; যেমন 'জব ডেভেলপমেন্ট বোর্ড', 'ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড' প্রভৃতি ধরনের নানা কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের পত্তন করতে হবে। আধুনিক ধনতন্ত্রের পক্ষ থেকে জনগণকে বোঝানো হচ্ছে যে পুঁজিবাদের কোন বিকল্প নেই তথা 'দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ' (টি. আই. এন. এ. বা টিনা)। এঁরা পুঁজিবাদের এই শ্লোগানের তাৎপর্যকে আরও ব্যাপক পরিসরসম্পন্ন বলে মনে করেন; এঁদের মতে আসলে এই শ্লোগান হলো "দেয়ার ইজ নো হিউম্যানি অল্টারনেটিভ" (টি. আই. এন. এইচ. এ. বা টিনহা)। এঁদের দাবী যে পুঁজিবাদের এই ভয়ংকর চ্যালেঞ্জের জবাব দেবে মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম।

প্রসঙ্গত একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, অতীতে আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নের বিশ্বস্ত সহযোগী ও অনেকাংশে অধীনস্থ এবং অনুকরণকারী হিসাবে ভূমিকা পালন করার পর বিগত কিছুকাল যাবৎ কানাডার ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে এখন যে নিজস্ব সক্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছে 'মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম' তত্ত্ব তার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। এই তত্ত্বের জন্য হোক বা না হোক, ১৯৯৪-১৯৯৭ সালের মধ্যে কানাডাতে অনেকগুলি জঙ্গী শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে ও তাতে অনেকটা সাফল্যও ঘটেছে।

ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজম ও প্রাসঙ্গিক তত্ত্বগুলি

সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজম তত্ত্বের উদ্ভব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বলা যায় যে পূর্বে আলোচিত মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজমের তত্ত্বের কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবের সাথে এটির অনেকটা মিলও রয়েছে। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ ভূখণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের কিছুটা নতুন উত্থানের পটভূমিতে এই 'ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট

ইউনিয়নিজম' তত্ত্বের উদ্ভব। এই তত্ত্বে যাঁরা বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাঁদের অন্যতম হলেন কিম মুডি, পি.কে.এডওয়ার্ড ও রিচার্ড হাইম্যান, ড্যানিয়েল বেনসেইড, গ্লেন পারুসেক ও কেন্ট ওরসেস্টার, ড্যান গ্যালিন, স্যাম গিনডিন, স্টিফেন লেরনার, মিচেল আইসেনশচার, গ্রে সেইডম্যান, টিম শেচরমেরহর্ন প্রমুখ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, লিবারাল লেখক, লেবার-ইকনমিস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা শাখার অধ্যাপক, স্ব-ঘোষিত বামপন্থী প্রভৃতি।

ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজম-এর উদ্গাতারা মনে করেছেন যে মধ্য-নব্বই-এর দশক থেকে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের নতুন কাঠামো অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এখন বিশ্বময়, কিন্তু বিশ্ব-অর্থনীতি এখনও খণ্ড খণ্ড এবং প্রচণ্ড উচ্চাবচ। একবিংশ শতাব্দী যতোই সমাসন্ন হচ্ছে, ততোই ক্রমশ বাড়ছে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের তৎপরতা, এটির কাঠামোসমূহ ও ফলাফলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশ ও জনগণের বিদ্রোহ। শ্রমিকশ্রেণীও রয়েছে গভীর পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায়; প্রায় সর্বত্রই শ্রমিকশ্রেণীর গঠন-প্রকৃতি হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড ধরনের বিভিন্নতাসম্পন্ন; শ্রমিকশ্রেণীর নতুন বিন্যাসে নারী ও অভিবাসীদের সংখ্যা বিশেষত ক্রমবর্ধমান; শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের পরম্পরাগত উচ্চাবচতায় এখন ভিন্ন মর্ম সৃষ্টি হচ্ছে এবং পুরানো মাপকাঠি দিয়ে সংগঠনের শক্তি বিচার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে—সর্বোপরি শ্রমিক সংগঠন সর্বত্রই পরিবর্তিত হচ্ছে। নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার দ্বারা যদিও শ্রমিক বিদ্রোহের আন্তর্জাতিক পটভূমিকা এখন রচিত হয়েছে, তথাপি এখনও পর্যন্ত সংঘটিত সমস্ত বিদ্রোহ জাতীয় ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে আবদ্ধ। অথচ এখন কর্মের ঐক্য গঠন করা একান্ত জরুরি—বর্ণ, জাতি ও লিঙ্গের ঘেরাটোপ এবং জাতীয় ভৌগোলিক সমস্ত সীমানা ভেদ করে। বিদ্রোহের বর্তমান ঘটনাবলী ও রূপগুলি যে যথার্থ ফল অর্জন করতে পারছে না তার অন্যতম কারণ হলো প্রচলিত শ্রমিক সংগঠনের তথা ট্রেড ইউনিয়নের এক উল্লেখযোগ্য অংশের নেতৃত্বের দোদুল্যমানতা। ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের শ্রমিকশ্রেণী ১৯৯৬ সাল থেকে বিদ্রোহাত্মক অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট করলেও ইউরোপের 'সোস্যাল পার্টনার'বাদী ইউনিয়নগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'বিজিনেস ইউনিয়নবাদী'রা (পূর্বে আলোচিত বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম থেকে এই ধারণা স্বতন্ত্র) বা জাপানের 'এন্টারপ্রাইজ ইউনিয়ন'বাদী ধারার ট্রেড ইউনিয়নগুলি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত রয়েছে শ্রমিকদের বর্তমান কালের সমস্যা সম্পর্কে এবং শ্রমিকদের কার্যকরী আন্দোলনে নিয়োজিত করতে। ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নবাদীরা অভিযোগ করেছেন যে এক নতুন তত্ত্বের দ্বারা নেতৃত্বের এই নিস্পৃহতাকে ট্রেড ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলছে—'নিউ ট্রেড ইউনিয়ন রিয়ালিজম'। এই 'নিউ ট্রেড ইউনিয়ন রিয়ালিজম' তত্ত্ব, কার্যকালে, 'সোস্যাল পার্টনারশিপ' 'এন্টারপ্রাইজ ইউনিয়নিজম' এবং 'বিজিনেস ট্রেড ইউনিয়নিজম'এর সঙ্কলিত, সমন্বিত এবং আধুনিক পরিণাম। 'নিউ ট্রেড ইউনিয়ন রিয়ালিজম' তত্ত্বে বলার চেষ্টা হয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়ন নতুন বিশ্ব-বাস্তবতাকে কোনভাবেই উপেক্ষা করতে পারে না। মেগা-কর্পোরেশনগুলির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা- ভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তৎপরতায় ট্রেড ইউনিয়নকেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারদের সাথে এই লক্ষ্যে সহযোগিতা করতে হবে। জাতীয় বা আঞ্চলিক মূলধনের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের পার্টনারশিপের মনোভাব ও ব্যবস্থাই কেবল শ্রমজীবীদের বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকার সুযোগকে সুনিশ্চিত করতে পারে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা এই 'নিউ ট্রেড ইউনিয়ন রিয়ালিজম'-এর মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত ও মালিকদের সপক্ষে শ্রমিকদের "বেতন ও সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয় ছাঁটাই করা"কেও সঙ্গত বলে মত প্রকাশ করেছেন (১৯৯৭)। এঁদের মধ্যে রয়েছে ফ্রান্সের কঁফেদারেত ফ্রাঁকাইজ দেমোক্রাতিক দ্যু ত্রাভেইল (সি. এফ. ডি. টি.)-এর নিকোলে নোতাত, ব্রিটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন মঙ্কস, জার্মানির আই. জি. কেমি'র (কেমিকেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) হামবেরটাস স্মোলডট, প্রাক্তন কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত ইতালির কনফেদারেজিওনি জেনেরালে ইতালিয়ানা দেল ল্যাভোরো (সি. জি. আই. এল.)-এর সেরগিও কফেরাতি, স্পেনের

প্রাক্তন কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত কমিসিওনিজ ওবরেরসি-এর এন্তনিও গুতাইরেজ প্রমুখ। অবশ্য এই ধরনের মতবাদী নেতৃত্বের দ্বারা মাঝে মাঝে আন্দোলনের ডাকও দেওয়া হয়। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নের প্রবক্তারা সমালোচনা করে বলেছেন যে, 'নিউ ট্রেড ইউনিয়ন রিয়ালিজম'-এর নেতারা আন্দোলন ডাক দেওয়ার সময় পুরানো ধারণার বশবর্তী হয়েই কাজ করেন। অথচ তারা লক্ষ্য রাখেন না যে মূল পরিস্থিতির অভ্যন্তরে গভীর ফাটল সৃষ্টি হয়েছে—মূলধনের নতুন চাহিদা বনাম ট্রেড ইউনিয়নের পরম্পরাগত লড়াই-এর রণনীতি ও কৌশলসমূহের ক্ষেত্রে। বিনষ্ট হয়েছে পূর্বের সমস্ত ধরনের স্থায়িত্ব। তাই সংগ্রাম চলার সময়েও এই ধরনের ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঝেড়ে ফেলতে পারে না পূর্বের 'স্টেবিলিটি' ও মালিকপক্ষের সাথে বার্গেনিং বা দর-কষাকষির ধারণাকে।

এইভাবে বর্তমান লিবারাল ট্রেড ইউনিয়নের ঝোঁকগুলিকে সমালোচনা করার পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নবাদীরা ট্রেড ইউনিয়নের সোস্যাল বা সামাজিক বিবর্তনের কিছু দিকও মূল্যায়ন করেছেন নিম্নোক্তভাবে। দেশে দেশে, বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব ইউনিয়ন, আন্দোলনে দায়িত্ব গ্রহণ করা শুরু করেছিলেন পুঁজিবাদের নতুন পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার অন্তর্বর্তী অধ্যায়ে। আশির দশকের শুরু থেকে একদিকে পুঁজিবাদের দৃশ্যত অনেকটা অসাড় অবস্থা ও অন্যদিকে কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল ছিল এটি। এইরকম কাল-পর্বে সৃষ্ট নতুন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব, "নতুন বিশ্ব ধারণা"র বশবর্তী হয়ে, গ্রহণ করেছিল পুঁজিবাদের সাথে সহযোগিতার নীতিকে। তখনকার "বাস্তববাদিতা"র (রিয়ালিজম) ধারণায় পুঁজিবাদের স্তরটিকে এঁরা 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্র্যাসি'র যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। সাধারণ শ্রমিকদের কাছ থেকে এদের মতবাদ ততক্ষণ পর্যন্ত তেমন কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি, অন্তত যতক্ষণ না ধনতন্ত্রের প্রকৃত ও ভয়ংকর ধরনের পরিবর্তনের ঝাঁকুনিতে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। এইভাবে শুরু করে, নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি পৌঁছে, নেতৃত্ব ও সংগঠকদের মধ্যে যেমন চিন্তার ফারাক ঘটে গেছে, অন্যদিকে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের গৃহীত সমস্ত নীতি ও তৎপরতার সাথে মালিকশ্রেণীর। কেননা পুঁজিবাদের নতুন রূপ পূর্বোক্ত প্রজন্মের নেতৃত্বের মানসিকতার স্তরে স্তরে জমে উঠা সমস্ত মতবাদ, সংগঠনের কাঠামো সম্পর্কে ধারণা, দাবীর চরিত্র, সরকারী শ্রম-আইনের তাৎপর্য, কার্যকারিতা ও প্রয়োগ, দর-কষাকষি, চুক্তির ব্যবস্থা প্রভৃতির পরম্পরা নেতৃত্বসহ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকেই দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলেছিল। বহুজাতিক সংস্থাগুলির নতুন উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক চরিত্র ট্রেড ইউনিয়নের পুরানো প্রথাগুলিকে অকার্যকর করে ফেলা সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন-নেতৃত্ব সংগঠনের কাজকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল জাতীয় স্তরে এবং জাতীয়তাবাদী ধারায়। এই সংকটের ফলে সর্বত্রই যে প্রশ্নটা এই সময় থেকে শ্রমিক আন্দোলনে উঠতে শুরু করে তা' হলো—এই অবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনে কার্যকরী কি করা দরকার? কেননা, আন্তর্জাতিক ভাবে সৃষ্ট এই নতুন বাস্তবতায় রাজনৈতিক বা অন্য যে কোন স্তর অথবা ক্ষেত্রের তুলনায় শ্রমিক আন্দোলনের সামনে সবচাইতে বেশি পরিবর্তন অনুভূত হচ্ছিল।

'ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজম'এর ধারা মোটামুটি পূর্বোক্তভাবে ট্রেড ইউনিয়নের পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছে। তবে, দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন উত্থানের প্রবণতা থেকে এখনই এঁরা এই সিদ্ধান্তে যেতে চান না যে ভবিষ্যতে শ্রমিক আন্দোলন উচ্চতর শ্রেণী-সংগ্রাম হিসাবে পুনরায় বিকশিত হতে থাকবে। তারা এখনও নিশ্চিত নন, যেভাবে হঠাৎ এই আন্দোলনের উদয় হয়েছে তেমনই হঠাৎ তা' অস্তমিত হবে কিনা। কিন্তু এ' বিষয়ে তারা অনেকটাই নিশ্চিত যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে অভিঘাত এই আন্দোলন ও ধর্মঘটের জন্ম দিয়েছে তা' সহসা প্রত্যাহৃত হবে না। তার অন্যতম কারণ হলো 'লীন-প্রোডাকশন' ব্যবস্থার ভয়ঙ্কর শ্রমশক্তি শোষণ এবং নতুন বাজারের নিয়মগুলি, অথচ যা ধনতন্ত্রের মুনাফার সংকটকে কাটাতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে মুক্ত-বাজার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। অতীতের পুঁজিবাদের ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে যদি অনেকটাই নির্দেশাত্মক বলে ধরা যায়, সোস্যাল মুভমেন্টবাদীরা বলেছেন, তবে বর্তমান শ্রমিক

ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ধারা অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়।

সুতরাং এঁরা মনে করেন যে বিশ্বায়নের যুগে শ্রমিক আন্দোলনের যথার্থ 'ভিশন' বা ভবিষ্যৎপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে 'ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজম'। এই ইউনিয়নিজমের বা সংগঠন-তত্ত্বের মর্মার্থ হলো : "এর (ইউনিয়নিজমের) দ্বারা ইউনিয়ন এমন এক পন্থায় পরিণত হয় যার সাহায্যে সদস্যরা কেবল নিজেদের সমস্যা ও দাবীগুলির সমাধানে দর-কষাকষির স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সক্রিয়ভাবে সমসাময়িক সেইসব বিষয় নিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয় যা শ্রমজীবীদের ও দেশের অভ্যন্তরে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। 'সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজম'-ভিত্তিক দাবী-দাওয়া নিয়ে দর-কষাকষির প্রয়াস, ইউনিয়নের কার্যাবলী এবং সর্বোপরি বৃহত্তর আন্দোলনের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব হয়তো কখনো কখনো পরাজিতও হতে পারে, কিন্তু একে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না।" এই মতবাদীদের আরও বক্তব্য হলো যে একদা ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকাতে বহুল প্রচলিত 'পলিটিক্যাল ট্রেড ইউনিয়নিজম'-এর তত্ত্ব ও ব্যবস্থা, যার ভিত্তিতে শ্রমিক ইউনিয়ন বামপন্থীদের একটি বা অপরটিকে সমর্থন করতো, অনুরূপ তত্ত্বের আধুনিক ও উত্তেজক সংস্করণ নয় এই নতুন মতবাদ। ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নবাদীরা আরও বলেছেন যে তাঁদের এই নতুন মতবাদ অতীতের ট্রেড ইউনিয়নের কোন কোন ধারার 'লিবারাল' বা উদারবাদী অথবা সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক 'কোয়ালিশনিজম ট্রেড ইউনিয়ন' তত্ত্বের (অর্থাৎ যে দৃষ্টিভঙ্গি ইউনিয়ন ও সামাজিক আন্দোলনকে নির্বাচনী-কোয়ালিশনের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করতো) অনুসারীও নয়। কেননা পূর্বোক্ত উভয় ধারাতে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য তথা সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ছিল রাজনৈতিক নির্বাচনী যুদ্ধে কুচকাওয়াজের।

সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজমে ট্রেড ইউনিয়ন বা সেটির সদস্যরা কোন অর্থেই নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন নয়। এই ইউনিয়ন ব্যবস্থা রাজপথে যেমন ভূমিকা নেবে, তেমনি রাজনীতিতেও। এই মতবাদী সংগঠন অন্য সামাজিক আন্দোলনের সাথে মৈত্রীও গঠন করে। এঁদের দাবী যে এই মৈত্রীতে এমন শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মর্মবস্তু শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গঠিত হবে যা নির্বাচনী বা যে কোন ধরনের সাময়িক কোয়ালিশন গঠনের লক্ষ্যকে অতিক্রম করে যাবে। সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজমের বৈশিষ্ট্য হলো যে এটি এক ধরনের 'সক্রিয় রণনীতিগত গঠন' (অ্যাকটিভ স্ট্রাটেজিক ওরিয়েন্টেশন) সৃষ্টি করে; এই মতবাদ সমাজের নিপীড়িত ও শোষিতদের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী অংশকে এবং সাধারণভাবে শ্রমিকদের ব্যবহার করে; জমায়েত করে সেইসব অংশের জন-সমষ্টিকে যারা নিজেরা সমবেত হতে কম সক্ষম, যেমন দরিদ্র, বেকার, অনিয়মিতভাবে নিয়োজিত শ্রমিক, অসংগঠিত অংশ প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক অতীতের (১৯৯৪-৯৬) 'বিজিনেস ইউনিয়নিজম'-এর 'সার্ভিস মডেল' বনাম তুলনামূলকভাবে নতুন 'মবিলাইজিং মডেল' বা 'অরগানাইজিং মডেল' ট্রেড ইউনিয়ন ধারার মধ্যে বিতর্ক এবং সেই দু'টির সাথে নিজেদের পার্থক্যও চিহ্নিত করেছে ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজমপন্থীরা। আমেরিকার বিজিনেস ইউনিয়নিজমের সার্ভিস মডেল শাখার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য হলো ঃ শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারের বৈষয়িক (আর্থিক) ও পরিষেবাগত চাহিদা পূরণ করাকে ইউনিয়ন প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে মবিলাইজিং মডেল বা অরগানাইজিং মডেল শাখা প্রধানত প্রস্তাব করে যে শ্রমিক-সংগঠনের প্রধান কাজ হলো সমস্যা প্রসঙ্গে শ্রমিকদের জমায়েত বা সংগঠিত করা। শেষোক্তটি প্রথমটির তুলনায় উন্নত বলে স্বীকার করে নিলেও, সোস্যাল মুভমেন্টবাদীরা মনে করে যে উভয় মডেলই ট্রেড ইউনিয়নে ধারাবাহিক আমলাতান্ত্রিক, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি এবং সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তার কু-উপাদানগুলিকে অতিক্রম করার কথা ভাবে না। তাছাড়া উভয় ধারাই উপেক্ষা করে 'লেবার-অ্যারিস্টোক্র্যাসি'র প্রবল উপস্থিতিকে। এর বিপরীতে সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজম দাবী করে যে তাদের সাংগঠনিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে ব্যাপক ও কার্যকরী করবে এবং সেকারণে নেতৃত্বকে তৃণমূলের কাছে জবাবদিহি করায় বাধ্য করতে ভূমিকা নেবে।

সমস্ত আন্দোলনই শুরুতে ও কার্যকালে জাতীয় বা স্থানীয় হলেও তার অর্থ, বর্তমানে অর্থনীতির পটভূমিকায়, এটা নয় যে সেই আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গঠন, সমন্বয় সাধন, সাংগঠনিক

যোগাযোগ ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রদর্শনের কোন ভূমিকা থাকবে না। বরং শেষোক্ত দিকগুলি বর্তমানকালে স্থানীয় আন্দোলনের সাফল্য অর্জনের অন্যতম সূত্র। এঁরা মনে করেন যে, বিশ্ব-মূলধনকে সংযত রাখতে হলে আন্তর্জাতিকতাবাদী তৎপরতাই হবে ট্রেড ইউনিয়নের ভবিষ্যতের প্রধান হাতিয়ার। প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ভূমিকার চরিত্রকে এঁরা নামকরণ করেছে 'ট্রান্সন্যাশনাল ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক' হিসাবে।

ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পূর্বোক্তভাবে ব্যাখ্যা করার পর দাবী করে যে এটি স্বভাবতই বহু স্রোতধারার মিলন। একই সাথে এঁরা জানিয়ে দিয়েছেন যে এই মতবাদ বামধারা সম্পন্ন কোন মতাদর্শ নয়। এটিতে যুক্ত হবে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী মতবাদসম্পন্ন এবং এমন কি বাম বা অন্য কোন মতবাদের সাথে যুক্ত ছিলেন না এমন ধরনের মানুষও। এই সংগঠন হবে প্রচলিত ইউনিয়ন বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির চেয়ে ভিন্ন। এই ইউনিয়নিজম হলো এক ধরনের 'অরিয়েন্টেশন', যা পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা গঠিত। জাতীয় শ্রম-সম্পর্কের ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা বা সমস্ত ইউনিয়নগুলিকে একইভাবে গড়ে তোলা এটির কাজ নয়। এঁরা মনে করেন ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক পূর্বাপর সমস্ত মতবাদ ও ভূমিকার সাথে লড়াই করে সোস্যাল মুভমেন্ট ইউনিয়নিজমকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আন্তর্জাতিক স্তরে। বিভিন্ন দেশের সংগঠকদের মধ্যে যে সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে এক আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্মধারা গড়ে ওঠার পথ সুগম হবে। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমানের সংগঠনগুলির অভ্যন্তরে ও সর্বস্তরে এই অরিয়েন্টেশনের জন্য সংগ্রাম হবে জোরদার। এ' হলো এমন এক ভবিষ্যৎ লক্ষ্য যা শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিকে সর্বোচ্চ করতে পারে। এই পথ শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান বিভিন্নতাকে সমন্বিত করে শ্রেণীটির খণ্ডীকরণকে রোধ করবে।

কার্যকালে বুর্জোয়া-লিবারাল ধারারই কোন না কোন অংশের অন্তর্গত পূর্বোক্ত মতবাদগুলি একদিকে যেমন কার্যত পরস্পরের ঘাড়ে ঘাড়ে লাগানো মতবাদ, অন্যদিকে বাস্তবতার অন্তর্বস্তুকে যথার্থভাবে বিচার না করে, স্ব-আরোপিত বাস্তববাদিতার দাবীদার। এগুলির কোন কোন তত্ত্ব একে অপরের তত্ত্বকে খণ্ডন করে কার্যকালে সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যতম নিয়ম 'নেগেশন অব নেগেশন' বা নেতির নেতি-কে যেন প্রমাণ করে চলেছে। তত্ত্বগুলিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এটাও দেখা যাবে, যদিও এগুলি শ্রেণী-সংগ্রামের নীতিকে খণ্ডন করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে উত্থাপিত হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য কোন স্থির পরিণামে পৌঁছাবার পরিবর্তে, নিজেদের প্রস্তাবিত তত্ত্বের জালে ব্যাপক ও গভীর স্ব-বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়ছে। ফলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হচ্ছে, কোন না কোনভাবে, শ্রেণী সংগ্রামকে তরল ও নমনীয় আঙ্গিকে প্রস্তাব করতে। লক্ষ্য করলে এটাও বোঝা যায় যে পরম্পরাগত ট্রেড ইউনিয়নের উপর আধুনিক কালের নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন (এন.জি.ও.)-এর তীব্র অভিঘাতের মুখোমুখি হয়ে এই ধরনের তত্ত্বগুলি এক ধরনের 'কম্প্রোমাইজ' বা সমঝোতা।

শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাধুনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আই. এল. ও.-র মূল্যায়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে নতুন 'সোস্যাল পার্টনারশিপ'-এর তত্ত্ব

আই. এল. ও. অর্থাৎ 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন'-এর ভূমিকা নিয়ে, এমনকি কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলিরও, যে উচ্ছ্বাস আশির দশকের শেষে দেখা যেতো, এখন বিপরীত অভিজ্ঞতার ধাক্কায় তার অনেকটাই পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সংস্থাটি এখন প্রায় পুরোপুরি বিশ্ব-পুঁজিবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে এবং আই. এম. এফ.-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রভৃতির আর্থনীতিক নির্দেশ কার্যকরী করার ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের সম্মত করানোর জন্য পরামর্শ ও ট্রেনিং দেওয়ার অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। আই.এল.ও.তে ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিত্ব ও ভূমিকা পালনের স্তরে ডব্লু.এফ.টি.ইউ. এখন যেমন এক উপেক্ষিত প্রতিনিধি, তেমনি অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর বিষয়ে নির্ধারক ভূমিকা নিচ্ছে আই.সি.এফ.টি.ইউ. বা অনুরূপ সংগঠনগুলি, যার ফলাফল কার্যকালে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নত দুনিয়ার স্বার্থের পক্ষে

যাচ্ছে। আই.এল.ও. বর্তমান বিশ্বায়ন ব্যবস্থা ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রত্যেকটি প্রসঙ্গকে স্বীকার করে নিয়েছে। আই.এম.এফ., ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও ডব্লু.টি.ও.-র সাথে গড়ে উঠেছে আই.এল.ও.-র স্থায়ী সমন্বয় এবং আলোচনার ব্যবস্থা। বিশ্বের দেশসমূহের শ্রম-ব্যবস্থা ও শ্রম-সম্পর্কের স্তরে প্রথমোক্তদের গৃহীত প্রস্তাবসমূহ যাতে যথার্থভাবে রূপায়িত হয় সেজন্য আই.এল.ও. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শদাতার ভূমিকা নিচ্ছে ও আইনি প্রয়োগের জন্য 'কনভেনশন' সৃষ্টি করতে শুরু করেছে; তাছাড়া সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করে পরিদর্শকের কাজ চালাচ্ছে এবং বিশ্ব-পুঁজিবাদের কর্মসূচী রূপায়ণে সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন, এন.জি.ও. প্রভৃতি সংস্থাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বা প্রশিক্ষণে সাহায্য করছে। শ্রমিকদের ভূমিকার আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালাতে গিয়েই আই.এল.ও.-র নিজের বর্তমান অবস্থাই প্রবেশ করেছে 'ট্রানজিশন ফেজ' বা অন্তর্বর্তীকালীন অধ্যায়ে। পূর্বতন চরিত্রের যে কিছু দিক এখনও অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলি প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এইরকম পটভূমিকায় ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালের প্রথমার্ধ-ব্যাপী দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর পরিস্থিতি, বিশেষত শ্রম-সম্পর্ক ও ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়ে, আই.এল.ও.র বিভিন্ন সমীক্ষা, রিপোর্ট, বিশেষত 'ওয়ার্ল্ড লেবার রিপোর্ট ঃ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশসনস, ডেমোক্র্যাসি এবং সোস্যাল স্টেবিলিটি, ১৯৯৭-৯৮'—এর কিছু উল্লেখযোগ্য দিক অনুসরণে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

নতুন প্রসঙ্গের প্রস্তাব করতে গিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার মর্ম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করা পুঁজিবাদী তর্ক শাস্ত্রের প্রথম রীতি। আই.এল.ও. স্বভাবতই সেই রীতি অবলম্বন করেছে।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও তাদের সংগঠনগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকরা এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সেগুলির কর্তৃপক্ষ, পরম্পরাগতভাবে সমাজে উৎপাদন ও বণ্টনের বিকাশের সুফল সৃষ্টির আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে। এছাড়া এই সমগ্র প্রক্রিয়া আরও দু'টি ভূমিকা সম্পাদন করে—একটি হলো গণতান্ত্রিক (যা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিককে মতামত দেওয়ার অধিকার দেয়) এবং অপরটি হলো সামাজিক (যারা বৃত্তিতে নিযুক্ত রয়েছে বা যারা কর্মপ্রার্থী তাদের সবাইকে সমাজের সাথে সংযুক্ত করে)। এই শতাব্দী যখন শেষ হতে চলেছে, অর্থাৎ যখন ব্যাপক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে, তখন আই.এল.ও. মনে করেছে, এ' প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে পূর্বোক্ত শক্তি-ত্রয় কতোখানি সার্থকতার সাথে সেগুলি সম্পাদন করতে সক্ষম হচ্ছে। আই.এল.ও.-র অন্যতম বিশেষজ্ঞ মিচেল হান্সেনি বর্তমান পরিস্থিতিতে শক্তি-ত্রয়ের ভূমিকার সমগ্র প্রসঙ্গে, প্রথমেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। এই মূল প্রশ্নকে সামনে রেখে সাম্প্রতিক মূল্যায়ন, রিপোর্ট ও কিছু বক্তব্য পেশ করেছে আই.এল.ও.।

এইসব প্রসঙ্গে নানা ধরনের জিজ্ঞাসাই সামনে এসে যাচ্ছে, প্রথমত ও বিশেষত দ্বি-পাক্ষিক বা ত্রি-পাক্ষিক যৌথ শ্রম-সম্পর্ক প্রসঙ্গে। যেমন, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ১৯৬০ বা ১৯৭০-এর দশকে উৎপাদন ও শ্রম-ব্যবস্থার স্তরে বিশেষভাবে ব্যবহৃত দ্বি-পাক্ষিক বা ত্রি-পাক্ষিক চুক্তির ব্যবস্থার আদৌ কোন ভবিষ্যৎ আছে কি? কেননা শিল্পোন্নত দেশগুলি অতীতের মত বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি ও নিয়োগের স্থায়িত্ব দিয়ে মানুষের জন্য রুটি ও রুজির নিরাপত্তা বিধানের বিষয় নিয়ে গুরুত্ব দিতে এখন নারাজ। অন্যদিকে অনুন্নত দেশগুলিতে তো বেশ কিছুকাল আগে থেকেই যৌথ শ্রম-সম্পর্কের উপর আস্থা নষ্ট হতে শুরু করেছে। কেননা শ্রম-বাজারের বৃত্তাংশে বিভাজন (সেগমেন্টেশন) ঘটানো, চরম অনিশ্চয়তাপূর্ণ বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারী এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে এই যৌথ শ্রম-সম্পর্কের ব্যবস্থা কোনভাবেই বিবেচনা বা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারছে না বা নিচ্ছে না। তাই, আই.এল.ও. মনে করে যে নতুন পরিস্থিতিতে পূর্বোক্ত তিন সামাজিক সহযোগীকে (সোস্যাল পার্টনারস)[!] এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে নতুন ধরনের ভূমিকা নিতে হবে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, বাজার ও অর্থনীতির বিশ্বায়নের ফলে গণ-প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান তথা সরকারের অতীতের মত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ খর্বিত হয়েছে। অথচ সরকারের উপরই প্রথমত ও প্রধানত দায়িত্ব ও চাপ রয়েছে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন ঘটানো ও

আধুনিকীকরণের এবং প্রচণ্ডভাবে জর্জরিত সামাজিক কাঠামোতে স্থায়িত্ব পুণ:প্রতিষ্ঠা করার। সরকারের পরই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা। সরকারের অবস্থার মতো, নতুন পরিস্থিতিতে, ট্রেড ইউনিয়নের সমস্যারও বহুদিক এখন স্পষ্টতর হচ্ছে। সমস্যা মূলত সৃষ্টি হচ্ছে শ্রমবাহিনীর বিভিন্নমুখীন নতুন বিন্যাস সাধনের ফলে। এক্ষেত্রে বিশেষত উল্লেখ্য যে, শ্রমবাহিনীর এখন বিভক্তিকরণ ঘটছে। তার মধ্যে সর্ব-অগ্রগণ্য হল স্থায়ী কর্মী বনাম অন্য অংশ যেমন অদক্ষ, অস্থায়ী, অনিয়ন্ত্রিত ইত্যাদি অংশের শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন। অতীতে এই সমস্যা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এবং সেক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যত তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। আর এখন এটা ঘটতে শুরু করেছে উন্নত দেশগুলিতে। শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে, অর্থাৎ অদক্ষ, অস্থায়ী, অনিয়মিত ইত্যাদি অংশের শ্রমিকের সংখ্যা যতো বেড়ে চলেছে, ততোই বাড়ছে ট্রেড ইউনিয়নের সমস্যা।

বর্তমানে যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে স্বভাবতই ঐ তিন সামাজিক সহযোগীর পরস্পরের মধ্যে অবস্থানের ভারসাম্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এখন মালিকদের ঈপ্সিত উৎপাদনের লক্ষ্যের প্রতিই তিন শক্তির পক্ষ থেকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বড় মালিকরা এখন দাবী করছে পূর্ণ স্বাধিকার। তার ফলে, এযাবৎকালের সোস্যাল-পার্টনারশিপ, শ্রম-সম্পর্ক এবং সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়নের পূর্বের পদ্ধতি-প্রকরণগুলি এখনও কি কার্যকর? সেগুলিকে কি রক্ষা করা হবে, অথবা কিছু পুনর্বিন্যাস সাধন করতে হবে কিংবা অবলম্বন করতে হবে সম্পূর্ণ নতুন পথ? শিল্পোন্নত দেশগুলির লিবারাল দৃষ্টিবাহী ট্রেড ইউনিয়নগুলির বহুত্বের (প্লুরালিস্ট) ঐতিহ্যের সামনে এই পরিস্থিতি অনেকটাই শ্বাসরুদ্ধকারী হয়ে উঠছে। এমনকি, পঞ্চাশ বছর বা একটি ক্ষেত্রে (প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন) তার চেয়েও দীর্ঘ সময়ব্যাপী মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গড়ে ওঠা আর্থনীতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার পর, এইসব দেশগুলিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তত্ত্ব ও প্রয়োগের নীতির ভিত্তিতে যে নতুন ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল, তাও বর্তমান পরিস্থিতির চাপে ভেঙ্গে পড়েছে অনেকটাই। অন্যদিকে উন্নতিশীল দুনিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ কেবল পাবলিক সেক্টর, জাতীয় বৃহদায়তন শিল্প ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকদের মধ্যে। তারাও উন্নত দুনিয়ার পূর্বোক্ত ট্রেড ইউনিয়ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে শুরু করেছে। কিন্তু দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটছে অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের। যেখানে অতীতে ট্রেড ইউনিয়ন তেমন ছিল না। কিন্তু এখন সেখানে শ্রমিকদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ার চাহিদা বাড়ছে ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়েও উঠছে। নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা কি সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হওয়া উচিত কেবল এই ক্ষেত্রটিতে?

এইরকম সংশয়বাদিতার অনুসরণ করে আই.এল.ও.-র সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা মিচেল হান্সেনি প্রস্তাব করেছেন যে যদি সাফল্য লাভ করতে হয় তবে ট্রেড ইউনিয়নকে অবশ্যই বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে হবে। কেননা গণ-উৎপাদনের (মাস প্রোডাকশন) স্থান করে নিচ্ছে যেহেতু বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-জাল, সমানুপাতে মালিকদের ভূমিকাকে প্রতিহত করার ক্ষমতাও কমছে ট্রেড ইউনিয়নের। অন্যদিকে ভোক্তাদের পক্ষ থেকেও চাহিদার স্তরে নতুন ধরনের চাপ সৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন-সংস্থাগুলি বেশি বেশি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার চরিত্র যেহেতু আন্তর্জাতিক রূপ পাচ্ছে, স্বভাবতই শ্রমজীবীদের সংগঠিত প্রতিনিধিত্বের অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নেরও অর্জন করতে হবে নতুন ধরনের প্রতিনিধিত্বের রূপ। সাধারণভাবে একথা বলাই নিরাপদ যে এক নতুন ধরনের সোস্যাল-পার্টনারশিপের ভিত্তিতে শ্রম-সম্পর্কের পুনর্গঠন ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং কেবল এই পথেই নিয়োজিত, বেকার ও আধা-নিয়োজিতের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব। এটা বিশেষত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যখন মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্রমাগত দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বকালের বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের প্রধান 'হিডেন অ্যাগনি', যা' শ্রেণী-সংগ্রামের আশংকা থেকে সৃষ্ট, কার্যকালে সেই পথ অনুসরণ করে আই.এল.ও. তথাকথিত এক ঐতিহাসিক আবিষ্কার করে বলেছে যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের দাঁড়ানো

অতীতে কখনোই কল্যাণকর হয়নি। সুতরাং, এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে ট্রেড ইউনিয়নকে। অবশ্য হান্‌সেনির মন্তব্য হলো যে বর্তমান কালটি এক অন্তর্বর্তী স্তর।

প্রচলিত 'শ্রম-সম্পর্ক' শব্দটিকে অপসারণ করে সেখানে প্রস্তাব করা হয়েছে 'শিল্প-সম্পর্ক' স্থাপন করার। যদি পূর্বের মতো 'সম্পর্ক'কে সুদৃঢ় ভিত্তি দিতে হয় তবে ট্রেড ইউনিয়নকে নতুন ধরনের 'সোস্যাল কন্ট্রাক্ট' বা সামাজিক চুক্তির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। আর সেজন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে সর্বস্তরে। সেগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে গড়ে তুলতে হবে নতুন পদ্ধতি। অবশ্য এ' বিষয়ে তাঁর সতর্কীকরণ হলো যে, শ্রমিকের স্বার্থের সন্তুষ্টি এবং ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মানবিক সম্পর্ক গঠনের প্রচেষ্টার মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এখন এই ধরনের পরিস্থিতির সামান্য কোন সম্ভাবনা দেখা দিলে তা' অবশ্যই পরিহার করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়নকে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন বা সংশ্লেষণ সাধনের জন্য ভূমিকা নিতে হবে। শ্রেণী-সমঝোতার প্রসঙ্গটি প্রস্তাবিত হয়েছে এইভাবে।

আই.এল.ও.-রিপোর্টে পূর্বোক্ত প্রসঙ্গটি প্রস্তাবের পিছনে এক আশংকার দিক বর্ণিত রয়েছে। তা' হলো আধুনিক অর্থনীতির গতির প্রবণতার মধ্যে দেশ-ভেদে উন্নয়নের মাত্রার ও অবস্থার পার্থক্য গঠন ছাড়াও, সামাজিক সংহতিকে বিপন্ন করার এক ভয়ঙ্কর আশঙ্কা রয়েছে। আই.এল.ও. মনে করে এটা হয়তো এখনই বলা সম্ভব নয় যে সামাজিক সংহতির সামনে প্রধান বিপদ অর্থাৎ আর্থিক বৈষম্য বা বেকারী কোন মুহূর্তে সামাজিক বিরোধের আকারে ফেটে পড়বে, কিন্তু দুষ্কৃতি, বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা, দারিদ্রায়ন ইত্যাদির উত্থানের মধ্য দিয়ে সামাজিক-বিরোধের অস্তিত্ব এখনই লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবতই এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ক্ষোভ ও ভীতির এই আশংকার সামনে, অতীতের অনুরূপ পরিস্থিতিতে সামাল দেবার মতো অনেকটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান (যেমন ট্রেড ইউনিয়ন) ও তৎপরতা (যেমন শ্রমিক আন্দোলন) বর্তমানে অনুপস্থিত হওয়ায়, সামাজিক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এই ধরনের বিপন্ন পরিস্থিতির আশঙ্কায় আই.এল.ও. সরাসরি ট্রেড ইউনিয়নকে খারিজ করতে পারেনি, বরং বলেছে যে এই মূল কারণে অর্থাৎ সামাজিক ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের স্বার্থে, ট্রেড ইউনিয়নের সার্বিক পুনর্গঠন এত জরুরি এবং সেটিকে সোস্যাল পার্টনারের নতুন চরিত্রে গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এইভাবে, পরোক্ষে, আই. এল. ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে পুঁজিবাদ সৃষ্ট সংকট থেকে সামাজিক সংকট নিরসনে পরিবর্তিত করার প্রস্তাব করেছে। এই কাজের মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আসলে মালিক শ্রেণীর 'সোস্যাল পার্টনার'এ পরিণত হবে।

আই.এল.ও.-র শ্রম-বিষয়ক সাম্প্রতিক মূল সমীক্ষা মন্তব্য করেছে যে তথ্য ও সংযোগ মাধ্যম এবং উৎপাদন- প্রযুক্তিতে বিপ্লব, বার্লিন-দেওয়ালের পতনের (ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়) ফলে বিশ্ব-রাজনীতিতে পরিবর্তন, নতুন শিল্পোন্নয়নকারী দেশগুলির অভ্যুদয়, জাতীয় অর্থনীতিগুলির পরস্পরের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা এবং বিশ্বময় সর্বস্তরে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব-এর তীব্র প্রভাব পড়েছে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো ট্রেড ইউনিয়নের উপরও। এর অন্যতম পরিণামে আই.এল.ও. কর্তৃক প্রদত্ত দলিলে (জে.ভিসার ঃ গ্লোবাল ট্রেণ্ডস ইন ইউনিয়নাইজেশন, ১৯৯৭) যে প্রায় ৭০টি দেশের তুলনামূলক পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে, তাতে বিগত ১০ বছরে, অর্ধেক সংখ্যক দেশে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা মোটের উপর অর্ধেক কমে গেছে! একথা ঠিক, অতীতে বাধ্যতামূলক সদস্যভুক্তির ব্যবস্থা থেকে বর্তমানে কিছু দেশে (প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে) মুক্ত সদস্যভুক্তির ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় এটা আরও বেশি প্রতিফলিত হচ্ছে। যেমন শেষোক্ত দেশগুলিতে অতীতে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যভুক্তির হার ছিল প্রায় ১০০ শতাংশ। কিন্তু তা' থেকে কমেছে (১৯৯৬) চেক রিপাব্লিকে (-) ৫০.৬ শতাংশ, পোল্যাণ্ডে (-) ৪৫.৭ শতাংশ, হাঙ্গেরিতে (-) ৩৮ শতাংশ, এস্তোনিয়াতে (-) ৭১.২ শতাংশ, বেলারুশে (-) ২২.৮ শতাংশ। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে পর্তুগালেই ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সবচাইতে বেশি কমেছে—৪৪.২ শতাংশ। তবে, বিভিন্ন দেশে

অগ্রগতির স্তর নির্বিশেষে, সদস্যভুক্তি হ্রাসের প্রবণতা একই রকম ব্যাপক, যেমন ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে কমেছে ইজরায়েল (-) ৭৫.৭ শতাংশ, কেনিয়া (-) ২৮.৬ শতাংশ, উগাণ্ডা (-) ৩৮.৬ শতাংশ, উরুগুয়ে (-) ৩১.৯ শতাংশ, ভেনেজুয়েলা (-) ৩২.২ শতাংশ, নিউজিল্যাণ্ড (-) ৪৬.৭ শতাংশ, ফ্রান্স (-) ৩১.২ শতাংশ, ইংলণ্ড (-) ২৫.২ শতাংশ, জাপান (-) ০.১ শতাংশ, ইতালি (-) ৬.৮ শতাংশ এবং জার্মানিতে (-) ২০.৩ শতাংশ।

অবশ্য ব্যতিক্রম হিসাবে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে প্রায় ২০টি দেশে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যভুক্তি বেড়েছে; সেগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হলো ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা (+) ১২৬.৭ শতাংশ, জিম্বাবোয়ে (+) ৫৪.৪ শতাংশ, চিলি (+) ৮৯.৬ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়া (+) ৬০.৮ শতাংশ, ফিলিপিনস (+) ৬৯.৪ শতাংশ, থাইল্যাণ্ড (+) ৭৭.৩ শতাংশ, হংকং (১লা জুলাই, ১৯৯৭-এর পূর্বে) (+) ৫৩ শতাংশ, পাকিস্তান (+) ১১.৭ শতাংশ, শ্রীলঙ্কা (+) ৪.৮ শতাংশ, ভারত (+) ৩.১ শতাংশ, বাংলাদেশ (+) ৫৭.৮ শতাংশ, স্পেন (+) ৯২.৩ শতাংশ, কানাডা (+) ১০.৭ শতাংশ, বেলজিয়াম (+) ৫.৮ শতাংশ, নেদারল্যাণ্ডস (+) ১৯.৩ শতাংশ এবং মধ্য আমেরিকার কতকগুলি ছোট ছোট দেশে।

একই পরিসংখ্যানের অপর সাধারণ দিক হলো, যে ৬৬টি দেশের সুস্পষ্ট তুলনামূলক তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে ৩৩টি দেশে সদস্যভুক্তিতে নিম্নগামিতার হার ২০ শতাংশের বেশি। শেষোক্তগুলির মধ্যে উল্লেখ্য আর্জেন্টিনা, কোস্টারিকা, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইজরায়েল, ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। যে ৯২টি দেশের ১৯৯৫ সালের সদস্যভুক্তির পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তার মধ্যে মাত্র ১৪টি দেশের সদস্য হার ছিল (অ-কৃষি শ্রমিকদের) ৫০ শতাংশের বেশী, আর ৪৮টি দেশের সদস্য হার ছিল ২০ শতাংশের কম।

সদস্যভুক্তির হার কমে যাওয়া থেকে আই.এল.ও. মনে করেছে যে সামাজিক সংগঠন হিসাবে ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন। অথচ এই প্রক্রিয়ার বিপরীতটাই বেশি কাম্য হয়ে উঠেছে। তবে আই.এল.ও. এও মনে করে যে বর্তমান সময়ে ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি কেবলমাত্র সদস্যভুক্তির দ্বারা সবটা অনুধাবন করা যায় না। সদস্যভুক্তির দ্বারা প্রধানত বোঝা যায় ট্রেড ইউনিয়নের আর্থিক শক্তি ও শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের স্তরটি। সদস্যভুক্তির ভিত্তিতে টি.ইউ.-এর শক্তি সম্পর্কে মূল্যায়ন অনেকটা অতীতের ধারণা। কেননা সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা গেছে যে সদস্যভুক্তি কম হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি দেশে দারুণ জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নের সামাজিক অংশীদার হওয়ার কারণগুলিকে প্রধানত বন্ধনীভুক্ত করা হয়েছে, আর্থনীতিক নতুন পরিবর্তন, শ্রমিকশ্রেণীর মানসিকতার পরিবর্তন এবং শিল্প-সম্পর্কের বিষয়ে অন্যান্য অংশগুলির, যেমন সরকারের, মনোভাবের পরিবর্তনের ভিত্তিতে।

আই.এল.ও.র প্রস্তাবিত নতুন সোস্যাল পার্টনারশিপের তত্ত্বে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ রয়েছে ইউনিয়নের লক্ষ্য, তত্ত্ব ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে। প্রথমে বক্তব্য হল ঃ বর্তমান যুগে, উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নির্ধারিত হওয়া দরকার, নতুন সমাজে ইউনিয়নের নতুন ভূমিকা কি হবে। পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে বুর্জোয়া লিবারাল তাত্ত্বিকদের মধ্যে যেমন ডুর্কেহেমেইন, জন. টি. ডানলপ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব বা লিবারাল-প্লুরালিস্ট, ভলেন্টারিস্ট, অক্সফোর্ড স্কুল, প্রভৃতি ধারা অথবা হাগ ক্লেগ, মার্ক পার্লমান প্রমুখ ইংলণ্ড, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থাকে শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র করে কেবলমাত্র শিল্প-সম্পর্ক ও শ্রম-সম্পর্কের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যেসব তত্ত্ব আমদানি করেছিলেন, নতুন মোড়কে 'সোস্যাল-পার্টনারশিপ' তত্ত্বে অনেকটা তেমন প্রস্তাব করেছে আই.এল.ও.। আই.এল.ও.-র বক্তব্য, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এটি সবসময়েই সত্য যে শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সবসময়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং একথাও বলা যায় যে ভিন্ন কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান তার বিকল্প হতে পারে না। আই. এল. ও.র মতে নিম্নোক্তভাবে ট্রেড ইউনিয়ন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। প্রথমটি হলো গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ। যেসব মানুষের কাজ আছে বা যারা কাজের জন্য প্রত্যাশী তাদের প্রত্যেককে নিজস্ব কর্মজীবন সম্পর্কে

মতামত দেবার ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়টি হলো অর্থনৈতিক তৎপরতা। উৎপাদন ও বন্টনের ফলের দ্বারা উন্নয়নের মধ্যে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। তৃতীয়টি, যা অবশ্য প্রথম দু'টি থেকে সৃষ্ট, তা' হলো সামাজিক ভূমিকা। ট্রেড ইউনিয়ন অতি অবশ্যই সহায়তা করতে পারে দারিদ্র্য মোচনে, একই সাথে শহরে হিংসা, সামাজিক উত্তেজনা ও অশান্তি রোধে ভূমিকা নিতে পারে এবং অবদান যোগাতে পারে সামাজিক স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠায়।

অর্থনীতি ও আইনে রাষ্ট্রকে বীর্যহীন করার প্রক্রিয়ায় বিশ্ব-পুঁজিবাদ এখন বাড়তি শ্রম-সংঘর্ষ আশংকা করছে। স্বভাবতই সামাজিক শান্তির প্রসঙ্গটি তাদের কাছে হয়ে উঠছে দীর্ঘতর। তাই ট্রেড ইউনিয়নকে একদিকে নিবীর্য করা এবং অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নের সংঘর্ষকারী ভূমিকার আমূল পরিবর্তন করে সেটিকে সামাজিক শান্তির হাতিয়ারে পরিণত করার অভিপ্রায় প্রস্তাবিত হয়েছে আই.এল.ও.র নতুন সোস্যাল পার্টনারশিপের তত্ত্বে। ষাটের দশকে ইউরোপের ট্রেড ইউনিয়নে একাংশ কমিউনিস্ট, বামপন্থী ও সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের 'হিস্টোরিক কমপ্রোমাইজ' ও 'সোস্যাল-পার্টনার শিপ'এর তত্ত্ব এখন নতুন মোড়কে ফিরে এসেছে আই.এল.ও'র পক্ষ থেকে।

মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনার নামে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা পরিবর্তনের নতুন তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলি এবং শ্রম-সম্পর্কের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া

সাম্প্রতিক 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' (এইচ.আর.এম.) বা মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে প্রায়শই কর্মী-ব্যবস্থাপনা (পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট) তথা গণ-ব্যবস্থাপনার সমর্থক বলে মনে করা হচ্ছে। কিছুকাল পূর্বের 'হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট' বা মানব-সম্পদ উন্নয়নের পুঁজিবাদী প্রস্তাবনা এবং সেবিষয়ে প্রচার এখন রূপান্তরিত করা হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজির স্বার্থের প্রত্যক্ষ অধীন করার জন্য। তাই 'ডেভেলপমেন্ট' এর স্থানে এসেছে 'ম্যানেজমেন্ট'। আর এই লক্ষ্য পূরণের অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমে ক্রমে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অন্যতম দিক 'পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট' এর নাম, সেটির আনুপূর্বিক ভূমিকা কার্যত অপরিবর্তিত রেখেই, 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' নামকরণ করছে। বর্তমান তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থনীতির বিশ্বায়নের কর্কশ চরিত্রকে চাপা দিতে, মানুষকে সম্পদ হিসাবে নিছক মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে, এই ধরনের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের এযাবৎকালের তৎপরতা ও শ্রমিক আন্দোলনের ফলে শ্রমের মর্যাদাবোধ ও শ্রমশক্তি সম্পর্কে শ্রমিকরা যেভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল, তথাকথিত এইচ.আর.এম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তা লুপ্ত করার চেষ্টাও রয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই, দক্ষ ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি এইচ.আর.এম.-কে তাদের 'রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট' (আর.অ্যাণ্ড.ডি.) এর অন্যতম বিষয় করে নিয়েছে। শ্রম-সমাজতাত্ত্বিকরাও এইচ.আর.এম.কে এখন বিবেচনা করছেন শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রম-সম্পদ তথা শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক প্রণালী হিসাবে, শ্রমশক্তি শোষণের বৃহত্তর হাতিয়ার হিসাবে। উৎপাদন-প্রণালী ও শ্রম-প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এইচ.আর.এম. সম্মত গুচ্ছ কর্মপ্রণালীর উদ্ভাবন এবং বাণিজ্যিক রণনীতির সাথে এইচ.আর.এম.-এর সংযুক্তিসাধনের উপর উৎপাদকরা জোর দিচ্ছে (স্ট্র্যাটেজিক এইচ.আর.এম.)। 'হার্ড' বা কঠোর এইচ.আর.এম. মডেল তথা আদল গুরুত্ব দেয় জাস্ট-ইন-টাইম প্রোডাকশন, ফ্লেক্সিবিলিটি, কঠোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা (স্ট্রং ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল), ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিতা (ইণ্ডিভিজ্যুয়ালিজম) এবং ব্যয় সংকোচের (কস্ট মিনিমাইজেশন) উপর। বিপরীতপক্ষে 'সফ্‌ট' বা নমনীয় এইচ.আর.এম. মডেল বা আদল মূল্যবান শ্রমশক্তি-সম্পন্ন হিসাবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের গণ্য করে। শেষোক্ত মডেলের অন্তর্গত তৎপরতাগুলি হলো বিকেন্দ্রীকৃত সাংগঠনিক কাঠামো (ডিসেন্ট্রালাইজড অরগানাইজেশনাল স্ট্রাকচার) গঠন, আধা-স্বশাসিত কর্মীগোষ্ঠীগত (সেমি-অটোনমাস ওয়ার্ক গ্রুপস) ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকদের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ও সংযোগসাধন, কর্মজীবীদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টির জন্য প্রয়াস চালানো, উৎপাদনের প্রণালীর ক্রমাগত পরিবর্তনের

সাথে মানিয়ে নেওয়ার মতো সুশিক্ষিত শ্রমশক্তি গড়ে তোলা, এবং মানব-কেন্দ্রিক (হিউম্যান-সেন্টার্ড) একগুচ্ছ শ্রম-নীতি ও ব্যবহারিক কর্মধারার সাহায্যে উৎপাদন করা।

অবশ্য 'হার্ড' ও 'সফ্‌ট' এইচ.আর.এম.-এর পূর্বোক্ত পার্থক্যগুলি যতোখানি জটিল তার তুলনায় প্রকৃত বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের ক্ষেত্রে এইচ.আর.এম-এর নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্বাচনের সময় এই দুই ধারার মধ্যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রায়শই সমন্বয় করে নেয়, যাকে একজন গবেষক বলেছেন 'প্র্যাগমাটিক এক্‌লেকটিনিজম' বা সারাংশ বেছে নেওয়ার.বাস্তববাদিতা (আর.লক, টি.কোচান এবং এম.পিওরি সম্পাদিত 'এমপ্লয়মেন্ট রিলেশনস ইন আ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড ইকনমি'-তে কে. সিমন-এর নিবন্ধ 'চেঞ্জ অ্যাণ্ড কনটিনিউটি ইন ব্রিটিশ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস : 'স্ট্র্যাটেজিক চয়েজ অর মাড্‌লিং থ্রু?' ১৯৯৫)। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে এটা আদৌ অগণ্য নয় যে একই ধরনের উৎপাদনের চরিত্রের কোম্পানি হার্ড এইচ.আর.এম.-এর পাশাপাশি সফ্‌ট এইচ.আর.এম. গ্রহণ করছে—আসলে ব্যাপকভাবে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমানো ও অস্থায়ী শ্রমিক বেশি সংখ্যায় ব্যবহার করার মাধ্যমে কর্পোরেট কাঠামো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে। মূল দিক হলো এইচ.আর.এম.-নীতিগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্ত হচ্ছে নতুন কর্পোরেট রণনীতির সাথে গণ-ব্যবস্থাপনাকে (ম্যাস-ম্যানেজমেন্ট) সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রয়োজনে। এর দ্বারা চেষ্টা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে গড়ে ওঠা শ্রমিকশ্রেণীর পরম্পরাগত সামাজিক সম্পর্কসমূহ ও সংস্কৃতিকে নতুন আদলে নির্মাণ করার।

এই বিষয়ক প্রায়োগিক তৎপরতাগুলির অন্তর্গত রয়েছে নানাবিধ দিক, যেমন প্রশিক্ষণ, ক্ষতিপূরণ, কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে যোগাযোগ, সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এইচ.আর.এম.-এর আর একটি দিক হলো শ্রমিকদের বেতন প্রসঙ্গ। ব্যক্তিগত বা কর্মী-গোষ্ঠীগত অথবা কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের স্তরে কর্মকুশলতার ভিত্তিতে বেতন-ব্যবস্থা গঠনে এইচ.আর.এম. কে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে উচ্চ উৎপাদনশীলতা সৃষ্টিতে কর্মীরা "অনুপ্রাণিত" (বাধ্য?) হয়। প্রতিষ্ঠানের মুনাফার একটা অংশ শ্রমিকদের মধ্যে তথাকথিত ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা বর্তমান এইচ.আর.এম.-এর আর একটি ক্রমবর্ধমান দিক। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যবস্থাপকদের স্বার্থের সাথে শ্রমিকদের সংলগ্ন করার চেষ্টা হয়। শ্রমিকদের মধ্যে তৈরি করা হয় এই মনোভাব যে কোম্পানির ভবিষ্যৎ উন্নতির সাথে শ্রমিকদের বেতনের স্বার্থ জড়িত। বৃত্তিতে যোগদানের জ্যেষ্ঠতা (সিনিয়রিটি) ও শ্রমের অন্তর্বস্তুর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বেতন স্থির করার পরিবর্তে বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মজুরি দেওয়ার নীতিও এইচ.আর.এম. ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়ে উঠছে।

প্রত্যেকটি এইচ.আর.এম.কে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করা যায়। কিন্তু এগুলির মধ্যে নিহিত কর্তৃপক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করতে এইচ.আর.এম. ব্যবস্থার উদ্গাতারা দাবী করেছেন, "এই ব্যবস্থা আসলে প্রচলিত (অভ্যন্তরীণ বাজারের অর্থাৎ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বৃত্তিগত, আর্থনীতিক, সামাজিক প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি) কোন প্রথাকে বিচ্ছিন্ন বা বিলোপ করে না এবং আবার অন্য প্রচলিত ব্যবস্থাগুলিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে না"। (পি. ওস্টারম্যান ঃ 'হাউ কমন ইজ ওয়ার্ক প্লেস ট্রান্সফরমেশন অ্যাণ্ড অ্যাডপ্টস ইট?' ১৯৯৪)। আসলে এইচ.আর.এম.-এর নামে যা করা হচ্ছে তা' হলো মুনাফার জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ বৃদ্ধি করতে শ্রমিকদের শ্রম-শক্তি ব্যবস্থার, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তাদের মজুরি, বৃত্তি, নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও তৎপরতাগুলির এক যোগফল। মোটের উপর পূর্বে আলোচিত উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার স্তরে এইচ.আর.এম. হলো একটি পরিপোষক (সাপোর্টিভ) তৎপরতা।

কোন কোন দেশে মালিকশ্রেণীর এ' জাতীয় তৎপরতার কিছুটা সাফল্য দেখা যাচ্ছে। এই সাফল্য আসছে মূলত ট্রেড ইউনিয়নের জঙ্গীপনাকে নিষ্প্রভ করে তোলার কাজে অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণীশক্তি-জাত সম্পদের প্রকৃত উন্নয়নে ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম ভূমিকা এবং সংগ্রামের পক্ষে প্রকৃত শ্রেণী-অধিকার অর্জন করার শক্তি ও ধারাকে বিলোপ করার কাজে। অর্থাৎ মালিকশ্রেণীর নিজ স্বার্থে, সামগ্রিকভাবে অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করছে শ্রমিকদের শ্রম-জড়িত উৎপাদনসহ অন্যান্য সমস্ত

দিকগুলি এবং অপসারণ করতে চাইছে শ্রমিক-জীবনের পূর্বের নেতৃত্ব ও মাধ্যমকে (ট্রেড ইউনিয়ন)। বর্তমানের এই প্রয়াসের অপর অন্যতম দিক হলো শ্রম-সংগঠন (ওয়ার্ক অরগানাইজেশন) ও মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনার (এইচ.আর.এম.) মধ্যে এমন গভীর, ব্যাপক ও কার্যকরী সম্পর্ক তৈরি করা যাতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রণনীতি উত্তরোত্তর নিপুণ ও প্রখর হয়ে ওঠে।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ফ্লেক্সিবিলিটি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তৎপরতা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন (টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ) শ্রম-সংগঠন—টীম ওয়ার্ক, ট্রেনিং, মজুরি প্রদানের নীতি, কর্মীদের অংশগ্রহণ এবং ব্যক্তি শ্রমিক বিষয়ক নীতি (পার্সোনেল পলিসি) প্রভৃতির ক্ষেত্রে এযাবৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির গুরুত্বকে দারুণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এখন এগুলি সমাধান করছে নিজ নিজ স্তরে। বিশ্ব-পুঁজিবাদ এমনও দাবী করে যে এইচ.আর.এম. ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব উভয়ত ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকদের মধ্যে দর-কষাকষি ও মতামত বিনিময়ের ক্ষেত্র ও প্রসঙ্গের সুযোগকে একই সাথে প্রতিষ্ঠানের স্তরে এবং বৃহত্তর পরিসরে প্রসারিত করে চলেছে। অর্থাৎ যৌথ প্রতিনিধিত্ব (কালেকটিভ রিপ্রেজেন্টেশন) অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন এবং ব্যবস্থাপনা-প্রযুক্ত এইচ.আর.এম. নীতিগুলি অর্থাৎ উৎপাদনে মালিকশ্রেণীর ভূমিকার মধ্যে সম্পর্ক এখন শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে নির্ধারক দিক হয়ে উঠেছে।

এইচ.আর.এম. তত্ত্ব ও ব্যবস্থা শুরুতে কেবলমাত্র মালিকদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়নি। পাশ্চাত্যের ইউনিয়নে নয়া-মানবতাবাদের (নিও-হিউম্যানিজম) ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'সোস্যাল পার্টনার' তত্ত্বের উদ্ভব এবং তা' থেকে মানব-সম্পদ উন্নয়নের শ্রেণীবিবর্জিত তথাকথিত শ্রমিক কল্যাণকারী তৎপরতার নানা প্রস্তাবের মধ্যেই পরবর্তীকালের মালিকশ্রেণীর এইচ.আর.এম.-এর বীজ নিহিত ছিল। আর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগে মালিকরা যথার্থভাবে 'হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট'কে স্বীয় স্বার্থে 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট'-এর ধারণায় পরিণত করে নিতে পেরেছে। তবে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শুরুর কালের পূর্বোক্ত বক্তব্যের সাথে বর্তমানের এইচ.আর.এম.-এর তেমন সাদৃশ্য না থাকলেও, পরবর্তীকালে উভয় দৃষ্টিভঙ্গি কাছাকাছি হতে তেমন সময় নেয়নি, যে কারণে পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই এখন দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করে এবং ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের দ্বারা যৌথভাবে এইচ.আর.এম. প্রযুক্ত হচ্ছে। এই কাজে, দেশ-ভেদে, অবলম্বন করা হচ্ছে নানাবিধ ঐতিহাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জাপানে শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থায় বৃত্তির নিরাপত্তার আইনি গ্যারান্টি, দেশীয় ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি ও সরকারী নীতিসমূহ প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানের স্তরে যৌথ দর-কষাকষি প্রভৃতি বর্তমান ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো মালিক ও শ্রমিকের পরস্পরের বিরোধিতার পরিবর্তে এইচ.আর.এম.-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক গভীর সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা গড়ে তোলা। জাপানের বাইরে, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাপানি মডেলের এইচ.আর.এম. এখনো তেমন সাফল্য পায়নি। কিন্তু একথা সত্য যে বিরোধ নিবৃত্ত করতে না পারলেও, ট্রেড ইউনিয়নকে অনেকটা নিবৃত্ত করতে পারছে এইচ.আর.এম.। আর এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ১৯৯৬-৯৮ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েটি দেশে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব ছাড়াই শ্রমিকদের বড় বড় ধর্মঘট হয়েছে। অন্যদিকে যেসব দেশে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে কম বিরোধমূলক, মালিকপক্ষের সাথে কর্মীদের আলোচনার অধিকার আছে, অথচ ইউনিয়নের তেমন প্রভাব নেই, সেইসব দেশে এইচ.আর.এম., অনেক সাবলীলভাবে ব্যবহার করা হয়। জার্মানিতে যেমন এই ক্ষেত্রে সাফল্য দেখা যায়। 'প্রাইস ওয়াটার হাউস ক্রানফিল্ড সার্ভে'র রিপোর্ট থেকেও জানা যায় যে অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশগুলিতে শেষোক্ত পরিস্থিতি ভিত্তিক এইচ.আর.এম. রয়েছে (সি. ব্রেওয়েস্টার এবং এ. হেগেউইস্চ সম্পাদিত 'পলিসি অ্যাণ্ড প্র্যাক্টিস ইন ইউরোপিয়ান হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট : দা প্রাইস ওয়াটার হাউস ক্রানফিল্ড সার্ভে, ১৯৯৪)। ঐ সার্ভে থেকে জানা গেছে, কোথাও কোথাও মালিকরা সরাসরি শ্রমিকদের সাথে এইচ.আর.এম.এর বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, যেমন সুইডেন, বেলজিয়াম, ইতালি ও অস্ট্রিয়া, আবার কোন

কোন দেশে ইউনিয়নের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ এ' বিষয়ে আলোচনা চালায় শ্রমিকদের সাথে। তবে জাপানের এইচ.আর.এম. পদ্ধতির সাথে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থার পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু কার্যকালে শেষোক্ত দুই দেশের পরম্পরাগত সংঘর্ষমুখী ভূমিকাসম্পন্ন যৌথ দর-কষাকষির সংস্কৃতিও (অ্যাডভারসিয়াল কালেকটিভ বার্গেনিং কালচার) এখন এইচ.আর.এম. কে ধীরে ধীরে স্থান করে দিতে শুরু করেছে। তবে এই তিনটি দেশের ক্ষেত্রেই আসল ঘটনা হলো, কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনের নতুন কার্যকরী প্রণালীর উদ্ভাবন অর্থাৎ উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য পদ্ধতির সাথে এইচ.আর.এম. প্রসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নকে যুক্ত করা হবে কিনা, তার সবটাই এখনও পর্যন্ত মালিকদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ট্রেড ইউনিয়নকে যুক্ত করা বা না করার প্রসঙ্গে কোনটির দ্বারা ইউনিয়নকে শ্রমিকদের থেকে কার্যকালে বিচ্ছিন্ন করা যায়, সেটাই কর্তৃপক্ষের কাছে প্রধানত নির্ধারক শর্ত। অন্যদিকে তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে এইচ.আর.এম. এখনও গভীর গুরুত্ব দিয়ে গৃহীতই হয়নি। মালিকপক্ষ ও ট্রেড ইউনিয়ন উভয় অংশেরই এই ব্যাপারে বিরোধিতা রয়েছে। অনুকরণ-প্রবণতায় যান্ত্রিকভাবে বা পরিস্থিতির চাপে তৃতীয় দুনিয়ার যেসব দেশে অল্প-বিস্তর এইচ.আর.এম. গৃহীত হতে শুরু করেছে সেই দেশগুলির এইচ.আর.এম.-এর স্তরের ও অবস্থার মধ্যে রয়েছে ব্যাপক বিভিন্নতা।

নতুন 'সামাজিক কথোপকথন' এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সাধিত্রগুলির প্রস্তাব

ধনতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাসে এবং সেটির গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বা উল্লম্ফনের কাল-পর্বে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে প্রচলিত বহু শব্দ প্রকাশ করতে থাকে নতুন তাৎপর্য ও অর্থ। তার সাথে আর একটি ঐতিহাসিক সত্য হল যে, উৎপাদিকা শক্তির সংকটের কাল ছাড়াও, একই পদ্ধতি-জনিত একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পেতে বিভিন্ন সময়ে উৎপাদনের আঙ্গিকের নবায়ন ঘটিয়েছে পুঁজিবাদ। নিজেদের তত্ত্ব ও কর্মকে লোকায়ত করার জন্য প্রচলিত ভাষার পুনর্বিন্যাস বা নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবন ও বিস্তার করেছে তারা। ইতিহাসে পুঁজিবাদের গতি ও ত্বরণ যত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সময় উত্তীর্ণ হয়েছে এই ধরনের তৎপরতা সমান্তরালে বেড়েছে; শব্দগুলিও অধিক সমৃদ্ধ, নিপুণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পূর্বোক্ত উভয়বিধ প্রসঙ্গের এ সমন্বয় হিসাবে আলোচ্য প্রসঙ্গ—'সোস্যাল ডায়ালগ' বা সামাজিক কথোপকথনকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাছাড়া, আধুনিক বুর্জোয়া লিবারাল ডেমোক্র্যাসি-র 'লিবারাল লেবার রিলেশন'এর অন্যতম অংশ হলো 'সোস্যাল ডায়ালগ'-এর ব্যবস্থা। এবং সঙ্গত কারণেই এটির মর্মবস্তুতে রয়েছে শ্রেণী, শ্রেণী সংগঠন ও আন্দোলনের বিরোধিতা কেবলমাত্র নয়, সেগুলিকে বিনষ্ট করার কৌশলও—বিশেষত ট্রেড ইউনিয়নকে।

শ্রম-সম্পর্কের নামে কার্যকালে প্রোডাকশন ও লেবার-প্রসেসের অন্যতম উপাদান হিসাবে 'সোস্যাল ডায়ালগ'কে বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে; একই সাথে এটাও ঘটনা যে 'কালেকটিভ বার্গেনিং-এর মর্মবস্তু ও আঙ্গিকের পরিবর্তনের জন্যও ব্যবহৃত হচ্ছে 'সোস্যাল ডায়ালগ'। প্রচলিত কালেকটিভ বার্গেনিং-এর ভর রয়েছে প্রধানত প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ অর্থকরী বিষয়ে, সামাজিক প্রসঙ্গ সেখানে সাধারণত গৌণ। জাতীয় বা প্রতিষ্ঠানের স্তরে 'কালেকটিভ বার্গেনিং' ঘটলে, সেটির আর্থিক প্রভাব সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ থাকে সংশ্লিষ্ট বৃত্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে; কিন্তু মালিক পক্ষের সাথে ট্রেড ইউনিয়ন দর-কষাকষি করে সরকারের মাধ্যমে চুক্তি করে জাতীয় স্তরে কোন ব্যাপক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত বা শ্রম-আইন গ্রহণ করলে তার প্রভাব ও ফলাফল সৃষ্টি হয় সমাজিক স্তরে। কালেকটিভ বার্গেনিং-এর শেষোক্ত দিকটি একদিকে রাষ্ট্রীয় স্তরে এবং অন্যদিকে সমাজের অন্যান্য অংশের সাথে শ্রমিক, মালিক, উৎপাদন প্রভৃতির সম্পর্ক-সাধন করে। উভয়বিধ—আর্থিক ও সামাজিক—ভূমিকা পালনের কারণে কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থা অধিকাংশ দেশেই ত্রি-পাক্ষিক—মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকার নিয়ে গঠিত। কোন কোন দেশে সরকারকে বাদ দিয়ে কালেকটিভ বার্গেনিং যে দ্বি-পাক্ষিক চরিত্র গ্রহণ করছে তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সম্পর্ক সাধনের সুযোগ থেকে এই ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধ থেকে, দ্বি-পাক্ষিক কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থার বাড়বাড়ন্ত রাষ্ট্রের জনব্রতী (ওয়েলফেয়ার স্টেট) ভূমিকা ক্ষয়ের অন্যতম চিহ্ন হিসাবে আবির্ভূত হতে শুরু করে।

সরকারের দায়মুক্তির ফলে মালিকপক্ষকে কালেকটিভ বার্গেনিং-এ বাধ্য করার দায় ট্রেড ইউনিয়নের উপর চেপে বসে। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত দ্বি-পাক্ষিক কালেকটিভ বার্গেনিং শুরু হচ্ছিল, শ্রমিক আন্দোলনের চাপ একটা স্তরে উন্নীত হওয়ার পর। উন্নত দুনিয়াতে এই অবস্থা ধীরে ধীরে প্রথায় পরিণত হয়েছিল। আশির দশক থেকে কেবল সরকার নয়, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ক্রমশ উদ্যোগহীন ও ক্ষমতাহীন করতে, আইনি ব্যবস্থা হিসাবে দ্বি-পাক্ষিক কালেকটিভ বার্গেনিং-এর প্রয়োগ শুরু হয়। যদিও কালেকটিভ বার্গেনিং সবসময়েই মোট শ্রমশক্তির এক ক্ষুদ্র ও সংগঠিত অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তথাপি পুঁজিবাদের কাছে তাও অসহ্য হতে থাকে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রের আর্থনীতিক ভূমিকার 'ডাউন সাইজিং', শ্রমজীবীদের কাজের চরিত্রের ব্যাপক খণ্ডীকরণ ও বিভিন্নতা সৃষ্টি তথা বিশ্ব-শ্রমবাজারের খণ্ড খণ্ড ও বিভিন্ন খণ্ডের কেন্দ্রীকৃত রূপ, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যভুক্তির ক্ষয়, শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কিত নানা তত্ত্বের অভ্যুদয় ইত্যাদি ঘটনাবলীর পটভূমিকায় ট্রেড ইউনিয়নের কোণঠাসা পরিস্থিতিকে স্থায়ী রূপ দিতে তৎপরতাগুলির 'কমপ্লিমেন্টারি' বা সহযোগকারী হিসাবে আধুনিক পুঁজিবাদের দ্বারা সোস্যাল-ডায়ালগ তত্ত্বের উদ্ভব। এটির ঘোষিত লক্ষ্য সামাজিক হলেও, প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বিকাশের প্রয়োজনে। ট্রেড ইউনিয়নকে তথা কালেকটিভ বার্গেনিং প্রথাকে এক্ষুনি সরাসরি উপেক্ষা না করলেও, 'সোস্যাল ডায়ালগ' ব্যবস্থা ব্যক্তি-শ্রমিক বা শপ-ফ্লোর শ্রমিকগোষ্ঠীর সাথে যৌথ আলোচনা, ব্যবস্থা গ্রহণ ও চুক্তিতে পক্ষপাতী। এই ব্যবস্থা সর্বত্রই এবং সর্বাংশেই প্রায় দ্বি-পাক্ষিক—মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ। পূর্ব আলোচিত তথাকথিত মানব-সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সামগ্রিক কর্মধারার অন্যতম অংশ হিসাবে সোস্যাল ডায়ালগ ব্যবস্থাকে দাবী করা হচ্ছে।

কালেকটিভ বার্গেনিং প্রথা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রথমে উদ্ভুত হলেও কালক্রমে অনুন্নত দেশগুলিতেও প্রসারিত হয়েছে। প্রথমদিকে মজুরি, ভাতা, নিয়োগের শর্তাবলী ইত্যাদির প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু হলেও এই মঞ্চটিতে ক্রমশ ব্যাপক প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে। দেশে দেশে এই মঞ্চটির ভূমিকার বিবর্তন নির্ভর করেছে সংশ্লিষ্ট সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার উপর। বার্গেনিং চরিত্র ও সাফল্য নির্ধারণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পরিস্থিতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। 'কালেকটিভ বার্গেনিং' ব্যবস্থাকে খণ্ডন করার জন্য এখন সেটিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এই বলে যে, এই ব্যবস্থা ছিল ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নিছক 'কনসেশন বার্গেনিং'। 'কনসেশন বার্গেনিং' কিভাবে শিল্প-সম্পর্কের বিবর্তন ঘটিয়েছে সেবিষয়ে দেওয়া হচ্ছে নানা মত ও ব্যাখ্যা। কেউ কেউ মনে করেন যে বিভিন্ন সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা শ্রম-পরিস্থিতির উপর যে আকস্মিক অভিঘাত আনতো তাতে মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সাময়িক সন্ধি হিসাবে 'কনসেশন বার্গেনিং' শুরু হয়েছিল। কেননা মালিক ও শ্রমিক—উভয় অংশই এই সময়ে অক্ষম হয়ে পড়তো। আবার যখনই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং অর্থনীতির সুস্থিতি ফিরেছে ট্রেড ইউনিয়ন ফিরে যেতো নিজ পদ্ধতিতে অর্থাৎ কনফ্রন্টেশন বা সংঘর্ষে। বিগত এক দশকের কিছু বেশি সময় জুড়ে 'কালেকটিভ বার্গেনিং' তথা 'কনসেশন বার্গেনিং' প্রায় একটিমাত্র ইস্যু-ভিত্তিক হয়ে উঠতে শুরু করেছে—শ্রমিকের বৃত্তিকে অর্থাৎ শিল্পে প্রাপ্ত কর্মসংস্থানকে রক্ষা করার জন্য দর কষাকষি। বিপরীত দিকের পরিস্থিতি হল যে, আধুনিক পুঁজিবাদের পক্ষে বৃত্তির নিরাপত্তার কোন কনসেশন দেওয়া আর সম্ভব নয়। তাই কালেকটিভ বার্গেনিং ব্যবস্থা বাতিলের চেষ্টা শুরু হয়েছে।

বিভিন্ন মাত্রায় হলেও, সাম্প্রতিককালে, প্রায় সমস্ত দেশেই উৎপাদন-সংস্থাগুলি অতীতের স্ব-শাসন ও শ্রম-সম্পর্কের যৌথকৃত অবস্থাগুলিকে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যক্তিগতকরণ (ইণ্ডিভিজুয়ালাইজেশন) করা শুরু করেছে। প্রস্তাবিত হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে শ্রমিকের স্বার্থ একান্ত ব্যক্তিগত স্তরের বিষয় হবে, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজস্ব শ্রমিক ব্যবস্থাপনার নীতির দ্বারা যৌথ শ্রম-সম্পর্কের বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকবে। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো, শিল্প ক্ষেত্রে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতির জন্য, বিশেষত মজুরি

বা সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের জন্যই হোক বা বেকারী অথবা বৃত্তির 'ক্যাজুয়ালাই-জেশন'-এর জন্যই হোক, উল্লেখযোগ্য অংশের শ্রমিক শেষোক্ত দুই ব্যবস্থা থেকেই বাদ পড়তে থাকবে। যে সামান্য সংখ্যক শ্রমিক তথাকথিত সুযোগ-প্রাপ্তির বৃত্তের মধ্যে থেকে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি হবে 'ইণ্ডিভিজুয়ালাইজেশন'—এটা হলো প্রস্তাবিত 'সোস্যাল ডায়ালগ'-এর ভিত্তিও।

এবারে ভিন্ন দিক থেকে সোস্যাল-ডায়লগের যুক্তি লক্ষ্য করা যাক। নতুন উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার ফলে, সামাজিক বন্ধন ও সংহতিতে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা' আঘাত করছে শ্রম-সম্পর্ককে। স্বভাবতই মালিকশ্রেণীও এতে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন। সামাজিক বন্ধন ও ঐক্যের এই ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া সমাজ-কারকরা (এক্ষেত্রে মালিকশ্রেণী, ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকার) স্ব স্ব স্তরে অনুভব করতে শুরু করেছে। বাজার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রক্রিয়া যে মাত্রায় তাদের প্রত্যেককে পরস্পরের প্রতি বিরোধী করে তুলছে, তাতে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ও মত বিনিময়ের অতীতের পদ্ধতি ও মাধ্যমগুলি কেবল দুর্বল হয়ে যাচ্ছে না, বরং ক্ষেত্রেবিশেষে সেগুলি ঘটাচ্ছে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। বহুকাল পূর্ব থেকে, পুঁজিবাদী সমাজের ও উৎপাদনের প্রয়োজনে, পূর্বোক্ত তিন শক্তির মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য নানা ইনস্ট্রুমেন্ট তথা সাধিত্রগুলির ক্রমাগত উদ্ভাবন, সংস্কার, উন্নয়ন ও ব্যবহার করা হয়ে এসেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির পুঁজিবাদও তৈরি করেছিল সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার কিছু কিছু সাধিত্র। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপর্যয়ের ফলে দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক যোগাযোগের সমস্ত ব্যবস্থাসমূহ ও প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে এবং তার জায়গায় নতুন কোন কার্যকরী বিকল্প আদৌ দানা বাঁধেনি এখনো। ফলে এখন প্রায় সর্বত্রই, মাত্রা-ভেদে, নানারকম সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির গুরুত্ব ও ভবিষ্যতে ক্ষতিকর পরিণাম আশঙ্কা করে, নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে, তথাকথিত 'সোস্যাল অ্যাক্টর' অর্থাৎ সমাজকারক শক্তিগুলির মধ্যে সামাজিক বন্ধন তথাকথিত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কানাডা (সিকিং আ ব্যালান্স), ইংলণ্ড (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অ্যাণ্ড কালেকটিভ বার্গেনিং), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ডানলপ কমিশন) ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার নানা কমিটি গঠন করে। নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে সামাজিক কথোপকথন ও সাধিত্র সৃষ্টির জন্য অনুসন্ধান চালিয়েছিল এবং নানা সুপারিশ করেছিল এই কমিটিগুলি। এসব সুপারিশ থেকে যেসব 'মডেল' তথা আদল গঠন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে সেগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—'ভলেন্টারিস্ট মডেল', 'ইউরোপিয়ান মডেল' ও 'সুনটো মডেল'। ইংলণ্ডে প্রথমে উদ্ভব ঘটলেও 'ভলেন্টারিস্ট মডেলে'র প্রধান প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই আদলের চরিত্র বিকেন্দ্রীকৃত এবং এতে কার্যত রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ শূন্যের স্তরে। দ্বিতীয় আদলটিতে কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক/শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে যৌথ দরকষাকষির সমন্বয় ঘটানো হয় প্রধানত কেন্দ্রীয় স্তরে। এই মডেলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শ্রমিক-মালিকের মধ্যে 'সামাজিক সংহতি' (শ্রেণী সংহতি?) সাধন। তৃতীয়টি হল জাপানি আদল বা 'সুনটো মডেল'। এই মডেলে জাপানের 'এন্টারপ্রাইজ ইউনিয়নিজম'-এর সমান্তরাল কারখানা-কারখানায় শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে অজস্র ও ধারাবাহিক আলোচনা চলে। সেগুলি থেকে গৃহীত সুপারিশগুলি ট্রাইপার্টাইট ন্যাশনাল কমিশনে'র কাছে যায়; তারপর কারখানা, মালিক ও শ্রমিক সম্পর্ক, সামাজিক বিষয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই শ্রম-সম্পর্ক গঠনে আইন-কানুন ও জয়েন্ট বার্গেনিং ব্যবস্থা—'জয়েন্ট কনসালটেটিভ মেশিনারি' তথা যৌথ আলোচনার সাধিত্র, 'ওয়াকার্স পার্টিসিপেশন ইন ম্যানেজমেন্ট' তথা ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ অথবা 'সোস্যাল পার্টনারশিপ' তথা সামাজিক অংশীদারিত্ব প্রভৃতি নানান ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিকদের মজুরি ও বিভিন্ন বৈষয়িক দাবী দাওয়ার বিষয়ে আলোচনা ও চুক্তির পরিবর্তে, উৎপাদন ও উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের ও ট্রেড ইউনিয়নকে জড়িয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় পরিণত হচ্ছিল। নব্বই-এর দশকে পৌঁছে পুঁজিবাদী সামাজিক 'ডেভেলপমেন্ট'-এর তত্ত্বে (কার্যকালে পুঁজি ও বাজারের উন্নয়ন) বিশেষ করে 'হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট' এবং সেকারণে 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট'-

এর সাধিত্রের ব্যবহার শুরু হয়। এরপর বলা শুরু হলো যে একটি নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট আর্থনীতিক বাস্তবতায়, সামাজিক ঐক্য যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে তথা সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে, শিল্প-সম্পর্ককে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যা নতুন আর্থিক নীতিগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। শিল্প বা শ্রম-সম্পর্কের কোন একটি বিশিষ্ট মডেল যেহেতু সমস্ত দেশের বাস্তবতার উপযোগী হতে পারে না, তাই বলা হলো যে সামাজিক কথোপকথনের উদ্দেশ্য ও সাধিত্রগুলি এমন সৃজনশীলভাবে গঠন করতে হবে যা সামাজিক সংহতিকে বহাল রাখবে এবং শক্তিশালী করবে। এইভাবে, শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর্থনীতিক ও সামাজিক বাধাগুলির সমাধান ঘটিয়ে সামাজিক কথোপকথন ভবিষ্যতে গঠন করবে গণতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বোচ্চ অনুকূল পরিস্থিতি।

সামাজিক কথোপকথনের 'ভলেন্টারিস্ট মডেল' সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয় অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন দেশগুলিতে—ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি। অন্যদিকে পূর্বে বর্ণিত দ্বিতীয় মডেলটি সাধারণভাবে গ্রীস, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া স্পেন, নেদারল্যাণ্ডস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, পর্তুগাল এবং সামান্য ব্যতিক্রমসহ জার্মানি প্রভৃতি দেশে বহাল হয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে 'কালেকটিভ বার্গেনিং'-এর প্রথাগত পদ্ধতির তেমন কোন তাৎপর্যপূর্ণ ব্যতিক্রম এখনও হয়নি ঠিকই কিন্তু পরিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার ফলে সমগ্র শ্রম-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলোচ্য চরিত্রের সোস্যাল ডায়ালগ এখনও খুবই দুর্বল। এর অন্যতম কারণ হলো, অর্থনীতি ও শিল্পে দেশগুলির পশ্চাৎপদতা ছাড়াও, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও যথেষ্ট দুর্বল ও অনিশ্চিত। কোন কোন দেশে গণতন্ত্র সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামগ্রিক দুর্বলতা তো আছেই। সুতরাং শেষোক্ত পরিস্থিতিগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে দেশগুলিতে প্রাপ্ত 'কালেকটিভ বার্গেনিং' ব্যবস্থার স্তর ও চরিত্রে। বলাই বাহুল্য কালেকটিভ বার্গেনিং-এর যেটুকু ব্যবস্থা তৃতীয় দুনিয়ার দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাতেও রয়েছে ব্যাপক অসমতা। বড় শিল্পের অভাব এবং মাঝারি বা ছোট শিল্পের আধিক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এইসব দেশের বার্গেনিং ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ট্রাডিশনাল বা পরম্পরাগত, কনফ্লিক্‌চুয়াল বা সংঘর্ষমূলক এবং কো-অপারেটিভ বা সমবায়মূলক। তবে এগুলির অভ্যন্তরে উন্নত দেশগুলির অনুকরণে এখন সোস্যাল ডায়ালগ ব্যবস্থা অতি সামান্য আকারে সবে প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নতুন পরিস্থিতি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুঁজিবাদী চরিত্রের শিল্প ও শ্রম-সম্পর্ক সদ্য গড়ে উঠতে শুরু করেছে এইসব দেশে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় চেক রিপাব্লিকে কালেকটিভ বার্গেনিং অ্যাক্ট (১৯৯০), শ্লোভাক রিপাব্লিকে অ্যাক্ট নং ৫৪/১৯৯৬, হাঙ্গেরিতে লেবার কোড (১৯৯২), বালগেরিয়াতে লেবার কোড (১৯৯৩), পোল্যাণ্ডে ২৪শে অক্টোবর, ১৯৯৪-এর অ্যাক্ট, রোমানিয়াতে কালেকটিভ এগ্রিমেন্ট অ্যাক্ট (১৯৯৬), লিথুয়ানিয়ায় অ্যাক্ট নং—১২০২ (১৯৯১), লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার 'লেবার কোড', রাশিয়ান ফেডারেশনের অ্যাক্ট নং ২৪৯০—১(১৯৯২) এবং ইউক্রেনে 'অ্যাক্ট রেসপেক্টিং কালেকটিভ কনট্যাক্টস অ্যাণ্ড এগ্রিমেন্টস' (১৯৯৩) প্রভৃতির মধ্যে পুঁজিবাদী কালেকটিভ বার্গেনিং-এর বীজাকার রূপ রয়েছে। অথচ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যথার্থ 'হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট' এবং সেজন্য 'হিউমান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' এবং নতুন মানুষ গড়ার লক্ষ্যে যথার্থ সোস্যাল ডায়ালগের নিরন্তর তৎপরতা চালিয়েছিল। এখন সেগুলি কেবল বাতিল হয়নি, শুরু হয়েছে উল্টো প্রক্রিয়া। আধুনিক সোস্যাল ডায়ালগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে লিবারাল ডেমোক্র্যাসি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আঙ্গিকগুলি কিছুটা সামনে রেখে, কিন্তু বিপরীত মর্ম নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে মজুরিভোগী শ্রমজীবীরা যেহেতু সামাজিকভাবে খণ্ডে খণ্ডে স্থায়ীভাবে বিভক্ত হওয়ার মুখোমুখি হয়েছে, স্বভাবতই পুঁজিবাদ মনে করেছে যে কর্মক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর

ফলাফলকে যথার্থভাবে মোকাবিলা করতে হবে সোস্যাল ডায়ালগের মাধ্যমে। স্বভাবতই এই নতুন পরিস্থিতিতে সেটির সাধিত্রকেও হতে হবে নতুন ধরনের ও প্রয়োজনের উপযোগী।

শেষ, কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যা, তা' হলো সোস্যাল ডায়ালগের তত্ত্বটির ভূমিকা স্বয়ং। এখন ট্রেড ইউনিয়নে একাংশ তাত্ত্বিকদেরও প্রচারের অন্যতম প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে পুঁজিবাদী সোস্যাল ডায়ালগ।

ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো ও কার্যকলাপের বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের ধারা

উৎপাদন, যন্ত্রসামগ্রী, পণ্য, বাজার, কাঁচামাল, বাণিজ্য, তথ্য, বিনিময়, ব্যবস্থাপনা, শ্রম, ভোক্তা ইত্যাদি সার্বিক প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (আর. অ্যাণ্ড ডি.) তথা গবেষণা ও উন্নয়ন বর্তমানকালে এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিল্প, কৃষি বা পরিষেবার উৎপাদিকা শক্তির সমস্যার সমাধান ও বিকাশের প্রয়োজনে, পুঁজিবাদ বিশেষত শিল্পোন্নত দেশগুলির, আর. অ্যাণ্ড ডি. দারুণ সাফল্য আনছে।

বর্তমান যুগ-ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নের সামনে যে জটিল ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ট্রেড ইউনিয়নের সমস্ত দিকের সমস্যার কারণ নির্ধারণ, বিকাশের জন্য নীতি, কাঠামো ও পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত সমস্ত নতুন ফলাফলগুলির প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে এক ধরনের 'আর. অ্যাণ্ড ডি.'র আবশ্যকতা সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে অনুভূত হতে থাকে। উৎপাদন প্রসঙ্গে 'আর. অ্যাণ্ড ডি.' প্রাকৃতিক এবং পুঁজিবাদী আর্থনীতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন সামাজিক নিয়ম ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে নিয়োজিত। ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে গবেষণার পরম্পরা প্রধানত ইতিহাসভিত্তিক ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব, গঠন-চরিত্র, সংগঠন ও আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর, দাবী-দাওয়ার বিবর্তন, শ্রম-আইন, মতবাদের গঠন ও ধারা-উপধারা, মালিকশ্রেণীর ভূমিকা, দর-কষাকষির চরিত্র, মজুরির স্তর, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, দমন-পীড়ন, রাজনৈতিক প্রভাব ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি নিয়েই প্রধানত গবেষণা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে ট্রেড ইউনিয়নের সমকালীন বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও ফলিত দিক নিয়ে অতীতের গবেষণা ও তার ভিত্তিতে উদ্ভাবন নগণ্য বললেই চলে।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি ট্রেড ইউনিয়নকে বাধ্য করছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পিতভাবে গবেষণা ও উন্নয়নের কর্মসূচী হাতে নিতে। তবে ট্রেড ইউনিয়নের নিজের পক্ষ থেকে যতোটা উদ্যোগ এখনও লক্ষ্য করা যায় তার চাইতে বেশি প্রচেষ্টা দেখা যায় শ্রম-বিষয়ক গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। (এখানে বলার চেষ্টা হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে ট্রেড ইউনিয়নের ফলিত বিষয়ক গবেষণার কথা, শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক প্রসঙ্গ নয়)। মালিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে উন্নত দেশগুলিতে আর. অ্যাণ্ড ডি.'তে উদ্যোগ যেমন বেশি, ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ঐ ধারা শিল্পোন্নত দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এখন পর্যন্ত। তবে এই দিকটি অনেকটা নতুন এবং ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত মানুষদের কাছে এখনো অনেকটাই অপরিচিত। তাই এই প্রসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করাও যথেষ্ট কঠিন। তথাপি কিছু কিছু দিক এখানে উত্থাপন করা যেতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটিকে 'ইনোভেশন' বা নতুন প্রথার প্রবর্তন বলাই বাঞ্ছনীয়। 'রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট' বলতে 'ডিসকভারি' বা আবিষ্কার, 'ইনভেনশন' তথা উদ্ভাবন এবং 'ইনোভেশন' বা নতুন ব্যবস্থা প্রয়োগ—এই তিন পদ্ধতি মিলিতভাবে বা এগুলির কোনটিকে বোঝায়। ইনোভেশন অর্থে ইউনিয়নের প্রচলিত অবস্থার কোন বুনিয়াদি পরিবর্তন বোঝায় না। তবে ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাসে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে যখনই প্রথাগত তৎপরতা অকার্যকর হয়ে পড়েছে, তখনই বিভিন্ন ধরনের ও নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটেছে। ইনোভেশনের সাফল্যের মধ্য দিয়ে অনুগামীদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের নতুন করে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে এবং স্থিতাবস্থা কাটিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের কিছু কিছু অগ্রগতি ঘটেছে। আদিকাল থেকে ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরে এই ধরনের উদ্ভাবন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল পরিস্থিতির চাপের প্রতিফলন এবং 'এম্পিরিক্যাল' বা অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের

দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত। মার্কসবাদীদের দ্বারাই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাস্তবতার বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা ও আশঙ্কা বিচার করে ট্রেড ইউনিয়নে 'ইনোভেশন'-এর তথা আর. অ্যাণ্ড ডি.-র কাজের সূত্রপাত ঘটেছিল। কিন্তু অতীতের বহু ইনোভেশন, যা সর্বজনীন নিয়ম ও ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল, এখন বহু ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। এটা ঘটছে মার্কসবাদী বিজ্ঞানের কোন ভুলের জন্য নয়, প্রয়োগকারীদের ব্যর্থতার জন্য। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নে সৃষ্ট দুর্বলতার অপর দিক হলো, ইনোভেশন নিয়ে তৎপরতায় দীর্ঘ অবহেলা।

ট্রেড ইউনিয়নে ইনোভেশনের মাধ্যমে অর্জিত নতুন নতুন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিহাসের অপর একটি দিক হলো যে সেগুলি একদিকে যেমন নেতৃত্বের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, আবার নীচুতলার সংগঠক, কর্মী বা অনুগামীরাও ছিল সেগুলির স্রষ্টা। কোন কোন নতুন প্রথা ছিল বিতর্কিত, কোন কোনটি তা' ছিল না। কোন কোন নতুন প্রথা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, আবার ব্যর্থ হয়েছিল কোন কোনটি। বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি যে সম্পূর্ণ "নতুন" ছিল তাও বলা যায় না। উপযোগী সংস্কার করে পুরাতন ব্যবস্থার নতুন রূপ দেওয়া হয়েছিল কোন কোন ক্ষেত্রে। ট্রেড ইউনিয়নের আদিপর্বে কাজ ছেড়ে শ্রমিকদের দলবদ্ধভাবে কারখানা থেকে পালিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে, কারখানার কাজ করাকালীন 'হাঙ্গার রায়ট', যন্ত্রপাতি ভাঙার আন্দোলন (লুডাইট মুভমেন্ট) প্রভৃতি ইমোশনাল স্তর থেকে এক ধরনের ইনোভেশনের মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলন নতুন আঙ্গিকে এবং তা' থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নততর স্তরে এগিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে এসেছে 'স্ট্রাইক' বা ধর্মঘট। ধর্মঘটের নতুন রূপ ও পদ্ধতি হিসাবে 'ওয়াক-আউট', 'গো-শ্লো', 'মাস-লীভ', 'সিট-ডাউন স্ট্রাইক', 'শাট-ডাউন', অর্জন করা হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়নগত ইনোভেশনে এটা দেখা গেছে যে ঝুঁকি নেবার দৃঢ় মানসিকতা ট্রেড ইউনিয়নের উজ্জীবনে ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

আসলে যে কোন নতুন ব্যবস্থার পত্তন ও প্রচলনে সর্ব-অগ্রগণ্য শর্ত হলো অনুগামী শ্রমিকেরা সেটিকে কিভাবে গ্রহণ করছে। অর্থাৎ দাবী আদায় বা সমস্যা সমাধানে সেই প্রথাকে তারা উপযুক্ত মনে করছে কি না এবং সেই প্রথায় শ্রমিকের অংশীদার হওয়ার সামর্থ ও সাহস আছে কি না। ট্রেড ইউনিয়নের দিক থেকে বিচার্য হলো সৃষ্ট নতুন প্রথা-পদ্ধতিতে শ্রমিকদের বেশি করে আকর্ষণ করা যাচ্ছে কিনা, মালিকের উপর চাপ সৃষ্ট করার ক্ষমতা বাড়ছে কিনা, ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠকরা উৎসাহী ও বলশালী হচ্ছে কিনা, ট্রেড ইউনিয়নের কাঠামো শক্তিশালী ও বিকশিত হচ্ছে কিনা, সর্বোপরি, ট্রেড ইউনিয়নের সর্বাত্মক প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা।

সত্তরের দশকে নতুন ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ইনোভেশনের সামনে প্রধান প্রসঙ্গ হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত কিনা (বক ও ডানলপ, ১৯৭০), আর বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন সংকটের শুরুতে এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ দাঁড়ায়, কোন একটি বিশেষ জয় বা পরাজয়ের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে, ক্রমাগত ঝুঁকি গ্রহণ করে, বারংবার নতুন বিকল্প পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য প্রচেষ্টা ট্রেড ইউনিয়ন চালিয়ে যেতে সক্ষম কিনা (সস্ট্যাক, ১৯৯১)। একেবারে আধুনিককালে ইনোভেশনের সামনে প্রধান প্রসঙ্গটি দাঁড়াচ্ছে যে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে অগ্রাধিকারের প্রধান বিষয় হলো কোন ধরনের নতুন পদ্ধতি রচনা এবং পরিবর্তন সংঘটিত করা হবে। শেষোক্ত সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো যে ট্রেড ইউনিয়ন হলো এক গণতান্ত্রিক সংগঠন। ট্রেড ইউনিয়নের মূল ভিত্তি শ্রমিকরা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এবং কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক স্তরে ক্রমান্বয়ে সম্মুখীন হচ্ছে কাঠামোগত পরিবর্তনের। শ্রমিকরা নতুন ইনোভেশন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে না পারলে নিজেদের সহ জনগণ ও দেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। শেষোক্ত সমস্যাটি বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের সামনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তবে এত আদর্শায়িত লক্ষ্য সামনে না থাকলেও, উদারনীতিক বা সংস্কারপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির সামনেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সমস্যাটি। এইরকম জটিল প্রেক্ষাপটে এবং প্রশ্নাবলীর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে ইনোভেশনের কাজ সত্যিই দারুণ কঠিন।

অথচ বর্তমান সংকটাপন্ন বাস্তবতা ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থার সামনে নতুন পদ্ধতি ও প্রকরণ সৃষ্টির

প্রয়োজনীয়তা অতীতের তুলনায় বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং বুর্জোয়াদের আর. অ্যাণ্ড ডি.-র সাফল্য থেকে এই ধারণা ট্রেড ইউনিয়নে স্পষ্ট যে নতুন প্রথার উদ্ভাবন ও ব্যবহার ট্রেড ইউনিয়নের সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করবে। সাম্প্রতিককালের এম্পিরিক্যাল গবেষণাগুলি থেকেও এটা পুনর্বার নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে (ফিয়োরিটো, জারলে ও ডেলানে, ১৯৯৫; ব্রনফেন্ব্রোর, ১৯৯৪)। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নে নতুন ব্যবস্থা প্রচলনের নির্ধারক কারণগুলির তথ্য এখনও ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় আছে। এবিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যসামগ্রী নিছক বর্ণনামূলক বা সেগুলি কিছু কিছু তৎপরতার বিশ্লেষণ (ক্যাফট্ ১৯৯১; জারলে ও ম্যারানটো, ১৯৯০; পেরী ১৯৮৭) অথবা একক ট্রেড ইউনিয়নের সাফল্যের খতিয়ান, (থম্‌সন, ১৯৮৮; ইচ্নিওস্কি ও জ্যাক্স ১৯৯০; হেস্কচার, ১৯৮৮)। তথাপি এই গবেষণাগুলি অন্ততপক্ষে ইনোভেশনের প্রয়াসের প্রামাণ্য দিক হিসাবে রয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে এই ধরনের গবেষণাগুলির ভিত্তিতে ভবিষ্যতে ইনোভেশনের মাধ্যমে সাফল্য গড়া কিছুটা সম্ভব। এগুলির ফলে নেতৃত্বের মধ্যে ইনোভেশনের জন্য উৎসাহ বেড়েছে। এই ধরনের মানসিক পরিমণ্ডলের ফলে নতুন এক প্রয়োজনীয় সংস্কৃতি ট্রেড ইউনিয়নে গড়ে তোলার সুযোগও এসেছে (গ্রাবেলেস্কি ও হার্ড, ১৯৯৪)।

'ইনোভেশন' সংক্রান্ত গবেষণা বহুমুখী। 'ইনোভেশন' বিষয়ক বহু তত্ত্ব প্রস্তাবিতও হয়েছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে এম্পিরিক্যাল গবেষণার ফলাফল অনেক ক্ষেত্রেই সংগতিহীন। আবার এটাও ঘটনা যে ফলাফলের এজাতীয় বিভিন্নতার কারণের ব্যাপারে গবেষকরাও একমত নন (ডামানপোর, ১৯৯১)। সঙ্গতির অভাবের এই ধরনের কারণে আবির্ভূত হয়েছে নানা 'ইনোভেশন সাব-থিওরিজ' বা উপতত্ত্বের। এবং পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বিচিত্র তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যও। পাশাপাশি, ট্রেড ইউনিয়ন গবেষকদের কাজের আর একটি দিক হলো ইনোভেশনের সুনির্দিষ্ট দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে গবেষকদের একাংশ ট্রেড ইউনিয়নের 'এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনোভেশন' বা প্রশাসনিক নতুন পন্থার (যা সাংগঠনিক কাঠামো বা ট্রেড ইউনিয়নের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত) সাথে 'টেকনিক্যাল ইনোভেশন' বা প্রাযুক্তিক নতুন পন্থার (পণ্য, পরিষেবা বা প্রযুক্তির সাথে যুক্ত) গুরুত্বের পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন। (ডামানপোর, ১৯৯১; ডামানপোর ও ইভান, ১৯৮৪)। আর একদল গবেষক পার্থক্য নির্দেশ করেন একটি সুনির্দিষ্ট 'ইনোভেশন' বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা রূপায়নের মধ্যে। (ম্যারিনো, ১৯৮২; জ্মুদ, ১৯৮২; জালট্‌ম্যান, ডানকান ও হলবেক, ১৯৭৩)। 'ইনক্রিমেন্টাল ইনোভেশন' বা স্থিরমাত্রায় নিয়মিত বৃদ্ধির পন্থা গ্রহণ এবং 'র‍্যাডিক্যাল ইনোভেশন' বা যার দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নের মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন আর এক অংশের গবেষকরা (ডিউয়ার ও ডাটন, ১৯৮৬; সাসম্যান, নিউম্যান ও রোমানেলি ১৯৮৬)। গবেষণার কাজগুলি প্রধানত 'ইউনিল্যাটারাল ইনোভেশন' বা এক সংগঠনের দ্বারা সৃষ্ট পন্থার বিষয়ে। 'বাইল্যাটারাল ইনোভেশন' বা যে নতুন পন্থা একটি ট্রেড ইউনিয়নে উদ্ভাবিত হওয়ার পর অন্য কোন সংগঠন আলোচনা করে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করে, সেই ধারা নিয়ে তেমন গবেষণা হয়নি। তার অর্থ এই নয় যে শেষোক্ত বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ বা এইরকম নতুন পন্থা গৃহীত হয়নি। বরং বলা যায় 'ইউনিল্যাটারাল ইনোভেশন'এর চেয়ে 'বাইল্যাটারাল ইনোভেশন'এর প্রয়াস ও প্রয়োগ কম নয়।

সাংগঠনিক কাঠামোগত নতুন প্রথা ব্যবহারের কতকগুলি দিক

গবেষণাতে দেখা গেছে যে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা অনেকাংশে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট কালের কাঠামোর পরিস্থিতির উপর। কাঠামোর কারণেই 'ইনোভেশন' ঘটতে পারে, আবার ব্যাহতও হতে পারে। (ডামানপোর, ১৯৯১)।

বর্তমান উৎপাদনের এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের, বিশেষত মেগা-কর্পোরেশনগুলির বহুত্ব, বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা ও জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে ট্রেড ইউনিয়নের কাঠামোতেও বহুত্ব, ব্যাপকতা ও জটিলতামূলক নানা ধরনের 'ইনোভেশন' গড়ে উঠছে। এটা যে অনুকরণধর্মী তা' বলা যায় না বাস্তব কারণেই এই অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যাপক ও জটিল উৎপাদন প্রণালী সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের মতই

জাতীয় স্তরের বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলি ক্রমে ক্রমে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার/সিস্টেম' বা প্রশাসনিক কাঠামো/ব্যবস্থা গড়ে তুলছে, যাতে দক্ষতার সাথে সমগ্র ট্রেড ইউনিয়নকে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা যায়। আবার এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ট্রেড ইউনিয়নে আমলাতান্ত্রিক নানা দিক সৃষ্টি হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষকরা দু'টি উপাদানকে চিহ্নিত করে এক্ষেত্রে ইনোভেশনের প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। একটি হলো 'র‍্যাশনালাইজেশন' বা বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন (স্ট্রাকচারিং অ্যাক্টিভিটি বা কাঠামোগত কার্যকলাপ), অপরটি হলো 'সেন্ট্রালাইজেশন' বা কেন্দ্রীকরণ। বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের প্রস্তাবের অর্থ হলো—ট্রেড ইউনিয়নের কাঠামোগত জটিলতার সরলীকরণ ও সংগঠনের গতিবিধির বিকাশের জন্য নতুন কাঠামোকরণের স্তর, বিভাগ ও মাত্রা স্থির করা। এ' হলো বহুমাত্রিক এক ধারণা যা একটি সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের কাজের ও লক্ষ্যের বর্গীকরণ করে থাকে। সেক্ষেত্রে কাজগুলি হলো (ক) কর্মমূলক বিশেষজ্ঞত্বের চরিত্রগুলি স্থির করা (স্পেশালাইজেশন বা বিশেষজ্ঞত্বকরণ) তাছাড়া রয়েছে (খ) যে শাখাগুলির দ্বারা সংগঠন গঠিত (ডিপার্টমেন্টালাইজেশন অর ফাংশানাল ডিফারেন্সিয়েশন তথা বিভাগীয়করণ বা গতিবিধি-ভিত্তিক পার্থক্যকরণ) ও (গ) কর্মগত পদ্ধতিকে যে মাত্রাতে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে (ফর্মালাইজেশন বা আনুষ্ঠানিকীকরণ) এবং যা সমগ্র সংগঠনের অভ্যন্তরে নিয়মিত অনুসরণ করা হয় (স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন বা মানককরণ) সেগুলি পুনর্নির্মাণ করা এবং (ঘ) সংগঠনের সদস্যদের পেশাগত জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার মান (প্রফেশনালিজম বা পেশাদারিত্ব) সম-স্তরে আনার ব্যবস্থা করা। ট্রেড ইউনিয়নের বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের সর্বপ্রসারিত ধারণা সৃষ্টির অন্তর্গত হলো সংগঠনের অভ্যন্তরে সর্বস্তরে তথ্য সম্প্রচারের অবস্থা যে পর্যায়ে ('কমিউনিকেশন' বা তথ্য সঞ্চালন) রয়েছে এবং সংগঠনের সহ-এককগুলি (সাব-ইউনিট) পরস্পরের মধ্যে যে ধরনের সমন্বয় করে চলে (কো-অর্ডিনেশন বা সমন্বয়) তাতে সু-সামঞ্জস্য বিধান।

'সেন্ট্রালাইজেশন' বা কেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় সংগঠনের সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ব্যবস্থা সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার মাত্রা বনাম সংগঠনের উচ্চস্তরে ঘনীভূত থাকার অবস্থাকে (নোকে, ১৯৯০ হেনড্রিকস, গ্রাম ও ফিয়োরিটো, ১৯৯৩)। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘনীভবনের বাস্তবতা ইনোভেশনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (রাসেল ও রাসেল, ১৯৯২; ক্যাফট, ১৯৯১)। কেননা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতিকেন্দ্রিকতা তৃণমূল ইউনিয়ন নেতৃত্বের এবং সদস্যদের স্বকীয়তাও স্বাধীন চিন্তন প্রক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। তার ফলে নিচুতলায় উদ্যোগ ও নতুন কল্পনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো ব্যাহত হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্রের আলোচনা ব্যতিরেকে কেন্দ্রীকরণ-উপাদান নিয়ে পর্যালোচনা হতে পারে না। জাতীয় স্তরের ট্রেড ইউনিয়নগুলির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো একই সাথে ক্ষমতা ও ভূমিকার কেন্দ্রীভবন ও গণতন্ত্রের স্বল্প উপস্থিতি। তবে সংগঠনের সংবিধান ও নিয়মাবলীতে এবং শ্রম-আইনের বাধ্যতার জন্য নির্বাচন, ভোটাধিকার ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা সর্বস্তরে সাধারণভাবে যা দেওয়া থাকে, তাকে আরও বাস্তব ও কার্যকরী করার জন্য নানা ইনোভেশনের প্রচেষ্টা বর্তমান সময়ে দেখা যায়। গবেষণাগুলিতে উল্লেখিত হয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাত্রা স্বয়ং সমগ্র কাঠামোর উপর কার্যকরী প্রভাব ফেলে। গণতন্ত্র প্রসারিত হলে সীমাবদ্ধ হয় নেতৃত্বের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ (স্ট্রাস, ১৯৯১), যদিও ট্রেড ইউনিয়ন-ভিত্তিক পর্যালোচনামূলক গবেষণাগুলিতে গণতন্ত্রের প্রসঙ্গে ইনোভেশন নিয়ে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীকরণ বেশি মাত্রায় থাকলে 'ইনোভেশন' ব্যাহত হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। ধরে নেওয়া যেতে পারে, শেষোক্ত অবস্থার বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ফলাফল আলাদা হতে পারে। যদি প্রসারিত গণতন্ত্র আনুষ্ঠানিক না হয় এবং গণতন্ত্রের অধিকার বোধ ও ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যের উপাদান সদস্যদের মধ্যে জীবন্ত থাকে তবে সংগঠনের সাফল্য বাড়ে।

ইউনিয়ন কাঠামোর বিষয়ে গবেষণাগুলি প্রায়শই 'জুরিসডিকশন' বা বৈধ কর্তৃত্বগত সীমানার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন পরিস্থিতিতে লক্ষ্য করা যায় যে প্রায় সব ইউনিয়নই নিজের সংগঠনের

এলাকাকে প্রসারিত করার জন্য 'ইনোভেশন' মূলক প্রচেষ্টায় তৎপর। কেননা, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে নতুন প্রযুক্তি ও কাঠামোগত সংস্কার, কারখানার প্রচলিত যন্ত্রপাতির কাঠামো ও ভূমিকার সংকোচন বা অন্যত্র অপসারণ, প্রথাগত শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষয় ইত্যাদি নানা কারণে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যশক্তি ক্রমশ কমছে। তাই ট্রেড ইউনিয়নের সীমানাকে অন্যান্য অংশের মধ্যে প্রসার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা বাড়ছে। কিন্তু সেই সব চেষ্টার মধ্যেও নানা রকম প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। (ফিয়োরিটো প্রমুখ, ১৯৯৫)।

ট্রেড ইউনিয়নের সীমানা ক্রমাগত প্রসারের তৎপরতা সেটির সদস্যদের গঠন-চরিত্র এবং সদস্যভুক্তির পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিয়ে চলে।

একটি ক্রাফট-ভিত্তিক ইউনিয়নের সদস্যদের সমস্যার চরিত্রের মধ্যে সর্বজনীনতা থাকার ফলে তাদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সর্বজনীন পথ স্থির করা সহজ। কিন্তু বহু ক্রাফট-বিশিষ্ট ইউনিয়নের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্বতন্ত্র। অন্যদিকে ইউনিয়ন যদি শিল্প ও অ-শিল্প, আনুষ্ঠানিক ও অ-আনুষ্ঠানিক ইত্যাদি বহুধা দিক নিয়ে গঠিত হয়, তবে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রথমোক্ত ইউনিয়নগুলির ক্ষেত্রে ইনোভেশনের চরিত্র ইউনিটারি, কিন্তু বহুত্ব-সম্পন্ন ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ইনোভেশনের মধ্যে মালটিপ্লিসিটি বা বহুত্ব থাকতে বাধ্য। তবে বহুত্বের মধ্যেও এমন ইউনিটারি ইনোভেশনেরও দরকার হয় যার সাহায্যে সমস্ত ধরনের সদস্যকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয় একটি মূলধারাতে। এসব বিষয়ে পশ্চিমি ট্রেড ইউনিয়নগুলির ইনোভেশনের উদ্যোগ সবচাইতে বেশি।

দেখা গেছে যে ইউনিয়নের সম্পদের স্বাচ্ছন্দ্য ইনোভেশনের পক্ষে সহায়ক। সদস্যদের চাঁদা বা দানই, সাধারণত, ইউনিয়নের তহবিলের প্রধান ভিত্তি। সুতরাং সদস্য সংখ্যা, চাঁদা ও দানের পরিমাণ, সংগ্রহের কাঠামো ও তার নিয়মিত/অনিয়মিত ব্যবস্থা, সদস্যদের স্বেচ্ছা-উদ্যোগ, সংগঠনের তহবিলের উপযুক্ত ব্যবহার ও সেবিষয়ে সদস্যদের সন্তুষ্টি ইত্যাদি অর্থ সংগ্রহ ও রক্ষণের প্রধান শর্ত সৃষ্টি করে। কিন্তু আর্থিক মানদণ্ডের এই সম্পদ তখনই প্রকৃত সম্পদে পরিণত হয়, যখন সংগঠনের নিজস্ব মনুষ্য ও প্রযুক্তিগত সম্পদ থাকে এবং এই তিন সম্পদের মধ্যে সম্ভব হয় যথার্থ সমন্বয়সাধন। আর তার দ্বারাই ইনক্রিমেন্টাল বা ক্রমান্বয়মূলক এবং মৌলিক—উভয় ধরনের ইনোভেশন সম্ভব হয়। পশ্চিমি উদারনীতিক গবেষকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে এক্ষেত্রে উপেক্ষা করেছেন। সেটি হলো মতাদর্শের প্রশ্ন। একথা ঠিক যে ইনোভেশন বিষয়ক গবেষণাগুলি যেহেতু রক্ষণশীল বা উদারনীতিক ট্রেড ইউনিয়নকে ঘিরে, স্বভাবতই এই প্রসঙ্গ সেক্ষেত্রে উপেক্ষিত। এবং এই উপেক্ষা পরিকল্পিত। এইভাবে সামাজিক বৃহত্তর লক্ষ্যের পরিবর্তে সদস্যদের একান্ত স্বার্থ ট্রেড ইউনিয়নের বিবেচ্য হওয়ায় মতবাদের প্রশ্নটি, যা সর্বোত্তম এবং ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশে নির্ধারক, তা' উপেক্ষিত হচ্ছে ইনোভেশনের স্তরে। ফলে ইনোভেশন, কার্যকালে, যান্ত্রিকতাসর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

সংগঠনের আয়তন ও সম্পদের সাথে 'ইনোভেশন' এর সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। সংগঠন আয়তনে যতো বড় হয় ততোই সংগঠনের মর্ম অনুগামীদের কাছে নৈর্ব্যক্তিক (ইম্পার্সোন্যাল) হতে থাকে। কিন্তু ছোট সংগঠনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এর অনেকটা বিপরীত। কেননা সেখানে সদস্যদের সাথে সংগঠনের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত। সহজ ভাবেই বোঝা যায় যে শেষোক্ত ক্ষেত্রে 'ইনোভেশন'এর উদ্যোগ ও প্রয়োগ যতোটা সহজ হয়, বৃহদায়তন সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে তা' নয়।

গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের পরম্পরাগত সাংগঠনিক অভ্যাসও 'ইনোভেশন'কে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ধারাবাহিকভাবে সংগঠনের সর্বস্তরের ও সমস্ত অবস্থার নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রক্রিয়া যেসব সংগঠনে বলবৎ আছে, সেই সব ইউনিয়নে 'ইনোভেশন' এর সুযোগ বেশি। এই বিশিষ্টতাসম্পন্ন ধারণার স্বতন্ত্র নামকরণ করা হয়েছে (যেমন 'এক্সটারনাল কমিউনিকেশন' বা বহিঃস্থ যোগাযোগ, ইত্যাদি)। তবে এই ধরনের তৎপরতা ট্রেড ইউনিয়নের সমগ্র রণনীতিগত পরিকল্পনা ও পরিস্থিতিগত মূল্যায়নের জন্য বহু ধরনের কাজের এক অংশ মাত্র (শ্যেক ও ভলাণ্ডার, ১৯৯০)।

ট্রেড ইউনিয়নে 'ইনোভেশন' এর দ্বারা অর্জিত ব্যবস্থাবলীকে নানা ধরনের 'ফর্মূলা' বা সূত্রের দ্বারা

গ্রথিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফর্মূলাগুলির অন্যতম হলো 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল', 'ডেসক্রিপটিভ রেজাল্টস','রিগ্রেশন রেজাল্টস' ইত্যাদি। এই নিয়ে তাত্ত্বিক ও গাণিতিক আলোচনা এখানে তেমন প্রয়োজনীয় নয়।

ইনোভেশনের কিছু ফলিত দিক

এবারে 'ইনোভেশন' এর কিছু অ্যাপ্লায়েড বা ফলিত দিক উল্লেখ করা যেতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যার পরিমাণ ও হার ক্রমাগত কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সদস্যভুক্তির প্রসঙ্গে নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব ও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবণতা বহুত্বসম্পন্ন সংগঠনগুলিতে বিশেষত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে এই প্রবণতা অন্যান্য ও 'ফেডারেটিভ' সংগঠনগুলির মধ্যেও আছে। সদস্যভুক্তির ক্ষেত্রে এযাবৎকালের 'ডাইরেক্ট মেম্বারশিপ' বা প্রত্যক্ষ সদস্যপদের সাথে যুক্ত হয়েছে 'অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বারশিপ' প্রথা। যেখানে বৃত্তি-ভিত্তিক বা অন্য ছোট ইউনিয়নগুলি স্বয়ং কোন এক ন্যাশনাল বা ফেডারেটিভ ইউনিয়নের সদস্য, সেখানে অনুমোদিত ইউনিয়নগুলির বাইরে অবস্থানকারী ইউনিয়নকে 'অ্যাসোসিয়েটেড' সদস্য করার চেষ্টা বাড়ছে। অন্যদিকে ইউনিটারি বা একীভূত ট্রেড ইউনিয়নগুলির কোন কোনটির ক্ষেত্রে, নিজ সংগঠনের সদস্যের বাইরে, সম-চরিত্রের শ্রমজীবীদের স্তরে 'অ্যাসোসিয়েটেড' সদস্য করার প্রচেষ্টাও বর্তমানে লক্ষণীয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠান থেকে অবসরপ্রাপ্ত কিংবা একই ধরনের শ্রমে যুক্ত কিন্তু অন্য বহু সদস্যবিশিষ্ট ইউনিয়নের সদস্য অথবা বৃত্তিতে যোগদানের আগে ট্রেনিং গ্রহণকারী বা নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনের সদস্য কিংবা মূল-প্রতিষ্ঠানের বিদেশে সাবসিডিয়ারি, সাব-কন্ট্রাক্টারি বা হোম-ওয়ার্কে যুক্ত শ্রমিক (যারা স্বতন্ত্র ইউনিয়নের সদস্য বা সদস্য নয়), এমনকি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তেমন অংশ যারা ইউনিয়নের সংবিধান অনুযায়ী সদস্য হতে পারে না, বা সম-চরিত্রের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী ইত্যাদি নানা অংশকে 'অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার' করা হচ্ছে। কোন ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে 'ড্যুয়াল মেম্বারশিপ সিস্টেম' বা দ্বৈত সদস্যভুক্তির প্রথা। কোথাও কোথাও এই ব্যবস্থায় অ্যাসোসিয়েটেড সদস্যের কাছ থেকে কোন চাঁদা নেওয়া হয় না বা গ্রহণ করা হয় সামান্য প্রতীকী থোক দান ।

শিল্প-ভিত্তিক ও জাতীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়নগুলির বহুধা-বিভক্তির ফলে দাবী-আদায়ের আন্দোলন বা বার্গেনিং-এর শক্তি কমে গেছে। এই দুর্বলতা কাটানোর জন্য এখন পৃথিবীর দেশে দেশে, অতীতে স্বতন্ত্রভাবে বা বিরোধী হিসাবে সৃষ্ট, এমনকি আদর্শগতভাবে বিপরীত, ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যেও সম্মিলিত সাধারণ মঞ্চ, এমনকি ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে কর্মোদ্যোগ বা আন্দোলন গঠনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে 'কনফেডারেশন', 'ন্যাশনাল ফোরাম' ইত্যাদি নামে এগুলি গঠিত হচ্ছে। কেবল জাতীয় স্তরে এই ধরনের প্রয়াস সীমাবদ্ধ নয়; বহুজাতিক সংস্থা-ভিত্তিক বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং এখনও পর্যন্ত বিরল ক্ষেত্রে 'ফেডারেশন', 'কনফেডারেশন' ইত্যাদি গঠন করার প্রয়াস দেখা যায়। নাফ্টা, ই. সি. ইত্যাদি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত দেশগুলির জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিয়ে আর এক ধরনের যৌথ সাংগঠনিক মঞ্চ গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এসবই ট্রেড ইউনিয়ন ইনোভেশনের ফলিত দিক।

উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে তো বটেই, অনুন্নত দেশেও জাতীয় স্তরের কোন কোন শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দপ্তর ও কাঠামো আধুনিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার দ্বারা শক্তিশালী করা হচ্ছে। সংগঠনের ব্যাপক অংশের কাজ পরিচালিত হচ্ছে কম্পিউটার ও ক্ষেত্র বিশেষে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তাছাড়া অন্যান্য আধুনিক ব্যবস্থাও রয়েছে। সংগঠনের বিভিন্ন দিককে গড়ে তোলা হচ্ছে প্রশস্ত ও বিশেষজ্ঞমূলক করে। ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন শাখা ও সেগুলির ইনোভেশনের ফলাফলের মধ্যে গড়ে উঠছে সমন্বয়কারী গবেষণার বিভাগ। এগুলি পরিচালনার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের বাইরের সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্প-ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা, আইন, প্রযুক্তি, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি শাখার বিশেষজ্ঞদের ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রে নিয়োগ করা হচ্ছে বেতনভোগী স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে। উন্নত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নে এদের সাংগঠনিক পদাধিকারীর মর্যাদা ও ক্ষমতা পর্যন্ত দেওয়া হয়। সমগ্র শিল্পের বিভিন্ন

ক্র্যাফট, নারী, বর্ণ, জাতি, বয়স, এলাকা প্রভৃতি স্তরের জন্য স্বতন্ত্র শাখা সৃষ্টি করা হচ্ছে; তাতে দায়িত্ববদ্ধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নে দক্ষ বা পেশাদার বিশেষজ্ঞদের। আন্তর্জাতিকভাবে অন্যান্য দেশের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য বিশ্বের অঞ্চল-ভিত্তিক কেন্দ্রীয়স্তরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে কোন কোন সংগঠনে। এন.জি.ও.দের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারেও ব্যবস্থা রয়েছে কোন কোন ট্রেড ইউনিয়নে। যেসব ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্ক রয়েছে রাষ্ট্রসংঘ, আই. এল. ও, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই. এম. এফ. ইত্যাদি সংস্থার সাথে, তাদের তদনুযায়ী বিভাগ রয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের শ্রমজীবীদের নিয়ে গঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি মূল সাংগঠনিক কাঠামোর অভ্যন্তরে, সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত, সংশ্লিষ্ট বৈচিত্র্য অনুযায়ী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাখা গঠন করছে। দাবী-দাওয়া, সমস্যা প্রভৃতির চরিত্রের বিভিন্নতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সংগঠনের প্রতি সংশ্লিষ্ট অনুগামী অংশকে আকৃষ্ট করার জন্য তথা ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিকে প্রসারিত রাখা ও শক্তিশালী করার জন্য গৃহীত হচ্ছে এইসব প্রচেষ্টা। অসংগঠিত, বিদেশাগত, সার্ভিস সেক্টর, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন ইত্যাদি অংশের জন্য তৈরি হচ্ছে স্বতন্ত্র শাখা সংগঠন। নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং এদের মধ্যে ক্রমাবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা রোধে, কোন কোন দেশে, মূল সংগঠনের সর্বস্তরে কাঠামো ও নেতৃত্বে নারীদের জন্য এক ধরনের 'রিজার্ভেশন'-এর ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ট্রেড ইউনিয়নের 'ডেলিগেশন' এর ক্ষেত্রেও নারীদের জন্য রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা বহু সংগঠন নিশ্চিত করেছে।

'ট্রেনিং অ্যাণ্ড এডুকেশন' তথা প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এখন বহু ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় স্তরে একটি উল্লেখযোগ্য শাখা ও ব্যবস্থা। কোন কোন সংগঠন অনুরূপ বিষয়ে শিক্ষাদানের ইনস্টিটিউট, শিক্ষার্থীদের আবাস, পাঠ্যক্রম, প্রশিক্ষণোত্তর ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট, নির্বাচিত ও স্থায়ী শিক্ষক/প্রশিক্ষকের সংস্থান, হাতে কলমে শিক্ষার ল্যাব প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছে। কোথাও কোথাও কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন মিলিতভাবে এগুলি পরিচালনা করে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্ত নতুন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের প্রযুক্তির বিষয়ে শিক্ষিত হওয়া, পদোন্নতি অর্জনের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রভৃতি বিষয়েও এইসব প্রতিষ্ঠান সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়। তাছাড়া শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরিবেশ, কর্মক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা, বাজারীকরণ, জন-সম্পর্ক, শ্রম-সম্পর্ক, ভোক্তাকে সহযোগিতা করা প্রভৃতির উন্নতিসাধনের বিষয়ে দক্ষ হওয়া।

কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণ সদস্যদের সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য নিত্যনতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে— স্কলারশিপ, ফ্রী ট্রিপ, কনজিউমার কো-অপারেটিভ, কো-অপারেটিভ হাউসিং, লটারি, বুক ব্যাঙ্ক, ব্লাড ব্যাঙ্ক, হসপিট্যাল, মেটারনিটি হোম, ক্রেস, এক্সকার্সন, ফেস্টিভ্যাল, কার্নিভাল, বিউটি কম্পিটিশন, ফ্যাশন শো, হেলথ চেক-আপ, স্পোর্টস, ডান্স-ড্রামা-সিংগিং কমপিটিশন, বিউটি পার্লার, বার-পাব, হট ড্রিংস পার্লার প্রভৃতি সেগুলির অন্যতম। লক্ষ্য করলে মনে হতে পারে এগুলি সাধারণভাবে পশ্চিমি ট্রেড ইউনিয়নের কালচার। একথা অংশত সত্য। তৃতীয় দুনিয়ায়, বিশেষত নিউলি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজিং কান্ট্রিজ-এর কোন কোন ট্রেড ইউনিয়নও, এইসব ব্যবস্থা নিচ্ছে। মানসিক ও বাহ্যিকভাবে শ্রমজীবীদের আকৃষ্ট করার জন্য তথাকথিত ন্যায্যমূল্যে বা স্বল্পমূল্যে যেসব চাহিদা পূরণ করা ও উপকরণ দেওয়া হচ্ছে, তা' এক অর্থে ভোগবাদিতাকে প্রবিষ্ট করানোরই নামান্তর। দেখা যায় যে, কোম্পানিগুলিও নিজেদের উৎপন্ন পণ্য ট্রেড ইউনিয়নকে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করছে বিবিধ লক্ষ্য থেকে। ট্রেড ইউনিয়নকে সহায়তা দানের নামে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রতি আকৃষ্ট রাখা এবং প্রতিষ্ঠান-কর্মীদের কোম্পানির পণ্যের পরোক্ষ প্রচারকে পরিণত করা এবং এইভাবে বাণিজ্য স্বার্থ বৃদ্ধি করা সেইসব লক্ষ্যের অন্যতম।

একদিকে বিশ্বায়ন ও কাঠামোগত সংস্কারের আক্রমণ ও অন্যদিকে সর্বাধুনিক প্রচার-মাধ্যমের আগ্রাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ট্রেড ইউনিয়নকে নিজ প্রচার, শিক্ষা-দান ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অডিও-ভিডিও প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের ব্যাপক সহায়তা নিতে হচ্ছে। উন্নত দুনিয়ার শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নগুলি টি.ভি. চ্যানেল, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ইত্যাদি ব্যবহার করলেও, তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের সামর্থের অন্তর্গত হয়নি সেগুলি এখনও। কিন্তু অডিও-ভিডিও ব্যবস্থা সর্বত্র ব্যবহৃত হতে

শুরু করেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। অডিও-ভিডিও-র সাহায্য ট্রেড ইউনিয়নের তৃণমূল পর্যন্ত প্রচার বা শিক্ষাদান ছাড়াও ব্যবহার করা হচ্ছে জনগণের মধ্যে সংগঠনের বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। নেতৃত্বের বক্তৃতা, পরিস্থিতির ব্যাখ্যা, প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ, শ্রমিকদের শ্রম-পরিস্থিতি, পারিবারিক অবস্থা, পরিবেশ, শ্রম-আইনের ব্যাখ্যা, প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুনের সুযোগ-সুবিধা কিভাবে পেতে হবে, কারখানার লাভ ও অন্য দেশে কারখানাটির ভূমিকা, ভিন্ন দেশে ঐ কারখানা-শ্রমিকদের পরিস্থিতি, নতুন অর্থনীতি ও কাঠামোগত সংস্কারের ফলাফল, শ্রমিকদের বিভিন্ন অংশের—অসংগঠিত, নারী, বিদেশাগত, কায়িক ও মানসিক শ্রমদায়ী প্রভৃতি অংশের বিশিষ্ট সমস্যা, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে শিক্ষা প্রভৃতি অজস্র বিষয় নিয়ে এখন তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন ক্যাসেট তৈরি করছে। প্রতিটি বিষয়কে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য ঘটনাবলীর চলচ্চিত্র থাকছে তাতে। আকর্ষণীয় শিরোনাম দিয়ে, আবহসংগীত ইত্যাদির ব্যবহার করে এবং এসব বিষয়ে দক্ষ ও পেশাদারদের নিয়োগ করে ক্যাসেটগুলি তৈরি করা হচ্ছে।

ইনোভেশনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তি প্রসঙ্গে তত্ত্ব

'ইনোভেশন' সংক্রান্ত পূর্বোক্ত বিভিন্ন ধরনের ও বিষয়ের গবেষণা ও আলোচনার চরিত্র আসলে সাবজেকটিভ এবং এগুলি প্রধানত বুর্জোয়া, লিবারাল ও সংস্কারবাদী অংশের দ্বারা প্রভাবিত। তবে একটি বিষয়ে প্রায় সব অংশই সহমত যে সংগঠন হলো এক সামাজিক উপাদান, কিন্তু ধারণাটি বিমূর্ত। সমাজের অভ্যন্তরে এটির আবির্ভাব, সমাজের বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এটির পরিবর্তন বা বিপরীতপক্ষে সংগঠনের পরিবর্তনও সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করে এসেছে। অন্যভাবে বলা যায় যে সংগঠন উত্থিত হয় ও জীবন্ত থাকে সামাজিক পটভূমিকায়; আবার, সমাজ সতত গতিশীল। সংগঠন কার্যকালে সামাজিক এই প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে বেগবান করে।

এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে হবসীয় ধারণা-প্রসূতভাবে ট্রেড ইউনিয়নকে অন্তর্গত করা হয়েছে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের পরিমণ্ডলে। এই ধরনের ধারণার ভিত্তি হলো নিয়মতান্ত্রিকতা (লিগ্যালিটি)। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন হলো রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অভ্যন্তরে এক আইনি সত্তা। ট্রেড ইউনিয়নের সংবিধান, ব্যবস্থা, দাবী-দাওয়া উত্থাপন, আন্দোলন ইত্যাদি হলো এটির অন্তর্গত মানুষদের নিজেদের মধ্যে এক ধরনের চুক্তির বিভিন্ন ধরনের প্রতিফলন। এইসব প্রস্তাব ও মন্তব্য করা হয়েছে 'ইনস্টিটিউশনাল ইকনমিকস' বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির তত্ত্বের ধারণার অন্তর্গত থেকে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, সদস্যরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে অংশগ্রহণ করে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ভূমিকা-পালনকারী এবং আইনি সুযোগ প্রাপক হিসাবে। তাছাড়া তাদের এই যোগদান এবং ভূমিকা পালনের ভিত্তি হলো নিজেদের আয় বনাম ব্যয় অর্থাৎ লাভ বনাম লোকসান তথা নিজ প্রদত্ত চাঁদা বা ইউনিয়নের জন্য সময় ব্যয় বনাম নিজেদের সমস্যার সমাধানে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকার তুল্যমূল্য বিচার করে নিশ্চিত হওয়া যে, ট্রেড ইউনিয়নের ব্যবস্থা তাদের কাছে অনুকূল। স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধতার দ্বারা সদস্যরা সংগঠনের মধ্যে অধিকার ভোগ ও সেটির প্রতি দায়িত্বপালন-মূলক দ্বিবিধ অথচ বাহ্যত পরস্পর-বিরোধী অবস্থাকে স্বীকার করে নেয়। সংগঠনে অংশগ্রহণকারীদের উপর এই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ককে বাধ্যতামূলক করা হয়। এর ফলে অংশগ্রহণকারীদের সৃষ্টি হয় এক 'কর্পোরেট আইডেন্টিটি' বা সমবায়ী পরিচিতি। অর্থাৎ তারা যেন অনেকটা নিরপেক্ষ সত্তা।

বিশ্ব-পরিস্থিতি তথা সমাজে যে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছে, সেই পটভূমিকাতে, ট্রেড ইউনিয়নের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক এই ধরনের তাত্ত্বিকদের বিস্তৃত বক্তব্য রয়েছে। সংগঠনের সৃষ্টির পর, কোন মুহূর্তে এসে সমাজের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে; ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্গত মানুষরা যেহেতু সামাজিক জীব, স্বাভাবিকভাবে তাদেরও পরিবর্তন ঘটে। বিপরীতপক্ষে মানুষের পরিবর্তনের জন্য সমাজের যেহেতু পরিবর্তন ঘটে, সেহেতু ট্রেড ইউনিয়নের ব্যবস্থাকেও করে নিতে হয় প্রয়োজনোপযোগী। এইভাবে প্রয়োজন দেখা দেয় সমগ্র চুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থার নবায়নের। সেকারণে

ইনোভেশনের প্রয়োজন পড়ে। ইনোভেশনের ভিত্তি হিসাবে, এই মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে পূর্বোক্ত তত্ত্বগুলি গ্রহণ করেছে।

'অরগানাইজেশন স্ট্রাকচার' বা সংগঠন-কাঠামো নিয়ে প্রথমাংশে ইনোভেশনগুলির কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে। সংগঠনের কাঠামোগত বিষয়ে 'অরগানাইজেশন থিওরি'গুলি নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছিল ম্যাক্স ওয়েবারের আদর্শায়িত সূত্রগুলির মাধ্যমে। এই ধারাকে পরবর্তীকালে 'ক্লোজড-সিস্টেম অ্যাপ্রোচ' বা ঘেরাবদ্ধ পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গি বলে নামকরণ করা হয়েছে। এই ধারার দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগঠন হলো কতকগুলি দুর্লভ স্থির গুণকের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, যেমন মনুষ্য-শক্তি, সাংগঠনিক রীতি-নীতি, প্রযুক্তি, আয়তন ইত্যাদি। এই গুণকগুলির সংস্থান করা হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও উদ্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের জন্য। বিভিন্ন ধরনের সংগঠনগুলির মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা উদ্দেশ্য ও উদ্দিষ্ট ফলাফলের পার্থক্যের জন্য। সুতরাং এই ধারার মতে সংগঠন সম্পর্কিত মূল্যায়ন করার এক অর্থ হলো উদ্দেশ্য ও উর্দ্দিষ্ট ফলাফলের মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিচার করা। এঁদের মতে ইনোভেশনের গুরুত্ব এই প্রসঙ্গেই।

এরই পাশাপাশি অনেকটা বিপরীতমুখী আর এক ধারণাকে বলা হয়েছে 'ওপেন সিস্টেম অ্যাপ্রোচ' বা খোলা পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গি। এই ধারার তাত্ত্বিকদের মতে শুরুর পর্বে ট্রেড ইউনিয়ন অভ্যন্তরীণভাবে একই ধরন-ধারণ নিয়ে গঠিত হলেও, পরবর্তীকালের সামাজিক পরিবর্তনের ফলে, শুরুর কালের সেগুলির উদ্দেশ্য ও উদ্দিষ্ট ফলাফল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। জন্মলগ্নের পর থেকে ক্রমাগত সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন ও তা' রক্ষা করার প্রয়োজনে বহুধামুখীন উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠন কাজ করার চেষ্টা চালায়। এর ফলে সংগঠনে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থারও পরিবর্তন বা পুনর্গঠন সাধিত হয়—তা' সামাজিক শক্তিগুলির চাপেই হোক বা অভ্যন্তরীণ অথবা রাজনৈতিক পরিবর্তিত প্রক্রিয়ার জন্য হোক এবং এগুলির প্রভাবে প্রয়োজন দেখা দেয় পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দিষ্ট ফলেরও পরিবর্তন ঘটানোর। অন্যদিকে একাংশ সংগঠন-চরিত্র বিষয়ক গবেষক মনে করেন যে দৃশ্যত এক চরিত্রের সংগঠন বলে মনে হলেও, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতা ও কাঠামোতে সংগঠনগুলির অবস্থানের জন্য এবং বাইরের বিভিন্ন শক্তির ভূমিকায় (যা সংগঠনের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়), সংগঠনের অভ্যন্তরীণ গঠন, উদ্দেশ্য ও ফল পরিবর্তিত হতে পারে। সুতরাং এই পরিবর্তনকে অনুকূলে আনার জন্য ট্রেড ইউনিয়নে 'ইনোভেশন' সব সময়েই জরুরি।

সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, লক্ষ্য ও ফল ইত্যাদি অর্জনে প্রথমে আলোচিত 'ইনোভেশন'এর দিকগুলি ও ব্যবস্থাসমূহ এবং পরবর্তীতে বর্ণিত সংগঠনে 'ইনোভেশন'-এর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তি সম্পর্কিত তত্ত্বর কোনটিই কার্যকালে বর্তমানের মর্মগত সমস্যাগুলিকে তেমনভাবে স্পর্শ করে না। শোষণ-ভিত্তিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ভূমিকা নেওয়ার কথা ট্রেড ইউনিয়নের; কেননা এটি শোষিতদের সংগঠন, যাদের স্বার্থ শাসকদের স্বার্থের বিরোধী। এই সংগঠনকে নিছক সোস্যাল কন্ট্রাক্ট-এর প্রতিফলন এবং আইনি প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করার অর্থ ট্রেড ইউনিয়নকে শোষণ-ভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এক ধরনের অবিভাজ্য অংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা। ট্রেড ইউনিয়নের 'রি-সেটিং' বা পুনর্বিন্যাসের প্রসঙ্গ, স্বভাবতই, পুঁজিবাদের পুনর্বিন্যস্ত শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য শক্তিশালী সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। অথচ পূর্বে উল্লেখিত 'ইনোভেশন'গুলিতে সমস্ত দিকই কেন্দ্রীভূত হয়েছে কাঠামোগত প্রসঙ্গে। এবং তাও পরিস্থিতির পশ্চাৎধাবন করার উপযোগী মনোভাব ও কার্যকলাপের দ্বারা।

এ কথা ঠিক যে, পরিস্থিতির প্রয়োজনে বাহ্যিক কার্যকলাপের পুনর্গঠনের অনিবার্য প্রয়োজন ট্রেড ইউনিয়নের সামনে থাকে, বর্তমানে রয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রচেষ্টায় যা উপেক্ষিত বা অনুপস্থিত তা' হলো অন্তর্বস্তুর দিকটি এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য তথা মতবাদের দিকটি। আর শেষোক্ত এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে অভ্যন্তর থেকেই প্রধানত; বাইরে থেকে তেমন নয়। আসলে, এই ধরনের ট্রেড ইউনিয়নগুলি 'ট্যাকটিক্যাল টাস্ক' রণকৌশলগত কাজকে 'স্ট্র্যাটেজিক টাস্ক' বা রণনীতিগত

কর্মসূচীতে পরিণত করেছে। বর্তমান বিশ্বে ট্রেড ইউনিয়নের কোণঠাসা বাস্তবতার অন্যতম কারণও এটি। ইউনিয়নগুলি ট্যাকটিক্যাল টাস্ক বা রণকৌশলগত কাজকে স্ট্র্যাটেজিক টাস্ক বা রণনীতিগত কাজে পরিণত করছে। বর্তমান বিশ্বে ট্রেড ইউনিয়নের কোণঠাসা বাস্তবতার অন্যতম কারণও এটি।

গ্লোবাল লেবার-নেট ও নতুন আন্তর্জাতিক

'বড় সমস্যার জন্য বড় চিন্তন প্রয়োজন'—এমন মনোভাব এখন দেখা যায় ট্রেড় ইউনিয়নের তাত্ত্বিক ও সংগঠকদের অনেকের মধ্যেই। ট্রেড ইউনিয়ন যেহেতু এখন গোটা দুনিয়া জুড়ে বিপুল সমস্যা ও প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েছে তাই 'বড় চিন্তন'-এর তত্ত্বের একটা বড় প্রভাব পড়েছে ট্রেড ইউনিয়নের তত্ত্ব, কাঠামো ও কর্মকাণ্ড গঠনে। কেবল তাই নয়, এই তিনটির মধ্যে অদ্ভুত ধরনের সংমিশ্রণের চেষ্টাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই মনোভাব সৃষ্টি ও তৎপরতার এক অতি সাম্প্রতিক নজির হলো 'গ্লোবাল লেবার-নেট' গঠন। ট্রেড ইউনিয়ন 'স্ট্রাকচারাইজেশন' বা ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামোকরণের জন্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাকে একইসাথে ট্রেড ইউনিয়নের 'থিওরি' তথা তত্ত্ব এবং 'অ্যাপ্লিকেশন' তথা প্রয়োগ হিসাবে প্রস্তাব করা হচ্ছে। তবে, তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নে এই প্রসঙ্গ এখনও অনেকটাই অপরিচিত বা অপ্রযুক্ত; তবে প্রসঙ্গটি দ্রুত ছড়াতে শুরু করেছে। এটাও সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে, প্রত্যেকটি ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবে। অর্থের সমস্যা বা পরম্পরাগত কর্মপদ্ধতিজনিত গোঁড়ামি অথবা আধুনিকতার সাথে সঙ্গতিসাধনে ব্যর্থতা কিংবা যোগ্যতার দিক থেকে বাতিল হওয়া নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না; কেননা ইতোমধ্যেই যেসব দেশের ট্রেড ইউনিয়নে এই ধরনের নতুন ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়েছে, সেইসব দেশে এইসব প্রতিকূলতা ব্যর্থ হওয়ার অভিজ্ঞতা ঘটেছে।

নতুন আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রস্তাব

মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির সীমানাহীন (বর্ডারলেস) ভূমিকা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অতীতের তুলনায় বেড়েছে। চরিত্র, আয়তন ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে সমস্ত ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন এখন এটা অনুভব করছে। শ্রমের সংগঠন ও সংগ্রামের আন্তর্জাতিকীকরণের প্রয়োজনবোধের বিষয়টি যেমন পুঁজিকে বিশ্বজনীন করার প্রত্যক্ষ চাপের অন্যতম ফল, অন্যদিকে বিশ্ব শ্রমিক-আন্দোলনের বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার এক দিক। কেননা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্বীয় বিকাশের প্রক্রিয়া হিসাবে কারখানা, শিল্প, অঞ্চল, দেশকে অতিক্রম করে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ সীমানাহীন হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে। 'শিল্প-বিপ্লব' চলাকালে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক তৎপরতার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরবর্তী প্রয়াস হিসাবে ১৮৬৪ সালে মার্কস-এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন', যা পরবর্তীকালে প্রথম আন্তর্জাতিক বলে পরিচিত হয়েছিল, সেটির অবসান ঘটে ১৮৭৬ সালের জুলাইতে, ফিলাডেলফিয়াতে অনুষ্ঠিত সভা থেকে। এটির অস্তিত্ব ছিল ১২ বছর। ১৮৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্যারীর সভা থেকে নতুন করে পত্তন হয় আর একটি আন্তর্জাতিকের, যা প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর (১৯১৪) মধ্য দিয়ে অবলুপ্ত হয়েছিল। ২৫ বছর স্থায়ী এই আন্তর্জাতিক পরিচিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক হিসাবে। আরও অনেকগুলি শিল্পভিত্তিক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই, যেগুলির সংখ্যা ছিল ১৪টি। আজও সেগুলি সমসংখ্যক হিসাবে বর্তমান রয়েছে—ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেক্রেটারিয়েটস (আই.টি.এস.)। পরবর্তীকালে আরও কতকগুলি আন্তর্জাতিক, যেমন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস (আই.এফ.টি.ইউ) গঠিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালে লেনিনের নেতৃত্বে 'কমিন্টার্ন' বা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পত্তন ঘটে, যা' টিঁকে ছিল ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ২৪ বছর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের সোস্যালিস্টরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের তথাকথিত পুনঃপত্তন করেছিল, যা পরিচিত হয়েছিল টু-অ্যাণ্ড-হাফ ইন্টারন্যাশনাল নামে। তাছাড়াও তৈরি হয় ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স

ফেডারেশন (আই.টি.এফ.), ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ফুড ওয়ার্কার্স (আই.ইউ.এফ.) প্রভৃতি। তিরিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দলত্যাগী ট্রটস্কির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে চতুর্থ আন্তর্জাতিক। নামে মাত্র হলেও, এটি এখনও টিঁকে রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গড়ে ওঠে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস এবং কমিউনিজম-বিরোধী ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস (আই.সি.এফ.টি.ইউ.)। পূর্বে উল্লেখিত সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এখনও টিঁকে থাকলেও, মাঝে মাঝে সভা বা সম্মেলন করা ছাড়া সেটি কোন ভূমিকাই নেয় না। শ্রমজীবীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন বিষয়ক একাংশ তাত্ত্বিক এই সব আন্তর্জাতিকের ইতিহাস নিয়ে আশির দশক থেকে বিশেষভাবে আলোচনা চালান। গবেষণাকালে এঁরা লক্ষ্য করেন যে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বহু নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালে গড়ে উঠেছে। এগুলি নতুন ধরনের সোস্যাল-মুভমেন্ট বা সামাজিক-আন্দোলন—বিশেষত মানব অধিকার, শান্তি, নারীবাদ, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি নিয়ে এগুলির বিকাশ ঘটেছে। সম্প্রতি এরা নিজেদের যেসব আন্তর্জাতিক গঠন করেছে, সেগুলির অন্যতম গণ আন্দোলন হলো গ্রীন-পীস এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বা মানবাধিকার আন্তর্জাতিক। এগুলির রয়েছে আন্তর্জাতিক সেক্রেটারিয়েট, বিশ্ব-কংগ্রেস অনুষ্ঠান করে এরা, প্রচার সামগ্রী জনগণের মধ্যে নিয়ে যায় এবং নিজেদের লক্ষ্য সম্পর্কে মানুষের মধ্যে উপলব্ধি গঠন করে। তাছাড়া, নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনগুলিরও রয়েছে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক। পিটার ওয়াটারম্যান দেখিয়েছেন কিভাবে এইসব সংস্থা নিজ নিজ কম্পিউটার ও কম্পিউটার কমিউনিকেশনের আন্তর্জাতিক নেটওযার্ক গড়ে তুলেছে। এইভাবে, এত ধরনের সংগঠনের দ্বারা, কার্যকালে সৃষ্টি হয়েছে 'কমিউনিকেশনস ইন্টারন্যাশনালস্'। আধুনিক আন্তর্জাতিক শ্রম-বিশেষজ্ঞরা, পূর্বোক্ত সমস্ত ঘটনাবলী থেকে শ্রমিকশ্রেণীর পূর্বতন আন্তর্জাতিকগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকার ত্রুটি-দুর্বলতাগুলি এবং তা থেকে বিলোপের কারণগুলি চিহ্নিত করার পাশাপাশি বর্তমান নতুন পরিস্থিতিতে নতুন আন্তর্জাতিক তৎপরতা কিভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে মত প্রকাশ করতে থা[illegible] [illegible]ক্ষণীয় যে লিবারাল শ্রম-তাত্ত্বিকদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর অতীতের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংগঠন বা গণসংগঠন ও সেগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে যে ধরনের ধারণা গড়ে উঠেছিল, আশির দশক থেকে সেইসব ধারণায় এক ধরনের পরিবর্তন তথাকথিত 'নিউ অ্যাওয়েকেনিং' বা নতুন জাগরণের কাল শুরু হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের গঠন, ভূমিকা গ্রহণ ও কাঠামোকরণের প্রয়োজনে এই সময়ে প্রস্তাবিত হতে শুরু করে নতুন তত্ত্ব। এই ভাবনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে তৃতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলাফল। যদিও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের কাঠামোকরণের প্রস্তাবের সাথে তথ্য-প্রযুক্তির (ইনফরমেশনাল টেকনোলজি) সম্পর্কের বিষয়টি ভাবনার জগতে উদয় হয়েছিল ৮০-র দশকের পূর্বেই।

ট্রেড ইউনিয়নে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে তাত্ত্বিক প্রস্তাবগুলি

১৯৬৯ সালে 'ইন্টার-নেট' নির্মিত হলেও ১৯৭২ সালে জনগণ এই পদ্ধতি ও ব্যবস্থার কথা, প্রথম জানতে পারে। সংক্ষেপে 'ইন্টার-নেট' হলো কম্পিউটারভিত্তিক বিশ্ব নেটওয়ার্ক সমূহের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। ১৯৬৯ সালে এটি প্রথম 'আরপানেট' বলে পরিচিত হয়েছিল। বর্তমানে এই ব্যবস্থায় কয়েক মিলিয়ন কম্পিউটার যুক্ত আছে এবং প্রণালীটি ব্যবহার করে কয়েক কোটি মানুষ। 'ইন্টার-নেট' যোগাযোগ মাধ্যমের এই নিপুণ ও প্রায় সর্বব্যাপী ব্যবস্থায়, মধ্য নব্বই-এর দশকে, 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব' (ডব্লু.ডব্লু.ডব্লু.) ব্যবস্থা বিশ্ব-তথ্য-সঞ্চালন প্রণালী হিসাবে গড়ে উঠেছে। 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব'এর ব্যবস্থা সংক্ষেপে হলো ইন্টার-নেটের সব চাইতে দ্রুততার সাথে বর্ধমান অংশ; এটি হলো টেক্সট, পিক্চার্স, সাউণ্ড ও ভি.ডি.ও সহ হাইপার মিডিয়া ফাইলসমূহের পরস্পরের সাথে সংযুক্ত সেট।

তথ্য-সঞ্চালন মাধ্যমের এই নতুন ব্যবস্থার আগামী সম্ভবনার ব্যাপকতা ও ভয়ংকর শক্তি নিয়ে গবেষণা যখন আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তরের বাইরে অন্য কোন স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছোয়নি,

সেই ১৯৭২ সালে কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েট (তখন আই.সি.এফ. বলে পরিচিত ছিল)-এর সেক্রেটারি জেনারেল চার্লস 'চিপ' লেভিনসন একটি পুস্তক লেখেন — 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়নিজম'। লেভিনসনের নামের সাথে 'চিপ' শব্দটি যুক্ত হয়েছে পরবর্তীকালে—মাইক্রোচিপসের ব্যবস্থা ট্রেড ইউনিয়নে প্রথম সংযোগ করার প্রস্তাবক হিসাবে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী, যা পরবর্তী যুগে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই জুলে ভার্নের রচনার সমতুল বলে এই পুস্তকটিকে পরবর্তীকালে আখ্যায়িত করা হয়েছে — 'জুলে ভার্নে অব লেবার টেলিমেটিকস'। টেলিমেটিকস সংক্ষেপে হলো সমস্ত ধরনের ডাটা-প্রসেসিং, ইলেকট্রনিক ইনফরমেশন এবং কমিউনিকেশনের মধ্যে পারস্পরিক অন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা। লেভিনসন বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ছাত্র ছিলেন না, কম্পিউটার ভিত্তিক নতুন তথ্য সঞ্চালন প্রণালী সম্পর্কে তাঁর সামান্যতম ধারণাও ছিল না। লেভিনসন এই পুস্তকে প্রথম বললেন যে বহুজাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা বহু দেশ জুড়ে উৎপাদনের ব্যবস্থা স্থাপনের ফলে শ্রমের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে, স্বীয় বিশ্বময় তৎপরতার প্রয়োজনে, ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মে কম্পিউটার ও কম্পিউটার কমিউনিকেশনের সংযুক্তিসাধন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে বহুজাতিক সংস্থার 'কাউন্টারভেইলিং পাওয়ার' বা প্রতিহতকারী শক্তি হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নকে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হবে, একটি বহুজাতিক সংস্থা যতগুলি দেশে উৎপাদন করে সেই সমস্ত দেশের ঐ প্রতিষ্ঠানটির ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে, 'কোম্পানি কাউন্সিল' গঠন করা দরকার। 'কোম্পানি কাউন্সিল' বলতে বলা হয়েছিল বহুজাতিক সংস্থাটির সমস্ত দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থের বিষয়ে এক সর্বময় দর-কষাকষির কমিটি। নিজ নিজ দেশে এই প্রতিনিধিরা অবস্থান করেও কম্পিউটার যোগাযোগের সাহায্যে নিজেদের সহকর্মীদের সাথে মতামত বিনিময় করবেন; কোম্পানির সাথে একইভাবে কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দর-কষাকষি চালাবেন। এই ধরনের আন্তর্জাতিক ভূমিকাকে যথার্থভাবে কার্যকরী ও সফল করতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দেশগুলির সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক সংস্থা ও শ্রমিকদের সমস্ত ও আধুনিক তথ্য প্রতি মুহূর্তে ট্রেড ইউনিয়নের হাতে পাওয়ার মতো এক স্বয়ংক্রিয় ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ব্যবস্থা থাকতে হবে। তিনি লিখলেন "কেবলমাত্র কম্পিউটারিভূত ইনফরমেশন ব্যাংকই পারে ইউনিয়নের দর-কষাকষি ও রণনীতিক শক্তিকে মালিকপক্ষের দুর্বলতায় পরিণত করতে। এই কম্পিউটারিভূত ব্যবস্থা গঠন করলে পাওয়া যেতে পারে কোম্পানির আর্থনীতিক ও তথ্য পরিসংখ্যান, উৎপাদন, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও যন্ত্রপাতির তালিকা, শ্রমিকদের মজুরির অবস্থা, কাজের ঘন্টা, ছুটি, অবসর এবং প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য"। লেভিনসন, এইভাবে, ট্রেড ইউনিয়নের নতুন আন্তর্জাতিক এক যান্ত্রিক কাঠামোকরণের প্রস্তাবই করলেন। তিনি এও বললেন যে এর মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নতুন চরত্রের আন্তর্জাতিক গঠন করে যথার্থ সামাজিক বিকল্প উত্থাপন করবে।

এই তত্ত্ব ও প্রস্তাবের পাশাপাশি সেটির প্রয়োগিক দিক নিয়ে, নানা দেশে, পরস্পরের অজান্তেই বিবিধ প্রয়াস শুরু হয়েছিল। তবে সেই আলোচনায় প্রবেশের আগে অভিনব ধরনের আন্তর্জাতিক গঠন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনাগুলির কিছুটা উল্লেখ করা দরকার।

১৯৮৪ সালে পিটার ওয়াটারম্যান সম্পাদিত 'ফর আ নিউ লেবার ইন্টারন্যাশনালিজম ঃ আ সেট অব রিপ্রিন্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কিং পেপারস' পুস্তকটি এবং সেটিতে তাঁর রচিত নিবন্ধ 'নিডেড্ ঃ আ নিউ কমিউনিকেশনস মডেল ফর আ নিউ ওয়ার্কিং ক্লাস ইন্টারন্যাশনালিজম' আরও গভীর, কার্যকরী ও ব্যাপকভাবে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিকে ট্রেড ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক ভূমিকায় ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের বিষয়ে নতুন আলোকপাত করে। ১৯৯০ সালে নেদারল্যাণ্ডসের ইপে-তে বিশ্বের নানাদেশের ট্রেড ইউনিয়নের ৫০ জন প্রতিনিধি মিলিত হয়ে কেবলমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের জন্য কম্পিউটার ও কম্পিউটার কমিউনিকেশন আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪ থেকে ১৬ই এপ্রিল, ১৯৯২ তারিখে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে প্রায় অর্ধশতাধিক দেশের ৯০ জন ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক তাত্ত্বিক এবং প্রতিনিধি এক সম্মেলনে মিলিত হন। আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা ও ক্যামেরুন, এশিয়া থেকে ফিলিপিনস, দক্ষিণ কোরিয়া,

ভারত ও সিঙ্গাপুর, লাতিন আমেরিকা থেকে মেক্সিকো, ব্রাজিল ও উরুগুয়ে, ইউরোপ থেকে ইউনাইটেড কিংডম, আয়ারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, ইতালি, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড এবং রাশিয়া ও হাঙ্গেরি ছাড়াও অন্য মহাদেশগুলির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড এই সম্মেলনে যোগ দেয়। আন্তর্জাতিক 'লেবার-নেট' গঠন করার বিষয়ে এই সম্মেলন থেকে গৃহীত হয় এক দলিল— 'ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন, অ্যাণ্ড দা লেবার মুভমেন্ট'। ১৯৯২ সালেই পিটার ওয়াটারম্যানের রচনা 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার কমিউনিকেশন বাই কম্পিউটার : দা ফিফ্‌থ ইন্টারন্যাশনাল' উন্নত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের একাংশ নেতৃত্বের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৯৪ সালে আই.এল.ও'র 'লেবার টেলিমেটিকস সেন্টার-এর পক্ষ থেকে জন অ্যাট্‌কিন্স প্রমুখ 'দা অপরচ্যুনিটি অ্যাণ্ড চ্যালেঞ্জ' অব টেলিমেটিকস', ডান গালিনের "ইনসাইড দা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার ঃ ড্রয়িং দা ব্যাটল লাইনস', মনটিয়েথ.ই.ইলিংওয়ার্থের 'ওয়ার্কার্স অব নেট, ইউনাইট!', পিটার ওয়াটারম্যানের 'ফ্রম মস্কো উইথ ইলেকট্রনিকস ঃ এ কমিউনিকেশন ইন্টারন্যাশনালিজম ফর অ্যান ইনফরমেশন ক্যাপিটালিজম', ১৯৯৫ সালে এরিক লী'র ২টি রচনা — 'লেবার অ্যাণ্ড দা ইন্টার-নেট' এবং 'ইন্টার-নেট ওয়ার্ল্ড' এবং ১৯৯৭ সালে এরিক লী'র দা লেবার মুভমেন্ট অ্যাণ্ড দা ইন্টার-নেট ঃ দা নিউ ইন্টারন্যাশনালিজম' প্রভৃতি রচনা থেকে ইন্টার-নেটের সমান্তরালে লেবার-নেট এবং নতুন ধরনের আন্তর্জাতিকতার তত্ত্ব ট্রেড ইউনিয়নে উত্থাপিত হয়।

লেবার-নেটের সূত্রপাত

১৯৮১ সালে ৪০ হাজার সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট ব্রিটিশ কলম্বিয়া টিচারস ফেডারেশনের (বি.সি.টি.এফ.), সভাপতি উইলিয়ম গিবসন সমিতির কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে যোগাযোগের প্রবল সমস্যার মুখে নতুন কার্যকরী পদ্ধতির সন্ধান করছিলেন। তার সংগঠনের ভৌগোলিক সমস্যাটির দিকে দৃষ্টি দিলেই তার অনুসন্ধান ও প্রয়াসের পেছনের কারণকে সহজেই বোঝা সম্ভব হবে।

কানাডা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। ব্রিটিশ কলম্বিয়া দেশটির তৃতীয় বৃহত্তম রাজ্য এবং গ্রেট ব্রিটেনের চেয়ে আয়তনে চারগুণ বড়ো — প্রায় ৩,৬০,০০০ বর্গমাইল। এটির বৃহত্তম স্কুল ডিস্ট্রিক্টের ভৌগোলিক আয়তন ব্রিটেনের সমান, অথচ সেখানে সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে কাজ করেন মাত্র ২০ জন শিক্ষক। এই রকম পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব ও অনুগামীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সদস্যদের অংশীদার করা একদিকে যেমন প্রচণ্ড সময়সাপেক্ষ এবং অন্যদিকে প্লেনে যাতায়াত করে তা' সম্পন্ন করার আর্থিক দায় সংগঠনের পক্ষে সম্পূর্ণ দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ ক্রমবর্ধমান সমস্যার ফলে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র ও অনুগামীদের মধ্যে, অতীতের চেয়ে অনেক বেশি যোগাযোগ সাধনের। কেননা সরকারের ইউনিয়ন-বিরোধী ভূমিকা এবং কানাডার শিক্ষকদের মজুরি ক্রমাগত ক্ষয় পাওয়ার সমস্যা বাড়ছিল। এই রকম অবস্থায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে এবং প্রতিটি শাখা দপ্তরে পার্সোন্যাল কম্পিউটার স্থাপনের ব্যবস্থা এবং সেগুলিতে শিক্ষক ও সংগঠনের সমস্ত ধরনের তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে, সারা বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বি.সি.টি.এফ. সর্বপ্রথম 'বুলেটিন বোর্ড সিস্টেম' (বি.বি.এস.) চালু করে। বি.বি.এস. বলতে বোঝায় ডায়াল করা পদ্ধতির অন-লাইন সিস্টেম যা থেকে ভোক্তারা প্রোগ্রাম বের করে নিতে পারে; অন্য ভোক্তার ব্যবহারের জন্য বক্তব্য জানিয়েও দিতে পারে, ইত্যাদি। প্রথমে এক্সিকিউটিভ সদস্যদের জন্য 'ডাম্ব' পোর্টেবল টার্মিনাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রত্যেক শাখাকে টার্মিনাল সরবরাহ করে ঐ সংগঠন। সমিতির সমস্ত কর্মী ও সংগঠকদের দলগতভাবে ভাগ করে এসব বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি কার্যকরী থাকে। তারপর সমগ্র সংগঠনকে অর্থাৎ কেন্দ্র, শাখা, সদস্যদের ব্যাপক অংশকে ইন্টার-নেটে যুক্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বি.সি.টি.এফ., বিশ্বে সর্বপ্রথম, এইভাবে লেবার-নেট গড়ে তুলেছিল।

জাতীয় স্তরে 'লেবার-নেট' গঠনের সংক্ষিপ্ত তথ্য, ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ছিল এই রকম।

১৯৮৯-৯০ সালে সংগৃহীত একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে সারা বিশ্বে প্রায় ১৮০টি ট্রেড ইউনিয়ন 'অন-লাইনে' ছিল। 'অন-লাইনে'র অর্থ হলো কোন প্রচলিত বা ব্যবসায়ভিত্তিক বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়া। ১৯৯০ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে বিশ্বের ৭০টি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন কোন না কোন ধরনের 'ই.-মেইল' ব্যবহার করে। 'ই.-মেইল' এর অর্থ ইলেকট্রনিক মেইল। ই.-মেইল ব্যবস্থা বলতে বোঝায় কম্পিউটার ও 'মোডেম' ব্যবহার করে এক ঠিকানা থেকে অন্য ঠিকানায় বিষয়বস্তু ও তথ্য পাঠানো। 'মোডেম' হলো তেমন পদ্ধতি যা কম্পিউটারের কাছ থেকে "শ্রবণ" করে, তারপর কম্পিউটার-কথোপকথনকে টেলিফোন কথোপকথনে পরিণত করে এমনভাবে যাতে কম্পিউটার যা বলছে তা প্রচলিত টেলিফোন লাইনের দ্বারা সংবাহিত হতে পারে। 'ইন্টারনাল মোডেম' হলো কার্ডসমূহ, যা কম্পিউটারের ভেতরে লাগানো থাকে, 'এক্সটারনাল মোডেম' 'কেবল'-এর সাহায্যে যুক্ত থাকে একটি মেটাল বক্সের ভেতরে এবং কম্পিউটারের সাথে। পূর্ব-ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে পরিণত হয় ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস (আই.সি.এফ.টি.ইউ.)। সমসাময়িক সময়ে এই সংগঠন ঘোষণা করে, "ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের যথার্থতা এখন নির্ধারকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" ১৯৯৪ সালে ইংলণ্ডের লেবার টেলিমেটিকস সেন্টারের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ১০ বছর বা তার কিছু বেশি সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন নতুন (টেলিমেটিকস) প্রযুক্তি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করে সাংগঠনিক নানাবিধ কাজকর্মে প্রভূত উন্নতি ঘটাতে পেরেছে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের লেবার-নেট

প্রথমে প্রধান প্রধান যেসব শ্রমসংগঠন 'লেবার-নেট' গঠন বা তাতে যুক্ত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলির নাম উল্লেখ করা যাক। আই.এল.ও, আই.সি.এফ.টি.ইউ, আই.সি.এফ.টি.ইউ.—এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল অরগানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব কমার্শিয়াল, ক্লারিক্যাল, প্রফেশনাল অ্যাণ্ড টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ (এফ.আই.ই.টি.), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন (আই.এফ.ডব্লু.ই.এ.), ইউরো—ডব্লু.ই.এ: ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আই.টি.এফ.), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব কেমিক্যাল, এনার্জি, মাইন অ্যাণ্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পাবলিক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল (পি.এস.আই.) প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক এই সংগঠনগুলি ছাড়াও দেশভিত্তিক জাতীয় স্তরের সংগঠনগুলি ছিল ঃ অস্ট্রেলিয়াতে অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর লেবার স্টাডিজ, অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়ন (এ.সি.টি.ইউ.), অস্ট্রেলিয়ান লেবার অ্যাণ্ড ট্রেড ইউনিয়ন পেজ, অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (ও.ই.জি.বি), কানাডাতে কানাডিয়ান ফার্ম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, সেন্টার ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস—ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টো, পাবলিক সার্ভিস অ্যালায়েন্স (পি.এস.এ.), ইউনিয়ন নেট (সোলি নেট/ ওয়েব), জার্মানিতে ফ্রিডরিশ ইবার্ট চিফটুং (এফ.ই.এস), আই.জি.মেটাল, আয়ারল্যাণ্ডে আই.এম.পি.এ.সি.টি বা ইমপ্যাক্ট, ইসরায়েলে ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং রিসার্চ কমিটি অন লেবার মুভমেন্ট, দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়ান কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস, হল্যাণ্ডে নেদারল্যাণ্ডস ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (এফ.এন.ভি), নিউজিল্যাণ্ডে কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়ন (সি.টি.ইউ), সিঙ্গাপুরে ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (এন.টি.ইউ.সি), দক্ষিণ আফ্রিকার কংগ্রেস অব সাউথ আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নস (কোসাটু) ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মাইন ওয়ার্কার্স (এন.ইউ.এম) এবং সাঙগোনেট, ইউনাইটেড কিংডমে কমিউনিকেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, জেনারেল ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস (জি.এফ.টি.ইউ), লেবার-নেট (গ্রীন-নেট), লেবার টেলিমেটিকস সেন্টার (এল.টি.সি), মিডিয়া ইউনিয়নস ওয়েব সাইট, এম.এস.এফ ইনফরমেশনাল টেকনোলজি প্রফেশনালস অ্যাসোসিয়েশন (আই.টি.পি.এ), ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্কুল মাস্টারস ইউনিয়ন অব উইমেন টিচারস, পপটেল, পাবলিক সার্ভিসেস, ট্যাক্স অ্যাণ্ড কমার্স ইউনিয়ন, ব্রিটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন

কংগ্রেস (বি.টি.ইউ.সি), ইউনিসন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার—কংগ্রেস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অরগানাইজেশন (এ.এফ.এল—সি.আই.ও), আমেরিকান ফেডারেশন অব স্টেট, কান্ট্রি অ্যাণ্ড মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ, ইকনমিক ডেমোক্র্যাসি ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (ই.ডি.আই.এন), ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব টীমস্টারস, লেবার-নেট আই.জি.সি, অফিস অ্যাণ্ড প্রফেশনাল এমপ্লয়িজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন, সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন, সীট মেটাল ওয়ার্কার্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন, টীমস্টারস ফর ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন, ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স, ইউনাইটেড মাইন ওয়ার্কার্স, ইউনাইটেড স্টীল ওয়ার্কার্স অব আমেরিকা, লেবার এডুকেটরস নিউজ লেটার, মেক্সিকোতে ইউনাইটেড ইলেকট্রিক্যাল ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি সাইট, রাশিয়াতে অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোগ্রেসিভ কমিউনিকেশন - গ্লাসনেট, কাসকর এবং জেনারেল কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস, মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব দা টিচিং প্রফেশন,লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জন্য স্পেনীয় ভাষায় পেরু'র প্রোগামা লাবোরাল ডি ডেসারোলো (প্লাডিস)প্রভৃতি। তাছাড়া, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের কোন কোন ট্রেড ইউনিয়নেও লেবার-নেট ব্যবস্থার পত্তন ঘটেছে। আমেরিকার র‍্যাডিক্যাল চার্চের সাথে সমন্বয় করে হংকং-এ এশিয়া মনিটর রিসার্চ (এ.এম.আর.সি.) এশিয়াতে বহুজাতিক সংস্থাগুলির তৎপরতার তথ্য ট্রেড ইউনিয়নকে সরবরাহের জন্য 'এশিয়া লেবার মনিটর' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছিল। ক্রমে সংস্থাটি জিওনেট ও ব্রিটেনের এ.পি.সি নেটওয়ার্ক তথা পপ্‌টেলের সাথে লেবার-নেট গড়ে তোলে। ডেনমার্কের শ্রমিক আন্দোলনে ১৯৮৮ সালে কম্পিউটার কমিউনিকেশনের সংযোগ শুরু হয়—প্রথম প্রকল্পটিকে বলা হত 'ফোক্‌স' (এফ.ও.এল.কে.এস)। ক্রমে ফরকান্ট (এফ.ও.আর.কে.এ.এন.টি) এবং পরিশেষে 'টুডিক' (টি.ইউ.ডি.আই.সি) লেবার-নেট গড়ে তুলেছে।

এখানে মূল কতকগুলি আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্বাধীন লেবার-নেটের নাম উল্লেখ করা হলো। এর বাইরে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে তো বটেই, উন্নত দুনিয়া ও তার বাইরে তৃতীয় দুনিয়ার কিছু কিছু দেশে লেবার-নেট গঠন বা গঠনের চেষ্টা শুরু হয়েছিল। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মে এর বহু আগে ই-মেইল ও কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। লেবার-নেটের পাশাপাশি বা এরই এক ধারা হিসাবে অন-লাইন স্টাইক নিউজ পেপার বা লেবার নিউজ পেপার প্রকাশ শুরু হয়। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলির নাম হলো 'দা বয়কটার', 'ইভিনিং স্টার', 'টরেন্টো স্টার', 'সিটিজেনস ভয়েজ', 'দা অরগানাজাইজার', 'উইনিপেগ সিটিজেন', 'সানফ্রানসিস্কো ফ্রী প্রেস', 'ডেট্রয়েট জার্নাল' প্রভৃতি। এছাড়া লেবার-নেটের সাহায্যে দেশে দেশে ও আন্তর্জাতিক 'ডিস্‌কাশান গ্রুপ'ও গড়ে উঠেছে। সেগুলির মধ্যে 'লিস্ট সার্ভ মেইলিং লিস্টস' সংগঠনটি কম্পিউটারে প্রোগ্রামকৃত বিষয়বস্তু, যাঁরা ব্যবহার করতে চান, তাঁদের জন্য সরবরাহ করে। এগুলি করা হয় লেবার-এল (বিশ্বের অর্থনীতিতে শ্রম প্রসঙ্গ), এইচ-লেবার (শ্রম বিষয়ক ইতিহাস), ইউনিয়ন-ডি (ইউরোপীয় শ্রম প্রসঙ্গ), লাবনিউজ (শ্রম বিষয়ক সংবাদ), মুন্ডো সিন্ডিক্যাল (পেরুতে অবস্থিত স্পেনীয় ভাষায় ট্রেড ইউনিয়নের তালিকা) প্রভৃতি শাখাতে। 'ইউজ নেট নিউজ গ্রুপ' ব্যবস্থা 'লিস্ট সার্ভ'-এর মতো প্রত্যেকের কাছে সুযোগ দেয় না; লেবার-নেট ব্যবস্থাকারী সংস্থাই কেবল এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া রয়েছে 'কনফারেন্স অন প্রইভেট নেট ওয়ার্কার্স', 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব-বেসড' 'ডিস্‌কাশান গ্রুপ' প্রভৃতি। এই ধরনের ব্যবস্থাগুলির বাইরে লেবার-নেটের মাধ্যমে 'অন-লাইন চ্যাট' (কথোপকথন), অন-লাইন পাবলিশিং (লেবার-নেটের মাধ্যমে লেবার থিসিসের প্রকাশনা) ইত্যাদি ব্যবস্থাও গৃহীত হচ্ছে।

লেবার-নেট গঠনকালের অভিজ্ঞতা

লেবারনেট বিষয়ে তত্ত্ব বা এটির প্রায়োগিক কলাকৌশল যতোখানি গুরুত্বপূর্ণ, এবিষয়ে কাজ করতে গিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের শুরুর অভিজ্ঞতা তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা প্রচলিত ও পরম্পরাগত অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নতুন, স্বভাবতই অপরিচিত, এমন পথে যাত্রা শুরুর মুহূর্ত ছিল এটি। তাছাড়া কোন একটি অন্তর্বর্তী স্তর সবসময়েই বিভ্রান্তিকর এবং ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে অনেকের

মধ্যেই দারুণ পিছুটান ঘটায়। তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল এক্ষেত্রেও। তাই সেই অভিজ্ঞতার সামান্য কিছু উল্লেখ করা দরকার।

ফ্রান্স, স্পেন ও স্প্যানিশ ভাষী লাতিন আমেরিকার কোন কোন দেশ বহু আগে কম্পিউটার ব্যবস্থা ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মে যুক্ত করলেও ইন্টার-নেট তথা লেবার-নেট ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এটা করেনি সচেতনভাবেই। এইসব দেশের জনগণের বিপুল অংশের মনোভাবের মতো ট্রেড ইউনিয়নও মনে করেছিল যে লেবার-নেটে যুক্ত হলে ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ তাদের মধ্যে ঘটবে। তাই, ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশ দেরীতেই এরা লেবার-নেট শুরু করে।

সর্বাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে পৃথিবীর বহু ট্রেড ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতৃত্বের মধ্যে প্রথমাবধি অনীহা থাকার কারণগুলি সম্পর্কে লেবার-নেট তাত্ত্বিকরা নিম্নোক্ত কারণগুলি উল্লেখ করেছেন ঃ

(ক) নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে নেতৃত্বের মধ্যে অজ্ঞতা বা পরম্পরাগত ধারণা থেকে তীব্র বিরোধিতার মনোভাব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে মালিকশ্রেণীর দ্বারা উৎপাদনকে উন্নত ও ব্যাপক করা এবং শ্রমিক শোষণের জন্য ব্যবহার এবং অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিরোধের ধারা, নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে এক ধরনের আধুনিক প্রযুক্তির বিরোধিতার মনোভাব গড়ে রেখেছে। আধুনিক প্রযুক্তি আসলে মালিকদের বিষয়, শ্রমিকদের নয়, এমন ধারণা পরম্পরাগত নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায়, প্রবলভাবে বিদ্যমান।

(খ) সাংগঠনিক গোঁড়ামি। ট্রেড ইউনিয়নেব কাজকর্মে দীর্ঘকাল ধরে গৃহীত ও ব্যবহৃত প্যাটার্নকে চিরন্তন বলে মনে করা হয় কোন কোন সংগঠনে। আচার, আচরণ ও বক্তব্যে এই গোঁড়ামিকে এক প্রতিরোধের প্রাচীরের মতো গড়ে রাখা হয়েছে, যা ভেদ করে আধুনিকতার আলো প্রবেশ করাই কঠিন এইসব ট্রেড ইউনিয়নে।

(গ) প্রযুক্তির কর্তৃত্বকারীদের দ্বারা অর্থাৎ মালিকশ্রেণীর দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নকে তথ্য-প্রযুক্তির সুযোগ পাওয়াব ক্ষেত্রে দীর্ঘ বঞ্চনায় ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে মালিকশ্রেণীর বিরোধিতার মতো প্রযুক্তির বিরুদ্ধেও সচেতন বা অবচেতনভাবে বিরোধিতার মনোভাব তৈরি হয়ে রয়েছে বহু দেশের ট্রেড ইউনিয়নে।

(ঘ) পৃথিবীর বহু দেশের চিরাচরিত নেতৃত্বের এক বৃহৎ অংশেরই নিজেদের বুনিয়াদি বিজ্ঞান শিক্ষায় অসম্পূর্ণতা বা অভাব ও তার ফলে অনেকটা অচল দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, নতুন প্রযুক্তিময় উৎপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত শ্রমজীবীদের ট্রেড ইউনিয়ন-নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে কার্যত এঁরা অনেকেই অক্ষম হয়ে পড়েছেন। ব্যক্তি, পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে, অন্য সবার মতো, এঁরা অভ্যস্ত হলেও সেগুলির কারিগরী দিকসমূহ ও নতুন প্রযুক্তির বহুবিধ ভূমিকা এবং তাৎপর্য অনুধাবন এবং সৃজনশীলভাবে সংগঠন আন্দোলনে আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করাব মতো মানসিক উদ্যোগ এঁদের অনেকের মধ্যেই গড়ে ওঠেনি। ববং ট্রেড ইউনিয়নে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসঙ্গ উঠলেই দেখা গেছে যে নানা যুক্তি-তর্কে এগুলিকে সরাসরি নস্যাৎ করেন এঁদের কেউ কেউ। লেবার-নেট তাত্ত্বিকরা আরও উল্লেখ করেছেন যে এই ধরনের মনোভাব গঠনের পেছনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাব যতোখানি কারণ, তার চেয়ে অনেক বেশি কারণ হলো আধুনিকতার গতির সাথে নিজেদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং নিজেদের অবস্থান খাটো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

দক্ষিণ আফ্রিকাব ট্রেড ইউনিয়ন 'কোসাটু'র ক্ষেত্রে এবিষয়ে অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ ঃ

(ক) উচ্চ শিক্ষিত বা কম শিক্ষিত নির্বিশেষে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কম্পিউটার প্রযুক্তি সম্পর্কে একধরনের ভীতি, (খ) হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার— উভয়ই ব্যবহার করা কঠিন বলে মনোভাব পোষণ করা, (গ) তথ্য-প্রযুক্তির ফলিত দিক ব্যবহারে নেতৃত্বের যোগ্যতার অভাব, (ঘ) কম্পিউটার থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সংবাদ, প্রভৃতি কার্যকরীভাবে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা এবং

(ঙ) উচ্চ প্রযুক্তিগত যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তাকে ট্রেড ইউনিয়নের সমস্ত কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ব্যর্থতা।

দক্ষিণ আফ্রিকার উদাহরণ বহু দেশের ক্ষেত্রেই সত্য। বহুদেশের ট্রেড ইউনিয়নে লেবার-নেট ব্যবস্থা পত্তনে আর্থিক সমস্যা অন্যতম প্রধান বাধা হলেও একমাত্র বাধা নয়। উন্নত বহুদেশে এখনও লেবার-নেট গড়ে না ওঠার ঘটনা থেকে এটা প্রমাণিত। গবেষকরা এক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য অংশের হীনম্মন্যতার একদিক। কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হলে তার মাধ্যমে প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমস্ত ধরনের তথ্য, অভিজ্ঞতা, ব্যাখ্যা এবং নির্দেশ পাওয়া বা পাঠানোর ব্যবস্থা গঠিত হলে নেতৃত্বের সর্বময় কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকৃত হয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কা থেকেও সংগঠনে এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার সম্ভাবনা রোধ বা বিলম্বিত হয়ে থাকে। তাছাড়া নেতৃত্ব এই নতুন ব্যবস্থা আয়ত্ত করতে পারবেন না বা নিজেরা এই ব্যবস্থায় ততোটা দক্ষ হয়ে উঠতে পারবেন না কিংবা অধঃস্তন নেতা, কর্মী বা সংগঠকের তুলনায় কম দক্ষ হবেন, এই আশঙ্কা থেকেও কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা করা হয়েছে। আর একটি দিকের উল্লেখ করেছেন গবেষকরা। বাম, মধ্য বা দক্ষিণ—যে মতাদর্শেরই সংগঠন হোক না কেন, কোন কোন ক্ষেত্রে মতাদর্শের শক্তি বনাম তথ্য-প্রযুক্তির শক্তির মধ্যে অকারণ তুল্যমূল্য বিচারের একধরনের প্রবণতা এবং প্রযুক্তিকে মতাদর্শের বিপরীত হিসাবে কল্পিতভাবে প্রস্তাবনাও ট্রেড ইউনিয়ন-কাঠামোর আধুনিকীকরণের সামনে বড় বাধা হয়েছে। অর্থাৎ 'আইডিওলজি ইন কম্যাণ্ড'-এর ব্যবস্থা 'টেকনোলজি কম্যাণ্ড'-এ পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেও অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছে কোথাও কোথাও। আসলে মতাদর্শের সাথে লেবার-নেট-এর কোন সংঘাত নেই। মতাদর্শ প্রয়োগের অন্যতম হাতিয়ার লেবার-নেট।

ট্রেড ইউনিয়নে লেবার-নেট যে ভূমিকা পালন করছে

দেশে দেশে পূর্বোক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি লেবার-নেটের মাধ্যমে ব্যাপক ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন লেবার-নেটগুলির ভূমিকা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার পরিবর্তে, মোটামুটি সর্বজনীন ও বিশিষ্ট কিছু দিক উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) ইউনিয়নভুক্ত ও ইউনিয়নভুক্ত নয়—এমন যেকোন ব্যক্তি-অংশগ্রহণকারীকে শ্রমজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে সমস্ত তথ্য ওপেন চ্যানেল অব কমিউনিকেশনে দেওয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নগোষ্ঠীর অভ্যন্তরের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দেওয়া হয় তথ্যের 'ওপেন-চ্যানেল'; এই সুযোগ দেওয়া হয় শ্রমিক নেতৃত্ব এবং ইউনিয়নের সদস্যদের; তাছাড়া সুযোগ দেওয়া হয় গবেষক, শিক্ষক, মধ্যস্থতাকারী (আরবিট্রেটর), আইনজ্ঞ, এবং শ্রম ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের। এভিন্ন কমিউনিকেশনের ওপেন চ্যানেল রয়েছে এক সদস্যের দ্বারা অন্য সদস্যের সাথে যোগাযোগ করার।

(২) সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যকে আরও বিকশিত করার জন্য লেবার-নেটকে এক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(৩) কোন একটি সংগঠনের বুলেটিন বোর্ড সিস্টেমের (বি.বি.এস) কম্পিউটার ও কম্পিউটার কমিউনিকেশনের প্রযুক্তিগত দিকগুলি সম্পর্কে অন্য সংগঠনের ভোক্তার কতোটা জ্ঞান আছে, তা বিবেচনা নিরপেক্ষভাবে, ভোক্তা ধারণাকে কম্পিউটার-কমিউনিকেশনের মাধ্যমে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এই ধরনের ইনফরমেশন-মাধ্যম-এর সাহায্যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করতে আকর্ষণীয়, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং উপভোগ্য পরিবেশ তৈরি করা হয়।

(৪) 'অন-লাইন স্ট্রাইক' সংবাদপত্র, বিভিন্ন দেশ, প্রতিষ্ঠান বা বৃত্তির আন্দোলন ও দাবী-দাওয়ার তথ্য, বিভিন্ন দেশ, প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তির দাবী-দাওয়া ও আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ঘটনাবলী, চুক্তিসমূহ, বিভিন্ন শ্রম-বিষয়ক রিপোর্ট, শ্রম-আইন, আইনের সংশোধন, আদালতের রায়, শ্রম বিষয়ক পুস্তক, পুস্তকের লেখক, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু বা পুস্তকের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য, বিভিন্ন ইউনিয়নের ঠিকানা, পদাধিকারীদের তালিকা, সম্মেলন বা সভার রিপোর্ট, বিভিন্ন দেশে ও

বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রম-বিষয়ক গবেষণাসমূহের অপ্রকাশিত থিসিস, গবেষণ চলছে এমন বিষয়সমূহ, শ্রম-শক্তিতে বিভিন্ন বর্গের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে পরিসংখ্যান ও তথ্যসমূহ, মহিলা ও সংখ্যালঘু অংশ, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচী—প্রকৃত ও প্রস্তাবিত, শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগসমূহ, বিভিন্ন দেশের বাজেটে শ্রম-বিষয়ক প্রস্তাব ও ব্যবস্থা এবং ব্যয়, আই. এল. ও'র লেবার স্ট্যাণ্ডার্ড, কনভেনশন, কনফারেন্সগুলির তথ্য ও বিবরণী প্রভৃতির সর্বাধুনিক তথ্য লেবার-নেটে পাওয়া যায়।

(৫) লেবার-নেটের মাধ্যমে শিল্প বা পরিষেবার শ্রমজীবীদের একদিকে যেমন শিল্পক্ষেত্রে বৃত্তি ও ব্যবস্থাপনার শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, অন্যদিকে কম্পিউটারসহ কম্পিউটার কমিউনিকেশন ব্যবস্থা সম্পর্কেও সুশিক্ষিত করা হয় তাদের।

(৬) বিভিন্ন ধরনের শিল্প বা পরিষেবা উৎপাদনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের (এম. এন. সি) যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত দেশের ট্রেড ইউনিয়ন লেবার-নেটের মাধ্যমে পেতে পারে।

(৭) ট্রেড ও ইণ্ডাস্ট্রি ঃ অটো ওয়াকার্স, টীমস্টারস, নার্সেস, হসপিটালিটি ওয়ার্কার্স, হসপিটাল ও হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স, মেরিটাইম ওয়ার্কার্স, পোস্টাল ওয়ার্কার্স, ট্রানজিট ওয়ার্কার্স, হোটেল এমপ্লয়িজ, পেট্রোকেমিক্যাল ওয়ার্কার্স, ওয়ার্কার্স ইন পাবলিশিং অ্যাণ্ড প্রিণ্টিং, কনষ্ট্রাকশন ট্রেড, গারমেন্ট অ্যাণ্ড টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স, এয়ারলাইন ইণ্ডাস্ট্রি, পেট্রোকেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রি, অয়েল ইণ্ডাস্ট্রি, ইঞ্জিনীয়ারিং ইণ্ডাস্ট্রি, স্টীল প্ল্যান্ট, টিচার্স, পাবলিক সার্ভিসেস প্রভৃতি অংশের সমস্ত ধরনের তথ্য লেবার-নেটের মাধ্যমে সরবরাহ হয়।

(৮) প্রত্যেকটি উন্নত দেশ ছাড়াও যেসব দেশের শ্রম-বিষয়ক তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে মেক্সিকো, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ব্রাজিল ও রাশিয়ার তথ্য রয়েছে লেবার-নেটে।

(৯) ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা পত্তন করতে ইচ্ছুক ট্রেড ইউনিয়নগুলির জন্য পরিকল্পনা, কর্মসূচী, ব্যয়, সম্ভাব্যতা, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি লেবার-নেট সরবরাহ করে। কর্মে নিয়োগ ও ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠন এবং তৎপরতার উপর টেলিমেটিকস-এর প্রভাব নিয়ে নীতি স্থির করা ও গবেষণা, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স স্থির করে দেওয়া, টেকনিক্যাল কনসালটেন্সি, সেমিনার ও কনফারেন্স করার যথোপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং সেকারণে থিসিস বা যুক্তিরূপে উপস্থাপিত বিষয় প্রভৃতি সরবরাহ করে লেবার-নেট।

দ্য নিউ ইন্টারন্যাশনালিজম

অবশ্য এই সমস্ত তালিকা অসম্পূর্ণ। কেননা প্রতিদিন লেবার-নেটে নতুন নতুন বিষয় ও সেগুলির অভ্যন্তরীণ দিকগুলি ক্রমাগত যুক্ত হয়ে চলেছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে ট্রেড ইউনিয়নের সর্বকালের ইতিহাসে লেবার-নেট ব্যবস্থা পরিণত হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের সরবরাহকারী ব্যবস্থায়। অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নের তথ্য, জ্ঞান ও কার্যাবলীতে যে কোন বাস্তব অসুবিধা কাটাতে সর্বাপেক্ষা দ্রুততম নিপুণ ও কার্যকরী সহায়ক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে লেবার-নেট। শ্রমের বিশ্বায়নে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে টেলিমেটিকস। একেই বুর্জোয়া লিবারাল শ্রম-বিশেষজ্ঞরা বলেছেন 'দ্য নিউ ইন্টারন্যাশনালিজম'।

লেবার-নেট তাত্ত্বিকরা দৃশ্যমান এই বিপুল বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে চান অতীতের ইন্টারন্যাশনালগুলির পরিবর্তে নতুন 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর উদ্ভব হিসাবে। প্রস্তাবিত তথাকথিত এই নতুন ইন্টারন্যাশনাল, অন-লাইন ইন্টারন্যাশনাল লেবার প্রেস বা ছাপাখানা ও যোগাযোগের জন্ম দিচ্ছে। এর দ্বারা গড়ে উঠছে শ্রমবিষয়ক অন-লাইন আর্কাইভস, ডিসকাশন গ্রুপস্ ও জার্নাল। কোন দেশ বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অধিকারের উপর আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হলে, এই ব্যবস্থার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'আর্লি ওয়ার্নিং' জানতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট দেশ বা প্রতিষ্ঠান এবং অন্য দেশ বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাবে আক্রমণের সম্মুখীন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন। সামগ্রিকভাবে এই ব্যাপক ও নিপুণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এক আন্তর্জাতিক শ্রম-বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পূর্বাবস্থাও সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমন বিপুল ও বিস্তৃত

জ্ঞান, ট্রেনিং ও শিক্ষা এবং বিশেষজ্ঞমূলক কার্যের নির্দেশিকা পাওয়া যাবে যা অতীতে ট্রেড ইউনিয়নের আয়ত্তে কখনো ছিলনা; বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শ্রম-বিষয়ক শাখাব কারিকুলাম তথা পাঠ্যসূচীগুলি এটির প্রান্তটুকু পর্যন্ত স্পর্শ করতে অক্ষম হবে।

ধনতান্ত্রিক 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা স্বয়ং এই 'নিউ ইন্টারন্যাশনালিজম'-এর জন্ম দিয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে। ফলে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা এখন তাদের স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় গন্ডিবদ্ধ ধারণাকে ত্যাগ এবং নিজেদের বিশ্বজনীন শ্রমসমাজের অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করবে। এই বিশ্বজনীন সমাজ কোন ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি ভিত্তিক গঠিত নয়, বরং গঠিত হচ্ছে সামাজিক শ্রেণী ভিত্তিক; সর্বোপরি এর দ্বারা গড়ে উঠছে এক 'গ্লোবাল ভিশন' বা বিশ্ব-বীক্ষা। দুনিয়ার অজস্র ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শক্তিশালী আন্তর্জাতিকের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তা বাস্তবায়িত হয়ে উঠছে নতুন শ্রম-বিষয়ক যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে। এই রকম বড়ো মাপের চিন্তনের কথা বড়ো আকারে বলেছেন লেবার-নেট তাত্ত্বিকরা।

শ্রেণী, শ্রেণী-সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়ন

একটি শতাব্দী ও একটি সহস্রাব্দের শেষ-মুহূর্ত মানব-সমাজের সামনে যে সব প্রশ্নাবলী রেখে যাচ্ছে, পরবর্তী প্রজন্মকে সেগুলির সমাধান করতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইতোমধ্যেই সমাধানের পথের কোন দিশা বা তার চিহ্ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অবশ্য এ কথা সত্য যে সেইসব চিহ্নগুলিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা, ক্রমান্বয়ে সেগুলি ব্যাপক মানুষেব দৃষ্টিতে আনা ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে তাদের ধারণাতে স্পষ্ট করা, সর্বোপরি ইতিবাচক উপাদানগুলিকে যৌথভাবে ব্যবহার করার পন্থা উদ্ভাবনের শুরুর কাজটি বর্তমানে যথেষ্ট সমস্যা-সংকুল অবস্থায় রয়েছে। এই মন্তব্যের কয়েকটি দিক রয়েছে। কেননা বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে একদল রয়েছেন যাঁরা শ্রেণী-অস্তিত্বের অনিবার্যতা ও সামাজিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে শ্রমজীবীদের নতুন উত্থানের সম্ভাবনাকে লক্ষ্য করছেন। অপর আর অংশের অভ্যুদয় ঘটেছে, যাঁরা নিজেদের দাবী করেন 'মার্কসিজম' বা 'রিভিনিজিম'-এর বাইরে পোষ্ট-মডার্ননিস্ট বলে, তাঁরা লক্ষ্য করছেন আর এক ধরনের পুনর্জাগরণ। তাছাড়া পুঁজিবাদ তাদের 'লিবারালিজম' ও 'লিবারালাইজেশনে'র অভ্যন্তরে খুঁজে পেয়েছে বিশ্ব-সমাজের সমস্যা ও সংকটের চিরস্থায়ী সমাধানসূত্র। বর্তমান সময়ে, এই সমস্ত ধারার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত যেমন এক তাৎপর্যপূর্ণ দিক, অন্যদিকে এর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে সমগ্র যুগ-সংকটের তাৎপর্যপূর্ণ চিহ্ন।

বর্তমানের মূল প্রশ্নগুলি প্রধানত উত্থিত হচ্ছে 'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়নের বিষয়টি থেকে। মানব-জাতির ইতিহাসে মানুষের দেশ থেকে দেশান্তরে গমন ও বসতি স্থাপন, ধর্ম ও জ্ঞানের দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিস্তারের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে এক ধরনের বিশ্বায়ন সব সময় চলেছে। সভ্যতার বয়স গণনার দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয় অর্ধেক জুড়ে পুঁজিবাদের উত্থান ও অস্তিত্ব কালে, সবসময়েই তৎপরতা চলেছে পুঁজির বিশ্বায়নের জন্য। বলা যায় এও হলো পুঁজির স্বাভাবিক প্রবণতা কিন্তু সেই তৎপরতার অগ্রগতি নির্ভর করেছে পুঁজিবাদের বিশ্ব-ব্যাপী অগ্রগতির স্তরের উপর। পুঁজির বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে দেশসমূহের পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার উপাদানটিও একইভাবে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন কি গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের নেতৃত্বে এক প্রস্থ বিশ্বায়ন ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। 'লেজে ফেয়ার' অর্থনীতির বলে দেশসমূহের মধ্যে আর্থিক বিনিময়ের বাধা অনেকটাই অর্ন্তহৃত হয়েছিল এবং তার ফলে পণ্য, পুঁজি ও মানুষের তথা শ্রমের দেশান্তর ব্যাপক রূপ পেয়েছিল। চরিত্রের দিক থেকে প্রায় এক হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বর্তমানের বিশ্বায়নে কয়েকটি দিক সুস্পষ্ট। যেমন, আন্তর্জাতিক আর্থিক আদান-প্রদানের দ্রুত বৃদ্ধি; বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ—বিশেষত 'গ্লোবাল কর্পোরেশনগুলি'র অভ্যন্তরে; প্রধানত 'বর্ডারলেস

কর্পোরেশন'গুলির দ্বারা বিদেশে মূলধনের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে বিপুল গতি সৃষ্টি; বিশ্ব-বাজারের অভ্যুদয় বিশ্বায়িত যোগাযোগ ও প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে একদিকে প্রযুক্তিগত ও অন্যদিকে জনগণের মধ্যে বুর্জোয়া বস্তুগত ও ভাবগত রুচি, চাহিদা ও ভোগের বিশ্বায়ন প্রভৃতি। সর্বোপরি সর্বাধুনিক বিশ্বায়নের দুটি সুনির্দিষ্ট দৃশ্যমান দিকও রয়েছে—উৎপাদনের বিশ্বায়ন ও পুঁজির বিশ্বায়ন। উৎপাদনের মৌলিক উপাদানের শর্তের মধ্যে ভূমি (প্রাকৃতিক সম্পদ), পুঁজি ও শ্রমের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তি ও তথ্য। প্রযুক্তিকে উন্নীত করা হয়েছে মতবাদে। এগুলির সমন্বয়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ার বিশ্বায়ন শুরু হয়েছে অবিরত।

ধনতন্ত্রের এই ধরনের অভিনব গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ঘূর্ণাবর্তকে কেন্দ্র করে বর্তমান যুগে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলনের সামনে যে ব্যাপক পটভূমিকা এবং তার সাথে সমন্বিতভাবে জটিলতা গড়ে উঠছে, তার কিছু কিছু দিক পূর্ববর্তী সমগ্র আলোচনাতে উত্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে ট্রেড ইউনিয়ন এক নির্দিষ্ট শ্রেণীর, শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির একান্ত সংগঠন ছাড়াও এক শক্তিশালী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সামাজিক সংগঠন। কেননা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্ব করে পুঁজিবাদী সমাজের বৃহত্তম ও শক্তিশালী সামাজিক-আর্থনীতিক শ্রেণীকে। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়নের সামনে গড়ে ওঠা পরিস্থিতি কার্যকালে সমগ্র সমাজের সামনে উদ্ভূত পরিস্থিতিরই আলেখ্য মাত্র। সেকারণে, দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে কোন অংশের সমাজতাত্ত্বিকই ট্রেড ইউনিয়নের সামনে সৃষ্ট সমস্যাবলীকে উপেক্ষা করতে পারেননা। সমাজের গুণগত, ইতিবাচক এবং ব্যাপকতম জনগণের হিতকারী আমূল পরিবর্তনে যাঁরা বিশেষত আকাঙ্ক্ষী ও আগ্রহী, তাঁদের কাছে তো বর্তমান পরিস্থিতির তাৎপর্য অনুধাবন এবং সেক্ষেত্রে করণীয় স্থির করা অনতিক্রম্য।

পঞ্চাশের দশক থেকে শ্রেণী, শ্রেণী-সংগ্রাম, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে উত্থিত বিতর্ক ক্রমশ প্রশস্ত ও তীব্রতর হয়ে, আশির দশকের শেষার্ধে, পাশ্চাত্যের সমাজতান্ত্রিক মডেলটির বিপর্যয়ের পর, যে বিভ্রান্তিকে কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গে পরিণত করেছে এখন, তা'হলো পূর্বে অবস্থিত সামাজিক শ্রেণীগুলি, বিশেষত সর্বহারা শ্রেণীর, এখন আর অস্তিত্ব নেই; মার্কসের মৃত্যুর পরবর্তী শতাব্দীটিতে মূলধন ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে বহাল থাকা শত্রুতা, আধুনিক বিশ্বের সামাজিক কাঠামোতে, ক্রমাগত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে, শ্রেণী-অস্তিত্ব লোপের প্রসঙ্গে, সর্বাগ্রে যে মন্তব্য করা হচ্ছে তা হলো কৃষক সমাজের অবলুপ্তি (হবসবম প্রমুখ)। লোপমূলক প্রতিপাদ্য থেকে একথাও বলা শুরু হয়েছে যে আধুনিক ধনতন্ত্রের সাথে পূর্বতন পরিস্থিতির কোন ধরনের মিল নেই; বর্তমান সামাজিক কাঠামো দেখিয়ে দিচ্ছে যে পুঁজিবাদের চরিত্র এখন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তাই পুঁজিবাদকে নিষ্করুণ হিসাবে চিহ্নিত করার ধারণা ও মানব-সমাজকে শোষণহীন সমাজে রূপান্তরিত করতে শ্রেণী-সংগ্রামকে আবশ্যিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার লক্ষ্য ও উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা এখন ভিত্তিহীন হয়ে পড়েছে। গত শতাব্দীর শেষ দশকটির শেষার্ধে উত্থাপিত 'ক্রাইসিস অব মার্কসিজম' এর তত্ত্ব উত্থাপনের ঠিক শতবর্ষ পরে, কিছুটা ভিন্ন মোড়কে, নতুন করে প্রায় একই বক্তব্য এইভাবে উত্থাপন করা শুরু হয়েছে।

বুর্জোয়া, উদারনীতিক অথবা নানা উত্তরবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক সমাজতাত্ত্বিকদের এক অংশ সব সময়েই শ্রমিকশ্রেণী বলতে শিল্প-উৎপাদনে যুক্ত কারখানার কেবলমাত্র কায়িক শ্রমদায়ী অংশকেই সামনে রেখে বিচার ও মন্তব্য করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, এক দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা হিসাবে, হোয়াইট-কলার এমপ্লয়িদের তথা দপ্তরের অভ্যন্তরে কর্মরত মস্তিষ্কজাত শ্রমদায়ীদের সংখ্যা দারুণ দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সত্তরের দশক থেকে কারখানাসহ অন্যান্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমদায়ীদের ক্রমবর্ধমানভাবে অপসারণ শুরু হয় শেষোক্ত অংশের শ্রমজীবীদের দ্বারা। নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে ব্যবহার করে উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়াতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের ফলে শেষোক্ত প্রক্রিয়ার তীব্রতর সূত্রপাত ঘটে। তার ফলে মস্তিষ্কজাত কর্মজীবীরা শ্রমের বাজার ও উৎপাদনের এখন দ্রুত নির্ধারক অবস্থান গ্রহণ করছে। এই নতুন পরিস্থিতি পূর্বোক্ত 'ক্রাইসিস অব

মার্কসিজম' বাদী আলোচনা ও নানা তত্ত্ব উত্থাপনের ক্ষেত্রে মূল দৃশ্যমান কারণ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। দৃশ্যমান বাস্তবতাকে মর্মগতভাবে যথার্থ অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন না করেই বলা হচ্ছে যে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রম-অবলুপ্তি ঘটছে এবং উত্থান ঘটছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর। অন্য অর্থে বলা হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর 'এমবুর্জোয়াইজমেন্ট' তথা বুর্জোয়া-অয়ন ঘটছে; এমবুর্জোয়াইজমেন্টের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী মধ্যবিত্তে পরিণত হচ্ছে। এই বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য পুরাতন শিল্পের 'ডি-ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন' বা বি-শিল্পায়ন এবং পুরাতন ভারী যন্ত্র ব্যবস্থার পরিবর্তে বর্তমানে সূক্ষ্ম, নিপুণ ও চতুর-প্রযুক্তিমূলক যন্ত্রপাতির দ্বারা পরিচালিত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উৎপাদন করার প্রণালীসমূহের দ্বারা গঠিত নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমশ নির্ধারক অবস্থান গ্রহণকারী উচ্চ মজুরির সুশিক্ষিত কর্মজীবীদের দেখানো হচ্ছে। তাছাড়াও কাঠামোর দিক থেকে উৎপাদনের কেন্দ্রে ('কোর') অধিক সুবিধাভোগী স্থায়ী কর্মজীবী বনাম উৎপাদনের প্রান্তে ('পেরিফেরি') অস্থায়ী, সাময়িক সময়ের, চুক্তিবদ্ধ ইত্যাদি ধরনের শ্রমিকদের বস্তুগত প্রাপ্তি ও জীবন-যাত্রার মধ্যে যোজন-প্রমাণ পার্থক্যকে খাড়া করা হচ্ছে শিল্প-শ্রমিকশ্রেণী তথা প্রলেতারিয়র অবসানের বক্তব্যের অন্যতম যুক্তি হিসাবে। আকস্মিক ও অপরিচিত ধরনের এই পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য, আন্দোলন ও সংগঠনের উপর যেহেতু প্রবল নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং অনেকটা কোনঠাসা অবস্থার উদ্ভব ঘটেছে, তাই এই বাস্তবতা পূর্বোক্ত মতবাদীদের বাড়তি যুক্তি হাজির করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

স্বভাবতই বর্তমান সমগ্র অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যত অগ্রগতি। এই কাজে সর্বাগ্রে যথার্থ ধারণা থাকা প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর যথার্থ মর্ম ও ভূমিকা সম্পর্কে।

এই প্রসঙ্গের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করার পূর্বে পুঁজিবাদের কালে প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক কিছু অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অতীতেও লক্ষ্য করা গেছে যে শ্রমিকশ্রেণী যখন বিভিন্ন সময়ে রক্ষণাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, কিছু সমাজতাত্ত্বিক সংশ্লিষ্টকালে শ্রেণী অবলুপ্ত হচ্ছে বলে রব তুলেছে। আসলে এই ধরনের মানসিকতা ও প্রস্তাব ছিল ঐসব সমাজতাত্ত্বিকদের উদ্ভূত নতুন ব্যবস্থার কাছে নিজেদের রাজনৈতিক আত্মসমর্পণের পক্ষে যথার্থতা প্রমাণেব চেষ্টা। কিন্তু বিগত দেড়-শতাব্দীব্যাপী এই রকম ঘটনার ক্ষেত্রে, শ্রমিকশ্রেণী পুনরায় স্বমহিমায় আন্দোলনে ফিরে এসেছে শক্তিশালী সামাজিক শক্তি হিসাবে।

সব সময়েই শ্রমিকশ্রেণীর বৃত্তির একটি বিশিষ্ট ধরনের আদল থাকে; এতে প্রতিফলিত হয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে মূলধনের সঞ্চয়ের কাঠামোটি। বিপরীতপক্ষে মূলধনের সঞ্চয়ের বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর নির্দিষ্ট আদলটিতে। মার্কসের কালে মজুরি-শ্রমিকের বৃহত্তর একক গোষ্ঠী ছিল গৃহস্থালি ভৃত্যরা (কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪-৭৫)। প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্পে অথবা 'মেশিনোফ্যাক্চার' স্তরে কিংবা ব্যাপক ভিত্তিতে যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা গণ উৎপাদনের (ম্যাস প্রোডাকসন) অধ্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বরূপ সম্পর্কে মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে গভীরভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের অধিকাংশ কালপর্ব জুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর এই বিচার সীমাবদ্ধ ছিল সামান্য কিছু অগ্রসর ক্ষেত্রে—বিশেষত ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতি বস্ত্র উৎপাদনের কারখানাগুলিকে ভিত্তি করে। র‍্যাফেল স্যামুয়েল 'হিস্ট্রি অব ওয়ার্কশপ', শীর্ষক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের 'ওয়ার্কশপ অব দা ওয়ার্ল্ড : স্টীম পাওয়ার অ্যান্ড হ্যান্ড টেকনোলজি ইন মিড ভিক্টোরিয়ান ব্রিটেন' শীর্ষক আলোচনাতেও দেখিয়ে ছিলেন, "কি শিল্পভিত্তিক উৎপাদন, কি কৃষি বা খনির কাজে, বিপুলতম সংখ্যক পুঁজিবাদী শিল্প পবিচালিত হতো, বাষ্পশক্তির প্রযুক্তির পরিবর্তে হস্ত তথা কায়িক শক্তি প্রয়োগ করে।" অর্থাৎ পুঁজিবাদী মূল উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রণালীর বাইরেও বিপুল সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। শিল্প-বিপ্লবের কালে নয়, মেশিনোফ্যাকচারের সর্বজনীনীকরণ ঘটেছিল তার অনেক পরে—ম্যাস এসেম্বলি লাইন প্রোডাকশন ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পর—বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ঊনবিংশ শতাব্দী শেষে ও বিংশ শতকের শুরুতে। এই অধ্যায়গুলিতে যদিও শ্রমিকশ্রেণীর স্বরূপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

ঘটে চলেছিল, কিন্তু দৃশ্যত একই ছাউনির নিচে, দলবদ্ধভাবে, কায়িক শ্রম দিয়ে যন্ত্র পরিচালনা করার (ক্রমাগত কায়িক শ্রমের ডিগ্রি কমছে) বাস্তবতার তেমন কোন গুরুতর পরিবর্তন ঘটেনি। কায়িক শ্রমের যতো ডিগ্রি কমছিল, মস্তিষ্কজাত শ্রমের ডিগ্রি ততোই বাড়ছিল এবং তথাকথিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানও শুরু হয়েছিল এবং বাড়ছিল। পরিবর্তনের গতি এত ধীর ছিল যে মার্কসোত্তর সমাজতাত্ত্বিকদের অধিকাংশই এই প্রক্রিয়াকে যথার্থভাবে অনুসরণ করেননি। রূপান্তরিত এই শ্রমিকশ্রেণীকে পুরনো মধ্যবিত্তের ধারণার সাথে বহুক্ষেত্রেই গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল। ফলে শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণা কার্যত একধরনের যান্ত্রিকতায় অনড় থেকে গিয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, একই ও অনড় ধরনের বৃত্তিগত কাঠামো শ্রমিকশ্রেণীর কখনো ছিল না। বরং এই কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে মূলধনের সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তায় পরিবর্তনের ভিত্তিতে ও অনুসারে। মূলধনের সঞ্চয় ও শ্রমিকশ্রেণীর এই পরিবর্তনের তথা পুরোনো পদ্ধতি থেকে নতুন পদ্ধতিতে পুনর্গঠন ও পুনর্কাঠামোকরণে যাওয়ার অন্তর্বর্তী সময়টি 'সংকটের কাল' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে;এই সব পরিবর্তনমুখীনকালে দেখা গেছে, অযোগ্য ক্ষেত্রগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, দেউলিয়া মূলধন তুলে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলির স্থান গ্রহণ করেছে নতুন, আধুনিক ও কার্যকরী ক্ষেত্র ও অধিক ফলদায়ী মূলধন। এই প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীও স্বয়ং যুক্ত হয়ে পড়েছে। কিছু নির্দিষ্ট আদলের বৃত্তি এই ধরনের প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়েছে, অন্যদিকে নতুন ধরনের আদল বা বৃত্তির উদ্ভব ঘটেছে। এইভাবে 'ডি-ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন'-এর অনুসরণ করে সব সময়ে এসেছে 'রি-ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন'। আর এই রকম পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর পরিবর্তিত হওয়ার পরিবর্তে বিলুপ্ত হওয়ার তত্ত্ব। কিন্তু দৃষ্টির অলক্ষ্যে মূলধনের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে এইভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছে শ্রমজীবীদের বাহিনী। ফলে, বলা যায় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের পরিবর্তনের গতিময়তায় শ্রমিকশ্রেণীর পুনর্গঠন চলে। বর্তমানকালেও একইরকমভাবে শ্রমজীবীরা নতুন ঐতিহাসিক পরিবর্তনের এক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হয়েছে।

আর ঠিক এই ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে শ্রেণী-সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্ব, নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে, পুনর্বার সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। শ্রেণী-সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্ব কোন আশু, খণ্ড ও দৃশ্যমান বাস্তবতা কেন্দ্রিক নয়, এক সর্বজনীন ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারী। অর্থাৎ শ্রেণী-বিষয়ক মূল ধারণাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষ যে সমাজে বাস করে সেই সমাজকে গঠন ও পুনর্গঠনের কাজে বিভিন্ন অংশের সুনির্দিষ্ট ভূমিকাকে বৈজ্ঞানিকভাবে চিহ্নিত করার এক সুসংহত প্রয়াসের মধ্যে। সমাজের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তিসমূহ, উৎপাদনের বস্তুগত উপায় ও মানুষের শ্রম-শক্তির উন্নয়নের উপব। সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য কোন কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে সামাজিক শক্তিসমূহ তীব্রভাবে গতিশীল হয়ে ওঠে। উৎপাদনের সম্পর্কের পরিস্থিতির দ্বারা মানুষের উৎপাদনকারী শক্তি আরও বিকশিত হবে অথবা কমবে তা নির্ণীত হয় এই প্রক্রিয়ার অন্তিম ফলাফলের দ্বারা। অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তিগুলির সাথে মনুষ্য-সমাজের যে সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে, সমাজ-সম্পর্কের গুরুতর পরিবর্তনের ফলে, তার স্তরেরও পরিবর্তন ঘটে। এ হলো একটি দিক।

শ্রেণী-সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার প্রথম উপাদান হলো, "সুনির্দিষ্ট এক আর্থনীতিক আদল, যাতে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীর মজুরি না পাওয়া উদ্বৃত্ত-শ্রম নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়।" (মার্কস; ক্যাপিটাল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯১)। অন্যভাবে বলা চলে যে শ্রেণীকে সংজ্ঞায়িত করা হয় উৎপাদনের শোষণমূলক সম্পর্কের দ্বারা যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সমাজটি গঠিত থাকে।

উৎপাদনের সম্পর্কসমূহ নির্ভর করে উৎপাদনের উপায়ের বণ্টনের উপর। স্বভাবতই মূলধন ও মজুরি শ্রমিকের মধ্যে অন্তর্লীন সম্পর্ক হলো, "বণ্টন; এই বণ্টনের অর্থ ভোগের সামগ্রীর সাধারণ বণ্টন নয়, বরং স্বয়ং উৎপাদনের উপাদানসমূহের বণ্টন, যে পদ্ধতিতে বস্তুগত দিকগুলি ঘনীভূত থাকে। এক পক্ষের হাতে এবং শ্রম-শক্তি হতে বিচ্ছিন্ন থাকে অন্যদিকে।" (ক্যাপিটাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩)। উৎপাদনের উপায়সমূহের এই বণ্টন ব্যবস্থা "উৎপাদনের সমগ্র চরিত্র ও গতিকে নির্ধারণ করে।"

(ক্যাপিটাল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭৯)। আর এই প্রক্রিয়াই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা করে প্রত্যক্ষ উৎপাদকের উদ্বৃত্ত শ্রমকে নিঙড়ে নেওয়ার।

এ থেকে অর্থ দাঁড়ায় যে এক ব্যক্তির শ্রেণী-অবস্থান নির্ভর করে উৎপাদনের উপায়সমূহের সাথে তার সম্পর্কের দ্বারা। পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক; শ্রমিকরা তা নয়; এই পরিস্থিতি নির্ধারণ করে দেয় মালিক ও শ্রমিকের পরস্পরের তুলনামূলক শ্রেণীগত অবস্থানকে। সুতরাং শ্রেণী বিষয়ক ধারণাটি বিষয়গত (অবজেকটিভ)। এটি গঠিত হয় উৎপাদনের সম্পর্কসমূহের ভেতরে ব্যক্তির চেতনা থেকে উত্থিত হয় না। এমন কি ব্যক্তির চেতনার সাথে এই অবস্থার সংঘাতও ঘটতে পারে। সর্বোপরি শ্রেণী হলো এক সামাজিক সম্পর্ক। একজন ব্যক্তি কি কাজ করে সেটির সাথে তাঁর শ্রেণীর সম্পর্কের বিষয়টি খুব কমই যুক্ত। সমাজতাত্ত্বিকরা কাজ করাটিকে বলেন অক্যুপেশন বা বৃত্তি। কিন্তু কোন ব্যক্তির শ্রেণীত্বে অন্তর্ভুক্তির অর্থ হল, উৎপাদনের প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে শত্রুতামূলক যে সম্পর্কের দ্বারা এক গোষ্ঠী অপরকে শোষণ করে তাতে সেই ব্যক্তি যে কর্ম করেন তা কিভাবে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি শেষোক্ত শর্তের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়াও, শোষণভিত্তিক সমাজে শ্রেণী-ধারণাটি দ্বিবিভাজিত—দুটি শ্রেণীর দ্বারা—শোষক ও শোষিত। উভয়েই, সতত, পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ করে।

ঐতিহাসিক জিওফ্রে ডি স্টে ক্রোয়িকস শ্রেণী সম্পর্কে নিম্নোক্ত এক সুসঙ্গত ধারণা দিয়েছেন : "শ্রেণী (নির্ধারকভাবেই এক ধরনের সম্পর্কের বিষয়) হলো শোষণের ব্যবস্থার সত্যতার যৌথ প্রতিফলন, অর্থাৎ যেভাবে সামাজিক কাঠামোতে শোষণ জড়িত রয়েছে। শোষণ বলতে আমি বোঝাতে চাই অন্যের শ্রমের ফলের অংশের আত্মসাৎকরণ.....

"একটি শ্রেণী (একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী) হলো একটি জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে এক গুচ্ছ মানুষ, যাদের চিহ্নিত করা যায় সমগ্র সামাজিক উৎপাদনের ব্যবস্থায় তাদের অবস্থানের দ্বারা; সর্বোপরি সংজ্ঞায়িত করা যায় উৎপাদনের পরিস্থিতির (অর্থাৎ উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের) সাথে তাদের সম্পর্কের (প্রাথমিকভাবে মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণের মাত্রার ভিত্তির) দ্বারা এবং তাদের সাথে অন্য শ্রেণীগুলির সম্পর্কের দ্বারা।" (দা ক্লাস স্ট্রাগল ইন এনসিয়েন্ট গ্রীক ওয়ার্ল্ড)

এইভাবে, শ্রেণী বিষয়ক ধারণার কতগুলি অতি উচ্চ ও সুনির্দিষ্ট উপাদান রয়েছে। প্রসঙ্গটিকে সংক্ষিপ্ত করলে এই রকম দাঁড়ায় ঃ প্রথমত, শ্রেণীকে বিচার করা হয় এক সম্পর্ক (রিলেশনশিপ) হিসেবে। দ্বিতীয়ত, এই সম্পর্ক হলো বৈরিতামূলক। তৃতীয়ত, এই শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে উৎপাদনের প্রণালীর মধ্য দিয়ে। চতুর্থত, শ্রেণী হলো এক বিষয়গত সম্পর্ক এবং শেষত, শ্রেণীকে সংজ্ঞায়িত করা যায়, উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কসমূহের মধ্যে এক সর্বজনীন চরিত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে। শ্রেণীসমূহ সম্পর্কে ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক পদ্ধতিটি হলো, বিচার করে দেখা যে মনুষ্যসমাজ কিভাবে সমাজকে পরিবর্তন করে এবং সেই সমগ্র প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের দ্বারা। অন্যভাবে বলা যায় যে শ্রেণী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে গতিশীল বৈজ্ঞানিক নিয়মকে অনুসরণ করতে হবে। স্থিতাবস্থা, পরম্পরা বা নিছক দৃশ্যমান বাস্তবতাকে ভিত্তি করে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা গড়ে উঠতে পারেনা। অর্থাৎ সমাজের একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যে সিঁড়িভাঙ্গা সামাজিক ব্যবস্থা লক্ষ্য কর যায় সেটিকে নির্ধারক হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। তার পরিবর্তে, উৎপাদিকা শক্তি-সমূহে ও অন্য গোষ্ঠীগুলিতে ব্যক্তির অংশীদারিত্বমূলক সেই ভূমিকা, যা শক্তি যোগায় ইতিহাস রচনাতে, সেই সামাজিক গতিকে অনুসরণ করে শ্রেণীতে ব্যক্তির অবস্থান স্থির করতে হবে।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে স্বভাবত বলা যায় যে, শ্রমিকশ্রেণীর অবসান বর্তমানে আদৌ ঘটেনি। নতুন উত্থিত নানা ধরনের সামাজিক উৎপাদন ও নানাভাবে তাতে ক্রমান্বয়ে যুক্ত শ্রেণীগুলির অধিকাংশই যে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ তা বর্তমান সামাজিক ও আর্থনীতিক বিশেষ ধরনের উৎপাদনের প্রণালীর মধ্যে কার্যকরী ভাবে। প্রমাণিত হতে শুরু করেছে।

এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে যে বক্তব্য তোলা হচ্ছে তা হলো যে মার্কস স্বয়ং মনে

করেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণী বলতে উৎপাদনমূলক শ্রমে (প্রোডাকটিভ লেবার) অংশীদারদের বোঝায় অনুৎপাদক শ্রম (আন-প্রোডাকটিভ লেবার) দানকারীরা শ্রমিকশ্রেণীর অংশ নয়। সুতরাং বর্তমানে পরিষেবা ক্ষেত্র, অসংগঠিত ক্ষেত্র, 'হিডেল ইকনমি' ইত্যাদি স্তরে ক্রমাগত প্রশস্ত কর্মজীবীরা শ্রমিকশ্রেণী নয়; বা তার অংশও নয়। এই যুক্তি ও তর্ক কতোটা সঠিক এবং যেকালে কার্ল মার্কস শ্রেণী-বিষয় ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন, তখন যথার্থই তিনি উৎপাদক শ্রম ও অনুৎপাদক শ্রমকে কিভাবে দেখেছিলেন এবং শিল্প-শ্রমিক ছাড়াও অন্যান্য শ্রমজীবী বর্গগুলি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল, তা কিছুটা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

মার্কস উৎপাদনশীল শ্রমকে ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্তভাবে ঃ

"উৎপাদনশীল শ্রম—পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটির অর্থ হল মজুরি শ্রম, যা বিনিময় হয় মূলধনের পরিবর্তনীয় (ভ্যারিয়েবল) অংশের সাথে....(এটি) কেবল এই অংশের পুনরুৎপাদন করে না (অথবা এটির নিজস্ব শ্রম-শক্তির মতো নয়), বরং তদাতিরিক্ত—পুঁজিপতিদের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য (সারপ্লাস ভ্যালু) সৃষ্টি করে থাকে।" (মার্কস, থিওরিজ অব সারপ্লাস ভ্যালু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫২)। অর্থাৎ উৎপাদনশীল শ্রম হল উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টিকারী শ্রম। অন্যদিকে অনুৎপাদক শ্রম হলো, "সেই শ্রম যা মূলধনের সাথে বিনিময়ে যুক্ত হয় না, বরং সরাসবি বিনিময়ে যুক্ত হয় রেভিনিউ-এর সাথে, অর্থাৎ মজুরি বা লাভের সাথে।" (থিওরিজ অব সারপ্লাস ভ্যালু, ১ম খণ্ড, পৃঃ:১৫৭)।

সুতরাং 'প্রোডাকটিভ' ও 'আন-প্রোডাকটিভ লেবার' মধ্যে পার্থক্য হলো 'প্রোডাকটিভ লেবার' হলো তেমন ধরনের শ্রম যা মূলধনের বিকাশে অবদান যোগায় আর 'আন-প্রোডাকটিভ লেবার' তেমন ধরনের শ্রম যা তা করে না। শেষোক্ত ক্ষেত্র প্রসঙ্গে মার্কস উদাহরণ দিয়েছিলেন সমকালে অর্থাৎ ভিক্টোরিয় যুগের গৃহস্থালি ভৃত্য-সমাজের, যারা উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর দ্বারা অর্জিত রেভিনিউ থেকে নিযুক্ত হতো।

অন্যদিকে মার্কস যুক্তি দিয়ে এবং উদাহরণ হিসাবে বলেছিলেন পণ্যর সঞ্চালনের সময় ক্রয় ও বিক্রয়ে, হিসাবপত্র রক্ষণ ইত্যাদিতে যে সময় ব্যয়িত হয় তা মূলধনেরই বিশুদ্ধ ব্যয় এবং এ থেকে কোন উদ্বৃত্ত-মূল্য গঠিত হয় না। (মার্কস;ক্যাপিটাল, ৩য় খণ্ড, ১৬শ অধ্যায়)। যারা আধুনিক পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের সম্পর্কে পূর্বোক্ত বক্তব্য প্রয়োগ করেন এবং একইসাথে তাদের শ্রমিকশ্রেণী নয় বলে দাবী করেন ও অন্যদিকে শিল্প-শ্রমিককে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি শেষোক্তটির অবসানের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর অবসানের ধারণা ব্যক্ত করেন, তাঁরা মার্কসের শ্রেণী-বিষয়ে আরও সুবিস্তৃত বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হন। মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে জোর দিয়ে বলেছেন যে বহু 'হোয়াইট কলার ওয়ার্কার'ই প্রোডাকটিভ লেবার। এটা ঘটে চলেছে উৎপাদনের ক্রমাগত সামাজিকীকরণের ফলে। এর তাৎপর্য হলো ঃ "মোটের উপর ব্যক্তি শ্রমিক শ্রম-প্রক্রিয়ার (লেবার প্রসেস) প্রকৃত হাতল নয়। বরং তার পরিবর্তে (প্রকৃত হাতল হলো) সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ শ্রমশক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী শ্রমশক্তি, যা সমবেতভাবে ও সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে প্রস্তুত করে সেই উৎপাদনকারী যন্ত্র, যা আবার পণ্য উৎপাদনের জন্য অবিলম্ব প্রক্রিয়া গঠন করে। ....কেউ হাতের সাহায্যে ভাল কাজ করে, আবার অন্য কেউ মস্তিষ্কের সাহায্যে, কেউ বা ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার বা টেক্‌নোলজিস্ট ইত্যাদি আবার কেউ বা ওভারসীয়ার, কায়িক শ্রমিক অথবা এমন কি 'ড্রাজ'। উৎপাদনশীল শ্রমের অবিলম্ব ধারণার মধ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে নানা ধরনের শ্রম যুক্ত হচ্ছে এবং যারা এই ধরনের শ্রম দেয় তাদের শ্রেণীভুক্ত করা হচ্ছে উৎপাদনশীল শ্রমিক হিসাবে, অর্থাৎ যারা মূলধনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শোষিত এবং এটির উৎপাদন ও প্রসারের প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অধীন।" (মার্কস : 'রেজাল্টস অব দা ইমিডিয়েট প্রসেস অব প্রোডাকশন', ক্যাপিটাল ১ম খণ্ড সংযোজনী, পৃঃ ১০৩৯-৪০)।

পণ্য উৎপাদন করার ক্ষেত্রে শ্রমের জটিল বিভাজন এবং গতিশীলভাবে তার বিকাশের ফলে সৃষ্ট মার্কস বর্ণিত "দা কালেকটিভ ওয়ার্কার" বা যৌথবদ্ধ শ্রমিকরা হলো 'প্রোডাকটিভ লেবার', যদি তারা

হস্তের সাহায্যে উৎপাদন নাও করে। তাছাড়া মার্কসের সমগ্র আলোচনা অনুসরণ করলে এটা অনুমিত হয় না যে তিনি কেবলমাত্র প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল অংশের শ্রমদায়ীকেই একমাত্র সর্বহারা শ্রেণী তথা শ্রমিকশ্রেণী বলেছেন। বরং পূর্বে উল্লেখিত কমার্শিয়াল কর্মচারীদের সম্পর্কে বক্তব্যের মতোই অন্যত্র মার্কসের উক্তিও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। মার্কস বলেছেন, "এক দিক থেকে বলতে গেলে কমার্শিয়াল এমপ্লয়িরা হলো মজুরি শ্রমিক। প্রথমত, তাদের শ্রমশক্তি ব্যবসাদারদের পরিবর্তনীয় মূলধনের সাথে যুক্ত করা হয়;(অর্থাৎ) রেভিনিউ হিসাবে প্রসারিত টাকার সাথে নয়, এবং তার ফলে এটা ব্যক্তিগত কাজের জন্য যুক্ত করা হয়না, বরং করা হয় মূলধনের প্রসারের জন্য। দ্বিতীয়ত, এদের শ্রমশক্তির মূল্য ও তার ফলে মজুরি অন্যান্য শ্রমিকদের মতোই নির্ধারিত হয় অর্থাৎ এদের সুনির্দিষ্ট শ্রম-শক্তির দ্বারা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের খরচের দ্বারা, এদের শ্রমশক্তির ফলাফলের দ্বারা নয়।" (মার্কস : ক্যাপিটাল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২)

প্রসঙ্গত একথাও উল্লেখ্য যে, সারপ্লাস-ভ্যালু বা উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির প্রসঙ্গটিকে মার্কস এক-মাত্রিক হিসাবে বিবেচনা করেনি। এই দিকটি দৃষ্টির বাইরে থাকার ফলে শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কিত ধারণা বামপন্থীদের কারও কারও মধ্যে অনেকক্ষেত্রে গুলিয়ে গেছে। সুতরাং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেই দিকটির প্রতিও কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। মার্কস বলেছেন যে, পণ্যের সঞ্চালনে নিজের ভূমিকার মধ্য দিয়ে কমার্শিয়াল ক্যাপিটালিস্ট বা বাণিজ্যিক পুঁজিপতিরা অন্যত্র যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে, তা অনেকটাই নির্ভর করে নিজের কর্মচারীদের শোষণ করার উপর, অর্থাৎ তাদের (কর্মচারীদের) মজুরির চাইতে দীর্ঘ সময় কাজ করানোর দ্বারা। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "ব্যক্তিগত ব্যবসাদারের মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে এই প্রক্রিয়ায় কি পরিমাণ মূলধন সে প্রয়োগ করতে পারবে এবং (সেকারণে সে) ক্রয় ও বিক্রয়ে নিজ কেরানীদের আরও বেশি করে ব্যবহার করে মজুরিহীন শ্রমে নিয়োগের দ্বারা। সেই 'ফাংশান' যার দ্বারা ব্যবসায়ীর টাকা পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়, তার অধিকাংশটাই সম্পন্ন হয় তার নিজের কর্মচারীদের দ্বারা। এই কেরাণীদের মজুরিহীন শ্রম, তা যদিও উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করেনা, কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনে সুযোগ করে দেয়, যা, কার্যকালে, তার মূলধনের প্রসঙ্গে, একই ভূমিকা নেয়। সুতরাং এটা তার কাছে মুনাফার সমতুল্য।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-২৯৪)

অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলির বর্তমানে ভরের পরিবর্তন, বিশেষত শিল্প থেকে পরিষেবায়, এবং তার ফলে শ্রমজীবীদের সংখ্যার ও দৃশ্যমান রূপের পরিবর্তন নিয়ে, তাই, বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা গত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে চর্চা শুরু করেছিলেন। এমনকি ১৯৫৭ সালে ডেভিড লকউড পরিষেবায় নারীর সংখ্যাধিক্য থেকে একথাও বলেছিলেন যে কারখানার নারীদের যেভাবে 'ব্ল্যাক কোটেড' বলে চিহ্নিত করা হতো এখন তাদের 'হোয়াইট কলারে'র মতো 'হোয়াইট ব্লাউজড' বলা উচিত। ১৯৭৪ সালে হ্যারি ব্রেভারম্যান উল্লেখ করছিলেন "ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অব অফিস ওয়ার্ক"-এর প্রসঙ্গটি।

পরিস্থিতির ভিত্তিতেই শ্রমিকশ্রেণী প্রসঙ্গে একই বক্তব্যের, অন্যভাবে, পুনরুক্তি করা দরকারী মনে হয়। মার্কসের আলোচনাসমূহে 'থিওরি অব ক্লাস' বলে কোন বিশেষীকৃত ও সংজ্ঞায়িত বক্তব্য না থাকলেও মার্কসের তত্ত্বে প্রলেতারিয় হলো শ্রমিকশ্রেণী যা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পূর্বের আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করে আরও বলা যায়, এই শ্রমিকশ্রেণী কেবল তাদের সবাইকে নিয়ে গঠিত নয় যারা বাঁচার জন্য কাজ করে অথবা যারা কার্যকরী বা প্রয়োজনীয় শ্রম দেয়। একারণে 'প্রলেতারিয় শব্দটি একটি সংখ্যার দ্বারা সীমায়িত গোষ্ঠীর সমার্থক নয়, যা প্রায়শই ভুলভাবে উত্থাপনের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রলেতারিয় তথা শ্রমিকশ্রেণী বলতে সমস্ত মজুরিভোগী শ্রমজীবীকে বোঝায়না। প্রলেতারিয় মানে একমাত্র শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীও নয়। কায়িক শ্রমজীবীরাও একমাত্র প্রলেতারিয় নয়। এমনকি উৎপাদনের কেন্দ্র-বিন্দুতে কর্মরতরাই একমাত্র প্রলেতারিয় নয়। শ্রমিকশ্রেণী তাদেরই বলা হয়েছে যাদের জীবন-ধারণ নির্ধারিত হয় মালিকশ্রেণীর সাথে শ্রমশক্তির সম্পর্কের দ্বারা এবং তারা স্বভাবতই, পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে, উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। প্রলেতারিয়রা কেবল সেই অংশের শ্রমজীবীরা নয়, যারা কেবলমাত্র বস্তুগত পণ্য উৎপাদন করে। তাছাড়া, পুঁজিবাদী

উৎপাদনে প্রলেতারিয়কে কাঠামোগতভাবে এক বুনিয়াদি একক হিসাবে বিচার করা হয়; কোন ব্যক্তি শ্রমিক দিয়ে নয়, বরং যৌথ শ্রমের দ্বারা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ দরকার যে, মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতেই সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "বিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়দের যেতে হয়।" অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিকাশের স্তরগুলি শ্রমিকশ্রেণীর আঙ্গিকে প্রতিফলিত হয়। তাই ধনতন্ত্রের প্রত্যেকটি স্তরের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর আঙ্গিকের ঐতিহাসিক ও বাস্তব, নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। পুঁজিবাদের জন্ম-লগ্ন থেকে শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি। পুঁজিবাদ যতো প্রসারিত হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীও। পুঁজিবাদের যতো উন্নত থেকে উন্নত স্তরে গেছে, শ্রমিকশ্রেণীর আঙ্গিক ও ভূমিকাও ততোই উন্নত হয়েছে। যারা দাবী করেন যে, পুঁজিবাদ বিশ্বায়নের স্তরে অধিকতর উন্নত, এমনকি শ্রেষ্ঠতম স্তর অর্জন করছে, তাদের একইসাথে বোঝা উচিত যে সেক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর আঙ্গিক বা মর্মবস্তুতে অবনমন বা শ্রমিকশ্রেণীর অবসানের পরিবর্তে বিপরীতটি ঘটাই স্বাভাবিক। এই সত্যর মুখোমুখি হতে বিপন্ন বোধ করার ফলে সম্ভবত শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে কোন কোন অংশ পুঁজিবাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে বলেও দাবী তুলছেন। ফলে এই ধরনের সমস্ত বক্তব্য এখন ক্রমশ পিচ্ছিল মাটিতে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

এইভাবে আজকের পরিস্থিতির দৃশ্যমান বাস্তবতার প্রকৃত তাৎপর্যকে ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই বর্তমানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে শ্রেণীর, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর চিহ্নিতকরণের কাজটি যথার্থভাবে সম্পন্ন করা। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামনে তখন এই কর্তব্যটিই সর্বপ্রধান এবং প্রাথমিকও বটে। জন্ম-লগ্ন থেকে ট্রেড-ইউনিয়নকে অনুগামী অনুসন্ধানের কাজ কখনো করতে হয়নি। কেননা, সংশ্লিষ্টকালে শ্রমিকশ্রেণী স্বয়ং ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। এখন পরিস্থিতিটা পাল্টেছে বহুলাংশে। তাই শ্রমিকশ্রেণীকে চিহ্নিতকরণের নতুন কাজ সামনে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন নতুন ক্ষেত্রগুলিতে নতুন আন্দোলনের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের পরিচয় নিজেরা প্রাথমিক ভাবে দিতেও শুরু করেছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দীর্ঘ অবস্থান এবং সেটির অসম বিকাশ ও উত্থান-মন্দার প্রক্রিয়ার ফলে, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখিত হয়েছে, "মাঝে মাঝে শ্রমিকরা জয়ী হয় বটে, কিন্তু তা কেবল অল্পদিনের জন্য।" এই মূল্যায়ন কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট একটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অধ্যায়ে অবস্থা, ভূমিকা পালন ও প্রভাব বিস্তারের স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ফলাফলের ক্ষেত্রেও সত্য। পুঁজিবাদের উচ্চাবচ বিকাশের প্রক্রিয়া চলা-কালে যে যে সময়ে ও দুর্বল অধ্যায়ে সেটির নিম্নগতি ঘটে, সংশ্লিষ্ট সেই সেই সময় ও কালপর্ব ব্যাপী শ্রমিকদের, অনেক ক্ষেত্রেই, বৃহত্তর ও কালমেয়াদী সাফল্য অর্জিত হয়। আবার পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্র শ্রমিকদের পূর্বে অর্জিত সাফল্য ও প্রভাবগুলি পুনরায় ছিনিয়ে নেয়। বর্তমানকালে যেমনটি ঘটছে। পুঁজিবাদের একটি অধ্যায় থেকে অপরটিতে আসীন হওয়ার পর এই চক্রাবর্তকে 'এপোক্যাল শিফ্ট' বা যুগান্তকারী পালা-পরিবর্তন বলা হয়েছে। কিন্তু এখন বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই 'এপোক্যাল শিফ্ট' পুঁজিবাদের পক্ষে 'ফাইন্যাল শিফ্ট'। বোরিস কাগারলিট্স্কি তাঁর 'দা আনফিনিস্ড রেভোলিউশন' (গ্রীন লেস্ট উইকলি, নভেম্বর, ১৯৯৭) শীর্ষক নিবন্ধে 'এপোক্যাল শিফ্টে'র তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন : "প্রতিক্রিয়া হলো ইতিহাসের স্বাভাবিক এক ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপার (ফেনোমেনন); কিন্তু যেমন ঘটে বিপ্লবের ক্ষেত্রে তেমনই এটিও (প্রতিক্রিয়া) একটি মুহূর্তে পৌঁছে নিঃশেষিত হয়ে পড়ে। যখন এই নতুনের ফুরিয়ে যাবার পালা শুরু হয় তখন নতুন পর্যায়ের বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটতে পারে।" ফ্রান্সিস ফকস পিভেন এবং রিচার্ড ক্লোয়ার্ডও অনুরূপ মর্মে ধনতন্ত্রের বিশ্বায়নের নতুন অধ্যায়ের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইতিহাসের এই 'ডাইলেকটিকস'কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কেননা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা আসলে ইতিহাসের বিজ্ঞান। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে তার নিস্তার নেই। পিভেন ও

ক্লোয়ার্ড তাই বলেছেন যে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের জন্য অবিলম্বে বর্তমানের বিশ্বায়নে ঘুন ধরবে। এ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সত্যতা কি?

উন্নত দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউনাইটেড কিংডম-এ সম্প্রতি জি. ডি. পি.-র হারে বৃদ্ধি ও বেকারীর পরিমাণ হ্রাসকে (১৯৯৭) যখন বিশ্বায়নের সাফল্য বলে প্রচার করা হচ্ছে, ঠিক তার পাশাপাশি জার্মানী ও জাপানে জি. ডি. পি.-র হার নিম্নগামী হওয়া ও বেকারী বৃদ্ধির ঘটনা শুরু হয়েছে। তৃতীয় দুনিয়ার পরিস্থিতি বাদ দিয়েও বলা যায় যে, পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, উন্নত দুনিয়াতেই পুঁজিবাদ সেটির সর্বকালের নিয়মকে আদৌ অতিক্রম করতে পারেনি—উৎপাদনে নৈরাজ্য ও অসম বিকাশ। কিছুদিন আগেও যে দুটি দেশের বিকাশকে পুঁজিবাদের আধুনিক স্তরের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলে প্রচার ও প্রমাণ করা হচ্ছিল, এখন সেই দুটি দেশের অর্থনীতি বহুলাংশে নিম্নগামী। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'এশিয়ান টাইগারস'দের পরিস্থিতি তো বলাই বাহুল্য। তাছাড়াও, সমাজতন্ত্রের পথ ছেড়ে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের পর, একদা আর্থনীতিক দিক থেকেও শক্তিশালী, বর্তমানের রাশিয়াতে গড়ে উঠেছে তীব্র সংকট; সংকটের ভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে নতুন শব্দ—'রাশিয়ান ক্রাইসিস'। কলিন লেজ ও লিও পিঞ্চ ধনতন্ত্রের বর্তমান অধ্যায়ের সংকটের বিকাশের এক চমৎকার সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক নজির এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: ১৭৯৬ সালে ব্রিটেনের সংকটগ্রস্ত অর্থনীতিকে বাঁচাতে আই.এম.এফ.-কে ঋণ দিতে হয়েছিল ৪ বিলিয়ন ডলার (তৎকালে সর্বোচ্চ পরিমাণ এককালীন ঋণ); একই প্রয়োজনে মেক্সিকোকে ১৯৯৪ সালে ঋণ দিতে হয়েছিল ৪৮ বিলিয়ন ডলার, আর ১৯৯৭ সালে (যখন দাবী করা হচ্ছে যে বিশ্বায়নের সাফল্য শীর্ষে) দক্ষিণ কোরিয়াকে ৬০ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েও দেশটিকে সংকট থেকে পরিত্রাণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। ধনতন্ত্রের পক্ষে সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যে সহজ নয়, তার আর এক প্রমাণ হলো, আই.এল.ও.-র ১৯৯৬ সালের রিপোর্টে স্বীকৃত হয়েছে যে সারা দুনিয়ার বেকার বা আধা-বেকারের সংখ্যা ১০০০ মিলিয়ান ছাড়িয়ে গেছে, ৩০০ মিলিয়ান শ্রমিক ক্যাজুয়াল হিসাবে কাজ করে, ৮০ মিলিয়ান শিশু শ্রমিক রয়েছে বিশ্বে।

'নিও-লিবারালাইজেশন'-এর এই কালপর্বে, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো থেকে উদ্ধৃত্ত করা যেতে পারে বিশ্ব-পুঁজিবাদের চরিত্র ও ভূমিকার সর্বকালের প্রতিচ্ছবি: "....মানুষের সাথে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বন্ধন ছাড়া আর কিছুই এরা (পুঁজিবাদীরা—শু. গুপ্ত) বাকি রাখেনি। ....অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করল ঐ একটি মাত্র স্বাধীনতা—অবাধ বাণিজ্য, যাতে বিবেকের স্থান নেই। ....উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বৈপ্লবিক বদল না এনে এবং তাতে করে উৎপাদন-সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে সমাজ-সম্পর্কে বৈপ্লবিক বদল না ঘটিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী বাঁচতে পারে না। ....বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক পরিবেশে অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। ....নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত বর্ধমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়াশ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র। ....(এর ফলে) সমস্ত সাবেকি জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস হয়েছে, নয় প্রত্যহ ধ্বংস হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প, যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই মরা-বাঁচার প্রশ্নেরই সামিল; এমন শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয়, দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে কাজ করছে; এমন শিল্প যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ....সকল উৎপাদন-উপকরণের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতার মাঝে টেনে আনছে সমস্ত জাতিকে....সকল জাতিকে তারা বাধ্য করছে বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট জাতির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে;...." একদিকে এই চলচ্চিত্র যেমন বিশ্বায়নের কালপর্বেও সম্পূর্ণ ও হুবহু সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে, অন্যদিকে "....নিজেদের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক ও সম্পত্তি-সম্পর্কসহ আধুনিক বুর্জোয়া-সমাজ ভেল্কিবাজির মতো উৎপাদনের এবং

বিনিময়ের এমন বিশাল উপকরণ গড়ে তুলেছে যে, তার অবস্থা আজ সেই যাদুকরের মতো, যে মন্ত্রবলে নরকের শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।" শেষোক্ত চিত্রটিও আধুনিক ধনতন্ত্রের বিশ্বায়নে ক্রমশ পরিস্ফুট হতে শুরু করেছে।

তৃতীয় দুনিয়া বা উন্নত দুনিয়া—যেখানেই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ বিশ্বায়নের ব্যবস্থার স্বাদ পেয়েছে সেখানেই নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। কলকারখানা বন্ধ, বেসরকারীকরণ, শিল্পের আধুনিকীকরণ, ছাঁটাই, কাজের সময়ের বৃদ্ধি, প্রকৃত মজুরি হ্রাস, বৃত্তির অনিশ্চয়তা ও সাময়িকীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাসমূহের ক্রমাবলুপ্তি, লিঙ্গ-জাতি-বর্ণভিত্তিক শ্রমের নতুন ও ব্যাপক বিভাজন, শ্রমের দেশান্তর প্রভৃতি যেমন কর্মজীবীদের অভিজ্ঞতায় তিক্ততর হচ্ছে, জনগণের অভিজ্ঞতাও হচ্ছে ভয়ঙ্কর ধরনের। তার মধ্যে প্রধান হলো সমাজে ক্রমবর্ধমান গণদারিদ্রায়ন, বিহ্বলকর সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, সন্ত্রাসবাদ, মাদকাসক্তি, পরিবারের ভাঙ্গন, আত্মহত্যা, খুন, চোরাচালান, ধর্ষণ, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, দাঙ্গা, গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং কি নয়! স্বভাবতই মানুষের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা জাগরিত হচ্ছে তা হলো, "....পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে সত্যিই কোন অর্থপূর্ণ নিবিড়তা গড়ে উঠতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, এই পদ্ধতির পরিসীমার মধ্যে পুঁজিবাদীশ্রেণী সংজ্ঞাগতভাবেই অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। এই ব্যাপারটা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আরো ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে যে শ্রম-শক্তি শক্তিশালী হলেই কিভাবে ধনতন্ত্র গতিশীল হয়। শ্রম-শক্তি দুর্বল হলে এর গতিশীলতা কমে। মাত্রাতিরিক্ত শোষণকে দূর করার জন্য একমাত্র পথ হলো শ্রেণী-সংগ্রাম। তবুও....পুঁজিবাদের হাত থেকে সুবিধা আদায় ছাড়াও, শ্রেণী-সংগ্রামের অনেক বড় মাপের ভূমিকা রয়েছে। আজও সমাজতন্ত্র একটি বাস্তবমুখী পথ—পুঁজিবাদের থেকেও বেশি বাস্তবমুখী অথচ মানবিক। পুঁজির হাত থেকে কনসেশন আদায়ের লড়াই এবং পুঁজির হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ দখলের লড়াই—এই দুয়ের মধ্যে বড় ধরনের ফারাক অবশ্যই আছে। এই তফাৎ অনেকটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে এক 'নিরাপত্তার জাল'এর সন্ধান এবং পুঁজিবাদী নীতিকে জীবনের অবশ্যকারী শর্তগুলি থেকে বিচ্ছেদকরণ এই দুটির মধ্যে পার্থক্যের সমান।...." (এ.এম.উড.)

এটা ঠিক যে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি মডেলের বিপর্যয় ও সমান্তরালে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সুবিধাজনক অবস্থানের পটভূমিকায় এবং তার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও আন্দোলনের কোনঠাসা পরিস্থিতিতে শ্রেণী-সংগ্রামকে সমাজতন্ত্র অর্জনের স্তরে উন্নীত করার মতো আশু বাস্তবতার কোন শর্ত এখনও গড়ে ওঠে নি; কিন্তু মানুষ ফের সামিল হতে শুরু করেছে আন্দোলনের দিকে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে শুরু করে, মধ্য-নব্বই-এর দশকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশে দেশে আন্দোলনের ব্যাপ্তি শুরু হয়েছে। ফলে তৃতীয় দুনিয়ার আন্দোলনগুলি অভিহিত হতে শুরু করেছে 'আই. এম. এফ.-রায়ট' নামে, যা চিহ্নিত করছে বিশ্বায়নের আক্রমণ থেকে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পাওয়ার এক মানসিকতাকে। সন্দেহ নেই, এখনও পর্যন্ত এই সমস্ত আন্দোলনগুলির চরিত্র অনেকটাই ডিফেন্সিভ—রক্ষণাত্মক। কিন্তু তার মধ্যেও গোপন কথাটি গোপন নেই। ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে বিশ্ব-পুঁজিবাদের অন্যতম প্রধান ও বিশ্বে অন্যতম সর্বাধিক প্রচারিত 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা 'ফাইটিং দা ক্লাস ওয়ার' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছে, "অনেক মন্তব্যকারী মনে করেন যে শ্রেণীর মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ এতে বিশ্বাসী নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণী-শত্রুতা সম্ভবত আরও খারাপের দিকে চলেছে। গ্যালপ পোলের ফলাফল অনুযায়ী "শ্রেণী সংগ্রাম" বর্তমানে বাস্তব হয়ে উঠেছে ব্রিটেনে এমন বক্তব্যে বিশ্বাসী ভোটারের সংখ্যা ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে ৬০ শতাংশ থেকে বেড়ে মধ্য-'৯০-এর দশকে দাঁড়িয়েছে ৮১ শতাংশ।..." ১৯৯৬ সালে 'নিউইয়র্ক টাইমস' কর্তৃক প্রকাশিত একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে ৫৫ শতাংশ আমেরিকান নিজেদের শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে পরিচয় দিয়েছে, অন্যদিকে মাত্র ৩৬ শতাংশ নিজেদের দাবী করেছে মধ্যবিত্ত বলে। নিও-লিবারাল যে তাত্ত্বিকরা নতুন বিশ্বকে এবং সর্বাগ্রে আমেরিকাকে শ্রমিকশ্রেণী মুক্ত এবং সর্বজনীন মধ্যবিত্ত সমাজ বলে প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত, পূর্বোক্ত সমীক্ষা স্বয়ং তার মূলে কুঠারাঘাত

করেছে। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ মানুষ দেশের অর্থনীতিকে তাদের জীবনে সৃষ্ট সমস্যার জন্য দায়ী করেছে।

এইভাবে শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম প্রসঙ্গ, যে কোন পক্ষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে আপনা-আপনি পুনরায় আবির্ভূত হতে শুরু করেছে। স্বভাবতই কলিন লেস ও লিও পিঞ্চ লিখেছেন, "আমরা বাস করছি এক চিত্তাকর্ষক সময়ে। প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এখনও বইছে, কিন্তু প্রত্যয় ও শক্তির বিচারে তা ক্রমশঃ নিভন্ত, অন্যদিকে প্রগতিশীল মনোভাব ও ধারণার প্রতি-প্রবাহ অর্জন করছে শক্তি, যদিও এখনও পর্যন্ত তা রাজনৈতিক ধারায় প্রকাশের কার্যকরী পথ পায়নি। নিও-লিবারালিজমের সুপ্ত নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বগুলি এখন ক্রমবর্ধমানভাবে প্রকাশ্যে যতো স্পষ্টতর হচ্ছে, ততোই কম থেকে অধিক কম মানুষ এটির চরিত্রকে বুঝতে ভুল করছেনা। লিবারাল ঢক্কানিনাদে সৃষ্ট আঁধিকে 'নির্দয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী' ক্রমশ ভেঙ্গে ফেলছে—এবং মেকি বামপন্থীদের 'নতুন সময়'এর মরীচিকা, 'মধ্যপন্থার বিপ্লববাদিতা' এবং বিচ্ছিন্নতা, দারিদ্রায়ন ও সংকট থেকে অলৌকিকভাবে মুক্ত পুঁজিবাদী বিশ্ব সম্পর্কে অনুরূপ স্বপ্নদর্শীদের আশাকে ভেঙ্গে তছনছ করা শুরু করেছে।"

বর্তমান প্রসঙ্গটি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না "পুঁজিবাদ সমাজের শেষ ধাপ' বা বিশ্বায়নকে 'টিনা' (দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ) বলে ঘোষণা ও প্রমাণ করার প্রচেষ্টায়। এসব যে অতিকথন তাও বর্তমানে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্পষ্ট হচ্ছে। পেছনে হাঁটা শুরুর সময় গোনা শুরু হয়েছে বিশ্বায়নের ব্যবস্থার। কেবলমাত্র বিতর্ক থাকতে পারে পশ্চাদপসরণের আরম্ভের 'ডিগ্রি'টি কি, তা নিয়ে। তবে একথাও সত্য যে এই নতুন প্রক্রিয়া থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই নিশ্চিতি তৈরি হয়না এবং এখনও হয়নি—অতঃপর বিকল্প কি? কোথা থেকে, কিভাবে এবং কোন আশু লক্ষ্যে বিশ্বায়নের এই নেতিবাচক প্রক্রিয়ার উপর ক্রমাগত হানা হেনে ক্রমাগত তা বাড়িয়ে তুলতে হবে? এইসব সংশয় তথা প্রশ্ন বিশেষত আরও এই কারণে যে সমগ্র পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় শ্রমজীবীদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব এবং সর্বাপেক্ষা জটিল ও কঠিন। এবং তা' সমস্ত দিক থেকেই—এমন কি সংগঠন, আন্দোলন, চেতনা ও ঐক্যের প্রতিটি স্তরেই। সুতরাং শত্রুর দুর্বলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্রমজীবীদের শিবিরের শক্তি বৃদ্ধির সমার্থক এমন সামান্য ধারণা কেবল ত্রুটি-পূর্ণ নয়, বিপজ্জনকও বটে। তাই, বর্তমান মুহূর্ত হলো দারুণ সতর্কভাবে পা ফেলার মুহূর্ত। এ ক্ষেত্রে বিশেষত সমগ্র ইতিহাসের ঘটনাবলীকে কেবল স্মরণে রাখা নয়, তার গভীর ও ব্যাপক পুনর্মূল্যায়ন ও তা থেকে যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়ার সময় এখন। এই কাজে ব্যর্থতার জন্যই আবার নতুন করে প্রতিকূলতার মুখে পড়েছে বাস্তববাদিতার নামে নানা 'সর্ট-কাট' মেকি বামপন্থী প্রস্তাবগুলি। তাছাড়া, অন্ধ অনুসরণ, তত্ত্বের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা, মতান্ধতার বহু ভুলও শ্রমিক আন্দোলনে অতীতে ঘটেছে বারবার, বহুবার। প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশের কোন কোন সময়ে ভ্রান্ত মূল্যায়ন ও পদক্ষেপ যেমন বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনকে ভ্রান্ত পথের অনুসারী করেছে, আবার কোন কোন সময়ে তাদের স্বীয় দেশের সমাজতন্ত্রের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রদত্ত কল্পিত তথ্য ও বিশ্ব-পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়নের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছে। সংশ্লিষ্ট সময়ে এসবের ফলাফল বোঝা যায়নি। কিন্তু ক্রমে সেগুলি স্তূপীকৃত হয়ে সর্বনাশের পথকে প্রশস্ত করেছিল। তাই এখন সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার যথার্থ ও সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের কাজ করে যাওয়া দরকার অবিরত। সঙ্গে সঙ্গে একের সাথে অন্য সংগঠন-আন্দোলনের প্রত্যেকটির নতুন অভিজ্ঞতার ক্রমাগত ও গভীর বিনিময় চাই। এই বিনিময় অঞ্চল, দেশ ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গকে অতিক্রম করে এবং ক্রমশ বিশ্বময় করে গড়ে তোলা দরকার। শ্রেণীগত মূল লক্ষ্য ও মতাদর্শের প্রসঙ্গ এই ধরনের কাজকর্মে এই মুহূর্তে প্রধান নাও হতে পারে, তবে বামপন্থীদের দৃষ্টিতে তা অস্বচ্ছ থাকলে চলবেনা। প্রধানত তাদেরই সর্বক্ষণ সৃজনশীলভাবে পথ নির্ণয় করার চেষ্টা চালাতে হবে। যাতে উত্তরোত্তর বেশি বেশি মানুষকে সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চে সামিল করা সম্ভব হয়। কোন গোঁড়ামির স্থান এই প্রয়াসে থাকতে পারে না। তবে তথাকথিত সৃজনশীলতার নামে এবং বাস্তববাদিতার আড়ালে কৌশল যেন নীতিকে অতিক্রম করে না যায়, সেই সতর্কতাও সর্বক্ষণের সঙ্গী

হওয়া দরকার। কেননা নানা বর্ণের পন্থা এখন পায়ে পায়ে জড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীর হাঁটার পথে বাড়তি ও গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি করছে, সেদিকেও সতর্কভাবে নজরে না রাখলে চলবে না।

পুঁজির বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ শ্রমের বিশ্বায়নের দ্বারাই তথা শ্রমজীবীদের বিশ্বময় সংগঠন ও আন্দোলনের সমন্বয়ের সাহায্যেই প্রথমে ও কার্যকরী করে গড়ে তোলা সম্ভব। এ কারণে বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা, অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায়, অনেক বেশি জরুরী হয়ে পড়েছে। এবং এই লক্ষ্যে শ্রমজীবীদের তো বটেই, তার আগে সংগঠনের নেতা, সংগঠক ও কর্মীদের এবিষয়ে সুশিক্ষিত করে তোলা দরকার। একই সাথে চতুর্দিকে প্রতি মুহূর্তে যা' ঘটছে, সে সম্পর্কে নিয়মিত পরিচিত ও জ্ঞাত থাকতে হবে সংগঠনকে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের স্তর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। শ্রমজীবীদের গঠন, তাদের সংগঠন, আন্দোলন ও চেতনার স্তরেও রয়েছে প্রভূত উচ্চাবচ পরিস্থিতি। সুতরাং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে এই বাস্তবতার ধারনাও সবসময় সুস্পষ্ট থাকা দরকার।

এখন একথা স্পষ্ট যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন-আন্দোলনের চিরাচরিত কাঠামো ও তৎপরতার মধ্যে নানা দিক থেকে পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে, নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া খুবই কঠিন হবে। উপর থেকে নিচের দিকে সংগঠন গড়ার ব্যবস্থার ভরকে অনেকটাই পরিবর্তন করে, নিম্ন থেকে উপরের দিকে গঠনের গুরুত্ব দানের প্রয়োজনীয়তা এখন অনেক বেশি বেড়েছে। হয়তো 'সিন্‌থেসিস থিসিস' থেকে সৃষ্ট বর্তমানের 'সিন্‌থেসিস ডিবেট' ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে প্রাথমিক পথের সন্ধান দিতে পারে। তাই যুগ-ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তনের ফলে সর্বনিম্ন স্তরের অনুগামীদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, মানসিকতা, রুচি, ব্যবহার ইত্যাদিকে উপেক্ষা করার অর্থ হবে ট্রেড ইউনিয়নের বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া। একথা ঠিক যে সংগঠন ও আন্দোলনের সংগঠকদের চেতনার স্তরকে সাধারণ অনুগামীদের চেতনার স্তরে নামিয়ে এনে যেকোন কাজ করা হবে অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে গুরুতর ভ্রান্তি ঘটবে যদি নিচুতলার মনোভাবকে সরাসরি উপেক্ষা করা হয়। এটা সবিশেষ লক্ষণীয় যে নতুন প্রজন্মের শ্রমজীবীদের মানসিকতাও অনেকটাই নতুন ধরনের। অতীতের সাথে তার মিল, সাধারণভাবে, অনেকটাই কম। তাই প্রকৃত যা ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্র তা কেবল আনুষ্ঠানিক ও কাঠামোর স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখার ঐতিহ্য বাতিল করার সময় এসেছে এখন, ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্রকে প্রকৃত মর্মে প্রতিষ্ঠার কাজ এ সময়ের অন্যতম প্রধান কাজ। এই কাজ যথার্থভাবে সম্পন্ন করতে 'ফ্রম বটম আপওয়ার্ডস' এখন এক কার্যকরী তত্ত্ব। এই 'ফ্রম বটম, আপওয়ার্ডস' প্রসঙ্গ যান্ত্রিক ও পরিমাণগত কেবল নয়, গুণগতও হতে হবে। তার অন্যতম হলো 'মাইনরিটি', 'ডিপ্রাইভড' প্রভৃতি অংশের অবস্থান ও ভূমিকাকে সমগ্র ট্রেড ইউনিয়নে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠা করা। নারী, ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাত, বহিরাগত প্রভৃতি স্তরের যারা এখনও শ্রমিক আন্দোলনে সংখ্যালঘু ও উপেক্ষিত তাদের অধিকারকে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দিকগুলির সাথে ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্রে সুনিশ্চিত করতে হবে।

তাই, ট্রেড ইউনিয়ন-বৃত্তের ধারণার আমূল পরিবর্তন করাও এখন একান্ত জরুরী। পূর্বোক্ত শ্রেণী-বিষয়ক আলোচনার ভিত্তি থেকে এটা স্পষ্ট হতে পারে যে কেবলমাত্র শিল্পগত কায়িক শ্রমদায়ীদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের তথাকথিত ধ্রুপদী ধারণা ও সংগঠন করার মনোভাব এখন একান্তই সময়োপযোগী নয়। শিল্প শ্রমিক অংশ ছাড়াও, সুবৃহৎ বিভিন্ন অংশ এখন শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্গত হচ্ছে এবং বিশ্বায়নের নতুন অর্থনীতিতে তারাও ধীরে ধীরে শক্তিশালী ও অন্তর্শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠছে। ইতোমধ্যেই তার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিক ছাড়াও মস্তিষ্কজাত শ্রমদায়ী অংশ, পাবলিক সার্ভিসের কর্মচারীরা, কন্ট্রাক্ট লেবার ইত্যাদি অংশের দ্বারাই '৯০-এর দশকে সারা বিশ্বে সবচাইতে বড়ো বড়ো ও শক্তিশালী ধর্মঘটগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথাকথিত 'মধ্যবিত্ত' সম্পর্কে একাংশ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের উন্নাসিক ধারণা, আজও বহু দেশে, ট্রেড ইউনিয়নের পরিমাণগত বিকাশের সামনেই বড়ো মাপের প্রতিবন্ধকতা হয়ে রয়েছে। শ্রেণী-সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এর বড়ো কারণ। এবং এই ধরনের ধারণার ফলেও দারুণ দ্রুতভাবে প্রসারমান অসংগঠিত ক্ষেত্র আজও ট্রেড

ইউনিয়নের বৃত্তের বাইরে রয়ে গেছে অথবা যথার্থ গুরুত্ব পাওয়া থেকে রয়েছে উপেক্ষিত। তাছাড়া, নতুন শ্রম-প্রক্রিয়ার ফলে 'কোর'-এর সুশিক্ষিত ও স্থায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি সংখ্যায় নিরঙ্কুশ 'পেরিফেরি'-এর ক্যাজুয়াল, সিজন্যাল, কন্ট্রাক্ট, জব-শেয়ারিং, হোম-ওয়ার্কার প্রভৃতি অংশত এখনও তেমন গুরুত্ব পায়নি ট্রেড ইউনিয়নে। অসংগঠিত অংশ সম্পর্কে ধারণাও সর্বত্র স্পষ্ট নয়। স্মরণ রাখা দরকার যে ব্যাপক বেকারীত্বের ফলে প্রতিদিন অসংগঠিত ক্ষেত্রের নতুন নতুন দিকের প্রসার ঘটেছে এবং শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাছাড়া সমাজের রুচি, চাহিদা ও ভোগের যে পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটছে, তা পূরণের এক আর্থিক বাজার-ব্যবস্থা হিসাবে, সমানুপাতে বিকাশ ঘটেছে এই ক্ষেত্রের। সুতরাং সামাজিক রুচি, চাহিদা ও ভোগের বিবর্তন/পরিবর্তন ও শ্রমের বাজারে তার ফলাফলের দিকে নিয়মিত লক্ষ্য না রেখে ট্রেড ইউনিয়ন সামাজিক অন্যতম সংগঠন হিসাবে বর্তমান সময়ে ভূমিকা পালন করতে পারেনা। নারী, অভিভাসিত শ্রমিক, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী বা অবহেলিত অংশের শ্রমজীবী, পুঁজিবাদী প্রথায় কৃষিতে নিযুক্ত মজুর, ফেরিওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ক্যাজুয়ালধর্মী শ্রমিক, সাময়িক (সিজন্যাল) উৎপাদনের ক্ষেত্রের (যেমন ইট ভাঁটা) শ্রমিক ইত্যাদি অজস্র অংশ তো রয়েছেই, তাছাড়াও বেশ্যা, হিজরা প্রভৃতি অংশও অসংগঠিত শ্রমিকদের অংশ। কেননা পরম্পরাগত শোষণভিত্তিক অতীতের সমাজের পরিস্থিতির মতোই, পুঁজিবাদের বর্তমান বিশ্বায়নের ব্যবস্থার অন্যতম শোষিত অংশ শেষোক্তদ্বয়। অতীতের তুলনায় বর্তমানে এদের উপর শোষণ অনেক বেড়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের মধ্যে যারা সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অথচ তথাকথিত তত্ত্বের বাগাড়ম্বর করেন, সেই সব অংশই বেশ্যা, হিজরা ইত্যাদি অংশকে এখনও উপেক্ষা করছেন; তারফলে তারা কার্যকালে উপেক্ষিত হচ্ছেন নিজ অনুগামী অংশের দ্বারা। তাছাড়া, অসংগঠিত বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতি ট্রেড ইউনিয়নের উপেক্ষার সুযোগ নিচ্ছে নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনগুলি। তারা এদের শ্রেণী-নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগঠিত করে শাসকশ্রেণীকে পরোক্ষ সহযোগিতা যেমন করছে, সমান্তরালে ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিকে সংকুচিত করে চলেছে। অথচ বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সংখ্যক অনুগামীদের সমবেতকরণের কাজটি ট্রেড ইউনিয়নের সামনে এখন প্রথম কাজ। 'ন্যূনতম কর্মসূচী, বৃহত্তম অংশগ্রহণ' এর সাংগঠনিক-আন্দোলনগত নীতি, তাই এখন দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' এই সত্যর উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান যুগের যথার্থ মূল্যায়নকে কাজে লাগিয়ে আশু সমস্যা ও দাবী দাওয়ার আন্দোলনে অনুগামীদের ক্রমে যুক্ত করা সম্ভব। ধৈর্য্যের সাথে এই আন্দোলন গড়ে তুলেই শ্রেণী-চেতনাভিত্তিক আন্দোলনের স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে উন্নীত করা সম্ভব। সর্বত্র নেতিবাদ যখন প্রবল, তখন প্রত্যেকটি ইতিবাচক দিক বা সাফল্যের ঘটনাকে সার্থকভাবে প্রচারে ব্যবহার করতে পারলে শেষোক্ত কাজের প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে। আস্থাহীনতার যে কোন সংকট কাটানোর অন্যতম সূত্রও হতে পারে এই প্রক্রিয়া।

ট্রেড ইউনিয়ন যেহেতু অন্যতম প্রধান ও শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন, স্বভাবতই এটির সংগঠকরা সমাজ-বিজ্ঞানীর যথার্থ ভূমিকা পালনে উদ্যোগ না নিতে পারলে, বর্তমানের জটিল সমাজ জীবনে সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেনা। আর, সমাজের সমস্ত দিক নিয়ে নিরন্তর চর্চা ব্যতীত, সেই ভূমিকা পালনের প্রাথমিক শর্ত গড়ে উঠতে পারে না। স্মরণ রাখা দরকার যে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থাতে আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক যতখানি পরিবর্তন ঘটেছে, তার চেয়ে গুরুতর ও প্রভাবমূলক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক মনস্তত্ত্বে তথা সাংস্কৃতিক স্তরে। অতীত বিশ্বের পরিচিত ধারণা নিয়ে এই নতুন বিশ্বের প্রান্তটুকু পর্যন্ত স্পর্শ করা প্রায় অসম্ভব। ট্রেড ইউনিয়নের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হলো, এক্ষেত্রে নেতৃত্ব-সংগঠকদের মধ্যে থেকে যাওয়া প্রবল দুর্বলতা, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে।

কাঠামোর ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক সমস্যা রয়েছে তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নের। তাছাড়া প্রবল অসমান বাস্তবতা তো রয়েছেই। ধ্রুপদী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে স্ব স্ব দেশের শ্রমজীবীদের পরম্পরাগত সামাজিক সংগঠনগুলির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন একদা গড়ে উঠেছিল।

এগুলির কাঠামোগত প্যাটার্ন আরোপিত হয়েছে তৃতীয় দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নে। পুঁজি ও শ্রমের বিশ্বময় সর্বজনীন নিয়মের দ্বারা সমস্ত দেশের ট্রেড ইউনিয়নের মৌলিক নীতিগুলি পরিচালিত হলেও, কাঠামোগুলিকে যথাসম্ভব হতে হবে দেশীয় পরিমণ্ডল, ক্ষেত্র বিশেষে, সামাজিক পরম্পরা ও বাস্তবতার যথাসম্ভব পরিপূরক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পশ্চাৎপদ সমাজের পশ্চাৎপদ সামাজিক সংগঠনের কাঠামোকে নতুন করে আকড়ে ধরা ও ব্যবহার করা। এখন এটা সম্পূর্ণ সম্ভবও নয়, কেননা দুনিয়াটা 'গ্লোবাল ভিলেজ' এ পরিণত হওয়ায় এবং তথ্য-প্রযুক্তির তীব্র গতি এবং নিরন্তর ও সর্বময় অভিঘাতের পটভূমিকায় তেমন কোন যান্ত্রিক ধারণা ও প্রয়াস ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই দেবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে স্বীয় দেশের মাটি ও সমাজে দাঁড়িয়েই ট্রেড ইউনিয়নকে কাজ করতে হবে। প্রসঙ্গত এন.জি.ও.গুলির সাংগঠনিক কাঠামো ও জনগ্রাহিতা অর্জনে অনুসৃত পদ্ধতিগুলির সাফল্য, প্রসঙ্গটির গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে। তাই, অনুগামীরা ছাড়াও দেশের জনগণ যাতে পুনরায় ও নতুন করে ট্রেড ইউনিয়নকে আপন ভাবতে পারে, সেই প্রাথমিক শর্ত সৃষ্টি করার কাজটি বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই কাজে সমাজ-পরম্পরা ও সমাজ-মানসের উপাদানকে কোনভাবেই খাটো করে দেখা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নকে সর্বতোভাবে সর্বাধুনিকও হতে হবে। এই আধুনিকতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নের সর্বসময় জ্ঞাত থাকা। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হওয়া উচিৎ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতার বিনিময়। এই পটভূমিকায়, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে শ্রমজীবীদের আঙ্গিকে ও চিন্তনে যে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাকে ধারণ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ হলো ট্রেড ইউনিয়নের আধুনিকতা অর্জনের অন্যতম কাজ। অন্যান্য প্রসঙ্গের মতো, ট্রেড ইউনিয়ন বর্তমানে এই ধরনের দুই মেরুর মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার কাজের মতো কঠিন সমস্যার মুখে দাঁড়িয়েছে। যুগ পরিস্থিতি এইরকম ও সেগুলির সমাধান যুগ-কর্তব্য। পরিস্থিতির উপযোগী সংগঠন গড়ার কাজটির চরিত্র তাই এমন দায়িত্বপূর্ণ ও কঠিন।

মোটের উপর ট্রেড ইউনিয়নের সামগ্রিক পুনর্গঠনের কাজটি বর্তমানে এতো ব্যাপক ও বহুধা মাত্রা সম্পন্ন হয়ে পড়েছে যে তার সবগুলি দিক এখনও, চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছেনা। সুতরাং এগুলির প্রত্যেকটি প্রসঙ্গে বিতর্ক থাকতে পারে—থাকাই স্বাভাবিক এবং তা স্বাগতও বটে; তাই প্রসঙ্গগুলি উন্মুক্ত থাকা দরকার। সেই রকম কোন আলোচনা বা বিতর্ক ভবিষ্যতে চললেও ট্রেড ইউনিয়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণের কাজ অবিলম্বে হাতে নিতে হবে ট্রেড ইউনিয়নকেই। এই সুবিশাল কাজ সম্পন্ন করা কোন একক মহা-মনীষীর পক্ষেও সম্ভবত অসম্ভব;এটা সম্ভব হতে পারে শ্রমজীবীদের সংকল্প ও যৌথ প্রয়াসের দ্বারা। সেই লক্ষ্মণও এখন কিছুটা দেখা যাচ্ছে। সর্বোপরি, যে সত্য পুনরায় নির্ধারকভাবে নতুন করে প্রমাণিত হচ্ছে তা হলো, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন এক মুহূর্তের জন্যও লুপ্ত হওয়ার নয়। কেননা ট্রেড ইউনিয়ন ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক নিয়তি, তাই পরস্পরের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।

নির্ঘণ্ট

ফ

ব

কিছু সূত্র

(A Few References)

A

Abbot, P and Sapsford, R	:	Woman and Social Class, 1987
Abercrombie, N	:	Class, Structure and Knowledge, 1980
Abercrombie, N : and Urry, J	:	Capital, Labour and Middle Classes, 1983
Abeysekera, Charles and Newton Gunasinghe edited	:	Facts of Ethnicity in Sri Lanka, 1987
Ackoff, Russel	:	Redesigning the Future, 1974
Adams, R. J.	:	The Growth of White Collar Unionism in Britain and Sweden : A Comparative Investigation, 1975
Adam, G	:	'Multinational Corporations and Worldwide Sourcing' in H. Radice edited International Firms and Modern Imperialism, 1975.
Adam B	:	Time and Social Theory
Ahmad, Mumtaz	:	'Islamic Fundamentalism in South Asia' : The Jamaat-i-Islami and the Tablighi Jamaat' in Martin E. Marty and R. Scott Appleby edited Fundamentalism observed, 1991
Akiner, Shirin	:	The Islamic Peoples of the Soviet Union, 1983
Akiner, Shirin edited	:	Mongolia Today, 1991
Allen, V. L.	:	'The Paradox of Militancy' in Blackburn, R and Cockbunn, A edited The Incompatibles, 1967
Allen, V. L.	:	The Sociology of Industrial Relations, 1971.
Alvater, E	:	'Multinational Corporation and Labour Class' in K. Tudyka edited Multinational Corporations and Labour Unions, 1973.
Amin Samir	:	Imperialism and Unequal developments, 1977.
Amin, Samir	:	Unequal Development. A.essay on the Social Formations of Peripherieal Capitalism, 1976
Amsdon, A. H. edited	:	The Economics of Women and Work, 1980
Ammerman, Naney T	:	'North American Protestant Fundamentalism' in Martin E. Marty and R. Scott Appleby edited Fundamentalism observed, 1991.
Anderson, M	:	Sociology of Family, 1975
Anderson, P	:	Consideration on Western Maxism, 1976.
Anthony, P.O.	:	The Ideology of Work, 1977.
Antoum, Richand T and Mary Elain Hegland edited	:	Religions Resurgence ; Contemporary cases in Islam, Christanity and Judaism, 1987.
Anderson, Walter K and Shridhar D, Damle	:	The Botherhood in Saffron : The Rashtriya Swayam Sevak Sangh and Hindu Revivalism, 1987.
Anthony, Giddens	:	The Transformation of Intimacy, Sexuality, Love and Eroticism in Modern Society, 1993.

Arrighi, G : 'International Corporations, Labour Aristocracy and Economic Development in Tropical Africa' in G. Arrighi and J. S. Saul edited Esseys on the Political Economy of Africa, 1970.

Aronowitz, S : The Professional - Managerial Class or Middle Strata.

B

Banks, J. A. : Social Movements, 1972.

Banks, J. A. : Trade Unionism, 1974.

Barkin, S : Social Contracts in Europe, 1977.

Bassett, P : Strike Free, 1984.

Barnet, R and Muller, R : Global Reach : The Power of the Multinational Corporations, 1974.

Barnet, D and Sharpe, K : Transnational Corporations versus the State, 1985.

Barratt, M : Women's Oppression Today, 1980.

Barratt, M and Me Intosh, M : The Antisocial Family, 1982.

Banman, Z : Intimations of Post–Modernity, 1992.

Badinter, Elizabeth : Myth Motherhood, 1981.

Bahro, R : Socialism and Survival, 1982.

Ben-Ner, A : 'Non-Profit Organisation. Why do they Exist in Market Economics', in Susan Rose Ackerman edited 'The Economics of Non-Profit Institutions, 1986.

Bendiner, Burton : International Labour Affairs. The World Trade Unions and the Multinational Corporations, 1987.

Beamont, P : The Decline of Trade Union Organisation, 1987.

Berger, P : The Human Shape of Work, 1964

Bendiner, Burton : International Labour Affairs, The World Trade Unions and the Multinational Companies, 1987.

Beek, U : Risk Society, 1992.

Bell, C : Middle Class Families, 1968

Bell, Daniel : The Coming of Post-Industrial Society, 1974.

Bell, Daniel : The Cultural Contradictions of Capitalism, 1976.

Berg, I edited : Sociological Perspectives on Labour Markets, 1981.

Berle, A. A. and Means, G. C. : The Modern Corporation and Private property, 1932.

Bernstein, R. J. : The Restructuring of Social and Political Theory, 1976.

Benavides, Gustavo and M. W. Daly edited : Religion and Political Power, 1989.

Berman, Marshall : All that is solid melts into Air : The Experience of Modernity, 1988.

Billerfulk, K and Yasugi, Y : Private Direct Foreign Investment in Developing Countries, 1979.

Blaisdell, Donald C : International Organisation 1966.

Blackburn R and Mann, M : The Working Class in the Labour Market, 1979.

Block, Edwin A	:	Representation of Non-Governmental Organisations at the United Nations, 1955.
Blackbunn, R. M.	:	Union Charter and Social Class : A study of White Collar Unionism, 1967.
Blau, P.M.	:	Exchange and Power in Social Life, 1964.
Blau, P.M. and Duncan, O. D.	:	The American Occupational Structure, 1967
Blanner, R	:	Alienation and Freedom, 1964
Bocock, R	:	Ideology of Work, 1985.
Bottomore, T. B.	:	Classes in Modern Society, 1965.
Bottomore, T. B.	:	Elites and Society, 1966.
Bottomore, T.B. edited	:	A Dictionary of Marxist Thought, 1975.
Bourdien, P	:	Distinction, 1984.
Boumann, Red E and Kenneth M Jensen edited	:	Religion and Politics, 1989.
Boris, Eileen	:	Home to Work, 1994.
Brain, G. S.	:	The Growth of White Collar Unionism, 1970.
Brain, G. S. and Elsheikh, F	:	Union Growth and the Business Cycle : An Econometric Analysis, 1976
Braverman, H	:	Labour and Monopoly Capital, 1974.
Brewer, A	:	Marxist Theories of Imperialism : A Critical Survey, 1980.
Brown, R	:	'Women as Employees : Some comments on Research in Industrial Sociology' in D. L. Barkar and S. Allen edited Dependence and Exploitation in Work and Marriage, 1976.
Brown, R	:	Understanding Industrial Organisation, 1992.
Brown, Paul and Faulder, Carolyn	:	Treat Yourself to Sex
Burktt, B and Bowers, D	:	Trade Unions and the Economy, 1979.
Burnham, J	:	The Managerial Revolution : What is happening in the World, 1941.

C

Castells, M	:	Class, City and Power, 1978
Capps, Walter H	:	The New Religions Right : Piety, Patriotism and Politics, 1990.
Callinicos, Alex and Harman, Chais	:	The changing Working Class, 1987.
Chanberlain, N. W., Gullen, D. E. and Lewin, D	:	The Labour Sector, 1980.
Chomsky, Noam	:	Detering Democracy, 1991.
Chomsky, Noam	:	Year 501. The Conquest Continues, 1993.
Chiang Pei-heng	:	Non Governmental Organisations At the United Nations Identity, Role and Function, 1981.

Chen, E : Multinational Corporations, Technology and Employment, 1983.
Chandler, A.D. and D aems, H : Manegerial Hierarchies : Comparative Perspectives on the Rise of the Industrial Enterprise, 1980.
Chodorow, N : Feminism and Plycho - analysis Theory
Chaddah, Mehar Singh : Arc Sikhs a Nation? 1982
Chandler, Alfred : The Visible Hand, 1980
Chapple, Stenen and Talbot, David : Burning Desires, 1990
Clegg, H. A. : Trade Unionism under Collective Bargaining, 1976
Clarke, J, Critcher, C and Johnson, R : Working Class Culture, 1979
Cleveland, Harlan : Agenda for an Open Movement, 1991
Clarke, I.M. : The Spatial Organisation of Multinational Corporations, 1985.
Clegg, Hugh : Trade Unionism under Collective Barganing, 1976
Coates, K and Toplianr, T : Workers' Controll, 1970
Cohen, Bernard C : The Influence of Non-Governmental Groups on Foreign Policy Making, 1959
Cole, G. D. H. : Self-Government in Industry, 1972.
Cockburn, C : Brothers : Male Dominance and Technological Change, 1983.
Coyle, A : Redundant Women, 1984
Cohen, B : The Question of Imperialism : The Political Economy of Dominance and Dependance, 1977.
Colombo, Umberto and Oshima, Keichi edited : Technology Blending, an Appropriate Response to Development 1989.
Connor, S : Post-Modernist Culture
Cott, Nancy : The Bonds of Womanhood, 1977
Crouch, C : Class Conflict and the Industrial Relations Crisis, 1977
Crouch, C : The Politics of Industrial Relations, 1979
Crompton, R and Jones, G : White Collar proletariat : Deskilling and Gender in Clerical Work, 1984
Crompton, R : Class and Stratification : An Introduction to Current Debates, 1993
Crompton, R and Gubbay, J : Economy and Class Structure, 1978
Crompton, R and Jones, G : White Collar Proletariat, 1984
Crompton, R and Mann. M edited : Gender and Stratification, 1986
Croix, G.E.M. de ste : The Class-Struggle in the Ancient Greek World, 1981

D

Damanpour, Fariborz : Organisational Innovation : A Meta Analysis of Effects of Determinants and Moderators, 1991
Danial, W. W. and Milward, N : Workplace Industrial Relations in Britain, 1983
Davis, H. B. : 'The Theory of Union Growth' in Mecarthy, W.EJ. edited The Trade Unions, 1972

Dahrendorf, R : Society and Democracy in Germany, 1967
Davis, H. B. : Towards a Marxist Theory of Nationalism, 1978
Davis, Winston : 'Fundamentalism in Japan : Religions and Political' in Martin E. Marty and R. Scott Appleby edited Fundamentalisms Observed, 1991.
Das, Veena edited : The Word the World : Fantacy, Symbol and Record, 1986.
Dally, Awan : Inventing Motherhood, 1982
Damanpour, Faribroz and William, M. Evan : Organisational Innovation and Performance : The Problem of Organisational Lag, 1984
Deem, Rosemary and William, M Evan : Work, Unemployment and Leisure, 1988
Deem, R and Salaman, G: Edited : Work, Culture and Society, 1985
Delphy, C : Close to Home, 1984
Dex, S : The Sexual Division of Work, 1985
Deutsch, Eliot edited : Culture and Modernity : East - West Philosophical Perspective, 1991
Delaney, J. T., Fiorito, J and Jarley, P. : Union Innovation and Effectiveness. Results from the National Union Survey, 1991
Dogma, M and Kasarda, J.D. edited : The Metropolis Era, Vol. II, 1988
Doeringer, P.B. and Piore, M.J. : International Labour Markets and Manpower Analysis, 1978.
Donzelot, J : The Policing of Families, 1979
Donaldson, L : In Defense of Organisation Theory, 1985
Dreyfus, H. L. : Being-in-the-World, 1971
Drue Ker, Peten : Managing in Tarbulent times, 1993.

E

Edelstein, J. D. and Warner, M : Comparative Union Democracy, 1979
Edwards, P, Garconna, P and Todling, F edited : Unions in Crisis and Beyond, 1986
Edwards, R : Contested Terrain, 1979
Edelstein, J. D. and Warner, M : Comparative Union Democracy : Organisation and Opposition in British and American Unions, 1975
Eldridge, J.E.T. : Sociology and Industrial Life, 1973
Elias, N : Involvement and Detachment, 1986
Ellis, Albert and Abarabance, Albert : Encyclopaedia of Sexual Behaviour, 1951
Ellis. Havelock : Psychology of Sex. 1946

Featherstone, M : Consumer Culture and Post-Modernism, 1991
Ferner, A and Colling, T : Privatisation, Regulation and Industrial Relations, 1991
Finnegan, R : What is Work? 1985

Finnegan, R : Working outside Formal Employment' in R. Deem and G. Salman edited Work, Culture and Society, 1985
Firestone, S : The Dialectics of Sex : The Case of Feminist Revolution, 1970
Filtzer, Donald : Soviet Workers and Stalinist Industrialization : The Formation of Modern Soviet Production Relations, 1928-1941, 1986
Filtzer, Donald : Soviet Workers and De-Stalinisation : The Consolidation of The Modern System of Soviet Production Relations, 1953-1964, 1992
Filtzar, Donald : Soviet Workers and the Collapse of Perestroika : The Soviet Labour–Process and Gorbachev's Reforms, 1985-1991. 1994
Fitz Patrick, Sheila : 'The Great Departure : Rural-Urban Migration in the soviet Union, 1929-33', in Social Dimensions of Soviet Industrialization, edited by William G. Rosenberg and Lewis H. Sieglbaum, 1993
Fox, A : A Sociology of Work in Industry, 1972
Foucanlt, M : History of Sexuality, 1979
Foucault, Michel : 'Technology of the Self' in Luther H Martin et al edited Technologies of the Self, 1988
Freedman, M : 'The Search for Shelters' in K. Thompson edited Work, Employment and Society, 1985.
Frank, A. G. : Capitalism and Under development of Latin America, 1969.
Frank, A. G. : Lumpen bourgeoisie : Lumpen - development, 1972
Frank, A., G. : Crisis in the Third World, 1981
Friedman, A : Industry and Labour, 1977
Frobel, F., Heinrich, J. and Kreye, O : The New International Division of Labour, 1977
Friedman, A. L. : Industry and Labour, 1977
Froomkin, J. N. : 'Automation' in D. L. Sills edited International Encyclopedia of Social Science, 1968
Friedman, Robert : The False Profit : Rabbi Meir Kahane – From FBI Informant to Knesset member, 1990
Frend, Sigmnd : 'The Sexual Aberration' in Three Essays on the Theory of Sexuality, 1953.
Fukuyama, Francis : The End of History and the Last man, 1992

G

Gardner, Richard and Max F. Millikan edited The Global Partnership : International Agencies and Economic Development, 1968
Gallic, D : In Search of New Working Class : Automation and Social Integration within the Capitalist Enterprise, 1978
Garden, Barbara : The Electronic Sweatshop, 1988
Gates, B : The Road Ahead, 1995
Gershuny, J and Jones, S : 'The Changing Work/Leisure Balance in Britain : 1961–

84 in J Horne, D. Jary and A. Tomlison edited Sport, Leisure and Social Relations, 1987.
Gershuny, J and Rahl, R : Britain in the Decade of the Three Economics, 1985
Gellner, E : Muslim Society, 1982
Ghayasuddin, M edited : The Impact of Nationalism on the Muslim World, 1986
Ghotoskar, S : Management Studies in the 1990s and Need for Framing new Union Stratagies, 1992
Giddens, A : A Contemporary Critique of Historical Materialism, 1981
Giddens A : The Constitution of Society : Outline of the Theory of Structuration, 1984
Giddens, A : The Nation – State and Violence (Contemporary Critique of Historical Materialism II), 1985
Giddens, A : The Consequences of Modernity, 1990
Giddens, A : Modernity and Self-Identity : Self and Society in Late Modern Age, 1991
Giddens, A : The Transformation of Intimacy, Sexuality, Love and Erotiesm, 1992
Gilter, George : Life After Television, 1992
Giddens, Anthony : Modernity and Self Identity, 1991 Glass, D.V. and Revelle, R
Glass, D. V. and Revelle, R : Population and Social change, 1972
Gladney, Dru : Muslim Chinese : Ethnic Nationalism in Peoples' Republic, 1991
Goldthrope, J. H., Lockwood, D., Bechhofer, F and Platt, J : The Affluent Worker : Industrial Attitudes and dBeavior, 1968
Goldthrope, J.H., Lockwodd, D, Behofer, F and Platt, J : The Affluent Worker in the Class-Structure, 1969.
Goldthorpe, J. H. : Social Mobility and Class Structure in Britain, 1980
Goldthorpe, J. H. edited : Order and Conflict in Contemporary Capitalism, 1985
Goldthrope, J. H. : Social Mobility and Class Structure in Modern Britain, 1987
Goldthorpe, J. H. and Hope, K : The Social Grading of Occupation : A New Approach and Scale, 1974
Gorden, D.M. Edward, R and Reich, M : Segmented Work, Devided Workers, 1982
Gorz, A : Strategy for Labour, 1967
Gouldner, A. W. : The Future of Intellectuals and Rise of the New class, 1979
Gouldner, A. W. : The Two Marxisms : Contradiction and Anamolies in the Development of Theory, 1980
Greer, G : The Female Eunuch, 1970
Gorz, A : Farewell to the Working Class, 1982 Grossman, Lawrence
Grossman, Lawrance : The Electronic Republic, 1995
Grem, G : The Female Eunuch Paladin, 1970
Gurevitch, M, Bennett, J, Curran, J and Woollacacott, J. edited : Culture, Society and Media, 1982.

Habermas, J : Communication and the Evolution of Society, 1979
Hall, Peter Dobkin : 'A Historical overview of the Social Condition, 1981
Hall, J.A. : Diagonoses of Our Time : Six view of our Private Non-Profit Sector ; in Powell, 1987
Hansmann, Henry : The Role of Non-Profit Enterprise. The Yale Law Journal. '89 (5)
Hall, S and Gielien, B : Formation of Modernity, 1992
Harris, C. C. : : The Family, 1969
Hant, N : When Marriage Ends : A study in Status Passage, 1989
Harvey, D : The Condition of Post Modernity, 1989
Harmondsworth : The History of Sexuality, Vol I, 1981
Harrison, Bennet : Lean and Mean : The Changing Landscape of Corporate Power in the Age of Flexibility, 1994
Hage, J : Theories of Organisation, 1980
Hero, Alfred O, : Voluntary Organisation in World Affairs Communications, 1960
Heath, A : Social Mobility, 1981
Hinton, J : The First Shop Stewards' Movement, 1973
Hill, S : Competition and Controll at Work, 1981
Hindess, B : The Decline of Working-Class Politics, 1971
Hood, N and Young, S : The Economics of Multinational Enterprise, 1979
Hooks, B : Feminist Theory : From Margin to Centre, 1984
Hofstede, Geet : Culture's Consequences : International Differences in Work-Related Values, 1980
Hobsbawm, Eric : The Age of Extremes : A short Twentieth Century, 1914-1991, 1995
Holmes, Leslie : Post - Communism : An Introduction, 1997
Hrist, P and Zeitlin, J : Flexible Specialization and Post Fordism : Theory, Evidence and Policy Implication, 1991
Hyman, R : Strikes, 1977
Hyman, R : Marxism and the Sociology of Trade Unionism, 1975
Hyman, R : Industrial Relations : A Marxist Introduction, 1975

I

Iehniowiski', C and Zax, J.S : Today's Association, Tomorrows Unions, 1990
Irigury, L : This Sex which is not One, 1977

J

Jackson, M. P. : Industrial Relations, 1977
Jackson, M. P. : Trade Unions, 1988
Jameson, F : Post Modernism, 1991
James, P. J. : Voluntary Agencies : True Mission
Jenkins, J Craig : 'Non-Profit Organisations and Policy Advocate in Powell, 1987

Jenkins, Rhys : Transnational Corporations and Uneven Development : The Internationalisation of the Capital and the Third World

Jenkins, R. O. : Transnational Corporation, Competitive and Monopoly, 1986

Jhonson, T. J. : 'The Professions in the Class Structure' in R. Scase edited Industrial Society : Class, Cleavage and Control, 1977

Juergensmeyer, M : Religious Nationalism Confronts The Secular State, 1994

K

Kahn, T. S. : The Structure of Scientific Revolutions, 1970

Kendall, W : The Labour Movement in Europe, 1975

Kerr, C. Dunlop, J. T., Harbison, F. H. and Mayers, C. A. : Industrialism and Industrial Man, 1962

Kelly, Liz : : Surviving Sexual Vidence, 1988

Kelly, J and Kelly, C : Theme and Us : Social Psychology and New Industrial Relations, 1991

Kelly, J : 'Union Militancy and Social Partnership', 1995

King, Alaxander and Schneider, Bertrand : The First Global Revolution, 1991

Kinsey, Pomeroj and Martin : Sexual Behaviour in the Human Female, 1948

Kimberly, J. R. : Managerial Innovation, 1981

Knoke, David : Organising for Collective Action, 1990

Korten, David C and Rudi Klanss edited : 'People-Centered Development. Contributions Towards Theory and Planning Frame Works, 1984

L

Lane, T : The Union Makes Us Strong, 1974

Lall, S : The Multinational Corporations, 1980

Lash, S and Urry, J : The End of Organised Capitalism, 1987

Lawrence, Bruce B : Defenders of God : The Fundamentalist Revolt Against Modern Age, 1989

Lapidus, Ira M. A. : History of Islamic Societies

Lenin, V. I. : Imperialism : The Highest Stage of Capitalism (Reprinted 1972)

Levinson, C : International 'Trade Unionism, 1972

Lefebvre, H : Critique of Everyday Life, 1991

Lipset, S. M., Trow, M.A. and Coleman, J. S. : Union Democracy, 1956

Lipset, S.M. and Bendix, R : Social Mobility and Industrial Society, 1959

Littler, C. R. : The Development of the Labour–Process in the Capitalist Societies, 1982

Littler, C. R. : 'Taylorism, Fordism and Job-Design' in D. Nights, H. Willmott and D. Collinson edited Job Redesign : Critical Perspectives on the Labour Process, 1985.
Loveridge, R : Occupational Change and the Development of Interest Groups Among White Collar Workers in the U.K. : A Long Term Model, 1972
Lockwood, D : Solidarity and Schism : 'The Problem of Order' in Durkheimian and Marxist Sociology, 1992
Lowith, K : Max Weber and Karl Marx, 1993.
Lumley, R : White Collar Unionism in Britain, 1973.
Lyotand, J. F. : The Post-Modern Condition : A Report on Knowledge, 1984

M

Maynard, M : 'House works and Their Work' in R. Deem and G. Salman edited Work, Culture and Society, 1985
Mandel, E : Late Capitalism, 1976
Mallet, S : The New Working Class, 1975
Mann, M : Consciousness and Action in the Western Working Class, 1973
Martin, D : Dilema of Contemporary Religion, 1978
Martin, J and Roberts, C: Women and Employment : A Lifetime Perspective, 1984
Macoby, E.E. and Jacklin, C.N. : The Psychology of Sex-Difference, 1974
Marcuse, Herbert : Eros and Civilization, 1970
Marcuse, Herbert : On Hedonism, 1968
Massey, D : Spatial Division of Labour : Social Structure and Geography of Production, 1984
Meier, G : 'Private Investment' in J. Dunning edited 'International Investment', 1972
McGowan, William : The Tragedy of Sri Lanka, 1992
McKenna, Richard : Relationship Marketing, 1991
Meszaros, I : Beyond Capital, 1995
Mirvis, Philip and Edward Hackett : Work and Work-Force Characteristics in the Non-Profit Sector. Monthly Labour Review, 1983
Millet, K : Sexual Politics, 1969
Mitchell, J : Women : The largest Revolution, 1974
Mitanura, Taisuke : Chinese Eumuch : The Structure of Intimate Politics, 1970
Moberg, David O : The Church as a Social Institution : The Sociology of American Religion, 1962
Moore, B : Injustice : The Social Bases of Obedience and Revolt, 1978
Morgan, D : Social Theory and Family, 1975
Mulvey, C : The Economic Analysis of Trade Unions, 1978
Murray, R edited : Multinationals Beyond the Market, 1981
Mytelka, L : Regional Development in Global Economy, 1979

Nassar, Jamal R and Roger Heacock : Intifada : Palestine at the Cross Road, 1990

Nelson D : Managers and Workers, 1975

Newby, H : The Deferential Worker, 1977

Nisleet, R. A. : Conversation, 1986

Nichdson, N, Gunsell and Blyton, P : The Dynamics of White Collar Trade Unionism, 1981



Oakley, A : House Work, 1974

Oakley, A : House wife, 1976

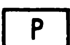
Oakeshott, R : The Case of Workers' Co-ops. 1978

Olson, Mancur : The Logic of Collective Action, 1971

Oppenheim, C : Poverty : The Facts, 1990

Osborne, K. O. H. and G. A. Armstrong : An Evaluation of the Joint Funding Scheme, 1982

Osssowshi, S : Class and Class Structure in Consciousness, 1963



Pahal, R : Division of Labour, 1984

Pahl, Samuel : Managing Development Programmes, 1982

Pahl, R. E. : Whose City? 1975

Parker, S. R. et al : The Sociology of Industry, 1972

Palloix, C : The Labour Process : From Fordism to Neo-Fordism, 1976

Parry, J : Competition and Monopoly in Multinational Relations with Host Countries' in R. G. Hawkins edited 'The Economic Effects of Multinational Corporations,' 1979

Parkin, F : Marxism and Class Theory : A Bourgeois Critique, 1979

Parkin, F : Class, 'n Quality and Political Order, 1971

Pfeffer, J : Power in Organisation, 1981

Pfeffer, J : Organisational Design, 1978

Phillips, G. A. : The General Strike, 1976

Phizacklea, Annie and Wolkowitz, Carol : Home Working Women, 1995

Piccotto, S : 'Firm and State in the World Economy' in J. Faundez and S. Piccotto edited The Nationalization of Multi nationality in Peripherial Economics, 1978

Pickvance, C. G. : Urban Sociology, 1976

Piose, M and Sabel, C.F. : The Second Industrial Divide, 1984

Plant, S : The Most Radical Gesture : The Situationist International in a Post Modern Age, 1992

Pollert, A edited : Farewell to Flexibility? 1991

Pope, Daniel : The Marketing of Moden Advertising, 1983

Pollert, A : 'Team Work' on the Assembly Line : Contradictions and Dinamies of Union Reliance, 1995

Premdas, Ralph R., et all edited : Secessionist Movements in Contemporary Perspective, 1990

R

Rapoport, David C. edited : Inside Terrorist Organisations, 1988

Ramanathan, K. V. : Management Control in Non-Profit Organisations, 1982

Raymond, Jauice : A Passion for Friends, 1986

Reuber, G. L. : Private Foreign Investment in Development, 1973

Rugman, A and Eden, L edited : Multinationals and Transfer Pricing, 1985

Reed, M. I. : The Sociology of Organisations, 1992

Reinhazz, S : Feminist Method in Social Research, 1992

Rex. J : Social Conflict : A Conceptual and Theoretical Analysis, 1981

Rex. J : Race Relations and Sociological Theory, 1970

Reich, Wilhem : Character Analysis, 1950

Reich, Wilhem : The Sexual Revolution, 1962

Ritzer, G : The McDolization of Society, 1993

Rose-Ackerman, Susan edited : The Economics of Non-Profit Institutions' Studies in Structure and Policy, 1980

Robinson, J : Multinationals and Political Control, 1983

Rolleerts, K, Cook, F.G., Clark, S. C. and Semeonoff, E : The Fragmentary Class Structure, 1977

Roleerts, K : The Working Class, 1978

Roi, Yaacov edited : The USSR and The Muslim World : Issues in Democratic and Foreign Policy, 1984

Rosen, George : Western Economists and Eastern Societies, 1985

Polurts, Nickie : Whores in History, 1993

Ross, Michaee : The Married Homosexual Man, 1983

Roemer, J : A General Theory of Exploitation and Class, 1982

Robertson, Ronald : Globalization : Social Theory and Global Culture, 1992

Runciman, W. G. : A Critique of Max Weber's Philosophy of Social Science, 1972

S

Salman, G : Work Organisations, 1979

Saunders, P : Social Theory and Urban Question, 1981

Salaman, L. M. : Partners in Public Service : The Scope and Theory of Government-NGO Relations, 1987

Sahliyen, Emile edited : Religious Resurgance and Politics in the Contemporary World, 1990

Schneider, Bertrand : The Scandal and the Shame
Schneider, Bertrand : The Bare-Foot Revolution : A Report to the Club of rome, 1988
Schneider, E. V. : E. V. Industrial Sociology, 1971
Schein, E. H. : Organisational Culture and Leadership, 1985
Scott, A : Ideology and New Social Movements, 1990
Scott, J : Corporation, Class and Capitalism, 1979
Schneider, Bertrand : The Bare-Foot Revolution, 1985
Schumacher, E. F. : Small is Beautiful : Economics as if People Mattered, 1973
Scott, J : 'Ownership and Employer Control' in D. Gallie edited Employment in Britain, 1988
Scott, J : The Upper Classes, 1982
Scott, W. R. : Organisational Structure, 1975
Seglow, P : Trade Unionism in Television, 1978
Sherman, B : The State of the Trade Unions, 1986
Sharpe, S : Just like a Girl : How Girls learn to be Women, 1979
Silnerman, D : The Theory of Organisations, 1970
Sivan, Emmanuel and Menachem Friedman edited : Religions, Radicalism and Politics in Middle East, 1990
Sklain, L : Sociology of the Global System, 1991
Smith, A. D. : National Identity, 1991
Smith, A. D. : 'Towards a Global Culture' in Mike Featherstone edited Global Culture : Nationalism, Globalization and Modernity, 1990
Soet, L : 'Technological Dependency : A Critical View' in D. Seers edited Dependency Theory, 1981
Sommer, John G : Beyond Charity : U. S. Voluntary Aid For a Changing Third World, 1977
Spencer, Jonathan : Sri Lanka : History and the roots of Conflict, 1990
Sprinzak, Ehud : The Ascendance of Israel's Radical Right, 1991
Stockman, F, Ziegler, R and Scott, J : Net works of Corporate Power : A Comparative Analysis of ten Countries, 1985
Stambolian, George : Male Fantasis/Gay Realities, 1984
Swingewood, A : The Myth of Mass-Culture, 1977
Swatos, William H (Jr.) edited : Religious Politics in Global and Contemporary Perspective, 1989

T

Taylor, R : Labour and the Social Contract, 1978
Taylor-Gooby : Social Change, Social Welfare and Social Science, 1991
Thomson, D and Larson, R : Where Were yours Brother? An Account of Trade Union Imperialism, 1978

Thomrson, E. P : The Poverty of Theory, 1978
Thompson, P : The Nature of Work : An Introduction to Debates on the Labour-Process, 1983
Therborn, G : The Ideology of Power and the Power of Ideology, 1980
Thornley, J : Workers Co-operatives : Job and Dreams, 1981
Thompson, Sharon : 'Search for Tomorrow OR Feminism and the Reconstruction of Teen Romance', in Carde S. Vance edited Pleasure and Danger. Exploring Female Sexuality, 1989
Thrift, N : 'Geography of International Economic Disorder' in A World in Crisis, edited by R. J. Johnston and J. P. Tylor, 1986
Thompson, E. P : The Making of English Working Class, 1988
Toennies, F : Community and Association, 1987
Touraine, A : The Post-Industrial Society, 1969
Traer, Robert : Faith in Human Rights : Support in Religious Traditions for a Global Struggle, 1991
Trompernaars, Fons : Riding the Wave of Culture : Understanding Cultural Diversity in Business, 1993
Turner, B. S. edited : Theories of Modernity and Post Modernity, 1990
Tylor, F. W. : Scientific Management (Reprinted : 1964)

U

Urry, J : The Anatomy of Capitalist Society-the Economy, Civil Society and the State, 1980

V

Vaitsos, C : 'Employment Effects of Foreign Direct Investment in Developing Countries' in E. Edwards edited Employment in Developing Nations, 1974
Vyas, M. D. and Shingala, Y : The Life of Style of Eunuchs, 1987

W

Wallerstein, Immanuel : Geo-Politics and Geo-Culture : Essays on the Changing World-System, 1991
Waxman, C. I. Edited : The End of Ideology Debate, 1968
Walker, K and Strans, E.B. : Sexual Abnormality in Male
Weisbrod, B. A. : The Non-Profit Economy, 1988
Westergaard, J and Resler, H : Class in Capitalist Society, 1975
West, J : Women, Work and the Labour Market, 1982
Weeks, J : Capital and Exploitation, 1981
Weeks, Jeffrey : Sexuality and its Discontents, 1985

Wheeler, F. Robert : International Labour and Working Class History, Labour under Communist Regimes.
Williams, K, Cutler, T. Williams, J and Haslam, C : The End of Mass-Production? 1987
Wilson, B : Religion and Sociological Perspective, 1982
Witz, A : Professions and Patriarchy, 1992
Williams, Raymond : The Politics of Modernism, 1989
Wilson, G. K. : Unions in American National Politics, 1979
Wood, E : The Retreat From Class, 1986
Wright, E. O. : Class Structure and Income Determination, 1979
Wright, E. O. : Class Crisis and the State, 1978
Wright, E. O. : Classes, 1985

Y

Yeandle, S : Women's Working Lives, 1984
Young, A : Feminity in Descent, 1990

Z

Zuboff, Shoshana : In the Age of Smart Machine, 1988
Zucker, L. G. : Institutionalised Theories of Organisations, 1987

Periodicals and Journals

Socialism Today / News Week / The Economist / Monthly Review / Science and Society / New Left Review

Note Book

Industrial and Labour Relations Review / Economic and Political Weekly / Occupational and Environmental Health / International Labour and Working-Class History / Socialist Register. / World Labour Report (I. L. O) / Front Line / India Today / Marxism Today.

News Paper

Economic Times / Times of India / Indian Express / The Hindu /The Statesman